বিরহ-বিধুরা।

শিল্পী—শ্রীনৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

তৃতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ৪ঠা বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৩। [২২শ সপ্তাহ

বাসন্তী পূর্ণিমা

[শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মৈত্র বি, এ]

জ্যোছনাময়ী সুন্দর মাধবী রাত্রি। রূপের প্লাবনে আজ সারাটী বিশ্ব প্লাবিত হ'য়ে গেছে। ফাল্গুনের পূর্ণিমা তিথি, ফাল্গুন তার আগুন বুকে নিয়ে মর্ত্ত্যে নেমে এসেছে। আজ বিশ্বে এসেছে সাড়া সখি জাগো, জাগো! সারাটী বছরের অশিব মুছে, সারাটী বছরের দৈন্য কেটে নিয়ে আজ এসেছে শান্তির বাণী। স্বপন পুরীর রাজকন্যা আজ মলয় বাতাস পাঠিয়েছে, তার প্রেমপদ্ম ফুটাবে বলে।

এস বসন্তের রাণী, এস আমার সবুজ প্রাণের প্রীতিতে, এস আমার মঙ্গল গীতিতে। এই নবীন সাঁঝে তুমি আসবে বলে, আমি বসে আছি। যুগ কেটে গেছে, বছর শেষ হয়ে গেছে আমি বসে আছি, তুমি আসবে বলে। এস তবে তুমি কবির বুকে, পাখীর গানে, জ্যোছনার হাসিতে, সবুজ প্রাণের তরুণ প্রীতিতে।

নিত্য চঞ্চলময়ী কিশোরী উর্ব্বশী আমার তুমি যে আসবে, তা তো আমি জানি। দিকে দিকে বাণী গেছে, বসন্তের রাণী এসেছে, পাপিয়া তার আগমনী গাইছে, কোকিল গাহিল বন্দনা, আকাশ তার মাথার উপরে নীল চন্দ্রাতপ বিস্তৃত করেছে। পৃথিবীর নব দুর্ব্বাদল দিল একখানি শাটী। রাণী এসেছে, রাণীর সাজে নিত্য চঞ্চলময়ী কিশোরী, হিল্লোলে হিল্লোলে, কম্পনে কম্পনে জগতে নেমে এসেছে।

এমনি একটা দিনে, বৃন্দাবনে এক তরুণ কিশোর, আর এক তরুণী কিশোরী, বিশ্ব রাঙিয়ে তুলেছিল তাদের হোলির আবির দিয়ে। তাদের রঙীন প্রেম পদ্মের পাপড়ি যে আজও আছে তেমনি রাঙা, তেমনি মধুর, তেমনি সতেজ। তাই আজও বিশ্বে এত হাসি, এত আনন্দ আজ সারা দুনিয়ায়

তরুণ তরুণীর বুকে সে প্রেম ফুলের পাপড়ি রঙীন হয়ে ফুটে উঠেছে। হোলি খেলা খেলতে হবে, ঐ বৃন্দাবনের বাঁশী বেজে উঠেছে।

আজ মলয় বাতাস দুলিয়ে দিয়ে গেল। ধীরে ধীরে পদ্মের পাপড়ি প্রস্ফুটিত হোলো। কোথায় তুমি, ওগো আমার স্বপ্ন জন্মান্তরের সাথী, নিত্য চঞ্চলময়ী তরুণী আশা, ফাল্গুনের বাতাস আজ আমায় দিয়েছে ভাষা। আমি আজ তোমার বন্দনা গাহিব, ঐ দখিন হাওয়ায় তোমার কেশের মৃদু বাস ভেসে আস্‌ছে।

দিনের পর দিন গেছে। ঠিক সার্দ্ধ চারি শতাব্দীর আগের আর একটী এম্‌নি ধরা স্তিমিত মৌন সন্ধ্যা। সেদিনও এম্‌নি হোলির উৎসব ছিল। পৃথিবী হোলির আবিরে লাল হয়ে উঠেছিল যেমনি করে তরুণী নববধূ লজ্জায় রাঙিয়ে ওঠে। সে এসেছিল, সারা নবদ্বীপ উৎসবে মেতে উঠেছিল। গোরা চাঁদ মর্ত্ত্যে নেমে এসেছিল প্রেমের বাণী নিয়ে, সে পাগল করা প্রেম পসরা নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছিল। তার বাঁশীর সুর এবার আর যমুনা নয়, সারা বাংলা প্লাবিত করে, পৌঁছেছিল সুদূর নীলাচলে।

আজ মৃদু বাতাস খেলছে লুকোচুরি। খেলতে খেলতে গোলাপের গণ্ডে দিল একটী ছোট্ট চুমা। লজ্জায় গোলাপ রাঙিয়ে উঠল, ঘোমটা খোলা বাসন্তী রাণী আজ নব যৌবন মদিরায় মত্ত হয়ে উঠেছে, মদের ফেনায় ফেনায় আজ আনন্দ উপ্‌চে উপ্‌চে উঠেছে।

দূরে—ঐ অতি দূরে ব্যর্থ প্রেমিকের বাঁশী হতে ব্যথার করুণ সুর ভেসে আস্‌ছে। আজ আনন্দের এই জাগরণে, ব্যথা ফুলে ফুলে গুম্‌রে গুম্‌রে উঠেছে। দাও দোলা দাও, দোলা দাও ওগো, ব্যথার রাণী, তোমার এ কোমল বুকে এ নিবিড় আলিঙ্গনে তুমি দুলিয়ে দিয়ে যাও।

গেল, গেল, ঐ সুখের পেয়ালা বুঝি ভাঙ্গল। জীবন পেয়ালা ভরে সুরা যত পার, পান কর। ঐ অমর কবি চীৎকার করে বলছে—

আজ ফাল্গুনের আগুন জ্বালে হতাশ বোনা শীতের বাস
পুড়িয়ে সে সব ছাই করে দাও—দাও আহুতি দুঃখের শ্বাস
আয়ু-বিহগ—খোঁজ রাখ কি—মেলিয়ে ডানা উড়ল হায়
পেয়ালাটুকু শেষ করে নাও—এক চুমুকেই ফাল্গুন যায়।

ঐ এক চুমুকেই ফাল্গুন চলে যায়, ঐ চাঁদ নিভে যাচ্ছে। মাধবী রাত্রির হাসিটুকু ঐ ম্লান হয়ে যাচ্ছে, তবে এস তরুণ, এস প্রেমিক, জীবন পেয়ালা আজ ভরে নাও, নূতন আশায়, নূতন সুরায়।
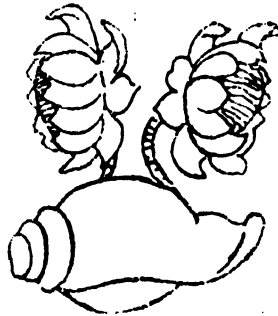
"গোকুলের ষাঁড়"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)
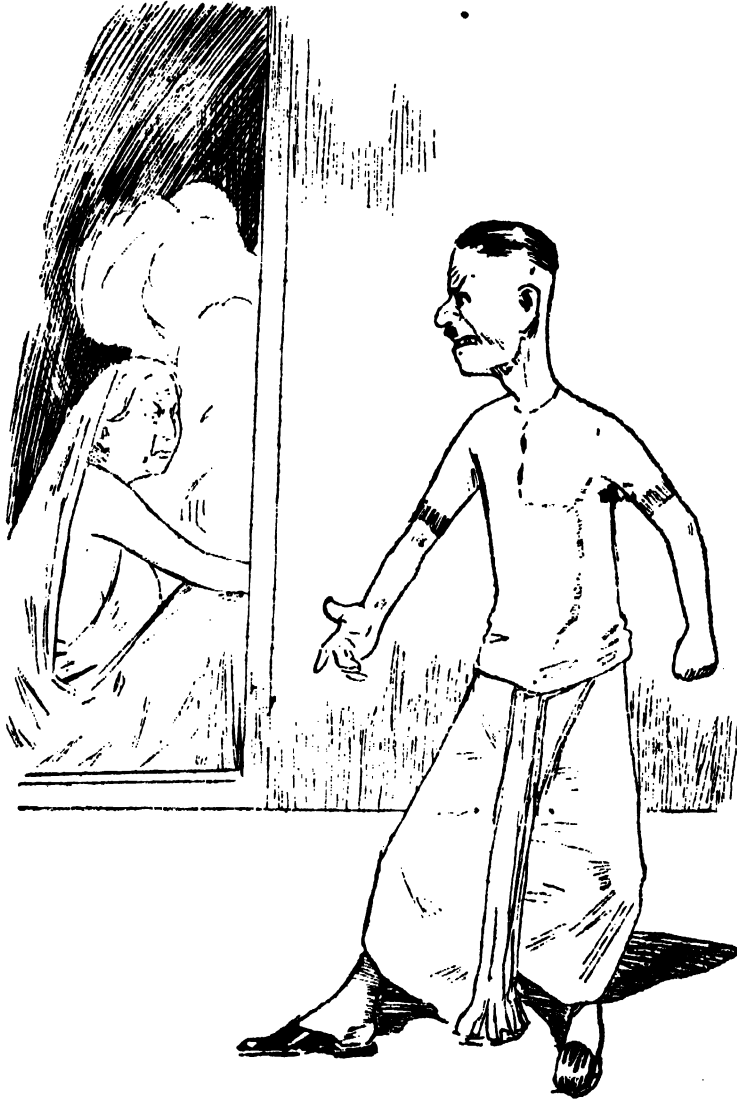
আহারের একটু বিলম্ব হ'লে সেদিন বৃদ্ধা মাতার কাঁধে মাথা থাকে না।

(৬)

দুপুর বেলা কি করেন—দোতলা ঘরের জানালা খুলে পরের বাড়ীর জানালার ছাদে দূরবীণ কষেন—

বন্ধ্যা

[শ্রীসুধীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়]

(ক)

মলয়ের বিয়ে হয়েছে আজ চার বছর। কিন্তু বাসন্তী তার শ্বশুর কুলে প্রদীপ দিবার জন্য একটীও পুত্র বা কন্যা এখনও পর্য্যন্ত শ্বশ্রু মাতাকে উপহার দিল না। মলয়ের মা হরিমতি বড় ভাবনায় পড়িলেন। বৌয়ের জন্যে তিনি কত রকমই না তুকতাক করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না—ঘর আলো করা নাতির মুখ আর তিনি দেখতে পেলেন না। সম্ভব, অসম্ভব, লম্বা গোল নানান রকমের মাদুলীর ভারে বাসন্তী বোধ হয় কিছু কুঁজো হয়ে গেল, কিন্তু "যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

গ্রামের মেয়েরা একজোট হয়ে পরামর্শ দিতে লাগল—"তোমার ছেলের আবার বিয়ে দাও-ও বৌ বাঁজা।"

প্রথমটা হরিমতি তাদের কথায় কাণ দেননি, কিন্তু শেষ কালে তিনিও তাদের মতে মত দিলেন। সত্যিই ত বাসন্তীর জন্যে কি তাঁর এত বড় শ্বশুর কুলে পিণ্ড দেবার লোক পর্য্যন্ত লোপ পাবে। হ্যাঁ যদি মলয়ের অন্য কোন ভাই থাকত তাহলে না হয় কথা ছিল। কিন্তু মলয় যে তাঁর একমাত্র বংশধর। তার যদি না ছেলে হয় তাহলে ত শ্রীরামপুরের মুখুয্যে বংশ লোপ পায়। এই সব ভেবে চিন্তে তিনি ছেলের আবার বিয়ে দেওয়াই ঠিক করলেন। পাত্রীও জুটে গেল—মলয়ের পুণর্বিবাহে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন ও বাড়ীর পদপিসি—তাঁরই এক ভাইঝি আছে, বেশ বাড়ন্ত গড়ন, মলয়ের সঙ্গে ঠিক মানাবে।

(খ)

"না সে হবে না তোমায় আবার বিয়ে করতে হবে।" বাসন্তী তার স্বামীকে এই কথা বললে।

বাসন্তীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে থাকবার পর মলয় হাসতে হাসতে বললে—"আচ্ছা রাণী আমি যদি আবার বিয়ে করি তাহলে তোমার কষ্ট হবে না?

বাসন্তীর টানা টানা চোখ-দুটী ছল ছল করে উঠল। কিছুদিন আগে সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি যে তার স্বামী আর একজনকে বিয়ে করবে। আজ চার বছর যে বুকে শুধু তারই একাধিপত্য ছিল, সেই অধিকার আর কেউ যে হঠাৎ কেড়ে নেবে একথা যে তার ভাবনার অতীত। তার স্বামী যে তাকে কতখানি ভালবাসে তা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করছে। আজও মলয় এই নিয়ে তার মার সঙ্গে ঝগড়া করেছে, আর এক রকম স্পষ্টই বলে দিয়েছে যে সে আর বিয়ে করতে পারবে না। কিন্তু বাসন্তী তা হতে দেবে না। তার জন্যে যে তার স্বামীর বংশ লোপ পাবে ইহা সে দেখতে পারবে না। আজ তাই সে বুক বেঁধে এসেছে যে করেই হোক মলয়কে পুণর্বিবাহে রাজি করবে। সে একটু পরেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে—"মোটেই কষ্ট হবে না, তুমি দেখো আমি তাকে নিজে বরণ করে ঘরে তুলব। মলয় হাসতে লাগল, দুষ্টুমি করে বললে—"আচ্ছা বেশ তোমার কথায় আমি রাজি হলুম, কিন্তু তার আগে তোমায় একটী কাজ করতে হবে—বল পারবে তাহলে আমি কালই তোমার সতীন এনে হাজির করব।"

বাসন্তী বললে—"বল কি কাজ, আমি নিশ্চয়ই পারব।"

—তাহলে আমি কালই একটী বর খুজে আনি, যে মায়ের এক ছেলে নয়, যার মায়ের চাঁদপানা নাতি দেখবার বিশেষ তাড়া নেই তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিই। তারপর আমিও বিয়ে করি, কি বল সেই ভাল কথা নয়?

বাসন্তী খিল খিল করে হেসে উঠল। মলয়কে ছোট্ট একটী কিল মেরে বললে—"আহাহা বাবুর দিন দিন কি বিদ্যেই হচ্ছে মেয়ে মানুষের বুঝি দুবার বিয়ে হয়?

মলয় কিন্তু গম্ভীর ভাবে বললে—"মেয়ে মানুষের যদি দুবার বিয়ে হয় না তাহলে পুরুষেরই বা কি রকম করে দুবার বিয়ে হতে পারে?

—শাস্ত্রে আছে"

—"রেখে দাও তোমার শাস্ত্র ;"

যত স্বার্থপর পুরুষগুলোই ত শাস্ত্র করেছে। তাই নিজেদের বেলাই কোন বাধা নেই যতগুলা ইচ্ছে বিয়ে করতে পার, আর যত নিয়ম যত বাঁধাবাধি সব মেয়েদের উপর। কেন রে বাপু, তারা কি মানুষ নয়, তারা পুরুষদের চেয়ে কোন্ অংশে কম ? তারা বিনা আপত্তিতে পুরুষদের সব অত্যাচার সহ্য করে বলে তাদের ওপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে।"

বাসন্তী আবার হেসে উঠল, ঘরে যেন জোছনা ছড়িয়ে পড়ল—"সে বললে—"বারে তুমি ত খুব lecture দিতে পার দেখছি! এই স্বরাজের দিনে ও কাজটাতেও মন্দ আয় হয় না। তা এক কাজ করো রোজ কলেজ থেকে প্রোফেসারি করে হাওড়া ষ্টেশনে মাঝ পথে ফিরবার সময় গোলদিঘিতে গিয়ে lecture আরম্ভ করে দিও। আর কোন বিষয় খুঁজে না পাওত ঐ নারী স্বাধীনতা বিষয়েই খুব খানিকটা চেঁচিয়ে যেও দু'দিন পরে orator হয়ে যাবে। তা সে না হয় হল, কিন্তু তাহলে তুমি কিছুতেই বিয়ে করবে না ?"

—না কিছুতেই নয়। তুমি কি যে বল তার ঠিক নেই আমার এই বুকে তোমাকে ছাড়া আমি কি আর কাহাকেও স্থান দিতে পারি? এ যে শুধু তোমারই। এই বলে মলয় বাসন্তীকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে গাঢ় চুম্বন দিয়ে তার মুখ ভরিয়ে দিলে।

(গ)

বৌমা ও বৌমা—পাড়া বেড়ান শেষ করিয়া হরিমতী গৃহে ফিরিয়া ডাকিলেন—'বৌমা ও বৌমা'। বাসন্তী ঘরে বসিয়া কার্পেট বুনিতেছিল, শাশুড়ীর ডাক শুনিয়া, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে—"কি মা ?"

"দেখ বাছা, মলয়কে ত তুমি যাদু করেছ দেখছি। আমার অত আদরের বাধ্য ছেলে সে কিনা আমার পর হয়ে গেল ; যে কখনও আমার অবাধ্য হয় নি, সে কিনা আমার চোখের জল দেখেও আবার বিয়ে করতে রাজি হল না। ও ত এ রকম ছিল না ; তুমি এসেই ওর মাথা খেলে।" এই বলেই হরিমতি চোখে আঁচল দিলেন। জল ছিল কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু হরিমতি চোখ মুছে আবার বলতে লাগলেন—তা দেখ আমার বংশ ত লোপ পেতে বসেছে, কিন্তু আমি যা পারি তা করব। আজ পাড়ায় শুনে এলুম গঙ্গার ঘাটে কে একজন স্বামিজী এসেছেন, তিনি নাকি সকলের মনস্কামনা পূর্ণ করেন—তিনি হিমালয় পর্ব্বতে তপস্যা করে বর পেয়েছেন তাঁর আশীর্ব্বাদ কখনও বিফল হবে না। কত লোকের বাসনা পূর্ণ করছেন। এই আমার গোলাপের নাতিটার আজ চারদিন থেকে কি অসুখই না যাচ্ছিল, আর কাল ও স্বামিজীর দুটা পা জড়িয়ে পড়েছিল, তিনি দয়া করে আশীর্ব্বাদ করলেন—"যা বাড়ী যা তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে—বাড়ী গিয়ে দেখবি তোর নাতির অসুখ কমে গেছে।" আমার গোলাপ ত পড়ি-মরি করে বাড়ী ফিরে এসে দেখে তার নাতি ক'দিন পরে চোখ মেলে চেয়েছে এই রকম আরও কত লোকের কত ইচ্ছা তিনি পূর্ণ করেছেন—তা তুমি বাছা কাল আমার সঙ্গে তাঁর কাছে যাবে, দেখি কপালে যদি থাকে তিনি দয়া করতেও পারেন।" এই বলে হরিমতি ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন।

বাসন্তী চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হরিমতির সমস্ত বাক্যবাণ হজম করলে—পরে তিনি যখন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। আজ তার মন আর কোন বাধা মানলে না! এতক্ষণ নিজেকে সে সামলে রেখেছিল, কি আর পারলে না। ঘরে এসে সে খালি কাঁদতে লাগল। কত কথাই না আজ তার মনে পড়ছে—তার কিসের দুঃখ ছিল ? প্রথম যখন সে এই বাড়ীতে আসে তখন তার কত আদরই না ছিল। এই যে তার শাশুড়ী, যাঁকে সে ছেলেবেলা থেকে নিজের মায়ের মতই ভক্তি করত, ভালবাসত, তিনি তাকে কত আদর যত্নই না করতেন ; একদিন যদি তার শরীর একটু অসুস্থ হত, তিনি ভেবে আকুল হয়ে যেতেন, কত ঠাকুরকে মানসিক করতেন—হে ভগবান আমার বৌমাকে ভাল করে দাও, ও ছেলেমানুষ অসুখ করলে ও বড় কষ্ট পাবে। আর সেই শাশুড়ী আজ ক'দিন থেকে তাকে কিনা বলছেন! সে

নাকি তাঁর ছেলেকে যাদু করেছে—হে ভগবান! এ কথাও শুনতে হল! তার কি দোষ? তার স্বামী তাকে ভালবাসেন এই তার দোষ? সে ত বরং কত করে তার স্বামীকে আবার বিয়ে করতে বলছে—কিন্তু স্বামী রাজি হন নি। এই সব কথা ভাবছে আর বাসন্তীর দুই চোখ দিয়ে মুক্তার মত অশ্রু বিন্দু ঝরে পড়ছে, এমন সময় মলয় সে ঘরে উপস্থিত। তাকে কাঁদতে দেখে মলয় তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বল্লে—"আমার বাসন্তী রাণী কাঁদছ কেন? মা বুঝি বকেছেন? ছিঃ কেঁদনা।"

"সহানুভূতি পেলে রুদ্ধ অভিমান উছলিয়া উঠে, স্বামীর নিকট আদর পাইয়া বাসন্তীর দুঃখ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল—সে আরও কাঁদিতে লাগিল। মলয়ের বুকের মধ্যে অনেকক্ষণ কাঁদিবার পর তার বুকের বেদনা অনেকখানি লাঘব হয়ে গেল। তারপর সে দুষ্টুমির হাসি হেসে বল্লে—তুমি কেন আমায় আদর করছ, যাও চলে যাও বলছি, ডাইনীকে আর আদর করতে হবে না।"

মলয় তার কপাল থেকে ঘন কোঁকড়ান চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে মুখখানি তুলে ধরল, বাসন্তী তখনও হাসছিল।

এবার মলয়ও হেসে বললে—"এ যে দেখছি শরতের আকাশ—এই রৌদ্র, এই বৃষ্টি! তাত হ'ল, কিন্তু তুমি ডাইনি হতে গেলে কেন?"

বাসন্তীর তখন সব দুঃখ দূর হয়ে গিয়েছিল, সে হাসতে হাসতে বল্লে—"তা জাননা বুঝি? আজ মা বললেন যে আমি তোমায় যাদু করে রেখেছি—তুমি নাকি তাই বিয়ে করতে চাইছ না - তা ডাইনী ছাড়া আর কে যাদু করবে বল?"

এই শুনে মলয়ও হাসতে হাসতে বললে—"এই শুনে বুঝি কান্না হচ্ছিল, আচ্ছা বোকা মেয়ে যাহোক; আর সত্যিই ত তুমি আমায় তোমার ওই দুষ্টুমি মাখা মুখখানা দিয়ে যাদু করে রেখেছ।"

তারপর বাসন্তী স্বামিজীর কথা বল্লে—মলয় উত্তর করলে—"যত সব কুসংস্কার, ঐ সব ভণ্ড, চোর ছোটলোকগুলো দেবে ওষুধ, তবেই হয়েছে। আমি মাকে এই সব পাগলামি করতে বারণ করে দেব।"

"না, না, লক্ষ্মীটী ও কাজ করোনা; তাহলে মা আরও রেগে যাবেন। তা ছাড়া তোমার সকলের ওপরেই খারাপ ধারণা। কেন, স্বামিজী সত্যি সত্যি ভালও হতে পারেন। সকলেই যে ভণ্ড চোর হবে তার কি মানে আছে।"

"না সকলেই যে খারাপ লোক হবে তার কোন মানে নেই, কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেই হয়, সেই জন্যে ওদের মধ্যে যারা দু'একজন ভাল লোক থাকে তাদের ওপরেও বিশ্বাস হারিয়ে যায়। তুমি যেতে চাও যেতে পার, আমার কিন্তু ওর উপর মোটেই বিশ্বাস নেই!"

"হাঁ আমি যাব। আমি আর পারছি না। বাড়ীতে মা সব সময় বকছেন, আর বাইরেও নিস্তার নেই। সকালে যখন ঘাটে যাই, তখন আমায় দেখে সকলে মুখ ফিরিয়ে নেয়, বলে আঁটকুঁড়ির মুখ দেখলে সমস্ত দিনটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি আর সহ্য করতে পারি না, দেখি যদি স্বামিজীর দয়া হয়।"

পরদিন শাশুড়ীর সঙ্গে বাসন্তী সন্ন্যাসী বাবার নিকট উপস্থিত হ'ল। পরণে তার লালপেড়ে গরদের কাপড় সে সদ্য স্নান করে চুলগুলি পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিয়েছিল। রাঙা পা'দুটী আলতায় আরও রাঙা দেখাচ্ছিল স্বামিজীর আস্তানা গঙ্গার ঘাটে এক বটগাছের তলায়। তাঁকে ঘিরে পাড়ার ছেলে, বুড়ো সবাই বসে রয়েছে, আর তিনি একমনে গাঁজার কলিকায় টান লাগাচ্ছেন।

বাসন্তী সেখানে যেতেই সকলের দৃষ্টি তার ওপর পড়ল, বটতলা যেন আলো হয়ে গেল, তাকে তখন ঠিক দেবী প্রতিমার মত দেখাচ্ছিল। সে অত লোকের সামনে এসে লজ্জায় জড়সড় হয়ে গিয়েছিল, তাতে তার রূপের জ্যোতি আরও খুলেছিল।

হরিমতি নানা রকমে বুঝিয়ে দিলেন যে, বৌ ডাইনি, সে তাঁর ছেলের মাথা খেয়েছে—ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন যদি স্বামিজী দয়া করেন তবেই তাঁর বংশ রক্ষা পায়, নৈলে তা' লোপ হবার আর বিশেষ বিলম্ব নাই।

স্বামিজী যতক্ষণ হরিমতির কথা শুনছিলেন ততক্ষণ আড় চোখে বারবার বাসন্তীকে দেখে নিচ্ছিলেন। বোধহয় কি ওষুধ দিতে হবে তাই দেখছিলেন।

বাসন্তীর চোখে কিন্তু তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে নি! বাসন্তী তাঁর চাউনি দেখেই শিউরে উঠল! তার সমস্ত ভক্তি কোথায় উড়ে গেল, বরং সন্ন্যাসীর ওপর তার একটা ঘৃণা জন্মে গেল। সর্ব্বস্বত্যাগী মহাপুরুষের কি এই দৃষ্টি! এই রকম লোলুপ দৃষ্টিতে তিনি পরস্ত্রীকে দেখেন। তাঁর কাছে ওষুধ নেবার ইচ্ছা আর তাঁর রইল না; কিন্তু কি করে শাশুড়ীর হুকুম। স্বামিজী হুকুম দিলেন যে অমাবস্যা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় শিবমন্দিরে বাসন্তী একা আসবে, তিনি তাকে ওষুধ দেবেন। হুকুম শুনেই বাসন্তীর চক্ষুস্থির।

কিন্তু হরিমতি অতশত বুঝলেন না, তিনি মনে করলেন স্বামিজী তাঁর ওপর বড়ই অনুগ্রহ করলেন। মনের আনন্দে পুত্রবধূকে নিয়ে তিনি ঘরে ফিরলেন। পথে আসতে আসতে তিনি হুকুম দিলেন, "দেখ বাছা, কাল ঠিক সময়ে যেও আমি বুড়ো মানুষ হয়ত রাত দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ব, তা বলে তুমি যেন ভুলে বসে থেক না।"

(ঘ)

বাসন্তীর কাছে সব কথা শুনে মলয় সন্ন্যাসীর ওপর ভীষণ রেগে উঠল। বাসন্তী কিন্তু ভয়ে মলয়ের কাছে কেঁদে ফেললে। মলয় তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—"তোমার কোন ভয় নেই, আমি সে বেটাকে দেখে নিচ্ছি। তার এতবড় আস্পর্দ্ধা! কাল যেমন সময় যেতে বলেছে সেই সময় যাবে, আমি তোমার সঙ্গে আড়ালে থাকব, তোমার কোন ভয় নেই।

পরের দিন রাত্রি বেলা বাসন্তীকে সঙ্গে নিয়ে মলয় সন্ন্যাসীর কাছে চলল। কাছাকাছি গিয়ে সে লুকিয়ে রইল। বাসন্তী একাই চলল। আগে থেকেই সন্ন্যাসী নির্দ্দিষ্ট স্থানে এসে অপেক্ষা করছিল। বাসন্তীকে দেখে তার লালসাপূর্ণ চোখ দুটো জ্বলে উঠল, সে বাসন্তীকে জড়িয়ে ধরতে গেল। ভয়ে বাসন্তী সরে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মলয় পিছন থেকে সন্ন্যাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যায়াম করে মলয়ের শরীরে ভীষণ শক্তি ছিল। ভণ্ডটাকে রীতিমত শিক্ষা দিয়ে সেখান থেকে বাসন্তীকে সঙ্গে করে সে বাড়ী ফিরল। পরদিন হরিমতি জিজ্ঞাসা করলে, বাসন্তী সন্ন্যাসীর কাছে গিয়ে ওষুধ খেয়েছ ?

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন বাসন্তীর এক দাদার সঙ্গে মলয়ের দেখা হ'ল। অন্যান্য কথার পর মলয় বলল—আচ্ছা ভাই, তুমি ত ডাক্তার, আজকাল তোমার আবার খুব পসারও হয়েছে ; বাসন্তীর এখনও ছেলেপুলে হচ্ছে না কেন বলত ?

হাসতে হাসতে বাসন্তীর দাদা বললে—কেন, হঠাৎ বাবা হবার সখ বেড়ে উঠল নাকি ?

আমার বাবা হবার সখ আদপেই নেই, এই বেশ আছি, কিন্তু মার যে আর দেরী সইছে না, তিনি ত ওকে বন্ধ্যা বলে আমাকে আর একটা বিয়ে করতে জেদাজিদি আরম্ভ করে দিয়েছে। তাই বলছি একদিন ওকে কি তুমি দেখবে ?

মার সঙ্গে কি তুমিও পাগল হলে ? এখন ওর বয়সই বা কত যে এর মধ্যে তোমরা ওকে বন্ধ্যা ঠিক করে বসলে! ওর বিয়ে হয়েছে যখন, তখন বোধহয় ওর বয়েস ছিল এগার কি বার এখন এই সবে পনের ষোল বছর বয়স! ওসব বাজে কথা ভেব না, সময় হলেই ঠিক ছেলে হবে।

* * * *

পর বৎসর বাসন্তীর এক পুত্রসন্তান হ'ল। হরিমতির আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। পাড়ার সকলকে তিনি পেট ভরিয়ে সন্দেশ খাওয়ালেন। সকলেই সন্ন্যাসীকে ধন্য ধন্য করতে লাগল—তার ওষুধের আশ্চর্য্য গুণ দেখে পাড়ার লোকেরা তার পায়ের কাছে তাদের মাথা আরও খানিকটা নুইয়ে দিল।

স্বয়ম্বরা

(গল্প)

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

(১)

আহা কি পান সাজাই হ'ল—চূণ দেবড়েছেন যেন কালির পোঁচ। বেচারার গাল যদি না পোড়ে ত কি বলছি—

—বেশ বেশ আমার বরের গাল পুড়বে, তা তোর কিলা ছুঁড়ি? আর অতই যদি পান সাজুনি হয়েছিস ত মিষ্টি হাতের দোনা খাইয়ে মিষ্টি মুখ কেড়ে নিতেই ত পারিস!

—থাম, থাম, আর রসের ফোয়ারা খুলতে হবে না। কোথায় বিয়ে তার ঠিক নেই, বর বর করেই গেলি। ম্যাট্রিক পাশ করেননি, বচনবাগীশতায় জলপানি পেয়েছেন কথার ছিরি দেখ না।

—আর নিজেও বড় কম যান কি না—সে কথা পরে হবে আসছি দাঁড়া। বলে লীলা লাফাতে লাফাতে হলঘরের দিকটায় চলে গেল। লীলার বৌদি নমিতা মুখটিপে হাসতে লাগলো! হাতে সেলাইয়ের সূঁচটা আবার উঠিয়ে নিয়ে মনে মনে বললে—ধন্যি মেয়ে যা হোক।

পাশের হলঘরে একটা সোফায় বসে বসে সতীশ লীলার বিধবা মাতা অরুন্ধতী দেবীর সহিত গল্প করছিল। ঘরটা খুব ঝক্‌ঝকে সাজানো। দেওয়ালে অয়েল পেন্টিং তাতে খুব বড় বড় আয়না ও বিলিতি ছবি ঝুলছে। গদি মোড়া সোফা, টেবিল চেয়ার আলমারি, টিপয় ইত্যাদিতে ঘর ভর্ত্তি। ঘরের কোনে দাঁড় করাণ একটী বিচিত্র কারু কার্য্য—খচিত বড় ঘড়ি অনবরত টুং টুং শব্দ করছে।

লীলারা ব্রাহ্ম। সতীশ এ বাড়ীতে বহু দিনের অতিথি এম, এ পাশ করে বি-সি-এস্‌,এর জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। দু'মাস বাদে হাকিম হয়ে লীলাকে জীবনসঙ্গিনী করবে এটা একপ্রকার ঠিকই হয়ে আছে। এখন ইংরিজি কায়দায় wooing চলছে।

লীলা চঞ্চল পদবিক্ষেপে ঘরে ঢুকে পানদুটো সতীশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—এই নাও বাপু, তোমার পান, ও পান সাজা-টাজা আমার বড় আসে না, তা তোমারও ও বদ অভ্যাস আর গেল না।

সাহেব সাজলে কি হবে ছেলে বেলাকার অভ্যাস পাণ খাওয়া সতীশের আজ অবধি যায় নি।

অরুন্ধতী বাধা দিলেন, বললেন—এর মধ্যে পান খাবে কি? কেষ্টাকে খাবার সাজিয়ে আনতে বলেছি, সেটা করছে কি, যা দেখগে যা।

সতীশ হেসে বললে—না না রোজ রোজ আবার ও সব কেন? সেই জন্যেইত আসি না। যত সব হাঙ্গামা পাকাতে পারলে আর কিছু চান না দেখছি।

অরুন্ধতী বললেন—আহা, ভারীত হাঙ্গামা। যা না লীলা দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

লীলা একবার সতীশের দিকে কটাক্ষপাত করে সাড়ীর আঁচলটা দুলিয়ে মুচকি হেসে বেরিয়ে গেল।

অরুন্ধতী সতীশের দিকে চেয়ে বললেন—লীলাকে নিয়ে প্রথম প্রথম তোমাকে একটু মুস্কিলে পড়তে হবে, বুঝেছ সতীশ, দিনকে দিন ও ভারী একগুঁয়ে হয়ে উঠছে।

সতীশ জিজ্ঞেস করলে—আপনি খদ্দর পরার কথা বলছেন ত?

—হ্যাঁ, এই দেখনা দুটো বছর চুপচাপ বসে আছে। পড়লে এ বছর আই-এ, দিতে পারতো। তা বলে কি 'পড়া খুব হয়েছে, এখন একটু চরকা কাটলে কাজ দেবে। বাপু দু'দিন বাদে হাকিমের বউ হবি, তোর এসব স্বদেশী পণা কেন?

সতীশ ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে—মুস্কিল! বাবা আবার

'রায় বাহাদুর' হয়েছেন—ওসব মোটেই দেখতে পারেন না। আমিও ত আর বুঝিয়ে পারলুম না।

অরুন্ধতী গম্ভীর মুখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন—না পারলেই বা চলবে কি করে সতীশ! আমাদের চেয়ে তোমার কথাটাই বেশী জোর হবে। এখনও দু'মাস আছে তোমায় চেষ্টা করে দেখতেই হবে। নইলে ও হতভাগীর কপালে যে কি আছে বুঝতে পারিনি।

এমন সময় লীলা নিজের হাতে ডিসে খাবার সাজিয়ে ঘরে ঢুকলো। ডিসটা টেবিলের ওপর রেখে বললে—হতভাগী আবার কি করলে?

অরুন্ধতী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—করবে আবার কি আমার মাথা আর মুণ্ডু। দেশোদ্ধার করতে নেমেছ, গুরুজনের কথা এখন সিকেয় তোলা থাক।

মার প্রকৃতির সহিত লীলা অনেকদিন থেকেই পরিচিত ছিল, সে বেশী কিছু না বলে' হেসে বললে—আবার সেই স্বদেশী নিন্দে চলেছে ত? আমি তবে চললুম এখন।

—না না আর পালাতে হবে না তোমায়, সতীশকে খাওয়াও ততক্ষণ আমি কাপড়টা কেচে আসি।

অরুন্ধতী দেবী চলে গেলে সতীশ অনুরাগভরা চক্ষে লীলার দিকে চেয়ে বললে—তুমি কি আমাদের দলে আসবে না লীলা?

লীলা সেল্‌ফ্ থেকে একটা বই টানতে টানতে বললে—নিজের অনিচ্ছাতেও তোমাদের দলে গেলে তুমিও সুখী হবে না, আমিও না।

কিন্তু অনিচ্ছাতেই বা আসবে কেন? আর তুমি কি নিশ্চয় বুঝছ, যে তোমার একার খদ্দর পরাতে দেশ স্বাধীন হবে?

লীলা মুখ ফিরিয়ে বললে—দেখ, তোমার আমার চেয়ে অনেক বড় বড় লোক মাথা ঘামিয়ে যা ঠিক করেছেন তা নিতান্ত গাঁজাখুরী নয়, আর আমরা তাঁদেরই স্বদেশবাসী হয়ে কেন তাঁদের এ মহৎ কার্য্যে বাধা দিই? আর আমার একার কথা বলছ? তোমরাও ত এ পথে এসে দাঁড়াতে পার, তা হলেই ত বহু হয়ে দাঁড়ায়, এ কথা বুঝছ না কেন?

—বুঝি সব কিন্তু জান ত, আমাদের তা হবার যো নেই। আমি দু'দিন বাদে I. C. S. পাশ করব। বাবার অতবড় সরকারী চাকরী—শুধু একটা খেয়ালের মাথায় আমি তা বলে খদ্দর পরে হট্টগোল বাধাতে পারি নি ত!

লীলা হেসে বললে—কে বলছে তোমায় অত গোলযোগের ভেতর আসতে? আমার sphereএ আমাকে ছেড়ে দাও, তোমাদের Arin নিয়ে তোমরা থাক। বিলেতই ত তোমাদের স্বদেশ—সেখেনে আইবুড়ো মেয়েদেরও তো অস্বচ্ছলতা কিছু নেই।

অনবরত খোঁচা খেয়ে সতীশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। সে বললে—দেখ ঠাট্টা করবার কিছু নেই এতে। দু'দিন বাদে আমরা স্বামী-স্ত্রী হ'ব এ কথা সমাজে জানতে আর কারু বাকী নেই। হঠাৎ এখন যদি তুমি বেঁকে দাঁড়াও তা হ'লে কি রকমটা হবে বুঝতে পারছ!

লীলা অতিষ্ঠ হয়ে বললে—এ কথা সমাজের সকলকে জানতে দিয়েছে কে? সে ত তুমি। আর আমাকেই বা তুমি কি করতে বল শুনি? আমার যা বিশ্বাস, আমার যা মনোগত সংস্কার সে সব জলাঞ্জলি দিতে হবে কতকগুলি লোকের মনস্তুষ্টি করবার জন্যে? এটা কিরকম অন্যায় জুলুম।

সতীশ অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। হাতের বোতামটা খুঁটতে খুঁটতে সে বললে—তিন মাস ধরে তোমাকে দেখছি লীলা, কিন্তু আজ অবধি তোমায় বুঝে উঠতে পারলুম না। জানি না তুমি আমায় ভালবাস কি না, কিন্তু তুমি যে আমার কতখানি হৃদয় জুড়ে আছ—তোমায় না পেলে যে আমার জীবনে কতখানি ক্ষতি স্বীকার করতে হবে, তা বোধহয় তুমি জান না।

সতীশের মুখচোখ লাল হয়ে উঠলো। লীলা এবার ফিরলে—এগিয়ে এসে সে বললে—এখন ও কথা থাক্। ওমা, এখনও যে তুমি খাবারে হাত দাও নি। মা এসে এখুনি বকবেন'খন। লক্ষ্মীটি খেয়ে নাও, তারপর বলো ত সন্ধ্যেটা মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক্। কি বল?

সতীশ মুখ কালো করে উঠে পড়ে বললে—'না না, তোমার অতখানি কষ্ট স্বীকার করতে হবে না—মাকে খুসী করাবার জন্যে আমাকে এত কষ্ট করে খাওয়াবারও দরকার

নেই। আমি চললুম—তবে যাবার সময় তোমার হাতে সাজা পানদুটো না নিয়ে পারলুম না। ক্ষমা কোরো—'

সতীশ বরাবর সিঁড়ি দিয়ে নেমে নীচে চলে গেল। খানিকক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে লীলা হলঘর থেকে বেরিয়ে নিজের পড়বার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বাইরে তখন সন্ধ্যার আবছায়া ধরণীর বুকে নেমে এসেছে।

(২)

একখানি জীর্ণ কুটীর। তারই একটা ভাঙ্গা ঘরে টিম্‌টিম্ করে লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। একটী টুলের ওপর বসে' অমল কি একখানা বই পড়ছিলো। আজ তিনদিন জ্বর ভোগের পর সে পথ্য করেছে। শরীর বড়ই দুর্ব্বল। রাত ন'টা বেজে গেছে। শোবে শোবে করেও সে শুতে পারছিল না।

আজ তিনদিন তার দেখা পায় নি। সেই রাঙ্গা মুখখানির দর্শনাশায় সে কতক্ষণ বসে আছে। চোখ তার বইয়ের পাতার ওপর নিবদ্ধ ছিল বটে কিন্তু মনটা তার উড়ে যাচ্ছিল সামনের সেই বড় বাড়ীটার একটা বিশিষ্ট ঘরে যেখানে তার প্রতিদিনকার হৃদয় নিংড়ানো ব্যর্থ সাধনা, সানুরাগ অভিনন্দন ও ভক্তি নৈবেদ্য রোজ জমা হচ্ছে।

তার মানসী প্রিয়ার দর্শন লালসায় দৃষ্টি তার বারবার সেই বড় জানলাটা থেকে প্রতিহত হয়ে আসছিল। রোজ ভোরবেলা ও রাত্রে এই সময়টা তার কাছে জগতের যত আলো হাসির ঝরণা নিয়ে উপস্থিত হয়। এই দুটী সময়েই সামনের বাড়ীর বড় জানলাটা কার দু'খানি কুসুমপেলব হাতে খুলে যায় আর একখানি চলন্ত জ্যোৎস্নার ফুটন্ত আভা এসে অমলের চোখে যেন ঠিক্‌রে পড়ে। এমনি করে দুটী বছর ধরে সে সেই অনবদ্য রূপের সোণালী স্পর্শে সে তার চক্ষুদুটীকে সার্থক করে এসেছে। শুধু চোখের দেখা—তাইতেই তার প্রাণ ভরে ওঠে—আর কিছু চায় না সে।

জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রোফেসারী করে অমলের দিন কাটছিল। প্রতিদিন চরকা কাটা, তাঁত বোনা, কাপড় তৈরী করা আর মহাত্মার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করা এই ছিল তার রোজকার নিয়মিত কার্য্য। সে জন্যে বাড়ীতে সে একখানা তাঁতও বসিয়েছিল। বাকী সময়টা সে নিজের মনে বাঁশী বাজাত আর বই পড়তো।

বাড়ীতে আপনার বলতে এক বৃদ্ধা পিসী। তিনিই দুটী রেঁধে দিতেন আর নিজের জপতপ নিয়ে থাকতেন। অবিবাহিত অমলের এমনি করে একরকম সুখে দিন কাটছিল।

এই জীর্ণ বাড়ীটায় আজ দু' বছর তারা ভাড়া করে আছে। প্রথম প্রথম সে তার অনাসক্ত মন নিয়ে নিজের কাজ করে যেতো। কিন্তু যেদিন থেকে সে লক্ষ্য করলে একটী জানলা থেকে কোন রূপসী তরুণীর দুটী আয়ত চঞ্চল কালো চোখ তাকে দেখবার জন্যে প্রতিদিন অসীম আগ্রহে চেয়ে থাকে—সেইদিন থেকে তার প্রাণ নবোদিত সূর্য্যের প্রথম কিরণপাতের ন্যায় এক নূতন ভাবের রঙে রঞ্জিত হয়ে উঠলো।

অমল জানতো সামনের বাড়ীটা যতরকম বিলিতি ফ্যাসানের লীলাভূমি। কিন্তু তারই ভেতরে বাস করেও ঐ মেয়েটী সে মোহ উপেক্ষা করে কি করে যে নিজের ললিত কমনীয় দেহলতাখানি মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে সজ্জিত করতো এই সমস্যাটী অমলকে ভারী আশ্চর্য্য করে তুলতো। তার মুগ্ধ নেত্র তরুণীর অনিমেষ দৃষ্টির অনুসরণ করে যখন চোখে চোখ মিলে যেত তখন কি এক নিবিড় লজ্জায় দুজনেরই মুখ রাঙা হয়ে উঠতো—দৃষ্টি নত হয়ে আসতো। উভয়েরই সেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে যেন এই সুর ঝরে পড়তো—'তোমাকে আমার বড় ভাল লাগে।'

দিন যায়, রাত্রি আসে। চাহনির ভিতর দিয়া দুজনের হৃদয়ের পরিচয় যেন প্রতিদিন সহজ হয়ে আসে। অমলের বাঁশীতে অশ্রুসজল ভৈরবীর সুর মিলন রাগিণী কোমল পর্দ্দায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠে!

তারপর সেই দিনটা! সে কথা ভাবতে এখনও তার প্রাণে বিদ্যুৎ খেলে যায়, সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে। সেদিন বোধ হয় ফাল্গুনের কোন এক বসন্ত-জাগা অপরাহ্ন। জাগ্রত জগতের বুকভরা আনন্দের উচ্ছ্বাস যৌবনের চঞ্চল মত্ততা নিয়ে সেদিন যেন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। আবীরমাখা রক্ত মেঘের বিচ্ছুরিত স্বর্ণরশ্মি যেন সেদিন সকল হৃদয় রাঙিয়ে তুলেছিল। অমলের চঞ্চল চক্ষুদুটী গিয়ে

পড়েছিল কার সন্ধানে সেই জানালাটির দিকে। হঠাৎ জানলায় যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে একটী বড় গোলাপ ফুল অমলের সমস্ত শরীরে পুলক জাগিয়ে তার কোলে এসে পড়লো। মুহূর্ত্তের জন্য অমলের সংযত চিত্ত মোহিত, অসংযত হয়ে পড়েছিল সেই সময়। সে সযত্নে ফুলটী তুলে ধরে আবেগের সহিত কম্পিত ওষ্ঠে সে বারবার চেপে ধরেছিলো। সেইদিন তার সকল আশা, সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণতা লাভ করেছে। এর বেশী আর সে কি আশা করতে পারে ?—

টুলের ওপর বসে বসে অমল এই সব ভাবছিল। একটীর পর একটী করে চিন্তা তার মনের কোণে উঁকি মেরে তার রোগ-পাণ্ডুর মুখখানি আশা ও আনন্দে উজ্জ্বল করে তুলছিল। হঠাৎ একটা দম্‌কা হাওয়া এসে ঘরের চিমনিটা নিভিয়ে দিলে এবং একই মুহূর্ত্তে সামনের জানলাটা খুলে গেল। তিনদিনের বুভুক্ষু পিপাসিত আঁখিদুটী তুলে সে চেয়ে রইলো। তরুণী লঘু-চঞ্চল-চরণে জানলার ধারে এসে অমলের অন্ধকার ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলে। অমলের মনে হ'ল যেন তার সেই আয়ত উজ্জ্বল ভাসা ভাসা চক্ষুদুটী বলছে—'ওগো তোমার ঘর আঁধার কেন ? আজ তিনদিন আমার চক্ষু পিপাসিত, দেখা দেবে না ? কোথায় আছ তুমি ?'

অমল ভাবলে—আলোটা জ্বালি ; কিন্তু না—আলোতে চক্ষু তুলে আশা মিটিয়ে দেখা হ'য়ে ওঠে না, লজ্জাজড়িত দৃষ্টি নত হয়ে আসে। অন্ধকারেই আজ সে নিমেষহারা দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। তরুণী অনেকক্ষণ বিফল অনুসন্ধান করে ধীরে ধীরে শুতে গেল। আবার জানলা বন্ধ হ'ল। অমলের বুকের কপাটও কে যেন দু'হাতে ঠেলে বন্ধ করে দিলে। মাতালের মত টলতে টলতে সে বিছানায় এসে তার ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিলে।

(৩)

অরুন্ধতী দেবী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে একাকী কোথায় গিয়াছিলেন। বৈশাখের অপরাহ্ণ। পশ্চিম দিকে আকাশে কালো মেঘের সঞ্চার হচ্ছে। বিদ্যুৎ স্ফুরণে মাঝে মাঝে কাজলমাখা মেঘগুলি দু'খানা হয়ে চিরে যাচ্ছে। ছাতের ওপর লীলা ফুলের গাছে জল দিতে দিতে বৌদি নমিতার সঙ্গে গল্প করছিল।

একটী গন্ধরাজ নাকের কাছে ধরে নমিতা জিজ্ঞেস করলে—হাঁগো ম্যাট্রিক্ মশাই, তোমার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে যে অত রাগাচ্ছ দিন দিন, তার মানেটা কি শুনি ? অত চটালে কি তিনি তোমার কর পীড়ণ করবেন বলে ভাবছ ?

প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করা অবধি লীলার ডাকনাম নমিতার কাছে 'ম্যাট্রিক' হয়েছে।

লীলা হেসে উত্তর দিলে—মোটেই তা ভাবি নি,—আপাততঃ পীড়ণ ছেড়ে কর পরিত্যাগ করলেই বাঁচি।

নমিতা বললে—সত্যি ঠাট্টা রাখ। সতীশবাবুকে অত জ্বালিয়ে মারিস্ কেন বল্ না।

—পতঙ্গ আগুনে এসে পুড়ে মরে বলে, আগুনেরই দোষ বটে ? খুব বুদ্ধি হয়েছে তোমার দেখছি।

সত্যি তুই সতীশবাবুকে বিয়ে করবিনি না কি ?

সে মা জানেন আর সতীশবাবুই জানেন।

আর ক'নে এ ক্ষেত্রে জগন্নাথ সেজে বসে আছেন নাকি ?

তাইত দেখ'ছি।

নমিতা গম্ভীর হয়ে বললে—তোর এ বিয়েতে মত নেই ? তুই সতীশবাবুকে ভালবাসিস না তা হ'লে বল্ ?

অত শত জানি নে বাপু, ফুল শুঁকছ শোঁক, তোমার অত কথার দরকার কি শুনি ?

আছে গো আছে, দরকার আছে। তাই ত বলি, মেয়ের পেটে পেটে এত বিদ্যে। তা আমায় জানালে কি হ'ত তোমার, কেড়ে নিতুম ? সে পুরুষ বহ্নিটি কে শুনি—যাতে পুড়ে মরবার জন্যে তোমার ডানা উঠেছে ? পাশের বাড়ীর ওই অমল বাবুটী নাকি ?

নমিতা দু' তিনদিন লীলাকে জানলা দিয়ে পাশের বাড়ীর অমলের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল। প্রতিবাসী হিসাবে অমলের নামও এ বাড়ীতে অজানা ছিল না। কিন্তু নমিতার মনে এ সম্ভাবনার সন্দেহও স্থান পায় নি—তার কথাতেও তেমন কোন গভীর ভাবব্যঞ্জক সুরও লুক্কায়িত

ছিল না। দুই বন্ধুতে যেমন ঠাট্টা বরাবর চলত এ ক্ষেত্রেও নমিতা তেমনিভাবে কথাটা জিগ্যেস করলে।

অমলের নাম শুনেই লীলার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। মুখ চোখ তার এমন লাল হ'য়ে উঠলো যে সে অনেক চেষ্টা করেও নিজের এই লজ্জিত ভাবটা দূর করতে পারলে না। তবুও যথাসম্ভব চোখ পাকিয়ে লীলা বললে—আচ্ছা, সব বিষয়ে তোমার ফাজ্‌লামী করতে হবে না।

এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ধরা পড়বার খুব সম্ভাবনা—কিন্তু লীলা নাকি চালাক মেয়ে তাই লীলার কণ্ঠস্বরে নমিতা প্রতারিত হ'ল।

নমিতা কি বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে আকাশে মেঘ ডেকে উঠলো—দু' এক ফোঁটা বৃষ্টিও দেখা দিলে। গল্পের স্রোত এইখানেই বন্ধ রেখে তারা নীচে নেমে এল।

নীচে এসে নমিতা বললে—এই ম্যাট্রিক্, রাত্রে কিন্তু বাকীটা বলতেই হবে বুঝলে? আপাততঃ আমি রান্নাঘরে চললুম, তদারক করতে, নইলে মা এসে আবার বকবেন—বলে' সে চলে গেল। লীলা খানিকক্ষণ এদিক ওদিক করে নিজের শোবার ঘরে এসে বসল।

দক্ষিণ দিকের সেই বড় জানলাটা খোলাই ছিল। আস্তে আস্তে সে সেখানে এসে দাঁড়াল। ঘরে বসে অমল বোধ হয় তখন কি লিখছিল। একাগ্র মনোযোগে তার হাতের কলম সাদা কাগজের ওপর আঁচড় কেটে চলেছে। মাথার রুক্ষ ও দীর্ঘ চুলগুলা কাণের পাশ দিয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। সুন্দর উন্নত বলিষ্ঠ দেহ শুভ্র খদ্দরের চাদরে আবৃত। লীলা অনিমেষনেত্রে এই সুন্দর যুবকটীর দিকে চেয়ে রইলো—কতক্ষণ—অমল তা জানতেও পারল না।

আজ দু' বছর অমলকে, লীলা সকাল সন্ধ্যে দেখে আসছে। দরিদ্রের কুটীর, দরিদ্রের আভরণ, দরিদ্রের শয্যা—কিন্তু তার ভিতরে কি চমৎকার একটী লালিত্য, একটী নিষ্ঠা ও তেজের স্পর্শ জাজ্বল্যমান। লীলা ভাবতে লাগল—যে ভারতের তেত্রিশ কোটী লোক আজ আধপেটা খেয়ে জীবন ধারণ করছে, সেই দেশে বাস করে ধনীর আকণ্ঠ বিলাসিতায় ভেসে যাওয়ার মত বর্ব্বরতা আর কি থাকতে পারে? সেও সহ্য করা যায় কিন্তু যারা আজ এই ভারতবাসীদের এই সর্ব্বনাশী দারিদ্র্যের পথে—এই হীন অবনতির পথে টেনে এনেছে তাদেরই কর স্পর্শজনিত সুখ লালসায় যে লোক অজস্র অর্থব্যয় করতেও কুণ্ঠিত নয় তার মত হীন পিশাচ আর কে আছে? আর অদৃষ্টের পরিহাস এমনি যে সেইরকম লোকেরই পুত্রবধূ হবার জন্যে তাকে প্রস্তুত হতে হচ্ছে।

লীলা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে অমলের দিকে চেয়ে রইলো। অমলের সে সুন্দর মূর্ত্তি তার চক্ষে যেন অমিয় ধারা বর্ষণ করতে লাগল। লীলা ভাবলে রাস্তায় বাহির হ'লে সে যে কত লোকের দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায় তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু তাদের সকলেরই চক্ষে কি কুটীল, কি বিশ্রী দৃষ্টি! আর সামনের ঐ যে যুবকটীকে প্রত্যহ সে দর্শন দান করিয়া আসিতেছে সে ত কতদিন কত রকম সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে কিন্তু কোনদিন তাহার হাবভাবে সে এতটুকু অসংযমেরও পরিচয় পায় নাই। সে চাহনিতে কি সরলতা, কি মধুরতাই না ফুটিয়া ওঠে!

বাইরে ভীষণ ঝড় উঠে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বর্ষণ ক্লান্ত গম্ভীর আকাশে যেন একটা বিষাদের ভাব জেগে উঠেছে! অনেক দূরে কোন এক বিরহী এই মেঘলা সন্ধ্যায় বাঁশীতে বেহাগের করুণ সুর তুলেছে—তারই রেশ শীকরলিপ্ত বাদলা হাওয়ার সঙ্গে ঘরের ভেতর ভেসে ভেসে বেড়াতে লাগলো।

(৪)

মাস দুই অতিবাহিত হয়ে গেছে। 'রায় বাহাদুরের' তৈল দানের কৃপায় সতীশ I. C. S. পাশ করে কলিকাতারই উপকূলস্থ কোন মহকুমার হাকিম হয়ে বসেছে। অরুন্ধতী দেবীও প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার পুত্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিতেছেন—শীঘ্র এসে ভগিনীর বিবাহের আয়োজনে লাগিয়া যাও।

এ হেন সময়ে একদিন বিকেলবেলায় লীলার মাসতুতো ভাই নীলমণি এসে লীলাকে পাকড়াও করলে—ওরে তোদের বাড়ীর পাশে যে স্বদেশী মেলা বসেছে, দেখতে যাস নি ত একদিনও?

লীলা অবাক হয়ে বললে—কই না ত।

নীলমণি বললে—তবে চল্ না আজকে দেখিয়ে নিয়ে আসি। আজ সেখানে দেশের বড় বড় নেতারা সব আসবেন ; যাবি ত বল, নইলে আমি চললুম।

নীলমণি মস্ত নন্-কো-অপারেটর। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে কংগ্রেস নিয়ে মেতে আছে।

নীলমণির কথায় লীলা লাফিয়ে উঠলো—ভাগ্যিস্ নীলুদা তুমি এলে—কতদিন তুমি আসনি বল ত ?

নীলমণি বললে—আসব কি বল ? মাসীমা ত চটেই লাল, তা ছাড়া আজ বাদে কাল তুই ম্যাজিষ্ট্রেট গৃহিণী হতে চলেছিস্।

—হ্যাঁ অমনি হলেই হ'ল কিনা—সে কথা যাক্, এখন তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এক্ষুণি কাপড়টা বদলে আসছি—বলে লীলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সত্য কথা বলতে কি লীলার মন যে স্বদেশীর দিকে ঝুঁকেছিল তার গোড়াতে ছিল নীলমণির শিক্ষা ও উপদেশ। আগে সে প্রায়ই আসত। কিন্তু অরুন্ধতী দেবী ব্যাপার দেখে বোনপোটীর প্রতি স্নেহের এত বেশী কার্পণ্য দেখাতে লাগলেন যে নীলমণির এ বাড়ীতে আসা প্রায় বন্ধই হয়ে গেছল। তবে কালেভদ্রে সে যখন হঠাৎ ঝড়ের মত এ বাড়ীতে এসে পড়ত তখন একটা গণ্ডগোল না পাকিয়ে যেত না।

লীলাকে খদ্দরে সাজতে দেখে অরুন্ধতী জিজ্ঞেস করলেন হঠাৎ ও নতুন গুণ চটগুলো গায়ে চাপান হচ্ছে যে।

লীলা হেসে বললে—আজ একজায়গা বেড়াতে যাচ্ছি যে।

অরুন্ধতী অবাক হলেন, বললেন—কোথায় চল্লি আবার এ সন্ধ্যের সময় ?

কোথায় এখন সন্ধ্যে মা, সবেত সাড়ে চারটে।

তা কোথায় যাওয়া হবে শুনি ?

নীলুদা এসেছে, বাড়ীর পাশে স্বদেশী মেলা বসেছে—তা একদিন দেখতে যাব না বুঝি ?

অরুন্ধতী দেবী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—ফের স্বদেশী নিয়ে হাঙ্গামা ? নীলুটা আবার এসেছে বুঝি ?

লীলা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিলে—হ্যাঁ এসেছে তা কি হবে শুনি ? তুমি ও রকম কোরো না বলছি।

না করবে না, মেয়ে দিনকের দিন ধিঙ্গি হয়ে উঠছেন, আর এক সপ্তাহ বাদে বিয়ে, উনি চললেন স্বদেশী প্রচার কর্ত্তে।

যা বকবার তা ফিরে এলে বোকো বাপু—বলে মার আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখেই দুম্ দুম্ করে এসে নীলমণিকে এক রকম টেনে নিয়েই বেরিয়ে পড়লো।

দেশবন্ধুর ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে যখন স্বদেশী মেলা ভরপুর করে তুলেছে সেই সময় নীলমণির সঙ্গে লীলা সেখানে এসে পৌছল।

ঐ সর্ব্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী আদর্শ একনিষ্ঠ স্বদেশ সেবকের পটের পানে তাকিয়ে লীলা মন্ত্র মুগ্ধ হয়ে গেল। যে সত্য ও পবিত্র আন্দোলনের ঢেউ আজ সমগ্র পৃথিবী তোল পাড় করে তুলেছে, তারই সৃষ্টিকর্ত্তা বাংলা মায়ের সুসন্তান ঐ যে হাঁটু অবধি খদ্দর পরে' তারই সামনে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে লীলার মাথা নত হয়ে এল। সে বার বার হাত যোড় করে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে মনে মনে বললে—'হে সর্ব্বত্যাগী বিরাট পুরুষ, তোমার তেজের প্রভায় আজ সারা বাংলার অন্ধকার দূর হয়ে যাক্, আমি তোমার পায়ে বার বার নমস্কার করি'।

একটী ষ্টলের সামনে এসে লীলা বললে—নীলুদা, ঐ নীল সাড়ীটার দর কত জিজ্ঞেস কর না, আমি কিনবো।

সাড়ীটা সুলভ মূল্যেই পাওয়া গেল। তারপর আরও দু একটা স্বদেশী জিনিষ কিনে তারা চারদিক ঘুরে বেড়িয়ে দেখতে লাগল।

চারিদিকেই স্বদেশী শিল্পের প্রদর্শনী বৈদ্যুতিক আলোয় ঝক্ ঝক্ করছে। প্রতি ষ্টলেই লোকের ভিড়—ক্রয় বিক্রয় চলেছে। কেউ বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে।

একদিকে লোকের ভিড় একটু বেশী। সেখানে দাঁড়িয়ে একটী যুবক অস্বচ্ছ স্বরে বলছিল—মহাত্মার হাতে কাটা সুতো এইখানে পাওয়া যায় দেখে যান।

অত্যধিক জনতার দরুন সে দিকটা ভাল করে দেখা

হয়ে উঠলো না। ঘুরে ঘুরে লীলা ক্লান্ত হয়ে উঠলো। নীলমণি বললে চল এবার যাওয়া যাক।

লীলা বললে—চল, কিন্তু যেতে ইচ্ছে করছে না নীলুদা' এ স্বর্গোদ্যান ছেড়ে আবার সেই নরকে ঢুকতে হবে ত?

কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে লীলা প্রস্তাব করলে—আসবার সময় ত গাড়ী করে আসা গেছে—এখন যাবার সময় হেঁটে যাওয়া যাক্।

নীলমণি আপত্তি করলে। বললে—এইতেই কি হয় তার ঠিক নেই, আবার হেঁটে গেছ শুনলে মাসীমা আর আস্ত রাখবেন না। আর তা ছাড়া এখন তোমার হেঁটে যাওয়া উচিত নয়।

লীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো—তোমরা সকলেই আমার বিপক্ষে লেগেছ দেখছি। উচিত নয় কেন শুনি? আর মাই বা জানবে কি করে?

নীলমণি বললে—কিন্তু···

ওসব কিন্তু টিন্তু আমি শুনছি না নীলুদা। ভারী ত পথ, এইটুকু হেঁটে গেলেই ত আর জাত যাচ্ছে না আমাদের। রাস্তায় হেঁটে যাওয়া পুরুষদেরই একচেটে নাকি নীলুদা?

তর্কে না পেরে উঠে নীলমণিকে অগত্যা লীলার কথায় রাজি হতে হ'ল।

কিন্তু হ্যারিসন রোডের মোড়টা পার হ'তে গিয়ে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেল। একখানা বড় 'অষ্টিনকার্' কখন যে নিঃশব্দে তাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে তা প্রথমটা তারা অন্ধকারে টের পায় নি। হঠাৎ লীলার একখানা হাত ধরে টেনে সজোরে পাশে ঠেলে দিলে। দুজনেই পড়তে পড়তে রয়ে গেল।

মোটরটা থেমে গিয়েছিল। নীলমণি ক্রোধান্ধ হয়ে ফিরে তাকিয়ে সোফারকে কি একটা কড়া কথা শোনাতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল। গাড়ীর আরোহী মুখ বাড়িয়ে বললেন—কে নীলু নাকি?

নীলমণি লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হয়ে বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ—আপনার সোফার বোধহয় নতুন, একটু সাবধানে চালাতে বলবেন।

হ্যাঁ দোষটা ওরই সম্পূর্ণ বটে কিন্তু মেয়েদেরও এ সময় রাস্তায় চলাফেরা করাটা একটু বন্ধ রাখলেই ভাল হয়—সেটা ওকে বুঝিয়ে দিও নীলু!

গাড়ী বেরিয়ে গেল—আর নীলমণির কাণ দুটোও অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠলো।

ভীষণ রেগে নীলমণি লীলাকে বললে—তোর জন্যেই ত কাণ্ডটা বাধল—এখন কি মুস্কিল হ'ল বল দেখি।

লীলা যেন কিছু হয়নি এমনি সুরে বললে কেন কি হ'ল আবার?

নীলমণি অবাক্ হয়ে বললে—কি হ'ল আবার! তুই বলস কি? 'রায় বাহাদুরে'র মেজাজটা চোখে পড়ল না বুঝি—না যা বলে গেল কানে ঢুকল না?

রায় বাহাদুর ও সতীশের সঙ্গে নীলমণি বিশেষ পরিচিত ছিল -- অবশ্য পরিচয়টা বন্ধুভাবে ছিল না।

নীলমণির কথায় লীলা হেসে বললে—ওঃ তাই বল। আমি ভেবেছিলুম বুঝি আর কিছু। তা বাপু 'রায় বাহাদুর'-দের মেজাজ নিজেদের ঘরের মেয়েদের ওপর আর কত মোলায়েম হবে আশা কর তুমি নীলুদা? সাহেবসুবো হতুম ত দেখতে। বলে খিল খিল করে হাসতে হাসতে লীলা আবার বললে—সে যাক্ গে, তুমি কিছু ভেবো না ভাই, এখন শীগ্‌গীর পা চালিয়ে চলে এসো।

নীলমণি কি ভাবলে কে জানে, সে আর কিছু বললে না।

লীলাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে সে যখন বিদায় নিলে তখন রাত নয়টা।

* * * *

সে রাত্রে মার কাছে প্রাপ্য বকুনির অংশটা এত বেশী মাত্রায় লীলার ওপর বর্ষণ হ'ল যে সমস্ত রাত সে ভাল করে ঘুমোতে পারলে না। শোবার আগে সে জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়ে দেখলে পাশের বাড়ীর জানালাটা খোলা। অন্ধকার জীর্ণ ঘরে শুভ্র জ্যোৎস্না যেন একরাশ কুন্দফুলের মত ছড়িয়ে পড়েছে! সেই তরঙ্গায়িত সুবিমল জ্যোৎস্না-কিরণে স্নান করে একখানি সুকুমার নয়নলোভন মূর্ত্তি অকাতরে নিদ্রা যাচ্ছে। বোধ হয় রাত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়টার অপেক্ষা করেও চিরপরিচিত দুটী কালো চোখের সন্ধান না

পেয়ে বেদনাবিদ্ধ হিয়া নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে! চাঁদের আলোয় তার কমনীয় দেহের লাবণ্য যেন ফুটে বেরুচ্ছে! দেখে লীলার প্রাণ এক অজানা পুলকে ভরে উঠলো—চিত্তের অনেকখানি অবসাদ কেটে গিয়ে তার মন অনেকটা শান্ত হয়ে এলো।

বিছানায় গিয়ে শুয়ে লীলার কত কথাই মনে হ'তে লাগল। যৌবনের মত্ততা সমস্ত রাত্রি ধরে তার সারা প্রাণে ঢেউ তুলতে লাগল। চিন্তা ও আধতন্দ্রায় সমস্ত রাত কাটিয়ে ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

(৫)

পরের দিন বিকেল বেলায় সতীশ আসতেই অরুন্ধতী সস্নেহে বললেন—এস বাবা, এস।

তারপর বিয়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি অনেক কথাই জিগ্যেস করতে লাগলেন। তুমি কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করলে? এখনও করনি? তাহোক এখনও এক সপ্তাহ আছে; তোমার বাবা কাউকে বাদ দেবেন না বোধহয়। আমিও দেখছ ত একলা সব গুছিয়ে উঠতে পারি নি। ছেলেটি তেমনি বিদেশে বিদেশে ঘুরছে—টেলিগ্রাম করেছি তাও একসপ্তা'র ছুটি নিয়ে আসবে—সে না এলে কেনা-কাটা কিছু হয়ে উঠছে না—ইত্যাদি।

সতীশের এসব মোটেই ভাল লাগছিল না। লীলাকে একবার একলা পাবার জন্যে তার মন উৎসুক হয়ে উঠছিল।

কথা প্রসঙ্গে লীলার কথা উঠতেই সতীশ জিগ্যেস করলে—কোথায় সে?—তাকে দেখছি না ত?

সে বুঝি ও ঘরে চুল বাঁধছে, রোসো তাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—বলে অরুন্ধতী লীলাকে ডেকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে কাজের অছিলায় চলে গেলেন!

সূর্য্যাস্তের লাল আভা জানলার ফাঁকের ভেতর দিয়ে এসে লীলার মুখখানি রাঙিয়ে তুলছিল।

রক্তিম কপোলে দু এক গাছি চূর্ণীত কুন্তল বাঁ হাত দিয়ে সরাতে সরাতে লীলা জিজ্ঞেস করলে—কখন এলেন?

সতীশ ঈষৎ হেসে বললে—তবু ভাল, দেখা দিলে আমি ভাবছিলুম—

লীলা নাটকীয় সুরে কথাটা কেড়ে নিয়ে শেষ করলে—বুঝি আমাকে ভুলে গেলে, আর এলে না।

সতীশ হেসে বললে—না ঠাট্টা নয়, সত্যি তুমি যেন দিনকে দিন কি রকম হয়ে যাচ্ছ।

এতক্ষণ এসে বসে আছি, তা না ডাকলে দেখা করবে না এর মানে কি?

লীলা উত্তর দিলে—সব কথারই মানে থাকতে হবে এমনই বা কি?

সতীশ অধীর ভাবে বললে—কিন্তু আমি যে এসে দু'ঘণ্টা বসে থাকব, তারপর তোমাকে ডেকে পাঠিয়ে কথা কইতে হবে এতে কি আমি খুব খুসী হই ভাব?

লীলা বললে—সকলের খুসী মত কাজ করতে গেলেই বা আমার চলে কি ক'রে বল।

—আমি কি সাধারণ সকলের মধ্যে একজন নাকি? এক সপ্তাহ পরে—

লীলা বাধা দিয়ে বললে—আপাততঃ ত তাই, তারপর এক সপ্তাহ পরের কথা, পরে আছে।

সতীশ উঠে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ লীলার হাতখানি ধরে বললে—লীলা, ব্যথা না দিয়ে কি তুমি কথা কইতে জাননা?

পশ্চিমের আকাশ অস্তমিত সূর্য্যের কণক কিরণে রঞ্জিত হয়ে উঠছিল—সেইদিকে চেয়ে লীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে—কোন উত্তর দিলে না।

সতীশ অধীর আগ্রহে বললে—লীলা, ভেবেছিলুম, তোমায় বুঝতে পেরেছি, কিন্তু মনকে আঁখি ঠেরে আর কি হবে? আমি তোমায় আজও বুঝতে পারলুম না।

লীলার হাত ছেড়ে দিয়ে সতীশ আবার চেয়ারে বসে পড়লো। লীলা ঘরের ভেতর পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। কথার প্রবন্ধটা অন্যদিকে ফেরাবার ছলে সতীশ জিগ্যেস করলে—একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব' ঠিক উত্তর দেবে লীলা?

বল সাধ্য থাকে ত দেবো?

তুমি চরকা, খদ্দর, স্বদেশীপণা এসব ছাড়বে কি না,

মনে প্রাণে আমার সহধর্ম্মিণী হবার মত ইচ্ছে তোমার আছে কি না—

সে কথা এখন কেমন করে বলব! মানুষের মন ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছে—আজ যা ভাল বলে ভাবছি কাল হয়ত আবার সেটা মন্দ ভাবব। তবে আপাততঃ এইটুকু বলতে পারি যে এদেশের মেয়ে হয়ে জন্মে এদেশের জিনিষই ব্যবহার করতে চাই—এই দেশকেই ভালবাসতে চাই আর বিদেশীর দেওয়া জিনিষ তা সে কাপড়ই হোক, খেতাবই হোক টাকাই হোক, সব জিনিষই ঘৃণা করতে চাই—তবে সময়ে পেরে উঠি না এই যা দুঃখ।

অনবরত বিরুদ্ধ উত্তরে ও কথা কাটাকাটিতে সতীশের মন বিরক্তিতে ভরে উঠছিল। তার ওপর পিতার সরকারী খেতাবের ওপর আক্রমণ করে লীলা ওরকম ভাবে কথাটা বলাতে সতীশের মন বিশেষ উষ্ণ হয়ে উঠলো।

সে এবার তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে—তাই বুঝি কাল আমাদের মতের অপেক্ষা না করে নীলমণিবাবুকে একা সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যের সময় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো শিক্ষা হচ্ছিল?

কথা কয়টীর অন্তর্নিহিত প্রচ্ছন্ন বিশ্রী ইঙ্গিতে লীলার মন তিক্ততায় ভরে উঠলো। সে কুটীল কটাক্ষপাত করে সতীশের দিকে একবার চাইলে, কোন উত্তর করলে না।

সতীশ আবার বললে—উত্তর দিলে না যে? কথাটা খারাপ বটে কিন্তু সত্য। বাবা যখন কাল আমায় বললেন তখন আমি বিশ্বাস করতে চাইনি, কিন্তু এখন তোমার মুখে চোখে এর যে উত্তর ফুটে উঠছে তাতে আমার অনেকখানিই জানা হয়ে গেছে; কিন্তু মনের ভেতর আমার যে কি হচ্ছে, তা যদি দেখতে পেতে।

সতীশ চুপ করলে—বুকের ভেতর থেকে তার একটা জালাময় দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল।

লীলা এবার তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে—

তাই বুঝি সেই কথাটার সত্যাসত্য যাচাই করতে আজ তাড়াতাড়ি এসে আমায় একলা পাবার জন্মে সুযোগ খুঁজছিলে?

সতীশ লোকটা ভারী দুর্ব্বলচিত্ত। লীলার অসামান্ত রূপ-লাবণ্য তাকে মুগ্ধ করেছিল। তাকে পাবার জন্তে সতীশ অনেক কিছু ক্ষতি স্বীকার করতেও কুণ্ঠিত ছিল না।

লীলাকে বেশী ঘাঁটিয়ে নিজেকে অপমানিত করতে সে রাজি ছিল না, তাই এবার গলার স্বর যথাসম্ভব কুণ্ঠিত ও নম্র করে বললে—না না, অতখানি তুমি আমায় ভেব না লীলা, একটুতেই ওরকম রেগে যেয়ো না। ব্যাপারটা একটু বুঝতে চেষ্টা কর।

লীলা কথা কইলে না।

সতীশ মুখে হাসি এনে বললে সত্যি তুমি ওরকম গম্ভীর হয়ে থেক না। মাঝখানে আর এক সপ্তাহ মাত্র বাকী আছে—আমি একটা কথা আজ ভাল করে জেনে যেতে চাই—যা আমি এতদিন ইচ্ছে করেই জানতে চাই নি। বিবাহের আগে আমি আর এখানে আসব না কাজেই কথাটা আমার আজ জেনে যাওয়া নিতান্ত দরকার তা—তুমি অত গম্ভীর হয়ে থাকলে কি করে জিগ্যেস করি?

লীলা গম্ভীর কণ্ঠে বললে—কি জানতে চাও বল।

সতীশ আবার দাঁড়িয়ে উঠে আবেগ কম্পিত হস্তে লীলার হাতখানি নিজের হাতে নিয়ে বললে—এতদিন আমি জিগ্যেস করতে ভরসা পাইনি লীলা, কিন্তু তোমার ব্যবহারে আমি তা জোর করে ভাবতে আনন্দ পেয়েছি—বল লীলা, আজ আমায় বল, তুমি আমায় ভালবাস কি না।

লীলা হাতখানি সজোরে টেনে নিয়ে বললে—সে কথা আজ শুনে তোমার দরকার নেই।

সতীশ নাছোড়বান্দা হয়ে ব্যগ্রভাবে বললে—আচ্ছা তোমার মুখে আর বলতে হবে না, আমি নিজেই তা জেনে নিচ্ছি—বলে হঠাৎ তাকে দু'হাত দিয়ে বুকের ওপর টেনে নিতেই লীলা ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রবল শক্তিতে সতীশের হাত হতে নিজেকে মুক্ত করে বলে উঠলো—ছিঃ তুমি এই! ক্রোধে তার ঠোঁট কাঁপছিল—সে বলতে লাগল—আমি এখনও তোমার বিবাহিতা স্ত্রী হইনি তবু তুমি আমাকে আজ এতখানি অপমান করতে সাহস পেলে কোন অধিকারে শুনি? তোমার সঙ্গে বন্ধু ভাবে চিরকাল কথা কয়ে এসেছি—আজ তোমার সঙ্গে আমার বিয়ের কথা হয়েছে শুধু বলেই তুমি আমার ওপর এতখানি অত্যাচার করতে সাহস কর—মানুষের

মন, মানুষের দৃষ্টি নিয়ে তুমি আসনা এখানে। ছিঃ—যাও তুমি বেরিয়ে—আর কখনো তুমি এবাড়ী ঢুকো না।

রাগে লীলার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। কম্পিত পদে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্ব্বাক নিস্পন্দ সতীশ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে খানিকক্ষণ বসে থেকে তারপর কাউকে না জানিয়ে যখন বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল তখন পাশের বাড়ীর কোন তরুণী হারমোনিয়ামে সুর তুলেছে—

'স্বপন ভাঙ্গিয়া গেছে—ভেঙে যায় মিছে হাসিখেলা—
ধীরে ধীরে আঁধার নামিয়া আসে, ফুরায়ে যায় যে বেলা—'

(৬)

গ্রীষ্মকালের ভোর বেলা। সারা রাত অসহ্য গরমের পর ভোরের দিকে বেশ একটু এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। ময়লাফেলা গাড়ীগুলো সমস্ত রাস্তা কাঁপিয়ে সবে মাত্র চলতে আরম্ভ করেছে। অরুন্ধতী দেবী অনেকক্ষণ হ'ল জেগে বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলেন—আলস্য বশতঃ উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। শুয়ে শুয়ে তিনি অনেক কথা ভাবছিলেন।

আগের দিন সতীশ জলখাবার না খেয়ে তাকে না জানিয়েই চলে গেছে—সেই থেকে লীলার মনটাও যেন কি রকম হয়ে আছে। দুজনের কথাবার্ত্তায় নিশ্চয়ই কোন কলহের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। কিন্তু কলহটা কিসের জন্য সেটা লীলাকে অনেক জেরা করেও তিনি জানতে পারেন নি। দুদিন বাদে বিয়ে—আর মাঝখান থেকে ঝগড়া পাকিয়ে মেয়ে যে কি কাণ্ড করে বসে আছে তা ভগবানই জানেন। কোথায় দুজনে আমোদ আহ্লাদ করবি—হাসি গান নিয়ে মত্ত থাকবি—তা নয় ঝগড়া-ঝাটি করে একটা ফ্যাসাদ বাধাবার চেষ্টা আর কি! কি একগুঁয়ে মেয়ে বাবা, সতীশ খুব ভাল তাই অতবড় লোকের ছেলে হয়েও লীলাকে বিয়ে করতে চেয়েছে—নইলে কি দুর্দ্দশা কপালে আছে তার তা ত ভাবাও যায় না। রূপটাই যা একটু জলজলে নইলে মেয়ের গুণ ত আর তাঁর জানতে বাকি নেই। ওই চরকা আর খদ্দরই ওর কাল হবে দেখছি।

এই সব ভাবতে ভাবতে হাই তুলে তিনি উঠে বসলেন। ঘড়ীতে দেখলেন ৫টা তখনও বাজে নি। হাওয়াতে জানলাটা বন্ধ হয়ে গিছিল—সেটা ভাল করে খুলে দিয়ে তিনি আর একবার শুয়ে পড়লেন।

বিয়ের ভাবনাও তার মনকে অনেকটা ভারী করে তুলেছিল। দেশ থেকে কাকে কাকে আনতে হবে কি কি আয়োজন করতে হবে, কি কি কাপড় চোপড় ও গয়নাগাঁটি আজকালকার ফ্যাসান দুরস্ত ইত্যাদি সব ভাবনাতেও তিনি সুস্থির থাকতে পারছিলেন না।

দরজাটা ভেজান ছিল। হঠাৎ বাইরে থেকে দরজা ঠেলে নমিতা ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ল। মুখে তার অস্বাভাবিক বিস্ময় ও বিভীষিকার চিহ্ন সুস্পষ্ট।

অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বললেন—কি হয়েছে নমিতা?

নমিতার ভীতকণ্ঠে স্বর ফুটলো না—সে কি বলতে চাইলে কিন্তু পারলে না।

অরুন্ধতী দেবী ব্যগ্র আবেগে উৎকণ্ঠিতস্বরে বললেন—কি হয়েছে? মুখ চোখ তোমার অমন হয়ে গেছে কেন নমিতা? তুমি অমন করছ কেন?

নমিতা অস্ফুটস্বরে বললে—লীলা ভোরবেলা এ ঘরে আসে নি?

না, কেন? কি হয়েছে তার?

তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

বল কি অ্যাঁ! কোথায় যাবে সে সকাল বেলা? অরুন্ধতী দেবী চীৎকার করে নমিতাকে সঙ্গে নিয়ে ঘর ছেড়ে দালানে এলেন।

নমিতা বললে—রোজ সকালে যেমন তাকে ডেকে ছাদে উঠি, আজও তেমনি গিয়ে দেখি দরজা খোলা ঘরে লীলা নেই। তারপর সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করে তাকে খুঁজেছি—কোথাও পাই নি।

অরুন্ধতী দেবী ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করলেন—কোথায় গেল সে হতভাগী? কি কেলেঙ্কারীতে পড়লুম আমি।

সমস্ত বাড়ীময় একটা গোলমাল, একটা উৎকণ্ঠা, একটা ব্যস্ততার ঢেউ বয়ে যেতে লাগলো। বাড়ীর চাকর কেষ্টাকে

ডেকে জিজ্ঞাসা করা হল—সে বললে—সকাল বেলায় ঘুম ভেঙ্গে ঝাঁট দিতে গিয়ে দেখি সদর দরজা খোলা; সেকথা আমি তখনি বৌদিমণিকে বলেছি—কিন্তু দিদিমণিকে আমি দেখিনি।

এই রকম কোলাহলের মাঝখানে অরুন্ধতী দেবী টল্‌তে টল্‌তে একটা সোফায় এলিয়ে পড়লেন। এ সময় কি যে করা উচিত তা তার মাথায় এলনা।

নমিতা বুদ্ধিমতী। সে বাড়ীর সকলকে গোলমাল করতে বারণ করে দিয়ে লীলার শোবার ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে আরম্ভ করে দিলে। হঠাৎ বালিসের তলা থেকে দুখানা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। সাদা খামে আঁটা একখানা নমিতা ও অপরখানা মার নামে ঠিকানা লেখা।

অধীর আগ্রহে কম্পিত হস্তে নমিতা নিজের চিঠিখানা খুলে পড়লে—

"বৌদি,

রাগ কোরোনা। এ ছাড়া আর আমার অন্যপথ ছিল না। তোমরা কি ভাবছ জানিনা, কিন্তু দোহাই তোমার আমাকে ভুল বুঝো না। আমাকে তুমি অনেকদিন দেখে আসছ—আমার মন তোমার কাছে অজ্ঞাত নেই। আমার 'পেটে পেটে এত বিদ্যে' যেছিল তা তুমিই একদিন ধরে ফেলেছিলে আর ঠাট্টাচ্ছলে সে প্রিয় লোকটীর সন্ধান নিতেও তুমি কসুর করনি। তবে ঠাট্টা যে এরকম ভাবে সত্যি হয়ে দাঁড়াবে তা বোধ হয় তুমি জানতে না। যাক্।

আগেকার কালে শুনতুম আমাদের দেশের মেয়েরা নাকি জীবনের সাথী নিজেরাই বেছে নিতেন। আমি সেই পুরাতন প্রথা মাথায় করে নিয়ে বেরিয়েছি। আমার জীবনের সংস্কার, বিশ্বাস ও ভালবাসা বিসর্জ্জন দিয়ে আমি দ্বিচারিনী সাজতে পারলুম না—তাই স্বয়ম্বরা হতে চললুম।

আমাকে অন্য কিছু ভেব না তোমার ম্যাট্রিক বন্ধু আগেকার মতই আছে তবে এক সপ্তাহ বাদে যখন তাঁর শুভ্রহাতে নিজের হাতখানি ফুলের মালায় বেঁধে তোমাদের কাছে আশীর্ব্বাদের জন্য এসে দাঁড়াব, তখন বিমুখ করোনা ভাই—আগেকার মতই তোমার নির্ম্মল হাস্তে আমাদের নতুন জীবনের পথ আলোকিত করে দিও।

—লীলা।"

বিস্ময়, আনন্দ, ভয়, সবগুলিই একে একে নমিতার হৃদয়ে বিদ্যুতের মত খেলে গেল। সে কম্পিতপদে ছুট্‌তে ছুট্‌তে মার কাছে এসে তাঁর হাতে তার চিঠিখানা দিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে বললে—এই নাও মা লীলার চিঠি, কিছু ভেব না, সে ভালই আছে; নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ আশ্রয় তার মিলেছে এই দেখ—

অরুন্ধতীর মাথায় তখনও আগুন জ্বলছিল। সমস্ত ব্যাপারটা তাঁর চোখে হেঁয়ালির মত ঠেকছিল—তিনি কোনরূপে তার সমাধানের পথ পাচ্ছিলেন না। অনেক কষ্টে নমিতার কথায় তিনি মাথাটা অনেকটা সুস্থির করে লীলার চিঠিখানা খুলে পড়লেন—

"মা, তুমি আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার মনোনীত পাত্রকে যখন আমি মনে প্রাণে বরণ করতে পারিনি তখন তাঁকে বিবাহ করতে তুমি মা হয়ে আমাকে কখন উপদেশ দিতে পারতে না। মেয়েকে তুমি লেখাপড়া শিখিয়েছ—অশিক্ষার অন্ধকারে রাখনি ত, মা তোমার ইচ্ছা ও আদেশ মতই সেই এক সপ্তাহের ভিতর আমার জীবন আর একটী তরুণ জীবনের সহিত পবিত্র বন্ধনে জড়িত হবে। তিনি গরীব, তোমার পরিচিত। গরীব বলে দুঃখু কোরোনা মা। গরীব কি মানুষ নয়? বিয়ের কি শুধু আর্থিক বিলাসের সহিতই সম্বন্ধ?

বাইরে তুমি আমায় যাই বল না কেন—অন্তরে তুমি আমায় আশীর্ব্বাদ না করে পারবে না—এই আশাই আমাদের মনকে সত্যের পথে নিয়ে যাক্।

তোমারই স্নেহবঞ্চিতা লীলা।"

———

[শ্রীশিশিরকুমার বসু]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

কয়েক মুহূর্ত্ত উভয়ে উভয়ের প্রতি চাহিয়া রহিল ; প্রথমে কুমারী নাডা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল "আপনার পত্র পাইয়া আমি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছি। করসিনির সহিত লণ্ডনে আমার বন্ধুত্ব হয় ; সত্যই সে একজন গুণী ব্যক্তি। সে আমাদের দেশে আসিয়া আমারই আপনার লোকের দ্বারা বিপন্ন -- এই সংবাদ আমাকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছে।"

শ্রীমতী কোয়েরোও ধীরে ধীরে জবাব দিল "সত্যই এইরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়াছে বলিয়াই আমি ছুটিয়া তোমার বাড়ীতে আসিয়াছি এবং তোমার পরিচারিকা কর্ত্তৃক অপমানিতা হইয়াও তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি।" কুমারী নাডা এই কথায় অত্যন্ত লজ্জিত হইল। শ্রীমতী কোয়েরো কুমারী নাডার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল "তোমার লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই ; পরিচারিকা হয়ত আমার কথা তোমাকে বলে নাই। যাহা হউক এখন কাজের কথা হউক—তোমার ভ্রাতার ক্রোধ হইতে কিরূপে করসিনিকে রক্ষা করা যায় ?"

কুমারী নাডা অত্যন্ত ভীতভাবে বলিল "তাইত, আমার ভ্রাতার সহিত বহু লোকের শত্রুতা থাকিতে পারে কিন্তু করসিনি নিরীহ, তাহার সহিত এইরূপ মর্ম্মান্তিক শত্রুতা হইবার কারণ কি ?"

শ্রীমতী কোয়েরো ধীরস্বরে উত্তর করিল "করসিনি অতর্কিতভাবে বরিস জোরাফের কোন গুপ্ত কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছে যদিও এখনও করসিনি সম্যক বুঝিতে পারে নাই যে কতটা সাংঘাতিক কার্য্য বরিস জোরাফ করিতে বসিয়াছে ; তথাপ বরিসের ভয় হইয়াছে যদি করসিনি সমস্ত বুঝিতে পারে তাহা হইলে বরিসের ভয়ানক বিপদ—এই আশঙ্কাতেই করসিনিকে হত্যা করিয়া সে বিপদমুক্ত হইতে চাহে।" এই কথা শুনিয়া কুমারী নাডা ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল—অত্যন্ত ভীতভাবে শ্রীমতীকে জিজ্ঞাসা করিল "হত্যা করিবে—কিন্তু তুমি কি করিয়া জানিলে ?"

"তাহার নিজের মুখ হইতে আমি শুনিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া কুমারী নাডা সোফার উপর এলাইয়া পড়িল। শ্রীমতী কোয়েরো তাহাকে সাহস দিয়া কহিল—"এখন নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না, করসিনিকে বাঁচাইতে হইবে।"

'হ্যাঁ—কবে করসিনিকে হত্যা করিবে কি করিয়া বুঝিব ?"

"তুমি নিশ্চয়ই জান যে আগামী কল্য তোমার ভ্রাতা করসিনিকে তোমাদের বাড়ীতে বাজাইবার নিমন্ত্রণ করিয়াছে —ইহার উদ্দেশ্য কি অনুমান কর ?"

কুমারী নাডা হতাশ ভাবে কহিল "হায়—আমার ভ্রাতা এত নীচ হইয়াছে ?" পরে একটু থামিয়া বলিল "কি করিব বল ? করসিনির সহিত দেখা করিয়া তাহাকে কাল আমাদের বাড়ীতে আসিতে নিষেধ করিব ?—কিন্তু তাহাকেই বা কি করিয়া ভ্রাতার গুণের কথা বলিব ?"

শ্রীমতী কোয়েরো একটু ভাবিয়া বলিল "শোন শোন, আমি শুনিয়াছি তোমার ভ্রাতার একটি অত্যন্ত বিশ্বাসী ও কর্ম্মঠ ভৃত্য আছে—তাহার নিকট হইতে কোন গুপ্ত কথা জানিয়া লইতে পার ?"

কুমারীর মুখে আশার সঞ্চার হইল, বলিল "খুব সম্ভব পারা যায় কারণ আমার বিশ্বাসী পরিচারিকা তাহারই স্ত্রী—সে আমাকে খুব ভালবাসে ; হয়ত তাহাকে দিয়া দাদার ভৃত্য পিটারের নিকট হইতে সমস্তই জানা যাইতে পারে।"

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া শ্রীমতী বলিল "বেশ কথা তাই কর—আমি জানি পিটারের সাহায্য ব্যতিরেকে জোরাফ নিজে কোন কার্য্য করিবে না। কর্‌সিনির জীবন রক্ষার ভার তোমার উপর রহিল। আমি চলিলাম—বরিসের আসিবার সময় হইয়াছে" বলিয়া শ্রীমতী উঠিল; কুমারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল "আচ্ছা একটা কথা—তুমি কি নিজে কোনও প্রকারে তাঁহাকে বাঁচাইতে পার না?"

ঈষৎ হাসিয়া শ্রীমতী কহিল "তোমার দাদাকে চেন না—জানিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে আমার মৃত্যু হইবে। তুমিই পারিবে—ভগবান তোমার সহায় হউন।" বলিয়া শ্রীমতী ত্বরিৎগতিতে প্রস্থান করিল।

* * * *

বহু চেষ্টা করিয়া কুমারী নাডা পরিচারিকার নিকট হইতে সংবাদ পাইল যে একখানি গাড়ী অদ্য রাত্রে বাটীর পশ্চাৎ দ্বারে প্রস্তুত থাকিবে—কোন বন্দীকে সেই গাড়ীতে রাত্রে মস্কো রোড দিয়া কোনও গুপ্তস্থানে লইয়া গিয়া হত্যা করিতে হইবে। সংবাদ পাইবামাত্র কুমারী নাডা স্থানীয় পুলিস ইনস্পেক্টরকে ঠিক এই কয়টি কথা একখানি পত্রে লিখিয়া ডাকে দিল—পত্রে নাম-ধাম দিল না। পত্র পাঠাইবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বরিস জোরাফ শিস্ দিতে দিতে কুমারীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল "নাডা কি ভাবিতেছ—অদ্যকার উৎসবে কি কাপড় চোপড় পরিবে তাহাই ভাবিতেছ কি?"

কুমারী মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল "হ্যাঁ দাদা—"

বরিস পুনরায় বলিল, "কর্‌সিনি আসিলে আজ আমি নিজে বসিয়া তাহার বাজনা শুনিব, সত্যই বেশ বাজায়" বলিতে বলিতে স্থান ত্যাগ করিল।

কুমারী একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—"হায় এই লোক আমার মার পেটের ভাই—হা ভগবান!" সঙ্গে সঙ্গে দরদর ধারে তাহার দুই চক্ষু দিয়া বেগে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

কাহিনী

[শ্রীঅশোক রায়]

বিজয়ী রাজা রাজপথ দিয়ে চলেছেন। নগরে সোরগোল পড়ে গেছে। আনন্দে সবাই দুঃখ কষ্ট ভুলে গেছে। রাজা নিজ হাতে দান ক'রতে ক'রতে চলেছেন।

এক সুন্দরী যুবতী এসে রাজার পথ আগলে দাঁড়াল। রাজা তার মুখের পানে চেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, "কে তুমি, কি চাও?" সুন্দরী তার শীর্ণ, গৌর হাত দু'খানি পেতে বলল, "আমি ভিখারিণী, কিছু অর্থ ভিক্ষা চাই।" রাজার চোখে এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ দেখা দিল। তিনি ব'ললেন, "আমার প্রাসাদে চল। যত অর্থ চাও দেব।"

রাজার চোখের সেই অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ রমণীর দৃষ্টি এড়াল না। সে ভয় পেল। বলল, "আমি ত বেশী চাই না মহারাজ।" কিন্তু তার কথা কারও কাণে গেল না। রাজার ইঙ্গিতে তাঁর অনুচরগণ রমণীকে শিবিকা বন্দিনী করে নিয়ে চলল।

রাত্রি দ্বিপ্রহর। সম্মুখে অত্যাচারিতা ভিখারিণী নারী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। রাজা অস্ফুটস্বরে ব'ললেন, "হ্যা—ভিখারিণীর আবার সতীত্ব!"

ভোর হয়ে এসেছে। আলো আঁধারের কোলাকুলি সবে আরম্ভ হয়েছে। ভৃত্য এসে সংবাদ দিল, "মহারাজ, কালকের ভিখারিণীটা ত মরে গেছে। কি ক'রব?" রাজা তাচ্ছিল্যভরে ব'ললেন, "মরে গেছে?—দাও গে নদীতে ভাসিয়ে।" তারপর মনে মনে ব'ললেন, "অমন কত মরেছে, কত মরবে।—"

প্রতীক্ষা

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

আজ জীবনের এই শেষ বিছানায় শুয়ে যা বলবো হয় তো তোমরা অবিশ্বাসের হাসি হেসে উড়িয়ে দেবে, পাগলের প্রলাপ বলে উপেক্ষা ক'রবে—কিন্তু তা নয় এর প্রত্যেকটী অক্ষর সত্যি—এর চেয়ে সত্যি আর কিছু হতে পারে কি না জানি না!

পুরুষমানুষ তোমরা নারীর এ কাহিনীতে বিশ্বাস ক'রবে কেন?—এ যে তোমাদেরই কীর্ত্তি! তোমাদের জীবনেরই মহান এক গর্ব্বের পরিচয়! অথচ তোমাদের কালিমা তোমাদের অপরাধের রেখাটুকু মুছে যায় ঐ পৌরুষত্বের চাপে, হায় রে!...

...কিন্তু আমার এ নারী জীবনের এই যে মর্ম্মান্তিক অধঃপতন তা তোমাদের পুরুষেরই বিরাট কীর্ত্তিস্তম্ভ—এর ইতিহাস আজ আমাকে খুলে বলতেই হবে—কি জানি যদি অবসর না আসে!...

সামান্য একটা বেশ্যা,- যার নামে মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়, মুচী মুদ্দোফরাসেরাও কুৎসিৎ বিদ্রূপ করে যায়—তারই জীবনের ইতিহাস,- খুব প্রয়োজনীয় নয়, তবু আজ বলবো।

যে করে শৈশবের কোন্ এক অজানা দিনে আমি মাকে আমার জন্মের মত হারিয়েছিলুম আমার তা ঠিক মনে নেই, তবে যেন স্বপ্নের মত, ছেলেবেলার গানের শেষ চরণের মত মাঝে মাঝে তাঁর মূর্ত্তিখানা চোখের সামনে ফুটে উঠে কিন্তু ভাল করে দেখবার আগে চোখের সামনেই মিলিয়ে যায়! আমরা ছিলুম খুব গরীব কোন রকমে দিন চলতো—কি রকমে যে চলতো তা এক ভগবানই জানেন, আর জানতুম আমরা! মা মারা যাবার পর দূর সম্পর্কের এক পিসীর কাছে এলুম—বললেন মানুষ করবেন ইত্যাদি।

মানুষের অদৃষ্টের চাকা ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এসে যে থামে মানুষ তা জানে না। আচ্ছা এমন হয় কেন? আজ যে রাজা কাল সে ফকির, আজ যে সম্ভ্রান্ত ঘরের পর্দ্দানসীন্ বধূ, দু'দিন পরে সে সবার ঘৃণ্য সবার হয় পতিতা—ঠিক যেন রঙ্গমঞ্চের একটা দৃশ্য একেবারে বদলে গেল, প্রথমটার সঙ্গে শেষটার কোন সম্পর্ক নেই—একেবারে আলাদা।

...কি জানি এই পরিবর্ত্তনটাই হয় তো মানুষের জীবনের একটা ধর্ম্ম হবেই হবে।

...যাক্ তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই আমার জীবনের ইতিহাস টুকুই শুধু বলবো।...

পয়সা ছিল না বটে, কিন্তু রূপ যা ছিল আমার তা অনেক বড়লোকের ঘরেও নাকি দুর্লভ ছিল। হায়রে, এই রূপই যে ধ্বংশের বীজ; চিতোর মরেছিল এই বীজের আক্রমণে—রামায়ণের সৃষ্টি,—তা'ও এই বীজ নিয়েই। কিন্তু বিধাতার সে কী নিদারুণ বিদ্রূপ! ঘরে পয়সা নেই অন্ন নেই অথচ একরাশ রূপ দেহময় ছড়িয়ে দিয়েছেন।

পিসীর কাছে থেকেই লেখাপড়া শিখতে লাগলুম। বেলা দশটা বাজতেই ইস্কুলের বাস এসে দরজায় দাঁড়াতো আবার সারাদিনের খর দিনের-আলো যখন অস্তাচলের মাথায় ম্লান হয়ে আসতো বাসে করে ফিরে আসতুম। সে কী আনন্দ ভরা দিনগুলি চোখের সামনে দিয়ে কেটে যেতো আজ মনে হয় সেটা বোধহয় স্বপ্ন—কিম্বা স্বপ্নের চেয়েও কোন একটা ক্ষণিক মধুর!

এমনি করেই বেশ দিন কাটছিলো; বছরের পর বছর ক্লাশে উঠতে লাগলুম। হঠাৎ একদিন পিসী ব'ললেন হিঁদুর ঘরের মেয়ে আর ইস্কুল যাওয়া হতে পারে না, লোকে নাকি নিন্দে ক'রবে! ইস্কুল যাওয়াও বন্ধ হোল।...হায় হিঁদুর ঘরের মেয়েরা লেখাপড়া শেখবার অধিকারটুকুও তোমাদের নেই,—এমনি কঠোর সমাজ তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে বসে আছে, সুযোগ পেলেই মারবে!

—সেদিনের বিকেলটা কিন্তু আমি কখনও ভুলবো না,

সেইটাই যে আমার জীবনের একটা প্রধান দায়ী ; বিকেলে ছাতে বসে বেশ একমনে বই পড়ছিলুম—হঠাৎ পাশের দুই একখানা বাড়ীর পরে একটা বাড়ীর ছাদে নজর পড়তেই দেখলুম বেশ ফুটফুটে চেহারার একটী ছেলে! বয়সটা বোধহয় তার তেইশ কি চব্বিশ হবে, চোখের উপর সোণার চশমা, স্বাস্থ্যটাও বেশ সবল সুস্থ···

প্রথমবারের চোখোচোখির মধ্যে সে কি একটা নেশা ছিল, কে জানে যতবার তার মুখখানা মনে পড়ে ততবারই তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে।...মনের সঙ্গে সে কী প্রবল দ্বন্দ্ব, সে কি দুর্দ্দম যুদ্ধ ইস্!··

—হিপ্নোটিস্‌ম বা সম্মোহন শক্তি বলে যদি কোন জিনিষ থাকে তা বোধহয় এই নীরব দৃষ্টি চলাচলটুকুর ভেতর দিয়েই হয়। কবে কোন্ মুহূর্ত্তে তার দৃষ্টিটুকু আমাকে মন্ত্র মুগ্ধ করেছিল কে জানে!

চোখোচোখী হলেই যেন আমার ভেতরের অন্তরটা তার কাছে পরাজয় মান্‌তো—পোষা কুকুরের মত—তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তো ...

তোমরা শুনলে হয়তো হাসবে সেইদিন থেকে আমার কাজ হোলো সময়ে অসময়ে চুপ করে গিয়ে ছাতে বসে থাকা! পৃথিবী বলতে আমার কাছে যতটুকু সেটুকুর মধ্যে যেন আমার কোনো সম্পর্ক ছিল না, ভাল-ও লাগত না কিছু—আর লাগবেই বা কি করে, মনটুকু—যার সঙ্গে ভালো লাগা না লাগার সম্বন্ধ—সেটা তো একেবারে বন্দী কি-না!

—হপ্তাখানেক পরে হঠাৎ একদিন দেখি পিসীর সঙ্গে ছেলেটীর কেমন করে বেশ ভাব হয়ে গেছে, পিসীও তাকে বাড়ীতে এনে বসিয়েছেন,- আমার সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল, তবে ভেতরটুকুর সঙ্গে নয়, সেটা যেমন চাপা ছিল তেমনি রইলো, · বাইরে যতটুকু হতে পারে···

হায় রে 'চাপা', যদি চিরকালই চাপা থাকতো!—তা যে থাকবার নয়—হঠাৎ কিসের ধাক্কায় একদিন আবরণটুকু উড়ে গিয়ে মনের নগ্নতাটুকু প্রকাশ হয়ে গেল কে জানে, ধরা পড়লুম ; মেয়েমানুষ কি না, ·মুখ ফুটে স্বীকারও করলুম—ভালবাসি!

দু'হাতে তার বুকের ওপর প্রবলভাবে চেপে ধরে সে বললে—সত্যি,—আমার জানাগুলি কেন ধীরা, আমিও যে তোমার জন্যে—তারপরে উঃ সে কী উষ্ণ, কী কোমল অধর স্পর্শ! সঙ্গে সঙ্গে মাতালের নেশার মত কী মাদকতায় ভরা একটা অবসাদ সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো। উঃ, জীবনে এত সুখ, এত তৃপ্তি তার আগে বোধ হয় আর কখনও পাই নি!...বিষও এত মিষ্টি?···হায় রে, সে যে গরল!···

জীবনের ধারাটা কি ভাবে হঠাৎ বদলে গেল শুধু সেইটুকুই আজ অন্তিম বিছানায় শুয়ে অকপটে স্বীকার করে যাবো। মেয়েমানুষ? সে তো পুরুষের হাতের খেলার পুতুল। সখ মিটলে আছড়ে ফেলে দেয়—তাদের জীবনের দাম কী এমন বেশী তা তো আমি দেখি না! ··

—হঠাৎ একদিন সে বললে—আচ্ছা ধীরা, জগতে ভালবাসার ওপর ভগবানের এতটা অভিশাপ কেন বলতে পার?...

হায় রে, তার উত্তর আমি দোব?—আমি চুপ করে রইলুম, আমার হাত দু'খানা তার বুকের ওপর টেনে নিয়ে সে কী আদর, সে কী ভালবাসা!···হায় রে অভাগী, বাইরেটা দেখে তখন ভুলেছিলি, সত্যের সন্ধান তখন তোর কোথায়?...

জীবনের প্রত্যেক ঘটনার খুঁটিনাটিটুকু বলতে গেলে একখানা বড় উপন্যাসের সৃষ্টি হয়, তা শোনবার ধৈর্য্য হয়তো তোমার নেই - অল্পে সংক্ষেপেই তাই সবটুকু বলবো!...

হঠাৎ একদিন সে ডাকলে তার কাছে। গেলুম, বললে—একটা কথা রাখবে ধীরা, যদি বল...

আগেই বলেছি সম্মোহন শক্তির অধীনে তখন আমি। আমার অন্তর ঠেলেও তখন একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা, একটা চাঞ্চল্য···

ব'ললুম—রাখবো, বলো!

* * * *

তার তিনদিন পরেই অধঃপতনের প্রথম সিঁড়িতে নামলুম। হায় শিক্ষা, হায় বংশ গরিমা!···কৈ পালাবার সময় মুহূর্ত্তের জন্যেও তো মনে হয়নি যে ভবিষ্যতে একদিন আসবে, যেদিনটা জীবন-ব্যাপী অনুশোচনার প্রথম দিন হবে!—সেদিন তো বেশ নিঃসঙ্কোচে তার হাত ধরে, তার

মুখের কথায় বিশ্বাস করে একটা ক্ষণিকেই মান, সম্ভ্রম সমস্তই বিলিয়ে দিলুম।…সে সর্ব্বনাশের পথে ছুটে যাওয়ার পাথেয় আমার কি ছিল?—শুধু পুরুষের মুখের আশাপূর্ণ কয়েকটা কথা—নয়?…

—সে যাক্‌, সব কথা খুঁটিয়ে বলবার মত অবস্থা আমার আজ নেই, এ পথের শতকরা নব্বইজন পথিকের যা হয় আমারও তাই হোল! বছর খানেক দিব্বি চললো, তারপর হঠাৎ একদিন দেখলুম আমি একা; যাঁর ভরসায়, যাঁর আশ্বাসে সব বিসর্জ্জন দিয়ে চলে এলুম তিনি আর তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখার প্রয়োজন মনে করলেন না, কর্ত্তব্যের খাতিরে একটা মাসিক বৃত্তি পাঠাবার প্রতিজ্ঞা করে বিয়ে করতে দেশে চলে গেলেন।…হায় রে এরাই পুরুষ, এরাই নারীদের রক্ষক—আর নারীরা এদের কথায় বিশ্বাস করে নিজেরা নিশ্চিন্ত হয়!……

—হয়তো তোমরা বলবে আত্মহত্যা করে কেন সমস্ত কলঙ্কের ধারা নিজের হাতে মুছে দিই নি।…আত্মহত্যা! হয়তো তাই করতুম, কিন্তু তখন পেটে যে একটা ছিল, ইহকাল নয়, পরকালের কথা ভেবে আত্মহত্যা করবার সাহসটুকু আর হোল না। একলা হলেও বা একটা কথা ছিল!…

…আজ এই যে মরণের পথে তালে তালে পা ফেলে চলেছি, এও তো আত্মহত্যা, এ মৃত্যুকে তো স্বেচ্ছায় নিমন্ত্রণ করে এনেছি, কিন্তু কেন?…

এ 'কেন'র উত্তর দেবার মত অবস্থা আজ আমার নেই, তবে এটুকু নিঃসঙ্কোচে বলবো এ আত্মহত্যা নয় প্রতিশোধ! —হয়তো বা নিজেরই ওপর। সামান্য একটা ক্ষণিকের উত্তেজনায়, একটা মুহূর্ত্তের চাঞ্চল্যে এই যে সারা জীবনের ধারাটা একেবারে উল্টে গেল এর জন্যে দায়ী কে?…সে তো আমিই। আজ এই যে শরীর নিয়ে ব্যবসা করছি, রূপের দামে পেট ভরাচ্ছি, সেটা না তারই প্রতিফল?…

আচ্ছা কি ঘৃণ্য, কি জঘন্য এই পতিতা জাতটা। ছিঃ নিজের মূর্ত্তি আয়নায় দেখে নিজেই আমি শিউরে উঠি; ঘৃণায় সর্ব্বশরীর রী রী করে জলে ওঠে! ……

তা নয় তো কী?…ভালবাসা? হুঁ, লোকে তাই বলে বটে, কিন্তু ভালবাসা জিনিষটা এই জাতটার কাছে যে কত দুর্লভ, কত দুষ্প্রাপ্য……

—পয়সা, শুধু পয়সা। হয়তো লোকে একটু আদর, একটু ভালোবাসা পাবার জন্যে ছুটে আসে, কিন্তু এসে দেখে কত বড় ভুলটাই না সে করেছে। অবিশ্যি মিথ্যে বলবো না, ভালবাসার অভিনয়টুকু আমাদের করতেই হবে, সেটুকু বাদ দিলে চলবে না!…এই তো জীবন!…

এই রুগ্ন শয্যায় শুয়ে শিয়রের জানলা খুলে দিয়ে সুমুখের ওই চওড়া রাস্তার দিকে যখন তাকিয়ে থাকি, অতীত জীবনের সব কথাগুলোই তখন মনে পড়ে যায়! ছেলেবেলার কথা মনে পড়লে চোখে জল আসে, উঃ কে তখন ভেবেছিল এই মর্ম্মান্তিক ভবিষ্যৎ জীবনটুকুর কথা।…

—বিকেল হলেই চোখের সুমুখ দিয়ে মেয়েদের স্কুলের গাড়ীগুলো চলে যায়।…কত মেয়ে, কেউ হাসছে, কেউ একদৃষ্টে পথের দিকে তাকিয়ে—হায় রে, একদিন আমিও ওদেরই একজন ছিলুম, কিন্তু আজ?…কত বড় পরিবর্ত্তন! জীবনটা যে হঠাৎ একদিনে এত নির্ম্মমভাবে বদলে যেতে পারে, কে তা আশা করেছিল?…

এই বদলে যাওয়া জীবন নিয়েই আমায় প্রতীক্ষা করতে হবে ঠিক ততদিন—যতদিন পর্য্যন্ত না মৃত্যু তার পরশ দিয়ে আমার সারা জনমের সঞ্চিত কালিমাটুকু মুছিয়ে দিয়ে যায়।…

———

আমার বিচার

[শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র]

আমি নানাস্থানে জজিয়াতি করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়াছি। আমার বন্ধুবর্গের সমালোচনায় আমি জজ নামের কলঙ্ক হইলেও যাহোক করিয়া হাতের পাঁচ বজায় রাখিয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছি। তাহাদের মতে দীর্ঘটীকি সমন্বিত তিলকধারী নেহাৎ বর্ব্বরশ্রী আমি কিনা জজ—আর পদ নখাগ্রভাগ হইতে কেশপ্রান্ত পর্য্যন্ত সাহেবিয়ানা পরিপূরিত মসীবিনিন্দিত বর্ণ আমার সুসভ্য বন্ধুবর মিঃ এন্ রে কিনা বিংশতি মুদ্রায় কেরাণী। সত্যই অবিচার।

একবার মজলিসে এক বন্ধু বলিলেন "হ্যাঁহে তুমি ত নামেও বিনয় কাজেও সাত চড়ে কথা বেরোয় না; কি করে জজিয়াতি কর বাবা?" এর আর উত্তর কি? তবুও একটু হাসিয়া বলিলাম, "ওহে, নামেতে কি আসে যায়। কত সুবোধের আড় বুঝুনিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় আবার অনেক শান্তিময়ী বধূর কলহে তাদের শ্বশুর গৃহ থেকে কাক পক্ষী বিতাড়িত করে।" সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

যাহোক সেই আমি কোনরকমে অবসর লইয়া ঘরে ফিরিয়াছি।

আষাঢ় মাস। বেলা প্রায় তিনটা বাজিয়াছে; ইতিমধ্যে বেশ এক পশলা বৃষ্টিও হইয়া গিয়াছে। আপাততঃ সূর্য্যদেব মেঘান্তরাল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া দ্বিগুণ তেজে কিরণ ঢালিতেছেন। আমি রাস্তার ধারের ঘরে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছিলাম। বোধহয় কোন ধর্ম্ম পুস্তক হইবে; কেন না পেন্‌সন্ লইয়া ধর্ম্ম পুস্তক পড়া একটা আধুনিক প্রথা। শৈশবে বেতের ভয়ে আড়চোখে গুরুমশায়ের শ্রীবপুখানি দেখিয়া ছেলেরা যেমন পড়া মুখস্থ করে, পেন্‌সন্ লইয়া অর্থাৎ বৃদ্ধত্বের পরোয়ানা জারি হইলে যমরাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভয়ে ভয়ে কোনরকমে যে কয়খানা পারে ধর্ম্ম পুস্তক শেষ করিয়া ফেলে। তারপর যা হয় হবে। আমিও বোধহয় সেই চিরন্তন প্রথার অনুসরণ করিয়া কোন একখানা ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করিতেছিলাম।

সেই সময় রাস্তায় হাঁকিল "চাই খাবার চাই।" কদম-তলায় শ্যামসুন্দরের বাঁশীর তানে উন্মাদিনী শ্রীমতীর মতন সেই 'চাই খাবার চাই' স্বরে আমার পঞ্চম বর্ষীয়া নাতনীটি ছুটিয়া আসিল।

"দাদা পয়সা দাও—এই খাবারওয়ালা এই বাড়ীতে আয়।"

ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে এক বৃদ্ধ খাবারওয়ালা ঘরে ঢুকিয়া ঝুড়ি নামাইয়া খরিদ কর্ত্রীকে যথাদিষ্ট খাবার দিল। আমি তাহাকে অত্যন্ত শ্রান্ত দেখিয়া বলিলাম, "ওহে, তুমি না হয় একটু এইখানে বোস।"

মাথার বিড়াটী খুলিয়া হাওয়া খাইতে খাইতে বলিল, "আর বাবু, এ বুড়ো বয়সে অনেক ভোগ আছে।"

"তোমার কি ছেলেপুলে কেউ নেই?"

"ছিল বাবু, সবই ছিল"—বৃদ্ধ চুপ করিল।

তাহাকে নীরব দেখিয়া বুঝিলাম তাহার পুত্র অকালে মৃত্যু কবলিত হইয়াছে তাই সান্ত্বনার স্বরে বলিলাম, "তা বাপু অদৃষ্টের ওপর ত কারুর হাত নেই।"

তা বটে, তবে অসুখ বিসুখে মরলে অতটা কষ্ট হ'ত না; বিনাদোষে—"

আগ্রহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়েছে?"

"তার ফাঁসী হয়েছে।"

"কি রকম?"

কপালের ঘাম মুছিয়া গামছাটী পাশে রাখিয়া বলিল, "তবে শুনুন বাবু।"

"আমার ছেলের নাম ছিল মানিকলাল, লোকে ডাকত হাবা বলে। তার বয়স ছিল পঁচিশ বছর; সে থাকলে এ

বুড়ো বয়সে আমায় আর খাটতে হ'ত না। সে খুব চালাক ছিল। বরাত মন্দ—ছেলেটা মরে গেল।"

বৃদ্ধ একটু নীরব হইয়া চোখ মুছিল ; আমি তাড়াতাড়ী বলিলাম, "তোমার যদি কষ্ট হয় তা হলে না হয় না-ই বললে।" তখন জানতাম না যে আমার পক্ষে না শোনাই ভাল ছিল।

বৃদ্ধ কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "না বাবু, কাঁদলে বুকটা অনেকটা হাল্কা হয়।" সে বলিতে লাগিল, "একদিন আমরা বাপ বেটায় দোকানে বসেছিলুম হঠাৎ তারে খবর এল হাবার মার বাঁচবার আশা নেই। তখন সন্ধ্যে হয়েছে ; দেবতাদের পেন্নাম করে হাবাকে নিয়ে ইষ্টিশনে গেলাম। টিকিট কিনে কোনরকমে গাড়ীতে উঠে জায়গা করে বসলুম। অনেক রাত্রে জায়গা করে শুয়ে পড়লুম। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না হঠাৎ একটা চীৎকারে জেগে উঠে দেখলুম একটা পশ্চিম দেশীয় লোকের বুকে আর একটা ঐ দেশীয় লোক ছুরী বসিয়ে দিলে। হাবা উঠে পড়ে "শালা খুন করে ফেলেছে" বলে লোকটাকে জড়িয়ে ধরলে। খানিক ধস্তাধস্তি করতেই ইষ্টিশন এসে পৌঁছিল—তৎক্ষণে লোকটা হাবাকে ফেলে দিয়ে নেমে পালিয়ে গেছে। পুলিস এসে হাবার গায়ে রক্ত দেখে তাকেই ধরলে। তখন আমার যেন জ্ঞান হ'ল। আমি অনেক করে তাদের পায়ে হাতে ধরে সত্য ঘটনাটা বলতে গেলুম কিন্তু সবাই হেসে উড়িয়ে দিলে। লাস সমেত হাবাকে খুনী বলে ধরে নিয়ে গেল। আমি কি যেন একরকম হয়ে তাদের সঙ্গে সঙ্গে চললুম।"

"দায়রার বিচারে খুনী আসামী বলে হাবার বিচার আরম্ভ হ'ল। পুলিসের তরফ থেকে দু'জন লোক সাক্ষী দিলে যে তারা ঐ গাড়ীতেই ছিল, তারা হাবাকে খুন করতে দেখেছে। আমি কাঁদতে কাঁদতে বলতে গেলুম যে ওরা সে গাড়ীতেই ছিল না হুজুর কিন্তু পুলিস এসে আমায় ঘর থেকে বার করে দিলে। একজন বললে "আহা ওর কি আর মাথার ঠিক আছে, ছেলের জন্যে ও পাগল হয়ে গেছে।"

"বিচারে হাবার ফাঁসীর হুকুম হ'ল - একদিন সকালে শুনলুম তার ফাঁসী হয়ে গেল। আমি পাগলের মতন ছুটে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু এই পেট হুজুর ; ও শোক তাপ কিছুই মানে না। কিছুদিন পরে কলকাতায় এলুম—সব হারিয়ে আবার পোড়া পেটের জ্বালায় ঝুড়ি মাথায় করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। মেদিনীপুর থাকতে আমি যেন এইরকম একটা কেশ করেছিলাম। কি সর্ব্বনাশ —মাথাটা কেমন ঘুরে গেল। বুকখানা দু' হাতে চেপে ধরে রুদ্ধনিঃশ্বাসে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কোথায় মোকদ্দমা হয়েছিল ?"

"মেদ্‌নীপুরে।"

কথাটা শেলের মতন বুকে বাজ্‌ল ; বুকখানা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার মতন হ'ল—মাথা নিচু করে বুকখানাকে চেপে ধরলুম। অনেকক্ষণ পরে মাথা তুলে দেখলুম বৃদ্ধ কখন চলে গেছে।

ঘরে ঘরে সাঁজের দীপ জ্বালা হ'ল ; শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনিতে নিখিল জগতে পবিত্রতা ছড়িয়ে দিলে ; পাপী আমি, দারুণ জ্বালা নিয়ে একই ভাবে বসে রইলুম।

ঘষি ঘষি রাঙ্গা পায়　　　　আল্‌তা লাগায় তার
রচয়ে মনের হরষেতে
রচয়ে বিচিত্র করি　　　　চরণ হৃদয়ে ধরি
তলে লিখে আপনার নাম।

*　　*　　*　　*

তৃতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]   ১১ই বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৩।   [২৫শ সপ্তাহ

"গোকুলের ষাঁড়"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৭)

বিকালে সিদ্ধির গুলি একতাল খাওয়া চাই——

(৮)

সন্ধ্যায়—সাজিয়া গুজিয়া একটু ভ্রমণ করেন—পথে ঘাটে বড়লোকের বাড়ীর ঝি দেখিতে পাইলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হন—

নতুন খাতা

[শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়]

অনেক দিনের একটা ছোট্ট কথা মনে এল। ছোট্ট বললুম, তবু স্মৃতির মণ্ডপে ওটুকুর মত জায়গা আর কেউই জুড়ে নেই। তাই ছোট্ট হলেও সত্যিই সেটা অনেক বড়।

হর্ষ-বিভোর বর্ষ বিদায়ের জন্যে উন্মুখ হয়ে পড়েছে; বিলীনমান বসন্তের সমাধির পর তপ্ত-গ্রীষ্ম-ঋষির নব-মন্দির জেগে উঠবে। সেই সময়েরই কথা!—

মামারা ছিলেন আমার বনেদি ব্যবসাদার। পয়লা বোশেখকে তাঁরা তাই ধুম করে অভ্যর্থনা করতেন। প্রতি বারের মত সেবারও ডাক এসে পৌছল। গেলুম সেখানে। কাজকর্ম্মে আমার মতন খাটতে নাকি কম লোকেই পারত! ...দু'দিন আগেই গিয়ে পড়েছিলাম সেবার।—

মামাত বোন হিরণ এসে বললে, দাদার কি যে কাণ্ড! এদ্দিনে একটা বে' থাও করলে না। এই অঘ্রাণমাসে শ্বশুর ঘর করতে চলে যাব; এর মধ্যে হ'লে—

ফুরসৎ হচ্ছে কই! তাইত'—

ফুরসতই বা হয় না কেন? লেখাপড়া নেই, চাকরী বাকরীও নেই। আর, তোমার কাকা জেঠারাই বা কচ্চেন কি...!

তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন বহু, এবং কৃতকার্য্যও হয়েছিলেন অনেকটা। সব স্থির, দোশরা বোশেখ বে'। কেবল একটী পাত্রীর অভাব ঘটল!...

'জীবনের এই বাসর রাতি, পোহায় বুঝি, নেবে বাতি,
বধূর দেখা নাইক শুধু প্রচুর পরিহাস।'

বুঝলি হিরণ?

হ্যাঁ মেয়ের আবার ভাবনা। পছন্দ হ'ল না তাই বল। ছেলেবেলা থেকে সুন্দরী মেয়ে বে' করবার যে সখ!...দেখবে —তেমনই রক্তকালীর ছোট বোনের সঙ্গে যদি না বিয়ে হয়...

—বারে! তাই বা হবে কেন? তোমরা রয়েছিস কি কর্ত্তে? দেখে শুনে দিবি তবে ত—

— আমার পছন্দ হলেই হ'বে?

খুব হ'বে।—আমি বললুম।...

এই নূতন খাতার দিনটীতে আমাদের নিকট এবং দূরাত্মীয়দের কেহই নিমন্ত্রিতের তালিকা থেকে বাদ পড়তেন না। আমার ওপর পড়ল মেয়ে পরিবেশনের ভার। এ ভারটা নিতে প্রায় সবারই একবার ইচ্ছে হয়, আবার ভয়ও যা হয় তাও বিশেষ কম নয়। নারী-বিশ্বে আমিই শুধু—এই ভয়!...

গায়ে একটা গেঞ্জী চাপিয়ে পটলের দোর্ম্মাটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠচি, পিছন থেকে হিরণ এসে বললে, দাদা ছাতে যাচ্ছ—একেও অমনি বসিয়ে দিও।

পিছন ফিরে দেখলুম একটী কিশোরী।...সিঁড়ির ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে—দেখাটা ভদ্রতা বিরুদ্ধ। বললুম—আসুন।

ছাতে কোনো পাতাই খালি ছিল না। ছাতের কোণ থেকে একখানা কলাপাতা টেনে এনে, একটা কুশাসন পেতে বললুম—এইটেতেই বসতে হ'বে। আর ত কিছু দেখছি না—

আনত-মুখী মেয়েটী ধীরে ধীরে আসনের ওপর বসে পড়ল।...

পিছন ফিরে চেয়ে দেখি—আর সব মেয়েরা আমার দিকে চেয়ে চেয়ে মুখ টিপে হাসচেন। আর আমায় নির্দ্দেশ করে হিরণকে কি বলছেন।...মেয়েটী মাথা নীচু করে লুচি ছিঁড়ছিল।...চোখ কাণ গরম হয়ে উঠল ...পালাতে চাইলুম, পালাতে পারলুম না। ভাবলুম তাতে এই মিষ্টি লজ্জাটুকু বাড়বে বই কমবে না ত'!...

কি একটা জিনিষ দিতে দিতে খানিকদূর এগিয়ে গেচি, স্পষ্ট শুনলুম একটী শ্যামা মেয়ে মুখ লাল করে তাঁর

পার্শ্বোপবিষ্টাকে বলছেন—কি বেহায়া ছেলে ভাই! তোয়ালেটা ইচ্ছে করে মেয়েটার গায়ে ঠেকিয়ে দিলে। দেখিস্—আজ থেকে ঐ তোয়ালের দর কত বাড়ে—

সত্যি, আমি কিন্তু জানতেও পারি নি...কখন যে...

মনে ভাবলুম এই সদ্যঃ পরিচিতার কাছে যে অপরাধে অপরাধী হলুম আজ তা' হয়ত সভ্যতা বিরুদ্ধ হ'ল। আবার মনে এল অপরাধ—বিশেষতঃ অজ্ঞান-কৃত অপরাধের মার্জ্জনাও ত হয়। আমিও হয়ত তা' থেকে বঞ্চিত হ'ব না!...

সেই প্রথম দেখা। শেষও...

হিরণ বললে, ওর নাম অমা। আমার মনে হয় ও আমারা চির পূর্ণিমা।...

তারপর আরও দু'দিন কাটল। ভীড়ের মধ্যে যার এসেছিল - ভীড়ের মধ্যেই তারা বিদায় নিল। বিদায় বেলায় পুরুষের সামান্য প্রয়োজনটুকুও তাঁদের ছিল না।

হিরণ এসে একদিন বল্ল—দাদার সেই মেয়েটাকে বড্ড পছন্দ।...

দূর! কে বললে তোকে? লজ্জিত হয়ে বললুম।

না. র.ঙা-বৌদি বলছিলেন তুমি নাকি অমাকে অনেক যত্ন করে খাইয়েছ সেদিন।

রাগতভাবে বললাম, কেন? কি অযত্নটাই বা করা হয়েছিল তাঁদের!

কি জানি দাদা, তাঁরা ঐ কথাই রটাচ্ছেন।...

রটাচ্ছেন—ভারী অন্যায় কচ্চেন। কিন্তু ও মেয়েটী তোদের কে হয়?

মেজ মাসীমার সতীনের মেয়ে।

খুব নিকট সম্বন্ধ ত।

হ্যাঁ দাদা তাই ত বলছিলাম—তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'তে পারে হয়ত।

তা দেখ না তোরা।...

ভয়ানক রকম হেসে উঠে হিরণ বললে, তবে তোমার পছন্দ নয় বল্লে যে!

অপ্রতিভ হওয়া উচিত নয় ভেবে বললাম, অনেক অপছন্দ মেয়ের সঙ্গেও ত লোকের বিয়ে হয়ে থাকে এমন—

মামী এসে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে, কিসের কথা হচ্চে তোদের!

পঙ্কজদা'র জন্যে একটা মেয়ের কথা বলছিলুম। তা পঙ্কজদা'র পছন্দ নয়—

কি করে মামীকে বোঝাই যে আমার অপছন্দ নয়।... যা হ'ক মামী বুঝলেন যে আমার পছন্দই, অপছন্দটা হিরণের বদমাইসি।

তিনি বললেন, বেশ ত! কোথাকার মেয়ে?

সে তোমার দেখা মেয়ে—

আ ম'লো! দেখা মেয়ে ত' দু' হাজার। তা বলে কি—

তোমার মেজ বোনের সতীনের মেয়ে।

মামী একটু সহজ হেসে বললেন, কে অমার কথা বলছিস? তা ওর সঙ্গে কি করে বে হ'বে।

হিরণ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলে, কেন হবে না মা?

কেন আবার কি! ও যে বাগদত্তা মেয়ে...

মামী চলে গেলেন।...

কাজকর্ম্মে দিন কাটে। তার কোনো ব্যতিক্রম হয় না।

ফিরে বার যখন মামার বাড়ী গেলুম হিরণ এসে বললে, দাদা শুনেছ, যে ছেলেটার সঙ্গে অমার বে' হবার কথা ছিল সে ছেলেটা গেল মাসে মারা গেছে।

না শুনিনি ত। কিসে মারা গেল ছেলেটা?

বসন্ত হয়েছিল—তাতেই।...

অমার জন্য বড় দুঃখ হ'ল। বাগদত্তা মেয়ে সে...ছেলেটি তার জন্যে কি করে গেল। না, সেই বা করবে কি! মৃত্যু ত' খবর দিয়ে আসে না, আর সে হয়ত জানতই না যে একটী মেয়ে তাকে স্বামীরূপে পাবার জন্যে বসে আছে। যাঁদের মনে এ কথা প্রথম উঠেছিল, তাঁদের মনের কথা হয়ত তখনও ছেলেটার কাছে ব্যক্ত হয় নি।

হিরণ বলছিল মা কথা পেড়েছিলেন—তোমার সঙ্গে বে' দিতে। মেজ মাসী রাজীও হয়েছিলেন। শুধু মেসো স্মৃতি শাস্ত্রের তর্ক তুলে বললেন, ও মেয়ে বিধবা, ওর আর বে' হয় না। আমি থাকতে পারি নি দাদা, তাঁকে জিজ্ঞেস

করেছিলুম, কেন ও বিধবা কিসে? ও ত—তিনি ধমকে দিয়ে বললেন, সে তর্ক তোর সঙ্গে করবার কোনো কারণ দেখি নে আমি।···সত্যি দাদা, অমারও তোমায় ভারী পছন্দ ছিল। তোমার কত কথা সে জিজ্ঞেস করত। একদিন সে জিজ্ঞেস কচ্ছিল—

কি সে জিজ্ঞাসা করেছিল তা' জানবার আমার দরকার ছিল না। জিজ্ঞাসা করেছিল এই যথেষ্ট। অমা দেবোদ্দিষ্ট ফুল, তা' দিয়ে আমায়—ভিন্ন দেবতার পূজা চলে না। আমি নিজে প্রার্থী হলে—না, তাতেও না।

*　　*　　*　　*

আর একটী কথা হিরণ আমায় বলেছিল।

অমা একদিন তাকে নাকি জিজ্ঞেস করেছিল, হিরণ তোর দাদা বিয়ে করবে ত!...সে কথার অর্থ হিরণ বোঝে নি, আমি বুঝেছিলাম। সে আমায় চাইত, আমি অপরের হ'লে তার বুকে লাগত।...সে তা সহ্য করতে পারতো না। সে ব্যথা হ'তে আমি তাকে অব্যহতি দিয়েছি। জীবনের এই ম্লান সন্ধ্যা এল···এখনও তার আশঙ্কা কার্য্যে পরিণত হ'তে দিই নি। কোথায়, কি ভাবে সে আজ আছে তা জানি না। অবিবাহিতা অমা সনাতন সমাজের শাস্ত্র শাসনে আজও বিধবা। এর চে' বড় পরিহাস আর কিছু নেই।... আজ আমার মামারাও নেই—মামার বাড়ীও নেই, তাঁদের নতুন খাতার পাটও নেই।

আবাহন

[কুমারী বীণাপানি ঘোষ]

এস হে মহান সাধনার ধন,
　　জীবন কুঞ্জে আমারি;
ওগো চির বরেণ্য কর গো ধন্য,
　　বারেক তোমা নেহারি

তুমি,　এস প্রিয় আজি এস হে প্রাণে
মম,　সুখ দুঃখ ভরা বীণার তানে
এস,　নিভৃত হৃদয়-কুঞ্জ-কাননে
মম,　　মুগ্ধ মানস বিহারী।

ভাদ্দর বৌ

[শ্রীশরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

(১)

বৈশাখ মাস। হাওয়া বইলে কি হয়, যে বিষম গরম প'ড়েছে তাতে আর ঘরের লোক বড় একটা বাইরে বেরুচ্ছে না। চোক, কাণ, নাক, সব নবদ্বারগুলোকে বন্ধ করে দেবার জন্যেই যেন বাতাস বাইরের যত রাজ্যের ধূলো উড়িয়ে এনে সকলের ঘেমো গায়ের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে। সূর্য্যিমামা যেন রেগে মাটি ফাটিয়ে একেবারে চু'কাক ক'রে দেবার চেষ্টা ক'রছেন।

এ গরমে জমীদারী খাতাপত্র আর দেখা চলে না, কাজেই পরেশবাবু বুদ্ধিমানের মতন বাইরের ঘরে তাকিয়া নিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন। পাড়াগেঁয়ে পিয়ন্ না বুঝে তাঁকে এ সুখ থেকে বঞ্চিত ক'রে, একটু জোর গলায় ডাক্‌ল,—"বড়বাবু এই নিন্।"

পরেশবাবু একেবারে তেলেবেগুণে জ্বলে গিয়ে বল্লেন,—"শালারা মনিঅর্ডার ক'রে টাকা পাঠিয়েছে! কেন, সদরে এসে দিয়ে যেতে পারে না!"

পিয়ন্ ত' একেবারেই হক্ চকিয়ে গিছল। শালারা! মনিঅর্ডার! টাকা! সদর! ইত্যাদি এসব কি? সে কোন প্রকারে ঢোঁক গিলে আস্তে আস্তে, হাতের ঘামে অর্দ্ধেক উঠে যাওয়া একটা খাতার মতন জিনিষের ভেতর থেকে একখানা খাম বার ক'রে আম্‌তা আম্‌তা ক'রতে ক'রতে বল্লে,—"আজ্ঞে, এই চিঠি—।"

"ওঃ চিঠি!"

বিজ্ঞের মতন এ দুটি কথা ব'লে তিনি খামটা নিয়ে ছেঁড়বার যোগাড় ক'রলেন।

পিয়ন্ চ'লে গেল। পরেশবাবু চিঠি পড়া শেষ ক'রে কি ভাবলেন, তা'পর এদিক ওদিক চেয়ে চেঁচিয়ে ডাকলেন,—"বিমু—বিমু।"

আবার ডাকলেন, কিন্তু কেউই আর উত্তর দিলে না। তিনি একটু রেগে গিয়ে খন্‌খনে গলায় আপনাআপনি বল্লেন,—"লক্ষ্মীছাড়ারা সব বুঝি আম খেতে বেরিয়েছে? কারুর চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখবার যো নেই।"

এগার বার বছরের মেয়ে উমাশশী ওরফে উমা উঠোনে পুণ্যিপুকুর তৈরি ক'রছিল। বাপের গলাবাজিতে সেখানে এসে বল্লে,—"দাদারা সব আম খেতে বাগানে গেছে।"

"তা আমি আগেই বুঝেছি। তোকে নিয়ে যায় নি বুঝি?"

উমাশশী নিজের দোষটা চাপা দেবার জন্যে বল্লে,—"যে রোদ্দুর, কে যাবে বাবা।"

পরেশবাবু আবার চিঠি প'ড়তে আরম্ভ ক'রলেন?

উমা বল্লে,—"কি বলছ বাবা?"

"পাঁজিটা একবার নিয়ে এস ত' মা।"

উমা পাঁজি নিয়ে এসে বল্লে,—"পাঁজি কি হবে বাবা?"

"একটা দিন দেখব।"

"কেন বাবা?"

"তোর কাকীমাকে তোর কাকাবাবু নিয়ে যেতে লিখেছে। ঘরের বউ, একটা ভাল দিন না দেখে কি ক'রে পাঠাই বল।"

"কাকাবাবু ত' ইছেপুরে মেসে থাকেন?"

"মেসের খাওয়া খেয়ে খেয়ে অম্বলের ব্যায়রামটি তৈরি ক'রেছেন। আমি তাকে একটা বাসা করবার কথা ব'লে দিয়েছিলুম। তোর কাকীমা গেলে খাওয়া দাওয়া সবই নিয়ম মাফিক হবে। সে কাল থেকে বাসায় গিয়ে উঠেছে। তুই ত' পড়তে পারিস,—"দেখ না।"

পরেশবাবু চিঠিটা মেয়ের দিকে ফেলে দিলেন।

উমাশশী চিঠি তুলে নিলে, আর পরেশবাবু ভাল দিনের খোঁজে পাঁজির পাতায় মন দিলেন। কিছুক্ষণ বাদে মুখ তুলে বল্লেন,—"যাক, সোমবার দিনটা ভাল আছে। তা'

আজ রবিবার কাল আমায়ও একবার কল্‌কাতা যেতে হবে, —এক কাজে দু'কাজ সেরে আসা যাবে।"

এই সময় ছেলেগুল' গোলমাল ক'রতে ক'রতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকছিল। একজন বল্‌লে,—"ছোড়দা তুমি বোম্বাই গাছ থেকে আঁব পেড়েছ আমি ব'লে দোব।"

সকলের ছোটটী ব'ললে,—"আমিও দেখেছি।"

এমন সময় পরেশবাবু জলদগম্ভীর স্বরে ডাক্‌লেন,— "মনে।" একেবারে সব ভয়ে জড়সড় হ'য়ে বাপের কাছে এসে হাজির। পরেশবাবু বল্‌লেন,—"বিনুকে ডেকে দে।"

এক্‌টু পরেই বিনয়চন্দ্র ওরফে বিনু এসে উপস্থিত। "প্রাপ্তে তু ষোড়শেবর্ষে পুত্র মিত্র বদাচরেৎ" এই বচন অনুযায়ী পরেশ বাবু বিনয়চন্দ্রের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তবে সব কাজে হাত দিতেন। বিনয়চন্দ্র বাপের সব কথা শুনে বল্‌লে,—"আমার যাওয়া ত' হবে না কারণ ও'দিন মুখুজ্যেমশাই আর ঘোশালমশাই আসবেন তাঁদের জমীজমা সম্বন্ধে একটা মিটমাট বন্দবস্ত করতে; আর সোমবারে একটা নিলামের দিন আছে তাতে আমায় নিজে না থাকলে চ'লবে না। আপনি ত' হরিশের মামলাটার তদবির ক'রতে ঐদিন কল্‌কাতায় উকিলের বাড়ী যাবেন। আপনি না হয় নিয়ে যাবেন। আমরা কেউ গিয়ে ষ্টেশনে তুলে দিয়ে আসব।"

পরেশবাবু ভেবে চিন্তে ছেলের কথাতেই রাজি হলেন। সোমবার দিন যাবার সব ঠিক্‌ঠাক্‌ হ'য়ে গেল।

(২)

ইচ্ছাপুর ষ্টেশনে নেমে পরেশবাবু হন্ত দন্ত হ'য়ে মেয়েদের গাড়ীর দিকে ছুটলেন। চেঁচিয়ে যে ডাকবেন তাও হয় না, —কারণ ভাদ্দর বৌ। ভাদ্দর বৌ যখন ভাসুরকে দেখতে পেয়ে নামতে যাবেন তখন ট্রেণ চলতে আরম্ভ করেছে। একজন চেঁচিয়ে বল্‌লে—"মশাই হাত ধরে নামিয়ে নিন্‌।"

পরেশবাবু দৌড়ে গেলেন তারপর কি ভেবে আবার সাত হাত পেছিয়ে এলেন।

"টেনে নাবিয়ে নিন্‌ মশাই, টেনে নাবিয়ে নিন্‌।" প্লেটফরমে হৈ হৈ পড়ে গেল।

আর নামিয়ে নিন। ট্রেণ তখন অনেকদূর এগিয়ে পড়েছে। পরেশবাবু ত' মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। এখন উপায়! সকলেই বললে যে পরের ট্রেণে আপনি নৈহাটি চ'লে যান। এটা হচ্ছে নৈহাটি লোকাল্‌— সেখানে গেলে নিশ্চয়ই পাবেন। আর দশ মিনিট বাদে ট্রেণ আসছে। নানান্‌ লোকে রকমারি কথায় পরেশবাবুকে বুঝিয়ে যে যার কাজে চলে গেল।

পরেশবাবু সেইখানে ব'সে ভাবতে লাগলেন;—তাঁর মকর্দ্দমার কথা। যে ব্যাপার তাতে আজকের মধ্যে উকিলের বাড়ী যাওয়া ঘটে ওঠা দায়। একবার ভাবলেন ভ্রাতাকে খবর দেবেন কি না। সেও ত' ষ্টেশান থেকে আধ ঘণ্টার পথ। ট্রেণ এতক্ষণে প্রায় এসে পড়েছে আর কি। তিনি নৈহাটি যাওয়াই স্থির ক'রে টিকিট কিনে এনে ট্রেণে উঠে আবার রওনা হ'লেন।

নৈহাটি ষ্টেশানে মাষ্টার মশাইকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন,—"হ্যাঁ মশাই, এরকম একজন স্ত্রীলোক এসেছিলেন বটে। রমেশবাবু ব'লে আমাদের একজন পরিচিত লোক আপনার কাছে তাঁকে পৌছে দেবার জন্যে পরের গাড়ীতে নিয়ে গেছেন।"

"নিয়ে গেছেন?" পরেশ বাবুর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। তিনি ত' একেবারে হতাশ হ'য়ে সেইখানেই ভূমি নিলেন। ষ্টেশন মাষ্টার তাঁর ভাবগতিক দেখে বললেন, —"ওরকম করছেন কেন মশাই? এরকম ব্যাপার ত' প্রায়ই ট্রেণে হয়। আপনি এত ভাবছেন না।

"প্রায়ই হয়?"

"তা হয় বই কি। একে কম সময় থামে, তায় মেয়ে ছেলেরা তেঁতুলের হাঁড়িটি পর্য্যন্ত ট্রেণ থেকে না নাগালে তাঁদের নামা হয় না। এই ত সেদিন দমদমার দত্ত বাড়ীতে একটা ওইরকম ঘটনা হ'য়ে গেছে।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কি। সবই ভদ্রঘরের ছেলেপুলেরা ট্রেণে যাতায়াত করেন। এরকম ব্যাপার দেখে তাঁকে দত্ত বাড়ীতে পৌছে দিয়েছিলেন।

তা হ'লে হারায় নি?"

"মুস্কিলেই ফেললেন মশাই। আপনি দেখছি বড় বেশী ভাবছেন। অত ভাববার কোন দরকার নেই। আপনি বাড়ী যান। গিয়ে দেখবেন আপনার স্ত্রীও হাজির।"

পরেশবাবু একেবারে জিভটা কেটে ফেলেছিলেন আর কি। মাষ্টার মশাই বললেন,—"এই ঘণ্টি দেও।

"এ কোন ট্রেণ আসছে মশাই ?"

"কলকাতার। আপনি একখানা টিকিট কেটে চলে যান মশাই। আপনার স্ত্রী—।"

পরেশবাবু বাধা দিয়ে বললেন,—"আজ্ঞে উনি আমার স্ত্রী নন্—ভাদ্দর বৌ।"

যাক ; ট্রেণ আসতেই পরেশবাবু আর বেশী কিছু বুদ্ধি না খাটিয়েই ট্রেণে উঠে কলিকাতায় রওনা হ'লেন। কলিকাতায় যখন নামলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ভাল-মন্দ ভেবে তিনি কাছেই বসুমতী আফিসে একটা বিজ্ঞাপনও দিয়ে গেলেন। বাড়ী যখন পৌছলেন তখন বাড়ীতে ব্যাপার শুনে মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। পুত্র বিমলচন্দ্র কোন ভয়ের কারণ নেই ব'লে পিতাকে বোঝাবার চেষ্টা করলো বটে ; কিন্তু পরেশবাবু তখনি ইছাপুরের দিকে রওনা না হ'য়ে থাকতে পারলেন না।

(৩)

শিয়ালদহ ষ্টেশানের শেষদিকে দু' একজন লোক জমে ভীড়ের মত হয়েছিল। অফিস ফেরতা বাবুর দল এক একজন ক'রে ব্যাপারটা জানবার জন্তে সেদিকে আসছিলেন তারপর সমস্ত ঘটনাটা শুনে যে যার কাজে চ'লে যাচ্ছিলেন। ইছাপুরের রমেশ চক্রবর্ত্তী কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির লোক। সে যখন সমস্ত ঘটনাটা শুনলেন তখন সত্যি সত্যি তার মনে পড়ে গেল। একটা পুরাণ কথা। অবিকল ঠিক এইরকম ব্যাপারে সে তার স্ত্রীটিকে হারিয়ে সারা রেলওয়ে ষ্টেশান পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছিল। রমেশ আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটির দিকে এসে বল্লে,—"আপনার স্বামীর নামটা কি বলতে পারেন ?"

স্ত্রীলোকটি সেই আগেকার মতন আধ ঘোমটা টেনে মুখ নীচু করে রইল। রমেশের হঠাৎ খেয়াল হ'ল ;—স্বামীর নাম বলাটা হিন্দু নারীর আচার বিরুদ্ধ। সে তখন পকেট থেকে কাগজ পেন্‌সিল বার ক'রে স্ত্রীলোকটির সুমুখে রাখলে ; বললে,—"আপনার স্বামীর নামটা অন্ততঃ লিখে জানান, যদি কিছু বিহিত করতে পারি ;—এ অবস্থায় লজ্জা করলে ত' চলবে না।"

স্ত্রীলোকটি কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ক'রে কাগজে স্বামীর নাম লিখে দিলে।

রমেশ কাগজের টুকরাটা দেখেই বল্লে,—"বিষ্ণুপদ ! কোন বিষ্ণুপদ ? যিনি ইচেপুরে চাকরী করেন ?

স্ত্রীলোকটি মাত্র ঘাড় নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ।

আপনাদের কি বারুইপুরে বাড়ী ?

এবারেও তিনি ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

"ওঃ আপনাকেই আজ আপনার ভাসুরের সঙ্গে কি ইচেপুরে আসবার কথা ছিল,—বিষ্ণুদা যে আলাদা বাসা করেছেন।"

রমণী রমেশকে স্বামীর পরিচিত জেনে তাঁর ঘোমটার মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে দিলেন। অপর সকলে প্রশ্ন করলেন,—"কে হে রমেশ ? চেন না কি ?"

রমেশ একটা ছোট্টরকম 'হ্যাঁ' ব'লে অন্যমনস্ক হ'য়ে কি ভাবতে লাগল।

"তা বেশ তুমিই এর একটা ব্যবস্থা কর।" বলতে বলতে সকলে যে যার কাজে চলে গেল।

একটু পরেই একটা ট্রেণ এল। রমেশ স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে সেই ট্রেণে আবার ইচ্ছাপুর রওনা হ'ল। যখন তারা বিষ্ণুপদর বাসা বাড়ীতে এসে পৌছল তখন রাত প্রায় সাতটা কি আটটা হবে। রমেশ খুবই দোর ঠেলাঠেলি করতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে ? একটু পরেই দোর খুলে গেল। একটা উড়ে চাকর বেরিয়ে ল্যাম্পটা মুখের কাছে ধরে বললে,—"কে রমেশবাবু অছি ?"

"কেরে জগা নাকি ?"

"মু ত' বাবুর কাছে অছি। থাকিবার ঘর, ভাত, কাপড় —।"

"থাক বেটা থাক। তোর অত গৌরচন্দ্রিকায় দরকার নেই। যা এঁকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে যা।"

তারপর স্ত্রীলোকটির দিকে ফিরে রমেশ বললে,—"যান আপনি কোন ভয় নেই। এইটেই বিষ্ণুদার বাসা।"

জগা এগিয়ে আলো ধরে স্ত্রীলোকটিকে ভেতরে দিয়ে এল'। বাইরে কথাবার্ত্তার আওয়াজ শুনে বিষ্ণুপদ কে এসেছে দেখবার জন্তে নীচে নেমে আসছিল। জগা বললে, —"রমেশবাবু আউছি।"

বিষ্ণুপদ একেবারে নীচে এসে হাজির। রমেশ বাইরের ঘরে বসেছিল। বিষ্ণুপদ সেখানে এসে বললে,—"ব্যাপার কিহে, তুমি এ সময় ?"

"সে তখন পরে হবে! ভারী ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও।"

বিষ্ণুপদ জগাকে ডেকে উনুনে আগুন দেবার জন্তে ব'লে দিলে। রমেশ নিজের পকেটে হাত দিয়ে বললে,—"ঐ যা, বিড়ী একদম নেই। বিষ্ণুদা তুমি একটু বস, আমি চট্ ক'রে বিড়ীটা কিনে আনি।"

রমেশ বেরিয়ে গেল।

বিষ্ণুপদ অনেকক্ষণ বাইরের ঘরে বসে রইল রমেশ আর আসে না। জগাকে খোঁজে পাঠান হ'ল। সে ফিরে এসে বললে,—"বাবুর সাক্ষাৎ ন হোঁছন্তি।"

আরো অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেল। রমেশের আর দেখা নেই। অগত্যা বিষ্ণুপদ রামশের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

(৪)

জগা তখন পাণের ডাবা খুলে নিজের জন্তে পাণ সাজছিল। দোরে দুম্‌দাম্ ধাক্কা পড়তে লাগল। বেচারী সবেমাত্র পাণে চুণ খয়ের লাগিয়েছে। ধাক্কা খুবই জোর জোর পড়ছিল। জগা রেগে গিয়ে ব'লে উঠল,—"সড়া ত' বড় ধক্কা লাগাইছে।"

দোর খুলে সে আরো একটা 'সড়া' বলবার মতলবে ছিল, কিন্তু একজন ভদ্রলোক দেখে তা আর তার বলা হ'ল না; কাজেই একটু মিষ্টি গলায় সে বললে,—বাবু ন অছি।"

ভদ্রলোকটি আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না ক'রে বাড়ীর মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। জগা বাধা দিয়ে চোখ পাকিয়ে বললে,—"এ কিমতি কাম হোঁছি পরা ? তু ভদ্রলোক অছি ন চষা অছি ?"

ভদ্রলোকটি ত' হকচকিয়ে গেলেন। এ আবার কি ? তিনি বললেন,—"আমি ভেতরে যাব।"

"বাবুর হুকুম ন অছি। আজকাল সময় ভাল ন অছি। সব লোকেরি ভাগিবার মতলব অছি।"

"নারে না, আমি বাবুর বড় ভাই।"

"তু ত' বড় রসবতী অছি। আবার সম্বন্ধ করিছন্তি। বাবু একটা মেয়েলোক রাখছন্তি—মু'ন পারিব।"

"মেয়েলোক কিরে ?"

"সব জানিকিরি প্রেমটি করিবারে আউছন্তি আবার নেকাটি হোঁছি পরা।"

জগা খুবই হাসতে লাগল। পরেশবাবু জগার মুখে বাবুর মেয়েমানুষ রাখবার কথা শুনে সবই বিগড়ে গেল। তবে কি বিষ্টু—। ছেলেবেলায় বিষ্টুর একটু স্বভাব দোষ ছিল। সেটা কি—।

পরেশ বাবুর সবই মনে পড়ে গেল তিনি জিদ্ ক'রে বৌমাকে আরো আগে অনেকবার পাঠাতে চাইলেও বিষ্ণু কিছুতেই সম্মত হয় নি। এ নিশ্চয়ই তাই। আর তা নইলে এমন চাকর রাখবে কেন ? ভাবতে ভাবতে তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে গেল। তিনি সেখানে আর না দাঁড়িয়ে ষ্টেশানের দিকে ফিরলেন। পথে চলতে চলতে ভাবতে লাগলেন,—বিষ্ণুটা কি এত উচ্ছন্ন গিয়েছে যে, এই বেশ্যার বাড়ীতেই ছোট বৌমাকে আনবার ব্যবস্থা করেছিল ? তা হ'তে পারে না। নিশ্চয়ই আলাদা বাসা করেছে।"

বিষ্ণুবাবুর স্ত্রী ওপর থেকে ভাসুরকে দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁকে চলে যেতে দেখে জগাকে ধমকে বললেন,—যা—যা—বেটা, সর্ব্বনাশ করলি। দৌড়ে যা, ডেকে আন।"

জগা ছুটল। 'বাবু বাবু' ক'রতে ক'রতে ষ্টেশানে এসে তাঁর নাগাল ধরে একগাল দাঁত বের করে বললে,—"মাম্মি ডাকিছন্তি।"

কি সর্ব্বনাশ! এমন মেয়েমানুষ যে, ওপর থেকে দেখবামাত্রই ডেকে পাঠান! পরেশবাবু চোখ লাল ক'রে জগাকে মারতে উঠলেন,—"বের বেটা—বের।"

জগন্নাথ মহাপ্রভু ভয়ে আর দ্বিতীয় কথাটি না ব'লে বাড়ীর দিকে ফিরলেন। খানিকটা আসতেই বিষ্ণুপদর সঙ্গে দেখা। জগা তাঁকে বাবুকে দেখিয়ে দিয়ে তার বাড়ী থেকে বাবুর ফিরে আসবার কথা বললে। বিষ্ণুপদ দূর থেকে দেখলে তার দাদা। ছুটে গিয়ে নমস্কার করে বললে,—"চলে এলেন ?"

বিষ্ণুপদকে দেখে পরেশবাবুর রাগে ও ঘৃণায় প্রথমে কথা বেরুল না, তিনি খানিকক্ষণ গুম্ খেয়ে রইলেন। পরে ভাবলেন, এ সময় রাগ করা চলে না, উপস্থিত ব্যাপারটা এখন একে বলা দরকার, বিশেষ যখন তিনি নিজেই এই ব্যাপারের জন্ত দায়ী। পথ চলতে চলতে তিনি সমস্ত ব্যাপারটা বিষ্ণুপদকে ভেঙে বললেন। কথা যখন শেষ হ'ল তখন তিনি দেখলেন যে তিনি বিষ্ণুপদর বাসার সুমুখে এসে হাজীর হয়েছেন।

বিষ্ণুপদ বললে,—"আসুন ততক্ষণ একটু বসুন, আমি কিছু টাকা যোগাড় ক'রে আনি।—প্রত্যেক ষ্টেশানে এখন তার করে দেওয়াই হ'ল প্রথম কাজ।"

এবার পরেশবাবু আর পূর্ব্বের রাগ সামলাতে পারলেন না।—চোখ পাকিয়ে বললেন,—"তুই এতটা উচ্ছন্ন গিয়েছিল! একে ত' এ বাড়ীতে তুই বৌমাকে আনবার ব্যবস্থা করেছিলি, তার ওপর আবার আমাকে এখানে ডাকতে তোর একটু লজ্জা হ'ল না ?"

বিষ্ণুপদ ত' হকচকিয়ে গেল। বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে সে বললে,—"কেন দাদা, এ বাড়ী ত' খারাপ নয়! বেশ দু'খানা বড় শোবার ঘর, রান্না· ·।"

ধমক দিয়ে পরেশবাবু বললেন,—"বলি এটা কি ভদ্রলোকের বাড়ী ?"

ভীত হ'য়ে বিষ্ণুপদ বললে,—"আজ্ঞে, আপনি এ কি বলছেন ?"

"আমি ঠিকই বলছি। ভদ্রলোকের বাড়ী বেশ্যা বাস করে না।"

"বেশ্যা ? জগা চাকর আর আমি এই দুটি প্রাণী মাত্র এ বাড়ীতে বাস করি, তৃতীয় ব্যক্তি ত' কেউ নেই।"

"তবে যে তোমার চাকর মেয়েমানুষ আছে বলে আমায় ঢুকতে দিলে না।"

বিষ্ণুপদ অনেকক্ষণ কি ভাবলে তারপর বললে, "দেখুন কিছুদিন আগে রমেশ ব'লে এক ছোকরা আমাদের মেসে মেয়েমানুষ সেজে এসে খুব একটা হৈচৈ করেছিল। আমার মনে হয় সেই হয়ত রহস্য করেছে ;—তার ঐ মেয়েমানুষ সাজা রোগ আছে।"

এ কথায় পরেশবাবু তেলে বেগুনে জলে উঠলেন। বললেন,—"আমি এই বেলা দশটা থেকে মনের অবস্থায় পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছি ; আমার সঙ্গে ইয়ারকি ? আমি যে তার বাবার বইসি। আজ তার রহস্য করাটা আমি একেবারে ঘোচাব।"

হন্ হন্ ক'রে পরেশবাবু ও'রে উঠতে আরম্ভ করলেন। বিষ্ণুপদ ভায়ের প্রকৃতি খুবই জানত। খুব বেশীরকম ব্যাপারটা না গড়ায় এই ভয়ে সে ভায়ের পেছন নিলে।

ঘরে ঢুকতেই বিষ্ণুপদর স্ত্রী সুমুখে ;—ভাসুরের গলার আওয়াজ আর পায়ের শব্দ পেয়েই সে একগলা ঘোমটা টেনে রেখেছিল। পরেশবাবু সুমুখে মেয়েমানুষ দেখেই "তবে রে, আমার সঙ্গে ইয়ারকি ?" ব'লে তাকে ধরতে এগিয়ে গেলেন। বিষ্ণুপদর স্ত্রী ভয়ে পালাতে চেষ্টা করলেন। একে এই অভাবনীয় ব্যাপার তার ওপর ভাসুর।—বিষ্ণুপদর স্ত্রী পালাতে গিয়ে আঁচলটা বেঁধে পড়ে গেল ; মাথায় কাপড় আর রহিল না।

পরেশ বাবুর তখন রাগে সবদিক লক্ষ্য করবার ধাত ছিল না, তিনি তাকে ধরতে গেলেন। বিষ্ণুপদ তার স্ত্রীকে চিন্তে পেরে তাড়াতাড়ি এসে পরেশবাবুর হাত ধরে ফেলে বললে, —"করেন কি,—এ যে আপনার ভাদ্দর বৌ !"

প্রায়শ্চিত্ত

[শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস]

(১)

আমাদের তাসের আড্ডাটি জমেছিল বেশ। মাঝে মাঝে যতীনদার "রয়েলস্" "নো-ট্রাম্প" ইত্যাদির চীৎকারে ছোট ঘরখানি মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল। একে শীতকাল, তাহার উপর ব্রীজ খেলা আমার জানা নাই, সুতরাং আমি আলোয়ানখানি আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া যতীনদার অঙ্গভঙ্গী নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।

বাস্তবিক, এত বয়স হইল,—এত খেলা শিখিলাম' কিন্তু ব্রীজ খেলাটি আমি আজ পর্য্যন্তও আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিলাম না। সেই জন্য—আমার মস্তকে যে একেবারে কোনও বুদ্ধি নাই, সে বিষয়ে অনেকে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু, বুদ্ধি যে একেবারেই নাই, তাই বা স্বীকার করি কেমন করিয়া? সুবুদ্ধি থাকুক, আর নাই থাকুক, কিন্তু কুবুদ্ধির প্রভাব আমার মস্তিস্কে এত বেশী পরিমাণে নিহিত ছিল,—যাহার জন্য আজ আমায় সকলে ঘৃণার চক্ষে দেখে—সকলেরই নিকট আমি ঘৃণিত ও পতিত! যৌবনের প্রথম অঙ্কুরেই আমি কতকগুলি এরূপ কাজ করিয়াছিলাম, যাহার জন্য আমি আজ পর্য্যন্তও বিবাহ করি নাই—এবং তাহার জন্য আমাকে বোধ হয় সারা জীবনটা ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করিতে হইবে। বাস্তবিক অতীতের কাহিনীগুলি চিন্তা করি, আর মনে হয়,—ইহা কিরূপে আমার দ্বারা সম্ভব হইল? বায়স্কোপের ছবির ন্যায় এক একটি ঘটনা আসিয়া চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়, এবং প্রত্যেকটিই মনের মধ্যে এক একটি নূতন আতঙ্ক ও বিভীষিকার সৃষ্টি করে। আমার যে "আমিত্ব", অর্থাৎ personality—তাহারও যে এত বৈচিত্র্য থাকিতে পারে, তাহা পূর্ব্বে আমার জানা ছিল না। যাহা হউক, অনেক বাজে বকিলাম ....

তখন বোধহয় ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। যতীনদা কাগজের উপর "ডাউন", "অনার" ইত্যাদি লিখিতেছিল। এমন সময়ে একটি ভদ্রলোক আসিয়া সংবাদ দিলেন—"রামকান্ত মিস্ত্রীর লেনে ১৬নং বাড়ীতে একটি ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন। ভদ্রলোকটি বিদেশ হইতে আগত—সঙ্গে এক ভাইপো ব্যতীত কেহই নাই—সুতরাং আমাদের অবিলম্বে যাইতে হইবে।"

যতীনদা ত' তৎক্ষণাৎ তাস ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়—আমরা যাচ্ছি—আপনি যান।"

একে ত' শীতকাল, তাহার উপর সেদিন সূর্য্যদেব মুহূর্ত্তেরও জন্য আত্মপ্রকাশ করেন নাই,—আমি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই যতীনদা কহিয়া উঠিল "আরে ভবেশদা, তুমি যাচ্ছ কোথায়? তুমি হচ্ছ দলের পাণ্ডা—তোমার না গেলে ত' চলবে না দাদা।"

আমি কহিয়া উঠিলাম—"না দাদা একে এই শীত, তার ওপর জানত খেয়ে দেয়ে......

আমার কথা সম্পূর্ণ হইতে না হইতেই যতীনদা হাসিয়া বলিয়া উঠিল,—হ্যাঁ গো দাদা, সে আমি বুঝেছি,—সে ঠিক হবে'খন।"

আমার আর কোনও আপত্তি রহিল না। কারণ পৃথিবীর মধ্যে এখন সুরাই আমার সান্ত্বনার প্রধান উপায়। আমি অগ্রসর হইলাম।

(২)

কোনও রূপে নিমতলার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। মৃত ব্যক্তি প্রৌঢ়, বয়স প্রায় ৫০ উত্তীর্ণ হয়। বিদেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলিয়া কেহই সৎকারের নিমিত্ত অগ্রসর হয় নাই। ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাহিয়া বক্ষের ভিতর কিরূপ একটি গোপন ব্যথা অনুভব করিতে-ছিলাম......

ডোমেরা চিতা সাজাইতেছিল—পার্শ্বে বসিয়া একটি

রমণী একদৃষ্টে কাতরভাবে মৃত ব্যক্তিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, রমণীকে দেখিলে যুবতী বলিয়া ভ্রম হয়, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায়, যে এককালে তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন। স্ত্রীলোকটীর সহিত ভদ্রলোকটির যে কি নিগূঢ় সম্পর্ক নিহিত থাকিতে পারে, সেটা আমার ধারণায় কুলাইয়া উঠিল না।

মৃতব্যক্তিকে চিতায় শয়ন করাইয়া দিয়া যুবকটি মুখাগ্নি করিবার উদ্যোগ করিতেই পূর্ব্বকথিত রমণীটি আসিয়া বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল—"ভুপেন, তুমি মুখাগ্নি কোর'না বাবা—হতভাগী এখনও বেঁচে আছে—মুখাগ্নির অধিকার আমার।"

যুবকটি বহুক্ষণ একদৃষ্টে রমণীর দিকে চাহিয়া বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কা—কী—মা!"

আমরা একেবারে স্তম্ভিত! এ আবার কি রহস্য! মরিলেন একজন ভদ্রলোক,—আর তাঁহার মুখাগ্নি করিবে একজন বেশ্যা?

যতীনদা বিস্ময়ান্বিত ভাবে প্রশ্ন করিল—"আপনি কি এঁর কেউ হন্?"

উদাস নেত্রে চিতার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রমণী কহিয়া উঠিল—"সব চেয়ে এখন নিকট স্ত্রী।"

এ কি! এরূপ কাতর কণ্ঠস্বর যে আমার পরিচিত বলিয়া বোধ হইতেছে। হৃদয় বীণার একটি পুরাতন তারে কে যেন সহসা ঝঙ্কার দিয়া গেল:…কিন্তু কি জানি রমণীর কথা যেন আমার বিশ্বাস হইতেছিল না। ইহাও কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? এ যে অসম্ভব। না—না! হইতে পারে বৈকি। অতীতের একটি অলস স্মৃতি জীবন্ত মূর্ত্তি লইয়া আমার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। উঃ—সে কি ভীষণ। একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস আমার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

রমণীটি কিন্তু এবার মৃতের পদধূলি লইয়া কাতরকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"না বাবা ভুপেন, তুমিই মুখাগ্নি কর—আমি আর কলুষিত দেহ লইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া তাঁর পুণ্যের পথে কালী লেপন ক'রে দেব না।"

* * * *

ধূ ধূ করিয়া চিতা জ্বলিতেছে। মৃদুমন্দ বায়ুর স্পর্শে অগ্নিদেব যেন আনন্দে গলিয়া যাইতেছিলেন। সূর্য্যের একটি শেষ ক্ষীণ রশ্মি, যেন শেষ আশীর্ব্বাদের ন্যায় চিতার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। রমণীটি নির্নিমেষ লোচনে চিতার দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল।

যতীনদা কহিল—"আপনি কেন আর মিছে কষ্ট পাচ্ছেন—"

যতীনদা বোধ হয় আরও কিছু বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু রমণীটি বাধা দিয়া তাহার উপর একটি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া করুণস্বরে কহিয়া উঠিল—"অনেক পাপ করেছি ওঁর বুকে আমি বড় ব্যথাই দিয়েছি, কিন্তু তা' সত্ত্বেও যখন ভগবান আমায় শেষ সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ দিয়াছেন—তখন সেটা আমি কোনও রূপেই অগ্রাহ্য করতে পারব না। স্ত্রীর শেষ কর্ত্তব্যটুকু হইতেও আমি বঞ্চিত হয়েছি,—কিন্তু দয়া করে শেষ পর্য্যন্ত আমায় থাকতে দিন—তাতেও বোধ হয়, আমি প্রাণে কিছু পরিমাণে শান্তি পাব।"

একটি উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস যেন তাহার বক্ষপঞ্জর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কি জানি প্রথম হইতেই রমণীর উপর আমার কিরূপ একটা সহানুভূতি আসিয়া গিয়াছিল। রমণীটি একটি দীর্ঘশ্বাস অতিকষ্টে দমন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"আমাদের দেশ ছিল মুরশিদাবাদে। বাবা ছিলেন Subjudge—সাহেবীয়ানা বড় পছন্দ করিতেন। আমার লেখাপড়ার উপর তাঁর তীক্ষ্নদৃষ্টি ছিল। একটি মেমের নিকট আমি ইংরাজী ভাষা বেশ ভালরূপেই আয়ত্ত করিয়াছিলাম। আমার স্বামী ছিলেন সেখানকার ডিপুটি—সেখানেই আমাদের বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহের বছর দুই পরে স্বামী গয়ায় বদলী হইলেন—আমিও তাঁর সঙ্গে গয়ায় চলে এলাম—"

গয়া! একটু চমকিয়া উঠিলাম। বহুদিনের একটি বিস্মৃত স্মৃতি আসিয়া মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল।

রমণী বলিতে লাগিল—গয়ায় যখন এলাম তখন আমার বয়স সতের, আঠার। সারা দেহের ওপর দিয়ে যেন আমার যৌবনের বান ডেকে গেছল।—আমাদের বাড়ীর সম্মুখে একটি যুবক থাকতেন—তাঁর ঘরটি আমার ঘরের জানালা হইতে বেশ স্পষ্টই দেখা যেত। যুবকটি প্রায়ই আমার

দিকে নির্নিমেষ লোচনে তাকিয়ে থাকত—ঘৃণায়, লজ্জায়, বিরক্তিতে আমি প্রথম প্রথম মুখ ফিরিয়ে নিতাম—কিন্তু শেষে অদর্শন অসহ্য হয়ে উঠল ; এমন অবস্থা হয়ে উঠল যে, তাঁকে দেখবার জন্ত আমি জানালার নিকট বসে থাকতাম...

একি! কে এ! আমার নিশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। কে এ ভগবান! উঃ একি কঠোর শাস্তি! ওঃ! ষোল বৎসরের পুরাতন স্মৃতি। রমণীর মুখটি একবার ভাল করিয়া দেখিবার আগ্রহ হইল—পারিলাম না। কি জানি। যদি ধরা পড়ি! রমণী চক্ষের জল মুছিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিল—স্বামী আমায় বড় ভালবাসতেন—বড়ই আদর যত্ন করতেন। কিসে আমি কষ্ট না পাই, কিসে আমার আনন্দ হয়,—সর্ব্বদাই তিনি তাই করতেন। কিন্তু হায়! হতভাগিনী আমি—স্বামীর এমন স্বচ্ছ অনাবিল প্রেমের মর্য্যাদা রাখতে পারলাম না।...

রমণীটির বক্ষের উপর দিয়া অশ্রুর নদী বহিয়া যাইতেছিল—যতীনদা কহিয়া উঠিল—"থাক্—যদি কষ্ট হয় ত আর বলবেন না।"

বাধা দিয়া রমণী কহিয়া উঠিল—"না! না! শেষ মুহূর্ত্তে যদি একবার দেখা পেয়েছি, তখন একবার আমায় সব কথা গুছিয়ে বলতে হবে—তা হলেও আমার পাপের কিছু পরিমাণ প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

তাহার পর কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া পুনরায় কহিতে লাগিল—"একদিন আমার স্বামী দেহাতে চলে গেলেন—বলে গেলেন পরদিন প্রাতঃকালে ফিরবেন। বাড়ীতে রইলাম আমি আর জীবলাল। কিন্তু দুই তিনদিন কাটিয়া গেল, স্বামী ফিরলেন না—আমার এইরূপ সর্ব্বনাশের জন্যই যেন তাঁর ফিরতে বিলম্ব হ'তে লাগল। পরের দিন পত্র আসিল যে, তাঁর ফিরতে এখনও তিন চারদিন দেরী হবে। তারপর।...তারপর। উঃ। সে কি ভীষণ দিন। সারা আকাশটা বহুক্ষণ ধরিয়া অভিমানভরে থাকিয়া শেষে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল—আমাদের এই অধঃপতনের নিমিত্ত যেন তাহার হৃদয় ফাটিয়া অজস্র ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল। সেই ভীষণ দিনে...উ. . আমি আর সেই যুবক···ওঃ।

পৃথিবীটা যেন পায়ের নীচ হইতে সরিয়া যাইতেছিল। কে যেন আমার নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দিল। উঃ—ভগবান আর যে পারি না। পলাইবার ইচ্ছা হইল—কিন্তু কে যেন আমার মাথার উপর বিশ মণের বোঝা চাপাইয়া দিল। রমণী বলিয়া যাইতেছিল "আমরা কলিকাতায় চ'লে এলাম। যুবকটির পয়সার অভাব ছিল না। বছর দুই তিন আমাদের বেশ নূতন নানারকম আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়াই কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে আমার স্বামীর অনাবিল প্রেমের কথা মনে পড়িত—কিন্তু যুবকটির প্রাণঢালা ভালবাসার তাহা অধিকক্ষণ স্থায়ী হ'তে পারত না। বাস্তবিক, যুবকটির মুখের দিকে চাহিলে মনে হ'ত বুঝি সত্যই সে আমায় ভালবেসেছে—কিন্তু হায়। সেই মুখের ভিতর যে ..

না: ; রমণীর প্রত্যেক কথাটি তপ্ত শলাকার ন্যায় আমার বক্ষের ভিতরটা সমস্ত দগ্ধ করিতে লাগিল। ওঃ! সেই আমি—আর এই আমি। যৌবনের স্মৃতি যে চিরমধুর ভগবান—কিন্তু আমার একি কঠোর—নিঠুর স্মৃতি। আমার চক্ষু ভেদ করিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রমণীটি পুনরায় বলিতে লাগিল—সেই পাপের ভিতর দিয়াই একটি শিশু এসে আমাদের বেঁধে ফেলল...তা'র দিকে চাইলে,—তার সেই হাসি দেখলে, আমি আমার সমস্ত ইতিহাস ভুলে যেতাম। Phillipsএর কবিতার কথাটি মনে পড়ল—

"An instance she gazed downward on that
baby that slumbered,
And holy the tavern grew."

বাস্তবিক, সে যখন কচি কচি স্বরে 'মা' বলে ডাকত, আমি ভাবতাম এই ত স্বর্গ। কোথায় পাপ?—যেখানে এমন শিশুর সরল স্বচ্ছ হাসি—সেখানে কি পাপ আসতে পারে? সেখানে ত' পাপের প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে ত' সর্ব্বদা মন্দাকিনীর তরঙ্গ—স্বর্গের অমৃত ধারা বইছে। কিন্তু তখন ত' বুঝি নি যে, আমার এই আনন্দ দেখে বিধাতা অন্তরালে ব'সে হাসছেন। ...এমন যে শিশু—সেই শিশুর মায়া ত্যাগ ক'রে সেই যুবক—যুবক না—সে শয়তান একদিন প্রাতঃকালে আমাকে ফেলে চলে গেল : দুপুর গেল, রাত্রি গেল—তার পরের রাত্রি গেল, তবুও যেন আমার মন বিশ্বাস

করতে চাচ্ছিল না যে, সত্য সত্যই সে আমাকে আর শিশুকে ফেলে পালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু শেষে এল না।—এক দিনের,—এক দণ্ডের এক মুহূর্ত্তের জন্যও না। আশ্চর্য্য!—তখনও কিন্তু আমার নিজের অবস্থার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হয় নি। মনে হ'ল সেইদিন—যেদিন বিধাতা আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিলে। উঃ। ভগবান কি আছেন? যদি থাকতেন, তা হলে কি ঐরকম ভাবে আমায় নিঃস্ব কাঙ্গাল ক'রে ছেলেটিকে কেড়ে নিতেন? বাছা আমার দুইদিনের অসুখে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ ক'রে পালিয়ে গেল—শয়তান এমন ফকীর ক'রে আমায় ফেলে গেল যে, বাছার আমি ভাল ক'রে চিকিৎসা করাতে পারলুম না। উঃ! শেষে অধঃপাতের আরও কয়েক ধাপ অবতরণ করলাম।—কিন্তু হায়। পারলাম না। তাকে রাখতে পারলাম না।

কিন্তু মরতে পারলুম না।...

এবার রমণীর কণ্ঠস্বরে এতদূর চমকাইয়া উঠিলাম যে তাহার দিকে একবার গোপনে দৃষ্টিপাত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। উঃ—সে কি ভীষণ দৃষ্টি! ব্যাঘ্রের হিংস্র শিকার-লোলুপ দৃষ্টিও কি ইহা অপেক্ষা ভীষণ!...কোনওরূপে আরও দুই তিন হস্ত পরিমাণ পিছনে সরিয়া গেলাম।...

রমণী বলিতেছিল—"মরলে সেই শয়তানের প্রতিশোধ নেব কি ক'রে? কোনও রকমে পেট চালাচ্ছি—আশা আছে, একদিন না একদিন দেখা হবেই; তারপর—তারপর—প্রতিশোধ! আমার সেই সন্তান...না। প্রতিশোধ যে চাই-ই—চাই।

...পলে পলে দগ্ধ হইয়া মরা কি ইহা অপেক্ষা ভীষণ? কে যেন সজোরে আমার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিল। ভগবান! একি কঠিন শাস্তি? তাহারই পরোলোকগামী স্বামীর সম্মুখে বসাইয়া আমাকে বিস্মৃত অতীত পাপের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিয়া—একি কঠোর প্রায়শ্চিত্ত লইতেছ প্রভু? শাস্তি দিবার কি আর কোনও পথ ছিল না প্রভু? আর ত' পারি না। আর যে সহ্য করিতে পারিতেছি না ভগবান! ইহা অপেক্ষা আমার মস্তকে বজ্রাঘাত হ'ল না কেন প্রভু? উঃ—এই আমার যৌবনের চির কঠোর স্মৃতি। এই আমার যৌবনের কার্য্যকলাপ। সেই ক্ষুদ্র শিশু—সেই মুখ—যাকে দেখে—যার মুখে অজস্র চুম্বন দিয়ে, আমার অভিশপ্ত জীবনটাকে শান্তিময় করিয়া তুলিতাম, সেই শিশু বিনা চিকিৎসায় পলাইয়া গেল? আমি কি মানুষ? মনুষ্যত্বের উপর দাবী করিবার কি আমার কিছু অবশিষ্ট আছে? এতদিন যে কি কারণে পাগল হই নাই, ভগবান জানেন। কেন আমাকে পাগল করিলে না প্রভু? পাগল হওয়াই যে আমার ইহা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল ছিল প্রভু। আর যে থাকিতে পারিতেছি না প্রভু। প্রতিশোধ নেবে। আমারই কৃতকর্ম্মের নিমিত্ত আমারই উপর প্রতিশোধ লইবে। একি। পা যে আর ঠিক রাখিতে পারিতেছি না। পদদ্বয় কাঁপিতেছে—মস্তকের প্রতি শিরার ভিতর দিয়া রক্ত যেন তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে। রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম—দেখিলাম কেহই তথায় নাই। ভয় হইল, তবে কি চিনিতে পারিয়া পশ্চাতে আসিয়াছে।...ফিরিয়া দেখিলাম—কেহ নাই। আঃ। তবু রক্ষা পেলাম—ভগবান! কি জানি! যদি চিনিয়া ফেলিত।...

* * * *

"কই হে ভবেশদা—চল চল, সব যে চ'লে গেল—"

একটি আগত দীর্ঘশ্বাস কোনওরূপ দমন করিয়া কহিলাম "হ্যাঁ ভাই—চল, যাচ্ছি"—

সাগর কূলে

[শ্রীজিতেন দাশগুপ্ত]

(দৃশ্য পরিচয়)

[পুরীর সমুদ্রকূলে একটি নির্জন বাড়ী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাম্‌নে সারি সারি টব সাজিয়ে বেশ সুন্দর একটি ফুলের বাগিচা তৈরী করা হইয়েছে—তাতে নানারকম ফুল ফুটে রয়েছে। বাড়ীটি বার থেকে বেশ সাজান। ভিতরেও নানারকম আসবাবপত্র আছে। দেখলে বড়লোকের বাড়ী বলেই মনে হয়। মাঝখানে একটি হলঘর ও দুইদিকে দুটি ছোট প্রকোষ্ঠ। হলঘরের সাম্‌নে দুটি বড় দরজা এবং ভিতরে পুব ও পশ্চিমের দিকে দুটি ছোট দরজা। এই দরজা দিয়ে পাশের ছোট দুটি ঘরে যাওয়া যায়। হলঘরটায় সাজ সরঞ্জাম বেশী কিছু নাই। পুবদিকের দরজার কাছে একখানা খাট—তার উপরে বিছানা পাতা রয়েছে। খাটের এক পাশে একখানা ছোট টেবিল—তার উপরে নানারকম ঔষধের শিশি ও দুই একটি বাটি সাজান আছে। খাটের আর এক পাশে একখানা চেয়ার।

খাটের উপরে একটি কুড়ি বছরের সুন্দরী যুবতী শুয়ে আছে। সে আজ একবছর হৃদরোগে আক্রান্ত। তার শরীরে কিছুই নাই—গায়ের রং একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। সাম্‌নের চেয়ারে পনেরো, ষোল বছরের একটি অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী বসে বাতাস করছে। এরা দুটি বোন। বড়টির অসুখ—তার নাম মমতা, আর ছোটটির নাম সাহানা।

তখন সবে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। অদূরে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠেছে। মাঝে মাঝে সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।]

মমতা। ও কিসের শব্দ সাহানা?

সাহানা। সমুদ্রের ঢেউয়ের।

মমতা। না না, সে শব্দ নয়। ওই যে অদূরে শাঁকের বাজনা শোনা যাচ্ছে না?

সাহানা। জগন্নাথ দেবের মন্দির থেকে আসছে। ও আরতির বাজনা।

মমতা। সন্ধ্যা হয়েছে বুঝি—এটা বুঝি গোধূলি লগ্ন?

সাহানা। হ্যা দিদি।

মমতা। এটা কি মাস?

সাহানা। ফাল্গুন মাস।

মমতা। ফাগুন মাস?…গোধূলি লগ্ন?…হ্যা সবইতো ঠিক মিলে গেছে।

সাহানা। কিসের মিল দিদি?

মমতা। পাঁচ বছর আগে এমনি এক ফাগুনের গোধূলি লগ্নে সে যে তাঁর মোহনরূপ নিয়ে এসে আমার সর্ব্বস্ব চুরী করে নিয়েছিল। আর আজ সে চোর কোথায়? এখনতো এল না। সেই ফাল্গুন মাস—সেই গোধূলি—সবই সেই। তবে—তবে সে চোর আস্‌ছে না কেন? সাহানা—সাহানা…

সাহানা। দিদি, তুমি অমন কচ্ছ কেন? কী হয়েছে তোমার? ক্ষিদে পেয়েছে?—একটু আঙুর খাবে?

মমতা। সাহানা, বোন—তুই আমাকে ভুলাবার চেষ্টা করছিস্। আমি কী বুঝিনা যে সকল সময় তুই আমাকে ভুলিয়ে রাখতে চাস। আমাকে একটু শান্তি দেবার জন্য—একটু সুখী করবার জন্য তোর প্রাণপণ চেষ্টা সবই আমি বুঝি—জানি। আমি নিজেও সে সব কথা ভুলবার চেষ্টা করি—কিন্তু পারিনা। থেকে থেকে আমার কেবলি মনে হয় সেই সব অতীত দিনের সুখ দুঃখের কথা।

সাহানা। তুমি অমন করলে তোমার অসুখ যে আরও বেড়ে যাবে—তা হলে কি হবে দিদি?

মমতা। অসুখ তো আমার দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমি জানি, এ রোগ থেকে আমার আর পরিত্রাণ নেই। এখন যে কয়দিন——

সাহানা। ছিঃ—ওকথা কি বলতে আছে ?

মমতা। যা সত্যি তা বলতে দোষ কি সাহানা ? আমার জীবনীশক্তি নষ্ট হয়ে এসেছে। আমার মনে হয় দুই, এক দিনের ভিতরই আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। মরতে আমার দুঃখ নেই—তবে মরবার আগে তাঁকে একবার —

সাহানা। তুমি অমন করতো আমি এখান থেকে চলে যাব।... অন্য কথা বল—তোমার কী আর কোন কথা নেই ?

মমতা। আমার আর কী কথা থাকতে পারে বোন। তুই তো জানিস না, সে আমায় কত ভালবাসতো—কত আদর করতো। সুখ দুঃখের ভিতর দিয়ে চারটি বছর যে কত আনন্দে কেটে গেছে—তা তুই ধারণা করতেও পারবি না। তোরও সেদিন আসবে—তোরও ফুল ফুটবে। সেদিন বুঝবি সে কী আনন্দ—কী শান্তি !

সাহানা। সবই বুঝি দিদি, কিন্তু——

মমতা। এর মধ্যে আবার 'কিন্তু' কি সাহানা ? আমি জানি, সে কথা ছাড়া আমার জীবনে আর কোন শান্তি নেই। দুনিয়ার কোন জিনিসই আমাকে আর তেমন আনন্দ দিতে পারবে না। শুধু সেই অতীত স্মৃতিটুকুই আমার সম্বল। তোমায় অনুরোধ করি সাহানা—আমার শেষ অনুরোধ, তাঁর কথা ভাবতে তুমি আমায় আর নিষেধ করোনা।

সাহানা। তোমার প্রাণ যদি তাঁর কথা বলতে চায়—তাঁর কথা ভাবতে চায়, তবে আমি আর নিষেধ করব না। তুমি যদি শুধু তাতেই আনন্দ পাও—তবে বল।...আমার যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে, তবে ক্ষমা কর দিদি ? আর কখনো তোমায় আমি বারণ করব না !

মমতা। না না, তোর কোন অন্যায় হয়নি বোন—তুইতো আমার ভালর জন্যই বলেছিস ! আমি অভাগিনী—আমার স্পর্শ লাগলে সাগর শুকিয়ে যায়—শ্যামল পল্লী মরুভূমির মত ধূ ধূ করে বিনামেঘে বজ্রপাত হয় ! কী কুক্ষণেই আমি এ দুনিয়ায় এসেছিলাম ! কাউকে এককণা শান্তি দিতে পেলাম না।

সাহানা। দিদি, তোমার প্রাণ যা বলতে চায় বল ! তোমার কষ্টের যদি একটু অংশও আমাকে দিতে পার—আমি সানন্দে তা মাথায় করে নেব।

মমতা। না—না, সে কষ্টের অংশ তোকে আমি দিতে পারব না। সে শুধু আমার নিজের—সে শুধু আমার আপনার।...মুখ গম্ভীর করে বসে রইলি যে বোন ? এর আস্বাদ তুইও একদিন পাবি রে—সেদিন তুইও স্বার্থপর হয়ে যাবি। তখন আর তোর এ দিদিটিকে মনে থাকবে না। সেদিন দেখতে আমার খুবই ইচ্ছা করে—কিন্তু তা আর পারলুম না বোন। আমার খেলাঘর বাঁধা শেষ হয়ে এসেছে, তবু—তবু...। দেখ বোন সেদিন আমি উপস্থিত না থাকতে পারলেও তোর দিদিকে একবার মনে করিস। করবি ত বোন।

সাহানা। দিদি, আবার কিন্তু আমি অবাধ্য হব। এসব কী কথা ভাই ? দিদি, দিদি—তুই আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবি ? মায়ের কোলে আমরা দুটি ফুল ফুটেছি—মার কোল আলো করেই থাকব।

মমতা। ভুল বোন ভুল। মানুষ আশা করে এক হয় আর এক। কালের গতিকে কেউ রোধ করতে পারে না। সে আপন মনে তার বিজয় শকট অবাধে চালিয়ে নিয়ে যায়। তাতে কত লোকের কত আশাঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়—সে একটুও ভ্রূক্ষেপ করে না—করবেও না।...আচ্ছা বোন, একটা কথা সত্যি বলবি ?

সাহানা। কি দিদি ?

মমতা। তোদের সু'বাবুর কোন সংবাদ পেয়েছিস ?

সাহানা। পেয়েছি দিদি। তিনি বেশ ভালই আছেন—দুই একদিনের ভিতরেই এখানে এসে পৌছবেন।

মমতা। সত্যি কথা বলছিস ?—সত্যি বল, আমার বুকে হাত দিয়ে বল—

সাহানা। আমাকে তুমি অবিশ্বাস কর দিদি ? এই তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি—আমি যা বলেছি তা সবই সত্যি।

মমতা। তবে সত্যিই আসবে রে ?—কবে—কবে আসবে রে ?

সাহানা। দুই একদিনের মধ্যেই আসবেন।

মমতা। আমি কী আর দু'দিন বাঁচব ?

সাহানা। কেন বাঁচবে না দিদি ? তোমার এমন কী হয়েছে যাতে তুমি অত বিচলিত হয়ে উঠেছ ?

মমতা। তা কি আর আমি বুঝি না সাহানা ? আজ আমার আর কোন গ্লানি নেই—কোন দুঃখ নেই। সাহানা, বোন—আমায় একটু ওই ফুলের বাগিচায় নিয়ে যাবি—আমি ওখানে একটু বসব।

সাহানা। না দিদি, ডাক্তার তোমায় বিছানা থেকে উঠতে নিষেধ করেছেন।

মমতা। তোর কোন ভয় নাই বোন। আমি বেশ ভালই আছি—কিছু হবে না। একটিবার—একটিবার আমাকে নিয়ে যা। আজ আমার ওখানে বসতে বড়ই ইচ্ছা করছে। কত সন্ধ্যা—কত রাত তাঁর সঙ্গে ওই বাগিচায় বসে নীল সাগরের ঢেউ দেখেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেছে, কেউ ওঠবার নামটি করি নি—তন্ময় হয়ে শুধু দেখেছি। সেই সব দিনে সাগরের সঙ্গে চাঁদের খেলা, নক্ষত্রের ঝিকিমিকি—আমাদের হৃদয়ে একটা স্বপ্ন রাজ্যের সৃষ্টি করত। নীল আকাশখানা বুকে করে ওই প্রশান্ত সাগর দুনিয়ার সব বাধা—সব বিঘ্ন তুচ্ছ করে ছুটে যেত। কেউ তাকে বাধা দিতে পারত না। তিনি এই সাগরের নৃত্য খুব ভালবাসতেন। এর বিরাট প্রাণের স্বাধীনতা তাঁর খুব ভাল লাগত। আমাকে একদিন বলেছিলেন—মমতা, কী সুন্দর, স্বাধীন ওই অগাধ নীলাম্বুরাশি। আপন মনে, আপন ইচ্ছায় স্বাধীন ভাবে চলে যাচ্ছে—কারো ধার সে ধারে না—ধারবে ও না। স্বাধীনতার ভিতরে ওর জন্ম, আবার স্বাধীনতার ভিতরেই ওর মৃত্যু। কী সুন্দর।

সাহানা। দিদি, এদিককার জানালাটা খুলে দি—বাইরে আর যেতে চেও না।

মমতা। একটিবার—একটিবারও কী নিয়ে যেতে পারবি না বোন ? আমার বড় আদরের গোলাপ ঝাড়—তার কী দশা হয়েছে ? ক'টা ফুল ফুটেছে—কেমন গন্ধ বের হচ্ছে ?—বোন, বোন—দয়া করে আমার একটা অনুরোধ রাখ। একটিবার—একটিবার নিয়ে যা !

সাহানা। দিদি তুমি তো সবই বোঝ। অসুখ তা হলে বেড়ে যাবে যে। আমি জানালা খুলে দিচ্ছি।

মমতা। বাঃ—কী সুন্দর বাতাস বইছে। বেশ ফুরফুরে হাওয়া তো। কই গোলাপের গন্ধ তো আসছে না। গোলাপ কি আজ ফোটে নি বোন ? আর ফুটবেই বা কেন ?—তারও ফোটার দিন ফুরিয়েছে। উঃ...ওই গোলাপ ঝাড়ের তলে কত রাত কাটিয়েছি। সে সব অতীত দিনের পুণ্য স্মৃতি। একদিন তিনি আমার খোঁপায় একটি গোলাপ পরিয়ে বলেছিলেন—কী সুন্দর তুমি মমতা ?

সাহানা। দিদি দেখেছ, আজ কেমন জ্যোৎস্না উঠেছে। সমস্ত পৃথিবী যেন শুভ্র হীরকে মণ্ডিত হয়েছে।

মমতা। সত্যি বলছিস বোন—এমন জ্যোৎস্না অনেক-দিন চোখে পড়ে নি। এমনি চাঁদিনী রাতে সাগর তীরের ওই ছোট্ট বেদীটির সঙ্গে আমার কত স্মৃতি জড়িত। সে সব দিন আর আসবে না। গোলাপও ফুটবে জ্যোৎস্নাও উঠবে—কিন্তু আমার আর সুখের কুঁড়ি ফুটবে না। আমার ফুল ফুটতে ফুটতেই শুকিয়ে গেল। বড় সাধ ছিল—

সাহানা। আচ্ছা দিদি, সুরেশবাবু যখন ব্যারীষ্টারী পড়তে বিলেত গিয়েছিলেন—তখন তুমি কেমন করে ছিলে ?

মমতা। তিনি আমাদের বিয়ের দেড় বছর পরে বিলেত যান। সেখানে তিনি মাত্র এক বছর ছিলেন। ওই এক টানা সুখের পরে সেই একটি বছর আমার যে কী ভাবে কেটেছে—তা মনে হলে এখনও আমার কষ্ট হয়। প্রথম প্রথম কিছুই ভাল লাগত না। রোজই মনে করতাম—কেন তিনি বিলেত গেলেন ? কী নিষ্ঠুর তিনি। তবে তখন মনে একটা সান্ত্বনা ছিল যে আমার স্বামী বিলেত থেকে পাস করে দশজনের একজন হয়ে আসবে। সেই কথা ভাবতেই মনটা গর্ব্বে ভরে উঠত। তখন ভাবতাম—একটা বছর পরে তিনি এলে আমাদের জীবন কত সুখেই কেটে যাবে। তখন তো বুঝি নি বোন যে আমার আশা এমনি করে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

সাহানা। হ্যাঁ দিদি, সুরেশবাবু বিলেত থেকে ফিরে এলে তোমার কেমন আনন্দ হয়েছিল ?

মমতা। তিনি যেদিন ফিরে এলেন, ভাবলাম—আমার

সুখের জন্ত বুঝি বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে ওই নীল আকাশ থেকে পূর্ণচন্দ্র দেহ পরিগ্রহ করে এ দুনিয়ায় নেমে এসেছেন। তিনি আমাকে বললেন—কেমন আছ মমতা? আমার মনে হ'ল যেন আমি আর এ দুনিয়ায় নাই—কোন এক মায়াপুরীতে চলে এসেছি।

সাহানা। তারপর দিদি, তারপর—

মমতা। তারপর যে দেড়টি বছর কলকাতা ছিলুম কত সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মান অভিমানের ভিতর দিয়ে কেটে গেছে সে সব দিন। নিষ্ঠুর কাল বুঝি আমাদের সে সুখ আর সইতে পারলে না। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন সমগ্র ভারতে ছেয়ে গেল। মায়ের জন্ত তাঁর প্রাণ কাঁদতো—প্রাণটা ছিল তাঁর বিরাট। তাই তিনি ব্যারিষ্টারী ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে লেগে গেলেন। তারপর গবর্ণমেণ্ট তাঁকে রাজবন্দী করে রেখে দিলে। উঃ—কী ঘোর অবিচার! মানুষের জন্মগত স্বাধীনতাকে পদদলিত করতে প্রবল একটুও দ্বিধা বোধ করে না—অথচ তারাই সভ্য, তারাই ভদ্র।

সাহানা। থাক্ দিদি থাক্, আজ তুমি অনেক কথা বলেছ। এখন একটু ঘুমাবার চেষ্টা কর।

মমতা। হ্যাঁ বোন, সত্যিই সে আসবে তো রে? কি লিখেছে আমায় আর একবার বল—আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

সাহানা। দিদি তোমায় আমি সত্যিই বলছি, সুরেশবাবু আসবে। আজ আমার কেবলি মনে হচ্ছে যেন আজই আসবে। ওঃ, কথায় কথায় তোমায় ওষুধ দিতে ভুলে গেছি। ডাক্তার বলেছিলেন, সন্ধ্যার পর তোমায় ওষুধ খাওয়াতে—তা হলেই তোমার ঘুম আসবে।

মমতা। আর ওষুধ খেয়ে কী হবে?—আজ সে আসবে—আজ সে আসবে। আজ আমি সারা রাত্রি জাগব। সেই বিয়ের বরণ ডালিটা নিয়ে আয়। আজ আমার বিয়ে—আজ আমার বিয়ে।

সাহানা। দিদি, তুমি কি বলছ তার কিছু ঠিক নেই। লক্ষ্মী দিদিটি আমার, ওষুধটা চট্ করে খেয়ে ফেল।

মমতা। হ্যাঁ সাহানা, সত্যিই সে আসবে তো রে?

সাহানা। আসবে বৈকি দিদি।

মমতা। আমার বড় ঘুম আসছে। তুই রবীবাবুর সেই গানটা কর—আমি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ি।

সাহানা। (গীত)

"হৃদয় আমার ঐ ঐ ঐ বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে,
বেড়া দেওয়ার মাতন নামে উদ্দাম উল্লাসে,
তোমার মোহন এল ভীষণ বেশে
আকাশ ঘেরা জটীল কেশে,
বুঝি এলো এলো এলো তোমার সাধন ধন চরম উল্লাসে।"

কে?

(পাশের ঘর থেকে)

দোর খোল—আমি এসেছি।

সাহানা। কে সুরেশবাবু, এসেছেন?

সুরেশ। মমতা, মমতা। সাহানা, মমতা কই? সে কেমন আছে?

সাহানা। ওই যে দিদি। সুরেশবাবু, দিদিকে বুঝি আর রাখতে পারলুম না। বোধ হয় তোমাকে দেখবার জন্যই ওর প্রাণটুকু আছে। আজ তুমি এসেছ, আজ আমার ভারী ভয় হচ্ছে।

সুরেশ। মমতা, মমতা—

সাহানা। চুপ—কথা কয়ো না। আজ ক'দিন পরে একটু ঘুমিয়েছে —

মমতা। সাহানা, সাহানা—কে রে? কার কণ্ঠস্বর? আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যেন তিনি ফিরে এসেছেন। যেন—

সুরেশ। মমতা, মমতা—সত্যিই আমি এসেছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?

মমতা। অ্যাঁ—সত্যি তুমি এসেছ? এতদিনে মনে পড়েছে? আজ কী দেখতে এসেছ—আমি যে মরণ পথের যাত্রী। সাহানা, সাহানা—তবে সত্যি আমার বিয়ে। সেই ফাল্গুন মাস—সেই গোধূলি লগ্ন।

সুরেশ। তুমি ও সব কি বলছ মমতা?

মমতা। যাবে? যাবে? তুমি আমার সঙ্গে যাবে? না না, তুমি থাক—তুমি থাক। আজ আমার বিয়ে

সাহানা, সাহানা—বিয়ের শাঁক বাজা—আজ আমাদের বিয়ে, আজ আমাদের বিয়ে!

সুরেশ। তুমি অমন কচ্ছ কেন মমতা? তোমার কী হয়েছে? কালই অসুখ সেরে যাবে।

সাহানা। দিদি, সুরেশবাবু এসেছেন তার সঙ্গে কথা বল।

মমতা। এসেছে—এসেছে? হ্যাঁ—তাইতো তুমি এসেছ—কখন এলে? একটা কথা শোন—আমার কাছে এস। একটিবার—একটিবার দেবে কী—সেই বিয়ের দিন যা দিয়ে আমার সর্ব্বস্ব চুরি করে নিয়েছিলে?

সুরেশ। মমতা—তুমি অমন বচ্ছ কেন? স্থির হও—অসুখ সারলেই ——

মমতা। ওঃ—ওঃ কী বিকট! কী ভীষণ!—সাহানা, সাহানা, বোন—দেখতে পাচ্ছিস না কে? উঃ উঃ…

সাহানা। দিদি—দিদি। একি? দিদি আর কথা কইছে না কেন সুরেশবাবু? দিদি, দিদি—

সুরেশ। মমতা—মমতা! সাহানা, শীগ্‌গির ডাক্তারকে ডাক!…এই যে ডাক্তারবাবু দেখুন—মমতাকে একবার দেখুন। এই যে কথা কইছিল—

ডাক্তার। সাহানা, সুরেশকে দেখবার জন্যই বুঝি মমতা বেঁচে ছিল।

সুরেশ। তাহলে মমতা আমাদের ফাঁকি দিয়েছে। উঃ———।

———

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা

[শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

সম্প্রতি হিন্দুর প্রতি আড়ি করিয়া বাংলা দেশের কয়েকজন মুসলমান, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইয়াছেন। এ যেন ভায়ের প্রতি রাগ করিয়া মাতাকে তাড়াইয়া দিবার প্রস্তাব। বাংলা দেশের শতকরা নিরানব্বুইএর অধিক সংখ্যক মুসলমানের ভাষা বাংলা। সেই ভাষাটাকে কোণ-ঠেসা করিয়া তাহাদের উপর যদি উর্দ্দু চাপানো হয়, তাহা হইলে তাহাদের জিহ্বার আধখানা কাটিয়া দেওয়ার মত হইবে না কি? চীনদেশে মুসলমানের সংখ্যা অল্প নহে, সেখানে আজ পর্য্যন্ত এমন অদ্ভুত কথা কেহ বলে না যে, চীনভাষা ত্যাগ না করিলে তাহাদের মুসলমানির খর্ব্বতা ঘটিবে। বস্তুতঃই খর্ব্বতা ঘটে যদি জবরদস্তির দ্বারা তাহাদিগকে ফার্সি শেখাইবার আইন করা হয়। বাংলা যদি বাঙালী-মুসলমানের মাতৃভাষা হয় তবে সেই ভাষার মধ্য দিয়াই তাহাদের মুসলমানিও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ হইতে পারে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে মুসলমান লেখকেরা প্রতিদিন তাহার প্রমাণ দিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাশালী, তাঁহারা এই ভাষাতেই অমরতা লাভ করিবেন। শুধু তাই নয়, বাংলা ভাষাতে তাঁহারা মুসলমানী মাল-মসলা বাড়াইয়া দিয়া ইহাকে আরো জোরালো করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাংলা ভাষার মধ্যে ত সেই উপাদানের কমতি নাই—তাহাতে আমাদের ক্ষতি হয় নাই ত। যখন প্রতিদিন মেহন্নত করিয়া আমরা হয়রান্ হই, তখন কি সেই ভাষায় আমাদের হিন্দুভাবের কিছুমাত্র বিকৃতি ঘটে? যখন কোনো কৃতজ্ঞ মুসলমান রায়ৎ তাহার হিন্দু জমিদারের প্রতি আল্লার দোওয়া প্রার্থনা করে, তখন কি তাহার হিন্দু-হৃদয় স্পর্শ করে না? হিন্দুর প্রতি বিরক্ত হইয়া ঝগড়া করিয়া যদি সত্যকে

অস্বীকার করা যায়, তাহাতে কি মুসলমানেরই ভালো হয়? বিষয়-সম্পত্তি লইয়া ভাইয়ে-ভাইয়ে পরস্পরকে বঞ্চিত করিতে পারে, ভাষা-সাহিত্য লইয়া কি আত্মঘাতকের প্রস্তাব কখনো চলে?

কেহ কেহ বলেন, মুসলমানের ভাষা বাংলা বটে, কিন্তু তাহা মুসলমানী বাংলা, কেতাবী বাংলা নয়। স্কটলণ্ডের চলতি ভাষাও ত কেতাবী ইংরেজী নয়, স্কটলণ্ড কেন, ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃত ইংরেজী নয়। কিন্তু তা লইয়া ত শিক্ষা ব্যবহারে কোনো দিন দলাদলির কথা শুনি নাই। সকল দেশেই সাহিত্যিক ভাষার বিশিষ্টতা থাকেই। সেই বিশিষ্টতার নিয়ম-বন্ধন যদি ভাঙিয়া দেওয়া হয়, তবে হাজার হাজার গ্রাম্যতার উচ্ছৃঙ্খলতায় সাহিত্য খান্ খান্ হইয়া পড়ে।

স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশেও হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ আছে। কিন্তু দুই তরফের কেহই একথা বলিতে পারেন না যে এটা ভালো। মিলনের অন্ত প্রশস্ত ক্ষেত্র আজও প্রস্তুত হয় নাই। পলিটিক্‌সকে কেহ কেহ এইরূপ ক্ষেত্র বলিয়া মনে করেন, সেটা ভুল। আগে মিলনটা সত্য হওয়া চাই, তারপরে পলিটিক্‌স হইতে পারে। খানকতক বে-জোড় কাঠ লইয়া ঘোড়া দিয়া টানাইলেই যে কাঠ আপনি গাড়ীরূপে ঐক্য লাভ করে একথা ঠিক নহে। খুব একটা খড়খড়ে ঝড়ঝড়ে গাড়ী হইলেও সেটা গাড়ী হওয়া চাই। পলিটিকসও সেইরকমের একটা যানবাহন। যেখানে সেটার জোয়ালে চাপরে চাকায় কোনোরকমের একটা সঙ্গতি আছে সেখানে সেটা আমাদের ঘরের ঠিকানায় পৌঁছাইয়া দেয়, নইলে সওয়ারকে বহন না করিয়া সওয়ারের পক্ষে সে একটা বোঝা হইয়া উঠে।

বাংলা দেশে সৌভাগ্যক্রমে আমাদের একটা মিলনের ক্ষেত্র আছে। সে আমাদের ভাষা ও সাহিত্য। এইখানে আমাদের আদানে-প্রদানে জাতিভেদের কোনো ভাবনা নাই। সাহিত্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিভেদ থাকিত, তবে গ্রীক্ সাহিত্যে গ্রীক্ দেবতার লীলার কথা পড়িতে গেলেও আমাদের ধর্ম্মহানি হইতে পারিত। মধুসূদন দত্ত খৃষ্টান ছিলেন। শ্বেতভুজা ভারতির যে বন্দনা করিয়াছেন সে সাহিত্যিক বন্দনা, তাহাতে কবির ঐহিক পারত্রিক কোনো লোকসানের কারণ ঘটে নাই। একদা নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও মুসলমান-আমলে আরবী ফার্শি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন; তাহাতে তাঁহাদের ফোঁটা কাঁপে বা টিকি খাটো হইয়া যায় নাই। সাহিত্য পুরীর জগন্নাথক্ষেত্রের মতো, সেখানকার ভোজে কাহারো জাতি নষ্ট হয় না।

অতএব সাহিত্যে বাংলা দেশে যে একটা বিপুল মিলন-যজ্ঞের আয়োজন হইয়াছে, যাহার বেদী আমাদের চিত্তের মধ্যে, সত্যের উপরে ভাবের উপরে যাহার প্রতিষ্ঠা, সেখানেও হিন্দু-মুসলমানকে যাঁহারা কৃত্রিম বেড়া তুলিয়া পৃথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা মুসলমানের ও বন্ধু নহেন। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে একটা স্বাভাবিক আত্মীয়তার যোগসূত্রকেও যাঁহারা ছেদন করিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তর্য্যামীই জানেন, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে দেশের মধ্যে অধর্ম্মকে আহ্বান করিবার পথ খনন করিতেছেন। কিন্তু আশা করিতেছি তাঁহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। কারণ প্রথমেই বলিয়াছি বাংলা দেশের সাধনা একটা সত্য বস্তু পাইয়াছে; সেটি তাহার সাহিত্য। এই সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক মমত্ববোধ না হওয়াই হিন্দু বা মুসলমানের পক্ষে অসঙ্গত। কোনো অস্বাভাবিক কারণে ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হইতেও পারে, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের সহজ বুদ্ধি কখনোই ইঁহাদের আক্রমণে পরাভূত হইবে না।

(প্রবাসী)

ষড়যন্ত্র

[শ্রীশিশিরকুমার বসু]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

সেদিন ছিল শনিবার, রবিবার দিন রাত্রে করসিনির প্রিন্স জোরাফের গৃহে নিমন্ত্রণ। শনিবার অপেরা হাউসে নৃত্যগীত ও অভিনয় হইতেছে—শ্রীমতী লা বেলা কোয়েরো ধীরে ধীরে আসিয়া করসিনির বসিবার কক্ষে উপস্থিত হইল; পুনরায় প্রিন্স জোরাফের বাটী নিমন্ত্রণ যাইবার কথা উত্থাপন করিল; করসিনির সেই একই উত্তর; "যাইতেই হইবে নচেৎ কুমারী নাডা দুঃখিত হইবে"—কথায় কথায় শ্রীমতী কোয়েরো আর সামলাইতে পারিল না বলিয়া ফেলিল "আচ্ছা কুমারী নাডা ত দুঃখিত হইবে কিন্তু প্রিন্স জোরাফকে ত জান? যদি সে তোমায় তাহার গৃহে পাইয়া কোনরূপ অপমান ক'রে—"

করসিনি শ্রীমতীর এইরূপ সমস্ত তর্কে যেন বিরক্ত হইয়া উঠিয়া বলিল "তাই যদি হয় তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তে সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিব।" এই বলিয়া করসিনি স্থান ত্যাগ করিল। শ্রীমতী কোয়েরো অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে প্রস্থান করিল।

পরদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমতী আর ঘরে বসিয়া থাকিতে পারিল না; বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সামান্য সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশভূষা করিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল এবং প্রিন্স জোরাফের বাটীর খিড়্‌কি দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং রাজকুমারী নাডার পরিচারিকা কেথেরাইনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বলিল "জানিয়া আইস,যে করসিনির জন্য কোনও উপায় করা হইয়াছে কিনা?" কেথেরাইন, তাহাকে সমাদর করিয়া তাহার নিজের ঘরে বসাইয়া কুমারী নাডার সন্ধানে গেল; কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া সংবাদ দিল "হ্যাঁ একরকম উপায় করা হইয়াছে কিন্তু তাহা কার্য্যকরী হইবে কি না কে বলিতে পারে?" শ্রীমতী এই উত্তর পাইয়া কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা কেথেরাইনকে প্রদান করিয়া সেস্থান ত্যাগ করিল; পথে যাইতে যাইতে সে দেখিল—করসিনি তাহার বেহালার বাক্সটি লইয়া ধীরে ধীরে প্রিন্স জোরাফের গৃহাভিমুখে চলিয়াছে—শ্রীমতী অন্ধকারে একপাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল; করসিনি তাহাকে দেখিতে পাইল না, চলিয়া গেল।

করসিনি প্রিন্স জোরাফের গৃহদ্বার-দেশে আসিয়া তাহাকে সাদর আহ্বান করিয়া ভিতরে লইয়া গেল; করসিনি প্রিন্সের এই ভাব দেখিয়া একটু বিস্মিত হইল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে করসিনি কয়েকখানি গৎ বাজাইয়া সকলের মনরঞ্জন করিল; বাজনা শেষ হইলে কুমারী নাডা আসিয়া বলিল "মিঃ করসিনি, আমার সঙ্গে একটু নির্জ্জন আলাপের সময় হইবে কি?" করসিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল; তাহার আরাধনার দেবী, তাহার মানস-প্রতিমা, নিজে স্বেচ্ছায় উপযাচিকা হইয়া তাহার সহিত নির্জ্জন আলাপ করিতে চাহিতেছে—এ অপেক্ষা সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে!

উভয়ে একটি নির্জ্জন কক্ষে গিয়া বসিল; প্রথমেই কুমারী নাডা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল "সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর আপনি নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছেন; আপনার গাড়ী আছে ত? তাহা হইলে আর বেশী রাত্রি না করিয়া আপনি আপনার বাসায় গিয়া বিশ্রাম করুন না?"

করসিনি উত্তর করিল "না আমার গাড়ী নাই; আমি রাত্রে হাঁটিয়াই যাইয়া থাকি।"

"তা হউক; আজ আর হাঁটিয়া যাইবেন না; অনুমতি করুন আমি আপনার জন্য একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করি।"

করসিনি উত্তেজিত হইয়া বলিল "না, না, আমার জন্য অত কষ্ট আপনাকে করিতে দিব না"—পরে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে কুমারীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া করসিনি বলিল; "আমার জন্য আপনাকে কোন কষ্ট করিতে দিব না—কেবলমাত্র মাঝে মাঝে আমায় মনে করিবেন তাহা হইলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করিব।"

কুমারী ক্রমেই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন "তাহাই হইবে, মিঃ করসিনি তাহাই হইবে, আমার অনুরোধ রক্ষা করুন—আমি একখানি গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিই আপনি তাহাতে করিয়া আপনার বাসায় প্রত্যাগমন করুন।"

হঠাৎ এই সময় প্রিন্স জোরাফ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল; কুমারীর পানে একটি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া করসিনির দিকে ফিরিয়া মৃদু হাস্য করিয়া করসিনির হাত ধরিয়া উঠাইয়া বলিল;"আসুন মিঃ করসিনি, আহার্য্য প্রস্তুত; আমি জানি আপনি কখনও রাত্রে কোনও যান ব্যবহার করেন না; সেই জন্য পাছে বেশী রাত্রি হইলে আপনার কষ্ট হয় সেই জন্য আমি আলাদা বন্দোবস্ত আপনার জন্য করিয়াছি।" এই বলিয়া করসিনির হাত ধরিয়া বাহির হইয়া গেল যাইবার সময় ভগ্নির প্রতি একটু করুণা মিশ্রিত কটাক্ষপাত করিয়া গেল; কুমারী সে কটাক্ষ লক্ষ্য করিল, অজ্ঞাতে একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া টেবিলের উপর লুটাইয়া পড়িয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

* * * *

প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যে করসিনি আহার সমাধা করিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল; প্রিন্স জোরাফের ভৃত্য পিটার ফটক পর্য্যন্ত তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিল; ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন বিকটাকার দস্যু তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে একজন দস্যু তাহার নাকের উপর একখানি রুমাল চাপিয়া ধরিল; সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। দস্যুরা ধরাধরি করিয়া তাহাকে লইয়া একখানি গাড়ীর মধ্যে শোয়াইয়া গাড়ী বন্ধ করিয়া সকলে তাহাতে উঠিয়া মস্কো রোড ধরিয়া চলিল; প্রিন্স জোরাফের ভৃত্য হাস্যমুখে ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে সংবাদ জ্ঞাপন করিল—প্রিন্স জোরাফের মুখে সকলের অলক্ষ্যে এক ক্রূর হাসি ফুটিয়া উঠিল; হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হইল।

(ক্রমশঃ)
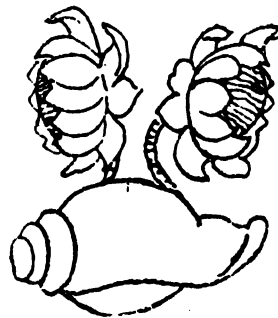
ব্রহ্মচর্য্য

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

নারী-জাতিটার উপর প্রভাময়ের কেন যে এতটা তীব্র বিদ্বেষ ছিল তাহা আর কেহ না জানিলেও আমরা বেশ জানি; জিজ্ঞাসা করিলে প্রভাময় কিন্তু লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইত যে তাহার কোষ্ঠিতে লেখা আছে যে সে অচিরেই সন্ন্যাস-জীবন লাভ করিবে অতএব নারী জাতির উপর বিদ্বেষ থাকাটা অত্যন্ত স্বাভাবিক; ব্যাপারটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি ;—

সে বছর গ্রামের ইস্কুল হইতে কোনরূপে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আই-এ পড়িবার জন্য প্রভাময় যখন সহরে প্রথম পদার্পণ করিল সহর-জাত আব-হাওয়ার পরশ পাইয়া তাহার গ্রাম্য অন্তরখানি দুই চারি মাসের মধ্যেই সহরের উপযোগী হইয়া উঠিল, প্রভাময় সিগারেট খাইল, বায়স্কোপ দেখিতে সুরু করিল এবং আরও দুই চারিটা উপসর্গের পর সহসা একদিন ছাত্র জীবনের অবশ্যম্ভাবী সাহিত্য-চর্চ্চা রূপ রোগে আক্রান্ত হইল।

তরুণ প্রাণ দোষ দেওয়া যায় না, কাব্যের ভিতর দিয়া মানসীর অন্বেষণ করিতে করিতে যখন সে একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিল সম্পাদক প্রত্যার্পিত কবিতার রাশী-গুলা একে একে তাহার দেরাজের সব কয়টী কামরাই অধিকার করিয়া বসিল তখন সহসা একদিন তাহার চক্ষু ফুটিল, দেখিল, যাহার অন্বেষণ সে কাগজের পাতায় পাতায় এতদিন বিরামহীন ভাবে করিয়া আসিয়াছে, সে 'মানসী' দূরে নহে, কাছে—অতি কাছে, তাহার পড়িবার ঘরের সম্মুখেই এক জানালার ধারে! হায় রে, মানুষ জগতে এমনি করিয়াই আপনার জিনিষটীকে দূরে দূরে খুঁজিয়া বেড়ায়!

প্রভাময় থাকিত একটা মেসে; ভদ্রলোকের পাড়া, রাত্রি দশটার পর চেঁচামেচি করিয়া তাস পাশা খেলিবার উপায় নাই, তাই রাত্রি দশটার পর সকলে খাইয়া দাইয়া শুইয়া পড়িলে প্রভাময় ছাদে উঠিত, ব্যাকুল বিরহীর মত অনিমেষনেত্রে সেই জানালাটার দিকে তাকাইয়া থাকিত যেখানে তাহার 'মানসী'র প্রথম দেখা সে পাইয়াছিল।... কিন্তু এমন করিয়া কয়টা দিনই বা কাটে?...প্রভাময়ের ক্ষুধা লোপ পাইল, দীর্ঘশ্বাস পড়িতে সুরু করিল, প্রেম রোগে আক্রান্ত হইলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহার সব কয়টাই প্রভাময় পাইল

সেদিন মেসের সকলেই যে যার আপন আপন কাজে বাহির হইয়া গেলে প্রভাময় ধীরে ধীরে জানালাটার মুখে আসিয়া বসিল। যেমন করিয়াই হউক আজ সে তাহার মানসীকে বুঝাইবেই কতটা ভালবাসা সে তাহার জন্য নিজের অন্তরের স্তরে স্তরে সাজাইয়া রাখিয়াছে, কী গভীর সে প্রেম, হায় রে, বুকের নিকট যদি একটা ক্ষুদ্র কবাট থাকিত,—তাহা হইলে আজ সে কবাট খুলিয়া দেখাইতে পারিত—কী, মূল্যবান অপাথিব বস্তু সে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে।...

একটা বাজিল, দুইটা বাজিল—এইবার সে আসিবে। প্রভাময় আয়নাতে মুখটা একবার দেখিয়া লইল, যে চাহনী দিয়া মানসীর অন্তরটা বিদ্ধ করিবে, আয়নার সম্মুখে আপন মনেই একবার রিহার্সেল দিয়া লইল।...হাঁ হইয়াছে বটে,—না হইয়া যায় কোথা।...

কিন্তু একি?...মাথায় সিঁদুর কেন? তবে, তবে কি—প্রভাময়ের মাথাটা একবার ঘুরিয়া উঠিল। হইবে,—সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে অতটা লক্ষ্য করে নাই...

কিশোরীটিও তাহাকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তবে? তবে—প্রভাময়ের বুকখানা আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কে বলে ভালবাসা জন্মে নাই? তা না হইলে অতক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে। হউক না বিবাহিত, ক্ষতি কি?-আহা, হয়তো বেচারীর স্বামী বিদেশে চাকরী করে, ন-মাসে, ছ-মাসে—হাজার হউক মেয়েমানুষ, বয়সটাও

কাঁচা, প্রাণটা তো একটু আনচান্ করিয়া উঠে...প্রভাময় স্থির করিল সে চিঠি দিবে, আজই...

সুখের কথার সম্মান প্রভাময় কিছু বেশী করিয়াই রাখে, আজও রাখিল। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া লিখিল :—

'মানসী' আমার—

তোমায় দেখিয়া অবধি আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। প্রেম,—প্রেম, আমার হৃদয়ের সঞ্চিত সমস্ত প্রেম আমি তোমাকেই দিতে চাই, লইয়া আমায় ধন্য কর। তোমার আশায় পথ চাহিয়া রহিলাম, পত্রের উত্তরে রহিলাম, বিফল করিও না।

ইতি তোমারই প্রেমাকাঙ্ক্ষী
শ্রীপ্রভাময় বসু।

একটা ছোট্ট ঢিল পুরিয়া প্রভাময় কাগজটুকু ছুঁড়িয়া জানালায় দিল। ব্যস্ এইবার তাহাকে পায় কে? এতদিনে তাহার সাহিত্য চর্চা, কবিতা লেখার সার্থকতা আসিল।... আসিবে না? energy চাই, চেষ্টা চাই, আর—আর চাই অন্তরের আবেগময় ভাষা।...

একদিন গেল, দুইদিন গেল—কিন্তু কৈ পত্রোত্তর আসিল কৈ?...মানসীও তো আর জানালায় আসিয়া দাঁড়ায় না। তবে? মন সান্ত্বনা দিল, দুঃখ নাই, সবুরেই মেওয়া ফলে—ঠিক, প্রভাময় দেখিল মন ই ঠিক বলিয়াছে। বিশেষতঃ এ সব গোপনীয় কাজ, অবসর সব সময়ে আইসে না, পত্র দিতে দেরী তো হইবেই।...

হইলও ঠিক তাই। অন্তরীক্ষে বসিয়া প্রেমের শ্রেষ্ঠ দেবতা জয়-পূর্ণ শংখানি প্রভাময়ের দিকেই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। প্রভাময় চিঠির উত্তর পাইল। বেশ সুশ্রী, সুন্দর ছাঁদের লেখা—

প্রিয়তম—

তোমার পত্র পাইয়া কতদূর যে আশ্বস্ত হইলাম, সামান্য কাগজ কলমে তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। ভালবাসা?—সে তো প্রথম দৃষ্টির সাথে সাথেই তোমায় দিয়াছি।... স্বামী আমার বিদেশে চাকরী করে, বাড়ীতেও বিশেষ কেহ থাকে না,—কাল দুপুরে একবার দয়া করিয়া আসিলে দেখাইব কে কাহাকে কত ভালবাসে। আসিও, লক্ষীটি—তোমারই আশায় থাকিব। ইতি তোমারই

'ম'

তবে?...কে বলে, প্রভাময় ভালবাসিতে জানে না। একটী চিঠি, তাহাতেই...সময়টা যেন প্রভাময়ের সহিত শক্রতা সাধিতেছে। এই তো রাত্রি দশটা। এখনও এগারটা, বারটা, একটা—উঃ ঘণ্টা নয়, যেন এক একটা যুগ। প্রভাময় ঘুমাইবার ব্যর্থ সাধনায় মনোনিবেশ করিল।...

পরদিন ভোরে উঠিয়া প্রভাময় সর্ব্বপ্রথমেই বাক্সটা খুলিল। কলেজের মাহিনা ও মেসের খরচের দরুণ গোটা পনেরো টাকা ছিল, তাহাই লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। শুধু হাতে যাওয়া ভাল দেখায় না, প্রভাময় একখানি শাড়ী কিনিল, সাবান, তেল কিছুই বাকী রাখিল না। মেসের লোকে জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিল, দেশের লোক আসিবে, সে তাহার বৌদিদির জন্য পাঠাইবে। হাজার হউক দেবর তো ...

সাড়ে দশটার পর মেসের কামরাগুলি একে একে খালি হইয়া গেলে, প্রভাময় উপহারের জিনিষগুলি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। আঃ আজ স্বর্গের ইন্দ্রও তাহার অপেক্ষা দুর্ভাগা...

দরজা খোলা ছিল। তরুণীর সাথে সাথে প্রভাময় ধীরে ধীরে উপরে উঠিল। সুন্দর একখানি ঘরের ভিতর আনিয়া তরুণী স্মিত হাসিয়া বলিল—বসুন।...পাণ টান খাওয়া হয়? সিগারেট—

প্রভাময় হাসিয়া বলিল—সিগারেটটা নয়, পাণ-টানগুলোতে আর আপত্তি নেই,—বিশেষতঃ তোমার হাতের—

সত্যি না কি?—তরুণী মৃদু হাসিল, বলিল—সাড়ী, সাবান—এসব আবার কি এনেছো, মিছিমিছি...

মিছামিছি?—হায় নারী, শাস্ত্রে তোমাদিগকে বৃথা মেয়েমানুষ আখ্যা দেয় নাই। প্রেমের পরিবর্ত্তে সাড়ী, সাবান এসব তো কিছুই নহে, জীবন পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে।...

প্রভাময় চক্ষু ঘুরাইয়া হাসিয়া বলিল—কি বলছো, মিছেমিছি ? হাঁ, এ সব তো কিছু নয়, দরকার হলে—

প্রাণও দিতে পারি, নয় প্রভাময়বাবু ?—এ কে ? প্রভাময়ের মুখখানা সহসা ছাইএর মত সাদা হইয়া উঠিল। প্রভাময় উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। আগন্তুক যুবক একটু হাসিয়া বলিলেন—

আহা, ব্যস্ত কেন, একটু বসুন না, এসেছেন যখন···

সমস্ত পৃথিবীটা যেন জিওগ্রাফির গ্লোবের মত প্রভাময়ের চক্ষের সম্মুখে ঘুরিতে সুরু করিল।

যুবক বলিতেছিল—তারপর, কতদিন থেকে এরকম 'প্রাণ' দিতে সুরু করেছেন ম'শায় ? এইটে নিয়ে ক'বার কাকে কাকে—

প্রভাময় সহসা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিল—এবারটি আমায় মাপ করুন, আর কক্ষনো...

আহা বসুনই না, অত তাড়াতাড়ি কেন ? আর কোথাও প্রাণ দেবার এনগেজমেণ্ট রেখে এসেছেন নাকি ?...

প্রভাময় স্তব্ধ, ফিরিয়া দেখিল কিশোরী দ্বারের পাশে দাঁড়াইয়া। মুখে ওকি ? সয়তানের মত ক্রূর হাসি নয়, উঃ—

যুবক সহসা আপন মনে বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল—আঃ দরওয়ানকে ঘোড়ার চাবুকটা আনতে বললুম, বেটা—

প্রভাময় কাঁদিয়া ফেলিল, যুবকের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল – দোহাই আপনার এবারকার মত—

ঠিক তো ? মনে থাকে যেন—

প্রভাময় কাঁদিয়া জানাইল মনে থাকিবে।

তবে শীগ্‌গীর পায়ে ধরে ওর ক্ষমা চা, আর 'মা' বলে···

প্রভাময় তখন সব করিতে পারে, দ্বিরুক্তি করিল না।

মেসে ফিরিয়া উপহারের জিনিষগুলা একটা কাগজে মুড়িয়া প্রভাময় হাওড়ার পুলে দাঁড়াইয়া জলে ফেলিয়া দিল। নোট বইয়ের পাতায় পাতায় বড় বড় অক্ষরে লিখিল, "নারীকে বিশ্বাস করিও না" "সন্ন্যাস ধর্ম্মই জগতে প্রধান ধর্ম্ম" ইত্যাদি...

প্রভাময় সেই দিনই 'রুম' বদল করিয়া অন্ধকার বাতাসহীন একটা ঘরে আশ্রয় লইল, জবাব দিল,—ব্রহ্মচর্য্য সাধনের পক্ষে নির্জ্জন স্থানই মনোরম।......

স্বার্থকতা

[শ্রীসরোজবন্ধু রায়]

জীবন যদি দান করিতে হয়,
　　পরের তরে করব তাহা দান।
মরণ যদি অনিবার্য্য হয়
　　যায় যেন সে বাঁচিয়ে আরেক প্রাণ।

তৃতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড] ২৫শে বৈশাখ শনিবার, ১৩৩৩। [২৪শ সপ্তাহ

THE CORNWALLIS STUDIO CALCUTTA

রৌদ্রাশ্বের তপোভঙ্গে—মহিষাসুরের প্রতি কাত্যায়নের অভিশাপ।

মহিষাসুর—শ্রীনির্মলেন্দু লাহিড়ী। কাত্যায়ন—শ্রীবিভূতিভূষণ গাঙ্গুলী। রৌদ্রাশ্ব—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (উৎসববাবু

"গোকুলের ষাঁড়"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৯)
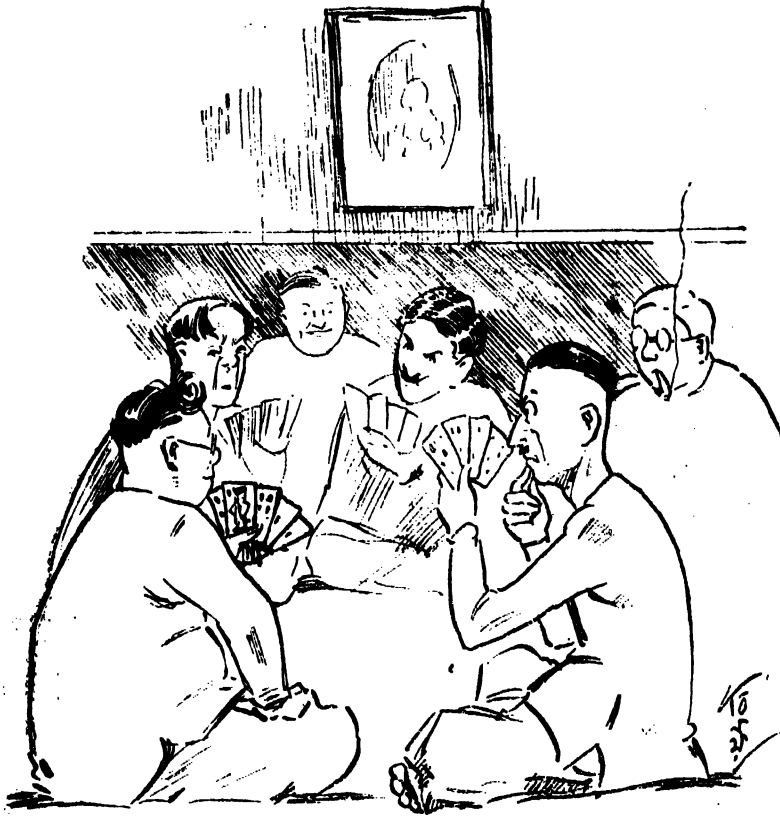
তারপরে তাস খেলার আড্ডায় রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত তাস খেলা চলে—

(১০)
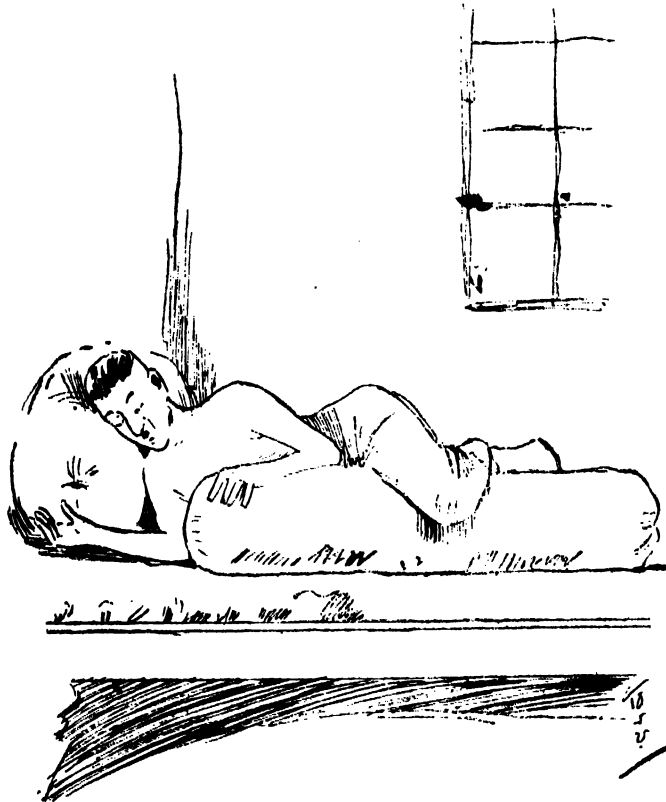
পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া থাকে কৃতার্থ করিয়া আহারাদি সম্পন্ন করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শয্যায় দেহ এলাইয়া মনের সুখে ঘুমাইয়া পড়েন।

এ রকম অনেক 'গোকুলের ষাঁড়' বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজমান!

ছন্নছাড়া

(গল্প)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(১)

গভীর রাত্রি। বিশ্ববাসী গভীর সুপ্তিতে নিমগ্ন। জাগিয়া আছে কেবল প্রকৃতি মায়ের কোলে অসীম নীরবতা। শান্ত মৌন, পল্লীবুকে প্রতিপদের ক্ষীণ চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্না-খানি যেন একটা পাতলা আবরণ বিছাইয়া দিয়াছিল। সারা দিন রাতের সমস্ত কর্ম্ম সারিয়া, খোলা ছাদের পরে মালা লইয়া আহ্নিকে বসিয়াছিলাম···সমস্তক্ষণের মধ্যে এইটুকুই হইল আমার নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবানকে আরাধনা করিবার সময়। দিনে বৈষয়িক, সাংসারিক বর্ম্মের মধ্যে প্রজাবৃন্দের নিত্য অভিযোগ, শত রকম ঝঞ্ঝাট—জপে বসিলে সমস্ত গুলাইয়া যায়—মন্ত্র ভুলিয়া যাই—শ্রীভগবানের পরিবর্ত্তে রাখাল জেলের বিধবা বউ—নির্য্যাতিতা বিধু বৈষ্ণবীর কাতর করুণ মুখ স্মৃতিপটে উজ্জ্বল হইয়া ক্রমাগত পীড়ন করিতে থাকে। আর পূজা হয় না। আহ্নিক শেষ করিয়া ললাটে হাত দিয়া গ্রামবাসীদের মঙ্গল কামনা করিয়া ঘরে যাইতে-ছিলাম—সহসা সুশীলের গলার স্বর শুনিতে পাইলাম। সে রাতের পাঠ সাঙ্গ করিয়া গুন গুন করিয়া গাহিতেছিল—

"আমারে যেন না করি প্রচার
আমার আপন কাজে
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

তার প্রাণঢালা সুরখানি আমার শোক-তপ্ত হৃদয়খানিকে মুহূর্ত্তে স্নিগ্ধ শীতলতায় ভরাইয়া দিয়া কোন অজানা প্রিয়ার উদ্দেশে আপন মনে চলিয়া গেল। বারান্দা ঘুরিয়া সুশীলের ঘরখানিতে গিয়া দেখিলাম, সে পিছন ফিরিয়া উন্মনা ভাবে গাহিয়া চলিয়াছে। চোখ দুইটি শুভ্র জলের ধারায় চক্‌চক্ করিতেছে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল এমন যার ভাই, তাহার আবার চিন্তা! আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত রাখিয়া বলিলাম—"রাত যে অনেক হ'য়েছে ভাই এখনো ঘুমাও নি?"

চমকিত সুশীল ফিরিয়া বলিল—"কে দিদি? পড়াটা এই মাত্র শেষ করলাম—হ্যাঁ দিদি কাল আমি বোধহয় কটক যাব।"

"কেন ভাই?" জিজ্ঞাসা করিলাম।

সুশীল ধরা গলায় বলিল—"অসিত চিঠি লিখেছে, সে একা সেখানকার লোকদের স্বমতে আনতে পার্চ্ছে না। আমাকে যাবার জন্তে বিশেষ অনুরোধ করেছে।"

আমি সুশীলের মাথাটি পরমস্নেহে বুকে চাপিয়া স্নেহাপ্লুত স্বরে বলিলাম—"তোমার যে সামনে পরীক্ষা আসছে ভাই।"

সুশীল অল্প হাসিয়া বলিল—"এও যে এক মহা পরীক্ষায় বিশ্বের পিতা আমাকে নিয়োজিত করেছেন দিদি—আমার কি এ একটা মহৎ কাজ নয়? যে যারা এখনও দেশের কর্ম্মে অনুপযুক্ত তাদের প্রাণে মহাশক্তি জাগিয়ে দেওয়া? জানো দিদি আমরা শিখেছি কেবল ভদ্রলোকদের বক্তৃতায় উত্তেজিত হ'তে—শিক্ষিত ভদ্রবংশধরেরা যাহাতে কাজে নামে সেই চেষ্টা কর্ত্তে—কিন্তু যারা নীচবংশ, ছোটলোক তাদের নাম বড় জোর আমরা কাগজে কলমে করি, কিন্তু যথার্থই কি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের শিক্ষিত কর্ব্বার চেষ্টা পাচ্ছি? দেশের সমস্ত বল, ভরসা ছোটলোকেরা—কেননা বাবুদের এমন শক্তি নেই যে নিজের হাতে চাষ করে ধান ফলিয়ে রেঁধে খাব—এ একটা কাজ কর্ত্তে গেলে বাবুরা আমরা এলিয়ে পড়ি,—তবে? ছোটলোকদের যদি আসল শিক্ষা দিয়ে আমরা দলপুষ্ট কর্ত্তে পারি, তাহলে তাদের দ্বারায় অনেক উপকার হবে। আমি এবার ভেবেছি দিদি যে এবার এম-এ, পাশটা আর দেব না—শিক্ষা আমার যা হয়েছে ঐ যথেষ্ট, বরং এই যে সময় নষ্ট করে রাত জেগে পড়া তৈরী

করছি, এ সময়টা যদি অন্য কাজে লাগি, তাহলে আমার সার্থক হবে—কেমন না দিদি ?"

আমি আর কী উত্তর দিব—সুশীলের সংইচ্ছার পরিচয় পাইয়া মনে মনে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ঠিক্—ঠিক্, এমনি প্রাণ ছিল আমাদের স্বর্গগত পিতৃদেবের। এমনিই পরের দুঃখে প্রাণ তাঁহারও কাঁদিত। নীরবে সুশীলের মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলাম—"সুশীল তোর ইচ্ছে সফল হোক্—যে কাজ আমাদের পিতৃপুরুষেরা অর্দ্ধসমাপ্ত করে ফেলে রেখে চলে গেছেন, সেই কাজ তুই তাঁদের বংশধর পূর্ণ কর—তাঁদের আত্মা তৃপ্ত হ'ক। সেই মহৎ কাজে তোর জীবনের সমস্ত সত্ত্বা পর্য্যবসিত হয়ে যাক—দীন দুঃখিনী পল্লী মাকে আবার শস্যশালিনী করে মুখ্য বংশ উজ্জ্বল কর—আমার এই প্রার্থনা।"

সুশীল অর্দ্ধ স্বগত ভাবে বলিল—"দিদি, বাবা আমাকে প্রায়ই বলতেন না—যে সুশীলকে আমি লেখাপড়া শেখাব না—আজ তিনি কোথায়—ওকি ? ওখানটায় অত আলো কিসের দিদি! আগুন—দিদি ওখানে আগুন লেগেছে, প্রণব কোথায়—বিশুকে শীগ্‌গীর তুলে দাও—আর একটা হ্যারিকেন চট্ করে দাও কী সর্ব্বনাশ! আমি চললুম—প্রণবকে শীগ্‌গীর তুলে দাও।"

সুশীল দ্রুতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। আমি নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় জানালার গোড়ায় বসিয়া রহিলাম। সর্ব্বগ্রাসী সর্ব্বভূকের লক্ লক্ শিখা বায়ুস্পর্শে ভীষণ আকার ধারণ করিয়া চতুর্দ্দিক গ্রাস করিতেছে। একি, এ সংহারমূর্ত্তি দেখাইতেছ প্রভু। দয়া, দয়া করো—এমন করিয়া সন্তানদের ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিও না—রক্ষা করো। সংবিৎ হারার মত বসিয়া ভাবিতেছিলাম—সুশীল নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া দেশবাসীকে বাঁচাইতে গিয়াছে—সে পুরুষ কিন্তু আমার প্রাণ কাঁদিলেও আমার যাইবার ক্ষমতা নাই—কিন্তু সুশীলও যদি আর না ফিরিয়া আসে—ইঃ, অগ্নির ঐ প্রবল তাপে যদি আমার সোনার পুতুল! ওঃ কেন তাকে ফিরাইলাম না—"সুশীল ভাইটি আমার ফিরে আয়—আমার নন্দনের পারিজাত—আয়, আয় কোলে ফিরে আয়"—পরক্ষণেই বুকের মধ্যে কে বজ্রবাণীতে বলিয়া উঠিল—"নিজের ভাইকে স্নেহের ছায়ায় আগুলিয়া রাখিয়া শত সহস্র ভাই ভগ্নিকে মৃত্যুর পথে তুলিয়া দিবে—এই তোমার দেশের প্রতি ভালবাসা!! সত্য মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম—টেবিলে সুশীলের গীতাখানি খোলা পড়িয়াছিল। পরম আবেগে গীতাখানি তুলিয়া মাথায় ঠেকাইলাম। আঃ সমস্ত ভয়, সব দুর্ভাবনা নিমেষে দূর হইয়া গেল। উঠিয়া বাহিরের দালানে আমার মানুষকরা দাসী বিরজা ঘুমাইতেছিল। তাহাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া বলিলাম—"ওঠ বিরজা শীগ্‌গীর নায়েব মশাইকে ডেকে পাইকদের নিয়ে ওপাড়ায় যেতে বল, আগুন লেগেছে—যা যা দেরী করিসনে—তোর মামাবাবু একা গেছেন আর তোর দাদাবাবুকে এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি যাঃ।"

বিরজাকে পাঠাইয়া ঘরে ফিরিয়া প্রণবকে ডাকিলাম -সে নিদ্রালস চোখ মেলিয়া বলিল—"কি মা ?"

বিশ্বনাথ—হৃদয়ে বল দাও। নিজের হাতে সন্তানকে তুলিয়া দিতেছি মরণের পথে। জোর করিয়া বলিলাম—ওপাড়ায় আগুন লেগেছে প্রণব তুমি শীগ্‌গীর যাও, সুশীল আগেই চলে গ্যাচে।"

প্রণব ঝটিতি শয্যা ত্যাগ করে আমার পায়ের তলায় বসিয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ কর মা।"

প্রণবের শীতল হাতখানি সস্নেহে বুকে চাপিয়া মনে মনে বলিলাম—"আমার আশীর্ব্বাদ কতটুকু, প্রভু নারায়ণ তুমি আমার এই শেষ ভরসা দুটিকে করুণা দৃষ্টিতে দেখিও।

(২)

রাত কোথা হইতে পোহাইয়া গেল। আবার উঠিয়া জানালার নিকটে দাঁড়াইলাম তখন আগুন নিভিয়া গিয়াছে। বঙ্গ জননীর কোমল বুকের পরে কাল যে ভীষণ দানব কঠিন চরণ চিহ্ন আঁকিয়া জয়োল্লাসে সমস্ত গ্রামখানি ধ্বংস করিয়া শ্মশান করিয়া গিয়াছে, বুঝি সেই মহা ক্ষতির জন্য সারা আকাশ ছাপিয়া করুণার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে। শীকর সম্পৃক্ত বাতাস আসিয়া আমার উদ্বেলিত চিত্তে সান্ত্বনার পরশ দিয়া দিল। অবসন্ন দেহখানি টানিয়া কোনরকমে স্নান সারিয়া আসিয়া দাঁড়াইতেই বিরজা হাঁফাইতে হাঁফাইতে

আসিয়া খবর দিল "মা ! দাদাবাবুকে আর মামাবাবুকে নায়েব মশাই খুঁজে পেলনা সে একাই ফিরে এলেছে।" "সে কিরে ?" বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। বলিলাম নায়েব মশাইর কি আক্কেল বাবুদের সঙ্গে না এনে একলা বাড়ী ফিরে এসেছেন ? বলগে তাঁকে আমার আদেশ যেন এক্ষুণি তাদের খোঁজে বেরুতে। বিরজা চলিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে ফিরিয়া সংবাদ দিল—নায়েব মশাই বিশুকে নিয়ে গ্যাছে। আর হিরু ঘোষাল আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেছে।"

আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম—"যত সব জ্বালাতন কি এই সকালেই ? আমি এখন পার্থনা—বলগে যা এখন সময় নেই দেখা কর্ব্বার।"

"সময় নেই বল্লে তো চলবে না মা লক্ষ্মী—প্রজাদের আপদ বিপদ তুমি না দেখলে কে দেখবে—এই যে মার স্নান সারা হ'য়ে গ্যাছে—তাহলে কি কথাটা শুনবে মা ?"

কী মুস্কিল—বাড়ীতে কেহ কি নাই ! ইহাকে অন্দর মহলে ঢুকিবার সাহস কে দিল ? শশব্যস্তে মাথায় কাপড় টানিয়া দরজার পাশে দাঁড়াইয়া বিরজাকে বলিলাম—আমার এখন কোন কথা শোনবার সময় নেই মন বড় খারাপ হ'য়ে রয়েছে ওঁকে এখন যেতে বল বিরজা।"

হীরু ঘোষাল আমার সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে বলিল—"দাঁড়াও মা কথাটা শুনেই যাও, তোমরা জমীদার বলে কি আমাদের গাঁয়ের বৌ ঝিদের নিয়ে বাস করতে দেবে না ?"

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইতেছিলাম, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলাম—"কী আপনার কথাটা বলেই ফেলুন না, অত ভণিতার কোন আবশ্যক নেই।"

হীরু ঘোষাল রেলিংএ পিঠ দিয়া বলিল—"ছোটবাবু কোথায় ?"

ছোটবাবু অর্থে সুশীল ! বলিলাম "সে খবরে আপনার প্রয়োজন আছে কি ?"

"খুব প্রয়োজন আছে, তোমার ছোট ভাই—" হীরু ঘোষাল আমার শঙ্কা বাড়াইয়া মধ্য পথে থামিয়া গেল। আমি ভুলিয়া গেলাম হীরু ঘোষাল সামান্য প্রজা, তার কাছে আমার ব্যাকুলতা প্রদর্শন উচিত হয় না। উদ্বেগ কাতরস্বরে বলিলাম—"সুশীল, সুশীল কি করেছে আপনাদের ?"

"কালকের সেই আগুন লাগার পর হ'তে প্রিয় চাটুজ্জের বিধবা মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

উচ্চস্বরে বলিলাম—"তাতে আমার কি—তার জন্যে সুশীল কি দায়ী ?"

"দায়ীই তো, সেই তো তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গ্যাছে।"

"মুখ সামলে কথা বলবেন ঘোষাল মশাই—ছোট মামার নামে খবর্দ্দার অভিযোগ আনবেন না, যান এখান থেকে সরে পড়ুন, না হ'লে অনধিকার প্রবেশের জন্য আপনার নামে "কেস্" আনব।"

আঃ সম্মুখে তাকাইয়া দেখিলাম প্রণব সহাস্যে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। বুক আনন্দে পুরিয়া উঠিল।

হীরু ঘোষাল বলিল—"কেন হে ছোকরা, তোমাদের জমীতে বাস করছি বলে ন্যায় অন্যায়ও বলতে পারব না ! হুঁঃ, কথায় কথায় অমন "কেস" আনা এই বুড়ো হীরু ঘোষাল ঢের দেখেছে।"

আমি স্বরে জোর দিয়া বলিলাম—"বাজে কথা ছেড়ে প্রণব ওঁর কি বলবার আছে জেনে নাও। অনর্থক সময় নষ্ট করতে পারি না।"

হিরু ঘোষাল প্রণবের দিকে চাহিয়া বলিল—"সেই কথাটাই তো বলতে এসেছি, প্রথম থেকে শোন। কাল বিকেলে কল্যাণীর সঙ্গে ছোটবাবু কথা বলছিলো তা আমার নাতি বিন্দু দেখেছে। সেই সময় ওদের কথাবার্ত্তা ঠিক হয়েছিল বোধ হয়, কালকে ঐ গোলমালে ছোটবাবু কল্যাণীকে নিয়ে…"

প্রণব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বজ্রনাদে বলিয়া উঠিল—"থামুন—থামুন ঘোষাল মশাই, বয়সের দিকে একটু লক্ষ্য রেখে মিথ্যে কথাগুলো বলবেন।"

আমিও তীব্রস্বরে বলিলাম—"কী আমার দেবতুল্য ভায়ের নামে হীন দোষারোপ ! কে দেখেছে তাকে কল্যাণীকে নিয়ে যেতে ?"

হিরু ঘোষাল দমিল না বলিল—"আমার ছেলে কিশোর।"

"ঘোষাল মশাই—মিথ্যে কথাটা বলতে আপনার একটুও লজ্জা আসছে না ?"

"মিথ্যে ! সেকি হে, হরি হরি—কখনও আমি মিথ্যে কথা বলেছি।"

প্রণব হীরু ঘোষালের সামনে দাঁড়াইয়া রক্ত চক্ষু ঘুরাইয়া বলিল—"দাঁড়ান, আপনার বড় ছেলে হিরণ আপনার কোথায় ?"

হীরু ঘোষাল থতমত খাইয়া আমতা আমতা করিয়া বলিল—"অ্যাঁ, অ্যাঁ, সে তো এখানে নেই, পরশু দিন সে কলকাতায় ফিরে গ্যাছে।"

প্রণব একেবারে ফাটিয়া পড়িল—"ভণ্ড, জুয়াচোর আপনি, এ সব সাজানো কথার একটি বর্ণও সত্যে মিশান নয়। হিরণকে কাল প্রিয় চাটুজ্জের বাগান বাড়ীর দিকে ঘুরতে ছোট মামা আর আমি নিজের চোখে দেখেছি ওঃ এতক্ষণে বুঝলাম, এ কাজ তা হ'লে তারই। ওঃ কাল যদি জানতুম—তা হ'লে ঐখানেই ওর মানব জন্ম শেষ করে দিতাম। যান, এখনি চলে যান, জুয়াচুরী করবার আর জায়গা পান নি ?"

হীরু ঘোষাল হাতমুখ নাড়িয়া বলিল—"আরে তোমাদের পাল্লায় পড়ে আমি না হয় জুয়াচোরই ব'নে গেলাম, কিন্তু তোমার ধার্ম্মিক প্রবর মামা কোথায় বার কর দেখি ?"

"কি হয়েছে দিদি, বাড়ীতে এত গোলমাল কেন ? একি ঘোষাল মশাই যে প্রণাম। কাল রাত্তিরে যে বিন্থু বললে—দাদামশাই বর্দ্ধমানে গ্যাছেন, তা এর মধ্যে এলেন কিসে এরোপ্লেনে নাকি ?"

হীরু ঘোষাল সম্মুখে সুশীলকে দেখিয়া গুটাইয়া কেঁচোর মত হইয়া সভয়ে বলিল—"অ্যাঁ—তা; তা কি জানি, বিন্থু ছেলেমানুষ, তাই কি বলতে কি বলেছে—তা বাবা আমি তো ঘরেই ছিলুম, বয়স বাড়ছে তো—বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হ্যাঁ যাই এখন আমি, দীননাথ তুমিই সত্য।"

প্রণব হীরু ঘোষালকে উল্টা সুর গাহিতে দেখিয়া ফিক্ করিয়া হাসিয়া হীরু ঘোষালের পথরোধ করিয়া ব্যঙ্গ সুরে বলিল—"দীননাথ আর কই সত্য হ'ল আপনার ঘোষাল মশাই ? মামাকে যে চাক্ষুষ দেখিয়ে দিলেন, মামলাটা তো সাজিয়ে ছিলেন খুব ভাল করে, এখন পালাচ্ছেন কোথায় ? আসামী হাজীর তো, এইবার আর একবার কথাটার পুনরাবৃত্তি করুন ?"

সুশীল টবের জলে হাত ধুইতে ধুইতে বলিল—"কিহে প্রণব, হীরু ঘোষাল মশাই কি বলতে এসেছেন ? কে আসামী এল এর মধ্যে !"

প্রণব বলিল—"তুমি ! জান ছোট মামা, ইনি মাকে বলতে এসেছেন তোমাকে শাসনে রাখতে।"

"আমাকে ! সে কি !"

"বল কেন—তুমি নাকি প্রিয় চাটুজ্জের বিধবা মেয়েকে লুকিয়ে রেখেছো ?"

স্বভাব বিরুদ্ধ উত্তেজনায় সুশীলের গৌরবর্ণ মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। 'সাবধানে কথা বলবেন ঘোষাল মশাই, জানেন আপনি একজন সামান্য প্রজা—ইচ্ছে করলে আপনাকে এ গাঁ হতে দূর করে দিতে পারি ? কল্যাণীকে যদি কেউ লুকিয়ে থাকে—তা হলে সে আপনার বড় ছেলে হিরণ। সে বদমাইসের শিরোমণি—তার গুণ তো এ পাড়ায় কারুর জানতে বাকী নেই।

হীরু ঘোষাল এতটুকু হইয়া বলিল—"আর তুমি যে কাল সন্ধ্যার সময় সদরের ঘাটের ধারে কল্যাণীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলে ? জানত বাপু শাস্ত্রে লেখা আছে..."

"রাখুন আপনার শাস্ত্র-পুঁথি তুলে। শাস্ত্রে আছে বিধবার সঙ্গে মাতৃভাবে কথা কইলে নরকে গমন। আর তাকে অসহায়া পেয়ে অপহরণ করলে স্বশরীরে স্বর্গলাভ—এই তো আপনার শাস্ত্রের ব্যাখ্যা। খুব পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন যান, এটা মিত্তিরদের চণ্ডীমণ্ডপ নয় যে পরচর্চ্চা করতে এসেছেন। এখন আস্তে আস্তে পথ দেখুন, না হ'লে ভাল হবে না ?"

"কেন হে মারবে নাকি ?"

সুশীল হুঙ্কার দিয়া বলিয়া বসিল—"প্রণব ঘোষাল মশাইয়ের হাত ধরে বাইরে বের করে দিয়ে এস। যাও ভ্যাগাবণ্ড কোথাকার।"

আমি সুশীলকে টানিয়া বলিলাম—"করিস্ কি সুশীল—ব্রাহ্মণ যে, বিশেষ আত্মীয়।"

সুশীল হীরু ঘোষালের হাতটা সজোরে নাড়িয়া ছাড়িয়া দিল। হীরু ঘোষাল রক্তমুখে যাইতে যাইতে বলিল—"উচ্ছন্ন যাবে—বিষয় সম্পত্তি সব উড়ে পুড়ে যাবে, আমার গায়ে হাত তোলা! কিন্তু মনে করো না সুশীল যে তোমার গাঁ ছাড়া আর আমার একটু জায়গা মিলবে না; ঢের অমন জায়গা মিলবে। হে—হা সাধ করে আর লোকে স্ত্রীলোকের জমীতে বাস করে না! এখানে বিচার আছে কি? আচ্ছা—!"

(৩)

নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুশীল বলিল—"এখন এর উপায় কি দিদি?"

আমি বলিলাম—"কিসের উপায় সুশীল?"

সুশীল বিরস ভাবে বলিল—"কল্যাণীকে উদ্ধার করা বিষয়ে..."

আমি চিন্তিত ভাবে বলিলাম—"সে যদি ইচ্ছে করে গিয়ে থাকে সুশীল, তা হলে কোথা হতে তুমি তাকে খুঁজে বার করবে?"

"কক্ষণো এ হতে পারে না দিদি, সে সে রকম মেয়েই নয়। হিরণের অনেক দিনের আক্রোশ ছিল—জান তো, প্রিয় চাটুজ্জে মুর্খ বলে ওর হাতে কল্যাণীকে দেয় নি। সেই ঝালটা এখন কল্যাণীর পরে' ঝেড়ে শোধ তুলেছে। এখন এর উপায় তো আমাদেরই করা দরকার?"

আমি সুশীলের গায়ে হাত রাখিয়া বলিলাম—"এই তো এত খেটেখুটে এলি ভাই, এখন একটু জল-টল খেয়ে বিশ্রাম করে পরে যা হয় কর।"

"দিদি আমার খাওয়াটাই কি এত বড় হলো? জমীদার আমরা—আমাদের চোখের ওপরে যে একজন নিরাশ্রয় স্ত্রীলোককে নিয়ে পাপিষ্ঠরা পালাবে, এ কক্ষণো হ'তে দেব না। আমি চললুম, কল্যাণীকে খুঁজতে, আর প্রণব তুমি দেখো হীরু ঘোষাল যেন আজ সন্ধ্যের সময়, বা তার মধ্যে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে যায়—কোন ওজর তার শুনো না।"

সুশীলের হাত ধরিয়া আমি বলিলাম—"অতটা উত্তেজিত হয়ো না ভাই? হীরু ঘোষাল দোষ করেছে; তার শাস্তি দেবার অধিকার আমার বা তোমার নেই। যিনি দেবার মালিক, তিনিই দেবেন। তবে হীরু ঘোষাল তোমার গ্রামে কলঙ্ক চাপিয়েছে বলে তোমার রাগ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু তা বলে কি আজ একটা রাগের ফলে একজনকে ভিটে হতে তাড়াতে পারি? এতে যে তার অভিশাপ লাগবে আমাদের সুশীল। কিছু করতে হবে না। দেখো এর ফলভোগ ও করবেই—। আচ্ছা একটু দাঁড়া ভাই আমি একটু জলখাবার নিয়ে আসি। প্রণবও বা হাতমুখ ধুয়ে ফেল আমি খাবার এনে দি।"

সুশীল দাঁড়াইয়া বলিল—"নাঃ, খাবার খেতে সময় লাগবে—তার চেয়ে এক কাপ চা যদি দিতে পার, তা হলে ভাল হয়।"

* * * *

"দিদি।"

চমকাইয়া সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দিলাম—অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে—স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না। কে! কণ্ঠস্বরটা যেন ধরা ধরা ভারী বলিয়া মনে হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে গা?"

"দিদি গো আমি কল্যাণী।" পলকে আমার পা দুখানি চাপিয়া কল্যাণী বসিয়া পড়িল। বলিলাম—"কল্যাণী তুই মরিস্‌নি? হতভাগী নরক থেকে কি কর্ত্তে ফিরে এলি—আমাদের নিষ্ঠাপূর্ণ সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালাতে?"

দিদি, দিদি, আমাকে তোমার কাছে একটু আশ্রয় দাও—আমি অপবিত্রা নই পাপিষ্ঠ হিরণের হাত হতে মুক্তি পেয়ে চলে এসেছি—আমার বাড়ী ঘর আমার ছোট ভাই সতীশ…। কল্যাণী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। হায় অভাগী তারা কি তোর আছে, কালকের সে আগুনের কবল হতে কাউকে রক্ষা কর্ত্তে পারিনি। কল্যাণীর ক্রন্দনে আমার মাতৃহৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। দূর হইতে তাহার মুখখানি দেখিয়া লইলাম—বড় করুণ—বড় পবিত্র বলিয়া বোধ হইল। ঈশ্বরকে বলিলাম—"পাপ পুণ্যের হিসাব তুমি ক'রো—কিন্তু এ সর্ব্বস্বহারা নির্য্যাতিতা অভাগীকে আমি ছাড়তে পার্ব্ব না। অপরাধ নিও না প্রভু। কল্যাণীর হাত ধরিয়া সস্নেহে তুলিয়া বুকে ধরিয়া বলিলাম—"আয় উঠে আয় কল্যাণু—তোর জন্যে পোড়ারমুখী আমার আজ মুখে অন্ন

যায় নি, সুশীল তো কখন তোকে খুঁজতে বেরিয়েছে এখনও আসে নি।"

কল্যাণীর ঠোঁট দুখানি কাঁপিয়া উঠিলো—মাথা নত করিয়া বলিল—"তিনিই আমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন।"

"কে সুশীল! সে কেমন করে তোর দেখা পেল?"

"আমাকে নিয়ে ওরা ষ্টেশনের পথে যাচ্ছিল; মামাবাবু আর দাদাবাবু গিয়ে হিরণের মাথায় লাঠি মেরে আমাকে ছিনিয়ে বাড়ীর পথে নিয়ে এসেছে।

পুত্র ও ভ্রাতার গৌরবে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল। কল্যাণীকে বলিলাম—"তুই যা, ভেতর বাড়ীর পুকুরে স্নান করে আয়। আজ তো সমস্ত দিন খাওয়াই হয় নি। আমি যাই দেখি পাগলটা গেল কোথায়।"

(৪)

সুশীলের কথা

কল্যাণীকে সঙ্গে করিয়া দিদির কাছে পৌঁছাইয়া চুপি চুপি নিজের ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলাম। মনের মধ্যে অনেক কথা ভিড় করিয়া দাঁড়াইতেছিল। সহসা মাথায় কাহার স্নেহের পরশ অনুভব করিয়া চোখ চাহিয়া দেখিলাম যে দিদি আমার মাথায় পরম স্নেহে আঙুল চালাইতেছেন। আমাকে চাহিতে দেখিয়া দিদি বলিয়া উঠিলেন—"সুশীল, সুশীল, বুকের রক্ত খাইয়ে তোকে মানুষ করা আজ আমার সার্থক হ'লো। যথার্থই তুই আমার মুখ রাখলি। যে পুরুষ নারীর সম্মান রাখতে বা তাকে বিপদ হ'তে রক্ষা করতে না পারে—তার সমস্ত শিক্ষা, দীক্ষা বৃথা! নারী আমাদের জননী। জননীকে অপরের করে লাঞ্ছিতা দেখেও যারা নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকে তাদের শতবার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। আজকাল মুখে সবাই ফাঁকা আওয়াজ করতে পারে—এ করব, ও করব কিন্তু কাজে ক'জন করে ভাই। কিন্তু তুমি আমার ভুল ধারণা ভেঙ্গে দিলে। কিন্তু কল্যাণীকে হিরণের হাত হ'তে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ এর জন্তে গ্রামে হয়ত বিদ্রোহ উপস্থিত হ'তে পারে, যেহেতু হিরণরা এখন শরৎ চৌধুরীর জমীতে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া আছে জান তো?"

আমি ছোট ছেলেটির মত দিদির কোলে মাথা রাখিয়া বলিলাম—"হোক্ বিদ্রোহ উপস্থিত; তোমার আশীর্ব্বাদের জোরে সব বাধা, বিপদ তুচ্ছ করি আমি।"

"আমার আশীর্ব্বাদ! না সুশীল, তাঁর আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর।" দিদির কোলেই সে রাতটা কাটাইলাম। পরের দিন সকালে বারান্দার প'রে চেয়ার টেনে বসিয়া ছিলাম। মন চঞ্চল। দৃষ্টি বিভ্রম। আগেকার মত উড়ো কথা মনে পড়িতেছিল। কল্যাণী! ঐ কল্যাণী তো আমারই হইতো, কিন্তু হইল না। তাহার প্রধান কারণ আমরা বড়লোক। আমরা জমীদার—আর কল্যাণী দরিদ্র গৃহস্থ কন্যা। দিদি ভাবিয়াছিলেন আমার জন্য কোন রাজপুত্রী অর্দ্ধেক রাজত্ব আর সোণার বরণ লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মাতৃহীন আমি, দিদিকেই মা বলিয়া জানিতাম। তাঁর অমতে কোন কাজ করিতে সাহস হইল না। শুভ লগ্নে কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গেল এক অশীতি বর্ষের বৃদ্ধের সহিত। তারপর মাসখানেক পরে একদিন দেখিলাম, সিঁথির উজ্জ্বল সিঁদুর কল্যাণীর ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে—অদৃষ্টের কঠোর সত্য অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। আজ কল্যাণী পরস্ত্রী, বি-ধ-বা! আবার ভাগ্যচক্রে সে আমারই আশ্রয়ে আসিয়া স্থান লইয়াছে। "পরদারেষু মাতৃবৎ" এটা অন্যের উপর ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু যে কল্যাণীকে আজন্ম ভালবাসিয়া আসিয়াছি, তাহাকে কি বলিয়া মাতৃবৎ দেখিব— ইহাতে কি আমার পাপ হইবে না? কিন্তু একি? এতদিন তো এ সব ভাবনা ছিল না। আজ কল্যাণীকে একেবারে নিকটে পাইয়া কি মনের কলকব্জাগুলা শিথিল হইয়া পড়িল? ছিঃ! সহসা চোখ পড়িল সম্মুখে—শ্যাওলাভরা পিচ্ছল পথের বুকে রক্ত চরণের ছাপ আঁকিয়া সদ্যস্নাতা সিক্তবেশা কল্যাণী বাড়ী ফিরিতেছিল। চলন্ত প্রতিমার পরে আমার অবাধ্য দৃষ্টি পড়িয়া স্থির হইয়া রহিল—

"ওগো আমার মাটীর স্বর্ণ মাথায় রাখি তোমার চরণ,
হওনা মাটি সোণা খাঁটি তুমি আমার জীবন মরন।"

"ছোটমামা,—মাটিকে যদি যথার্থই মা-টি গ'ড়ে তুলতে পারি,—তবেই আমাদের এত প্রচেষ্টা সার্থক; না?"

লজ্জিত ভাবে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলাম—প্রণব ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বারান্দায় ষ্টোভটা লইয়া চায়ের যোগাড় করিতেছে। খবরের কাগজখানা তুলিয়া আগেকার লজ্জাটা ঢাকিতে চেষ্টা পাইলাম। প্রণব ষ্টোভে পেট্রল ঢালিয়া বলিল—কলকাতায় যাচ্ছ কবে ছোটমামা?"

"কে আমি—দেখি। নাঃ আজই যাই কি বলিস্ প্রণব—কাজগুলো বড় পিছিয়ে পড়ছে, না?"

তাইত, প্রণব ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছে। চা খাইয়া দিদির সন্ধানে নাবিয়া গেলাম। দিদি তখন ভাঁড়ার বাহির করিতেছিল। দিদির কাছেই কল্যাণী বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল। অসাবধানবশতঃ জুতা পরিয়াই ভাঁড়ার ঘরে ঢুকিতে যাইতেছিলাম। দিদি বাধা দিয়া বলিল—"সুশীল জুতোটা ছেড়ে আয়।"

"ওঃ" বলিয়া জুতা খুলিয়া দিদির কাছে গিয়া বলিলাম—"আজ বারোটার ট্রেণে চললুম দিদি।"

"কোথায় রে?"

আমি বলিলাম—"কলকাতায়।"

"এরি মধ্যে!"

"আবার এরি মধ্যে কি দিদি, অনেকদিন যে এসেছি আর দেরী করলে ভয়ানক ক্ষতি হবে, সব গুছিয়ে দিও।"

জুতোটা পরিতে পরিতে একবার কল্যাণীর মুখের পানে তাকাইলাম। চোখে চোখ পড়িতেই সে ঝুঁকিয়া পড়িল। বোধ হয় আর একটু ঝুঁকিলে বঁটীর ঘাড়েই পড়িত। আমি তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া ট্রাঙ্ক গুছাইতে বসিলাম।

(৫)

কলিকাতায় আসিয়া নূতন করিয়া আমার আরব্ধ কর্ম্মে মন দিলাম। নাঃ কিছুতে তেমন করিয়া মন লাগে না। অথচ সকলই সেই পূর্ব্বের নিয়মএ চলিতেছে তথাপি কী যেন একটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। মনকে প্রশ্ন করিয়া কোন সদুত্তর পাইলাম না। আঃ একি হইল আমার! শেষে কি কল্যাণীর চিন্তা আমাকে পাইয়া বসিল না কি? তবে কি আমার পবিত্র মন পাপের আবিলতায় পূর্ণ হইয়া অশুচি হইয়া উঠিবে? আজ প্রায় পাঁচ মাস হইতে চলিল বাড়ী যাই নি। এর মধ্যে প্রণব আর দিদির কাছ হইতে অগণিত পত্র পাইয়াছি। কোনখানার জবাব হয়ত দিতেই ভুলিয়াছি। আবার কোনখানার জবাব হয়ত অতি সংক্ষেপেই সারিয়া দিয়াছি। শেষের চিঠিখানায় প্রণব লিখিয়াছে "কল্যাণী দিদির আশ্রয়ে খুবই সুখে আছে, বোধ হয় আমার প'রেও মা'র অত দৃষ্টি আজকাল নাই। কল্যাণীই আজকাল মা'র সর্ব্বস্ব ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কুক্ষণে তুমি কল্যাণীকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলে ছোটমামা—ও আসিতে আমি মায়ের স্নেহ হারাইতে বসিয়াছি। আর একটা নূতন খবর তোমায় দিতেছি। হিরণ—সেই পাপিষ্ঠ হিরণ কলেরায় মারা পড়িয়াছে, বেশ হইয়াছে—বৎসরও ঘুরিল না। দোষীকে সমুচিত দণ্ড বিধাতা দিয়াছেন। সেই হীরু ঘোষাল আসিয়া মা'র আর কল্যাণীর দু'টা পা জড়াইয়া বলিয়াছিল—"রক্ষা কর মা, তোর সন্তানকে মার্জ্জনা কর। আশীর্ব্বাদ কর, যেন হিরণ আমার বেঁচে ওঠে।" জান ছোটমামা-মা আর কল্যাণী গিয়ে হিরণের শেষ অবস্থায় খুব সেবা করিয়াছে। তুমি এবার পত্রপাঠ আসিও-দেখিবে এখানে আমি কত উন্নতি করিয়াছি।" ইত্যাদি—কিন্তু হিরণের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আমার ভারী দুঃখ হইল। আহা বেচারী...!"

* * * *

এখানের কাজ পুরাদমে চলিতেছিল। সহসা বাড়ী হইতে টেলিগ্রাফ আসিল—"দিদি পীড়িতা, অবস্থা শোচনীয়।" লেখক প্রণব। এতদূর হইল! আত্মানুশোচনায় মন ধিক্কার দিয়া বলিল—"অকৃতজ্ঞ, নরাধম, কল্যাণময়ী দিদির শেষ সময়েও একবার উপস্থিত হইবি না?" সত্য, দিদির প্রতি আমি কতটুকু কর্ত্তব্য করিয়াছি? প্রণব এখনও ছেলেমানুষ। সংসারের যত ঝড়, ঝাপটা উঁহার মাথায় ফেলিয়া একটা রমণীর জন্য ভয়ে ভয়ে মরিতেছি। নাঃ আর না, এইবার দিদির কাছে গিয়া ক্ষমা চাহিব। কিন্তু তিনি কি ক্ষমা করিবেন? আমার এ স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের কি মার্জ্জনা আছে?

(৬)

ছায়া ঢাকা পল্লীবুকে তরুণ রবির প্রথম আলোক সম্পাত

সোণালী আল্পনার মত ঝরিয়া পড়িতেছিল। শঙ্কা দোদুল মনে বাটীর দুয়ার খুলিলাম। একি সুদূর দিগন্তের পানে অধীর আঁখি মেলিয়া কল্যাণী কাহার আশায় দালানের প'রে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিয়াছে? কে সে ভাগ্যবান! সে পলকহারা দৃষ্টি দেখিয়া হৃদয় মাঝে কোন অব্যক্ত বেদনার বিপুল বাণী গুমরিয়া উঠিল। আমার পদশব্দে তাহার সচেতন মন সচকিত হইয়া উঠিল। আগ্রহভরে প্রশ্ন করিলাম —"দিদি কেমন আছে কল্যাণী?"

কল্যাণী কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল—"ভালই, যান পূজোর ঘরে।"

"পূজোর ঘরে যাবো কি, কল্যাণী তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছো?"

বর্ষার আকাশ খানির মত তার প্রফুল্ল মুখখানি ম্লান হইয়া উঠিল। সে বিকল চিত্তে বলিল—"আপনাকে ঠাট্টা করবো আমি?"

কল্যাণী আর তথায় অপেক্ষা করিল না। আমিও সেই অবস্থায় পূজা গৃহের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাইতো, দিদি স্নান করিয়া পূজার ফুল চন্দন গুছাইতেছেন যে! তবে চেহারাখানি বড় রোগা রোগা মনে হইল। বাহিরেই বসিয়া ডাকিলাম -"দিদি—"

"সুশীল! এসেছিস্ ভাই—" দিদি উঠিয়া দেবতার চরণ-পূষ্ট নির্ম্মাল্য লইয়া আমার মাথায় ঠেকাইয়া হাসিমুখে বলিলেন—"ভাল আছিস তো?"

আমি ততোধিক বিস্মিত স্বরে বলিলাম—"তবে অসুখ নয়! প্রণব যে চিঠি লিখেছিল, তারপর আজ টেলিগ্রাফ গেল—কী ব্যাপার দিদি?"

দিদি হাসিয়া বলিল—"না এরকম করলে কি তুই আসতিস?"

অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেলাম। দিদি আমায় সকরুণ ভাবে বলিল—"তোর কি কোন অসুখ করেছে সুশীল?"

আমি ক্লান্তভাবে বলিলাম—"না দিদি।"

"তবে ওপরে বা, আমি ধ্যানটা সেরে এখনি তোর কাছে যাচ্ছি, বিশেষ দরকারী কথা আছে।"

এই বিশেষ দরকারী কথাটা কী ভাবিতে ভাবিতে উপরে উঠিয়া আমার কতদিনের পরিত্যক্ত ঘরখানিতে গিয়া দাঁড়াইলাম। ঘরখানি তেমনিই সাজানো গুছানো রহিয়াছে— যেন কাহার পুণ্য শুচি-শুভ্র কোমল হাতের পরশে তাহার নূতন করিয়া শ্রী ফিরিয়া আসিয়াছে। এ ছন্নছাড়ার অগোছাল ঘরখানি যে কাহার ছোঁয়ায় প্রাণ পাইয়াছে, বুঝিতে বিলম্ব হইল না। শ্রদ্ধায় মন ভরিয়া উঠিল। বই দুখানা ফেলিয়া জামা কাপড় ছাড়িতেছিলাম। সহসা দিদি আসিয়া একখানি ফটো আনিয়া আমার হাতে দিল। ফটোতে একটি সুন্দরী কিশোরীর অলেখ্য চিত্রিত ছিল। বলিলাম—"কে, এ দিদি।"

দিদি গর্ব্বের সহিত বলিল—"তোর ক'নে পছন্দ হয়— না, এবারে না বল্লে শুনছি না—চিরকালই এমনি ঘুরে ঘুরে বেড়াবি—ঘরবাসী হবি নে? আমি তো কোন দিন আছি, কোন দিন নেই সুশীল—তোদের দুটোকে তবু সংসারী করে রেখে গেলে নিশ্চিন্তে মর্ব্বো।"

আমি হতভম্বের মত বলিলাম—"না না দিদি এ হতে পারে না—এ হবে না।"

"কি হবে না সুশীল?"

"না দিদি আমি বিয়ে করে ঝঞ্ঝাট জড়ো কর্ব্বো না— বেশ আছি আমরা ভাই বোনে—কেন ওসব জঞ্জাল?"

দিদি ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—"মেয়েটি বেশ রে বড় লক্ষ্মী— না হয় তুই একবার দেখে আয়না?"

"না দিদি তোমায় অনুনয় করে বলছি ওসব মেয়ে ফেয়ের কোন দরকার নেই—তাহলে আমি চললুম।"

আমার দৃঢ় কণ্ঠস্বরে আপত্তির লক্ষণ দেখিয়া দিদি ফটো-খানি তুলিয়া মলিনমুখে প্রস্থান করিল।

(৭)

শুধু কলিকাতার ঘেরা গণ্ডীর মধ্যে মন টিকিল না। সীমার মাঝে বদ্ধ মন আমার কেবলি হাঁফাইয়া কাঁদিয়া বলিল—"আগে চল—আগে চল ভাই।" সঙ্গী ও সহকর্ম্মীদের প্ররোচনায় একদিন আবশ্যকীয় জিনিষপত্র ছোট ট্রাঙ্কটিতে বোঝাই করিয়া বিদেশে বাহির হইলাম। দিন কতক খুব জলন্ত ভাষায় লেকচার দিয়া, ঘুরিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া বাসায় আসিতেই চাকর হরিচরণ আমাকে একখানি খামে

খোলা পত্র দিল। দাঁড়াইয়া পত্র বাহির করিয়া চোখ বুলাইতেই মাথার পরে যেন বজ্র ভাঙিয়া পড়িল। দিদি, দিদি আর এ জগতে নাই। "চলে গ্যাছে!" অপূর্ণ সাধ আশা বুকে লয়ে আমার দিদি কি অভাগা ভাইটির পরে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে? হরিচরণের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির পরে চাহিয়া তাহাকে আবেগে জড়াইয়া হাহাকার করিয়া বলিলাম—"হরিচরণ, ভাই, আজ তুই আর আমি একসঙ্গেই মাতৃহারা হ'য়েছি রে।"

* * * *

দীর্ণ হৃদয়ে বাড়ী আসিয়া প্রথমেই দেখিলাম—উঃ, এই কি আমাদের চির-শান্তিময় ভবনখানি। এ যে প্রতিমার বিসর্জন হইয়া গিয়াছে—শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ হাহা খাঁ খাঁ করিতেছে—সব শূন্য! একের অভাবে আজ সারা বাড়ীখানি মর্ম্মবেদনায় নীরবে কাঁদিতেছে! অবশ চরণ দুইটাকে টানিয়া দিদির ঘরে আসিয়া বুকভাঙা বেদনায় সংবিৎ হারাইলাম।

কাহার মমতাভরা সেবায় চোখ মেলিলাম—একি এ কার কোলে শুয়ে আছি, দিদি কি! নাঃ দিদিকে কোথায় পাইব—কিন্তু না—আর দেখিতে চাহি না—যেই হোক্ এ পরশ আমাকে বড় সান্ত্বনা দিতেছে। আস্তে আস্তে আমার মাথাটা মাটিতে নামিয়ে উঠিয়া কল্যাণী বলিল—"সুশীলবাবু ভাঙা মন্দিরে আজ কী দেখতে এসেছেন।"

কল্যাণী ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম—"প্রণব কোথায় জান?"

"জানি, সে এখানে নেই করাচীতে গ্যাছে।"

"করাচীতে, কেন এখানে কি তার পয়সার কোন অভাব হ'য়েছিল? দিদি জানতেন?" কল্যাণী ঘাড় নাড়িল। আমি বলিলাম—"এসব বিষয় সম্পত্তি!"

কল্যাণী বলিল—"সমস্ত আপনার নামে দিদি করে গ্যাছেন।"

আশ্চর্য্য মানুষের মনের গতি! এই প্রণব যে এরকম হইবে স্বপ্নের অতীত! মাথা গুজিয়া বলিলাম—"কেন আমাকে ডাকতে এসেছ কল্যাণ—আমি এখানে বড় শান্তিতে শুয়ে রয়েছি আমি উঠবো না—তুমি যাও।"

পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে বিরজা দাসী আসিয়া বলিল, "ওগো ছোট দাদাবাবু গো—তোমাকে পুলিশের লোক ডাকতেছে গো।"

"পুলিশের লোক সে কিরে?" আমি উঠিয়া বসিলাম। বিরজা বলিল—"হ্যাঁগো দাদাবাবু পুলিসে একেবারে চাদ্দিক ঘেরাও করেছে—মাগো, এ কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো—তুমি যেওনি দাদাবাবু পালাও।"

"পালাব কিরে কি করেছি আমি।" আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে উঠিয়া বাহির বাড়ীতে আসিয়া দেখি, সত্য সত্যই মহাপ্রভুরা স্বয়ং আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে। আমি যাইতেই ইন্সপেক্টর উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"সুশীলকুমার মুখার্জী কার নাম বাবু?"

আমি বলিলাম—"কেন, আমারই নাম।"

"আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে—আমি আপনাকে অ্যারেষ্ট করলাম।"

"আমার নামে ওয়ারেণ্ট কেন অপরাধ?"

"অপরাধ রাজদ্রোহ।"

"আমি রাজদ্রোহী—না না ভুল বুঝেছেন আপনারা—আমিতো রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইনি? আমার স্বদেশের জন্য যতটুকু কর্ত্তব্য তাহাই করেছি। কেন আপনাদের দেশ এ রকম হ'লে আপনারা কি চুপ করে থাকতেন—মিঃ হার্লী?"

মিঃ হার্লী গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"অত খবর জানিনা বাবু বিশ্বাস না হয় এই দেখুন ওয়ারেণ্ট।"

ওয়ারেণ্ট দেখিয়া আর আমি কি করিব। বলিলাম—"একবার বাড়ী হতে আমাকে বিদায় নিয়ে আসতে দিন্—"

মিঃ হার্লী কি ভাবিয়া সম্মতি দান করিলেন। আমি দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিরজাকে প্রশ্ন করিলাম—"কল্যাণী কোথায়?" সে দন্তহীন মাড়ি বাহির করিয়া হাউ হাউ রবে কতকগুলি অবোধ্য ভাষায় বলিয়া গেল—"দিদিমণি ঠাকুর ঘরে।"

(৮)

একরাশী শুভ্র মল্লিকা ফুলের মত কালো মর্ম্মর মণ্ডিত মেঝের পরে শ্রীধর জীউর মূর্ত্তির সামনে কল্যাণী উপুড় হইয়া

পড়িয়া মাথা খুঁড়িতেছিল। আমি কল্যাণীর অনাবৃত মস্তকে স্নেহভরে হাত রাখিয়া ডাকিলাম কল্যাণ।"

নিরুদ্ধ অশ্রু সাগরের বন্যা ছুটাইয়া রক্তজবার মত মুখ লাল করিয়া কল্যাণী আকুল নয়নে চাহিল। ওগো পাষাণ দেবতা - বাঁধনছেঁড়া ছন্নছাড়াকে যাবার বেলায় একী দেখালে প্রভু? কল্যাণীর প্রতি মন আমার অনুকম্পায় ভরিয়া আসিল, বলিলাম—"এইবার চললুম কল্যাণ।"

ভাঙ্গা গলায় সে বলিল,—"কোথায়?" তখনও তার দুটী গাল হতে জলের ধারা মুছিয়া যায় নাই।

একটু গর্ব্বের সহিত বলিলাম—"আমার চির ঈপ্সিত মানস স্বর্গে—জেলে যাচ্ছি কল্যাণ, বিষয় সম্পত্তি তুমি দেখো—আর প্রণবকে চিঠি দিয়ে জানিও। যে তার মত আমি কথার কথা করিনি, আমি কাজ করে কারাবরণ করেছি বুঝলে?"

কল্যাণী ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"আমাকে—আমাকে কার কাছে দিয়ে যাচ্ছেন। আমি কি করে থাকব—উঃ।"

এক পা সরিয়া বলিলাম—"তোমার ভাবনা কি কল্যাণ্? ঐ দেখ সামনে তোমার চির উপাস্য দেবতা শ্রীধর—যদি সত্যিই আমায় ভালবেসে থাক, তাহলে আমার শেষ অনুরোধ—এই ভালবাসা ঐ চিরসুন্দর সৎচিদানন্দ মহা-প্রেমিককে অর্পণ ক'রো—ঐ কালবরণকে ভালবেসো কল্যাণ, মহা শান্তি পাবে— তখন সমস্ত ভুলে যাবে, জীবনটাতো তুচ্ছ কল্যাণ—ভেবে দেখো আজ আমার কি মহা আনন্দের দিন! আর পিছনে ডেকোনা আমায়, আমি মহা যাত্রায় বেরুচ্ছি—আর এই দেশের প্রজাদের জননী হ'য়ো—নারীর পূর্ণতা আসে যখন সে মাতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়, এত কাজ তোমায় দিয়ে গেলুম—আর কিসের ভাবনা তোমার যাই আমি।" "দাঁড়ান একটু।" কল্যাণী আমার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। বিসর্জ্জনের আগে ভক্তিমতীরা যেমন দেবতার চরণ ধূলি গ্রহাস্তে সযত্নে মাথায় ঠেকাইয়া পুনর্ব্বার গলায় আঁচল তুলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। পরে একেবারে পিছন ফিরিয়া শ্রীধরের চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিল। আমি অবসন্নভারাক্রান্ত চিত্তে আসিয়া পুলিসের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলাম।

শেষ বিদায় লইবার আগে একবার চিরদিনের নিমিত্ত আমার বাল্যের সুখ দুঃখ জড়ান আনন্দভবন খানি দেখিয়া লইলাম,—নিমেষে স্মৃতিপটে কত পুরাতন কথা প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। একবার উর্দ্ধে চাহিলাম বাতায়ন ফাঁকে দুটি জলজলে তারার মত মমতা কাতর সকরুণ আঁখি আমার শেষ যাওয়া দেখিতেছিল যেন তাহারা বলিতেছিল—"ফিরোনা তুমি ফিরোনা—করো করুণ নয়নপাত।" ক্রমে সে দৃশ্যও অদৃশ্য হইল বুক মোচড় দিয়া উঠিল। বিদায় ওগো আমার স্নেহশালিনী জন্মভূমি! আজ জন্মের মত বিদায় নিলাম। অভাগী কল্যাণীকে তুমি মমতাভরা আঁচল দিয়া আবরিয়া রাখিও। চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ষ্টেশনে পৌছিলাম। কামরা ইহাদের রিজার্ভ করা ছিল। দম খাওয়া পুতুলের মত টলিতে টলিতে কামরায় উঠিয়া বসিলাম, অসংখ্য পুলিশ প্রহরী বেষ্টিত হইয়া। হস্ হস্ করিয়া ট্রেণ ছুটিল, মনে পড়িল দিদির কথা, প্রণবের কথা, চোখের জলকে এইবার আর ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। বুক ভাসাইয়া ঝরিতে লাগিল। বেলা শেষে ক্লান্ত সন্ধ্যারাণী তিমিরাঞ্চলে ধীরে ধীরে ধীরে ধরণীকে ঢাকিয়া ফেলিতেছিল। পাশের কামরা হইতে কোথাকার কোন অচেনা যাত্রী খুব মৃদু সুরে গাহিতেছিল।

"যাত্রী আমি ওরে
কোন দিনান্তে পৌছুব কোন ঘরে

* * * *

নিমেষ হারা শুধু একটি আঁখি
জেগেছিল অন্ধকারের পরে।"

মুক্তি পথে

(কাহিনী)

[শ্রীসুবাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়]

সন্ধ্যার অরুণিমা নিয়ে তপনদেব বিদায় নিলেন। রাতের অন্ধকার পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলবার আগেই বনের পাখী বনের দিকে তাদের বাসায় ফিরে যেতে লাগলো।...শান্ত-প্রকৃতির ভেতর দিয়ে তারা উড়ে যাচ্ছিল—সুনীল আকাশে নীলপাখা ছড়িয়ে—বিশ্বের লোক তাদের দিকে চেয়ে ভাবছে দেবদূতের মতো পেখম উড়িয়ে পাখীরা কোন্ এক অচিন্ পথের দিকে যাত্রা করছে।

বিভোর হয়ে তারা এই সৃষ্টির বৈচিত্র্য দেখছিল, দেখতে দেখতে কখন্ যে দৃষ্টি পড়ল—একটী পক্ষী-মিথুনের ওপর, তারা দুটীতে অনন্তের কানে কানে কি যেন একটী কথা বলতে, অনন্তের পানেই আপনহারা হয়ে ছুটে চলেছে।...

বিশ্বপ্রকৃতি তাদের দেখে নীরবে বড় মধুর হাসছিল।

হঠাৎ একটা গভীর কালো মেঘ বিকট দৈত্যের মতো ছুটে এসে তাদের এই শাশ্বত-মিলনের পথে বাধা হোলো··· দিগন্তের কোণ পর্য্যন্ত কে যেন একটা নিকষ কালো যবনিকা টেনে দিলে। সেই সীমাহীন অন্ধকারের মাঝে পৃথিবী আপনাকে লুকিয়ে ফেললে। ততক্ষণে রুদ্রবীরের পৈশাচিক তাণ্ডব লীলা পৃথিবীর বুকে সুরু হয়েছে। সেই ভীষণ অন্ধকারের মধ্যে নিষ্ঠুর কালো দৈত্যটা মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিতে লাগলো...আর সেই ভীষণ হুঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষণপ্রভা অন্ধকারের বুক চিরে বেরিয়ে আসতে লাগলো।

বিদ্যুৎ জগৎকে জানিয়ে দিলে যে ধরিত্রীর বুকের ওপোর কী নির্ম্মম স্মৃতি তারা অঙ্কিত করেছে। সেই মুক্ত পথের যাত্রী দম্পতির একটি তার প্রিয়ার জন্যে আকুল হ'য়ে ব্যথাভরা আর্ত্তনাদ নিয়ে ছুটাছুটি করছে—। আর সেই প্রলয়ঙ্কর দৈত্য তারই দিকে চেয়ে হাসছে। অসহায় মুক্ত-পথগামী তাকে মিনতি ক'রে ব'লছে—ওগো কি অনিষ্ট আমরা তোমার করেছি, যে জন্যে আমাদের বিচ্ছিন্ন করলে? ওগো দয়া ক'রে ব'লে দাও, কোথায় তাকে রেখেছ।—আমি তার কাছে যাব, তার কাছে যাবার জন্যে যে আমি আকুল হোয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তোমরা কি দেখছ না! আর আমাদের ছাড়াছাড়ি ক'রে তোমার লাভ ত' কিছুই হবে না। তবে?...

একটা বিরাট বজ্র অট্টহাসি হেসে তার এই করুণ প্রার্থনাকে রুদ্ধ করে দিলে।

* * * *

পরদিন সকালে তখন প্রকৃতির তাণ্ডব লীলা থেমে গেছে। রেখে গেছে তার ভয়াবহ স্মৃতি আর নিষ্ঠুর কঠোর প্রমাণ। সোণার অরুণ আবার তাঁর প্রাভাতিক শান্ত সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যে পৃথিবীকে ধৌত করে দিচ্ছিলেন। বিশ্ব তখন মুক্ত—সব বাধা বিপত্তি দূর হয়ে গেছে।

লোকেরা গিয়ে দেখলে সবুজ মাঠের ধারে—শ্যামল শয্যার ধারে বিহঙ্গমা বিশ্বের দেনা পাওনা মিটিয়ে কোন্ অজানা দেশের যাত্রী হয়েছে আর তার বুকের ওপর মাথা রেখে বিহঙ্গম স্থির শান্তিময় ঘুম ঘুমুচ্ছে। মেঘের প'রে রৌদ্রের মতো তার মুখে ব্যথার চিহ্ন—তৃপ্তির চিহ্ন ফুটে রয়েছে।...

অন্তর থেকে যেন সেই পাখীটার করুণ ব্যাকুল স্বর ভেসে এলো—প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে তার ব্যাকুল অনুরোধ—

প্রিয়া! প্রিয়া! একটু দাঁড়াও—আমি এসেছি—চল আমরা একসঙ্গে মুক্তির সন্ধানে—অনন্তের পথে যাত্রা করি!"

প্রিয়তমা যেন দয়িতের চির পরিচিত ব্যাকুল স্বর শুনে দাঁড়াল। পেছন ফিরে দেখলে যে তার বাঞ্ছিত এসেছে।... তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। হাসিমুখে সেই পক্ষী দম্পতি নীল পাখা উড়িয়ে মুক্তির পথে গমন করলে।...

আকাশ বাতাসের সঙ্গে যেন প্রতিধ্বনি করলে—"প্রিয়া। প্রিয়া?" একটা পাপিয়াও সঙ্গে সঙ্গে ডাকলে—"পিউ। পিউ।"

বিশ্ব প্রকৃতি ও তাদের এই মৃত্যু মিলন দেখে ধন্য হোল।......

তখন নবারুণের দিগন্ত বিস্তৃত রঙীন সোণার কাঠির স্পর্শে, কিরণস্নাতা, রক্তাম্বরা ঊষা মহীয়সী হয়ে উঠেছে।

পয়লা বৈশাখ

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

আজ বছরের প্রথম দিন।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙে চোখ মেলতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রভাতের আকাশ হতে ভেসে আসা এক ঝলক আলো। প্রথমটায় সে আলোর পানে চাইতে পারলুম না, দুই হাতে চোখ ঢাকলুম। একটু একটু করে আবার চাইলুম, ঘুমের ঘোর কেটে গিয়েছিল দেখলুম সামনে আমার নববর্ষের সূচনা করেছে এই সুন্দর আলো।

আমার মুখে তো হাসি এল না, এই আলো, এই শান্ত নীল আকাশ, এদের পানে তাকিয়ে আমার বুকের মধ্যে একটা অবর্ণনীয় ব্যথা অনুভব করছিলুম, আমার চোখ ফেটে ঝর ঝর করে জল বেরিয়ে পড়ল। আমি হাসি দিয়ে নূতন বর্ষকে অভ্যর্থনা করতে পারলুম না, কান্না দিয়ে পথখানা তার ভিজিয়ে দিলুম। এসো, ওগো নূতন বর্ষ, এই কান্নাভেজা পথ চেয়ে আমার আছে তুমি এস।

হ্যাঁ, শুধু যে এই বছরকেই আমি এমনি ধারায় অভ্যর্থনা করলুম তা নয়। আমার কাছে নূতন বছর যতগুলি এসেছে আমি এমনি করে কান্নায় তার পথ ভিজিয়ে দিয়েছি। এ আজ তো নূতন নয়, এ যে আমার চিরন্তন, সেও যে প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্ত্ত আমার কাছ হতে হাসির পরিবর্ত্তে গরম চোখের জল উপহার পাবে এ তার জানা কথা। সে এ জল পাবে জেনে শুনেই আসে, আমার কাছ হতে হাসির প্রত্যাশা সে কোনদিন করে নি।

আজ বছরের প্রথম দিন।

লোকে আজ কত না মঙ্গলাচরণ করছে, কতনা প্রার্থনা করছে নূতন বছর যেন প্রত্যেক দিনটিকেই তাদের কাছে সুন্দর রমণীয় করে রাখে। আর আমি? আমি করছি আমার সে প্রার্থনা নিস্ফল, আমার প্রত্যেক দিনটি চোখের জলে ভিজে বিদায় নেবে।

তাই বটে, কেন না—আমি যে বিশ্বের পরিত্যক্তা, আমি যে সংসারের আবর্জ্জনা বিধবা। সংসারে আমার কোন দরকার নেই, একটা বিরাট বোঝা হয়ে আমি সংসারের বুকে বিরাজ করি।

উঃ;—আজ বছরের এই প্রথম দিনে বাংলার মেয়েদের কথা ভাবছি। কতগুলি জীব এই নূতন বছরে জন্মগ্রহণ করবে, তাদের জীবন কি রকম ধারায় গড়ে তুলবে তারা, ভগবান কোন পথে তাদের চালাবেন।

আমিও এমনি কোন এক বছরের প্রথম মাসে জন্ম নিয়েছিলুম, শুনেছি সে দিনটি আজকের এই দিনই ছিল। বছরের এই প্রথম দিনে প্রভাতের শুভ্র আলো যে আমার ললাট স্পর্শ করেছিল, আজ ভাবছি, সে আলো না অন্ধকার। অন্ধকারই বটে, আমার সারা জীবনখানা সে ব্যর্থ করে দিয়ে গেছে, আমার জীবনে প্রকৃত আলোর স্পর্শ আমি কোনদিনই তো পেলুম না।

কি ঘৃণার মধ্যে আমি বেড়ে উঠেছিলুম, সে কথা আজ কেমন করে বলব? আমি যেন সংসারকে ফাঁকি দিতে এসেছি—এমনি সকলের মনের ভাব। ওগো, তোমরা একবার ভেবে দেখ নি কি—আমি কতখানি ফাঁকিতে পড়েছি। জগতে এসে আমি তোমাদের কিছু দিতে কার্পণ্য করি নি, তোমরা আমায় কতখানি দিয়েছ তাই আমায় বল।

অত ঘৃণা—অত অনাদরের মধ্যেও মরিনি, আগাছার মত এই বিশাল সংসারের এককোণে আমি বেড়ে উঠেছিলুম। বাপ মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করতেন, সামনে গেলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতেন, মা অবশ্য অতটা না করলেও তাঁর মনের যে ভাবটা মুখে ফুটে উঠতো তা দেখে আমার প্রাণ শুকিয়ে যেত, আমি ভয়ে তাঁদের দিকে বিনা দরকারে কখনই যেতুম না।

তবু—এই হতভাগি মেয়েটার জন্তেও তাঁদের ভাবতে

হল, কেন না বিয়ে না দিলে সমাজে পতিত হতে হবে। বাবা দারুণ ভ্রূকুটি হেনে পাত্র খুঁজতে বেরুলেন, মা হাজারবার আমার মরণ প্রার্থনা করলেন।

দুনিয়ায় যে টাকাই পরমার্থ তা তখন বুঝিনি, এখন বুঝেছি। উঃ, তখনও যদি মরতুম; কিন্তু মরলুম না তা, তবুও তো বেঁচে রইলুম।

গরীব বাপ খুঁজে খুঁজে যোগ্যতম পাত্রই নির্ব্বাচন করলেন। তিনি তো তাঁর মেয়ের দিকে চাননি তিনি তাকিয়েছিলেন, সমাজের দিকে কেবল সমাজের নিয়ম রক্ষার জন্যেই তিনি পাত্র খুঁজতে বার হয়েছিলেন।

জানি নে কে সে পাত্র, শুনতে পেলুম সে নাকি আমাদের ঘর খরচ দিয়ে আমায় বিয়ে করবে। মার মুখে সেই প্রথম প্রসন্নতার হাসি দেখলুম, আমার মাথার চুল তিনি নিজের হাতে সেই প্রথম বেঁধে দিলেন, বললেন ক্যান্তর আমাদের কপাল ভাল বেশ বর হবে, সুখেই থাকবে।

বললে মিছে কথা হবে যে, আমার মনটাও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে নি। কল্পনায় আমি বরের ছবি মনে এঁকে নিলুম, তাঁর বাড়ীর ছবি আঁকলুম; বুকটা আমার ভরে উঠল।

দেখতে পেলুম বিয়ের সময়।

অস্ফুট একটা শব্দমাত্র আমার মুখ দিয়ে আমার অজ্ঞাতে বার হয়ে পড়ল। স্বামীর পানে তাকিয়ে আমার মনটা অকস্মাৎ দারুণ বিরক্তিতে ভরে উঠল, বাপ মায়ের নিষ্ঠুরতা ভেবে চোখে জল এল।

বৃদ্ধ তার আকুল তৃষ্ণা নিয়ে আমার মুখের পানে চেয়েছিলেন। বুঝতে পারি নে—মরণ যখন মাথার কাছে দাঁড়ায় তখনও মানুষ কেমন করে জোর করে নিজের দৃষ্টি তার দিক হতে ফিরিয়ে নিয়ে সংসারের পঙ্কিলতার প'রে রাখে। এই মরণ পথের পথিক, তাঁর হাতের উপর বাবা যখন আমার হাতখানা রাখলেন তখন একবার হাতখানা টেনে নিতে গেলুম, পারলুম না। অশ্রুজলে চোখ আমার ঝাপসা হয়ে গেল, আমি কোনদিকে আর চাইতে পারলুম না।

শ্বশুর বাড়ী,—না—স্বামীর বাড়ী গেলুম, মা খুব উপদেশ দিয়ে দিলেন, বাবা এই জীবনে প্রথম আমায় আশীর্ব্বাদ করলেন।

স্বামীকে দেখলে আমার ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যেত। বৃদ্ধের চোখে কি আকুল তৃষ্ণা, আমায় যেন গ্রাস করতে চাইতেন। আমি প্রাণপণে তাঁকে এড়িয়ে চলতুম, তিনি আমার অনুসরণ করতে ছাড়তেন না।

তৃষ্ণা ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল। তিনি নিজেকে সংযত করতে পারলেন না। আমার বড় রাগ হয়েছিল, ভয় হয়েছিল, কি বলেছিলুম ঠিক নেই।

এর পর হ'তে তিনি আমার ওপর বড় নিষ্ঠুরাচরণ আরম্ভ করলেন। পরণে কাপড় দিতেন না, খেতে পর্য্যন্ত দিতেন না। লুকিয়ে অনেক অনুনয় বিনয় করে আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে মা বাপকে পত্র দিলুম, তার উত্তর যে এল সে আমার কাছে নয়, আমার স্বামীর কাছে। বাবা স্বামীকে যে পত্র দিলেন সেই পত্রের মধ্যেই মা আমায় অনেক তিরস্কার করে লিখেছিলেন। অনেক উপদেশও দিয়েছিলেন, যে স্বামী দেবতা, তিনি যা বলবেন তা আমার শুনতেই হবে, অন্য পথে আমার মরণই মঙ্গল।

স্বামী দেবতা,—কথাটা শুনলেও হাসি পায়। যে পিতামহের বয়সী বৃদ্ধ, যাঁর দৃষ্টি এখন ইহলোক ছাড়িয়ে পরলোকের পথে নিবদ্ধ থাকবার সময়, সে এখনও পাশবিক ক্রিয়া নিয়ে ভুলে থাকতে চায়, সে এখনও মরণকে ফাঁকি দিতে চায়। আমার এই দেহটা নিয়ে সে ইচ্ছামত ব্যবহার করতে চায়, আমি কেমন করে ধরে দেব? আমি পারব না, আমি মরব, কেন না এ কষ্ট আমি আর সইতে পারি নে। জানি নে ভগবান কেন তুমি আমায় এ সংসারে প্রেরণ করেছ? যদি প্রেরণই করলে—আমার অদৃষ্ট এরকম করে গড়লে—আমার মনের ভাব কেন এরকম দিলে, কেন আমি স্বামীর ইচ্ছার প'রে আমায় ফেলে দিলুম না?

ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার মনের ধারণা এমনিই হয় অন্ততঃ আমি তো তাই জানি। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা সংসারের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না। কোন মেয়েই এ সময়ে স্বামীকে ভক্তি করতে, ভালবাসতে পারে না। প্রথমে দয়া দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে বালিকার চিত্ত জয় করতে হয়, আমার বৃদ্ধ স্বামী তা বোঝেন নি, তিনি জোর করে আমায় জয় করতে এসেছিলেন। একদিন আমার প'রে

অত্যাচার করতে আসাতে আমি সেদিন মরিয়া হয়ে তাঁকে ফেলে দিয়ে খাঁচড়িয়ে পালিয়ে গিয়েছিলুম।

দেবতা আরও নির্দ্দয় হয়েছিলেন, আমায় সেদিন পায়ের জুতো দিয়ে যথেষ্ট প্রহার করেছিলেন, আমার সমস্ত গা কেটে কেটে গিয়েছিল।

স্বামী আমার বাপ মাকে কি পত্র দিয়েছিলেন জানি নে, কয়েকদিন পরে বাবা এলেন। তাঁকে দেখে আমার বড় আনন্দ, হয়েছিল, ভেবেছিলুম তিনি আমায় নিতে এসেছেন। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেল। বাবা আমায় যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন, তারপর কি ভেবে মিষ্ট কথায় অনেক বুঝিয়ে—স্বামীর আদেশানুসারে চলতে আদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

বেশ জানলুম—আমার মুক্তি নেই। মরব বলে কতবার এগিয়ে গিয়ে মরতে পারলুম না, সাহস হ'ল না। এর পর স্বামী আর আমার পানে ফিরেও চান নি, আমায় ঘৃণা করে তিনি দূরে দূরে থাকতেন। আমার কাছে সেই হ'ল তাঁর আশীর্ব্বাদ। আঃ, আমায় তিনি ঘৃণাই করুন, আমি তাই চাই।

দিনগুলো একে একে সরে যাচ্ছিল, কয়টা বছর জলের মত চলে গেল। স্বামীর ঘৃণা সমভাবেই রয়ে গেল, আমিও তাঁর কাছ হতে সমান দূরে থাকতুম।

তখনও জানতে পারি নি মাথার ওপর আমার কাল বৈশাখী ঘনিয়ে এসেছে, প্রবল ঝড় উঠবে যাতে আমার জীবন তরণী ভিন্ন পথে চালিত হবে।

আমাদের বাগানের মধ্যে একটি পুকুর ছিল, এ পুকুরে অনেকে স্নান করত, বাসন মাজত। আমিও এই পুকুরে যাওয়া আসা করতুম।

কয়টি যুবককে প্রায়ই এই পুকুরের ধারে দেখতে পাওয়া যেত। তারা মাছ ধরবার অছিলায় বসে থাকত, কুৎসিৎ গান করত, কত রকম ইসারা করত। কোনদিনই তাদের দিকে চাই নি, তাদের গানে কাণ দিই নি। নিজের কাজ করতে ঘাটে যেতুম, কাজ সেরে চলে আসতুম।

সেদিন স্বামীর প্রবল জর এলেছে; অসহায় অবস্থায় তাঁকে আমার হাতে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। সেবাপরায়ণ নারী হৃদয় সেদিন এই অসহায়কে ফিরাতে পারে নি, নিজের কর্ত্তব্য মনে করে আমি তাঁকে সেদিন তুলে নিয়েছিলুম।

ঘাটে যেতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। স্বামী তখন জরের ঝোঁকে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘাম হচ্ছে দেখে কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘাটে গেলুম। তখন বেশ অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল, বাগান নিস্তব্ধ—জনমানবশূন্য। সেই স্বল্পালোক—স্বল্পান্ধকারের মধ্যে আমি ঘাটের পাশে সেই কয়টি যুবককে দেখতে পেলুম।

অনিশ্চিত বিপদাশঙ্কায় আমার হৃদয় কেঁপে উঠেছিল, আমি ফিরে আসব বলে পা তুললুম।

তারা ছুটে এসে আমায় চারিদিকে ঘিরে ফেললে, চীৎকার করবার আগেই আমার মুখ বেঁধে ফেললে, হাত দু'খানা চেপে ধরলে। ভয়ে একটা অস্ফুট শব্দও বার হ'ল না, আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লুম।

সকালে যখন জ্ঞান হ'ল—দেখলুম সেই বাগানে একটা গাছতলায় পড়ে আছি, মুখ তখনও বাঁধা। হাত দিয়ে মুখ খুলে ফেলে উঠতে গেলুম, সর্ব্বাঙ্গে বড় ব্যথা।

ভোরের যে আলো আকাশের গা চিরে ধরার গায়ে এসে পড়েছিল সে আলোও ছিল বছরের প্রথম দিনের, এই পয়লা বৈশাখের।

হাহাকার করে আছড়ে পড়ে কেঁদে উঠলুম—নতুন বছর, নতুন বছর, আমার জন্যে আজ তুমি কি বয়ে নিয়ে এলে? একদিন এমনি এক নতুন বছরের আলো যখন ধরার বুকে পড়েছিল তখন আমি জন্মিয়েছিলুম। ঘৃণার ফোঁটা আমার কপালে পরিয়ে দিলেও বিশে আমায় এতটুকু স্থান রেখেছিলে। আজ—সতেরটা বছর পরে—আজ এই শুভ পয়লা বৈশাখের প্রভাতে আমার কপালে যে ফোঁটা তুমি দিয়ে দিলে, এ যে আমরণ কাল স্থায়ী হ'ল, এ ফোঁটা দেখে সবাই ঘৃণা করবে যে।"

উঃ, বলতে বুক ফেটে যায়, স্বামীর পায়ের তলায় যখন আছড়ে পড়লুম, তিনি আমায় পদাঘাত করলেন। স্পষ্ট বললেন তিনি আগে হতেই আমার ব্যাপার জানেন। বলতে পারলুম না,—বুঝাতে পারলুম না কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত

আমার দেহ আমারই ছিল, কেউ তা স্পর্শ করে কলঙ্কিত করতে পারে নি।

তিনি আমায় তাড়িয়ে দিলেন। পায়ে ধরে একটু থাকবার মত আশ্রয় চাইলুম, তিনি আমায় তাও দিলেন না। ঘৃণিত জন্তুকে মানুষ বাড়ীতে স্থান দিতে পারে তবু আমায় স্থান দিতে পারে না।

আমার সহায় কেউ হ'ল না, দেশের সবাই আমায় ঘৃণা করলে, আমায় নির্ব্বাসিতার আদেশ দিলে। এক সময়ে যাকে একদিন অস্পৃশ্য হাড়ি বলে ঘৃণা করেছি সেই মতিয়ার মা আমার সহায় হ'ল।

তাকে সঙ্গে করে আমি পদব্রজে বাপের বাড়ী চললুম। সাত ক্রোশ পথ- হাতে একটি পয়সা ছিল না যে গাড়ী করে যাব। সকালবেলা রওনা হয়ে বাপের বাড়ী যখন গিয়ে পৌঁছালুম তখন সন্ধ্যে উতরিয়ে গেছে। বাবা বাড়ী ছিলেন না, মা বারাণ্ডায় একখানা আসনে বসে আহ্নিক করছিলেন।

এত লাঞ্ছনা, অপমান সহ– তারপর চার বছর মাকে দেখি নি, আমি একবার মাত্র মা বলে ডেকে ছুটে তাঁর কোলে পড়তে যাচ্ছিলুম, মা আসন হতে লাফিয়ে উঠে তাড়াতাড়ি এক কোণে সরে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন "এই— ছুঁস নে, ছুঁস নে বলছি।"

মুহূর্ত্তে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, ছুটে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলুম, সেইভাবেই রইলুম, আর এক পা নড়তে পারলুম না।

এরপর আর বেশী কথা বলবার দরকার নেই, এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, যিনি আমায় গর্ভে স্থান দিয়েছিলেন তিনি এই কলঙ্ক প্রচারিত হওয়ার পর সমাজের ভয়ে আমায় ঘরে স্থান দিতে পারলেন না। তিনিও বললেন—এ আমারই দোষ, আর কারও দোষ নয়, এ দোষের শাস্তি আমায় ভোগ করতেই পেতে হবে।"

স্বামীর পায়ে ধরে কাঁদতে পেরেছিলুম, বাপমার পায়ে পড়ে কাঁদতে পারলুম না। সেই রাত্রে আর একটি কথা না বলে মতিয়ার মায়ের কাঁধে ভর দিয়ে বাপের বাড়ী হতে বেরিয়ে এলুম। মা আমায় উপদেশ দিয়েছিলেন আমার মরণই ভাল, সেই উপদেশটাই আমার মাথমার ধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমি মতিয়ার মার গলা ধরে হাহাকার করে কেঁদে বললুম,—"তুই ফিরে যা মতিয়ার মা, আমি আর কোথাও যাব না, জগতে আমার আর স্থান নেই, আমি মরব।"

বৃদ্ধা আমায় মরতে দিলে না; আমার চোখের জলের সঙ্গে তার নিজের চোখের জল মিশিয়ে সে বললে—"মরবে কেন মা? কি পাপ গতজন্মে করেছিলে যার ফলে এজন্মে আবার এই যে আত্মহত্যা পাপ করবে, পরের জন্মে আবার তার জন্যে কত সাজা তোমায় পেতে হবে তা কে জানে।

আমি আত্মহত্যা করতে পারলুম না, উদ্যত হয়েও ফিরে এলুম। মনে হল একথা সত্য—গতজন্মে কি মহাপাপ করেছিলুম যার জন্যে আমি এজন্মে সব হতে বঞ্চিতা হয়েছি, এতটুকু শান্তি এ জীবনে লাভ করতে পারলুম না। সংসারকে আমি সব দিলুম কিন্তু সংসার আমায় বেদনা ভিন্ন আর কিছু দিলে না।

ব্রাহ্মণের মেয়ে ছিলুম আমার স্থান হল শেষে হাড়ির ঘরে। শান্তিলাভ করলুম, কেননা লোকে আমায় যা বলবার তা একবারই বলে দিলে বার বার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে পারলে না।

আজ আমি ঝুড়ি বুনি, চুপড়ি চেটায় বুনি, মতিয়ার মা বিক্রী করে, তাতে আমাদের দুজনের দিন বেশ কেটে যায়। আমার সমাজ আমায় আশ্রয় দিতে পারলে না, আমায় আত্মহত্যা করে মহাপাপে ডুবাবার অনুমতি দিলে, অস্পৃশ্যা হাড়ি মায়ি আমায় রক্ষা করলে। আমার গর্ভধারিণী সমাজের ভয়ে আমায় সে রাতটুকু বাড়ীতে রাখতে পারলেন না, আমার দোষগুণ কিছু বিচার করলেন না।

আজ সেই পয়লা বৈশাখ।

এই পয়লা বৈশাখে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এই পয়লা বৈশাখে আমি সমাজের পরিত্যক্তা হয়েছি।

আজ এই ঝুড়ি বুনতে বুনতে একবার সামনের রৌদ্রতপ্ত পৃথিবীর পানে তাকিয়ে ভাবছি—জানি নে, এই বছর আমার জন্যে কি নিয়ে আসছে। আমার জীবনে একটা দিন এল না যেদিন আমি শান্তি পেয়েছি, আমার চোখের জল মুছে গেছে।

তবু তাঁরা সবাই আজ আছেন। বাপ, মা, ভাই, বোন, স্বামী সবাই আছেন। বিশ্ব হ'তে বাইরে আমি পড়ে আছি, সকলের সব আছে, আমার কেউ নেই। আমি সংসারকে ফাঁকি দিয়েছি না সংসার আমায় ফাঁকি দিয়েছে এ কথা আজ কে বিচার করে বলবে?

আজ এই বছরের প্রথম দিনে আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে বলছি,—প্রভু, আমার দিন সংক্ষিপ্ত কর। আমি অজ্ঞানে যে পাপ করেছি তার কি মার্জ্জনা নেই প্রভু? তোমার দেওয়া জীবন আমি নষ্ট করে ফেলে নিজের জন্যে আরও কঠোর শাস্তি সঞ্চয় করে রাখতে চাইনে, তোমার জীবন তুমিই শেষ করে দাও প্রভু।

দূরে পল্লীর ঘরে ঘরে মঙ্গলশঙ্খ বাজছে, সংকীর্ত্তন বার হচ্ছে।

আমি অনেক দূরে—অনেক দূরে; ওদের কাছে যাওয়ার অধিকার আমার নেই,—উঃ, ভগবান।

তবু আজ সেই পয়লা বৈশাখ, তাই আজ মনে করে রাখছি। ভুলতে পারছি নে—আজ বছরের প্রথম দিন।

অর্ঘ্য

[শ্রী——দাসী]

কি জানি কেমনে হয়তো স্বপনে নয়তো ইন্দ্রজালেতে
উদিলে ভারত-ভাগ্য-গগনে, শুভ মাহেন্দ্র কালেতে!
নিজ মহিমায় হরিলে হৃদয় ভরিলে ভাবের লহরে
ঢুলালে চক্ষু নেশার ঢুলালে ঘন নবাবেশ লহরে
হে রূপদক্ষ! কবিতা কাজল পরালে সবার নয়নে
চিত্র-বিহীন হৃদয়ে চিত্র আঁকিলে প্রীতির বয়নে
চয়নে মোহন মন্ত্র পূজনে, গাঁথালে মালিকা ভুবনে
কবি সম্রাট! অপূর্ব্ব তাজ; মহল-গড়িলে-জীবনে
অলক্ষ্যে গুণী! কত সঙ্গীত ফুটালে মর্ম্ম বীণাতে
নির্গীতে গান, ভাব সুমহান, ভরিলে তুচ্ছ দীনাতে
কাব্য সুরভি-উৎস ঝরালে, পাষাণ-চিত্ত বিদারি
নীরস মানস সুধায় সরস, করিলে ছন্দ উজাড়ি!
মৌন কাননে, কাকলী কূজন, কুহু গুঞ্জন জাগালে
অখিল বনের শ্যামলিমা এনে মনেতে সবার লাগালে!
গাহন করালে দীপ্ত প্রভায় নিখিল উজল কিরণে
বুলালে সুরভি পরাগ হিয়ায় শ্রীচরণ রেণু হিরণে
ভাসালে জগৎ অমিয় সাগরে, সঙ্গম মহা মিলনে
সুন্দর! তুমি ব্যথা-সুন্দর, অন্তর অনুশীলনে
সুরহীনে তুমি বাজিতে শিখালে ত্যাগের মন্ত্র সওয়ারে
তিক্ত বিরসে মাধুরীমা দিলে বুকভাঙা দুখ্ বওয়ারে!
কোন্ যুগে কারে ধন্য করিলে দিলে পদসেবা ভার হে?
দাস্যে বরিলে, গর্ব্বে ভরিলে, নেমে এলে অবতার হে!
সান্ধ্য-বিতানে পূরবীর তানে, আজি বিশ্রাম নিমিষে
কি মধু সৃষ্টি! পুষ্প বৃষ্টি! একি হরিষণ বরিষে!
ধরা বরেণ্য! ভারতারণ্যে তুমি সুগৌর শ্যাম হে!
ভারতীর বুকে, গৌরব সুখে, লেখা তব প্রিয় নাম হে!
জীবনে রচিত ভাগবৎ গীতা হৃদয় শোণিত ক্ষরণে,
পৃথিবীর নব কুরুক্ষেত্রে, প্রাচী প্রতীচ্য তরণে!
অনন্ত হ'ক্, জীবন্ত গীতা, হ'ক্ অক্ষয় অমৃত
বিশ্বের কবি; বিশ্বের প্রিয়, চির বিশ্বোদ্ভাসিত!

যৌবন-রক্ষা

[শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল]

যৌবনকাল পরম রমণীয়। জীবনের এই শুভ সন্ধিক্ষণে কোন এক যাদুকরের অজ্ঞাত মোহন দণ্ড প্রভাবে, বিশ্বের সকল দৃশ্য-পট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এক অনির্ব্বচনীয় প্রাণোন্মাদক নূতন রঙে সমস্ত জগৎ রঞ্জিত হইয়া উঠে। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৈহিক বিকাশের সঙ্গে হৃদয়তন্ত্রী কি যেন এক নূতন সুরে বাজিয়া উঠে—অন্তরের যাবতীয় বৃত্তি পরিপূর্ণ গতিতে উদ্দামভাবে ছুটিতে চায়, এবং নূতন আশা নূতন উদ্যম, নূতন শক্তি লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রাণ অনন্ত বিশ্বের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিয়া কি এক সার্থকতা খুঁজিতে থাকে। মানুষের কামনা সাধনা সকলেরই পরিচালনা ও পরিতৃপ্তির সময় এই। শারীরিক যন্ত্র ও স্নায়ুসমূহের বিশেষ ও শক্তিশালী অবস্থার জন্য এবং মনের বিচিত্রতার নিমিত্ত ভোগসুখের তীব্র আস্বাদনের সময়ও যেমন এই, সুনির্দ্দিষ্টভাবে পরিচালিত হইলে তেমনি সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধন ও আত্মানুশীলনেরও ইহাই প্রকৃষ্ট সময়। এই শক্তি,—এই অবস্থাটা হারাইলে, মানুষ বড় কিছু করিতে পারে না। যিনি জগতে যত বড় হইয়াছেন, সকলেরই উন্নতি ও প্রতিষ্ঠার ভিত্তি এই যৌবনে এবং এই সময়েই তাঁহারা জীবনের প্রকৃষ্ট কাজসমূহ করিয়াছেন।

সুতরাং এই যৌবনকাল বাঁধিয়া রাখিতে কাহার না প্রাণে স্বাভাবিক ব্যাকুলতা হয়? কে না ইহার কথা প্রাণের ভিতর তীব্রভাবে অনুভব করে? প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পদার্পণ করিয়া কে না একবার তৃষিত দৃষ্টিতে ইহার দিকে ফিরিয়া চায়? কিন্তু হায়! আমাদের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতাই আছে; কিন্তু কাজ নাই। এবং সে জাতীয় চেষ্টাও আমরা জানি না। কৃচ্ছ্র সাধনা বলে বিধি নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যৌবনকে চিরদিনের মত বাঁধিয়া রাখা যায় কি না, তাহার মধ্যে যদিও কোনরূপ প্রশ্ন থাকে, কিন্তু অধ্যবসায়, জ্ঞান ও কর্ম্মপ্রভাবে যৌবনকে যে নির্দ্দিষ্টকালের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখা যাইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই। কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা এবং কি নিয়মে কাজ করিলে আমরা এ বিষয়ে সফলকাম হইতে পারি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

যৌবনকে স্থির ও অবিকৃত রাখার জন্য মন ও চিন্তাশক্তির প্রভাবই সকলের উপর। এইজন্য সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্বপ্রযত্নে মনকে সর্ব্বদার জন্য এইভাবে তৈয়ারী রাখিবে যে, 'আমি কখনও যৌবন হারাইব না, বৃদ্ধ হইব না। প্রথম যৌবনে আমি যেমন ছিলাম তেমনটাই আছি, আমার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই বা ঘটিতে পারে নাই।' দিন, মাস, বছর চলিয়া যাইবে, কিন্তু নিজের জরা মরণের চিন্তা যেন মুহূর্ত্তের জন্য না আসে। সর্ব্বদা যৌবনোচিত স্ফূর্ত্তি ও সুখভোগ করিতে চেষ্টা করিবে এবং জোরপূর্ব্বক একান্ত মনঃসংযোগ সহকারে মনের মধ্যে যৌবনের স্ফূর্ত্তি আনিবে। সর্ব্বদাই যেন এই অটল বিশ্বাস থাকে যে আমার যৌবন কখনও হারাইব না।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" চিন্তা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। সুতরাং এই যৌবন রক্ষা বিষয়ে মনঃসংযোগ ও ইচ্ছাশক্তির প্রভাব যে অসামান্য তাহা এই ভাবে কিছুদিন কাজ করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কোন একজন বিখ্যাত দার্শনিক বলিয়াছেন "Would you always remain young and would you carry all joy and buoyancy of youth into your maturer years? Then have care concerning but one thing – how you live in your thought world," যদি তুমি পরিণত বয়সেও যৌবনোচিত সকল আনন্দ পাইতে ও যুবক থাকিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে একটী কথা মাত্র স্মরণ রাখিবে যে, চিন্তা-জগতের সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হইও। সর্ব্বদা কিশোর ও বালকদের

সঙ্গে খেলা করিবে ও প্রাণ খুলিয়া তাহাদের সহিত মিশিবে। যুবকের মত নিজের প্রাণটী সরস ও বালকের মত কোমল রাখিবে। দিনের পর দিন মনে করিবে "আমি ক্রমশঃ পূর্ণযৌবন অবস্থায় যাইতেছি।" শিশু ও বালকদিগকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসিবে এবং তাহাদের কোলে করিবে; ইহাতে শরীর ও মনের গ্লানি অচিরাৎ দূরীভূত হইয়া প্রাণ এক যৌবনসুলভ নূতন রসে অভিষিক্ত ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পবিত্র ও সাত্ত্বিক ভাবে জীবনযাপন করা যৌবন-রক্ষা বিষয়ে প্রধান সহায়। শরীর ও মন পরস্পর অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ইত্যাদি রিপু ও হীনবৃত্তি সকলের পরিচালনায়, শরীরস্থ রক্তের গতি দূষিতভাবে চালিত হয়। আমাদের মুখমণ্ডলের স্নায়ু আদি সুকুমার তন্তু সকল বিকৃত ভাবাপন্ন করে এবং আমাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র জরাগ্রস্ত করিয়া তুলে। এই জন্য এই সব দুষ্প্রবৃত্তি যে শুধু আমাদের শ্রী ও স্বাস্থ্য নষ্ট করে তাহা নহে, অকালে জরা-মৃত্যুও আনিয়া থাকে। ইহা আনুমানিক সত্য নহে, সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। যে লোক সর্ব্বদা হিংসা ক্রোধাদি সম্পন্ন, যাহার জীবন কদর্য্যভাবে পরিচালিত, তাহার দিকে চাহিলেই ইহার সত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই সব রিপু ও কুপ্রবৃত্তি সকলকে দমন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিবে। সর্ব্বদা সাত্ত্বিকভাবে জীবনকে চালিত করিবে, মনোমধ্যে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি স্থান দিবে না এবং দয়া, ক্ষমা, পরোপকার ভগবদ্ভক্তি ইত্যাদি সদ্গুণাবলীর সম্যক অনুশীলনে আমাদের নাড়ী (nerve), শিরা, ধমনী ইত্যাদিতেও রক্তের ভিতরে এক নূতন রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকিবে, যাহাতে আমাদের মুখে, চোখে, সর্ব্বাঙ্গে এক নূতন শ্রী, নূতন ভাব, নূতন শক্তির বিকাশ হইতে থাকিবে এবং আমাদের স্বাস্থ্য ও যৌবন-শ্রী বহুদিন পর্য্যন্ত অটুট রাখিবে। এই জন্য মিতাচারী ভগবদ্ভক্ত ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিদের যৌবন ও সৌন্দর্য্য বিনা সাধনায়ও বহুকাল পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে, এবং ইহার সত্যতা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রকৃত জ্ঞানের সহিত আন্তরিক ভাবে উপলব্ধি করিয়া চেষ্টা দ্বারা সকলেই এইভাবে নিজের জীবন চালিত করিতে পারেন এবং যিনি যতটুকু পারিবেন তিনি সেই পরিমাণেই কলভাগী হইবেন, কাহারও হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

তৃতীয়তঃ, গুরুবাক্য ও যোগশাস্ত্র হইতে কতকগুলি নিয়ম এখানে উদ্ধৃত করা হইল, যাহা একান্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে পালন করিলে আমরা নিশ্চয়ই সফলকাম হইব এবং এই সব অমূল্য উপদেশের মহিমা দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব।

১। দিবাভাগে বাম নাসিকায় ও রাত্রিতে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস-বহন রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে আমাদের স্বাস্থ্য ও যৌবন বহুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত থাকিবে। এজন্য প্রথম প্রথম দিবাভাগে কিছু সময় দক্ষিণ নাসিকা পরিষ্কৃত তুলা দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখিবে ও বাম নাসিকায় শ্বাস বহন করিতে চেষ্টা করিবে। একটু একটু করিয়া এ অভ্যাস করিতে হয় এবং কিছুদিন এই অভ্যাস করিলে শেষে আপনা হইতেই এইরূপ নিঃশ্বাস বহিতে থাকিবে। রাত্রিতে বাম পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিবে; তাহাতে কিছুক্ষণ বাদেই দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকিবে।—এইরূপে সমস্ত রাত্রি বাম দিকে শয়ন করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস বহন করিতে চেষ্টা করিবে। অভ্যাস দ্বারা অনায়াসেই ইহা সহজ-সাধ্য হইবে। স্বর শাস্ত্রোক্ত ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট নিয়ম এবং সকলেই ইহা ভক্তিসহকারে পালন করিতে চেষ্টা করিবে।

২। প্রত্যহ দুইবেলা আহারান্তে আট দশ মিনিট পর্য্যন্ত একটু শক্ত চিরুণীর দ্বারা মাথার চুল জোরে আঁচড়াইবে। ইহাতে মস্তিষ্ক শীতল রাখিবে এবং অকালে মাথার চুল উঠিবে না বা চুল পাকিবে না।

৩। চোখের জ্যোতিঃ অব্যাহত রাখার জন্য প্রত্যহ প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিবার পরই মুখের ভিতর সম্পূর্ণরূপে জল দ্বারা পুরিয়া চোখে আট দশবার শীতল জলের ঝাপটা দিবে। পরে একবার ঐ জলে কপালটী ধুইয়া ফেলিয়া পুনরায় আট দশবার চোখে ঐরূপে জলের ঝাপটা দিবে। প্রত্যহ স্নান করিবার সময় দুই পায়ের অঙ্গুষ্ঠের নখের কয়েক ধারে একটু তেল দিয়া পরে অন্যান্য স্থানে তৈল মর্দ্দন করিবে। এতদ্ভিন্ন চোখের অন্যান্য সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম

পালন করিবে। ইহাতে কোনও দিন চোখের জ্যোতিঃ খারাপ হইবে না বা কোনরূপ চোখের ব্যারাম হইতে পারিবে না।

৪। যতবার মলমূত্র ত্যাগ করিবে ততবারই যতক্ষণ ঐ কার্য্য শেষ না হয় ততক্ষণ দুই পাটি দাঁতে দাঁতে একটু জোরে চাপিয়া ধরিবে ; ইহাতে দাঁত নড়িবে না বা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্তও দাতের কোন অসুখ হইবে না। স্বাস্থ্য সমাচারের নিয়মিত পাঠকগণ দন্তরক্ষার অন্যান্য স্বাস্থ্যের নিয়ম অবগত আছেন। সুতরাং তাহার পুনরুক্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন।

৫। যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয় চালনায় ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও কার্য্যক্ষম অবস্থা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে। এই জন্য একটী নিয়ম সর্ব্বতোভাবে সকলে প্রতিপালন করিবে। যতবার মলমূত্র ত্যাগ করিবে ততবার যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্য সম্পন্ন না হয় ততক্ষণ বাম হস্তের দ্বারা দৃঢ়মুষ্টিতে কোষদ্বয় শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিবে। ইহাতে ইন্দ্রিয়-দৌর্ব্বল্য অকালে কিছুতেই ঘটিতে পারিবে না।

মহাজন মুখনিঃসৃত ও শাস্ত্রোক্ত এই সব নিয়মগুলি মহা মূল্যবান এবং ইহার প্রত্যেকটাই পরীক্ষিত সত্য। তবে সর্ব্বদাই আমাদিগকে একটী কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে একদিনে বা একেবারেই কোন একটী কার্য্যের চরম ফল লাভ করা যায় না। আমাদের চিত্তের স্থিরতা ও দৃঢ়তার একান্ত অভাব ; দু'একদিন কোন কার্য্য করিয়াই তাহার ফল না পাইলে অমনি অধীর হই। বিশ্বাস হারাই, চিত্তের দৃঢ়তাও থাকে না। সুতরাং কোন বিষয়ে আমরা সফলকামও হইতে পারি না। তারপর সকল কার্য্যের পক্ষে ভক্তি ও বিশ্বাস এই দুটী বড় মূল্যবান জিনিষ। ভক্তি ও বিশ্বাস দ্বারাই চিত্তের একাগ্রতা জন্মে এবং একাগ্রতা হইতেই will force বা ইচ্ছা শক্তির সৃষ্টি হয়। এই শক্তিই সকল কার্য্যের প্রাণ। এই শক্তির অভাবেই আমরা প্রতি পদে বিফলমনোরথ হই এবং এই শক্তি যেখানে যে অনুপাতে আছে কার্য্যের ফল সেখানে সেই অনুপাতে অবশ্যম্ভাবী। শাস্ত্রোক্ত এই সব স্বাস্থ্যের নিয়মগুলিতে আস্তিক্যবোধ বা সত্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া একান্তচিত্তে ইহা প্রতিপালন করিয়া চলিলে আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবনে ইহার মহিমা ও আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মুগ্ধ হইব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই।

চতুর্থতঃ, ব্রহ্মচর্য্য পালন যৌবন স্থির রাখার প্রধান সহায়। যাহার শুক্রধাতু অবিকৃত ও পরিপূর্ণ অবস্থায় আছে তাহার রক্ত, স্নায়ু, মাংসপেশী, নাড়ী ইত্যাদি সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও সতেজ অবস্থায় থাকে এবং দেহস্থিত যন্ত্রসমুদায় উপযুক্ত অবস্থায় থাকে, সহসা জরা, ব্যাধি, ইত্যাদি আক্রমণ করিতে পারে না। সকল সাধনার শ্রেষ্ঠ সাধনা এই ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন। সুতরাং সর্ব্বপ্রযত্নে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবে। এই ব্রহ্মচর্য্যের অভাবেই আজকাল অকালবার্দ্ধক্য, রোগ, মৃত্যুর সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে। "যৌবন করিয়া ব্যয় বয়সে কাঙ্গাল" এই বাক্যটি অতি মূল্যবান। যৌবনে সাবধান না হইয়া অত্যাচার করাতেই, আমরা শীঘ্র শীঘ্র যৌবন হারাইয়া জরাগ্রস্ত হইয়া পড়ি। তখন ভবিষ্যতের চিত্র কিছুতেই মনে স্থান পায় না। জীবনের সারভূত এই শুক্রধাতু অবৈধ অত্যাচারে অযথা নষ্ট করিলে, অতি শীঘ্রই জীবনী শক্তি ক্ষয় করিয়া ফেলে এবং অকালে বার্দ্ধক্যের সমস্ত লক্ষণ আসিয়া দেখা দেয়।

ইহার প্রমাণ চারিদিকে—কোনই অভাব নাই। ব্রহ্মচর্য্য-পালন বিবাহিত জীবনেও হয় ; সুতরাং সকলেই সর্ব্বাগ্রে এইদিকে লক্ষ্য রাখিবে। যিনি যে পরিমাণে এই ব্রত সাধন করিবেন তিনি সেই পরিমাণে ফলভোগী হইবেন।

এতদ্ভিন্ন, কয়েকটী আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ পালন করিতে হইবে ; যৌবনরক্ষার্থে এগুলিও একান্ত প্রয়োজনীয়।

ক। প্রত্যহ প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করার পরই একগ্লাস পরিষ্কৃত-শীতল জল নাসারন্ধ্র দ্বারা পান করিবে। এই নাসাপান আয়ুর্ব্বেদ মতে পরম উপকারী। নিয়মিত ভাবে ইহা পালন করিলে ইহা রাসায়নিক কার্য্য করে এবং জরা, গলিত অবস্থা ইত্যাদি দূর করিয়া যৌবনসুলভ সামর্থ্য ও শ্রী প্রদান করে। বরাবর এই নিয়মটী পালন করিলে কিছুতেই অকালবার্দ্ধক্য আক্রমণ করিতে পারিবে না। এই নাসারন্ধ্র অভ্যাস করা কোনই গুরুতর ব্যাপার নহে। একটু একটু করিয়া চেষ্টা করিলে চার পাঁচদিনের মধ্যেই অনায়াসে ইহা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে।

খ। প্রত্যহ কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে শারীরিক ব্যায়াম করিবে। শরীরকে সুস্থ, সুদৃঢ় ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখিতে ব্যায়ামের মতন আর কিছুই নাই। নিয়মিত ব্যায়ামকারীকে সহসা জরা আক্রমণ করিতে পারে না। যৌবনোচিত শক্তি, গঠন ও সৌন্দর্য্য বহুদিন তাহাদের দেহে অব্যাহত থাকে। ইহার প্রমাণ আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই। অশিক্ষিত ইতর লোক শারীরিক পরিশ্রমের জন্য দীর্ঘ দিন পর্য্যন্তও কেমন সুস্থ ও সুন্দর থাকে, বৃদ্ধ বয়সেও শারীরিক সামর্থ্য হারায় না আর আমরা ভদ্রশ্রেণী এই ব্যায়াম বিমুখ হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যেই ভুঁড়িযুক্ত, লোলচর্ম্ম এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি। ইচ্ছাশক্তির সহিত নিয়মিত ভাবে ব্যায়াম করিলে ইহার ফল অসামান্য, ইহাতে আমাদের বেশী সময় নষ্ট বা অন্য ক্ষতিও হয় না। কিন্তু হায়, আমাদের এমন শিক্ষা, এমনি অভ্যাস এবং আলস্য যে আমরা এই মহামূল্য জিনিষে একেবারে উপেক্ষা করিয়া থাকি। প্রত্যহ মাত্র দশ পনের মিনিট ব্যায়াম করিলেই আমরা ব্যায়ামের সুফল সম্যক লাভ করিতে পারি এবং কে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্য হইতে এই দশ পনের মিনিট কাল ব্যয় করিতে না পারেন? যিনি কর্ম্ম জীবনের যে অবস্থাতেই থাকুন এ বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান থাকিলে এই সামান্য সময় ব্যয় করিয়া শারীরিক ব্যায়াম করিতে কাহারও আটকায় না এবং ইহা দ্বারাই তিনি আশাতীত ফল পাইতে পারেন। তবে এ বিষয়ে চাই শুধু একাগ্রতা, নিয়মনিষ্ঠা ও প্রফুল্লতা।

গ। তৈলাভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে রাখিবে। অভ্যঙ্গ ও উদ্বর্ত্তন দ্বারা চর্ম্ম মসৃণ, সতেজ, মাংসপেশী, স্নায়ু প্রভৃতি কার্য্যক্ষম থাকে এবং এই জন্য চর্ম্মের লোলতা ইত্যাদি জরাবস্থা সহসা আসিতে পারে না। তৈলমর্দ্দন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণও বলিয়া গিয়াছেন যে ঘৃতের চেয়ে তৈলের উপকারিতা আটগুণ বেশী, কিন্তু ভক্ষণে নহে—মর্দ্দনে। কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য শিক্ষা ও অনুকরণের কল্যাণে আমাদের এই প্রথা প্রায় লোপ হইতে বসিয়াছে। আজকাল আর প্রায় কাউকে তৈল মর্দ্দন করিতে দেখা যায় না। অনেকেই ইহা অসভ্যতার চিহ্ন বলিয়া বিদ্রূপের চোখে দেখিয়া থাকেন।

ঘ। মধ্যে মধ্যে উপবাস ও ফলমূলাদি আহার করা স্বাস্থ্য ও যৌবনের পক্ষে একান্ত অনুকূল। এইজন্য আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে যে একাদশীর উপবাস ও মধ্যে মধ্যে অন্য উপবাসাদির ব্যবস্থা আছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ উপবাস দ্বারা জঠরাগ্নি উদ্দীপ্ত ও শরীরস্থ যন্ত্রসমূহ সতেজ থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি সাম্যভাবে থাকায় আমাদের স্বাস্থ্যের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষ বিধান হইয়া থাকে। যৌবনরক্ষা ও দীর্ঘজীবন লাভের জন্য উপবাস ও মিতাচার প্রধান সহায় বলিয়া মনে রাখিবে। আমরা বর্ত্তমানে অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িয়াছি—এই সব শাস্ত্রোপদেশের প্রকৃত মর্ম্মও বুঝি নি বা বুঝিতে চেষ্টাও করি না এবং ইহারই ফলে অকালে জরাগ্রস্ত ও নানা ব্যাধিযুক্ত হইয়া পড়িতেছি।

ফলমূল আহার একান্ত মঙ্গলজনক। বড় বড় ডাক্তারের মতে সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ একদিন শুধু ফলমূল খাইয়া থাকিলে স্বাস্থ্য ও যৌবনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়। সুপক্ক টাটকা ফলই প্রশস্ত এবং এই ফলমূল আমাদের খাদ্যের একটা প্রধান অংশ হওয়া উচিত। শিক্ষার অভাবেই হউক আর বিকৃত রুচির জন্যই হউক আমরা এখন বাজে খাবার পচা তৈলে ও ঘৃতে ভাজা বাসি ও বিষাক্ত দ্রব্যাদি খাইতে অভ্যস্ত হইতেছি, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। ঐ অর্থে উৎকৃষ্ট ফলমূল যে সময়ের যা তাহা অনায়াসে খাইতে পারি এবং উহা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে পরম মঙ্গলজনক তাহা সকলেরই মনে রাখা উচিত।

(স্বাস্থ্য-সমাচার)

কবি-প্রিয়া

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী]

কবির কুঞ্জবনে,
সবে তখন অরুণ আলো
সুপ্ত পাখীর ঘুম ভাঙ্গালো,
নিশি রাতের আঁধার কালো
মিশল আলোর সনে,
পাতার বুকে ফুটল কুঁড়ি
কবির কুঞ্জবনে।

তাল নারিকেল শিরে,
ঝিকিমিকি রোদের আলো
পাতার আগায় রং ফলালো,
নিভে এল দিনের আলো
আঁধার আসে ধীরে ;
বনের পাখী চল্‌ল ফিরে
আপন আপন নীড়ে।

ভাঙ্গল কবির ঘুম ;
ওষ্ঠ পুটে ছিল লেগে
আঁখির পাতায় ছিল জেগে,
দুরন্ত সেই প্রেমাবেগে
মানস প্রিয়ার চুম ;
প্রভাত আলোক চোখে লাগি
ভাঙ্গল কবির ঘুম।

সাগর-উপকূলে,
ক্লান্ত কবি দেখল চেয়ে
অস্তপারের কিনার বেয়ে ;
মানসী তার ডাকটি পেয়ে
ঘোমটা খানি খুলে
তার পানেতেই আছে চেয়ে
সজল আঁখি তুলে।

বিষাদ মলিন মুখে,
উদাস কবি কণ্ঠে তরুণ
বিজয়া গীত গাইল করুণ,
ছিল তখন দীপ্ত অরুণ
মাঝ আকাশের বুকে,
উদাস কবি রইল চাহি
বিষাদ মলিন মুখে।

সূর্য্য তখন পাটে,
তরীর বাঁধন খুলে দিয়ে
ব'লছে কবি যাচ্ছি প্রিয়ে,
সিন্ধুপারের বুক বাহিয়ে
মানস প্রিয়ার ঘাটে,
নিরুদ্দেশের যাত্রী চলে ;
সূর্য্য তখন পাটে।

মাষ্টার মশাই

[শ্রীভারতকুমার বসু]

(১)

আশ্বিন মাস। বিকেলবেলা।...

পশ্চিম—আকাশের কোণে অস্তগামী সূর্য্য তখন ধীরে ধীরে কোন্ অনন্ত রহস্যের বুকে মিশে যাচ্ছিল।...

জমীদার বাড়ীর একটা ঘরের মধ্যে একটা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ সেই অস্তোন্মুখ সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিল।...

"মাষ্টার মশাই!"

সাড়া নেই।

"মাষ্টার মশাই, শুনচেন?"

ক্ষিতীশের যেন চমক ভাঙলো। স্বপ্নে জেগে ওঠার মত সে তাড়াতাড়ি জানলার কাছ থেকে চ'লে এসে, একটা চেয়ারের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে বললে, "অ্যাঁ,—ও—অরুণা। কি বলচ?—"

"আজ দুর্গা প্রতিমার বিসর্জ্জন দেখতে যাবেন না?—"

ক্ষিতীশ মুহূর্ত্তের মধ্যে একবার তার সেই জীর্ণ মলিন কাপড়টার দিকে চেয়ে নিয়ে ব্যথা-ভরা স্বরে বললে, "নাঃ! আমি আর যাবো না অরুণা, তোমরা যাও।—"

অরুণা একেবারে সাজ-গোছ ক'রে বড় আশাতেই এসেছিল ক্ষিতীশের কাছে, ইচ্ছেটা সেও যায় তাদের সঙ্গে গঙ্গার ঘাটে বিসর্জ্জন দেখতে। কিন্তু মাষ্টার মশাইয়ের কাছে হঠাৎ এরকম অপ্রত্যাশিত উত্তর পেয়ে সে শুধু দমে গেল তা' নয়, সঙ্গে সঙ্গে একটু মনঃক্ষুণ্ণও হ'লো। একটু এগিয়ে এসে সে মিনতি-ভরা স্বরে বললে, "কেন যাবেন না মাষ্টার মশাই, চলুন না আমাদের সঙ্গে!"

ক্ষিতীশ তেমনি ম্লান-স্বরে বললে, "আমি ত যেতে পারবো না, অরুণা!—"

সরল-প্রাণ বালিকা অরুণা, মাষ্টার মশাইয়ের এই কথাগুলো ভাল ক'রে বুঝতে পারলে না। সে নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, মাষ্টার মশাই?"

"এমনি।"

"ও, তা হ'লে আপনি ইচ্ছে ক'রে যাবেন না, বলুন!"

এইবার অরুণার বিষম অভিমান হ'লো। সে বললে, "আপনি যদি না যান, আমিও কথখনো যাবো না, ব'লে দিচ্ছি—"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সে আবার বললে, "আপনি তা' হ'লে যাবেন না ত?—"

ক্ষিতীশ মলিন স্বরে বললে, "আমি না গেলেও ত চলবে, অরুণা! তোমার দাদা ত আছেন।—"

"আচ্ছা বেশ। তা' হ'লে যাবেন না ত?" বলেই অরুণা সে ঘর থেকে বেগে বেরিয়ে গেল।

একেবারে নিজের ঘরে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে সে তার পোষাক পরিচ্ছদ সব খুলে ফেলে সাদাসিদে পোষাক পরলে। তার কেবলই মনে হ'তে লাগলো, "আমি মাষ্টার মশাইকে অত ক'রে বললুম, আর তিনি তা' অগ্রাহ্য করলেন!..."

রাগে অভিমানে তার বুকটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। জানলার পাশে এসে দাঁড়িয়ে সে ঐ কথাটা নিয়েই আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলো।...

এমন সময় বাইরে দরজার পাশ থেকে তার মায়ের গলা পাওয়া গেল, "অরুণা! অরুণা!"

স্বাভাবিক স্বরে অরুণা ভেতর থেকেই বললে, "কেন, মা?—"

"বেড়াতে যাবি নি আমাদের সঙ্গে?"

"না, মা।"

"কেন রে, কি হয়েচে?"

"বড্ড মাথা ধরেচে।—"

(২)

ক্ষিতীশ ঘরে বসে পড়ছিল।

অরুণা ঘরের ভেতর ঢুকে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলে, "মাষ্টার মশাই!"

বই থেকে মুখ তুলে অরুণার দিকে চেয়ে ক্ষিতীশ বললে, "কেন?"

অরুণা ধীরে ধীরে গিয়ে ক্ষিতীশের পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করলে। তারপর ব্যথা-ভরা মৃদুস্বরে বললে, "আমরা আজ গিরিডি যাচ্চি।"

ক্ষিতীশের বুকের শিরায় শিরায় রক্ত-স্রোত একবার

চন্‌মন্ ক'রে উঠলো। তা দমন ক'রে স্বাভাবিক স্বরেই সে বললে, "তা' জানি। কখন যাচ্চ ?"

"বিকেল পাঁচটার ট্রেণে।"

ক্ষিতীশ বললে, "হুঁ।"

অরুণারা যে কেন গিরিডিতে হঠাৎ এমন সময় যাচ্চে, এ কথাটা লজ্জায় অরুণা নিজে না বললেও সে খবর আগেই পেয়েছিল ক্ষিতীশ।

সেদিন সকালেই অরুণার বাবার গিরিডি থেকে একখানা টেলিগ্রাম পাওয়া গেল যে, সেখানে তাঁর এক ম্যাজিষ্ট্রেট বন্ধুর ছেলের সঙ্গে তিনি অরুণার বিয়ের ঠিক করেছেন। সমস্ত কথাই পাকাপাকি হ'য়ে গেচে। আর চারদিন পরে অরুণার বিয়ে।

কথাটা শুনেই ক্ষিতীশের বুকটা কেমন খাঁ খাঁ করে উঠেছিল।

...সে চির অসহায়। স্নেহ, আদর যে কি, তা এর' পূর্ব্বে জীবনে কখনও জানতো না। সেই অনাদৃত, সহায়-হীন, বন্ধুহীন হ'য়ে সে যখন অরুণাদের বাড়ীতে এল, তখন একে একে তার বুকের সেই লুকানো ব্যথা একটু একটু ক'রে ধুয়ে মুছে দিয়েছিল এই অরুণা—অসময়ে তাকে সাহায্য ক'রে, দরিদ্র হ'লেও ছোট বোনটির মত ভক্তি, আদর ক'রে, তার জীবনের লক্ষ্যহীন ধারা বদলে দিয়ে—খাঁটী বন্ধুর মত। সেই অরুণাকে ছেড়ে কি ক'রে থাকবে সে ? আর, কার কাছেই বা থাকবে ? কে তাকে অমনটী ক'রে যত্ন করবে ? কে তার দুঃখ-কষ্টে দরদী বন্ধুর মত সমবেদনা-ভরা বুকে নিরালে গিয়ে কেঁদে কেঁদে আসবে !...

ক্ষিতীশ মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলে—আর ছয় ঘণ্টা। তারপর..., আর সে ভাবতে পারলে না। তার চোখের কোলে দুটী ধারা টল্ টল্ করতে লাগলো। সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে !...

অরুণা ছলছল চোখে ধরা গলায় বললে, "আর দেখা হ'বে না, মাষ্টার মশাই। আপনার কাছে যদি কোন দোষ—"

অরুণার চোখের কোল দিয়ে বিদ্রোহী অশ্রুধারা ঝ'রে ঝ'রে পড়তে লাগলো। ক্ষিতীশ চাইলে অরুণার দিকে। তারও চোখের অশ্রু উপ্‌চে বেরিয়ে পড়লো। সে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। কাঁদতে কাঁদতে বেগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল,—চোখের পড়া এক এক ফোঁটা জলে মেঝের ওপর স্মৃতির আল্‌পনা এঁকে দিয়ে।...

সেদিন সমস্তক্ষণ ক্ষিতীশ যে কোথায় ছিল, তা কেউ এল। ঠিক সেই সময়েই অরুণার বড় ভাই হরেন অরুণাদের ট্রেণে তুলে দিয়ে ফিরে এল।

ক্ষিতীশকে দেখে হরেন বললে, "যাক্, এইবার বিয়েটা নির্ঝঞ্ঝাটে চুকে গেলেই বাঁচা যায়, কি বলেন ক্ষিতীশবাবু ?"

ক্ষিতীশ অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক স্বরে বললে, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" মনের ভেতরটায় তখন কিন্তু তার ঝড় বইছিল।

হরেন বললে, "চলুন, আমরাও যাচ্চি এই পরশু দিন। এদিক্‌কার বাজার কিছু করতে হ'বে। সেইটে সেরেই রওনা হওয়া যাবে।"

ক্ষিতীশ গম্ভীর ভাবে বললে, "আচ্ছা।"...

(৩)

যেদিন ক্ষিতীশ আর হরেনের গিরিডি যাবার কথা, সেদিন সকালে উঠেই ক্ষিতীশ তার দামী দামী বইগুলো একটা আলমারীর ভেতরে থাকে থাকে সাজিয়ে রাখলে। তারপর আস্তে আস্তে একবার এল দেয়ালে টাঙানো এমন একটী ছবির সামনে, যা' সে জীবনে কখনও ভুলতে পারবে না, আর যার স্মৃতি দিবানিশি জেগে থাকবে তার বুকের মধ্যে অনন্ত সুষমায়—ব্যথার সময় ইঙ্গিতে তার কচি বুকখানির স্নেহের পরশ বুলিয়ে, সমস্ত বেদনা দূর ক'রে দিতে।...

সেই ছবিটীর দিকে চেয়ে' চেয়ে' ক্ষিতীশের চোখদুটী ভিজে হ'য়ে উঠলো। একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আর একবার তা' দেখে নিয়ে সে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর তেমনি নীরবেই বাড়ী ছেড়ে চ'লে গেল। কেউ দেখলে না, কেউ জানলে না, কি অভিমানে, কিসের ব্যথায় সে কোন্ নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলে।...

* * * *

অরুণার বিবাহ রাত্রে তার আত্মীয় পরিজনেরা যে সব যৌতুক দিয়েছিলেন, সব চেয়ে সেরা উপহার এয়েছিল ডাক পার্শেলে। সমজদার জহুরী তাকেই অমূল্য রত্নোপহার ব'লে মেনে নিলেন।

সেটী ছিল একছড়া হীরের নেকলেস, খুব সাদাসিদের ওপর, অথচ সুন্দর ! ডালাটী তুলতেই ভেতর থেকে কালীতে লেখা এক টুকরো কাগজ পাওয়া গেল। তাতে লেখা ছিল :—

"অরুণার শুভ বিবাহে মঙ্গল আশীর্ব্বাদ।" লেখকের নাম-ধাম কিছুই ছিল না।—

কিন্তু ঐ লেখার প্রত্যেক বর্ণটী যেন বলে দিচ্ছিল এ কোন্ মরম-ভাঙা বুকের আকুল অশ্রুতে ভেজা প্রাণের বেদন তার প্রিয়জনকে নিবেদন করছে।...

লজ্জাবনতা

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ
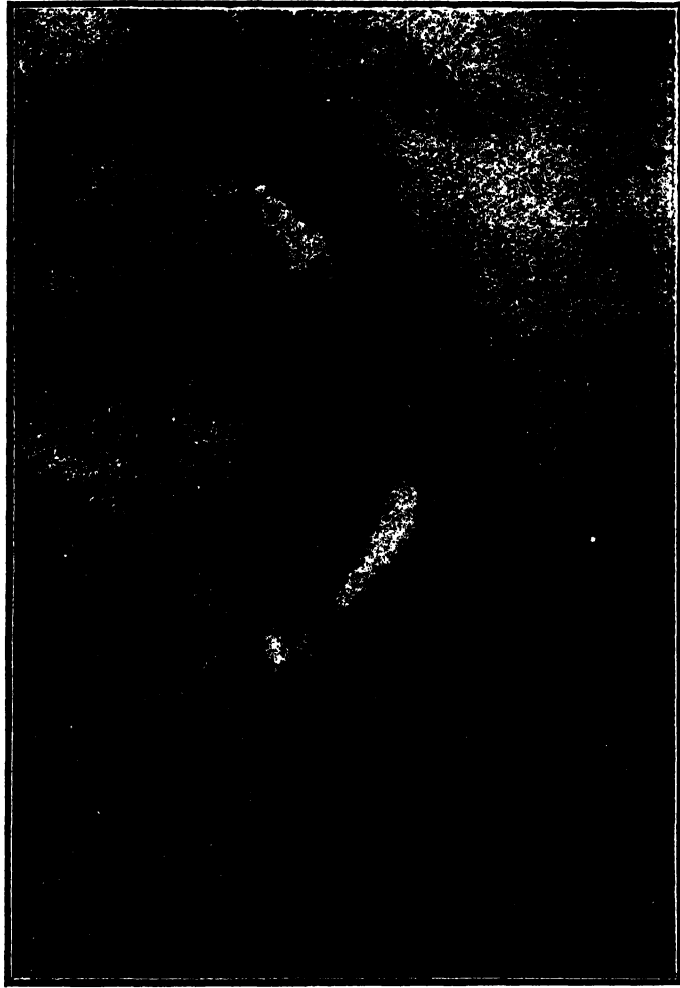
তৃতীয় বর্ষ ; প্রথম খণ্ড]   ১লা জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৩।   [২৫শ সপ্তাহ

নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেনে ধনি, হয়েছে এমনি,
কহ না কি লাগি শুনি।

* * * *

সুধা ছানিয়া কেবা ও সুধা ঢেলেছে গো
তেমনি শ্যামের চিকণ দেহা।
অঞ্জন গঞ্জিয়া কেবা খঞ্জন আসিল রে
চাঁদ নিঙ্গাড়ি কৈল থেহা॥

*   *   *   *
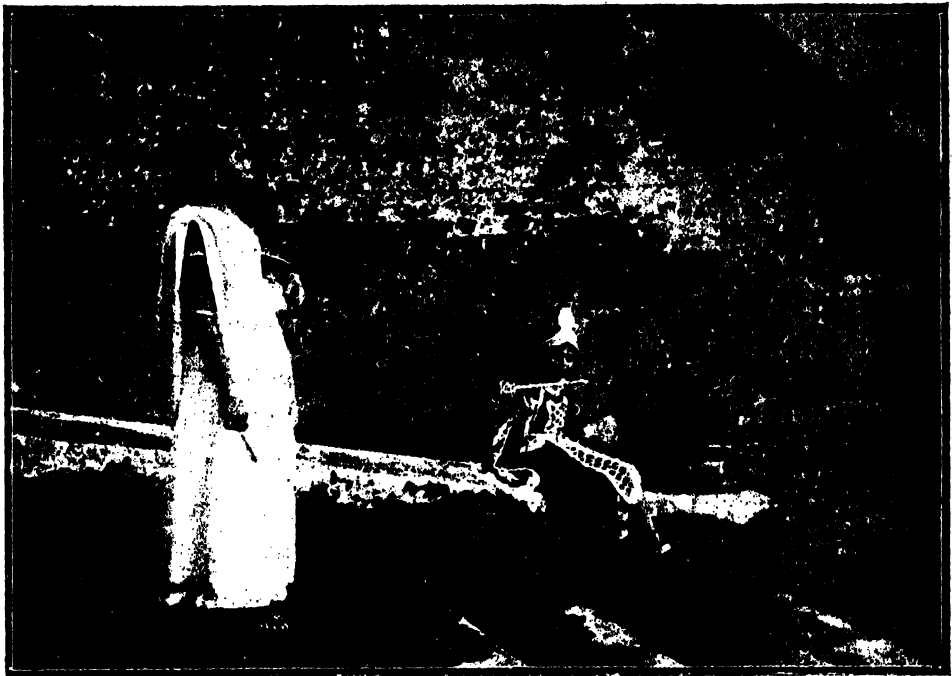
কেমন মোহিনী দেহ।
যদি সহায় পাই এমতি হয় ;
তা সহ করি যে লেহ॥

*　　*　　*

*　　*　　*　　*

ব্যর্থ

[শ্রী———]

বসন্তের সন্ধ্যা তখনও হয় নাই। রোদের আলো চারিদিকে ঝিলিক মারিতেছিল। দক্ষিণের মৃদুল হাওয়া রং বেরংয়ের ফোটা ফুলের গন্ধ আনিয়া ঘরখানাকে পূর্ণ করিয়া দিতেছিল। দখিণ হাওয়ায় কি যেন ছিল—একটা মাদকতা; তাহাকে মাতাল করিয়া তুলিল। সে তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল,—তা'র অতীতের কথা, মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছিল,—পুরাণ স্মৃতি।

সে ভাবিতেছিল,—কত রজনী অশ্রুধারার ভিতর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে। মনে পড়িল তার জীবনের ব্যর্থতা,—বুক ভরা ব্যথা আর নৈরাশ্য।

বাগানের লতায় পাতায় জীবনের যে পরিপূর্ণতা ফুটিয়া একটা সৌন্দর্য্যের বিকাশ করিতেছিল, তার জীবনেও তো একটা পরিপূর্ণতা আসিতে পারিত।

সে জীবনের ক্ষুদ্র ঘটনাটিও তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিল, —জীবনে কি পাইয়াছি,—কি পাই নাই। এমন সময় মনের কোণে ভাসিয়া উঠিল,—একটী সন্ধ্যার ছবি। তার সঙ্গে সঙ্গে তার বাকী জীবনটা মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিল। মনে পড়িল,—

একদিন দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া দরজা খুলিয়াই দেখিল, নিশীথ।

তাহাকে বলিল,—দাঁড়াও আস্‌ছি।

জামাটা গায়ে দিয়া তাহারা বাহির হইয়া পড়িল। মাঠের মধ্যে কিছুদূর যাইয়াই নিশীথ বলিল,—এই প্রবন্ধটী পড়ে দেখ।

প্রবন্ধটী ছিল তার ছাত্রীর লেখা—"নারীর জন্ম।" নারীর জন্মের কথাগুলি সেদিন প্রাণের মধ্যে গাঁথিয়া রহিল। চোখের জলে পায়ের তলা ভিজিয়া গেল। সমবেদনায় বুক ভরিয়া উঠিল। তাহাকে কি করিলে সুখী করা যায়,—এ লইয়া আমরা সেইদিন অনেক কল্পনার জালই বুনিয়াছিলাম। কিন্তু কোন মীমাংসাই করিতে পারে নাই। সেইদিন হইতে তাহার অন্তর নিভার পায়ে স্নেহ, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা একে একে নিঃশেষ করিয়া দিল। নিভার পায়ে তাহার ভালবাসার অর্ঘ্যটি কেমন তা সে কোন দিনই বুঝিতে পারে নাই। তাহার ভালবাসা বুঝি ভাষা দিয়া সাজাইয়া লোকের সম্মুখে ধরা যায় না। সে অব্যক্ত।

মানব জীবনের যৌবনের দিনগুলিই সাফল্যের যুগ। যৌবন প্রাণের ভিতর উন্মাদনা আনিয়া দেয়। সুখের রঙিন ছবি চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখে। গতি তার অপ্রতিহত দ্রুত। সেও তখন যৌবন রাজ্যের সীমায় পৌঁছিয়াছিল। কত রং বেরংয়ের আশা তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া থাকিত। একদিন একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া তাহার প্রাণে গ্রন্থকার হইবার একটা দুরাশা জাগাইয়া দিয়া গেল। যৌবনের উন্মাদনা কোন বাধাই মানিল না। একদিন কয়েকটি বন্ধু মিলিয়া একখানা পত্রিকা বাহির করিয়া ফেলিল। উদ্দাম বাসনার স্রোতে গা ছাড়িয়া দিল। কিন্তু প্রবন্ধ পত্রিকায় দিবার পূর্ব্বে নিভাকে পড়াইতে না পারিলে তাহার প্রাণে একটা অতৃপ্তি ঘুরিয়া বেড়াইত। নিশীথকে দিয়া সে প্রতি বারই নিভাকে প্রবন্ধ পাঠাইয়া দিত, আর তার ছবি প্রাণের মাঝে কল্পনার তুলি দিয়া বসিয়া বসিয়া আঁকিত। নিভার মুখের একটু প্রশংসা তাহার দ্বিগুণ উৎসাহ আনিয়া দিত।

এমন করিয়াই একটা রঙিন নেশার মাদকতা লইয়া তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল।

নিশীথ পড়াইতে যাইত আর সে কল্পনার ছবি লইয়া উদাসের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াইত। ফিরিবার পথে নিশীথকে ডাকিয়া লইয়া আসিত। কতবার নিভাকে দেখিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু রাজ্যের সমস্ত লজ্জা আসিয়া তাহাকে বারণ করিত। দিনগুলি সুখ, দুঃখ, গড়া ভাঙ্গার ভিতর দিয়াই কাটিয়া যাইতেছিল। এমন সময় নিশীথকে তাহার দাদা টেলিগ্রামে ডাকিয়া পাঠাইল। নিশীথকেও বাধ্য হইয়া যাইতে হইল।

কয়দিন সে নিভার সংবাদ পায় নাই। প্রাণের ভিতর একটা ব্যথা গুম্‌রিয়া উঠিতেছিল। তখন সে মনে মনে ঠিক করিল,—একদিন নিভাদের বাসায় যাইতে হইবে। কিন্তু যাই যাই করিয়াও যাইতে পারছিল না। শত বাধা

আসিয়া তাহাকে বাধা দিত। কতদিন নিভাদের বাসার নিকটে যাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও ডাকিতে সাহস হয় নাই। একদিন সত্যিই নিভাদের বাসার পাশের বাড়ীর একটী কুলী মেয়েকে ডাকিল। মেয়েটির নাম ছিল "মহুয়া"। মহুয়াকে বলিল—এই চিঠিখানা তোমার সেজদিকে দিয়া এস। চিঠিতে লিখিল,—

মহাশয়া,—

আপনার নিকট যে আমাদের "শান্তি"খানা আছে অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। ইতি

শান্তি সম্পাদক।

তাহার প্রাণ বলিয়া উঠিল—"তুমি কি শান্তি লইতে আসিয়াছ? এখানেও ছলনা? হায় রে সভ্যতা। এই সভ্যতার দিনে সত্য কথা বলবারও সাহসটুকু নাই। প্রাণের ব্যথাও খুলিয়া দেখান যায় না।"

সন্দেহের দোলায় যখন সে দুলছিল তখন মহুয়া আসিয়া বলিল,—"মা আপনাকে ডাকছেন।"

থমকে দাঁড়াইল। বারান্দায় উঠিয়াছে, দরজা খুলিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল,—নীল সাগরের জলে ছোবান একখানা শাড়ী পরিয়া, চোখে মুখে লজ্জার আভা মাখিয়া একটী পঞ্চদশ বর্ষীয়া যৌবনোন্মুখী তরুণী দাঁড়াইয়া আছে। সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলটীর মতই তরুণীর মুখে চোখে রূপের হিল্লোল নাচছিল। কি তার রূপ। সন্ধ্যার ছায়া জগৎ ঘিরিয়া ফেলিয়াছে কিন্তু ঘরটি তরুণীর রূপের ছটায় জোছনা ভরা ছিল। তরুণীর কালো চুলে দোদুল বেণী, তাহার অগ্রভাগে একটী টক্‌টকে লাল সিল্ক ফিতা বাঁধা—সে এক অপরূপ শোভা। সে চকিতে তাহার পানে তাকাইল, দৃষ্টি দুইয়া গেল। মনে পড়িল,—

নীথর নীরবতা ভাঙ্গিয়া এক সৌম্যা শুভ্র বসনা নারী আসিয়া সস্নেহে বলিলেন,—বাবা, আমি তোমাকে ডাকিয়াছিলাম।

স্নেহ, করুণায় তাহার মুখখানি জল্ জল্ করিতেছিল। মনে হইল ইনি কোন্ স্বর্গের দেবী। ঠিক যেন ম্যাডোনার মূর্ত্তি। সেই দেবী মূর্ত্তি জীবনেও ভুলবার নয়। তিনি বলিলেন,—"তুমি যদি নিভাকে পড়াও তা হ'লে খুবই ভাল হয়। পড়াবে?"

সেইদিন সে মায়ের আদেশ মানিয়া লইয়াছিল। ঐ বিদ্যুৎ প্রভা তরুণীই ছিল তার বাঞ্ছিতা—নিভা।

মনে পড়িল সেদিন সে কত রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ঘুম তাহার সামনেও আসিল না। নিভার ঐ ঢলঢলে টল্‌টলে মুখখানাই তাহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার [illegible] প্রদীপের শিখাটি সমুজ্জ্বল করিয়া দিল।

তাহার আরো মনে পড়িল,—সে কেমন করিয়া পড়ার পরও গল্প করিয়া তিন চারিঘণ্টা কাটাইয়া দিয়া আসিত। নিভার মুখে চোখে রূপের হিল্লোল দেখিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। সেই গিয়াছে একদিন। তখন তার দুর্লভ যৌবনের দিনগুলিকে এক বিচিত্র শোভায় পূর্ণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিত।

তারপর মনে পড়িল,—যেদিন নিশীথ দাদার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল। সেদিন নিভার চোখে একটা আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মনে পড়িল,—সে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল,—নিশীথ নিভায় আসক্ত। নিভাও আসক্তা।

যখন বুঝিত নিভা কোনদিন তাহার হইবে না, তখন প্রাণে কি এক বেদনা অনুভব করিত!

সে কী বেদনা! সে বেদনা কাউকেও বুঝাতে পারতো না। মনটা তীক্ষ্ণ ছুরি দিয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া রক্তাক্ত করিয়া দিত।

তারপর তাহার মনে পড়িল,—যেদিন তাহার মনের কোণে ভাসিয়া উঠিয়াছিল—ত্যাগের মহিমা। মনে পড়িল, সেইদিন হইতে সে কেমন করিয়া নিশীথ নিভার মধ্যে হাইফেন হইয়া বসিল।

কিছুদিন পরে নিশীথ চাকুরীর উদ্দেশ্যে বিদেশে চলিয়া গেল। তাহার চোখে ভাসিয়া উঠিল,—বিদায়'খনের নিভার চোখের করুণ চিত্র,—একটা বিষাদের ছায়া। প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়া বিষাদের কালিমা সে লুকাইতে চাহিল। কিন্তু পারিল না। শত গুণে ফুটিয়া বাহির হইল।

রঙিন কভারের ভিতর দিয়াই তাহাদের মধ্যে "মন্দ মধুর হাওয়া" বহিতে লাগিল। কিন্তু দুই দিনের মধ্যেই বাবুর

বাঁধ ভাঙিয়া গেল। রুদ্র কঙ্কণের ঝঙ্কার চলিতে লাগিল। রুদ্র কঙ্কণের ভিতর দিয়া দুইটি বছর কাটিয়া গেল। নিশীথ আবার ফিরিয়া আসিল। তাহাকে দেখিয়া তাহার মধ্যে একটা সন্দেহের কালো মেঘ জমাট বাঁধিয়া বসিল। নিভার দুঃখের কথা ভাবতে যাইয়া তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। একটা সামান্ত ঘটনা তাহাদের সম্মুখে বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। তাহাদের বীণার তার ছিঁড়িয়া গেল।

নিভার পানে চাহিয়া তাহার প্রাণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সে চাহিয়াছিল নিশীথকে দিয়া নিভাকে সুখী করিতে। সেদিন তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রাণ উন্মুখ হইয়া উঠিল।

একদিন ভাবিল,—এই সভ্যতার কৃত্রিম বেড়াটি ভাঙিয়া দিয়া নিভাকে সব কথা খুলিয়া বলে,—তার জন্ম তাহার প্রাণ কত অনুরাগে ভরা। তার জন্ম এই ক্ষুদ্র হৃদয় কি ভাবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তাক্ত হইয়া যাইতেছে।

সে কি তাহার দুঃখে গলবে না? তাহাদের এই ভাঙাও কি তাহাদের মিলন করিয়া একটা অনাবিল শান্তির সৃষ্টি করিতে পারিবে না? নিভার উপর এই যে তার প্রবল আকর্ষণ এ কি মানুষের গড়া? না, না, এই দানের অপমান করবার সাহস তাহার নাই।

মনে পাড়ল সেদিন সে কেমন করিয়া প্রাণের সমস্ত শক্তি এক করিয়া নিভাকে বলিয়াছিল,—"নিভা আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি কি আমার হইবে?"

তাহার হাতে ধরিল, পায়ে পড়িল। সে ছোট্ট একটী কথায় বলিল,—"না!"

সে যখন "না"টি বলিল তখন সে মুগ্ধ নেত্রে অবাক হইয়া তাহার পানে চাহিয়াছিল। হয়ত নিভা ভুল করিয়াছিল। তবু সে ভাবিয়াছিল,—নারীর প্রেম কি গভীর কি প্রশান্ত। তাহাকে তখন কি সুন্দরই না দেখাইতেছিল। তাহার চোখে মুখে একটা আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

তারপর নিভা ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। সে স্তব্ধ হইয়া শুইয়া রহিল। অনুশোচনার একটা ধাক্কা খাইয়া সে বাহিরে আসিয়া পড়িল।—আসিয়া ভাবিয়াছিল,—"ক্ষণিকের উত্তেজনায় সে এ কি করিল? এতদিনের গড়া সম্বন্ধ মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতায় ভাঙিয়া দিল।" সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, বাসায় ছুটিয়া আসিল।

বাহিরের শিশু কণ্ঠের কোলাহল আসিয়া তাহার চমক্ ভাঙিয়া দিল। বিছানা হইতেই মাথা উঠাইয়া জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল,—দূরে বাগানের ভিতর মিঃ বাক্‌চির ছেলে ও মেয়ে কতকগুলি সদ্য ফোটা গন্ধ-পাগল ফুল লইয়া খেলা করিতেছে। আর দূরে বসিয়া আছে মিঃ ও মিসেস্ বাক্‌চি,—ঠিক পাশাপাশি।

তাহার প্রাণে দারুণ আঘাত লাগায় সে বিছানার মধ্যে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল। না, না, আজ আর কোথাও সে যাইবে না, কোন কাজই করিবে না। কাল হইতে সে আপনাকে দুনিয়ার কাজে বিলাইয়া দিবে। আজ নয়! আজকার দিনটী তা'র মানসী—নিভার। আজ সে কারো নয়! বুকের উপর হাত রাখিয়া সে অসাড়ের মত বিছানায় পড়িয়া রহিল। ভবিষ্যৎটা একবার দেখিতে চেষ্টা করিল। বসন্তের জোছনা তাহার গায়ে ছড়াইয়া পড়িল। সে নড়িলও না। পড়িয়া রহিল একটা প্রাণভরা আকাঙ্ক্ষা লইয়া।

—

মরণ পথের যাত্রী

[শ্রীজিতেন দাসগুপ্ত]

—এক—

রাত তখন প্রায় বারোটা। বায়স্কোপ দেখে ফিরছি। সন্ধ্যাবেলায় বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশের পশ্চিম দিকটায় তখনও পুরো মাত্রায় মেঘ জমে ছিল। রাস্তা একেবারে ফাঁকা—ক্বচিৎ দুই একজন পথিক দেখা যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে এক একখানা রিক্স ঠুং ঠুং শব্দ করে অবাধ গতিতে চলে যাচ্ছিল।

ধর্ম্মতলার মোড়ে এসে ভাবলাম— এই দুর্য্যোগের রাত—একখানা রিক্স করে যাওয়া যাক। প্রায় পনেরো মিনিট কাল রিক্সর জন্য অপেক্ষা করলাম- কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ একখানা গাড়ীও চোখে পড়ল না। তখন দুর্গা নাম স্মরণ করে সোজা হাঁটতে আরম্ভ করলাম।

নানাকথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে অনেকটা পথ চলে এসেছি। হঠাৎ উপরের দিকে চেয়ে দেখি,—সমস্ত আকাশ কালো মেঘে একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে আর মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আকাশের অবস্থা দেখে মনে হ'ল, শীগ্‌গিরই বৃষ্টি আরম্ভ হবে। তাড়াতাড়ি বাড়ী পৌছবার জন্য সরু একটা গলির ভিতর ঢুকে পড়লাম। গলিটার খানিকটা এসে দেখ্‌লাম, রাস্তার প্রায় সবগুলি বাতিই নিভে গেছে। ভীষণ আঁধারে পথ চলা অসম্ভব। গা-টা বড় ছম্ ছম্ করতে লাগ্‌ল—মনে ভয়ও হ'ল। যদি কোন গুণ্ডা এসে আক্রমণ করে তবে তো নিরুপায়। তার উপর এ পল্লীটাও তত ভাল না---যত মাতাল বদমাইসের আড্‌ডা। নানারকম সন্দেহ মনে আসতে লাগল। একবার ভাবলাম,—ফিরে যাই ; আবার ভাবলাম—এতটা পথ যখন চলে এসেছি, তখন আর ফিরেও বিশেষ লাভ নেই।

খানিকটা পথ এসে দেখলাম অদূরে সারি সারি কয়েকটা বাড়ীতে তখনও আলো জলছে। মনে একটু আশার সঞ্চার হ'ল। সাহসে ভর করে সেই দিকে ক্ষিপ্রগতিতে ছুটে যেতে লাগলাম।

খানিকটা যেতে না যেতেই একটা সুমিষ্ট সঙ্গীতের ধ্বনি আমার কাণে এল। সঙ্গীতের পদগুলি প্রথমে বুঝতে পারলাম না। আর একটু এগিয়েই গানটা আমার কাছে বেশ সুস্পষ্ট হয়ে গেল।

"ওগো তোরা কে যাবি পারে ?
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।
ওপারের উপবনে কত খেলা কত জনে।
এপারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে।"

সঙ্গীতটা বামা কণ্ঠ নিঃসৃত। রাতে এই সব পল্লী সঙ্গীতের ধ্বনিতে ভরপুর হয়ে থাকে। গানটা শুনেই অলক্ষ্যে আমার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসি বেরিয়ে এল। ভাবলাম—এরাও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াতে পারে নি। কিছুদিন পূর্ব্বে যারা শুধু অশ্লীল গান গেয়েই সন্তুষ্ট থাকত—আজ তাদের ভিতরও আধুনিকতার ছাপ পুরো মাত্রায় এসে পড়েছে। আবার শোনা গেল—

"এই বেলা বেলা আছে, আয় কে যাবি ?
মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি ?
সূর্য্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে,
খেয়া বন্ধ হয়ে যাবে সন্ধ্যা আঁধারে।"

গানটার ঢেউ এসে আমার প্রাণটাকে আকুল করে তুলল। কী সুন্দর ভাব এই সঙ্গীতে। প্রাণের নিভৃততম কোণে গিয়ে আঘাত করে এর প্রতি ছত্র। আমি বগান শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গেলাম।

আমি বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলাম যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। শীগ্‌গিরই আমায় বাড়ী পৌছাতে হবে। যখন গানটা শেষ হয়ে গেল, তখন দেখলাম যে আমি একটা বাড়ীর পানে হাঁ

করে তাকিয়ে আছি। মনে বড় ধিক্কার এল। এই গভীর রাতে এই পল্লীর ভিতর এরকম অবস্থায় কেউ যদি আমাকে দেখে, তবে সে কি ভাব্‌বে ?—বড়ই লজ্জার কথা হবে সেটা।

এবার তাড়াতাড়ি হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ভাবতে লাগলাম—এই সব পতিতাদের কথা। এদের সদাহাস্য প্রফুল্লিত মুখের আবরণে এরা যে কত বড় একটা দুঃসহ জ্বালা লুকিয়ে রেখেছে—তা মনে হলে সমবেদনায় বুকটা ভরে ওঠে। এদের মনে কোথাও এক কণা শান্তি নেই। যদি তাদের হৃদয় চিরে দেখা সম্ভব হ'ত—তবে দেখা যেত, সেখানে উত্তপ্ত মরুভূমির মত শুধু তপ্ত বালুকণা ধূ ধূ করছে—একবিন্দু জল কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে অনেকে নিজেদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও, হিন্দু সমাজের কঠিন নিষ্পেষণে জর্জ্জরিত হয়ে এই ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করছে—আবার কেউ কেউ নিজের সামান্য একটু ভুলের জন্য এই কাজ করেছে—কিন্তু এখন হয়তো তাদের অনুতাপ এসেছে।

—হঠাৎ একটা রিভলভারের শব্দ কাণে এল। আমি আঁৎকে উঠলাম। মনে হ'ল যেন পাশের বাড়ী থেকে এই শব্দটা এসেছে। সেই বাড়ীটার দিকে তাকাইয়া দেখি,—রিভলভার হাতে একটি লোক উন্মত্তবৎ আমার দিকে দ্রুত গতিতে ছুটে আসছে। আমার মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। মুহূর্ত্ত মধ্যে লোকটাকে একবার ভাল করে দেখে নিলাম। দেখলাম—লম্বা দোহারা চেহারা, গায়ের রং ফরসা। পরণে একখানা সাদা ধুতি, গায়ে একটা সিল্কের জামা, এক পায়ে একখানা জুতা—আর এক পা নগ্ন, হাতে একটা রিভলভার।

তাকে ঐ অবস্থায় দেখে আমার প্রাণ উড়ে গেল। অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করে খপ্ করে তার হাতটা ধরে ফেললাম। লোকটাকে ধরা মাত্রই সে চম্‌কে উঠল। একটু সম্‌‌‌লে নিয়ে আমাকে বল্‌ল—কে হে তুমি ? ভাল চাও, তো ছেড়ে দাও, নইলে—

আমি আর একটু শক্ত করে তার হাতটা ধরে বললাম—প্রাণ থাকতে আমি তোমাকে ছাড়ব না।

লোকটা একটু থতমত খেয়ে গেল ! একটু পরেই সে তার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল। ছেলে বেলা থেকেই শক্তিমান বলে আমার বিশেষ খ্যাতি ছিল। আমিও আমার শেষ সামর্থটুকু ব্যয় করে তাকে আটকে রাখতে বদ্ধপরিকর হলাম।

কিছুক্ষণ পরে সেই বাড়ীটা থেকে একটা ভীষণ গোলমালের শব্দ কানে এল। কে যেন চিৎকার করে বল্‌ল—মায়াকে কে খুন করে পালিয়েছে। তখন আমার একটু সাহস হল। আমি সাহায্যের জন্য চিৎকার করতে লাগলাম দেখতে দেখতে সেই বাড়ীটা থেকে আলো নিয়ে কয়েকটি স্ত্রী পুরুষ বেরিয়ে এল। আমি তাদের সাহায্য করতে বলায় তারা আমার সঙ্গে যোগ দিল। তাদের মধ্যে দুজন পুলিসে খবর দিতে থানায় চলে গেল।

প্রায় আধ ঘন্টা পরে তারা জনকয়েক পুলিস ও দারোগা নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হলো।

দারোগাবাবু এসেই তাঁর খাতা খুলে ডায়েরী লিখতে লাগলেন। সকলেই জবানবন্দী দিল। তাদের জবানবন্দীতে প্রকাশ পেল—প্রায় চারমাস পূর্ব্বে নিশিথবাবু (বর্ত্তমান আসামী) মায়াকে এখানে নিয়ে আসেন। দোতালার একটি ঘর ভাড়া নিয়ে তাকে সেখানে রেখে দেন। রোজ রাত্রেই নিশিথবাবু এখানে আস্‌তেন। মায়া কারুর সঙ্গে মিশত না—একা একা থাকৃতেই সে ভালবাসত। অন্য কোন লোককে কেউ কোনদিন সে ঘরে যেতে দেখেনি। রোজকার মত সেদিনও নিশিথবাবু এসেছিলেন। হঠাৎ রাত বারোটার সময় মায়ার ঘরের দিক থেকে একটা বন্দুকের শব্দ কাণে আসায় সবাই সে দিকে ছুটে গেল। গিয়ে দেখল—ঘরের দরজা একেবারে খোলা। খাটের পাশে মেঝের উপর রক্তের ঢেউ বয়ে চলেছে—মায়ার রক্তাক্ত মৃতদেহ সেখানে পড়ে রয়েছে। বন্দুকের গুলি কর্ণমূল ভেদ করেছে। তখন নীহার তাড়াতাড়ী চিৎকার করে উঠল—মায়াকে কে খুন করে পালিয়েছে। তাই শুনে সবাই রাস্তার দিকে ছুটে এল। এসে দেখে নিশিথবাবুর সঙ্গে আমার মল্লযুদ্ধ চল্‌ছে। তখন আমার কথামত তারা আমাকে সাহায্য করে নিশিথ বাবুকে আটকে রেখেছে ও দুইজনে থানায় খবর দিতে গেছে।

দারোগাবাবু সব কথা লিখে নিলেন। তারপর আমার জবানবন্দী লিখতে লাগলেন। আমি সব কথাই বল্‌লাম।

তিনি আমাকে খুব ধন্যবাদ দিয়ে একটী পুলিস পাহারার সঙ্গে আমার বাড়ীতে পৌঁছে দিলেন।

যখন বাড়ীতে এলাম তখন রাত প্রায় চারটা।

—দুই—

আজ ৩০শে মার্চ্চ। আজ ১১টার সময় আমাকে সেই মোকদ্দমার সাক্ষী দিতে আদালতে যেতে হবে। সকাল সকাল স্নান আহার শেষ করে ধীরে ধীরে আদালতের দিকে রওনা হলাম।

বেলা বারোটার সময় হাকিম এসে এজলাসে বস্‌লেন। চার দিকে চেয়ে দেখলাম—এত বড় হল ঘরটা লোকে লোকারণ্য। সেই রাত্রিতে যাদের দেখেছিলাম তারা সবাই এসেছে। তাছাড়া উকিল, ব্যারিষ্টার, পুলিস ও বাজেলোকে ঘরটা একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেছে।

হাকিম আসামীকে আন্‌তে হুকুম দিলেন। অমনি একজন পুলিসের জমাদার হাঁক দিল—নিশিথ চট্টোপাধ্যায় আসামী হাজির।

তিন চারজন পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে নিশিথ এসে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল। তখন সবারই নজর আসামীর দিকে। কেউ বল্‌ল—লোকটার রাজপুত্তুরের মত চেহারা—ও শেষে বেশ্যা খুন কর্‌লে ?

কেউ বলল—লোকটার টাকা পয়সা বোধ হয় যথেষ্ট আছে। হঠাৎ বোধ হয় খুন করে ফেলেছে।

কেউ বল্‌ল—রেখে দাও ওসব কথা। ওসব লোক দেশের কুলাঙ্গার। ওরা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। বেশ হয়েছে যেমন গিয়েছিল খুন করতে।

নানাজনে নানারকম কাণাঘুষা করতে লাগল। নিশিথ কিন্তু স্থির, ধীর—মনের কোনরূপ চাঞ্চল্যই দেখা যাচ্ছে না। সে কাঠগড়ার উপরে অধোমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

জজসাহেব তখন সাক্ষীদের ডাকবার হুকুম দিলেন। এক এক জন সাক্ষী এসে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে লাগল। উকিলের প্রশ্নমত তারা জবাব দিতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে আমার ডাক পড়ল। আমাকে ডাকবার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা কেমন বিচলিত হয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সমজে নিলাম। কাঠগড়ায় উঠে আদালতের প্রথামত হলপ করলাম—আমি যা জানি তা সত্য বই মিথ্যা বলব না, ইত্যাদী। তারপর উকিলের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়ে নেমে আসছি এমন সময় আসামীর দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম—সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। তার চোখ থেকে যেন একটা করুণার প্রস্রবণ বের হয়ে আস্‌তে চাইছে। তাকে দেখে আমার বড় মায়া হল। পরক্ষণেই মনে হল, নারীহন্তা বেশ্যাহন্তা পশুর প্রতি মায়ার উদ্রেক হওয়াটাও অমার্জ্জনীয়। সে দিকে আর না তাকিয়ে ধীরে ধীরে আমি নীচে নেমে এলাম।

বেলা ৫টার সময় সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী নেওয়া শেষ হয়ে গেল। বাকী রইল শুধু আসামীর জবানবন্দী ও জজের রায়।

হাকিম হুকুম দিলেন—কাল আবার এগারোটার সময় বিচার হবে। সমস্ত সাক্ষীদের উপস্থিত থাকা চাই-ই।

বাড়ী ফিরবার পথে ভাবলাম কী ফ্যাসাদেই পড়া গেছে। ভগবান বোধ হয় আড়াল থেকে তখন একটু হেসেছিলেন।

* * * *

পরদিন আবার ঠিক সময়ে আদালতে গিয়ে হাজির হয়েছি সে দিনও লোকের ভিড়ে সমস্ত হলঘরটা একেবারে ভর্ত্তি হয়ে গেছে।

ঠিক বারোটার সময় বিচার আরম্ভ হল। আসামীর ডাক পড়ল। আসামী কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল। আসামীর জবানবন্দীতে জানা গেল—তার নাম নিশিথ চট্টোপাধ্যায়। বাড়ী তার নবাবপুর। তার বাপ রমেশ চট্টোপাধ্যায় নবাব-পুরের একজন ধনী ব্যক্তি। নিশিথ রমেশ বাবুর একমাত্র পুত্র। তার ষোল বছর বয়সের সময় রমেশবাবু একমাত্র পুত্র ও স্ত্রীকে রেখে অজানা পথের সন্ধানে চলে গেছেন। নিশিথের ভাল ছেলে বলে গ্রামে বিশেষ সুখ্যাতিই ছিল। কয়েকমাস পূর্ব্বে সে তাদের পাড়ার নরেন চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দরী কিশোরী পত্নী মায়ার প্রেমে পড়ে। নরেন নিশিথের সমবয়সী সে দূরদেশে চাকরী করে।

কয়েকমাস পূর্ব্বে একদিন ফাল্গুন প্রভাতে নিশিথ তাদের পুকুরের পার দিয়ে পায়চারী করছিল এমন সময় ও বাড়ীর মায়া ছোট একটি ছেলে সঙ্গে করে সেই পুকুরে জল নিতে আসে। ফাল্গুনের সেই স্নিগ্ধ প্রভাতে কি কুক্ষণেই নিশিথের

সঙ্গে তার চার চোখের মিলন হয়ে ছিল—যার জন্য তার চির-পুত চরিত্রে কলঙ্কের দাগ পড়ে গেল। সে অনেক চেষ্টা করেও তার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে সংযত করতে পারল না। নানা-উপায়ে সে মায়াকে বশ করবার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু কিছুতেই রাজী হল না। একদিন সন্ধ্যাকালে ভীষণ ষড়যন্ত্র করে বাড়ী থেকে তাকে বের করে নিয়ে এল কলকাতায়। তার পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য তাকে রাখল এক বারাঙ্গনার অন্তঃপুরে। প্রবৃত্তির তাড়নায় সে এমনি উন্মত্ত হয়েছিল—যাতে সে ভুলেগিয়েছিল সে সরলা অবলার কি সর্ব্বনাশ করতে যাচ্ছে। সে বিস্মৃত হয়েছিল এর পরিণাম কী।

তারপর সে তার লালসা চরিতার্থ করবার জন্য রোজই মায়ার কাছে যেত। কিন্তু প্রত্যহই তাকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরতে হয়েছে। বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে তার লালসা আরও বেড়ে গেল। ঘটনার দিন সে আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না। রাগ সামলাতে না পেরে সে মায়াকে খুন করেছে। আদালতের কাছে সে প্রার্থনা জানাচ্ছে যাতে তার জীবন শীগগির শীগগির শেষ হয়ে যায়—আদালত তারই ব্যবস্থা করুন।

যতক্ষণ নিশিথ তার জবানবন্দী দিচ্ছিল—সবাই টু শব্দটি না করে সাগ্রহে শুনে যাচ্ছিল। তার কথা শেষ হ'লে জজ সাহেব রায় দিলেন—আসামী দোষী—তার শাস্তি মৃত্যু। একমাস পরে আসামীর ফাঁসী হবে।

নানা জনে নানাকথা বলতে বলতে আদালত ছেড়ে চলে গেল। আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক হয়ে গেলাম, নিশিথের অদ্ভুত স্বীকারোক্তি শুনে। তার চরিত্রের উদারতা দেখে আমি মুগ্ধ হলাম।

নিশিথের উকিল আমাকে বললেন—আসামী তার মৃত্যুর পূর্ব্বে কারাগারে আপনার দর্শন প্রার্থী।

আমি সম্মত হলাম।

—তিন—

সে রাত্রে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার আর ঘুম হোল না। থেকে থেকে কেবলি নিশিথের কথা মনে হতে লাগল। ভাবলাম—প্রবৃত্তি মানুষকে স্বর্গের দেবতা করে আবার নরকের পিশাচে পরিণত করে। জীবনের সামান্য একটা ভুলের জন্য নিশিথ আজ অকালে মরণ পথের যাত্রী হতে চলেছে।

নানা কথা মনে আসতে লাগল। শেষে ঠিক করলাম—কালই একবার নিশিথের সঙ্গে দেখা করে আসব। আমার জন্যই সে আজ চরম দণ্ডে দণ্ডিত। নিজের বড় অনুতাপ হোল—কেন তাকে আমি ধরিয়ে দিলাম? ভাবলাম—তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইব। তার উদারতার যে পরিচয় আমি পেয়েছি—তাতে মনে হয় সে আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে।

ভাবতে ভাবতে কোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছি—তা জানি না। যখন ঘুম ভাঙ্গল—সমস্ত ঘরটা রোদে ভর্ত্তি হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। কালকার ঘটনা সবটা আমার কাছে একটা অস্পষ্ট স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল।

বেলা নয়টার সময় নিশিথের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম। জেলে গিয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাছে আমার অভিপ্রায় জানালাম। তিনি আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন।

নিশিথের ঘরে ঢুকেই আমার মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল—তার চেহারার পরিবর্ত্তন দেখে। এক রাত্রিতে এত পরিবর্ত্তন। কাল যে নিশিথকে দেখেছিলাম—এ যেন সে নিশিথ নয়। যেন তাকে কত যুগ পরে দেখছি। তার চুলগুলো এক রাত্রেই একেবারে সাদা হয়ে গেছে—গাল বসে গেছে। হাত, পা কুঞ্চিত হয়ে পড়েছে—চোখের পাতায় কে যেন কালী মাখিয়ে দিয়েছে।

নিশিথ বলল—নমস্কার, আসুন। আপনি যে আজই আসবেন—আমি তা আশা করি নি।

আমি বললাম—কাল আপনার যে মহৎ চরিত্রের পরিচয় পেয়েছি—তাতে আমি বিস্মিত, মুগ্ধ। আমি আপনার কাছে মাপ চাইতে এসেছি। আশা করি আপনি ক্ষমা করবেন।

—আপনি বলছেন কী? আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি নরাধম—পাপিষ্ঠ। ভগবান আমাকে ঠিক শাস্তিই

দিয়েছেন। মরব বলে আমার কোন দুঃখ নেই—শুধু একটা দুঃখ, আমার বৃদ্ধ মাকে সান্ত্বনা দেবার আর কেউ রইল না। বড় অভাগিনী সে —

বল্‌তে বল্‌তে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। আমি তাকে অনেক সান্ত্বনা দিলাম। বললাম—আমি যখন আপনার মরণের জন্ম দায়ী—তখন ইচ্ছা করলে আমাকে সে ভার দিয়ে যেতে পারেন। আমার মরণের শেষ দিন পর্য্যন্ত—

বাধা দিয়ে নিশিথ বল্‌ল—এই কথা বলব বলেই আমি আপনাকে দেখতে চেয়েছিলাম। এখন আমার আর মরতে কোন দুঃখ নাই। আপনাকে আমি আর একটা কথা শোনাব—আশা করি, আপনি আমায় বিশ্বাস করবেন।

...একটু পরেই নিশিথ বলতে আরম্ভ করল—কাল আদালতে আমি যা বলেছি—প্রথম থেকে তা সবই সত্যি—কিন্তু শেষ দিকে একটু মিথ্যা আছে।

সেই ঘটনার রাত্রে আমি মায়ার ওখানে গিয়ে দেখি—মায়ার স্বামী নরেন সেখানে বসে। আর তার কোলের উপর মাথা রেখে মায়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ঘরে ঢুকে এই দৃশ্য দেখেই আমার মনটা একেবারে মুষড়ে গেল। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি এমন সময় নরেন দৃঢ়-মুষ্টিতে আমার হাতটা ধরে অনেক কথা বল্‌ল। মাঝে মাঝে "পাষণ্ড, পশু" দুই, একটা কথা ছাড়া আর কিছুই আমার কাণে এলনা।

মুহূর্ত্তমধ্যে সে আমার হাতটা ছেড়ে দিয়ে আমার মাথার উপর একটা রিভলভার উঠিয়ে দাঁড়াল। আমি ভয়ে দুই পা পেছিয়ে গিয়ে মায়ার দিকে ফিরে বললাম—মায়া আজ থেকে তুমি আমার মা। আমাকে রক্ষা কর।

মায়ার নারীহৃদয়ে করুণার প্রস্রবন বয়ে গেল। সে তার স্বামীর সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল—এমন সময় নরেন রিভলভারের ঘোড়া টীপে দিল। গুলি মায়ার কর্ণদেশ বিদ্ধ করল। আমি আঁৎকে উঠলাম। মনে করলাম আমিই ধরা পড়ব। তখন তাড়াতাড়ী রিভলভারটা কুড়িয়ে নিয়ে রাস্তার দিকে ছুটে গেলাম।

তারপর যা হয়েছে আপনি তা সবই জানেন।

একটু থেমে বলল—আপনার বোধ হয় খট্‌কা লেগেছে যে কী করে নরেন ওখানে এল। আমিও তা ঠিক বল্‌তে পারিনা—তবে মনে হয় সে কোন রকমে খোঁজ পেয়ে ওখানে এসেছিল।...আমার মনে এখন এক শান্তনা যে মায়া নিষ্পাপ, আর আমি তাকে মাতৃসম্বোধন করতে পেরেছি।...আমার আমার আর বেশী কিছু বলবার নেই। আমার বৃদ্ধমায়ের ভার আপনাকে নিতেই হবে।

এতক্ষণ বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছিলাম।

এবার বুঝলাম তার হৃদয় কত মহৎ। সামান্য একটা ভুলের জন্য একটা নির্দ্দোষী লোক চিরদিনের মত পরপারে চলে যাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—নরেন কোথায় গেল?

—জানিনা। আর আপনার তাকে খোঁজ করবার কোনও দরকার নেই। এ কথা আর কাউকে বলবেন না—এই আমার শেষ অনুরোধ।

তারপর দুই একটা কথা বলে সেদিন সেখান থেকে বিদায় হলাম।

— চার—

আমি প্রায়ই নিশিথের সঙ্গে দেখা করতে যাই—যদি তাকে একটু শান্তি দিতে পারি। পাঁচ সাত দিন পরে দেখলাম—সে বেশ একটু প্রফুল্ল হয়েছে। তার সঙ্গে নানা-রকম সুখ দুঃখের কথা হত। যতই তার সঙ্গে মিশতাম ততই আমার মন তার দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল।

ক্র.ম ফাঁসির দিন ঘনিয়ে আসতে লাগল। আর মাত্র একদিন বাকী। কালই একটা তরুণ প্রাণ জীবনের সব আশা সব আকাঙ্খা বিসর্জ্জন দিয়ে চলে যাবে সেই মরণের দেশে।

নিশিথ আমাকে বলল কাল আমার এই দেহ ধূলায় লোটাবে—আরতো আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। আজ আমার ভারী কষ্ট হচ্ছে। আজ মনে হচ্ছে পৃথিবী কত সুন্দর—কত মধুর। এ সূর্য্যের আলো আর আমি দেখতে পাবনা। এ জোৎস্না আর আমার চোখে পড়বে না। এমন মৃদু মধুর বাতাস আর আমি উপভোগ করতে পারব না। আজ কিছুতেই এ পৃথিবী ছাড়তে ইচ্ছা করছে না। কিন্তু—

একটু থেমে সে আবার বলল—আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু নন—আজ থেকে আপনি আমার সত্যিকারের ভাই। ভাই—তোমার মাকে দেখো।

আমার চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে আসছিল। আমি বললাম—তুমি আজ আমাকে ভাই বলে ধন্য করেছ। কিন্তু আমি এমন অভাগা যে ভাইয়ের মত ভাই পেয়ে তাকে আবার হারাতে হচ্ছে।

সে বলল—কাল মা আসবে। কাল তাঁকে তোমার হাতে সঁপে দেব। আমার অভাব তাকে বুঝতে দিও না ভাই।

* * * *

আজ ১লা মে। আজ নিশিথের ফাঁসি। বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য। সকাল থেকে কাতারে কাতারে লোক আসতে লাগল। এতে তাদের মনে একটু লজ্জা হল না—একটু ধিক্কার এলনা। একটা তরুণ জীবনের অবসান হয়ে যাচ্ছে—আর তারই দেশবাসী তাই উপভোগ করতে এসেছে। হায়রে মানুষ—তোমরাই ভগবানের সেরা সৃষ্টি।

কিছুক্ষণ পরে বন্দী এল। সকলে হৈ হৈ করে উঠল। এতে যেন তাদের কত আনন্দ—কত উল্লাস।

নিয়ম আছে চরম দণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে মরবার সময় সরকার তার শেষ আশা পূর্ণ করেন। নিশিথ তার মাকে ও আমাকে দেখতে চাইল।

তার মাকে পূর্ব্বেই সেখানে আনা হয়েছিল—আমিও প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের তার সামনে নিয়ে যাওয়া হল। সে কিছুই বলতে পারছে না, অথচ তার ভাব দেখে বোধ হচ্ছে যেন সে কত কি বলতে চাইছে।

তার মা চীৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করলেন ;—আমার ও চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে নিশিথ আমার হাতটা টেনে নিয়ে তার মায়ের হাতের উপর দিয়ে বলল—মা, আমার জন্য দুঃখ করোনা। আমি তোমার অভাগা পুত্র। আজ হতে এই তোমার ছেলে—এ আমার সহোদরের চেয়েও বেশী। আমার এই ভাই তোমার সন্তানের স্থান পূরণ করবে। দুঃখিনী মা আমার, নিশিথের কথা একেবারে ভুলে যাও, আঃ—

নিশিথের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না।

এমন সময় প্রহরী এসে বলল—টাইম হুয়া বাবু।

‘মোদের জাতীয় সঙ্গীত’

[শ্রীশৈলেন্দ্র চৌধুরী]

ওরে কিসে আমরা কম ?
কারা পারে আড্ডা দিতে দিয়ে গাঁজায় দম্ ?
কারা পারে মোদের মতো মিথ্যে কথা কইতে ?
কারা পারে মোদের মতো, জুতো লাথি সইতে ?
কারা পারে মোদের মতো স্ত্রীদের দিতে গাল ?
কারা পারে বলতে নিত্যি “করবো এ সব কাল” ?
কারা পারে পরের জন্যে (নিত্যি) পিষে দিতে গম ?
কারা ওরে ঘরের দিকে (ফিরে) চায় না একদম ?

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

—এক—

পিতৃ মাতৃহীন অমলকুমারের সিবিল সার্ভিস পরীক্ষায় সসম্মানে উচ্চ বিভাগে পাশ হওয়ার সংবাদে তাহার পিতার বাল্যবন্ধু ও তাহার প্রতিপালক কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ব্যারিষ্টার মিঃ এ, সি, মুখার্জ্জীর মনটা যে পরিমাণে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল...ঠিক তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে মিস্ ডোরোথি মুখার্জ্জীর তরুণ মনের নিভৃত কন্দরে সুখের অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় পুলকোচ্ছ্বাস বহিয়া তাহার অন্তর বাহির প্লাবিত করিয়া তুলিতেছিল। মিস্ ডোরোথি মুখার্জ্জী অমল কুমারের বাগদত্তা।

চৈত্রের এক উষ্ণ মধুর রৌদ্রালোকিত প্রভাতে ড্রয়িং রুমে বসিয়া পিতা পুত্রী দৈনন্দিন চা পান করিতেছিলেন। দ্বারের চিত্র বিচিত্র রঙীন পর্দ্দাটা ঠেলিয়া 'বয়' আসিয়া প্রভাতের 'ডাক্' রাখিয়া নীরবে অভিবাদনান্তে প্রস্থান করিল। চা পান করিতে করিতে মিঃ মুখার্জ্জী কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"দেখ তো মা ডোরা, বোম্বে থেকে আমার কিছু চিঠিপত্র এসেছে কি না ?"

বোম্বাই...! আশা, আনন্দ ও লজ্জার সংমিশ্রণে ডোরোথির মুখের বর্ণ অপরূপ হইয়া উঠিল। পিতার স্নেহপূর্ণ আদেশে আনত বদনে সে পত্র বাছিতে সুরু করিল। পত্র মধ্যে অধিকাংশই তাহার পিতার নামে আসিয়াছিল... ডোরোথি তন্মধ্য হইতে সন্তর্পণে বাছিয়া চির পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা 'এনভেলাপ' খানি তাহার পিতাকে আগাইয়া দিল। মিঃ মুখার্জ্জীর চা পান ইতিপূর্ব্বে সমাধা হইয়া গিয়াছিল, তিনি ব্যগ্র হস্তে 'এন্ভেলাপ' ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পাঠ করিতে করিতে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। পরে প্যাণ্টের পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন—"ভারী সুখবর মা—অমল লিখছে আগামী এপ্রিল মাসের first week এ Calcuttaতে পৌঁছুবে, এই নাও মা, প'ড়ে ছ্যাখ।"

রাঙা মুখ আরও রাঙা করিয়া কন্যা নতমুখে জড়িত স্বরে বলিল—"আপনি তো পড়েছেন বাবা, আমার আর দেখবার দরকার নেই।"

মিঃ মুখার্জ্জী কন্যার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া উঠিয়া কন্যার মস্তকে আপনার স্নেহ শীতল হাতখানি রাখিয়া বলিলেন—"তুই কি করে জানবি মা, যে অমলের এই পাশের সংবাদে আমি কী সুখী হয়েছি। আঃ আজ মনে পড়ছে সেই দিনের ঘটনা...যখন সুবোধ তার পাঁজর সেঁচা একমাত্র মাণিক অমলকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে, আমারই চোখের সামনে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়বার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বলেছিল—"দাদা, তোমার হাতে এই মাতৃহীন অনাথ বালককে তুলে দিয়ে গেলাম, আর আমি ত জন্মের মত পৃথিবীর বুক হতে বিদায় নিচ্ছি, দেখো ভাই, তোমার স্নেহে ও যেন পিতার সবখানি অভাব ভুলতে পারে, আর, আর আমার ছেলে যাতে দশের মাঝে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, এটুকুও তুমি আমার অবর্ত্তমানে মনে করে ক'রো। আঃ সেই বন্ধু আমার আজ কোথায় কোন্ অসীম দেশে চলে গ্যাছে—আমার বুকের একখানি পাঁজর ভেঙে দিয়ে।"

মিঃ মুখার্জ্জী থামিয়া থামিয়া কথাগুলি বলিয়া ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন—যেন সেই কাল মৃত্যু দিবস তাঁর চোখের উপর হইতে ঘন যবনিকা খানি তুলিয়া সেই দিনটি সুস্পষ্টরূপে অভিনয় করিয়া গেল। লুপ্তপ্রায় অতীত আজ বহুদিন পরে বায়স্কোপের ফিল্মের মত পর পর, দৃশ্যের পর দৃশ্য উল্টাইয়া যাইতে লাগিল। প্রথম—তাহার বাল্যের প্রিয়তম সুহৃদ সুবোধকুমার চৌধুরীর মৃত্যু। দ্বিতীয়—সেই শোকের বিষম আঘাতের ক্ষত মিলাইতে না মিলাইতে

তাহার প্রাণাধিকা পত্নীর অকালে পরলোক গমন—আত্মীয় স্বজনের দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের নিমিত্ত অনুরোধ উপরোধ, অবশেষে ব্যর্থকাম,—পরে কন্যা ও অমলকুমারকে লইয়া বারাকপুরে নূতন আবাসে উঠিয়া আসা—অমলের বিদ্যা শিক্ষার্থ বিলাত গমন। এ সকল কতদিনকার পুরাতন ঘটনাবলী আজ মিঃ মুখার্জ্জীর স্মৃতির দ্বারে ভাসিয়া আসিল। তাঁহার চোখের পাতা অশ্রুজলে ঝাপ্সা হইয়া উঠিল। আর ডোরোথি! সেও মূক! তাহারও আজ ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। হারান দিনগুলির বার বার স্মরণ করা প্রতি ক্ষণ, প্রতি কথাটি আজ তাহার মনের ভিতর আছাড় খাইয়া পড়িল—যেন অধীর চঞ্চল উর্ম্মিমালার ন্যায়। অমলকুমারের বিলাত গমনের পর দীর্ঘ একটি যুগ কাটিয়া গিয়াছে—দশ বৎসর কেম্ব্রিজে থাকিয়া সেখানকার অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিল। পথিমধ্যে কি একটা খেয়ালের বশে বোম্বে নামিয়া তথায় একটানা দুইটি বৎসর কাটাইয়া আজ সে আবার ভারতে ফিরিয়া আসিতেছে। উঃ, সে কতদিন চলিয়া গিয়াছে, এতদিন পরে আবার, আবার তাহাদের দেখা হইবে। কে জানে, বিলাতের সেই হিম কুন্দ শুভ্র তুষার ধবলিত। শ্বেতাঙ্গনাদের সংস্পর্শে গিয়া আজিও তাহার মনখানি এই কত দেশ দেশান্তরের এ পারে একটি গৃহ কোণে ঘুরিতেছে কি না? ভাবিতে ভাবিতে ডোরোথির ব্যাকুল চিত্ত সবেগে দোল খাইয়া উঠিল—অজানিত আশঙ্কা মন হইতে জোর করিয়া ঝাড়িয়া সে ভাবিল- না না এ সব সে কী ভাবিতেছে, ছিঃ ছিঃ তাও কি হয়, ও সব কথা ভাবতেও যে বিশ্রী লাগে মাগো!

"বয়, ভিতরমে সাব্ হ্যায়।"

বাহির হইতে এই কথাগুলি ভাসিয়া আসিল। পিতাকে গম্ভীর চিন্তামগ্ন দেখিয়া ডোরোথি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া উত্তর দিল—"ইয়েস্ মিঃ বোস, কাম্ অন্ প্লীজ।"

বন্ধ ঘরের দ্বার ঠেলিয়া ডোরোথির সহিত গৃহে প্রবেশ করিল—যৌবনের প্রথম সীমায় উপনীত সুন্দর কান্তি সম্পন্ন একটি প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক সুপ্তভঙ্গে প্রথমটা লোকে যেমন দিশাহারা হইয়া কোন কিছুই সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না। তেমনি যুবকের আগমনে মিঃ মুখার্জ্জী পাঁচ ছয়বার এধার ওধার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"কে আলোক নাকি, এস এস, ফিরলে কবে?"

আলোক মিঃ মুখার্জ্জীকে নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিয়া বলিল—"ফিরেছি কাল রাত্রে দশটা পঁয়ত্রিশএর ট্রেণে...তারপর, এখানকার খবর সব আপনাদের ভাল তো? আপনি কেমন আছেন মিস্ মুখার্জ্জী, ওঃ কালকে সারা পথটা রেবা আপনার নাম করতে করতে এসেছে"

ডোরোথি মুখ ঘুরাইয়া কৃত্রিম অভিমান মিশ্রিত সুরে বলিয়া উঠিল—"তবে রেবা আপনার সঙ্গে এল না কেন? বাড়ীতে নেমে বুঝি আমার কথা ভুলে গেছে মিঃ বোস।"

আলোক হাসিয়া বলিল—"না না সে কি কথা, সে আসবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল—হঠাৎ তার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়াতে আসতে পারলে না। বিকেলে সুস্থ হলে সে নিশ্চয় আসবে, তখন বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া করে অনেক দিনের রাগ মেটাবেন মিঃ মুখার্জ্জী।"

মিঃ মুখার্জ্জী 'অ্যাস্ ট্রে'তে চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া বলিলেন—"শুন আলোক, আজ তোমাকে একটি শুভ সংবাদ দিচ্ছি, অমল আগামী এপ্রিলে এখানে আসছে।"

"তাই নাকি, কবে ফিরছেন তিনি?"

"খুব সম্ভব first weekএ।"

"বোম্বে থেকে আসছেন বুঝি? ওঃ দাঁড়ান মিঃ মুখার্জ্জী আজ আপনাকে একটা জিনিষ দেখাতে এনেছি" বলিয়া পকেট হইতে একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্র বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে লাল পেন্সিলে চিহ্নিত স্থানটিতে অঙ্গুলী রাখিয়া অবহেলাপূর্ণ কণ্ঠে আলোক বলিল—"ফরোয়ার্ড কি লিখছে দেখুন, 'আগত এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাই হইতে দেশের সুযোগ্য সন্তান কর্ম্মবীর শ্রীঅমলকুমার চৌধুরী দেশ মাতৃকার উদ্ধার-কল্পমানসে ভারতে আগমন করিতেছেন, সমগ্র ভারতবাসী তাঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনার জন্য প্রস্তুত হউন। হুজুগ আর বলেন কেন, লাগলেই হ'লো আঃ পথে ঘাটে আর বেরুবার জো নেই, চারিদিকে স্বদেশীর দল একেবারে হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছে, আচ্ছা মিঃ মুখার্জ্জী

ইনি আমাদের মিঃ অমল চৌধুরী নন্ তো? তা হ'লেই সর্ব্বনাশ...।"

মিঃ মুখার্জ্জী এ সংবাদে একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। পরে বলিলেন—"নাঃ অমল সে রকমই নয়।"

"বলা যায় না মানুষের মনের গতি কখন কি ভাবে বেয়ে চলে; আচ্ছা এই স্বদেশীদের এত হুজুগের কী প্রয়োজন? এতে কি তাদের কোন লাভ আছে?"

"দেখ আলোক, তাদের আসল কর্ম্মটি হচ্ছে মাতৃপূজা, লাভ বা অলাভের তাঁরা ধার ধারে না। এ মহা যজ্ঞের যে প্রধান হোতা, তাঁকে যে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে, পূজা করবে, তাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। এই দেখ না, এই যে অসংখ্য কর্ম্মী তাদের দেশভক্ত পূজারীর জন্ম প্রচুর আদর অভ্যর্থনার অনুষ্ঠান করছে...হয়তো এর চেয়ে বেশী আদর ও উৎসবের আয়োজন অমলের জন্ম করবে। কিন্তু তুমি লক্ষ্য করো বোস্, যে এ কর্ম্মে প্রাণ খুলে কেউ যোগদান করবে না, তার কারণ অমল আমাদেরই আত্মীয়, তাদের তো কেউ নয়—অমলের কৃতিত্বের সংবাদে আমরাই সুখী। কিন্তু বল দেখি আলোক, অমলকে অভিনন্দিত করতে আমরা আত্মীয়-বন্ধু ছাড়া দেশের কয়জন লোক যাবে?"

আলোক প্রচ্ছন্ন হাসি টিপিয়া স্বগতঃ বলিল—"আপনার ও বিদেশী খোলসটা খুলে ফেলবার বড়ই প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, মিঃ মুখার্জ্জী।" মুখে সে বলিল—"তা দেশের লোক যোগ দিন্ বা না দিন তাতে আমাদের কোন ক্ষতি নেই। মিঃ চৌধুরী যে কারুর কৃপার ভিখারী নন্ এটা আমি খুবই জোর করে বলতে পারি, কি বলেন—মিঃ মুখার্জ্জী?"

*　　*　　*　　*

হাওড়া ষ্টেশনে ভীষণ জনতা—বোম্বে হইতে দেশনেতা আজ কলিকাতায় পৌছিবেন। বিরাট জন বাহিনীর অগণিত উৎসুক আঁখি দূর, সুদূরের পানে অধীর আবেগে মেলিয়া রহিয়াছে—কখন তাদের ঈপ্সিত রত্ন বুকে ধরিয়া ট্রেণখানি আসিবে। ক্রমে সিগন্যাল পড়িল, ধীরে ধীরে ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে সগর্ব্বে 'ট্রেণ' 'ইন্' হইল। বিপুল জনতা হইতে উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—"বন্দে মাতরম্।"

বন্দে মাতরমের প্রবর্ত্তক ঋষি জগদ্বরেণ্য সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র! তাঁহার চরণে কোটী কোটী প্রণিপাত। যুগ লক্ষ্মীর আহ্বান শঙ্খ তিনিই প্রথমে বাজাইয়াছিলেন সাত কোটী সুপ্ত বাঙ্গালী সন্তানের হাত ধরিয়া তিনিই প্রথমে মাতৃ মন্দিরের পথের সন্ধান বলিয়া দিয়াছিলেন। প্রবুদ্ধ জনতা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলিল—

"আমার সোণার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী,
*　　*　　*　　*
আমি পরের ঘরে কিনব না আর ভূষণ বলে গলার ফাঁসী।"

—দুই—

"কার" হইতে নামিয়া মিঃ মুখার্জ্জী, মিস্ ডোরোথি মুখার্জ্জী ও আলোকনাথ বোস অতি কষ্টে সেই অসংখ্য নরনারী বেষ্টিত জন ব্যূহ ভেদ করিয়া প্রথমে ফাষ্ট ক্লাশ কামরা অন্বেষণ করিলেন। তাঁহাদের সমুদয় উদ্যম ব্যর্থ হইল। কামরার মধ্যে জনকয়েক ইউরোপীয়ান নর নারী ছাড়া, তাঁহাদের একখানি পরিচিত মুখের কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না। ক্ষুব্ধ চিত্তে তাঁহারা তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আলোক বলিল—"একবার ওদিকটা দেখলে হ'তো না, যদিই আমাদের অন্যমনস্কতায় তিনি নেমে পড়ে থাকেন—কি বলেন আপনারা?"

ডোরোথি অপ্রসন্ন মুখে সেই শোভাযাত্রার পানে তাকাইয়া উদ্বেগ কাতর স্বরে বলিল—"সে তো বেশ কথা মিঃ বোস্, চলুন না বাবা ঐ দিকে। উঃ কী সাংঘাতিক ভীড়, অসম্ভব ঐ ভীড় ঠেলে যাওয়া—না মিঃ বোস্?"

মিঃ মুখার্জ্জী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"হোক ভীড়, তবু আমাদের দেখতে হবে একবার। আচ্ছা দেখ ষ্টেশন মাষ্টারকে বলে, যদি কোন উপায়ে তিনি পথ করে দিতে পারেন—ঐ যে তিনি এ-দিকেই আসছেন। হেলো মিঃ রয়, অনুগ্রহ করে একবার এদিকে আসবেন কি?"

ষ্টেশন মাষ্টার চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িলেন। পরে বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন—"হেলো মিঃ মুখার্জ্জী, তারপর কন্যাসহ এখানে আজ হঠাৎ এসেছেন?"

মিঃ মুখার্জ্জী ভাবনা ব্যাকুল স্বরে বলিলেন—"বড় মুস্কিলে

পড়েছি মিঃ রয়, আমার একটি আত্মীয়ের এই ট্রেণে আসবার কথা ছিল। ফার্ষ্ট ক্লাস কামরা খুঁজে দেখলাম, তাকে পেলাম না। ভাবছি একবার ও ধারটা খুঁজে দেখব, কিন্তু এমনি গণ্ডগোল বাধিয়ে তুলেছে ওরা যে ওখানে যাওয়াই দুর্ঘট। আপনি একটু চেষ্টা করে দেখুন না, যদি কোন রকমে ওদের সরিয়ে দিতে পারেন ?"

মিঃ রয় এ প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারিলেন না। 'টাইম্ টেবল্' খানি খুলিয়া দৃষ্টিপাত করিয়া মাথা দুলাইয়া বলিলেন—"ইম্পসিবল্"—দেখছেন না, ওঁরাই জায়গার জন্যে কিরকম মারামারি বাধিয়ে তুলেছেন। ওদেরকে বলতে গেলে শুনবে কেন ? আর জোর করেও হটিয়ে দিতে পারা যায় না কারণ ওরা রেল কোম্পানীর অর্ডার পেয়ে তবে এসেছে, তা হ'লে বুঝতেই পারছেন তো এ ক্ষেত্রে কোন কথা বলা খাটবে না। আচ্ছা, ক্ষমা করবেন, আপনার কিছু উপকার করতে পারলাম না, এর জন্যে বড় দুঃখিত আমি। এখন বড় ব্যস্ত আছি, good bye।" বলিয়া তিনি টুপী খুলিয়া অভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইলেন। মিঃ মুখার্জ্জীর আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়াতে ডোরোথি জ্বলিয়া উঠিল। জনতার পানে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি হানিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল—"দেখছেন বাবা, আজকাল সব স্পর্দ্ধা কি রকম বেড়ে উঠেছে, ছিঃ আপনাকে এরকম অপমান করতে ওঁর একটু বাধল না।"

মিঃ মুখার্জ্জী শান্ত সুরে বলিলেন—"অপমানটা তুমি কোথায় দেখলে মা ? সত্যি আমারই বলা অন্যায় হয়েছে।"

ডোরোথি বলিল—"বেশ যাহোক বাবা, ঐরকম কাউকে কিছু বলেন না বলে সবাই বাড়িয়ে তুলেছে। না বাবা, এ অপমানের প্রতিশোধ আপনাকে তুইতেই হবে।"

"কাকাবাবু।"

মিঃ মুখার্জ্জী, আলোকনাথ, ডোরোথি সকলে এক কালে চমকিয়া ফিরিয়া তাকাইলেন। মিঃ মুখার্জ্জীর কণ্ঠ হইতে স্বর ফুটিল না। আর ডোরোথির মুখে দারুণ ঘৃণার ছায়া নিবিড় ভাবে ঘনাইয়া আসিল। অমল সকলের ভাব বৈলক্ষণ্যে আশ্চর্য্যান্বিত কণ্ঠে বলিল—"কাকাবাবু আপনারা কি আমার এই সামান্য পরিবর্ত্তনে চিনতে পারলেন না ?"

তাহার স্বর হইতে বেদনা ঝরিয়া পড়িল। মিঃ মুখার্জ্জীর মনের মধ্যে পুরাতন কথাগুলি তাল পাকাইয়া জমিয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া অমলকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তিনি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"একটু আশ্চর্য্য হয়েছি বই কি বাবা, তুমি যে এতটা এগিয়ে যাবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি।"

অমল একটু জোর করিয়া হাসিয়া বলিল—"এই যে সুনীতিও এসেছে, ভাল আছ তো ?"

ডোরোথির পিত্ত শুদ্ধ এই সম্বোধনে জ্বলিয়া উঠিল, এতদূর ! সে একটু শ্লেষ পরিপূর্ণ স্বরে বলিল—"গুড ইভ্‌নিং মিঃ চৌধুরী, আপনার স্মরণ শক্তির প্রাচুর্য্য দেখে না ধন্যবাদ দিয়ে থাকতে পারছি না। ওঃ কত কালের সেই পুরাণো নামটা ঠিক মনে করে রেখেছেনও তো, একজন সিভিলিয়ান যে এরকম স্বদেশীয়ানার পক্ষপাতী হয়ে পড়বে আগে জানতাম না। মিঃ চৌধুরী, বিলাতী নামটা ধরতেও কি দোষ জন্মায় ?"

অমলের বাম পার্শ্বে শুভ্র খদ্দর পরিহিত গৌর বর্ণের একটি যুবক উক্ত কথোপকথন শুনিয়া মনে মনে ক্রমশঃ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। কেবল অমলের আত্মীয় বলিয়া সে কোন কথার অবতারণা করিতে সাহসী হইল না।

ডোরোথির বিদ্রূপবাণ ভরা সুতীক্ষ্ণ বাক্যগুলি নীরবে হজম করিয়া অমল স্মিতহাস্যে বলিল—"নিশ্চয় দোষ বই কি নীতি, পরের দেওয়া জিনিষ নিয়ে কেন আমরা খাটো হ'ব বলুন তো কাকাবাবু ? বলুন তো কয়জন সাহেব আমাদের বাঙ্গালী নাম কমলা বা সুশীলা রাখে ? সত্যি সাহেবদের অনুকরণে, আমরা এই বাঙ্গালী জাতি যতটা অভ্যস্থ আর বোধ হয় বাঙ্গলা, বেহার, উড়িষ্যার একটা শিক্ষিত ভদ্রলোকও এতদূর বাড়াবাড়ি করতে সঙ্কুচিত হ'ন্।"

মিঃ মুখার্জ্জী দেখিলেন—কথাগুলি ক্রমে ক্রমে দ্বন্দ্বে পরিণত হইবার উপক্রম ঘটিতেছে। সেই জন্য আপোষে উভয় পক্ষকে নিরস্ত করিবার প্রধান উপায় উদ্ভাবনা করিয়া অমলের কাঁধে হাত দিয়া বলিলেন—"যার যা ইচ্ছে যাবে সে তাই করবে, তাতে রাগ কর কেন তোরা ? অমল কি বাড়ী যাবে না, তোমাদের তর্ক এখন থামাও দেখি ! বাড়ী চল, তারপর যত পার অমলের সঙ্গে তর্ক ক'র।"

কথা কহিতে কহিতে সকলে প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমল পূর্ব্ববর্ণিত যুবকের হাত ধরিয়া

বলিল—"এইবার তুমি বাড়ী যাও মৃণাল, মা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমি পারি তো বিকেলে যাবোখ'ন।"

মৃণাল অমলের হাতে একটু চাপ দিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিল—"পারি তো নয় নিশ্চয় যাবেন, আর আশীর্ব্বাদ করুন অমলদা, যে ভার আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের হাতে তুলে নিয়েছি, তা যেন সুশৃঙ্খলে শেষ করতে পারি।"

অমল তাহার উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়া বলিল—"আশীর্ব্বাদ আমার কাছে চেও না মৃণাল, যিনি মঙ্গলময় বিশ্ব পিতা—তাঁর আশীষ ধারা তোমাদের শিরে নিত্য ঝরে পড়ুক, এই আমার প্রার্থনা।"

মিঃ মুখার্জ্জী অবাক হইয়া বলিলেন—"অমল তুমিই কি সেই দেশ সেবক!"

মৃণাল তৎক্ষণাৎ তাঁহার দিকে ফিরিয়া গাঢ়স্বরে বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, ইনিই বাঙ্গলা মায়ের সুসন্তান আর আমাদের প্রাণের ভাই, শিক্ষাগুরু! আমরা খুব আশা করছি যে ইনি আমাদের পতিত হিন্দু সমাজটাকে পুনরায় নূতন করে গড়ে তুলতে পারবেন।"

প্রশংসা বাক্যে লজ্জিত অমল মৃদু স্বরে মৃণালকে বলিল—"আঃ কী বাজে বকছ মৃণাল, সামান্য মানুষকে এতটা বাড়িয়ে তোলা তোমার উচিত হয় নি। না কাকাবাবু ওর কোন কথা শুনবেন না।"

সামনেই মিঃ মুখার্জ্জীর সুবৃহৎ মিনার্ভা 'কার' খানি অপেক্ষা করিতেছিল। মিঃ মুখার্জ্জী অমলকে ডাকিয়া বলিলেন—"এসো বাবা অমল।"

"ক্ষমা করুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরে আসছি।" বলিতে বলিতে অমল সেই বিপুল জনমণ্ডলীর মধ্যে ত্বরিত পদে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরিয়া আসিয়া 'কারে' উঠিয়া বসিল। সোফেয়ার ষ্টার্ট দিল।

—তিন—

গাড়ীর মধ্যে বসিয়া অমল একবার নিজের কৌতুহলী চোখ দুইটা বুলাইয়া সকলের মুখের ভাবগুলি দেখিয়া লইল। সহসা আলোক বলিল—"আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, এই মোটা খদ্দরের কাপড় চাদরে আপনার কষ্ট হচ্ছে না?"

অমল স্নিগ্ধ স্বরে বলিল—"কষ্ট, কিছুমাত্র না; বরঞ্চ আপনি একবার ব্যবহার করে দেখবেন যে আমাদের এই দেশীয় মোটা পরিচ্ছদ কত আরাম প্রদায়ক। আঃ ঐ বিলাতী কোর্ট, প্যাণ্ট, কলার, নেকটাই যেন এক একটা বন্ধনী, আমার তো মনে হয় যে গলায় কলার নেকটাই লাগালে দম বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের এই শুভ্র সরু পাড় ধুতি খানির ভাঁজ খুলে পরলে মনে হয় যেন সারা অঙ্গে নির্ম্মল চাঁদের স্নিগ্ধ রজত ধারা ঝরে পড়লো। পাতলা কোঁচান চাদর খানির প্রতিটি কুঞ্চন যেন নদীর বুকের এক একটি হিল্লোল। তবে সকলকার মনোভাব কিছু একরকম নয়, আপনি আমাকে বস্ত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলেন তাই বললাম। সত্যি বলুন দেখি, ঐ সমস্ত আঁটা আঁটা পোষাক পরে কোথাও হাত, পা মেলিয়ে বসবার জো আছে?"

আলোক চিন্তিত ভাবে বলিল—"কতকটা সত্যি বটে কিন্তু দু'দিন পরে যখন কোর্টে বেরুবেন, তখন তো বাধ্য হয়ে আপনাকে এ স্বদেশী পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করতে হবে।"

অমল স্বরের উপর জোর দিয়া বলিল—"সে আমি ভেবেই রেখেছি, কোর্টে আমি বেরুচ্ছি না।"

বিনা মেঘে সহসা বজ্রপাত হইলেও লোকে অতটা চমকাইয়া উঠে না, যতটা অমলের কথায় মোটরশুদ্ধ লোক চমকিয়া উঠিলেন।

মিঃ মুখার্জ্জী মস্তকের কেশ বিরল স্থানটায় হাত রাখিয়া বলিলেন—"বল কি অমল, চাকরী করবে না?"

দ্বিধা-লেশ-বর্জ্জিত সরল স্পষ্ট ভাষায় অমল বলিল—"না কাকাবাবু।"

"অমল—কথাটা বলবার পূর্ব্বে বিবেচনা করে দেখেছ কী?"

খুবই বিবেচনা করে দেখেছি কাকাবাবু। এই এতদিন ধরে বিবেচনা করে করে শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মিথ্যার নামান্তর সত্য জিনিষটাকে শাস্ত্র এবং সমাজ নীতির দোহাই দিয়ে মেনে চলতে পারব না। সেই যে চিরাচরিত ধরে স্বাস্থ্যহীন দুর্ব্বল অলস বাঙ্গালীর মুখে অবিরত শোনা যাচ্ছে হা চাকুরী, যো চাকুরী, চাকুরীই প্রাণ। ছিঃ ঘৃণা ধরে গ্যাছে, না কাকাবাবু ও চলতে আমি বড়ই নারাজ জানবেন।"

মিঃ মুখার্জ্জী সংশয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—"তবে বিলেতে গিয়ে সার্ভিস পাশ দিলে কেন অমল ?"

"দিলেই বা কাকাবাবু, শিক্ষাতে কি কোন দোষ আছে ? কিন্তু হীন দাসত্ববৃত্তিতে জীবন যাপন করাটাকে, আমি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করি।"

মিঃ মুখার্জ্জী মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—"বাপু এখনো ছেলেমানুষ আছ তুমি। আমি ঐ সমস্ত দেখে দেখে চুল পাকালুম, এখন এই স্বদেশীর ঢেউটা নূতন, দেশে আমদানী হয়েছে তাই তোমাদের তরুণ মনগুলি অতি সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে। থাম, দেখতেই পাবে কিছুদিন পরে ওর স্বরূপ মূর্ত্তিটা।"

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অমল বলিল—"স্বরূপ মূর্ত্তি ওর আর কী দেখব বলুন, দেখাদেখি তো আমার মনে। আমি তো ইচ্ছে করলে এখনই এ সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে পরের গোলামী—যা আজকালকার বাঙ্গালী জাতির প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই করতে পারি, কিন্তু কেন তা করব ? দেশ আমার আরাধ্যা জননী। কাকাবাবু মাকে আমি ত্যাগ করব ? মায়ের প্রাণে আপনি ব্যথা দিতে বলেন ?"

ডোরোথি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সে সহসা বলিয়া বসিল—"মায়ের মনে কষ্ট ! ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছেলে হলে মার প্রাণে আনন্দ হয় না, এ যে বড় আশ্চর্য্য কথা বলছেন মিঃ চৌধুরী ?"

অমল শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"আনন্দ হবে না কেন সুনীতি হয়, কিন্তু সেটা বেশীর ভাগই অশিক্ষিতা মাতার। কিন্তু আজকালকার নবযুগের শিক্ষিতা হিন্দু জননী, সন্তান প্রতিপালন করবার সময়…করবেন না যে ছেলে আমার হাকীম হয়ে বিদেশীর পদলেহন করুক। এক মায়ের কোল ছেড়ে বড় হয়ে যে মায়ের দেওয়া অন্ন মুখে তুলেছি—সারা বছর যিনি আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য যোগাচ্ছেন, নানান দেশের নানান ছবি চোখের সামনে ধরে সত্যের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন, যিনি জ্ঞানের আলো জেলে আমাদের ভবিষ্যতের আঁধার দূর করবার জন্য চেষ্টা করছেন, সেই চির স্নেহময়ী মা-টি যদি আজ হাজার হাজার সুস্থ, কর্ম্মঠ সন্তানদের কাছ হ'তে সহানুভূতি না পান, সেই মায়ের চোখের জল যদি গড়িয়ে পড়তে থাকে…তা হ'লে সন্তানদের প্রাণে ব্যথা লাগা উচিত কি অনুচিত সেটা তুমিই বিবেচনা করে দেখতে পার নীতি।"

আবার সেই জীর্ণ, পুরাতন সম্ভাষণ সুনীতি ! খোঁচা দিয়া খোঁচা খাইয়া ডোরোথি বাহিরে চুপ করিল কিন্তু অন্তরে তার ক্ষুব্ধরাগ, রোষ সমুদ্রের মত গর্জ্জন করিয়া ফেনাইতে লাগিল। গর্ত্তের ভিতরে আহত ভুজঙ্গ যেমন মাটি ফাটাইতে না পারিলে রুদ্ধ রোষে নিজের মাথা নিজেই আছড়াইয়া ভাঙ্গে, ঠিক তেমনি বাক্যের দ্বারায় অমলকে পরাজিত করিতে না পারিয়া ডোরোথি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে 'হর্ণ' বাজাইয়া মোটার কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিল। ব্যথা ও অভিমানের ভারে প্রপীড়িতা ডোরোথি অন্য দিকের দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িল। দ্বিতলের ড্রয়িংরুমে অমলকে বসাইয়া মিঃ মুখার্জ্জী বলিলেন—"এইখানে একটু বিশ্রাম কর বাবা আমি একবার উপরে যাই, এস আলোক।"

বারাকপুরের ঠিক গঙ্গার ধারেই মিঃ মুখার্জ্জীর প্রকাণ্ড সৌধ। সম্মুখে হাতার দুই ধারে দুইটি রাস্তা সর্পাকারে আঁকিয়া বাঁকিয়া একটি গঙ্গার কোলেতে মিশিয়া গিয়াছে, অপরটি গাছের ছায়ায় ছায়ায় আপনার ক্ষীণ দেহখানি বিস্তার করিয়া চলিয়াছে কোন্ অসীম বিশাল পথে ভিড়িবার জন্য। গঙ্গাবক্ষে কাঁপন জাগাইয়া সাদা সাদা 'ষ্টীম লাঞ্চ'গুলি শরতের শুভ্র মেঘশিশুর মত হাল্কা গতিতে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিতেছে। হাতার বাম ধারে অনেকটা খোলা জমী পড়িয়া নষ্ট হইতেছিল, মিস মুখার্জ্জীর ইচ্ছায় বা আবদারে সে স্থানটির আগাছা ও কাঁটাবন ঘুচিয়া এক্ষণে শ্যামল শষ্পাবিস্তৃত সু-বিস্তীর্ণ 'টেনিস্ কোর্টে' পরিণত হইয়াছে। দক্ষিণে বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে নানারকম বিলাতী ফুলের গাছ এবং পাতা বাহারে লতা, মধ্যে মধ্যে হোয়াইট রোজের গোল গোল কেয়ারী। আকাশ আজ ঘন ঘটাচ্ছন্ন। মেঘের কোলে নিকষ কালো থমথমে মেঘগুলি এলাইয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে, কোথাও এতটুকু ফাঁক নাই। চতুর্দ্দিক কেমন যেন মৌনতায় ভরা। সারা বিশ্ব সংসারটাও কেমন যেন অজানা ব্যথার আশঙ্কায় স্তব্ধ মূক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আকাশের এই গুমরাণী …প্রকৃতির এই এলান ভাব দর্শনে, দীর্ঘকাল স্বজন পরিত্যক্ত

প্রবাস প্রত্যাগত যুবকের মনের মধ্যে বিশ্বের বিরাট ক্ষুধা মূর্ত্ত হইয়া জাগিয়া উঠিল। তাহার সম্মুখে দুইটি পথ…কোন পথে সে যাইবে। একদিকে কঠোর কর্ত্তব্য…অন্যদিকে অগাধ বিষয়ের সাথে সুন্দরী তরুণীর বুকভরা ভালবাসা… কোথায় সে যাইবে? মন তাহার চঞ্চল হইয়া হু হু করিয়া উঠিল। সে একট ব্যাকুল স্বরে ডাকিল—"সুনীতি।"

ডোরোথির চমক ভাঙ্গাইয়া সে স্বর মর্ম্মের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া ভিতরে পৌঁছাইল। তাহার মুখের কাঠিণ্য ভাব ঐ একটি মিষ্টি মধুর বাণীতে গলিয়া কোমল হইয়া গেল। সেও মৃদু মধুর সুরে বলিল—"কী বলছেন মিঃ চৌধুরী? ওঃ কত রাত হয়ে গ্যাছে দেখছেন—বাবা যে আমাদের অনেকক্ষণ উপরে যেতে বলে গেছেন কিন্তু…"

"কী কিন্তু নীতি?"

"আমার একটি কথা কি রাখবেন?"

অমল গলার স্বর কোমল করিয়া বলিল—"বল—সাধ্য হলে নিশ্চয় রাখব।"

ডোরোথি একটু থামিয়া পরে বলিল—"অন্ততঃ এ সময়টা আপনার বেশ পরিবর্ত্তন করে ফেলাই উচিত, যেহেতু সেখানে আমার অনেকগুলি বন্ধুবান্ধব এসেছেন…"

"থাম দেখি নীতি—তোমার কথার ভাব বুঝতে পারছি না আমি। এলেনই বা তোমার বন্ধুবান্ধব, আমার এই বেশে কী এমন ভয়ঙ্কর পদার্থ আছে…যে দেখলে তাঁরা ভয় পাবেন বা ঘৃণা করবেন? না নীতি, তোমার এ অন্যায় আবদার আম রাখতে পারলাম না, এ বেশ আমি ছাড়তে পারব না। আশা করি আমার যে প্রিয়জন, সেও যেন এই রকম দীন বেশে সমাজে মেশে।"

ডোরোথির পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত দুলিয়া উঠিল। মুখটাকে সে যথাসম্ভব নীচু করিয়া ক্ষুব্ধস্বরে বলিল— "আমাকে বার বার ব্যথা দিয়ে আপনি কী খুব সুখী হচ্চেন মিঃ চৌধুরী?"

বিস্মিত নয়নে অমল ডোরোথির মুখের পানে তাকাইয়া বলিল—"ব্যথা দিচ্চি আমি তোমায়! এ কী কথা নীতি, আমার কোন কথার আঘাতে তুমি ব্যথা পাচ্চ আমি যে কিছুই বুঝতে পাচ্চি না?"

চোখের জল চোখে চাপিয়া ডোরোথি বিষাদব্যঞ্জক স্বরে বলিল—"নাঃ কিছু মনে করবেন না, আমারই বলবার ভুল।"

অস্থির ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, পরে অন্যমনস্ক ভাবে জানালার সূক্ষ্ম নেটের পর্দ্দাখানি টানিয়া টানিয়া সোজা করিতে করিতে অমল ডাকিল—নীতি।

ডোরোথি তাহার বাষ্পাকুল নেত্র ক্ষণেকের তরে অমলের বিশাল আঁখির পরে বিবদ্ধ করিয়া নতমুখী হইল। অমল একটু সরিয়া আসিয়া বেদনাবিদ্ধ সুরে বলিল—"নীতি, বহুদিন পরে স্বদেশে ফিরে এসে তোমাদের মুখ দেখে আমার চির দুর্ভাগ্যময় জীবন আবার বহুদিনের অনাগত আশায় আনন্দে মেতে উঠেছিল। কিন্তু এখন দেখছি—যে আমার কথায় তুমি ব্যথা পাচ্চ, কাকাবাবু গম্ভীর হয়ে উঠছেন, আরও কত কি, নীতি, যখন আমি আমার সঙ্কল্প ছাড়তে পর্ব্বনা— তখন এমনিতর দুঃখ আরও যে কত লোককে দেব তা কে জানে? যাক্ এ মীমাংসা পরের জন্যে তোলা থাক্ এখন এস। রাত অনেক হয়ে গ্যাছে।

ত্রিতলের সুসজ্জিত হলঘর খানি আহূত অতিথি মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। ডোরোথিকে লইয়া অমল তথায় উপস্থিত হইতেই অসংখ্য কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইল, "ওয়েলকাম্ মিঃ চৌধুরী, আমরা আপনাকে 'কংগ্র্যাচুলেট' করছি।"

অমল হাসিমুখে সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া একখানি সোফার উপরে বসিয়া পড়িল। তারই পাশের চেয়ার হইতে আলোক বলিয়া উঠিল—"জানেন মিঃ ডাট্—বিলেত হ'তে ঘুরে এসে ইনি দেশের হিতার্থে উঠে পড়ে লেগেছেন, আচ্ছা মিঃ চৌধুরী, কি করলে দেশহিতৈষী হওয়া যায় আমাকে অনুগ্রহ করে শিখিয়ে দিতে পারেন? বোধ হয় পথে ঘাটে খদ্দর প্রচারের জন্য খুব জ্বালাময়ী ভাষায় লেকচার দিলেই হয় না? ওঃ আপনি এখনও সেই খদ্দর পরে রয়েছেন যে দেখছি, না না ছেড়ে ফেলুন মিঃ চৌধুরী, নিজের শরীরকে অতখানি কষ্ট দেবেন না, রেবা তুমি পরবে অমনি কাপড়?"

আলোক পরিহাসের সুরে শেষোক্ত কথাগুলি পার্শ্বোপবিষ্টা এক তরুণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল। রেবেকা তৎক্ষণাৎ চোখে মুখে দারুণ ঘৃণা ফুটাইয়া বলিল—"বাব্বা, ও পরে

বোধ হয় এক সেকেণ্ডও আমি থাকতে পারি না, উঃ কি ভয়ঙ্কর মোটা সুতোর তৈরী!"

অমল তাহার দিকে ফিরিয়া ধীরস্বরে বলিল "দেখুন মিসেস্ বোস্ সকলকার রুচি কিছু সমান নয় এ জিনিষটাকে আমি ভালবাসি তাই ব্যবহার করি, কিন্তু এটা এমন কিছু নিন্দা বা উপহাসের নয়, সনাতন পদ্ধতি অনুসারে, আমাদের মোটা কাপড়, এবং মোটা ভাতেই সন্তুষ্ট থাকার বিশেষ দরকার আমাদের পূর্ব্বতন পুরুষরা কিছু বিলাতী চাল চলনে অভ্যস্ত ছিলেন না—কিন্তু তাঁদের মতন যথার্থ সুখী, সরল প্রাণ মহানুভব ব্যক্তি, আজকালে সারা ভারত খুঁজলে বোধ হয় মুষ্টিমেয় মেলে।"

অমলের কথায় ব্যঙ্গ করিয়া আলোক বলিল "জানেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ পুরুষই ছিলেন অশিক্ষিত, তাঁদের ভালমন্দ বিচার করবারই ক্ষমতা ছিল না। আত্মসম্মান বা আত্মমর্য্যাদা যে কাকে বলে বোধ হয় তাই জানতেন না। কেবল হাঁটুর ওপর কাপড় পরে পরনিন্দা আর পরচর্চ্চায় দিন কাটাতেন। তাঁরা জানতেন সমাজে দলাদলি বাধাতে... কারুর পাণ হ'তে চুণ খসলে সামান্য দোষেই তাকে গলাবাজী করে একঘরে করতে। কিন্তু এটাও জানবেন মিঃ চৌধুরী— অসভ্যের মত হুঁকো হাতে নিয়ে আর্কফলা নেড়ে শুধু শাস্ত্রালোচনা করলেই হয় না, পাশ্চাত্যের খবরগুলোও একটু একটু জানার দরকার।"

আলোকের এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে কথা বলিবার ধরণ দেখিয়া গৃহমধ্যে একটা চাপা হাসির মৃদু গুঞ্জন শ্রুত হইল।

পিতৃপুরুষদের প্রতি একজন শিক্ষিত হিন্দু যুবকের এইরূপ হীন ধারণা দেখিয়া অমলের সর্ব্বশরীর রী রী করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সে ভাবিল ছিঃ ছিঃ এই কি নৈতিক উচ্চ শিক্ষার ফল। মনের ভাব গোপন করিয়া বলিল—"মিঃ বোস, পাশ্চাত্যের খবর তাঁরা রাখুন আর নাই রাখুন এটা আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে লোকের বিপদে শিক্ষিত নামধারী বিলাতী খোলসে ঢাকা, আজকালকার সভ্য সমাজ নেতাদের মত পিছন ফিরে বলতে পারতেন না যে ও সব ছোটলোকদের কে দেখবে, আমাদের মহামূল্য সময় নষ্ট হবে। কিম্বা কোন দুঃস্থ পরিবার সাহায্যের আশায় প্রার্থী হয়ে দাঁড়ালে হয় গেটের ভোজপুরী দারোয়ানদের পাকা লাঠির বহর দেখেই ফিরতে হতো... আর ওরি মধ্যে যাঁর বড় কপাল জোর বোধ হয় বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাপ মারা, তাঁদের হয়ত বাবুর সরকার এসে বলে গেলেন—"আপনি অন্য সময়ে আসবেন, বাবু এখন গার্ডেন পার্টিতে চললেন।" এই যে আজ যাঁরা অন্ন সমস্যা, বস্ত্র সমস্যা বলে মুখে খুব তর্জ্জন গর্জ্জন করছেন, তাঁদের মধ্যে যথার্থই কয়জন পল্লীগ্রামে গিয়ে অন্ন ও বস্ত্র সমস্যা সমাধান করবার জন্য চেষ্টিত হচ্ছেন বলুন তো? কত পরিবার যে না খেতে পেয়ে ঘরের কোণে মুখ বুজিয়ে মারা পড়ছে সে খবর কি তাঁরা একবারও কর্ম্মের অবসরে রাখেন? কেন আজ বাঙ্গলায় এমন দুর্দ্দশা! আগেকার সেই অশিক্ষিত মহাপুরুষরা নেই বলেই—আর গুটির মধ্যে যাঁরা আছেন তাঁদের ছাড়া, প্রায় অর্দ্ধেক বিদ্বান ও ভদ্রমণ্ডলীরা প্রতীচ্যের মোহে প্রাচ্যের সমস্ত রীতি, নীতিগুলি ভুলে বসে আছেন। তাই আজ সারা ভারতে হাহাকারের ঢেউ বয়ে চলেছে, সে হেতুই বাঙ্গালী আজ অন্নের কাঙ্গাল। একদিন যাঁরা নিজের হাতে চাষ করে সোণা ফলিয়ে স্ত্রী পুত্র, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে, দীন দুঃখীকে প্রতিপালন করে হেসে খেলে দিন কাটিয়ে গেছেন, আজ তাঁদেরই বংশধরেরা লাঙ্গল ধরা কাজটাকে অপমান বলে বোধ করেন। তাই আজ ত্রিশটা টাকার জন্য পরের দ্বারে গোলামী করতে দ্বিধাবোধ করেন না। নিজের সুস্থ শরীর, কর্ম্মক্ষম সবল বাহু থাকতেও আজ বাঙ্গালী শক্তিহীন, বল বীর্য্যহীন কেন? সেটা আজকালকার এই আবহাওয়ার ঢেউয়েতেই না?"

উত্তেজনায় অমলের কণ্ঠস্বর কাঁপিতে লাগিল।

"তা হ'লে মিঃ চৌধুরী তোমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গ্যাছে যে শিক্ষা, জ্ঞানচর্চ্চা সমস্ত ছেড়ে দিয়ে পল্লীগ্রামে গিয়ে চাষ আবাদ করলেই যথার্থ মানুষ তৈরী হয়। তা হলে সি, আর দাশ প্রমুখ অন্যান্য মনীষিদের বিলাত গিয়ে ডিগ্রী নিয়ে আসাই অন্যায় হয়েছে কেমন?"

অবজ্ঞা ভরে মিঃ ডাট্ রেবেকার পিতা ভাগলপুরের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এই কথাগুলি বলিয়া গেলেন। অমল সেই দণ্ডে যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া গাঢ়কণ্ঠে বলিল—"ওঃ

ওকথা বলবেন না মিঃ ভাটৃ—তাঁদের প্রতি লক্ষ্য করে আমি কথাগুলি বলিনি মহাত্মা গান্ধী বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও প্রধান প্রধান কর্ম্মীদের ত্যাগ অপূর্ব্ব...অবর্ণনীয়. কিন্তু আপনি, তাঁদের কথা ধচ্ছে'ন কেন? আমি তো বরাবরই বলে আসছি যে শিক্ষা চাই মূর্খ হয়ে থাকলে চলবে না—শিক্ষা নেব আমরা তা বিদেশীয় হলইবা—কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের অনুকরণে চলে, আমরা আমাদের স্বাধীনতাটুকুকে নষ্ট হতে দেব কেন? আমার এই ইচ্ছে যে আমরা যেন প্রকৃত হিন্দু বলে সবার কাছে মাথা তুলে গর্ব্বভরে দাঁড়াতে পারি।"

অমলের সুন্দর মুখখানি কী অপূর্ব্ব দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সমস্ত কক্ষ নীরব। সহসা রেবেকা উঠিয়া আসিয়া অনুরোধ করিয়া বলিল "প্রাচ্য আর প্রতীচ্যের হাঙ্গামা ফেলে একবার উঠে পড়ুন তো দেখি। নিন্ দেরী করবেন না মিঃ চৌধুরী।"

অমল উঠিয়া চেয়ার খানা সরাইয়া বিনীত কণ্ঠে বলিল "আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, কেন না আমি এতগুলি কথা কাউকে বলি নি। তবে মনটায় ভারী আঘাত লেগেছিল তাই এতগুলি অপ্রিয় অবান্তর কথার অবতারণা করে ফেলেছি।"

(ক্রমশঃ)

ঢেউয়ের ব্যথা

[শ্রীহরিধন মিত্র]

তখন প্রভাত হয়েছে।

তরুণ তপনের কনক রেখা ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাখীদের প্রভাত কাকলীর রেশ তখন বাতাসে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এমন সময়...পূবে—ওঠা রাঙা রবির দিকে চেয়ে একটী মেয়ে নদী সৈকতে দাঁড়িয়ে ছিলো। মেয়েটী বড় সুন্দরী। ফুলের গন্ধ-মেশা বাতাস তার চুলের খস্‌খসে বাস চুরী ক'রে সরে যাচ্ছিল—ফুলের গন্ধ চুরী ক'রে লোভ সাম্‌লাতে পার্চ্ছিল না সে; তাই মেয়েটীর চুলের গন্ধও যতটা পারলে, চুরি করলে...আহা মেয়েটী সে সব কিছু জানতে পারলে না—সে দাঁড়িয়েই রইলো।......

নদীর ঢেউগুলির কাছে তার আগমন বার্ত্তা কেমন করে যে ছড়িয়ে পড়েছিলো—তারা এসে, তার আল্‌তা-রাঙা টুক্‌টুকে পা দুটীতে প্রাণের অর্ঘ্য দিয়ে একে একে ফিরে যাচ্ছিল—ধীরে ধীরে, চুপে চুপে—

অনেকক্ষণ থেকে থেকে মেয়েটী ফিরে গ্যাল।

তখনো সব ঢেউয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করা হয় নি—অনেকেই আসছিলো...এসে তাকে দেখতে না পেয়ে তারা নদী সৈকতে আছাড় খেয়ে খেয়ে পড়তে লাগল—তারপর ছল্ ছল্ করে কেঁদে উঠল!

কেঁদে কেঁদে শেষকালে তারা ফিরে গ্যাল। আবার এলো, আবার আছাড় খেয়ে পড়ল।

*　　*　　*　　*

আজও ঢেউগুলি ঘুরে ঘুরে সেই নদী সৈকতে আসে; কিন্তু মেয়েটী আসে না—তাই তাদের আসাই সার হয়—আছাড় পিছাড় করেই দিন কাটে।

*　　*　　*　　*

বাতাসের প্রাণে কোন ব্যথা নেই; সে তেমনি বয়ে যায়। বাতাস, তার যতটা পেরেছিল, চুরী করেছিল বোলে কি বাতাসের প্রাণে কোন ব্যথা নেই? আর ঢেউগুলি; বিলিয়ে দিয়েছিল বোলেই কি তাদের এত ব্যথা?

বিলিয়ে দিলে কি ব্যথাই পেতে হয়?......

শিখ শোভাযাত্রা

শিখ মিছিল

মিছিলের অগ্রভাগ

বহুবাজার ও সেণ্ট্রাল এভিনিউ মোড়ে শিখ মিছিল

সুসজ্জিত মটর লরিতে 'গুরুগ্রন্থ' সাহেব

ভলাণ্টিয়ার গার্ড

সেণ্ট্রাল এভিনিউতে ভলাণ্টিয়ারদের মধ্যে আর্মষ্ট্রঙ্গ (Armstrong) সাহেব

ব্যর্থ প্রেম

(কোন সংস্কৃত কবিতার ভাব লইয়া)

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

তুমি ভাল যদি মোরে নাহি বাস তবে,
চাহিও না মুখপানে গো—
আর ভরিও না বুক আশায় কুহক গানে গো ;
শুধু শুষ্ক নীরস হাসিতে তোমার
দিওনা গো দুখ প্রাণে গো।

সেই নবীন প্রভাতে রবির কিরণ
উঠেছিল যবে দুলিয়া—
ছিলে আপনার মনে আপনাকে যেন ভুলিয়া
মনে পড়ে কি এখন চেয়েছিলে লাজ-
-বঙ্কিম আঁখি তুলিয়া ?

সেই ছায়া পথ ঘেরা আকুল-বকুল-
কুঞ্জ-কুটীর ভবনে,
খোলা এলোচুল তব উঠেছিল দুলে পবনে,
কিবা আহ্বানভরা আকুল আবেশ
ফুটেছিল তব নয়নে !

যবে কুলুকুলুস্বর তরল মধুর
গেয়েছিল ক্ষীণা তটিনী,
দূরে শান্ত নয়নে চেয়েছিল বনহরিণী—
আর সরসীর বুকে ফুটেছিল কত
নির্ম্মল-দল-নলিনী !

তব নয়নের পাতে তাকানু যখন
নিকটে আসিনু সরিয়া—
গেল পরাণ আমার কি এক পুলকে ভরিয়া !
ছিলে স্নিগ্ধসুরভি বকুল মালিকা
কম্পিত করে ধরিয়া !

সেই নিমেষের তরে নয়নে নয়ন
বিস্ময়লাজচকিতা !
শুধু মুচকি হাসিয়া নামালে নয়ন ললিতা,
মনে পড়ে কি লো সখি, আজিকে সে সব
জ্যোৎস্নাশুভ্র হসিতা !

তবে আজ কেন সখি, হাসনাক আর
সুমধুর—চারুহাসিনী !
কেন হয়েছ নিদয় নিঠুর নীরবভাষিণী ?
বঁধু আজ কি গো আমি তোমারে তেমন
প্রাণ দিয়ে ভালবাসিনি ?

হায় কি বুঝিবে তুমি মনপ্রাণ দিয়ে
কত ভালবাসি তোমারে—
ভাল বাসিতে হৃদয় প্রিয়জনে কিছু যা পারে,
আমি বাসিয়াছি তার বেশী ভালবাসা
ওগো বঁধু ওগো তোমারে !

প্রেম জান কি গো সখি, কত নির্ম্মল
স্বর্গীয় কত সুমধুর,
যেন জননীর চুমা, শিশুর হাসিটি ভরপুর !
সে যে স্বরগের সুধা, প্রভাতের আলো
কিশোরী বধূর মিঠিসুর !

ভাল তুমি নাহি বাস, না বাসিলে সখি,
আমার এ প্রেম চিরদিন—
যদি মনে পড়ে কভু দিও শোধ কণা প্রেমঋণ,
আর নাহি যদি পার সেও ভাল, শুধু
কোরোনাক মোরে দীনহীন !

বেশ ভাল যদি আর নাহি লাগে মোরে
চেও না অমন চেওনা—
শুধু ঘৃণার হাসিতে জীবন আমার ছেয়ো না,
আর অন্তর মম বিদীর্ণ করি
বিচ্ছেদ-গীতি গেয়োনা !

ষড়যন্ত্র

[শ্রীশিশিরকুমার বসু]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পুলিস সাহেব পত্রখানি পাইয়াই বুঝিলেন, যে পত্রখানি কোন স্ত্রীলোকের লেখা, এবং নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকটি অনিচ্ছা-সত্ত্বে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অশ্বারোহী পুলিস উক্ত রাস্তায় চিঠিতে লিখিত গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে পাঠাইলেন। পুলিসের বড় কর্ত্তা এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া কাউণ্ট গলিজাইনের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন।

আহারাদির পর নানারূপ কথাবার্ত্তার মধ্যে সেই পত্র খানি বাহির করিয়া কাউণ্টকে দেখাইলেন। কাউণ্ট পড়িয়া পত্রে লিখিত একটি লাইন চীৎকার করিয়া পুনরুক্তি করিলেন— "একজন খ্যাতনামা শিল্পী?" পুলিস সাহেব বেইলস্কি কাউণ্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কে আপনি বুঝিলেন কি?"

কাউণ্ট পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন "করসিনি, করসিনি কি?"

বেইলস্কি চমকিত হইয়া উত্তর করিল "সে কি?"

"এক্ষুণি, এক্ষুণি একজন লোক করসিনির হোটেলে পাঠাও, তার সন্ধান এক্ষুণি চাই। পাগলের ন্যায় কাউণ্ট ইতঃস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন – বেইলস্কি দ্রুতগামী অশ্বারোহী পুলিস পাঠাইয়া করসিনির সন্ধান লইয়া আসিলেন —তাহাকে কোথাও পাওয়া গেল না—সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। কাউণ্ট চীৎকার করিয়া উঠিলেন "বেইলস্কি, চাই এই গাড়ী ধরাই চাই।"

বেইলস্কি ছুটিয়া কাউণ্টের গৃহ হইতে বাহির হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বেগে প্রস্থান করিলেন; কাউণ্টও অস্থির ভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

করসিনিকে লইয়া সেই বদ্ধ গাড়ী বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে —গাড়ীর মধ্যে করসিনি অজ্ঞান অবস্থায় পতিত; শুধু অজ্ঞান নহে, দুর্ব্বৃত্তেরা তাহার হস্তপদদ্বয় দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়াছে।

হঠাৎ একটি সরাইএর নিকট আসিয়া দুর্ব্বৃত্তগণ গাড়ী থামাইল; এবং সরাইএ প্রবেশ করিয়া জলযোগ ও মদ্যপান করিতে বসিল। তাহারা বসিয়া আমোদ প্রমোদ ও গল্পগুজব করিতেছে এমন সময় হঠাৎ সরাইএর অধ্যক্ষ আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল "সর্ব্বনাশ—পুলিস আসিয়া চারিদিক ঘিরিয়াছে"; এই কথা শুনিবামাত্র দুর্ব্বৃত্তগণ বেগে বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইল; পুলিসও তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মাত্র দুইজনকে ধৃত করিল; অন্যান্য কয়েকজন পলায়ন করিল।

বেইলস্কি গাড়ীর দরজা খুলিয়া করসিনিকে বাহিরে আনিয়া শুশ্রূষা করিয়া তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। করসিনি ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল "আমি কোথায়।"

বেইলস্কি উত্তর দিল "ভয় নাই, আপনি নিরাপদ।" সেই গাড়ীতে করসিনিকে শোয়াইয়া ধৃত দুর্ব্বৃত্ত দুইজনকে বন্দী করিয়া লইয়া বেইলস্কি সদলবলে পুনরায় সেণ্ট পিটার্সবর্গে যাত্রা করিল।

(ক্রমশঃ)
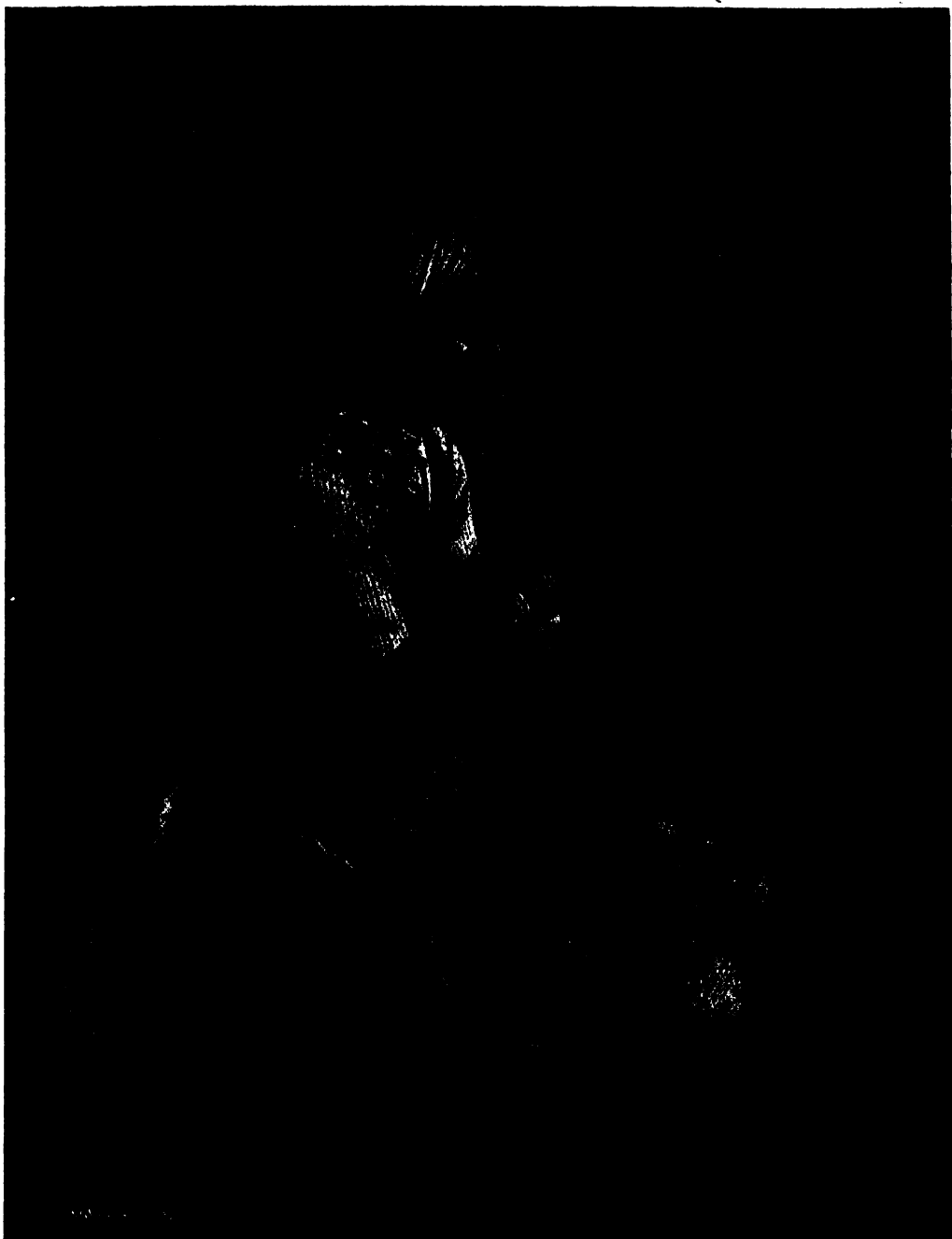
নমাজ।

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন দে।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৩। [২৬শ সপ্তাহ

সজনি, ও ধনী কে কহ বটে।
গোরোচনা-গৌরী নবীনা কিশোরী
নাহিতে দেখিনু ঘাটে।

* * * *
* * *

বাম হাত ধরি আঙ্গুল মোড়ি
দেখে ধাতু কিবা বয়।
"পিরীতের জ্বরে জ্বরেছে ইহারে
পরাণ রয় কি না রয়।"

* * * *

শকুন্তলার মনস্তত্ত্ব

[শ্রীঅমলকুমার চট্টোপাধ্যায়]

মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিকাশ নাটকের প্রাণ। নায়ক নায়িকার মনের পরিবর্ত্তন ও ভাব যিনি নাটকে সুন্দররূপে ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত নাট্যকার। আজকাল নাট্য-জগতের নবযুগে নানাবিধ নাটক রচিত হইতেছে,—এই সকল নাটক ভাল কি মন্দ এ কথা বিচার না করিয়া প্রাচীন ভারতে নাটকের কিরূপ উন্নতি সম্ভব হইয়াছিল, এখন আমরা তাহাই আলোচনা করিব।

জগতের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার প্রায় দেড়-হাজার বৎসর পূর্ব্বে নাটক রচনায় যে অতুল প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আমরা বিস্মিত হইয়া যাই। প্রাচীন যুগে ভারতের একজন 'টুলো' পণ্ডিত যে মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করিয়া গেছেন, আধুনিক বাঙ্গালায় একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী মনো বিজ্ঞানে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াও সেরূপ লিখিতে পারেন না। অভিজ্ঞান-শকুন্তলা কালিদাসের একটী শ্রেষ্ঠ নাটক।

শকুন্তলায় প্রকৃতি-বর্ণনা ও দার্শনিক সত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়াও আমরা যদি কেবল তাহার নাটকীয় মনস্তত্ত্বের আলোচনা করি, তাহা হইলেই আমরা বুঝিতে পারি—কি তীক্ষ্ণ প্রতিভা কবির মস্তিষ্কে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল প্রথম হইতে সপ্তম অঙ্ক পর্য্যন্ত প্রতি ছত্রে কি সুন্দর মাধুর্য্য ছড়াইয়া রহিয়াছে—কবি কত মনোযোগের সহিত সর্ব্বত্যাগী ঋষি হইতে মায়াজালে জড়িত গৃহীর জীবন লক্ষ্য করিয়াছেন! একজন ছোট বালক—যাহার আধ আধ অপরিস্ফুট কথাগুলি নব বিকশিত দন্তগুলির মধ্য দিয়া শুভ্রমেঘমালা হইতে বর্ষিত জলকণার মত বাহির হইতেছে সেও কবির বিশেষ মনোযোগ হইতে অব্যাহতি পায় নাই। লোকালয় হইতে বহুদূরে সংসারে অনভিজ্ঞ ঋষিকন্যা যখন স্বাভাবিক যৌবনের বিকাশে মনোহর হইয়া উঠিল, তখন তাহার মনের নিভৃত দেশে যে চিন্তাতরঙ্গ খেলা করিতেছিল, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কঠিন তপস্যায় ক্লিষ্টদেহ তপস্বীর অন্তরে যে সুপ্ত স্নেহ ফুটিয়া উঠিয়াছিল—তাহাও তিনি নিপুণতার সহিত লিখিয়াছেন—'বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো!'

শকুন্তলায় সকলের চেয়ে দেখিবার জিনিষ হইতেছে—মানুষের সহিত প্রকৃতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। প্রকৃতির প্রতি পরিবর্ত্তনে মানুষের কি পরিবর্ত্তন হয়। মানুষের হর্ষে, দুঃখে প্রকৃতির মন-অনুভূতি কেমন করিয়া তাহাকে আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে—তাহা কালিদাস কি সুন্দরভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। প্রায় দেড়হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি যে পুলিশের মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন, তাহা আমরা আজ কখনই অসত্য বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না। এই সকল গুণের জন্যই তাহার নাম এবং রচনা শাশ্বত হইয়া আছে।

শকুন্তলা পড়িতে বসিলেই প্রস্তাবনার সহিত নাটকের মূল ঘটনা সংযোগ করিবার কৌশল বেশী করিয়াই চোখে পড়ে। সূত্রধার কেমন কৌশলে নাটকের আরম্ভ করিয়া দিল। ঐ দূরে মৃগ যেমন রাজাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তেমনি তাহার মন নটীর গানে আকৃষ্ট হইয়াছিল—সে সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছিল একটা ঘটনা হইতে অন্য ঘটনার অবতারণা কেমন নৈপুণ্যের সহিত সম্পন্ন হইল। তৎপরে শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের সাক্ষাৎ একটী সামান্য ভ্রমরের দ্বারা সংঘটিত হইল।

অদ্ভুত কৌশলে কবি দুষ্মন্তের মুখ দিয়া লজ্জাশীলা অনুরক্তার মনোভাবের বিবরণ দিয়াছেন। ভালবাসার পাত্রের কথা নারী মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে-তাহার দিকে বেশীক্ষণ তাকাইয়া থাকে না। এই লজ্জাশীলা নারী হৃদয়ের সূক্ষ্ম ভাবগুলি একটী শ্লোকে কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে। রাজাকে ছাড়িয়া যাইতে শকুন্তলার মন উঠিতেছে না কোন ছুতা করিয়া বিলম্ব করিতেছে, এবং সেই সময়ের অবকাশে রাজাকে দেখিয়া লইতেছে। পায়ে কুশবিদ্ধ হইয়াছে বৃক্ষের শাখায় বল্কল বাধিয়া যাইতেছে—ইত্যাদি মিথ্যাকথা বলিয়া, কুশ তুলিয়া ফেলিবার ও বল্কল ছাড়াইবার ভাণ করিয়া রাজাকে দেখিতেছে;—প্রেমিকা শত প্রকারে প্রিয়তমকে দেখিবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করিতে পারে না। হৃদয়ের বোধশক্তির পূর্ণ বিকাশ যেখানে, তাহাই সুন্দর এবং তাহার সৌন্দর্য্যই চিরকাল অক্ষত

থাকিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে। অনেক সময় উপন্যাসে ও নাটকে মনস্তত্ত্বের নাম দিয়া যে বিসদৃশ বিচার করা হয়—তাহা অন্যদিকে যেমন হাস্যাস্পদ তেমনি সাহিত্যের অবনতির কারণ হইয়া থাকে।

কালিদাস যথার্থ কৌশল জানিতেন। তিনি নিজে একজন লেখক হিসাবে কোন কিছু লিখেন নাই। প্রেমিক, সন্ন্যাসী, গৃহী—মানুষ হইয়া তাহাদের অবস্থা ও মনের সম্যক-ভাব মনে মনে কল্পনা করিয়া দেখিয়া লিখিয়াছেন—তাই তাঁহার রচনা এতই নিখুঁত। সেক্সপীয়ারও এইরূপ ছিলেন এই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে Coventry Patmore লিখিয়াছেন—

"The best part of the best play of Shakespeare is Shakespeare himself."

শকুন্তলায় অনুসূয়া ও প্রিয়ম্বদা এই দুটী স্ত্রী চরিত্র অঙ্কণে দুটীর মধ্যে পার্থক্য সৃজন করিবার জন্য কবি যাহা করিয়াছেন, তাহা সত্যই অতুলনীয়। একথা কথা দ্বারাই এক একজনের মনের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। একজন সমস্তক্ষণ ধরিয়া প্রতি কার্য্যে তাহার হাস্তরস ও পরিহাস প্রিয়তার ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছে—আর একজন শান্ত, সরল,—বিনীত। যদিও দুইজনেই একই ভাবে লালিত পালিত এবং তাহাদের কার্য্য এক, তথাপি তাহাদের মধ্যে কত পার্থক্য !

দ্বিতীয় অঙ্কে রাজা যখন বিদূষকের নিকটে শকুন্তলা বৃত্তান্ত বলিয়া ফেলিয়া ভাবিলেন, এই সরল প্রকৃতি মানুষটী অন্তঃপুরে গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিতে পারে, তখনই কেবল একমুহূর্ত্তে কথা পরিবর্ত্তন করিয়া বলিলেন—'পরিহাস বিজল্পিতং সখে—'

অভিজ্ঞান শকুন্তল পড়িতে বসিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইতে হয়, যখন দেখি গোতমীর আগমন বার্ত্তা কৌশলে জানাইবার জন্য সখীদ্বয় বলিতেছে,—'চক্রবাকবধূ সখার কাছে বিদায় লও।' এত কৌশল—বৃদ্ধা অভিজ্ঞা গৌতমীর নিকট দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার নিভৃত আলাপের কথা গোপন করিয়া তাহাদের সাবধান করিবার জন্য এই যে কথার অবতারণা—ইহাতেই আমরা কালিদাসের প্রতিভার তলে সসম্মানে মাথা নত করি।

তৎপরে পঞ্চম অঙ্কের সেই প্রসিদ্ধ শ্লোক,—'রম্যানি বীক্ষ্য—।' গান শুনিয়া রাজার মনের যে অবস্থা হইয়াছে তাহার কারণ নির্দ্দেশ দেখিলে কবির দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে বিশেষ ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের মনের মধ্যে মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে যে বেদনার করুণ সাড়া জাগিয়া উঠে—তাহার উৎপত্তি কোথায়—দর্শন শাস্ত্রের এই সমস্যা কবি একটী শ্লোকের মধ্যেই পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের এরূপ মিলন অন্য কাহারও নাটকে সম্ভব হইত না। হৃদয়ের বিরহ যন্ত্রণার ব্যথিত চিত্তে উত্তেজনা ও বীর রসের সৃষ্টি করিতে হইলে যে পন্থা অবলম্বন করিতে হয়, তাহা কবির সম্পূর্ণ জানা ছিল—তাহা তৃতীয় অঙ্কের মাতলির কার্য্যে প্রকাশ পায়।

শকুন্তলা পড়িতে বসিলে মনে হয় যেন সুন্দর তরণী বাহিয়া অনাবিল স্রোতে প্রবাহিত স্বচ্ছ নদীর উপর দিয়া চলিয়াছে,—দুই তীরে গৃহীর গৃহ—তপস্বীর তপোবন—প্রকৃতির প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি—স্বর্গের স্নিগ্ধ আভাষ দেখিতেছি; হৃদয়ে পূর্ণ তৃপ্তিও অতৃপ্ত বলিয়া বোধ হয়—কিসের আগ্রহে উৎসুক মন ব্যাকুল ভাবে সম্মুখে চাহিয়া থাকে।

কালিদাস বিরহিণী শকুন্তলার যে করুণ মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ভুলিবার নয়। মিলনান্ত নাটকে এই একটী মূর্ত্তি থাকিয়া থাকিয়া কেবল ব্যথার সৃষ্টি করে। মিলনের মধ্যেও বিয়োগের এইরূপ অদৃশ্য প্রভাব পাঠকের মনকে আলোড়িত করিতে থাকেন—সেইজন্যই অভিজ্ঞান শকুন্তল অনুপম—ইহার তুলনা ইহা নিজেই।

শকুন্তলার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ অল্পে সম্ভব হয় না। কালিদাসের প্রতিভার তুলনা হয় না—তাহা অদ্বিতীয়। যুগ যুগ ধরিয়া যাহা জগতের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া আছে—সে প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিবার যোগ্যতা আমাদের নাই। শ্রেষ্ঠ চিরদিনই শ্রেষ্ঠ—সেই শ্রেষ্ঠত্বের তলে মাথা রাখিয়া আমরা ধন্য হইয়া যাইব।

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

—চার—

রেবেকার সহিত লাইব্রেরী রুমে আসিতেই অমলের দুই নয়ন ধাঁধিয়া গেল। এ কী উজ্জ্বল মধুর—আলো ও ছায়ার একত্র সমাবেশ...! তাহার মনে হইল সে মর্ত্যলোক ছাড়িয়া যেন স্বপ্ন মাধুরীর স্নিগ্ধ জড়িমা মাখা অচিন্ রাজ্যে অনাহুত পথিকের মত আসিয়া পড়িয়াছে, এখানকার যাহা কিছু সবই যেন মধুর রসে সিঞ্চিত...কী একটা অজানা পুলকের সাড়া পাইয়া তরুণের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া, দুলিয়া ফুলিয়া উঠিল। ইহার পূর্ব্বে সকলের নিকট হইতে ঘৃণা ও তাচ্ছল্যের আঘাত পাইয়া পাইয়া তাহার সমস্ত মনখানি বিষাইয়া উঠিয়াছিল। এখন যেন শিশিরসিক্ত দীর্ণ ধরণীর বুকখানির উপর বসন্তের সুরভি মলয় বহিয়া গেল, নির্জ্জন শুষ্ক বনানীর বুকে আবার যেন লতাগুলি ফুলে ফুলে বিকশিত হইয়া উঠিল। অন্তরে তার বেদনার স্থানে অসীম তৃপ্ততা ভরিয়া উঠিল। ভাবের সায়রে ভাসমান অমলের মনখানি যখন সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছিল না সেই সময় কাহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর তাহাকে সচকিত করিয়া ধাক্কা মারিয়া মাটির রাজ্যে তুলিয়া দিল।

"বাঃ বেশ হয়েছে ডোরা, এইবার তোর টুকটুকে পা দু'খানি রাঙ্গা আলতায় রঙ্গীন হয়ে উঠবে। জানেন মিঃ চৌধুরী, আপনাদের মিলন দিনটা শেষ হয়ে গেলে আপনাদের বাড়ী গিয়ে একবার নতুন রাঁধুনীর রান্না খেয়ে আসব, দেখব বাঙ্গালী গৃহিণী ডোরোথি আমাদের কেমন রাঁধতে শিখেছে, কি বলিস্ ভাই চেরী ?"

স্বপ্নরাজ্য হইতে অমলকে যেন ঠেলিয়া কে পৃথিবীর নিষ্করুণ বুকে ফেলিয়া দিল। মুহূর্ত্তে আবার তার মনখানি তিক্ততায় ভরিয়া উঠিল। আঃ কোথায় সে যায়! যে প্রশ্নের জাল হ'তে মুক্তি পাইল ভাবিয়া সে রেবেকার সহিত এখানে আসিয়া তৃপ্তিলাভ করিল। আবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সেই কথা! এখানেও তাহার নিষ্কৃতি নাই গো। অমল মন হইতে সমস্ত দ্বন্দ্ব জোর করিয়া ঝাড়িয়া বেশ সংযত স্বরেই বলিল—"মিস্ দাশ, ভাত রান্না আর আলতা পরাটা কি ভয়ানক শক্ত কাজ ?"

মিস্ দাশকে আর উত্তর দিতে হইল না, রেবেকা তাহার কথার উত্তর দিল—"বাবাঃ যে পারে সে জন্ম জন্ম ভাতই রাঁধুক গিয়ে, কিন্তু আমি তো কক্ষণো পারব না; কী একটা বিশ্রী রঙ সারা পা'টায় লেপে থাকবে, ছিঃ কাপড় চোপড় নষ্ট...আর ভাত রাঁধবার সময়ই বা আমার কখন সারাদিন মিটিংএ মিটিংএ ঘুরতেই আমার এক লহমা টাইম থাকে না, তবে আমার এই ননদটি ও-সকল বিষয়ে খুব পটু। এ বোধ হয় আপনারই ধাতে গড়া, কি বল ফাল্গুনী ?"

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া রেবেকা কথাগুলি বলিল সমস্ত বিশ্বের লজ্জা মাখিয়া তাহার আরক্ত মুখখানি ঝুঁকিয়া পড়িল। অমলের শান্তোজ্জ্বল দৃষ্টি, অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ, সংযত মিষ্ট ভাষাগুলি কী সুন্দর! ফাল্গুনী ভাবিল তাহার এই দামী দামী সাড়ী ব্লাউসের কোন মূল্যই নাই! হঠাৎ তাহার দৃষ্টি সম্মুখস্থ দর্পণে গিয়া পড়িল...সে শিহরিয়া উঠিল। আজ তাহার পোষাকগুলি যেন উপহাস করিয়া উঠিল। নিজের দৈন্যতায় কুণ্ঠিতা, শ্যামলা তন্বীটি অন্তরাল খুঁজিতে লাগিল।

"আহা ফাল্গুনকে নিয়ে টানাটানি কর কেন রেবা ও বেচারী তোমাদের দল ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে যে, দেখছ কী ?"

আকস্মিক স্বামীর আগমনে স্তম্ভিতা রেবেকা স্খলিত ভাষায় বলিল—"ওরে বাসরে...বোনের পরে দরদ যে উথলে

উঠছে। সত্যি কথা বলেছি, তাতে হয়েছে কী, আমি কি ফাগুনকে ঘর থেকে যেতে বলেছি না কি?"

রেবেকার মুখের উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আলোক বলিল—"না বল, কিন্তু ফাগুনের সম্বন্ধে অন্যায় দোষারোপ করছ যে রেবা! তুমি কি ভেবেছ যে ও-ও এই ছেলেমানুষী খেয়ালে মাতবে?"

রেবেকা ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বলিল—"দেখো পরে কি হয়, কিন্তু তোমায় তো এখানে আমি ঝগড়া কর্ত্তে ডাকি নি, তুমি এখানে এলে কেন?"

"কি আর করি বল রেবা…মিঃ চৌধুরীকে তোমরা এতগুলি মিলে ছেঁকে ধরে যে রকম অনবরত বাছা বাছা কথায় বাণ বর্ষণ করে যাচ্ছ, তাই ওঁর হয়ে দু' চারটে কথা বলবার জন্তে ওখানকার মজলিস ছেড়ে এখানে এলাম। দেখছেন মিস্ মুখার্জ্জী…আপনার বন্ধুটি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে যেন বাঁচেন, এর উপায় কী করি বলুন তো লক্ষ্মীটির মত।"

ডোরোথি হাসি চাপিয়া বলিল—"সত্যি রেবা আজকাল ভারী দুষ্টু হয়ে পড়েছে, মিঃ বোস্ আপনি আমার কথা রেখে ঐ চেয়ারখানিতে স্বচ্ছন্দে বসতে পারেন, দেখি রেবা একবার কী বলে।"

আলোক ডোরোথির চম্পকাঙ্গুলীর নির্দ্দেশমত রেবেকার পাশের চেয়ারখানিতে বসিয়া পড়িয়া কৃতজ্ঞস্বরে ডোরোথিকে বলিল—"ধন্যবাদ আপনাকে! নাও রেবা এইবার তোমার কি বক্তব্য আছে বলে ফেলো কেন না বিচারের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।"

রেবেকা মনে মনে চটিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"তোমার কথা বলবার সময় এখন নয়।" সে ঘুরিয়া অমলের সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—"জানেন তো মিঃ চৌধুরী, ডোরা জ্যাঠামশায়ের কিরকম আদুরে মেয়ে। আর কিছুদিন পরে ওর সমস্ত ভার আপনার হাতে পড়বে, তাই আবশ্যক বোধে দু' একটি প্রশ্ন করতে চাই, অবশ্য যদি আপনি রাগ না করেন।"

অমল বিব্রত হইয়া বলিল—"বলুন না কি বলবার আছে মিসেস্ বোস্, সত্যি কোন বিষয়েতে মনের সন্দেহ পুষে রাখা ঠিক নয়।"

রেবেকা হাতের পাখাখানি নাড়িতে নাড়িতে মিহিস্বরে বলিল—"দেখুন ডোরা ঐ সমস্ত স্বদেশীয়ানা মোটেই পছন্দ করে না, তারপর চরকা ঘোরান, আর ঘর সংসারের উনকোটি কাজে একেবারেই অনভ্যস্থা। তাই বলছি আপনি যদি ঐ সমস্ত বাজে মত-টত্ গুলো বদলে ফেলেন তা হলে আপনাদের মিলনের পথে কোন অন্তরায়ই ঘটে না।"

রেবেকার কথায় অমল তড়িৎপৃষ্ঠের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল —পরে লজ্জিত ভাবে অপ্রতিভমুখে অসাড় হইয়া বসিয়া রহিল। হায় রে এই তাহার কর্ম্মজীবনের সুখ সহায়তার সঙ্গিনী। অমল একবার চট করিয়া ফাল্গুনীর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল—কালো মেয়েটির মুখখানি ব্যথার ম্লানিমায় শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে, শ্যামাভ তরুণীর পাণ্ডু মুখখানির প্রতি রেখায় রেখায় ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল যেন অন্তরের কী একটা নিরুদ্ধ কাতরতা। নিষেধ নিগড় নিপীড়িতা অসহায়ার সকাতর আঁখিদুটি সকলের অলক্ষ্যে অমলের দীপ্ত চাহনীর নিকট হইতে নীরবে মৌন ভাষায় ক্ষমা মাগিয়া লইল।

মুহূর্ত্তে অমলের মন হইতে সমস্ত রাগটুকু সরিয়া গেল। সকলেই তাহা হইলে ইহাদের মত নিষ্ঠুর প্রকৃতির নহে… এই নির্ম্মম জগতে সমব্যথীও খুঁজিলে পাওয়া যায়? তাহার সারা চিত্ত এক অচিন্তনীয় পুলকের উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার উৎসাহিত চোখে মুখে একটা আনন্দের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সে কণ্ঠস্বরে বেশ একটু উষ্মার রেশ টানিয়া নিয়ে বলিয়া উঠিল—"মিসেস্ বোস্ আপনার বান্ধবী ঠিক যেটিকে পছন্দ করেন না, সেটিই হচ্ছে আমার সমস্ত জীবনের কাম্যবস্তু, আমি এই রকম ভাবে দীন হয়ে জীবন যাপন করাটাকে বড় সুখের—বড় শান্তির বলে মনে করি…আমার এই আচার ব্যবহারে আপনারা সকলে অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, সব বুঝতে পার্চ্ছি…কিন্তু কি কর্ব্ব, আমি যে সত্য ও ন্যায়ের আহ্বানে নবযুগের পথে চলা সুরু করে দিয়েছি—প্রলোভন যদি শত সহস্র মূর্ত্তি ধরে আমাকে স্নেহের আহ্বান করে—তবুও সে আমাকে ফেরাতে পার্ব্বে না

আপনারা আমাকে ঘৃণা করুন, আমাকে হৃদয়হীন বলুন, আমি সেই আপনাদের সমস্ত নিন্দার বিশেষণগুলিকে মূল্যবান ভূষণ বলে মাথা পেতে নেব—কিন্তু তবুও জানবেন যে আমার এই সঙ্কল্প শুভ্র তুষার কিরীট হিমগিরির মত অচল অটল—বাঙ্গালীর আজকাল একটা নিন্দে উঠেছে যে তারা কথার ঠিক রাখতে জানে না—এইবার দেখবেন যে বাঙ্গালী কথায় ও কাজে একই কিনা—আরও একটা কথা, আপনাদের এই রীতি-নীতি হতে আমার রীতি-নীতি ঢের তফাৎ—আমার আদর্শ বহু উচ্চ…" সহসা অমল মধ্যপথে থামিয়া গেল। সে রেবেকার অপমানহতা মলিন মুখের প্রতি চাহিয়া ভাবিল—ছি ছি আগে তাহার ভাবি। দেখা উচিত ছিল—যে রেবেকা একজন সামান্য নারী মাত্র…সে নিজের স্বভাব সুলভ চপলতা বশতঃ ও এই প্রশ্ন করিতে পারে, এবং সেই কথার পরে' এতটা উত্তেজিত ভাবে তাহার উত্তর দেওয়াটা শীলতা সঙ্গত হয় নাই। মনের মধ্যে এই কথা-গুলি জাগিয়া উঠিতেই সে আপন হইতেই কেমন যেন লজ্জিত হইয়া উঠিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল—"ক্ষমা করবেন মিসেস্ বোস…আমার এই উদ্ধত কণ্ঠের রূঢ়তার জন্য মার্জ্জনা চাইছি।" কথাগুলি সে ইংরাজীতেই বলিয়া সহজভাবে সকলকে নমস্কার করিয়া লাইব্রেরী ঘর হইতে ধীর পদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

* * * *

নীতি নীতি চুপ করে থাকলে চলবে না…আমার কথার একটা উত্তর দাও, জেনো যে তোমার এই একটি উত্তরে আমার সমস্ত জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করছে—ওকি মুখ ফেরালে? না না আমি একটা জবাব চাই, আমায় স্পষ্ট করে জানিয়ে দাও, আমার এই প্রস্তাবে তুমি রাজী আছ কিনা?"

সিঁড়ি বাহিয়া নিমন্ত্রিতেরা দ্বিতলে খাইবার ঘরে নামিতে ছিল—অমল সকলের পাশ কাটাইয়া ডোরোথির পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার বাম হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া আবেগভরে প্রশ্ন করিল। ডোরোথি বিব্রতভাবে জড়িত স্বরে উত্তর দিল—"আজ, আজই—না থাক আজকে, মাপ করুন আমি এখনি এর জবাব দিতে পার্ব্বনা।"

অমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—"না, তা হয় না নীতি—আমাদের এ জীবন মরণের সমস্তা আমি তোমার উত্তরে সমাধান কর্ত্তে চাই বল্ল।"

অমল তাহার প্রেমপূর্ণ উজ্জ্বল নয়নদ্বয় ডোরোথির মুখের পরে' তুলিয়া ধরিল। মুখখানি ঘুরাইয়া ডোরোথি কাতর-স্বরে বলিল—"তাহলে কি বলতে চান যে এই সমস্ত আচার ব্যবহার আমাকে সব ছেড়ে দিতে? এতদিনকার আজন্মের সংস্কার আমি কেমন করে ছাড়ি বলুন?"

অমল ব্যগ্রস্বরে বলিল—"নীতি, তুমি কি আমার জন্যে তোমার সামান্য সুখটুকু ছাড়তে পার না?"

ডোরোথি মাথা নামাইল—তাহার মুখে অসন্তোষের ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। অমল সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না, বিহ্বলকণ্ঠে বলিল—"এত অকরুণ তুমি নীতি—আর স্বজনহীন বিলাতে যে তোমার স্মৃতি আমাকে অনুক্ষণ জাগিয়ে রাখত…আমার এত সুখের কল্পনায় গড়া স্বর্ণসৌধ তুমি এমন করে চূর্ণ করে দিও না—নাইবা হ'লো নীতি বাইরের মিথ্যে কতকগুলো মুখস্থ ভড়ং যা আমি মোটেই ভালবাসিনা—আমরা পল্লীমায়ের নিরালা জায়গাটিতে ছোট একখানি নীড় রচনা করে সমাজ সংসার লোকজনের হতে বহুদূরে একা একা দিন কাটাতে পারি না কি?"

ডোরোথি বিস্ময়ান্বিত স্বরে বলিল—"বলেন কি পাড়া-গাঁয়ে যাব বাস করতে?"

অমল উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ সেথায় আমি আর তুমি থাকব, পল্লীমায়ের সেবা কর্ব্ব। আমি থাকব পুরুষদের উন্নতি সাধনে চেষ্টিত, আর তুমি আমার কল্যাণী হয়ে সেখানকার বালিকা ও রমণীদের শিক্ষা দেবে—সেথায় আমরা এক নূতন রাজ্য গড়ে তুলব, শান্তি, প্রীতি, মিলন, সাম্য, স্বাধীনতা এক হয়ে যাবে সেথায়—কোলাহল সেথা হতে দূরে পলাবে কেবল চারিধারে অসীম শান্তি, আমার সুদূর কল্পনাকে সত্যে পরিণত কর্ত্তে?"

ডোরোথি অপ্রসন্নভাবে বলিল—"সে হয় না। না না তাতে বাবাও মত দেবেন না।"

অমল নৈরাশ্য ব্যঞ্জকস্বরে বলিল—"নীতি ওসব তো

হলো বাজে ওজর—তোমার প্রকৃত মনোভাবটি কেবল আমায় খুলে বল।"

ডোরোথি নিরুত্তর।

"বুঝলাম এতদিনে যে সত্য সত্যই আমার মুখ চাইবার কেউ নাই—আমার মতে অন্তত: একজনও সম্মতি দিতে পারে না। আচ্ছা বেশ সুনীতি তুমি যাতে শান্তিতে থাক কয়ো—আমি আর তোমার চোখের সামনে আমার দীন হীন নগণ্য মূর্ত্তিটাকে এনে ধর্ব্বো না…ওঃ যাও তুমি স্বাধীন, আশীর্ব্বাদ করি তুমি চিরসুখে থাক যোগ্য পাত্রে আত্মসমর্পণ করে প্রীতিলাভ করো—আমি ভাবব যে দুদিনের জন্যে কেবল অভাগাকে বিধাতা অমৃতের আস্বাদ দিয়ে সুধার পাত্র কেড়ে নিলেন। কাঙ্গালের কাছে রত্নমন্দির চিরদিনের নিমিত্তই বন্ধ থেকে যায় নীতি সে একটা কেবল স্বপ্নমাত্র। যে আজন্ম পরের কাছে মানুষ হয়েছে, তার আবার উচ্চ আশা কেন? যা পেয়েছি তাই যথেষ্ট, সেই পূর্ব্বেকার পুণ্যস্মৃতি আমার বুকে জেগে থাকবে অহোরহ। যাক, আমার আজ এ একটা দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ হলো—হ্যাঁ, তবে যাবার পূর্ব্বে একটা কথা বলে যাই—যে আমার মত এমন করে অন্য কোন লোককে আশা দিয়ে নিরাশার স্রোতে ভাসিও না,—আর তার দীর্ঘনিশ্বাস কুড়িও না, এতে মর্ম্মে বড় গভীর ঘা লাগে।"

যাই তোমার মূল্যবান সময়ের আর অপব্যয় কর্ব্বো না—অমলের কণ্ঠে বিরাট ক্ষোভ, গভীর নৈরাশ্য, মুক্তির আনন্দ একসঙ্গে একতালে বাজিয়া উঠিল। ডোরোথির হাত ছাড়িয়া সে দ্রুতপদে সিঁড়ি অতিক্রম করিতে লাগিল। ডোরোথি ক্ষণেকের জন্য একবার বাহিরের গুমোটভরা শুব্ধ রাত্রির জমাট অন্ধকারের পানে তাকাইল—পরে সে ভারাক্রান্ত চিত্তে নামিয়া ভোজনাগারে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মনের অগোচরে দুইটি চক্ষু অজ্ঞাতে কোন্ বেদনা পীড়িত আশাহত ব্যক্তির সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। কিন্তু সে তখন কোথায়! অমল একেবারে নামিয়া নির্জ্জন বাগানের একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ঘন ঘন মাথাটাকে চাপিয়া ধরিতেছিল। ডোরোথি লোকচক্ষুর অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে বারান্দা পার হইয়া নিজের ঘরখানিতে আসিয়া সোফার উপর হেলিয়া পড়িল। অকারণে তার চোখে জলে সাগর উছলিয়া উঠিল। তার হৃদয়ের কোমল তারগুলি কী এক করুণ সুরে ঝন্ ঝন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

———

দেশের কল্যাণে

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

বলতে গেলে দেশের কথা চোখে শুধুই আসে জল,
ভাবতে গেলে রয় না যে জ্ঞান, হারাই যে গো বুকের বল।
নিত্য যেথায় ঝগড়া ঝাঁটি, দলাদলি নিত্য যথা,
দেশের শুভ,—পায় যে হাসি, এ কি শুধুই কথার কথা?
এরাই নাকি করবে বরণ সকল দুঃখ দরিদ্রতা,
মনে আমার সত্য যে নেয়, এদের সে সব মুখের কথা।
মরতে কেবা পেরেছে রে, মরার ভয়েই ভীত এরা,
জানে নাকো দেশের কাজে হতে হবে আগেই মরা।
নিত্য যথা দলাদলি, নিত্য বিবাদ অবাধ চলে,
উন্নতি কি লভতে সে দেশ পেরেছে গো মুখের বলে?
মিথ্যা কথায় দ্বন্দ্ব চলে, মারামারি চলছে নিতি,
চমৎকার এ দৃশ্যখানি, চমৎকার এ দেশের রীতি।
এরাই নাকি এগিয়ে যাবে, এরাই নাকি স্বরাজ নেবে,
হায় ভগবান, দেখাও কত, কালে কালে কতই হবে।
এরাই নাকি সাম্য মন্ত্রে করবে ব্রত উদ্‌যাপন,
এরাই নাকি বাসবে ভাল বিশ্বে—করে প্রাণপণ।
হায় বাঙ্গালী, মিথ্যে আশা, মিথ্যে তোমার বচন সার,
দেখিয়ো নাকো মুখ জগতে, বার করো না নিজকে আর।
ঘরে ঘরে নিত্য যাদের চলছে বিবাদ গণ্ডগোল,
তারাই বাসবে বিশ্বে ভাল, উপহাসের উঠবে রোল।
কল্যাণ,—সে ভগবানের অন্তরেরই আশীর্বাদ,
স্বার্থত্যাগে মিলবে জেনো, পুরবে তবেই মনের সাধ।
দেশের শুভ করতে গেলে নিজকে আগে পুড়িয়ে নিয়ে,
চলতে হবে বিশ্বমাঝে স্বার্থছাড়া পথটি দিয়ে।

স্বার্থ যথা—দলাদলি, ঝগড়া বিবাদ সেথায় চলে,
সেখানেতে প্রকৃত কাজ হয় না জানি কোন কালে।
কার ঘরে কে চুপি চুপি বললে কথা সেইটি শুনে,
উঠছে ক্ষেপে দেশের নেতা এই ছবিটি রইল মনে।
এ বাজারে কিনতে যে নাম ছোট বড় সবাই চায়,
দেশের শুভ ঢাকনী দিয়ে আসল কথা ঢাকছে হায়।
মিথ্যে কেবল ঝগড়া বিবাদ, মিথ্যে কেবল মারামারি,
মিথ্যে এদের মুখোস নেওয়া; সকল কাজেই বাড়াবাড়ি।
রুই, কাতলা লাফিয়ে বেড়ায়, ঘোলা হ'ল পুকুর জল,
পুঁটি, খলসে বলছে হেসে "ওদের মতই লাফিয়ে চল।"
অবাক ব্যাপার, সবাই যে চায় উল্টে দিতে জগৎখান,
পিছন দিকে কেউ বা টানে, কেউ বা বলে—"সামনে টান।"
মাঝে পড়ে রইল যারা তাদের যে হয় চক্ষুস্থির,
"দেশের শুভ" নাম দিয়ে যে ভাঙছে এরা সুখের নীড়।
এমনি করে দেশের তরে কাজ কি করে সুধাই তাই,
কাজ তো কিছু হয় না এতে, পিষ্ট হও তো নিজেরাই।
চাপা ছিল যে সব কথা এখন সবই জেগে উঠে,
যায় যে সবার ঘরে, কাণে বাতাস বহার আগে ছুটে।
সত্য কাজের জ্বলছে আগুন, আগে তাতে লাফিয়ে পড়,
স্বার্থ আগে পুড়িয়ে ফেল তবেই লোকে বলবে—বড়।
হায় ভগবান, "দেশের শুভ" ঢাকনি দেওয়া এমন কথা,—
স্বার্থসিদ্ধি আশা কভু বলো নাকো—পাই যে ব্যথা॥

হিন্দু-মোসলেম প্যাক্ট

[শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বঙ্গবাণী-সম্পাদক মহাশয়,

আপনি ত হুকুম দিয়ে গেলেন আমাকে "বঙ্গবাণীর" জন্য একটা প্রবন্ধ যা হোক কোরে খাড়া করতেই হবে; কিন্তু আপাততঃ দেখতে পাচ্ছি বীণাপাণির সেবা করার চেয়ে গদা-পাণির সেবা করাই বেশী দরকার। প্রাণে যদি বাঁচি ত সাহিত্য-চর্চ্চাটা দু'দিন পরেও হতে পারবে।

দেখেই ত গেছেন আমার বাড়ীটা একেবারে মুসলমান বস্তির মাঝখানে। এ কথাটার অর্থ যে কি তা আর এই দুর্দ্দিনে স্পষ্ট কোরে না বললেও চলবে। বস্তিতে যারা বাস করে তারা প্রায় সবাই রাজমিস্ত্রী অথবা মজুর। দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্যে এদের কাজকর্ম্ম প্রায় বন্ধ; তবে সন্ধ্যার পর দেখতে পাই, সবাই লাঠি বা মশাল তৈরি করছে, কিম্বা ছুরি-ছোরা শাণাচ্ছে। সেদিন লাঠি তৈরি করবার সময় এদের খোসগল্প হচ্ছিল। ভগলু সব চেয়ে প্রাচীন। সে বল্লে—"আরে না, না; কাবুল আসতে পারবে না; ইংরেজ তাকে রুখে ফেলবে। তা ছাড়া কাবুল অনেক দূরে যে!" করিম বয়সে ছোট। সে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা নিজামের ফৌজ আসবে, শুনিছি যে। নিজাম এলেই হবে। তারপর হিন্দুদের একবার দেখে নেব।"

বস্তির ভিতর এইসব উচ্চ অঙ্গের রাজনীতির চর্চ্চা শুনে আমার কাণ খাড়া হয়ে উঠলো।

রেজাক একখানা ছোরায় শাণ দিচ্ছিল। সে বল্লে—'এই ইংরেজ শালারা যদি না থাকত, তা হলে সব বেটা হিঁদুকে ধরে গরু খাইয়ে দিতুম।' বুড়ী ফুলজানি এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। হিঁদুদের গরু খাওয়ানতে তার একটু আপত্তি দেখা গেল। বেচারা বোধ হয় ভাবলে যে সত্যি সত্যিই যদি এতগুলো মদ্দ পুরুষ হিঁদুদের গরু খাওয়াতে আরম্ভ করে, তা হলে গরু রাঁধতে রাঁধতে তাকে হয়রাণ হতে হবে। সে আস্তে আস্তে একটু প্রতিবাদ করে বললে—'আচ্ছা, গরু খেলেই যে মুসলমান হবে তার মানে কি? খৃষ্টানও ত হয়ে যেতে পারে!'

ভগলু তার জবাব দিলে। দেখলুম লোকটা শুধু প্রাচীন নয়, ধার্ম্মিকও বটে! সে বল্লে—"গরু খাওয়াবার আগে কলমা পড়িয়ে নিতে হবে।" করিম খুব খুসী হয়ে উঠলো। বললে—"ঠিক বলেছ বড় মিঞা; গরু খাবার পর বেটারা হয়ত গোবর খেয়ে পেরাচিত্তির করবে, কিন্তু কলমার আর কাটান নেই।"

লাঠি আর ছোরার সাহায্যে যারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের সংকল্প করছিল, তাদের সকলকেই আমি অনেকদিন থেকে চিনি। তারা কেউ লোক মন্দ নয়। সবাই আমার বাড়ীতে রাজমিস্ত্রীর কাজ করেছে। বুড়ী ফুলজানি আমার ছেলের অসুখের সময় নানা জায়গা খোঁজ করে ছাগল দুধের যোগাড় করে দিয়েছে। ভগলু আমার একখানা বিশ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়ে নিজে সেধে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে। ফুলজানির এক বিধবা বোন হজ করতে যাবার সময় তার সারা জীবনের সঞ্চিত ৪২৫৲ টাকা আমারই কাছে গচ্ছিত রেখে গিয়েছিল। তখন তাদের কারও মনে পড়েনি যে আমি হিঁদু, সুতরাং কাফের। তারা যখন বেহেস্তে যাবে, তখন আমায় সঙ্গে তাদের দেখা শুনা হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আজ দাঙ্গা হাঙ্গামার পর মৌলভী সাহেব এসে তাদের সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে গেছে; আর তারা সর্ব্ব কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে ছোরা ছুরি শাণাতে লেগে গেছে। এখন একবার নিজামের ফৌজ এসে পড়লেই হয়।

নিজামের ফৌজ আসবার আগে ইংরেজের ফৌজ এসে পড়বার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু একদিন গভীর রাত্রে এরা যদি স্বপ্ন দেখে যে নিজাম বাহাদুর এসে হাজির হয়েছেন, আর ঘুমের ঘোরে এরা যদি ছুরি, ছোরা, মশাল, শাবল নিয়ে ধর্ম্মপ্রচার করতে বেরিয়ে পড়ে, তা হলে হয়ত এই

কুলীন ব্রাহ্মণ-সন্তানকে আগামী মাস থেকে সৈয়দ মোহম্মদ খেঁচুউদ্দীন বা ঐরকম একটা কিছু হয়ে যেতে হবে। তাতে বেশী দুঃখ নেই; দুঃখ শুধু এই যে জাতও যাবে, আর পেটও ভরবে না। নবাবী আমল হলে হয়ত নাম বদলানর সঙ্গে সঙ্গে কালিয়া পোলাও কাবাবের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে যেতে পারতো; কিন্তু আজকাল ত সেদিন নেই। কিন্তু আমার নিজের দুর্গতি যাই হোক, এ কথা যখন ভাবি যে দু-তিন পুরুষ পরে আমারই বংশধরেরা ভাঙা ভাঙা ফার্সিতে প্রমাণ করতে লেগে যাবে যে তাদের কোন্ এক পূর্ব্বপুরুষ নাদির সার সঙ্গে খোরাসান থেকে ভারতবিজয় করতে এসেছিলেন, যখন ভাবি যে হারুণ-উল-রশিদের নাম শুনে তাদের জিভ দিয়ে জল পড়বে, খলিফার দুঃখে তাদের ঘুম হবে না, 'শাত্তিল আরব' স্বাধীন করবার খেয়ালে তারা নিজেদের দেশের পরাধীনতা ভুলে যাবে, আর আমার ভায়েদের বংশধরদের কাফের মনে করে তারা নাক সিঁটকাবে —তখন হেসে আর বাঁচিনে। তারা হয়ত বলবে যে বাংলা তাদের মাতৃভাষাও নয়, পিতৃভাষাও নয়, চৌদ্দ পুরুষের কারও ভাষাই নয়; আর আঠারটা বোতাম লাগান আংরাখা আর চুড়িদার পাজামার উপর প্রকাণ্ড একটা তুর্কি ফেজ উঠিয়ে প্রতিপন্ন করে দেবে যে, বিশুদ্ধ আরবী বা তুর্কি রক্ত ছাড়া এক ফোটাও বাজে রক্ত তাদের শরীরে নেই।

এই সব ভেবে চিন্তে সে রাত্রে ত আর ঘুম হলো না। তার পরদিন তাড়াতাড়ি উঠে কংগ্রেস আফিসে খবর দিলুম। কংগ্রেসী কর্ত্তারা আশ্বাস দিলেন - 'কিছু ভয় নেই; তাঁরা সব ঠিক করে দেবেন।' দন্তবিকেশ করে তাঁদের ধন্যবাদ দিলুম বটে, কিন্তু মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগলো। কি জানি বাবা, তাঁরা সব ঠিক করতে করতে এদিকে সগোষ্ঠী আমি না ঠিক হয়ে যাই। কিন্তু না, কর্ত্তারা তাঁদের কথা ঠিক রেখেছেন দেখলুম। তাঁরা একটা মৌলভীকে পাঠিয়ে দিয়েছেন মুসলমান ভ্রাতাদের শান্ত করতে। মৌলবী সাহেবটা ধার্ম্মিক লোক; হজ করে ফিরে এসেছেন; তা ছাড়া স্বরাজের জোরে একটা স্বরাজী কারবারে একটা বড় চাকরীও যোগাড় করেছেন। সুতরাং ভাবলুম তিনি ধর্ম্মের খাতিরেই হোক, আর চাকরীর খাতিরেই হোক, ছোরা, ছুরি, মশালের একটা মীমাংসা করে দিয়ে যাবেন। কিন্তু তিনি মোটরে চড়ে বস্তির চারিদিকে বার দুই ঘুর পাক খেয়ে কোথায় যে সরে পড়লেন তার সন্ধান পেলুম না।

এ তো মহা বেগতিক। তা হলে কি এই বুড়ো বয়সে কাছা খুলে কলমা পড়তে হবে না কি? হয় ত বা তারও সময় থাকবে না, আগেই অগ্নিপক্ক হয়ে যেতে হবে।

ভাবতে ভাবতে প্রায় কাহিল হয়ে পড়বার যোগাড় হয়েছি, এমন সময় আমাদের 'পল্টু' এসে উপস্থিত। হাতে একগাছি খেঁটে লাঠি, পরণে খাকির হাফ প্যাণ্ট। আমি বললুম—'পল্টু, এই খিলাফৎ কোম্পানীর জ্বালায় যে রাত্রে ঘুমুবার জো নেই, তার কি ব্যবস্থা করি বল্ দেখি। এরা যে ক্রমাগত লাঠি তৈরী করছে আর ছোরা শাণাচ্ছে—দেখে ত আমার হাত পা পেটের ভিতর ঢুকে গেছে। নেতারাও হার মেনে গেছে, পুলিসেও হার মেনে গেছে। এখন তোরা যদি কিছু না করতে পারিস ত এ দেশ ছেড়ে পালাতে হয়।"

পল্টু একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে—'আপনি প্যাক্ট চালাবার বন্দোবস্ত করছেন না কেন?'

আমার পিত্তি জ্বলে গেল। বললুম—"রক্ষে কর বাবা; তোমাদের প্যাক্টের ফলেই এরা আস্কারা পেয়ে গেছে। ভাবছে, গায়ের জোরে যা খুসী তাই করবে। আজ বলছে শতকরা আশীটা চাকরী আমাদের চাই, কাল হয়ত বলে বসবে শতকরা আশীটা হিঁদুর মেয়ে আমাদের বিয়ে দিতে হবে। নইলে আমরা তোমাদের সঙ্গে ভোট দেব না।"

পল্টু একটু হেসে বললে—প্যাক্টের সব দিকটা আপনি ভেবে দেখেন নি, দেখছি। আসল প্যাক্টটা হচ্ছে সর্ব্বতোমুখী। সব বিষয়েই ওদের বেশী ভাগ দিতে হবে, তা না হলে বনিবনাও হবে না, এ কথা ত আমরা মেনেই নিয়েছি। এখন না বললে চলবে কেন? আমাদের মন্দির যদি কুড়িটা ভাঙে, তা হলে সঙ্গে সঙ্গে আশীটা মসজিদ ভেঙে পড়া চাই, আমাদের যদি কুড়িটা জখম হয় তা হলে ওদের জখম হওয়া চাই আশীটা। তা না হলে ওদের ভাগে কম পড়বে; আর প্যাক্ট রক্ষা করা হলো না ভেবে ওরা চটে যাবে। কিন্তু ওদের হিসাব যেমনি ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেবেন, অমনি ধাঁ করে মিল হয়ে যাবে।"

পণ্টুর কথা শুনে আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। বললুম—'এ সব কি সর্ব্বনেশে কথা বলছিস, পণ্টু? এতে যে মারধোর বেড়েই চলবে।'

পণ্টু বললে—"আজ্ঞে না; প্যাক্টের উপর আপনার শ্রদ্ধা নেই বলেই আপনি ভয় পাচ্ছেন। বিশ্বাস না হয়, হাতে হাতে আপনাকে ফল দেখিয়ে দিচ্ছি।"

পণ্টু লাঠি নিয়ে বস্তির ভিতর ঢুকে পড়ল। আমার ভয় করতে লাগল, পাছে গোঁয়ার ছেলেটা না একটা কাণ্ড ঘটিয়ে বসে।

আধঘণ্টা পরে যখন পণ্টু ফিরে এল, আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—'কি পণ্টু, কি করে এলি?'

পণ্টু বললে—'আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারেন। আমি করিম মিঞাকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে বস্তি ছেড়ে লাঠালাঠি করতে বের হলে, ফিরে এসে আর বস্তি দেখতে পাবে না। করিম বুদ্ধিমান লোক, ইঙ্গিতেই বুঝে নিয়েছে যে, আমরা প্যাক্ট পন্থ।"

* * * *

তারপর থেকে নিজামের ফৌজ কত দূর এল, সে সংবাদ আর পাই নি

—বঙ্গবাণী

ঢেউ

[শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়]

মলয় দিতেছে দোল
উজানেতে তটিনীর।
রবি-কর-উজ্জ্বল
চঞ্চল নাচে নীর॥

মাথাগুলি ভাঙা ভাঙা—
সোহাগের টানেতে।
যেন সরমের কম্পন—
কিশোরীর গানেতে॥

যেন পরীদের বাসরের
মতি-ঝাড়-লণ্ঠন।
যেন বধুর চকিত আঁখি
ভেদি অবগুণ্ঠন॥

বুঝি জলতলে রাজবালা
কৌটাটী খুলিয়া।
অপরূপ মণিটীরে
দেখে ধ'রে তুলিয়া॥

প্রবালের-জানলায়—
রূপ তার ঠিক্‌রে।
এসে পড়ে দুনিয়ায়
হাসে চারি-দিক্‌-রে॥

প্রিয়কর পরশনে—
নব বধু কম্পন।
বুঝি সাগর আলিঙ্গনে
তটিনীর শিহরণ॥

বাঁশীর ডাক

[শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস]

—ক—

প্রতিদিনের ন্যায় সেদিনও ভোলা তাহার বাঁশীটি হাতে লইয়া ঘাটের উপর আসিয়া উপবেশন করিল। সন্ধ্যাদেবী তখন ধীরে ধীরে তাঁহার গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের অঞ্চলখানি ক্ষুদ্র গ্রামখানির বুকের উপর বিছাইয়া দিতেছিলেন। দূরে মন্দিরের আরতির বাজনার শব্দ আকাশে মিলাইয়া গেল।

বাঁশীটি হস্তে লইয়া ভোলা তাহাতে ধীরে ধীরে ফুঁ দিল। সন্ধ্যার সেই গাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বাঁশরীর স্বর ক্রমশঃ উচ্চ পর্দায় উঠিতে লাগিল—করুণ হইতে বাঁশরীর সুর আরও করুণ হইতে লাগিল। কাহার বুকের নিভৃত গোপন ব্যথাটি লইয়া বাঁশরী যেন আকুল ভাবে ফিরিতে লাগিল।

নিকটস্থ বাড়ীটির বারাণ্ডার দরজাটি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে খুলিয়া গেল। ভিতরে ইজিচেয়ারে একটি রুগ্না তরুণী শুইয়াছিল, পার্শ্বস্থিত যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"আচ্ছা, বৌদি, কে ভাই অমন ক'রে রোজ বাঁশী বাজায়?"

যুবতী কহিলেন—"কি জানি ভাই! বোধহয় ভোলা।"

"ভোলা কে?"

"ভোলাকে চেননা ভাই।" সেই যে বছর ২৪।২৫ বয়স হবে, মাথায় লম্বা লম্বা চুল, ঘাড়ের দিকটা একেবারে কামান…"

"কি করে বৌদি?"

"কি করে? করে সব! তাড়ী খায়, মদ খায়, গাঁজা খায়, বাঁশী বাজায়, মিলে কাজ করে, রাত্রে প্রায় বাড়ী থাকে না…"

তরুণী একটু শিহরিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ বৌদি, কেউ কি নেই ওর?"

"না! থাক্‌বার মধ্যে খালি এক ছোট ভাই আছে।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া গভীর সহানুভূতির স্বরে তরুণী কহিয়া উঠিল—"আহা!" তৎপরে কহিল—"কিন্তু বড় সুন্দর বাঁশী বাজায়—না ভাই বৌদি?"

"হ্যাঁ ভাই, গুণের মধ্যে ত' ঐ একটি——না একটিই বা বলি কি ক'রে? ওঁদের কাছ থেকেই ত শুনি যে ভোলার মনটা নাকি বড় ভাল। কারুর বিপদ আপদে ওই আগে গিয়ে নিজে বুক পেতে দাঁড়ায়, কারুর অসুখ বিসুখ করলে ও প্রাণপণ যত্নে তার সেবা শুশ্রূষা করে।"

তৎপরে একটু চুপ থাকিয়া কহিলেন—"এই সেদিন রাত্রে ভুতির মায়ের কলেরা হ'য়েছিল,—ও বুঝি তখন বাড়ী ছিল না, খবর পাবামাত্রই ছুটে এল।"

তরুণীটি প্রত্যুত্তরে কিছু না বলিয়া যেদিক হইতে বাঁশীর স্বর ভাসিয়া আসিতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া কহিল—"ঐ শোন—শোন বৌদি,—কি চমৎকার বাঁশী বাজাচ্ছে—নয়?"

তখন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, চাঁদের জ্যোৎস্নায় সারা জায়গাটিকে একটি মনোরম মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ভোলার কোনও দিকে লক্ষ্য ছিল না, সে তন্ময় হইয়া বাঁশী বাজাইতেছিল। বাঁশীর সুর কখনও সপ্তমে উঠিতেছিল, কখনও আবার ধীরে ধীরে খাদে নামিতেছিল। বাঁশীর রব তরুণীর প্রাণের মধ্যে আকুলি বিকুলি হইয়া ফিরিতে লাগিল—তাহার সমস্ত হৃদয় তন্ত্রীতে যেন বাঁশরীর সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল—সে ব্যস্তভাবে কহিয়া উঠিল চল ভাই বৌদি, ঐ বারাণ্ডায় গিয়ে একটু বসি গে।"

যুবতী বাধা দিয়া কহিয়া উঠিলেন—"না ভাই। বারাণ্ডায় যাব না। ডাক্তার বেশী নাড়াচাড়া করতে বারণ ক'রে গেছেন।"

"দোহাই বৌদি—বাধা দিও না, চল একটু বসি গে। আহা—হা, কি সুন্দর বাজাচ্ছে বল দেখি,—কি চমৎকার।

এমন বাঁশী শুনে কি কেউ কখনও ঘরের ভেতর বসে থাকতে পারে ভাই।"

অগত্যা যুবতীটি তরুণীর আপাদমস্তক একটি শালে উত্তমরূপ মুড়ি দিয়া তাহাকে অতি সন্তর্পণে বারাণ্ডায় লইয়া আসিলেন।

কিয়ৎক্ষণ ঘাটের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তরুণীটি যুবতীর দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা বৌদি,—এই রকম বাঁশী ত' আমি আর কখনও শুনি নি। কি মধুর! কি করুণ! এ যে সত্য সত্যই প্রাণের মধ্যে এক অদ্ভুত তুফানের সৃষ্টি করলে ভাই! আমার বুকের ভেতরটা যেন কি রকম করছে—দেখ—দেখ বৌদি—" এই বলিয়া সে সহসা যুবতীর হাতখানি লইয়া নিজের বক্ষের উপর স্থাপন করিল।

যুবতী এইবার একটু ভীতা হইয়া কহিলেন—"চল বাসন্তী, এবার শোবে চল,—লক্ষ্মী টি ভাই, ঠাণ্ডা লাগবে।"

"না! না! এখন আমি কিছুতেই যাব না।"

"রাত যে ১১০টা বাজতে চ'ল্ল।"

বাসন্তী এবার দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল—"বাজুক গে—২টা বাজুক ৩টা বাজুক—কিছুতেই যাব না। যতক্ষণ বাঁশী বাজবে, ততক্ষণ থাকব। ঐ শোন! ঐ! কি করুণ বাজাচ্ছে বল দেখ! উঃ কি—বৌদি, তুমি কি মানুষ? মানুষ হ'লে কি আজ এমন মধুর বাঁশী শুনে তুমি ঘরে যাবার জন্যে পাগল হ'তে? তোমার হৃদয় বলে কোনও জিনিষ নেই!"

এই কয়টি কথা বলিয়াই বাসন্তী হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, একটু দম লইয়া পুনরায় কহিয়া উঠিল "আচ্ছা বৌদি,—ও এইরকম করে রোজ এসে বাজাবে ত'? আমার কি মনে হ'চ্ছে জান বৌদি? আমার ইচ্ছে হচ্ছে, আমি ছুটে গিয়ে ওর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে বলি যে, দোহাই তোমার—প্রত্যহ রাত্রে, অন্ততঃ এক ঘন্টার জন্য তুমি ঐ ঘাটে ব'সে বাঁশী বাজিও; বেশীক্ষণ আমি তোমায় থাকতে বলব না, অন্ততঃ এক ঘন্টার জন্য! তোমার বাঁশী যে আমি বড় ভালবাসি। কত রাত্রে আমি তোমার বাঁশী শোনবার জন্য আকুল ভাবে ঘাটের দিকে চেয়ে থাকি! ওগো! কত রাত্রি যে বিছানা থেকে উঠে কাঁপতে কাঁপতে আমি তোমার বাঁশী শুনেছি! সারা দিনটা ধ'রে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি, কখন সন্ধ্যা আসবে, কখন এসে তুমি ঘাটের ওপর ব'সে তোমার সাধের বাঁশীতে ফুঁ দেবে!—আচ্ছা বৌদি, তা হ'লে ও ত' রোজ সত্য সত্যই আসবে?"

সহসা বাঁশী থামিয়া গেল। বাঁশী থামিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলি স্থানটিকে মুখরিত করিয়া তুলিল—যেন কাতর ভাবে পুনরায় বাঁশী বাজাইবার নিমিত্ত মিনতি করিতে লাগিল।

ভোলা ধীরে ধীরে ঘাট হইতে আসিয়া পথের উপর নামিয়া পড়িল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন সে অতি কষ্টে পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতেছিল—শীতে যেন তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতেছিল। গায়ের কাপড়খানা নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ভোলা ধীরে ধীরে বাঁশীটি হস্তে লইয়া পথ চলিতে লাগিল।

যতদূর দেখা যায়,—বাসন্তী তাহার দিকে নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া গেলে তাহার অন্তর ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল; যুবতীর দিকে ফিরিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিল "চল বৌদি, শুই গে' যাই।"

সারা রাত্রি বোধহয় সেদিন তাহার ঘুম হইল না,—বাঁশীর সুর তাহার প্রাণের মধ্যে আকুল ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল।

(খ)

উক্ত ঘটনার পর প্রায় পাঁচদিন অতীত হইয়া গিয়াছে। সেই রাত্রি হইতেই ভোলা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িল। যৌবনের প্রথম অঙ্কুর হইতেই সে শরীরটাকে অবহেলা করিয়া আসিয়াছে। যৌবনের প্রথম স্বপ্নে, বসন্তের রঙীন হাওয়ায় তাহার প্রাণ থাকিয়া থাকিয়া এক অজ্ঞাত কারণে হু হু করিয়া উঠিত। একে তাহার মাথার উপর কেহ শাসন করিবার ছিল না, তাহার উপর নানারূপ প্রলোভন দমন করাও তাহার পক্ষে সাধ্যাতীত হইয়া উঠিল। যৌবনের উদ্দাম স্রোতে নির্ব্বিকার ভাবে সে তাহার শরীর, মন ভাসাইয়া দিল। দুই বৎসরের মধ্যেই সে একটি 'পাঁড়'

মাতাল হইয়া উঠিল। তাহার উপর অত্যধিক পরিমাণে রাত্রি জাগরণ, এবং নানারূপ কুৎসিৎ অত্যাচার তাহার সহ্য হইল না। নানা উপসর্গ আসিয়া শীঘ্রই তাহার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ইহার পূর্ব্বে যে সে কখনও উত্থানশক্তি রহিত হয় নাই, তাহা নহে, ডাক্তারী বিদ্যার গণ্ডীর ভিতরে যত রকম ভয়ঙ্কর, যত রকম কুৎসিৎ রোগ আছে, প্রায় তাহার মধ্যে খুব অল্পেরই কৃপা হইতে সে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, তথাপি এই ডবল নিমোনিয়াই যেন এবার তাহার প্রাণে এক অজ্ঞাত অবশ্যম্ভাবী ভয়ের সঞ্চার করিয়া দিল। তাই পূর্ব্ব দিনে যখন গণেশ গ্রামের হেমন্ত বাবুকে লইয়া আসিয়াছিল, সে তখন আগ্রহ সহকারেই প্রশ্ন করিয়াছিল—"ডাক্তারবাবু দয়া করে ঠিক ক'রে বলুন কি রকম দেখলেন।"

হেমন্তবাবু নূতন ডাক্তার। বছর তিন হইল M. B. পাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং টাকার উপর তত লোভ জন্মাইবার সুযোগ তখনও তাঁহার হয় নাই। নূতন ডাক্তার পশার জমাইবার জন্য যেরূপ যত্ন করিয়া দেখিয়া থাকেন, তিনিও তাহার ব্যতিক্রম করেন নাই। আর তাহা ছাড়া, এই তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি বহুবার ভোলাকে অনেকেরই রোগ শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে দেখিয়াছিলেন—সেই জন্যই নূতন যুবক ডাক্তারের ভোলার উপর একটু স্নেহ পড়িয়া গিয়াছিল—কহিয়াছিলেন "শরীরের ওপর বড় অত্যাচার করেছ ভাই। মদ খেয়ে বুকের ভেতরটা একেবারে ঝাঁঝরা করে ফেলেছ। চারিদিকেই Cough জমেছে। একটু আগেও যদি সাবধান হ'তে।"

তাহার তখন আর বুঝিতে কিছু বাকী ছিল না। চক্ষু দিয়া তাহার দুই ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছিল, কহিয়াছিল "ডাক্তারবাবু, আপনার fee আমি দিতে পারব না। দয়া ক'রে, যা'তে শীঘ্র সেরে যাই তার চেষ্টা করুন।"

তাহার পর রুদ্ধস্বরে কহিয়াছিল "আমি মরলে ত' কোনও ক্ষতি নেই ডাক্তারবাবু, কিন্তু গণেশের কি হবে? সে যে আমায় ছাড়া আর কাউকে জানে না! যতই খারাপ আমি হই ডাক্তারবাবু—যতই উৎসন্নে আমি গিয়ে থাকি,—তাকে যে আমি আজ পর্য্যন্ত কখনও কষ্ট দিই নাই—দয়া করে রোজ দেখে যাবেন।"

ডাক্তারবাবু কহিয়াছিলেন "সে কি কথা! আসব বৈকি ভাই, নিশ্চয়ই আসব! feeএর কথা ভুলে যা' ভাই। আমার যতদূর সাধ্য আমি চেষ্টা করব, তারপর ভগবানের হাত।"

আজ তাহার কেবলই ডাক্তার বাবুর কথাই মনে পড়িতেছিল। কেন সে কিছু পূর্ব্ব হইতে সতর্ক হইল না? তাহা হইলে ত' আজ তাহাকে এরূপ অকালে, অসময়ে মরিতে হইত না! আজ ত' তাহা হইলে গণেশকে পথের উপর বসাইয়া যাইতে হইত না! উঃ ভগবান! দয়া কর! —তাহাকে বাঁচাইয়া রাখ! অনেক পাপ সে করিয়াছে, অনেক অপরাধ সে করিয়াছে—সব মার্জ্জনা করিয়া তাহার এ প্রার্থনাটুকু আজ পূর্ণ কর ভগবান। আহা গণেশ! গণেশকে সে কাহার নিকট রাখিয়া যাইবে। সে ডাকিল—"গণেশ!"

"কি দাদা" এই বলিয়া গণেশ নতমুখে তাহার নিকটে সরিয়া আসিল।

"কই, আরও একটু স'রে আয় ভাই" এই বলিয়া ভোলা তাহাকে সাগ্রহে বক্ষের উপর ধারণ করিল, কহিল "এ্যা! হ্যাঁ! কাঁদছিস কেন ভাই? ছিঃ! কেঁদ না, ভয় কি? আমি সেরে উঠব।" শেষের দিকটা শত চেষ্টাতেও সে নিজের স্বর ঠিক রাখিতে পারিল না।

গণেশ তাহার বুকের উপর হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল ডাক্তারবাবু পাঁচকড়ি দাদাকে বলছিলেন..."

বিকৃত স্বরে ভোলা প্রশ্ন করিল "কি বলছিলেন রে?"

"বলছিলেন যে, তুমি আর..."

গণেশ আর বলিতে পারিল না—ফোঁপাইয়া ভোলার বুকের উপর মুখ লুকাইল।

ভোলা কোনওরূপে উদ্গত অশ্রুর বেগ দমন করিয়া কহিল "না রে না, আমি ঠিক ভাল হ'য়ে যাব, দেখিস্।"

কিন্তু হায়! কি নিষ্ঠুর পরিহাস! কি দারুণ মিথ্যা! কে আরোগ্যলাভ করিবে? ভোলা! হায় রে! মৃত্যুরও

যদি পশ্চিম দিকে উদয় হইবার সম্ভাবনা থাকে—কিন্তু তাহার বাঁচিবার কোনও আশাই নাই। তাহার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া আসিল ; সে আর ভাবিতে পারিল না ; গাঢ় অন্ধকারের একটি কাল পর্দ্দা তাহার চক্ষের সম্মুখে নামিয়া আসিল। সে গণেশের হাতখানি নিজের কপালের উপর স্থাপন করিয়া রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল "এইখানে একটু হাত বুলিয়ে দে ভাই—আঃ!"

গণেশ তাহার কপালের উপর হাত বুলাইতে লাগিল।

এমন সময় হেমন্তবাবু গৃহের ভিতর পদার্পণ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"গণেশ তোমার দাদার এখন জ্বর কত ভাই?"

গণেশ রুদ্ধস্বরে কি উত্তর দিতে যাইতেছিল, ভোলা বাধা দিয়া ক্ষীণস্বরে কহিয়া উঠিল "জ্বর এখন নেই ডাক্তার বাবু,—আপনার এত দেরী হ'ল কেন ডাক্তারবাবু?"

"কুমুদ বাবুর বোনের বড় অসুখ—"

বাধা দিয়া ভোলা প্রশ্ন করিল—"কার ডাক্তারবাবু? বাসন্তীর?"

"হ্যাঁ" এই বলিয়া ডাক্তারবাবু যাইয়া ভোলার বিছানার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া ভোলা প্রশ্ন করিল—"কি অসুখ ডাক্তারবাবু?"

"ডবল নিমোনিয়া।"

"তারও ডবল নিমোনিয়া! কি রকম দেখলেন ডাক্তারবাবু?"

"অবস্থা খারাপ, বড় জোর দু'তিন দিন।"

"অ্যাঁ! বলেন কি! আহা তাকে যে আমি কিছুদিন আগে গাড়ী ক'রে বেড়াতে যেতে দেখেছি!"

এবার অজ্ঞাতে ডাক্তারবাবুরও চক্ষে জল আসিয়া পড়িল! হায় রে! যাহার বড় জোর দুই ঘণ্টার অধিক এই পৃথিবীতে থাকিবার মেয়াদ নাই, তাহার প্রাণ এখনও পরের শুভের জন্য উন্মুখ। অথচ ইহারই অনেকে নিন্দা করে!

কোনওরূপে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি কহিলেন—"থাক্ গে, এখন বেশী কথা বল না,—দেখি তোমার হাতখানা।"

হাতখানি স্পর্শ করিয়াই সহসা তিনি দুই হাত পিছাইয়া গেলেন, ভীতিপূর্ণস্বরে কহিলেন—"এ কি!"

গণেশ চীৎকার করিয়া উঠিল—অ্যাঁ! কি হয়েছে ডাক্তারবাবু! বলুন,—বলুন, দাদা কি সত্যই"—সে ভোলার বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল।

হেমন্তবাবু ব্যস্ত হইয়া তাহাকে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন "এই যে ওষুধটা লিখে দিচ্ছি, দৌড়ে গিয়ে আমার ডাক্তারখানা থেকে নিয়ে এস।"

হেমন্তবাবু ধীরে ধীরে ভোলার নিকটে আসিয়া তাহার হাতখানি লইয়া ঘড়ির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ভোলা ধীরে ধীরে ক্ষীণস্বরে কহিল—"আর কেন বৃথা চেষ্টা করছেন ডাক্তারবাবু? আমি বেশ বুঝতে পারছি আমার সময় হয়ে এসেছে। আপনার ঋণ শোধ করতে পারলুম না।"

তাহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল—কহিল—"ডাক্তারবাবু, গণেশের কেউ রইল না, আপনিই আজ হ'তে ওর বড় ভাই, আপনি ওকে দয়া ক'রে একটু স্থান দিবেন।"

হেমন্তবাবুর চক্ষু শুষ্ক রহিল না, রুদ্ধস্বরে তাহার হাত দুখানি নিজ হস্তের মধ্যে লইয়া কহিলেন,—হ্যাঁ ভাই—তার বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হও,—আজ থেকে সে আমার ছোট ভাই।"

এই কথা কয়টি শুনিবার নিমিত্তই যেন সে বাঁচিয়াছিল, কথাগুলি শেষ হইবামাত্র তাহার ওষ্ঠে একটি স্নিগ্ধহাস্য রেখা ফুটিয়া উঠিল—তাহার পরেই সব শেষ!

গণেশ হাঁপাইতে হাঁপাইতে ঔষধ লইয়া গৃহের ভিতর পদার্পণ করিবামাত্রই হেমন্তবাবু ডুকরিয়া উঠিলেন—"গণেশ, তোর দাদাকে আর বাঁচাতে পারলাম না রে ভাই।"

ঔষধের শিশিটি সজোরে নিক্ষেপ করিয়া, ভোলার দেহের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া গণেশ পাগলের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল—"অ্যাঁ! দাদা নেই। চলে গেছে। উঃ আমাকে ফেলে যে কখনও যাও নি দাদা! কার কাছে রেখে গেলে আমায় দাদা। উঃ—ভগবান!

* * * *

—গ—

তখন রাত্রি প্রায় ৮টা হইবে। বাসন্তী বিছানায় শুইয়া একদৃষ্টে ঘাটের দিকে চাহিয়াছিল। সরলা তাহার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে একখানি উপন্যাস পড়াইয়া শোনাইবার জন্য ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছিলেন।

ঘাটের দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া সরলার দিকে ফিরিয়া বাসন্তী হতাশকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"কৈ বৌদি, আজও ত' সে এল না।"

উপন্যাস খানি বন্ধ করিয়া সরলা উত্তর করিলেন—"আসবে বৈকি ভাই—সময় হোক।"

"সময় ত অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে বৌদি, এত দেরী ত' তার কোনও দিন হয় নি। প্রতিদিনই ত' সে ঠিক সন্ধ্যার সময়ে আসত—" এই বলিয়া বাসন্তী উদাসনেত্রে ঘাটের দিকে উৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা বৌদি, তার কোনও অসুখ বিসুখ করেনি ত?"

"না না! তুমিও যেমন ভাই। সে হয়ত এখন মদ খেয়ে কোথায় পড়ে আছে।"

বাসন্তীর চক্ষু দুটী একবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, কহিল—বৌদি, তোমাদের স্বভাব হচ্ছে, খালি লোকের দোষ খুঁজে বেড়ান। খারাপ দিকটাই তোমরা আগে চট্ ক'রে ধ'রে নাও। অমুক লোক মদ খেয়েছে,—অমুক লোক ইয়ে করেছে—এ সবের জন্য যেন তোমাদের ঘুম হয় না, কিন্তু তাদের ভিতরে যে কি গুণ আছে, তা একবার তুলে দেখতেও চেষ্টা কর না।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া পুনরায় কহিয়া উঠিল—"এই যে তাব কথা বলছ বৌদি——স্বীকার করি আমি—যত রকম গর্হিত কর্ম্ম আছে,—সব রকমই করে সে। কিন্তু তার মত ক'টা লোক বাঁশী বাজায়, আমায় দেখাও ত' ভাই। মদ বল, গাঁজা বল,—সে ত' আজকাল প্রায় সকলেই খায়, গর্হিত কর্ম্মও ত' প্রায় অনেকেই করে,—কিন্তু, ঐ রকম বাঁশীর সুরে আজকাল কে কা'কে পাগল করেছে, বল দেখি, কে কার প্রাণে এরকম তুমুল তুফান তুলেছে দেখিয়ে দাও ত' ভাই।"

কথা কয়টি বলিয়াই সে হাঁপাইতে লাগিল।

সরলা অতি সঙ্গোপনে একটি দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া মাথার বালিশটি তাহার মস্তকের আরও একটু নিকটে সরাইয়া দিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন "তুমি লক্ষ্মীটি ভাই, তুমি এখন একটু ঘুমুতে চেষ্টা কর।"

বাসন্তী বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল—"না ভাই, কেন ও রকম করছ—ঘুম এখন আমার কিছুতেই হবে না, তা'র চেয়ে তুমি ঐ জানালাটি একটু খুলে দাও।"

তৎপরে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পর ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া কহিল—"আচ্ছা বৌদি, আজ প্রায় ছ'দিন হ'ল, সে আসে নি না?"

সরলা উত্তর করিলেন "হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন আসছে না ভাই! তার বাঁশী যে আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না! তা'র বাঁশীর সুরে আমার প্রাণের মধ্যে যে উদ্দাম তরঙ্গের সৃষ্টি করেছে, তা'র আঘাত যে আমি আর সহ্য করতে পারছি না। ঐ! ঐ যে! বাজছে না বাঁশী। শোন দেখি ভাল করে।"

সরলা একটু ভীতা হইলেন, কহিলেন—"ছিঃ, চুপ কর ভাই, অসুখ বাড়বে যে।"

এমন সময়ে কুমুদবাবু গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যস্তভাবে প্রশ্ন করিলেন "কি গো? এখন কত জ্বর?" তাহার পর বাসন্তীর নিকটে আসিয়া তাহার কপালে হাত দিয়া কহিয়া উঠিলেন "ইস্। গা যে বড় গরম দেখছি।"

"হ্যাঁ, এখন একশ' দুই জ্বর" এই বলিয়া সরলা একটু সরিয়া বসিলেন।

"তাই ত, জ্বরটা আবার বেড়ে গেল" উদ্বেগপূর্ণ স্বরে এই কথা কয়টি কুমুদবাবু বলিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন—"আহা। সেই যে ভোলা—অবনী বাবুর ছেলে গো।—উঃ লাগে যে। অমন ক'রে চিমটি কাটছ কেন?"

ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় দৃষ্টি লইয়া বাসন্তী বালিশ হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়া অস্বাভাবিক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ, কি হয়েছে দাদা তার?"

"আহা! সে বেচারা কাল সন্ধ্যার সময়ে মারা গেছে—

আঃ কি করছ। লাগে যে। আচ্ছা লোক ত'। ও কি। বাসন্তী ও বাসন্তী কি হ'ল রে ?"

অকস্মাৎ বাসন্তীর মুখ কাগজের ন্যায় সাদা হইয়া গেল—তাহার চক্ষু দুটি অস্বাভাবিকরূপে ঘুরিতে লাগিল। পরমুহূর্তেই তাহার শিথিল দেহলতা বিছানার উপর এলাইয়া পড়িল।

ভীত হইয়া তাহার দেহখানি ধরিয়া ফেলিয়া আশঙ্কাজনক স্বরে কুমুদবাবু প্রশ্ন করিলেন—"একি! কি হোল ? বাসন্তী—অ-বাসন্তী।"

সরলা ক্রুদ্ধকণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"ছিঃ ছিঃ—তোমার যদি একটুও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। এত ইসারা করলুম, এত চিমটি কাটলুম, তবুও কিছু বুঝতে পারলে না।"

তারপর ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—"যাও, চট্ করে একটু জল নিয়ে এস। যাও যাও, আর দেরী ক'র না তোমার জন্যই মেয়েটাকে বাঁচান কঠিন হবে দেখছি।"

কুমুদবাবু দৌড়াইয়া কুঁজা হইতে এক গ্লাস জল আনিয়া দিয়া কহিলেন—"তুমি ততক্ষণ দেখ, আমি একবার চট্ ক'রে হেমন্তবাবুকে নিয়ে আসি—"

মস্তকে জলসিঞ্চন করিয়া কিয়ৎক্ষণ বাতাস করিবার পর সরলা ডাকিলেন—"বাসন্তী ও বাসন্তী।"

কোনও উত্তর পাইলেন না, কিন্তু জ্ঞান হইয়াছে, তাহা টের পাইলেন, পুনরায় ডাকিলেন—বাসন্তী—অ-বাসন্তী।"

এইবার বাসন্তী উচ্চৈস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল—"হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ, তবে না আসবে না! কেন এলে কেন ? না এসে ত' কৈ থাকতে পারলে না! হাঃ—হাঃ।"

এ যে ঘোর বিকার! সর্ব্বনাশ! সরলা তাহাকে একটু নাড়া দিয়া কহিলেন—"বাসন্তী ও বাসন্তী, কাকে কি বলছ, আমায় চিনতে পারছ না ভাই!"

বাসন্তী কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে রক্তনয়নে চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই হাসিয়া উঠিল—"হাঃ—হাঃ কেমন জব্দ! চলে যাবে ? ইস্! তা' আর না ?"

এমন সময়ে হেমন্তবাবুকে লইয়া কুমুদবাবু গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সমস্ত পরীক্ষা করিয়া হেমন্তবাবু কহিয়া উঠিলেন—"সম্পূর্ণ বিকার! পট্ করে Heart fail করতে পারে।" চাকরটাকে পাঠিয়ে দিন, এই ওষুধটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, খুব অস্থির হইলে খাইয়ে দেবেন।" এই বলিয়া হেমন্তবাবু প্রস্থান করিলেন।

কুমুদবাবু বাসন্তীর বিছানার এক প্রান্তে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার কণ্ঠ দিয়া কোনও বাক্য নিঃসৃত হইল না। কাতর নয়নে বাসন্তীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। অতীতের সমস্ত ঘটনা তাঁহার মনের মধ্যে আসিয়া তোলপাড় করিতে লাগিল। উঃ সে কতদিনের কথা। যখন ১০ বৎসর পূর্ব্বে......১৬ বৎসর বয়সে তিনি পিতামাতা দুইই হারাইলেন,—তখন সান্ত্বনার এক জিনিষ রহিল বাসন্তী। ইহাকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার প্রাণের যত সুখ, যত দুঃখ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতামাতার মৃত্যুর পর সকলেই তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন বিবাহ করিতে। প্রথমে তিনি সম্মত হন নাই, ভয় ছিল, কি জানি যদি নববধূ আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র ভগ্নিটীকে সেরূপ ভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম না হয়। যদি কখনও তাহার ক্ষুদ্র কোমল প্রাণে আঘাত দেয়। সে আঘাত ত' বাসন্তী সহ্য করিতে পারিবে পারিবে না। যাহাই হউক সরলাকে পাইয়া তিনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। এই গৃহে পদার্পণ করিবার পর হইতেই সে তাহাকে আপনার সহোদরা ভগ্নির ন্যায়ই মানুষ করিয়া আসিতেছিল। এই কিছুদিন পূর্ব্বে যখন তিনি সরলার নিকট তাহার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন তখন সরলা ভৎর্সনা করিয়া কহিয়াছিল—"এর মধ্যেই ওর বিয়ের জন্যে এত অস্থির হ'চ্ছ কেন ? বিয়ে হ'য়ে গেলে ত' আর ও তোমার কাছে থাকতে পারে না, তার চেয়ে যতদিন বোনটিকে নিজের কাছে রাখতে পার, ততই ভাল।"

কিন্তু হায় রে! সে ত' তবু বিবাহ। আর আজ! আজ যে সে সত্য সত্যই তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যাইতে বসিয়াছে।

সহসা বাসন্তী বিছানার উপর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাজাও, বাজাও—আবার বাজাও, দোহাই তোমার থেম না। থেম না, বলছি। ওগো, তোমরা ওকে আবার বাজাতে বল না গো! বাঁশী থামলে

যে আমি আর বাঁচব না গো। কই বল,—ব—ল মা বাজাতে গো—"

কুমুদবাবু ব্যস্ত হইয়া তাহাকে শোয়াইয়া দিয়া কহিলেন "বাসন্তী, লক্ষ্মী বোনটি আমার,—তুমি শোও, আমি ওকে আবার বাজাতে বলছি..."

তিনি আর বলিতে পারিলেন না—তাঁহার চক্ষু দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

সরলা কহিলেন "ছিঃ চুপ কর, ভয় কি? প্রলাপের ঘোরে...

বাধা দিয়া কুমুদবাবু ফুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিলেন আমার যে বাসন্তী প্রাণ ছিল সরলা—তাকে আমি কত ভালবাসতুম, সেটা ত' তুমি জান সরলা—তবে—তবে বল কি ক'রে চুপ করি! উঃ—বাসন্তী!" এই বলিয়া তিনি বালিশের কোণে মুখ গুঁজিলেন।

এবার সরলা শত চেষ্টাতেও আপনাকে সংযত রাখিতে পারিলেন না। রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "ছিঃ—এত অস্থির হচ্ছ কেন? পুরুষ মানুষ!"

কুমুদবাবু গর্জিয়া উঠিলেন "কি! পুরুষ মানুষ! পুরুষ মানুষের বুঝি প্রাণ নেই? পুরুষ মানুষের শরীরে বুঝি দয়ামায়া কিছুই নেই! পুরুষ মানুষ বড় নিষ্ঠুর! না? আর তোমরা নারী—তোমাদের প্রাণ কোমল! মিথ্যাকথা! সম্পূর্ণ মিথ্যা। কে বলে পুরুষের হৃদয় নেই, কে বলে পুরুষের শরীরে দয়ামায়া নেই—আমি তাকে খুন করব! উঃ সরলা—সরলা—বুকটা যদি খুলে দেখাবার হ'ত, দেখাতুম যে, সেখানে প্রলয়ের কি ভীষণ সংগ্রাম চলছে! ওকি!—বাসন্তী উঠছিস্ কেন? ধর—ধর—ওকে ধর।"

বাসন্তী তখন বিকারের ঘোরে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিল। কুমুদবাবু আর সরলা জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিলেন।

সে বাধা দিয়া কাঁদিয়া উঠিল "ঐযে! ঐ! ঐ বাঁশী বাজছে—চ'লে গেল। উঃ! চ'লে গেল! ওগো ধর—ওকে তোমরা কেউ ধর না গো। ঐযে! বাঁশী আমায় ডাকছে।—আমায় ডাকছে—ছাড় আমি যাব। ছেড়ে দাও—উঃ ছেড়ে দাও—তোমাদের পায়ে পড়ি—ছা—ড় না গো। আমি যাবই। ঐযে! এখনও বাঁশী শোনা যাচ্ছে। ওগো—দাঁড়াও। দয়া করে একটু দাঁড়াও—আমি যে তোমার সঙ্গে যাব গো। উঃ—ছাড় না গো, তোমরা মানুষ না কি! ছা—ড় না গো। আমার জন্যে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও—ঐ শোন। এখনও বাঁশী বাজছে—ছা—ড় না—আমি যে যাব—আমায় যে যেতেই হবে গো।"

শেষের দিকটা সে একবার জোর করিয়া উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল—পরমুহূর্ত্তেই তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ বিছানার উপর পড়িয়া গেল।

কুমুদবাবু পাগলের ন্যায় দেহের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন "বাসন্তী—বাসন্তী বোনটি আমার। কই। সরলা কথা ক'চ্ছে না কেন? অ্যাঁ। তবে কি সত্যই আমায় ছেড়ে চলে গেলি বাসন্তী। উঃ আমার যে মাত্র একটি বোন ছিল ভগবান, তাও তোমার প্রাণে সইল না।"

* * * *

ঊষা দেবীর আগমনের আশঙ্কায় তখন সুধাদেবী ম্লানমুখে পশ্চিম দিকে চলিয়া পড়িতেছিলেন। আর সরলা বাসন্তীর মৃত দেহখানি জড়াইয়া ধরিয়া করুণ স্বরে কাঁদিতেছিলেন—বাসন্তী, বোনটি আমার, একবারটি ফিরে আয়,—যাস্ নে—আগে বল্লিনি কেন। আমি তোকে যে সারা জীবন ধ'রে তা'র বাঁশী শোনাতুম...একবারটি ফিরে আয় বোন..

———

স্নান

[রায় বাহাদুর ডাঃ শ্রীচুনীলাল বসু C, I, E, I, S, O, M, B]

ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে সুস্থ শরীরে প্রত্যহ স্নান করা কর্ত্তব্য। যেমন বাসগৃহের ময়লা জল চতুঃপার্শ্বস্থিত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়, তদ্রূপ আমাদের দেহের অনেক ময়লা ত্বকের মধ্যস্থিত অসংখ্য নালী সাহায্যে নির্গত হইয়া যায় এই ময়লার কতক অংশ জলীয়, কতক অংশ আঠাল। ইহা ঘর্ম্মের সহিত এবং পৃথক্‌ভাবে নির্গত হইয়া ত্বকের উপর অবস্থিতি করে। পরে উহার জলীয় অংশ শুকাইয়া গেলে তন্মধ্যস্থিত নানাবিধ লাবণিক পদার্থ, আঠাল ময়লার সহিত মিশ্রিত হইয়া ত্বকের উপর জমিয়া থাকে। যদি আমরা রীতিমত স্নান ও গাত্রমার্জ্জনা দ্বারা ইহাকে দূরীভূত না করি, তাহা হইলে নালীগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং দেহাভ্যন্তরস্থ ক্লেদ বাহির হইতে না পারিয়া শরীরকে অসুস্থ করে। পয়ঃপ্রণালীর মুখ বন্ধ হইয়া গেলে বাসগৃহের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, চর্ম্মের উপর ময়লা জমিয়া এই সকল নালীর মুখ বন্ধ হইলে আমাদের শরীরেরও সেইরূপ দুরবস্থা উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ বাহিরের ধূলিকণা সর্ব্বদা আমাদের গায়ে লাগে বলিয়া এই ময়লার পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে; সুতরাং শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্য চর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কৃত রাখিবার বিশেষরূপ আবশ্যকতা হয়। আমাদের শরীরের ময়লা প্রধানতঃ ত্বক ও মূত্র-যন্ত্র সাহায্যে দেহ হইতে নির্গত হইয়া যায়। যদি এই ময়লা চর্ম্মদ্বারা বহির্গত হইয়া না যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে বাহির করিবার জন্য মূত্র যন্ত্র (kidney) প্রভৃতি দেহস্থিত অন্যান্য যন্ত্রাদির অতিরিক্ত পরিশ্রম করিবার আবশ্যকতা হয়, সুতরাং অল্প-কালের মধ্যেই সেই যন্ত্রগুলি দুর্ব্বল ও রোগগ্রস্ত হইতে পারে। ত্বকের উপর ময়লা জমিলে শুদ্ধ যে দেহ অসুস্থ হয় তাহা নহে, বাহিরের ধূলিকণার সহিত পাঁচড়া, দাদ্‌ প্রভৃতি নানাবিধ চর্ম্মরোগের ও স্ফোটক বিশেষের বীজ অনেক সময়ে মিশ্রিত থাকে এবং উহা আমাদিগের ত্বকের উপর পতিত হইয়া ঐ সকল ক্লেশদায়ক রোগ উৎপাদন করে। চর্ম্ম সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকিলে ঐ সকল রোগের বীজ কোন অনিষ্টসাধন করিবার সময় বা সুবিধা পায় না।

সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে শীতল জলে স্নানই প্রশস্ত। ইহাতে শরীর সতেজ হয় এবং এই অভ্যাসের গুণে কফ, কাশি, সর্দ্দি প্রভৃতি রোগ শরীরে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে অত্যন্ত শীতল জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। অবগাহন-পূর্ব্বক স্নান করিলে বিশেষ উপকার হয়, কিন্তু অধিকক্ষণ শীতল জলে শরীর নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে দেহতাপ অধিক পরিমাণে অপহৃত হইয়া প্রকৃত অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। ৫।৭ মিনিট কাল জলের মধ্যে থাকিলেই অবগাহন-স্নানের উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাঁহাদিগের সর্ব্বদা মাথা ধরে অথবা রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় না, তাঁহাদিগের পক্ষে অবগাহন-স্নান বিশেষরূপে উপকারী। যদি গায়ে জল লাগিলে বেশী শীত বোধ হয় অর্থাৎ গায়ে কাঁটা দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ শীতল জলে স্নান করা প্রশস্ত নহে। এরূপ স্থলে স্নানের জল রৌদ্রে রাখিয়া অথবা যথাপরিমাণ উষ্ণ জল উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ, শিশু ও দুর্ব্বল ব্যক্তির শীতল জলে স্নান অনেক সময়ে সহ্য হয় না।

উষ্ণ জলে প্রত্যহ স্নান করিলে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ঘটিবার সম্ভাবনা। তবে যাঁহাদের শীতল জল সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে শরীরে সহজ উত্তাপের অনুরূপ ঈষদুষ্ণ জল স্নানের জন্য ব্যবহার করা সঙ্গত। দুর্ব্বল ও অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষে খোলা যায়গা অপেক্ষা ঘরের ভিতর স্নান করাই প্রশস্ত। গায়ে জল ঢালিলে দেহের তাপসংস্পর্শে উহা শীঘ্র বাষ্পাকারে উড়িয়া যায় অর্থাৎ শুকাইয়া যায় এবং এ অবস্থায় দেহ হইতে তাপ অপহরণ করিয়া শৈত্য উৎপাদন করে। গরম জল শীতল জল অপেক্ষা শীঘ্র বাষ্পাকারে পরিণত হয়। আমরা দেখিতে পাই যে শীতকালে গরম জলে স্নান করিবার সময় শরীর হইতে ধূঁয়া বাহির হইতে থাকে। ইহার কারণ এই যে, জল-বাষ্প স্বভাবতঃ অদৃশ্য হইলেও শীতকালে বাহিরের শীতল বায়ুসংস্পর্শে উহা শীঘ্র ঘনীভূত হইয়া ধূঁয়ার আকারে দৃশ্যমান হয়। কি শীতল, কি উষ্ণ, সকল অবস্থাতেই অল্পাধিক পরিমাণে বাষ্পাকারে পরিণত হওয়া জলের সাধারণ ধর্ম্ম। বেশী বাতাস বহিলে জল শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ভিজা কাপড় বাতাসে টাঙ্গাইয়া দিলে উহা শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়,

ইহা আমরা সকলেই দেখিয়াছি। এই একই কারণে খোলা জায়গায় স্নান করিলে স্নানের জল দেহ হইতে শীঘ্র উড়িয়া যাইয়া তাপশোষণ হেতু শৈত্য উৎপাদন করে; সুতরাং খোলা জায়গায় উষ্ণ জলে স্নান করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এরূপ অবস্থায় অকস্মাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া সর্দ্দি কাসি হইবার সম্ভাবনা। বাতাসের জোর না থাকিলে অথবা বেলা অধিক হইলে শীতল জলে বাহিরে স্নান করিলে কোন দোষ হয় না। অবশ্য সকলই অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। পৌষ মাঘ মাসের শীতে কলিকাতায় প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া হিন্দুরমণীগণকে সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে থাকিতে দেখা যায়।

স্নানের পর সমস্ত শরীর শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া গায়ে প্রয়োজন মত বস্ত্রাদি চাপা দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা শরীরে তাপ রক্ষিত হয় এবং হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিবার সম্ভাবনা থাকে না। স্নানের পর অধিকক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকা অকর্ত্তব্য, কারণ দেহসংলগ্ন ভিজা কাপড় যত শুকাইতে থাকে, ততই দেহ হইতে তাপ অপহৃত হইয়া শৈত্য উৎপন্ন হয়; এরূপ অবস্থায় সর্দ্দি, কাসি, জ্বর প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা। যাঁহাদের "শুচিবাই" নামক চিকিৎসাশাস্ত্র-বহির্ভূত রোগ আছে, তাঁহাদের মধ্যে এই কদভ্যাস প্রবলভাবে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। তাঁহাদের শরীর অনেক সময়ে এই কারণে অসুস্থ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যাঁহারা দূরস্থিত পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে বাড়ী ফিরিয়া আসেন, ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহাদের স্বাস্থ্যের হানি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। দূরে স্নান করিতে গেলে পরিধেয় শুষ্ক বস্ত্র সর্ব্বদা সঙ্গে লইয়া যাওয়া উচিত।

আমাদের দেশে স্নানের পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গে তৈলমর্দ্দনের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা হিতকর ও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানানুমোদিত। পাশ্চাত্য আচারপক্ষপাতী নব্যসম্প্রদায়-ভুক্ত অনেক যুবক যুবতী এই প্রথার বিরোধী, এ জন্য এই প্রথার উপকারিতা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। গায়ে তৈল মাখিলে ঘর্ষণ দ্বারা চর্ম্মের উত্তেজনা হয়, এই হেতু অধিক পরিমাণ রক্ত চর্ম্মের দিকে সঞ্চালিত হইয়া ক্লেদ-নিঃসরণ কার্য্যের সহায়তা করে। পুনশ্চ তৈলমর্দ্দন করিলে স্নানের সময় শরীরে কম ঠাণ্ডা লাগে, এ জন্য যাঁহারা নদী বা পুষ্করিণীতে অবগাহনপূর্ব্বক স্নান করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে তৈলমর্দ্দন অবশ্য কর্ত্তব্য।

তৈলের অপর একটি নাম স্নেহ। ইহা মস্তকে ও শরীরে যথারীতি অনুলিপ্ত হইলে আয়ুর্ব্বেদ মতে মস্তিষ্ক ও দেহ উভয়ই স্নিগ্ধ থাকে, চর্ম্মের কর্কশতা নষ্ট হইয়া উহা মসৃণ ও দৃঢ় হয়, কেশের অকালপক্কতা দোষ দূর হয়, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়, এবং ধাতুর রুক্ষতাদোষ উপশমিত হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের ধাতুতে বায়ু প্রবল, যাঁহারা হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি বায়ুরোগে কষ্ট পান, মস্তকে ও সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করিয়া অবগাহন স্নান করিলে ঐ সকল রোগের অনেক উপশম হয়। তৈলাভ্যঙ্গের উপকারিতা সম্বন্ধে চরকের উপদেশ হইল :—

"নিত্যং স্নেহার্দ্রশিরসঃ শিরশূলং ন জায়তে।
ন খালিত্যং ন পালিত্যং ন কেশাঃ প্রপতন্তি চ॥
বলং শিরঃ কপালানাং বিশেষণাভিবর্দ্ধতে।
দৃঢ়মূলাশ্চ দীর্ঘাশ্চ কৃষ্ণাঃ কেশাঃ ভবন্তি চ॥
ইন্দ্রিয়ানি প্রসীদন্তি সুত্বগ্ ভবতি চামলং।
নিদ্রালাভঃ সুখঞ্চ স্যান্ মূর্দ্ধ্নি তৈলনিষেবনাৎ॥
স্নেহাভ্যঙ্গাদ্ যথা কুম্ভশ্চর্ম্ম স্নেহ বিমর্দ্দনাৎ।
ভবত্যুপাঙ্গাদক্ষশ্চ দৃঢ়ঃ ক্লেশসহো যথা॥
তথা শরীরমভ্যঙ্গাদ্দৃঢ়ং সুত্বক্ প্রজায়তে।
প্রশান্তা মারুতাবাধং ক্লেশ ব্যায়াম সংগ্রহং॥
সুস্পর্শোপচিতাঙ্গশ্চ বলবান্ প্রিয়দর্শনঃ।
ভবত্যভ্যঙ্গ নিত্যত্বান্নরোহল্পজর এব চ॥" ইত্যাদি

অর্থাৎ নিত্য মস্তকে তৈল অনুলেপন করিলে শিরঃপীড়া জন্মে না, কেশের রুক্ষতা অপনীত হয় এবং চুল উঠিয়া যাইয়া মাথায় টাক ধরে না। ইহা দ্বারা কেশ দৃঢ়মূল, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শিরোদেশ বলিষ্ঠ হয়। তৈলমর্দ্দন করিলে ইন্দ্রিয়-সমূহ প্রশান্ত থাকে, চর্ম্ম কোমল, মসৃণ ও পরিষ্কৃত হয় এবং রাত্রিকালে সুনিদ্রা লাভ হইয়া থাকে। যেমন কোন পুরাণ কুম্ভে, চর্ম্মে অথবা চক্রের ধুরায় পুনঃ পুনঃ তৈলসেক করিলে উহা সুদৃঢ় ও ঘাতসহ হয়, তদ্রূপ শরীরে তৈল অনুলেপন করিলে উহা সুদৃঢ়, কষ্টসহ ও সুত্বকবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যথারীতি তৈলের ব্যবহারে বায়ুরোগ প্রশমিত হয় এবং দেহ শ্রমসহিষ্ণু হইয়া থাকে। প্রতিদিন তৈল মাখিলে শরীর

সুখস্পর্শ, তেজস্বী ও প্রিয়দর্শন হয় এবং বৃদ্ধ বয়সেও জরাজনিত লক্ষণের অসদ্ভাব হইয়া থাকে।

প্রাচীন চরক ঋষির উপরোক্ত উপদেশ বিষয়ে নবীন পাঠকপাঠিকাগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কোন কোন সাহেব আমাদিগকে "তৈলাক্ত বাবু" বলিয়া রহস্য করে বলিয়া আমাদিগকে যে এই দেশোপযোগী ও স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল প্রাচীন প্রথা পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইহা যুক্তিসঙ্গত বা সত্যানুমোদিত নহে। বিশেষতঃ তৈল মাখিয়া স্নানের সময় সাবান দ্বারা তুলিয়া ফেলিবার যখন সদুপায় রহিয়াছে, তখন তৈলমর্দনের উপকার হইতে বঞ্চিত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য বলিয়া মনে হয় না।

সকল তৈল অপেক্ষা খাঁটী সরিষা তৈল ঝাঁঝাল ; সুতরাং গায়ে মাখিবার পক্ষে প্রশস্ত। অন্ততঃ দশ পনের মিনিট কাল শরীরের সর্ব্বস্থানে তৈলমর্দ্দন করিলে ভাল হয়। এ কার্য্যের জন্য চাকরের আবশ্যকতা নাই, নিজে নিজেই ইহা সুচারুরূপে সম্পাদন করা যাইতে পারে। আমরা বাঙ্গালী জাতি, ব্যায়াম করিতে সদা উৎসুক নহি। যদি আমরা পনের মিনিট কাল ব্যাপিয়া সমস্ত শরীর জোরে তৈলমর্দ্দন করি তাহা হইলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও কতকটা ব্যায়ামের কার্য্য হইয়া যায়।

সরিষার তৈল মাথায় মাখিবার পক্ষে প্রশস্ত নহে। ইহা কিছুদিন ব্যবহার করিলে মাথায় আঠা হয়। সকল তৈল অপেক্ষা নারিকেল তৈল মাথায় মাখিবার উপযোগী। ইহা অনেক দিন মাখিলেও মাথায় আঠা হয় না এবং মাথা বেশ ঠাণ্ডা থাকে। আয়ুর্ব্বেদে নারিকেল তৈল মাখা প্রশস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তবে অনেক পুরাতন প্রথার সহিত নারিকেল তৈলের ব্যবহারও আমাদের মহিলাকুলের মধ্যে অনেকের নিকট ক্রমশঃ অনাদরণীয় হইয়া আসিতেছে এবং ইহার স্থলে বহু বিজ্ঞাপন-মুখরিত নানাবিধ তৈল অধুনা তাঁহাদের কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। এই সকল তৈলের মধ্যে যথার্থ তৈল বলিয়া যে জিনিষ, তাহা আছে কিনা, তাহা অনেক সময়ে পরীক্ষা দ্বারা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। তবে বিলাতী কৌশলে বিদূরিতগন্ধ কেরোসিন্ জাতীয় খনিজ তৈল যে অনেক সময়ে উহার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। এরূপ তৈল প্রতিদিন ব্যবহৃত হইলে কোন কুফল প্রসব করিবে কিনা, মস্তিষ্কের কোনরূপ নূতন পীড়ার আবির্ভাব হইবে কিনা, অথবা পরচুল ব্যবসায়ীদিগের সহিত এই সকল তৈল ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসায়সূত্রে কোন সম্বন্ধ আছে কিনা, ইহা নির্ণয় করিবার ভার ভবিষ্যবংশীয় চিকিৎসকদিগের উপর অর্পিত রহিল। তবে কেরোসিন্ জাতীয় এই সকল খনিজ তৈলের ব্যবহারে তৈল-ব্যবহারের যে উদ্দেশ্য, তাহা যে সাধিত হয় না, ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে। আমাদিগের শরীরে যে মেদ (Fat) আছে, তাহা তৈল জাতীয়। ইহা দ্বারা শরীর রক্ষা ব্যতীত শারীরিক তাপ ও কার্য্য করিবার শক্তি প্রয়োজন মত উৎপন্ন হয়। প্রকৃত তৈল মাখিলে উহার কিয়দংশ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মাখন জাতীয় খাদ্যের কার্য্য করে। অনেক স্থলে ডাক্তারেরা এই কারণে কড্‌লিভার্ তৈল গায়ে মাখিবার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

নারিকেল তৈল কিছুদিন থাকিলে বিকৃত হইয়া দুর্গন্ধযুক্ত হয় ; এরূপ তৈলের ব্যবহার অনেকের পক্ষে যে অপ্রীতিকর হইবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু আজকাল বিশেষভাবে সংস্কৃত নারিকেল তৈল বাজারে বিক্রীত হইতেছে। ইহা বহুদিন পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে এবং ইহার সহিত কিঞ্চিৎ গন্ধতৈল মিশাইয়া লইলে মাথায় ও গায়ে মাখিবার বেশ উপযুক্ত হয়। অনেকে ঘরে মসলা মিশাইয়া যে নারিকেল তৈল প্রস্তুত করেন, তাহা ব্যবহারের অনুপযোগী নহে।

তৈল মাখিলে জামা কাপড় শীঘ্র ময়লা হইবার সম্ভাবনা, এই আশঙ্কায় অনেকেই তৈল ব্যবহারের বিরোধী। স্নান করিবার সময় করকরে গামছা দ্বারা গা ঘসিলে সমস্ত তৈল উঠিয়া যাইবার কথা। আবার যদি স্নানের পর শুষ্ক কাপড় বা তোয়ালে দিয়া গা উত্তমরূপে মোছা যায়, তাহা হইলে গায়ে কিছুমাত্র তৈল লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা থাকে না। স্নানের সময় যাঁহারা সাবান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের গায়ে মোটেই তৈল লাগিয়া থাকিবার সম্ভাবনা নাই, তবে ভাল সাবান ব্যবহার না করিলে গা খস্‌খসে হয় এবং গায়ে

(বিশেষতঃ শীতকালে) "খড়ি" ফোটে। যাঁহাদের সাবান ব্যবহার করিতে আপত্তি আছে, তাঁহারা সাবানের পরিবর্ত্তে বেসন ব্যবহার করিতে পারেন। বেসনে গায়ের ময়লা ও চুলের আঠা সহজেই উঠিয়া যায়, অথচ সাবান মাখিলে গা যেরূপ খস্‌খসে হয়, ইহাতে তাহা হয় না। কিন্তু আজকালকার দিনে বেসনের গুণ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে ভরসা হয় না। সম্ভবতঃ নারিকেল তৈলের সুখ্যাতি করিয়া আমরা শ্রদ্ধাস্পদা পাঠিকাদিগের বিরাগভাজন হইয়াছি; তাহার উপর আবার বেসনের গুণ বর্ণনা করিলে, হয়ত তাঁহাদের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা।

অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে জল মাত্রেই সাবান ঘসিলে ভাল ফেনা হয় না। কোন কোন জলে সাবান ঘসিবামাত্র ভাল ফেনা হয়, যেমন বৃষ্টির জল বা কলিকাতার কলের জল। এরূপ জলকে ইংরাজীতে Soft water কহে। আমরা এইরূপ জলকে "কোমল জল" কহিব। যতক্ষণ সাবানের ভাল ফেনা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দেহ বা বস্ত্রাদিতে সাবান ঘসিলে উহার মলিনতা অপনীত হয় না। এমন অনেক কূপের বা পুষ্করিণীর জল দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহাতে অনেকক্ষণ সাবান না ঘসিলে ফেনা উৎপন্ন হয় না; সুতরাং এরূপ জল স্নান বা বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইলে, অনেক সাবান নষ্ট হইয়া যায়। ইংরাজীতে এরূপ জলকে Hard water কহে। আমরা ইহাকে "কঠিন জল বলিব।

যদি স্নানের জল এইরূপ "কঠিন" হয় তবে উহাকে ফুটাইয়া শীতল করিয়া লইলেই উহার "কঠিনত্ব" কমিয়া যাইবে। তখন ইহাতে সাবান ঘসিলে সহজে ফেনা হইয়া গাত্র পরিষ্কৃত হয় এবং অধিক সাবানও নষ্ট হয় না। কাপড় কাচিবার জলও ফুটাইয়া উহাতে অল্প পরিমাণ সোডা দিলে অল্প সাবানের ব্যবহারেই কাপড় পরিষ্কৃত হয়।

প্রত্যহ এক সময়ে স্নান করা কর্ত্তব্য। স্নানের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই; যে সময়ে যাঁহার অভ্যাস তিনি সেই সময়ে স্নান করিতে পারেন। তবে অধিক পরিশ্রমের পর, দীর্ঘ উপবাসের পর অথবা পূর্ণ আহারের পর স্নান করা অবৈধ। অনেকেই প্রাতঃস্নানের পক্ষপাতী। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রাতঃস্নান অতিশয় সুখকর এবং শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তিজনক। বিশেষতঃ যাঁহারা দূরে যাইয়া নদী বা পুষ্করিণীতে স্নান করেন, তাঁহাদের পক্ষে প্রাতঃস্নানই প্রশস্ত, কারণ বেলা হইলে রৌদ্রের জন্য যাতায়াতের কষ্ট হয়।

যাঁহাদের প্রত্যহ স্নান সহ্য হয় না, তাঁহাদের ভিজা গামছা দিয়া দিবসে দুই তিনবার সমস্ত শরীর ভাল করিয়া মুছিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের সহ্য হয়, তাঁহাদের পক্ষে গ্রীষ্মকালে দুইবার স্নান উপকারী ভিন্ন অপকারী নহে।

প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে প্রাতঃকৃত্যসমাধানের অভ্যাস স্বাস্থ্যরক্ষার বিশেষ অনুকূল। ইহা দ্বারা শরীর ও মন উভয়ই প্রফুল্ল থাকে। বিশেষ অর্থেই এখানে প্রাতঃকৃত্য কথাটির ব্যবহার করিলাম। দিবসে যে সময়েই মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হউক না কেন, ঐ বেগ ধারণ না করিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রিয়া সমাধান করিলে আমরা নানারোগের আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি। স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার বেগ ধারণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ ভৈষজ্যশাস্ত্রের মতে মহা অনিষ্টকর। এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

> "ন বেগান্ধারয়েদ্ধীমান্ জাতান্ মূত্র পুরীষয়োঃ।
> ন রেতসো না বাতস্য ন বম্যাঃ ক্ষবথোন চ ॥
> নোদ্গারস্য ন জৃম্ভায়া ন বেগান্ ক্ষুৎপিপাসয়োঃ।
> ন বাষ্পস্য ন নিদ্রায়া নিঃশ্বাসস্য শ্রমেণ চ ॥"

(চরক—"ন বেগান্ ধারণীয়" অধ্যায়)

অর্থাৎ বুদ্ধিমান ব্যক্তি মল, মূত্র, রেতঃ, বায়ু, বমি, হাঁচি, উদ্গার, হাই, ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা এবং পরিশ্রমজনিত শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগ ধারণ করিবেক না।

তবে কার্য্যগতিকে বা স্থলবিশেষে এই সকল স্বাভাবিক শারীরিক ক্রিয়ার বেগধারণ অপরিহার্য্য হইলে যত শীঘ্র সম্ভব, উহাদিগের প্রতি মনোযোগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(স্বাস্থ্য)

প্রতিশোধ

(গল্প)

[শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়]

(১)

সে অনেক দিনের কথা। তখন গোবিন্দপুরের মাঠ বলিলেই সাধারণের প্রাণে একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠিত। গোবিন্দপুর গ্রামের দক্ষিণে পাঁচক্রোশব্যাপী এই প্রকাণ্ড মাঠ যেন গভীর নীরবতার কোলে গা ঢালিয়া দিয়াছে। সীমান্ত হইতে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, কোথাও দু' একটা অশ্বত্থ আর কোথাও বা সুদীর্ঘ খর্জ্জুর বৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না।

সন্ধ্যার ম্লানিমা তখন একটু একটু করিয়া ঘনাইয়া আসিতেছিল। গ্রাম সীমান্তবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে তখনও গ্রামবাসিনী রমণীগণ পূর্ণ কলস কক্ষে গৃহাভিমুখে ফিরিতেছিল। দূর দিগন্তের কোলে আকাশের রঙ্গীন আভাটুকু তখনও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই।

রঙ্গিন কাপড়ে ঘেরা একখানা ডুলি স্কন্ধে চারিজন বেহারা স্বভাবসুলভ অস্ফুট ধ্বনি করিতে করিতে আসিতেছিল। ক্রমশঃ ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইলে একটা অশ্বত্থবৃক্ষ তলে ডুলিখানা নামাইয়া কেহবা গামছা বিছাইয়া, কেহবা একখানা ইট পাতিয়া, কেহবা ঘাসের উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একটী সুন্দর কান্তি যুবক ক্ষিপ্রপদে সেইস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিল "এখানে আবার বসলে কেন মধু খুড়ো—সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে এখন ভালয় ভালয় এই মাঠটা পার হ'তে পারলে হয়।"

গামছা ঘুরাইয়া হাওয়া খাইতে খাইতে বেহারাদের মধ্যে একজন বলিল "কি করি বল বাবাঠাকুর, যোয়ান বয়েসের সে শক্তি কি আর আছে—এখনও অর্দ্ধেক পথ আসি নি, তবু যেন মনে হচ্ছে পা গুলো আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে। তাও এখানে ডুলি নামাচ্ছি না তুমি যে [illegible] পেছিয়ে পড়তে।"

ললাটের ঘর্ম্মবিন্দুগুলো উড়ুনীর প্রান্তভাগ দিয়া মুছিতে মুছিতে যুবক বলিল "তা বটে, তবে কি জানো খুড়ো, এ মাঠটার একটা ভারী বদনাম শোনা যায় কি না—"

উপেক্ষার হাসি হাসিয়া মধু বলিল "সে ভয় তোমরা করতে পারো বাবাঠাকুর, মধো বাগ্দী ওসব ভয় রাখে না—এখনও এই বুড়োর হাড় ক'খানায় ভেল্কী খেলে।" বলিয়া মধু উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে উঠিতে দেখিয়া অপর তিনজন বেহারাও উঠিয়া ডুলির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পুকুর ঘাট হইতে যাহারা জল লইয়া ফিরিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একটী বার তের বৎসরের বালিকা নবাগত রঙ্গীন ঘেরাটোপ ঢাকা ডুলিখানার অভ্যন্তরে লুক্কায়িত অভিনব প্রাণীটিকে দেখিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিল "বৌ দেখাও না গা—"

ডুলি তুলিতে তুলিতে মধু বলিল "আর বৌ দেখাবার সময় নেই মা লক্ষ্মী, আমাদের অনেকদূর যেতে হবে—এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বেহারাগণ ডুলি কাঁধে লইয়া অগ্রসর হইল, যুবক ডুলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বালিকাকে ক্ষুণ্ণমনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাহার সঙ্গিনীদের মধ্যে একজন বর্ষীয়সী রমণী ভৎর্সনার স্বরে বলিল "কেমন হয়েছে ত! মেয়ে যেন ধিঙ্গি—যা মনে আসবে তাই কর্ব্বে।"

বালিকা কোন কথা বলিল না—ধীরে ধীরে তাহাদের অনুসরণ করিল।

(২)

বালিকার নাম মোহিনী। রংটুকু উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ হইলেও তাহার মুখ, চোখ, নাক ও অবয়বের গঠন দেখিলে মনে হয় সে মোহিনী নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

বাড়ী ফিরিয়া মোহিনী তার পিতার নিকট গেল। বহির্ব্বাটীর দাবায় বসিয়া মোহিনীর পিতা বলাই তখন পাট

কাটিতেছিল। এরূপ অসময়ে কন্যাকে আসিতে দেখিয়া বলাই বলিল "এখন আবার কি মনে ক'রে মা ?"

পিতার প্রশ্নের উত্তরে মোহিনী বলিল "আজ তোমরা শিকারে যাও নি বাবা ?"

মোহিনীর কথায় বলাই যেন আকাশ হইতে পড়িল। বলাই এ অঞ্চলের ঠগীদের নেতা। গোবিন্দপুরের মাঠে তাহাদের আড্ডা। অসহায় পথিককে হত্যা করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করাই তাহাদের শিকার।

জ্ঞান হওয়ার পর মোহিনী যখন বুঝিল এই নির্ম্মম নরহত্যাসহ জঘন্য দস্যুবৃত্তিই তাহার পিতার উপজীবিকা তখন হইতে সে তাহার পিতাকে এই মহাপাপের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এত চেষ্টাতেও যখন সে কিছুতেই বলাইকে এ মহাপাপের পথ হইতে ফিরাইতে পারিল না তখন একদিন আত্মহত্যা করিবে বলিয়া ভয় দেখাইল। কন্যাগতপ্রাণ বলাই অগত্যা নিজে শিকারে যাওয়া বন্ধ করিল। সে শিকারে যাওয়া বন্ধ করিলেও তাহাদের দলের কার্য্য সমভাবেই চলিতে লাগিল।

সেই মোহিনীর মুখে আজ হঠাৎ এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনিয়া বলাই যেন আকাশ হইতে পড়িল। সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না—অবাক বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বুদ্ধিমতী বালিকা নিমেষে পিতার মনোভাব বুঝিয়া লইয়া একটুখানি ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া বলিল "আমি বুঝেছি বাবা, কেন তুমি কথা কইচো না। অহঙ্কারী মানুষের উপর আমি হাড়ে হাড়ে চটে গিয়েছি তাই আজ এরূপ প্রশ্ন করলুম। এবার থেকে—না না আজ থেকে তুমি শিকারে যাও বাবা, আমি মানা করবো না। এখনও বেরিয়ে পড় যদি দেখতে পাবে—নইলে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

হিংস্র পশু যেমন শিকারের সন্ধান পাইলে আনন্দে লাফাইয়া উঠে—কন্যার কথায় বলাই পাট কাটা ফেলিয়া চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার লালসাদীপ্ত ভাঁটার মত চোখদুটো জল্ জল্ করিতে লাগিল। সে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল "কতদূর গেছে মনে হয়, নাগাল পাবো ত ?"

"খুব পাবে, কতদূর আর গেছে—তারাও তাদের পথ দেখলে আমিও বাড়ী চলে এলুম।"

"তা হ'লে পাবো—কিছু নিশেন ?"

"রঙীন ঘেরাটোপ দেওয়া ডুলি—চারজন বেহারা—একটী বাবু—"

"ব্যস্"—বলিয়া বলাই লাঠীহস্তে ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেল। মোহিনীও তাড়াতাড়ি অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। অন্দরে আসিয়া সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে আপনার শয়ন গৃহে প্রবেশ করিল।

ঘরে প্রবেশ করিতেই ঘরটা যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে লাগিল। তাহার ছোট্ট খাটখানি, ছোট্ট কাঠের আলনাটা, পুতুলের বাক্স, খেলনা প্রভৃতি তৈজসপত্র যেখানে যেটী যেমন ভাবে সজ্জিত ছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই রহিয়াছে এতটুকু এদিক ওদিক হয় নাই অথচ ঘরটা এমন ফাঁকা ফাঁকা দেখাইতেছে কেন ? সে ইহার কারণ কিছুই ভাবিয়া পাইল না—অগত্যা সে ধীরে ধীরে খাটের উপর গিয়া বসিল। নাঃ, কিছুই ভাল লাগিতেছে না ! সে ভাবিতে বসিল।

তাহার একবার মনে হইল কাজটা ভাল হইল কি না ? সে তখনই নিজে নিজেই সে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লইল। সে ঠিক করিয়াছে—অপমানের প্রতিশোধ লইয়াছে।

সহসা যেন তার বুকের ভিতরটা দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—যেন একটা অজানিত বেদনা তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়া তাহাকে নিতান্ত অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। সে দুইহস্তে বুকখানা প্রাণপণে চাপিয়া ধরিয়া ছটফট করিতে লাগিল। তাহার ইচ্ছা হইল সে একবার চীৎকার করিয়া কাঁদে—কিন্তু তাহা সে পারিল না। সে অস্থির ভাবে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া এক নিঃশ্বাসে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িল তারপর উন্মত্তের ন্যায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রাণপণে ছুটিল।

(৩)

রাত্রি প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। একখণ্ড কালো মেঘ পশ্চিমাকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। গোবিন্দপুরের তেপান্তর মাঠের একটা অশ্বত্থ বৃক্ষতলে রঙীন ঘেরাটোপ ঢাকা একখানা ডুলি নামাইয়া চারিজন বেহারা বিশ্রাম

করিতেছিল, অদূরে একটা যুবক বসিয়া ধূমপান করিতেছিল। সকলেই নিস্তব্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক বলিল "আর এই পথটুকু গেলেই ত বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আরাম করতে পারতিস— এখানে না নামালেই হ'ত। দেখছিস্ আকাশের অবস্থা— এখুনি বৃষ্টি নামবে।"

বেহারাদের মধ্যে একজন বলিল "সারা দুপুরের রোদটা মাথার উপর দিয়ে গেছে, একটু না জিরুলে পারবো কেন। একটুকু জিরিয়ে নিয়ে যে ডুলি ধরবো একেবারে তোমার শ্বশুর ঘরে গিয়ে নামাবো। বৃষ্টি নামতে এখনও ঢের দেরী"

"আমি ভাবচি একে অন্ধকার রাত তায় আবার মেঘলা মেঘলা।"

সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না—ডুলি ধরবো কি উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবো।" বলিয়া যুবকের হস্ত হইতে কলিকাটি লইয়া তাহাতে উপর্য্যুপরি কয়েকটা টান দিয়া উহা তাহার সঙ্গীকে দিল। সেও ধূমপানান্তে উহা অপরকে দিল। এইরূপে সকলের ধূমপান শেষ হইলে বেহারাগণ যেমন ডুলি উত্তোলনের উদ্যোগ করিবে অমনি অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা পাব্‌ড়া আসিয়া একজন বেহারার হাঁটুতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিয়া ধরাশায়ী হইল। দেখিতে দেখিতে আর একটা—আবার একটা—আবার একটা - শেষ আর একটা আসিয়া যুবকের মস্তকে লাগিবামাত্র যুবক একটা তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিত হইল—বুঝি সঙ্গে সঙ্গে তার ইহলীলাও ফুরাইল।

যেখানে যুবকের রক্তাক্ত দেহ ধূল্যবলুণ্ঠিত—ডুলী হইতে বাহির হইয়া রমণী সেইখানে ছুটিয়া গেল এবং যুবকের ধূলি-ধূসরিত রক্তাক্ত মস্তক স্বীয় অঙ্কে তুলিয়া লইয়া এই জনশূন্য প্রান্তরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিল।

"বাবা—বাবা থামো—ওগো কোথায় তোমরা—"বলিতে বলিতে উন্মাদিনীর ন্যায় মোহিনী সেইখানে ছুটিয়া আসিল।

"তুই আবার এলি কেন মোহিনী, আমি কাম ফতে করে ফেলেছি—তোকে অপমান করার প্রতিশোধ নিয়েছি বেটা একঘায়েই জমি নিয়েছে—বলিতে বলিতে ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া বলাই সেইখানে ছুটিয়া আসিল।

মোহিনী নাম শুনিয়া রোরুদ্যমানা রমণী কাতরকণ্ঠে বলিল—"কে বৌদি—তুমি এসেছ—দেখ বৌ দিদি আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, দাদাকে বুঝি মেরে ফেলেছে।"

ব্যাকুলভাবে মোহিনী বলিল—"কে তুমি কাকে বৌ দিদি বলচো? কাকে মেরে ফেলেছে গা?"

"তুমি যদি বলাই বাগ্দীর মেয়ে মোহিনী হও হবে তোমারই স্বামীকে—আমার দাদাকে মেরে ফেলেছে— আমরা তোমাদেরই বাড়ী যাচ্ছিলুম।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একবার বিদ্যুৎবিকাশ হইল—সেই আলোকে আহত ব্যক্তির মুখ দেখিয়া মোহিনী আর্ত্তনাদ করিয়া ভূপতিত হইল।
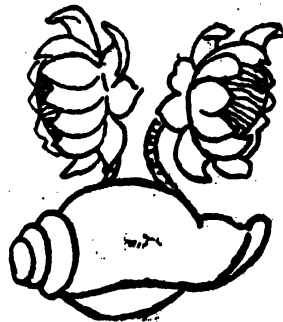
নিদ্রা ভঙ্গ

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১৫ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৩। [২৭শ সপ্তাহ

ব্যায়াম-বীর বাঙ্গালী

স্বর্গগত ভীম ভবানীর পর যে যে বাঙ্গালী যুবক ব্যায়াম ক্রীড়ায় পারদর্শীতা লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যে মাষ্টার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। ছাত্র জীবনের প্রথম করণীয় অধ্যয়ন কার্য্যে সম্পূর্ণ ভাবে লিপ্ত থাকিয়াও অবসর মত ব্যায়াম চর্চ্চা করিয়া মাষ্টার বসন্তকুমার এই তরুণ বয়সেই কলাবিদ্যার উন্নতি সাধন করিয়া যেরূপ যশস্বী হইয়াছেন তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গর্ব্বের ও গৌরবের বিষয়।

বসন্তকুমার আহিরীটোলা নিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার ভগবানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র এবং স্বর্গীয় হারাণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র দৌহিত্র।

বাঙ্গালী ব্যায়ামবীর মাষ্টার বসন্ত।

তিনি বেনিয়াটোলা আদর্শ ব্যায়াম শিক্ষা সমিতিতে যোগদান করেন এবং তত্রত্য শিক্ষক ও তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের যত্নে তিনি এই বিংশতি বৎসর বয়সে নানাপ্রকার ক্রীড়া কৌশলে দক্ষতা লাভ করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়া উঠিয়াছেন।

তাহার ক্রীড়া কৌশল বস্তুতঃই চমৎকার ও উল্লেখযোগ্য। নিম্নে সন্নিবেশিত কয়েকখানি ফটোগ্রাফ হইতে তাহার কৃতিত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফল যে ভবিষ্যতে তাঁহাকে উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত করিবে তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডাক্তারী শিক্ষার কঠোর কর্ত্তব্য সমষ্টির গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও বসন্তকুমার অবসর মত মধ্যে মধ্যে সহর ও মফঃস্বলের নানা স্থানে তাঁহার ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহাতেই তাঁহার যশোরাশি দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এমন কি গত বৎসর London Wembly Exhibitionএ তাঁহার ক্রীড়া কৌশল প্রদর্শন করিবার জন্য আহূত হইয়াছিলেন।

ইহা কি বাঙ্গালীর গৌরবের পরিচায়ক নহে? বাঙ্গালার ছাত্রবৃন্দই এখন বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ আশা ভরসা। তাঁহারা
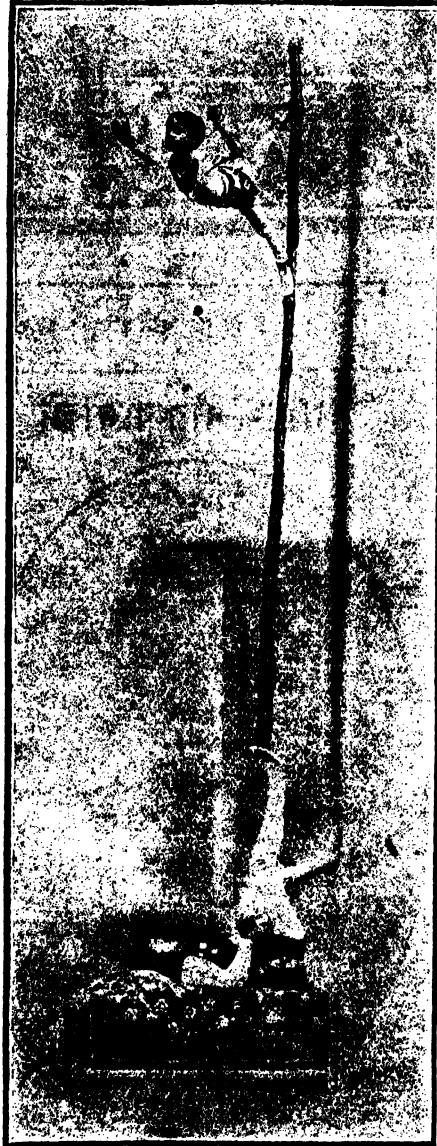
মাষ্টার বসন্তকুমার একপদোপরি বংশদণ্ডের উপর অদ্ভুত ক্রীড়া দেখাইতেছেন। ক্রীড়াকালে বালক ক্রীড়কসহ বংশ-দণ্ডটী দক্ষিণ পদ হইতে বাম পদে এবং বামপদ হইতে দক্ষিণ পদে লোফালুফি করেন এবং পরিশেষে উহা দক্ষিণ পদের হাঁটুর উপর রাখিয়া ভারকেন্দ্রের সাম্যভাব প্রদর্শন করেন।

যদি অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে অবসর মত একটু একটু ব্যায়াম-চর্চ্চা করেন তাহাতে যে শুধু বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতার হীন অপবাদ অচিরে ধুইয়া মুছিয়া যাইবে তাহা নহে, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন আবার নূতন ভাবে গঠিত হইবে। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত রুগ্ন প্লীহাসর্ব্বস্ব বাঙ্গালী মূর্ত্তিতে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে মনুষ্যোচিত শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবে। যে বাঙ্গালীর পূর্ব্বপুরুষগণ সুদীর্ঘ জীবনের মধ্যে কখনও দৃষ্টি শক্তির অল্পতা অনুভব করেন নাই বর্ত্তমান যুগে তাঁহাদেরই বংশধরগণের ন্যায় বিংশ বর্ষ অতিক্রম করিবার পূর্ব্বেই দৃষ্টিহীণতার অজুহাত দেখাইয়া চোখের উপর পরকোলার ছাউনী খাটাইয়া দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে না,—পুরুষোচিত কঠোর বজ্রমুষ্টি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া ক্ষীণ ছড়ি ধারণ উপযোগী হইবে না। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ভীম, ভবানী, বসন্তকুমার, রামমূর্ত্তি জন্মগ্রহণ করিবে।

ললাটোপরি স্থাপিত বংশদণ্ডের উপর বালক ক্ষীরোদলালের পতাকাকৃতি প্রদর্শন। মাষ্টার বসন্তকুমার এই ক্রীড়ায় অভিনবভাবে ভারকেন্দ্রের সাম্যভাব দেখাইতেছেন। এইসকল অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল অভ্যাস করিতে তাঁহাকে বহুসাধনা করিতে হইয়াছে।

অভিশপ্ত

(গল্প)

[শ্রীযোগানন্দ রায়]

(১)

সে আজ অনেকদিনের কথা, যখন আমি মা সরস্বতীর দোর থেকে বিদায় নিয়ে, মা বাপের অজ্ঞাতসারে সুদূর এলাহাবাদে এক বন্ধুর সহিত আমোদ প্রমোদে মন ঢেলে দিয়েছিলাম; তখন কিন্তু মনে হয় নি আমার এ জীবনটা পরে পথহারা পথিকের মত ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ ক'রে দেবে।

মা বাবার একমাত্র নয়নের নিধি ছিলাম, শাহারা মরুর ওয়েসিস্ ছিলাম; তাই তাঁদের আশা ভরসায় জলাঞ্জলি দিয়ে, তাঁদের জীবন তরীখানা মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে, বিশ্বাস ঘাতকের মত সরে পড়েছিলাম।

তিনটি বছর লক্ষ্যহারা ভাবে ঘুরে ঘুরে যখন প্রাণটা কিসের চাপে মুস্‌ড়ে উঠল, তখন আমার এ স্বাধীন মনটা কি এক অজানা পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ল। মনে পড়ল—সেই দীঘির পাড়ের উপর বাল্য লীলা, আর আর মনে পড়ল, সেই চিরস্নেহময় মা বাপের অফুরন্ত ভালবাসা; প্রতিমুহূর্ত্তে মনে হ'তে লাগল কতদিনে সেই চির পরিচিত স্থানটিতে পৌছিব, কতক্ষণে বাল্য সাথীদের কাছে আমার দীর্ঘ প্রবাসের কত কথা কইব, কতক্ষণে মা-বাবার স্নেহ বিজড়িত কমল অঙ্গে আমার উদভ্রান্ত বিবস শরীরটাকে এলিয়ে দিয়ে বাকি দিনগুলো অন্য পথে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করব। কিন্তু মানুষ যা মনে করে, তা ত দেবতাদের মত তখনই হ'য়ে উঠে না, তার উপর নিঃস্বদের ত কথাই নাই; তাই প্রাণটা আমার তখনই ঐ সব চাইলেও সময় মত হ'য়ে উঠল না। পৌছতে লেগে গেল তিনটি মাস।

তখন মরা গাঙ্গে বান ডেকেছিল, বিল খালগুলো জলধির মত সীমারেখা দেখবার জন্য মাথা উঁচু করে, বুক ফুলিয়ে চলেছিল—অদূরে বর্ষণক্লান্ত মেঘগুলো বিশ্রাম করবার জন্য জমাট বাঁধছিল; শ্রান্তি দূর হলেই পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করবে বলেই বোধ হচ্ছিল। গ্রামে যখন পৌছিলাম তখন উষার আলোক পূর্ব্বদিকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

প্রথমে গ্রামের দু'একজনের সঙ্গে দেখা হলেও তারা আমায় চিন্‌তে পারলে না, আমিও কোন কথা না বলে একবারে বাড়ীর মোড়ে গিয়ে থামলাম; কিন্তু বাড়ীর কোনই চিহ্ন পেলাম না—সব যেন ওলট্ পালট্। যেখানে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল, সেখানে রাণিগঞ্জের টাইল দিয়ে ছাউনি মেটো একখানি বাংলো, বাংলোর চারিপাশে বাগান। বাগানে বেলা, রজনীগন্ধ, হেনা প্রভৃতি ফুলের মন মাতান সৌরভে দিগন্ত আমোদিত।

মনে ভ্রম হয়নি বলে সে দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করলাম; কিন্তু প্রাণ আমার আতঙ্কে শিউরে উঠল। মনে হলো—তবে কি মা বাবা দুজনে এখানে নাই, দুজনে কি হতভাগ্যকে ত্যাগ ক'রে কোন অজানা দেশে চলে গিয়েছে, নানান্ চিন্তায় আত্মবিস্মৃত হ'য়ে কতক্ষণ যে আমি সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম তা ঠিক জানি না।

যখন চমক ভাঙ্গল, তখন দেখলাম আমার সম্মুখে আমারই বাল্যবন্ধু রমেন, সুরেশ প্রভৃতি কয়েকজন দাঁড়িয়ে বল্‌চে—"পাগল—পাগল না হ'লে কি আর ও রকম ভাবে এক দৃষ্টি ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে থাকতে পারে।"

কথাটায় আমার পাঞ্জরার হাড় ক'খানা যেন একবারে কেঁপে উঠল, আমার জিহ্বা আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। কথা কইতে পারলাম না। রুদ্ধ আবেগ কেবল অশ্রুতে পরিণত হ'য়ে ঐ স্থানটির তত্ত্ব জানবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠল।

রমেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো—"তুমি কাঁদচ কেন?" কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে বললাম—"না আমি ত কাঁদি নি—তবে তুমি বলতে পার আমার বাপ মা কোথায়? আর আমাদের বাড়ীরই বা এ অবস্থা কেন?"

আমার প্রশ্নে তারা ( ) রকম হ'য়ে পরস্পর মুখ

চাওয়া-চায়ি করতে লাগল—তারপর রমেন আমার কাছে এসে বললে—"তুমি কি বিজয় ?"

"হঁা। রমেন আমিই বিজয়।"

"তুই এতদিন কোথায় ছিলি ?"

"অনেক ঘুরলাম ভাই।"

"তোর বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

"কোথায় ?"

"কাশীতে।"

"না আমিত কাশীতে অনেকদিন ছিলাম, কৈ সেখানে ত তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি ; রমেন ! বাবা কি এখানে নাই।"

"এখানে ! না বিজয় যেদিন তুই এখান হ'তে তাঁদের না বলে চ'লে যাস—সেইদিন তোর বাবা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান করেও যখন কোন সন্ধান পেলেন না—তখন নিরুপায় হ'য়ে বাস্তুভিটাটুকু জমিদারকে বিক্রি ক'রে কাশীবাসী হব বলে এখান হ'তে চলে যান ! তারপর আর কোন সংবাদ আমরা পাই না ; ভেবেছিলাম হয়ত তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে সেইখানেই আছেন। কিন্তু ভাই সে আজ প্রায় তিন বচ্ছরের কথা। চোখের সাম্‌নে হ'তে যে জিনিষটা চলে যায় তার স্মৃতি পলে পলে জগৎ হ'তে বিলুপ্ত হয় ভাই।"

রমেনের কথা নির্ব্বাক বিস্ময়ে সব শুনলাম—দীর্ঘ প্রবাসের পর অন্তরের যে ব্যাকুলতা সেই চির-পরিচিত দুয়ারে টেনে এনেছিল—আজ সেই ব্যাকুলতা আমার বৃদ্ধ পিতামাতার শ্রীচরণ উদ্দেশে ছুটিয়ে নিয়ে চললো। উর্দ্ধশ্বাসে সেখান হ'তে বেরিয়ে আকুল নয়নে পথ প্লাবিত ক'রে নিজের কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্ম জন্মের মত জন্মস্থান হ'তে বিদায় নিলাম।

(২)

কাশীধামে এসে পাতি পাতি করে সন্ধান করলাম—কিন্তু কোথাও তাঁদের সন্ধান পেলাম না। পরে তিন বছরের মৃত্যু রেজিষ্টারী সন্ধান ক'রে জানলাম ; তাঁদের উভয়েরই একমাস আগু পিছু মৃত্যু হয়েচে।

রুদ্ধ হৃদয়ের শত আবেগ ভাগীরথীর মত শত শাখা বিস্তার ক'রে কোন্ অজানা পথে টেনে নিয়ে চললো—প্রয়াগ মথুরা যেখানে যত তীর্থ ছিল সব ঘুরে বেড়ালাম কোন জায়গায় শান্তি পেলাম না। কেবল অশ্রান্তভাব বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠে আমার অনুতপ্ত মনকে বারিধী তরঙ্গের মত তোলপাড় করতে লাগল।

নানান্ স্থান ঘুরে ঘুরে পুরুষোত্তমে এসে পৌঁছলাম—এখানেও কেউ নাই—কেউ যদি এ তাপিত হৃদয়ে একটু শান্তির বারি ছিটিয়ে দেয়। নীরব নিশীথে দুই চক্ষু প্লাবিত ক'রে নীলসিন্ধুর পারে বসে কত কাঁদলাম—কত বুক চাপড়ালাম। কিন্তু ঐ নীল সিন্ধুর ওপার হ'তে কে যেন তীব্র ভীষণ কর্কশকণ্ঠে বলে উঠলো—পিতৃহন্তার শান্তি কোথায়।

তবে কি শান্তি নাই, তবে কি এ জীবন ব্যর্থতায় ভরা। ভগবান দীনের প্রতি ফিরে চাও—একবার পদস্খলন হ'য়েছে বলে কি আর তাকে উঠতে নাই।—না, তবু না—প্রাণ যায় কি ম্রিয়মান হাহাকারে হৃদয়খানা সাহারার মত হয়ে উঠল।

আরও তিন চারদিন চলে গেল—আহার নাই, নিদ্রা নাই। মনে হতে লাগল—বুঝি বা সব হারাই, বুঝি বা পাগল হ'য়ে যাই। তারপর আর নড়বার চড়বার শক্তি থাকল না। শরীর অবসন্ন হয়ে পড়লো। শেষে বেলাভূমি আশ্রয় করে এক গাছতলায় অজ্ঞান হয়ে পড়লাম।

যখন জ্ঞান হ'ল—তখন মনে হ'ল কার স্নিগ্ধ করস্পর্শে আমার তাপিত হৃদয়, একটু শান্তির ক্রোড়ে স্থান পেয়েচে।

ধীরে ধীরে চোখ মেললাম—দেখলাম একটি সুসজ্জিত কক্ষে পালঙ্কের উপর আমি শুয়ে আছি, আর আমার শিয়রে বসে একটি প্রৌঢ়া অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

আমায় একটু সুস্থ দেখে, প্রৌঢ়া ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে বলে উঠল—"রাণু শীগগীর দুধ নিয়ে এস ত মা।"

মনে হ'ল কে এ রমণী ! কে এ হতভাগ্যের আশ্রয়দাত্রী মাতৃরূপিণী দেবী ? বহু পুরাতন স্মৃতি মানসপটে ফুটে উঠে আমার নীরস চোখ-দুটি সজল করে দিলে।

প্রৌঢ়া আমার চোখের কোণে জল দেখে বললে "বাবা কাঁদচ কেন ? কোন কষ্ট হচ্ছে কি ?"

আমি বললাম—"না মা,—তবে—আর বল্‌তে পারলাম না। আমার চোখ দুটি কি একটা তড়িৎ প্রবাহের আকর্ষণে

অন্যদিকে চলে গেল—দেখলাম কিশোলয়ের মত একটি উন্মুখ যৌবনা কিশোরী কাজল কেশের রাশি এলিয়ে একখানি বাসন্তী রংয়ের শাড়ীতে তার অরুণরাঙা তনুখানি সুনিপুণ ভাবে ঘিরে প'রে একবাটী দুধ হাতে নিয়ে এসে প্রৌঢ়াকে বলল—"মাসিমা! এই যে দুধ এনেছি—এখন উনি কেমন আছেন মাসিমা ?"

মুহূর্ত্তের জন্য আমি দিশেহারা হ'য়ে গেলাম—আমার ক্লান্ত চোখ দুটি কিসের আবেগে বুজে এল—মনে হলো—এ অভিশপ্ত জীবনের উপর আবার একি প্রহেলিকা!

কিশোরী আমার দিকে তার লাল রক্তিমভরা স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে তার মাসীমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

তার মাসীমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বললে—"হাঁ মা এখন একটু জ্ঞান হয়েচে দেখছি। তুই একটু বস্, আমি শীগ্গীর গা হাতটা ধুয়ে আসি"—এই বলে তিনি আমাকে বললেন—"দুধটুকু খেয়ে নাও ত বাবা ?"

মাসীমার এ স্নেহের অনুযোগ তখন বেশী প্রয়োজন মনে করলাম না—তখন সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বোধ করলাম কি করে আমি, কোন আশীর্ব্বাদের জোরে আমি, এই স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত অনুপম বেড়াজালে ঘেরা পড়লাম।

কেবলমাত্র তাঁকে একটি ছোট্ট "না" বলে পাশ ফিরে শুলাম।

মাসীমার কথামত কিশোরী একটা চেয়ারে ব'সে কি একখানা বই ওলটাতে পালটাতে লাগল। বিক্ষুব্ধ মন, থেকে থেকে ঐ অচেনা মুখখানির তত্ত্ব জানবার জন্য বেশী রকম চঞ্চল হ'য়ে উঠল। স্থির থাকতে পারলাম না,—জিজ্ঞাসা করলাম—"বলতে পার আমি এখানে কি করে এলাম।"

কিশোরী বললে—"আগে আপনি দুধ খান, তারপর বলছি!" তার কথায় দুধ খেয়ে নিয়ে উত্তরের প্রতিক্ষায় চাইলাম। সে বলতে লাগল ;—

"আমি সন্ধ্যার পর সমুদ্রতীর হ'তে বেড়িয়ে ফিরছিলাম, এমন সময় আপনার অস্ফুট কাতর আর্ত্তনাদ শুনতে পেলাম, অনুসন্ধান করতেই দেখলাম, আপনি একটা গাছতলায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করচেন—আমি চাকরটাকে দৌড়ে মাসীমাকে খবর দিতে বললাম, বাসা আমাদের নিকটেই, মাসীমার আসতে বিলম্ব হল না ; তিনি আপনার অবস্থা জেনে একখানা গাড়ী আনিয়ে বাসায় নিয়ে এলেন—সে আজ চারদিনের কথা।"

আপনার বাড়ী কোথায় বলুন আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, তাঁরা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

একটা দমকা বাতাস যেমন রুদ্ধ জানলাগুলো খুলে দিয়ে প্রচণ্ডভাবে দেওয়ালে আঘাত লেগে ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যায় তেমনি আমার রুদ্ধ হৃদয়খানা কিশোরীর কথায় চুরমার হ'য়ে গেল।

নিজের কৃতকর্ম্ম তাকে একনিঃশ্বাসে বলে ফেল্লাম, আমার কাহিনী শুনে কিশোরীর মুখখানা বাদলা দিনের সাঁঝের মত হ'য়ে উঠলো। তবু সে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, "ভাববেন না—ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যই করেন। ঐ যে মাসীমা আসচেন"—এই বলে সে আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার কাহিনী তার মাসীমাকে ধীরে ধীরে বলতে লাগল।

মাসীমা ছল্‌ছল্ নেত্রে সস্নেহে আমার জীর্ণ বুকখানিতে হাত দিয়ে বললে—"বাবা আমি শীগগীর কলকাতায় ফিরবো। আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। এ দুনিয়াতে আমার কেউ নাই, এই একটি বোনঝি ছাড়া। তোকে যখন পুরুষোত্তম জুটিয়ে দিয়েছেন, তখন জানবো সেটা তাঁরই দান।'

(৩)

আজ প্রায় দু' সপ্তাহ অতীত হ'য়ে গেছে আমরা সকলে কলকাতায় এসেচি। প্রৌঢ়াকে মাসীমা বলেই ডাকতে আরম্ভ কর্য়েচি। মাসীমার অবস্থা মন্দ নয়। মাসিক প্রায় পাঁচ ছয় শত টাকা বাড়ী ভাড়ার আয় আছে বটে, কিন্তু মাসীমার তীর্থ ভ্রমণ হিড়ীকে একটি পয়সাও জমতে পায় না।

মাসীমা আমাকে সন্তান তুল্যই ভালবাসতে লাগলেন, রাণুর এখন সঙ্কোচের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েচে। দাদা বলেই ডাকে। নানা আব্দারে আব্দারে অতিষ্ঠ ক'রে তুলে। আমি তার কোন কথার প্রতিবাদ করতে পারি না। যদিই বা করি, তখনই তার অভিমান-

বিক্ষুব্ধ সজল আঁখি আমার উদাস প্রাণটিকে আরও কিসের চাপে দমিয়ে দেয়। সে জন্য আমি না বলতে পারি না।

যত দিন যেতে লাগল ততই রাণুর সরল স্বভাব মাধুর্য্য পরিপূর্ণ অমিয় ব্যবহারে আমার হৃদয়ের সমস্ত নৈরাশ্য, কি এক অপূর্ব্ব আশা সুষমায় ভরে উঠতে লাগল।

কিন্তু অদৃষ্ট দোষে একজনের বিষ দৃষ্টিতে পড়লাম, তিনি মাসীমার দূর সম্পর্কীয় দাদা, মাসীমার যা কিছু করবার তিনি করতেন। আমার আসায় ও আমার উপর মাসীমার ঐকান্তিক ভালবাসায় তাঁর আশাতরু উৎপাটিত হ'বে ভেবে, আমার প্রতি কাযেই দোষ ধরতে লাগলেন। আমায় উঠতে বসতে তিরস্কার করতে লাগলেন। প্রতি কথায় শ্লেষবিজড়িত স্বরে আমায় সাবধান করতে লাগলেন।

আমার উদ্‌ভ্রান্ত বিবশ মনটা যে শান্তির অমিয় ছায়ায় আশ্রয় পেয়েছিল, তা মামার শুষ্ক নীরস কর্ত্তব্যে ঘূর্ণী বাত্যার মত সেখান হ'তে উড়িয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

মনে হ'তে লাগল—এ জীবনে শান্তি আসতে পারে না—যে কুলাঙ্গার পিতা মাতার অবাধ্য হ'য়ে, নিজের সুখ শান্তির জন্য পিতামাতাকে হত্যা করে; তার চিরতুষানলে দগ্ধ হওয়াই উচিত। তাই সময়ে সময়ে ভাবতাম, এখানে না থাকাই ভাল।

কিন্তু মাসীমা আমাকে বিমর্ষ দেখলেই সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বলতেন "বাবা বিজয় তোর প্রাণে যদি কোন কষ্ট হয় আমাকে বলিস্, আমি সাধ্যমত সে কষ্ট দূর করবার চেষ্টা করবো। তুই যে আমার ভগবানের দয়ার দান।"

মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ-তুষার পাতে আমার এ মরু হৃদয় শীতল হ'য়ে যেত। মামার দুর্ব্বিসহ বাক্য যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে সেই অনাবিল স্নেহ মমতায় ডুবে যেতাম।

আরও তিনটি মাস এ ভাবে চলে গিয়েচে। ইতিমধ্যে বুদ্ধিমতী মাসীমাতা আমার সঠিক পরিচয়ের জন্য প্রতিবেশী কানাই বাবুকে আমাদের গ্রামে পাঠিয়ে আমার যাবতীয় পরিচয় জানিয়ে নিয়েছেন এবং আমাকে নিয়ে একবার সেখানে যাবেন তাও প্রকাশ করেছেন।

মাসীমার এ অন্তরের ব্যাকুলতা আমার বুঝতে বাকী ছিল না। তবু আমি অভিশপ্ত জীবনের উপর বিশ্বাস স্থাপন ক'রে কোনও শান্তি পাচ্ছিলাম না। অহর্নিশি সেই প্রবল চিন্তা—পিতামাতার অবাধ্যতার প্রতিফল, আমাকে মর্ম্মে মর্ম্মে সইতে হবে।

* * * *

আমার এ আতঙ্কের দিন শীগ্‌গিরই ঘনিয়ে এল—সে বৎসর শীতের অন্তে কলকাতা সহরে ভয়ানক ভাবে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হ'য়েছিল; প্রত্যহ পাঁচ সাতটি প্রত্যেক পাড়ায় মারা যাচ্ছিল। সকলেই ত্রস্ত, অবস্থাপন্ন ব্যক্তি সহর ছেড়ে অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে যাবার বন্দোবস্ত করছিল। মাসীমাও আমাকে বললেন "বাবা বিজয়, চল আমরাও দিনকতকের জন্য বৈদ্যনাথ ধাম হ'তে ঘুরে ফিরে আসি।" মাসীমার কথার সমর্থন করে সমস্ত গুছিয়ে নিতে লাগলাম। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে মানুষ যা মনে করবে তা ত হ'য়ে উঠবে না। তাঁকে মানুষ এ চক্ষে দেখতে না পেলেও, তাঁর অজ্ঞাত আদেশ পালন করতে সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রস্তুত হ'য়ে থাকতে হবে।

তাই শেষ রাত্রিতেই মাসীমার প্রবল ভাবে জ্বর এল। পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই মায়ের কৃপা···সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান—আশা ভরসা নির্ম্মূল। রাণুর ঐকান্তিক চেষ্টা, আমার শারীরিক পরিশ্রম, সমস্তই ব্যর্থ ক'রে, আমার অস্তমিত আশা নবোদয়ের মত উজ্জ্বল ক'রে স্নেহময়ী মাসীমাতা মাত্র তিন দিনের রোগে ভুগে কোথায় যে চলে গেলেন তা আমি ও রাণু একাধিক্রমে পাঁচ সাতটি দিন অনাহার অনিদ্রায় চিন্তা ক'রেও আবিষ্কার করা ত দূরের কথা সে পথের সন্ধানও করতে পারলাম না।

* * * *

অভিশপ্ত জীবনের আর এক পর্য্যায় ভীষণ মূর্ত্তিমতী হ'য়ে আমার সামনে দাঁড়াল—মাসীমার শ্রাদ্ধশান্তি হওয়ার পর মামা রাণুর বিবাহের আয়োজন করতে লাগলেন। আর সে বিবাহ তাঁরই পুত্রের সঙ্গে ঠিক করলেন।

মামার এ অভিসন্ধি স্বর্গীয়া মাসীমা অবগত ছিলেন কিন্তু পুত্রের নানা গুণে অলঙ্কৃত থাকায় তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর বলেও দিয়েছিলেন, এ কথা যেন স্বপ্নেও আর মনে উদয় না হয়। কিন্তু যা ভবিতব্য তা চিরবরণীয়।

ই মাসীমার অকাল গমনে মামার অভিসন্ধি ষোলকলায় রিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো।

রাণুর বিবাহের দিন ১০ই জ্যৈষ্ঠ স্থির হয়ে গেল। আমার র অন্দরে যাবার আদেশ নাই। রাণুর সঙ্গে দেখা হবার পায় নাই। কেবল অন্তরের ব্যাকুল আর্ত্তনাদ আমার হৃ ও মনকে নিষ্পেষিত ক'রে দিচ্ছিল।

একদিন রাণু আমায় নিভৃতে সাক্ষাৎ করবার জন্য ডেকে ঠালে—আমার অসংবদ্ধ মনকে স্থির করতে না পেরে তার কটাকে উপেক্ষা করতে পারলাম না সন্ধ্যার পরে তালার ছাদে সাক্ষাৎ করতে গেলাম।

—দেখি রাণুর সে রক্তিম গোলাপ মুখখানি নিলীমায় রে গিয়েচে। দেহলতার সে লাবণ্যপ্রভা আর নাই—ষাদ মাখা মলিন মুখখানি যেন দূর ভবিষ্যৎ বিভীষিকার ত্তর উপর সংবদ্ধ! চক্ষু স্থির! কণ্ঠ শুষ্ক! তার এ বস্থা দেখে আমার রুদ্ধ আবেগ জোয়ারের মত কিনারায় নারায় উপ্‌চে উঠলো।—তবু তার বাহুলতাখানি ধরে াস্তে আস্তে বললাম—"রাণু! কেন আমায় ডেকেছ?"— । তার ভাষা দৃষ্টি নিয়ে উদাস প্রাণে একটি মাত্র কথা বলে ঠলো—"বিজুদা—" আর বলতে পারলে না—কেবল বাধ্য অশ্রুজলে তার শুষ্ক গণ্ডদুটি ভিজিয়ে দিতে লাগল। ামি তাকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছি, এমন সময় মামার ভীষণ র্কশ কণ্ঠ আমার কাণে বেজে উঠলো। ফিরে দেখলাম, মা আমার দিকে আস্ফালন করতে করতে আসছেন। সেই আমাকে উত্তম মধ্যম দিয়ে বলে দিলেন কাল সকালে ন এখানে আর না দেখতে পাই, এই বলে রাণুর হাত রে সেখান হতে হড়হড়িয়ে টেনে নিয়ে চলে গেলেন। র্ব্বাক বিস্ময়ে এ অপমান সহ্য করলাম—কেবল রাণুর বিষ্যতের উপর নির্ভর করে।

(৪)

হৃদয় বড়ই উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। শত চিন্তা, শত ্যাকুলতা আমায় যেন কোন্ অন্ধকারের সীমাহীনতায় নিয়ে যতে লাগল। মনে মনে স্থির করলাম রাণুকে একখানি ত্রে আমার অদৃষ্ট অজ্ঞাত—জীবনের শেষ পরিণাম জানিয়ে, আমার ইহকালের ব্যর্থ জীবনটা পরকালে শান্তি পাবার আশায় অগ্রসর হব।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে ছাদের উপর এলাম—দেখলাম শারদ পূর্ণিমা তার অফুরন্ত সোহাগের আলো নিয়ে পৃথিবীর বুকের উপর ভরা যৌবন নিয়ে লুটোপুটি খাচ্ছে, আর সময়ে সময়ে ঐ দূর নিলীমার গায়ে হ'তে পবন ধীরে ধীরে তার ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা করচে:

প্রকৃতির এ নগ্ন সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। আমিও আস্তে আস্তে সেই সৌন্দর্য্যে মিশে যাব বলে নেমে আসচি এমন সময় কার কোমল করস্পর্শে আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হ'য়ে উঠলো। ফিরে দেখলাম রাণু—সে তার বেদনা কাতর ভাষা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে, মুখে কথা নাই। যেন কোন সুদক্ষ শিল্পীর হাতের তৈরী প্রস্তর প্রতিমা। তার বিষাদ মাখা মলিন মুখখানি দেখে স্থির থাকতে পারলাম না। ধীরে ধীরে ছাদের উপর নিয়ে গিয়ে বললাম, "রাণু তুমি ত অবুঝ নও—আমি অভিশপ্ত, অভিশপ্তের সংস্পর্শে যে আসবে তার জীবন মরুময় হ'য়ে উঠবে। তুমি ধীর চিত্তে সংসারে অগ্রসর হও। আমার স্মৃতি ভুলে যাও। আমার এ অভিশপ্ত জীবনের উপর আর কোন স্পৃহা নাই। এই বলে তাকে ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু—কিন্তু দেখলাম, রাণু আমার শেষ কথা শুনতে শুনতে ছিন্ন কদলী বৃক্ষের মত আমার পায়ের তলায় পড়ে গেল বড়ই বিচলিত হ'য়ে পড়লাম। তারপর অদূরে কি একটা অস্ফুট শব্দ শুনতে পেয়ে চমকিত হ'য়ে উঠলাম; তার একটু জ্ঞান ফিরতেই তাকে আর কোন কথা না বলে নিষ্ঠুরের মত তাকে ফেলে তার কৃতজ্ঞতার উপযুক্ত প্রতিদান দিয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়লাম।

* * * *

আজ প্রায় দশ বছর পরে নানা দেশ ঘুরতে ঘুরতে হরিদ্বারে পৌচেছি। জানি না ভগবান এ অভিশপ্তের উপর সদয় হবেন কি না, কিন্তু আমি তাঁর নিকট নতজানু হ'য়ে এই পুণ্যক্ষেত্রে রাণুর কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করি।

ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি—ওঁ শান্তি!

দিদির দান

[শ্রীসুধীরকৃষ্ণ মিত্র]

(১)

সে পানওয়ালী। বয়স আঠাস কি উনত্রিশ হবে। যৌবনে যদিও ভাঁটার টান পড়িয়াছে তবুও তাহার সুগোল মুখখানি দেখিলেই আবার দেখিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় যেন তাঁহার দৃষ্টিতে যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে।

আমি তখন কলেজে পড়ি। দ্বিতীয় বৎসরে সবে পদার্পণ করিয়াছি। কলেজে যত অসৎ লোকগুলি আমার সঙ্গী এবং বিশেষ অনুগত কারণ তাহাদের জন্য আমি প্রত্যহ পানেতে ও চুরুটে দৈনিক প্রায় বার চৌদ্দ আনা খরচ করিয়া থাকি।

সেই পানওয়ালীর দোকানের সামনেতেই আমাদের আড্ডা জমে উঠে। সেইখানেই বসিয়া দাঁড়াইয়া আমাদের যত হাসি-ঠাট্টা হয়।

একদিন সন্ধ্যার সময় আমি কলেজের পাস দিয়া বাসায় ফিরিতেছি এমন সময় দেখলুম সেই পানওয়ালী মোক্ষদা সেই রকে বসে পান সাজছে। আস্তে আস্তে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম।

মোক্ষদা সামনের কাঠের বাক্সের উপর পানগুলি সাজাইয়া খয়ের দিতে দিতে মুখ তুলিয়া বলিল—"কিগো বাবু!"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম,—"আচ্ছা তুমি অত কষ্ট কর কেন বল দিকিনি?" মোক্ষদা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। কথাটা হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাওয়ায় আমি একটু লজ্জিত হইয়া পড়িলাম। তারপর সেটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—"থাক্ গে দুটো পান দাও।"

মোক্ষদা দুটো পান ও একটা চুরুট আমার হাতে দিয়া বলিতে লাগিল,—"তুমি যাই কর বাপু তোমার উপর সত্যি আমার রাগ হয়। এই যে এদের জন্য এত করে খরচ কর দু'দিন বাদে কি কেউ তোমায় চিনতে পারবে! বাবা টাকা পাঠাচ্ছেন কাজেই কোন ভাবনা চিন্তে নেই।"

আমি তখন কিছু হইয়া কোনও কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। রাস্তায় কেবলই আমার মনে হতে লাগলো—তাইত!

পরদিন কলেজে এসে আমি তার হাতে একখানি দশ টাকার নোট দিয়ে বললুম—"তোমার পাওনা বাদে যা থাকবে সেটা আমার নামে জমা করে রেখ।"

মোক্ষদা নোটটি না তুলিয়াই অভিমান সুরে বলিতে লাগিল—"তুমি যদি বাপু এরকম কর তা হ'লে আমি আর এখানে বসবো না। এই সবে একটাকা ছয় আনা পাওনা হয়েছে, আমি অত বেশী রাখতে পারবো না।"

আমি নোটখানি তার হাতে গুজে দিয়ে বললাম,—"সে বিশ্বাস তোমার উপর আছে বলেই ত' তোমার কাছে রাখি।"

এ সব তোমাদের ভারী অন্যায় বলিয়া মোক্ষদা নোটটি বাক্সের তলায় রাখিল।

একজন বন্ধু এই কথা শুনিয়া বলিয়া উঠিল,—"মাসী ভাবছো কেন? সোণায় তোমার গা ভরে যাবে।"

তাহার কথা শেষ না হইতেই মোক্ষদা তীব্রদৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইল—সেও থতমত খাইয়া গেল।

কলেজের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। অনেকে আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিত বটে কিন্তু কেউ আমার মতন পড়া কামাই করে না। ঘণ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা কলেজের ভিতর গেল, কেবল আমার মতন দুই একজন সেইখানে বসিয়া রহিল।

(২)

সেইদিনের পর থেকে আজ সাতদিন হতে চললো মোক্ষদা আর পান সাজিতে বসে না। আমাদের আসরও

আর তেমন জমে না। আমি হেসে খেলে বেড়ালেও আমার মনের অবস্থা কাহাকেও জানতে দিই না। মোক্ষদার অভাব আমি যেরূপ অনুভব করেছিলুম বোধ হয় সেরূপ আর কেহ করে নাই।

এইরকম করে পনের দিন কেটে গেল।

একদিন বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার অন্ধকারে মোক্ষদার বাটীর সামনে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ কি যেন একটা অজানা আশঙ্কায় আমার প্রাণটা শিউরে উঠলো। আমি দুই একবার বাটীতে ঢুকিতে চেষ্টা করলুম কিন্তু পারলুম না। কেবলই সেই বাড়ীর সামনে পায়চারী করিতে লাগিলাম। শেষে কোনরকমে মনে বল সঞ্চার করে ভিতরে প্রবেশ করলুম।

অমনি ঘরের ভিতর হইতে পরিচিত কণ্ঠে কে একজন বলিয়া উঠিল,—"এসেছ! আমি তোমারই জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিলুম।"

আমি চারিদিক চাহিয়া মৃদু আলোকে দেখিলাম, একটী বৃদ্ধা জীর্ণ শীর্ণকায়া একটি রোগীর সেবা করিতেছে।

আমায় সেই অবস্থায় ঘরের প্রবেশ পথের সামনে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রোগী ক্ষীণকণ্ঠে বলিল,—"ওখানে কেন? কাছে এস।"

আমি নিকটে গিয়া রোগীকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলাম —এই কি সেই মোক্ষদা! এই কয়দিনে এত পরিবর্ত্তন।

মোক্ষদা ঘর হইতে সেই বৃদ্ধাকে যাইতে সঙ্কেত করিল। বৃদ্ধা চলিয়া গেলে মোক্ষদা তাহার বিছানায় আমাকে আসন লইতে বলিয়া বলিল,—"ঠিক সময়ে এসেছ! আর একটু দেরী হলে হয়ত তোমায় দেখতে পেতুম না। মঙ্গলময় ভগবানের অশেষ দয়া।"

মোক্ষদার মুখে এই কথা শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। এ রকম কথা ত' কখনও তাহার মুখে শুনি নি। আমি চুপ করিয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আমায় চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মোক্ষদা আমায় বলিল,—"তোমার উদ্দেশ্য অসৎ হলেও আমি বেঁচে থাকতে তোমায় সে পথে যেতে দিতাম না। কদিন অসুখে পড়ে কেবলই ভেবেছি তোমায় কে দেখবে?"

আমি আর চুপ থাকিতে পারিলাম না, বলিলাম,— "মোক্ষদা! আমার জন্যে তুমি এত ভাব।"

"তোমায় যে ছোট ভায়ের মতন দেখে এসেছি। কখনও যে তোমায় খারাপ ভাবতে পারি নি।" দুই ফোঁটা অশ্রু মোক্ষদার গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল।

"আমি যে তোমায় কখনও তুমি ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারতুম না। জিবটা জড়িয়ে যেত।"

আমি কি বলে তাকে সম্বোধন কর্ব্বো খুঁজে পেলুম না। অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লুম,—"আচ্ছা! ঐ বৃদ্ধা তোমার কে হন? তুমি আর ঐ বৃদ্ধা দুইজনে এই ঘরে থাক। তোমার কি আর কেউ নেই?"

"আমার সব ছিল, সবই বোধহয় আছে কেবল আমার বলবার অধিকারটা নেই—আমার আদি বাড়ী কুড়িগ্রাম।

আমারও যে বাড়ী কুড়িগ্রামে! কই সেখানে ত' একে কখনও দেখি নি।

"তবে কি এটা তোমার স্বামীর ঘর?"

"স্বামীর ঘর ত' চোকে দেখতে পেলুম না। নলিন সত্যই আমি বড় হতভাগিনী।" বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে মোক্ষদা ফুপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"তোমার বিয়ে হয়েছিল কোথায়?"

"না! একটু থাম—একটু জল দাও—বড় তেষ্টা তোমায় সব কথা বল্‌বো নলিন। একটু জল দাও।

আমার আর বুঝতে বাকী রইল না, মোক্ষদার অন্তিমকাল উপস্থিত। আমি ঘরের কলসী হইতে একগ্লাস জল আনিয়া অল্প মোক্ষদার গলায় দিলাম। মোক্ষদা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার জীবনের পূর্ব্ব ইতিহাস বলিতে আরম্ভ করিল।

১৫ই ফাগুন সন — —আমার বিবাহের দিন স্থির হয়। তাহার দেড়মাস আগে একটা সূর্য্যগ্রহণ পড়ে। আমি মাকে চেপে ধরলুম তাঁদের সঙ্গে গঙ্গায় নাইতে যাব। প্রথমে সবাই আপত্তি করেছিল, কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডন করিবে। অবশেষে তারা মত করিল। সে আজ ষোল বৎসর আগেকার কথা। সে ঘটনা এখনও নূতন করে আমার মনেতে গাঁথা আছে।

স্নানের দিন গ্রহণের একঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা কলিকাতার বাসা হইতে বাহির হই। পথে অসংখ্য যাত্রী আমাদের মতন পাপক্ষয় কর্ত্তে চলেছে, কিন্তু আমার মতন পাপীর আর গঙ্গাস্নান হল না। কলিকাতা সহর পূর্ব্বে কখনও দেখিনি। আমি রাস্তার দুই দিক্‌কার বাড়ী দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলাম। এই অবকাশে কখন যে আমার মা ও আত্মীয়েরা আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তাহা আমি মোটেই টের পেলুম না। হঠাৎ সামনের দিকে চেয়ে মাকে দেখতে না পেয়ে আমার ভয় হল। আমি তাড়াতাড়ি চলিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেকটা পথ চলিয়াও তাহাদের দেখা পেলুম না। আমি মা মা বলে চিৎকার করিতে করিতে পথ চলিতে লাগিলাম।

এই অবধি বলিয়া মোক্ষদা থামিয়া গেল এবং একটু জল দিতে বলিল। আমি আবার তাহার গলায় একটু জল দিলুম। মোক্ষদা আবার বলিতে লাগিল।

আমি অনেক ছুটাছুটি করিলাম অনেককে জিজ্ঞাসা করলুম কিন্তু কেহই তাঁহাদের খবর দিতে পারিল না। আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলাম, শেষে অনন্যোপায় হইয়া এক জায়গায় বসিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

জনৈক ভদ্রবেশধারী যুবক আমার কাছে এসে জিজ্ঞাসা কল্লে। আমি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সে আমায় সঙ্গে নিয়ে একটি গলির পথের বাড়ীতে আমায় নিয়ে গেল। আর আমায় কিছু খেতে দিয়ে বল্লে যে শীঘ্রই সে আমার মায়ের সন্ধান নিয়ে ফিরে আস্‌ছে।

তার কথায় বিশ্বাস করে আজ আমার এই দশা।

যাবার সময় সে আমায় শিকল দিয়ে চলে গেল। সমস্ত রাত্রি তাহার আর দেখা পেলুম না। আমার মনে অনেক রকম ভয় এসে জড় হ'লো।

পরদিন সকাল বেলায় সে আমার কাছে এসে বল্লে—যে সে আমার মায়েদের খবর পেয়েছে এবং তাদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়িও নিয়ে এসেছে। কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ ভরে উঠলো।

তাহার মনে যে এত পাপ ছিল তাহা আমি জানিতাম না। সেই পাপিষ্ঠ গাড়ীতে তুলিয়া আমায় একটি বাগান বাড়ীর বৈঠকখানায় লইয়া আসিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার বন্ধুদের বলিতে লাগিল,—"তোরা আমায় কি ঠাওরাস্। বাহবা দে। কথাগুলো এখনও আমার বেশ মনে আছে।"

তাহাদের কথাবার্ত্তা ও ভাব-ভঙ্গিতে আমার প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। আমি তাহাদের পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিলাম,—কেঁদে কেঁদে নিজের ইজ্জত ভিক্ষা চাহিলাম—কিন্তু কিছুতেই সেই পাষণ্ডদের দয়া হ'ল না। তারপর—মোক্ষদা আর বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল ইসারায় একটু জল চাহিল।

আমার উদ্দেশ্য মুহূর্ত্তে বদ্‌লাইয়া গেল। রাগে, ঘৃণায় আমার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিল। অতীতের সেই কথাগুলি মনের কোনে উঁকি মারিতে লাগিল—যখন পুরুষেরা স্ত্রীজাতিকে সম্মান করিয়া চলিত,—

আমি মোক্ষদাকে একটু জল দিলুম। সে আবার তাহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল। "তারপর সেই দুর্বৃত্তেরা আমায় একটি বেশ্যালয়ে গচ্ছিত রাখিয়া প্রত্যহ আমার খোঁজ নিবে বলিয়া তাহাকে শাসাইল। যাহার আশ্রয়ে রাখিয়া গেল তাহার বেশ বয়স হইয়াছে এবং এখন ব্যবসা ভাল চলে না বলিয়া দিনের বেলায় পান বিক্রয় করিয়া থাকে।"

তাহার কথা শুনিয়া আমার মরিতে ইচ্ছে হইল। পাপী হয়ে থাকার চেয়ে মরা শতগুণে ভাল। ঐ কথাটা আমার মা প্রায়ই বলে থাকতেন।

একদিন গভীর রাত্রে আমি পালাইয়া গঙ্গার তীরে আসিলাম। পথে দু'একজনকে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হয়েছিল। আমি জলেতে অনেকটা নেমে গেলুম কিন্তু মরতে ভয় হল, উঠে পড়লুম। সকাল বেলায় ঐ বৃদ্ধাটী গঙ্গাস্নান করতে এসে আমায় সঙ্গে নিয়ে এসে এইখানে আশ্রয় দেয়।

"বৃদ্ধা কেন তোমায় তার বাড়ীতে রাখলে না। একলা এইভাবে—"

"না! সমাজের ভয়ে কেউ তখন আমায় আশ্রয় দেয় নি। মাকে চিঠি লিখেছিলুম—জবাব দেয় নি। সেখানে যেতে চেয়েছিলুম কিন্তু ঐ বৃদ্ধা আমায় যেতে দেয় নি।

বললে—সেখানে তোমার আর আশ্রয় নেই—তুমি পতিতা হয়েছ। কিন্তু দোষ কার—ভগবান বিচার করবেন।"

মোক্ষদা আবার জল চাহিল। আমি জল দিলাম। সে একটি চাবি আমার হাতে দিয়া কাঠের একটা বাক্স খুলিতে অনুরোধ করিল। বাক্সটী খুলিয়া সামনে একটা বড় থলি পাইলাম।

মোক্ষদা আমায় কাছে ডেকে ক্ষীণকণ্ঠে বলল,—"ওটা তোমার। তোমার সমস্ত টাকা যা আমায় দিয়েছিলে সবই ওতে পাবে। সৎকাজে ব্যয় করো। ও-রকম যা তা করে খরচ করো না। নলিন তোমার বাড়ী কোথায়?"

"কুড়িগ্রাম।"

মোক্ষদা চোখদুটো বড় বড় করিয়া চাহিয়া বলিল—"কুড়িগ্রাম। এতদিন আমায় বলনি কেন?"

"বলবার সময় হয় নি। আচ্ছা তোমার নাম কি সত্যই মোক্ষদা না শোভা।"

মোক্ষদা চীৎকার করিয়া উঠিল,—"নলিন—নলিন।"

আমিও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিয়া উঠিলাম—"শোভাদি, শোভাদি—তুমি রাই পিসীর মেয়ে!"

মোক্ষদা নিস্তেজ হইয়া পড়িল—আমি তাহাকে জোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—"শোভাদি, শোভাদি—তোমার টাকা আমি চাই না। নয় তো বলে যাও তোমার মাকে পাঠিয়ে দেব।"

অতি ক্ষীণকণ্ঠে মোক্ষদা বলিল,—"ছিঃ ভাই—ওটা দিদির দান বলে গ্রহণ কর। আমায় মাপ—

তারপর সব স্থির—শোভাদিদি স্থির—আমি স্থির—বাহিরের দিকে চেয়ে দেখি—প্রকৃতি স্থির—ধীর—গম্ভীর।

চপলা

[শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়]

কেন, চপলারি সম চমকিয়া তুমি,
চকিতে যাও গো মিশায়ে।
কেন, মাঝে মাঝে তুমি দেখা দিয়ে মোরে,
পথ দাও ওগো ভুলায়ে॥
চকিত চাহনি চাহিয়া তোমার,
পাগল কর গো পরাণ আমার,
কেন, আশার আলোক জেলে দাও তুমি,
আমার এ সুপ্ত হৃদয়ে॥

ক্ষণিকের তরে, অধর ভরিয়ে,
কেন হাস তুমি অমন করিয়ে,
যদি ধরা নাহি দিবে, তবে কেন তুমি,
হৃদয় লও গো হরিয়ে॥
যদি ধরা দিবে—দাও চিরতরে,
যদি প্রেম দিবে—দাও হৃদি ভ'রে,
তুমি, নিমেষেরি তরে দেখা দিয়ে মোরে,
জীবন দিয়ো না শুকায়ে॥

প্রজাপতির খেয়াল

[শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী]

—১—

বাদলের বর্ষণ-ক্লান্ত প্রভাত। ছেঁড়া ছেঁড়া কাজল মেঘের ফাঁকে নীল আকাশকে মনে হচ্ছে কোন রোদন-ক্লান্ত সুন্দরী তরুণীর আঁখি—তার পল্লবদুটী এখনও অশ্রুতে সজল হ'য়ে রয়েছে। কল্‌কাতার কর্দ্দমাক্ত রাজপথের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে; বিলাসী ধনী আরোহীদের মোটরকার দরিদ্র পথচারী পথিকদের ফর্সা জামা-কাপড়ে অবজ্ঞা ভ'রে কাদা ছিটিয়ে গর্ব্বিত গতিতে ছুটে চলেছে।

বেলা প্রায় দশটা বাজে। কাঞ্চন কলেজে যাচ্ছিল, হাতে তার একখানা বাঁধানো খাতা। সে 'সিটি কলেজে' বিজ্ঞান-বিভাগে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ে। কাঞ্চন তার হাতের 'রিষ্টওয়াচ্'টার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলে দশটা বাজতে আর মিনিট দুই দেরী আছে। তাদের অরসিক রসায়ণ-শাস্ত্রের অধ্যাপকটী একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে ক্লাসে থাকেন; সুতরাং তাঁর দেরী হ'য়ে গেলে উপস্থিতের চেয়ে অনুপস্থিত বলে গণ্য হবার সম্ভাবনাই বেশী। এই কথা ভাবতে ভাবতে কাঞ্চন তার পায়ের গতি অপেক্ষাকৃত দ্রুত করে তুলল।

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও সুকিয়া ষ্ট্রীটের সঙ্গম-স্থলে এসে সে রাস্তা পার হবার জন্যে যেই রাস্তায় নেমেছে, অমনি একখানা মস্ত বড় 'উল্‌সলী'কার' তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে কাদা ছিটিয়ে তার অতি সাধের গরদের পাঞ্জাবীটাকে দিব্যি চিত্র-বিচিত্র করে তুলল। অকস্মাৎ এই অভদ্রতা-সূচক উৎপাতে বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে কাঞ্চন রক্তনেত্রে মোটরখানার পানে তাকাতেই তার উদ্ধত দৃষ্টি বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল।

তার মনে হ'ল কলকাতার কর্দ্দমাক্ত পাথরের পথের বুকে সহসা যেন একটী শ্বেতশতদল বিকশিত হয়ে উঠেছে। মোটরের ভিতর থেকে একটী বছর পোনেরোর কিশোরী অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রয়েছে! তার মুঞ্জরিত লতার মত তনুখানি ঘিরে একখানা চম্পক-রঙের শাড়ী পরা; গায়ে শাড়ীর সঙ্গে মিল-করা রঙের একটী ব্লাউস আর তার পিঠের ওপর আস্‌মানী রঙের চওড়া সিল্কের রিবন্ দিয়ে 'বো' বাঁধা বেণী দুলছে।

কাঞ্চন কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সেই নিখুঁত ছবিখানির পানে।

সহসা চলন্ত মোটরখানা পথের ধারে থেমে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে কার উচ্চকণ্ঠের সোল্লাস আহ্বান শোনা গেল—"হ্যাল্লো কাঞ্চন! ওঃ, কতদিন পরে দেখা বল্‌তো?"

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! কাঞ্চন অবাক হ'য়ে দেখল মোটরের দরজা খুলে হাস্য-প্রফুল্ল মুখে নেমে আসছে তারই আবাল্য-সখা পিয়াল!

পিয়াল এসে কাঞ্চনের ডান হাতখানা ধরে একবার খুব জোরে ঝাঁকানী দিল; তারপর তার কর্দ্দম-চিত্রিত পাঞ্জাবীর পানে নজর পড়তেই অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে উঠল—"একি তোর পাঞ্জাবীতে এত কাদা লাগল কি করে? আমাদের গাড়ী যাবার সময় ছিটকে লেগেছে নাকি?"

কাঞ্চন হেসে বলল—হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দীর্ঘকাল পরে বন্ধুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের উপহার। কিন্তু তুই কি আকাশ থেকে আবির্ভূত হলি নাকি? হাজারীবাগের মায়া কাটিয়ে কল্‌কাতায় কবে এসেছিস্।"

পিয়াল বলল—"সত্যি, পথের মাঝে এমনভাবে দেখা হবে, তা' স্বপ্নেও ভাবি নি। আমরা পরশুদিন কল্‌কাতায় এসেছি, শুনলুম তোরা নাকি বাড়ী বদল করেছিস্, তাই আর দেখা করতে পারিনি। আজ হঠাৎ দেখা হ'য়ে ভালই হোল—চল্ এখন আমাদের বাড়ীতে—মা তোর কথা কত বলেন—"

—"মাসিমাকে আমার প্রণাম জানাস্ ভাই। কিন্তু এখন ত যাওয়া হবে না—এখন যে কলেজে যাচ্ছি—"

ওঃ, সেকথা ভুলেই গিয়েছিলুম। তা হলে সন্ধ্যাবেলা যাস্‌। এখন চললুম ভাই, সুজাতাকে স্কুলে পৌছে দিতে যাচ্ছি—বেথুনে পড়ে। সুজাতাকে তোর মনে নেই? সেই যে হাজারীবাগে তাকে দেখেছিলিস্‌! ওই তো আমাকে বললে—দাদা, দেখ কাঞ্চনদা যাচ্ছে।

"সন্ধ্যাবেলা আমাদের ওখানে ঠিক্‌ যাস্‌—বুঝলি ?"

কাঞ্চন বলল,—"আচ্ছা যাব—"

পিয়াল গিয়ে মোটরে ষ্টার্ট দিল, অমনি গতির আবেগে মোটর গর্জ্জন করে উঠল। পিয়াল মোটরে উঠে কাঞ্চনকে বলল—"গুড্‌ বাই—" কাঞ্চনও বিদায় অভিনন্দন জানাল—"গুডবাই—"

মোটর ছুটে চলল। কাঞ্চন আর একবার তার পিয়াসী চোখ দুটোকে পাঠিয়ে দিল মোটরের উদ্দেশ্যে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে মোটরখানা দৃষ্টির বহির্ভূত হ'য়ে গেল।

কাঞ্চন তার 'রিষ্টওয়াচের' পানে তাকিয়ে দেখল দশটা বেজে এক কোয়ার্টার হ'য়ে গেছে। এখন আর ক্লাসে যাওয়া নিষ্ফল জেনে সে আস্তে আস্তে বাড়ীর পানে পা চালিয়ে দিল।

—২—

খাতাটা টেবিলের ওপর ফেলে, পাঞ্জাবীটা খুলে আলনায় টাঙিয়ে রেখে কাঞ্চন অলসভাবে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল।

সাত বছর আগেকার বিস্মৃত প্রায় ছবিগুলো তার চোখের সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। শ্যামল শোভায় সাজান সেই হাজারিবাগ—তার সঙ্গে কাঞ্চনের শৈশব-কৈশোরের মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

পিয়ালরা ছিল হাজারিবাগের পুরোণো বাসিন্দা। কাঞ্চনের বাবা বন-বিভাগের কাজে ঘুরতে ঘুরতে হাজারিবাগে এসে ঠিক পিয়ালদের পাশের বাংলোটায় আস্তানা পাতলেন। সে অনেকদিনের কথা—কাঞ্চনের বছর পাঁচেক বয়স।

ক্রমে ক্রমে এই দুটী পাশাপাশি পরিবারের মধ্যে একটা সুন্দর প্রীতির সম্বন্ধ গড়ে উঠল। পিয়ালের বাবা রাজশেখর বাবুর সঙ্গে কাঞ্চনের বাবা প্রশান্তবাবুর বন্ধুত্ব যেমন অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রগাঢ় হয়ে উঠল, তেমনি কাঞ্চনের মা চারুবালা পিয়ালের মা হেমাঙ্গিনীর সঙ্গে "বকুলফুল" পাতালেন—তাঁদের অকৃত্রিম সখীত্বের নিদর্শন স্বরূপ। যতই দিন যেতে লাগল, তাঁদের সে প্রীতির 'বকুলফুল' ঝরে তো গেলই না, বরং গন্ধে এই দুটী পরিবারকে আমোদিত করে বিকশিত হ'য়ে উঠতে লাগল।

কাঞ্চন পিয়ালেরই সমবয়সী। পিয়ালদের বাড়ীতেই সে দিনের অধিকাংশ সময় কাটাত, পিয়ালের সঙ্গে খেলত, বেড়াত।

কাঞ্চন তখন তেরো বছরের, সেই সময় একবার গ্রীষ্মের ছুটীতে সুজাতা হাজারিবাগে এসেছিল বেড়াতে। সুজাতা পিয়ালের মামাতো বোন; বেথুন বোর্ডিংএ সে থাকৃত। পিতৃমাতৃহীন সুজাতার অভিভাবকতার ভার গ্রহণ করেছিলেন রাজশেখর বাবু।

সে তখন ন বছরের বালিকা—গিরি-নির্ঝরিণীর মতই চঞ্চলা।

কাঞ্চনের মনে পড়ল নিস্তব্ধ দুপুর বেলায় সুজাতা, পিয়াল আর সে—এই তিনজনে মিলে ছায়া-শীতল শালবনের নির্জ্জন পায়ে-চলা পথটী ধরে শিরীষ আর মহুয়া ফুল কুড়োতে কতদূর চলে যেত......নৃত্য চপলা স্বচ্ছ-সলিলা সেই পাহাড়ী ঝর্ণাটীর পাশে তারা শালপাতার নৌকো তৈরী করে স্রোতে ভাসিয়ে দিত···কার নৌকো আগে যায়, সেই বিষয়ে তাদের রেষারেষি চলত।......

তারপর কয়েক বছর পরে প্রশান্তবাবু সপরিবারে কলকাতায় চলে এলেন—কাঞ্চনের স্কুলে ভর্ত্তি হবার উপলক্ষে। হেমাঙ্গিনী সজল চোখে সখী চারুবালাকে বিদায় দিলেন।.. কিন্তু এই সাত বছরের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন। তাদের সংসারের ওপর দিয়ে প্রলয়ঙ্কর কাল-বৈশাখীর নিষ্করুণ ঝাপ্‌টা ব'য়ে গেছে। স্বামী পুত্রের মায়ার ডোর ছিন্ন করে চারুবালা কোন অচিন্‌ মায়া-রাজ্যের উদ্দেশ্যে অবেলায় পাড়ি দিলেন।

এই নিষ্ঠুর শোকের আঘাত প্রশান্তবাবুকে অকাল-বার্দ্ধক্যের ভারে স্থবির করে ফেলল; তিনি পেন্‌সন্‌ নিয়ে জীবন-সন্ধ্যার বাকী সময়টুকু কল্‌কাতাতেই কাটাবেন স্থির করলেন।

তারপর কাঞ্চনরা কয়েক বছর হোল পিয়ালদের কোন খবর পায় নি ; পিয়ালরাও কাঞ্চনদের খবর পায় নি।

তাই এতকাল পরে আজ কাঞ্চন ও পিয়াল অপ্রত্যাশিত রূপে পরস্পরের দেখা পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল।

— ৩ —

সন্ধ্যাবেলা কাঞ্চন পিয়ালের কথামত তাদের বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হোল। বেহারাকে দিয়ে খবর পাঠাবার কিছুক্ষণ পরেই পিয়াল বেরিয়ে এসে তাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে বলল—"আরে তুই। আমি ভেবেছিলুম আর কেউ হবেন বা! আচ্ছা পাজী হয়েচিস্ তো—উপরে না গিয়ে বেহারাকে দিয়ে খবর পাঠান হয়েছে—শীগগির উপরে চল—" বলে তাকে টান্‌তে টান্‌তে উপরে নিয়ে গেল।

দোতালায় তাদের ড্রয়িং-রুমে কাঞ্চনকে বসিয়ে পিয়াল চীৎকার করে ডাক্‌ল—"মা, কাঞ্চন এসেচে—"

পিয়ালের ডাক শুনে হেমাঙ্গিনী পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কাঞ্চন দেখল তাঁর মুখের মমতা-মাখা লাবণ্য আজও তেম্‌নি অম্লান হ'য়ে রয়েছে, শান্ত নয়ন দুটী করুণার আভায় স্নিগ্ধ। সাত বছর পূর্ব্বে হেমাঙ্গিনী যেমনটী ছিলেন, এখনও ঠিক তেমনিই আছেন। কাঞ্চন নত হ'য়ে তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় নিতেই, তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় একটী স্নেহাশীষ চুম্বন ঢেলে দিলেন।

একটু খানি মিষ্টি হেসে তিনি বল্‌লেন—"কাঞ্চন এম্‌নি করেই কি মাসিমাকে ভুলে যেতে হয় রে?"

কাঞ্চন একটু লজ্জিত হ'য়ে বল্‌ল—"না, মাসিমা, আমি ভেবেছিলুম হাজারিবাগের ঠিকানায় আপনাদের একখানা চিঠি লিখব, কিন্তু আজ হঠাৎ পিয়ালের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হ'য়ে গেল। আপনারা যে কলকাতায় চলে এসেচেন আমি তা' জানতুম না—"

হেমাঙ্গিনী বললেন—"হ্যাঁ, পিয়ালের মুখে সব কথা শুনলুম। তোর বাবা ভাল আছেন?"

কাঞ্চন বলল—"কিছুদিন আগে ঠাণ্ডা লেগে তাঁর বুকের সেই ব্যথাটা আবার বেড়েছিল, কিন্তু এখন অনেকটা কমে গিয়েছে—আপনারা হঠাৎ কলকাতায় চলে এলেন কেন মাসিমা?"

হেমাঙ্গিনী বললেন—"তোরা কলকাতায় চলে আসবার পর, আমাদের আর হাজারিবাগে থাকতে ভাল লাগত না—প্রায় আট বছর পাশাপাশি থেকে কেমন একটা মায়ার বাঁধনের সৃষ্টি হয়েছিল। আর চারুর সঙ্গে সেই তো আমার শেষ দেখা, তাই সকলে মিলে কল্‌কাতায় চলে এলুম—" বিগত দিনের সুখের স্মৃতি মনে পড়াতে হেমাঙ্গিনীর নয়ন-পল্লব আর্দ্র হ'য়ে উঠল। একটু পরে "তোরা বসে গল্প কর্‌—আমি গিয়ে চা'টা পাঠিয়ে দিই—" বলে তিনি অন্দরে চলে গেলেন।

একটা মার্ব্বেল পাথরের ত্রিপদী টেবিলের ওপর একখানা ফোটো ছিল। কাঞ্চন সেখানা মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস্ করল—"এখানা হাজারিবাগের সেই শাল বনের ছবি, না রে পিয়াল?"

পিয়াল বলল—"হ্যাঁ, আর ওই ঝর্ণাটার নাম দিয়েছিলুম আমরা—চঞ্চলা। দুপুরবেলা সুজাতা, তুই আর আমি এই তিনজনে মিলে পাতার নৌকো গ'ড়ে ঝর্ণার জলে ভাসিয়ে দিতুম—মনে পড়ে?"

কাঞ্চন হেসে বলল—"নিশ্চয় মনে পড়ে। সে সব দিনের কথা কোনোদিন ভুলব না—" এমনি সময় ফুলপাতা আঁকা একটা জাপানী কাঠের ট্রে দু'হাতে ধরে সুজাতাকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে কাঞ্চন চুপ করল। সেই ট্রে'র ওপর সাজানো ছিল চায়ের সরঞ্জাম, কেক্, আরও নানারকম খাবার।

পিয়াল সুজাতার হাত থেকে ট্রেখানা নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল।

আজ সুজাতার পরণে একখানি টক্‌টকে লালপাড় সাদা শাড়ী আর একটী বাদামী রঙের ব্লাউস; তার পিঠের ওপর আজ বেণী দুলছিল না—কালো রেশমের মত চুলগুলি এলো হ'য়ে ছিল।

সুজাতার সমস্ত ভঙ্গিমাটুকু কাঞ্চনের চোখে একটী সুন্দর সুষমাময় হ'য়ে দেখা দিল। সে আজ দেখল, সুজাতা আর ন' বছরের সেই চল-চঞ্চলা বালিকাটি নেই, আসন্ন যৌবনের

লাবণ্যে তার নিটোল কিশোর তনুলতাটী অপরূপ শ্রী-মণ্ডিত হ'য়ে উঠেছে—প্রথম শরতের পূর্ণ-সলিলা তটিনীর মতই।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর পিয়াল বলে উঠল—"একি সকলে মৌনব্রত অবলম্বন করলে কেন? কিরে সুজাতা, আজকে তুই কাঞ্চনকে চিন্‌তে পারছিস্ না, না-কি?"

কেমন একটা লজ্জার তরঙ্গ এসে কাঞ্চন আর সুজাতার মুখের কথা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এইবার সুজাতা তার পাতলা ঠোঁট দু'খানি হাসিতে রঞ্জিত করে বলল—"ভাল আছেন কাঞ্চনদা?"

কাঞ্চন বলল—"হ্যাঁ, তোমাদের খবর ভাল তো? তুমি বোর্ডিং ছেড়ে দিলে না-কি?"

সুজাতা বলল—"পিসীমারা যখন কলকাতায় চলে এলেন তখন আর বোর্ডিংএ থেকে কি লাভ? সেই জন্যে বোর্ডিং ছেড়ে দিলুম—"

সুজাতা দু' পেয়ালা চা তৈরী করে কাঞ্চনকে আর পিয়ালকে দিল। কাঞ্চন কাপে একটা চুমুক দিয়ে মৃদু হেসে বলল—"আর একটু চিনি দিলে ভাল হোত—"

পিয়াল উচ্চহাস্য করে সুজাতাকে বলল—"কাঞ্চনের চায়ে চিনি দিস্ নি? খুব অতিথি-সৎকার করছিস তো—"

বেচারী সুজাতার গালদুটী সরম-রাগে রঙিন হ'য়ে উঠল; তাড়াতাড়ি সে দু' চামচ চিনি কাঞ্চনের কাপে ঢেলে দিল।

খাবারের প্লেটের দিকে তাকিয়ে কাঞ্চন বলল—আমাকে দেখলে কি দুর্ভিক্ষের দেশের লোক বলে মনে হয়? এতগুলি খাবার খেলে পরে বাড়ীতে গিয়ে রাত্তিরে খাওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিতে হবে—"

সুজাতা বলল—"না, না, সব খেয়ে ফেলুন—কিছু ফেলে রাখলে পিসীমা বড় রাগ করবেন—"

পিয়ালের সবল হাতের একটা বিশেষ উপহার কাঞ্চনের পিঠে সশব্দে এসে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিয়াল বলে উঠল—"আচ্ছা, আচ্ছা, তোর ওই মহিলা-সুলভ ন্যাকামি রেখে দে—তোর বাড়ীর খাবার আমি গিয়ে খেয়ে আসব'খন, নষ্ট হবে না—"

এদিকে কখন যে নিবিড় ব্যথার মত কাজল-ঘন মেঘপুঞ্জে আকাশের বুক ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে আর বিরহী শ্রাবণের অশ্রু-বারিধারা ঝরতে সুরু হয়ে গেছে, তা' কেউ টের পায় নি।

সহসা বাইরের পানে দৃষ্টি যেতেই কাঞ্চন বিস্মিত স্বরে বলে উঠল—"একি বৃষ্টি ঝরচে যে! মুস্কিলে ফেললে দেখছি—"

পিয়াল বলল—"তা তোর অত ভাবনা কিসের? তুই তো আর জলে পড়িস্ নি—"

কাঞ্চন হেসে বলল—"আপাততঃ সে আশঙ্কা নেই বটে, কিন্তু আর কিছুক্ষণ এইভাবে বৃষ্টি ঝরলেই রাস্তায় জল জমতে বেশী দেরী হবে না—" তারপর ঘরের কোণে অর্গ্যানটার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সুজাতাকে বলল—"ততক্ষণে তুমি বর্ষা রাতের গান সুরু করে দাও সুজাতা—"

সুজাতা অর্গ্যানের সুমুখে টুলটার ওপর বসে গ্রীবা ফিরিয়ে জিজ্ঞেস্ করল—কোনটা গাইব?"

কাঞ্চন বললে—"তোমার অভিরুচি—"

সুজাতা খানিকটা আপন মনে বাজিয়ে শেষে গাইল—

"ওগো আমার শ্রাবণ মেঘের খেয়া তরীর মাঝি
অশ্রু ভরা পূরব হাওয়ায় পাল তুলে দাও আজি—"

বৃষ্টি তখন ধরে গিয়েছিল, গানের রেশটুকু বাদল-বাতাসে কেঁপে কেঁপে বেড়াচ্ছিল।

বিদায় নেবার সময় হেমাঙ্গিনী বললেন—"সময় পেলেই এখানে চলে আসিস্ কাঞ্চন—" আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাঞ্চন উঠে পড়ল। পিয়াল আর সুজাতা তাকে সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিতে এসেছিল। রাস্তায় বেরিয়ে কাঞ্চনের অবাধ্য চোখদুটো ফিরে চাইতেই দেখল আরতি প্রদীপের স্নিগ্ধোজ্জ্বল শিখার মত সুজাতার আঁখিদুটী তারই যাবার পথে জেগে রয়েছে·····

—৪—

কাঞ্চন পিয়ালদের ড্রয়িংরুমে প্রতি সন্ধ্যায় নিয়মিত হাজিরা দেয়। সন্ধ্যাবেলাটা সেখানে বেশ আনন্দেই কেটে যায়। নানা প্রসঙ্গের আলোচনায়, হাসি-গল্পের স্রোতে আর সুজাতার সুললিত কণ্ঠের গানের ঝঙ্কার তাদের সান্ধ্য-মজলিশটা ভরপুর হ'য়ে থাকে।

সুজাতার কলহাসি, স্নিগ্ধ চাহনি, রূপের জ্যোতিঃ সুরার

নেশার মত কাঞ্চনকে মাতাল করে তুলেছিল। তার ফলে যৌবন বসন্তের সবুজ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের প্রাণের স্বর্ণ সিংহাসনে একদিন এই আসন্ন-যৌবনা কিশোরীটির প্রেমের অভিষেক হ'য়ে গেল।

নিভৃত অবসরে মন তার স্বপ্নের মায়াপুরী রচনা করে—রঙ তার ইন্দ্রধনুর মত রঙিন।

সেদিন বাতায়ন পথে উৎকণ্ঠিত দুটী আঁখির প্রদীপ জ্বেলে কে জানে কার প্রতীক্ষায় সুজাতা বসে ছিল। ছাতের টবের নতুন-ফোটা যুঁই, রজনীগন্ধার সুরভি উপহারটুকু সন্ধ্যার বাতাসে ভেসে আসছিল। শুক্ল সন্ধ্যার চাঁদের আলোয় বসে সুজাতা ভাবছিল—এত দেরী কেন আজ?

এমনি সময় সিঁড়িতে একটী পরিচিত জুতোর শব্দ ধ্বনিত হ'য়ে উঠতেই সুজাতার বুকের রক্ত চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে হাস্য-বিকশিত মুখে ঘরে ঢুকল কাঞ্চন। সুজাতা অভ্যর্থনার সুরে বলে উঠল—"আসুন কাঞ্চনদা'—"

কাঞ্চন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করল—"পিয়াল কোথায়?"

সুজাতা বলল—"ছোড়দা কোন বন্ধুর বাড়ীতে টেনিস্-ম্যাচ খেলতে গ্যাছে—ফিরতে রাত হবে বোধ হয়।"

টেবিলের ওপরকার 'রিডিং-ল্যাম্পের' মৃদু শিখাটা উজ্জ্বল করে দেবার জন্যে সুজাতা হাত বাড়াতেই কাঞ্চন বলে উঠল—"থাক্, থাক—ওটা জ্বেলে এমন সুন্দর জ্যোৎস্নাকে ঘর থেকে নির্ব্বাসিত করো না—তার চেয়ে তুমি অর্গ্যানে এসে বোস দিকি—"

সুজাতা 'নব-গীতিকার' পাতা উল্‌টে অর্গ্যানের সুরের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইল—

"দীপ নিভে গেছে মম নিশীথ সমীরে
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে।

এ পথে যখন যাবে
আঁধারে চিনিতে পাবে

রজনীগন্ধার গন্ধ ভরেছে মন্দিরে।

আমারে পড়িবে মনে কখন সে লাগ
প্রহরে প্রহরে আমি গান গেয়ে জাগি।

ভয় পাছে শেষ রাতে
ঘুম আসে আঁখি পাতে

ক্লান্তকণ্ঠে মোর সুর ফুরায় যদিরে।"

জানলা দিয়ে এক ঝলক্ রূপোলি জ্যোৎস্না এসে সুজাতার মর্ম্মর প্রতিমার মত পুরন্ত মুখখানিতে শুভ্র সুষমা মাখিয়ে দিচ্ছিল আর কাঞ্চন বিমুগ্ধ নয়নে এই সুরপরীর মুখের পানে চেয়ে চুপ করে বসে ছিল।

গানটা আর একবার ফিরে গেয়ে সুজাতা থামল। ঘরের নীরব নিস্তব্ধতা সুরের ঝঙ্কারে বীণার তারের মত কাঁপছিল। সুজাতা চপল হাসির লহরী তুলে বলে উঠল—"আপনার আবার কি হোল কাঞ্চনদা'? মৌনী হ'য়ে পড়লেন কেন?"

হঠাৎ কাঞ্চন কম্পিত স্বরে বলে উঠল—"একটা কথার সত্যি উত্তর দেবে সুজাতা?" তার স্বরে অবরুদ্ধ আবেগ ফুটে বেরুচ্ছিল। কাঞ্চনের আবেগময় কণ্ঠস্বর শুনে সুজাতার কপালে চন্দন-লেখার মত স্বেদবিন্দু ফুটে উঠল। কি কথা বলতে চায় সে? কি কথা?...সে ব্রীড়ারুণ মুখে আঁচলটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল—"কি বলুন—"

কি ভেবে কাঞ্চন বলল—"না থাক্—" পরক্ষণেই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কাঞ্চন চলে যাবার পর সুজাতা তেমনি চিত্রার্পিতের মত স্তম্ভিত হ'য়ে বসে রইল। চাঁদের আলোয় তার আঁখির তটে হীরের মত চকচক্ করছিল—দু' ফোঁটা অশ্রু...

—৫—

বেলা আটটা বাজে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাঞ্চন নিবিষ্ট মনে খাতায় কি লিখছিল।

প্রভাত-রৌদ্রের হেমাভ কিরণে ঘরখানা প্লাবিত হ'য়ে গেছে।

এমনি সময় দরজার সামনে পিয়াল আবির্ভূত হোল। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে সহাস্যে বলে উঠল—"ইস্, বেজায় সুবোধ বালক হ'য়ে পড়েছিস্ দেখছি—"

কাঞ্চন তার দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল—"বোস্—কতক্ষণ এসেচিস্ জানতেই পারি নি—"

পিয়াল চেয়ারে বসে বললে—"বেশীক্ষণ নয়। তারপর

কাঞ্চনকুমার আজ তিন চারদিন ধরে বেমালুম ডুব মেরেচ কেন বল তো ? মা বললেন, একবার কাঞ্চনদের বাড়ীতে গিয়ে দেখে আয় তার কোন অসুখ বিসুখ করল কি-না। এখন দেখচি মার আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক—"

কাঞ্চন তাড়াতাড়ি একটা কৈফিয়ৎ জুটিয়ে দিল—"কলেজে শীগ্‌গির একটা পরীক্ষা হবে কি-না—তাই এ কয়দিন পড়ার চাপের চোটে তোদের বাড়ীতে যাবার সময় পাই নি ভাই—"

পিয়াল কণ্ঠস্বরে তরল বিদ্রূপ মিশিয়ে বলল—"তাই তো ! পাঠে তোর এমনই প্রবল অনুরাগ যে, বিকেলবেলায় একঘণ্টা বেড়াতে বেরুলে পড়ার ক্ষতি হবে ?"

কাঞ্চন একটু বিব্রত ভাবেই বলল—"জানিস্ তো সারা বছর ফাঁকি দেওয়াই আমার স্বভাব—শেষে পরীক্ষার সময়—"

পিয়াল বাধা দিয়ে বলে উঠল—"যাক্ গে ও সব কথা ! একটা খবর দিতে এসেচি শোন্—আসছে আশ্বিনেই সুজাতার বিয়ে—" পকেট থেকে একখানা গোলাপী রঙের খাম বের করে সে কাঞ্চনের হাতে দিল। এক কোণে তার অগ্নি-শিখার মত জলন্ত রক্তাক্ষরে লেখা—শুভ বিবাহ !.. কাঞ্চনের হাতখানা হঠাৎ থর থর করে কেঁপে ওঠায় খামখানা মাটিতে পড়ে গেল···হেমন্ত-সন্ধ্যার মত একটা বিশ্রী পাণ্ডুর ছায়া তার মুখের দীপ্তিটুকু নিভিয়ে দিয়ে গেল··

পরমুহূর্ত্তেই কাঞ্চন অপ্রতিভ হ'য়ে তাড়াতাড়ি খামখানা কুড়িয়ে নিয়ে খুসীর সুরে জিজ্ঞেস করল—"সত্যি নাকি ? পাত্রটী কেমন রে ?"

পিয়াল বলতে লাগল—"পাত্রটী আমারই এক বন্ধু ; জার্ম্মাণীতে 'ইন্‌জিনিয়ারিং' শিখতে গিয়েছিল—সম্প্রতি সেখান থেকে পাশ করে ফিরে এসেচে। বাপ তার 'রিটায়ার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট'...আর অসিতের নাকি সুজাতাকে ভারি পছন্দ... আচ্ছা চললুম তা হ'লে—আমায় আবার একগাদা চিঠি বিলি করতে হবে—"

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পিয়াল জিগ্যেস করল—"সন্ধ্যাবেলা আজ আমাদের ওখানে যাচ্চিস্ তো কাঞ্চন ?"

উত্তর এল—"সময় পেলেই যাব—"

পিয়াল চলে যাবার পর কাঞ্চন পাথরে-গড়া অচল মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। কেবল একটা উৎসাহহীন শিথিল শ্রান্তি তার সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেলছিল—চেয়ার থেকে ওঠবার উদ্যমটুকুও যেন আর ছিল না

কলমটা তুলে নিয়ে সে নোট লেখায় আবার মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করল—কিন্তু ভাল লাগল না...একটা তিক্ত বিস্বাদে তার মন ভরে উঠেছিল। কলমটা রেখে দিয়ে সে বাইরে সৌম্য শরতের অরুণোজ্জ্বল প্রভাতের পানে তাকিয়ে রইল। আকাশের স্নিগ্ধ নীলিমার মাঝে একটা কালো মেঘের টুকরো মন্থরগতিতে ভেসে যাচ্ছিল - কাঞ্চনের মনে হোল, তারও জীবনের ধারা বদলে গিয়ে ঠিক ওই কালো মেঘখণ্ডের মতই বিশ্রী খাপছাড়া হ'য়ে গেছে !···

টেবিলের ওপরে গোলাপী খামটা তার দিকে চেয়ে যেন নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করছিল !···সেই উচ্চ-শিক্ষিত ধনী-যুবার পাশেই সুজাতার যোগ্য স্থান—কোন্ সাহসে সে তার এই দীনতার মাঝখানে তাকে বরণ করে আনবে ?···তার হৃদয়ের গোপনে যে ব্যাকুল বাসনা ফল্গুধারার মত লুকিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে, তা' প্রাণের মাঝে লুকানোই থাক্···

সুজাতা যে সুখী হ'তে চলেছে—এইটুকুই কেবল তার পরম সুখ।

— ৬ —

···কাল-বৈশাখীর ঝড়ের সন্ধ্যায় সহসা শুষ্ক পত্রের ধ্বজা উড়িয়ে ঘূর্ণী হাওয়ার তাণ্ডব সুরু হ'য়ে যায়, তিমির ঘন মেঘপুঞ্জে আকাশ ছেয়ে আসে, ক্ষ্যাপা-খেয়ালী মহেশ্বরের মত রুদ্র ঝঞ্ঝা ধরণীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে···আবার দেখতে দেখতে প্রকৃতির খেয়ালে দুরন্ত ঘূর্ণী বাতাস নিদ্রাতুর শিশুর মতই শান্ত হ'য়ে আসে, মেঘ কেটে গিয়ে শুভ্র মাধবী-জ্যোৎস্না মায়ের স্নিগ্ধ স্নেহাশীষ ধারার মত বসুন্ধরাকে প্লাবিত করে ফেলে···

মানুষের জীবন-আকাশেও প্রতিদিন ঠিক এম্‌নি অপরূপ আলো-আঁধারির খেলা চলছে। রহস্যের চির-দুর্ভেদ্য যবনিকার ওপরে যে ভাগ্য-নিয়ন্তা বসে আছেন, তারই খেয়ালে যে প্রতি পলে কত লোকের জীবন-ধারা সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে, কে তার খবর রাখে।

কলেজ থেকে সেদিন ফিরে এসে কাঞ্চন দেখলে তার

বাবার ঘরে রাজশেখরবাবু বসে আছেন। ঘরের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় সে শুধু শুনতে পেল, রাজশেখরবাবু উত্তেজিত স্বরে কি সব বলছেন।

সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করে সে নিজের ঘরে গিয়ে জামা-কাপড় বদলাতে প্রবৃত্ত হ'ল। অল্পক্ষণ পরেই চাকর এসে জানাল—কর্ত্তাবাবু একবার ডাকছেন। তাঁদের আলোচনার মাঝে কাঞ্চনের উপস্থিতির যে কি প্রয়োজন, তা' বুঝতে না পারলেও সে বলল—"বল্ গে যাচ্ছি—"

গেঞ্জিটা গায়ে দিয়ে সে আস্তে আস্তে তার বাবার ঘরে ঢুকে জিগ্যেস করল—"ডেকেছেন আমায় ?"

রাজশেখরবাবু বললেন—"এই যে কাঞ্চন। হ্যাঁ, তোমায় একবার ডেকে পাঠিয়েছিলুম—তা' বোসো—"

কাঞ্চন খাটের একপাশে বসল। প্রশান্তবাবু তখন তাঁর স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে যা' বললেন তার মর্ম্ম এই—

অসিতের সঙ্গে সুজাতার বিয়ের প্রস্তাব ওঠায়, রাজশেখর বাবু এ বিবাহে মত দিতে আপত্তি করেন নি, কারণ একে জার্ম্মাণী-ফেরত, তার ওপর ম্যাজিষ্ট্রেট-সন্তান—কাজেই অসিতকে তিনি দুর্লভ সুপাত্র হিসাবে গণ্য করেছিলেন।

কিন্তু বিয়ের সমস্ত আয়োজন যখন প্রস্তুত, এমন কি নিমন্ত্রণের চিঠি পর্য্যন্ত বিলি হ'য়ে গেছে, তখন হঠাৎ রাজশেখরবাবু খবর পেলেন যে অসিত বিবাহিত—এবং তার স্ত্রী বর্ত্তমান।

বিয়ের দু'দিন পূর্ব্বে অসিতের শ্বশুর এসে রাজশেখর বাবুকে সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্লেন। অসিতের পূর্ব্ব-স্ত্রী সুনীতি নাকি সুজাতারই দূর সম্পর্কের এক বোন। বিয়ের রাতে তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে অসিতের বাবার সঙ্গে তার শ্বশুরের বাদানুবাদের ফলে প্রতাপান্বিত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সদর্পে প্রতিজ্ঞা করেন যে, অমন নীচ-দরিদ্র বংশের পুত্রবধূকে তিনি কখনও গ্রহণ করবেন না।

এই সংবাদ পাওয়ার পর রাজশেখরবাবু এ বিবাহ ভেঙ্গে দেওয়াই স্থির করেছেন। একটী বালিকার মুকুলিত জীবন যে বিনা অপরাধে ব্যর্থ করে দিয়েছে, সেই হীন পশু-প্রবৃত্তি লোকটার ঘরে কেমন করে তিনি সুজাতাকে স্বেচ্ছায় সমর্পণ করবেন ? হোক্ না সে ম্যাজিষ্ট্রেট...

কিন্তু এখন তাঁরা কাঞ্চনকেই পাত্ররূপে মনোনীত করেছেন। বিয়ের সবই আয়োজন তো প্রস্তুত, কেবল কাঞ্চনের সম্মতির অপেক্ষা।

কাঞ্চন যেন স্বপ্নের ঘোরে কথাগুলি শুনছিল। নিজের শ্রবণশীলতার বিষয়ে সে কিছুতেই সন্দেহমুক্ত হ'তে পারছিল না—কোনমতে তার সম্মতি জানিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

...দীপালোকিত সভায় যখন মৃদু-কম্পিত মৃণাল-শুভ্র একখানি হাত ধরতে হোল, কাঞ্চন তখন সত্যই কেমন যেন বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিল।

বিয়ের পর বর-বধূ বেশে কাঞ্চন আর সুজাতা হেমাঙ্গিনীকে প্রণাম করতেই আন্তরিক স্নেহের প্রভায় তাঁর মুখখানি সমুজ্জ্বল হ'য়ে উঠল—দু'জনের মাথায় হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললেন—"তোদের এ শুভ মিলন-পথ মঙ্গলালোকে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক—। আজ যে চারুর মুখখানি কিছুতেই ভুলতে পারছি নে কাঞ্চন—" আজ নয়ন-কোণ হ'তে দু' ফোঁটা অশ্রু নির্ম্মাল্যের শেফালির মত তাদের মাথায় ঝরে পড়ল।

পিয়াল এসে সশব্দে কাঞ্চনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠল—"হ্যালো কাঞ্চন···'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্ টু ইউ।' কেবল একটা দুঃখ এই যে নিমন্ত্রণের চিঠিতে কাঞ্চন মিত্রের জায়গায় অসিত বোসই র'য়ে গেল। এ হচ্ছে—বুঝলি কিনা—প্রজাপতির খেয়াল—"

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

—পাঁচ—

নীরব নিশীথ। আঁধার চতুর্দ্দিকে আঁধারে ঘেরিয়াছে... কালো কালো মেঘগুলির বুকের পরে অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র অমলকে যেন বিদ্রূপ করিয়া মিটিমিটি হাসিতেছিল। অমল চোখের উপর হাত রাখিয়া বাগানের মধ্যে একখানি লোহার বেঞ্চের উপর শুইয়া, গাড়ী হইতে নামা আরম্ভ পর্য্যন্ত, আর এই কিছুক্ষণ আগে ঘটিয়া যাওয়া একটা অস্বস্তিকর অজানা ব্যাপারগুলি মনের মধ্যে শতবার নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। অমলের বুক ফাটিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল—উঃ পৃথিবীর নারী জাতি কি এত স্বার্থপর—এত নিষ্ঠুর। তবে নারীকে স্নেহ স্বরূপিণী বলে কেন? তবে লোকে নারীকে এত মমতাময়ী বলিয়া উচ্চ আসন দিয়াছে কেন? কই তাহাদের হৃদয়ে তো দয়া-মায়ার লেশমাত্রও নাই। নীতি নীতি···তুমিও লোকের প্রাণে কঠিণ বজ্র হানিতে শিখিয়াছ—কোথায় তোমার সেই কারুণ্যভরা একান্ত নির্ভরশীল কোমল অন্তকরণটি। হায় গো জাননা তুমি—যে তিল তিল করিয়া আমার অন্তরের মধ্যে কেমন করিয়া বাসা বাঁধিয়া বসিয়াছ, চিত্তের আশা আকাঙ্খা তোমার কাছে জানাইতে গেলাম—অকরুণ হয়ে তুমি মুখ ফিরাইলে—নির্দ্দয়া তুমি আমার প্রতি ফিরিয়াও চাহিলে না—তোমারও কঠিন বুকের মধ্যে আমার স্থান নাই—তবে কি সে স্থান অপরের অধিকৃত হইয়াছে... তাই কি! উঃ তবে একপক্ষে আমাকে বড়, বড় মুক্তি দিয়াছ—তোমার সহায়তায় আমার এতটুকুও কর্ম্ম সফল হইত না। অমল ভাবিয়া শিহরিয়া চোখ মুদিল···আঃ এই সব হিন্দু রমণী সন্তানের জননী...মাতৃমূর্ত্তি ইহাদেরই নিকট হইতে আমরা আবার সাহায্য চাহিতেছি! এই সমস্ত বাহ্যিক এটিকেটের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ স্ত্রীলোকেরা এঁরাই করিবেন মাতৃপূজা! যাঁহাদের একটু প্রাণ খুলিয়া হাসিলে সভ্যতার কঠিন নিয়ম ভঙ্গ হয়, যাঁদের চাল-চলন হাসি কথা সবখানিই পরের নিকট হইতে ধার করা—এঁরাই আমাদের পুরাকালে শক্তির অংশ স্বরূপা আর্য্যনারী! অমলের হাসি আসিল ভাবিয়া. যে ইহারা যেন দম দেওয়া কলের পুতুল। চাবি ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দাও খুব খানিক ফর ফর করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে—কিন্তু কাজ চেওনা ইহাদের নিকট তাহা হইলে সর্ব্বনাশ, কেবল সেই কালো মেয়েটি...সে যেন একরাশী বিলাতী ফুলের তোড়ার মধ্যে একটি আধফুটন্ত যুঁই বর্ণে না হউক গন্ধটি বোধ হয় তেমনিই স্নিগ্ধ প্রাণমুগ্ধকারী...আঃ, সে যেন ওদের দলভ্রষ্ট হইবার জন্য পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল। কিন্তু ওরকম একটি কি দুইটি শান্তির প্রলেপে দেশের এত বড় গভীর ক্ষতি পূর্ণ হইবে না চাই ঐ রকম মাতৃমূর্ত্তি প্রতি ঘরে ঘরে। অমল শান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিল। পরে পকেট হইতে ক্ষুদ্র একখানি আলেখ্য বাহির করিয়া ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া অস্পষ্টস্বরে আনমনে বলিয়া উঠিল—"বলে দাও আমায় দেবতা—যেন কর্ত্তব্যভ্রষ্ট না হই, যে নিষ্কাম ব্রতের অনুষ্ঠান তুমি দেখাইয়া দিয়াছ···যেন তোমার আশীর্ব্বাদে সেই মহাব্রতের হোমানলে আমার তুচ্ছ প্রাণটুকু আহুতি দিয়া ধন্য হতে পারি।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া অমল একবার উন্মুক্ত গগনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—সহসা সেই ঘন অন্ধকারের মধ্য হইতে জোনাকীর আলোর মত কী একটা মৃদু আলোক দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নির্ভীক হৃদয় অমল সেই আলোর রেখা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইল। ছোট্ট একটা কামিনী গাছের অন্তরালে বসিয়া আলোক সেই মধ্য রাত্রে সিগারেট টানিতেছিল। অমল নিস্তব্ধ পদসঞ্চারে তথায় উপস্থিত হইয়া আলোকের পৃষ্ঠে হাত রাখিল। অতর্কিত আক্রমনে আলোক চমকিয়া ফিরিয়া বলিল—"ওঃ 'গড্'

মিঃ চৌধুরী—আপনাকে যে এইখানে এমন অবস্থায় দেখব আশা করিনি—ভালই হলো আমার সঙ্গী মিলে গেল—বসুন এই খানটায় আঃ কী ঠাণ্ডা বাতাস, নিন্ একটা সিগার ধরুন।"

অমল মৃদুকণ্ঠে ধন্যবাদ দিয়া বলিল—"ওটা আপনিই রাখুন—আমি ও সমস্ত খাই না—"বলিয়া অমল আলোকের পাশের জায়গাটিতে বসিয়া পড়িল। আলোক বলিল—"বলেন কী ..এই নূতন যুগে আপনি এমন জিনিষ খান্না? আশ্চর্য্য, ভারী আশ্চর্য্য…কিন্তু আমার এ চাই-ই, না হলে এক মিনিট চলে না" —

অমলও হাসিয়া উত্তর দিল—"তা হতে পারে...কিন্তু শুধু ঠাণ্ডা বাতাস উপভোগ কর্ব্বার জন্তে যে এত রাত্রে নিরালায় বসে সিগারেট ধ্বংস কচ্ছেন না—এ আমি আপনার মুখের ভাব দেখেই বেশ বুঝতে পাচ্চি।"

আলোক সিগারেটটা ছুঁড়িয়া পুনরায় সিগার কেস্ হইতে আর একটি সিগারেট তুলিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিয়া বলিল—"ঠিক ধরেছেন মিঃ চৌধুরী আপনার অনুমান ঠিক—আমি একটা বিষম সমস্যায় পড়ে গেছি।"

অমল কোমলস্বরে বলিল—"কি আপনার সমস্যাটি বলুনতো? আচ্ছা তার আগে একটা কাজ করুন তো পরে ও সমস্যার মীমাংসা হবে।"

"কি কাজ মিঃ চৌধুরী?"

"না এমন বিশেষ কিছু না—দেখুন আলোকবাবু—আমরা বাঙ্গলার ছেলে বাঙ্গালী, যার তার কাছ হ'তে ঐ মিঃ চৌধুরী ডাক শুনে শুনে অধৈর্য্য হ'য়ে পড়েছি—অবশ্য বিলেতের কথা আলাদা—কিন্তু জ্বরের সময় তেতো 'কুইনাইন' গলাধঃকরণ কর্ত্তে হয় বলে কি সুস্থ অবস্থায় সেটা ভাল লাগে—তেমনিই আজ আপনার মত একজন শিক্ষিত স্বদেশীয়ের মুখে আমার নিজের মায়ের দেওয়া বাঙ্গলা নামটি শুন্তে বড় ইচ্ছে করে।"

আলোক অপ্রতিভ হইয়া বলিল—"মাপ করুন অমলবাবু, হ্যাঁ তাহলে আমার সে কথাটা শুনবেন কি?"

অমল আলোকের কাছে সরিয়া বসিয়া বলিল—"নিশ্চয়ই শুনব বলুন?"

"আচ্ছা তখন যে আপনি বল্লেন—দেশের হিতে প্রাণ দেবার মত লোক ভারতে মুষ্টিমেয় গেলে, এ কথাটা কি সত্য?"

"সত্য না তো কি ভাই, কই তেমন লোকতো আমি সংখ্যাতীত দেখতে পাই নে।"

আলোক সহসা বলিয়া বসিল "অমলবাবু আপনার অনুমতি পেলে আমি আপনার কিছুও সাহায্য কর্ব্বার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে নামতে পারি।"

অমল একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল—সে যন্ত্রবৎ বলিল—"সে কী আপনি! একি সম্ভব—আলোকবাবু? আজ রাত্তিরে যে আপনার মুখে অন্য ধরণের কথা শুনেছি। না না, এ বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

হ্যাঁ অমলবাবু আজ রাত্তিরে হয়তো আমি অন্য ধরণের কথা বলে থাকতে পারি—কিন্তু কি জানি আপনার ভিতরে কি শক্তি নিহিত আছে জানিনা—শুধু আপনার তেজোময় কথার মাধুর্য্যে মুগ্ধ, আকৃষ্ট আমি এই পথে নামলুম—বলুন অমলবাবু আমার দ্বারায় কি আপনি সামান্য উপকারটুকুও পেতে পারেন না?"

আলোকের স্বর যেন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া পড়িয়াছিল। আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া অমল পুলকভরা স্বরে বলিল—"কেন হবে না ভাই—তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্য পেলে আমি কৃতার্থ হয়ে যাব।" বলিয়া আলোককে বুকের মধ্যে জড়াইয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বলিল—"বল ভাই একবার বন্দেমাতরম্।"

দমকা বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে কাল মেঘের আড়ালে লুকান চাঁদের ক্ষীণ রশ্মিটুকু উভয়ের মুখের উপর লুটাইয়া পড়িল। আলোক আস্তে আস্তে বলিল—"কাল আমরা এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাব। বলুন দয়া করে একবার আমার বাড়ীতে যাবেন?"

অমল বলিল—"কাল, কাল বোধহয় আমিও এখানে থাকচি না।"

"কেন, তার মানে?"

অমল বলিল—"তার মানে আমার ডাক এসেছে ভাই, বোধহয় এই ভোরের ট্রেণেই আমাকে খুলনা যেতে হবে,

সেখানে শুনছি যে ম্যালেরিয়ায় সারা গ্রামটা উজাড় হয়ে যাচ্ছে। যাঁরা তার প্রতীকার কর্ত্তে পারেন—তাঁরা যে যার প্রাণ নিয়ে পালাতে পথ পাচ্ছেন না...ডাক্তার তো ভুলেও সে পথে চলেন না।...শুধু যারা অসহায় বৃদ্ধ, পঙ্গু, শিশু বা অনাথা স্ত্রীলোক, কেবল তারাই এখনও মরণের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ কচ্ছে। অথচ তারা নিজেরাই জানেনা মৃত্যুর সঙ্গে তাদের অসহায় প্রাণগুলি যে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়ে তুলেছে...তাতে জয়ী হতে পার্ব্বে কিনা! তার ওপর এ বছর অনাবৃষ্টিতে সমস্ত ফসল শুকিয়ে নষ্ট হ'য়ে গ্যাছে...সমস্ত গ্রামের লোকগুলি না খেতে পেয়ে ছট্‌-ফটিয়ে মরে যাচ্চে···তাই ভাবছি দেখি সেখানে গিয়ে একবার, যদি একটা প্রাণীকেও বাঁচাতে পারি।"

সুদূর পারের মরণাহত দুঃস্থ পরিবারদিগের কষ্টের কথা স্মরণ করিতে করিতে সরল-হৃদয় অমলের চোখ দিয়া দরদর করিয়া করুণার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। আলোক একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"কালকে আপনি চলে যাবেন অমলবাবু—কাউকে বলেন নি?"

"নাঃ, কি দরকার তাতে...তবে দেখি যদি অবসর পাই, তাহলে তাঁকেই বলে যাব—এ ভিন্ন আমার যাওয়ার কথা আর কেউ জানবে না—আমার যাওয়া আসাতে তো কারুর ক্ষতি বৃদ্ধি নেই।"

আলোক বলিল—"কাল ভোরে যাবেন বলছেন, কিন্তু ভোরের তো আর ট্রেণ নেই অমলবাবু।"

"নেই! বলেন কী?" বলিয়া অমল হাতে বাঁধা রিষ্টওয়াচটি দেখিয়া বলিয়া উঠিল—"উঃ এত রাত হয়ে গেছে। তাইতো সেটা যে চারটে পঁয়তাল্লিশে ছাড়ার কথা—এখনই তো হচ্ছে চারটে উনচল্লিশ··· আচ্ছা যাকৃগে সকালের দিকে যে কোন একটা ট্রেণ ধরলেই হবেখ'ন।"

"তাহলে কাল আপনি এখানে কিছুতেই থাকবেন না স্থির করেছেন?"

"হ্যাঁ ভাই, এখানকার সমস্ত যেন বিষাক্ত বলে ঠেকছে। বিশেষ এঁদের ব্যবহারে আমার মনতো একেবারেই টিকতে চাচ্ছে না। আচ্ছা আলোকবাবু, দাঁড়কাকের বর্ণতো ময়ূর পুচ্ছে ঢাকবার উপায় নেই তবে কেন এঁদের এই ব্যর্থ সজ্জা।"

আলোক সহসা আপন মনেই বলিয়া ফেলিল—"অমল বাবু কাল আমি আপনার মুখে এ রকম ধরণের কথা শুনলে বোধহয় চটতুম···কিন্তু কি জানি এখন আমারও এই সমস্ত আচার ব্যবহার গুলো বিসদৃশ ঠেকছে···আচ্ছা অমলবাবু, মিস্ চাটার্জ্জী তো আপনাকে—কি বলে···বেশ...ভাল,··· আর তার সাথে অনেকদিন আগে হতেই তো আপনার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ছিল—তবে এখন কেন তিনি মত দিলেন না?"

আলোকের এই কথাটায় অমলের ব্যথিত অন্তরটা নূতন আঘাতে টন্‌টন্ করিয়া উঠিলো। এক মুহূর্ত্ত পরে সে ভাবটা সামলাইয়া বলিল—"তিনি অমত করে আমাকে মুক্তি দিয়েছেন ভাই...সত্যি ও রকম স্ত্রী নিয়ে আমার মত অবস্থার লোকের সংসার করা দুঃসাধ্য! আমি চাইনা যে আমার স্ত্রী সামান্য বিলাসব্যসন নিয়ে মেতে থাকবে...ভাই স্ত্রীতো শুধু ভোগের সামগ্রী নয়...আমি চাই তাকে সংসারের শ্রীরূপে, শক্তিরূপে, জননীরূপে...সে এসে আমাকে শক্তিরূপে সাহায্য কর্ব্বে...পিছন হতে আমাকে উৎসাহ দেবে···যখন আমার কর্ম্মক্লান্তি আসবে। আমার সন্তানকে আদর্শ জননী রূপে শিক্ষা দিয়ে তাদের যথার্থ কর্ম্মী মানুষ করে গড়ে তুলবে। এই দেখনা আজই আমার শক্তি আছে সামর্থ্য আছে···অর্থ আছে...সে মনের আমোদে হেসে খেলে দিন কাটালো। কিন্তু পরে ভবিষ্যৎ কি কেউ বলতে পারে? ধর যদি আমার শরীর শক্তিহীন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে—যখন আমায় পয়সা দিয়ে চাকর দাসী রাখবার ক্ষমতা থাকবে না। তখন, তখন বোধহয় একমুঠো অন্নের আশায় লালায়িত হ'য়ে পরের দ্বারে হাত পাততে হবে? আর গৃহের লক্ষ্মী তখন আমার ড্রয়িং রুমে বসে অর্গেনের সঙ্গে তাল রেখে গান ধরবে—

"এসহে হৃদয় ভরা—এসহে পিপাসা হারা
এসহে আঁখি শীতল করা ঘনায়ে এস মনে।"

"কেমন এই তো?" বলিতে বলিতে অমল করুণভাবে হাসিয়া উঠিলো। পরে আলোকের হাতখানি ধরিয়া মৃদু

মৃদু স্বরে বলিল—"একদিক দিয়ে এই মুক্তির আনন্দে আমি এমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি—ঠিক খাঁচার পাখীর বাঁধন খুলে দিলে সে যেমন বাইরের মুক্ত হাওয়ায় বুকভরা সুখে নেচে ওঠে—তেমনি নিছক নির্ম্মল আনন্দ আজ আমি মনে প্রাণে অনুভব কর্চ্ছি ..আঃ এখন যেথায় ইচ্ছে চলে যাব ..পিছন হতে ডাক দেবার লোক আমার আর কেউ রইল না।"

অমল নীরব হইল। আলোক তাহার আবেগময় বাক্যোচ্ছ্বাসে বাধা দিল না। বোধহয় তাহার সে ক্ষমতা তখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল—সে শুধু নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল দেবতার সম্মুখে দীন ভক্তের মত। অমল পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"আলোক ভাই, তোমাকে আমি 'তুমি' বল্লাম বলে, হয়তো তুমি আমাকে কত কিনা ভাবছ, কিন্তু বলতে কি তোমার মত একটি স্নেহপরায়ণ সোদরের জন্যে প্রাণের মধ্যে দিনরাত ছটফট্ কর্ত্তো। প্রথম তোমাকে দেখেই আমার মনে হ'ল—বুঝি আমার কত দিনকার হারাণ ভাইটি আবার বুকের মাঝে ফিরে পেলাম। আলোক তুমি কি আমার পরে' রাগ করেছ ভাই ?"

"রাগ !" নত হইয়া আলোক অমলের পদধূলি লইয়া গাঢ়স্বরে বলিল—"রাগ! তাও আপনার পরে ?" না না অমলদা আমি এখন বড় দুঃখিত হচ্ছি এই ভেবে—যে আগে আপনার অন্তর না বুঝে শুধু শুধু আপনাকে কত অপমান করেছি।"

আলোকের অনুতপ্ত হৃদয়টি ঐ কথা কয়টিতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। অমল বিব্রত হইয়া পা সরাইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিল—"কর কি ভাই তুমি—কেন এত কুণ্ঠিত হচ্ছ ?"

"কিন্তু তুমি যে অলীক মোহের মায়া কাটিয়ে এত শীগ্গীর পরিবর্ত্তিত হয়েছ, এইটুকুই তোমার বিশেষত্ব! যাক্, এখন ভোর হয়ে আসছে কথায় কথায় সময় কেটে গেল, চল এইবার উঠে পড়ি।"

(ক্রমশঃ)

অভাবিত

[শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়]

কাঁচা-চামড়ার সঙ্গে পাড়ার হাওয়াটা বিষিয়ে উঠেছে। বৃষ্টি পড়চে ....মেটে ঘরখানার দাওয়া বরাবর বৃষ্টির ঘোলাটে জলটা ঠেলে উঠচে ;....কাজ কচ্চি...চামড়া পিটে চলেচি। বাইরে জল ঝরচে। যেন মাঝ রাতে বিছানায় পড়ে শুন্‌চি—ইঁট-খোয়ায় এব্ড়ো খেব্ড়ো পথ দিয়ে একটী অচেনা মেয়ে তা'র পায়ের ভারি ক'গাছা মল বাজিয়ে চলেচে .....

আমাদের এই ঘরটার ঠিক সুমুখটায় ঐ চালাটায় কাল রাতে একটী ছেলে আর মেয়ে এসে উঠেচে। আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে, এই লম্বা চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের দু'টীকেত একবারও হাসিমুখে 'কথা কইতে দেখলুম না! ছেলেটী তবু কয়েকবার সাধ্য-সাধনা করলে, কিন্তু গরবী মেয়ের মান আর ভাঙ্গল না।

তার চোখ দুটী আজকের এই অকাল-বরষার জলভার-নত রাত্রির আকাশেরই মত !

ওর সঙ্গে ভারি ইচ্ছে করচে সেধে কথা কইতে! সেও যে কথা কইবে, তারই বা ঠিক্ কি !

কাজে মন লাগচে না। রাত ত' অনেক হ'ল! ইচ্ছে হচ্চে শুয়ে পড়ে ঐ মেয়েটীর কথা ভারি দু'দণ্ড। শুকনো কাজ এত চিরদিনের জন্য রইল!

চামড়া পিটতে পিটতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম!

উঠলুম একেবারে যখন কাদা প্যাচ-প্যাচে র'কটার উপর সকালের রোদ এসে লুটোপুটি করচে! নাম শুনলুম, লছিয়া। লছিয়া আমার চামড়া-পেটা সরস করে তুলচে!

যমুনার সঙ্গে যে ছেলেটা এসেচে তার উপর আমার দয়া হয়। লছিয়ার মুখে সামান্য হাসিটুকুও সে ফোটাতে পারে না? এত অপদার্থ!

শেষ তা'র সঙ্গে কথা কইলাম! এত অভাবিত সে জীবন-গাঁথা তা'র! একদিন তা'কে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তোমার কাহিনী আমায় বলতে হ'বে!

পশ্চিমের এক ছোটখাট গাঁয়ের ছোট খাট এক দোষাদের ঘরে এই লছিয়ার জন্ম। বাপমার কোলে চোদ্দটা বছর সুখ দুঃখে তার কেটেচে। নীচ দোষাদের ঘরে জন্মালেও যৌবন তা'র সম্পদ সম্ভার থেকে তা'কে বঞ্চিত করলে না!

সেদিন একটা হাটবার। মকাই মড়ুয়া এমনি গোটা-কতক সে দেশী ফসল চেঙারিতে বোঝাই করে লছিয়া খেত-ডিঙানো আঁকাবাঁকা পল্লী পথটা দিয়ে হাটের দিকে চলেছিল। সেই পথেই জমিদারদের বাড়ী।

প্রাসাদের এক নিভৃত অংশ থেকে হরিলাল লছিয়ার অপরিচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হ'ল। লছিয়া প্রথমদিন তা জানলেও না! ক্রমে সে বুঝলে, হরিলাল তা'র রূপমুগ্ধ। প্রত্যেক হাটবারে জমিদারের ছেলে হরিলাল সেই পথে কোনো না কোনো ছলে দাঁড়িয়ে থাকে—দোষাদের মেয়ে টুকরী মাথায় করে এগিয়ে যায় হাটের দিকে···কতদূর—সে ছেলেটা যায় মেয়েটার পিছনে পিছনে...কত—কতদূর। বুকে হাজার কথা ঠেলে উঠে—মুখ কিন্তু ফোটে না! খানিক দূর গিয়ে সে ফিরে আসে। লছিয়া হাটে যায়।

পাড়ার সবাই একদিন বল্লে সাবধান! লছিয়াকে আর হাটে যেতে দিও না! ও জাতকে বিশ্বাস নেই—তাছাড়া তোমার মেয়ের বয়েস এখন চোদ্দ।

হরিলাল আরও কতদিন এসে পথটার পাশে দাঁড়াল। কিন্তু হায় যার পদচিহ্ন দেখে চলা সে এলনা—চলা আর হ'ল না। 'নবেধ দিলে তা'র প্রিয়ার পায়ে বেড়ী পরিয়ে।

দিন যায়।...

এমনি সময় লছমন গিয়ে পৌছল সে দেশে। তাদের বিয়ে হ'ল। লছমন ধন্য হ'ল, এ বিবাহ যেন তা'র বহু সুকৃতির ফল। তবু লছিয়া তাতে সুখী হতে পারলে না। সে মুখ বুজে আপনাকে বঞ্চনা করেই চলল।

চেষ্টা সে করেছিল অনেক, শুধু ব্যর্থতাই বড় হ'ল! লছমনকে ছাড়িয়ে, তা'র স্বামীকে ছাড়িয়ে, লছিয়ার মন ঘুরে বেড়ায় সেই হাটে যাওয়ার ধূলি-ধূসর পথটার আশে পাশে। যেখানে সেই ভীরু লাজুক হরিলাল—সে তাকে ভুলতে পারলে না। তার প্রতিবাসী আত্মীয়েরা জানে সে অত্যাচারী সে কামুক! যমুনা জানে, আর জানে হাটে যাওয়ার আঁকা-বাঁকা পল্লী পথটা—সে কত ভীরু—সে কত লাজুক!

লছিয়া এখন যোড়শী; তরুণী ধরণী আজ তা'র চোখে ঊষর! বাহিরের পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ থেকে সে চির বিচ্ছিন্ন!

মানুষের গোপন মনটাই এমনি অভাবিত! তবু মানুষ তা'র ওপর কারিগরী না করে পারে না!

কবচের ফল

[শ্রীকালিদাস চট্টোপাধ্যায় বি এ]

(১)

দু'বার বি, এ, ফেল হবার পর স্থির হ'ল যে আমার দ্বারা আর লেখাপড়া হবে না। এই axiomatic সত্যটি যদি আমার থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাসের ফল দেখেই স্থির হ'ত তবে বাবারও অনেক পয়সা বেঁচে যেত আমারও হয়ত এতদিনে একটা যা হয় কাজকর্ম্ম হ'ত। যাই হ'ক আর কোন পথই দেখলুম না, বাবাকে বললুম ব্যবসা করব কিন্তু ব্যবসাও ত' অত সোজা নয়—সেও শিখতে হয়—বাবা বল্লেন —"দিন কতক Share marketএ যাও।"

আজ বছর খানেক হ'ল দালালী করছি। উপার্জ্জন খুব বেশী হচ্ছে না বটে—কিন্তু আশা আছে—বরাত খুলতে ক'দিন ? আমি graduate হইনি বলে কিন্তু বাবার বড়ই আপশোষ; তাঁর এখনও ধারণা যে আমি যদি ভাল করে পড়ে একজামিন্ দিই তবে আমার নামের পাশে ইংরাজী বর্ণমালার আদ্য অক্ষর দুটো বসাতে পারি। আমার কিন্তু তার জন্য ততটা আক্ষেপ ছিল না—লক্ষ্য ছিল কি করে হঠাৎ বড়লোক হতে পারি !

(২)

Share marketএর report গুলোর উপর একবার চোক্ বুলিয়ে নিয়ে সারা কাগজখানা খুঁজছিলাম কোথাও বড়লোক হবার সহজ মতলব বার করে কেউ বরাত ফিরিয়েছে কি না ! কিন্তু হায়, কোথায় কি ? যত নীরস প্রবন্ধে নিবন্ধে ভরা ! হঠাৎ একটা বিজ্ঞাপনের উপর নজর পড়ল—

"সর্ব্বমঙ্গলা কবচ"

"ইহা ধারণে সর্ব্বপ্রকার বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায়—মকর্দ্দমায় জয়লাভ হয়—চাকুরী প্রাপ্তি—পরীক্ষায় পাস—ব্যবসায়ে উন্নতি—হঠাৎ সৌভাগ্য লাভ··" ব্যস্ আর যায় কোথা ? এই ত' আমি খুঁজছিলাম—তাড়াতাড়ি বাকীটা না পড়েই তলায় দেখলাম "মূল্য আড়াই টাকা মাত্র, প্রাপ্তিস্থান...প্রশংসা পত্র" ইত্যাদি—

সেইদিনই একটি কবচ আনিয়া ভক্তি সহকারে ধারণ করিলাম—পূজা মানসিক করিলাম ! দেবতার প্রতি আমার চিরকালই অগাধ ভক্তি--তা ছাড়া আমার বড়লোক হবার সম্ভাবনা খুবই বেশী ; অনেক জ্যোতিষী আমার হাত দেখিয়া ঐ কথাই বলেছেন আর বাবার clientরা সকলেই ছেলেবেলায় আমায় বলত "এ ছেলেটি খুব সুলক্ষণযুক্ত—এ রাজা হবে।"

সেদিন Court হইতে এসেই বাবা বললেন "ত্যাখো মনে করছি তোমাকে Registered Broker করে দেব তা' হলেই তোমার কাজের খুব সুবিধা হবে—ডিপোজিটের টাকাটা দু' চারদিনের মধ্যেই জোগাড় করে ফেলি।"

মনটা লাফিয়ে উঠল, কবচ ধারণের সঙ্গে সঙ্গেই সৌভাগ্যের উদয় ! Registered হ'তে পারলেই ব্যস্, লাক্ লাক্ টাকার transaction চালাতে পারব—বরাত খুলতে আর দেরী কৈ ? তার উপর কবচ সহায়।

সেদিন রাত্রে বেশ সুনিদ্রা হ'ল।

* * * *

জাভা থেকে এক জাহাজ চিনি আসছিল—সংবাদ এল পথে খুব ঝড়বৃষ্টি হয়ে জাহাজ খানার মাল অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেছে। চিনির ক্রেতা তাড়াতাড়ি অর্দ্ধমূল্যে মালের রসিদ খানা বিক্রয় করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—বরাত ঠুকে আমিই সেই রসিদখানা কিনে নিলুম—টাকাটা লেখায় পড়ায় দেওয়া হ'ল মাত্র।

তিনদিন পরে "তার" এল জাহাজখানা রক্ষা হয়েছে ; মাল প্রায় সবই ঠিক আছে। বাজারে চিনির দর ইতিমধ্যেই চড়ে গিয়েছিল অনেক খরিদ্দার জুটল—সেই রসিদ খানাই

আবার প্রায় পুরা দামে বিক্রি করে দিলুম—মাল থেকে আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হ'ল।

বরাত যখন খোলে এমনি করেই খোলে—সংবাদ এল "ডার্বির" তৃতীয় প্রাইজটা এ বছর আমিই পেয়েছি। হার্টফেল হবার কোন লক্ষণই হ'ল না কারণ আমি চিরকালই জানি একদিন না একদিন আমি পাবই; আজ পাঁচ বছর ধরে ডার্বির টিকিট কিনছি—এবার তার উপর কবচ সহায়!

বড়লোক হবার বরাত, না হয়ে যায় কি করে? বাড়ীখানি কেনা হ'ল বেশ পছন্দ মতনই—অনেক বিলিতি ছবিতে এমনি ছবির মত বাড়ীই দেখেছি। ফার্ণিচার কেনা ও সাজান গোছান বেশ মনোমতই হ'ল কেবল 'মোটার' কেনা নিয়ে বাবার সঙ্গে একটু মতান্তর হয়েছিল—বরাতই যখন খুলল ও সব Ford, সেভ্রলে কেন? অন্ততঃ একখানি 'রোলস্ রইস্'ই এখন চলুক।

এতদিনে graduate হবার ইচ্ছাটা আমারও প্রবল হয়ে উঠল কবচের গুণাবলীতে 'পরীক্ষায় পাস' এ কথাটাও ত' ছিল—এখন এক্জামিন দিলে পাস হবনা কে বলতে পারে? সামনেই এক্জামিনের সময়—non-Collegiate candidate হয়ে দরখাস্ত করে দিলুম।

কবচের কি অসীম গুণ! ঠিক যে কয়টি পড়ে এসেছি সেই কয়টিই পড়েছে—এবার graduate হওয়া ছাড়ায় কে?

সবই ঠিক হয়ে গেল—Gazetteএ নামটা বের হলেই স্থির করে আছি আমার বহুদিনের আশা আমার College friend সুকোমলএর বোন নেলী সেনকে propose করব! এতদিন সাহস হয় নি কিন্তু এখন আর অশোভন দেখাবে না। তারা ব্রাহ্ম—তাতে কি? আমরা এখন বড়লোক হয়েছি, বাবার নিশ্চয় এখন ও সব prejudice থাকবে না!

কোথাকার এক জমিদারের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা স্থির হ'চ্ছিল। ধ্যেৎ, ঐ পাড়াগেঁয়ে ভূত আমি বিয়ে করতে পারব না, হলেই বা জমীদারের মেয়ে! বাবাকে বলতে সাহস হ'ল না মাকে বললুম—মা ত চটেই উঠলেন—বললেন "ওমা কী ঘেন্না, তুই বলিস কি? তুই বেম্ম বেধর্ম্মী বিয়ে করবি, তুই হলি কি?"

বাবাও খুব চটে গেলেন—হুকুমের মতই একেবারেই আমাকে বললেন—"তোমাকে আমি এইখানে বিয়ে দিতে চাই—তোমার কোন অমত শুনতে চাই না।"

আমিও ঠিক বিলিতি কায়দাতেই বলতে বাধ্য হলুম "মাপ করবেন আমি তা' পারব না—আমি যাকে ভালবাসি তাকে ছাড়া আর কাহাকেও বিয়ে করা আমার দ্বারা হবে না।"

বাবা খুব চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—"কী, একেবারে উচ্ছন্ন গেছ—আমি জানি বরাবরই তোমার দ্বারা কিছু হবে না—worthless তুমি...

* * * *

বাবার বকুনীতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল—চেয়ে দেখি একরাশ আলো এসে ঘর ভরে গেছে—তখনও বাবা বকছেন—"worthless—একেবারে কুঁড়ের বাদ্শা—এরাই আবার ব্যবসা করবে। বেলা ন'টা পর্য্যন্ত ঘুমোবে সাত ডাকে উঠবে না, এরা এক্জামিনে ফেল হবে না ত' কি?...

হায়, হায়, এতটা তা হলে সবই স্বপ্ন? কবচটার দিকে দেখলুম ঠিকই আছে হাতে বাঁধা। মনটা বড়ই দমে গেল—যত রাগ হ'ল কবচটার উপর, সেটাকে ছিঁড়ে জানলার বাইরে ফেলে দিলুম রাস্তার উপর।

বাতায়ন-পথে

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　২২শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৩।　　[২৮শ সপ্তাহ

মটরের চলন্ত বাড়ী
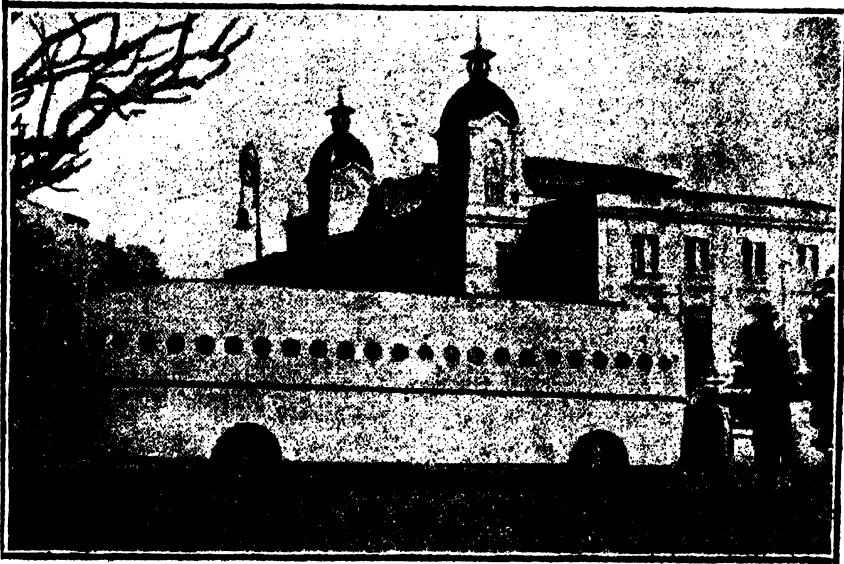
ইদানিং বিলাতে একপ্রকার শুইবার ও বসিবার, রান্নার, চাকরদের, স্নান করিবার, ফটোগ্রাফিক, বেতার বার্ত্তা বহনের ঘর বিশিষ্ট একপ্রকার মটর প্রস্তুত হইয়াছে। এই মটরে চড়িয়া সকল প্রকার সুখ সুবিধাসহ সৌখিনতা বজায় রাখিয়া যত্রতত্র বেড়ান যায়।

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

—ছয়—

বিকালের পড়ন্ত রোদটুকু ছাদের ঢেউ খেলান আলিসার বুকের উপর দিয়া টবে সাজানো নানাবিধ ফুলের গাছগুলিকে নীরবে বিদায় বার্ত্তা জানাইয়া প্রস্থান করিতেছিল। প্রিয় বিরহ ব্যথায় শঙ্কিতা হইয়া মলয় স্পর্শে দুলিয়া দুলিয়া নীরব ভাষায় বলিতে লাগিল, ওগো নিঠুর, ওগো প্রিয়, তুমি এমনি করিয়া চলিয়া যাইও না, ফিরিয়া চাহো গো—একবার ফিরিয়া চাহ ; অরুণ ফিরিয়া তাহাদের কপোল হইতে অলক গুচ্ছ সরাইয়া শুভ্র মুকুলগুলিকে বিদায় চুম্বনে অভিষিক্ত করিয়া মৃদু মৃদু বচনে বলিয়া গেল—"ওগো রাণী, ভয় নেই গো তোমাদের···আমি আবার আসব··রাতে আমার প্রতিনিধির পরশ ঝরে পড়বে তোমাদের বুকের পরে, তাকে দেখে তোমরা ঘোমটা খুলো শতেক দলে।

ছাদের উপর ইজি চেয়ারে হেলিয়া রেবেকা একখানি নূতন ইংরাজী 'ম্যাগাজিন' পাঠ করিতেছিল। মুখে তাহার চপল হাসি ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়া উঠিতেছিল। তার বাঁদিকের কাঁধের উপর শ্যাম্পেন রঙের শিল্ক শাড়ীর কাজ করা আঁচলটুকু কোঁচকাইয়া ছোট্ট একটী মীনা করা সোণার ব্রোচে আবদ্ধ। ঘাড়ের উপর এলান খোঁপার ভিতর হইতে সরু একগাছি সোণার 'চেন' বিকালের ম্লান আলোকে ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। সহসা পিছন হইতে আলোক আসিয়া তাহার উভয় চক্ষু চাপিয়া ধরিল। সে স্পর্শে রেবেকা বিরক্ত হইয়া ঝাঁঝিয়া বলিল—"আঃ কী ছেলেমানুষী আরম্ভ করে দিলে বলত, যাও ছাড়, দেখছ বইখানা পড়ছি আজই ফেরৎ দিতে হবে।"

আলোক চট করিয়া চোখ ছাড়িয়া রেবেকার হাত হইতে বইখানি ছোঁ মারিয়া তুলিয়া দুই চারি পৃষ্ঠা উল্টাইয়া অবহেলাভরে চেয়ারের এক পাশে ফেলিয়া বলিল—"ছিঃ রেবা, তুমি এই সব বাজে 'ম্যাগাজিন' পড়তে ভালবাস ?"

রেবেকা হেঁট হইয়া বইখানি তুলিয়া তাহার পাতা খুলিতে খুলিতে বলিল—"কেন 'ম্যাগাজিন' খানায় কী দোষ তুমি দেখলে ?"

আলোক বলিল—"দোষ নয়, ওতে যত সব বাজে 'অথর'রা লেখেন, আর সে লেখাও এমনি যে তীব্র সুরার মত উত্তেজক, ঐ সমস্ত দুর্নীতিমূলক উৎকট প্রেমের গল্প পড়ে পড়েই মেয়েছেলেদের মাথা খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে। তাতে ক'য়ে ফল দাঁড়িয়েছে এই যে উঠতে বসতে তারা স্বামীকে জন্তুবিশেষ ভাবে, এই যেমন তুমি—নম্বর ওয়ান্।"

রেবেকা ঝঙ্কার দিয়া আলোককে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—"আমি তো মন্দ চিরকালই আছি, সেটা আজ নতুন করে শোনাচ্ছ কি...তোমার যদি মাথার ঠিক থাকে তা হলে উঠে যাও, আজ সন্ধ্যার সময় আমাকে সিনেমায় নিয়ে যাবে বলেছ যাও বক্সটা রিজার্ভ করে এস, না হলে পরে পাওয়া যাবে না।"

আলোক চেয়ার ছাড়িয়া বলিল—"কেন, আমি তোমার গোলাম নাকি যে যখন তখন তোমার হুকুম পালন করতে ছুটব ?" বলিতে বলিতে আলোক ভিতর বাড়ীর বারান্দায় ঝুঁকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"ফাগুন।"

শ্রাবণের ঘন মেঘের মত একরাশি ভিজা কালো চুল পিঠের প'রে এলাইয়া সন্ধ্যা রাণীর মত মৃদু গতিতে উদয় হইয়া ফাল্গুনী বলিল—"কি দাদা ?"

আলোক পকেট হইতে সুন্দর লাল রেশম কাপড়ে মোড়া মোটা অথচ ছোট্ট একখানি বহি বাহির করিয়া দূর হইতে উভয়কে দেখাইয়া তরল কণ্ঠে বলিল—"এই বইখানার নাম

যে করতে পারবে তাকে আজ বায়স্কোপের নতুন ফিল্ম দেখিয়ে আনব।"

রেবেকা সমস্ত রাগ ঝাড়িয়া মুছিয়া স্বামীর কাছে ঘেঁসিয়া বলিল—"কি বই গো দেখি, ওখানা কি "টুর্গেনিভের" কি বল তো, আমার নাম ঠিক মনে পড়ছে না। দেখি না, দাও একবার।" রেবেকা হাত বাড়াইল।

আলোক সরিয়া হাসিয়া বলিল—"ছাই পার্লে বলতে… ছি ছি রেবা, তোমার বি-এ পড়াই মিথ্যে, সামান্য একখানা বইয়ের নাম তুমি বলতে পারলে না? ফাগুন্ তুই বল তো এ খানা কি বই?"

রেবেকা আহতা ভুজঙ্গীর মত ফোঁস্ করিয়া বলিয়া বসিল—"ঠিক লোককে ধরেছ, হুঁ উ'ন আবার তোমার ব'য়ের নাম বলবেন।"

"কেন ও কি তোমার চেয়ে নীচু নাকি. কিরে ফাগুনী তুইও ঠক্‌লি নাকি?"

ফাল্গুনী কৌতুকোজ্জ্বল চোখ দুইটি রেবেকার মুখের পরে স্থাপিত করিয়া বলিল—"দাঁড়াও দাদা একেবারে জবাব দিতে পারব না, কেন না ওর নামটা তো মোটেই দেখতে পাচ্ছি না—আচ্ছা ধর প্রথম, বোধ হয় গীতা হবে নয় কি?"

আলোক পরিতৃপ্তির হাসি হাসিয়া রেবেকার কাঁধে হাত দিয়া বলিল—"কি হলো রেবা, হার মানছ তো ফাগুনের কাছে, আহা তোমার বায়স্কোপটাই মাটি হ'য়ে গেল। একটা অল্প শিক্ষিতা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের কাছে হেরে গেলে? ফাগুন্ এই নে ভাই তোর গীতা।"

রেবেকা জ্বলিয়া বলিল—"এর আবার হার জিত কি। ও সব বাজে ব'য়ের খবর আমি রাখি না, তোমরা সব এক একটি পণ্ডিত, তোমরা ও সব মন্ত্র শেখ; যাও পথ ছাড়, নীচে আমার কাজ আছে।"

প্রস্থানোদ্যতা ক্রুদ্ধা পত্নীর হাত ধরিয়া আলোক সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—"অবাক্ করলে যে রেবা! হিন্দুর মেয়ে তুমি গীতার খবর রাখ না?"

মুখটা বাঁকাইয়া ভ্রূদ্বয় কোঁচকাইয়া রেবেকা বলিল—"অবাক আমি কিছুই করি নি গো…অবাক হচ্ছি তোমার দিন দিন পরিবর্ত্তন দেখে।"

"তাই নাকি রেবা, আমার পরিবর্ত্তনটুকু তা হলে তোমার অত কাজের ভীড়েও নজর এড়ায় নি দেখছি, আমার কি হচ্ছে না হচ্ছে তা হলে সেটুকুরও খবর রাখছ। হঠাৎ হতভাগার উপর এ অনুকম্পা এল কেন রেবেকা, বলতে কি তোমার আপত্তি আছে?"

ধাঁ করিয়া আলোকের হাত হইতে নিজের হাত মুক্ত করিয়া পুনরায় চেয়ারে বসিয়া বলিল—"দেখ সকল কাজের একটা সীমা আছে জান তো? তুমি আজকাল সভ্যতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে বেরুতে শিখেছ, বাস্‌রে যিনি ননকোর নামে খড়্গহস্ত তিনি এখন একজন ভণ্ড ননকো-অপারেটারের পায়ের ধূলো মাথায় করে নিচ্ছেন…চমৎকার, এক রাত্তিরে একটা বিদ্রোহীর কথায় মেতে উঠে চারিদিকের লোক হাসানো, এ তোমার চমৎকার ব্যবহার। নাঃ তুমি আর আমাকে এ বাড়ীতে টিক্‌তে দেবে না দেখছি।"

আলোক পূর্ব্ব হইতেই এইরকম প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিল। বার দুই মাথা নাড়িয়া ক্ষুব্ধস্বরে সে বলিল—"রেবা, আমার মত এইরকম পরিবর্ত্তন যদি আজ তোমার হ'তো…তা হ'লে স্ত্রীর গৌরবে আজ আমি ধন্য হতুম। রেবা ভগবান যে আমাকে এত শীগগীর মুক্তি মার্গের সোপান দেখিয়ে দেবেন এ আমার কল্পনাতীত ছিল। রেবেকা, একবার বলো যে স্বামীর ধর্ম্ম পালন করাই সতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য। আমি তোমার মতেই চলব।" আমি কি আশা করতে পারি রেবা যে তুমি তোমার ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করবে?"

রাঙ্গা ঠোঁট দু'খানি উল্টাইয়া রেবেকা ঘৃণার সহিত বলিল—"হ্যাঁ আগে তাই করব! তোমার মত তো আমি পাগল হই নি যে "দেশ আমার জননী" ব'লে ক্ষেপে উঠবো—আমাদের চিরাচরিত রীতি নীতিগুলো ভুলে…। যাও গো, তোমার ও বহুমূল্য উপদেশগুলো এখানে না ছড়িয়ে, অন্য কোথাও 'লেকচার' দাও গে—তাতে কাজ দেখবে।"

আলোক তাহার দম্ভপূর্ণ উত্তর শুনিয়া বিমূঢ় হইয়া রহিল। সহসা একটা তীব্র ঝঙ্কার তাহার কাণে আসিয়া বাজিল—"ফাগুন, এই অ-বেলায় তুমি স্নান করেছ অসুখ

করলে কে দেখবে? তুমি দিন দিন ভয়ানক জেদী মেয়ে হ'চ্ছ, আগে তো এমন ছিলে না।"

রেবেকার তিরস্কারে ফাল্গুনীর ডাগর আঁখি ছলছল করিয়া উঠিল। আলোক ঝটিতি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"উঠে আয় ফাগুন্, অবেলায় স্নান করে যে অসুখে পড়ে সে তোমাদের মত অবলা কোমলা নারীদেরই বেশীর ভাগ দেখা যায় অত শরীরের কি ভয় করলে সংসার চলে? গায়ে কাপড়, জামা এঁটে স্বাস্থ্য নষ্ট করে ঘরের কোণে এড়িয়ে থাকা তোমাদের মত বিলাসিনী অলস মেয়েদের সাজে, কিন্তু ওর শরীর ফ্যানের নীচে শুয়ে নভেল পড়বার জন্য সৃষ্টি হয় নি···ও যাতে আদর্শ হিন্দু রমণী হয় সেই শিক্ষাই আমি দেব বুঝতে পারলে?"

জলন্ত দৃষ্টিতে রেবেকাকে দগ্ধ করিয়া ফাল্গুনীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে আলোক নামিয়া গেল। জড় পুতুলের মত রেবেকা নিশ্চেতন হইয়া বসিয়া রহিল। ক্রোধে তাহার সাদা মুখখানি টকটকে হইয়া ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম হইতেছিল। ওঃ এতদূর! এত তাচ্ছল্য! এত অপমান-সূচক কথা যে স্বভাব কোমল আলোকনাথের মুখে শুনিতে পাইবে সে তাহা প্রত্যাশা করে নাই। অভিমানের আতিশয্যে তাহার চোখ ঠেলিয়া জল আসিতে চাহিল। হাতের সেই অর্দ্ধ পঠিত 'ম্যাগাজিন'খানি ছুড়িয়া অসহিষ্ণু ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সম্মুখে যে দৃশ্য তাহার পড়িল, তাহাতে তাহার চোখের জলের ধারা নিঃশেষে শুকাইয়া, তৎপরিবর্ত্তে জ্বালা ভরিয়া উঠিল। যেন তাহাকে উপেক্ষা ও বিদ্রূপ করিবার মানসে কাহারা গাহিয়া উঠিল—

"ওগো গৃহলক্ষ্মী ধরি তোদের পায়
এই জীর্ণ ধরটি গুঁড়িওনা'ক
একটি লাথির ঘায়?"

রেবেকা তাড়াতাড়ি তাহার সুন্দর ধপধপে চরণ দু'খানি লাল মখমলের "শ্লিপারের" মধ্যে ঢুকাইয়া এক ঝলক দমকা বৈশাখী ঝড়ের মত উদ্দামগতিতে ঘুরিয়া দ্বিতলের বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইল। যাহা সে দেখিল তাহাতে তাহার বুকের মাঝখানটা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। স্বামী তাহাকে এত তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে...যে যাহাতে সে আজন্ম ঘৃণা করিয়া আসিতেছে সেই স্বেচ্ছাসেবকেরা তাহারই বাটীর উঠানের মধ্যে বসিয়া গীত গাহিতেছে? রেবেকা কি একটা কথা বলিবার জন্য ঝুকিয়া পড়িল—সেই সময় গায়কেরা গানের শেষ চরণ গাহিয়া উঠিল।

"তোমরা যাহার মুখের বেণু—তোমরা যাহার পায়ের রেণু
তোমরা বিনা যাদের বীণা বাজবে নাকো হায়
তোমরা তাদের মাথায় বসে, আপন টান টেনে কসে
চালাও যদ মনোরথ তবে দেশটা কোথায় যায়।
এই দেশেতে সীতা ছিল......"

মধ্যপথে গান থামাইয়া রেবেকা ক্ষিপ্ত হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল—"মানসিং।"

"কেয়া মাঈজী?"

নেপালী দারোয়ান ভাঁটার ন্যায় ক্ষুদ্র গোলাকার চক্ষু ঘুরাইয়া উপরে তাকাইল। রেবেকা চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল—"শুয়ার···তুম্ কাঁহা গিয়া থা ..অন্দরমে এৎনা ডাকু ঘুসনে দিয়া হারামজাদ।"

নীচে স্বেচ্ছাসেবকদের পাশে দাঁড়াইয়া আলোক মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। তাহা দেখিয়া রেবেকা জলন্ত কামানের গোলার মত ছিটকাইয়া বলিল—"এ মানসিং অভি নিকাল দেও, কুছ্ বাত নেই শুনেগা।"

"রেবা।"

অকস্মাৎ আলোককে সম্মুখে পাইয়া রেবেকা মনের রাগ মিটাইবার সুযোগ পাইল। ক্রুদ্ধা সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া বলিল—"কী?"

"সহের সীমা যে তুমি অতিক্রম করে যাচ্ছ রেবা··· ভদ্রলোকের ছেলেদের দারোয়ান দিয়ে গলাধাক্কা দিতে তোমায় লজ্জা করে না? এতে তোমার স্বামীর মাথা কত নীচু হচ্ছে তাকি এত লেখাপড়া শিখেও জানতে পাচ্ছ না?"

"তাই নাকি গো? কিসে তোমার মাথাটা নীচু হচ্ছে শুনি...আর তুমিও যে আজকাল বড় বাড়িয়ে তুলেছ, আমি এ বাড়ীর কর্ত্রী···তোমার ন্যায় অন্যায় গুলো আমাকেও

দেখতে হবে, যাও শীগগীর ওদের বিদেয় কর—আর তুমি যদি না পার—আমিই যাচ্ছি।"

"চুপ চুপ রেবা—খুব হয়েছে—আর জ্বালিও না · আস্তে কথা বল—নীচে ওঁরা শুনতে পেলে কি ভাববেন বলতো?"

রেবেকা মাথা নাড়িয়া বলিল—"ভাববেন আবার কী সত্যি কথা বলছি তাতে ভয়টা কি? না না, এত সব অনাচার আমি চোখে দেখতে পার্ব্ব না—"শেম্" ওঃ তুমি কি ভুলে যেতে বসেছ যে তুমি একজন নামজাদা ব্যারিষ্টার। ছিঃ এমন হীন হয়ে পড়েছো তুমি···যে সমাজে এ সব কথা উঠলে—তাঁরা আমাদের সান্নিধ্য হতে ঘৃণায় সরে যাবে।" বলিয়া সত্য সত্যই যেন সেই অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় রেবেকা শিহরিয়া উঠিল।

আলোক তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কঠোর স্বরে বলিল—"আমি যে ব্যারিষ্টার, আর তুমি যে ব্যারিষ্টার পত্নী, সে কথা ভুলে যাও রেবা—ভাব তোমার স্বামী একজন দীন দরিদ্র মায়ের ছেলে।"

মুখ মচ্‌কাইয়া রেবেকা বলিল—"মায়ের সন্তান নাতো কি অমনি হয়েছ।"

"স্বেচ্ছাচারিণী প্রগল্‌ভা...ইট্ ইস্ মাই মিসফরচুণ দ্যাট্ আই হ্যাভ্ ম্যারেড্ ইউ।"

*　*　*　*

আলোক তর্ তর্ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অমলের কাঁধে হাত দিয়া করুণস্বরে বলিল—"চলুন অমলদা আমিও আপনার সঙ্গে খুলনায় যাব।"

অমল তাহার বেদনা পীড়িত অথচ কিসের দীপ্তিতে প্রভান্বিত মুখের পানে চাহিয়া সানন্দে বলিল—"সেতো আমার সৌভাগ্য ভাই।"

আলোক তাহার হাত ধরিয়া অনুনয় করিয়া বলিল—"একটু দাঁড়িয়ে যান্ একবার দয়া করে মৃণাল বাবুকে নিয়ে আপনাকে ওপরে যেতে হবে।"

*　*　*　*

ফাল্গুনীর ছোট্ট ঘরখানিতে উভয়কে বসাইয়া আলোক ভগ্নীর সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। অমল ও মৃণাল সবিস্ময়ে ঘরখানির প্রতি দৃষ্টি বুলাইয়া দেখিল—সম্মুখের প্রাচীর গাত্রে মহাত্মা গান্ধীর প্রকাণ্ড তৈলচিত্র সন্ধ্যার ঝিকিমিকি আলোতে পূতময় হইয়া উঠিয়াছে—পার্শ্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, বাল গঙ্গাধর তিলক, মাননীয় গোখলে, দাদা ভাই নৌরজী, লালা লজপৎ রায়ের এবং কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি বাঙ্গলার কয়েকটি উজ্জ্বল রত্ন স্বদেশ প্রাণ মহাত্মাদিগের আলেখ্য গৃহ প্রাচীর সুসজ্জিত, পবিত্র। দক্ষিণ দিকের জানালার কোলেই ঝক্‌ঝকে জলচৌকীর পরে' কমলা চরকা, ও সুতা কাটিবার সমস্ত সরঞ্জাম সুরক্ষিত। গৃহের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বস্তুগুলিও কাহার শ্রীকর স্পর্শে নিপুণভাবে সাজান, গুছানো। ধুনা ও গুগগুলের মধুর সুবাস তাহাদের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে সোনার থালায় গাছ কয়েক সোনার চুড়ী ও দুই থাকে দুই শত টাকা লইয়া আলোকের সহিত ফাল্গুনী দেবী প্রতিমার মত ঘরে ধীরে ধীরে প্রবিষ্টা হইল! তাহার আগমনে ঘরের সমস্ত অপূর্ণটুকু যেন পূর্ণতায় ভরিয়া হাসিয়া উঠিল। উভয়ের পদপ্রান্তে থালাখানি রাখিয়া মোটা আঁচলখানি গলায় তুলিয়া ফাল্গুনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। আলোক কুণ্ঠাপূর্ণ স্বরে বলিল—"অমল দা' ফাগুনী আপনাদের স্বরাজ ফণ্ডে যৎসামান্য উপহার দিচ্চে।"

অমলের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। ফাল্গুনীর হাত ধরিয়া উঠাইয়া স্নেহ গদ্‌গদ্ ভাষায় বলিল—"দিদি ফাল্গুন লক্ষ্মী তুমি···তোমার এ দান আমাদের অমূল্যরত্ন। এ ঘর বোধ হয় তোমারই না? আলোক এই রকম শান্তিকুঞ্জ যদি প্রতি গৃহে গৃহে হয়, তাহলে আমাদের সমস্ত অভাব শীগগীরই দূর হবে আশা করি।"

অমলের প্রশংসা বাক্যে কালো মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ রাঙিয়া উঠিল। আর মৃণাল...সে সেই কালোরূপের স্নিগ্ধ শুচি-শুভ্র অন্তরখানির পরিচয় পাইয়া কী একটা পুলক...কী একটা মাধুর্য্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া অভিভূত হইয়া বসিয়াছিল। অনেক বর্ণশ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের সে দেখিয়াছে... এবং সুন্দরের প্রশংসা সে কত জায়গায় করিয়াছে কিন্তু সে সব সুন্দরীদিগের মধ্যে প্রাণের পরিচয় পায় নি। এখন তাহার মনে হইল যে বহিঃসৌন্দর্য্যে সার পদার্থ কিছুমাত্র নাই, সে কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন করে মাত্র···কিন্তু

অন্তরের যা সৌন্দর্য্য…সে পুষ্প পরাগের মত লুপ্ত থাকিয়া পরকে মাতাইয়াই সুখী হয়। মেঘে ঢাকা ক্ষণপ্রভা…কিম্বা অন্ধকারের বুকে লুকান চাঁদের মিষ্ট আলোটুকু…অথবা শ্যামলা ধরিত্রী…কী এ, এর সবটুকুই যে সুন্দর…কি দিলে ইহার উপমা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বেশী আলো লোকের চোখে সহ্য হয় না আলোর আড়াল খুঁজে ..তেমনিই চিরটা কাল সৌন্দর্য্যের উপাসক মৃণাল…ঐ কাল মেয়েটির অন্তর খুঁজিতেছিল অন্তর্দৃষ্টি দিয়া। একমুহূর্ত্ত মৃণালের প্রশংসামান মুগ্ধ অপলক নেত্রের প্রতি চাহিতেই বিশ্বের সমস্ত লজ্জা যেন ঝাঁপিয়া ফাল্গুনীর মুখে চোখে আসিয়া পড়িল। উদ্বেলিত হৃদয়ে পুনর্ব্বার উভয়কে প্রণাম করিয়া ফাল্গুনী ললিত গতিতে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

গ্রীসের আদিম যুগের কথা

[শ্রীক্ষিতিনাথ সুর]

যে কোন দেশেরই হউক না কেন আদিম যুগের ইতিহাস লিখিতে হইলে অনুমান ও আধা-ইতিহাসের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। ক্রমে ক্রমে দেশ যত সভ্যতার পথে অগ্রসর হইয়াছে, ততই দিনে দিনে তাহার ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত লেখা ইতিহাস না পাওয়া গিয়াছে, সে পর্য্যন্ত কোন সংবাদকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া মানিয়া নেওয়া চলে না।

গ্রীস দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীর আগের কোন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। যদিও সপ্তম শতাব্দীতে ইতিহাস লেখা সুরু হইয়াছে, তথাপি খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের সঠিক ও নিয়মিত ইতিহাস পাওয়া যায় না।

সুতরাং গ্রীসের প্রাগ-ঐতিহাসিক আদিম যুগের ইতিহাস পড়িতে হইলে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের যে ইতিহাস তাহাই পড়িতে হইবে। সে ইতিহাস যে নির্ভুল, অকাট্য সত্য তাহা নহে। কিন্তু তাহা যে কিছু পরিমাণে সত্য ও তাহাই যে গ্রীস-ইতিহাসের আদি উপাদান ও ভিত্তি তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভারতের মহাভারত ও রামায়ণের ঐতিহাসিক সত্য কতখানি তাহা কষিয়া ঠিক করা কঠিন, কিন্তু তাহারাও যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটা অংশ বা ভারতের ইতিহাসকে গড়িয়া উঠিতে তাহারাও যে সাহায্য করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

গ্রীস দেশের অডিসি (Oddesus) ও ইলিয়ডের (Illiod) ঐতিহাসিক মূল্য ঠিক আমাদের রামায়ণ ও মহাভারতেরই মত। উহাদের সবটা সত্য নয় নিশ্চয়, কিন্তু উহাদের কিছুটা যে সত্য তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি কিছুই সত্য না হয়, তাহাতেও হতাশ হইবার কারণ নাই, কারণ তাহারা সে যুগের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় যে ছবি আমাদের মনের সামনে তুলিয়া ধরে, তাহারও যতটুকু দাম আছে, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। সে যুগের যে ইতিহাস আমরা পাই, আধা-ঐতিহাসিক ও আধা-কাল্পনিক, যাহাকে ইংরাজীতে বলে Legand.

সুতরাং এই Legandary ইতিহাস হইতে, গ্রীসের আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারি, তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নাই। গ্রীসের ইতিহাসে Heroic Age (বীরত্বের যুগ) বলিয়া যে যুগ আছে, তাহাও প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগ। সেই যুগেরই চিত্র গ্রীসের ইতিহাসে বিস্তৃতভাবে দেওয়া আছে, তাহার আগের ইতিহাস আরও অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ভাবে কদাচিৎ অপ্রচুর ভাবে দেওয়া আছে। সে যুগের সেই লুপ্ত অপ্রচুর ইতিহাসকে ঘাঁটিয়া টানিয়া বাহির করা যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি অপ্রীতিজনক। কষ্টের কথা বাদ দিলেও, সেই আনুমানিক আধা-ইতিহাসকে বাদ দিয়া তাহার পরের দিকে বেশী মনযোগ দিলে সমস্ত ব্যাপার বুঝিবার আদৌ অসুবিধা হইবে না।

খৃঃ পূঃ একাদশ শতাব্দীতে ট্রয়ের যুদ্ধ (The Trojan War) সংঘটিত হয়, তখনও বীরত্বের যুগ চলিতেছে। এই ট্রয় যুদ্ধের ইতিহাসে তখনকার গ্রীস দেশের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম বিশ্বাসের সমস্ত চিত্র নগ্ন হইয়া পড়ে। এই ট্রয় যুদ্ধের কাহিনীর সাথে আমাদের রামায়ণের একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে। Paris যখন Menelausএর অনুপস্থিতিতে Helenকে চুরি করিয়া পলায়ন করে, তখন আমাদের মনে পড়ে, পঞ্চবটী বনে রাম লক্ষণের অনুপস্থিতিতে রাবণের সীতা হরণ। Paris হেলেনকে সাথে করিয়া Algean সাগরের পারে নিজের পিতৃ রাজ্যে চলিয়া গেল—ঠিক রামায়ণেরই রাবণের লঙ্কায় পলায়নের মত। তারপর Manelausএর ভাই অনেক সৈন্য সাথে করিয়া ট্রয়ের দিকে জাহাজ ভাসাইয়া দিল—সেখানে একাদিক্রমে দশ বৎসর যুদ্ধের পর ট্রয় ধ্বংস হয়। গ্রীসের লোকেরা Helenকে সঙ্গে করিয়া গ্রীসে ফিরিয়া আসিল। রামায়ণেও ঠিক একই চিত্র দেখিতে পাই—রামচন্দ্রের লঙ্কা অভিযান—তারপর সীতার উদ্ধার ও অযোধ্যায় প্রত্যাগমন। ভারতবর্ষ ও গ্রীসের প্রধান পৌরাণিক কাব্যের এই সাদৃশ্যের জন্য অনেকে অনুমান করেন, গ্রীসের ও ভারতের আদিম অধিবাসী একই স্থানের লোক, তারপর কোন কারণে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া, দুই দেশে বাস করিলেও ভাব ও চিন্তার ধারা বিশেষ বিভিন্ন হইতে পারে নাই।

তারই একটু আগের আর্গোনাটিক অভিযান (Argonaertic Expedition) প্রাচীন গ্রীসের অর্থ-প্রিয়তা ও নৌ-পারদর্শিতার পরিচায়ক। ব্যবসা বানিজ্যের জন্য নয়, নিছক কিছু মোটা রকমের দাঁও মারিবার জন্য সমুদ্রের ব্যবধান, সাগরিকার মোহিনী ও সুন্দর গানের লোভ ও মায়া কাটাইয়া, নিঃশ্বাসে আগুন ঝরা ষাঁড়ের মুখে যাওয়ার চিত্র প্রাগ্ইতিহাসক যুগে বেশী পাওয়া যায় না।

তারপর ট্রয় যুদ্ধের কথা। Homerএর Illiodএও ট্রয় যুদ্ধের কাহিনীর শেষের দিকটা আছে। ইহাতে যে চিত্র আছে, একটু পরে তাহা বলিতেছি। গ্রীক সৈন্য যখন সমুদ্রের মধ্য দিয়া ট্রয়ের অভিমুখে যাইতেছে তখন প্রাকৃতিক অবস্থা খারাপ হইলে (Agamemnon) স্বীয় দুহিতা Ipligeniaকে বলি দিয়া দেবতার কোপ কমাইয়াছিলেন। ডেলফির ভবিষ্যদ্বাণী (Delphic Oracle) ও প্রাকৃতিক শক্তিকে পূজা প্রভৃতি হইতে তাহাদের দেবতার প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের নমুনা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে গঙ্গাসাগরে পুত্র উৎসর্গ, তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থানে 'ধর্ণা' দেওয়া প্রভৃতির উদাহরণ একই ভাবের প্রকাশক।

পৃথিবীর কোন দেশের সহিত গ্রীসের তুলনা হয় না এই বিষয়ে যে, ভৌগলিক গ্রীস ও রাজনৈতিক গ্রীসে (Political Greece) আকাশ পাতাল প্রভেদ। বাহির হইতে গ্রীস একই দেশ ভাবে দেখিলেও বস্তুতঃ তাহা নহে। পাহাড় প্রাচীর বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর সতন্ত্র রাজ্যভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কাহারও সহিত কাহারও কোন রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল না। এইরকম প্রত্যেক নগর বা রাজ্যের উপর একজন করিয়া রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের মোকর্দ্দমার বিচার করিতেন, যুদ্ধে সেনাপতির কাজ করিতেন ও দরকার হইলে পুরোহিতের কাজও করিতেন সাধারণতঃ রাজ্যে রাজা সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন, কিন্তু কোন কোন স্থানে সভা-বিশেষ কর্ত্তৃক রাজার শক্তি শৃঙ্খলিত ছিল. দাসপ্রথা তখনও প্রচলিত ছিল কিন্তু পরবর্ত্তী কালের মত অত বেশী ভাবে গ্রীক সভ্যতার মজ্জাগত হইয়া যায় নাই। কোন প্রভু কোন দাসের উপর কোন অত্যাচার করিত না—সব

সময়েই বেশ ভাল ব্যবহারে তাহাদিগকে সুখী করিয়া রাখিত।

লোকে সাধারণ বেশভূষাই ভালবাসিত। রাজা বা জমিদারেরা শারীরিক কার্য্য করিতে কুন্ঠিত হইতেন না, বরং কোন অর্থকরী শিল্প জানাকে গৌরবের মনে করিতেন। নমুনা স্বরূপ Oddyssewsএর নাম করা যাইতে পারে। তিনি ট্রয় যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজের জন্য ঘর প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তিনি বেশ ভাল লাঙল চষিতেও পারিতেন। ধনী, দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকলেই অতি সাধারণ খাদ্য খাইত ও রন্ধন বিদ্যায় পারদর্শিতা গর্ব্বের বিষয় ছিল। ফল, রুটী, মাংস ও মদ সাধারণ খাদ্য ছিল। গরু, মেষ ও ছাগ মাংসই বেশী প্রচলিত ছিল। যদিও মদ খাওয়া দোষাবহ ছিল না, তথাপি কেহ অতিরিক্ত মদ খাইত না। খাবার সময় সঙ্গীতের ব্যবস্থাও ছিল।

কেবল মাত্র পুরুষ নয়, স্ত্রীলোকেরাও শারীরিক পরিশ্রম অপমানজনক মনে করিতেন না। কিন্তু কালে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সৌখিনতা প্রবেশ করে, তখন সকলে শারীরিক পরিশ্রম অপমানজনক ভাবিতে আরম্ভ করেন। মেয়েরা তাঁত বুনিতে ও সূচের নানাবিধ কাজ করিতে লাগিলেন। দূরবর্ত্তী কূয়া হইতে সাংসারিক কাজের জন্য জমিদারের মেয়েরা জল বহিয়া আনিতে লজ্জিত হইতেন না।

চৌর্য্য ও জলদস্যুতা দোষের ছিল না, কিন্তু ধরা পড়িলে বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইত। যুদ্ধের সময় রাজায় রাজায় বল পরীক্ষা হইত সৈন্যদের কোন কাজ করিতে হইত না। যুদ্ধে যে রাজা জয়ী হইতেন সেই পক্ষেরই জয় ঘোষিত হইত।

ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ছিল না। গ্রীসের সমস্ত আবশ্যকীয় জিনিষ ফিনিশীয় বণিকেরা সরবরাহ করিত। তাহারা আরব ও অন্যান্য পুর্ব্বদেশীয় প্রদেশ হইতে এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়া দেশে দেশে বিক্রয় করিয়া বেড়াইত।

এই সমস্ত গেল গ্রীসের Heroic Ageএর আচার ব্যবহার ও সামাজিক অবস্থার কথা। এই যুগের যে আনুমানিক ইতিহাস আছে তাহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না—কারণ তাহা আধা ঐতিহাসিক ও আধা কাল্পনিক। কিন্তু তবুও তাহারা সে যুগের যে চিত্র আমাদের মনের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছে তাহা হইতে আমরা গ্রীক সভ্যতার যে পরিচয় পাই, তাহাতে আমরা মুগ্ধ না হইয়া পারি না। সে যুগের সেই শান্ত ও সরল গ্রীকরা কেমন করিয়া কালে দুর্দ্ধর্ষ সামরিক জাতিতে (A Nation of Soldiers) পরিণত হইয়া বিশাল গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল ও মহান্ গ্রীক সভ্যতার বিরাট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, তাহা চিরস্মরণীয়।

ফটো চোর

[শ্রীযজ্ঞেশ্বর রায়]

"দিদি! দিদি!"—

"কেন, চেঁচাচ্ছিস রে।"—

"শীগ্‌গির বল, আমার নূতন ফটোখানা কে নিয়েছে।"

"কে নেবে?"

"কে নেবে! তবে পাচ্ছি না কেন?"

"পাচ্ছিস না তা' আমি কি জানি। খুঁজে দেখগে কোথায় রেখেছ।"

"আমি বুঝি খুঁজে দেখি নি,—না? কোথাও পেলুম না। এ নিশ্চয় বাঁদরি লেখার কাজ। ডাক তোমার আদরের বোন লেখাকে। আমি নিশ্চয় বলতে পারি ওরই কাজ। তোমার জন্ত ওকে কিচ্ছুটি বলবার যো নেই। অমনি আমার সাথে লাগবে। আদর দিয়ে দিয়ে ওর মাথাটি খেলে,"—এই বলে রেখা হুম্ হুম্ করে চলে গেল।

সেদিন আর রেখার খাওয়া হ'ল না। সে না খেয়েই স্কুলে চলে গেল।

স্কুলে যেয়েও রেখা ফটোর কথা ভাবছিল। এমন সময় রেণু এসে তাকে বলল,—"কিরে রেখা, আজকে যে তোকে বড্ড শুক্‌নো দেখাচ্চে। তোর আজ কি হয়েছে?"

"আর ভাই বলিস্ নে,—আমার মনটা আজ বড্ড খারাপ। তুই তো ভাই দেখেছিস আমার সেদিনের তোলা ফটো।"

"হাঁ, তা' কি হ'য়েছে?"

"আর কি হবে,—চুরি গিয়েছে।"

"ও, তাই! আমি ভাবছিলুম কি হ'লো। তবু ভাগ্যিস তোকে চুরি করে নি। ফটোখানা করেছে।"

"তোর ভাই সবটাতেই ঠাট্টা। আমি মরছি কেঁদে আর তুই হাসছিস।"

"তবে আয় ভাই,—একটু গলা ধরে কেঁদে নি।" এই বলে রেণু যেমনি রেখার চিবুকে একটি চুমু খেতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই তাহাদের কাণে এসে বাজল মিস্ বসুর কণ্ঠস্বর। তাহারা পেছন ফিরে মিস বসুকে দেখতে পেল আর চুমু খাওয়া হ'ল না। দুইজনেই ক্লাশের দিকে পালাল।

রেখা ও রেণু দু'জনেই এবার ম্যাট্রিক দেবে। দু'জনেই ভাল ছাত্রী। লেখাপড়ায় যে শুধু তারা ভাল ছিল তা নয়, গান বাজনায়ও তাদের একটা ভাল সার্টিফিকেট ছিল। রেখা ছিল,—গানে, আর রেণু,—সে ছিল অর্গেন, পিয়ানোতে। তাদের বন্ধুত্ব তাদের মধ্যে একটা পূর্ণতা এনে দিয়েছিল।

সেদিন ক্লাসে রেখা কোন পড়ায়ই মন দিতে পারছিল না। শুধু ফটোর কথাই ভাবছিল। কোন প্রকারে ঘণ্টা ক'টা কাটিয়ে রেখা বাড়ী ফিরে এল। রেণুদের দরজায় গাড়ী থামলে, রেণু রেখার কাণে কাণে বলে গেল—"ফটো চোরকে ধরে ফাঁসি দেবার পূর্ব্বে আমাকে জানাস, ফাঁস পরিয়ে দিয়ে আসব।"

বাড়ী ফিরে তন্ন তন্ন করে সে আবার ফটোখানা খুঁজল, লেখাকে লোভ দেখাল, ভয় দেখাল; কিন্তু যখন কিছুতেই আর পেল না তখন সে রাগে, দুঃখে শুয়ে পড়ল! সেদিন আর তাকে কেউ খাওয়াতে পারল না।

* * * *

ম্যাট্রিক পরীক্ষা হ'য়ে গিয়েছে। ফল বের হবার আর বেশী দেরী ছিল না। অনেকেই গোপনে ফল জেনেছে। রেখাও তা'র নিজের ও রেণুর ফল জেনে রেণুকে লিখল— "তা'রা দুজনেই পাশ করেছে। বোধহয় তা'রা দুজনেই স্কলারশিপ্ পাবে।" আরো একটা নিউজ লিখল—"—ই জ্যৈষ্ঠ রেখার দাদার বন্ধুর সাথে রেখার বিয়ে! রেণুকে কিন্তু আসতেই হবে। সে না এলে রেখা বিয়েই করবে না।"

ঐ দিনেই রেখার বিয়ে হয়ে গেল। রেখার গানে ও রেণুর বাজনায় সে দিনের বাসর বেশ জমে উঠল। তা'দের

প্রাণগুলি সেদিন "অমল ধবল পালেই" প্রেম দরিয়ায় ছুটে যাচ্ছিল। এমন সময় রাত তিনটে বেজে গেল। আর তা'দের তরণী বাওয়া হ'ল না। বাসরের আসর ভেঙ্গে গেল।

পরদিন আটটা বেজে গেল, তবু কেউ ঘুম হ'তে উঠে নি। দিদি যেয়ে সবাইকে ডেকে ডেকে উঠাল—"তোমাদের চা তো ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে।"

দিদির ডাকে একে একে সবায়ই চায়ের টেবিলে এসে বস্‌ল। মলয় রেখাও দেখা দিল। ধীরে ধীরে চায়ের টেবিলটাও বেশ জমে উঠল। হাসির গড্‌ডালিকায় ঘরের ভেতর ফোয়ারা ছুটছিল। এমন সময় লেখা লাফাতে লাফাতে এসে বলল—"সেজদি, সেজদি,—এই যে তোমার ফটো পেয়েছি!"

"ফটো!"

তখন সবাই তাকে জিজ্ঞেস ব'ল্‌ল—"কোথায় পেয়েছিস্।"

"আমি কি জানি? সেজদির ঘরে যেয়ে মলয়বাবুর জামা ধরে নাড়া দিতেই তার জামার বুক পকেট হ'তে একখানা মরক্কো বাঁধাই নোটবুকের মত মেজেয় পড়ে গেল। উঠাইয়া দেখি নোটবুক না,—একখানা কেশ। খুলতেই দেখি সেজদির ফটোখানা।"

"হু, আমায় কত ফটোর জন্য বকে ম'রছিলে না?"

লেখার কথা শুনে ঘরের ভেতর হাসির ফোয়ারা ছুটে গেল।

"হারে হতভাগা!" অজিত মলয়ের কান ধরে বলল—"পূর্ব্বরাগটা বুঝি ফটোতেই হ'য়েছিল।"

"উঃ! কানটে যে ছিঁড়ে ফেল্লে—"

তাই রিসার্চ্চ ক্লাস ফেলে ফেলে আমার মাথা খাওয়া হ'য়েছিল—"অজিত রেখাকে—অজিত রেখাকে—"

মলয়ের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল।

এমন সময় রেণু বলে উঠল,—"আহা! অজিতদা তুমি কচ্ছ কি? তুমি একাই যে ফটো চুরির শাস্তিটে দিয়ে দিচ্ছ। রেখার জন্য কিছু রাখ, রেখার জন্য কিছু রাখ।"

রেণুর ব্যস্ততা দেখে ঘরের ভেতর আবার একটা হাসির বন্যা ছুটল। শুধু রেখার চোখে মুখে একটা প্রেমের হিল্লোল খেলে গেল।

ষড়যন্ত্র

[শ্রীশিশিরকুমার বসু]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দুর্ব্বল, ক্লান্ত করসিনি গলিজাইনের বৈঠকখানায় তাহার সম্মুখে একখানি ইজি চেয়ারে শায়িত, পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বেইলস্কি উভয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান; বেইলস্কি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া করসিনিকে জিজ্ঞাসা করিল "মিঃ করসিনি, কি ঘটনা ঘটিয়াছিল আপনার মনে আছে কি ?"

করসিনি আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল "আমার মনে পড়িতেছে যে প্রিন্স জোরাফের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া বাজাইতে গিয়াছিলাম, বাজাইয়া গৃহে ফিরিবার সময় হঠাৎ রাস্তায় কয়েকজন লোক আমাকে আক্রমণ করে, তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না।—পরে যখন জ্ঞান হইল তখন ত আপনারা উপস্থিত ছিলেন।"

গলিজাইন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"মিঃ করসিনি, ভাল করিয়া মনে করিয়া দেখ, আরও কিছু মনে পড়িতেছে কি না ?"

করসিনি কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিল "হ্যাঁ, একটা কথা, জানি না এই ঘটনার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ আছে কি না ? শ্রীমতী কোয়েরো প্রিন্স জোরাফের গৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে আমায় নানাপ্রকারে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—বিপদাশঙ্কার কথাও বলিয়াছিল; প্রিন্স জোরাফের ভগিনী রাজকুমারী নাডাও জোরাফের গৃহ হইতে ফিরিবার সময় হাঁটিয়া আসিতে আমায় নিবারণ করিয়াছিলেন—গাড়ীতে আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছিলেন। জানি না এই ঘটনার সহিত ইহাদের দুইজনের কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কিনা ?"

কাউণ্ট গলিজাইন বেইলস্কির মুখপানে তাকাইয়া বলিলেন "বুঝিতেছেন ?"

বেইলস্কি সসম্ভ্রমে বলিলেন, "বুঝিতেছি বই কি ? এই উভয় মহিলাই এ ঘটনা পূর্ব্ব হইতে জানিতেন; এবং বেনামী পত্রে আমাদের সংবাদ দান করাও ইহাদেরই কার্য্য।"

গলিজাইন একমিনিট চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সে দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করিয়াছেন ?"

বেইলস্কি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল "তাহাদের দুইজন পলাইয়াছে অন্য দুইজন ধরা পড়িয়াছে—দুর্বৃত্তরা এতদূর শয়তান যে কিছুতেই তাহাদের নিয়োগকর্ত্তার নাম বলিতেছে না।"

কাউণ্ট গলিজাইন করসিনির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "করসিনি তোমার প্রতি এইরূপ অত্যাচারের জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত; ইহার প্রতিশোধ আমি লইবই। আর তোমার ভয়ের কোনও কারণ নাই, কারণ এখন হইতে তোমার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা দেহরক্ষী নিযুক্ত থাকিবে—এখন আপাততঃ তুমি তোমার হোটেলে ফিরিয়া যাইতে পার; সেখানে কাহারও নিকট এ সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিও না।"

পরদিন প্রাতে শ্রীমতী কোয়েরোর দাসীকে ধরিয়া থানায় আনিয়া বেইলস্কি জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানিলেন যে সে পুলিসে চিঠি লইয়া আইসে নাই; বেইলস্কি তাহাকে কিছু পুরস্কার দিয়া এই সমস্ত কথা গোপন রাখিতে উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন এবং রাজকুমারী নাডার পরিচারিকা কেটেরিসাকে ধরিয়া থানায় আনাইলেন। ভয়ে তৎক্ষণাৎই সে স্বীকার করিল যে সেই তাহার মনিবের হুকুমে বেনামী পত্রখানা থানায় তাহার নিকট দিয়া গিয়াছিল—বেইলস্কি তাহাকে যথারীতি অভয় দিয়া বলিয়া দিলেন যেন সে তাহার মনিব রাজকুমারী নাডাকে বলে যে বৈকালে তিনি নিজে তাঁহার সহিত দেখা করিবেন।"

পরিচারিকার মুখে সমস্ত শুনিয়া নাভা বিচলিত হইলেন, করসিনির কি হইল তাহা জানিবার জন্যও ব্যাকুল হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া করসিনিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে করসিনি এখন থিয়েটারে আছেন। এই সমস্ত শুনিয়া রাজকুমারী করসিনি সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন।

বৈকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে বেইলস্কি আসিয়া জোরাফ ভবনে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারীকে সংবাদ পাঠাইলেন; রাজকুমারী তখন তাহার অসুস্থা মাতার নিকটে ছিলেন—সংবাদ পাইয়া ধীরে ধীরে বসিবার কক্ষে আসিয়া বেইলস্কির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বেইলস্কি কুশল প্রশ্নের পর বলিলেন "বুঝিতেছেন নিশ্চয়ই—আমি কিসের জন্য আসিয়াছি; বেনামী পত্র যে আপনি দিয়াছিলেন সে সংবাদ আমরা পাইয়াছি—এখন অনুগ্রহ করিয়া সমস্ত আমায় খুলিয়া বলুন যে আপনি কি কি জানেন ?"

(ক্রমশঃ)

জাগৃহি

(বোধনের গান)

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

হায় আর কতদিন এমন করে রইবি নারী—
দুখে কতকাল আর ফেলবি এমন আঁখিবারি ?

অন্ধকূপে বদ্ধ থেকে রুদ্ধ হিয়া
একটীবারও ওঠে নাকি মর্ম্মরিয়া
কেন গুমরে মরিস্ মনকে শুধু আঁখিঠারি ?

প্রকৃতির ঐ নীল আকাশের চন্দ্রাতপে
বাঁধন হ'তে মুক্তি লভি' আসবি কবে
কবে ধরার বুকে স্বপ্রতিষ্ঠা করবি জারি ?

বিফলতার মরণ লভি পলাস্ না বোন্
শক্তিময়ী মা যে তাদের তাঁর কথা শোন্
তখন দেখবি তোদের সবাই হবে আজ্ঞাকারী।

জাতির মেরুদণ্ড যে রে তোরাই ভবে
হাসিমুখে বহিস বোঝা ধীর নীরবে
আবার দুঃখরাতে তোরাই ছিটাস্ শান্তিবারি।

এত করেও ন্যায় সুবিচার পাস্‌না যদি
পুরুষ হাতে লাঞ্ছনা তোর নিরবধি
তবে ক্ষমিস্ কেন জেনেও তারে অত্যাচারী ?

'দেবী দেবী' হায় সে মুখের কথা
নাইক তাতে একতিলও আন্তরিকতা
শুধু স্বার্থ হাঁসিল করার ওটা উমেদারী !

নারীর প্রতি এত হেলা এত ঘৃণা
মা বোনেরা সইবি কেন এ লাঞ্ছনা ?
ওরে জ্বালা চিতে তীব্র অনল মহামারী !

বিশ্বমায়ের ডাক এসেছে ওপার হ'তে
যুগের বাণী প্রদীপ দেখায় নবীন পথে,
তোরা আলোকে সব আয় বেরিয়ে আঁধার ছাড়ি'।

ফকিরের ফিকির

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

ত্রিতলস্থ বাতায়ন পার্শ্বে বসিয়া মৃণাল বীন্ বাজাইতে বাজাইতে একখানা মুসলমানী প্রেমের গান গাহিতেছিল :—

সহসা পাশের বাড়ীর জানালার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই সে দেখিতে পাইল, জানালার পর্দ্দাটা একটু একটু করিয়া এক-পাশে সরিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে সেখানে বসোরার গোলাপের মত একখানি সুন্দর মুখ—সত্যই দেখিবার মত বটে। কিন্তু সহসা পাশের বাড়ীতে এরূপ অপূর্ব্ব সুন্দরীর আবির্ভাব হইল কি করিয়া তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। পূর্ব্বে ইহাকে কোনদিন দেখিয়াছে বলিয়াও তাহার মনে হইল না। মৃণালের গলাটায় তাল মান গুলি কেমন যেন আটকাইয়া যাইতে লাগিল—বীন্‌টা যেন ক্রমেই বেসুরা বুলি বলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে শীঘ্রই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইল কারণ সে বুঝিয়াছিল যে তাহার সঙ্গীত শেষ হইবার সাথে সাথে মুখখানিও পরদার অন্তরালে নিঃশব্দে অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

কিন্তু মৃণালের ভাগ্যে এরূপ চুরি করিয়া দর্শন সুখলাভ অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। একটু পরেই পরদার অন্তরাল-স্থিত কোন অদৃশ্য স্থান হইতে একটী বামা কণ্ঠের আহ্বান মৃণালের কাণে ভাসিয়া আসিল, "আঙ্গুর ! ও আঙ্গুর !" বাতায়ন পার্শ্বস্থ প্রস্ফুটিত মুখখানি তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।

মৃণালের আর সঙ্গীতালাপ ভাল লাগিল না। বীন্‌টী একপার্শ্বে ঠেলিয়া রাখিয়া দিয়া আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল, "আঙ্গুর ! বটে ! সেই কাঁচা কুঁড়িটী এতদিন পর এমনি সুরসাল টকটকে আঙ্গুরটী হ'য়ে উঠেছে ! আমি ত চিন্‌তেই পারিনি মোটে !"

(২)

পাশের বাড়ীর গৃহস্বামী হবিবুল্লা সাহেবকে মৃণাল ছেলে বেলা হইতেই যথেষ্ট চিনিত। তিনি দুই পুরুষে মুসলমান। তাহার পিতা শেষ বয়সে একজন ফকিরের পাল্লায় পড়িয়া পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সেই হইতে পুত্র হরেন্দ্রের নাম হইয়াছিল হবিবুল্লা, পুত্রবধূ শোভাময়ীর নাম হইয়াছিল সফিয়া, কিন্তু ক্ষুদ্রা বালিকা আঙ্গুরের নাম আঙ্গুরই রহিয়া গেল কেন তাহা ঠিক্ বলা যায় না ; বোধহয় আঙ্গুর নামটা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই প্রযোজ্য।

হবিবুল্লা সাহেব খানাপিনায়, চাল-চলনে, খাঁটী গোঁড়া মুসলমান হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পত্নী শোভাময়ী 'সফিয়া' নাম গ্রহণ করিলেও তাহার দুর্ব্বুদ্ধি অথবা সুবুদ্ধি বশতঃই হউক—হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অটুট বিশ্বাস জলাঞ্জলি দিয়া মুসলমান হইতে পারেন নাই ; হিন্দুর আচার ব্যবহার পূজা পার্ব্বন সমস্তই তিনি প্রাণপণে বজায় রাখিয়াছিলেন। কাজেই হবিবুল্লা সাহেবের আবাস গৃহখানি বাহিরে ছিল খাঁটী মুসলমান, কিন্তু অন্দরে ছিল খাঁটী হিন্দু।

মৃণালের পিতার সহিত হরেন্দ্রবাবুর যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য জন্মিয়াছিল। আঙ্গুর, মৃণাল অপেক্ষা কয়েক বৎসরের ছোট হইলেও উভয়ে একসঙ্গেই পড়াশুনা এবং খেলাধূলা করিত। তারপর হরেন্দ্রবাবু 'হবিবুল্লা সাহেব' হইলে মৃণালের পিতার সহিত তাহার বন্ধুত্ব বন্ধন শিথিল হইয়া আসিলেও তাহাতে মৃণাল ও আঙ্গুরের বালক বালিকাসুলভ খেলাধুলার কোন বাধা জন্মে নাই। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে আঙ্গুর পিতার ইচ্ছানুক্রমে ক্রমেই পর্দ্দানশীন হইয়া পড়িল এবং মৃণালও বাল্যকালেই পিতার সহিত পশ্চিমে সঙ্গীত শিক্ষা করিতে চলিয়া গেল।

তারপর ৭ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে মৃণালের পিতা পশ্চিমেই মারা গিয়াছেন। মৃণালও আজ কয়দিন হইল দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে।

(৩)

অন্দর মহলস্থ নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া হবিবুল্লা সাহেব ডাকিলেন,—'সফিয়া!' স্ত্রী শোভাময়ী ধীরে ধীরে নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হবিবুল্লা সাহেব বলিলেন—"আঙ্গুর কি করছে?"

শোভাময়ী বলিলেন, "একখানা কি বই প'ড়ছে দেখে এলুম। কেন?"

"না! এম্‌নি জিজ্ঞেস্ ক'চ্ছিলুম।"

কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া শোভাময়ী বলিলেন,—"মেয়ের বিয়ের কিছু ঠিক কর্ত্তে পারলে?"

হবিবুল্লা বলিলেন—"তাইতো ভাবছি।"

"আর কতকাল ভাববে? তোমার ভাবতে ভাবতে তো মেয়ে বুড়ী হতে চ'ললো।"

হবিবুল্লা সাহেব বাল্য-বিবাহের ঘোর বিদ্বেষী ছিলেন, বলিলেন,—"না এমন আর কি বিশেষ বড় হয়েছে? সে যাক্—একটা সম্বন্ধ স্থির করেছি।"

"কোথায়?"

"সাহদাত সাহেবের ছেলের সাথে। মস্ত বড় লোক। ছেলেটী দেখতে সুন্দর, ব্যারিষ্টারী পড়তে বিলেত গেছে, আসছে বছর ফিরে আসবে। সাহদাত সাহেব কথা দিয়েছেন, ছেলে ফিরে এলেই আমার মেয়ের সাথে বে দেবেন।"

"তা বেশ তো! কিন্তু আবার একটা বছর দেরী ক'ত্তে হবে?"

"তা হোক্‌গে,—আমি তা ভাবছি নে,—আমি ভাবছি আর একটা কথা। সাহদাত সাহেব বলেছেন, মেয়েকে বেশ ভাল ক'রে লেখাপড়া আর গান-বাজনা শিখোতে।"

"লেখাপড়া তো ঢের শিখেছে, আর কি হবে?"

"তাতো শিখেছে—কিন্তু গান বাজনা?"

"শেখাও না কেন!"

"শেখাবো তো, ওস্তাদ পাচ্ছি কোথা? আমার তো গানের বিদ্যে জানই।"

শোভাময়ী একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"আমি কিন্তু একজনের সন্ধান দিতে পারি।"

হবিবুল্লা বলিলেন,—"কোথায়?"

"এই পাশের বাড়ীতে আজ কদিন হ'ল একটী ছেলে এয়েছে, খুব ভাল গাইতে বাজাতে পারে,—ভারী মিঠে গলা। আমি আড়াল থেকে ক'দিন শুনেছি।"

হবিবুল্লা সবিস্ময়ে বলিলেন,—"পাশের বাড়ীতে জ্যোতির্ম্ময় বাবুর বাড়ী?"

শোভাময়ী বলিলেন,—"হ্যাঁ।"

"ছেলেটীকে আগে কোনদিন দেখেছ বলে বোধ হয়?"

শোভাময়ী বলিলেন,—"আগে দেখেছি! কই না, মনে হয় না তো!"

হবিবুল্লা সাহেব ভাবিতে লাগিলেন।

(৪)

পরদিন সকালে বহির্ব্বাটিতে বসিয়া মৃণাল একটা এস্রাজে সুর দিতেছিল, কিন্তু মন তার এস্রাজের দিকে মোটেই ছিল না। পূর্ব্বদিন রাত্রে মৃণাল আঙ্গুরের সহিত জড়িত একটা মধুর স্বপ্ন দেখিয়াছিল, এবং খুব সম্ভবতঃ সে তখন তাহাই মনে মনে বিশ্লেষণ করিতেছিল। এমন সময় দ্বারবান আসিয়া বলিল,—বাহিরে হবিবুল্লা সাহেব তাহার দর্শনপ্রার্থী।

সহসা সাহেবের আগমনের কোন কারণ মৃণাল অনুমান করিতে না পারিয়া বিস্মিত হইল। দ্বারবানকে হুকুম দিল যেন সাহেবকে অবিলম্বে সসম্মানে তাহার নিকট লইয়া আসা হয়। হবিবুল্লা সাহেব প্রবেশ করিতেই মৃণাল এস্রাজটী রাখিয়া তাহাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "বসুন কাকাবাবু।"

হবিবুল্লা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তুমি আমাকে চেন নাকি? কিন্তু কই! আমি তোমাকে চিন্‌তে পাচ্ছিনে তো!"

মৃণাল সহাস্যে বলিল,—"বারে! দুদিনেই সব ভুলে গেলেন কাকাবাবু? আমি মৃণাল।"

হবিবুল্লা সাহেব বলিলেন, "তা বেশ বাবা বেশ। তুমি বেশ বড়টী হয়েছ। তাই চিন্‌তে পারিনি। তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন, তা জানো বোধহয়। তিনি মারা গেছেন সে খবর পেয়েছিলুম, শুনে বড্ড কষ্ট হ'ল। অমন ভদ্রলোক আর হয় না।"

মৃণাল কথা কহিল না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর দেওয়াল

গাত্র সংলগ্ন নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রগুলির দিকে চাহিয়া হবিবুল্লা বলিলেন, "তুমি নাকি বেশ গাইতে বাজাতে পার ?"

মৃণাল বলিল,—"পশ্চিমে এতদিন ধরে তো ঐ শিখলুম, কাকাবাবু।"

হবিবুল্লা সাহেব তাহার কন্যার বিবাহ সম্বন্ধের কথা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "তাই তোমার কাছে এসেছিলুম বাবা। তুমি যদি আমার মেয়েটীকে একটু গান বাজনা শিখোও। আমি উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে রাজি আছি।"

মৃণাল বলিল, 'তা বেশ তো কাকাবাবু শিখোবো বৈকি খুব মনযোগ দিয়ে শিখোবো, কিন্তু পারিশ্রমিক আমি কিছুই নোবো না তা বলে দিচ্ছি"

"কেন ?"

"আপনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। তা ছাড়া আপনার মেয়ে আঙ্গুরতো আমার অচেনা নয় !"

"তুমি তাকে চেন নাকি ?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "আপনি যে সবই ভুলে গেছেন কাকাবাবু আঙ্গুর আর আমি ছেলেবেলায় একসাথে কত খেলা ধুলো করেছি যে।"

হবিবুল্লা হাসিয়া বলিলেন, "হ্যা, হ্যা, এইবার মনে প'ড়েছে বটে। তখন তোমরা খুব ছোট ছোট ছিলে, অনেকদিনের কথা কিনা, ভাল মনে নেই। কিন্তু তুমি কিছুই নেবে না, শুধু শুধু খাটবে, এটাতো ঠিক্ হয়না বাবা।"

মৃণাল সহাস্যে বলিল, "বেশতো। আঙ্গুরের বের সময় নেমন্তন্ন ক'রে খুব খাইয়ে দেবেন।"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া হবিবুল্লা সাহেব বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্থির হইল সেই দিন সন্ধ্যা হইতেই মৃণালের শিক্ষকতা আরম্ভ হইবে। কারণ সন্ধ্যাকালই সঙ্গীত শিক্ষার পক্ষে প্রশস্ত।

(৫)

মৃণাল ও আঙ্গুরের বাল্যের পরিচয়টুকু ক্রমেই গাঢ় হইতে লাগিল—প্রীতিটুকু ক্রমেই গভীর হইয়া উঠিতে লাগিল। ফলে ছয়মাসের মধ্যে আঙ্গুর উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট হইতে অনেক জিনিস শিখিয়া ফেলিল। প্রেম শিখিল, গান শিখিল, প্রেমের গান শিখিল, বাজনা শিখিল, ছেলেবেলার লুকো-চুরী খেলাটা নূতন করিয়া নূতন ভাবে শিক্ষা করিল, সাহানা, বেহাগ আলাপের সাথে হৃদয়ে হৃদয়ে আলাপ করা শিখিল, আরও কত কি শিখিল তাহা শুধু তাহারাই জানে।

হবিবুল্লা সাহেব বাহির হইতে দেখিয়া খুসী হইলেন, শোভাময়ী ভিতর হইতে দেখিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন,—ইচ্ছা করিয়াই উভয়কে বাধা দিলেন না। কারণ হিন্দুধর্ম্মের উপর গভীর আস্থা প্রযুক্ত তিনি ভাবিয়াছিলেন, আঙ্গুর কোন মুসলমান যুবকের হাতে না পড়িয়া যদি তাহাদের পাল্টী ঘর এই সুন্দর ধনবান, সচ্চরিত্র যুবকটীর হাতে পড়ে তাহাই সর্ব্বাংশে ভাল হইবে। ভবিষ্যতে তাহারা সদ্বংশজাত হিন্দুর ন্যায় সুখে কালযাপন করিতে পারিবে এবং তাহার স্বামী ইস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য আঙ্গুরের গায়ে যে কলঙ্কের ছাপটুকু লাগিয়া আছে তাহাও কালক্রমে হিন্দু সমাজ একটু একটু করিয়া বিস্মৃত হইয়া যাইবে।

কিন্তু অগ্নি অধিকক্ষণ ছাই চাপা থাকে না ; একটু হাওয়া আসিলেই তাহার স্বরূপ বাহির হইয়া পড়ে। মৃণালের অপূর্ব্ব শিক্ষকতাও তেমনি অধিকক্ষণ চাপা রহিল না। একদিন হবিবুল্লা সাহেব কন্যার শিক্ষাগৃহের পার্শ্ব দিয়া যাইবার সময় সহসা উভয়ের প্রণয়ালাপ শুনিতে পাইলেন। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে শ্রবণ করিয়া হবিবুল্লা সাহেব ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন,—"মৃণাল ?"

মৃণালের হাত হইতে আঙ্গুরের হাতখানা খসিয়া পড়িল। মৃণাল চমকিয়া উঠিয়া উত্তর দিল,—"কাকাবাবু।"

হবিবুল্লা গর্জ্জিয়া বলিলেন,—"আমি আমার মেয়েকে গান শিখোতে বলেছিলাম,—তাকে কুপথে নিয়ে যেতে বলি নি।"

মৃণাল সবিস্ময়ে বলিল,—"কুপথে !"

"আমার কাছে গোপন করা বৃথা, আমি সব জানতে পেরেছি।"

একমুহূর্ত্ত নীরবে থাকিয়া নতমুখী আঙ্গুরের হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃণাল বলিল, "আপনার অনুমতি হ'লে আমি আঙ্গুরকে বিয়ে করবো কাকাবাবু।"

হবিবুল্লা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বে কোরবে। তোমার বাবা আমার বন্ধু ছিলেন ব'লে কাফেরের সাথে মেয়ের বে দোবো ভেবেছ নাকি? তুমি এক্ষুণি আমার বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, যদি কোনদিন এখানে এস তা' হ'লে অপমান হ'তে হবে তা ব'লে দিচ্ছি।"

আঙ্গুরের হাত ছাড়িয়া দিয়া মৃণাল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(৬)

হবিবুল্লা সাহেবের অন্দর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অশান্তির সৃষ্টি হইল। আঙ্গুর আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিনরাত কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মৃণাল আরও কিছুদিন তাহার শিক্ষকতা করিলে সে যে আরও কি একটা করিয়া বসিত ঠিক বলা যায় না। শোভাময়ী কন্যার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেমন করিয়া হয় মৃণালের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। দেখিয়া শুনিয়া হবিবুল্লা সাহেব অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। তিনি অন্দরের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া বাহিরে বাহিরে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্তু একদিন কোনও বিশেষ প্রয়োজনে মুহূর্ত্তের জন্য অন্দরে আসিয়া তিনি স্ত্রীর নিকট ধরা পড়িয়া গেলেন। শোভাময়ী রুক্ষস্বরে বলিলেন, "মেয়েটা যে দিনরাত কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে, তা কি চোখে দেখতে পাচ্ছো না?"

হবিবুল্লা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "তা আমি কি কোরবো?"

"তুমি কি কোরবে! ঐ একটা মাত্তর মেয়ে—মৃণালকে ভালবাসে; তার সাথে বিয়ে দিলে যদি সুখী হয়, তুমি তা না ক'রে কি মেয়েটাকে মেরে ফেলতে চাও না-কি?"

"তাই বোলে কাফেরের সাথে মেয়ের বে দোবো? সমাজে নিন্দে হবে যে।"

শোভাময়ী গর্জ্জিয়া বলিলেন, "কাফের! কাফের কে? মৃণাল যদি কাফের হয় তা হ'লে তুমি আমি কি? তুমি যেন দু'দিন হ'ল পীর পয়গম্বর হয়েছ, কিন্তু তোমার চোদ্দ-পুরুষ কি ছিলেন? আর সমাজ সমাজ কোচ্ছো, মেয়ের প্রাণের চেয়ে কি তোমার সমাজই বড় হ'ল নাকি?"

হবিবুল্লা ভাবিতে লাগিলেন।

গৃহিণী আবার বলিলেন, "মেয়ের যদি কিছু হয়, তা হ'লে আমিও গলায় দড়ি দোবো তা ব'লে রাখছি।"

হবিবুল্লা গম্ভীর মুখে বলিলেন, "বেশ! মৃণাল যদি ইস্‌লাম ধর্ম্মমতে বিয়ে করে, তা হ'লে আমি রাজী আছি।"

গৃহিণী চিন্তাকুল বদনে বলিলেন, "তা হলে তাই দেখগে যাও।"

হবিবুল্লা সাহেব তৎক্ষণাৎ মৃণালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু মৃণাল স্বীকৃত হইল না; অধিকন্তু সদর্পে বুক ফুলাইয়া বলিল, "তাহার কন্যার জন্য সে স্বধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে পারিবে না—হিন্দুমতে বিবাহ হইলে সে রাজী আছে।"

হবিবুল্লা সাহেব বিষণ্ণ বদনে ফিরিয়া আসিলেন। মৃণালও তৎপর দিবস হইতে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

(৭)

এক বৎসর পরের কথা।...

ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। নিরুদ্দিষ্ট মৃণালের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আঙ্গুর অনেকটা শান্ত হইয়াছে, শোভাময়ীও তাহাকে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছেন। শাহ্‌দাত সাহেবের পুত্র ইয়াকুব হোসেন ব্যারিষ্টার হইয়া কয়দিন হইল বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কাজেই চারিদিকে শান্তির লক্ষণ দেখিয়া হবিবুল্লা সাহেব মহানন্দে পূর্ব্বকৃত বিবাহের কথাবার্ত্তাটা পাকা করিয়া ফেলিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে সেই অঞ্চলে সহসা এক বৃদ্ধ ফকিরের শুভাগমন হইয়াছিল। ফকির সাহেবের শ্বেতবর্ণ গুম্ফ, শ্মশ্রু ও বাবরী চুল, অথচ কাঁচা কাঁচা মুখখানি দেখিলে স্বতঃই লোকের মনে ভক্তির উদয় হইত। কেহ বলিত, তাহার বয়স শত বৎসর, কেহ বলিত তাহারও অধিক, কেহ বলিত তিনি স্বয়ং পয়গম্বর, যাহা বলেন, তাহাই ফলিয়া থাকে। ফকির সাহেব বৃক্ষতলেই আস্তানা লইয়াছিলেন, কাহারও বাড়ী আসিতেন না এবং তাহার ইচ্ছানুযায়ী মাত্র দুই একজনের সহিত কথা কহিতেন।

একদিন সকালে হবিবুল্লা সাহেব স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ, ফকির সাহেবের খুব নাম শুনছি, তিনি নাকি যা

বলেন তাই হয়। মেয়ের হাতটা একবার এর কাছে দেখালে হয় না ?"

শোভাময়ী বলিলেন, "বেশ তো দেখাও না। কিন্তু তিনি কি আমাদের গরীবখানায় আসবেন ? আসেন না তো শুনেছি।"

"দেখি যদি হাতে পায়ে ধরে নিয়ে আসতে পারি। তা না হলেও তো অন্ততঃ তোমার অম্বলের ব্যথার দাওয়াইটা নিয়ে আসতে পার্কো ? অনেকদিন ধরেই তো ভুগছো।"

শোভাময়ী বলিলেন, "তা বৈকি ! কিন্তু যদি যাও তো আমি বলি আজই একবার যেয়ো, কারণ ওসব সন্ন্যাসী ফকিরদের বিশ্বেস নেই, হঠাৎ এক সময় নিরুদ্দেশ হ'য়ে যাবেন।"

হবিবুল্লা বলিলেন, "আজই কেন, এক্ষুণি যাচ্ছি আমি।"

ফকিরের আস্তানায় পৌছিয়া হবিবুল্লা দেখিলেন, তখনও অধিক সংখ্যক লোক জড় হয় নাই। সসম্ভ্রমে সেলাম করিয়া তিনি নীরবে ফকিরের সম্মুখেই বসিয়া পড়িলেন। ফকির সাহেব তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "স্ত্রীর অসুখের দাওয়াই নিতে এসেছ ?" ফকিরের অলৌকিক শক্তি দেখিয়া হবিবুল্লা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না।

ঝোলা হইতে একটা মস্ত বড় মাদুলি বাহির করিয়া হবিবুল্লার হাতে দিয়া ফকির সাহেব বলিলেন, "এই নাও আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে এটা খুলে একটু দুধ দিয়ে দাওয়াই খেতে বোলো—এর ভেতর দাওয়াই আছে।"

হবিবুল্লা সবিনয়ে বলিলেন, "আরো একটা আরজ আছে মেহেরবান্।"

ফকির সাহেব ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি ?"

"আমার মেয়ের হাত দেখতে একটীবার গরীবখানায় পায়ের ধূলো দিতে হবে।"

"তাকে এখানে আন না কেন ?"

"সে পর্দ্দানসীন।"

কিন্তু ফকির সাহেব কাহারো বাড়ী যাইতে সহসা রাজী হইতে চাহিলেন না! অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়া হবিবুল্লা তাহাকে স্বীকার করাইয়া লইলেন।

(৮)

ফকির সাহেবকে সসম্ভ্রমে অন্দরে লইয়া বসিতে দেওয়া হইল এবং আঙ্গুরকে তাহার নিকট লইয়া আসা হইল।

অনেকক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে কররেখা পরীক্ষা করিয়া ফকির ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন, আঙ্গুরের হাতখানা ঘৃণাভরে ঠেলিয়া দিয়া গম্ভীর মুখে বসিয়া রহিলেন।

হবিবুল্লা সভয়ে বলিলেন, "কি দেখলেন ?"

ফকির বলিলেন, "তোমার মেয়ের সবই ভাল কিন্তু—"

"কিন্তু কি ফকির সাহেব ?"

ফকির সক্রোধে বলিলেন,—"কিন্তু সে ইস্‌লামের কলঙ্ক, একটা কাফেরকে মনে মনে ভালবাসে, সেই কাফেরটার সাথেই এর সাদি হবে।"

"আমি যে একজন মুসলমানের সাথেই এর সাদি স্থির করেছি সাহেব!" আঙ্গুরের ভাবী খসম ব্যারিষ্টার ইয়াকুব হোসেনের কথা হবিবুল্লা সাহেব সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন।

পক্ক শ্মশ্রুর মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মাথা নাড়িয়া ফকির বলিলেন, "যেমন করেই হোক্ এ বিয়ে কিছুতেই হবে না।—হতে পারে না। খোদাতালার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।"

হবিবুল্লা বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "ভাগ্যলিপি কি কাটান যায় না ফকির সাহেব ?"

"বোধ হয় যায়, কিন্তু আমার সময় নেই।"

হবিবুল্লা ফকিরের পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িলেন, "যেমন করিয়াই হউক কপালের লেখা কাটাইতে হইবে। কাফেরের সহিত মুসলমান কন্যার বিবাহ হইলে ইস্‌লামের মান থাকে না—ইস্‌লামের মান রক্ষা করা ফকির সাহেবের কর্ত্তব্য।"

ফকির সাহেব অবশেষে স্বীকৃত হইলেন। হাসিয়া বলিলেন, "তুমি তো ভারী নাছোড়বন্দ্ দেখছি। আচ্ছা বেশ, আমি কাটিয়ে দোবো, কিন্তু আমার ইচ্ছেমত সব ব্যবস্থা কোত্তে হবে।"

হবিবুল্লা তৎক্ষণাৎ রাজি হইয়া বলিলেন, "কিরকম ব্যবস্থা বলুন, আপনার ইচ্ছেমতেই সব ঠিক ক'রে দোবো হুজুরালি।"

ফকির বলিলেন, "এমন বিশেষ কিছুই নয়। তোমার মেয়ে যে ঘরে শোয় তার পাশের ঘরে আমার নামাজের ব্যবস্থা কোত্তে হবে। আমি সারা রাত্তির খোদার কাছে আরজ্ কোরবো, তোমার মেয়েকে নিজের ঘরে বসে সব শুনতে হবে, একটুও ঘুমুতে পাবে না। আর তোমার মেয়ের বা আমার সঙ্গে অথবা আশেপাশে অন্য কেউ থাকতে পাবে না, থাকলে তার ভাল হবে না।"

হবিবুল্লা বলিলেন, "বেশ তাই হবে। কিন্তু আপনি কবে আরজ্ কোর্ব্বেন ফকির সাহেব?"

"তোমার মেয়ের সাদী কবে দেবে স্থির কোরেছো?"

"স্থির—এই আসছে জুম্মাবার।"

ফকির সাহেব বলিলেন, "তা হ'লে আজই সব ব্যবস্থা কর, আমি সন্ধ্যের পর আসবো।"

ফকির সাহেবের ইচ্ছানুক্রমেই সব বন্দোবস্ত হইল। যথা সময়ে তিনি শুভ পদার্পণও করিলেন, কিন্তু সমস্ত রাত্রি কি প্রকারের আরজ্ করিলেন তাহা সুষুপ্তিমগ্ন গৃহবাসীগণের মধ্যে কেহই দেখিল না।

(৯)

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া হবিবুল্লা দেখিলেন, ফকির সাহেব নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, আঙ্গুরেরও কোন সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না! উভয়েরই কক্ষদ্বার উন্মুক্ত!

অম্বলের ব্যথার মাদুলীটা খুলিয়া দাওয়াই পাওয়া গেল একখণ্ড ক্ষুদ্র পত্র। পত্রটা এইরূপ :—

কাকাবাবু,

আঙ্গুরকে নিয়ে চল্লুম, কিছু মনে কোর্ব্বেন না। তাকে হিন্দুশাস্ত্রমতেই বিয়ে করবো, কারণ ফকিরের কথা মিথ্যে হবার নয়। আঙ্গুর সাবালিকা,—স্বইচ্ছায় আমার সাথে যাচ্ছে; কাজেই মকর্দ্দমায় কিছু সুবিধে হবে না, শুধু আপনারই কলঙ্ক বাড়বে। বিয়ের পর যখন ফিরে আস্‌বো তখন আঙ্গুর আমার পরদানসীন স্ত্রী হবে, সুতরাং কোন পুরুষের তার সাথে সাক্ষাৎ সম্ভবপর হবে না। ক্ষমা কোর্ব্বেন।

প্রণতঃ—মৃণাল

পত্রখানি পড়িয়া হবিবুল্লা সাহেব নিস্ফল আক্রোশে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু অম্বলের দাওয়াইটা ভালই বলিতে হইবে, কারণ সফিয়া ওরফে শোভাময়ীর অধরকোণে একটু ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।
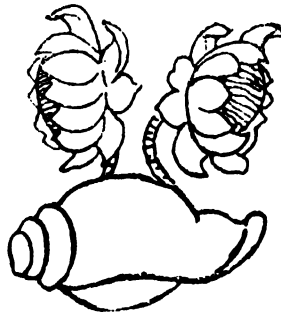
পল্‌কা

(ছোট গল্প)

[শ্রীমতিলাল দাস এম-এ]

(১)

শৈশব-স্মৃতির মাঝে একটা মিষ্ট আমেজ আছে, লুপ্তসুরভি গোলাপবাসের মতন। কিন্তু সেটা একেবারে বেদানায় মস্‌গুল—সে বেদনা আপনাকে দহিয়া একটা সুখানুভূতি জাগায়। তাই আজ অনেকদিন পরে পল্‌কার কথা মনে পড়ায় মনটা কেমন ভাববিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল।

তার ভাল নাম প্রলয়েশ। কিন্তু অত বড় গালভারি নাম বিদ্যালয়ের হাজিরা খাতাই শুধু নির্ব্বিবাদে বহন করিত। ব্যস্ত মানুষের দল নামটাকে পল্‌কা করে নিয়েছিল। আমার বেশ মনে পড়ে যেদিন প্রথম পল্‌কাকে দেখি, সেদিন পড়ার ঘণ্টায় পণ্ডিত মহাশয়ের সংস্কৃত পড়ান একেবারে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। আগুনের হল্কার মতন চঞ্চল বেগে সে ক্লাসে এসেই বইগুলি সজোরে টেবিলে ফেলে সবার দিকে চেয়ে চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর নিঃশব্দে খাতা বের করে পণ্ডিত মহাশয়ের চেহারা নকল করতে লাগল। পণ্ডিত মহাশয় প্রথম মনে করেছিলেন এই আগন্তুক তার পাঠনায় মুগ্ধ হয়ে গেছে, আর সুবোধ বালকের মতন প্রয়োজনীয় বিষয় লিখে নিচ্ছে। তিনি প্রীতি-স্মিত মুখে পল্‌কার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ;—"খোকা তোমার নাম কি ?"

"পল্‌কা।" উত্তরের মধ্যে দিল এমন একটা স্বতন্ত্র স্বাধীনতা ও চঞ্চল উদ্দামতা যা শান্ত সুবোধ আমাদের মনে একেবারে অদ্ভুত বলে ঠেকল। এ উত্তর শুনে পণ্ডিত মহাশয় যে খুসী হয়েছিলেন, তা মনে হয় না, তবে তিনি আমাদের মত চমকিয়ে যান নি।

"তোমার ভাল নাম কি ?"

"সে ভারি বিশ্রী—খাতায় দেখতে পাবেন !"

"নিজের নাম না হয় তোমার বিশ্রী বলে মনে হয়, কিন্তু যারা আদর করে তোমার নাম রেখেছেন—তাদের সম্মানের জন্য—"

"আমি জগতে কাউকে সম্মান করি না।" মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সে উত্তর করিল—আমরা বজ্রাহতের মতন বিমোহিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন শক্ত ছেলের হাতে পড়েছেন। তাই ওদিকটা ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"আচ্ছা তোমরা কি ?"

"আমরা কি জানিনা—তবে আমি দুপেয়ে মানুষ—তার চেয়ে কিছু বেশী পরিচয় জানিনা—"

পণ্ডিত মহাশয় বড় চটে গেলেন। তারপর একটু ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—"বড় ফাজিল ছোকরা দেখছি যে, খাতায় কি লিখছ দেখি ?"

কথাটী না বলিয়া পল্‌কা খাতা পণ্ডিত মহাশয়ের সামনে ফেলে দিল, তাতে পণ্ডিত মহাশয়ের চেহারা অবিকল গড়ে উঠেছিল ছাবটা নেহাৎ মন্দ হয় নি। সকলের চেয়ে মজার হয়েছিল টিকিটা—সেটা একেবার চীনা টীকির মতন লম্বা করে আঁকা হয়েছিল।

বেত্রাঘাতের ব্যাপার উপস্থিত মনে করে, ক্লাশের অনেক ছেলে খুসী হয়ে উঠল, কিন্তু আমার মনট কেন জানিনা এই ছেলেটীর প্রতি অকারণ সমবেদনায় ভরে উঠিছিল। কিন্তু আমাদের সকলের আশঙ্কা নিস্ফল হ'ল, পণ্ডিত মহাশয় পল্‌কারে কিছু না বলে পুনরায় পড়াতে লাগলেন—

"বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্যাতি পাত্রতাম।
পাত্রতাৎ ধনমাপ্নোতি ধনাৎ ধর্ম্মস্ততো সুখম॥"

(২)

পল্‌কার অন্য পরিচয় জানা গেল না, কিন্তু যদি স্বনামে পুরুষ ধন্য হয়, তবে পল্‌কা নিশ্চয় হয়েছিল। তার আগমনে

ক্ষুদ্র সহরটী নিমেষ মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠল। নিত্যকার মামুলী আনাগোনা যেখানে পাথরের মতন চেপে বসেছিল, সেখানে সে একটা মাদকতা নিয়ে আসল। সহরের হোমরা চোমরা হ'তে মেথর মুদ্দফরাস পর্য্যন্ত সবাই পল্‌কাকে চিনে নিল। আর পল্‌কার সঙ্গে সবার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। যারা তাকে ঘৃণা করিত, যারা তার দুষ্টমিকে অশ্রদ্ধা করিত তারাও পর্য্যন্ত তার সম্মুখে তাকে খাতির করিত—কারণ তার মুখে ও চেহারায় যেন একটা যাদু ছিল। সহরের ঘুঁটেকুড়ুনী বুড়ীকে সে মা বলে তার বাসায় আশ্রয় দিল। এই বুড়ীর অতীত ইতিহাস কালিমাময় ছিল বলে এই অদ্ভুত ব্যাপারটায় ছেলেদের গুরুজনেরা ভীত হয়ে উঠলেন। কিন্তু বাধা সহ্য করা তার ধাতে ছিল না, তাই তার আশ্রয়নীড় সে কিছুতেই ত্যাগ করল না।

পল্‌কার কাজ ছিল সব নূতন ধরণের। মহকুমার হাকিমের বাড়ীর সামনে যে মাঠ ছিল, সেই মাঠে আমরা অনেককাল ধরে খেলা করে আসছিলাম, কিন্তু নূতন একজন হাকিম এসে মাঠে বিলিতি ফুলের চারা বসালেন আর আমাদের খেলাও বন্ধ হয়ে এল।

ছেলেদের সব হাত করে পলকা একদিন দুপুরে হাকিম যখন কাছারীতে গেছেন, তখন সমস্ত ফুলের চারা ছিঁড়ে ফেলে দুধারে বাঁশের খুঁটী পুতে ছেলেদের খেলতে বলল। খেলা পুরাদমে চলতে লাগল। ডেপুটী বাবুর আরদালি ফিরে এসে দেখল যে বাবুর সাধের ফুলের চারা নষ্ট হয়ে গেছে। আরদালি ছুটে চলল—খানিক পরে ডেপুটীবাবু দু'তিন জন পুলিস নিয়ে বাসায় ফিরে পল্‌কার অবাক কাণ্ড দেখে কি করবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। রাগে তাঁর চোখ দুটী লাল হয়ে উঠল।

খানিক পরে কড়া হাকিমী মেজাজে উত্তর দিলেন—"এই এদের সব পাকড়াও।"

আমরা ভয়ে ভয়ে খেলছিলাম, এবার ব্যাপার সঙ্গীন দেখে নিরুপায় হয়ে পল্‌কার মুখের দিকে চাইলাম। পল্‌কা বিজয়ী বীরের মত ঘাড় সোজা করিয়া বলিল—"দেখুন, এদের কারো দোষ নেই—এ দোষ আমি একা করেছি—এদের বাড়ী যেতে দিন।"

ডেপুটীবাবু নিজের ক্ষমতা পরিচালনের চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "এই পাঁড়ে, ওরে বেটা ভকত, বাঁধ বজ্জাত ছোকরা সবাইকে বাঁধ।"

পলকা তার মাংসবহুল সবল হাত গুটাইয়া বলল—"এই পাঁড়ে খবরদার!" তারপর আমাদের পানে চেয়ে বলল—"যা ছোঁড়ারা তোরা পালা।"

মহকুমার কর্ত্তার কড়া হুকুমের ভয়েও পাঁড়ে, ভকত, শিউলাল এক পা নড়ল না, অন্য সকলে "যঃ পলায়তি স জীবতি" নীতি অনুসরণ করে পলায়ন করল। আমি শুধু পলকার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এ কাণ্ডটা হয়ে গেলে ডেপুটীবাবু পল্‌কাকে বেধে নিয়ে বারান্দায় বসালেন। খানিক পরে রাগ থামলে তিনি পল্‌কাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কিহে ছোকরা, তোমার কি ভয় ডর নেই? তুমি যে ক্ষতি করেছ, তার জন্য তোমার জেল হ'বে তা জান—"

"তার আগে আপনার জেল হওয়ার দরকার—এতদিন ধরে ছেলেরা যে মাঠে খেলা করছিল—সে মাঠ আপনি বন্ধ করেন কোন আইনে? আপনার একার সুখ বড়? না এতগুলি ছেলের সুখ বড়।"

ডেপুটীবাবু কি জানি কেন পল্‌কাকে এই কথা শুনে ছেড়ে দিলেন, আর সেইদিন থেকে আমাদের খেলাও নির্ব্বিবাদে চলতে লাগল।

(৩)

সবার চেয়ে পল্‌কার সঙ্গে আমার ভাব হয়ে গেল। অন্য সবাই পল্‌কার উৎসাহকে অবজ্ঞা করত, তার চাঞ্চল্যকে সমীহ করত, কিন্তু তার প্রাণধারাকে বুঝত না কিংবা ভাল বাসত না। আমি তাকে বুঝতে চাইতাম, ভালবাসতে চাইতাম। পল্‌কা যে আমাকে ভালবাসত, তা নয়, তবে সে ছিল ঝড়ো হাওয়া—বইতে বইতে যখন যেস্থানে বেধে যায়, সেখানে আপনাকে প্রকাশ করে। পল্‌কাও তেমনি আমাকে দু'একদিন একটু আদর করত—আমার বিষয় একটু সচেষ্ট হ'ত। আমার মনের খবর নিতে চেষ্টা করত।

ছোট বয়সে আমার কবিতা লেখার বাতিক ছিল। মানুষের বর্দ্ধমান হৃদয়ে সৃষ্টিক্রিয়ার আনন্দ একেবারে স্বর্গীয় মাধুরী বয়ে আনে, তাই এ কবিতা লেখার একটা সার্থকতা আছে। মাসিক পত্রের সম্পাদকেরা যদিও এই নবোদ্ভিন্ন কবিতা কলিকার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন না, তাহা হইলেও মানস লোকের যিনি কর্ত্তা তিনি ঐ আলোর বার্ত্তাপ্রাপ্ত তরুণ প্রাণকে নিশ্চয়ই অবজ্ঞা করেন না।

পল্‌কা নিজে গাইয়ে ছিল, তার কণ্ঠস্বরও সুমিষ্ট ছিল। কতদিন অর্দ্ধরাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শুনতাম, পথ বেয়ে পল্‌কা গান গেয়ে চলেছে কখনও উদাস সকরুণ সুরে, কখনও ব্যগ্র বিপুল উন্মাদনায়, কখন তীব্র যাতনার্ত্ত ব্যথায়, কখনও প্রণয়ালস বিহ্বলতায়। কিন্তু ভক্তির আবেশ তার কণ্ঠে ছিল না, ভগবানের নাম তার মুখে ছিল না। তার মতে ভগবান কেউ নেই—মানুষই তার আপন প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির দ্বারা ভগবান বলে একটা খেলনা গড়ে তুলেছে। পল্‌কা আমার কবিতা লেখা সহ্য করতে পারত না। তার একটা কারণ তার ন্যাকামি ভক্তির সুর। তরুণ কবি তরুণ বয়সে লেখার খোরাক কম পায়, কারণ কবিতার আদিম সুর তখন তার প্রণয় জ্ঞানহীণ চিতে আপন বাঁশী বাজায় না। ভগবান আর প্রকৃতি—এই দুই নিরীহ বস্তুই তার সমস্ত প্রাণের আগ্রহ বজায় রাখে।

এই কবিতার ব্যাপার নিয়েই তার সঙ্গে আমার একটা ক্ষণিক মনোমালিন্য হয়। কিন্তু তার আগের ঘটনাগুলিও একটু জানা দরকার। পল্‌কা ইদানিং বড়ই বাড়াবাড়ি করে তুলেছিল। তার পরিচয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার খাওয়ার কোনও বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল না। ঘুরতে ঘুরতে যেদিন যেখানে পৌছে যেত সেদিন সেখানেই দুটো ভাত খেত। কিন্তু এতে সে জাতবিচার করত না বলে লোকে ভাল দেখত না, তার উপর যখন সেদিন রামা মেথরের ভাত খেয়ে বসল, তখন সমাজ তা আর স্নেহ চক্ষে দেখতে পারল না—

ঘরে ঘরে কড়া আদেশ বার হ'ল পল্‌কার সঙ্গে কেউ মিশতে পারবে না। কিন্তু এ আদেশ টিকল না—তার মনের বন্যাস্রোত এই আল্‌গা বাঁধন ভাসিয়ে নিয়ে গেল।

কিন্তু এই সময় আর একটা ব্যাপার ঘটল। দীনু বৈরাগীর মেয়েটী সংসারের আওতায় আপনার স্বাধীনতা অক্ষুন্ন হতে দেখে বাহিরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছিল—যাওয়াও অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিল। পল্‌কা না জানি কেমন করে ব্যাপারটা টের পেয়ে মেয়েটীকে নিজের কাছে এনে রাখল। অবশ্য অবশেষে যখন জলধরের সঙ্গে মেয়েটীর বিয়ের ব্যবস্থা পল্‌কা করে দিল, তখন সবাই খুসী হ'ল কিন্তু সে দু' একমাস পরে—এর মধ্যেই আমাদের মন ভাল হয়ে গেল।

আমাদের ছোট সহরটীর পাশ দিয়েই ইচ্ছামতী তার নির্ম্মল জলধারা বক্ষে নিয়ে বয়ে যেত, নদীর তীর দিয়ে চলেছে রাজপথ—পল্লীর নিবিড়-শ্যামল বনরাজার মাঝ দিয়ে শস্য ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে। খানিকদূর গিয়ে নদীটা যেখানে বেঁকে গেছে তার কোণটায় একটা খেজুর বন ছিল। এই বনটাকে কুঞ্জ বললে মিথ্যা বলা হবে না—সবুজ দূর্ব্বাঘাসে এর তল ছাওয়া, উপরে ঘন সন্নিবিষ্ট খেজুর পাতার ছত্র।

এই সুন্দর স্থানটীতে বসে বহু অপরাহ্ন ও সন্ধ্যা দিনান্তের ম্লান লালিমার সঙ্গে তরুণ প্রাণের রাঙিমা দিয়ে মিশিয়েছি। এখানে আমার ও আমার কার্য্যভক্ত কতিপয় পূজারীর কবিতা পাঠ ও কবিতা লেখা চলত। সেদিনও চলছিল—অনেকদিন পরে একটা নূতন কবিতা লিখেছিলাম—তার নাম ছিল "তরুণ"—তার ভিতর দিয়ে তরুণ প্রাণের যত আজগুবি ভাবনা ফুটিয়ে তুলেছিলাম। এ তরুণ যেন চলেছে বিজয় যাত্রায়—সমস্ত বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে, অত্যাচার অন্যায় দমন করে। জগৎকে নূতন করবার, মধুর করবার অক্ষুন্ন উৎসাহে—এ জয়যাত্রা তার শেষ হবে, যখন অচিন দেশে তরুণী তার গলায় মালা পরিয়ে দেবে আর উচ্ছ্বস রূপসীরা বরণ ডালা সাজিয়ে বরণ করে নেবে। কচি কচি প্রাণে এই মালা পাওয়াটার মধ্যে বেশ একটু আনন্দ পাচ্ছিল—তা বর্ত্তমানের sex-psychology যারা লিখেছেন তারা জলের মতন বুঝিয়ে দেবেন—এটাকে স্ফুটমল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বাসনা বলে—কিন্তু আমার মনে হয় এর ভিতর ছিল সুদূর ও গোপনের রোমাঞ্চ বা ইংরেজীতে বলতে পারি Romance।

ভক্ত অপরেশ সুর করে পড়ছিল—

"অচিন দেশের রূপের রাণী পরিয়ে দেবে মালা।

রাজার পুরীর সখীরা সব সাজিয়ে দেবে ডালা।”

পল্‌কা কখন যে পিছনে এসেছিল, তা জানি না। অপরেশের হাত থেকে আমার কবিতার খাতাটা টেনে নিয়ে আমার গালে এক চড় বসিয়ে বলল—“গোল্লায় যাচ্ছ—যা এ সব আর লিখতে পাবি না” এই বলে খরস্রোতা নদীর জলে কবিতার খাতাটী ছুঁড়ে ফেলে দিল। সেদিন আমাদের মন সত্যই ভেঙ্গে গেল।

(৪)

তারপর দু' চারমাস কেটে গেল—পল্‌কার সঙ্গে আমার ভাব ফিরল না, তবে দুজনের মাঝে না হ'ক আমার মাঝে মিশবার একটা আগ্রহ জমাট হয়ে উঠছিল। সেদিন বৈশাখের অপরাহ্ণ—আমরা বেড়াতে চলেছিলাম। পূর্ব্বকথিত রাজপথ দিয়ে চলতে চলতে অনেকদূর গিয়ে বসেছি—এমন সময় মেঘ হয়ে উঠল। আমাদের বাহিনী মেঘকে উপেক্ষা করে চিরকালই চলি, কিন্তু সেদিনকার মেঘের কালিভরা মুখ দেখে প্রত্যাগমন করা শ্রেয় মনে করলাম—কিন্তু ফিরতে না ফিরতে বৃষ্টি ও ঝড় প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরে দেখা দিল—নিরুপায় আমরা আমাদের খেজুর কুঞ্জে আশ্রয় নিলাম। খানিক পরে পল্‌কা দেখি কাক-ভেজা হ'য়ে এসে পৌছেছে—আমাকে দেখে হেসে বলল—“কিরে বড় যে রাগ করেছিস, তা রাগ করিস না, আমি ইচ্ছামতীর বুকের তল খুঁজে তোর হারাণো মাণিক এনে দেব।”

তার কথা ফুরাতে না ফুরাতে ঝড়ের দমকা বেড়ে উঠল—ইচ্ছামতীর ঢেউ গর্জ্জে উঠল—গাছের ডালপালা মড়মড় করে উঠল। হঠাৎ পল্‌কা নিজের জামা খুলে ফেলে আমার দিকে চেয়ে বললে—“এই আমার জামা দেখিস” তারপর সেই ক্রুদ্ধ নদীবক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ল। নদীর দিকে চেয়ে দেখি—সেই পাড়ার দুখু কাপালি তার ডিঙ্গি চড়ে ফিরছে। ওপারের ক্ষেত হতে বুড়ো এই সময় রোজই ফিরে, কিন্তু বুড়ো আজ বড় নাকাল হয়ে পড়েছিল—দেবতার রোষ সহ্য করা তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

পল্‌কা সাঁতার দিয়ে চলল—কিন্তু সেদিনকার ঢেউয়ের বিরুদ্ধে যুঝতে যাওয়া ভীষণ ব্যাপার—কোনক্রমে যখন দুর্ব্বল দেহে বুড়োর ডিঙ্গির নিকট পৌছে গেল—তখন দমক আরো জোরে বয়ে উঠল আর ডিঙ্গি উল্টে গেল। খানিকক্ষণ কিছু দেখা গেল না—তারপর দেখলাম দুখুকে পল্‌কা ধরেছে কিন্তু বুড়ো পল্‌কারে এমন করে ধরেছে যে পল্‌কার সাঁতরান কষ্টকর বলে মনে হ'ল।

তারপর আবার ঝড়ের অট্টহাসি শোনা গেল - মেঘে বজ্র নিনাদিত হ'ল, পল্‌কাকে ঢেউয়ের তলে ডুব দিতে দেখলাম। কিন্তু সেই ডুবই তার শেষ ডুব—সে আর উঠল না। আমরা প্রথমে কিছু বুঝতে পারি নাই যখন বুঝলাম, তখন দু'ধারে কোথাও কেহ ছিল না, আর করবারও কিছু ছিল না।

পল্‌কা চলে গেছে। আমার হারানো মাণিক সে পেয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু আজিও যখন রুদ্র তার প্রলয় বিষাণ কালবৈশাখীতে বাজিয়ে তোলেন তখন এই দিনকার ছবিটা মনে পড়ে আর মনে পড়ে এই খেয়ালী সৃষ্টিছাড়া মানুষটীকে।

———

আমিষ না নিরামিষ

[শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত]

মানুষের আহার্য্য আমিষ হইবে কি নিরামিষ হইবে এ আলোচনা প্রাচীন বিশেষ ভারতবর্ষে। যাহারা আমিষ আহারের পক্ষপাতী তাহারা দোহাই দেয় প্রধানতঃ নরদেহের গঠন-বৈশিষ্ট্যের, আর যাহারা নিরামিষ খাদ্যের পক্ষপাতিত্ব গ্রহণ করে, তাহাদের অস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ আর কোমল-বৃত্তির বিশ্লেষণ।

বিশাল সামাজিক সমস্যারূপে নিরামিষ ও আমিষ আহারের প্রশ্ন ভারতবর্ষের বাহিরে কোনও জাতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে কি না জানি না; কারণ য়িহুদী, খৃষ্টান বা মুসলমানের পক্ষে চিরদিন আমিষ আহার নিষিদ্ধ হইবে এমন কোনও বিধানের কথা শুনি নাই। ক্যাথলিক খৃষ্টান এবং মুসলমানকে মাঝে মাঝে অনশনে থাকিতে হয়--সেই অনশন বা অর্দ্ধাশনের দিনে ক্যাথলিকের পক্ষে মৎস্য ও মাংস নিষিদ্ধ। রোমজানের রোজা খুলিয়া মুসলমান রাত্রে মাংস খাইতে পারে। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রসারের সহিত ভারতবর্ষের সভ্যতা আর্য্যাবর্ত্তের বাহিরে প্রবর্ত্তিত হইলেও বৌদ্ধদেশে নিরামিষ আহার সামাজিক নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। শামন, ভিক্ষু, লামা প্রভৃতি মাংসাহারী না হইলেও চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম, লঙ্কা, যবদ্বীপ, এমন কি তিব্বত, ভুটান, নেপাল, কাশ্মীর প্রভৃতি সকল দেশ বা প্রদেশের বৌদ্ধগণ অদ্যাপি মাংসাশী। এমন কি নেপাল, ভুটান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধদের পক্ষে মুসলমানের নিষিদ্ধ মাংসও শুদ্ধ এবং হিন্দু যাহাকে মহা মাংস বলে, তাহারও বহুল প্রচলন লাডাক, বাল্টিস্থান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধের উহা একটা কারণ, এবং নেপালীকে ভুটিয়া বলিলে সে অতি রুষ্ট হয়।

এই তর্ক মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে আমাদের কতকগুলা অকাট্য প্রামাণিক কথা মানিয়া লইতে হয়।

১ম—দেহের জন্য আমিষ ভোজন একেবারে প্রয়োজন নয়—কারণ এই বহু সহস্র বর্ষ ভারতবর্ষের কোটি কোটি লোক নিরামিষ আহার করিয়া প্রাণধারণ করিয়াছে এবং দেহের ও মনের বল ও পুষ্টির অসাধারণ আদর্শ দেখাইয়াছে।

২য়—মানুষের দেহের এমন গঠন যে তাহাকে মাংসাশী বা আংশিক মাংসাশী প্রাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

প্রথম প্রমাণটি ঐতিহাসিক এবং সেটি নিরামিষ আহারের স্বপক্ষে। কিন্তু তাহা বলিয়া সেটি আমিষ আহারের বিপক্ষে নয়, যেহেতু এটুকুও ঐতিহাসিক যে কোটি কোটি লোক মাংস খাইয়া প্রাণধারণ করে, বরং প্রাগ্‌ ঐতিহাসিক কথা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, আদিম অসভ্য মানুষের প্রকৃতিই মাংসাহার। সুতরাং ভারতবর্ষের ইতিহাস ইহা সাক্ষ্য দেয় মাত্র যে, মাংস ভোজন না করিলেও মানুষের বল বুদ্ধির ব্যত্যয় ঘটে না। ভারত-বাসী আরব বা আফগানের নিকট যুদ্ধে হারিয়াছিল—দৈহিক বলের অভাবে নয়, একতার অভাবে। এ কথা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

দ্বিতীয় কথাটিতে বলিবার অনেক আছে। সত্যই মানুষের দাঁত আছে যাহা মাংস ছিঁড়িয়া খাইবার উপযোগী। তাহার পাকস্থলী মাংস হজম করিতে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়। তাহার শরীরে যে পরিমাণে উষ্ণতা আবশ্যক হয়, তাহা মাংস হইতে সহজে পাওয়া যায়। আরও অনেক প্রমাণ এ পক্ষে আছে সেগুলা সাধারণতঃ সকলেই জানে।

মানুষের মত দেহ, তাহার কেনাইন দাঁত অপেক্ষা বড় দাঁত বনমানুষের বা বানরের আছে তবু সে ফলাহারী। হয়তো দাঁত দুইটা শত্রুকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য ভগবান তাহাকে দিয়াছিলেন, ভোজনের সহায়তার জন্য নয়। দুঃশাসনের রক্তপান ভীমের পক্ষে অসম্ভব হইত যদি মধ্যম পাণ্ডব তীব্র-দংষ্ট্র না হইতেন।

দেহের প্রমাণটা সত্যই বড় প্রমাণ নয়। কারণ বিলাতী

অভিব্যক্তিবাদ'দের কথা মানিলে বুঝা যায় যে, মানুষ অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে পুর্ব্বপুরুষ জানোয়ারের এমন এক একটা শারীরিক যন্ত্র লাভ করিয়াছে যে সেগুলা তাহার আদৌ কাজে লাগে না। অথচ সেগুলা তাহার আছে বলিয়া সে অনেক শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পায়। মেচনিকফ্ সাহেব এইগুলার আলোচনা করিয়া শেষে তাঁহার বৈজ্ঞানিক পুস্তকে সকলকে দধি-ভোজন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মেচনিকফ্ সাহেব বলেন, আমাদের অঙ্গের লোম ঐরকম একটা অনাবশ্যক পদার্থ। ভ্রূণ যখন মাতৃ-জঠরে থাকে, তখন একবার তাহার অঙ্গ কেশে ভরিয়া যায়। সে কেশ আবার খসিয়া পড়ে। পরে মানুষের গায়ে আবার যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে নানা স্থানে কেশোদ্গম হয়। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, মানুষের দেহের সর্ব্বত্র কেশের কোনও আবশ্যক নাই বরং কেশরন্ধ্রে রোগের জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মানুষকে বিব্রত ও ক্লিষ্ট করে। কেশ তাহার অভিব্যক্তির ধারার একটা সাক্ষ্য মাত্র।

তেমনি মানব দেহের অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মেরুদণ্ডের নিম্নপ্রান্তের গঠন (caecum)! বোধ হয় আমাদের ষট্‌চক্র নিরূপণ সেই স্থানটা বা তন্নিকটকর্ত্তী স্থান মূলাধার।

অপর অনাবশ্যক অঙ্গ appendix ইহা Large intestineএর নিম্নে অবস্থিত। বৈজ্ঞানিকদের মতে ইহাও অনাবশ্যক যন্ত্র—অথচ ইহাকে আশ্রয় করে appendicites নামক কালব্যাধি।

Large intestines সম্বন্ধেও অনেক বড় বড় দেহ-তত্ত্ববিদের ঐ অভিমত। সেটি শাক, তৃণ প্রভৃতি খাদকের উপযোগী। কারণ তাহাতে এক প্রকারের জীবাণু জন্মে, যাহারা ভুক্ত তৃণাদি হইতে উদ্ভূত এক প্রকার জীবাণুকে ভোজন করিয়া শাকতৃণভোজী জন্তুকে নিরাময় রাখে। মানুষের দেহে এ যন্ত্র বিষের জনক। সেই বিষকে দমন করিবার জন্য মেচনিকফ্ সাহেব দধি-ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আরও অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এই শ্রেণীর। নরের দেহে নারী-দেহের জননেন্দ্রিয়ের এবং নারী-দেহে নরদেহের জননেন্দ্রিয়ের উপযোগী অনেক শুক্‌না বিকৃতগ্রন্থী প্রভৃতি আছে। কুমারী রমণীর যে কুমারী ত্বক আছে তাহা অন্য কোনও জীবে বর্ত্তমান নাই। ইহাও দেহ-ধারণের পক্ষে অনাবশ্যক।

আমি দেহের তথাকথিত অনাবশ্যক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের তালিকা এ প্রসঙ্গে দিয়াছি দেখাইবার জন্য যে মানুষ ঠিক দেহের গঠনের উপযোগী মনোবৃত্তি লইয়া জীবনধারণ করে না। ইহাই মানুষের সঙ্গে ইতর শ্রেণীর জীবের পার্থক্য। আমি স্বীকার করি না যে, যে সকল অঙ্গকে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, প্রাণ-ধারণের পক্ষে তাহাদের কোনও উপযোগিতা নাই। মানুষ এখন সভ্যতার যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে তাহাতে এ সকল যন্ত্র নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু প্রথম নর যখন অস্ত্রের ব্যবহার আয়ত্ত করে নাই বা চারুশিল্পের প্রসারের সহিত বস্ত্রের দ্বারা শরীরের কমনীয়তা বাড়াইতে শিখে নাই, তখন গায়ের রোম বা মাংসছেঁড়া দাঁত যে তাহার আবশ্যক ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। রন্ধন বিদ্যা শিখিবার মূলে অগ্নি প্রজ্বলনের রহস্য। এ রহস্য মানুষ ভিন্ন অপর কোনও জীব আয়ত্ত করে নাই। আদিম নরেরও এ শিল্প অবিদিত ছিল। কাজেই "স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি" তাহাকে জঠর-জ্বালা নিবারণ করিতে হইত। নাড়িভুঁড়িটাকে সে ক্ষেত্রে কেমন করিয়া অনাবশ্যক করিতে পারি? যৌন-মিলনে আধুনিক কালের মত অপব্যবহার কমাইবার জন্য বোধ হয় রমণীর কৌমার্য্যের একটা প্রত্যঙ্গে ভগবান তাহাকে ভূষিত করিয়াছেন।

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, অঙ্গের গঠন আলোচনা করিয়া যাহারা আমিষ ভোজনের একান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাদের ধারণা ভুল ভিত্তির উপর স্থাপিত। তাহারা মানব-প্রকৃতির প্রধান বিশেষত্বটা উপেক্ষা করিয়া তর্ক আরম্ভ করে। জ্ঞান মানুষের বিশেষ অধিকার। এই জ্ঞানের বিকাশে মানুষ নিজের কেন নিজের পালিত জীবেরও দেহবৃত্তির কত পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। যাহারা মানুষকে ইঁদুর, বিড়াল বা মৌমাছির মত জানোয়ার

বা কীট বিবেচনা করে তাহারা মানুষের মনকে এবং সেই মনের বৃত্তি জ্ঞানকে উপেক্ষা করে। ইঁদুর চমৎকার সুড়ঙ্গ কাটে, বিড়াল অতি সাবধানে, বিবেচকের মত শিকার করে, মৌমাছি মানব-গৃহ-নির্ম্মাতা অপেক্ষা অধিক দক্ষতার সহিত মৌচাক তৈয়ারি করে। কিন্তু তাহাদের সেই জ্ঞান সেই বুদ্ধি—সহজ জ্ঞান, সহজাত সংস্কার। একটা বিড়ালের বা একটা শৃগালের তিন বৎসর বয়সে পক্ষীশাবক চৌরকার্য্যে যে প্রকার কৃতিত্ব অপর বিড়াল বা শৃগালের কৃতিত্ব ঠিক সেই প্রকার। কেবল যে বিড়াল বা কুকুর বা পায়রা মানুষের গৃহে পালিত হয় মানুষের বুদ্ধি তাহার সহজ বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটায়। কেবল যে পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহার মনে, এমন নয়—পরিবর্ত্তন ঘটায় তাহার দেহেও। একথা আমরা সকলেই জানি। বুনো টিয়াপাখি ঘি-মাখা ভাত খায় না, বন্য বিড়াল—চা ও পাঁওরুটি খায় না, অথবা বনের হাঁস মানুষের ঘরের পাতিহাঁসের মত কেবল ভূচর নয়। আমি মুসলমানের ঘরে পালিত একটা কাকাতুয়াকে মাংসের কাবাব খাইতে দেখিয়াছি। আর আমাদের হিন্দুর ঘরের পোষা কুকুর তো দিনের পর দিন দুধ-ভাত ও দধি-ভাত খাইয়া প্রাণধারণ করে।

মানুষের মনোবৃত্তি দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিত্য ক্রিয়ার অনুসারিণী নয়, তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত মাতৃস্নেহে। যত দিন মাতৃ-স্তনে দুধ থাকে, স্তন্য-পায়ী জীবের মাতৃস্নেহ ততদিন প্রবল থাকে। সে স্নেহ বড় কোমল, বড় স্বার্থশূন্য, স্বর্গীয়। যতদিন শাবক স্বাবলম্বী না হয় শীল (Seal) জননী জলে নামিয়া মাছ অবধি ধরে না। সে প্রায় ছয় মাস অনশনে থাকিয়া শাবক-পালন করে. এই সময় সে এত কৃশ ও দুর্ব্বল হয় যে, মানুষ তাহার চামড়ার জন্য তাহাকে বধ করে সে পলাইতে পারে না। পৃথিবীতে যত সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য আছে তাহার মধ্যে আমার মনে হয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দৃশ্য কাতরা জননীর রুগ্ন সন্তানের মুখ চাওয়া। রাফেলের ম্যাডোনার চিত্র না কি জগতে অতি শ্রেষ্ঠ। তাহার কারণ জননী মেরীর মাতৃত্ব আমাদের সুকোমল বৃত্তিতে প্রবুদ্ধ করে। ভারতবর্ষের কালীর মূর্ত্তির সহিত মাতৃত্বের সংযোগ না থাকিলে কেবল চারুশিল্প কি তাহাকে আবহমানকাল পৃথিবীতে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিত ?

এই মাতৃত্বের বৃত্তির আলোচনা করিলে মানুষের মনোবৃত্তি তাহার দেহের প্রত্যঙ্গের টানকে কত তুচ্ছ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়। ইতর জীবের মাতৃত্ব বিকশিত থাকে যতদিন তাহার শাবক স্বাবলম্বী না হয়। কিন্তু মানব মাতা চিরদিন সন্তানের মঙ্গল-কামিনী। পাশ্চাত্যে এবং দুঃখের বিষয় আমাদের তথাকথিত সভ্যাদের মধ্যে জীবের সহজবৃত্তি সন্তানকে স্তন্য-পান করান এক রকম উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বিলাতের সাফ্রেগিট নারীও মাতৃত্বের কোমল বৃত্তি—পুত্রস্নেহ বর্জ্জন করিতে পারে নাই- কেবল সন্তানের শৈশবে নয় আমরণ কাল পর্য্যন্ত। এই স্নেহ একটা বৃত্তি বা ইমোসান্ বটে, কিন্তু বহু পুরুষ ধরিয়া জ্ঞানের সাধনার ফলে মানুষ এই সুকোমল বৃত্তিতে ভূষিত হইয়াছে। প্রেমও প্রায় তদনুরূপ। বাঘ, ভালুক, কুকুর, শৃগাল, মেষ-মহিষের প্রেমের এক একটা সময় আছে। এটা তাদের জাতীয় ধারা রক্ষা করিবার সহজ বৃত্তির উপর স্থাপিত। মানুষ সেই আদিম বৃত্তিটাকে এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছে যে, মানুষ প্রেম করে না কেবল বসন্তের ফুরফুরে হাওয়ায় বা চাঁদের ধপ্ ধপে কৌমুদীর তলায়। সে নিশিদিন প্রেম করে আর প্রেমরূপ আদিম বৃত্তির বংশ রক্ষা রূপ যে ফলটা তাহা গ্রহণ করিতে মোটে প্রয়াসী নয়।

এ রকম দৃষ্টান্তের অন্ত নাই। নিঃশ্বাস জীবের দেহধারণের প্রধান উপায়, কিন্তু মানুষ নিঃশ্বাস দিয়া কত রকমের স্ফটিক পদার্থ নির্ম্মাণ করিতেছে। অলমতি বিস্তরেণ। মোট কথা, দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্কেতের উপর আমিষ ও নিরামিষ আহারের দাবীর মোকদ্দমা বিচার চলে না।

এ বিষয়ে বিচার করিতে হইবে জ্ঞানের কষ্টিপাথরে। মহাত্মা গান্ধী নিরামিষ আহারী। তিনি Howard Williams প্রণীত The Ethics of Diet নামক পুস্তকের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—ঐ পুস্তকেপ্রমাণ আছে যে, পিথাগোরাস্ হইতে মহাপুরুষ যীশু প্রভৃতি সকলেই নিরামিষ ভোজন করিতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতবর্ষের মুসলমান

ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত সকল মহাপুরুষ নিরামিষভোজী ছিলেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কোন্ কোন্ পীর নিরামিষ ভোজন করিতেন তাহা আমি ঠিক জানি না। "আইনী-আকবর" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সম্রাট আকবর আমিস আহারের তেমন পক্ষপাতী ছিলেন না! তিনি বলিতেন, মিছামিছি নরদেহকে মৃত পশুর কবর করিবার আবশ্যক নাই। খাদ্যের তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যায় তাঁহার সাম্রাজ্যে গোমাংস খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। তবে পীরদের সিন্নির ব্যবস্থা দেখিলে মনে হয় তাঁহাদের দৈনিক খাদ্যের মধ্যে বোধহয় মাংসের তেমন স্থান ছিল না। আমি উৎসবে বা ধর্ম্মের নামে পশুবলির কথা বলিতেছি না। সে সব ব্যবস্থার মূলে অনেক জটিল গবেষণা আছে। তবে মোটামুটি মনে হয় যে, কোনও উন্নত পুরুষ পশুবধের পক্ষপাতী নন।

এ তর্কের মীমাংসার মূল সূত্র এইখানে। শ্রেষ্ঠ জীব —মানুষের পক্ষে—দেহ ধারণের জন্য নিত্য রাশি রাশি জীবহত্যা করা উচিত কি না। মানুষ পশুর মত সংস্কার বশে কাজ করে না। সে বিচার করিয়া, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা সকল বিধি প্রবর্ত্তন করে। এখন স্বাধীন চিন্তার দ্বারা মানুষ ঠিক করিয়াছে যে, যুদ্ধের নাম করিয়া এক জাতি অপরজাতির মানুষকে হত্যা করিলে অধর্ম্ম হয় না অথচ একজন মানুষ অপর একজন মানুষের গালে একটা চড় মারিলে বা কাঁকড়ার দাড়া ভাঙ্গিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। মানব সভ্যতার এ যুগে ভোট লইলে নিরামিষ ভোজী পরাস্ত হইবে। কিন্তু মানুষ যখন প্রকৃত পবিত্রতার পথে অগ্রসর হইবে যেমন পবিত্রতা আর্য্যাবর্ত্ত একদিন জগতে প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী ছিল—তখন নিঃসন্দেহ যুদ্ধও উঠিয়া যাইবে, জীব-হিংসাও ঘৃণিত বলিয়া বিবেচিত হইবে। কারণ খুব উচ্চ নীতির দিক হইতে ভবিষ্যতে মানুষ মাত্রকেই বলিতে হইবে—

স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেনাপি প্রপূর্য্যতে
অস্মদগ্নোদরস্যার্থং কঃ কুর্য্যাৎ পাতকং মহান্।

স্বচ্ছন্দবনজাত তৃণের দ্বারাও যাহা পূর্ণ হইতে পারে এমন পোড়া পেটের জন্য কে মহাপাতক করিবে?

—অর্চ্চনা
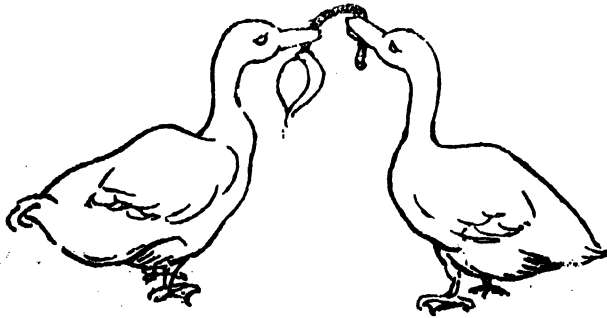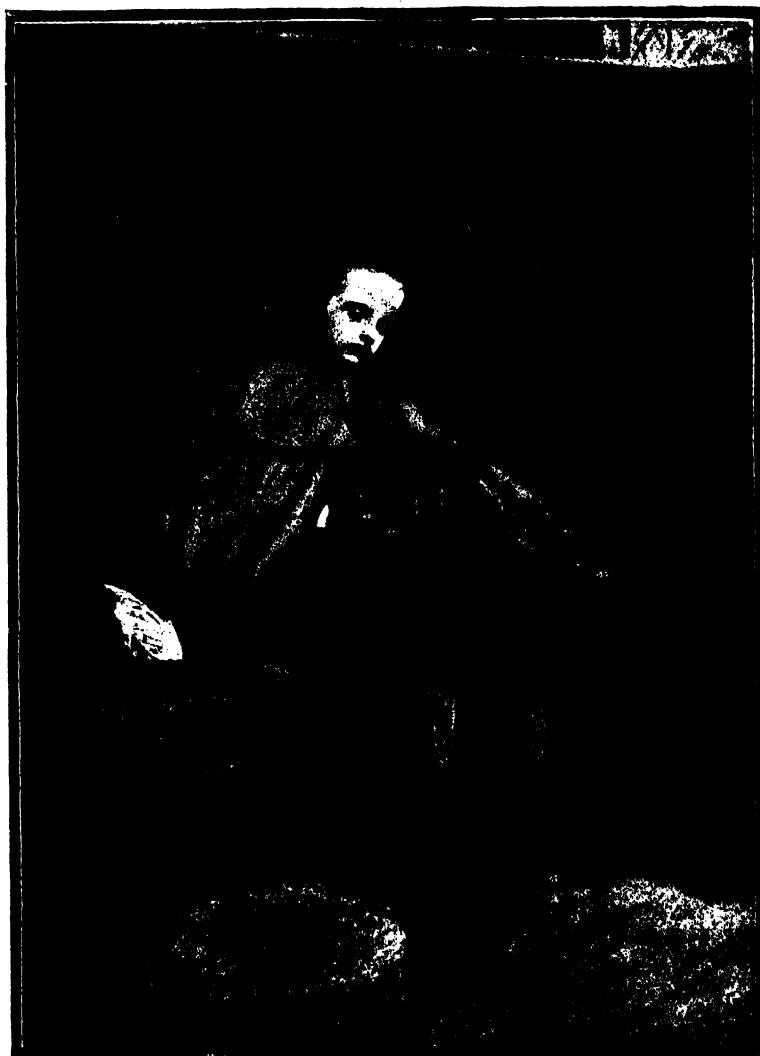
ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ (দ্বিতীয় বার)

শিল্পী—স্যর জে, ই, মিলে ব্যারনেট, পি-আর-এ

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৯শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার, ১৩৩৩। [২৯শ সপ্তাহ

কাঞ্চন-বরণী কে বটে সে ধনী
ধীরে ধীরে চলি যায়,
হাসির ঠমকে চপলা চমকে
নীল শাড়ী শোভে গায়॥

* * *

থির বিজুরী বরন গৌরী
পেখনু ঘাটের কূলে।
কানাড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে
নব মল্লিকার মালে॥

* * *

প্রেমের পরীক্ষা

[শ্রীপূর্ণিমা দেবী বি-এ]

"দাদামশাই যে! কবে এলে?"

"আজই আসছি বোন্। একটা দরকারী কাজ আছে। তারপর তোরা ভাল আছিস্ ত?"

"ভাল আছি বৈকি দাদামশাই। ভেতরে গিয়ে বসবে এস।"

"এখন বসবার সময় নেই অপু! কাল সকালেই আস্‌ব ফের এখন শুধু একবার খবর দিয়ে যাচ্ছি!...জ্যোতিষ কোথায়?"

"আসেন নি এখনো। আফিস থেকে আসবার পথে একজন ছেলেকে পড়িয়ে আসেন রোজ, তাই একটু দেরী হয়ে যায়।"

"আজ আমার সেই কথাটা মনে করে হাসি পাচ্ছে। বলেছিলি, আমাদের সকলকে ছেড়ে থাকতে তুই পারবি না; কিন্তু আজকে আশা করি বদলে গেছে সে মতটা! কেমন সত্যি ত? রাগ করিস নি, আমার কাছে চুপি চুপি বল—আমি কারেও প্রকাশ করব না—ছোঁড়াটা ভালবাসে কেমন?"

"মোটেই নয় দাদামশাই। তুমি কি আজও তাঁকে চিনতে পারনি? ওই ত মনুষ্য! কাঠখোট্টা চেহারা! উনি ভালবাসার কি বুঝবেন?"

"বটে? না—না—মিথ্যে বলছিস্। তোর চোখের হাসি মনের মিথ্যা কথা লুকিয়ে রাখতে পারলে না। আচ্ছা আমি আজ পরীক্ষা করব।"

"বেশ ত!"

"বাজী রাখতে হবে কিন্তু। ভালবাসার পরীক্ষায় যে আজ জিতবে তাকে আমি নিজের হাতে পুরস্কার দেব। আর যে হারবে তাকে শাস্তি দেব।"

"আচ্ছা! রাজী আছি!"

জ্যোতিষের আসিতে তখনো বিলম্ব আছে দেখিয়া দাদামশাই প্রস্থান করিলেন। তাঁর বিশেষ জরুরি কাজে লালবাজারে পুলিসদের আস্তানায় তখনি যাবার দরকার ছিল।

দাদামশাই অপর্ণার বাপের খুড়ো। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি গিয়াছে। তাহলেও যৌবনের তাজা রক্ত তখনো তাঁর শরীরের ধমনী শিরায় বিরামহীন গতিতে বহিত। অথচ বৃদ্ধ-জন-সুলভ রস-সমুদ্রের সুস্নিগ্ধ বারিধারারও অভাব ছিল না। শাসন ও আদর উভয় ব্রহ্মাস্ত্রের সাহায্যে তিনি নাতিনী ও নাতজামাইয়ের হৃদয় মন জয় করিয়াছিলেন।

জানালার সার্সীটা হাওয়ায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সেটা খুলিয়া দিয়া অপর্ণা আকাশের তারকাখচিত নীলাভ রূপটুকু দেখিতে লাগিল। এমন সময় জ্যোতিষ বাড়ী আসিয়াই ব্যস্ত-বাগীশের মত বলিল, "শীগ্‌গির ভাল কাপড় পরে এস! শীগ্‌গির!"

"কেন? কোথায় যেতে হবে?"

"আজ মিনার্ভায় বিল্বমঙ্গল আছে। আসবার পথে বক্স রিজার্ভ করে এসেছি।"

"একটু জিরোও। বস! জলটল খেয়ে নাও!"

"না, তাতে দেরী হয়ে যাবে। সময় বেশী নেই। ওখানেই আমি সব বন্দোবস্ত করে দেব চল।"

অপর্ণা আপত্তি শুনিল না। বলিল "সেই কোন সকালে বেরিয়েছ, কিছু না খেয়ে গেলে শরীর থাকবে কেমন করে।"

অগত্যা জ্যোতিষকে রাজী হইতে হইল। অপর্ণা বিবিধ ফল ও মিষ্টান্ন রেকাবে সাজাইয়া দিল। জ্যোতিষ সামান্য কিছু মুখে দিয়া বলিল—"তুমিও এস! একলা এত জিনিষ খাবার মত ক্ষুধাও নেই ধৈর্য্যও নেই। এদিকে সময়ও হয়ে আসছে। দুজনে যতটা পারি শেষ করে দিই!"

"না—না—ফেলে রেখ না! এমন কিছু নয় যে খেতে পার না।. আঃ, ছাড় ছাড়! আমি এখন কাপড় ছেড়ে

আসি। আমার জন্যে রেখে দিয়েছি, এর থেকে আর ভাগ বসালে চলবে কেন ?"

জ্যোতিষ উঠিয়া অপর্ণার হাত ধরিয়া আহারের স্থানে টানিয়া আনিল ও নিজে তাহার মুখে খাবার তুলিয়া দিল। এইরূপে ভালবাসার ঝগড়া একরকম করিয়া তখনকার মত মিটিল।

ট্যাক্সি ডাকিয়া জ্যোতিষেরা যখন রঙ্গগৃহে পৌঁছিল তখন দুটো দৃশ্য অভিনয় হয়ে গিয়েছিল। জ্যোতিষ এই প্রথম অংশটা না দেখায় সমস্ত দোষ অপর্ণার ঘাড়ে দিল।

অপর্ণা জিজ্ঞাসা করিল "বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের এই যে ভালবাসা, পুরুষের পক্ষে সম্ভব হতে পারে কখনো ? মনে হয় বাড়িয়ে লেখা।"

জ্যোতিষ বলিল "কেন, পুরুষ কি ভালবাসতে জানে না ? দেখলে ত, সর্প আর রজ্জুতে প্রভেদ থাকে না। গলিত নরকঙ্কাল বুকে জড়িয়ে ভেসে চলল! প্রতিদানে নারী তোমরা কৈই বা দিতে পার। অবজ্ঞা ও অবহেলায় চিন্তামণি তাঁকে দুয়ার হতে তাড়িয়ে দিলে। ভালবাসার বড়াই তোমরা করো না।"

"বিল্বমঙ্গল দেবতা ছিলেন। আর—"

"বলতে চাও—আমরা তাহলে উপদেবতা ?"

"ক্ষমা কর! অমন কথা আমি বলি না। বরং এইটুকু বলতে পারি, নর দেবতা হয়ে শিবের আসন পেতে পারেন, কিন্তু নারী তাঁর চেয়েও বেশী—নারী জগতের আদি জননী—শিবের মা। আদ্যাশক্তি! নরের ভালবাসা প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণের মত,—আর নারীর ভালবাসা স্নিগ্ধ চাঁদের আলো। চিন্তামণির কথা বলছ ? চিন্তামণি যেদিন বিল্বমঙ্গলকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেইদিন তার সুপ্ত নারীত্ব জেগে উঠল। তার আগে পর্য্যন্ত সে যে পাষাণী ছিল। সেই ঘুম ভাঙ্গার দিন থেকেই তার বুকের বদ্ধ ঘরের সমস্ত দুয়ার খুলে গেল। সে আপনাকে রিক্ত করে বিলিয়ে দিলে। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে ভুলে ব্রজদুলালকে ভালবাসতে শিখলেন, চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলের পায়েই আপনাকে লুটিয়ে দিলে কৃষ্ণকে চাইলে না!"

অভিনয় দেখার সঙ্গে সঙ্গে এমনি সব ভালবাসার ঝগড়া আবার ভালরকম করিয়াই বাঁধিবার সূচনা ঘটিতেছিল।

শেষের মিলন দৃশ্য দেখিয়া দুজনকার হৃদয় যুগপৎ আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। নারী অথবা নর কার ভালবাসা বড় সে দ্বন্দ্ব আর মনে ছিল না।

জ্যোতিষ অপর্ণাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিয়া গাড়ীর সন্ধান করিতেছিল।

"কে হে জ্যোতিষ না কি ?"

জ্যোতিষ চমকিয়া চাহিল। রমেন্! সে তাহার ছেলেবেলাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আজ বছর পাঁচ ছয় দুজনের দেখা নাই। জ্যোতিষ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কোথা থেকে হে ? কি করছ এখন ?"

"রেঙ্গুনে ছিলুম ভাই। সেখানে কিশোর বাবুর সহকারী হয়ে কাজ করছি। তাঁর সঙ্গেই আজ বিকেলে এসেছি।"

"কোন কিশোর বাবু, আমার দাদাশ্বশুর যিনি ?"

"হাঁ! তিনি এসে তোমাদের বাড়ী দেখা করতে গিয়েছিলেন—দেখা হয় নি ?"

অপর্ণা জ্যোতিষকে বলিল "দাদামশাই এসেছিলেন তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। মাত্র দু'পাঁচ মিনিট ছিলেন। কাল সকালে আবার আসবেন।"

একটী মোটরে চড়িয়া এক মুসলমান ভদ্রলোক সেইখান দিয়া যাইতেছিলেন। রমেন তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছিল, "এই যে জ্যোতিষ! চেন তুমি এঁকে ?"

আগন্তুক বলিলেন "রমেন! তোমার এখানে দাঁড়িয়ে গল্প করা শোভা পায় না। যে কাজের ভার নিয়েছ তা শেষ করে তবে ছুটী পাবে। চলে এস। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে হয় কাল কর। কিশোর বাবুর কাছে এখনই আমি তোমার নামে নালিশ করব।"

রমেন কাছে গিয়া আগন্তুকের কানে কানে কি বলিল। ভদ্রলোকটী বিস্মিতভাব দেখাইয়া বলিলেন "বটে! তা আমায় বললে না কেন এতক্ষণ ?...কিশোরবাবু আপনার দাদাশ্বশুর ? আপনি কিছু মনে করবেন না! আমি ত জানতুম না। যাই হ'ক রমেনকে আজ ছেড়ে দিন, ওর একজন পলাতক আসামীর সবিশেষ খোঁজ নেবার জন্য এখন

এখানকার দু একটা বস্তী খুঁজতে হবে! আমি বরং আমার মোটরে করে আপনাকে বাড়ীতে রেখে আসি চলুন। কাল কিশোর বাবুকে সঙ্গে করে, রমেন আর আমি আপনার অতিথি হব, যদি আপনি অনুমতি করেন।"

জ্যোতিষ বলিল—"বিলক্ষণ! যাবেন বৈকি! কাল রবিবার আছে, সুবিধেও হবে। আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ করবার সুযোগ পেলে ধন্য হব। আপনার নামটী কি, যদি কিছু না মনে করেন—?"

"আমার নাম জসীমুদ্দীন। কিশোর বাবুকে আমি ছেলে বেলা থেকে চিনি। নিন্, উঠে পড়ুন। আসুন দিদিমণি কিশোর বাবু আমাকে ভাইএর মত ভালবাসেন, সেই সুবাদেই আমি আপনাদের ডাকছি, কিছু মনে করবেন না!"

জসীমুদ্দীনের কথাবার্ত্তায় অপর্ণার দু'একবার সন্দেহ হইতেছিল। গোপনে কাণে কাণে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল "কিছু বুঝতে পারছ?"

জ্যোতিষ বলিল, "না! কেন? তুমি এঁকে চেন?"

অপর্ণা স্বামীর কথায় ভাবিল—হয়ত বা তাহারই ভুল, নইলে স্বামীও ত তাঁকে চিনিলেন না।

জসীমুদ্দীনের মোটরে, জ্যোতিষ ও অপর্ণা যখন বাড়ী আসিয়া পৌছিল তখন রাত প্রায় একটা।

জ্যোতিষ নামিয়া দুয়ারের কাছে গিয়া ডাকিতে লাগিল, "রামদুলাল! ওঠ, দোর খুলে দাও! আমরা এসেছি!"

রামদুলাল বোধহয় গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। প্রথম ডাকে উত্তর দিল না। দুতিনবার ডাকাডাকি করিবার পর সে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল—"খুলে দিচ্ছি বাবু।"

দুয়ার খুলিলে অপর্ণাকে নামাইয়া আনিবার জন্য ফিরিতেই জ্যোতিষ যারপর নাই আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, মোটর, জসীমুদ্দীন অথবা অপর্ণা কাহারও কোন চিহ্ন নেই। অপর্ণা কোথায় গেল? জসীমুদ্দীন তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল না কি? এ কি বিভ্রাট! জ্যোতিষ চঞ্চল হইয়া ডাকিল—"অপর্ণা! অপর্ণা!"

রামদুলাল জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে বাবু? মা-ঠাকরুণ কোথায়?"

সর্ব্বনাশ! ঐ মুসলমানটাই নিয়ে পালিয়েছে! ছি, ছি, কি লজ্জার কথা! কেন অপরিচিতের গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম? এখনই দাদা শ্বশুরের কাছে গিয়া জানিয়া লইবে লোকটা কে? রমেনও হয় ত তার ঠিকানা দিতে পারে? কিন্তু… রমেন নিজেও কি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট? তাহাদের বিশ্বাস-ভাজন হইবার জন্যই দাদাশ্বশুরের নাম করিয়াছিল! হয় ত কিশোর বাবু রমেন অথবা জসীমুদ্দীন কাহাকেও চেনেন না! হয় ত এইরূপ জঘন্য কাজই আজকাল রমেন প্রভৃতির পেশা হইয়াছে রমেনই জসীমুদ্দীনকে চুপি চুপি এই পরামর্শই হয় ত দিয়াছিল।

রামদুলাল ব্যাপার শুনিয়া কান্না জুড়িয়া দিল "সর্ব্বনাশ হয়েছে গো! মাকে ধরে নিয়ে গেল যে গো!"

জ্যোতিষ বলিল "থাম্ বেটা থাম্! চুপ কর। লোক জানাজানি যেন না হয়। এই রাতের মধ্যেই খুঁজে বের করতে হবে।"

"চুপ করব কী বাবু? এই সর্ব্বনাশের পর চুপ করব কি?…ওগো! আমাদের মা ঠাকরুণ কোথায় গেল গো? কে কোথায় আছ, তোমরা বাবুকে বোঝাও গো! এরপর শোকে, দুঃখে বাবু আমাদের আর বাঁচবে না!"

"চুপ কর বেটা!"

জ্যোতিষ যত থামিতে বলে রামদুলাল সুরের পর সুর চড়াইয়া দেয় আর কাঁদে, "আমাদের এমন লক্ষ্মী মা আর কি পাব?...ভূ-ভারতে তেমন মেয়ে যে আর নেই গো?"

যদি কিছু উপায় করা যায়, এইজন্য জ্যোতিষ স্থানীয় থানায় গিয়া হাজীর হইল। দারোগাবাবু তন্দ্রাজড়িত চক্ষে জ্যোতিষের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কাল সকালে আসবেন মশাই! আজ এখন কোথায় যাই বলুন!"

"জসীমুদ্দীন বলে আপনাদের লালবাজারে কেউ আছে কি না যদি—"

"সে খবরও ত মশাই আজ রাত্রে সম্ভব হয় না; আচ্ছা ডায়েরী লেখাতে এসেছেন লিখিয়ে যান। কাল আমি বিহিত করব। এই রমেন লোকটাকে আমি চিনি, আজ সবে এসেছে রেঙ্গুন থেকে। তাকে প্রেস করলেই সব জানা যাবে।…কী নাম বললেন?—অপর্ণা দেবী?…বয়স?… আচ্ছা, দেখতে শুনতে?…ভালই! আচ্ছা, অলঙ্কার গায়ে

কিছু ছিল ?...কত দাম হবে ?...আড়াই হাজার! ভাবনা নেই আপনার পাই পয়সাটী পর্য্যন্ত উদ্ধার করে দেব! কিন্তু, দুঃখ হচ্ছে, যদিও সবই পাওয়া যাবে আদত ফুলটাই বিনা দোষে নষ্ট হ'ল।......"

"কেন মশাই ?"

"আর কী তাঁকে ঘরে নিতে পারবেন ? যে ঝরল, সে চিরকালের জন্তই ঝরে গেল! আর তাঁর উদ্ধার নেই। আমাদের সমাজে, মেয়েদের মান ইজ্জত ঠুনকো কাঁচের মত। ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।"

"সমাজের বিধি-বিধান যাই হোক্ দারোগাবাবু, অপর্ণা কোথায় আছে খোঁজ করে দিন। আমি সব দিতে পারি, আমার ঐশ্বর্য্য, সম্পত্তি, মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি সব বিসর্জ্জন দেব,—শুধু তাকে উদ্ধার করে দিন—।"

"আপনি উতলা হবেন না। যতদূর সাধ্য চেষ্টা করে দেখব।"

জ্যোতিষ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ভাবিল যদি এখনও ফিরিয়া থাকে। কিন্তু হায়! নৈশ অন্ধকার অপর্ণাকে এমন করিয়া গ্রাস করিয়াছিল যে, তাহার আর যে কখনো সাক্ষাৎ মিলিবে সে ভরসাটুকুও মনে হইতেছিল না।

জ্যোতিষ ফটকের গায়ে হেলান দিয়া ভাবিতেছিল।

হঠাৎ একটা ফিটন্ গাড়ী আসিয়া থামিল। জ্যোতিষ চমকিয়া দেখিল অপর্ণা। তাহার বহুমূল্য পার্শী সাড়ীর বদলে এখন একখানা সামান্য ছেঁড়া আট ন' হাত ধুতি পরিধানে ছিল। দুর্ব্বৃত্তেরা অঙ্গের যাবতীয় অলঙ্কার সমস্তই কাড়িয়া লইয়াছে। অপর্ণার মুখ ও চোখ কাপড় দিয়া বাঁধা।

কোচওয়ান অপর্ণাকে নামিতে বলিল। জ্যোতিষ হাত ধরিয়া অপর্ণাকে নামাইয়া চোখ ও মুখের বাঁধন খুলিয়া দিলে সে বলিল, "বাবু! ডাকাত লোকটা রিভলভর হাতে ধরে মা'কে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আমাকে বললে, অমুক ঠিকানায় রেখে আয়। দশটাকা বখশিস্। না কথা শুনলে প্রাণ নেব। ভয়ে আমি একটা কথাও উচ্চবাচ্য করতে পারি নি।"

অতঃপর লোকটী গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল।

"ঘরে এস।"

অশ্রুরুদ্ধ লোচনে অপর্ণা বলিল "আমি তোমার পায়ে প্রণাম করে বিদায় নেবার জন্তই প্রাণ রেখেছি।...আমায় তাড়িয়ে দাও দুঃখ নেই, কিন্তু ঘৃণা ক'র না। আমার নিজের কোন দোষ নেই ভেবে মাপ কর।"

"ঘরে এস অপর্ণা!"

"কী বলছ তুমি? তাড়িয়ে দেবে না আমাকে ?... তবে ?...তবে...আশ্রয় দেবে ?"

"ঘরে এস অপর্ণা! আমি তোমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। গহনা সব চুরি গেছে ক্ষতি নেই। আবার কিনে দেব। লোকে গঞ্জনা দেয় তাও সইব।... এস।"

"পারবে ?"

"পারব বৈকি অপর্ণা! আমি কী বুঝতে পারছি না এ ব্যাপারে আগাগোড়া সমস্ত দোষই আমার ? আমি নামবার সময় তোমাকেও সঙ্গে করে নামিয়ে নিলে এ কাণ্ড ঘটত না!"

"পারবে ?...তোমার কথা শুনে আমার আবার বাঁচবার স্পৃহা জাগছে।...এ স্বপ্ন নয় ত ?"

জ্যোতিষ রামদুলালকে ডাকিলে সে দোর খুলিয়া দিল। অপর্ণাকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। কী একটা আপত্তির কথা উল্লেখ করিতে যাইতেছিল, জ্যোতিষ তাহাকে ধমক দিয়া থামিতে বলিল।

স্বামীর সোহাগে অপর্ণার ক্ষুদ্র বুক ভরিয়া গেল।

ভোর থাকিতে থাকিতেই কিশোর আসিয়া জ্যোতিষের নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

শেষ রাত্রে অপর্ণা আসিবার পর থেকে, তাহার কাছে বসিয়া জ্যোতিষ জাগিয়াছিল। অপর্ণা শ্রান্তিবশতঃ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। জ্যোতিষের মনে হইতেছিল, সে নিজে না ঘুমাইয়া পড়ে। অপর্ণাকে সে চোখে চোখে রাখিয়া পাহারা দিবে, দুর্ব্বৃত্তেরা আবার না সন্ধান করিয়া তাহাকে কাড়িয়া লইয়া যায়।

জ্যোতিষ দুয়ার খুলিয়া দাদাশ্বশুরকে অভ্যর্থনা করিল।

"দাদামশাই! এত ভোরের বেলাতেই আসছ যে ?"

কিশোর বলিলেন "একি শুনছি জ্যোতিষ! ইন্সপেক্টর

সেন আমার কাছে গিয়ে জানাল অপর্ণাকে পাওয়া যাচ্ছে না —সত্যি নাকি ?"

"না—! না—! কে বললে—? মিথ্যাকথা !"

"মিথ্যা ত ? তা হলেই হ'ল ! কে একজন তোমার নামে ডায়েরী পর্য্যন্ত লিখিয়ে এসেছে ! যাক্ বাঁচলুম। অপর্ণা কই ?"

জ্যোতিষ অপর্ণাকে জাগাইয়া দিল।

অপর্ণা আসিয়া দাদামশাইকে প্রণাম করিল।

"চোখ ছল ছল করছে যে ! কী হয়েছে রে অপু ? স্বপ্ন দেখেছিলি ?"

"হাঁ, দাদামশাই। ভয় করছিল খুব। মনে হচ্ছিল কে যেন আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তোমাদের দেখে বুঝেছি, সেটা স্বপ্নই বটে। কিন্তু এখনো বুক কাঁপছে।"

"এ কী কাপড় পরেছিস ? জ্যোতিষের কি একখানা ভাল কাপড় কিনে দেবারও ক্ষমতা নেই ? তোর যে সব গহনা ছিল কোথায় গেল ? সব বেচে খেয়েছে বুঝি ?... কিন্তু কাল যখন এসেছিলুম তখনো মনে হচ্ছিল কিছু কিছু দেখেছিলুম যেন—।"

"দাদামশাই, লজ্জা দিও না আমাদের। কাল রাত্রে চোর এসেছিল। কিন্তু আমার গহনা কিম্বা কাপড় সব চুরি করলেও আমার দুঃখ নেই। আশীর্ব্বাদ কর আমার মাথার সিন্দুর অক্ষয় হোক,—প্রাণে বেঁচে থাকুন,—এই আমার সবচেয়ে বড় সম্পদ। আমি আর কিছু চাই না।"

"ভাল ! ভাল। এই ত চাই। এমনি মনের জোর চিরকাল থাকুক। আমি তোর কথায় বড় সন্তুষ্ট হয়েছি।... জ্যোতিষ! তোমাকে আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। নিজে এখনই বললে অপর্ণার কোন বিপদ হয় নি, অথচ অপর্ণা বলছে চোর এসেছিল, ব্যাপার কী বলত ?...ইন্সপেক্টর সেনের খবর সত্যি নয় কি ?...অপর্ণাকে যদিই ধরে নিয়ে যেত, তার যে মনের পরিচয় পাচ্ছি, আমার মনে হয় প্রায়শ্চিত্তের দরকার নেই কিছু—কী বল ?

"দাদামশাই, এমন কিচ্ছুই হয় নি। আপনি ভাববেন না। সামান্য জিনিষ নষ্ট হয়েছে, তার জন্য আমরা কেউ চিন্তিত নই। আমরা দুজনেই সুস্থ আছি, এই আমাদের যথেষ্ট।"

"অপর্ণা, কাল তোদের ভালবাসার পরীক্ষা করব বলেছিলুম,—দুজনেই পূর্ণ সংখ্যা পেয়েছ। দুজনেই একসঙ্গে ফার্ষ্ট। মনের মধ্যে যেটুকু ধোঁয়া আছে তাও উড়ে যাবে। এস অপর্ণা। এই ব্যাগটা খুলে তোমার জন্য যে কাপড় আর সামান্য কিছু গহনা এনেছি নাও প'র।"

অপর্ণা ও জ্যোতিষ সবিস্ময়ে দেখিল, কিশোরের ব্যাগে তাহাদেরই হারাণো জিনিষ সমস্ত রহিয়াছে। তাহারা মুগ্ধ নয়নে দাদামশাইএর দিকে চাহিল।

রমেন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "জসীমুদ্দীন সাহেব ! আপনার লুঙ্গী, জামা ও টুপি পুলিস অফিসে পড়ে ছিল। অথচ আপনি নিরুদ্দিষ্ট দেখে ভেবেছিলুম, জ্যোতিষ আপনাকে খুন করেছে। যাক্, সুস্থ দেখছি, ভগবানকে ধন্যবাদ।"

কিশোর বলিলেন "এখন আমি জসীমুদ্দীন নই রমেন। এই সব তরুণ নাতি নাতনীর পাল্লায় পড়ে আমাকে আবার কিশোর সাজতে হয়েছে।"

অপর্ণা বলিল "দাদামশাই ! আমাদের পুরস্কার ?"

কিশোর নিজের বুক পকেট হইতে বর্ম্মা-রেশমের অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত একখানি রুমাল বাহির করিলেন, তাহাতে জ্যোতিষ ও অপর্ণার যুগল মূর্ত্তি আঁকা ছিল এবং নীচে লেখা ছিল,—

"বিকশিত যাহে এ মরু জীবন,
প্রাণের মনের এ মহা মিলন,
সুখে, দুখে আর শয়নে, স্বপনে,
ভুলে, ভ্রান্তিতে, জীবনে, মরণে,
অটুট হউক—হে ভগবান !"

রুমালখানি দুইজনেরই সামনে ধরিয়া তিনি বলিলেন "প্রথম পুরস্কার শুধু একখানিই হতে পারে। যদিও তোমরা দুজনেই প্রথম হয়েছ, এই এক পুরস্কারই তোমাদের নিতে হবে। তোমাদের কাল রাত্রির বিরহ, মিলন, সুখ, দুঃখ, ভয়, ভাবনা, আনন্দ সব এমনি এক হয়ে ভগবানের আশীর্ব্বাদ বুকে ধরে তোমাদের বেঁধে রাখে যেন।"

জ্যোতিষ ও অপর্ণা নত হইয়া প্রণাম করিয়া দাদামশায়ের পদধূলি গ্রহণ করিল।

———

পথের সম্বল

[শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস]

—এক—

ভবেশের বাড়ী হইতে তাহার বৌভাতের নিমন্ত্রণ খাইয়া যখন দেবকুমার পথের উপর নামিয়া পড়িল, তখন রাত্রি প্রায় ১১টা বাজিয়া গিয়াছিল। ভবেশের বাড়ী হইতে তাহার বাড়ী মিনিট কুড়ির পথ। সে একটু দ্রুতগতিতেই অগ্রসর হইতেছিল। তাহার সারা মুখটিতে যেন বিরক্তির চিহ্ন সম্পূর্ণরূপেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—"ম্যানার মা—অ ম্যানার মা,—দরজাটা খুলে দিয়ে যাও।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই একটি বর্ষিয়সী দাসী আসিয়া দরজাটি খুলিয়া দিয়া তাহার এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া গেল।

দেবকুমার প্রশ্ন করিল "শোভা কি জেগে আছে?"

"হ্যাঁ বাবু,—কি একটা বই পড়ছেন" এই বলিয়া ম্যানার মা দরজায় খিল দিয়া প্রস্থান করিল।

দেবকুমার ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেল।

শোভা তখন বারাণ্ডায় বসিয়া একখানি বাঙ্গালা উপন্যাস পড়িতেছিল। তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণের তরে চাহিয়া থাকিয়া দেবকুমারের মুখে দারুণ ঘৃণা, দারুণ বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল; সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া জামা কাপড় ছাড়িয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

স্বামীর বিরক্তিভরা মুখখানির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া শোভা উপন্যাসখানি বন্ধ করিয়া ধীরে ধীরে গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

খাটের নিকট উপস্থিত হইয়া কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া শোভা একটু সাহস সঞ্চয় করিয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কিগো—তোমার বন্ধুর বৌ কি রকম দেখলে?"

কিন্তু দেবকুমারের কর্ণে যে সেটা প্রবেশ করিল না, তাহা তাহার ভাব দেখিয়াই প্রকাশ পাইল। তাহার মনে তখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চিন্তা আসিয়া তাল পাকাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল তাহার অদৃষ্টের কথা! এত লোকের বিবাহ হয়—এত লোকের ভাগ্যে সুন্দরী স্ত্রী ঘটে—কিন্তু তাহার অদৃষ্টে এ কি বিড়ম্বনা। হায় রে! সুন্দরী স্ত্রী ত' দূরের কথা সে যে গৃহলক্ষ্মীকে বরণ করিয়া আনিয়াছে, তাহার তুলনা করিতে হইলে বোধহয় তাহাকে সুদূর আফ্রিকায় যাইয়া কাফ্রী রমণীদের দর্শনলাভ করিতে হয়। এইমাত্র সে ভবেশের বৌ দেখিয়া আসিতেছে। কি চমৎকার সুন্দরী! যেমন ছোট মুখখানি, তেমনিই ছোট কপালটি ঢাকিয়া স্তরে স্তরে কুঞ্চিত চুলের গুচ্ছগুলি মুখের উপর পড়িয়া উড়িতেছিল, আর তাহারই ভিতর হইতে গায়ের রঙটুকু যেন ফাটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছিল। উন্নত নাসিকাটির নিম্নে ক্ষুদ্র ওষ্ঠ দুইটির পশ্চাতে যেন সর্ব্বদাই প্রচ্ছন্নভাবে একটি স্নিগ্ধহাস্যরেখা আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছিল···

অন্যান্য বন্ধুরা যখন সকলে উপহার প্রদান করিয়া হাস্য-কোলাহলে গৃহটিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল—তাহার প্রাণের ভিতর তখন যেন কে হাতুড়ী পিটিতেছিল—সে অপলকনেত্রে বধূর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। নববধূর সৌন্দর্য্যের প্রত্যেক খুঁটিনাটিই যেন তাহাকে শোভার রূপের অভাবের ইঙ্গিত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে নিষ্ঠুর উপহাস করিতেছিল। হায় রে! তাহার বেলাই অদৃষ্ট বিদ্রোহাচরণ করিল! অথচ, রূপে, গুণে, মানে, মর্য্যাদায় সে কোনও অংশেই ভবেশ অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু মন তাহার আজ এই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া ক্ষান্ত রহিল না। একটা নৈরাশ্যের আগুন তাহার প্রাণের মধ্যে হু হু করিয়া বেড়াইতেছিল।

শোভা পুনরায় একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"কি গো? চুপ ক'রে রইলে যে? কি রকম বৌ দেখলে?"

তাহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দেবকুমার কঠিন হইয়া শ্লেষপূর্ণস্বরে কহিয়া উঠিল—"তোমার মত রূপসীর তা' জান্‌বার কোনও অধিকার নেই! বরং যদি তার আগে

আয়নাতে একবার দয়া করে নিজের মুখখানি দেখে আস ত' বড়ই ভাল হয়!"

শোভার মুখে যেন কে সহসা খানিকটা কালী লেপন করিয়া দিল। স্বামীর নীরবতার হেতুর একটি ক্ষীণ সূত্র পাইতে তাহার আর বিলম্ব হইল না! সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দেবকুমার তখনও তাহার দিকে চাহিয়াছিল। শোভার সেই শান্ত স্তব্ধ মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার ক্রোধ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল "কই, এখনও উঠলে না যে? আমিই কি তবে উঠে গিয়ে আয়নাখানা এনে মুখের সামনে ধরব নাকি?"

শোভার প্রাণে তখন অপমানের সহস্র তীক্ষ্ণ সূচ ফুটাইতেছিল—সে রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল—"দয়া ক'রে মাপ কর—আমার জিজ্ঞেস করা ঝকমারী হয়েছে—"

দেবকুমার গর্জ্জিয়া উঠিল—"সে কি একবার। একশো বার ঝকমারী হয়েছে। শুধু তোমার কেন—আমারও ঝকমারী হয়েছে তোমায় বিয়ে করা। লোকের বউ এসে গৃহকে উজ্জ্বল ক'রে তোলে। কিন্তু, তুমি এসে অবধি, আমার গৃহ উজ্জ্বল করা ত' দূরের কথা—আমার উজ্জ্বল গৃহটীকে ক্রমশঃ নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে খাপ্ খাইয়ে নিচ্ছ" এইটুকু বলিয়া সে একটু চুপ করিল, তাহার পর পুনরায় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিয়া উঠিল..."তোমাকে বিয়ে করবার আগে আমি ঢের সুখী ছিলাম। মনে মনে কল্পনা রাজ্যের কত শত ছবি এঁকে বিবাহিত জীবনটাকে মধুময় ক'রে তুলব ভেবেছিলাম—কিন্তু তুমি পদার্পণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি আমার মন থেকে একেবারেই মুছে গেছে,—এমন কি তার একটা দাগও এখন পাওয়া যায় না। তোমাকে বিয়ে করা অবধি বাস্তবিকই আমার প্রাণে একতিল শান্তি নেই। আমার ভাগ্যে যে এই কুৎসিৎ বউ আছে—বাস্তবিকই আমি তা' স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।" কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব থাকিয়া সে পুনরায় তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দারুণ বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিয়া উঠিল—"তোমার জন্য আজ আমায় কত লাঞ্ছিত, কত অপমানিত হ'তে হয়েছে তা' জান? প্রায় চেনা পরিচিতের মধ্যে সকলেই যাবার সময়ে আমাকে বলে গেল—"কি হে! কেমন Execellent দেখতে বল দেখি—তোমার বউয়ের চেয়ে সহস্রগুণে ভাল।" ভূপেন মুচকে হেসে বল্লে—"ওহে, তোমার বউকে একবার এর পাশে বসিয়ে দেখো দেখি—কি রকম দেখায় পরেশ টিটকারী করলে 'দেবুদা, তোমার বউকেও বেশ দেখতে ভাই, তবে কিনা—ঐ সাম্‌নের দাঁত দুটো—তা' সেটা উখো দিয়ে ঘ'সে দিলেই চলবেখ'ন।"

এই বলিয়া দেবকুমার নীরব হইল—তাহার অন্তর ভেদ করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"হা ভগবান! আমার কপালে এই ছিল? আমি যে মনে মনে কত সুখেরই স্বপ্ন গড়েছিলাম! ছেলেবেলায়ই বাপ মা দুইই হারালুম—তার পরও অশেষ কষ্টের ভেতর দিয়ে কাটিয়ে এসেছি। ভেবেছিলাম যে বিয়ে ক'রে বুঝি যথার্থই সুখী হব। কিন্তু, হায়! এই ত' তার নিদর্শন।"

শোভা এবার শত চেষ্টাতেও আপনাকে সংযত রাখিতে পারিল না। দেবকুমারের কথার প্রত্যেক অক্ষরটি যেন তাহার প্রাণে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় প্রবেশ করিয়া তাহার ভিতরটাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। হায়! সে কুরূপা! কিন্তু, তাহার নিমিত্ত কি সে দায়ী? সুরূপ, কুরূপ দুইয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই যে তাহাকে কুরূপা করিয়াছেন।

সে অতিকষ্টে একটি দীর্ঘশ্বাস ধীরে ধীরে দমন করিয়া ফেলিল তাহার স্বামী যে তাহাকে বিবাহ করিয়া বিন্দুমাত্রও সুখী হন নাই—এই কথাটি ক্ষণে ক্ষণে তাহার প্রাণে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিতেছিল। ওগো কেন? রূপ তাহার নাই, সে ত' তাহা অস্বীকার করিতেছে না! কিন্তু রূপ ব্যতীত কি পৃথিবীতে মানুষের কাম্য অন্য কোনও বস্তু নাই? সে যে এই ছয়মাস ধরিয়া তাহার স্বামীকে একনিষ্ঠ ভাবে ভালবাসিয়া আসিতেছে—সে যে প্রতি মুহূর্ত্তেই একান্ত ভাবে তাহার সেবা করিয়া আসিতেছে। তাহার এই যে একনিষ্ঠ প্রেম, এই যে ঐকান্তিক সেবা—এগুলি কি রূপ অপেক্ষা হীন? এইগুলির বিনিময়ে কি তাহার কুরূপের আধিপত্য তাহার স্বামীর হৃদয় হইতে মুহূর্ত্তেরও জন্য দূর হয় নাই? বাহ্যিক রূপ ব্যতীত কি মানুষকে সুখী করিবার

অন্য কোনও উপায় নাই ? ওগো, কে তাহাকে বলিয়া দিবে— যাহাতে সে তাহার স্বামীর মনোরঞ্জন করিতে পারে—যাহার দ্বারা সে তাহার প্রাণে শান্তি দিতে পারে। ওগো কি করিলে সে তাহার স্বামীর সর্ব্বাঙ্গহীন রূপে উপযুক্ত হইতে পারে ? তাহার কি কোনও উপায় নাই ? যে কোনও উপায় হউক—যত বড়ই হউক—তাহার প্রাণ দিলেও যদি তাহার স্বামী সুখী হন—তাহাও দিতে সে প্রস্তুত। তাহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে করুণস্বরে কহিয়া উঠিল—"কেন তুমি আমার জন্য এত কষ্ট পাচ্ছ ? বল—বল,—কি করলে আমি তোমায় সুখী করতে পারি ? তুমি যে আমার জন্য ....."সে আর বলিতে পারিল না—একটি উদ্দাম অশ্রুর বন্যা তাহার কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

কিঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া সে দেবকুমারের পা দু'খানি জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করিল "ওগো, বল—বল—কোথায় তোমার ব্যথা ? আমি প্রাণপণে তা' দূর করবার চেষ্টা করব।

দেবকুমার কোনও উত্তর করিল না। দারুণ বিরক্তিভরা দৃষ্টিতে তাহার দিকে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত দৃষ্টিপাত করিয়া সে পা দু'টি মুক্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

পা দু'খানিকে আরও একটু শক্তভাবে চাপিয়া ধরিয়া, তাহার উপর মস্তক রাখিয়া শোভা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "ওগো না-না ! পা সরিয়ে নিও না। আগে বল, কি করলে আমি তোমার মনের ব্যথা দূর করতে পারি ; তুমি আমার স্বামী—আমার দেবতা-আমার সর্ব্বস্ব,—তোমার কষ্ট দেখলে যে আমার বুক ফেটে যাবে। বল,—বল,—আমি কুরূপা, আমার জন্য তোমার মনে তিলমাত্রও শান্তি নেই ; বল তুমি,-আমি তোমার মনের মত মেয়ের সঙ্গে আবার তোমার বিয়ে দেব। আমার তাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখ হবে না। বল—বল-তাহলে ত' তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হবে ! তাকে তুমি প্রাণ ভরে ভালবেস—তার ওপর তোমার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত প্রেম এক নিঃশ্বেসে ঢেলে দিও—আমি তাতে কিছুই বলব না। আমি তোমার কাছ থেকে কিছুই চাইব না—আমায় খালি এই চরণ দু'খানি থেকে বঞ্চিত ক'রো না—প্রতিদিন তোমার এই পা দু'খানি আমায় দয়া করে পূজা করতে দিও" এই বলিয়া সে দেবকুমারের পা দু'খানি অজস্র চুম্বনে ভরিয়া দিল।

দেবকুমার দারুণ ঘৃণাভরে কহিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, আমার বাপ লাখ টাকার তালুক রেখে গেছেন কিনা যে,—আমি বসিয়ে বসিয়ে দুটো মাগকে খাওয়াব।"

"দোহাই তোমার। তুমি বিয়ে কর—তুমি সুখী হও। তোমার কষ্ট যে আমি প্রাণ থাকতে দেখতে পারব না। লক্ষ্মীটি, তুমি আর একটি বিয়ে কর। বাবার কাছ থেকে আমি মাসে মাসে যা হাত খরচ পাই, তাইতেই তার খুব চলে যাবে। আমরা দু'জনে দুটি বোনের মত থাকব .."

ঘড়িতে টং করিয়া একটা বাজিয়া গেল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া একরাশ বাতাস আসিয়া দুরন্ত ছেলের ন্যায় শোভার চুলগুলি লইয়া খেলা করিতে লাগিল। শোভা সেইরূপ ভাবেই তাহার পায়ের উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়াছিল। দেবকুমার একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঘৃণাভরে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার নিরন্তরই ভবেশের বধূর মৃদু হাস্যমণ্ডিত লজ্জানম্র মুখখানিই মনে পড়িতেছিল। সে কহিয়া উঠিল "দূর হোক ছাই।—এখন একটু ঘুমুতে দেবে না কি ?"

"আগে বল, আমার এই মিনতিটী রাখবে—বল আগে, তুমি আর একটি..."

দেবকুমার বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল "আচ্ছা জ্বালাতনেই পড়েছি যাহোক্—এখন ওঠ,—দয়া ক'রে আমায় একটু ঘুমুতে দাও।"

শোভা কোনও উত্তর না দিয়া সেইরূপ ভাবেই পড়িয়া রহিল।

দেবকুমার এবার একটু উত্তেজিতকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "আচ্ছা ফ্যাঁসাদেই পড়েছি বাবা—রাত্রে একটু ঘুমুতেও দেবে না ?"

অস্ফুট স্বরে শোভা বলিল "তা' তুমি ঘুমোও না—আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

দেবকুমারের ক্রোধ ক্রমশঃ ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম

করিতেছিল,—কহিয়া উঠিল "আর অত দরদে কাজ নেই—, এখন বিছানা থেকে উঠবে কিনা বল ?"

তাহার পা দু'খানি আরও নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিয়া শোভা এবার দৃঢ়স্বরে কহিয়া উঠিল "না! বিছানা থেকে কোনও মতেই উঠব না আমি!···আমিও এখানে শোব।"

দেবকুমার দৃপ্তস্বরে কহিয়া উঠিল "কি? এত বড় স্পর্দ্ধা! যা' হবার হয়েছে—আজ থেকে তোমাকে আমি কিছুতেই আমার কাছে শুতে দেব না। যাও—এখনও উঠে যাও বলছি, নইলে..."

এই বলিয়া সে তাহার পা দু'খানি জোর করিয়া মুক্ত করিয়া লইল।

শোভা বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল। একটি দুর্দ্দমনীয় অশ্রুর নির্ঝর তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল। সে পূর্ব্ববৎ রুদ্ধ অথচ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিল "নইলে যা' খুসী কর। আমি এখান থেকে কিছুতেই যাব না...এই বিছানাই আমার..." সে আর বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

এবার দেবকুমারের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। দারুণ ঘৃণায়, ক্রোধে, বিরক্তিতে সে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল—সে চীৎকার করিয়া উঠিল "আলবৎ যাবে—তোমার বাবা যাবে" এই বলিয়া সে পা দিয়া সজোরে তাহাকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া পাশের বালিশটি কোলের ভিতর টানিয়া লইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল।

তাহার সেই আঘাত শোভা সহ্য করিতে পারিল না—গড়াইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। খাটের কোনে লাগিয়া তাহার কপাল হইতে ফিন্‌কী দিয়া রক্ত ছুটিল।

একটি দারুণ হাহাকার,—তাহার অন্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল। তাহার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

সে অস্ফুট স্বরে "উঃ মাগো" বলিয়া ক্ষতস্থানটি টিপিয়া ধরিয়া সেইরূপভাবে বসিয়া রহিল।

—দুই—

উক্ত ঘটনার পর প্রায় তিনমাস অতীত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যার সময়ে ভবেশ Harish Park এ একটি বেঞ্চের উপর বসিয়া Forward এর উপর চক্ষু বুলাইতেছিল।

এমন সময়ে দেবকুমার আসিয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল "এই যে ভবেশ—Jamalpur থেকে কবে ফিরলে ?"

Forward খানি রাখিয়া দিয়া ভবেশ উত্তর করিল "কাল সকালে; বস।"

তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া দেবকুমার একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"তারপর—কি ব্যাপার হে?"

কিসের ব্যাপার ?"

বলি—বউয়ের সঙ্গে চলছে কেমন ?"

"ওঃ" এই বলিয়া ভবেশ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল "আর—দাদা।"

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া দেবকুমার প্রশ্ন কহিল "কিহে? চুপ করলে যে ? কিরকম চলছে?"

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ভবেশ গম্ভীর ভাবে কহিল "এতদিনে বুঝতে পেরেছি শ্রীকৃষ্ণ কেন বলেছিলেন "দেহি পদপল্লব মুদারম্।"

মৃদু হাসিয়া দেবকুমার কহিল—"বটে। তোমাকেও তা হ'লে মাঝে মাঝে শ্রীরাধার মান ভাঙ্গাতে হয়?"

উদাসকণ্ঠে ভবেশ উত্তর করিল "হ্যাঁ ভাই। তবে তার সঙ্গে শ্রীরাধিকার তুলনা ক'র না—তাতে রাধা নামের অপমান করা হবে।"

মুখ হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণ করিয়া একটু আশ্চর্য্য হইয়া দেবকুমার প্রশ্ন করিল—"কিরকম? অমন বৌ তোমার···"

সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল—বাধা দিয়া ভবেশ কহিয়া উঠিল "দরকার নেই ভাই আমার অমন সুন্দরী বউয়ের; ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যেন বরাবর আমি কাল বউ পাই।"

দেবকুমার এবার অধৈর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল "সমস্ত একটু খুলেই বল না ছাই—কি ব্যাপারটা শুনি।"

"আচ্ছা বলছি—দেখি একটা সিগারেট।"

সিগারেট ধরাইয়া তাহাতে একটি টান দিয়া ভবেশ

উদাস ভাবে কহিল "প্রথম যখন বিয়ে হ'ল, তখন সাবিত্রীকে পেয়ে আমার আর আনন্দের সীমা রইল না। প্রত্যেকেই বউ দেখে সুখ্যাতি করে যেতে লাগল—আমারও বুকটা সেই পরিমাণে ফুলে উঠতে লাগল। তার মুখের দিকে দেখলেই—তার একটু হাসি দেখলেই আমি আমোদে আত্মহারা হয়ে যেতাম—ভগবানকে মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ দিতাম। কিন্তু হায়! তখন ত' বুঝিনি যে ঐ হাসির পিছনে কতবড় একটা পাষাণের মূর্ত্তি ফুটে বেরুচ্ছে!"

এই বলিয়া সে একটু চুপ করিল।

"কিহে—চুপ করলে কেন—বল না?" এই বলিতে বলিতে দেবকুমার তাহার একটু নিকটে সরিয়া বসিল।

ভবেশ একটু দৃপ্তকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কি আর বলব ভাই। এটুকু জেনে রেখ যে, আজকাল—শুধু আজকাল কেন—যতদিন সাবিত্রী বেঁচে থাকবে, ততদিন আমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে।"

"কেন, সে কি তোমার যত্ন টত্ন করে না?"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভবেশ কহিল—"কি বল্লে—যত্ন? সাবিত্রীকে JamalPurএ নিয়ে যাবার পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত যত্নই বল, আর আদরই বল যথেষ্টই পেয়েছিলাম। কিন্তু, এখন যত্ন ত' দূরের কথা—আমি তার কাছ থেকে এই কয়দিনের ভেতরই যা' ব্যবহার পাচ্ছি—অন্য কেউ হ'লে বোধহয় কোনও কাণ্ড ক'রে বসত।"

দেবকুমার আগ্রহ সহকারে প্রশ্ন করিল—"কেন?"

O little learning is a dangerous thing, drink deep or touch not—ঐ রকম কি একটা ইংরাজী কথা আছে না?"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ—"

"আমার বৌয়েরও হয়েছে তাই! শ্বশুর ত' মাইনে পান ৩৫০৲ টাকা। কিন্তু তার গুমোরেই আমার সাবিত্রীর মাটিতে পা পড়ে না। উঠতে বসতে আমাকে খোঁটা দেন—'আমার বাপের এত পয়সা, আমার কখনও এত কষ্টে থাকা অভ্যেস নেই। সেখানে আমি তিনদিন অন্তর একটা ক'রে নতুন সাবান ভাঙতুম—চারদিন অন্তর Hazeline আসত আমার এ রকম রান্না-বান্না পোষায় না।" ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ভাই গরীব মানুষ—মাস গেলে মাইনে পাই মাত্র ৮০টি টাকা। তার মধ্যে এখানে মা, বিধবা বৌদি,—ছোট ভাই এঁরা সব থাকেন। মা পৈতৃক ভিটে বাড়ী ছেড়ে যেতে চান না—সুতরাং এখানে আমার প্রতি মাসে প্রায় পঞ্চাশ ষাট টাকা করে পাঠাতে হয়। আমার দ্বারা কি করে অত হয়ে ওঠে ভাই।"

মুখ হইতে ধ্বংসাবশেষ সিগারেটটি নিক্ষেপ করিয়া দেবকুমার উত্তর দিল—"সে ত' ঠিক কথা।"

"কিন্তু, তবু আমি তাকে সুখী করবার জন্য কোনও ত্রুটি করি না! আমি আজন্মকালই কষ্টের ভেতর দিয়েই লালিত পালিত,—সে ত' তুমি জানই। সাবান, সেণ্ট, ইত্যাদি, আমি কখনও জীবনে ব্যবহার করিনি। কিন্তু পাছে সে কিছু মনে করে—পাছে সে মনে কষ্ট পায়—সেইজন্য আমি প্রতি মাসেই তার জন্যে একবাক্স সাবান আর একটা Hazeline নিয়ে আসি। কিন্তু, ভাই এত করেও আমি তার কাছ থেকে মুহূর্ত্তের জন্যও ভাল ব্যবহার পাইনি।"

এই বলিয়া সে একটু নীরব হইল, পরে পুনরায় কহিয়া উঠিল—"তুমি যত্নের কথা বলছিলে না? শুধু একদিনের কথা বলি শোন—তারপর যা' খুসী হয়, বল। সেদিন বোধ হয় পয়লা হবে—আমার মাইনে পাবার দিন। সকাল থেকেই যেন গা হাত পায়ে অসম্ভব রকম বেদনা হ'য়েছিল। কিছু না খেয়েই আফিসে বেরিয়ে পড়লাম। হ্যাঁ—যাবার সময়েই সাবিত্রী এসে বল্লে—"আজ ৫দিন ধ'রে বলছি, যে, আমার সাবান ফুরিয়ে গেছে—সাবান এনে দাও—তা' কথা কানেই তোলা হচ্ছে না; যেন কে দাসী কিংবা চাকরাণী বলছে আর কি। কিন্তু আজ যেন মনে থাকে আজ আমার সাবান না হ'লে মোটেই চলবে না।" আমি ত' "আচ্ছা" বলে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভাই বেলা তিনটার সময়ে ভয়ানক জ্বর এল—হাত পা সব ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল—কোনও রকমে বাড়ীতে এসে বিছানার ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম; সকালে কিছু খেয়ে যাই নি—খিদেও পাচ্ছিল। বললুম "সাবিত্রী, আমাকে একটু সাবু করে দিতে পার?" তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না! সে কি বললে জান?"

দেবকুমারের চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একখানি কাল পরদা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছিল—কহিল "কি বললে ?"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ভবেশ কহিল "সাবুর কথা ত' ছেড়েই দাও। সে বল্লে "কই আমার সাবান ?" জরে, অসহ্য বেদনায় তখন আমার সর্ব্বশরীর পুড়ে যাচ্ছিল, বললুম "আপিসেই আমার জর এসেছিল সাবিত্রী, সেই জন্যে তোমার সাবান আনতে পারি নি, কাল যদি ভাল থাকি ত' নিয়ে আসবখ'ন। তুমি এখন আমাকে একটু সাবু করে দাও—ক্ষিদেয় পেট জলে যাচ্ছে।"

গাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া দেবকুমারের যেন আলোর একটি ক্ষীণরেখা দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। সে অধৈর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল "তারপর ?"

"তারপর আর কি ? বারুদে অগ্নিসংযোগ ! অ্যাঁ, সাবান আন নি ? পাঁচদিন ধরে যে আমার সাবান মাখা হ'চ্ছে না—সেটা কি চোখের মাথা খেয়ে দেখতে পাচ্ছ না ? এতদিন 'মনে ছিল না', 'হাতে টাকা নেই' এই ব'লে আসছিলে, আর আজ অমনি কোথাও কিছু নেই—হঠাৎ জর ! ওসব চালাকী আমি বুঝি। কৈ, মাকে মাসে মাসে একরাশ টাকা পাঠাবার বেলা ত' ভুল হয় না ? আমার বেলাই যত ভুল ইত্যাদি। আমি একটু রেগেই বলে উঠলাম না, সে ভুল আমার জীবনে কখনও হবে না। সে ভুল হবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়। এখন বাজে চেঁচিয়ো না—একটু সাবু করে দিতে পারবে কিনা বল ?"

এবার তিনি একেবারে কেউটে সাপের মত ফোঁস করে উঠলেন—"ব'য়ে গেছে, আমার এখন সাবু করতে। এই চারটের সময়ে আমি আবার উনুনে আগুন দিই আর কি। অত গরজ থাকে ত' নিজে করে নিতে পার—আমি কারও দাসী নই।" আমি থাকতে পারলুম না, বললুম "আমার অসুখের চেয়ে কি তোমার সাবানটা বেশী হ'ল সাবিত্রী ? স্বামীর জন্য যদি এই সামান্য কর্ত্তব্যটুকু করতে না পারবে—তবে বিয়ে করেছিলে কেন ? তোমার বিয়ে না করাই উচিত ছিল।"

দেবকুমার স্নেহপূর্ণ স্বরে প্রশ্ন করিল "তিনি কি উত্তর দিলেন ?"

"উত্তর ! আমার কাছে এসে এক horrible postureএ হাতমুখ নেড়ে বললেন "বিয়ে কি আমি নিজে করতে গিছলাম—না তোমার মা আমার বাবাকে সেধে সেধে আমার সঙ্গে বিয়ে দিলে ? আবার বলেন কি না কর্ত্তব্য করতে পার না ? ওঃ! নিজে ত' স্ত্রীর সব কর্ত্তব্য ক'রে একেবারে উল্টে গেলেন। আমি যে এতদিন ধরে সাবান মাখতে পাচ্ছি না—না মাখতে পাচ্ছি Hazeline সেটার বেলা চোখদুটো থাকে কোথায় ?"

এইরকম ভাই। মুখ আর মনের মধ্যে যে এতবড় একটা ব্যবধান থাকতে পারে—সেটা আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা। সাধ করে কি বলছি ভাই যে, ও যতদিন থাকবে—ততদিন আমার দুর্গতির সীমা নেই।"

"তা' তুমি ত এখানে চলে এসেছ,—তাঁকেও এনেছ না কি ?"

"না ভাই। সে পথ সে নিজেই close ক'রে নিয়েছে।"

"তার মানে ?"

"এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি বাপকে চিঠি লিখেছিলেন, বাপ এসে আদরিণী কন্যাকে নিয়ে গিছলেন।"

"তোমায় join করতে হবে কবে ?"

"আজ হ'ল গিয়ে 5th, আমাকে join করতে হবে 19th। বাস্তবিকই দেবকুমার, ওর জন্যে আমার আর Jamalpurএ ফিরতে ইচ্ছে করে না—কিন্তু কি করব ভাই, অন্য উপায়ও ত নেই।" তৎপরে একটু ভাবিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল "এবার কিন্তু আমি নিজে কিছুতেই তাকে আনছি না —যতদিন না বাপ নিজে কন্যাকে রেখে যায়।"

দেবকুমার তখন নিজের চিন্তায় বিভোর। সে তখন মনে মনে তুলনার নিক্তিতে একদিকে সাবিত্রীকে ও অপর দিকে শোভাকে রাখিয়া তাহাদের পার্থক্যটা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার প্রয়াস করিতেছিল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই শোভার প্রতি তাহার এই কয়মাসের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাহার সারা অন্তর আজ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। একটা তীব্র অনুশোচনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তাহার মন আজ শোভার প্রতি বেশ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং সেই

সঙ্গে সঙ্গেই সে মনে মনে ভবেশকে শত শত ধন্যবাদ দিতেও ভুলিল না। সে কহিল "অঁ্যা।"

ভবেশ এবার একটু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল "যাঁদের outward appearance একটু ভাল,—কিংবা যাঁরা of fair complexion,—তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেরই অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না। মনে করেন বুঝি, এক একজন এক একটি Cleopetra. যাঁরা unfortunately একটু কুৎসিৎ দেখতে —কিংবা যাঁদের complexionটা তাঁদের চেয়ে একটু inferior—তাঁদের সঙ্গে ত' সেই Cleopetraর দল—অর্থাৎ সেই সুন্দরীরা ত' কথাই বলতে চান না। কেন না —তাঁদের Prestige নষ্ট হবে।"

দেবকুমার একটু উত্তেজিত ভাবেই কহিয়া উঠিল—"exactly."

"কিছু মনে ক'রনাক' তুমি, ফুলশয্যার রাত্রেই আমি সাবিত্রীকে দেখে ভাবলুম হঁ্যা, বৌ হয়েছে বটে, যেমন complextion, তেমনিই cuttings, কিন্তু সেই সঙ্গে যে তোমার বৌয়ের beautyর কথা মনে ক'রে একটু টিটকারীর হাসি হাসি নি,—এমন মিথ্যে কথা আমি বলব না। কিন্তু, বল ত' ভাই—তোমার বউ কি..."

বাধা দিয়া দেবকুমার কহিয়া উঠিল "না ভাই; আমার বউ কাল, কুৎসিত - দুইই বটে। কিন্তু গুণ ভাই তার অশেষ। তার গুণের কথা বলতে গেলে আর অন্ত থাকে না।"

মুখে সে এই কথা বলিল বটে। কিন্তু হায় রে! তাহার সেই ব্যবহারের বিনিময়ে শোভা যে তাহার নিকট হইতে কিরূপ প্রতিদান পাইয়া আসিয়াছে সেটা ত' তাহার অজ্ঞাত নাই। অতি সঙ্গোপনে সে একটি দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া ফেলিল। তৎপরে রিষ্ট ওয়াচের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিয়া উঠিল "আচ্ছা আটটা বাজে। আজ চললুম ভাই, একটু কাজ আছে।"

"আচ্ছা—পার ত' কাল একবার এস।"

—তিন—

কেহ কোনও নূতন তথ্য আবিষ্কার করিলে তাহার প্রাণে যেরূপ আনন্দ হয়, তাহার অপেক্ষাও বোধ হয় বেশী আনন্দ হইতেছিল দেবকুমারের—তখন সে park হইতে বাহির হইয়া পথের উপর নামিয়া পড়িল। সে সোজা বাড়ী না গিয়া একেবারে clubএ গিয়া উপস্থিত হইল।

ভিতরে পদার্পণ করিবামাত্র একযোগে প্রায় সকলেই কহিয়া উঠিলেন "আরে, এই যে দেবুদা—এস, এস, অনেকদিন তোমার গান শুনি নি, একখানা হ'য়ে যাক্।"

সে মৃদু হাসিয়া হারমোনিয়াম লইয়া গান ধরিল—

"কত আশা করে তোমারই দুয়ারে
ভিখারীর বেশে এসেছি"

গাইতে যে সে খুব ভাল পারিত, তাহা নহে, তবে গলাটি ছিল তার বড় মিষ্ট! সে গাহিতে লাগিল—

'খোল দ্বার খোল, তোল মুখ তোল,
দেখ দেখ আমি কত কেঁদেছি'

"কিহে—দেবকুমার যে! তুমি এখানে?"

এই বলিতে বলিতে অজয় গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

হারমোনিয়ামের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে দেবকুমার মৃদু হাসিয়া উত্তর করিল "কেন দাদা? আসতে নেই কি?"

"আসতে থাকবে না কেন? তবে তোমার স্ত্রীর অসুখ কিনা—সেই জন্য..."

"আমার স্ত্রীর অসুখ! কে বললে?" বিস্মিত কণ্ঠে এই বলিয়া সে অজয়ের মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল।

কিয়ৎক্ষণ তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া অজয় আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল "সে কি! এত অসুখ—আর তুমি জান না? কালকেই ত' ধীরেনবাবু আমাকে বলেছিলেন যে, Precarious condition"

সহসা যদি সেই মুহূর্ত্তে গৃহের ভিতরে একটি বোমা ফাটিয়া পড়িত, তাহা হইলেও বোধ হয় সে অতটা ভীত ও চমকিত হইয়া উঠিত না যতটা না অজয়ের কথা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

হারমোনিয়ামের বেলোটাকে সজোরে চাপিয়া ধরিয়া সে কোনওরূপে কহিয়া উঠিল "না—না হতেই পারে না, তুমি ভুল শুনেছ।"

বাধা দিয়া অজয় কহিয়া উঠিল "পাগল না কি? ভুল হ'লেই হ'ল? আর তা ছাড়া, মা নিজে গিয়ে দেখে এসেছেন। পরশুদিন তিনটার সময়ে এসে মা আমাকে বললেন 'ওরে, দেবুর বৌয়ের ভয়ানক অসুখ।' জিজ্ঞাসা করলুম 'কি অসুখ মা?' মা বললেন "কি জানি বাবা। কিছুদিন আগে বুঝি সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি নামতে গিয়ে পড়ে গিছল—তাইতে কপালের খানিকটা কেটে গিছল। সেইদিন থেকেই একটু একটু ক'রে জ্বর হ'ত—তার ওপর ছুঁড়ীটা যেন কি রকম, শরীরের প্রতি মোটেই যত্ন নিত না— এখানী তিন চারদিন হ'ল বেশ বাড়াবাড়ি হয়েছে।'

পার্শ্ব হইতে নিবারণ কহিয়া উঠিল "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও কণার মুখে তোমার স্ত্রীর অসুখের কথা শুনেছিলাম বটে, কিন্তু এরকম অবস্থা তা ত' জানি না।—যাও ভাই, তুমি চলে যাও, আর দেরী ক'র না।"

দেবকুমার কোনওরূপে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া টলিতে টলিতে পথের উপর নামিয়া পড়িল। কে যেন ক্ষণে ক্ষণে তাহার নিঃশ্বাস রোধ করিয়া দিতেছিল। অজয়ের কথার প্রত্যেকটি অক্ষর যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাহার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভিতরের সমস্তটা দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছিল। 'সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কপালটা কেটে গিছল'—এই কথাটি যেন নিরন্তরই তাহার হৃদয়ের সবটুকু একেবারে হু হু করিয়া জ্বালাইয়া দিতেছিল। উঃ—এই শোভা! এই শোভাকে সে পদাঘাত করিয়াছিল। কপাল তাহার কিরূপে কাটিয়া গিয়াছিল এ কথা অন্য কেহ জানুক বা নাই জানুক,—তাহার এবং তাহার অন্তর্যামীর ত' তাহা অজ্ঞাত নাই। উঃ—তাহাকে পদাঘাত করিবার পূর্ব্বে তাহার মাথায় বজ্র হান' নি কেন প্রভু। তাহারই কৃতকর্ম্মের এই শোচনীয় পরিণাম। কিন্তু কই, তাহার যে এরূপ অসুখ শোভা ত' তাহাকে সেটা মুহূর্ত্তের নিমিত্তও জানিতে দেয় নাই। উপরন্তু সে যে সেই অবস্থাতেই প্রতি মুহূর্ত্তে নীরবে ঐকান্তিকরূপে তাহার সেবা করিয়া আসিয়াছে। কেবল দুই তিনদিন তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের সে ত্রুটি দেখিয়াছিল। কিন্তু ভগবান, তখনও তাহাকে কেন ঘুণাক্ষরেও জানিতে দাও নাই?—তাহা হইলেও যে সে প্রাণপণে তাহার প্রতীকার করিতে পারিত। উঃ—আজ সে নিজেই তাহাকে হত্যা করিতে বসিয়াছে। ভগবান তাহাকে যত বড়ই শাস্তি দাও সে তাহা মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত—শুধু শোভার মৃত্যুর ভিতর দিয়া যেন তাহার অপরাধের প্রতিশোধ লইও না।

শূন্য, জনহীন অঙ্গনে পদার্পণ করিবামাত্র সারা অঙ্গনটি যেন তাহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। একটা দমকা বাতাস যেন কাণের নিকটে বলিয়া গেল "ঠিক্ হয়েছে। কেমন জব্দ—ও আর কিছুতেই বাঁচবে না। সে কোনওরূপে আত্মসংবরণ করিয়া রুদ্ধশ্বাসে 'নিজের গৃহের সম্মুখে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল।

শোভা তখন মেঝের উপর বিছানাতে চক্ষু বুজিয়া শুইয়াছিল, আর ম্যানার মা তাহার শীর্ণ বক্ষের উপর মালিশ করিতেছিল। তাহার জ্যোতিঃহীন চক্ষু দু'টির কোলে দুই বিন্দু অশ্রু টল্ টল্ করিতেছিল। এই দাসীটি শোভার বাপের বাড়ীর। শোভা যখন দুই বৎসরের তখন হইতেই সে তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া এক রকম মানুষ করিয়া তুলিয়াছে—তাই ভালবাসিতও শোভাকে যথেষ্ট। দেবকুমারকে দেখিয়া ম্যানার মা শোভার শীর্ণ বক্ষটি আবৃত করিয়া দিয়া কহিল "দিদিমণি, জামাইবাবু এসেছেন।"

চক্ষু উন্মীলন করিয়া গৃহের সম্মুখে দেবকুমারের বেদনাক্লিষ্ট মুখখানির উপর দৃষ্টিপাত করিবামাত্র শোভা অন্তরে নিবিড় ব্যথা অনুভব করিল। একটু হাসিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিল— "এস, আজ এত শীগ্‌গীর এলে যে?"

দেবকুমার শত চেষ্টাতেও আর স্থির থাকিতে পারিল না; সে পাগলের মত বিছানার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল "শোভা—শোভা—আমায় ক্ষমা কর।"

"ছিঃ! ও কথা বলতে নেই—ওতে যে আমার অপরাধ হয়।" মৃদুকণ্ঠে এই কথা বলিয়া সে ম্যানার মা'র দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "ম্যানার মা, প্রায় ন'টা বাজে, তুমি ওঁর ঠাঁইটা করে দাওগে।"

ম্যানার মা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

দেবকুমার কহিয়া উঠিল—"এখন আমি কিছুতেই খাব না, শোভা—আমার মোটেই খেতে ইচ্ছে নেই।"

বাধা দিয়া শোভা কহিয়া উঠিল—'খুব খেতে পারবে। মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

তারপর তাহার মুখের উপর একটি গভীর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া মৃদু হাসিয়া ভৎর্সনা সূচক স্বরে কহিয়া উঠিল—"এঃ চোখ দুটো যে একেবারে রাঙা জবা হ'য়ে গেছে—কাঁদছিলে বুঝি ? অ্যাঁ ?"

দেবকুমার আর থাকিতে পারিল না—সে তাহার একটু নিকটে আসিয়া তাহার একখানি শীর্ণ হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে লইয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "তোমার এত অসুখ শোভা—কেন আমাকে জানতে দাও নি ? আমি এ ক'দিন রাগ করে তোমার সঙ্গে কথা বলিনি ব'লে, কি তোমারও অভিমান করে থাকৃতে হয় ? কেন তুমি অন্য ঘরে শুতে বল ? বল—এই রকম করেই কি প্রতিশোধ নিতে হয় ? ম্যানার মাকে দিয়েও ত' বলাতে পারতে ? কেন তুমি আমায় এত পর করে দিলে ? উঃ শোভা—শোভা—কেন তুমি আমায় বলনি ? আমার প্রাণে যে..."

শোভা তাহার হাতের উপর একটু চাপ দিয়া অনুযোগপূর্ণস্বরে কহিল—"দোহাই তোমার, তুমি অত উতলা হ'য়ো না। ভয় কি ? অসুখ কি আর কারও হয় না ? আমি সেরে যাব'খন।" শেষের দিকটা তাহার গলার স্বর ধরিয়া গেল। সে অশ্রু গোপন করিবার নিমিত্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। হায় রে! কিছুদিন পূর্ব্বেও একথা বলিলে তাহার কিছু সামঞ্জস্য থাকিত। কিন্তু, এখন সে কথা বলা শুধু বিড়ম্বনা মাত্র।

"না! না! আমায় ছেড়ে দাও আমি ডাক্তার নিয়ে আসি—যত ভাল ডাক্তার আছে. আমি সকলকে দেখাব, দেখি...'

বাধা দিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া শোভা একটু কাতরভাবে কহিয়া উঠিল—"কেন তুমি অত অস্থির হ'চ্ছ ? তোমাকে যেতে হবে না! ম্যানার মা তোমার নাম করে ডাক্তারকে বলে এসেছে..."

এমন সময়ে ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া ম্যানার মা গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

ডাক্তারবাবু প্রবীণ—এখানে নূতন আসিয়াছেন। দেবকুমারকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আপনি বুঝি এঁর husband ?"

দেবকুমার উত্তর করিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

ডাক্তারবাবু প্রশ্ন করিলেন—"কিন্তু কাল ত' আমি আপনাকে দেখি নি।"

দেবকুমার কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই শোভা নিম্নকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"উনি এখানে ছিলেন না—আজ সকালে এসেছেন।"

বক্ষটি সজোরে চাপিয়া ধরিয়া দেবকুমার অস্ফুটকণ্ঠে একটি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

ডাক্তারবাবু যথাযথ পরীক্ষা করিয়া উঠিবামাত্রই দেবকুমার তাঁহার সহিত বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফি প্রদান করিয়া, আকুলস্বরে প্রশ্ন করিল—"কি রকম দেখলেন—সত্য করে বলুন ডাক্তারবাবু ?"

ডাক্তারবাবু কিয়ৎক্ষণ তাহার বেদনাক্লিষ্ট কাতর মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিয়া কহিলেন "absolutely hopeless! মাথার এক টুকরা হাড় brainএ—না! কালকের চেয়ে অবস্থা ঢের খারাপ! বড় জোর ঘণ্টা দুই তিন।"

দেবকুমার পাগলের মত তাঁহার পা দু'খানি জড়াইয়া রুদ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল—"ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি, বলুন, কি করলে আমি শোভাকে বাঁচাতে পারি। যত টাকা লাগে...আমি এখনই দেব—দয়া করুন ডাক্তারবাবু—আমি যে বড় একলা—শোভা ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তারবাবুর চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিলেন—"কি করব বাবা বল,—এখন ত' আর আমাদের হাত নেই—এখন ভগবানের হাত। তবে ঝিকে পাঠিয়ে দাও—দেখি একটা last attempt ক'রে। কিন্তু এ ত hope against hope—কিছু হবে বলে ত' আশা করা যায় না।"

ম্যানার মাকে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া সে যখন শোভার পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন করিল—তখন তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শোভা কোনও মতেই নিজেকে সংযত রাখিতে পারিল না। সে বাষ্পাকুল নেত্রে কহিয়া উঠিল—"ওগো আমার মাথা খাও, এমন করে ভেবনা তুমি। আমি যে..."

কিন্তু তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই দেবকুমার তাহার বুকের উপর পড়িয়া উন্মাদের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল—"শোভা! উঃ, কেন তুমি আমার এই সামান্য অপরাধটুকু ক্ষমা করতে পারলে না? তোমরা যে দয়াময়ী শোভা—তবে কেন আমায় দয়া করলে না? কেন—ওগো, কেন তুমি আমায় একবারটি অসুখের কথা বল্লে না?"

এবার শোভা ফোঁপাইয়া উঠিল, কহিল—"তোমার দুটি পায়ে পড়ি...তুমি অমন করে ব'ল না। আগে জানলেই বা কি হ'ত? যে যাবার, সে যাবেই—তাকে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।"

তাহাকে একটু নিকটে টানিয়া লইয়া দেবকুমার বিকৃত-স্বরে কহিল "তবুও ত' একবার চেষ্টা করে দেখতে পারতাম শোভা। এতে যে আমাকেই অপরাধী করে গেলে—আমার প্রাণের মধ্যে যে তুমি..."

তাহার চুলের ভিতর অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে শোভা পূর্ব্ববৎ অশ্রুরুদ্ধ স্বরে কহিয়া উঠিল—"ফের তুমি আমাকে এ রকম ক'রে বলছ—এতে যে আমার অপরাধ হবে। তুমি যদি এত অস্থির হও, তাহলে মরণেও যে আমি শান্তি পাব না গো? তুমি আমার স্বামী—আমার দেবতা। তুমি যে আমাকে ক্ষমা ক'রে তোমার পায়ের ধূলো দিয়েছ—এই আমার যথেষ্ট! এর বাড়া আমি আর কিছুই চাইনি!"

তৎপরে কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষীণস্বরে কহিল—"কিন্তু আজ আমি তোমার কাছ থেকে দুটো জিনিস চাইব। দেবে নাকি?"

কোনও রূপে উদ্বেল হৃদয়টিকে চাপিয়া ধরিয়া দেবকুমার প্রশ্ন করিল "কি?"

একটু ক্ষীণ হাসিয়া শোভা কহিল—"আমি মরে গেলে—লক্ষ্মীটি—তুমি তোমার মনের মত দেখে শুনে একটি বিয়ে ক'র। আমি তোমায় সুখী করতে পারলুম না——আর যাবার সময়ে আমাকে একটি..."

এই বলিয়া সে একবার কাতরভাবে দেবকুমারের মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিল।

এবার আর দেবকুমারের চক্ষের জল বাধা মানিল না। সে শোভাকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার শীর্ণ ওষ্ঠদ্বয় হইতে...বোধ করি,—প্রণয়ের শেষ পুষ্প কয়টাই চয়ন করিয়া লইল। তৎপরে তাহার মুখের উপর করুণদৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিল—"তোমার শেষের অনুরোধটা রাখলুম শোভা, তুমি সেরে ওঠ চিরকালই এ অনুরোধ আমি রাখব—কিন্তু প্রথমটা আমি কিছুতেই রাখতে পারব না—কিছুতেই না! শোভা—তোমার জায়গাতে আমি কি করে আর একজনকে বসাব! উঃ, শোভা! আমার যে বাপ নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই—আমার যে আর কেউ নেই শোভা। তুমিই যে আমার সব! তুমি ছাড়া যে আমার আর কেউ নেই! কোথায় যাবে তুমি কিছুতেই আমি তোমাকে যেতে দেব না; আমি তোমাকে এই রকম করে ধরে রাখব—দেখি কার সাধ্য তোমায় নিয়ে যায়।" এই বলিয়া সে তাহার শিথিল অবশ দেহটিকে আরও নিবিড়ভাবে জড়াইয়া ধরিল।

"কিন্তু ওগো, আমায় যে যেতেই হবে—না গেলে ত চলবে না। আমি যাবই! কিন্তু এতটা পথ, আমি কি নিয়ে অতিক্রম করব? আমার যে কিছু নেই গো—আমাকে কিছু সম্বল দাও তা থেকে আমায় বঞ্চিত ক'র না।"

ক্ষীণকণ্ঠে জড়িতস্বরে এই কয়টি কথা বলিয়া শোভা অতি কষ্টে তাহার মুখখানি ঈষৎ উন্নত করিল। দু'টি চক্ষু বহিয়া তাহার অশ্রুর বান ডাকিয়া যাইতেছিল।

একটি অস্ফুট বেদনাজড়িত আর্ত্তনাদ করিয়া দেবকুমার তাহার মুখটি শোভার মুখের নিকটে নত করিল। ধীরে ধীরে ক্ষীণ বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া শোভা তাহার শীর্ণ, রক্তশূন্য ওষ্ঠদ্বয় একবার দেবকুমারের ওষ্ঠে স্থাপন করিল। তাহার সারা মুখখানি একটি সার্থকতার আনন্দে ভরিয়া উঠিল—পরমুহূর্ত্তেই তাহার শিথিল দেহলতা বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িল। পার্শ্বস্থিত বাড়ী হইতে তখন একটি সৌখীন ছোকরা গাহিতেছিল—

'রূপের লাগিয়া বেসনাক' ভাল,
ভালবেসে সুখ পাবে না পাবে না।
রূপ মদনেশা ছুটে গেলে প্রাণে,
মিলনেতে সুখ হবে না হবে ন' ॥'

অস্তরাগ

[শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী]

দুর্গন্ধময়, অপরিচ্ছন্ন একটা বস্তির মধ্যে একটা ভাঙ্গা খোলার ঘরে শৈল পাষাণ-মূর্ত্তির মত স্তব্ধভাবে বসেছিল। ব্যাধির অত্যাচারে তার দেহটা শীর্ণ কঙ্কালসার হ'য়ে পড়েছে। শুকনো পাণ্ডুর মুখে দৈন্যের নিবিড় কালিমা সন্ধ্যা-ছায়ার মতই ঘণিয়ে এসেছে। তার আঁচল ধরে ধুলোয়-ঝরা মুকুলটির মত একটী বুকের পাঁজরা-বেরুনো শিশু কেঁদে বল্ছিল—"ওমা খিদে পেয়েচে—খেতে দেনা মা—"

সদ্য-বিধবা অভাগী শৈল যেদিন শেষ আশ্রয়টুকুও হারিয়ে ক্ষুধাতুর শ্রান্ত শিশুর হাত ধরে পথে বেরিয়েছিল, সেদিন ভিক্ষাই ছিল তার বাঁচবার একমাত্র উপায়।

আজ দু'দিনের ওপর তার অনশনে কেটে গেছে। সারাদিন পথে পথে ঘুরে সে পেয়েছে শুধু লাঞ্ছনা আর ঘৃণা! কি বলে সে আজ এই অবুঝ শিশুকে শান্ত করবে?...ছেলেটা আবার কেঁদে উঠল—"কি খাব বল্‌না মা—" কথাগুলো শৈলর জীর্ণ বুকের মাঝখানটায় ব্যথার শেল হান্‌ল।...

অস্বাভাবিক তিক্তকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠল—"দিনরাত শুধু খাই খাই! আমায় খেয়ে ফ্যাল্‌না হতভাগা—আপদ চুকে যাক্ সব"—শৈলর চোখদুটো ছাপিয়ে বড় বড় ফোঁটায় অশ্রুজল ঝরে পড়ল। ছেলেটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সে ছেঁড়া আঁচল দিয়ে তার চোখ মুছিয়ে স্নেহ-কোমল স্বরে বল্‌ল—"ছি মাণিক, কাঁদতে নেই...আমি এখুনি খাবার কিনে আন্‌চি—"

দরজাটা বাইরে থেকে ভেজিয়ে দিয়ে শৈল আবার ভিক্ষেয় বেরুল। রুদ্র বৈশাখের দু'পহর। সহরের পিচে-ঢাকা রাস্তা জলন্ত আগুনের মত তপ্ত হ'য়ে উঠেছে। ছায়া-লেশহীন সেই পথের ওপর দিয়ে শৈল তার ক্লান্ত দেহটা টেনে নিয়ে চল্‌তে লাগল। সব বাড়ীর দরজা বন্ধ; গৃহবাসীরা গ্রীষ্ম-দ্বিপ্রহরের এই নিস্তব্ধ অবকাশটুকু অলস তন্দ্রার মাঝে উপভোগ করছে...কেউ দেখল না, জান্‌ল না—হতভাগিনী ভিখারিণীর এই দুর্দ্দশা। হু হু করে ধুলো উড়িয়ে হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাস তার জ্বালাময় নিশ্বাসে শৈলর সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সে দিয়ে গেল...সে আর চলতে পারল না—অদূরে একটা রকের ওপর তার অনশন-ক্লিষ্ট দেহটা এলিয়ে দিল।

সেই অতীতের কথা একে একে তার মনে পড়ছিল।... পুষ্প-পরিমলে-ভরা এক ঝলক্ মলয়ানিলের মত মিষ্টি সেই স্মৃতিটুকুই যে তার দুঃখ-তপ্ত বুকের মাঝে চন্দনের মত স্নিগ্ধ প্রলেপ বুলিয়ে দেয়।.........

আজ যারা তাকে পথের কুকুরের মত "দূর দূর" করে ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দেয়, তাদেরি মত তারও একদিন সব ছিল গো...তাদের সেই ছোট সংসারটী শরৎ প্রভাতের মত হাসি-আনন্দের আলোয় ঝল্‌মল্ করত—পয়সার স্বচ্ছলতা সেখানে না থাকলেও, বিমল শান্তির অভাব ছিল না...স্বামীর স্নিগ্ধ প্রেমে তার বুক তৃপ্তিতে কাণায় কাণায় ভরেছিল—তারপর একদিন তার কোলে শুভ্র ফুলের কুঁড়ির মত খোঁকা এল, তাদের সংসারে নব-বসন্তের হাওয়া বইয়ে—তখন সে তো স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি, যে ধ্বংস-দেবতার নির্ম্মম খেয়ালে তাদের নিভৃত নীড় একদিন চুরমার হয়ে যাবে।

তিনদিনের জ্বরে শৈলর স্বামী জীবনের দেনা-পাওনা মিটিয়ে খেয়াতরীতে ওপারের পানে যাত্রা সুরু করল—তার অসহায় শিশু আর নিরাশ্রয়া বিধবা স্ত্রীকে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে......

মরণের স্নিগ্ধ কোলে শৈল তার সকল জ্বালা জুড়োতে পারত; কিন্তু ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি করেও বাঁচতে হোল, কেবল ওই অসহায় শিশুটার জন্যে। সে আজ মৃত্যুবরণ করলে তার খোঁকার কি দুর্দ্দশা হবে, তা' ভাবতেও সে শিউরে উঠল—ও যে তার স্বর্গগত স্বামীর শেষ স্মৃতি!

শৈল ভাবল—ভগবান দীনের বন্ধু, আর্ত্তের সহায় একথা মিথ্যা। কি অপরাধ করেছিল সে, যার জন্যে তার

মাথায় এই শাস্তির বজ্র ভেঙে পড়ল? কেউ তো তাদের দুঃখে একফোঁটাও সহানুভূতির অশ্রু ফেল্‌ল না।...

ভাবনার অতল সাগরে শৈল একেবারে ডুবে গিয়েছিল। তার চমক্ ভাঙ্গল যখন, তখন দুপুরের জনহীন পথে কর্ম্ম-চঞ্চল লোকের স্রোত বয়ে চলেছে। তার মনের কোণে একটু ক্ষীণ আশার শিখা জ্বলে উঠেছিল—যদি কোন পথিক দয়া করে এই দীনা ভিখারিণীর মুখের পানে চায়।

শৈল তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়াল, যেখানে আফিস-ফেরত যাত্রীপূর্ণ ট্রাম এসে থেমেছিল। হাত পেতে দাঁড়িয়ে সে বাবুদের কাছে ভিক্ষে চাইতে লাগল—শুধু একটী মাত্র পয়সা—যার শতগুণ প্রতি মুহূর্ত্তে বিলাস-ব্যয়িত হ'য়ে যাচ্ছে। তার কাতর কণ্ঠস্বরে করুণ মিনতি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল।

কিন্তু হায় রে! সকলে আসে আর উপেক্ষা ভরে চলে যায়;—দীনা ভিখারিণীর এই ব্যাকুল আবেদনে কর্ণপাত করে না। কেউ বা বিরক্তি-কটু কণ্ঠে ধমকে ওঠে—"খেটে খেতে পারিস্ না? পয়সা অত সস্তা নয়—"

যেদিকে সে চায়, সেই দিকে শুধু লাঞ্ছনা আর ঘৃণা তাকে ক্রুর ব্যঙ্গ করে...নেই—এদের বুকজোড়া শুষ্ক-মরুতে এক ফোঁটাও সজল মমতা নেই......

পথ দিয়ে মোটরকারে সুবেশী ধনী সন্তান আনন্দ-দীপ্ত মুখে স্বচ্ছন্দ মনে চলে গেল, তার বিলাস লালসা মেটাবার জন্যে এখুনি হয় তো সে দ্বিধাহীন চিত্তে স্রোতের মত টাকা খরচ করে ফেলবে—কিন্তু তার দরিদ্র ক্ষুধাতৃষাতুর ছেলে একটা পয়সার অভাবে অনাহারে দিন কাটাবে···একি অন্যায় অবিচার ভগবানের?

জীর্ণ পোড়ো বাড়ীর ভিতর দিয়ে যেমন করে দমকা বাতাস বয়, শৈলর ক্ষয়ক্ষীণ বুকের পাঁজরা ঠেলে তেমনি করে একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল···

তার পা দুটো চলে চলে ক্রমেই অবশ হ'য়ে আস্‌ছিল, পিপাসায় আকণ্ঠ শুখিয়ে উঠেছিল। রাস্তার কলের জলে অঞ্জলি পূরে মুখের কাছে তুল্‌তেই মনে পড়ল তার খোকা প্রতীক্ষা ব্যাকুল চোখে তারই আসার আশায় বসে আছে···

মাগো!—তার অবোধ অভাগা ছেলেকে কি বলে সে সান্ত্বনা দেবে?

হঠাৎ তার নজর পড়ল অদূরে একটা মস্ত ইন্দ্রপুরীর মত অট্টালিকার ওপর দেবদারু-কিশলয় দিয়ে সাজানো শ্যাম-তোরণ দ্বারের শীর্ষে বড় বড় অক্ষরে লেখা "স্বাগতম্।" ধনী অভ্যাগতদের ভিড়ে বাড়ীটা একেবারে সরগরম হ'য়ে উঠেছে।

দ্বারের একপাশে ঘেঁসে চোরের মত কুণ্ঠিত সঙ্কুচিত হ'য়ে শৈল ভিতরে ঢুকতে যাচ্ছিল একটা পয়সার আশায়, কিন্তু গৃহস্বামী তাকে দেখতে পেয়ে কর্কশকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন—"আঃ—এ ভিখারিণী মাগীটাকে এখানে ঢুকতে দিলে কে? দরোয়ান আভি নিকাল দেও—"

আজ এক সপ্তাহও কাটে নি, তাঁর উদ্দীপনাময় ভাষায় লেখা সেই সুদীর্ঘ 'দয়া' প্রবন্ধটীর অজস্র সুখ্যাতির সমালোচনায় মাসিকের পাতা ছেয়ে গেছে।

প্রভুর মুখের হুকুম শেষ হবার পূর্ব্বেই ভোজপুরী যম-দূতের কুলিশ-কঠিন হাতের রূঢ় ধাক্কায় শৈল ফুটপাথের ধারে ছিট্‌কে পড়ল।

প্রাণের অসহ্য বেদনার তাপ তার চোখের শেষ অশ্রু-কণাটী পর্য্যন্ত শুষে নিয়েছিল···

অতিকষ্টে গ্যাসপোষ্ট ধরে সে যখন উঠে দাঁড়াল, তখন তার রগের খানিকটা কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে গেছে। রাস্তা পার হবে বলে সে টল্‌তে টল্‌তে পথে নামল, কিন্তু দু'পা না এগোতেই দুঃসহ যন্ত্রণায় তার মাথার শিরা উপশিরাগুলো টন্ টন্ করে উঠল—তিমির-রাত্রির মত নিরন্ধ্র অন্ধকারে এই বিরাট সৃষ্টিটা তার দৃষ্টির সমুখ থেকে নিমিষে মিলিয়ে গেল—শৈল জ্ঞান হারিয়ে পথের মাঝখানে লুটিয়ে পড়ল।

মুহূর্ত্তে একখানা প্রকাণ্ড মোটরকার রক্ত-পিপাসী হিংস্র নেকড়ের মত তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—তারপর সকল ভাবনার অবসান ··

বিদায়-রবির অস্ত-রাগ তখন পশ্চিমের ভাঙা মেঘে তাজা রক্তের মত রাঙা হ'য়ে জ্বলছিল।

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(৭)

কাজল কালো মেঘে ছাওয়া মেদুর দিনের সজল সন্ধ্যা-খানি। ভাদ্রের শেষ। সেদিন সকাল হইতেই আকাশের মুখটা অল্প অল্প করিয়া ঘোরালো হইয়া উঠিতেছিল। বাতাসটাও কেমন যেন এলোমেলো হইয়া ছন্নছাড়ার মত ঘুরিতেছিল। মধ্যে মধ্যে যেন কোন ব্যথাতুরের মর্ম্ম নিঙ্‌ড়ান দীর্ঘশ্বাসের মত ছুটিয়া আসিয়া বন্ধ জানালার কোলে কোলে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল। মানুষের স্বভাবতঃই এই মেদুর ক্লান্ত দিবসে মন বড় চঞ্চল হইয়া উঠে, বিশেষ প্রিয়জন যাহার সুদূর প্রবাসে—

হাতের কাজগুলা চট্‌পট্‌ করিয়া সারিয়া যখন নিজের ক্ষুদ্র গৃহটির কোণে ফাল্গুনী বিকল চিত্তে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন আকাশ চুয়াইয়া দুই এক ফোঁটা জলকণা ঝরিতেছে। খোলা জানালা হইতে জলের ছাট লাগিয়া পাছে তাহার চরকাটি নষ্ট হইয়া যায়.. এই কারণে ফাল্গুনী জানালার কপাটটা ভেজাইয়া, পিতলের প্রদীপ জ্বালিয়া, ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুতা তুলিতে বসিল।

"ফাল্গুনী।"

ফাল্গুনী মুখ তুলিয়া দেখিল, রুমালে, কাপড়ে এসেন্স ঢালিয়া কুঞ্চিত মুখে রেবেকা দাঁড়াইয়া। রেবেকার আগমন এ গৃহে নূতন। ফাল্গুনী জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিল। অপ্রসন্ন মুখে রেবেকা বলিল—"বাবাঃ যখনি এই ঘরটার সামনে দিয়ে ওদিকে যাই, তখনি মনে পড়ে সেই রূপকথার সেই সেকেলে বুড়ীর কথা, আঃ জ্বালাতন। চব্বিশ ঘণ্টা ঘ্যানর, ঘ্যানর। ভালও লাগে...? কি ভাই বসতে পারি কি এখানে...না ম্লেচ্ছ রমণীর স্পর্শে হিন্দু রমণীর শুচিপূর্ণ ঘর অস্পৃশ্য হ'য়ে যাবে। কি বল, সরে পড়ব?"

ফাল্গুনী বলিল—"তুমি হ'লে ম্লেচ্ছ রমণী, তা হ'লে দাদা..."

"বালাই তোমার দাদা কেন ম্লেচ্ছ হতে গেল, সে জন্ম জন্ম হিন্দু হ'য়ে জন্মাক। এবারে এলে বলো—যেন টিকি রাখে, মন্দ দেখাবে না, অবতারের 'কভারের' মত কতকটা হবে খ'ন।" বলিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ঘরের চারিদিক দেখিয়া বলিল—"ওক্‌ কাঠের চেয়ারগুলো দেখছি ঘর থেকে গ্যাছে, তা হ'লে কি অবশেষে এই ধূলোতেই বসব নাকি?"

"ধূলোর ওপর বসবে কেন বৌদি,—আহা অমন 'ক্রীম কলারের' সাড়ীখানাই যে নষ্ট হ'য়ে যাবে, দাঁড়াও ভাই দিচ্ছি বসবার জায়গা।" বলিয়া ফাল্গুনী তাহার হাতে বোনা চটের আসনখানি বিছাইয়া বলিল—"বসো বৌদি।"

"ও আবার কী বিশ্রী জিনিষ দিলে? থাক, আমি বিনা কারণে আসিনি, যা বলতে এসেছি শোন, তোমার এ রাস্তার ধারের ঘরটা আমার চাই। দেবে কি?"

ফাল্গুনী রেবেকার মতলব বুঝিয়া বলিল—"এটা যে মায় ঘর ভাই?"

"আঃ ঐ তো তোমার 'সেণ্টিমেণ্ট' মার ঘর, বাবার ঘর, ও কী! কেন তোমার মা তো এ বাড়ীর সব ঘরগুলিই ব্যবহার করে গ্যাছেন—তবে তোমার আপত্তিটা কিসের?"

ফাল্গুনী কোন উত্তর করিল না। রেবেকা আপন মনেই বলিয়া চলিল—"আমি মনে করছি এই ঘরটাকে আমার 'ষ্টুডিও' রুম করলে বেশ সুবিধে হয়। কি বল, দিতে পারবে না? কথার জবাবটাই দাও না।"

ফাল্গুনী বেশ স্পষ্ট সুরেই মুখ তুলিয়া জবাব দিল—"না।"

ছোট্ট এই 'না' কথাটি রেবেকার বুকের প'রে জ্বলন্ত আগুনের টুকরার মত ছিটকাইয়া পড়িল। "কী—আমার

মুখের পরে' জবাব! জানো ফাল্গুনী —এ বাড়ীর কর্ত্রী তুমি নও, আমি।"

শশব্যস্তে জিভ্ কাটিয়া ফাল্গুনী বলিল—"ছিঃ বৌদি, ও কথা কি বলতে আছে—কখনও তো আমাকে এমন করতে না? আজকাল তোমারই বা কি হ'লো ভাই?"

অধিকতর উচ্চস্বরে রেবেকা বলিল—"হয়েছি তোমাদের আক্কেল দেখে—তোমরাও কি এমনি ছিলে? এই সেদিন ভাই বোনে মিলে প্রায় শ' চারেক টাকা কী একটা বাজে ফণ্ডে দিয়ে এলে, পয়সাগুলি তো অমনি আসে না।"

রেবেকার মুখে শেষোক্ত কথাগুলি উপহাসের ন্যায় শুনাইল—এই রেবেকাই সেদিন তাহার পিত্রালয়ের বন্ধু ডাক্তার জে, কে, রায়ের বিবাহোৎসবে একছড়া দামী মুক্তার নেকলেস বধূকে উপহার দিয়া আসিল। তারপর বায়স্কোপ, বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাওয়া আসা, পিক্‌নিকে এক একটা বড় বড় ভোজ দেওয়া, এ ত হামেসাই হইতেছে। রেবেকা অস্থির ভাবে বলিল—"তা হ'লে ঘর বোধ হয় পাব না? কিন্তু শোন ফাল্গুনী, তোমার পিছনে আজকাল বড্ড বেশী খরচ হচ্ছে, সে খবর কি রাখো?"

ফাল্গুনী অবাক্ হইয়া বলিল—"আমার পিছনে বাজে খরচ। সেকি বৌদি?"

"নিশ্চয়ই। এই পরশুদিন কতকগুলো চরকাই কিনে ফেললে, তারপর তোমার আলমারীতে বোধ হয় নানারকম কাপড়ে ভর্ত্তি, তবুও তুমি দাম দিয়ে মোটা খদ্দর কিনে পরছো। তৃতীয় তুমি সেদিন কতকগুলো স্বদেশী গুণ্ডাদের নতুন চুড়ীগুলো আর দু'শো টাকা অনর্থক দিয়ে দিলে—এগুলি কি বাজে খরচ নয়? আমি এসব গুলো মোটে পছন্দ করি নে।"

অপমানে ফাল্গুনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল—শক্তভাবে কথাটার উত্তর দিতে যাইয়া কি ভাবিয়া সে আত্মসংবরণ করিয়া গলার স্বরকে যতদূর সম্ভব কোমল করিয়া বলিল—"বেশ তো বৌদি, তোমার বিবেচনায় যদি এ সব বাজে খরচ বলে মনে হয়...তা হ'লে এক কাজ করো ভাই আমাকে তিন চার মাসের জন্যে সময় দাও—আমি তোমার যা টাকা-কড়ি খরচ করেছি সমস্ত শোধ করে দেব..."

রেবেকা বিদ্রূপ করিয়া বলিল—"তাই নাকি! তুমি আবার উপায় করতেও শিখেছ নাকি?"

ম্লান ভাবে হাসিয়া ফাল্গুনী বলিল—"কাজে কাজেই... কি আর করি বল বৌদি, তোমার মত তো আমি বাপের বিষয় পাই নি। কাল দেখলুম "আত্মশক্তিতে" একজন নার্সের জন্যে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, না নয় সেই কাজটাই নিইগে'। তা হ'লে আজই তাদের চিঠি লিখে দি, কিছু 'এলাউন্স' টাকা পাঠিয়ে দিলেই শুধু এ ঘরটা কেন, সমস্ত বাড়ীটাই আমি ছেড়ে দেব।"

একফোঁটা মেয়ের মুখে এত শক্ত শক্ত কঠোর সত্য মিশান জবাব শুনিয়া রেবেকা ইতিকর্ত্তব্যতা হারাইল। কি বলিবে খুঁজিয়া না পাইয়া হঠাৎ উত্তেজনাবশে বলিয়া ফেলিল —"তা কিছুদিন পরে কেন বাড়ী ছাড়বে আজই ছেড়ে দাও, আমিও তোমার মত বিদ্রোহী মেয়ের ঘরে থাকাটা পছন্দ করি না।"

ফাল্গুনী নিঃসঙ্কোচে বলিয়া উঠিল—"বেশ আমি এখনই যেতে প্রস্তুত আছি। ভাল বৌদি, একজন অনেকদিন আগেই গেছে, বাকী ছিলাম আমি...আমিও চললুম ভাই। প্রার্থনা করি তুমি সুখে থাক।"

"ফাল্গুনী—তুমি বড় লম্বা লম্বা কথা বলছ, তোমার দাদা ইচ্ছে করে চলে গ্যাছে—তাকে তো আমি যেতে বলি নি, তার জন্ম কি দায়ী আমি?"

"কতকটা দায়ী বইকি বৌদি, পায়ে পড়ি তোমার ভাই, রাগ করো না, তুমি লেখাপড়াই শিখেছ কিন্তু স্বামীকে কেমন ক'রে ভালবাসতে হয় জান না—স্বামীর মর্য্যাদা কিসে থাকে সে শিক্ষা তোমার হয় নি। তা যদি জানতে, তাহলে—তাহলে আজ দাদা তোমাকে এমন করে উপেক্ষা করতো না।

"বাঃ বেশ লেকচার দিচ্ছ তো। তাহলে তোমার দাদার মহা ভুল হয়েছিল যে এক বিলাত ফেরৎ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করা—আর তারই পিতৃদত্ত ধনে বিলেতে গিয়ে ব্যারিষ্টারী শেখা। তার উচিত ছিল...পাড়াগাঁয়ের অসভ্য, জংলী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করা, তা হলে তোমার দাদার মত গুণী ব্যক্তির মর্য্যাদা যথার্থই থাকত।"

ফাল্গুনী বেশ সহজ, সরল ভাবেই বলিল—"বৌদি আমাদের পাড়াগাঁটাকে অতটা তুচ্ছ ভেবো না, সত্যি যদি তুমি একজন অশিক্ষিতা মেয়ের কাছে শিক্ষা নাও, তাহলে তোমার ওসব 'সায়েন্স', 'ম্যাথামেটিক্স', 'ফিলজফির' কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য ভাবার চেয়ে সে গার্হস্থ্য শিক্ষা বড় সরল লাগবে।"

অবহেলাভরে উচ্চহাস্য করিয়া রেবেকা লুটাইয়া পড়িল ; হাসির বেগ প্রশমিত হইলে বলিল—"অবাক করলে আমায় ফাল্গুনী...'ফাই' সেখানে আমার সমকক্ষ কেউ কি আছে, তারা আমার মূল্যই বোঝে না। ও আমি যাব সেখানে শিক্ষা নিতে...?"

ফাল্গুনী আর থাকিতে পারিল না, ফস্ করিয়া বলিল—"হ্যাঁ বৌদি কথাটা খুব সত্যি বলেছ, খনি গর্ভস্থিত রত্নের মূল্য সে চাষার মেয়েরা কেমন করে জানবে···তারা কেবল কাজই শিখেছে......"

"বাব্বা, হার মানছি তোমার কাছে...তোমার সঙ্গে কথা কইতে আসাই ঝকমারী হয়েছে। আচ্ছা তুমি যে অনর্থক 'সায়েন্স' আর ইংরেজী ব'য়ের নিন্দে করলে, তারা 'সায়ান্স' কাকে বলে জানে ?"

ফাল্গুনী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"কেন জানবে না—তাদের 'সায়েন্স' 'রামায়ণ' 'মহাভারত'। তোমার আদর্শ হয়ত 'জোয়ান অফ্ আর্ক' হতে পারে, কিন্তু তাদের আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, সতী, দময়ন্তী···তুমি যতটা সময় বাজে নভেল পড়ে কাটাও তার চেয়ে সে সময়টা আমাদের আদর্শ রমণী লীলা, খনা, গার্গী এঁদের জীবন চরিত্রগুলো প'ড়ো, মনের সমস্ত জড়তা কেটে গিয়ে নির্ম্মল হ'য়ে যাবে...তাতে শান্তি, তৃপ্তি দুইই পাবে। যাক অনেক কথাই বলে ফেললুম মাফ ক'রো ভাই, এখনি তো যাচ্চি—রমা···" ফাল্গুনী উচ্চরবে দাসীকে ডাকিল। হাসিমুখে রমা আবির্ভাব হইয়া বলিল—"কেন দিদিমণি।"

রেবেকা চোখ ঘুরাইয়া ধমক দিয়া বলিল—"আজ তোকে ফুল দিয়ে হলটা সাজাতে বলেছি, হয়ে গ্যাছে সাজানো ?"

রমা ভীতি বিবর্ণমুখে বলিল—"সাজাচ্ছিলুম তো··· দিদিমণি ডাকলেন..."

রেবেকা কঠোর স্বরে বলিল—"তোমার দিদিমণির কাজ করতে হবে না, তার ইচ্ছে হয় কুলী দিয়ে সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে যাক্। আমাকে অপমান করে আমার চাকর দাসীর সাহায্য নেবে ভেবেচো, তা হবে না—যাও আমার চাকর দাসীর দ্বারায় একটাও সাহায্য পাবে না। তোমার যা যা জিনিষপত্র আছে নিয়ে যাও কিন্তু আমার জিনিষের একটি জিনিষও ভাগ পাবে না - তবে অবশ্য তোমার মায়ের জিনিষপত্র, গহনা সব বের করে দিচ্ছি নিয়ে যেতে চাও তো যাও। তাতে তোমার অধিকার আছে...আইন সঙ্গত কাজ আমি করব। তখন যে তোমার দাদা এসে কোন কথা বলবে, সে সহ্য করবার মেয়ে আমি নই। তোমার জিনিষে আমার জোর নেই।"

রক্ত জবার মত রাঙা হইয়া ফাল্গুনী বলিল - সে জোর হয়তো তোমার আছে বৌদি...সবই তো তুমি জোর করে করছো···দাদাকে তুমি কটু কথা বলে তাড়ালে—কিন্তু একদিন এর জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে এটা স্থির জেনো। আর তোমার দয়ার দান আমি চাইনে বৌদি·· আমার মায়ের গহনা রেখে গেলুম—দাদার ছেলের বৌ এসে পরবে। ফাল্গুনী বস্ত্র সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—পরে হেঁট হইয়া বলিল—"যতই কর বৌদি বয়সে দু'এক বছরের ছোট হোলেও তুমি আমার প্রণম্য।" রেবেকার সুন্দর স্লিপার শোভিতা চরণের ধূলো লইয়া সিক্ত আঁখি পল্লব দুই করে আবরিত করিয়া ফাল্গুনী গভীর সুরে বলিল—চল্লুম বৌদি, পথের একটা কাঁটা অনেকদিন হলো বিদায় নিয়েছে, আর আজ দ্বিতীয়টিও জন্মের মত দূর হ'লো।"

দীপ্তমুখে দীপ্তময়ী ফাল্গুনী আজন্ম পরিচিত স্নেহ নীড় পিতৃভবন ত্যাগ করিয়া নূতন আলোকের সন্ধানে কিসের আহ্বানে যাত্রা করিল।

* * * *

হাঁফ ছাড়িয়া রেবেকা বলিল—"দেখলি রমা তোর দিদিমণির আক্কেল—আমি ওর মান্যে কত বড়, আর আমাকেই অহঙ্কার দেখিয়ে চলে যাওয়া হ'লো—আসতেই হবে যাবে কোথায় ?"

রমা পরম বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল—"কক্ষনো

নয়—সে সে রকম হালকা মেয়েই নয়। না খেতে পেয়ে রাস্তায় মরলেও এ বাড়ীতে আর পা দিচ্ছে না।"

"যা, যা বকাসনে তুই, ঐ দেখ দেখি সন্ধ্যে হ'য়ে এল… এক্ষুণি ওরা সব এসে পড়বে। এই যে গুড্ ইভনিং মিঃ রায়—আসুন, আসুন—কিন্তু আজ আপনার তিন মিনিট লেট হ'য়ে গ্যাছে…এই দেখুন পাঁচটায় আসবার কথা—পাঁচটা তিন হ'য়ে গ্যাছে।"

ডাক্তার কল্লোল রায়ের আগমনে রেবেকার মুখে চোখে আনন্দের উজ্জ্বল আভা ছড়াইয়া পড়িল। কল্লোল মৃদু হাসিয়া বলিল—"গুড্ ইভনিং মিসেস্ বোস্—লেট্ হবার দরুণ মাফ চাইছি, কিন্তু জানেনই তো আমরা বাঙ্গালীর ছেলে অতটা ঠিক 'টাইমলি' সব কাজ করে উঠতে পারিনে…কিন্তু ও ঘরটায় কি হয়েছে বলুন তো…মিনিট কয়েক আগে রণযুদ্ধ হ'য়ে গ্যাছে নাকি জিনিষ পত্র এমন বিশৃঙ্খল হ'য়ে রয়েছে কেন?"

চট্ করিয়া অলক্ষ্যে রেবেকা সুগন্ধি রুমাল দিয়া ধপধপে গাল দুইটা মুছিয়া তাতে তাজা রক্তের ঢেউ খেলাইয়া মিহি-সুরে বলিল—"ওঃ সে ভয়ানক বিশ্রী ব্যাপার! চলুন বাইরে, সমস্ত শুনবেন—এ ঘরটার মধ্যে যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।"

উভয়ে কক্ষ পার হইয়া ছাদের উপর দুইখানি সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

"তারপর—মিঃ বোস্কে দেখ্ছি না কেন? তিনি কি টুরে বেরিয়েছেন?"

অন্যমনস্কতার ভাব জোর করিয়া আনিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া বলিল—"ঠিক বলেছেন তো মিঃ রায়—জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী হলেন কবে থেকে?"

কল্লোল হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"জ্যোতির্বিদ্যার ধার ধারিনে—এমনিই মন গড়া একটা কথা বলে দিলেম, তা পুজোর এদিকে তো মিঃ বোস ফিরছেন?"

ছলনাময়ী রেবেকা সকরুণ কণ্ঠে বলিল—"তাহলে তো বাঁচতুম মিঃ রায়…কি জানেন—আমাদের মধ্যে…যাক্, হ্যাঁ পুজোর শেষেই বোধহয় বাড়ী আসবেন।"

মিঃ রায় বলিল—"তা হলে পুজোর ছুটিতে বাড়ীতে বসেই থাকবেন?"

কৃত্রিম মলিন ভাবে কম্পিতকণ্ঠে রেবেকা বলিল—"তাই হয় ত হবে—আপনি এবারে কোথায় বেরুবেন মিঃ রয়?"

"এখনও প্রোগ্রাম ঠিক করিনি, তবে কোথাও যে যাব, এটা নিশ্চয়ই।"

"মিঃ রয়—যদি আপনার কোন অসুবিধা না হয় তাহলে আমাকে কি আপনি এবার সঙ্গী করে নিতে পারেন?"

চেয়ার হইতে উঠিয়া বিস্ময়সূচক কণ্ঠে কল্লোল বলিয়া উঠিল—"আপনি যাবেন! সে তো আমার সৌভাগ্য মিসেস্ বোস, যে আমি এবার আপনার মত সাথী পাব—একথা আবার কুণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞেস করছেন? সত্যি যেতে প্রস্তুত আছেন মিসেস বোস?"

টানিয়া টানিয়া রেবেকা বলিল—"সত্যিই বলছি, মিঃ রয়, মিথ্যে কেন বলব বলুন। কিন্তু আপনার যেন আপত্তি নেই জানলুম—মিসেস্ রয়ের তো কোনও —"

হা হা করিয়া কল্লোল হাসিয়া উঠিল। বলিল—"মিসেস রয়ের কথা তুলবেন না মিসেস বোস, সে মানুষই নয়—বোধ হয় এই পুজোর সময় সে বাপের বাড়ী যাবার জন্যে বায়না ধর্ব্বে।"

একটা পাতলা হাসির রেখা বিদ্যুৎ বেগে রেবেকার মুখের উপর খেলিয়া গেল। সরল কল্লোল সে ভাবটুকু দেখিল না। বুকের আনন্দ চাপিয়া রেবেকা যেন পরম দুঃখিতের মত অত্যন্ত করুণা প্রকাশ করিয়া বলিল—"ও তাহলে আপনি সাংসারিক হিসেবে বড় সুখী নন্ না মিঃ রয়? কিন্তু আপনার স্ত্রীতো শুনেছি বেশ শিক্ষিতা?"

কল্লোল সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া বলিল—"জ্বালাতন হয়ে গেছি মিসেস বোস্…সে শিক্ষিতা হলে কি হবে? সে পুরাতন মতটাই শ্রেষ্ঠ করে মানতে চায়—সে যে অমন জানতাম না, ভারী আশ্চর্য্য?"

"আশ্চর্য্য কিছুমাত্র নয় মিঃ রয়, আমার ননদের বিসদৃশ ব্যবহারে সে ভ্রম আমার ঘুচে গ্যাছে। উঃ কি এক-রোখা মেয়ে সে—আজ একটা সামান্য কথার জন্যে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।"

"তাই নাকি, মিস্ বোস্ তাহলে কোথায় গেলেন?"

কে জানে কোথায় কোন সেবাশ্রমের নর্স হতে। যাক্, ও সব বাজে কথা, তাহলে ঠিক যাচ্ছেন তো মিঃ রয় ?

"সার্টেন্ লি, আমি সর্ব্বক্ষণই 'রেডী' হ'য়ে রয়েছি, বলুন না কবে আপনি যাবেন ?"

"কোথায় যাওয়া হচ্ছে রেবা ?"

চমকিতা রেবেকা পিছন ফিরিয়া ডোরোথিকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া আনন্দোৎফুল্ল স্বরে বলিল—"ডোরা ? কতদিন পরে দেখা হল ভাই ? সেই মিঃ চৌধুরী আসতে তোদের বাড়ী গেছলুম ; তারপর থেকে চারদিক দিয়ে আমার এমন কাজ পড়ে গেল, যে মোটে ফুরসুৎ পেলাম না—কিন্তু, তুই তো ভাই একবার আসতে পারতিস ?"

ডোরোথি বলিল—"কেমন করে আসব ভাই, মাঝে বাবার 'প্লুরিসি' হ'ল, আজ কদিন হ'লো তিনি একটু ভাল হয়েছেন, তাই মনে করলাম একবার তোমায় দেখে আসি।"

রেবেকা উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল—"ডোরা! জ্যাঠা মশাইয়ের 'প্লুরিসি' হয়েছিল ? আমাকে জানাস্ নি, কেন ভাই ?"

মিঃ রয় এতক্ষণ নীরবে ইহাদের আলোচনা শুনিতেছিল—সহসা সে বলিয়া উঠিল—"বাঃ মিসেস্ বোস্...ওঁকে কি বসবার অবসরও দেবেন না ?"

রেবেকা ঈষৎ লজ্জিতা হইয়া পাশের চেয়ারটিতে ডোরোথিকে বসাইয়া বলিল—"মিঃ চৌধুরীর কোন খবর পেয়েছিস ?"

অস্তগামী রবির রাঙা কিরণের মত সহসা ডোরোথির মুখের বর্ণ হইয়া উঠিল। সে নতমস্তকে বলিল তা জানিনা।"

রেবেকা কল্লোলের দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল—"মিঃ রায়, ইনি হচ্ছেন আমার প্রিয়তম বন্ধু মিস্ ডোরোথি চ্যাটার্জ্জী, আর ডোরা—ইনি ডাক্তার কে, কে, রায়।"

কল্লোল সহাস্যে বলিল—"বড় সুখী হলুম মিস্ চাটার্জ্জী আপনার সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে।"

ডোরোথিও হাসিয়া বলিল—মিঃ রয়, আমিও তদ্রূপ।"

'ইন্‌ট্রোডিউসের' পালা শেষ হইল। সান্ধ্য সমিতিতে রেবেকার পরিচিত বন্ধুবর্গের শুভাগমনে আলোকের বাটী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রেবেকার মৃদু মৃদু বচন বিন্যাসে, সকলে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহকর্ত্রীর গৃহসজ্জা ও সেই সুসজ্জিত গৃহের অধিশ্বরী মিসেস্ বোসের রূপের ছটা উপভোগ করিতে লাগিল। হায় হতভাগ্য আলোক নাথ! তুমি ব্যারিষ্টার হইলে কি হইবে। দুরাদৃষ্ট তোমার, তাই গৃহে এমন রূপের রাণী সুন্দরী পত্নীকে ফেলিয়া স্বদেশ উদ্ধার সাধনে ঘুরিয়া মরিতেছ ?

* * * *

হাসনুর প্রাণ মাতান সুবাস, ইকেট্রিকের তীব্র জ্যোতিঃ, সুন্দরী তরুণীদের চটুল হাস্য পরিহাসে রেবেকার প্রকাণ্ড হলখানি সুরভিময়, সমুজ্জ্বল, গীতি মুখরিত হইয়া উঠিল। আছে সবই গো, নাই কেবল যাহার বড় সাধের সাজানো গৃহ, যাহার সর্ব্বস্ব—সেই আলোক, আর নাই শান্ত শ্রীসম্পন্ন শ্যামলা নম্র স্বভাবা ফাল্গুনা। কেন জানিনা...আজ রেবেকার স্ফূর্তি শতধারে উগ্র প্রপাতের ন্যায় ঝরিয়া পড়িতেছিল। শুভ্রবেশ পরিহিতা ডোরোথির যে এ সমস্ত ভাল লাগিতেছিল তাহা নয়। সে রেবেকার এতদূর বাড়াবাড়ি দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিতেছিল। কি একটা, কি একটা দারুণ লজ্জা, ঘৃণায় ডোরোথি শিহরিয়া উঠিল। ছিঃ, ছিঃ ছিঃ—তাহার বাল্যের সহচরী, আলোকের পরিণীতা পত্নী রেবেকা, এ যে তাহার আত্মসম্মান পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, সামান্য বিলাসপ্রিয়া স্ত্রীলোকের ন্যায়। আলোক ও ফাল্গুনীর গৃহত্যাগের কারণ শুনিয়া ডোরোথি একেবারেই সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই...যতদূর হইবে রেবেকা ভাবিয়াছিল নিজের মন দিয়া। আলোকের অবস্থা স্মরণ করিতেই, কি জানি, কেন অকারণে ডোরোথির বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বাম হস্তে বুকটা চাপিয়া মনের এই চাঞ্চল্য ঘুচাইবার মানসে সে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল—যেখানে রেবেকা গাঢ় নীল রঙের সাড়ী পরিয়া অর্গেনের সহিত নিজের মোহন গলার সুর মিলাইয়া গাহিতেছিল—

"ওহে সুন্দর, মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি,
আমি রেখেছি কনক মন্দিরে কনকাসন পাতি।"

রেবেকার অসংখ্য স্তাবক দলের প্রশংসার মৃদুগুঞ্জন গান

ছাপাইয়া উর্দ্ধে উঠিল। প্রশংসা গর্ব্বিতা রেবেকার সুরের লহরী বিচিত্র মালায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ডোরোথির এক মুহূর্ত্তও তথায় দাঁড়াইতে অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। টলিতে টলিতে ডোরোথি একটা কৃত্রিম লতামণ্ডিত থামের পরে মাথা রাখিয়া নিষ্পলক নেত্রে নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, "আলোক! আলোক কি মা..
ছিঃ সমাজের সভ্যতার আবরণ তলে এ কি হীন কদর্য্য মূর্ত্তি লুকান ছিল! এই সমাজেরই বুকের পরে দাঁড়াইয়া সভ্যতার মুখোস পরিয়া এমনি করিয়া কুৎসিৎ অভিনয় করিয়া যাইবে! অথচ কেহ ইহাকে একটি কথাও বলিতে পারিবে না? বাঃ সমাজ এ যে চলিত হইয়া গিয়াছে। "অতিথির সম্মানের জন্য তাহার সম্মুখে বাহির হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য ..অতিথির মনস্তুষ্টির নিমিত্ত দুই একটা গান তা গাহিলেই বা দোষ কি!" এই সমস্ত বলিয়া কহিয়া হিন্দুনারীকে তার গৃহাশ্রম হইতে বাহির করিয়া "এন্‌লাইটেণ্ট" বা "এডুকেটেড্" করার ফল যে কতদূর বিষময় হইতে পারে সময় সময়। এটুকু প্রত্যেক মানবের বুঝিয়া দেখা উচিত। অবশ্য সকল নারীই কিছু সমান নহে, তবে স্বাধিনতার নাম দিয়া স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কোনমতেই উচিত নহে। নারী সর্ব্ব বিষয়ে সুশিক্ষিতা হইয়া সর্ব্বদিক দেখুন, যথার্থই নারীমূর্ত্তিতে প্রকটিত হউন; কিন্তু দোহাই কয়েকটি বাজে নভেলের নায়িকা সাজিয়া সমাজের সংসারের সর্ব্বনাশ করিয়া বেড়াইলে এ ভারতের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী!

* * * *

অসহ্য। ডোরোথির দেখিয়া দেখিয়া অসহনীয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই সমস্ত বিদেশীয় পরিচ্ছদে কাল অঙ্গ ঢাকা বাঙ্গালী সাহেবদিগের প্রতি ডোরোথির চিত্ত আজি বিমুখ হইয়া উঠিল। ক্ষণেকের তরে সে কল্পনায় অমলের দেশীয় বস্ত্রে শোভিত দেবকান্তি ইহাদের পার্শ্বে আনিয়া উপস্থিত করাইতেই...ডোরোথির মন বলিল—'না, না।' বিবেক বলিল—'না, না,' সমস্ত দেহের শিথিল কলকব্জাগুলিও নড়িয়া চড়িয়া বলিয়া উঠিল—"না গো না কিসে আর কিসে তুলনা।" চিত্তের নিকট দ্বন্দ্বে পরাজিতা ডোরোথির শ্রান্ত দেহ দাঁড়াইতে অক্ষম হইল। গৃহের একপাশে একখানি সোফার পরে' এলান দেহ এলাইয়া, চোখ মুদিয়া ডোরোথি পড়িয়া রহিল। পাশেই কাচের রঙ্গীন কাচের টবের কয়েকটি প্রস্ফুটিত নিশিগন্ধার মিষ্ট সুবাস তাহার নাকের কাছ দিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল। নিজের মনের এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনে ডোরোথি কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করিল। ডোরোথি কেমন কাঁপিয়া উঠিল—তাইতো...নাঃ পায়ের নীচে মেঝেটা যেন দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে...অমল—অমলকেও তো সে এমনি করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সত্য কিন্তু কেন অমলের প্রতি তার ভালবাসা একবিন্দুও কমিয়া যায় নাই কেন? সে অমলকে এখনও ভালবাসিয়া চলিয়াছে—কেন আজ তাহার বিরহ এমন ভাবে শাশ্বত ফুটিয়া উঠিল। আজ কেন তাহার বঞ্চিত ক্ষুধিত তরুণ হৃদয় পরাণ প্রিয়ার সঙ্গ যাচনা করিতেছে। উন্মনা ভাবে ডোরোথি উঠিয়া বসিল, আবার তাহার দৃষ্টি রেবেকার মুখের পরে পড়িল। ছিঃ কি ঘৃণিত মূর্ত্তি, এতকাল সুরুচির আবরণে অতি সঙ্গোপনে লুকাইয়াছিল! রেবেকার পরিণাম কি ভয়ানক, ভাবিয়া ডোরোথি তাহার জন্য সত্য সত্যই একটা বেদনা উপলব্ধি করিল। আর নিজেকে সে ধন্যবাদ দিল—আর যাহাই হউক না কেন—এ রকম করিয়া পুরুষের লালসা-বহ্নিতে পতঙ্গের মত ঝাপ দেয় নাই—তাহাদের লালসাপূর্ণ কামনার মোহে মুগ্ধ হয় নাই - ছিঃ, এতদিন সে পেশা চনীকে হিতকামিনী ভাবিয়া ভালবাসা দিয়া অবাধে মেলামেশা করিয়াছিল।

"জাগরণে যায় বিভাবরী, আমার আঁখি হতে
নিদ ঘুম কাড়ি।"

রেবেকার গানখানি ডোরোথির কাণে তীক্ষ্ণ শরের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া বিঁধিল। ডোরোথির ইচ্ছা হইল সে ছুটিয়া যাইয়া রেবেকার কণ্ঠ চাপিয়া বলে—থাক্ রেবেকা...এই খানেই এ পরিচ্ছদ সমাপ্ত করো, আর মুখ পুড়াইও না—যথেষ্ট হইয়াছে। মিসেস বোসের মুখের প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া মিঃ সরকার, মিঃ লাহিড়ী, মিঃ দত্ত, মিঃ সেন ইত্যাদি শিক্ষিত নামধারী ব্যক্তিগণ তৃষিত হৃদয়ে বসিয়া আছে। হায় হতভাগ্য অপরিণামদর্শী যুবকের দল—

ভাবিয়াছ ঐ প্রভাব রূপোপাঙ্গিকে ধরিয়া কাদে ফেলিবে— তোমরাই ঘুরিয়া মরিবে একবিন্দু করুণার প্রত্যাশী হইয়া; পাইবে না একবিন্দুও। বড় বিচিত্র এই নারীর হৃদয়। যে নিজের স্বামীকে স্বেচ্ছায় বিতাড়িত করিয়া বন্ধুবান্ধব পরিবেষ্টিতা হইয়া আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতেছে! ধিক রেবেকা!! ডোরোথি উঠিয়া রেবেকার পৃষ্ঠে হাত রাখিল। চমকিতা রেবেকা মুখ তুলিল। অর্দ্ধ সমাপ্ত গান আর্ত্তনাদ করিয়া থামিয়া পড়িল।

"কি ডোরা ?"

রেবেকা সবিস্ময়ে চাহিল।

ডোরোথি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া স্খলিত ভাবে বলিল— বড় মাথা ধরেছে ভাই। আমার 'কার' ঐ বাইরে আছে, দয়া করে কাউকে বলো গাড়ী বারান্দায় আনতে, আমি চললুম।"

"সেকি ডোরা, এখনি যাবি ? আর একটু বসবি নি ?"

ডোরোথি বিরস অথচ মৃদুকণ্ঠে বলিল—"না ভাই।"

অগত্যা রেবেকাকে উঠিতে হইল। সকলের সমবেত উৎ... অপরিচিতার মুখের পরে পড়িতেই কী এক পবিত্র দ্যুতিতে ঝলসাইয়া অপ্রতিভ আঁখির দল নিরদৃষ্টি হইল। পাশ কাটাইয়া ডোরোথি কক্ষ হইতে নিস্ক্রান্ত হইয়া গেল। সশব্দে হর্ণ দিয়া মোটর বাহির হইয়া গেল। গাড়ীর মধ্যে অবস্থিতা ডোরোথি অবসন্ন হইয়া পূর্ব্ব কথার সমালোচনা করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

গিন্নী

(রবীন্দ্রনাথের "যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার" অবলম্বনে)

[শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্য]

যদি রান্নার ঘরের দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু,
শিকল খুলিয়া এস তুমি ঘরে, ফিরিয়া যেও না প্রভু !!

যদি কভু তব জিহ্বার তীরে
চন্‌চনি ওঠে ঝোল-লংকারে,
দয়া ক'রে নাথ ক্ষণেক শিখায়ো ; উঠিয়া যেও না তবু !!

তব আহ্বানে যদি কভু মোর,
নাহি নামে ওগো দাল্‌না ও ঘোর,
ছ্যাচ্‌ড়া পোড়ায়ে দেব নামাইয়ে, উঠিয়া যেয়ো না প্রভু !!

যদি কোনদিন তোমার পিঁড়িতে,
আর কাহাকেও বসাই পীরিতে,—
চির রজনীর হে রাজা আমার, ফিরিয়া যেয়ো না তবু !!

কাননে।

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　৪ঠা আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩।　　[৩০শ সপ্তাহ
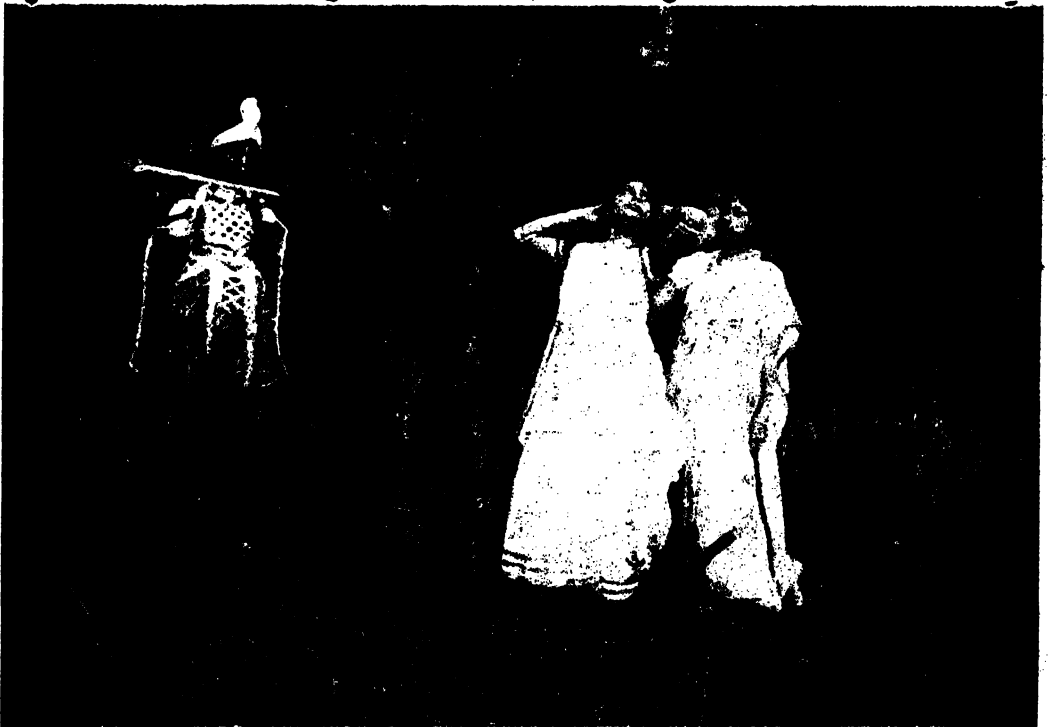
যেদিন দেখিব　　আপন নয়নে
তা সঙ্গে কহিতে কথা।
বেশ ছিঁড়ি বেশ　　দূরে তেয়াগিব
ভাঙ্গিব বাড়িয়া মাথা।

*　　*　　*

এত নিশি বল কোথারে গমন
সরম নাহিক তোর।
বহুৎ গঞ্জনা শুনি নিশবদে
রহিল কমল মুখি।

* * *

যখন তাহার ঘুমাইল পতি
ত্যজিয়া তখন গেল।

বন্ধু

(গল্প)

[শ্রীমণীন্দ্ররঞ্জন মজুমদার]

তিনদিন জ্বরভোগের পর সুস্থ হইয়া বাহিরের ঘরের দরজার সুমুখে একখানা চেয়ারে বসিয়া আছি, শ্রাবণের অপরাহ্ন; সারাদিন টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তা গলি সব কাদাময় হইয়া গিয়াছে, মোটরকার গুলি ফুটপাথের দু'ধারে কাদা ছিটাইয়া দিয়া সগর্ব্বে ছুটিয়া চলিয়াছে; নিরীহ পথিক অতিকষ্টে আপনার জামা কাপড় বাঁচাইয়া পথ চলিতেছে, হঠাৎ একটী পরিচিত মুখ দেখিয়াই ডাকিয়া উঠিলাম, "মণিলাল,—মণিলাল!" আমার কাছে আসিয়া সে দাঁড়াইল; পরিধানে তাহার আধময়লা কাপড় আর ছেঁড়া জামা। খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে বলিয়া উঠিল, "ওঃ! চিনেছি,—জিতেন! কতদিন পরে দেখা হল ভাই! এখানেই বুঝি আছিস্ তুই?" আমি তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া ঘরে বসাইয়া বলিলাম, হ্যাঁ ভাই, এখানেই আছি; অনেক কাল পরেই দেখা হ'ল বটে! সেই কবে স্কুল থেকে দুজনে পাশ করে বেরিয়েছি, তারপর এই দেখা! তা' এই বাদলার দিনে জলে ভিজে বেরিয়েছিস্ কোথায়?"

মণিলাল বলিল, "ভাইরে! বাঙ্গালীর ছেলে গোলামীর নেশায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর কি। রোদ বাদল কি আর গায়ে লাগে ভাই! কোথায় চাকরী খালি হ'ল আর অমনি ছোট সেখানে—এই ত হয়েছে কাজ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমনিভাবে কতদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ এখানে?"

"বেশীদিন নয়, চাকরীও হয়েছিল আজ পাঁচ বছর ধরে; কিন্তু ব্যাটারা সব retrenchment ক'রে আমাদের বরখাস্ত করেছে। সেই থেকে আজ দু'মাস পর্য্যন্ত শুধু ঘুরেই বেড়াচ্ছি, একটা চাকরী বাকরীর সুবিধে করে দেনা ভাই! কোথায় কাজ কচ্ছিস তুই?"

"হাইকোর্টে প্র্যাক্টিস্ করছি। সেখানে কি আর আমরা সুবিধে করে দিতে পারি? বোস্ ভাই, আমি আস্‌ছি," বলিয়াই মণিলালের জন্য একটু জলযোগের ব্যবস্থা করিতে ভৃত্য রঘুয়াকে ডাকিবার জন্য উঠিলাম; তাহার সন্ধান মিলিল না। অগত্যা নিজেই মনিব্যাগটা বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা টাকা নিয়া ব্যাগটা খাটের উপর রাখিয়াই ঘর হইতে বাহির হইলাম। কাছেই মিঠাইএর দোকান ছিল; সেখান হইতে একটাকার মিষ্টি কিনিয়া আনিয়া একখানা রেকাবীতে সাজাইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মণিলাল নাই। ভাবিলাম, হয়ত আমারই জন্য বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। বাহিরে আসিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়াও তাহার দেখা না পাইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। খাটের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, মণিব্যাগটাও সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হইয়াছে। ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বন্ধু আর এখন সে বন্ধু নাই; সে এখন জোচ্চোর, ভণ্ড এবং লম্পট!

* * * *

দিন পাঁচেক পর প্রাতঃকালে একদিন চা-পান সারিয়া সংবাদপত্র নিয়া পড়িতে বসিয়াছি, এমন সময় পিয়ন আসিয়া একখানা খামে আঁটা চিঠি দিয়া গেল। চিঠিখানা খুলিতেই দেখিলাম, মণিলাল লিখিয়াছে। এক নিঃশ্বাসে আগ্রহ সহকারে পড়িতে আরম্ভ করিলাম—

ভাই জিতেন!

অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়—কথাটা খুবই সত্য। সেদিন খুব যত্ন করিয়াই আমাকে তোমার ঘরে নিয়া বসাইয়াছিলে আর তা'র প্রতিদান স্বরূপ আমি কি করিয়াছি—ভাবিতে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ভাই, অভাবটা যে আমার কত বড়—তাহা যদি জানিতে পারিতে

তাহা হইলে আমার প্রতি তোমার যে ঘৃণার উদ্রেক হইতেছে, তাহা একটু কম পরিমাণে হইত বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

"পাঁচ বছর চাকুরী করার পর যেদিন কাজে ইস্তফা দিতে হইল, সেদিন দেখিলাম হাতে মাত্র ৪০৲ টাকা আছে ; এই ৪০৲ টাকার উপরই চারটী প্রাণীর জীবন নির্ভর করছে ;—বাড়ীতে তিনটী—মা, স্ত্রী এবং পুত্র, এবং এখানে একটী—আমি। বাড়ীতে ২০৲ টাকা পাঠাইলাম ; আর বাকী ২০৲ টাকা হইতে মেসের দু'মাসের বাড়ী ভাড়া দিয়া একবেলা খাইয়া অন্য বেলা না খাইয়া পড়িয়া রহিলাম। বাড়ীতে চাকুরী যাওয়ার সংবাদ দেই নাই ; সুতরাং সেখান হইতে চিঠির উপর চিঠি আসিতে আরম্ভ করিল—'টাকা পাঠাও।' কিন্তু পাঠাইব কোথা হইতে ? হাতে যে কিছুই নাই !

"ভাই, দুইদিন উপবাসের পর খালি ঘরে যেদিন তোমার টাকায় ভরা মণিব্যাগটা দেখিলাম সেদিন আর আপনাকে সামলাইতে পারিলাম না, ক্ষুৎপিপাসায় নিজেই কাতর, তার উপর আবার মনে পড়িয়া গেল মা, স্ত্রী এবং শিশুপুত্রের শীর্ণ কাতর মুখগুলি। জীবনে যা করি নাই তাহাই করিয়া ফেলিলাম ; ব্যাগটী নিয়া সরিয়া পড়িলাম। ব্যাগে ৩০টী টাকা ছিল, ২০৲ টাকা সেইদিনই বাড়ী পাঠাইলাম আর ১০৲ টাকা রাখিলাম আমি। তোমার এই টাকা আমি চুরি করিয়া আনিয়াছি ; তাই লজ্জায় এ জীবনে আর তোমাকে মুখ দেখাইতে পারিব না। উপরে ঠিকানাও দিলাম না সেই জন্য, কিন্তু ভাই, তোমার টাকা একদিন আমি শোধ দিব—এটা নিশ্চিত জানিও। ঘৃণিত চোর আমি ; আমাকে তুমি ঘৃণা করিবে, ইহাতো স্বাভাবিক ! কিন্তু তোমার কাছে আমি ঋণী, চিরকৃতজ্ঞ, কারণ, তুমি এই ক্ষুধিত চারটী প্রাণীর মুখে অন্ন দিয়া আজ আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছ, ভগবান তোমায় চিরজীবি করুন।

তোমাদের হতভাগ্য—মণিলাল।"

চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে চোখ দু'টা আমার জলে ভরিয়া গেল, পড়া শেষ হইতেই ফোঁটা দুই জল টস্‌টস্ করিয়া চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। মনে পড়িয়া গেল, স্বপ্নময় কোন্ এক সুদূর অতীতে পল্লীমায়ের স্নিগ্ধশ্যাম অঞ্চলতলে দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সজিদের ভিতর রাজা-রূপে আমি আর মন্ত্রী রূপে মণিলাল ! মনে পড়িল, ভাদ্রের ভরা নদীর বুকের উপর আমি আর মণিলাল কবে কোন এক কৈশোরে যেন খেলিয়াছিলাম ; গ্রীষ্মের আম-পাকানো রৌদ্রের সময় আমি আর সে বুঝি বা এ জন্মেই কোন এক সু-উচ্চ গাছের উপর আরাম শয্যা রচনা করিয়া শুইয়াছিলাম ! আর আজ ! আজ সেই মণিলাল শীর্ণক্লিষ্ট অবসন্নদেহে ঘুরিতে ঘুরিতে ঘটনাচক্রে আমারই দ্বারে আসিয়া বুকের ব্যথা লজ্জায় গোপন করিয়া চুরি করিয়া গেল ! শৈশবের সঙ্গে ভবিষ্যতের এর চেয়েও আর অসামঞ্জস্য চিত্র আছে কি ! আমার অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টির সুমুখে সে মুখ দেখাইতে পারিবে না। হায় বন্ধু ! ঘৃণার পরিবর্তে তোমার জন্য আমার হৃদয়ের ভিতর ভালবাসার কি এক অমৃত-নিস্যন্দিনী ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহা যে তুমি বুঝিতেও পারিলে না !

* * * *

তিনমাস কাটিয়া গেল, মণিলালের আর কোনও সন্ধান পাইলাম না। অনশনক্লিষ্ট পরিবার নিয়া সে আজ বাঁচিয়া আছে কিনা জানিবার জন্য প্রাণটা বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ৺পূজায় আফিস আদালত সব বন্ধ হইয়াছে। মণিলাল যদি চাকুরী পাইয়া থাকে, তবে হয়ত সে আজকাল বাড়ী যাইবে, এই মনে করিয়া রোজই তাহার দর্শনের জন্য ষ্টেশনে আসিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া তাকাইয়া থাকিতাম ; কিন্তু কোথায় সে ? শুধু একটা নিরাশাসের হাহাকার নিয়া বাড়ী ফিরিতাম। এমনি একদিন বুকের ভিতর জমাট বেদনারাশি নিয়া বাড়ী ফিরিয়া অবসাদক্লিষ্ট দেহটা খাটের উপর এলাইয়া দিয়াছি, এমন সময় অনুপমার স্বরে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম।

"অসময়ে ঘুমুচ্চো কেন ?"

"শরীরটা ভাল নেই।" বলিয়াই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতেই স্ত্রীর কাছে ধরা পড়িয়া গেলাম। সে বলিয়া ফেলিল, "আচ্ছা, কদিন থেকে তোমায় এমন মনমরা দেখাচ্ছে কেন ? কি হয়েছে তোমার খুলে বল, সত্যি করে বলো—মাথার দিব্যি।"

অনুর কাছে আজ পর্য্যন্ত এ বিষয় কিছুই খুলিয়া বলি নাই। বড় দয়ার তা'র প্রাণ, বড় সরল সে! তাহাতে আঘাত দিয়া কোনও লাভ নাই মনে করিয়া ইহা গোপনেই রাখিয়াছিলাম। আজ তাহার অনুরোধে আর তাহাকে না বলিয়া পারিলাম না। ধীরে ধীরে বাক্স হইতে মণিলালের চিঠিখানা বাহির করিয়া আনিলাম, তাহার হাতে দিয়া, বলিলাম, "পড়লেই বুঝতে পারবে।"

পড়া শেষ হইতেই দেখিলাম, দু'চোখ তাহার জলে ভরিয়া গিয়াছে, বেদনাহত দৃষ্টি নিয়া আমার পানে তাকাইয়া সে বলিল—"চুরি করেছিল সে?"

"হ্যাঁ।"

"পুলিসে দাও নি তো?"

"না; তার খোঁজই পাচ্ছি না আমি।"

সজল দৃষ্টি নিয়া আমার চোখের উপর চোখ রাখিয়া সে বলিল—"এত নিষ্ঠুর তুমি! কোথায় লোকটা অনাহারে মরছে, তার সাহায্য করবে, না তার খোঁজ করে তুমি তাকে পুলিসে ধরিয়ে দিতে চাও।"

বলিলাম, "না গো না, তাকে খোঁজ করেছি তার সাহায্য করবার জন্যই।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া অনু বলিল—"তার বাড়ীতে একটু খোঁজ করে দেখলে পারতে।"

তাও তো বটে! এত সহজ উপায় থাকিতে তাহার কত অনুসন্ধানই না করিয়াছি। স্ত্রীর প্রতি একটী কৃতজ্ঞ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তখনই মণিলালের নামে তাহার বাড়ীর ঠিকানায় এক চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম। কিন্তু সপ্তাহ গেল, মাস গেল; চিঠির উত্তর আর আসিল না।

অনু আসিয়া বলিল,—"চিঠির জবাব দেবে না সে, সে যে লিখেছিল, লজ্জায় তোমায় আর মুখ দেখাতে পারবে না, এক কাজ কর, তুমি নিজে গিয়ে একবার তা'র খোঁজ করে এস। ছুটীতো তোমার ফুরোয় নি।"

তথাস্তু! তাহাই মানিয়া লইলাম।

* * * *

মণিলালের বাড়ী আসিয়া দেখিলাম—স্ত্রী, পুত্র, মা তার সবই সেখানে আছে; কিন্তু সেই নাই। কোথায় আছে কেহ বলিতে পারে না; আজ চারমাস যাবৎ তাহার সন্ধান নাই। কি করিয়া তাহাদের অন্ন সংস্থান হয়, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, মণিলালের স্ত্রী প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাঁধিয়া বাড়িয়া দেয়, তিনিই দয়া করিয়া তাহাদের খাওয়ান; তাহাও এখন আর তিনি পারিবেন না' বলিয়া জানাইয়াছেন, আমি কলিকাতা হইতে আসিয়াছি এবং মণিলালের সঙ্গে চারমাস পূর্ব্বে আমার দেখা হইয়াছিল শুনিয়া মণিলালের বৃদ্ধা মাতা প্রথমে খুব খানিকটা কান্নাকাটি করিলেন, তারপর বলিলেন, "আমার ছেলেটার একটু খোঁজ করে দাও বাবা, আমার মণি তো কখনও এ রকম ছিল না, সে যে সপ্তাহে একখানা করে চিঠি লিখত; আমায় খুব ভাল বাসত।" ইত্যাদি।

তাহাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দেখিয়া আমি তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলাম,—"আপনারা দেখছি এখানে খুব কষ্টে আছেন, আমার সঙ্গে কলকাতায় চলুন না কেন? সেখানেই তার খোঁজ করা যাবে।"

বৃদ্ধা যেন অকূল সাগরে কূল পাইল; বলিয়া ফেলিল, "আমার সঙ্গে যে আমার বৌ ও তার ছেলে আছে। তারা যে—"

"কেন? তা'রাও সঙ্গে চলুন। আমার স্ত্রী আছে। একসঙ্গেই থাকব এখন। আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় বৃদ্ধা আমার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুবারিতে উহা ধৌত করিয়া দিল।

তবুও মনের কোণে একটু খটকা রহিয়া গেল। মণির অনুপস্থিতিতে তাহাদিগকে এমনিভাবে নিয়া যাওয়া কেমন যেন অশোভন বলিয়াই আমার মনে হইতে লাগিল! তাই তাহাদের সেই অন্নদাতা ব্রাহ্মণের নিকট পরামর্শের জন্য উপস্থিত হইলাম! ব্রাহ্মণ সমস্ত শুনিয়া আমাকে শতমুখে প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "এতে আর কে কি বলবে? আপনি সাধু, মহৎ ব্যক্তি; তাই এই তিনটী লোককে আশ্রয় দিতে চাচ্ছেন। আপনি এদের নিয়ে যান। সৎকাজ কচ্ছেন, কেউ কিছু বলবে না।" তাহাই করিলাম। তাহাদিগকে নিয়া কলিকাতা পৌঁছুতেই অনু বলিয়া উঠিল, "তোমার বন্ধুর কোনও খোঁজ পেলে?"

বলিলাম, "না, তা'র কোনো খোঁজ পাই নি; তবে

তার নিরাশ্রয় পরিবারদের আশ্রয় দেবার জন্য এখানে নিয়ে এসেছি।"

অনু আসিয়া বৃদ্ধার পদধূলি মাথায় নিয়া তাহাদিগকে ঘরে তুলিয়া লইল।...

কলিকাতার বাসাবাটীর ঠিকানাসহ প্রত্যেক সংবাদপত্রে ছাপাইয়া দিলাম,—"মণিলাল, ফিরে এস। তোমার মা তোমায় দেখবার জন্য পাগল।" দিনের পর দিন কাটিতে লাগিল, মাসের পর মাস কাটিয়া তিনমাস কাটিল; কিন্তু মণিলাল আসিল না। নিরাশায় ও দারুণ উৎকণ্ঠায় মন অবসন্ন হইয়া পড়িল; কিন্তু তবুও তার মাকে প্রবোধ দিতাম, মণিলাল আসিবে।"

* * * *

প্রায় একটা বছর আরও কাটিয়া গেল। মণিলালের অনুসন্ধান একরকম ছাড়িয়া দিয়াছি। হয় সে সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, নতুবা মারা গিয়াছে, ইহাই স্থির করিয়া নিয়াছি।...

শরীরটা আজ ভাল বোধ হইতেছিল না; তাই কোর্টে যাই নাই। বৈঠকখানা ঘরে একটা চেয়ারে বসিয়া একখানা আইনের বই পড়িতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, "বাবু, একঠো ইনস্যুর চিট্‌ঠী আয়া।" বলিলাম, "পিয়নকে এদিকে পাঠিয়ে দে।" পিয়ন আসিয়া উহা হাতে দিতেই দেখিলাম, মণিলালের প্রেরিত! কম্পিত হস্তে কোনও রকমে নামটা সহি করিয়াই উহা খুলিয়া ফেলিলাম। তিনখানা দশটাকার নোটের সঙ্গে একখানা চিঠি বাহির হইয়া আসিল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে পড়িয়া দেখিলাম, মণিলাল লিখিয়াছে,—

"বিদায়, বন্ধু, বিদায়। আজ প্রায় দেড় বছর পর আবার আসিয়াছি। আমার এই দেড় বছরের জীবনেতিহাস শুনাইয়া তোমার কাছে বিদায় চাই।

"দেড়বছর পূর্ব্বে একদিন তোমার ত্রিশ টাকা সমেত একটা ব্যাগ আমি চুরি করিয়াছিলাম। তা' তোমার বেশ মনে আছে বোধ করি। তাহাই আজ তোমাকে পরিশোধ করিলাম।

"সামান্য ত্রিশ টাকায় আর ক'দিন যায় ভাই! কিছুদিন বাদেই আবার সেই ক্ষুধার তাড়না, স্ত্রী, পুত্র, মাতার সেই শীর্ণ, কাতর মুখ আমাকে আবার উন্মত্ত করিয়া তুলিল। শিয়ালদহ ষ্টেশনে মাথায় করিয়া মোট বহিতে গেলাম; তিনদিন অনাহারে ছিলাম বলিয়া মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেলাম। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম; দেখিলাম এক ভদ্রলোক কতকগুলি নোটের তাড়া পকেটে পুরিয়া একটা দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। তাহার অনুসরণ করিলাম। বড় একটা রাস্তার মোড় ঘুরিতেই লোকটার পকেট হইতে নোটগুলি ছিনাইয়া নিতেই সে বাঘের মত খপ্‌ করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল। পিঠের উপর এবং মাথার উপর চারিদিক হইতে কিল, চড়, পড়িতে আরম্ভ করিল। রক্তাক্তদেহে জ্ঞানহারা হইয়া ফুটপাথের উপর পড়িয়া গেলাম। তারপর কি হইল, কিছুই মনে নাই। যখন জ্ঞান হইল দেখিলাম, ছোট একটা অন্ধকার কুঠুরিতে পড়িয়া আছি, বাহিরে লাল পাগড়ীওয়ালা পাহারাদার। বুঝিতে আর বাকী রহিল না, জেলে আসিয়াছি। বিচারে একবছর সশ্রম কারাদণ্ড হইল।

"আজ দুইমাস হ'ল জেল হইতে মুক্তি পাইয়াছি। স্ত্রী, পুত্র মা বাঁচিয়া আছে কি না দেখিবার জন্য বাড়ীতে ছুটিয়া আসিলাম। কোথাও তাহাদের খোঁজ না পাইয়া গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোথায় এরা?" তাহাদের ভিতর কেহ কেহ বলিল, মা দারিদ্র্যের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার স্ত্রীকে এক পরপুরুষের হাতে সঁপিয়া দিয়া ৺কাশী চলিয়া গিয়াছেন। বিশ্বাস হইল না। প্রতিবেশী একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ব্যাপারটা সব জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ গো, সত্যিই তাই। আমিই তাদের মাস ছয়েক খাইয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। তারপর কল্‌কাতা থেকে সুন্দর একটা সৌখীন ছোক্‌রা এখানে এল। তাকে দেখে তোমার বৌ কি মতলব ঠাওরাল বোঝা ভার। একদিন ঘুম থেকে উঠেই শুনি তোমার মা ভেউ ভেউ করে কাঁদছেন। ব্যাপার বুঝতে আর বাকী রইল না। বুঝলুম, বৌ পালিয়েছে সেই ব্যাটাছেলের সঙ্গে। তারপর তোমার মা কাঁদতে কাঁদতে ৺কাশী"—

"আর কিছু কাণে ভিতর প্রবেশ করিল না। মাথাটা

ঘুরিতেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটা ঘুরিতেছিল বলিয়া মনে হইতে লাগিল। দূরে একটা গাছের তলায় গিয়া শুইয়া পড়িলাম। শুইয়া শুইয়া কত কি মনে পড়িতেছিল। যাহাদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য চোর হইয়াছি, পকেট কাটিয়া মার খাইয়া রাস্তার উপর গড়াগড়ি গিয়াছি, জেলে গিয়াছি, তাহারাই আজ এতদূর বিশ্বাসঘাতক! উঃ!—

"কারাগারে অনেকদিন মনে করিয়াছিলাম, দেয়ালের গায়ে মাথা ঠুকিয়া আত্মহত্যা করি; কিন্তু ইহাদের মুখ চাহিয়া তাহা পারি নাই। আজ আর কোনও বাধা নাই আমার। ভালবাসার জন তো আর আমার কেউ নাই। আজ আমার ভিটামাটী তিরিশ টাকায় বিক্রয় করিয়া তোমার ধার শোধ করিলাম। বন্ধু! বিদায় দাও। বিষ কিনিয়া আনিয়াছি; বিষপান করিব। তুমি যখন আমার এই চিঠি পাইবে, তাহার বহু পূর্ব্বেই আমার নশ্বর দেহ ইহসংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে।"—

হাত হইতে চিঠিখানা ঠক্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। মাথাটা চেয়ারের উপর এলাইয়া পড়িল। কতক্ষণ এরূপ মূর্চ্ছিতের মত ছিলাম জানি না; যখন জ্ঞান হইল তখন বাহিরে ময়লা বোঝাই গাড়ীগুলি ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া বাড়ী ঘর কাঁপাইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, ঘরের কোণে মণিলালের ছোট ছেলে মণ্টু বাড়ীর পোষা সাদা বিড়ালটার লেজ ধরিয়া টানিয়া উহাকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে।

আহার

[ডাক্তার শ্রীরমেশচন্দ্র রায়, এল্, এম্, এস্]

(১) হিন্দুর দিক হইতে।

হিন্দুরা নিত্য ভোজন ক্রিয়াটিকে বিলাস বা ভোগের কার্য্য বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা স্বহস্তে, শুদ্ধবুদ্ধি লোকজনের নিকট হইতে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিয়া, স্বয়ং তাহা পাক করিয়া শ্রীভগবানকে তাহা নিবেদন করিয়া প্রসন্ন চিত্তে নির্জ্জনে বসিয়া দেহরূপ যজ্ঞাগ্নিতে তাহা আহুতি দিয়া থাকেন। হিন্দুর পক্ষে, ভোজন ক্রিয়াটি একটি নিত্য অনুষ্ঠেয় যজ্ঞ। এই গেল হিন্দুর চক্ষে আহারে উদ্দেশ্য।

তাহার পরে, হিন্দুদিগের আহারের সময়। তাঁহারা তিথি বিশেষে উপবাস দেন। "উপবাস" শব্দটির অর্থ— উপ (=নিকটে, ঈশ্বর সান্নিধ্যে) + বাস (=স্থিতি)। অর্থাৎ উপবাস=অনাহার বা স্বল্পাহার এবং অহোরাত্র ভগবৎ স্মরণ। তাঁহারা তিথি বিশেষে খাদ্য দ্রব্য বর্জ্জন করেন; উদ্দেশ্য, ঐ ঐ তিথিতে নিষিদ্ধ উদ্ভিজ্জের রস স্বাস্থ্যানুকূল নহে বলিয়া তাহা বাদ দেওয়া—অথবা নিজ স্বার্থের জন্য উদ্ভিদ কুলের নিত্য ধ্বংস না করা। আজ আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু বলিয়া দিয়াছেন বলিয়া সকলেই উদ্ভিদের প্রাণশক্তি ও বোধশক্তিতে আস্থাবান্। কিন্তু হিন্দু বহুকাল হইতে উহা অবগত ছিলেন; এইজন্য ঔষধার্থ কোনও বনস্পতিকে আহরণ করিবার পূর্ব্বে, হিন্দু সেই বনস্পতিকে পূজা করিয়া, তাঁহার কৃপাভিক্ষা করিয়া আসিতেন। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান পাশ্চাত্যগণও স্বীকার করেন যে, ঋতু, তিথি ও দিবারাত্রি ভেদে ঔষধির বীর্য্যের তারতম্য ঘটিয়া থাকে; এমন অবস্থায়, তিথি বিশেষে খাদ্যদ্রব্যের বীর্য্যের যে হ্রাসবৃদ্ধি হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি?

তৎপরে, হিন্দুর আহার্য্য। এদেশ গ্রীষ্মপ্রধান। এদেশে আমিষ জাতীয় খাদ্যাপেক্ষা শালি জাতীয় খাদ্যই প্রশস্ত।

এজন্য, হিন্দুরা অন্নগত প্রাণ, পাশ্চত্যেরা মাংসগত প্রাণ। হিন্দুর নিত্য ভোজ্য কতদূর বিজ্ঞান সম্মত তাহা দেখিলে বুঝিতে পারি যে—

(১) ভিটামাইন—শাকে, দুধে, ঘৃতে, মুগের ডালে, ফলে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান।

(২) আতপ তণ্ডুল—বেরি-বেরি-নিবারক ভিটামাইনে পূর্ণ। পাছে তণ্ডুল অত্যধিক পরিমাণে ভোজনের ফলে নানা ব্যাধির সৃষ্টি হয়, কতকটা এই ভয়ে এবং কতকটা তণ্ডুলে স্নেহাংশ নাই বলিয়া এবং ঘৃতের ন্যায় brain food আর দ্বিতীয় নাই বলিয়া, হিন্দুর পক্ষে ঘৃত ভোজন অবশ্য কর্ত্তব্য। ঘৃতহীন অন্ন, হিন্দুর চক্ষে "নিকৃষ্ট" পথ্য।

(৩) মটর ডাল (বা অপর ডাইল) + আতপ চাল + ঘৃত + দুধ + চিনি হইলে ডাক্তারি মতে complete food

(৪) পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের নিত্য মত পরিবর্ত্তন। প্রথম-প্রথম পাশ্চাত্যেরা বলিতেন যে, সেই আহারই বিজ্ঞান সম্মত—যাহাতে যথাযথ পরিমাণে আমিষ জাতীয়, শালি জাতীয় ও লবণ জাতীয় খাদ্যাংশ আছে। এ হুজুগের দিন বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহার পরে, একদল লোক প্রচার করিলেন যে, কোন্ কোন্ খাদ্যাংশের কি পরিমাণে উত্তাপ প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা আছে, সেই ধরিয়া চলাই উচিত। ইহাকে ইংরাজীতে "ক্যালোরি" বলে। যেমন, বলিতে পারা যায় যে, এক গ্যালন পেট্রোল সঙ্গে থাকিলে, মোটরে ৫০ মাইল বেড়ান যায়, তেমনি করিয়া তাঁহারা খাদ্যাংশের শারীরিক উত্তাপ রক্ষণ ও কার্য্যকরী শক্তি দানের মাপে আহার পর্য্যাপ্ত কিনা তাহা মাপিতে লাগিলেন।

তৃতীয় এক ব্যক্তি বলিলেন "তোমাদের গোড়ায় গলদ রহিয়াছে—ভাইটামীন্‌কে বাদ দিয়া সর্ব্বনাশ করিয়াছ!" "ভাইটামীন" জিনিষটি একটা কাল্পনিক জিনিষ, খাদ্যে যাহার অভাব হইলে, বেরি-বেরি, স্কার্ভি, পেলাগ্রা, পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগ দেখা দেয় এবং খাদ্যে যাহার প্রাচুর্য্য ঘটিলে, দেহের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য অটুট থাকে। দেখা যায় যে, যে সকল গরুকে ছোলা, যব ও বিচালি খাওয়াইয়া রাখা যায়, তাহারা অল্পায়ু ও রোগ প্রবণ হয় এবং তাঁহাদিগের বৎসতরী রোগা ও অল্পায়ুঃ হয়; কিন্তু যে সকল গরুকে কাঁচা কাঁচা ঘাস পাতা খাওয়াইয়া রাখা যায়, তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, তাহারা দীর্ঘায়ুঃ হয়; তাহাদের দুধ বেশী হয়, তাহাদের বৎসতরীরা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করে। গ্রামের শাকান্ন ভোজী গরীব লোকেরা যদি ম্যালেরিয়া প্রভৃতি নির্ব্যাধির কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সহরের ধনীদিগের অপেক্ষা স্বাস্থ্য ও আয়ুঃ বেশী পায়। টাটকা তরীতরকারী, ফলমূলে, মাংসে, মাছে, দুধে, ঘৃতে, ডালে প্রচুর পরিমাণে ভাইটামিন্ থাকাই তাহার কারণ সহরের বাসী খাদ্যে, দোকানের মণ্ডা-মিঠাইয়ে, কৃত্রিম বিলাতি "ফুড" ও মাটাতোলা দুধে ভাইটামীন আদৌ নাই! ধব্‌ধবে চালে, ধব্‌ধবে ময়দায় ভাইটামীন নাই তাহা হইলে, পাশ্চাত্যদিগের খাদ্য সম্বন্ধে মতামতের সমষ্টি ফল দাঁড়াইতেছে এই :—

(ক) আহার্য্যে আমিষাংশ, স্নেহাংশ, শালির অংশ ও লবণাংশ যথাযথ পরিমাণে থাকা চাই; তদুপরি—

(খ) খাদ্যাংশগুলি এরূপ পরিমাণে থাকা চাই—যাহাতে ব্যক্তিবিশেষের শ্রমজনিত ক্ষয়ের পূরণ হইয়াও দেহ অটুট থাকিবে; এবং

(গ) প্রত্যেক খাদ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে ভাইটামীন্ থাকা চাই।

উপর্যুক্ত হিন্দুদিগের খাদ্যে (ক) ও (গ) ন্যায্যমত ত আছেই, বোধ হয় ভাইটামীনের প্রাচুর্য্যই আছে। উক্ত (খ) দফার সম্বন্ধে হিন্দুর কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। আর এই (খ) দফাই, এই দেহরূপ যন্ত্রটিকে প্রাণহীন কলের সঙ্গে সমান দরে ফেলিয়া, ইহার জন্য কতটা খাদ্যরূপ পেট্রোল লাগিবে, তাহা হিসাব করিয়া ব্যবস্থা করিতে চায়। অথচ, উঠ্‌তি বয়সে, ছেলে মেয়েরা প্রাকৃতিক প্রেরণায় মুহুর্মুহু খাইতে চাহিলে, তাহাদিগকে পেটুক বলিতে দ্বিধা বোধ করে না! এত বড় মজার কথা—মানুষ মানুষই—কল নয়!

যদি এদেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর প্রভৃতি না থাকিত, যদি গ্রামগুলি ধ্বংস ও সহরগুলি ময়লা ও রোগের আড্ডা না হইত,—তাহা হইলে—এত গরম দেশ হইলেও, এ দেশের লোকেরা উক্তরূপে আহার করিয়াই স্বাস্থ্যবান ও দীর্ঘায়ু ছিল! কাজেই, স্বীকার করিতে হইবে যে, এ দেশীয়দিগের আহার অতীব বিজ্ঞানানুমোদিত।

(৩) রোগের কারণ।

হিন্দুরা বলেন যে, বায়ু, পিত্ত বা কফের বিকৃতি ঘটিলে তবে ব্যারাম হয়। এই কথাটা শুনিলেই, আমরা "সেকেলে ধারণা" বলিয়া উড়াইয়া দিই। কিন্তু কে বলিতে পারেন যে, যে সূক্ষ্মদোষ কবিরাজেরা নাড়ীতে ধরেন, তাহা endocrine গ্রন্থিগুলির কার্য্যাধিক্য বা কার্য্যাক্ষমতার ফল নহে? কে বলিতে পারেন যে, বায়ুপিত্ত বা কফের নাড়ীর অর্থ শরীরে ভাইটামীনের ন্যূনাধিক্য কি না? চিকিৎসক হিসাবে, এই কথাটা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, মাংসাশী ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা নিরামিষাশীরা কম রোগপ্রবণ, তাঁহাদিগের আয়ু বেশী, এবং তাঁহাদিগের দেহে ক্ষতাদি সত্বর সারিয়া যায়। ইহা হইতে কি এমন অনুমান করা যায় না, যে, ত্রিদোষের পশ্চাতে খাদ্যজনিত দোষত্রুটি বর্ত্তমান? কাজেই, আমার পক্ষে, "সেকেলে ধারণা" বলিয়া রহস্য করা কষ্টকর।

পাশ্চাত্যেরা প্রায় সকল রোগের কারণভূত জীবাণুকে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জন্য, তাঁহাদিগের মতে মশকাধিক্য হইলে ম্যালেরিয়া হয়, যক্ষ্মা-জীবাণুর আধিক্যে ক্ষয়কাশ হয়, ইত্যাদি। আমি একথা একেবারেই সন্দেহ বা অস্বীকার করিতেছি না যে, মশকাধিক্য হইলে ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মা জীবাণু হইতে ক্ষয়কাশ হয়, কিন্তু আমি বলিতে চাই যে, শুধু ঐরূপ যুক্তির উপরে নির্ভর করা উচিত নহে। থাকুক ক্ষয়কাশের জীবাণু কিন্তু যতক্ষণ আমার দেহ সুস্থ ও সবল; ততক্ষণ ঐ জীবাণুরা আমার শরীরে প্রবেশ লাভ করিবামাত্রই আমাকে ধরিতে পারে না। বারম্বার আক্রমণ করিয়া অথবা অপর কোনও কারণে, দেহ রুগ্ন বা ভগ্ন হইলে, তবে তাহারা আমাদিগকে পাড়িয়া ফেলিতে পারে। যাঁহারা ক্ষয়কাশ রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া "অপ্‌সোনীন" হিসাবে রোগীর ভাবীফল নির্ণয় করেন, তাঁহারা ত সেকেলে humoral theory বা বায়ু পিত্ত, কফের কথাই প্রকারান্তরে বলেন? যাঁহারা রক্তের শ্বেত কণিকার Arneth count গণনা করেন, তাঁহারাই ত প্রকারান্তরে বায়ুপিত্ত কফের, কথা স্বীকার করেন! সে যাহাই হউক, আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এইটুকু বড় করিয়া বলা যায় যে, উপযুক্ত ও যথেষ্ট আহার্য্য পাইলে ম্যালেরিয়া, ক্ষয়কাশ প্রভৃতি ব্যারাম সহজে ধরে না। কাজেই ব্যারামের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই দুর্ভাগ্য বাঙ্গালাদেশে, শুধু ম্যালেরিয়ার মশক তাড়াইয়া বা ইঞ্জেকসনের ধূম ধাম করিয়া বা বড় বড় ক্ষয়কাশ চিকিৎসালয় খুলিলে হইবে না, যাহাতে দেশের লোকে দু'মুঠা পেট ভরিয়া অবিকৃত পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় তাহা করা রাজসরকারের, দেশবাসীর ও সকল চিকিৎসকের প্রথম কর্ত্তব্য। এবং যে চিকিৎসক রোগীর পথ্যের দিকে খরদৃষ্টি না রাখেন, তাঁহার চিকিৎসা বিফল!

(স্বাস্থ্য)

লখিয়া

[শ্রীনরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়]

"না আজ মতি যা" একটি তরুণী তার স্বামীর হাত দুটি ধরে সজল চোখে বলে উঠল—"না আজ মতি যা।"

মন্নু তার পত্নীর মুখের ওপর একটা সোহাগের চিহ্ন এঁকে দিয়ে বল্ল—"পেয়ারি মল গোলাম হুঁ।" দাসত্বের গুরুভার এতই যে সে আজ তার পত্নীর করুণ আবেদনকেও উপেক্ষা করছে।

মন্নু আর একবার লখিয়াকে বুকে চেপে ধরল তার কপালের ওপর আর একটা চুমো দিয়ে তার বড় লাঠিখানা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

লখিয়া দেখল তার স্বামীর সেই যোদ্ধ্ বেশ, তার বুকটা ফুলে উঠল মুখখানি শুখিয়ে গেল।

তখন সহরে ভীষণ দাঙ্গা চলেছে। মন্নু এক বড়লোকের বাড়ীর দ্বারবান; তাকে যেতে হয় সেখানে পাহারা দিতে, ভোরে যায় আবার সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসে।

লখিয়া একলাটি বসে বসে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গোণে।

এর আগের দিন ভীষণ মারামারি হয়ে গেছে, মন্নু মাড়োয়ারির বাড়ীর চাকর, মুসলমানরা আগের দিন সেই বাড়ী আক্রমণ করেছিল মন্নু একা সবাইকে ফিরিয়ে দিয়েছে তাই তাদের আক্রোশ মন্নুর ওপর। লখিয়া শুনেছিল তার স্বামীর বীরত্ব, লখিয়া শুনেছিল মুসলমানদের আক্রোশ, লখিয়া বুঝেছিল স্বামীর জীবনের কথা তাই করুণ চোখে কাতর বুকে মিনতি করেছিল না যেতে—অন্ততঃ শুধু সেই দিনটা।

কিন্তু গোলামী! ভীষণ চাপ; যে গোলাম হয়েছে তার যে অমন শতেক মিনতি পায়ে দলে চলে যেতে হয়। কেন? না সে গোলাম। তাই মন্নু তার স্ত্রীর কথা রাখতে পারল না।

সমস্ত দিন লখিয়ার খাওয়া হল না। সহরে তুমুল কলহ ধর্ম্মের নামে ভাইএর বুকে অবাধে ভাই ছুরি বসিয়ে দিচ্ছে। চিরদিন যারা একসঙ্গে একপাড়ায় এক আঙ্গিনায় খেলে এসেছে তারা আজ সব বন্ধুত্ব ভুলে গিয়ে শুধু হত্যা আনন্দে মেতে উঠেছে একজন তার বাল্যবন্ধুর স্নেহময় বুকে অকাতরে ছুরি বসিয়ে দিয়ে দেখছে কেমন করে সে এ পৃথিবী ছেড়ে ধর্ম্মাধর্ম্মের চরম দেশে চলে যায় লখিয়া সব শুনছে সব দেখছে ভয়েতে তার বুকখানা কেপে উঠছে আর কেবলি মনে পড়ে যাচ্ছে মন্নুঃ মুখখানা তার লাঠি কাঁধে যোদ্ধ্বর বেশ।

এমনি করে যখন সমস্ত দিনটা কেটে গেল তখন সে উৎসুক হয়ে দ্বারের পানে চেয়ে রইল একটি চির পরিচিত স্বরের আশায়।

সবে সে তার উনুনটিতে আগুন ধরিয়েছে তার স্বামীর খাবার তৈরি করতে এমন সময়ে সেই চিরবাঞ্ছিত স্বরখানি এসে কাণে পৌছুল সে দৌড়ে গিয়ে কপাট খুলে দিয়ে তার সামনেটিতে দাঁড়াল—এতক্ষণ পরে তার নীরস অধরে সরস হাসি ফুটে উঠল। মন্নুর হাত থেকে লাঠিখানা নিয়ে নিলে একটু পরখ করে বল্ল "বড়া ভারী হয়।"

মন্নু একটু গর্ব্বের সঙ্গে হেসে তার বিশাল বাহু দুটি দেখিয়ে বল্ল "এহি বাঁও মে ঘুমতা হয়।"

খাওয়া দাওয়ার পর লখিয়া মন্নুর বুকের কাছটিতে শুয়ে শুনতে লাগল কেমন করে সে একা একদল মুসলমানকে হটিয়ে দিয়েছে, কেমন করে তার লাঠির ঘায়ে একটি একটি করে অনেকগুলি মুসলমান ধরাশায়ী হয়েছে। কেমন করে তার মনিবেরা পিট চাপড়ে মিষ্টি খেতে তাকে টাকার থলি উপহার দিয়েছে; এমন সময় হঠাৎ কে এসে দ্বারে ঘা দিয়ে ডেকে উঠল—মন্নু—মন্নুয়া।

মন্নু ও লখিয়া দু'জনেই চমকে উঠল; উঠে বসল। আবার কে ডেকে উঠল "মন্নু, এ মন্নু?"

এবারে চিনতে পেরে মন্নু সাড়া দিল; বলল "কে জিতন?"

জিতন বলল "হাঁ জলদি, শালা লোগ ফিন্ আয়া; জলদি বোলাতা হায়।"

"মেরা লাঠি" বলে মন্নু লাফিয়ে উঠল; লাঠিখানা কাঁধে ফেলে ছুটতে লাগল। লখিয়া আর থাকতে পারল না, সেও ছুটল তার পেছন পেছন; মন্নু কিছু না দেখে শুধু ছুটতে লাগল।

পৌঁছে দেখল "মুসলমানেরা বাড়ীখানা ঘিরে ফেলেছে; তার দোর ভাঙ্গে আর কি।"

"জয় মহাবীর কি জয়" বলে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত সে লাফিয়ে পড়ল সেই জনসমুদ্রের মাঝে। দু'হাতে ঘোরাতে লাগল তার সেই লাঠিখানা। কত মুসলমান "আল্লা হো আকবর" বলে ধরা নিলে। কতক পালাল, কিন্তু মন্নুর মাথায় এবার বড় চোট লাগল। যখন সবাই পালিয়ে গেল মন্নুর মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল; পাশে তাকিয়ে একবার ডাকল জিতন—কেউ সাড়া দিল না। লখিয়া দূরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছিল, পাছে মন্নু রাগ করে তাই যেতে সাহস করছিল না। মন্নু আবার ডাকল "মলজি; ওপর থেকে একটি মাড়োয়ারি যুবক নেমে এল। মন্নু তার দিকে তাকিয়ে বলল "পানি"। মাথা থেকে তার ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়ে যেখানটায় বসেছিল সেখানটা কাদা করে দিলে; মন্নু শুয়ে পড়ল।

লখিয়া আর পারল না, ছুটে গিয়ে তার মাথাটা কোলের ওপর তুলে নিলে। রক্তে কাপড়খানা ভিজে গেল। সে ডুকরে কেঁদে উঠল।

মন্নু তাকিয়ে দেখতে চাইল অন্ধকারে কিছু পেল না। হাতখানা তার হাতের মধ্যে চেপে ধরে যেন বুঝতে পারলে; সে বললে "পিয়ারি?"

লখিয়া কিছু বলতে পারল না শুধু কাঁদতে লাগল। মন্নু তার হাতখানা আর একটু চেপে বললে "পিয়ারি যাতা হায়, রোও মৎ।"

লখিয়া আর একবার ডুকরে কেঁদে উঠল কিছু বলতে পারল না।

আস্তে আস্তে লখিয়ার কোলের ওপর লখিয়ার হাতে হাত রেখে মন্নু চিরতরে চোখ বুজল। তার ঠাণ্ডা হাতে লখিয়ার গরম হাতখানি ধরাই রইল। লখিয়া কাঁদতে গেল; বুকে বেঁধে মন্নুর বুকের পরে পড়ে গেল।

* * * *

সকালে যখন পুলিস এসে মৃতদেহগুলি উঠিয়ে নিয়ে গেল তখন লোকেরা বলাবলি করতে লাগল—"এক আওরাৎ ভি কাল মরি থি।"

পাগল
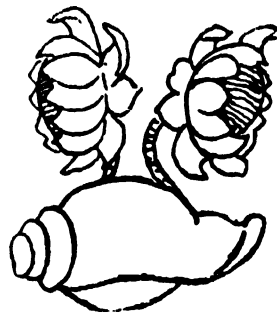
[শ্রীবিনয় মিত্র, বি, এস্‌, সি]

সে ছিল এক শিল্পী। অনেক রাজবাড়ী, নবাব বাড়ীতে তার ছবি দেওয়ালে সাজান আছে। তার আঁকা ছবি তার পেটের ক্ষিধে মিটাত বটে কিন্তু তাতে তার মনের ক্ষিধে মিটত না; কেননা সে আঁকতে চায় দুইখান ছবি। প্রথম খানি হ'বে পরিপূর্ণ "মাতৃত্বের" এবং তার পরেই থাকবে "মাতৃত্বের অবসানের" ছবি।

অনেক 'মডেল' সে মনের মধ্যে গড়লে—এঁকে রাজসভায় দিলে—শ্রেষ্ঠ ছবি বলে পুরস্কার পেলে—কিন্তু তার মনের ক্ষিধে মিটল না। সে তার বাঞ্ছিত জিনিস ছুটোর সন্ধানে সারা দেশ ঘুরে বেড়াল—কিন্তু পেলে না।

জগতের লোকের যেমন দিন যায়—তার দিনও সেইরূপ ভাবে যেতে লাগল; কিন্তু দুনিয়ার অনেক মানুষ যেমন ঘুরতে ঘুরতে দিশেহারা হয়—সেও সেইরূপ বাহির হ'তে তার মনের ক্ষিধের দেনা-পাওনা মিটাতে পারলে না; তবু দিশেহারা হলো না—কেননা তার ভরসা ছিল সে পাবে।

বাইরের লোকে বলতো "হ্যাঁ লোকটা আঁকে বটে"; কিন্তু যারা তাকে চিন্‌তো তারা তা'কে বলতো—"লোকটা আঁকে,—কিন্তু পাগল।"

সে পাগল কি না, তা জানবার জন্য অনেকে বোধ হয় 'পাগল' হয়ে ছুটে আস্‌তো তার কাছে—ছবি আঁকা শিখবার জন্য—কিন্তু সে থাকতো শুধু তা'র কল্পিত ছবি দুখানির চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে। বড়বেশী কথা বলতো না—তাই শিক্ষার্থীরা বলতো—"বদ্ধ পাগল, নইলে শিখাতে চায় না।"

কেউ বলতো—"বদ্‌মায়েসী ওর। ওর অন্ন মারা যাবে যে।"

বাড়ীতে তার কেবলমাত্র ছিল একটী সুন্দরী স্ত্রী। তার স্ত্রীকে সে ভালবাসতো খুবই—তাকে 'মডেল' করে—তার একটু আধটু বদলে সে অনেক ছবি এঁকেছে; কিন্তু তবু সে যা চায় তা পায় নি—তার 'ভালবাসা' জিনিসের—ছবির বিনিময়েও।

তারপর তার একটী ছোট্ট পদ্মপাপড়ির মত মেয়ে হ'লো। তার মনে আনন্দ ধরে না। সেটী একটু বড় হ'লে—তার পিঠে ডানা দিয়ে—পরী করে আরব্যোপন্যাসের মত ছবিও আঁক্‌লো—কিন্তু তবুও তার ক্ষুধিত চিত্ত শান্ত হয়নি।

একদিন তার মেয়েটীর অসুখ হ'লো। সে বড় গ্রাহ্যের মধ্যে আনলে না, বিকালে যখন একটী প্রকৃতির দৃশ্যের ছবি নিয়ে ফিরে বাড়ী এলো - তখন তার মেয়ের খুব অসুখ—সে ছট্‌ফট্‌ করছে। বাড়ী ফিরতেই তার চোখে পড়ল—তার রুগ্না মেয়ের কাছে বসে' তার স্ত্রী—মেয়ের দিকে সজল দৃষ্টি রেখে। এ কি! যে ঈপ্সিত জিনিসের সন্ধানে তার চির-বুভুক্ষিত চিত্ত একটা অজানা বেদনাতে ভরা ছিল—এ যে তার ঘরের মধ্যে—ওগো এ যে এত কাছে। এই ত তার সাধনার প্রথম খানি—এই যে পূর্ণ মাতৃত্বের ছবি! সে অপলক নেত্রে ঐ পূর্ণ মাতৃত্বের দিকে চেয়ে রইল—মেয়ের অসুখের কথা ভুলে গেল। তারপর—তারপর সে বসে পড়ল তার ক্ষুধিত অন্তরের ব্যাকুল বাসনা মিটাবার জন্য। কি আনন্দ তার চোখে-মুখে ফুটে উঠল। সে চায় কেবল ঐ পূর্ণ মাতৃত্বের রূপখানি তার তুলির আগে রঙীন করে তুলতে।

তার স্ত্রী বললে—"ওগো ডাক্তার ডাকো—খুঁকী যে কেমন করছে।"

সে এতক্ষণ মডেলখানি শেষ করে ফেলে—তা দেখতে লাগলো, ওটার খুঁত ধরবার জন্য।

স্ত্রীর দ্বিতীয় কথায় তার চমক ভাঙলো—সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"এঁ্যা কি বলছো।" "ওগো ডাক্তার—খুঁকী বোধ হয় আর বাঁচবে না। দেখছো না—কি রকম হ'য়েছে।"

"যাই—এই ছবিটী—হ্যাঁ—একটু দেখে—এই যাই।"

ছবিটী ঠিক করে সে ছুটলো ডাক্তার ডাক্‌তে।

ডাক্তার নিয়ে যখন ফিরে এলো— তখন সব শেষ হ'য়ে গিয়েছে। তার তুলিতে আঁকা—অপূর্ব্ব মাতৃত্বের আর লেশমাত্র নেই। তার অবসান হ'য়েছে।

ডাক্তার বললে "শেষ হয়ে গেছে মশাই।"

কিন্তু সে তখন ব'সে পড়েছে—আমার ছবি আঁকতে। দ্বিতীয় খানও যে এবার চোখের সামনে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছে। সেই মাতৃত্বের অবসানের ছবি আবার যে তার চোখের সাম্‌নে দেখতে পেয়েছে;—একসঙ্গে সে তা'র চিরদিনের কাম্য দুটী জিনিস সে পেয়েছে; সে কি ছাড়ে! এ যে তার কাছে বিষাদ ও আনন্দের সংমিশ্রণ। দাহ ও শান্তি একসঙ্গে যে তার প্রাণের ভিতর ফোয়ারা তুলেছে। এ যে তার বহুদিনের কাম্য, ঈপ্সিত, বাঞ্ছিত। যার জন্য সে বাইরে 'পাগল' শিল্পী বলে পরিচিত। সে কি ছাড়ে! কি অপূর্ব্বভাবে ভঙ্গিমায় সে ছবিখানির উপর তুলিকা বুলাতে লাগলো—যেন কত কালের হারাণো মাণিক সে আবার ফিরে পেয়েছে।

ডাক্তার যুবক। ভাবলে লোকটা শোকে ভয়ঙ্কর অভিভূত হ'য়েছে—তাই স্বতঃ প্রবৃত্ত হ'য়ে—পাশের ক্লাব হ'তে জন কয়েক সহৃদয় যুবককে ডেকে আনলে, সৎকারের জন্য।

তারা যখন মেয়েটাকে 'বলহরি, হরিবোল' বলে নিয়ে যাবার যোগাড় করলো—সে তখনও ছবি আঁকছে বাহ্যজ্ঞান রহিত হ'য়ে।

যুবারা বললে—মশায় উঠুন, একবারে পাগল হ'য়েছেন।

সে বললে—"হ্যাঁ—এই যাই।"

আবার ছবি দুখান সে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো। এবার তুলি দিয়ে ওতে রঙ ফুটাবার জন্য—তুলি নিয়ে বসবার উপক্রম করলে। উঠবার বা মেয়ের সৎকারের কোন আয়োজন করবার উদ্যোগই নেই। ছবি দুটোর উপর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হ'বে তখনকার যেন তার মনের ভাব।

ছেলেরা বললে—"চলহে আমরাই শেষ করে আসি।" ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললে—"আপনি এখানে একটু থাকুন, দেখবেন ঐ পাগলটাকে।"

* * * *

কিন্তু আজ সে কিসের পাগল কে জানে? চির বুভুক্ষিত অন্তরের ক্ষুধা মিটিয়ে—না মেয়ের শোকে কে জানে?

স্মৃতি

[শ্রীশ্রীচরণ ঘোষ]

বিজলীর হাসি—
হাসিয়ে ক্ষণিক,
নীরদ কোলে লুকায়ে যায়।

কুসুমের হাসি—
দুদিনের তরে,
হাসিয়ে কুসুমে মিশিয়ে যায়॥

তেমতি প্রেয়সী—
তোমারি সে হাসি,
হাসিয়ে দুদিন তেমনি করে।

কোথায় মিশেছ,
কোন্ সুদূরে,
স্মৃতিটুকু এঁকে হৃদয় পরে॥

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(৮)

"বাবা।"

টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া কন্যাকে গৃহ প্রবিষ্টা হইতে দেখিয়া মিঃ মুখার্জ্জী স্নেহভরা কণ্ঠে বলিলেন—"কে, মা ডোরা এখনি ফিরে এলে?"

"হ্যাঁ বাবা আর আমার ভাল লাগলো না"...সহসা পিতার জানু পরে মুখ রাখিয়া সিক্তকণ্ঠে ডোরোথি বলিল— "হ্যাঁ বাবা, মা কোথায় মারা গেছলেন, এইখানে কি?"

পুরাতন স্মৃতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইতে দেখিয়া মিঃ মুখার্জ্জী একটু বিমনা হইয়া কন্যাকে নিকটে টানিয়া বেদনা মিশ্রিত কণ্ঠে বলিলেন—"কেন মা,...সে কথা এতদিন পরে তুলছ?"

"না, এমনিই জিজ্ঞেস্ কর্চ্ছি...আচ্ছা বাবা, মা কি আপনার এই সমস্ত বিলাতী আদব কায়দায় চলতেন?"

"না মা, তোর মা ছিলেন আদর্শ রমণী...প্রফেসরের কন্যা ছিল সে, শিক্ষার কোনটাই তার বাকী ছিল না। তবে মনে মনে বোধ হয় ঘৃণা করতেন কিন্তু মুখ ফুটে কখনো আমার কোন কাজেই বাধা দ্যায় নি। কেবল মাঝে মাঝে আমার অমিতাচার দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সরে দাঁড়াতো..."

"বাবা...বাবা..." ডোরোথি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

"কি হয়েছে মা ডোরা..." মিঃ মুখার্জ্জী ডোরোথির ব্যাকুলতা দর্শনে অস্থির হইয়া কন্যার মস্তকে ধীরে ধীরে হস্তাবমর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই মাতৃহীনা মেয়েটিকে তিনি এক দণ্ডের জন্য কাঁদিতে দেন নাই। আজ বুঝিলেন না যে তাহার এ কান্না কি কারণে।

"বাবা মা যেখানে আগে ছিলেন আমাকে সেইখানে নিয়ে চলুন না?"

"সেকি মা, তুমি সেখানে যাবে, সে বড় খারাপ জায়গা... ম্যালেরিয়া..."

"হোক্ ম্যালেরিয়া...সে তো আমাদের জন্মভূমি বাবা, আমি আপনার ছেলেবেলার দেশ দেখবো। চলুন না বাবা একবার।"

"দূর পাগলী বেটী, যাওয়া বললেই কি যাওয়া হয়... সেখানকার ঘরদোর সব সংস্কারের অভাবে ভেঙ্গে পড়ছে। দাঁড়া মা, ম্যানেজারকে একখানা চিঠি দি...তিনি সব সারিয়ে বাসের উপযোগী করে দিন তারপর যাওয়া যাবেখ'ন।"

"না বাবা, আমি সেই ভাঙ্গা বাড়ীই দেখবো, আমাকে না নিয়ে গেলে আপনাকে আজ সারারাতই জ্বালাতন করব।"

কন্যার এই দেশপ্রীতি দেখিয়া মিঃ মুখার্জ্জী সন্তুষ্টচিত্তে বলিলেন—"বেশ তো মা, তা হলে কবে যেতে চাও?"

"আমি কালই যাব।"

"কালই যাবে – অসম্ভব!"

"কেন অসম্ভব বাবা?"

সমস্ত গুছোতেও তো অন্ততঃ একটা দিন সময় চাই।"

ডোরোথি মাথা নাড়িয়া বলিল—"কোন জিনিষপত্রে দরকার নেই বাবা। দরকার হলে সেখানকার জিনিষেই চলবে, আমার আর একতিল এখানে ভাল লাগছে না। বলুন না বাবা, তা হলে কাল যাবেন কিনা?"

"যাব মা নিশ্চয়। তোমার মনের এই পরিবর্ত্তনে আমি বড় সুখী হ'য়েছি...ডোরা এইটি যদি কিছুদিন আগে হতো।" মিঃ মুখার্জ্জীর বুকের ভিতর কি একটা ব্যথা ক্রমাগত পীড়ন করিতেছিল।

"বাবা।"

"কি মা?"

ডোরোথি ক্ষণকাল থামিয়া বলিল—"বাবা সুনীতি আমার নাম কে রেখেছিল ?"

"তোমার মা।"

"মা! তবে আপনি আমার নাম ডোরোথি রাখলেন কেন ?"

"ডোরা আমি ভেবেছিলুম কি জানিস্, যে তোর মায়ের কাজে সকল বিষয়ে বাধা দেব। কিন্তু তোমার নাম ডোরোথি রাখতেই সে আর ভুলেও তোমাকে সুনীতি নামে ডাকে নি, দরকার পড়লে সে খুকী বলে সেরে নিতো। তোমার মাকে অমল বড় ভালবাসত...তাই সে বিলেত হ'তে এসেই তোমাকে ঐ নামে প্রথমে অভিহিত করে।"

অন্তর্বেদনায় ডোরোথির বুক মোচড়াইয়া চোখ ফাটিয়া জল ঝরিল। মিঃ মুখার্জ্জী ডোরোথির মাথা কোলে টানিয়া ব্যথিত ভাবে বলিলেন—"অনেক রাত হয়েছে মা—যাও শোও গে। কাল যখনি বলবে···সেইক্ষণেই কল্যাণপুর রওনা হ'ব।

ডোরোথি শিথিল চরণে কম্পিত বক্ষে নিজের কক্ষে যাইয়া···অলস ক্লান্ত দেহলতা সুকোমল সোফার অঙ্কে অর্পণ করিল।

"আকাশ কাঁদে হতাশ সম
নাই যে ঘুম নয়নে মম
দুয়ার খুলি হে প্রিয়তম
চাই যে বারে বারে।"

পাশের বাটী হইতে কে গাহিয়া উঠিল করুণ সুরে। ডোরোথির অন্তরাত্মাও সমতালে গাহিয়া বলিল—

"অন্তরে আজ কী কলরোল
দ্বারে দ্বারে ভাঙল আগল
হৃদয় মাঝে জাগল পাগল
আজি ভাদরে।"

বাহিরে মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জন·· বাতাসের ঝাপটার সাথে ভেসে আসা...কাহার গানের এক টুকরা কলি··· ডোরোথির ব্যাকুল অন্তর আজ হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া বলিল--"কই গো কই, যারে চাই আজ, সে কোথায়, কোন্ সুদূরে, কোন্ কল্পলোকে···না না সে নাই, সে নাই গো।" টলিয়া টলিয়া উঠিয়া পাশের ঘরের কপাট ঠেলিয়া ডোরোথি ডাকিল—"লখিয়া।"

এক ডাকে ঘুম ভাঙ্গা লখিয়ার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। ধড়মড়িয়া উঠিয়া নিদ্রা জড়িতকণ্ঠে লখিয়া বলিল—"কি দিদিমণি ?"

কপাটটা দুই হাতে চাপিয়া ব্যথা কাতরস্বরে ডোরোথি বলিল --আয় না লখিয়া...একটু আমার ঘরে বসবি।

"চল দিদিমণি, ভয় করছে বুঝি···আহা একলাটি, অমন বয়সে আমরাও একলা থাকতে পারতুম না।"

"ভয় কিরে, নাঃ ভয় করবে কেন ? একলা সত্যিই ভাল লাগছে না। হ্যাঁরে লখিয়া তোর শ্বশুর বাড়ী আছে ?"

"নেই আবার দিদিমণি, সবই আছে দিদি.. বাপের বাড়ী এলাহাবাদে, শ্বশুর বাড়ী গয়ায়।"

"কে কে আছে সেখানে ?"

"সবই আছে, সোয়ামী আছে, তিনটে ছেলে, দুটো মেয়ে ....."

ডোরোথি বলিল—"তবে মরতে তুই চাকরী করতে এসেছিস কেন ?"

"পেটের দায়ে দিদিমণি, এযে বড় জ্বালা .." লখিয়া গম্ভীর ভাবে নিঃশ্বাস ফেলিল।

ডোরোথি উৎসুক ভাবে বলিল—"মাস গেলে তো পনের টাকা মাইনে পাস্...তাতে তোর খরচে কুলোয় ?"

লখিয়া ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল -"আ পোড়া কপাল আমার দিদিমণি···আমার একটা পেটের জন্যে কি ভাবি ? মাসে যে দশটাকা করে দেশে পাঠাই।"

"কার কাছে পাঠাস ?"

"কেন সোয়ামীকে...রুগ্ন আছে সে, কি করব দিদিমণি, বুড়োমানুষ একে,তাতে আবার বাতে পঙ্গু, আমি না দিলে সে খাবে কি করে...ওকি দিদিমণি, তুমি কাঁদছ কেন ?"

ডোরোথি ভাবিল এই অশিক্ষিতা নীচ জাতিয় রমণী হৃদয়েও কী গভীর স্বামীভক্তি···তাহার চোখে করুণার অশ্রু আসিতেছিল। বলিল—"দূর, কাঁদব কেন! দেখ লখিয়া, কালকে বাবাকে বলে তোর মাইনে পঁচিশ টাকা করে দেব,

তা হলে তোর চলবে তো ! আর কাল তোকে দু' মাসের মাইনে দেব, তুই দেশে চলে যাস। আঃ কী করিস লখিয়া পা ছাড় না...যা যা, কাল যে আমরাও দেশে যাব। যা এখন, আমি ঘুমোব।"

বিস্ময় বিমূঢ়া লখিয়াকে একরকম ঠেলিয়াই শয্যায় আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। বাহিরে বর্ষার অবিরাম গীতি-ধ্বনিতে তার চাপা কান্নার অস্ফুট শব্দ মিশাইয়া গেল। আকাশের বুক ভাসাইয়া বাদল ধারা ঝর ঝর করিয়া নিঝুম ধরণীর তাপিত চিত্ত শীতল করিয়া ঝরিতেছিল।

* * * *

ঝমঝমে নিশুত্ রাত। ষ্টেশনে জনমানবের সাড়াটি নাই। দূরে একটা তেলের ল্যাম্প তৈলাভাবে নিভন্ত, দ্যুতিহীন, নিষ্প্রভ তারার মত টিম্ টিম্ করিয়া জ্বলিতেছিল। মধ্যে মধ্যে জলো হাওয়ার এক একটা ঝাপটায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল। দূরাগত নীড়হারা ঝিল্লীর অস্পষ্ট করুণ রাগিণী কেমন যেন চাপা কান্নার গুমরাণীর মত শুনাইতেছিল। প্ল্যাটফর্ম্মের টিনের চালা ভেদ করিয়া অবিশ্রান্ত বৃষ্টির ধারা ঝরিতেছে। কল্যাণপুর গ্রামখানি যেন অকল্যাণের পূর্ণ মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কী একটা অনির্ণীত শঙ্কায় ডোরোথির বুকটা ছ্যাত করিয়া উঠিল। পিতার পাশটিতে দাঁড়াইয়া ভীতিবিহ্বল নেত্রে চারিদিকে চাহিতেছিল।

"মুখুজ্জ্যে মশাই !"

প্রকৃতির বুকভরা তমোরাশী নাশ করিয়া আলোর রেখা প্রান্তভাগে ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে মানব কণ্ঠের সাড়া পাইয়া ডোরোথি ফিরিল। শ্যাওলা রঙের হাতকাটা সার্ট গায়ে, মোটা লাল পাড় ধুতি পরণে...উজ্জ্বল শ্যামকান্তি সম্পন্ন এক যুবকের দৃষ্টিতে ডোরোথির চঞ্চল দৃষ্টি মিলিল। ডোরোথি লজ্জাজড়িত আঁখি ফিরাইয়া দূরে 'সিগন্যালের' পানে নিবদ্ধ করিল। মিঃ মুখার্জ্জী বিস্মিত হইয়া বলিলেন —কে......"

"আমি মানস, চিনতে পাচ্ছেন না ?"

"ওহো তুমি হরকুমারের ছেলে মানস, না ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ"—মানস মিঃ মুখার্জ্জীর পায়ের ধুলা লইয়া মিষ্টস্বরে বলিল—"ওঃ আজ কতদিন...কত মাস পরে আপনার সঙ্গে দেখা হলো। * * * ষ্টেশনে প্রায় পাঁচ ছ'ঘণ্টা 'লেট' করে ফেললে, কোথায় লাইন খারাপ হয়েছিল। কিন্তু আমি এত করে ম্যানেজারকে চিঠি দিলাম.. কিন্তু সেও তো এলনা ; আর যে দুর্য্যোগ.."খুব সম্ভব, এই দুর্য্যোগে তিনি বাড়ী থেকে বেরুবার অবসর পাননি। আর আজও আমি কেমন অভাবনীয় ভাবে এখানে এসে পড়লুম—এই ট্রেণটায় আমার এক বন্ধুর আসবার কথা ছিল ; তাকে আনতে এসে আপনার দেখা মিলে গেল...উঃ আরো যে চেপে বৃষ্টি আসছে...আচ্ছা আপনি আমার ছাতিটা নিন্, বলিয়া মানস ডোরোথিকে লক্ষ্য করিয়া সম্ভ্রমভরা কণ্ঠে বলিল—"কিন্তু উনি..."

মিঃ মুখার্জ্জী হাসিয়া বলিলেন—"বাঃ মানস আমাকে চিন্‌লে আর ডোরাকে চিনতে পারলে না ? উটি যে আমার ছোট্ট মা,—আর তোমার মনে না থাকবারই কথা—কেননা ও যখন এখানে এসেছিল, তখন খুব ছোট।"

মানস লজ্জারক্ত মুখখানায় স্নিগ্ধহাসি ফুটাইয়া বলিল—"তবে আপনি আমার এই ম্যাকিণ্টসটা নিন্ পরে ফেলুন—আমি একবার দেখে আসি গাড়ী পাওয়া যায় কিনা ?" বলিয়া নিজের ম্যাকিণ্টসটা খুলিয়া ডোরোথির হাতে তুলিয়া মানস দ্রুতপদে সম্মুখে অগ্রবর্ত্তী হইল। মিঃ মুখার্জ্জী বলিলেন—"আর তুমি নিজে যে ভিজে গেলে মানস—শোন, শোন..."

প্রবল ঝড়ের শব্দে তাঁহার কথাগুলি মিলাইয়া গেল। মানস চক্ষের নিমিষে একটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হইয়া গেল।

(৯)

প্রভাতের মুক্ত অরুণকিরণ চোখে মুখে লাগিতেই ডোরোথির গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। দুই হাতে চোখ রগড়াইয়া ফুল্লমনে শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল। রেবেকার বাড়ী হইতে আসিয়া পর্য্যন্ত, নানারকম দুশ্চিন্তায়, ও কয়দিন তাহার ঘুমই হয় নাই। তাহার পর কালকের সারাদিন ট্রেণ 'জার্ণি'তে অবসন্ন ডোরোথি অতরাত্রে বাড়ী ফিরিয়া শয্যা আশ্রয় করিতেই শান্তিময়ী সুপ্তির কোমল অঙ্কে নির্ভাবনায় ঢলিয়া পড়িয়াছিল। আজ এতখানি বেলা অবধি ঘুমাইয়াছে ভাবিয়া ঈষৎ লজ্জিতা ডোরোথি আস্তে আস্তে পা টিপিয়া

দ্বার খুলিয়া চওড়া দালানের পরে' দাঁড়াইতেই সবিস্ময়ে দেখিল ..তাহার পিতা বহু পূর্ব্বেই উঠিয়া কালকের সেই অচেনা দয়ালু যুবকটীর সহিত গল্প জুড়িয়া দিয়াছেন। সামনে অভুক্ত চায়ের পেয়ালা পড়িয়া রহিয়াছে, বোধহয় এখনও স্পর্শ করেন নাই। একে বেলায় উঠার দরুণ লজ্জা...তাহার উপর একজন অপরিচিত যুবকের সম্মুখে হঠাৎ আসিয়া পড়িল—ডোরোথির মুখের পরে' প্রভাতের অরুণরাগের মত লজ্জার অরুণিমা ছড়াইয়া পড়িল! পিতা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া স্নেহসিঞ্চিত ভাষায় বলিলেন—"এস মা, কালকে তোমার ঘুমের কোন অসুবিধা হয় নি তো?"

আরক্তমুখে ডোরোথি বলিল—"না বাবা—বরঞ্চ সেখানের চেয়ে কাল এখানে বেশীই ঘুমিয়েছিলাম।"

মানস তাহার সরল চোখ দুইটি ডোরোথির প্রশান্ত চক্ষুর পরে' সমাবেশ করিয়া বেশ পরিচিতের মতনই বলিল—"কালকে এদেশে নূতন এসেছ দিদি...তাই মশার উৎপাত টের পাওনি—কিন্তু দুচার দিন থাক, দেখবে রাত্তিরে মশার দল কি রকম 'কনসার্ট' বাজাতে আরম্ভ কর্ব্বে, আর একদণ্ড মশারীর বাইরে শোবার জো নেই...সেই জন্য প্রতি বছর ম্যালেরিয়াতে দেশটা উচ্ছন্ন যেতে বসেছে।"

ডোরোথির কাণে মানসের এই স্নেহ সম্বোধন যেন নূতন সুরে বাজিয়া উঠিল। সে একটু ভয় ব্যাকুল স্বরে বলিল—তাই নাকি মানসদা? কিন্তু আজকাল তো অনেক স্বদেশীর দল এই পল্লী সংস্কারে মন দিয়েছেন, তাঁরা এ কল্যাণপুরের সংস্কার করছেন না কেন?"

"হ্যাঁ সে চেষ্টাও হচ্ছে বই কি, অমলদা আজকাল পল্লী সংস্কার, জাতীয়তা উন্নতি লাভাশায় যতটা ঝুঁকে পড়েছেন, বোধহয় তার মত স্বার্থত্যাগী কর্ম্মঠ, উৎসাহী কর্ম্মী খুবই বিরল। তিনি এদেশে এখনও পৌছুতে পাচ্ছেন না; কিন্তু আমাকে প্রতি পত্রে জানাচ্ছেন"—এখানে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠা কর, বয়ন বিদ্যা, শিল্পোন্নতি দ্বারা গ্রামে, দেশের অর্থাগমের প্রকৃত পন্থা বলে দাও। হিন্দু মুসলমান মিলে সংঘ গঠন কর...তাদের প্রত্যেকের কাণে স্বাধীনতা বীজমন্ত্র শুনাও। কিন্তু কাকে শোনাব দিদি—বলতে গেছলুম তাতে ফল হল এই যে নিরক্ষর চাষারা ক্ষেপে উঠল, ভদ্রবাসীরা বললে—"বিপ্লব বাদী রাজদ্রোহীর কথা আমরা মানব না—আমরা রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর্ব্বো না। কিন্তু এটা তাঁরা বুঝছেন না যে রাজা এই ভারতবর্ষের রাজাই থাকুন কিন্তু আমরা নিজেদের স্বাধীনতাটুকুকে পরের হাতে তুলে দেব কেন? বিপ্লব বাধায় কারা? যাঁরা পরভৃতি, চিরদিন পরাধীন হ'য়েই থাকতে চান,...তাঁদের কাছেই স্বদেশ সম্বন্ধে বলতে গেলেই বিদ্রোহ বাধিয়ে তুলে, কিন্তু আমরা জানি এ কাজ বিদ্রোহ করে বিরোধ করলে সফল হবে না। কিন্তু সে কথা কয়টি আমরা বুঝলুম—আর সম্প্রদায়ের সকল কর্ম্মী বুঝল না—ফলে কত জায়গায় হাতাহাতি হ'বার উপক্রম পর্য্যন্ত হয়ে গ্যাছে। সেই জন্যে আমি আপাততঃ হাল ছেড়ে দিয়েছি। অমলদা'কে লিখে দিয়েছি যে তিনি না এলে, এখানকার সংস্কার কিছুতেই হবে না।"

মিঃ মুখার্জ্জী উৎসুক ভাবে বলিলেন—"মানস—তুমি কোন্ অমলের কথা বলছ?"

মানস মিঃ মুখার্জ্জীর কথায় প্রতিধ্বনি তুলিয়া সহাস্যে বলিল—"অমলদা'র পরিচয় অমলদা' তার অন্য কোন পরিচয় পাই নি। তবে এইটুকু বলতে পারি যে কেম্ব্রিজ থেকেই আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়, আমি যে বছর পরীক্ষা দিয়েছি...তার পরের বছর তিনি সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন......"

মুহূর্ত্তে কক্ষের মধ্যে একটা গাঢ় নিস্তব্ধতা আসিয়া দেখা দিল। মিঃ মুখার্জ্জী একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চেয়ারের পরে সোজা হইয়া বসিলেন। আর ডোরোথি আপনাকে সম্বরিতে গৃহান্তরে আশ্রয় লইল।

*　　*　　*　　*

শুভ্র থানে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে আবরিত করিয়া, মৃণালের মত দু'খানি অলঙ্কার শূন্য হাতে, দুই থালা জল খাবার লইয়া মিঃ মুখার্জ্জীর বিধবা ভাগিনেয়ী মমতা আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল—"মামাবাবু।"

মিঃ মুখার্জ্জী মুখ তুলিয়া বলিলেন—"কি মা মমতা?"

"আপনার জলখাবারের সময় হ'য়েছে উঠুন, হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসুন।"

"কি করে জানলে মা যে আমার ক্ষিধে পেয়েছে ?"

লজ্জাবনত মুখে মমতা বলিল—"এতখানি বেলা গড়িয়ে পড়লো—মানুষের পিপাসা পায় না ? ওমা ! মানসদা' যে অনেকদিন পরে এ পাড়ায় ?"

মানস বলিল—"তা জানি মমতা, যে এর জন্মে তোমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে। কিন্তু এ পাড়ায় কেন—এ পাড়া, ও পাড়া, রায় পাড়া, মুখুয্যে পাড়া, প্রত্যেক পাড়া খুঁজলেও আমাকে পেতে না। আমি এখানে ছিলেম না।"

"কোথায় গেছলে ?"

"আমি অমলদার কাছে দৌলতপুরে গেছলুম।"

"তুমি গেছলে দৌলতপুরে ! সেখানে তুমি কী কাজ করলে ?"

কেন মমতা, আমার দ্বারায় কি কোন কাজ হয় না মনে কর।"

"কি জানি—আমি তো কেবল জানি, তুমি কেবল বাঁশী বাজাতেই জান ; তোমার মত আত্মভোলা মানুষে যে কোন কাজ করতে পারে এ আশ্চর্য্য।"

মিঃ মুখার্জ্জী এইবার মমতার কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"না মা মমতা, মানস বোধ হয় এখন খুব কাজের লোক হ'য়েছে...।"

মমতা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল—"ঐযে ভাল ছেলেটির কাজের নমুনা দেখুন না। জলখাবার দিলুম, তা উনি আবার নিজের বাড়ীতে বসে লৌকিকতা করছেন। দেখছেন তো সন্দেশ দুটো পাতে ফেলেই জলের গ্লাস মুখে তুলছেন।"

মানস বলিল—"না মমতা বাড়ী থেকে এক দফা খেয়ে বেরিয়েছি...আর কখনও খাওয়া যায় ?"

তাই তো বাড়ীতে তোমার জন্মে কে খাবার তৈরী করে বসে আছে ? তুমি যে আবার নিজের জন্মে জলখাবার তৈরী করেছ...ভাল, তবু আজ তোমার মুখে একটা নূতন কথা শুনলুম।"

মানস মমতার এই স্পষ্ট উত্তরে অপ্রতিভ হইয়া মাথা নত করিল। মিঃ মুখার্জ্জী মানসকে বলিলেন—"একি সত্যি কথা মানস, বাড়ীতে তোমার কেউ নেই ?"

ম্লানমুখে মানস বলিল—"আত্মীয় স্বজন তো বহুদিনই আমাদের পরিত্যাগ করেছেন...আর বাবাকে বিলেত থেকে ফিরে এসে আর দেখতে পাই নি........."

মিঃ মুখার্জ্জী বলিলেন—"কোন জায়গাটায় থাক তুমি বাবা—অনেকদিন হ'ল আসিনি, সব ভুলে গেছি—"

মাথা নীচু করিয়া মানস বলিল—"আজ্ঞে পৈতৃক বাড়ীখানা হাঁসপাতালের জন্মে ছেড়ে দিয়েছি...এখন থাকি দত্ত পাড়ার ওদিকে অলকা নদীর ধারে ....."

"কোথায়, মাটীর বাড়ীতে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বুদ্ধিমান ছোকরা, নিজের মাথা রাখবার ঠাঁইটুকু বিলিয়ে দিয়ে এখন কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিয়েছ, এও কি তোমাদের মহাত্মার আদেশ ?"

"না না মহাত্মার আদেশ হবে কেন ? আমার জন্মভূমি —আমি স্বইচ্ছায় মাতৃভূমির কাজে লাগিয়েছি, আর একা মানুষ, অত বড় বাড়ীটায় থাকতে পারা যায় না।"

"তার তত্ত্বাবধান করে কে ?"

"কোথায় হাঁসপাতালের...তার জন্মে বিশ্বস্ত লোক নিয়োগ করেছি—তা ছাড়া আমিও রোজ দু'বেলা গিয়ে দেখাশুনো করে আসি। আচ্ছা উঠি এখন জ্যাঠামশায়, বড় বেলা হয়ে গ্যাছে—"

মানস উঠিয়া দাঁড়াইল। মিঃ মুখার্জ্জী মানসের হাত ধরিয়া বলিলেন—"আর তোমায় যেতে দেব না বাবা। মায়ার বাঁধনে যখন তুমি নিজে হ'তে ধরা দিচ্ছ, তখন তোমার এই বুড়ো ছেলেকে, আর তোমার ছোট বোনটিকে দেখতে হবে। তা হলে তোমার জিনিষপত্র নিয়ে এস এইখানে ?"

মানস এই প্রস্তাবে চঞ্চল হইয়া অনুনয়ের সুরে বলিল— "এ আমার বড় সৌভাগ্য জ্যাঠামশায়, কিন্তু ঐ বিষয়ে আমাকে মাফ করতে হবে। আমার একলা থাকতে কোন কষ্ট হয় না.. আর এতদিন যখন কেটে গ্যাছে, তখন—"

মিঃ মুখার্জ্জী ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন—"আচ্ছা তা হলে আজ রাত্তিরে এখানে খেয়ে যেও...কেমন, আমার এই কথাটা তো রাখবে ?"

ব্যস্ত হইয়া মানস বলিল—"অমন করে বলবেন না

জ্যাঠামশায়, এ আপনার অনুরোধ নয়, স্নেহের আদেশ বলে আমি মাথা পেতে নিলুম...এ আবার কী ডোরা ?"

মিঃ মুখার্জ্জী আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন—বিস্ময়ের ঘোর কাটিলে কন্যাকে নিকটে টানিয়া বলিলেন—"এ বেশ কোথায় পেলি মা ?"

ডোরোথি তাহার 'মভ্' রঙের সুন্দর সাড়ীখানির পরিবর্ত্তে মোটা খদ্দরের সাড়ীতে সুগৌর অঙ্গ ঢাকিয়া মাতৃ-মূর্ত্তি ধরিয়া সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিল। পিতার প্রশ্নে ডোরোথি মাথাটি অল্প হেলাইয়া বলিল—"কেন এই তো ভাল বাবা। আগে ভুল বুঝেছিলুম, তাই 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' মাথায় তুলে নিতে পারি নি। কিন্তু মানসদা' আপনাকে একটি কাজ করতে হবে, আমাকে খানকতক স্বদেশী মোটা সাড়ী আনিয়ে দিতে হবে...যেখান থেকেই হোক।"

মানস ডোরোথির হাত ধরিয়া সানন্দে বলিল—"দিব বই কি দিদি, কালকেই তোমার এ দীন ভায়ের নিজের হাতে বোনা মোটা কাপড় পাবে।"

(১০)

ডোরোথির প্রত্যাখানে অমলকুমারের বুকের একদিকটা নৈরাশ্যে যেমন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তেমনই অপর দিকটা মুক্তির উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছিল। দেশের চারিদিক হইতে তখন ডাক আসিয়াছিল। "উঠ সুপ্ত বঙ্গবীর, জাগো, মনের অবসাদ দূর করো...চরকা ধর, দেশ মাতৃকার চরণ সেবায় আত্মোৎসর্গ কর। মহাত্মার বাণী "স্বাধীনতা লাভ কর", উহা বীজ মন্ত্র বলিয়া নিশিদিন জপ করো···উহাই স্বরাজ্য লাভের প্রধান উপায়। আজ এই নব জাগরণের দিনে, আর নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘুমাইও না। স্বাবলম্বী হও...বাঙ্গালী তোমার দেশের অন্ন, দেশের সম্ভূত বস্ত্র পরের হাতে তুলিয়া দিতে লজ্জা হয়, হীন দাসত্ববৃত্তিতে লজ্জা হয় না ? বাঙ্গলার আকাশ, বাঙ্গলার বাতাস তোমাকে উৎসাহ দেয় না ? এস ভাই দেশ প্রেমিক সুধীবৃন্দ, তোমরা আপন আপন জাতীয় কর্ম্মের পুনঃ অনুষ্ঠান করিয়া দেশের এই দারিদ্র্য মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়া বাঙ্গলার লুপ্ত গরিমা, লুপ্ত কীর্ত্তির পুনঃ অধিষ্ঠান কর। এস মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ফিরিয়া এস। মায়ের কাছে জাতি নির্ব্বিচার নাই, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নাই, সব এক, সব ভাই..." এহেন নবযুগের আহ্বানে তখন সমগ্র ভারতে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতে লাগিল। অমলকুমারও এই লোভনীয় আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারিল না। নিজের স্বার্থ, আপন জীবনের শত সহস্র প্রলোভন... হৃদয়ের কামনা—অন্তরের অতৃপ্ত বাসনা সমূহ স্বদেশের চরণে বলি দিয়া, আর্ত্তের জন্য স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কর্ম্মসাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। * * * কাজ, কাজ, কাজ, কাজের আর বিরাম নাই। চতুর্দ্দিকে ঘরে ঘরে রোদনের বিরাট রোল উঠিয়াছে। গ্রাম শ্মশানে পরিণত। প্রতি গৃহে গৃহে পুত্রশোকাতুরা মাতার, স্বামী বিরহে পত্নীর, পিতা অভাবে পুত্রীর বুকভাঙ্গা হাহাকার ধ্বনি রণিয়া রণিয়া বায়ু-স্তরে মিশিয়া দিগ্মণ্ডল কাঁপাইয়া তুলিতেছে। তদুপরি অন্নের কষ্ট। শুষ্ক স্তন্য মৃতপ্রায় শিশুর অধরে দিয়া কঙ্কাল-সার জননী প্রেতমূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। পাশের ঘরে স্বামী ও উপযুক্ত পুত্রের মৃতদেহ লইয়া শিবাকুল সানন্দে টানাটানি আরম্ভ করিতেছে, লোক কোথায়, সৎকার কে করিবে···উঃ কী বিভীষিকা! ঔষধের বাক্স লইয়া মলিন মুখে অমলকুমার ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতি বস্তীতে রোগী দেখিয়া ফিরিতেছে। পশ্চাদ্বর্ত্তী—আলোকনাথ ও মৃণাল কান্তি এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীদের, কাহারও হস্তে দুগ্ধ ভাণ্ড—কাহারও মস্তকে চাউল ইত্যাদি রাঁধিবার সমস্ত সরঞ্জাম। তরুণ সম্প্রদায়ের চক্ষে মুক্তাবিন্দুর ন্যায় বিষাদের অশ্রু জল্ জল্ করিতেছে। * * ইহাদের দেখিলে স্বতঃই প্রাণে জাগে—কে বলে ভারতে বাঙ্গালী নাই ? আছে গো আছে, এখনও পরের দুঃখে দুই বিন্দু সহানুভূতি পূর্ণ অশ্রুত্যাগ করিবার জন্য অর্দ্ধ ভারত জাগিয়া আছে। যাহাদের গৃহে রুগ্ন ব্যতীত দ্বিতীয় লোক আছে—তাহারা আপনারাই সমস্ত যোগাড় করিয়া লইতেছে···আর যাহাদের ঘরে দ্বিতীয় লোক নাই··· সেস্থানে অমলকুমার স্বহস্তে পীড়িতের মলমূত্র পরিষ্কার করিয়া ঔষধ পথ্যাদি পান করাইয়া মরণোন্মুখ দেহকে সঞ্জীবিত করাইতেছে··· এইভাবে তিনটি মাস অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, মৃতপ্রায় প্রাণখানি পুনর্জীবিত হইয়া হাসিয়া উঠিল। খুলনার

অর্দ্ধ সমাপ্ত কর্ম্ম প্রিয়তম সহকারীদ্বয় আলোক ও মৃণালের হস্তে ন্যস্ত করিয়া অমলকুমার দৌলতপুর অভিমুখে রওনা হইল।

*   *   *   *

মোহাম্মদ ফজলুল হক···দৌলতপুরের প্রসিদ্ধ ধনী মুসলমান, এবং দেশের অন্যতম নেতা। অমলকুমার বহুদিন পূর্ব্বে তাঁহার নাম শুনিয়াছিল। দৌলতপুর গ্রামে গমন করিয়া অমল তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিল। অমলকুমারের আগমনে গ্রামস্থ সকলেই তাহার বিরুদ্ধে ছোট খাট রকমের সংগ্রাম বাধাইয়া তুলিলেন। কিন্তু সে সংগ্রামে অমলকুমারেরই জয় হইল। কারণ কতকগুলি প্রবীণ ছাড়া নবীন ও কিশোরের দল অমলকুমারের সম্প্রদায়ে যোগ দিল। ক্রমে ক্রমে গ্রামের যুবকবৃন্দ অমলকুমারের নেতৃত্ব সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া তাহার আদেশানুযায়ী কর্ম্ম করিতে লাগিল। অবশেষে যাঁহারা পূর্ব্বে অমলকুমারকে বিপ্লববাদী রাজদ্রোহী বলিয়া অপমান করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই·· আজ তাঁহারাই অমলকুমারের প্ররোচনায় বক্তৃতা করিতে যাইয়া বন্দীগৃহের লৌহ-নিগড় কুসুম মাল্য বলিয়া স্বেচ্ছায় সকলে হাসিমুখে গলায় পরিল।

(ক্রমশঃ)

দিশেহারা

[শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ]

সাঁঝের আঁধারে হ'য়ে দিশেহারা,
ডাকিছ বিষম ত্রাসে।
চেয়ে দেখ আমি এসেছি নামিয়া,
দাঁড়ায়ে র'য়েছি পাশে॥

জীবনে মরণে আমি যে তোমারি,
দুদিনের তরে শুধু ছাড়াছাড়ি,
ভয় নাই এবে চল হাত ধরি,
যাই সে সুখের দেশে॥

সে দেশের প্রাণী মিলনে বিভোর,
জানে না বিরহ ক্লেশ।
রোগ, শোক সেথা পারে না পশিতে
নাহিক হিংসা দ্বেষ॥

সেথা চিরবসন্ত জ্যোছনা উছল
নাচিছে গগনে তারকার দল,
সুরধনী ওগো বহি কলকল
কাননে কুসুম হাসে॥

পার্ব্বণি

[শ্রীরাধিকাচরণ মুখোপাধ্যায়]

বেলা তখন বারটা কি একটা হবে, আহার সারিয়া শয্যার উপর পড়িয়া একটু বিশ্রাম করিতেছিলাম। পূর্ব্ব রাত্রে অনেকদূরে একটা ডাক পড়িয়াছিল, কাজেই ঘুমের তেমন যুত হয় নাই, আজ তাই সুদে আসলে পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করিতেছিলাম। যাহা হউক, সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যখন একনিষ্ঠ সাধকের মত চক্ষুদুটী মুদ্রিত করিয়া পড়িয়াছিলাম, আর নিদ্রাদেবী যখন ধীরে ধীরে পা টিপিয়া টিপিয়া একটু একটু করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, ঠিক সেই সময় আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিয়া গুণধর পুত্র আসিয়া ডাকিলেন, "বাবা!" আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, কোন উত্তর দিলাম না, আবার মধুর কণ্ঠে ডাক পড়িল, "বাবা।" আমি এক নিঃশ্বাসের মধ্যে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বিরক্তভাবে বলিলাম, "তোর বাবা মরেছে! আপদ কোথাকার, একটু যে ঘুমাব তারও যো নেই।"

রাখাল একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিল, "আমি কি শুধু শুধু ডেকেছি, পয়সা চাই যে।"

আমি বিরক্ত ভাবে বলিলাম, "কেন আমার সপিণ্ডকরণের আয়োজন করবার জন্য নাকি?"

রাখাল মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, "স্কুলের দরোয়ান পার্ব্বণি চাইতে এসেছে।"

আমি আর কোন কথা না বলিয়া ব্যাগের ভিতর হইতে একটা আধুলি বাহির করিয়া ফেলিয়া দিলাম; রাখাল আধুলিটা পাইয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল; বাহিরে তখন দরোয়ান আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দিতে ডাকিতেছিল, "খোকাবাবু, থোড়া জল্‌দি করে এস, অনেক জায়গায় ঘুমতে হবে।"

খোকার হাত হইতে এড়াইলাম বটে, কিন্তু ঘুম আর আসিল না। খোকা চলিয়া গেল, কিন্তু তাহার স্থানে আর একজনকে আমাকে জ্বালাইবার জন্য রাখিয়া গেল; সে খোকার চেয়েও দুরন্ত; খোকাকে ধমকাইলে, চোখ রাঙ্গাইলে ভয় পায়, কিন্তু সে কিছুতেই ভয় পায় না। আজ প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া তাহাকে বশে আনিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সে কিছুতেই বশে আসিতে চায় না; সময় পাইলেই, অবসর পাইলেই সে আসিয়া আমাকে চাপিয়া ধরে, সে কে জান? দুরন্ত স্মৃতি। বড় কঠিন সে, বড় নিষ্ঠুর সে! সব যায়, কিন্তু সে জীবনের শেষদিন অবধি হৃদয়টাকে অধিকার করে বসে থাকে। বীণা থামিয়া যায় কিন্তু তাহার রেশ অনেকক্ষণ অবধি কাণে বাজিতে থাকে, তেমনি কর্ম্ম ফুরাইয়া যায় কিন্তু তাহার স্মৃতি সহজে মুছে না।

প্রাণের মধ্যে ক্রমাগত সেই আধা হিন্দি আধা বাঙ্গালা কথাগুলি বাজিতেছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিনের একটা ঘটনার কথা মনের মধ্যে আসিয়া উঁকি মারিয়া যাইতেছিল; সেই অতীত শৈশবের কথা, যখন মন ছিল স্বর্গের মন্দাকিনীর মত স্বচ্ছ, আর তারই মত পবিত্র! সেইদিনকার কথা, যখন মুখে ছিল অফুরন্ত হাসি, প্রাণে ছিল অবিশ্রান্ত আনন্দ, আর বুকে ছিল অটল উৎসাহ। ঠিক এমনি করিয়া সেও আধা বাঙ্গালা আধা হিন্দিতে কথা বলিত; সে ছিল স্কুলের দরোয়ান। ছেলেবেলায় যখন টিফিনের ছুটি হইত, তখন দেখিতাম, সে তাহার ছোট ঘরখানার দরজার কাছে একটা ভাঙ্গা খাটিয়ার উপর বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া একমনে রামায়ণ পড়িত। আমরা কতবার পৃষ্ঠে ধূলি ছড়াইয়া দিয়াছি, কিন্তু তার মেজাজটী এত নরম ছিল যে, তাহার মুখে কোনদিন রাগের চিহ্ন দেখি নাই, সে কেবল বলিত, "ছিঃ খোকাবাবু, ওসা মত্ করনা।" আমরা হাসিয়া চলিয়া যাইতাম। লছ্‌মনের বয়স হইয়াছিল অনেক, তা প্রায় ষাটএর কাছাকাছি বৃদ্ধের সাদা ধব্‌ধবে শ্মশ্রুরাজির মধ্যে বেশ একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব পরিস্ফুট দেখা যাইত।

অপরাপর বালক অপেক্ষা বৃদ্ধ আমাকে একটু অধিক ভালবাসিত ; কোথায় দেশ থেকে কে আসিবে, অমনি লছমন তাহাকে আমার জন্ম কিছু না কিছু আনিতে লিখিয়া দিত, তারপর বৃদ্ধের সেই সামান্য উপহারগুলি সে যখন আমার হাতে তুলিয়া দিত তখন তাহার মুখে একটা কি যে করুণ ভাব ফুটে উঠত তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। সে প্রায়ই বলিত, "খোকাবাবু, আচ্ছা করে লেখাপড়া কর, তোমাকে জজ্ হতে হবে।" আমি সে কথায় কাণ না দিয়া বৃদ্ধকে রাগাইবার জন্ম বলিতাম, "টিকিমে রাধাকিষণ", বৃদ্ধ গম্ভীর ভাবে বলিত, "ছি বাবু, ওকথা বলতে মানা আছে।" আমি তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া ক্রমাগত একঘেয়ে সুরে আওড়ে যেতাম, "টিকিমে রাধাকিষণ, টিকিমে রাধাকিষণ।' ইহার পর আমি ক্রমেই বড় হইতে লাগিলাম। ক্রমে গ্রাম্য স্কুলের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাহিরে আমার ডাক পড়িল। আমাকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্ম সহরে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

আমি গ্রাম্য স্কুল ত্যাগ করিলাম। বৃদ্ধ সেদিন খুব বড় গোছের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিল, "রামচন্দ্রজী তোমার ভাল করবে বাবু, তুমি জজ্ হবে।" দেখিলাম এই কটী কথা বলিবার সময় বৃদ্ধের সেই দীপ্তিহীন চক্ষুদুটিতে বড় বড় দুই ফোঁটা জল সঞ্চিত হয়েছে। গ্রামের মায়া ত্যাগ করিয়া সহরে আসিলাম, প্রথম প্রথম মন টিকিত না। কিন্তু ক্রমে যতই সহরের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলাম, সহরের মাধুর্য্য ততই যেন আমাকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিতে লাগিল। রাস্তায় বাহির হইলেই কত হরেক রকমের মজা, কত নিত্য নূতন দৃশ্য! গ্রামে এ সকলের কিছুই নাই। আছে কেবল জাত মারামারি, পরকে ফাঁকি দেওয়া, পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, পরকুৎসা, পরের দ্রব্য চুরি করা, পরের দু'হাত জমা কিসে আমার হয় তাহারি চেষ্টা আর হুঁকা হাতে করিয়া রন্ধনশালায় গৃহিণীদের আঁচল ধরিয়া বসিয়া থাকা, এই ত নিষ্কর্ম্মাদের কাজ। প্রথম প্রথম ছুটী পাইলেই বাড়ী যাইতাম, কিন্তু ক্রমে বাটী যাওয়া কমাইয়া দিলাম; বাবা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম, "এখানে এলেই পড়াশুনার ব্যাঘাত হয়।" বাবা আর কোনও কথা বলিতেন না। যাহা হউক আমার অনেক সুকৃতি যে, এল্-এ পরীক্ষার দ্বারে গিয়া কপাট বন্ধ দেখিতে হয় নাই।

পাশের সংবাদ লইয়া যখন গ্রামে গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন সকলেই খুব খানিকটা বাহবা দিল। গ্রাম্য স্কুলে গিয়া পুরান শিক্ষকগণকে এই শুভ সংবাদ দিয়া আসিলাম, তাঁরা খুব আশীর্ব্বাদ করিলেন। প্রধান শিক্ষক অসিতবাবু মুরুব্বি চালে বলিলেন, "আমাদের প্রকাশ যে পাশ করবে সে ত জানা কথা।" ফটকে দরোয়ানের সঙ্গে দেখা হ'ল, বুড়া প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। বুড়াকে একটা টাকা বখশিস্ করে বাড়ী ফিরিলাম। যখনি বাড়ী ফিরিতাম, বুড়ার সঙ্গে দেখা হ'তই ; কোনবার বা আমি গিয়া দেখা করিয়া আসিতাম, কোন কোনবার বা সে আমাদের বাড়ীতে আসিয়া দেখা করিয়া যাইত। ছুটী ফুরাইল ; আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম ; বাবার ইচ্ছা আমি ডাক্তারী 'লাইনে' যাই, আমারও তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না, কাজেই মেডিকেল কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইলাম। তাহার পর ক্রমান্বয়ে বৎসরের পর বৎসর কাটাইয়া একদিন প্রাতঃকালে যখন শুনিলাম, আমি ডাক্তারী পরীক্ষায় পাশ হইয়াছি, সেইদিন বুঝিলাম এতদিনে আমার সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হইল।

এবার বাড়ী ফিরিয়া সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, হইল না কেবল বুড়ার সঙ্গে। শুনিলাম, সে না কি তার দেশে চলিয়া গেছে, আর কাজ করা তার পোষায় না, বয়সও অনেক হইয়াছে, তা' ছাড়া তার শরীরটাও ইদানিং ভেঙ্গে পড়িয়াছিল। যাহোক, কথাটা শুনে মনটা খারাপ হইয়া গেল। কেন বলিতে পারি না, মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। বুড়া যে আমার অজ্ঞাতে হৃদয়ের এতখানি স্থান অধিকার করিয়া ফেলিয়াছিল, এতদিন টের পাই নাই। পাশ করিয়া প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর গ্রামে প্র্যাকটিস করিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম তাহাতে পসার নাই। কলিকাতায় কিছুদিন চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। কোথায় যাই, কোথায় যাই ভাবিতেছি, এমন সময় মা আসিয়া ধরিয়া বসিলেন, "আমি কাশী যাব", আমি ভাবিলাম, 'এ মন্দ কথা

নয়', প্রকাশ্যে বলিলাম, "বেশ ত ;" মা একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, কেন না ইতিপূর্ব্বে তিনি অনেকবার কাশী যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি রাজী হই নাই, আজ যে একবারে এক কথায় রাজী হইয়া গেলাম, ইহাতে মা একটু আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। মা বলিলেন, "তবে সব ঠিকঠাক করিলে, বৌমা রইল, তুই রইলি, তোরা ত আর ছেলেমানুষ নস্ যে আমি গেলে তোদের একদণ্ড চলবে না, এখন বৌমা ডাগরটী হয়েছে, সে সংসার দেখবে ; আমি এই বুড়ো বয়সেও যদি ধর্ম্মকর্ম্ম না করব ত আর করব কবে।

তাহলে ঐ ও পাড়ার বামুন দিদিরা কাল যাবে, আমি ওদের সঙ্গে চলে যাই কেমন ? আমি বলিলাম, "বামুন দিদির সঙ্গে যেতে যাবে কেন, আমি নিয়ে যাব।"

মা বিস্মিত হয়ে বলিলেন, "সে কি, বৌমা থাকবে কোথা ?"

আমি বলিলাম, "কেন সেও সঙ্গে চলুক না।" তখন সব কথা মাকে খুলে বললুম, মা বলিলেন তার চেয়ে আর ভাল কথা কি হতে পরে।"

কাশী গিয়া উঠিলাম, একটী দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়া দরজার উপর বড় বড় হরফে সাইনবোর্ড লিখিয়া ঝোলাইয়া দিলাম, দিন দিন পশার বেশ বাড়িতে লাগিল, কিন্তু মাঝে মাঝে বড় মুস্কিলে পড়িতে হইত, হিন্দুস্থানীদের মধ্যে দারিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী, ইহারা সব সময় ভিজিট্ দিয়া উঠিতে পারে না, অথচ না গেলেও নাম খারাপ হইয়া যায়। সেদিন রবিবার, রাত্রি তখন বারটা হবে, একে শীতকাল, তায় আবার সকাল থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কাজেই শীতটা বেশ রীতিমত মালুম দিচ্ছিল, আমি শয্যার উপর আপাদ-মস্তক লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়াছিলাম ; আমার স্ত্রী তখন মেঝের উপর বসিয়া স্প্রিটের উনানে খোকার জন্য দুধ গরম করিতেছিল। এমন সময় সহসা কড়া নাড়ার শব্দ কাণে প্রবেশ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বেহারা সুমেরু আসিয়া খবর দিল যে একটী বৃদ্ধা হিন্দুস্থানী আমাকে ডাকতে এসেছে, তার বাড়ীতে ভারী ব্যায়রাম।

বুঝিলাম, এও সেই হাড় জ্বালানো ধরণের লোক যাদের ভিজিট্ দিবার সামর্থ নাই। বলিলাম, বলগে যা বাবুর শরীর খারাপ, যেতে পারবে না, কাল সকালে যেন আসে।"

কিছুক্ষণ পরে সুমেরু আবার ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, বৃদ্ধা কিছুতেই ফিরিতে চায় না, সে বলে, না গেলে সে সারারাত এইখানে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে। স্ত্রী বলিল, "আহা বেচারা অত করে বলছে, না হয় একবার কষ্ট করে গেলে।"

আমি বিরক্তভাবে বলিলাম, না হয় গেলাম, কিন্তু আমার পারিশ্রমিক দেয় কে বলত ?"

আমার স্ত্রী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "না হয় এক জায়গায় অমনিই গেলে, তাতে পুণ্য ছাড়া পাপ ত হবে না।"

আমি সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া সুমেরুকে বলিলাম, "বলগে যা ভোর বেলা আসতে, এখন আমি যেতে পারব না।"

তারপর আর কেহ বিরক্ত করিতে আসিল না দেখিয়া আমি তোফা ঘুম জুড়িয়া দিলাম। ভোর রাত্রে স্ত্রী ঠেলিয়া দিয়া বলিল, "ওগো সেই বুড়ী এসেছে যে, যেতে হবে না ?"

আমি আর কি করি, অগত্যা উঠিলাম। কোচম্যানকে গাড়ী জুড়িতে বলিয়া দিয়া বৃদ্ধাকে ডাকাইয়া রোগীর সম্বন্ধে সকল কথা জানিয়া লইলাম, বুঝিলাম কলেরা রোগী। আর উপায় নেই—প্রথমেই যদি ট্রিটমেণ্ট করা যেত ত আশা থাকত, এখন বৃথা চেষ্টা, যাহা হউক, অনিচ্ছাসত্বেও গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম, গাড়ী চলিতে লাগিল ; ক্রমে আমরা সহরের সীমানা ছাড়াইয়া গ্রামের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম ; দুধারে ধানের মাঠ, তার মধ্য দিয়া আমাদের গাড়ী চলিয়াছে ; বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আর কতদূর ?"

বৃদ্ধা বলিল, "এখনও কিছুদূর যেতে হবে বাবু।"

আমি বিরক্তভাবে বলিলাম, "এতক্ষণে আমার চার পাঁচ জায়গায় রোগী দেখা হয়ে যেত, ভাল জ্বালায় পড়লাম, এই রকম দু'একটী রোগী জুটলেই আমার অন্ন বন্ধ হবে আর কি !"

বৃদ্ধা কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বাবু, আপনি আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে দিন, আপনি টাকার জন্য ভাববেন না, আমার সর্ব্বস্ব আমি আপনাকে দেব।"

ক্রমে আমাদের গাড়ী একটী ছোট কুটিরের দরজার নিকট আসিয়া থামিল, বৃদ্ধা আমাকে নামিতে বলিল ; আমি বৃদ্ধার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই কুটিরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। বৃদ্ধা আমাকে একটি ছোট কক্ষের মধ্যে লইয়া গেল, কক্ষের মধ্যে এত অন্ধকার যে, কোথায় কি আছে, তাহা দেখিতে পাইলাম না। আমি অতি কষ্টে রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলাম, নাড়ী টিপিলাম, দেখিলাম অত্যন্ত ক্ষীণ, আশা একেবারেই নাই। মাথার শিয়রের জানালাটা বন্ধ ছিল, আমি খুলিয়া দিতে বলিলাম, জানালা খুলিয়া দিবামাত্র ক্ষীণ সূর্য্যরশ্মি আসিয়া রোগীর মুখের উপর পড়িল। সেই ক্ষীণালোকে আমি যাহা দেখিলাম, তাহা অতীব বিস্ময়কর, অতীব মর্ম্মান্তিক! আমি যুগপৎ দুঃখে, ভয়ে, বিস্ময়ে একবারে অভিভূত হইয়া পড়িলাম! "এ যে আমাদের সেই স্কুলের বৃদ্ধ দরোয়ান লছমন!" অনুতাপানলে সমস্ত হৃদয় পুড়িয়া দগ্ধ হইতে লাগিল, হায়! আর একটু আগে কেন আসিলাম না, তাহা হইলে হয় ত বাঁচাইতে পারিতাম! আমারি জন্য বৃদ্ধের মৃত্যু হইল! ছেলেবেলাকার সব কথা মনে পড়িতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম অদূরে বৃদ্ধের স্ত্রী হতভম্বের মত বসিয়া আছে, আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি তাহাদের ঠাকুমার চারিদিকে চুপটী করিয়া বিষণ্ণ মুখে দাঁড়াইয়া আছে, আহা বেচারারা কিছু জানে না, কিছু বোঝে না।

বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু, কেমন দেখলেন ?"

কি বলিব ; বলিলাম, "ভগবানের হাত, মানুষ কি করে বলতে পারে, তবে চেষ্টার ক্রটী হবে না।"

প্রাণপণে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃদ্ধকে বাঁচাইতে পারিলাম না। রোগীর অন্তিমকাল ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতে লাগিল ; সে তখন আবল তাবল কি সব বকিতেছিল, সে সব কথার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না ; কেবল একটী কথা আমার কাণে গেল, বৃদ্ধ বলিতেছিল, "খোঁকাবাবু রামচন্দ্রজী তোমাকে ভাল রাখবেন।" আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলাম, "লছমন!" সুপ্তোত্থিতের ন্যায় লছমন চক্ষু উন্মীলিত করিল, তাহার পর অর্থহীন দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণের জন্য চাহিয়া থাকিয়া আবার চক্ষু মুদ্রিত করিল ; তাহার পর বৃদ্ধের অবস্থা খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল। প্রায় বেলা বারটার সময় বৃদ্ধ সংসারের সমস্ত জালাযন্ত্রণার হাত হইতে মুক্ত হইয়া রামচন্দ্রজীর চরণে স্মরণ লইল। বৃদ্ধ চলিয়া গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনটাকে ভেঙ্গে চুরে একবারে 'চুরমার' করে দিয়ে গেল। আজ এই এতদিন পরেও সেদিনকার কথা মনে পড়িলে প্রাণটা যেন কেমন ধারা হয়ে যায়।
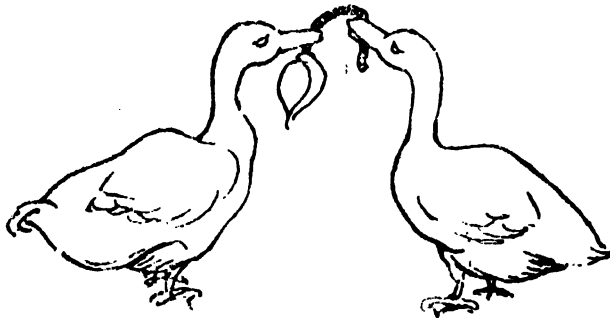
প্রত্যাবর্ত্তন

(বড় গল্প)

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

প্রথম পরিচ্ছেদ

অফিসে সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর অরুণ যখন বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, গৃহলক্ষ্মীদের শঙ্খ-ধ্বনিতে সমস্ত পাড়াটা মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে।

সবেমাত্র রান্নাবান্না চুকাইয়া কিরণ ঘরের ভিতর মাদুর পাতিয়া দেওয়াল চিমনিটা জ্বালিয়া একটী মাসিক পত্রিকার ছবি দেখিতেছিল। কিন্তু মন তাহাতে কিছুতেই বসিতে চাহিতেছিল না। স্বামীর প্রতিক্ষায় তার চঞ্চল চিত্ত বারবার উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল।

শনিবার! অন্যদিন এতক্ষণ কখন এসে পড়েন। আজ সন্ধ্যা হয়ে গেল, এখনও তার দেখা নাই। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তার কোমল তরুণ হৃদয় কেবলি কাঁপিয়া উঠিতেছিল। এমন সময় দ্বারে কড়া নাড়ার শব্দ পাইয়া সে একরকম ছুটিয়া আসিয়াই দোর খুলিয়া দিল।

অরুণ বাড়ী ঢুকিলে সে প্রশ্ন করিল—এত দেরী হ'ল যে?

কিরণের ছলছল চক্ষুদুটীর উপর দৃষ্টি রাখিয়া অরুণ বলিল—একটু দেরী হয়ে গেছে বটে, তুমি বড় ভাবছিলে না?

না তা ভাবব কেন? একলা সন্ধ্যের সময় এই নির্জ্জন পুরীতে ছটফট করে মরি, আর তুমি বেড়িয়ে বেড়াও।

রাগ কোরো না লক্ষীটি, চল বলছি কেন দেরী হ'ল, বলে অরুণ দরজায় খিল লাগাইয়া কিরণের হাতখানিতে একটু টান দিয়া শুইবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

জামা কাপড় ছাড়িয়া হাতমুখ ধুইয়া অরুণ একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। জানলা দিয়া হাওয়া আসিতেছিল। আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিয়া কিরণ কহিল—গল্প পরে হবে খ'ন, তোমার জন্যে জলখাবারটা আগে নিয়ে আসি একটু বোসো।

অরুণ বাধা দিয়া বলিল—জলখাবারের তাড়া নেই কিরণ, আজকে আমি খেয়ে এসেছি।

কিরণ পাখাখানা উঠিয়ে নিয়ে অরুণের পাশে আসিয়া হাওয়া করিতে করিতে বলিল—ও, সেইজন্যে দেরী হ'ল না? তা কোথায় খাওয়া হ'ল শুনি?

অরুণ কিরণের হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া কহিল—জানলা দিয়ে খুব হাওয়া আসছে—আর পাখার হাওয়া করতে হবে না। তারপর একহাত দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া অরুণ বলিল—আচ্ছা স্বামী সেবায় তোমার কি একটুও খুঁত থাকতে নেই রাণু? অত ভালবেস না গো, সইবে না শেষে—

কিরণ তাড়াতাড়ি অরুণের মুখে হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল—ফের আবার ওই সব কথা, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা না হলে—

ছিঃ সামান্য কথায় রাগ করে কি বোকা? তবুও যদি অমর হতুম—বলে অরুণ কিরণের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগিল

কিরণ কহিল—থাক্ গে, এখন কোথায় খেয়ে এলে তাই বল।

অরুণ বলিল—আমাদের অফিসের ছোট সাহেব আজ চলে যাচ্ছে কি না তাই আমাদের একটা ভোজ দিয়ে গেল কিন্তু দেরীটা অন্য কারণে হয়েছে, রাগ না কর ত বলি। কথায় কথায় ত মনসা দেবী হয়েই আছ—

তাই বুঝি ধুনোর গন্ধ দিয়ে মজা দেখ?

অরুণ হাসিয়া বলিল—তা বাপু তুমি যদি এখন আমার প্রতি কথাতেই ধুনোর গন্ধ পাও ত আমি বেচারী যাই কোথায় বল দেখি?

আচ্ছা আচ্ছা, আর ঠাট্টা করতে হবে না, এখন রাগের কি কাজটা করেছ শুনি?

তুমি যে সংসারের খরচ বাঁচিয়ে দশটা টাকা সেদিন আমায় দিয়েছিলে জুতো আর ছাতা কেনবার জন্যে তা দিয়ে আমি আজকে তোমার নামে ডার্বির টিকিট কিনে ফেলেছি। অফিসের সকলেই কিনলে সেইসব গোলমালে একটু দেরী হয়ে গেল।

শুনিয়া কিরণের রাগ হইল। সে বলিল—ঝ্যাঁ করেছ কি বলত ?

কেন ?

দশ দশটা টাকা জলে ফেলে দিয়ে এলে ?

অরুণ বলিল—আহা জলেই যে ফেললুম, তার ঠিক কি ? লেগেও ত যেতে পারে ? তা ছাড়া আফিসের সকলেই কিনলে।

কিনলে ত বয়েই গেল। তারা বড়লোক, বড়মানুষী তাদের পোষায়। কিন্তু এই যে রোজ ছাতার অভাবে বিষ্টিতে ভিজে বাড়ী আসছ—

নাঃ তুমি ভারী Pessimist—ভগবানের ইচ্ছা হলে ও টাকা ত দশগুণ হয়েও ফিরে আসতে পারে।

ভগবানের ইচ্ছে থাকলে তুমিও ত তিরিশ টাকার বদলে একশ' টাকা মাইনের চাকরী পেতে। যাক্ গে যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু আমাকে না জানিয়ে তুমি আর ওসব কিনো টিনো না বাপু,—যত সব পোড়ারমুখো বন্ধু করেছ।

অরুণ হাসিতে লাগিল। বলিল—দেখবে গো দেখবে, যখন দাঁওটা মেরে নেব তখন ঐ পোড়ারমুখো বন্ধুরাই আবার সোণামুখো হয়ে উঠবেন।

আচ্ছা সে পরের কথা পরে আছে এখন খাবে এস, রাত হ'ল।

সিংহিদের বাগানওয়ালা বাড়ীটা থেকে পেটা ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দশটা বাজিয়া গেল। বাহিরে বরফওয়ালা 'চাই বরফ' হাঁকিতে হাঁকিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িল।

অরুণ উঠিল। রান্নাঘরের কাছে আসিয়া সে বলিল—আজকে কিন্তু আমার সেই কথাটা তোমায় রাখতে হবে বাপু।

কিরণ জিজ্ঞাসা করিল—কোন কথা ?

আমার পাতে বসে খেতে হবে একসঙ্গে।

আবার সেই পুরোন আবদার ? যত বলি খেতে নেই।

নেই কেন শুনি ? এই যে হিন্দু ছাড়া প্রায় সব দেশের মেয়েরাই বাপ, মা, স্বামী, ছেলে নিয়ে এক টেবিলে বসে একসঙ্গে খায়, তাদের কি পরকালে নরক ভোগ করতে হয় না কি ?

আমরা ত আর সেই দেশে জন্মাই নি। বাঙ্গালী হয়ে জন্মেছি, বাঙ্গালীর আচার ব্যবহার মানতেই হবে।

তা মানো না কেন, কে বারণ করছে কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারটায় কি আর এমন মহৎ দোষ হয়েছে ?

আছে একটা দোষ।

কি শুনিই না।

জান না মা বলতেন, একসঙ্গে খেলে তোমার আয়ু ক্ষয় হয় ?

আজ দুই বৎসর হইল অরুণের বিধবা মাতা স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হঠাৎ তাঁর কথা উঠিতেই অরুণের মনে অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। আহা, কিরণকে তিনি কি ভালটাই না বাসতেন। যেন নিজের পেটের মেয়ে। সে একদিন গেছে।

অরুণ বলিল—আমার কাছে ইংরিজি পড়লেও বাঙ্গালীর কুসংস্কারগুলো ভোলো নি তা হ'লে ?

এত কুসংস্কার নয়, এযে মার আদেশ—বলে কিরণ ভাত বাড়িতে লাগিল।

জায়গা করিয়া ভাত দিয়া কিরণ কহিল—বসো।

অরুণ হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, গলাটা যা শুকিয়ে আছে, আগে একটু ভিজিয়ে নিই নইলে বিষম খাব যে—বলিয়া সে কিরণের মুখখানা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া দাম্পত্য জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আদায় করিয়া লইল।

(ক্রমশঃ)

পল্লীপথে

শিল্পী—বি, মুখোপাধ্যায়।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১১ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩। [৩১শ সপ্তাহ

জলের আবেশে চাতক বাঁরয়ে
তেমনি আমরা হই।
তবে সে জীয়ই অধির রমণী
জলদ গতিক সেই॥

* * *
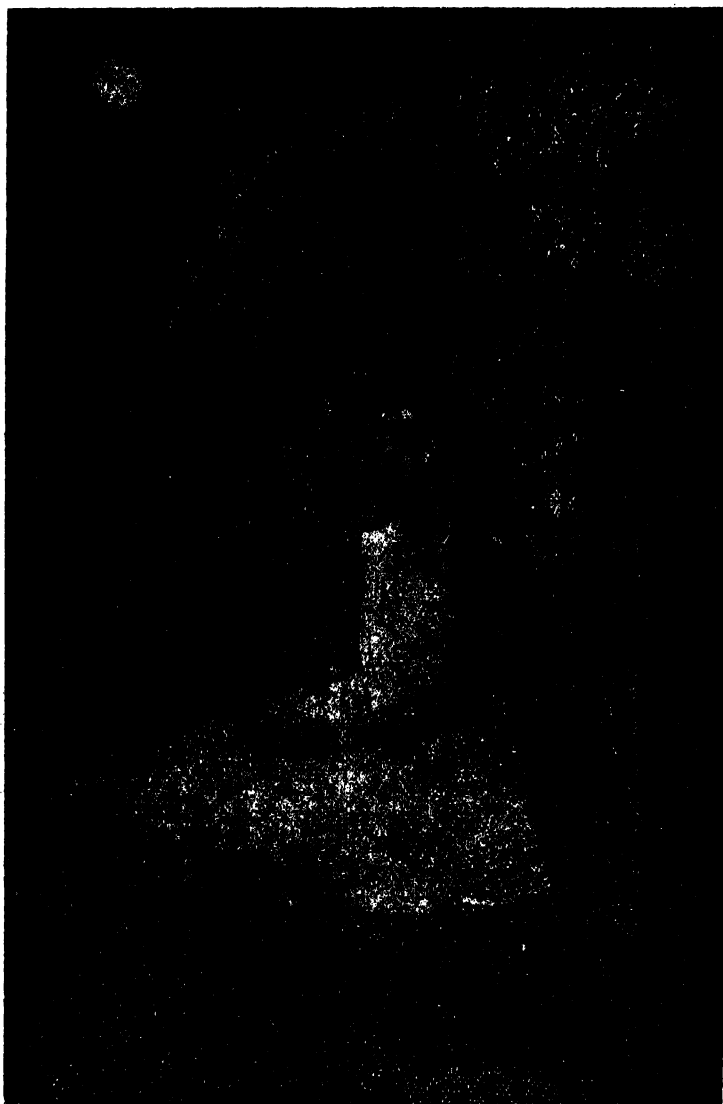
চাঁদ গগনে যদি তোরে পাই লাগি।
লোহার মুষলে ভাঙ্গিয়া তোমারে
করিমু শতেক ভাগি।

* * *

ব্যথার বাদল

[শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী]

সে এক বাদল-ব্যাকুল সাঁঝে তাকে হারিয়েছিলুম।

আজও সেই আষাঢ় নিবিড়-নীল মেঘের রথে ফিরে এসেছে, কিন্তু সে আমার পাশটীতে নেই! আজ এই বৃষ্টি-ধারার অশ্রান্ত ঝর্ঝর-গুঞ্জনের মাঝে একটী অতৃপ্ত তৃষাতুর আত্মার বুক চাপা রোদন-বিলাপ শুনতে পাচ্ছি···বৃষ্টি—সজল দম্‌কা বাতাস যেন তারই বুকের গুম্‌রে-ওঠা দীর্ঘশ্বাস!

তার নীলাম্বরী শাড়ীখানি ব্যাকুল আগ্রহে বুকে চেপে ধরলুম···বর্ষার রাতে এখানি পরতে সে বড় ভালবাসত! স্নিগ্ধ আঁধার রাতের মত এই শাড়ীখানি তার লঘু তনুলতা ঘিরে জড়িয়ে থাকত—এলোচুলের আড়াল হ'তে তার কাণের সোনার দুল দুটী বিজুলীর ক্ষণিক আভার মত দীপ্ত হান্‌ত।··· ওগো অভিমানিনী রাণী আমার! অশ্রুজলের মালা গেঁথে তুমি বিদায় নিয়েছিলে, আজ কিসের ছলে তোমায় আমার এ তৃষা-তাপিত বুকের মাঝখানে ফিরিয়ে আনব? মেঘের ওই মায়ালোক হ'তে তুমি চেয়ে দেখ, তোমারই স্মৃতির প্রদীপটী মনের মন্দিরে জ্বেলে এই ব্যর্থ বিরহ রজনী জাগছি ····

পাশের মেসের একটী ঘুমহারা উদাসী তরুণ বেহালায় সুরের সঙ্গে তার করুণকণ্ঠ মিলিয়ে নীরব তামসী-যামিনীকে কাঁদিয়ে দিচ্ছে—

"বঁধুয়া! নিদ্‌ নাহি আঁখি পাতে,
আমিও একাকী, তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে।"

যৌবন-ফাল্গুনের সেই সবুজ দিনগুলো বারে বারে মনের কোণে ভেসে উঠছে - বৃষ্টি-ভেজা কেতকী বনের গন্ধটুকুর মত...সেই অকারণ মান-অভিমান, হাসি-পরিহাস, এম্‌নি বর্ষা নিশীথে আমার বুকের পরে শরতের শিশির-ধোয়া শেফালির মত তার মুখখানি এলিয়ে দেওয়া—সে সব দিন-গুলোকে এখন মনে হয় যেন গত রাতের অলীক স্বপ্ন-মায়া!

মনে পড়ছে, শুভ-দৃষ্টির সময় সন্ধ্যা-তারার মত দুটী সরম-কুণ্ঠিত কালো আঁখি-তারার নম্র চাহনির সঙ্গে আমার বিমুগ্ধ দৃষ্টিটী মিলতেই সে কি মদির পুলকে আমার তরুণ প্রাণ মাতাল হ'য়ে উঠেছিল! ভাবলুম, পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনের পাটের আড়তের গরীব বিল সরকার আমি, আমার ভাঙ্গা কুটীরে এ নন্দনের পারিজাতটী মানাবে না।

হাঁ, যথার্থই সে নন্দনের শুভ্র পারিজাতটী ছিল—তেম্‌নি শুচি-সুন্দর, তেমনি সুরভি—আমার দৈন্য-মলিন ঘরখানা সে অপরূপ শোভা-সুষমায় উজল করে তুলেছিল।

আমার সংসারে শত অভাব অভিযোগের মাঝেও তার মুখের জ্যোৎস্না-মধুর হাসি-রেখাটুকু কোনদিন ম্লান হ'তে দেখিনি। প্রতিদিন সূর্য্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘর নিকানো থেকে সুরু করে ছেঁড়া কাপড় সেলাই করা পর্য্যন্ত সকল কাজই তাকে একলা করতে হ'ত; কিন্তু তার সমস্ত শ্রান্তি ছাপিয়ে একটী পরিপূর্ণ তৃপ্তির আভা সর্ব্বাঙ্গে উছ্‌লে উঠত।

আজ কেবলই মনে পড়ছে, আমি খেতে বস্‌লে, আমার পাশে বসে তার পাখা দিয়ে বাতাস করা, 'এটা খাও, ওটা ফেলে রেখ না' এমনিতর তার বার বার মমতা-ভরা অনুরোধ, আর চোখ দুটো ঠেলে একটা সজল হাহাকার বেরিয়ে আস্‌তে চাইছে...

কাজে বেরোবার সময় রোজ সে দরজা অবধি এগিয়ে এসে মিষ্টি হাসি-মুখে আমায় বিদায় দিত। পিছন ফিরে দেখতুম যতক্ষণ আমায় দেখা যায়, ততক্ষণ অবধি সে চেয়ে আছে আমার যাবার পথের পানে। আবার সন্ধ্যার গ্যাস-জ্বালা সুরু হলেই ফেরবার পথে দূর থেকে দেখতুম, ভাঙ্গা জানলার ফাঁকে তার পথ-চাওয়া আঁখিদুটী সন্ধ্যা-দীপের মত জেগে আছে—আমারই আসার আশায়।

তারপর জামা-কাপড় বদলে, মুখ হাত ধুয়ে আস্‌তে না আস্‌তেই সে তার নিপুণ হাতে মাজা ঝকঝকে থালায় পরিপাটী করে জলখাবার সাজিয়ে আমার সাম্‌নে ধরত—

তারপর দু'জনে মিলে সেই নিভৃত অবসরে সারাদিনের জমানো গল্পের উৎস খুলে বসতুম।

দিন কাটছিল—শরতের হাল্কা মেঘ-তরীর মত...ক্রমে বছর ঘুরে এল। চট-কলে বেশী টাকা মাইনের একটা কাজ পেয়ে হঠাৎ একদিন বিল-সরকারি কাজে জবাব দিয়ে বসলুম।

সে শুনে তার বিষণ্ণ চোখদুটী আমার মুখের ওপর তুলে ধরে বলল—"হ্যাগা, বেশী টাকায় আমাদের দরকার কি? কাজ নেই তোমার ওই চট-কলে গিয়ে···শুনেছি সেখানকার সঙ্গ খারাপ—"

আমি তার একখানি সুগোল হাত দিয়ে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে আদর-মাখা স্বরে বললুম—"পাগল হয়েচ রাণি! আমার সম্বন্ধ কাজের সঙ্গে, সেখানকার সঙ্গ আমার কি দরকার? আর তোমার এ হাত দুখানির বাঁধন ছেঁড়বার ক্ষমতা আমার নেই—"

হায় রে! তখন যদি জানতুম আমার ভাঙা ঘরের স্নিগ্ধ আলো-রেখাটুকু গ্রাস করতে গহণ-কালো অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে—একটা ক্রুর দানবের মত !···

চট-কলের কাজে ঢুকে দেখলুম যারা নিতান্ত অল্প মাইনে পায়, তাদেরও পকেট-ভরা টাকা সারাক্ষণ ঝমঝম্ করছে। প্রথমে এটা আমার কাছে হেঁয়ালীর মত দুর্ব্বোধ্য ঠেকলেও, এর সহজ পন্থাটা আবিষ্কার করতে দেরী হোল না - কাজে উপরি ছিল প্রচুর, তার ফলে আমারও শূন্য পকেট টাকার ঝমঝম্ শব্দে মুখর হ'য়ে উঠল।

এখানকার লোকদের জীবনের প্রধান উপভোগ্য ছিল মাত্র দুটী জিনিষ—সুরার পেয়ালা, আর নারীর রূপ। শুধু জঘন্য প্রমোদ বিলাসের আহুতি দিয়ে লালসার লেলিহান অগ্নি-শিখাকে পরিতৃপ্ত করা—ব্যস্...এই তাদের জীবন! পশুর জীবনের সঙ্গে কোন প্রভেদ নেই।

প্রথম দিন কতক তাদের ঘৃণিত সঙ্গ আমি যথাসাধ্য এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতুম—তারা ঠোঁটের কোনে একটু ব্যঙ্গের হাসি চেপে রাখত। কিন্তু প্রলোভনের রঙিন মোহ আমায় আগুনের রূপে মুগ্ধ পতঙ্গের মত একটু একটু করে আকর্ষণ করছিল...কি অপরাজেয় সেই আকর্ষণ! তার কাছে যে অহঙ্কার করে বলেছিলুম—"লোকের সঙ্গে আমার দরকার নেই—"সে অহঙ্কার ধূলোয় লুটিয়ে পড়ল, যেদিন সঙ্গীদের অনুরোধে অনিচ্ছাসত্ত্বেও মদের গেলাসে একটি চুমুক দিলুম।

মদের সেই সর্ব্বনাশা নেশা ক্রমে ক্রমে 'অক্টোপাশের' মত আমাকে জড়িয়ে ধরল...দুটো মাসও ফুরোলো না, আমি সেই নিত্য নব-ফুলের মধু-পিয়াসী ভ্রমরদলের একজন প্রধান হ'য়ে উঠলুম।

তার মুখের হাসির জ্যোৎস্নার ওপর মেঘের ছায়া পড়ল।

নেশা ছুটে গেলেই রোজ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করতুম—এ নরকের পথে আর পা বাড়াব না...কিন্তু পরদিন সঙ্গীদের ডাকে কোথায় ভেসে যেত সেই প্রতিজ্ঞা! তার দুটী চোখের মৌন মিনতি উপেক্ষা করে তাদের সেই কুৎসিৎ খেলো-রসিকতায়, পঙ্কিল আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতুম।

মাসের শেষে মাইনে পেয়ে যখন মদের দোকান থেকে বাড়ী ফিরতুম, তখন পকেটে যে ক'টা টাকা পড়ে থাকত তাতে দুটো লোকের পোনেরো দিনও খাওয়া চলে না। আমার ভাতের থালায় তার কোন পরিচয় পেতুম না বটে, কিন্তু একদিন লক্ষ্য করেছিলুম, শুধু দু'গাছি কল্যাণশঙ্খ ছাড়া তার হাতে আর কিছু নেই!

নির্লজ্জের মত জিগ্যেস করলুম—"তোমার হাতের সোনার চুড়িগুলো গেল কোথায়?" একটুখানি মলিন হাসি হেসে সে বলেছিল—"ময়লা হ'য়ে গ্যাচে, তাই তুলে রেখে দিয়েচি—"

তখন বুঝিনি, যে তার হাসিটুকুর আড়ালে ব্যথা-ক্ষত মরমের অশ্রুর বন্যা লুকিয়ে ছিল!

সেই জীর্ণ একতলা বাড়ীটাও আমাকে ছাড়তে হোল—তিন মাসের ভাড়া বাকী পড়েছিল। সহরতলীতে একটা জঘন্য পল্লীর মধ্যে একখানা খোলার ঘর ভাড়া নিলুম। সে একবার কুণ্ঠিত হ'য়ে বলেছিল—"এ পাড়ায় একলা থাকতে কেমন ভয় করে—"

ঝাঁঝালো রুক্ষস্বরে জবাব দিয়েছিলুম—"আমার সংসারে বড়মানুষি পোষাবে না—বাপের বাড়ী থেকে যে একটা পয়সাও আনে নি, খোলার ঘর দেখে নাক সিঁটকানো তার সাজে না—"

তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি ব্যথার ছায়ায় ম্লান হ'য়ে এল…হয় তো বুকের ভেতর একটা দীর্ঘশ্বাস গুম্‌রে উঠেছিল…

তারপর—তারপর এ অভিশপ্ত জীবনের যে অধ্যায়টী অশ্রুজলের মত করুণ, শুধু সেই শেষটুকু বাকি আছে…

সেও আষাঢ়ের এম্‌নি এক বাদল-বেলা ; মেঘ-মেদুর আকাশের কাজল আঁকা নয়ন অশ্রু-বরষায় ছলছল করছিল।

কল সেদিন বন্ধ ; এমন বাদ্‌লায় স্যাঁৎসেঁতে ঘরের কোনে বসে ছুটীটা বাজে খরচ না করে, মোতিয়ার বাড়ীতে আসর জমানো যাক্‌—এই ভেবে আমি বেশভূষায় মনযোগ দিলুম। সে আস্তে আস্তে জিগ্যেস করল—"আজকে তো ছুটী বললে, তবে আবার কোথায় বেরোচ্ছ ?"

রূঢ়ভাবে বললুম—"তোমার তাতে দরকার কি ? সব কথার কৈফিয়ৎ দিতে আমি রাজী নই"

সে হঠাৎ নত হ'য়ে বসে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কান্না-করুণ সুরে বলে উঠল—"তোমায় মিনতি গো, তুমি ফেরো…আমরা ভিক্ষে করে খাব, সেও ভাল—আর সর্ব্বনাশের পথে এগিয়ে যেও না।"

বিরক্তি তীব্রকণ্ঠে বললুম,"পা ছাড়ো—ও সব নভেলিয়ানা ঢলাঢলি বাজারে গিয়ে ক'রো, এখানে নয়—"

বুকের ভেতর যেন হাতুড়ির ঘা'র মত কঠিন আঘাত পেয়ে সে বিবর্ণমুখে স্তব্ধ হ'য়ে রইল।…এখন বুঝতে পারি, অধঃপতনের কতদূর নিম্নস্তরে নাম্‌লে পরে, ওই সব কুৎসিৎ কথাগুলো মুখ দিয়ে বেরোয় !

মোতিয়ার ঘরে যখন ঢুক্‌লুম, তখন সুরার পেয়ালা আর ঘুঙুরের শব্দে বর্ষা-আসর দিব্যি জমে উঠেচে। আমায় দেখে মাতালগুলো উল্লসিত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠল—"এস দাদা এস, তুমি না থাকলে কি ফূর্ত্তি জমে ?"

কি জানি কেন মাতালদের এই হল্লা, অট্টহাসি সেদিন কাণে ভারি বিশ্রী কর্কশ শোনাচ্ছিল…একখানা ব্যথা-ম্লান মিনতি কাতর মুখ আর অশ্রু-ছলছল্ দুটী চোখ থেকে থেকে বুকের মাঝে কাঁটার মত বিঁধছিল। দমে-যাওয়া মনটাকে প্রফুল্ল করে তোল্‌বার জন্য পেয়ালার পর পেয়ালা মদ নিঃশেষ করতে লাগলুম—কিন্তু নাঃ, মদও বিস্বাদ ঠেকল ! উঠে পড়লুম সঙ্গীরা বিস্মিত হ'য়ে বলে উঠল—"এরি মধ্যে চল্‌লে কোথায় ?"

"ভাল লাগচে না" বলে আমি সেই বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম—সেখানকার বিষাক্ত হাওয়াটাও আবার অসহ্য লাগছিল !

বাড়ী ফিরে এসে বন্ধ দরজায় বারকতক ধাক্কা মারলুম, কোন সাড়া এল না—চারিদিকে নির্জ্জন পোড়ো-বাড়ীর মত অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ! বুকটা উৎকণ্ঠায় কেঁপে উঠল…জীর্ণ দরজাটায় সজোরে একটা লাথি মারতেই খিলটা ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলুম কেউ নেই—খুঁজতে খুঁজতে কলতলায় গিয়ে বাক্‌হারা স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম—মনে হোল পায়ের নীচে মাটিটা প্রবল ভূমিকম্পের দোলায় টলমল করচে—বাদল-সাঁঝের সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখলুম, শ্যাওলা-পড়া পিছল উঠোনে কয়েকটা বাসনের পাশে তার রক্তাক্ত দেহখানি লুটিয়ে পড়ে আছে—রক্ত-চন্দন-মাখা ফুলের মত !

পাগলের মত আমি চীৎকার করে উঠলুম—"অভিমান করে চলে গেলে রাণী ! ক্ষমা চাইবার অবসরটুকুও দিলে না ? চেয়ে দেখ আমি আজ ফিরে এসেছি…"

দমকা হাওয়া হা হা করে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ করে গেল !

ভুল

[শ্রীসুবোধচন্দ্র সিংহ]

সন্ধ্যা তখন ধীরে ধীরে নেমে আসছিল ধরণীর বুকের উপর। অচেনা বন পাখীরা সবুজের দেশের গান গেয়ে গেয়ে চলে যেতে যেতে সারা বিশ্বে একটা নব জাগরণ এনে দিয়ে গেল।

ঐ আলো ছায়া গগন প্রান্তে দু' একটি করে জ্যোৎস্না ফুটে উঠবার সাথে সাথে সলিল তার চির-পরিচিত স্থানটিতে এসে উপস্থিত হ'ল।

পূবাকাশের অন্তরাল হতে পূর্ণিমার চাঁদ উঁকি মেরে সলিলের প্রাণখোলা সুমিষ্ট স্বর লহরী শোনবার জন্য আগ্রহান্বিতা হয়ে ক্রমে ক্রমে তার রূপের দীপ্তি ভুবনময় ছড়িয়ে দিল।

নীলাকাশের পশ্চিম কোণের বড় তারাটি হঠাৎ জ্বল জ্বল করে ফুটে উঠে বোধ করিবা সলিলের দিকে প্রেমোৎপল দৃষ্টিতে চাইছিল—তার স্নিগ্ধ মাধুর্য্যটুকু সাথে লয়ে।

সরু নদীটির ছোট্ট পুলটার রেলিংএর উপর ব'সে নদীর কালো জলের দিকে চেয়ে তার ছলছল কলকল তানের সহিত সমতাল রেখে সলিল গাইছিল মুক্ত আনন্দময় কণ্ঠে। দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু তার নবীন গণ্ডদেশের উপর প'ড়ে চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করছিল।

কাল তার বিবাহ। সে যাকে বাল্যকাল হতে দেখে এসেছে—চির স্নেহমথিত হৃদয়ে, যৌবনের প্রারম্ভে যার রূপ জ্যোৎস্নায় মোহিত হয়ে গিয়ে নিজের প্রাণ অজ্ঞাতে হারিয়ে ফেলেছে—তাকে সে যে কালিকার মধু যামিনীতে চাঁদের আলোর মাঝে জয় করে আনতে যাবে।—সেই চিন্তায় কি একটা বিপুল উদ্দাম পুলক তার প্রতি শিরায় শিহরণ এনে দিচ্ছিল।

* * * *

স্বর লহরী তার থেমে গেছে। শুধু বিশ্বের নীরবতার মাঝে তার প্রাণের আকুল চাওয়া প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল কত শত সুখ সম্মিলনী চিন্তার আশ্রয় নিয়ে।

চন্দ্রিমা আকাশের গা অবলম্বন করে অনেকখানি উপরে উঠে এসেছে। পশ্চিম গগনের শুভ্র তারাটি গগন প্রান্তে নেমে যাই যাই করে কাঁপছিল—কি একটা ভীতি মিশ্রিত বেদনা লয়ে।

সলিল গৃহে ফিরবার জন্য নেমে দাঁড়াল। তার বুকখানা কেঁপে উঠল গ্রাম্য পথটির পানে চাইতে। ঐ পথের উপর দিয়া আগমনশীলা মূর্ত্তিটির দিকে সে বিস্ফারিত ভীতি-মিশ্রিত নয়নে চেয়ে রইল—তার অধর দাঁত দিয়ে চেপে ধ'রে। জ্যোৎস্নার আলোয় সে মূর্ত্তিটি রমণীয় বলে তার মনে হ'ল। তার হৃদয়ে একটা সন্দেহ মিশ্রিত ভীতির সঞ্চার হ'ল। সে যেন এই রমণীকে একটু ভাল রকমেই চেনে। কি একটা বলবার জন্যে সে চেষ্টা করলো—কিন্তু কণ্ঠ দিয়া কোনও স্বর পবন হিল্লোলে মিশল না।

আগমনশীলা রমণী গ্রাম্যপথ পরিত্যাগ করে নদীকূলের দিকে নেমে যেতে লাগলো, সলিল তার দৃষ্টি নিমেষের জন্যও সেই রমণীর দিক্ হতে ফিরাতে পারল না।

তার ভীতি মিশ্রিত বিস্ময় টুটে গেল তখন, যখন তার উৎসুক কাণে এসে বাজল একটা করুণস্বর—আর সেই রমণীর নদীর জলে পতনোত্থিত শব্দ।

সে নিমেষে নিজেকে ঠিক্ ক'রে নিয়ে নদীতটের নিম্নে ছুটল ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে। অসমতল ভূমির উপর তার ঈষৎ কম্পিত পদদ্বয় অস্থির ভাবে দৌড়াচ্ছিল। কি একটা পায়ে লাগাতে সে পড়ে গেল—তার কপোলদেশের কোণটা কেটে গিয়ে ঝর ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে উঠে পুনরায় তার লক্ষ্য স্থলের দিকে অগ্রসর হল।

চাঁদের আলোয় শুভ্র বস্ত্রখানার কিছু কিছু তখনও জলের

উপর দেখা যাচ্ছিল। সলিল ত্বরিতে স্রোতস্বতীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল!

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে একটি অসাড় দেহলতাকে নিজের বুকের মাঝে নিয়ে নদীতটের উপর উঠে পড়ল।

চাঁদের আলোয় সারা বিশ্ব তখন হাসছিল। শুধু রেবার অস্পন্দিত মুখ-কমলের উপর পড়ে তার দীপ্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছিল

সলিল বেদনামিশ্রিত নয়নে রেবার অস্পন্দিত মুখপানে চেয়ে চেয়ে তার সংযমের বাঁধ হারিয়ে ফেলছিল—তার বুক ফেটে করুণ-কান্না ঝরে পড়তে চাইছিল

রেবার দেহলতা একটু নড়ে উঠল—ভুরু একটু সঙ্কুচিত হ'ল সলিলের আঁখিতে আশার সঞ্চার হ'ল।

সে ধীরে রেবার বাহু দুটিতে মৃদু স্পন্দন দিয়ে ডাকল ব্যাকুল কণ্ঠে—রেবা—রেবা।

রেবার আঁখি দুটি করুণ প্রভাতের ন্যায় ধীরে ধীরে খুলে এল। বিস্ময়ের চিহ্ন তার নয়নে প্রকাশিত হ'ল। তার একটি হাত ধীরে ধীরে তুলে সলিলের কণ্ঠে লগ্ন করে সে তার মাথাটা একটু উঁচু করল। সলিল তার বাহু দিয়ে রেবার ক্লান্ত মাথাটিকে ধরে রেখে অপর হাত দিয়ে রেবার আলুলায়িত ভিজা চুলগুলি মুখের উপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে ডাকল—রেবা।

রেবা কেঁদে ফেললে। অবসাদগ্রস্ত ক্ষীণকণ্ঠে সে বলল—আমায় বাঁচালে কেন? আমি মরে গেলেই যে আমার জীবনের সকল জ্বালার অবসান হতো। সে তার মুখটা বুকের দিকে নীচু করল। দুই গণ্ড প্রবাহিত করে কান্না তার বুকের উপর এসে পড়তে লাগল।

সলিল ধীর কণ্ঠে জিজ্ঞাস্ করলে—"জীবনের এত সুখ সাধ আহ্লাদ ছেড়ে মরবার এত ইচ্ছা হ'ল কেন রেবা।

রেবার গ্রীবাদেশ তখনও সলিলের বাহুর উপর ন্যস্ত ছিল। বক্ষ তার ফুলে ফুলে কেঁদে উঠছিল। সে উত্তর করল—

কেন? কেন?—তা কি তুমি জাননা? কাল যে আমার বিয়ে—যাকে আমি.........

"বিয়ে? সে ত ভাল—এতে তোমার অমতের কি থাকতে পারে রেবা?"

"তোমার কাছে আমার কিছু গোপন থাকতে পারে না। আমি একজনকে—ভালবাসি। যদি তার সঙ্গে আমার জীবন এক না হ'ল তবে এ মিথ্যা খেলার জীবনে কি লাভ?

সলিলের বুকখানা ভীষণ ভাবে দুলছিল। একি—একি কথা—রেবা সে চায় অপরকে—ভালবাসে অপরকে—ছিঃ—কি লজ্জা—কি নিদারুণ অপমান। বেদনায় তার অন্তর প্রদেশ নিস্তব্ধ হ'য়ে আসতে চাইছিল। সে তার বাহুতে বড্ড বেশী ব্যথা অনুভব করছিল—রেবার ভার তার আর সহ্য হচ্ছিল না। সে নিজের গোপন ব্যথা সম্বরণ করে জিজ্ঞাস্ করলে কয়েক মুহূর্ত্ত পরে—কে সে রেবা? কাকে তুমি ভালবাস?

রেবার মুখকমল লজ্জারুণ হয়ে উঠল। সে একবার নীল আকাশের রাণীর দিকে চেয়ে তারপর সলিলের মুখের উপর পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করে বিষাদ কণ্ঠে বলল—

তোমায়—তোমায়!

তবে ডুবে মরবার জন্যে এসেছিলে কেন? আমায় শীঘ্র বল—আমায় সংশয়ে রেখো না রেবা। আমার সঙ্গেই ত' তোমার কাল বিবাহ হবার কথা—এ ত' সকলেই জানে—তুমি কি তা জানতে না রেবা?

অ্যা তোমারই সঙ্গে—তবে—তবে বৌদি বল্ল......উঃ কি সাংঘাতিক ভুলটাই না করছিলুম।

হাঁ বড্ড ভুল করছিলে রেবা—আমায় তুমি চির জনমের মতন——

ও কি? তোমার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে যে।

ও কিছু না—প্রেমের পরশ পেলে ও সকলের দুঃখ কষ্ট কিছুই মনে থাকবে না।

রেবা তার কম্পিত অধর দিয়ে সলিলের গণ্ডদেশের উপর ঝরে পড়া কপোলদেশের রুধির মুছিয়ে দিল।

পশ্চিম গগনের বড় তারাটি হেসে ডুবে গেল ধরার বুকে।

প্রত্যাবর্ত্তন

(বড় গল্প)

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

কিরণ নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল—বাবাঃ, তোমার কিছু বাদ পড়বার যো নেই।

খাইতে খাইতে অরুণ কহিল—আচ্ছা, এই যে তোমায় চুমু খেলুম, এতেও আমার আয়ুক্ষয় হওয়া উচিত !

ষাট্—ষাট্ অমন কথা মুখে এনো না।

কেন এর বেলায় বুঝি সাতখুন মাপ ?

আহা ও হচ্ছে আলাদা জিনিষ, দাম্পত্য জীবনের একটা অঙ্গ। আর এটা বুঝতে পারছ না কেন ? এঁটো খাওয়ায় ত আপত্তি নেই, আপত্তি হচ্ছে এক পাতে বা একসঙ্গে বসে দুজনে খাওয়া। এই ধর না, রাত্রে দু'জনে শুইত ? তোমার গায়ে ত কত পা লাগে আমার, কিন্তু তাই বলে কি অন্য সময়ে তোমার শরীরে পা ঠেকাতে পারি ? বাপ্ রে !

অরুণ খাইতে খাইতে বলিল—কে জানে বাপু তোমাদের কোনটা নিয়ম আর কোনটা অনিয়ম বোঝবার যো নেই।

দুধের বাটীটা পাতের কাছে আগাইয়া দিয়া কিরণ বলিল—দেখ আজ আমায় একটা পুরস্কার দিতে হবে কিন্তু।

কেন ?

আজকে 'ইষ্টলান' খানা শেষ করেছি, তুমি বলেছিলে শেষ হলে একটা পুরস্কার দেবে।

ওঃ তা তবু ভাল। আমি ভেবেছিলুম বুঝি ওটা শেষ হতে এ বছরটা যাবে।

আহা, মোটে ত পনেরো দিন বইটা ধরেছি। তাও কি সব দিন দুপুরবেলা পড়তে পাই নাকি ? বোনা আছে, সেলাই আছে, সংসারের আরও কত কাজ রয়েছে।

অরুণ কটাক্ষপাত করিয়া হাসিয়া অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করিল—তা বেশ আজকে বিছানায় শুয়ে পুরস্কারটা ভাল করেই পাবেখ'ন।

যাও তোমার সব তাতেই ঠাট্টা। আমি কি ভেবে বললুম, আর উনি কি বলছেন।

কি ভেবে বললে, বলেই ফেল।

ষ্টারে আজকাল রবিবাবুর বই দিচ্ছে জান ত ?

ওঃ বুঝেছি, তা বেশ ত ! আজ ত হ'ল না, আসছে শনিবার যাওয়া যাবে।

কিরণের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বলিল—এত শীঘ্র যে তুমি রাজী হবে তা ভাবি নি।

অরুণ হাসিতে হাসিতে বলিল—বাঃ Promise is Promise. ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। কথা যখন দিয়েছি তখন—

কিরণ হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, তা বলে দুধটা ফেলে রাখতে হবে না, ওটুকু খেয়ে নিন্ মশাই।

দেখ ভদ্রলোক হলেও দয়িতার নিকট মশাই সম্বোধনে আমার আপত্তি আছে।

আপত্তি আছে ত রয়েই গেল। সত্যি ফেলে রেখ না, খেয়ে ফেল দুধটুকু।

তোমার জন্যে প্রসাদ রাখছি দেখছ

তোমার পাতে খেলেই প্রসাদ খাওয়া হবেখ'ন, লক্ষ্মীটি খেয়ে নাও।

জল খাইয়া উঠিবার সময় অরুণ বলিল—টাকার জন্যে কোন সখই মিটল না আমার। কত আশাই না করেছিলুম কিছুই হ'ল না, এই দেখ না থিয়েটারে যাব, তা তুমি বসবে ওপরে, আমি বসব নীচে। টাকা থাকলে বক্স ভাড়া করে দুজনে একসঙ্গে বসে দেখতুম।

কিরণ কহিল—আচ্ছা এখন আর টাকার ভাবনা ভাবতে হবে না। টাকার চেষ্টাতেই শরীরটা মাটী করবে দেখছি।

সাধে কি করি, তুমিই ত সেদিন 'রমলা' পড়তে পড়তে দেখাচ্ছিলে গো—

'Money, Money, Money,
Brighter than sun-shine
Sweeter than honey!'

কিরণ গম্ভীর হইয়া বলিল—আচ্ছা সে ভাবনা পরে হবেখ'ন, এখন একটু জিরোও গে দেখি আমি এখুনি সব চুকিয়ে আসছি, এই নাও পানের ডিবে।

ডিবে হাতে লইয়া অরুণ কহিল যাই একলা বিরহে বিছানায় ছটফট করি গিয়ে, কিন্তু

আবার কিন্তু কি?

পেটের ভাত হজম হবে যে, হজমি গুলি কৈ? আমার রোজকার পাওনা তুমি ভুলতে পার, আমি ভুলব কেন শুনি?

এতও জান তুমি বাপু, বলে কিরণ এগিয়ে এল।

আর একবার তাহার অধর হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া অরুণ শুইবার ঘরে আসিয়া বিছানায় শুইয়া পাণ চিবাইতে লাগিল।

খাইয়া দাইয়া সব চুকাইয়া কিরণ যখন আসিয়া শুইল তখন এগারোটা বাজিয়া গিয়াছে। অরুণ জাগিয়াই ছিল। পাখার হাওয়ায় চিমনিটা নিভাইয়া দিতেই এক ঝলক চাঁদের আলো জানলা দিয়া বিছানাময় ছড়াইয়া পড়িল।

কিরণ বলিল—বাঃ কি সুন্দর জ্যোৎস্না!

অরুণ কহিল—আর এই সুন্দর জ্যোৎস্নায় রূপের রাণী আমার সোণামণির মুখখানি গোলাপ ফুলের মত কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে।

যাও তুমি ভারী দুষ্টু, বলে কিরণ অসীম নির্ভয়ে স্বামীকে দুই হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ গুঁজিয়া শুইল। দূর থেকে একটী সঙ্গীহারা কোকিলের অশ্রান্ত বিরহ কাতর 'কু কু' রব ভাসিয়া আসিতেছিল। তাহাই শুনিতে শুনিতে দুইজনে বক্ষোসংলগ্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দুষ্ট সরস্বতী অরুণের উপর যথেষ্ট কৃপা-দৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, তারই জোরে সে সম্মানের সহিত অনেকগুলি পাশ করিয়া ফেলিয়াছিল লক্ষ্মীর সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রীর সম্বন্ধটা নাকি ভিন্ন রকমের। তাই তাঁর অনুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা যে অরুণ অর্জ্জন করিতে পারে নাই তাহা সে বুঝিতে পারিল যখন সে দরিদ্রতার শেষ সীমানায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বিধবা মায়ের সামান্য পুঁজিপাটা ও নিজের অর্জ্জিত জলপাণির সাহায্যে সে এতদিন পড়াশুনা চালাইয়া আসিয়াছে। এরি মধ্যে কয়েক বছর আগে মায়ের একান্ত অনুরোধে পাড়াগাঁ হইতে তিনকুলহারা দরিদ্রা কিরণকে সে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য ইহাতে তাহার অমত ছিল না। কেন না চেষ্টা করিলে সে যে এক অর্থবান ধনী শ্বশুরের কন্যাকে জীবন সঙ্গিনী করে দারিদ্র্যের কথঞ্চিৎ অপশম করিতে পারিত না এমন নয়। কিন্তু শ্বশুরের অর্থে নবাবী করার চেয়ে গাছতলায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করাটাও তার মতে গৌরবের সামগ্রী ছিল। তাহার এক বন্ধু এক ধনী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল। বন্ধুটী আগে তাহারই মত পণপ্রথার ঘোরতর বিরোধী ছিল কিন্তু কার্য্যকালে পঞ্চ সহস্র মুদ্রার প্রলোভন সে দূর করিতে পারিল না। পণটী গোপনে আদান প্রদান চলিয়াছিল বলিয়া বন্ধু সগর্ব্বে মাঝে মাঝে প্রচার করিত—'আমি যে বিয়েতে টাকা নিয়েছি তা তোমরা দেখেছ?' অরুণ উত্তরে হাসিত, জবাব দিত না কেন না ব্যাপারটী সে ভাল করিয়াই জানিত। কাজেই বৃথা তার সত্যাসত্য যাচাই করে সময় নষ্ট করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না। যে ব্যক্তি আগে কোঁচার খুট গায়ে জড়াইয়া রাস্তায় বাহির হওয়া লজ্জার বিষয় ভাবিতে পারিত না, বিবাহের পরে সেই লোক আদ্দির পাঞ্জাবী, কোঁচান কালাপেড়ে ধুতি ও পাম্প্‌সু না পরিয়া বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। দেখিয়া অরুণের লজ্জা করিত। কিন্তু এ ত তুচ্ছ ব্যাপার। বন্ধুবরের সংসারে কোন অসুখ-বিসুখ বা বিপদাপদ উপস্থিত হইলে শত অসুবিধার মাঝখানেও যখন বাড়ীর বউ পিতৃভবনে প্রস্থান করিত তখন বরপক্ষের কিছু বলিবার থাকিত না। পঞ্চ সহস্রের এমনি মহিমা! তা ছাড়া তত্ত্ব ও সাময়িক উপহারের নামে প্রতি মাসে শ্বশুরের নিকট হইতে যে রাজ-সম্ভোগ আসিয়া উপস্থিত হইত তাহা পাছে বন্ধ হয় অথবা

রোষবশে কন্যা পাঠাইতে পাছে তিনি অস্বীকৃত হইয়া বসেন এই ভয়ে বাড়ীর কাহারও নব বিবাহিতা এই বধূটির উপর উচ্চ একটা কথা বলিবারও অধিকার ছিল না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া ধনী শ্বশুরকুলের উপর একটা অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা আসিয়া অরুণের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তাই সে মায়ের আদেশে গরীব হইলেও রূপসী কিরণকে বিবাহ করিয়া যখন তাহার গুণের সম্যক পরিচয় পাইল তখন অন্যান্য বন্ধুদের সহিত তুলনা করিয়া তাহার মন এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ও গর্ব্বে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তবে উপার্জ্জনক্ষম হইয়া বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা তাহার ভঙ্গ হইল দেখিয়া অরুন কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু কি করিবে? জন্মাবধি সে মায়ের কোন কথাই—তা সে যতই তুচ্ছ হউক, অবহেলা করিতে পারে নাই। তাঁহার আদেশ পালন করিতে সে নিজের প্রাণ অবধি বিসর্জ্জন দিতেও পশ্চাৎপদ ছিল না। মা যাহা ভাল বুঝিতেছেন, যাহাতে সুখ, আনন্দ পাইবেন বলিয়া অগ্রসর হইয়াছেন তাহাতে অরুণের সাধ্য নাই বাধা দিবে। আহা মা যে চিরদুঃখিনী।

পাশ করিয়া সংসারের কুটীল ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া লক্ষ্মী-লাভের আশায় হতাশ হইয়া অরুণ দেখিল ত্রিশ টাকা মাইনের কেরাণী গরি ছাড়া বিধাতা তার ভাগ্যে অন্য কিছু লিখেন নাই। তাই সই! সে এক মার্চ্চেণ্ট আফিসে ঐ মাইনেতেই লাগিয়া গেল। কিন্তু পুত্রের উপার্জ্জন বিধবা মায়ের বেশীদিন ভোগ করিতে হইল না। বিবাহের বছর দুই পরে এক ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্রাবণ নিশীথে অশ্রান্ত বারিধারার ভিতর ইহকালের সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বামীর পাশে মিলিত হইবার জন্য মাতা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

যে পাড়াগেঁয়ে মেয়েটীকে গৃহে আনিয়া মা আপনার মেয়ের মত সযত্নে শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন অরুণ দেখিল সেই মেয়েটী সংসারের সকল ঝক্কি এক নিমেষে মাথায় তুলিয়া লইয়া নীরব হাসিতে স্বচ্ছন্দে সমস্ত কাজ আগেকার মতই সুসম্পন্ন করিতে লাগিল। মা'র মৃত্যুতে প্রথমটা অরুণ খুবই আঘাত পাইয়াছিল। কিন্তু কালের গতিতে এবং কিরণের সহৃদয় ব্যবহার, অসাধারণ স্বামীসেবা ও সর্ব্বদা হাসি হাসি মুখখানির বিনয় নম্র কথাবার্ত্তায় অরুণের মন এক নতুন শান্তিতে ভরিয়া উঠিল। স্ত্রীর নির্ম্মল ভালবাসায় তার প্রাণ আবার নূতন প্রীতিতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল।

একখানি ভাড়াটিয়া বাড়ীর তিনখানি ঘর নিয়ে অরুণ কিরণকে লইয়া থাকে। বাড়ীর অপর অংশটা পৃথক, সেখানে অন্য একটী ভদ্রলোক সপরিবারে বাস করেন। মাঝে আসা যাওয়ার পথ আছে। অরুণ যখন বাড়ী থাকে না তখন কিরণ হয় ও বাড়ী গিয়া বধূদের সঙ্গে গল্প করে নয় তারাই এসে কিরণকে নিয়ে গল্পে মাতে।

পাঠাবস্থায় অরুণের মনে অনেক রঙ্গীন স্বপ্ন গড়িয়া উঠিত। সে কতরকম আশার জাল বুনিয়াছিল কিন্তু টাকার অভাবে কোন সখই সে মিটাইতে পারে নাই। দারিদ্র্যের কবলে এই তরুণ দম্পতীর দিনগুলি কোনক্রমে চলিয়া যাইতেছিল।

সেদিন কিসের একটা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে আফিসের ছুটী ছিল। অরুণ চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। সহস্র অভাব ও অনাটনের ভিতরও অরুণের লেখাপড়ার অভ্যাসটা যায় নাই। একটু সময় পাইলেই সে বই লইয়া বসিত—তা সে খবরের কাগজই হোক্, সাহিত্যই হোক আর নভেলই হোক। দিন রাতের ভিতর খানিকটা সময় তার লেখাপড়ার জন্য স্বতন্ত্র করা ছিল। কিরণকেও সে আজ অবধি প্রত্যহ পড়াইয়া আসিতেছে। শিক্ষিত স্বামীর টিউসনিতে কিরণ এ কয় বছরে অনেক কিছুই শিখিয়া ফেলিয়াছিল।

রান্নাঘরে ঝোলটা সাঁতলে রেখে হাত ধুয়ে কিরণ অরুণের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল খবরের কাগজ পড়ছ?

হাঁ৷ কেন?

না, সেই যে তুমি কি ছাই টিকিট কিনেছিলে তার খবর আজকে বেরুবার কথা না?

অরুণ হাসিয়া বলিল—ওঃ, তাই তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে ছুটে এসেছ জানতে? যাক্ টাকাটা যে জলে ফেলে দিই নি, তা এখন তুমিই স্বীকার করছ দেখে সুখী হলুম।

কখন স্বীকার করলুম আবার?

মুখে স্বীকার না করলেও মনের কথা কাজে প্রকাশ পায়

তা বুঝি জান না? কিন্তু আজকে ত নয়, সে ত কালকের খবরের কাগজে বেরুবে।

বেরুক্ গে যবে হয় আমি জানতে চাই না, নিজে অন্যায় করে আবার আমায় দলে টানা হচ্ছে, পুরুষ ত নয়—

কাপুরুষ, কি বল?

তা নয়ত কি? বলে মুখ টিপে হেসে কিরণ চলে যাচ্ছিল, অরুণ ডাকিয়া কহিল—অমন বিদ্যুতের মত চমকে আবার অন্তর্দ্ধান হচ্ছ কেন? এই চেয়ারটায় একটু বসে খবরের কাগজটা পড়ে শোনাও না গা।

যা বলেছ, খবরের কাগজ পড়ে শোনাবার সময়ই বটে। ভাত চড়িয়ে এসেছি, পুড়ে যাক্ আর খবরের কাগজ খেয়ে আজ পেট ভরুক্—বলিয়া অরুণের প্রতি দুষ্টুমিভরা চাউনি হানিয়া চঞ্চল পদবিক্ষেপে কিরণ প্রস্থান করিল।

আদত খবরগুলি পড়া হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞাপনের Wantedএর কলমটা অরুণ চোখ বুলাইতে লাগিল। প্রত্যহ সে এই পাতাটা ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখে যদি কিছু অর্থ সন্ধান মিলে। অন্যদিনের মতই আজও সেই পাতাখানি তন্ন তন্ন করিয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ নিম্নের নূতন বিজ্ঞাপনটী পড়িয়া একটা ক্ষীণ আশার জ্যোতিতে তার প্রাণ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিজ্ঞাপনটী এইরূপ :—

"একটী মেধাবিনী ছাত্রীর জন্য একজন শিক্ষিত প্রাইভেট টিউটর প্রয়োজন। বি-এ বা এম্-এ পাশ হওয়া চাই। প্রশংসাপত্রসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় সত্বর আবেদন করুন।"

বিজ্ঞাপনটী অরুণ দুই তিনবার ভাল করিয়া পড়িল। এটী যে আজকে নতুন দেওয়া হইয়াছে তাহা নিশ্চয়, কেন না কালকের অবধি খবরের কাগজে এ বিজ্ঞাপন সে পড়ে নাই। ঠিকানাটী ভাল করিয়া মুখস্থ করিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। একটা জামা কাঁধে ফেলিয়া জুতোটা পায়ে দিয়া অরুণ রান্নাঘরের কাছে আসিয়া ডাকিল—কিরণ, শোন শোন, ভারী একটা মজার খবর আছে।

উৎসুকচিত্তে কিরণ তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল। অরুণ খবরের কাগজখানা কিরণের হাতে দিয়া বিজ্ঞাপনটী তাহাকে দেখাইয়া বলিল—কিরণ, এইবারে বুঝি দুঃখু ঘুচল।

কিরণ গম্ভীর হইয়া বলিল—তোমার দেখছি গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। কোথায় কি তার ঠিক নেই, শুধু বিজ্ঞাপন দেখেই লাফাচ্ছ।

অরুণ দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—তুমি যাই বল কিরণ, আমি এ টিউশানি জোগাড় না করে ফিরছি না। চললুম এই ঠিকানায় এখুনি।

অরুণ চলিয়া যায় দেখিয়া কিরণ বলিল—দেখ বৃথা টানা পড়েন করবে। কলকাতা সহরে বেকার লোকের অভাব কিনা। এতক্ষণে কোনকালে ও ঠিক হয়ে গেছে।

অরুণ বলিল—তুমি বাধা দিও না কিরণ, এই সবে সকালে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, এর মধ্যে ঠিক হয়ে গেলেই হ'ল কিনা।

বিজ্ঞাপনটী দেখিয়া অবধি কিরণের ভারী খারাপ ঠেকিতেছিল। একেই ত অরুণের অফিস হইতে ফিরিতে সন্ধ্যে হইয়া যায়। সমস্ত দিন একলা স্বামীর অদর্শনে তার তরুণ বিরহী প্রাণ ছটফট করিতে থাকে। শুধু রাত্রিটুকু স্বামীকে কাছে পাইয়া কিরণের আকাঙ্খা মেটে না। যদি টাকার চিন্তা না থাকিত তাহা হইলে সে বোধ হয় স্বামীকে একদণ্ডও চোখের আড়াল করিতে পারিত না। সমস্তদিন স্বামীর মিলনের আশায় পতিপ্রাণা কিরণের চিত্ত উন্মুখ হইয়া থাকে। সারা দিনের অদর্শনে তার প্রাণ ছটফট করে, ইহার পর টিউশানি জুটিলে সেও দু' একঘণ্টার কম নয়। সে বিলম্বটুকুও সহিবার মত তাহার মনের শক্তি ছিল না।

মুখ ভার করিয়া কিরণ কহিল—আদত কথা তোমার টিউশনি করা আমার ভাল লাগছে না। কি দরকার বাপু, এইতেই ত বেশ চলে যাচ্ছে আমাদের।

অরুণ বলিল নাঃ তুমি পাগল হয়েছ দেখছি। হাতের লক্ষ্মী এইরকম ভাবে পায়ে ঠেললে আর কোন কালে সুখের মুখ দেখতে হবে না। আমি চললুম বলিয়া অরুণ আর উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া বাহির হইয়া গেল।

কিরণ জানিত স্বামীর অর্থোপার্জ্জনের জন্য এত চেষ্টা সে শুধু তাহাকে সুখে যত্নে রাখিবার জন্য। ওগো, এমন স্বামী থাকিতে তাহার আর অন্য সুখে কি প্রয়োজন? মাথার সিঁদুর ও স্বামীর ভালবাসা অক্ষুন্ন থাকিলে কিসের দরকার

তার আর্থিক সুখে ? সে ভগবানের কাছে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিল—'হে ভগবান, যেন এ টিউশনি তিনি না পান।' রাস্তায় অরুণও বোধ করি সেই সঙ্গে ভগবানের কাছে বিপরীত প্রার্থনা করিতেছিল—'হে ভগবান, যেন এটী জুটে।' দোটানায় পড়িয়া ভগবান বোধ হয় একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু কিরণ বেচারীর প্রার্থনায় বধির হইয়া কেন যে তিনি অরুণের উপর সহসা কৃপাদৃষ্টি করিলেন এ পক্ষপাতিত্বের কারণ বাহির করা শক্ত।

(ক্রমশঃ)

বাইজী

[শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস]

—ক—

গয়ার জমিদার রায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার বিবাহোপলক্ষে ডালিমমণি যখন তিনদিন গাহিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল,—তখন তাহার প্রাণের মধ্যে কি যেন এক অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের সুরু হইয়া গেল! রায় বাহাদুরের পয়সার অভাব ছিল না—গাহিবার মণ্ডপটি চমৎকার রূপে সাজাইয়া ছিলেন। নানাস্থান হইতে বিখ্যাত বাইজী আনাইয়াছিলেন।

প্রত্যহই,—বিশেষতঃ তাহার যে কয়দিন গাহিবার কথা ছিল, সেই কয়দিন আসরটিতে তিলার্দ্ধেরও স্থান থাকিত না। কিন্তু সেই কয়দিনই, সেই অসংখ্য জনতার ভিতর হইতে একখানি করুণ মুখ তাহার অন্তরটিকে বড়ই ব্যথিত করিয়া তুলিল।

আসরটিতে ধনীর অভাব ছিল না। বহুসংখ্যক ধনী যুবক সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া গান শুনিবার অছিলায়, তাহার সুগঠিত দেহের অপরূপ ভঙ্গীমার দিকে নির্নিমেষ লোচনে চাহিয়া থাকিতেন। গান শুনবার আগ্রহ বোধহয় তাহাদের মধ্যে কাহারও ছিল না।

তাঁহাদের অনতিদূরেই সেই যুবকটি বসিয়া থাকিত একটি ময়লা জামা ও কাপড় পরিয়া। কিন্তু, এত বড় আসরটির মধ্যে গান শুনিবার আগ্রহটুকু ঐ যুবকেরই শুধু ছিল। ভিড়ের মধ্য হইতে প্রত্যহই সে যথাসম্ভব তাহার মাথা উঁচু করিয়া তাহার দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া তন্ময় হইয়া তাহার গান শুনিত! সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত গাহিত, ততক্ষণ যেন তাহার আর কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ থাকিত না।...তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় যেন সে তাহার সমস্ত গানটুকু পান করিত। তাহার সেই নীরব আগ্রহভরা মুখখানি যেন তাহার প্রাণে সোণার কাঠি স্পর্শ করিয়া দিত। তাহার সেই নীরব আকুল দৃষ্টিটুকু যেন তাহার প্রাণের দুয়ারে ঘা দিয়া বলিত— "ওগো, আমি ভালবাসি—তোমার গান আমি বড় ভালবাসি......

প্রতিদিনই তাহার প্রত্যেক গান শেষ হইবামাত্রই চতুর্দ্দিক হইতে বারিবর্ষণের ন্যায় অসংখ্য ফুলের মালা আসিয়া তাহার উপর পড়িত—অসংখ্য প্রশংসাধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত। কিন্তু, সেই যুবকের নিকট হইতে সে কোনও দিনই সামান্য ফুলের মালা, কিংবা প্রশংসাধ্বনি কিছুই পায় নাই! তথাপি, যুবকটির সেই নীরব, ভাষাহীন, মন্ত্রমুগ্ধ দৃষ্টি তাহাকে বিহ্বল করিয়া তুলিত—সেই অসংখ্য জনতার ভিতরে শুধু তাহারই সেই তন্ময় ভাবটুকু তাহার প্রাণে এক অতুলনীয় অমৃতসিঞ্চন করিয়া দিত—যাহার, সে আজ পর্য্যন্তও জীবনে কখনও আস্বাদ গ্রহণ করে নাই।

ফিরিয়া আসা অবধি সে নিরন্তর এই ঘটনাগুলিই মনের মধ্যে আলোচনা করিয়া যাইত! এই আলোচনায় তাহার আনন্দ ছিল যথেষ্ট—এই সব ঘটনা তাহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার করিয়া দিত। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অজ্ঞাতে সে বহুবার ভগবানের নিকট যুবকটির দর্শন ভিক্ষা করিত...

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে বিছানায় শুইয়া উদাসনেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার প্রাণের ভিতর এক মাস পূর্ব্বের ঘটনাগুলি বায়স্কোপের ফিল্মের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছিল! আঃ, কি মধুর সে দিন! তাহার সেই নীরব আগ্রহভরা চাহনীটুকু দেখিবার সুযোগ আর একটিবার দাও প্রভু—সে দৃষ্টি যে সে কোনও প্রকারেই ভুলিতে পারিতেছে না—কখনও যে পারিবে না! সে দৃষ্টি যে তাহার হৃদয়ে আনন্দের বন্যার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে!

এমন সময়ে তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া চঞ্চলা, ওরফে চঞ্চি, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, সিগারেটে একটু টান দিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁলা ডালিম, তোর আজকাল কি হয়েছে বল্‌ত? ওদিকে যে একজন নতুন নাগর এসে তোকে খুঁজছে।"

"নতুন নাগর আবার কে'লো?"

"তা' জানিনা,—দেখলুম বামী তার সঙ্গে কথা বলছে।"

"ফিরিয়ে দিতে বল ভাই, দরকার নেই!"

"কেন বল্‌ত? গয়া থেকে এসে অবধি তোর যেন কি হয়েছে! অমন দামী দামী আসবাবগুলো বেচে ফেল্লি; নবকিশোর ব্যাচারা ত দশ বারদিন এসে এসে ফিরে গেল—"

ডালিম উদাসস্বরে কহিল—"কি জানি ভাই!"

"বলি—কারও সঙ্গে সেখানে প্রেমে পড়েছিস্ নাকি?"

ডালিম কোনও উত্তর না দিয়া বাহিরের দিকে দৃষ্টিস্থাপন করিল।

কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া চঞ্চলা মৃদু হাসিয়া কহিল—"ও বাবা! এর মধ্যে এত! তা বেশ ত'। টোপ ফেল্‌তে চেষ্টা কর্‌না—তারপর কিছু মোটা সোটা রকমের আদায় করে নে"

ডালিম এবার কোনও কথা না বলিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়া ফেলিল। হায় রে! কাহার নিকট হইতে সে আদায় করিবে—সে যে গরীব—টোপ ফেল্‌বার মাছ যে সে নয়।

সে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে বামী আসিয়া কহিল—"দিদিমণি, তোমায় কে একজন খুঁজছে।"

ডালিম প্রশ্ন করিল—"কি রকম দেখতে বলত?"

"একেবারে যাচ্ছেতাই! একটা ময়লা কাপড়, আর ময়লা সার্ট কি পাঞ্জাবী হবে।"

ডালিম আগ্রহ সহকারে কহিয়া উঠিল.."দৌড়ে যা—তাকে তুই এখানে নিয়ে আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই বামী একটি যুবককে লইয়া গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

ডালিম এবার অত্যধিক পরিমাণে চম্‌কিয়া উঠিল! একি ভীষণ—একি মধুর দৃশ্য! তাহার বুকের সমস্ত রক্ত একসঙ্গে তাল পাকাইয়া উঠিল। হৃদয়ের ভিতর কি এক অনির্ব্বচনীয় পুলকোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল! সে তাহার দিকে নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ যুবকের প্রশ্নে তাহার চমক ভাঙ্গিল।

যুবকটি মৃদু হাসিয়া কহিল—"এই যে,—নম—স্কার।"

সরোজ বোধহয় আরও কিছু বলিত, কিন্তু চঞ্চলার উচ্চ-হাসির শব্দে একেবারে নীরব হইয়া গেল। সে তাহার প্রস্থানরতা মূর্ত্তির দিকে কিয়ৎক্ষণ হতভম্বের ন্যায় একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, তৎপরে আপনার জামা-কাপড়ের উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া ডালিমের দিকে ফিরিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল—"উনি আমাকে দেখে ওরকম করে হেসে উঠলেন কেন বলুন ত? আমায় কি এতই বিশ্রী দেখাচ্ছে?" এই বলিয়া সে একটু হাসিল।

কিন্তু, সেই হাসিটি যে সম্পূর্ণ ধার করা—সেই হাসিটীর পশ্চাতে যে বেদনার একটি সূক্ষ্ম জাল প্রচ্ছন্নরূপে জড়িত ছিল, সেটা তাহার দৃষ্টি এড়াইতে পারিল না! বাহিরের দিকে চঞ্চলার উদ্দেশ্যে একটি কুপিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সে মৃদুকণ্ঠে কহিল—"না, না! ওর ঐ রকম স্বভাব—মাঝে মাঝে আপনিই হেসে ওঠে। তা' আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—ভেতরে এসে বসুন না?"

একটি চেয়ারে উপবেশন করিয়া সরোজ তাহার কোঁচার অগ্রভাগ দিয়া ঘর্ম্মাক্ত মুখখানি মুছিয়া লইয়া কহিল, "আপনি তাহলে এখানেই থাকেন দেখছি! অথচ, আজ দু'তিন ঘণ্টা ধ'রে আমি আপনার বাড়ী খুঁজে হয়রান। তা' যাই হো'ক, আমি আপনাকে গুটিকয়েক কথা বলতে চাই, অনুগ্রহ করে একটু শুনবেন কি?"

শেষের দিকটা বলিবার সময়ে যেন তাহার মুখে আগ্রহের ছাপ পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠিল।

ডালিম স্নিগ্ধস্বরে কহিল—"কেন শুনব না—বলুন।"

"দেখুন, ছেলেবেলা থেকেই আমি গান শুনতে বড় ভালবাসি। ভাল গান যেখানে হয়, হাজার বাধা-বিপত্তিতেও আমি সেখানে যাই। এই বয়সেই আমি অনেক বড় বড় গাইয়ে, বড় বড় বাইজীর গান শুনেছি। তার মধ্যে খালি আপনার গান কখনও শুনিনি! তা' ছাড়া, আপনার গান শোনবার আশাও আমি কখনও করিনি; কারণ, অনেকের মুখেই শুনেছি যে, খুব বেশী Charge না হলে আপনি বড় একটা কোনও আসরে যান্ না। সেইজন্য, যখন শুনলুম যে, রায় বাহাদুরের বাড়ীতে আপনি আসছেন—তখন যে মনে কি রকম একটা আনন্দ হ'ল, তা আমি বলতে পারি না।"

তৎপরে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"কিন্তু, জানেন ত'—যারা গরীব, তারা যদি ভদ্রসন্তান—এমন কি খুব উচ্চ-বংশেরও ছেলে হয়—তাদেরও বড় বড় সভায় কিংবা Partyতে কেউ কখনও মর্য্যাদাহানীর ভয়ে নিমন্ত্রণ করে না। আপনার যে তিনদিন গাইবার কথা ছিল, সে তিনদিন রায় বাহাদুর খালি সেখানকার বড় বড় গণ্যমান্য লোকদেরই card পাঠিয়েছিলেন। আমাদের মত হতভাগ্যদের সেখানে যাবার কোনও আশাই ছিল না! সেই তিনদিন আমি দরওয়ানকে অনেক অনুনয় করে কোনও রকমে ঢুকে পড়ে-ছিলুম। পাছে কেউ চট্ করে চিনে ফেলে,—সেই জন্যে আমি একেবারে চাকরদের সঙ্গে—তাদের জায়গাতেই বসে যেতাম।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে একটু চুপ করিল; পরে তাহার মুখের উপর একটি স্থির দৃষ্টিস্থাপন করিয়া কহিয়া উঠিল—"কিন্তু আহা—হা! কি চমৎকার গানই শুনলুম—জীবনে বোধহয় এত মধুর গান কখনও শুনিনি! আপনি যেদিন চলে এলেন, সেইদিন হ'তে আমার খালি কি মনে হ'ত জানেন?"

ডালিম নীরবে তাহার দিকে জিজ্ঞাসুনেত্রে চাহিয়া রহিল—

সরোজ তাহার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল—"কবে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে? কবে আমি আবার আপনার সেই রকম গান শুনব? বাস্তবিক, এত গান শুনেছি, কিন্তু আপনার মত এমন মধুর, প্রাণমাতান, গান আমি কারও কাছে শুনিনি! ইচ্ছা হয় চিরদিন শুনি!"

ডালিম প্রত্যুত্তরে কিছু বলিল না। সরোজের প্রত্যেকটি কথা যেন তাহার প্রাণে এক অপূর্ব্ব, অনির্ব্বচনীয় পুলকোচ্ছ্বাসের হিল্লোল বহাইয়া দিতেছিল। তাহার গানে যে সরোজ মোহিত হইয়াছে, এই কথাটি স্মরণ হইবামাত্র তাহার হৃদয়ের মধ্যে এক অফুরন্ত আনন্দের উৎস বহিয়া যাইতেছিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, সরোজের কথায় নীরব হইয়া গেল।

সরোজ তাহার একটু নিকটে সরিয়া আসিয়া আগ্রহ সহকারে কহিয়া উঠিল—"কিন্তু, দয়া ক'রে আমার একটা অনুরোধ আপনি রাখবেন না কি?"

কোমল স্বরে ডালিম প্রশ্ন করিল "কি বলুন?"

"যেদিন হ'তে আপনি চলে এসেছেন, সেইদিন হ'তেই, আপনার গান আমার প্রাণের মধ্যে হু হু করে বেড়াচ্ছে—আপনার গান আমি জীবনে কখনও ভুলতে পারব না। অনুগ্রহ করে রোজ—রোজ না হো'ক, অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন করে আপনি আমাকে আপনার গান শুনতে অধিকার দেবেন? বেশী না—শুধু একটি করে?"

এই বলিয়া সরোজ তাহার দিকে আকুল আগ্রহে করুণ নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ডালিম প্রত্যুত্তরে চট্ করিয়া কিছু বলিতে পারিল না। সারা দেহের মধ্য দিয়া তখন তাহার বর্ষার নদীর ন্যায় আনন্দের তুমুল তুফান বহিয়া যাইতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইল, সে সরোজের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া বলে—ওগো, তোমাকে গান শোনাব না ত' কাকে শোনাব? আমি যে সেইদিন থেকেই তোমার পথ চেয়ে বসে আছি। ওগো, এস,—এস, কত গান শুনবে, শোন। আমি যে আমার ক্ষুদ্র বুক ভরে তোমার জন্য গান রেখেছি। তুমি এস, তুমিই যে এখন আমার গানের একমাত্র শ্রোতা। পৃথিবীতে যে আর কেউই সে স্থান দাবী করতে পারে না।

সে তাহার মিনতিপূর্ণ কাতর মুখের উপর দৃষ্টিস্থাপন করিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিয়া উঠিল "কেন শোনাব না—আপনার যখন খুসী আসবেন—আমি তখনই আপনাকে গান শোনাব —যত গান আপনি শুনতে চান।"

ডাক্তারের মুখে মরণোন্মুখ কোনও আত্মীয়ের শুভবার্ত্তা শুনিলে উল্লাসে যেরূপ সারা অন্তর নাচিয়া উঠে, ডালিমের কথায় সরোজের মুখখানি ততোধিক আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। কহিয়া উঠিল "ঠিক বলছেন ত'? আঃ—তা হলেই হ'ল।"

কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরেই তাহার মুখখানি অত্যধিক পরিমাণে ম্লান হইয়া গেল। সে জোর করিয়া ওষ্ঠে একটি হাস্যরেখা টানিয়া আনিয়া কহিল "কিন্তু, দেখছেন ত' আমি বড় গরীব। মাসে মাইনে পাই মাত্র চল্লিশ টাকা। আপনার গানের আমি পূরো…

মধ্য পথেই থামিয়া গিয়া সে ডালিমের দিকে আকুলনেত্রে চাহিয়া রহিল।

ডালিমের মুখখানিও সহসা ক্ষণিকের তরে নিষ্প্রভ হইয়া গেল—তাহার হৃদয়টিকে কে যেন সজোরে চাপিয়া ধরিল। সে অসহিষ্ণু ভাবে কহিয়া উঠিল "না! না! সে বিষয়ে আপনি কিছু ভাববেন না অনুগ্রহ করে আপনি রোজ এসে আমার গান শুনে যাবেন।

* * * *

—খ—

সরোজের এই পৃথিবীতে আপনার বলিতে এক মাসী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। তিন বৎসর বয়সে তাহাকে রাখিয়া তাহার মাতা যখন চিরদিনের জন্য প্রস্থান করিলেন, তখন সে এই মাসীমার ক্রোড়েই মানুষ হইতে লাগিল। পয়সার অভাব পূরণ না হইলেও, মাসীর নিকট হইতে সে স্নেহের অভাব কখনও অনুভব করে নাই। কিন্তু বিধাতা তাহার কপালে সুখ লিখেন নাই। কয়েক বৎসর পরেই সে যখন গ্রামের fourth classএ পদার্পণ করিল, তাহার পিতাও মাতার অনুগামী হইলেন। তাহার মেসো মহাশয় তখন সেই গ্রামেরই Police Sub-Inspector, গ্রামের মধ্যে গায়ক বলিয়া তাঁহার কিছু প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় সে তাঁহার নিকট হইতে সঙ্গীতবিদ্যায় কিছু পারদর্শীতা লাভ করিয়াছিল, এবং সেই জন্যই সঙ্গীতের উপর আগ্রহ ছিল তাহার যথেষ্ট। first classএ উঠিবামাত্র তাহার মেসো মহাশয় গয়ায় বদলী হইলেন। কোনওরূপে Matriculation পাশ করিবার পর সে তাহার পিতার অফিসেই একটি চল্লিশ টাকা বেতনের চাকরী জোগাড় করিয়া লইল। মধ্যে মধ্যে ছুটী পাইলেই সে গয়ায় মাসীর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইত। সেবার অসুস্থতার ছুটী লইয়া সে কিছু দিনের জন্য গয়ায় গিয়াছিল—তাহার পর কি ঘটিয়াছিল তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘটনার পর হইতে সে প্রতিদিনই রাত্রে ডালিমের বাড়ী যাইত। এটা যেন তাহার একটি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছিল—শত বাধা বিপত্তিতেও সে এই কর্ত্তব্যটুকু অবহেলা করিতে পারিত না। —রাত্রে প্রত্যহ সে তিন চারঘণ্টা ডালিমের গান শুনিয়া মেসে প্রত্যাগমন করিত।

সেদিন সন্ধ্যার পর হইতেই সারা আকাশটা কাল, থমথমে নিকষ মেঘে একেবারে ভরিয়া গিয়াছিল—সারা প্রকৃতিটা যেন অসম্ভবরূপ মৌনতা অবলম্বন করিয়াছিল।

আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া সরোজ মেস হইতে বাহির হইয়া পথের উপর নামিয়া পড়িল। কিন্তু, কিয়দ্দুর অগ্রসর হইতে না হইতেই প্রবলবেগে বৃষ্টি আরম্ভ হইল,—যেন কোন্ বিরহিণী বধূর চক্ষু হইতে অজস্র ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

মেস হইতে ডালিমের বাড়ী অধিকদূর না হইলেও খুব নিকটে নহে। সে কোনওরূপে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া ডালিমের গৃহে উপস্থিত হইল।

ডালিম জানালার পার্শ্বে রাস্তার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পদশব্দে চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া সরোজকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া বিস্ময়ান্বিতভাবে কহিয়া উঠিল— "যা' ভেবেছি তাই! এই বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আসবার কি দরকার ছিল বলুন ত?"

তাহার পর তাহার আপাদমস্তক একবার উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া কহিয়া উঠিল "এঃ! একেবারে নেয়ে

গেছেন যে ! যান্—যান্ চট্ করে ভিজে কাপড় জামাগুলো ছেড়ে ফেলুন" এই বলিয়া সে ড্রয়ার হইতে একটি ফরসা কাপড় বাহির করিয়া দিল।

সরোজ নিঃশব্দে ভিজা কাপড় জামা ছাড়িয়া ডালিম প্রদত্ত কাপড়খানি পরিধান করিয়া খাটের উপর উপবেশন করিয়া কহিল "নিন্—এইবার গান আরম্ভ করুন।"

ডালিম নিকট হইতে একখানি আলোয়ান লইয়া তাহার হস্তে প্রদান করিয়া কহিল, "তা গাইছি,—আপনি এই আলোয়ানটা বেশ করে গায়ে দিন দেখি—যে হাওয়া দিচ্ছে, —চট করে ঠাণ্ডা লেগে অসুখ হতে পারে।"

সরোজ কি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, ডালিমের মুখের দিকে চাহিয়া নীরব রহিয়া গেল।

আলোয়ানখানি গায়ে উত্তমরূপে জড়াইয়া সে স্মিতহাস্তে কহিল "এই নিন্ হ'ল ত' ? আচ্ছা - আমার জন্ত আপনার এত মাথা ব্যথা কেন বলুন ত ?"

ডালিম একমুহূর্ত্ত নতমুখে নীরব থাকিয়া কহিয়া উঠিল "তা জানি না ! এখন কি গান গাইব বলুন ?"

সরোজ কহিল,—সেটা আপনার খুশী।"

ডালিম কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে অপেক্ষা করিয়া টেবিল হারমোনিয়ামে গান ধরিল—

"ভালবাসি তাই ভাল বাসিতে আসে
আমি যে বেসেছি ভাল, সে বাসা সে ভালবাসে—"

বাহিরে তখন প্রকৃতির তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল সারা প্রকৃতি যেন বিশ্ববাসীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্ত তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছিল।

বাহিরের ভীষণ গর্জ্জনকে ছাপাইয়া ডালিমের স্বর ক্রমশঃ উচ্চ পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল। পশ্চিম দিকের জানালাটি সজোরে খুলিয়া দিয়া একরাশ হাওয়া, যেন তাহার গানে মুগ্ধ হইয়া—তাহার চুলগুলি লইয়া অপরূপ ভঙ্গীমায় সোহাগ করিতে লাগিল।

সরোজ হারমোনিয়ামের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একাগ্র চিত্তে তাহার দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া গান শুনিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে সে তাহার বহু গানই শুনিয়াছে—এই গানও যে শোনে নাই, তাহা নহে। তথাপি কি মধুর—কি চমৎকার আজকার এই গান।

গানের প্রত্যেক পর্দ্দাতেই যেন তাহার হৃদয়ের অদম্য আকঙ্ক্ষাটুকু আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। গানটির প্রতি বর্ণই যেন তাহার অন্তরের গোপন রুদ্ধ আবেগটুকু ব্যক্ত করিয়া দিতেছিল। আজ যেন এই গানের ভিতর সে কি এক অপূর্ব্ব বস্তুর সন্ধান পাইয়া গেল। গানটির প্রত্যেক অক্ষরই আজ যেন তাহার প্রাণের দোলাকে দুলাইয়া দিয়া কি এক অপরূপ সত্যের আভাস জানাইয়া দিল ...

গানটি শেষ হইবামাত্রই সে সহসা খপ্ করিয়া ডালিমের হাতখানি ধরিয়া ফেলিয়া আবেগভরে কহিয়া উঠিল—"দয়া করে আমার একটা কথার উত্তর দিন।"

তাহার আগ্রহভরা মুখখানির উপর দৃষ্টিস্থাপন করিয়া ডালিম উত্তর দিল "আচ্ছা দিচ্চি ;—দাঁড়ান, আগে আমি আপনার ভিজা কাপড়টা বাইরে দিয়ে আসি।"

সরোজ বাধা দিয়া কহিয়া উঠিল "না ! না ! সে কি হয় ! ছাড়ুন আপনি, আমি নিজেই দিয়ে আসছি।"

তাহার উপর একটি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ডালিম শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল "কখন না। আপনি কেন দিতে যাবেন ? আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ এ কাজ আমিই করব।

সরোজ তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল।

ডালিম কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া বারাণ্ডায় উপস্থিত হইল। লাইটটি জ্বালাইয়া সে সযত্নে সরোজের কাপড়টি নিংড়াইয়া দড়ীতে টাঙ্গাইয়া দিল।

পাঞ্জাবীটা নিংড়াইয়া দড়ীর উপর রাখিতেই একটি ভিজা পোষ্ট কার্ড তাহার পকেটের ভিতর হইতে পড়িয়া গেল।

পোষ্টকার্ডটি যথাস্থানে রাখিতে যাইবার সময়ে তাহার মধ্যে তাহার নিজের নাম দেখিয়া সে যারপরনাই বিস্মিত হইয়া গেল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আদ্যোপান্ত পত্রটি সমস্ত পড়িয়া গেল। পত্রটি এইরূপ লেখা ছিল—

কল্যাণীয়,

সরোজ, কিছুদিন আগে তোমায় আমি দু'তিন খানি চিঠি দিয়েছিলাম, কিন্তু তার কোনও উত্তর পাই নাই !

ভেবেছিলাম, তোমার অসুখ করেছে। কিন্তু, এখন আমার সে সন্দেহ দূর হয়েছে। মেসের Superintendent হরিবাবু কিছুদিন আগে আমাকে পত্রে জানিয়েছেন যে, তুমি নাকি আজকাল রাত্রে সব সময়ে মেসে থাক না। কোথায় একজন ডালিমমণি আছে—তুমি নাকি সেখানে যাতায়াত সুরু করে দিয়েছ। ছিঃ ছিঃ সরোজ—তুমি এত উৎসন্ন গেছ। শেষে কিনা একজন বেশ্যা......

ডালিম আর পড়িতে পারিল না—তাহার প্রতি শিরার ভিতর দিয়া যেন রক্তের উদ্দাম স্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল। পত্রের প্রতি বর্ণই যেন জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাহার প্রাণের ভিতরটা দগ্ধ করিতে লাগিল। পত্রটি যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া সে কোনও রূপে টলিতে টলিতে নিজের গৃহের ভিতর প্রবেশ করিল।

সরোজ দ্বারের দিকে উৎকণ্ঠিত নেত্রে চাহিয়াছিল—ডালিমের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্রই সে একটু শিহরিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল—ওকি! আপনার কি হঠাৎ কোনও অসুখ বিসুখ করল নাকি! মুখখানা ওরকম হয়ে গেল কেন?"

ডালিম খাটের একাংশে উপবেশন করিয়া কহিল—"কই না, কিছুই হয় নি ত'!—তা' আপনি যে কি বল্‌বেন বলছিলেন যে?"

সরোজ কিয়ৎক্ষণ তাহার দিকে অপলকনেত্রে চাহিয়া থাকিয়া একটু অগ্রসর হইয়া তাহার একখানি হাত ধরিয়া ফেলিয়া আগ্রহভরে প্রশ্ন করিল—"আপনি যে এই গানটি গাইলেন---এটা কি আপনি যথার্থই প্রাণের ভেতর থেকেই গেয়েছিলেন?"

কিয়ৎক্ষণ নতমুখে অপেক্ষা করিবার পর, ডালিম ধীরে ধীরে নিজের হস্তখানি মুক্ত করিয়া লইয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "কিন্তু, তার আগে আপনি আমার একটা কথার উত্তর দিন।"

সরোজ স্নিগ্ধস্বরে কহিল—"কি বলুন?"

তাহার মুখের উপর একটি স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া ডালিম প্রশ্ন করিল—"আপনি এখানে রোজ আসেন কেন?"

সরোজের মুখের উপর যেন সহসা কে সপাং করিয়া একটি চাবুক মারিল। ওষ্ঠে একটি ক্ষীণ হাস্যরেখা আনিয়া সে কহিল—"আপনার গান শুন্‌তে।"

ডালিম পূর্ব্ববৎ কহিল—"ঠিক বল্‌ছেন? আমার গান শোনা ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে আপনি এখানে আসেন না?'

কিয়ৎক্ষণের তরে নীরব থাকিয়া সরোজ একটু হাসিয়া দ্বিধা ভরে কহিল—"না - হাঁ - না —হ্যাঁ—হ্যাঁ, একটু উদ্দেশ্য আছে বটে! তা' সেটা আপনি নাই শুন্‌লেন।"

অপূর্ব্ব এক পুলকের হিল্লোল আসিয়া ডালিমের সারা অন্তরটাকে প্লাবিত করিয়া দিল! কিন্তু, সেটা মুহূর্ত্তের জন্য! পরক্ষণেই সে তাহার দিকে ফিরিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে কহিল—"সে যাই হো'ক, আপনি আর আসবেন না।"

সরোজ এবার অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গেল, প্রশ্ন করিল—"কেন?"

"কেন—তা' জানিনা; তবে আর আপনি আস্‌বেন না।" এই বলিয়া ডালিম ব্যাকুলনেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

"ওঃ! বুঝেছি!" কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর করুণ সুরে এই কথাটি বলিয়া সরোজ তাহার হাতখানি ধরিয়া কাতরভাবে কহিয়া উঠিল—"কিন্তু, কি করব, বলুন – আমি যে বড়ই গরীব! আচ্ছা, আমি এবার থেকে আপনাকে···

কথাটি সম্পূর্ণ না করিয়াই সে ডালিমের মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিল।

ডালিমের মুখ হইতে যেন কে সমস্ত রক্ত নিংড়াইয়া লইল। একযোগে যেন শত বৃশ্চিক তাহার প্রাণের ভিতর দংশন করিয়া উঠিল। সে সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিয়া উঠিল—"না না, সেজন্য নয়!

"তবে—তবে কি জন্য বলুন।" এই বলিয়া সরোজ তাহার আরও একটু নিকটে সরিয়া আসিল।

ডালিমের কণ্ঠ ভেদ করিয়া এবার একটি অদম্য অশ্রুর উচ্ছ্বাস বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল। হায় রে! কি জন্য—সে তাহার কি বলিবে! তাহার কি ইচ্ছা, সরোজ না আসে। সে যে প্রতিমুহূর্ত্তে—সে যে একান্তভাবেই তাহার সঙ্গ প্রার্থনা করে। কিন্তু হায়! সে যে পতিতা!

সে যে বেশ্যা! তাহার সঙ্গ, তাহার স্পর্শ, তাহার বায়ু সকলই যে দূষিত। আজ তাহারই জন্য যে সরোজের দারুণ নিন্দা, এই কথাটি বারংবার তাহার মনের ভিতর সূচ ফুটাইতে লাগিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চিন্তা করিয়া সে প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা সরোজবাবু, আপনার কি কেউ নাই ?"

সরোজ একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, "কেন বলুন ত ?"

"এম্‌নি ·····"

"নাঃ! এক মাসী ছাড়া আর কেউ নেই! তিনিই আমাকে তিন বছর বয়েস থেকে মানুষ করেছেন।"

গভীর সহানুভূতির স্বরে ডালিম কহিয়া উঠিল—"আহা!" তৎপরে কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পুনরায় কহিয়া উঠিল—"আপনি তাঁর কাছেই থাকেন বুঝি ?"

সরোজ কহিল—"না। মাসীমারা এখন গয়ায়। আমি এখানে Amherst St. Subudhan মেসে থাকি।"

ডালিম কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল, পরে ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া প্রশ্ন করিল—"আচ্ছা,—আপনি যে এখানে আসেন,—তা' আপনার মাসীমারা জানেন ?"

সরোজ একটু চম্‌কিয়া উঠিল, নতমুখে কহিল—"না।"

এই সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাটি বুঝিয়া লইতে ডালিমের মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। সে তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। হৃদয়ের মধ্য দিয়া তাহার এক অপূর্ব্ব পুলকের হিল্লোল বহিয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই শত বৃশ্চিক তাহার প্রাণের ভিতর দংশন করিয়া উঠিল। পত্রটীর প্রতি অক্ষরই যেন তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়া দিল। সরোজের নিন্দায়, দুর্ণামের হেতু যে সে নিজেই, এই কথাটি স্মরণ হইবামাত্র তাহার হৃদয় শতধারায় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছিল। সরোজের এই নিন্দার ভারটুকু তাহার প্রাণে নিবিড় ব্যথা প্রদান করিতেছিল সে আর থাকিতে পারিল না।

অকস্মাৎ সে সরোজের পা দুখানি সবলে জড়াইয়া ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিয়া উঠিল "কিন্তু দোহাই আপনার আমার এই কথাটি রাখুন—আপনি আর আমার বাড়ী আস্‌বেন না!"

সরোজ এবার তাহার কথায় যতটা না বিস্মিত হইল, ততোধিক পরিমাণে তাহার সারা অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি তাহাকে উঠাইয়া তাহার দু'খানি হস্ত নিজ হস্তের মধ্যে লইয়া করুণস্বরে কহিয়া উঠিল—"কেন বলুন ত', আপনি বার বার আমায় এই কথা বল্‌ছেন? আমি গরীব—বড়ই গরীব। গরীবেরও প্রাণ আছে, আমি যে তোমায় ভালবাসি ডালিম—বড় ভালবাসি!"

সরোজের এই কথা শুনিয়া ডালিম সুপ্তোত্থিতের মত বলিল,—ভালবাসা—ভালবাসা—ভালবাসা। ভালবাসার কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমাদের কাণ ঝালা পালা হয়ে গেছে। যখন লোকে আমাদের রূপের লহর দেখে পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন তাদের ঠোঁটে ভালবাসা দেখিয়ে কাজ আদায় করে নিই। তারপর ছিন্ন পাদুকার ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করি।···যাও, তুমি আর কখনও এদিক মাড়াইও না। যাও, উঠ·····"

থিয়েটারের গুপ্তকথা

[নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)
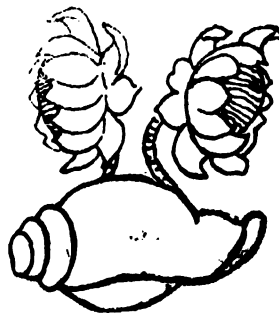
[পারিবারিক অসুস্থতা বশতঃ "থিয়েটারের গুপ্তকথা" সচিত্র শিশিরের গত বৎসর ২০শে চৈত্র শনিবার সন ১৩৩২ সালে তৃতীয় বর্ষের ১ম খণ্ডের ২১শ সপ্তাহের সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়া দুইমাস যাবৎ বন্ধ ছিল। সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট এই অপরাধের জন্য আমি মার্জ্জনা প্রার্থী। অতঃপর ভবিষ্যতে এরূপ ত্রুটী আর না হয়, তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক থাকিব।

ইতি—লেখক।]

(২০)

আজ শনিবারে থিয়েটারে মহা ধূম। কলিকাতার সহরের ধনকুবের বংশের মেজবাবু সদলবলে আজ ইণ্ডিয়ান থিয়েটারে নতুন নাটকের অভিনয় দেখতে যাবেন। আমার তো মহা ফুর্ত্তি। রাত্রি নটার সময় অভিনয়; আমি বেলা পাঁচটা না বাজতে বাজতে থিয়েটারে গিয়ে দেখি, প্রায় সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীরাই এসেছে। একে নতুন নাটক "রাঠোর কুমারীর" প্রথম অভিনয়, তার ওপোর 'মণ্ডল বাবুরা আজ থিয়েটারে আসবেন, এ খবরও সকলে পেয়েছেন। সকলেই যেন আজ আনন্দ সাগরে ভাসছে। ম্যানেজারবাবুও আজ মহা ব্যস্ত। একবার ষ্টেজের ভেতরে যাচ্ছেন, একবার অডিটোরিয়মে (যেখানে একপাশে দর্জ্জিরা ব'সে নতুন পোষাক তৈরী কচ্ছিল সেইখানে) গিয়ে দর্জ্জিদের তাড়া দিচ্ছেন, একবার দোতলায় গিয়ে "বক্সগুলো" ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার হ'ল কি না দেখছেন, তার সব চেয়ারগুলো আস্ত কি ভাঙ্গা তাই তদারক ক'চ্ছেন, এক একবার ফটকের ধারে এসে তাঁর মামুলী চেয়ারখানাতে বসে দু'চার টান গড়গড়ার নলে তামাক টানছেন, আবার তখুনি উঠে ষ্টেজে গিয়ে যোগীবাবু, নীরোদবাবু প্রভৃতি এক্টর বাবুদের সঙ্গে খুব হাত পা নেড়ে কথাবার্ত্তা কইছেন। অন্য অন্য অভিনয়ের দিন অভিনেতা অভিনেত্রীরা আসে প্রায় রাত্রি সাড়ে সাতটা কিম্বা আটটা। কারণ নটায় থিয়েটার আরম্ভ। গিরিবালা, শরৎ কুমারী, "জাঁদরেল যুগলী" প্রভৃতি বড় বড় একট্রেসরা আসেন রাত্রি প্রায় পৌনে ন'টা। আজ সবাই এসেছেন, ঠিক সন্ধ্যা হ'তেই, অর্থাৎ সাতটার পূর্ব্বে। আজ সকলকারই অন্যরকম ভাব; সবাই যেন কেমন একটা উদ্বেগ ও চিন্তায় ব্যাকুল। সবাই একধারে ব'সে বা দাঁড়িয়ে আপনার আপনার "পার্ট" (কাগজে লেখা তাঁর ভূমিকা) মুখস্থ করছে। কেউ বড় একটা কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করছে না। ম্যানেজারবাবু সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছেন আর সবাইকে বলছেন "দেখো বাবা, আমার মান রক্ষে কোরো! তোমার ওপোর আমার নাটকের "ছাক্-ছেক্" (success) নির্ভর করছে। নতুন নাটক "রাঠোর কুমারী" ম্যানেজার বাবুরই লেখা।

আমাকে ম্যানেজারবাবু দেখতে পেয়েই চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন,—"তোর কি এতক্ষণে আসবার সময় হ'ল বাবা দীনু?"

আমি অবাক্ হয়ে বললুম—"সে কি মশাই? আমি তো বেলা পাঁচটা থেকে এসে আপনার কাছে কাছে ঘুরছি!"

ম্যানেজারবাবু সে কথায় কাণ না দিয়েই বললেন—"বাজে কথা কস্ নি, বাজে কথা কস্ নি! এখন চ' দিকি একবার ষ্টেজে—" ব'লেই আমাকে একরকম টেনে নিয়ে ষ্টেজে যোগীবাবুর কাছে হাজীর হ'য়ে বললেন—"যোগীবাবু! এই এমন ওস্তাদ ছোকরা থাকতে "কেল্লা দখল" সিনে যুদ্ধের ভাবনা?"

যোগী। হাঁ, হাঁ, ঠিক বলেছেন। এর কথা আমার মনেই পড়ে নি। আর পড়বেই বা কি ক'রে? ও তো থিয়েটার ছেড়ে দিয়েছে শুনলুম। এখন নতুন কাকে—"

যোগীবাবুর কথায় বাধা দিয়ে ম্যানেজারবাবু বললেন—"সে কথা থাক্, সে কথা থাক! একে তা হ'লে একবার ঐ "সিনে" সৈন্যাধ্যক্ষের পার্ট টা বলিয়ে নিন্ যোগীবাবু! এই তো সবে সাতটা—এখনও তো ঘণ্টাখানেক ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে—"

যোগীবাবু বললেন—"সৈন্যাধ্যক্ষের পার্ট তো ভারী। খালি "মহম্মদ টোগ্‌লকের" সঙ্গে তলোয়ার ঘুরিয়ে লড়াই!"

ম্যানেজার। "তা ও ছোক্‌রা খুব পারবে। কিহে দীনু? একটু আধটু তলোয়ার ঘুরিয়ে লড়াই করতে পার্ব্বে না? বেশ একটু ফূর্ত্তি করে—

আমি বললুম—"কেন পারব না মশাই? দেখবেন একবার?"

যোগীবাবু বললেন—"আচ্ছা দেখি! যাও দিকি, সাজঘর থেকে দু'খানা তলোয়ার নিয়ে এস দিকি!"

আমি মহানন্দে তলোয়ার আনতে ছুটলুম। ছেলেবেলায় বাঁখারি নিয়ে তলোয়ার ঘোরানোটা এমন অভ্যেস্ করিছি,—যে গাঁয়ের কোন ছোক্‌রা আমি "বাঁখারি তরোয়াল" ঘুরুলে কেউ আমার সামনে এগুতে সাহস করতো না,—লড়াই করা তো চুলোয় যাক্! বাঁখারির জ্যায়গায় এ নয় সত্যিকার তরোয়াল!

দু'খানা তরোয়াল এনে যোগীবাবুকে দিলুম। যোগীবাবু নিজে একখানা নিয়ে, আমার হাতে একখানা দিয়ে বললেন—"ব্যাপারটা আগে শোনো। মহম্মদ টোগ্‌লক্ (যে পার্ট টা নীরোদবাবু সাজবেন) তরোয়াল নিয়ে কেল্লা দখল করতে যাবে। প্রথমে সে কেল্লায় যত সৈন্য থাকবে—(কেষ্টা, সিধে, ম্যান্‌কা, বিধু—) তারা একসঙ্গে তরোয়াল নিয়ে "নীরোদকে" অর্থাৎ "মহম্মদকে" আক্রমণ করতে যাবে, কিন্তু দু' একবার তরোয়াল ঠকাঠক্ কর্ব্বার পরেই সকলে পড়ে মরে যাবে। তুমি তখন বেরিয়ে বলবে—"পাপিষ্ঠ যবন! বীরবল এখনও জীবিত! তাকে পরাস্ত না করলে তোমার দুর্জ্জয় আশা কখনই সফল হবে না।—" এই কথা বলেই একেবারে তরোয়াল খুলে লাফিয়ে "নীরোদের" সঙ্গে যুদ্ধ করতে লেগে যাবে। তুমি "সৈন্যাধ্যক্ষ" কি না, তুমি একটু রীতিমত তলোয়ার খেলার কায়দা দেখিয়ে শেষকালে ধড়াস্ করে পড়ে যাবে।"

আমি বললুম—"পড়ে যাব?"

ম্যানেজার মশাই—"পড়ে যাবি বই কি বাবা! তুই না পড়লে মহম্মদ টোগ্‌লক্ কেল্লা দখল করবে কি করে? তুই মরে গেলে, তবে মহম্মদ টোক্‌লক্—"সরযূ বাঈকে" হরণ করতে পারবে!"

যুদ্ধের ব্যাপারটা ম্যানেজার মশাই এবং যোগীবাবু দুজনে মিলে আমাকে বেশ ভালরকম বুঝিয়ে দেবার পর, আমি "মালকোঁচা" বেঁধে তলোয়ার হাতে নিয়ে বেরুলুম লড়াই করতে "মহম্মদ টোগ্‌লকের" সঙ্গে। মহম্মদ টোগ্‌লকের পার্ট যদিও "নীরোদ শুঁড়ির;—তিনি এখন কষ্ট করে আপনার ঘর ছেড়ে আমাকে "পার্ট" শেখাবার জন্যে আমার কাছে আসতে রাজী নন্। সুতরাং তাঁর কাজটা যোগীবাবু "ব-কলমে" আরম্ভ করলেন। আমিও খুব স্ফূর্ত্তি ক'রে লেগে গেলুম দস্তুরমত একহাত তরোয়াল খেলতে! খানিকক্ষণ খুব কেরামতি দেখিয়ে তরোয়াল ঘুরিয়ে লড়াই দেখাতে দেখাতে যেই আমাকে দু'জনে বললেন—"এইবার পড়ে যাও—শুয়ে পড়—" আমি অম্‌নি ধপাস্ করে পড়ে গেলুম।

সকলেই ব'লে উঠলেন—"বেশ, চমৎকার হয়েছে!"

আমি গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দেখি—সামনে পেছনে আশে পাশে প্রায় সমস্ত একটর, একট্রেস্‌রা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাদের ভেতর থেকে "গিরিবালা" বিবি বেরিয়ে এসে ম্যানেজার বাবুর দিকে চেয়ে বললেন "ছোক্‌রাটী সকল দিকেই "এক্‌পার্ট" (expert) কি বলেন ম্যানেজার মশাই?"

ম্যানেজার মশাই একগাল দেঁতো হাসি হেসে বল্লেন—"হ্যাঁ—তা আর একবার ক'রে বলতে? বলেই শরৎকুমারীর দিকে একবার চেয়ে বললেন—"কি বল শরৎ?"

শরৎকুমারীর মুখখানা লজ্জায় যেন সিঁদুর বর্ণ হয়ে উঠলো। বেচারী এত লোকের মাঝখানে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তখুনি কিন্তু সে ভাবটা সামলে নিয়ে

বললে—"শরৎ একলা কেন বলবে? আপনারা কি বুঝতে পারছেন না,—ও এখানে অনেক বড় বড় একটারের চেয়ে কাজের লোক।" বলেই ফর্ ফর্ ক'রে (একটু যেন রেগে অন্যদিকে চলে গেল।

যা'হোক্—নতুন নাটকে আমার তবু একটা "পার্ট" হ'ল! শুধু পার্ট নয়, পার্টের মত পার্ট। খুব একটা "কারদানী" দেখাবার পার্ট। আনন্দে বুকটা যেন আমার ফুলে উঠতে লাগলো। তবে একটা কথা, নাটকখানা মস্ত বড়। পাঁচ অঙ্কে সমাপ্ত। আমার এ "পার্ট" সেই চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে। আমার "কারদানি" দেখাতে হবে সেই রাত্রি দুটো তিনটের সময়! ততক্ষণ কি দর্শক লোকজন ধৈর্য্য ধরে থাকবে? কিম্বা যদিও থাকে, হয়তো সবাই ঘুমিয়ে পোড়বে—নয় তো "ঢুলতে থাকবে। এঃ,—এটা যদি অন্ততঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় দৃশ্যে হ'ত।

দেখতে দেখতে রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা হোলো। ক্রমে লোকজন আসতে শুরু করলে। টিকিট ঘরে খুব ভীড়! পাণের দোকানে একটা ছোঁড়া বিশ্রী আওয়াজে হাঁকছে—"চাই—মিঠে পাণ, গোলাপী খিলি, সোডা, লিমনেড্ বরফ!"—ফটকের একপাশে একটা লোক বিশ পঁচিশটা খেলো হুঁকো কল্‌কেশুদ্ধ (তামাক সাজা, আগুন দেওয়া সমেত) আগলে নিয়ে হাঁকছে—"রামসুন্দরের তৈরী তামাক! তৈরী তামাক বাবু! তৈরী তামাক—এক এক পয়সায় ভরপুর, মজ্‌গুল, প্রাণ ভর—র—র্!"

দর্শক বাবুরা এক একটা খেলো হুঁকো নিয়ে শোঁ শোঁ করে টান্‌তে লেগে গেছেন! কেউ ফুঁ দিচ্ছেন,—কেউ কাশ্‌ছেন, কেউ এক টানে একমুখ জল মুখে পেয়েই "থুঃ থুঃ" করে ফেলে "রামসুন্দরের বাপের" পিণ্ডির ব্যবস্থা ক'চ্ছেন। কেউ বলেন—"আরে—কি তামাক রে বাবা! টেনে টেনে চোয়াল্ ব্যথা হয়ে গেল, ধোঁয়া বেরোয় না! তামাক নেই বুঝি?" কেউ বলে—"উঃ, বাবারে বাবা—কোথা থেকে এ চণ্ডাল গুড়ুক্ আমদানি করেছিস বাবা রামসুন্দর।"

তামাক খাবার আড্ডায় এ একটা ভারী মজার দৃশ্য। তখন তো সিগারেট বা বিড়ির রেওয়াজ মোটেই ছিল না।

একবার কন্‌সার্ট বেজে গেল। দ্বিতীয়বার কন্‌সার্ট শুরু হ'ল। এটা থামলেই ড্রপ্ উঠবে, থিয়েটার আরম্ভ হবে। আমি ফটকের ধারে দাঁড়িয়ে আছি—কখন্ দলবল নিয়ে মেজবাবু আসবেন, তাঁদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে। কারণ, ম্যানেজারবাবু এখন ষ্টেজের ভেতর থেকে বেরুতেই পাচ্ছেন না। দ্বিতীয় কন্‌সার্ট শেষ হয়ে গেল—থিয়েটার আরম্ভ হ'ল,—বাবুদের কারও দেখা নেই। আমি দোতলায় দাঁড়িয়ে থিয়েটার দেখতে সুরু করলুম। একবার করে ফটকের ধারে যাই—একবার ক'রে ভেতরে এসে থিয়েটার দেখি। মহা মুস্কিলে পড়া গেল।

দুটো একটা দৃশ্য অভিনীত হবার পর, মেজবাবুর মস্ত চৌঘুড়ী আর তার পেছনে চার পাঁচটা বড় বড় জুড়ী এসে থিয়েটারের ফটকের সামনে হাজীর। কনের বাড়ীতে বর এসে পৌঁছুলে যেমন কনে যাত্রীদের আনন্দ হয়, আমার ঠিক সেই ভাবটা হ'ল। আমি ফটকের ধারে না দাঁড়িয়ে একেবারে মেজবাবুর চৌঘুড়ীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। মেজবাবু যেন "নব কার্ত্তিকটী" সেজে এসেছেন। চৌঘুড়ী থেকে আগে তিনি নাবলেন। নেবেই আমাকে খুব নরম সুরে বললেন—"থিয়েটার আরম্ভ হয়েছে দীনু?"

আমি—"আজ্ঞে হ্যাঁ—" বলতে না বলতেই দেখি ম্যানেজারবাবু দন্তবিস্তার করে মেজবাবুর হাত ধরে বললেন—"এত দেরী করে এলেন বাবু। তিনটে সিন্ প্লে হয়ে গেল।" বলেই মেজবাবুকে হাত ধরে খাতির করে নিয়ে দোতলায় উঠলেন। ঠিক যেন "কন্যেকর্ত্তা" মশাই বরকে পাল্‌কী থেকে নামিয়ে কোলে করে নিয়ে "বিবাহ সভায়" চললেন। মেজবাবুর জন্যে যে তিনখানা বক্স ঠিক করা ছিল, তারই মাঝের খানায় ম্যানেজারবাবু "মেজবাবুকে" বসিয়ে বললেন—"আপনার জন্যে আজ বাঁড়ুজ্জে মশাইদের ড্রয়িংরুম থেকে ভাল ভাল কুশন্ চেয়ার, সোফা আনিয়ে রেখেছি। পুরোণো চেয়ারে তো আপনাদের বসাতে পারি না।"

মেজবাবু বললেন—"তা বেশ করেছেন। আমাকে বললেই হ'ত,—আমি বাড়ী থেকে পাঠিয়ে দিতুম।"

মেজবাবু থিয়েটার দেখতে এলেন, যেন কোন রাজা মহারাজা সাজসরঞ্জাম, লোকজন নিয়ে শিকার করতে এলেন।

সঙ্গে "লটু-বহরই" বা কত। তিনখানা বড় ল্যাণ্ডো জুড়ী-গাড়ী থেকে লোক নামলেন প্রায় "কুড়ী বাইশ"জন। চারটে বড় বড় রূপোর গড়গড়া, দু' ঝাঁকা ফুলের তোড়া, "গোড়ের মালা", ছোট ছোট বুকে আঁটবার "বোকে" ইত্যাদি। তিনজন খানসামা এক ডজন কাঁচের গেলাস,—একটা কাঠের বাক্সতে ভরা কি "মাল" দেখতে পেলুম না, (বিধু এপেণ্ঠিস্ বললে তাতে ভাল "হুস্কি" মদ আছে—), এক বাক্স মণটাক্ বরফ, এক ঝাঁকা সোডা-ভর্ত্তি বোতোল। চারজন খান্‌সামা "তকমা-টকমা" আঁটা, পোষাক পরা। লোকে থিয়েটার দেখবে কি? সকলের নজর ওপোর দিকে, বক্সের ওপোর। ষ্টেজে যারা অভিনয় করছিল, তারাও অন্যমনস্কে নিজেদের "পার্ট" বলা ভুলে গিয়ে "মেজবাবুর" থিয়েটারে শুভাগমনের বিরাট ব্যাপারের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

"বক্স" ভাড়া করা ছিল তিনখানা। তাতে এত লোক তো গাদাগাদী করে বসতে পারেন না! একটা বক্সে "মেজ বাবু" এবং তাঁর পেয়ারের বন্ধু "প্রসাদ" বাবু "পেসাদ" পাবার জন্যে গিয়ে বসলেন। আর দুটোতে ওরই মধ্যে যিনি যতটা পেয়ারের, সেই ওজনে আগে হতেই গিয়ে বসলেন। সে দুটোতে জন আষ্টেক বাবু "ধরলো"। বাকী দাঁড়িয়ে রইলো প্রায় দশ বারোজন, খানসামা চাকর বাদে। মেজবাবু ম্যানেজার বাবুকে বললেন,—"আর সব বক্সই বিক্রী হয়ে গেছে? দু' একখানা খালি নেই?"

ম্যানেজারবাবু খুব আপ্যায়িত ক'রে ব্যস্তভাবে বললেন,—"হোক্ বিক্রী! আপনি যদি বলেন, আমি এখুনি তাঁদের অন্য জায়গায় বসিয়ে বক্স খালি করে দিচ্ছি। আর ক'খানা বক্স চাই বলুন।"

মেজবাবু "তা কি পার্ব্বেন? ভদ্রলোকেরা পয়সা দিয়ে এসেছেন,—ছেড়ে দেবেন কি?"

ম্যানে। "ছেড়ে দেবে না? এমন ম্যানেজারি আমি করি না। আপনার জন্যে আমি কি না পারি? তারা অন্য জায়গায় বসতে রাজী না হয়,—আমি এখুনি তাদের দাম ফিরিয়ে দিচ্ছি। ক'খানা বক্স চাই? বারোজন আছেন বুঝি? তা হ'লে তিনখানা হ'লেই হবে—"

ব'লেই "হুম্‌কো-ধুম্‌কো" হয়ে ম্যানেজারবাবু অন্য তিনটে বক্সের লোকেদের কাণে কাণে কি বললেন,—তাঁরা শোনবামাত্রই সুড় সুড় করে উঠে নীচে নেমে গেল।

সেই নারানবাবু—(যাঁকে বাবু সেদিন নিজের বৈঠক-খানা থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—) গলায় হাতে মাথায় ফুলের মালা জড়িয়ে একগাল দেঁতো হাসি হেসে বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন,—"মেজবাবু বক্‌স্ চাইছেন শুনলে দেশে এমন কোন্ শালা আছে যে বাপের সুপুত্তুর হয়ে ছেড়ে দেবে না?"

"চুপ্ কর ষ্টুপিড! ভদ্রলোকদের গাল দিতে হবে না—" বলেই মেজবাবু হতভাগাটাকে এক ধমক্ দিলেন।

ম্যানেজারবাবু ব্যস্তভাবে এসে বললেন—"বলবামাত্রই ভদ্রলোকেরা নীচে চলে গেলেন। অবিশ্যি—টাকা আমি তাঁদের ফিরিয়ে দোবো। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারই করা উচিত। তা হ'লে—আপনার লোকদের ঐ তিনখানা বক্সে গিয়ে বসতে বলুন।"

মেজবাবু। "বাস্তবিক, আমি খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। ভদ্রলোকেরা পয়সা দিয়ে এসে বসেছেন, আপনি বলবামাত্রই উঠে চলে গেলেন—"

ম্যানে। "যাবে না? একটুও খাতির যদি publicএর কাছে এ গরীব ব্রাহ্মণের না থাকবে মেজবাবু, তা হ'লে এতকাল "মেনেজুরি" করলুম কি ঘাস কাটতে?"

বাকী বারোজন বাবু বসলেন গিয়ে সেই তিনটে বক্সে। ম্যানেজারবাবু সকলকে বসিয়ে দিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"দীনু—তুমি তা হ'লে আমার প্রতিনিধি হ'য়ে মেজবাবুর কাছে থাক,—আমি হেঁ হেঁ—মেজবাবু, আজ একটু ভেতরে ব্যস্ত থাকব, নতুন বই—হেঁ—হেঁ—হেঁ—"

মেজবাবু। "যান্, যান্, আপনি এখানে থেকে কি কর্ব্বেন আমি দীনুকে দিয়ে বক্‌সের দাম এখুনি—"

ম্যানে। থাক্—থাক্—তার জন্যে আর ভাবনা কি? বক্‌সের আবার দাম দেবেন কি? এ থিয়েটার তো আপনারই! আপনারই তো সব—হেঁ—হেঁ—হেঁ—! তা হ'লে দীনু তুই থাকিস বাবা,—মেজবাবুর যদি কিছু আমাকে বলবার কইবার দরকার হয়, তুই গিয়ে—বুঝলি—" ব'লেই ম্যানেজার মশাই প্রস্থান করলেন।

আমি মেজবাবুর বক্সের পেছনে দাঁড়িয়ে রইলুম। মেজবাবু আমাকে সস্নেহে বললেন—"দীনু! তোমার এ নাটকে কোন পার্ট নেই ?"

আমি। "আজ্ঞে আছে। সেই চতুর্থ অঙ্কের শেষকালে।"

মেজ। "বটে বটে! আচ্ছা দেখা যাক্ তুমি কি রকম প্লে কর—"

প্রসাদ বাবু গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"সেই চতুর্থ অঙ্কের শেষে ? ও বাবা—অত রাত্তির পর্য্যন্ত কে থাকবে ?"

মেজ। তুমি চলে যেও। আমি দীনুর প্লে না দেখে এখান থেকে যাচ্ছি না। তা সে যত রাত্তিরই হোক্!"

প্রসাদবাবু তৎক্ষণাৎ ব'লে উঠলো—"বটেই তো! দীনুর প্লে দেখতে হবে বইকি! দীনুর প্লে দেখব বলেই তো এসেছি, নিশ্চয়ই দেখব। সমস্ত রাত কেটে গেলেও দেখব"—

আমি প্রসাদবাবুর কথা শুনে মনে মনে হাসতে লাগলুম, এ রকম না বল্লে কইলে কি বাবুর "পেয়ারের" বন্ধু—(যাকে চল্‌তি কথায় বলে "মোসাহেব") হ'তে পারেন ?

ষ্টেজে অভিনয় হ'চ্ছে—বাবুদের সেদিকে তেমন লক্ষ্যই তো কারও দেখছি না! মাঝে মাঝে এক একবার ষ্টেজের দিকে চাইছেন,—আর আপনা-আপনি গল্প কচ্ছেন। যেই কোন স্ত্রীলোক অভিনয় কর্ত্তে বেরুচ্ছে, বাবুরা তার দিকে মন নিবিষ্ট করে দেখছেন—আর চুপি চুপি কি বলাবলি কচ্ছেন! খানিক পরে দুজন খানসামা বোতল, গেলাস, সোডা, বরফ এনে মেজবাবুর কাছে উপস্থিত। বুঝলুম এইবার বড়-মানুষি পালা গাওনা সুরু হবে। আমি সেখান থেকে একটু তফাতে গিয়ে দাঁড়ালুম। সর্ব্বাগ্রে "দেবতার ভোগ,"—অর্থাৎ মেজবাবু সবার আগে "গেলাস" ধরে "হুস্‌কি সেবন" করলেন! তারপর "প্রসাদবাবু" কায়স্থ সন্তান, অন্য গেলাসে খানসামারা তাঁকে "মদ্য" ঢেলে দিয়েছিল, তিনি সে "মদ্য" বাবুর উচ্ছিষ্ট গেলাসে (একটু যা বাকী পড়েছিল—তার সঙ্গে মিশিয়ে) ঢেলে—"সুবর্ণ বণিকের" মহাপ্রসাদ ধারণ ক'রে ধন্য হ'লেন ? এর তাৎপর্য্য বুঝলেম—মেজবাবুকে বেশী রকম আপ্যায়িত করা! কিন্তু আমার মনে সন্দেহ হয়, তাতে মেজবাবু কি "পেয়ারের" বন্ধুটীকে বেশী "পেয়ার" কর্ব্বেন,—না, বেশী "ঘেন্না" কর্ব্বেন ? কি জানি ? এ সব ব্যাপার মেজবাবুই জানেন—আর তাঁর "মোসাহেবরাই" জানেন!

চুলোয় যাক্—ও সব বাজে কথায়! দেখতে দেখতে খানসামা চারজন ঘুরে ঘুরে মেজবাবুর সকল "সাঙ্গোপাঙ্গ" অর্থাৎ নন্দীভৃঙ্গিদের একবার মদ্য খাওয়ানো কার্য্য সমাধা করলে। চারটে "বক্সে" চারটে গড়গড়ায় মুহুর্মুহুঃ তামাক বদলে দেওয়া হচ্ছে! "মদ্য" দানের প্রথম পর্ব্ব শেষ হবার মিনিট পনেরো বাদেই খানসামারা বাবুর বন্ধুদের সকাতর অনুরোধে আবার দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু করে দিলে। ক্রমে তৃতীয় পর্ব্বও দেখতে দেখতে শেষ হ'ল। এমন সময় একজন খানসামা আমাকে বললে—"বাবু আপনাকে খুঁজছেন!"

আমি তাড়াতাড়ি বাবুর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। গিয়ে দেখি বাবুর মেজাজ তখন "দেল্‌খোস্" গোছের! আমাকে সামনে দেখেই বাবু প্রসাদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বক্সের দাম কত দেওয়া যায় প্রসাদ ?"

প্রসাদ একটু যেন বিরক্ত হ'য়ে বললেন—"দিন্‌না গোটা পঞ্চাশ টাকা! ভারি তো বক্‌স্।"

মেজবাবু একটু রেগে বললেন—"তোমার অত ছোট মন বুঝলে পেসাদ! তোমার মান আর আমার মান, দুয়েতে বিস্তর তফাৎ। ভদ্রলোক কত খাতির আজ আমায় করলে তা বুঝতে পারছ ?"

একটু "কাঁচুমাচু" হ'য়ে প্রসাদ তখুনি বললে—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা—তা করেছে! কর্ব্বেই তো—কর্ব্বেই তো! আপনি তো যে সে লোক নন্,—মণ্ডল বাড়ীর মেজবাবু! "ডাক্‌-সাইটে" নাম! তা দিন্—দিন্—গোটা ষাটেক টাকা—"

"চুপ করে থাকো—গাধা কোথাকার!" বলেই মেজবাবু পকেট থেকে কুড়ীখানা দশ টাকার নোট অর্থাৎ দুশো টাকা গুন্‌তি ক'রে আমার হাতে দিয়ে বললেন—"কি বল দীনু! দুশো টাকা দিলে হবে না ?"

আমি হাত জোড় করে বললুম—"আজ্ঞে আপনার নামের উপযুক্তই হবে।"

মেজ। "যাও—এই বেলা ম্যানেজার বাবুর হাতে দিয়ে এসো—"

আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছি দেখে মেজবাবু আমাকে ডেকে বললেন—"আর দেখ দীনু, গোটাকতক ফুলের তোড়া আর কিছু মালা নিয়ে গিয়ে ভেতরে এই—এই সব—"

প্রসাদবাবু তৎক্ষণাৎ বলে ফেল্লেন—"গিরিবালাকে দিয়ে বলবে যে মেজবাবু——"

মেজবাবু বললেন—"হ্যাঁ—বলো যে তার প্লে দেখে আমি খুসী হয়ে উপহার দিইছি——"

খানসামা এক ঝুড়ি ফুল এনে আমার হাতে দিতেই আমি জিজ্ঞাসা করলেম—"আজ্ঞে শুধু কি গিরিবালা বিবিকে দোবো ?"

প্রসাদ। "নিশ্চয়ই।"

মেজবাবু বললেন—"না না,—তুমি চুপ করো প্রসাদ। শুধু একজনকে নয়, যারা বড় বড় পার্ট করছেন—"

আমি। "একটরু বাবুদেরও ?"

প্রসাদ। "ঝাঁটা মারো একটারদের মাথায়—"

মেজবাবু গড়গড়ার নলটা দিয়ে ঠকাস্ করে প্রসাদবাবুর মাথায় মেরে বললেন—"তুমি শালা অতি বেকুব-গাধা! আমার কথায় কথা কইতে বারণ কচ্ছি না ?" পরে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"হ্যাঁ—দু'চার জনকে দেবে বই কি ?"

প্রসাদ। "মোদ্দাৎ ঐ নীরো শুঁড়ি বেটাকে দিস্‌নি,—খবরদার—"

আমি তার কথায় কর্ণপাত না করে বললুম—"তাহলে আমি একজন খানসামাকে সঙ্গে করে কতকগুলো ফুল নিয়ে যাই——"

বাবু তৎক্ষণাৎ একজন খানসামাকে হুকুম করলেন—ফুলের একটা ঝাঁকা আমার সঙ্গে ভেতরে নিয়ে যেতে ?

আমি টাকা ও ফুল নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি এমন সময় দেখি—প্রসাদবাবু তাড়াতাড়ি এসে আমার কাছে উপস্থিত! আমি ভাবলুম—মাতাল বেটা বুঝি বা বিভ্রাট ঘটায়।

প্রসাদবাবু আমাকে বললেন—"এই ভাল "বোকেটা" আর এই সোনালি তবক্ দেওয়া পান ক'টা "শরৎকুমারী" বিবিকে দিয়ে বলবে—"প্রসাদবাবু নিজে তোমাকে লুকিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছেন! দোহাই বাবা দীনু, দিস্ তাকে!"

রাগে আমার সর্ব্বশরীর জ্বলতে লাগলো। ভাবলুম, বাবুকে গিয়ে ব'লে দিই। আবার তখুনি মনে হ'ল, বাবুর যে রকম মেজাজ, তার ওপোর পেটে দু'পাত্র মদ পড়েছে, এখুনি আমার মুখে একথা শুনলে প্রসাদবাবুকে হয়তো "গোবেড়েন্" করে দেবেন। আমি কোন কথা না ব'লে তাঁর হাত থেকে ফুলের "বোকে" ছুটো আর সোনালি তবক্ দেওয়া সেই পান কটা নিয়ে চলে গেলুম।

সে সময় প্রথম অঙ্ক শেষ হয়ে "ড্রপ্" পড়েছে। আমি ষ্টেজের দরজার কাছে গিয়ে সেই "সোনালি তবক্" দেওয়া গোটা দুই পান নিজের মুখে পুরে বাকী কটা ট্যাঁকে গুঁজে ফেললুম। তারপর বোকে ছুটোকে ছুঁড়ে বাজারের মাঠের দিকে ফেলে দিয়ে—খানসামাকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেজের ভেতর ঢুকলুম।

আমাকে দেখেই ষ্টেজের যত অভিনেতা অভিনেত্রী সেখানে আমার কাছে এসে জড় হ'ল। আমি খানসামাকে ঝাঁকা রেখে চলে যেতে বলে—ম্যানেজার মশায়ের হাতে দুশোখানি টাকা দিলুম।

ম্যানেজার মশাই একেবারে যাকে বলে "আহ্লাদে আটখানা।"

ফুলগুলো তাঁরই জিম্মায় দিয়ে বললুম—"বাবু বলেছেন, ম্যানেজার বাবুকে বল—বড় বড় অভিনেতা অভিনেত্রীদের তিনি নিজের হাতে বিলি করে দিন্।"

গিরিবালা বিবির কথা যদিও আমি নিজে কিছু বললুম না বটে, ম্যানেজার বাবু "খলিফা" লোক, তিনি তখুনি গিরিবালাকে নিজেই বললেন—"গিরিবিবি ফুলগুলো তুমি নাও, মেজবাবু তোমার "প্লে" দেখেই বিশেষ খুসী হয়েছেন,—তাই "ভেট" পাঠিয়েছেন বুঝতে পাচ্ছি। হা—হা—হা—হা—" বলেই সেই মামুলি হাসি হাসতে হাসতে টিকিট ঘরের দিকে টাকা নিয়ে চলে গেলেন।

(ক্রমশঃ)

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(১১)

"রাবেয়া।"

"কেন দাদাভাই।"

"মৌলভী সাহেব এসেছেন...এস পড়বে তো?"

কক্ষ মধ্য হইতে চঞ্চল চরণে বাহির হইয়া নীল নয়ন ঘুরাইয়া রাবেয়া উত্তর দিল—"আজ আর পড়তে ভাল লাগছে না দাদাভাই।"

"তবে ওস্তাদজীকে খবর দি, গান কি সেতার শেখ।"

সজোরে কর্ণাভরণ দুলাইয়া রাবেয়া উত্তর করিল—"নাঃ তাতেও দিল লাগছে না।"

মোহাম্মদ ফজলুল হক, নাতিনীর বাক্যের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া ভাষাহীন নয়নে রাবেয়ার শান্ত মুখের শোভা দেখিতে লাগিলেন।

দাদা মহাশয়ের গলা ধরিয়া রাবেয়া প্রশ্ন করিল—"অমন করে কী দেখছ দাদাভাই?"

"দেখছি তোর মুখের ভাব, যদি তাতে তোর মনের কথা বুঝতে পারি।"

কৌতুকভরা স্বরে রাবেয়া বলিল—"আচ্ছা দাদাভাই বলতো দেখি আমার মনে আজ কী ইচ্ছে যাচ্ছে।"

"দাঁড়া সবুর কর বলছি,...হুঁ, তোর মনে এখন ইচ্ছে যাচ্ছে ঐ আশমানটাকে হাতে ধরতে।"

"দুর ওতো ছাই ঠাট্টা, ঠিক বলতে পারলে না, ছিঃ।"

"তবে মণিয়া বাঈজীর গান শুনতে—।"

"যাও।" রাবেয়া গমনোন্মুখী হইল। মোহাম্মদ হক হাসিয়া বলিলেন—"তবে আমার মত বুড়ো বরকে সাদী করতে?"

"না তাও ঠিক বলতে পারলে না।"

হাল ছাড়িয়া হক মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"তবে হার মানলুম দিদি, এ গুঢ় রহস্য তুই-ই ভেঙ্গে দে।"

রাবেয়া সেইখানে বসিয়া একটু ভাবিয়া বলিল—"আমার ইচ্ছেটা কি জান, আমাদের ঐ আটচালাতে খদ্দর সমিতি বসাতে হবে, তারপর অমলদা' তো পুরুষের উন্নতি সাধনে চেষ্টিত হ'য়েছেন। আমি চাই...আমাদের হিন্দু নারীও সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের সহায়তা করবে। এই পাশের পোড়ো ঘরটায়, আমি একটা মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল খুলব .. তাতে লেখাপড়াও শিখতে পারবে, সুতা তোলা শিখবে, শিল্প বিদ্যায় পারদর্শী হবে, গৃহকর্ম্ম নিপুণ ভাবে শেখান হবে, আবার সময় থাকলে সঙ্গীতেরও একটু আধটু চর্চ্চা করবে... কি বল দাদাভাই, দেবে তোমার জায়গা?"

"দেব না কেন দিদি, তোমার কোন্ সাধটা আমি অপূর্ণ রেখেছি; তোমার সৎ সাধনায় আমি বাধা দিয়ে পাপের ভাগী হব কেন? তবে এই একটা ভাবনা...তারা মুসলমানীর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে কেন?"

রাবেয়ার মুখে ক্ষণিকের তরে বিষাদ ঘনীভূত হইয়া আসিল। পরে সে ভাব কাটাইয়া প্রশ্ন করিল—"কেন করবে না? তা হলে গ্রামের হিন্দু পুরুষরা তোমার কথা মানছে কেন?"

"তাদের কথা ছাড় দিদি, তারা পুরুষ, কিন্তু হিন্দু নারীদের কথা স্বতন্ত্র, তাঁদের বড় কড়া বাছ-বিচার...তাঁরা আমাদের ছায়ায় গোবর জল ঢেলে দেন।"

"আচ্ছা তাদের না পাই, ছোট ছোট মেয়েদের তো পাব?"

চিন্তিত ভাবে হক বলিলেন—"কি জানি ভাই? আচ্ছা এ ফন্দী তোর মাথায় কে ঢোকালে?"

ব্রীড়া সঙ্কুচিত বদনে সলাজে রাবেয়া বলিল—"অমলদা'র সেই বন্ধুটি ...."

হক সাহেব এতক্ষণে রাবেয়ার বাক্যের গূঢ়ত্ব বুঝিয়া বোধ হয় সন্তুষ্ট হইলেন না। বিমর্ষ মুখে বলিলেন—"ও। সেই পাগলা ছোকরাটির কথা এখনো মনে করে রেখেছিস রাবেয়া? সে যে হিন্দু ভাই, তার খেয়ালে তোকে মাত্‌লে তো হবে না ভাই; সে তার বন্ধুর কাছে আসবে, চলে যাবে, সে কি আর আমাদের কাছে আসবে? দেখছিস না খবর দেব বলে, এখন একেবারেই ডুব মেরেছে।"

রাবেয়া ধীরে ধীরে বলিল—"বোধ হয় তাঁর কোন বিপদ হ'য়ে থাকবে…"

ফজলুল হক মাথা নাড়িলেন। মনে মনে বলিলেন—বিপদ তার হয় নি। বিপদ তোমাকে নিয়ে বাধবে।"

অধীরা রাবেয়া বলিল—"কথার জবাব দিলে না যে দাদাভাই।

"তা কি জানি দিদি; আচ্ছা অমল আসুক, পরামর্শ করা যাবেখ'ন।"

"কিসের পরামর্শ দাদাভাই " অমলকুমারকে সহাস্য বদনে গৃহ প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া রাবেয়া আনন্দোৎফুল্লকণ্ঠে বলিল—"দেখছেন ভাই সাহেব—দাদাভাই আমার কথায় রাজী হচ্ছেন না "

আসন গ্রহণ করিয়া অমলকুমার হকের দিকে ফিরিয়া বলিল—"রাবেয়ার কোন কথাতে রাজী হচ্ছেন না দাদা ভাই ?"

হাসিয়া হক বলিলেন—"কথা বলো না ভাই আবদার বল, সেই যে তোমার কোন বন্ধু…কি নাম তার, হ্যাঁ হ্যাঁ মানস বুঝি,…সে, সেবারে এসে বলে গেছল যে শুধু পুরুষ জাগলে হবে না, নারীদেরও কর্ম্মে এগোতে হবে…সেই জন্যে তাদের শিক্ষার আগে দরকার। ও এখন আমার কাছে আবদ্ধ এনেছে সামনের আটচালাতে খদ্দর সমিতি বসাবে, আর মেয়েদের বিদ্যালয় স্থাপনা করতে হবে…তাতে আজকালকার দেশোপযোগী সমস্ত শিক্ষাই দেওয়া হবে।"

অমলকুমার সস্নেহ কণ্ঠে বলিলেন—"এত সুন্দর মতলব রাবেয়া, দাদাভাই না মত দেন আমি তোমার হ'য়ে দাদা-ভায়ের মত চেয়ে নেব। তা শিক্ষয়িত্রী তুমি হবে তো ?"

অমলের আগ্রহ দর্শনে মনে মনে উৎসাহিতা হইয়া রাবেয়া বলিল—"আমার একার দ্বারায় কি সম্ভবপর হবে ভাই সাহেব ?"

"খুব হবে…তুমি স্কুল খোল ত, তারপর আমিও যোগ দেব…।"

হক সাহেব প্রীতিভরা নেত্রে উভয়ের পানে চাহিয়া বলিলেন—"যাক্ তোমরা তো এ সমস্যাটি একরকম নিষ্পত্তি করে নিলে, কিন্তু যার কথায় এত বড় অনুষ্ঠানটি হবে…তিনি কার্য্যক্ষেত্রে নামবেন না ?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তার সেখানকার কাজ ফুরোলেই এখানে আসবে…।"

রাবেয়া ঊর্দ্ধমুখী হইয়া অমলের কথা শুনিতেছিল। রাবেয়ার দুই নয়নের প্রশ্ন বুঝিয়া বলিল—"কাল তার একখানা চিঠি পেয়েছি, সে লিখেছে যে তার মত কেউ সেখানে মানতে রাজী হচ্ছে না, কারণ তার বাপের সঙ্গে সেখানকার জমীদারের সঙ্গে কি ঘরোয়া ব্যাপারে ঝগড়া হয়, এখন যদিও তারপর বহুদিন অতীত হয়ে গ্যাছে, সে জমীদারও মৃত, তথাপি তার নায়েব, আমলাতন্ত্র সে কথাটা না ভুলে মানসের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।"

হক সাহেব গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"তবে যে তুমি সেদিন বললে যে মানস সেখানে দাতব্য চিকিৎসালয়, ঔষধালয়, খাদি প্রতিষ্ঠান করেছে ?"

অমল বলিল—"করেছে সত্য, কিন্তু দু' চারটে, তাতে কি হবে ? আমাদের এই অবসাদগ্রস্ত, ঘুমিয়ে পড়া সমস্ত জাতির জড়তা দূর হওয়া একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে… বোধ হয় আমিও শীগ্‌গীর কল্যাণপুর যাব।"

"তুমি গিয়ে কী করবে অমল ?"

"আমি গিয়ে যথাযথ চেষ্টা করবো, আমাদের জাতীয়তার উন্নতি লাভ করতে হলে প্রথমে M, A, B, A, ইত্যাদি পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবকদের মনোবৃত্তির বিশেষ প্রয়োজন। তারপর আমাদের শ্রমিকদলের অর্দ্ধেকের উপর আজকাল জাত ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে কলকাতার বাবু হ'তে ছুটছে, তাদের যেমন করে হোক ফেরাতে হবে।"

"কেন ?"

"তারা দেশে ফিরে নিজের নিজের ব্যবসায় আরম্ভ করে দেশের টাকা দেশের সাহায্য কল্পে জমা করুক। আমাদের আর তো অলস হ'য়ে বসে থাকলে চলবে না। এই ঘন তমোময় যুগের বক্ষে নবযুগের আলোর প্লাবন ছুটাতে হবে। আমরা চাই একতা। আমরা চাই হিন্দু মুসলমানের মহা মিলন। হিন্দু মুসলমান দুটি ভাই হ'য়ে জগতের বুকে দাঁড়াবে…আমরা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সাদরে হৃদয়ে আশ্রয় দিয়ে বলব—দেখ তোমরা আমাদের ত্যাগ করেছ . কিন্তু আমরা তোমাদের ত্যাগ করি নি…ভালবাসলেই ভালবাসা পাওয়া যাবে। এই আমাদের স্বরাজ্য লাভের প্রধান উপায়। এর প্রবর্ত্তক ঋষি মহাত্মা গান্ধী…। নন্‌কো-অপারেশন বা অসহযোগ এর সাধনা। আচ্ছা যাক্, চল রাবেয়া তোমার স্কুল ঘরটা দেখে আসি। দিন্ দাদাভাই, ঘরের চাবিটা খুলে দিন।"

ফজলুল হক গভীর সুরে বলিলেন—"দাদাভাই আমাকে কথার ছলে ভুলিয়ে ঘরখানা কেড়ে নিলে ? চল ভাই, তোমাদের এ অনুরোধ এড়ান আমার সাধ্য নয়।"

(ক্রমশঃ)

ক্লিয়োপেট্রা।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১৮ই আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩। [৩১শ সপ্তাহ

চিত্রে ইতিহাস

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম্ এ]

শুনতে পাওয়া যায় যে আগে টেষ্ট টিউবের পরিবর্ত্তে অধ্যাপক তাঁহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি দেখাইয়া রসায়ণ শাস্ত্র পড়াতেন। আজকাল এ কথাটা আমরা একটা নিছক পরিহাস বলে মনে করি। কিন্তু এদেশে ইতিহাসের অধ্যাপনাও অনেকটা ঐ রকমভাবে হয়ে থাকে। ইতিহাসের অধ্যাপকেরা ক্লাসে এসে হয় নোট্ দেন নয় বক্তৃতা করেন। ছাত্রেরা নিতান্ত পরীক্ষা পাশের খাতিরে তাহাতে মন দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইতিহাসের সঙ্গে সত্যিকারের পরিচয় যে তাদের হয় না তা বোঝা যায় সাধারণের মধ্যে ইতিহাসের নামে বিভীষিকার ভাব দেখে। কোন একটা জাতির কোন বিশেষ যুগের ইতিহাস বোঝাতে গেলে সেই দেশের বা সেই কালের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শুধু মুখের কথায় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র আংশিক ভাবেই বোঝান যেতে পারে। এই জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস পড়ান হয় চিত্র ও মডেলের সাহায্যে। ক্লাসে বড় বড় ছবি সেখানে দেখান হয়। ছবিতে ইতিহাসের বর্ণিত ঘটনা থাকে ও আলোচ্য যুগের শিল্পকলা বেশভূষা প্রভৃতির পরিচয়ও থাকে। ছবিগুলি ঐতিহাসিক প্রণালীতে অঙ্কিত বা আলোক চিত্র। আর ইতিহাসের বর্ণিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের মূর্ত্তিও ছেলেদিগকে দেখান হইয়া থাকে। ইহাতে ছেলেরা ইতিহাস পড়িতে আনন্দ পায়, আর সেই জন্যই বড় হইয়া তাহারা ইতিহাসের আদর করিতে শিখে কিন্তু আমাদের দেশে দেওয়ালে টাঙ্গান ছবি কিনিবার পয়সা কোথায়? তাই আমাদের "ঢাল নাই তরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দ্দার" হইয়া ইতিহাস পড়াইতে হয়। অনেক কলেজে আবার ঐতিহাসিক মানচিত্র পর্য্যন্ত নাই। সুতরাং

এদেশে ছেলেরা যে ইতিহাস পড়ার নামে ভয় পাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

অথচ চিত্রের সাহায্যে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস পড়াইবার বহু উপকরণ সংগৃহীত হইয়া আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের মিউজিয়াম গুলিতে যে সমস্ত ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে তাহার কতকগুলির ফটো ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ তাঁহাদের নৈপুণ্যের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিত্র ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের মধ্যে সেই যুগের সভ্যতার ছাপ সুস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাহা বিশ্লেষণ করিয়া কেমন করিয়া দেশের ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া যাইতে পারে, তাহা সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় বৈশাখের "প্রবাসী"তে
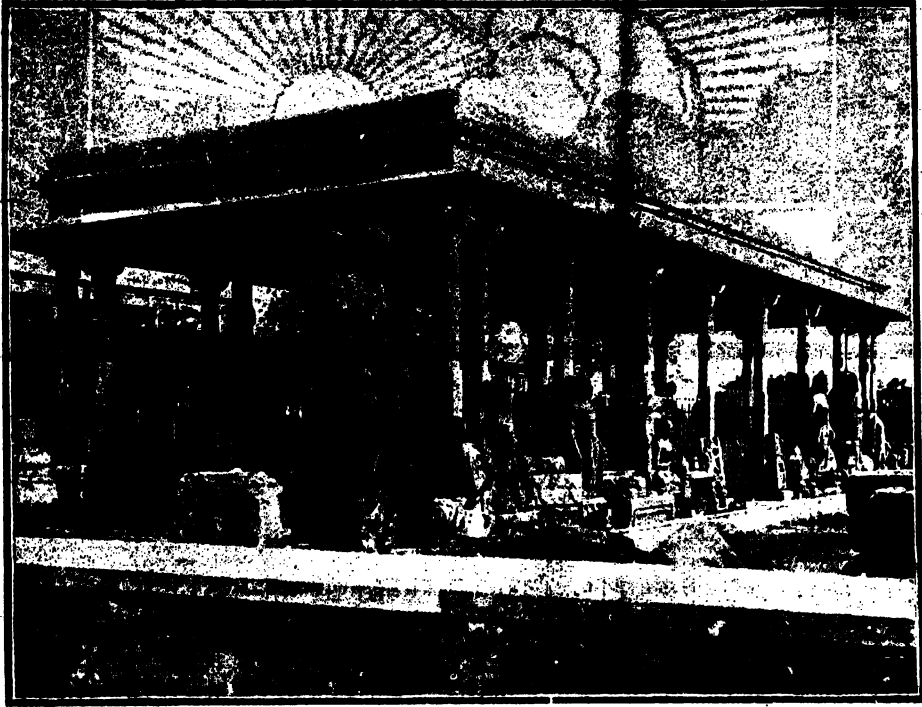
সারনাথের মিউজিয়াম।

লইয়া, দেওয়ালে টাঙ্গাইবার উপযোগী চিত্র করিয়া লওয়া যাইতে পারে। চিত্রগুলিকে যুগ অনুসারে সাজাইয়া তাহার সাহায্যে যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ান যায়, তাহা হইলে অধ্যাপনা যেমন চিত্তাকর্ষক হয়, তেমনি স্থায়ী ফলপ্রদ হয়।

প্রাচীনকালে আমাদের দেশে ইতিহাস লেখা হইত না বলিয়া একটা কথা শোনা যায়। কিন্তু অজান্তা, ইলোরা, মথুরা, সারনাথ প্রভৃতি দেখিলে এ কথাটা কতটা যুক্তিসহ সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। উল্লিখিত স্থানগুলিতে যুগে যুগে প্রকাশিত "গৌড়ের অধঃপতন" নামক প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝা যাইবে।

যে সকল স্থানে শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি সংগ্রহ থাকিত, সেগুলি সেকালে তীর্থস্থান ছিল। সহস্র সহস্র নরনারী যাইয়া তাহা দর্শন করিয়া আসিত। তাহাতে অনেকেই দেশের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় পাইতেন। আবার কোথাও কোথাও শিল্পাগারের নিকটেই বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। সুতরাং ছাত্রেরা এই সকল মূর্ত্তি প্রভৃতি সশ্রদ্ধভাবে অধ্যয়ন

করিবার সুযোগ পাইত। এখন লোকে তীর্থ যাত্রা করিতে গেলেও এ সব শিল্পাগার দর্শন করে না। সেই জন্য বিভিন্ন দেশের মিউজিয়াম গুলির বিশিষ্ট মূর্ত্তিগুলির ফটো বড় করাইয়া ছেলেদের সামনে ধরা উচিত। এইরূপ করিলে ইতিহাসের অধ্যাপনা কত সরস হইতে পারে তাহা সারনাথের কয়েকটী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া একটু দেখাইব।

বুঝিতে পারা যাইবে। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে হয়তো নোট্ লেখাইয়া ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু সাধারণের বোধগম্য করিয়া মূর্ত্তি স্থাপনার দ্বারা যে ইতিহাসকে সরল করিয়া উপস্থিত করা হইয়াছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এই প্রবন্ধের সহিত প্রদত্ত ৩নং চিত্রখানি হইতে মোটা-

সারনাথ।

মুটি রকমে বুদ্ধদেবের জীবনী ও ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস জানা যায়। এই চিত্রখানি গুপ্তযুগে প্রস্তরে খোদিত একখানি চিত্রের প্রতিলিপি। ইহার সর্ব্বনিম্ন অংশে বুদ্ধদেবের জন্ম-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা হইয়াছে। চিত্রের বামভাগে বুদ্ধজননী রাণী মায়াদেবী শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন বুদ্ধদেব শ্বেতহস্তী রূপে তাঁহার গর্ভে আবির্ভূত হইতেছেন। চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে বুদ্ধদেবের ভূমিষ্ঠ হইবার ঘটনা অঙ্কিত রহিয়াছে। কপিলবস্তুর নিকটে লুম্বিনী উপবনে মায়াদেবী শালপুষ্প

সারনাথ বৌদ্ধদিগের চারিটী প্রধান তীর্থের মধ্যে একটি। কেননা বুদ্ধদেব এইখানেই সর্ব্ব প্রথমে বৌদ্ধধর্ম্ম চক্র প্রবর্ত্তন করেন ও বিরাট বৌদ্ধসঙ্ঘের মূখবীজ বপন করেন। সারনাথের ভাস্কর্য্য হইতেই ইহার বিবরণ বুঝাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সারনাথে মৌর্য্য শুঙ্গ কুশাণ গুপ্ত ও পাল যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শন সংগৃহীত হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তি ভাল করিয়া দেখিলেই বৌদ্ধধর্ম্মের মোটামুটি একটা ইতিহাস

দক্ষিণ হস্তে চয়ন করিতেছেন। তাঁহার বামে তাঁহার ভগিনী প্রজাপতি নবজাত বুদ্ধদেবকে ধরিয়া আছেন। নাগরাজ নন্দ ও উপানন্দ কুম্ভ হইতে সহস্রধারায় গৌতমকে স্নান করাইতেছেন।

—তাঁহার সহিস ছন্দক তাঁহার হাত হইতে উহা লইতেছে। অশ্বের পিছনে ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা অঙ্কিত রহিয়াছে। গৌতম মস্তকের কেশ তরবারি দিয়া কাটিয়া ফেলিতেছেন। তাহার পিছনে দেখা যাইতেছে যে সুজাতা উপবাসক্লিষ্ট
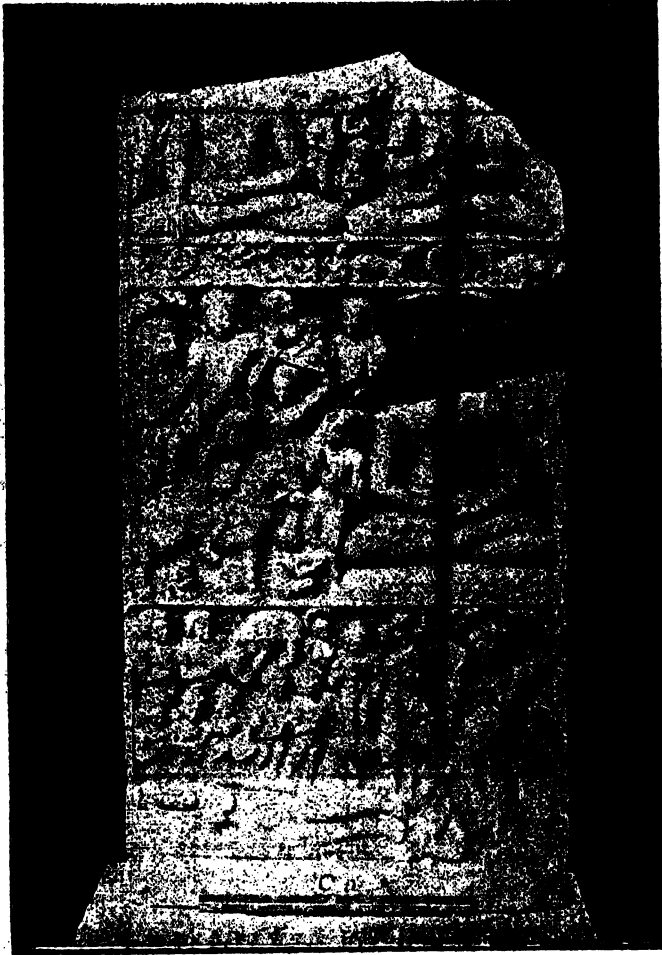
বুদ্ধের জীবনের প্রধান ঘটনাবলী।

৩নং চিত্রের মধ্যভাগে রাজপুত্র গৌতমের গৃহত্যাগের বিবরণ অঙ্কিত হইয়াছে। গৌতম কপিলবস্তু হইতে পলায়ন করিতেছেন। তিনি তাঁহার সুসজ্জিত "কণ্টক" নামে অশ্বে আরোহণ করিয়া নিজের গায়ের অলঙ্কারাদি খুলিতেছেন

গৌতমকে পায়সান্ন দিতেছেন। সুজাতার পাশে গৌতম নাগরাজ কালিকের সহিত কথোপকথন করিতেছেন।

৩নং চিত্রের ঊর্দ্ধ অংশে বুদ্ধের ধর্ম্মজীবন অঙ্কিত রহিয়াছে। বাম ভাগে বুদ্ধদেব ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় সম্বোধি

লাভ করিতেছেন। মার ও তাহার কন্যারা তাঁহাকে নানাবিধ প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। চিত্রের দক্ষিণ দিকে বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন বা প্রথম ধর্ম্ম ঘোষণা করিতেছেন দেখান হইয়াছে।

এই ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনের বিবরণটী ৪নং চিত্রে আরও পরিষ্কার করিয়া দেখান হইয়াছে। এই চিত্রটী গুপ্ত যুগের সুপ্রসিদ্ধ একটি মূর্ত্তি শিল্পের প্রতিলিপি। ইহার শিল্পকলা এত সুন্দর যে সহজে চোখ ফিরান যায় না। বুদ্ধদেব ধর্ম্মচক্র
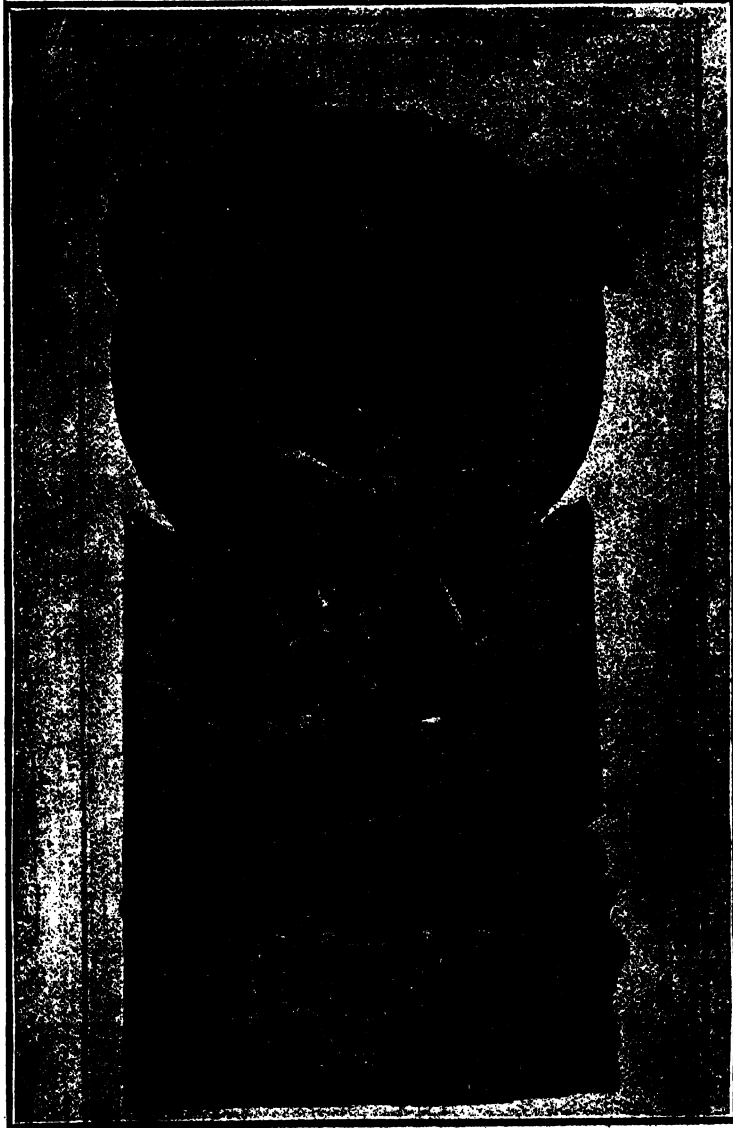
বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন।

মুদ্রায় হস্তদ্বয় বক্ষের নিকট ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার পরিধানে সুচিক্কণ বস্ত্র। মূর্ত্তিটী একটি সুন্দর পদ্মের উপর স্থাপিত। বুদ্ধদেবের পায়ের খানিকটা নীচে ধর্ম্মচক্র—তাহার উভয় দিকে দুইটি অর্দ্ধশায়িত সারঙ্গ মূর্ত্তি। চক্রের উভয় দিকে সাতটী মনুষ্য মূর্ত্তি জানু পাতিয়া বসিয়া আছেন। ইঁহাদের মধ্যে মুণ্ডিত মস্তক পাঁচজন বুদ্ধদেবের প্রথম শিষ্য—তাঁহাদের নাম পঞ্চবর্গীয় ঋষি। বুদ্ধদেব যখন সম্বোধি লাভ করিয়া সারনাথে আসেন তখন এই পঞ্চবর্গীয় ঋষিগণ তাঁহার সহিত অত্যন্ত উদ্ধত ব্যবহার করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহাকে বসিবার আসন পর্য্যন্ত প্রদান করে নাই। কিন্তু

অশোকের সিংহস্তম্ভ।
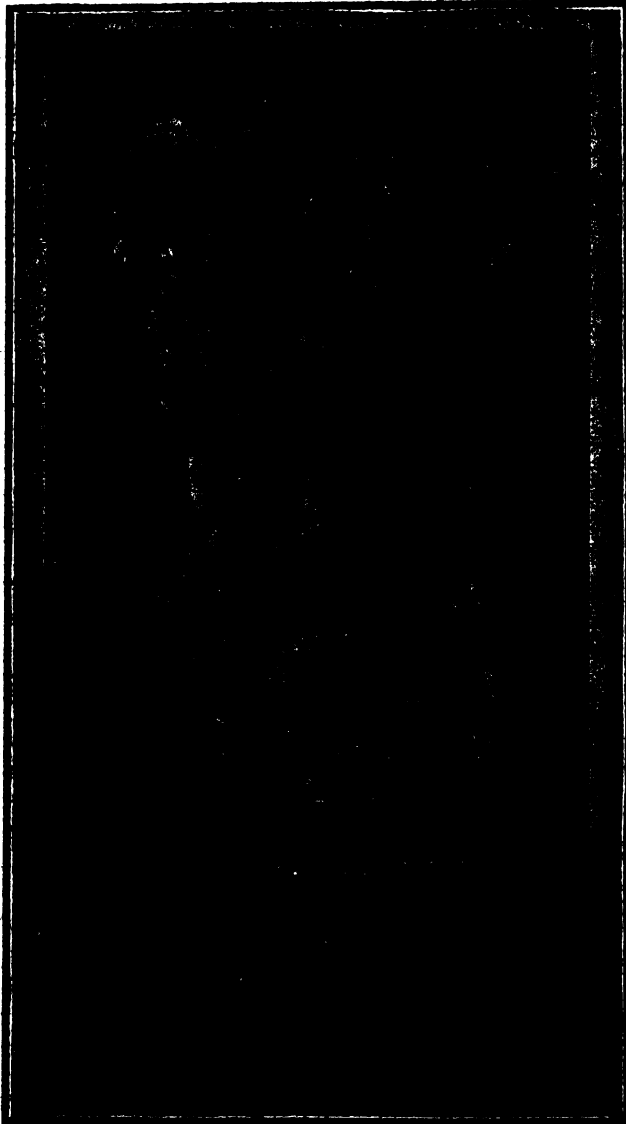
পরে বুদ্ধদেবের নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করিয়া ইঁহারা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকেই সর্ব্বপ্রথমে মধ্যম পথ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেই হইতে সারনাথ বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত হইয়াছে।

এই তীর্থে লক্ষ লক্ষ যাত্রী আসিয়া তাহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিত। মৌর্য্য সম্রাট অশোক বোধ হয় সেইজন্যই এখানে তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সিংহস্তম্ভ স্থাপিত করিয়াছিলেন। সেই সিংহস্তম্ভ এবং চিত্রে দেখিতে পাইবেন। এই সিংহস্তম্ভটী সৌন্দর্য্যে অশোকের নির্ম্মিত অন্যান্য স্তম্ভকে

বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী।

পরাভূত করিয়াছে। ইহার প্রশংসায় দেশ বিদেশের ঐতিহাসিকগণ পঞ্চমুখ হইয়া উঠেন। স্তম্ভের মাথার উপর চারিটী প্রকাণ্ড সিংহ—এককালে তাঁহাদের চক্ষু-গোলক মণিময় ছিল। সিংহগুলির নিম্নদেশে চারিটি চক্র—দুই দুইটী চক্রের মধ্যভাগে হস্তী ষণ্ড অশ্ব ও সিংহ অঙ্কিত। যে সময়ে বৌদ্ধ বিহারগুলির মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া যাইতেছিল ও সম্প্রাদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল সেই সময়ে অশোক এই স্তম্ভ সারনাথে স্থাপন করেন। তিনি ইহার গাত্রে লিখিয়া দেন যে তিনি সমস্ত সঙ্ঘগুলির নেতৃস্থানীয় এবং যদি কেহ ধর্ম্ম কলহ করে তবে তাহাকে সংঘচ্যুত করা হইবে।

৬নং চিত্রখানি জ্ঞানের দেবতা বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী মূর্ত্তির চিত্র। এটিও গুপ্ত যুগের মূর্ত্তি। বুদ্ধদেব স্বয়ং মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিলেন, কিন্তু মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবের ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ করেন। গুপ্তযুগে এইরূপে মূর্ত্তি পূজার যে প্রাবল্য ছিল তাহা এই প্রবন্ধের সহিত প্রদত্ত চিত্রগুলি আলোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে।

আমাদের দেশের ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করিয়া বুঝাইবার অনেক উপকরণ আছে। অভাব কেবল আমাদের চেষ্টা ও অর্থের। অনেকেই কাশী বা বৃন্দাবনে তীর্থ করিতে যান—সেই সময়ে তাঁহারা যদি কাশী হইতে সাত মাইল দূরবর্ত্তী সারনাথ ও বৃন্দাবন হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী মথুরার যাদুঘর দেখিয়া আসেন তাহা হইলে তাঁহারা প্রচুর আনন্দ ও শিক্ষালাভ করিতে পারেন।

বিলাতের অনেক ইতিহাসে ইউরোপ ও আমেরিকার মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্ত্তি প্রভৃতির চিত্র থাকে। তাহাতে ইতিহাস অধিকতর শিক্ষাপ্রদ ও মনোরঞ্জক হয়। আমাদের দেশের ইতিহাসের বইয়ে কি এরূপ ভাবে চিত্র সন্নিবেশ করা সম্ভব হইবে না?
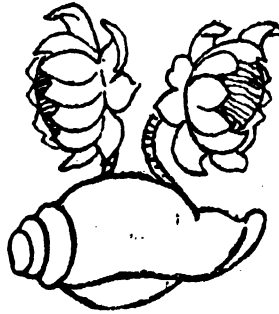
প্রত্যাবর্ত্তন

(বড় গল্প)

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শ্যামবাজারের মস্ত বড় এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে আসিয়া অরুণ দেখিল, ঠিকানা এই বাড়ীরই বটে। সামনেই 'গেটে' দরোয়ান বন্দুক হস্তে পাহারা দিতেছিল। অরুণ ঢুকিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল—কাঁহা যাতা বাবুজী? বাড়ীর মালিকের সহিত সাক্ষাতের প্রয়োজন এই কথাটা সে বুঝাইয়া বলিতেই, দরোয়ান সামনের গোমস্তাদের সারবন্দি ঘরের একদিকটায় অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলিল—আগাড়ি নায়েব মশা'কো সাথ্ সাক্ষাৎ কিজিয়ে বাবুজি। অরুণ বুঝিল বাড়ীর মালিকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হওয়া শক্ত।

দরোয়ান নির্দ্দেশিত ঘরে গিয়া অরুণ দেখিল একটী বৃদ্ধ লোক টুলে বসিয়া টেবিলের উপর খাতাপত্র ছড়াইয়া চশমা চোখে তাহারি তদ্বিরে ব্যস্ত। অরুণকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কাকে চান?

অরুণ খবরের কাগজখানা খুলিয়া বিজ্ঞাপনটী দেখাইয়া বলিল—আপনারা Tuter চান লিখেছেন।

বৃদ্ধ বলিলেন—ওঃ, আপনি candidate হতে চান। বসুন, আপনার qualification বলুন।

অরুণ সবিনয়ে জানাইল সে ইংরাজীতে প্রথম বিভাগে এম-এ পাশ করিয়াছে।

শুনিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—তা হ'লে ত আপনার chanceই বেশী, এর আগে আরও দু' তিনজন candidate এসেছিলেন তাদের দু'জন B, A, একজন সংস্কৃতে M, A, আমরা Englishএ M, A, খুঁজছিলুম, তা বেশ। আপনিই আসবেন কাল থেকে।

আর্থিক কথা অর্থাৎ মাইনেটার সম্বন্ধে অরুণের বিশেষ কৌতুহল ছিল। উসখুস্ করিয়া সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল—কত দেবেন?

কেন বিজ্ঞাপনে তা দেওয়া হয় নি? দেখি দেখি, তাইত বেটারা ছাপাতে ভুল করেছে দেখছি। তিরিশ টাকা মাইনে। রাজী আছেন ত?

তিরিশ টাকা! অরুণের মনটা আশা ও আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ঘণ্টা দুই পড়াইয়া শুধু সমস্ত দিন অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পারিশ্রমিক উশুল হইয়া আসিবে। সুখে তার চিত্ত ভরিয়া উঠিল। এতদিনে কিরণকে সে একটু সুখে রাখিতে পাইবে। আঃ—!

অরুণ কথা পাকাপাকি করিয়া উঠিতেছিল, বৃদ্ধ বলিলেন—তাহ'লে চলুন কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন।

চলুন বলিয়া অরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ নায়েব অরুণকে সঙ্গে লইয়া অট্টালিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

চারিদিকে ফুলের বাগান। মাঝখানে সুবৃহৎ বাস ভবন। বাড়ীর ভিতরের সব আসবাবপত্র দেখিয়া অরুণ ভাবিল, উঃ, কত টাকার অধিকারী হইলে তবে এ বাড়ীতে বাস করা যায়।

একটী সুবৃহৎ কার্পেটে মোড়া ঝক্‌ঝকে বিলিতি আসবাবে সাজানো সুন্দর কারুকার্য্যখচিত ঘরে অরুণ নায়েবের সহিত ঢুকিল। তাহার ভিতর একটী সোফায় হেলান দিয়া একটী বৃদ্ধ আলবোলা টানিতেছিলেন। গায়ের রং ধবধবে ফরসা, মাথা জোড়া টাকটি চক্ চক্ করিতেছে—দেখিলেই ধনী ও উচ্চপদস্থ বলিয়া মনে একটা সম্ভ্রম জাগে।

অরুণ হাত দুইটী কপালে ঠেকাইতেই নায়েব পরিচয় দিয়া কহিলেন—ইনি সেই টিউসানিটা করতে চান।

বৃদ্ধ বলিলেন—আচ্ছা তুমি বাইরে যাও, আমি এঁর সঙ্গে আলাপ করি।

নায়েব চলিয়া গেলে বৃদ্ধ ওরফে কৃষ্ণপুরের জমীদার রামরতনবাবু অরুণকে বলিলেন—বসুন।

অরুণ একটী চেয়ারে উপবিষ্ট হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—কতদূর অবধি পড়েছেন আপনি?

আজ্ঞে ফার্ষ্ট ক্লাসে ইংরাজিতে এম-এ পাশ করেছি।

এরি মধ্যে এম-এ পাশ করে ফেলেছেন? ভাল ভাল, তা কি করছেন এখন?

মার্চ্চেন্ট অফিসে চাকরী—তা ছাড়া আর অসহায়, সম্পত্তিহীন বাঙ্গালীর কি গতি আছে বলুন?

অরুণের স্পষ্ট কথায় রামরতনবাবু খুসী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অরুণের অবস্থা শুনে দুঃখিত স্বরে বলিলেন—তাইত মাসে শুধু তিরিশ টাকা আয়, ঐটুকুতেই সম্বল করে আপনার সংসার চালাতে হয়, অথচ ফার্ষ্ট ক্লাস এম-এ আপনি। এর চেয়ে আর ইউনিভার্সিটীর কলঙ্ক আর কি থাকতে পারে?

অরুণ নম্রস্বরে বলিল—মুটে মজুররাও এর চেয়ে বেশী রোজগার করে মশাই, আমরা বাঙ্গালী বাবু কিনা তাই আত্ম-সম্মানটুকুও টনটনে।

একটু একটু করিয়া অরুণের অনেক খবরই রামরতনবাবু লইলেন। কথাবার্ত্তায় অরুণ বুঝিল গৃহস্বামী ধনবান হইলেও হৃদয়হীন নহেন। এমন কি অরুণ প্রতিশ্রুতি পাইল, দুই একমাস পড়াইতেই তিনি তিরিশ টাকার স্থলে চল্লিশ টাকা দিতেও রাজী আছেন যদি তিনি দেখেন ছাত্রী পড়াশুনায় দ্রুত উন্নতি করিতেছে।

কিন্তু এই পড়ানোর প্রধান পাত্রী যে ছাত্রীটি—তাহার বিষয় অরুণ বিশেষ কৌতুহল অনুভব করিতেছিল।

পাঠ্যাবস্থায় সে যে দু'একবার টিউসনি না করিয়াছে এমন নয়, তবে সে-সব ছাত্র। কিরণ ছাড়া সে মেয়েদের সংস্পর্শে বড় একটা আসে নি। তাই তার ঔৎসুক্য ও সংশয়ের সীমা ছিল না।

কিন্তু সে সংশয়েরও সমাধান হইয়া গেল। অরুণকে বিদায় দিবার আগে রামরতনবাবু বলিলেন—হ্যাঁ, তা হ'লে তোমার ছাত্রীটির সঙ্গে আজ পরিচয় করে যাও। লিলি আমার একমাত্র আদরিণী কন্যা হলেও আমার বিশ্বাস সে তোমার সন্তোষ অর্জ্জন করতে পারবে। ভারী ভালো মেয়ে সে। বলে তিনি হাঁকিলেন—রাম সিং।

লম্বা চৌড়া রামসিং আসিয়া উপস্থিত হইল। রামরতন বাবু বলিলেন—যা, দিদিমণিকে এখানে একবার ডেকে দে।

রামসিং চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট কাটিল। রামরতনবাবু নিজের কন্যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইতে লাগিলেন। অরুণেরও হৃদয়াবেগ বাড়িতে লাগিল।

ওঃ হরি, এই ছাত্রী? অরুণের সকল উদ্বেগ ও সংশয় একনিমেষেই দূর হইয়া গেল। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কালো চুলের ভিতর গোলাপফুলের মত মুখখানি একটী আট নয় বৎসরের বালিকা চঞ্চল পদবিক্ষেপে প্রজাপতির মত রঙীন সজ্জায় সাজিয়া যখন ঘরে আসিয়া ঢুকিল তখন অরুণের ভারী হাসি পাইল। এই ছাত্রী! ইহাকে পড়াইবার জন্যই এত হাঙ্গামা, এত বিজ্ঞাপন! এই ক্ষুদ্র মেয়েটীকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে মাসে তিরিশ টাকা অকুণ্ঠিতচিত্তে ব্যয়! অরুণ ভাবিল—হাঁ ইহারাই মানুষ বটে! জীবনটাকে উপভোগ করিতে ইহারাই সার্থক পৃথিবীতে আসিয়াছে!

রামরতন বাবু কন্যার দিকে চাহিয়া কহিলেন—লিলি, আজ থেকে ইনি তোমার নতুন মাষ্টার মশাই হলেন। এঁকে নমস্কার কর—তোমার পড়বার ঘরে এঁকে নিয়ে গিয়ে আলাপ পরিচয় করগে—কাল থেকে ইনি রোজ তোমায় পড়াতে আসবেন, বুঝেছ?

লিলি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল বুঝিয়াছে! একটী নমস্কার করিয়া অরুণের একেবারে গা ঘেসিয়া দাঁড়াইয়া তবু সে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি আমাকে পড়াবেন?

অরুণ মৃদু হাসিয়া কহিল—হাঁ।

রামরতন বাবু বলিলেন—আপনি যান্ ওর সঙ্গে ওর ঘরে। তাহ'লে ঐ কথা রইলো, কাল থেকে আসবেন।

অরুণ স্বীকৃত হইয়া লিলির পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘরের বাহিরে আসিল। তারপর সামনের সুবৃহৎ শ্বেত প্রস্তরের দালান

অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া ছাত্রীর সহিত অরুণ তাহার পড়িবার তেতালা ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘরখানি ছোট হইলেও চমৎকার সাজানো। ধনী গৃহের উপযুক্ত আসবাবে অলঙ্কৃত। মাঝখানে টেবিল দুধারে দুটী গদিমোড়া চেয়ার।

অরুণ একখানি চেয়ারে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আমাকে মাষ্টার মশাই বলে তোমার ভয় করছে না ত লিলি ?

লিলি হাসিয়া ফেলিল, বলিল—ওমা, আপনি এমন সুন্দর, আপনাকে ভয় করব কেন ? আপনি ত আর আমাকে মারবেন না।

অরুণ হাসিয়া বলিল—মারবো না কি করে জানলে ? আমার কথামত পড়াশুনা যদি না কর ?

লিলি বলিল—আহা আপনি বুঝি মারতে পারেন—আর পড়াশুনো না করলে ত ?

এমনি সহজ সরল সুন্দর কথাবার্ত্তায় মাষ্টার ও ছাত্রীর পরিচয় হইয়া গেল। তারপর পাঠ্য পুস্তকের তালিকা বর্ণনায় লিলি মাষ্টার মশাইকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মাষ্টার মশাইটীও—'ইস্ এরি মধ্যে এত বই পড়ে ফেলেছ ?' 'তুমি ত ভারী লক্ষ্মী মেয়ে' ইত্যাদি উৎসাহবাক্যে ছাত্রীর মন আনন্দে ও গর্ব্বে পূর্ণ করিয়া তুলিল। আদত কথা আধঘণ্টার ভিতরই মাষ্টার মশাইয়ের সঙ্গে লিলির এত ভাব হইয়া গেল যে সে শেষটা বলিয়া ফেলিল—'আপনি আজ থেকেই আসুন না কেন ? সত্যি আপনি ভারী ভাল। আপনাকে আমি আর কক্ষণো ছাড়বো না—আমাকে বরাবর আপনাকে পড়াতে হবে।'

লিলির সহিত কথা কহিবার সময় অরুণ মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিল—তাহার কারণ পাশের ঘরে এস্রাজের ঝঙ্কার ধ্বনিত হইতেছিল। যে বাজাইতেছিল তাহার হাতের দক্ষতা যে এ বিষয়ে সামান্য নহে তাহা অরুণ বুঝিতে পারিল। খানিকক্ষণ তাহা শুনিয়া কৌতূহল বশে অরুণ লিলিকে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা ওঘরে কে এস্রাজ বাজাচ্ছে না ?

লিলি বলিল—হ্যাঁ ছোটমা বাজাচ্ছেন।

ছোটমা কে ? মাকে তুমি ছোটমা বল বুঝি ?

হ্যাঁ আমার আপনার মা নেই কিনা—তাই ওই মাকে ছোটমা বলি। কিন্তু এ মাও খুব ভাল মাষ্টার মশাই—আগেকার মায়ের চেয়েও আমাকে ভালবাসেন। ছোটমা এমন সুন্দর গান গাইতে পারেন, তা আর কি বলব ? এস্রাজ সেতারও খুব ভাল বাজাতে পারেন—আমিও শিখছি ছোটমার কাছে। আপনি একদিন ছোটমার গান শুনবেন মাষ্টার মশাই ?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া অরুণ ভারী বিপদে পড়িয়াছিল। ওই সামান্য প্রশ্ন হইতে যে এত কথা উঠিতে পারে তাহা সে ভাবিতেও পারে নাই। এখন সে এই সরল শিশুটীকে বুঝাইতে পারিল না যে তাহার এ সমস্ত শোনা অন্যায়—তাহার সম্মুখে এ সব বিষয় আলোচনাও অন্যায়। তাই এ প্রসঙ্গ থামাইবার অভিপ্রায়ে সে কহিল—আচ্ছা আচ্ছা সে হবে'খন, তুমি দেখছি একদিনেই সব হাতিঘোড়া মারতে চাও।

বেলা দশটা বেজে গেছে দেখে অরুণ উঠিল। যাবার সময় লিলি বলিল—কাল যখন আসবেন বরাবর সিঁড়ি দিয়ে উঠে এই ঘরে এসে এই সুইচ্‌টা টিপ্‌বেন—তাহলেই আমি টের পেয়ে আসব, বুঝলেন ?

অরুণ স্বীকৃত হইয়া বিদায় লইল।

কিরণ রান্নাবান্না সারিয়া স্বামীর প্রতীক্ষায় উদগ্রীব হইয়া বসিয়াছিল। অরুণ ফিরিতেই তার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া সে অনেকটা অনুমান করিয়া লইল। তবু জিজ্ঞাসা করিল—কি হল ?

অরুণ বলিল—দেখছ কি কিরণ—লক্ষ্মী এতদিনে মুখ তুলে চেয়েছেন।

কিরণ ব্যঙ্গের সুরে বলিল—কার দিকে চাইলেন, তোমার দিকে না আমার দিকে ?

অরুণ বিস্মিতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে ?

কিরণ বলিল—তুমি চলে গেলে আমি কেবলই ভগবানকে ডাকছিলুম, যাতে তোমার এ টিউশনিটা না জোটে।

অরুণ কৃত্রিম রাগের সহিত বলিল—তুমি ত খুব শুভাকাঙ্ক্ষিণী স্ত্রী দেখছি। স্বামীর এত বড় লাভটা হাত ছাড়া করে দিচ্ছিলে।

কত বড় লাভটা শুনি ?

আন্দাজ কর না দেখি।

কত আর, দশ পনেরো টাকা, আবার কত ?

আজ্ঞে না মহাশয়া, পুরো তিরিশ, একেবারে অফিসের মাইনে।

কিরণ বিস্মিত হইয়া গেল। তারপর কি ভাবিয়া আনন্দিত স্বরে কহিল—যাক্ ভালই হয়েছে, অফিসটা তাহলে ছেড়ে দাও, সেই বেশ হবে'খন।

অরুণ হাসিয়া ফেলিল। বলিল—দিনকে দিন তুমি খুব দামী দামী Advice gratis দিতে শিখছ যে দেখছি। কোথায় আমি ভাবছি কি করে সংসারের সুরাহা হবে তা নয় উনি উপদেশ দিচ্ছেন পুনর্মূষিকো ভব।

এ বিষয়ে স্বামীর মত অটল বুঝিয়া কিরণ আর কিছু বলিল না। বেলা হয়ে যাইতেছে দেখিয়া সে বলিল—আচ্ছা বাপু, ও সব কথা পরে হলেও চলবে। এদিকে ভাত কটা যে চাল হয়ে যায়।

অরুণ বলিল—চল যাচ্ছি। কিন্তু একটা কথা—

কি ?

তুমি যে আর কিছু জিগ্যেস করলে না বড় ?

আবার কি জিগ্যেস্ করব ?

এই ছাত্রীটি কি রকম দেখতে—কি রকম আলাপ পরিচয় হল—প্রেমটেম হল কি না।

প্রেম অত সস্তা নয় গো মশাই, যে রাস্তায় রাস্তায় করে বেড়াবে—আর তা ছাড়া আমার স্বামীকে আমি চিনি তোমার সেজন্যে মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই।

তাই নাকি ? কিন্তু সব তাতে অতি ভক্তি অতি বিশ্বাস ভাল নয় জান ত ?

দেখ আমার ভাল মন্দ আমি বুঝি—তোমার তাতে মাথা ঘামাবার কিছু দরকার নেই।

অরুণ হাসিয়া বলিল—না সত্যি বল না, আমাকে তোমার সন্দেহ হয় না একটুও ?

কিরণ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তারপর সহসা মাথাটা নীচু করিয়া অরুণের দুপায়ে লুটাইয়া পড়িয়া গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল—তোমায় সন্দেহ করবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।

অরুণ তাড়াতাড়ি কিরণের হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিল—না বাপু, তোমাকে হারাবার যো নাই। তা যাই হোক জেনে রাখ ছাত্রীটি যুবতীও নয়, কিশোরীও নয়, সামান্য নয় বৎসরের বালিকামাত্র।

এবারে কিরণ অতিমাত্রায় উৎসুক হইয়া উঠিল—জিজ্ঞাসিল—ওমা, ওইটুকু মেয়ে, তাকে পড়াতেই তিরিশ টাকা করে দেবে ?

হুঁ। কিন্তু ওসব কথা এখন থাক, খেয়ে দেয়ে হবে। বড্ড খিদে পেয়ে গেছে, ভাত বাড়বে চল—বলিয়া অরুণ উঠিয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

অনাবৃষ্টি

(গল্প)

[শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়]

(১)

জ্যৈষ্ঠের প্রতপ্ত মধ্যাহ্ন। অনাবৃষ্টির দরুণ আকাশ হইতে সহস্র ধারায় যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছিল। মাঠ-পথ, গাছ-পালা, সমস্তই যেন সে প্রচণ্ড দাহনে জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছিল। মাঠে আর একটাও তৃণ সবুজ ছিল না, প্রকৃতির শ্যামায়মান সৌন্দর্য্য-উচ্ছ্বাস যেন দিনে দিনে ঝল্‌সাইয়া লাল হইয়া উঠিতেছিল। দূরে আকাশের কোলে জ্বলন্ত অগ্নি-পাথারের বুকের উপর দিয়া একটা শঙ্খ চিল আর্ত্তকণ্ঠে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল। গোকুল সেইদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাহার ভাঙা কুঁড়েখানির দাওয়ার উপর চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

মাঠের প্রান্ত দিয়া যে সরু সুতি খালটি বহিয়া গিয়াছে তাহারই এই পারে কয়েক ঘর জেলে কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিত। এবারের দারুণ অনাবৃষ্টিতে খালে জল ত আর ছিলই না বরং তাহার সমস্ত বুকটা ফাটিয়া একেবারে চৌচীর হইয়া গিয়াছিল। তাই এব্বারে সেখানকার জেলেদের বিশেষ আর কোনও কাজ ছিল না; অনাহারের বিনিময়ে এবারে তাহাদের অবসর মিলিয়াছিল।

গোকুল যখন তাহার কুঁড়েখানির দাওয়ার উপরে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল ঠিক সেই সময়েই নিতাই জেলের পনের ষোল বছরের মেয়ে বিলাসী একটা কলসী কাঁকে করিয়া আসিয়া বলিল "গোকুলদা'! আমার একটা উপকার করবে আজ ?"

গোকুল তাহার উদাস দৃষ্টিটা আকাশের বুক হইতে টানিয়া লইয়া বিলাসীর সুন্দর নিটোল মুখখানির উপর ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি বললি বিলাসী ?—উপকার !"

বিলাসী কাঁকের কলসীটা মাটিতে নামাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ।"

গোকুল গম্ভীরভাবে জবাব দিল "উপকার আমি আজকাল আর কা'কেও করি না বিলাসী।"

বিলাসীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল "তবে দয়া করে......"

গোকুল বাধা দিয়া বলিল "দয়াও আমি আর কাউকে করি না।"

অপ্রত্যাশিত অপমানে বিলাসীর মুখখানা কালো হইয়া উঠিল। কি একটা কড়া কথা সে বলিতে যাইতেছিল কিন্তু সেটাকে সামলাইয়া লইয়া বেশ সহজ অথচ শক্ত স্বরেই সে বলিল "আচ্ছা বেশ। আর কোনও দিন কোন উপকার চাইব না তোমার কাছে।" বলিয়াই সে তাহার শূন্য কলসীটি কাঁকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইবে বলিয়া যেমনি পা বাড়াইল অমনি গোকুল খপ্‌ করিয়া তাহার আঁচলটা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল "বিলাসী..."

বিলাসী তাহার ক্রুদ্ধ চক্ষু দুইটীর জ্বলন্ত দৃষ্টি গোকুলের মুখের উপর ফেলিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিল "ছেড়ে দাও বলচি।"

গোকুল নরম করিয়া বলিল "দিচ্ছি। কিন্তু আমার কপালের এই লম্বা দাগটা কেন হয়েচে বলতে পারিস্ ?"

বিলাসীর মনে পড়িয়া গেল সেও এমনি একটা রৌদ্র-দীপ্ত জ্যৈষ্ঠের তপ্ত মধ্যাহ্ন। সে আজ অনেক দিনের ঘটনা হইলেও আজিও যেন তাহা ছবির মতই স্পষ্ট মনে পড়ে। শুধু তাহারই একান্ত জেদে ও আব্দারে-অত্যাচারে ওই মানুষটী সেদিন ঘোষেদের আম বাগানে চুরি করিয়া আম পাড়িতে গিয়া গাছ হইতে পড়িয়া মাথা ফাটাইয়া ঘরে ফিরিয়াছিল! অনেক করিয়া সে ক্ষতটা শেষে সারিয়াছে বটে কিন্তু তাহার দাগটা আজিও মিলায় নাই, ঠিক পূর্ব্বের মতই তেমনি ধারা গভীর হইয়া আছে। বিলাসীর মনে কোথায় যেন একটা অতি পুরাতন ব্যথা গোপনে লুকানো

ছিল। গোকুলের কথায় সেইখানটায় আঘাত লাগিয়া টন্ টন্ করিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাবটাকে সে চাপিয়া রাখিয়া কঠিন স্বরে বলিল "আমি জানি না, যাও।"

গোকুল ব্যথিতকণ্ঠে বলিল "এত শীগ্‌গির তুই ভুলে গেলি বিলাসী!"

বিলাসী দৃঢ়স্বরে বলিল "হ্যাঁ।"

গোকুলের শিথিল মুঠার ভিতর হইতে বিলাসীর কাপড়ের অঞ্চলটা খসিয়া পড়িল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল "আচ্ছা, ছেড়ে দে ওকথা। তুই কি বলতে এসেছিস বল দেখি।"

বিলাসী বলিল "আর আমার সে কথা বলবার দরকার নেই গোকুলদা।"

গোকুল মৃদু হাসিয়া বলিল "আচ্ছা, দরকার না থাকে, নেই আছে। তোর কলসীটা তবে দিয়ে যা।"

"কেন?" বলিয়া এমনি দৃষ্টিতে বিলাসী গ্রীবা বাঁকাইয়া গোকুলের মুখের দিকে চাহিল যেন সে আজ খুব খানিকটা মুখোমুখি ঝগড়া করিয়া কি একটা বিষয়ের বোঝাপড়া করিতে চায় তাহার সঙ্গে।

গোকুল তেমনি হাসিয়া বলিল "তুই কি আজ ঝগড়া করবি বলে এসেছিস বিলাসী?"

বিলাসী উপেক্ষার সুরে বলিল "তুমি আমার কে গোকুলদা যে তোমার সঙ্গে আমি বাড়ী বয়ে ঝগড়া করতে আসব" বলিয়াই সে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

গোকুল ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিয়া বলিল,—"সত্যি বলছিস বিলাসী, আমি আজ আর তোর কেউ নই?"

চলিয়া যাইতে যাইতে বিলাসী দূর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিয়া গেল—"না, কেউ নও।"

সহসা গোকুলের মুখখানা একেবারে পাণ্ডুর মত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত বুকখানা তোলপাড় করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ঝরিয়া পড়িল। গোকুল ধীরে ধীরে তাহার দাওয়ার কোণে-রাখা একটা বাঁশের চোঙ হইতে একছিলিম তামাক বাহির করিয়া সাজিতে বসিল।

তামাক টানিতে টানিতে বিলাসীর শেষ কথাটা কেবলই গোকুলের মনে কাঁটার মত খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। গোকুল আজ আর তাহার কেউ নয়। উঃ! অথচ একদিন ছিল যখন এই গোকুলই বিলাসীর সবখানি ছিল। বিলাসীর যত আব্দার, যত অত্যাচার, সমস্তই সহ্য করিতে হইত এই গোকুলকে। গোকুলের অন্তর আজিও হাহাকার করিয়া ফিরে বিলাসীর সেই আব্দার, সেই অত্যাচার, সেই অধিকারের দাবী সহ্য করিবার জন্য; কিন্তু বিলাসী ত আজকাল আর তেমনি করিয়া আব্দার করে না, তেমনি করিয়া অধিকারের দাবী দিয়া অত্যাচার করে না তাহার উপরে! যদি সে কোনদিন কিছু বলিতে আসে, যদি সে কোনদিন কিছু চাহিতে আসে, তাহা হইলে সে এমনি বিনয় করিয়া বলে—এমনি অনুনয় করিয়া চায়, যেন গোকুল তাহার নিতান্তই পর। এইটায় যে গোকুল সহ্য করিতে পারে না একেবারেই। গোকুল চায় বিলাসী তাহার কাছে আব্দার করুক, তাহার উপরে অত্যাচার করুক, এমনি করুক যাহাতে প্রমান হইয়া যায় যে গোকুলের উপরে তাহার পূর্ব্বেকারের সেই নিজস্ব বলার দাবী আজিও আছে। কিন্তু বিলাসী যে আজকাল আর তাহা করে না; তাহাতেই ত……

আচ্ছা, কেমন করিয়া এমন হয়? যে বিলাসীর তাহাকে না পাইলে একদণ্ডও চলিত না, সেই বিলাসীর আজ তা'কে না পাইয়াও দিনের পর দিন কেমন করিয়া চলিয়া যাইতেছে! গোকুলের মনে হইল বিলাসীর দিন যাইতেছে বটে কিন্তু যেমনটী করিয়া যাওয়া উচিত ছিল বোধ হয় ঠিক তেমনটী করিয়া আর যাইতেছে না! আর যাইতেছে না বলিয়াই আজ তাহার এই পরিবর্ত্তন! হয় ত এ পরিবর্ত্তন তাহার হইত না, নিতাই জেলে যদি না টাকার লোভে এমনি করিয়া তাহাদের জীবন দুইটা তিক্ত বিষে ভরিয়া দিত। কিন্তু যে টাকার লোভে সে একাজ করিল, কই সে টাকাত সে আজিও পাইল না! দিনরাত্রি সমান করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, কতদিন একবেলা খাইয়া, কতদিন একেবারে নিরম্বু উপবাস দিয়া, বিলাসীকে বিবাহ করিবে বলিয়া চার গণ্ডা টাকা সে জমাইয়া ছিল। কিন্তু নিতাই যেদিন স্পষ্ট করিয়াই তাহাকে জানাইয়া দিল যে আটগণ্ডা টাকা পনের কম কিছুতেই সে বিলাসীর বিবাহ দিবে না, সেদিন বিকাল বেলায় বিলাসী আসিয়া গোকুলকে বলিয়া গেল—খবরদার গোকুলদা! ফের যদি তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও

তা'হলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব, এই তা' বলে গেলুম।"

ইহার কিছুদিন পরেই কাঁটা পুকুরের গণেশ মোড়ল আট গণ্ডা টাকা পণ দিবে বলিয়া বিলাসিকে আসিয়া বিবাহ করিয়া গেল। কিন্তু সমস্ত টাকা সেও একেবারে দিতে পারিল না। নিতাইও বাকী টাকার জন্য বিলাসীকে তাহার স্বামীর ঘর করিতে যাইতে দিল না। সেই হইতেই···

ভাবিতে ভাবিতে কখন যে গোকুলের কলিকার আগুন নিবিয়া গিয়াছিল সেদিকে তাহার খেয়ালই ছিল না। বার দুই সজোরে টান দিয়া যখন সে একটুও ধোঁয়া বাহির করিতে পারিল না তখন সে নিবন্ত কলিকাটাকে দাওয়ার এক কোণে উপুড় করিয়া রাখিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া দেখিল। সহসা গোকুল দেখিতে পাইল তখনও দূরে বিলীয়মান মাঠের প্রান্তে কলসী কাঁকে করিয়া বিলাসী ময়না দিঘীর উদ্দেশ্যে জল আনিতে যাইতেছে। গোকুলের বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল! ইহারই জন্য যে আর একটু আগে বিলাসী তাহাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিল। এই ভর-দুপুরে মাঠের পথে সে একলাটী জল আনিতে পারিবে না ব লয়াই ত সে অত করিয়া সাধিতে আসিয়াছিল। কিন্তু কথায় কথায় কি হইয়া গেল! গোকুলের যত রাগ হইল তাহার নিজের উপরে। কেননা, সে-ই যদি আগে অমনি করিয়া বিলাসীকে খোঁচা না দিত তাহা হইলে......

(২)

দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় উঠানে মাদুর পাতিয়া কতকগুলি শুক্‌না তালপাতা লইয়া গোকুল চাঁদের আলোয় বসিয়া চাটাই বুনিতে বুনিতে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতেছিল—

"ও তোর আশার বাসা ভাঙল যদি
তবে আর কেন তুই থাকিস ঘরে..."

সেদিন দারুণ গুমোট। মাঠের বুকে এতটুকুও হাওয়া নাই। সমস্ত দিন ধরিয়া যে প্রচণ্ড রৌদ্র-ধারা মাঠের ফাটল দিয়া পৃথিবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিল রাত্রে তাহাই যেন উত্তপ্ত বাষ্পাকারে উপরে ফেনাইয়া উঠিতেছিল। গোকুল আপন মনেই গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে চাটাই বুনিতেছিল। হঠাৎ পিছন হইতে কে একজন ডাকিল "গোকুলদা!" গোকুল পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল গণেশ। গোকুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিল "আরে কেও—মোড়লের পো! কখন এলে হে?"

"এই ত আসছি সবে।" বলিয়া গণেশ উঠানে মাদুরের উপর বসিয়া পড়িল।

গোকু তাহার দাওয়ার উপর হইতে আগুন, মাল্‌সা, হুঁকা-কলিকা ও একছিলিম তামাক আনিয়া গণেশের কাছে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তারপর, বাড়ীর সব খবর ভাল ত?"

গণেশ বলিল "ওমনি একরকম কেটে যাচ্ছে কোন গতিকে। তারপর, তোমার খবর কি গোকুলদা?"

গোকুল তামাক সাজিয়া কলিকায় আগুন তুলিতে তুলিতে বলিল "আমারও তাই। দুঃখে-কষ্টে কোনরকম করে দিন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু এ গাঁয়ে হঠাৎ তুমি কি মনে করে গণেশ?"

গণেশ বলিল "তোমার কাছেই এসেছি দাদা। যদি একটা উপকার কর।"

গোকুল তাহার হুঁকাটিতে গোটা দুই টান দিয়া একগাল ধোঁয়া উপর দিকে ছাড়িয়া হুঁকাটি গণেশের হাতে দিয়া বলিল "উপকার!"

গণেশ গোকুলের হাত হইতে হুঁকাটি লইয়া বলিল "হ্যাঁ দাদা। তোমার অজানা ত কিছু নেই। সেই ও বছর ফাগুন মাসে বিয়ে করলুম কিন্তু টাকার অভাবে নিজের মাগ নিজের ঘরে নে যেতে পারলুম না। সোমত্ত বয়েস, বাপের বাড়ীতে পড়ে রয়েছে, পাড়ার পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে আরম্ভ করেছে। অপমানে ত আর কারুর কাছে মুখ দেখাতে পারি না দাদা।"

সহসা গোকুলের মেজাজটা যেন কেমন চড়িয়া গেল; সে বিরক্ত হইয়া বলিল "আমি তার কি করব মোড়লের পো?"

গণেশ যেন কেমন একটু থতমত খাইয়া গেল। শেষে সে গোকুলের হাতদু'টী ধরিয়া ফেলিয়া বলিল "একটা উপকার তুমি আমার কর দাদা। গণ্ডা চারেক টাকা আজ আমাকে তুমি ধার দাও।"

গোকুল ততক্ষণে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। সে অপেক্ষাকৃত নরম হইয়া বলিল "ভাখ, মোড়লের পো! উপকার-টুপকার আমি আজকাল আর কাকেও করি না ভাই। তবে, গণ্ডা চারেক টাকা যদি তুমি ধার চাও ত তা বরং আমি দিতে পারি। কিন্তু দস্তুরমত কড়ার করে।"

এত শীঘ্র যে গোকুল সম্মত হইবে তাহা গণেশ স্বপ্নেও ভাবে নাই। সে যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বলিল "যে কড়ার তুমি বলবে দাদা, সেই কড়ারেই আমি টাকা দেব। এতটুকু তার খেলাপ হবে না।"

গোকুল সে কথায় কাণ না দিয়া তাহার ঘরের ভিতর ঢুকিল। তারপর না খাইয়া না পরিয়া বিলাসীকে বিবাহ করিবে বলিয়া যে চারগণ্ডা টাকা সে বহু কষ্টে সঞ্চয় করিয়া ভাঁড়ের ভিতরে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, ভাঁড়শুদ্ধ সেই টাকাগুলি আনিয়া গণেশের হাতে দিয়া বলিল "নিয়ে যাও।"

গণেশ ভাঁড়টী হাতে নিয়া বলিল "তা হ'লে দাদা কড়ারটা?"

গোকুল বলিল "হ্যাঁ, ভাল কথা। কড়ার এই যে এ টাকা তুমি আর কখনও আমাকে শোধ দিতে আসবে না। তা যদি কখনও এস তা হলে দস্তুরমত অপমান হয়ে যাবে কিন্তু, এই তা বলে দিলুম।"

গণেশ একেবারে অবাক হইয়া গেল। এমন অসম্ভব কথা সে জীবনে কাহারো কাছে কোনদিন শুনে নাই। সে কি একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলিতে যাইতেছিল, সহসা গোকুল দাঁত-মুখ বিকৃত করিয়া বিকট ভঙ্গীতে চীৎকার করিয়া উঠিল "দাঁত বের করে বড় দাঁড়িয়ে রয়েছ যে মোড়লের পো! আরও কিছু চাই নাকি? বেরিয়ে যাও বলছি শীগ্‌গির আমার বাড়ী থেকে। তা না হলে ঘাড় ধরে বার করে দেব কিন্তু।"

গোকুলের মুখের দিকে চাহিয়া গণেশের আর একটি কথাও বলিতে সাহস হইল না। সে হতভম্বের মত নির্ব্বাক বিস্ময়ে ধীরে ধীরে তাহার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

গণেশ বাহির হইয়া গেলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গোকুল তাহার চলে-যাওয়া পথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে আসিয়া চাটাই বুনিতে বসিল। কিন্তু বুনিতে আর ভাল লাগিল না। তাহার বুকের ভিতরটা যেন সব একেবারে ওলট্-পালট্ হইয়া গিয়াছিল। একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনায় তাহার মাথার ভিতরে যেন কেমন জ্বালা করিতেছিল। সে উঠিয়া উঠানে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইয়া বেড়াইয়া যখন সে ক্লান্ত হইয়া পড়িল তখন সেই উঠানে-পাতা মাদুরটির উপরেই শুইয়া পড়িল। তাহার সংসারে সে ব্যতীত আর কেহ ছিল না, কাজেই দুইবেলা তাহাকে নিজ হাতেই রাঁধিয়া খাইতে হইত। সে রাত্রে আর তাহার রান্না-খাওয়া হইল না। গভীর রাত্রের ঠাণ্ডা বাতাসে তারপর কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

* * * *

গোকুলের যখন ঘুম ভাঙিল তখন পূর্ব্বাকাশ একেবারেই ফরসা হইয়া গিয়াছে। গোকুল তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। অদূরে নিতাই জেলের বাড়ী হইতে তখন অত সকালেই অনেকগুলি মিলিত কণ্ঠের কোলাহলধ্বনি ভোরের বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল। গত রাত্রের ঘটনাটি একটা স্বপ্নের মত গোকুলের মনে পড়িয়া গেল। সে বুঝিতে পারিল আজ এখনই গণেশ বিলাসীকে লইয়া যাইতেছে এ তাহারই আয়োজন কোলাহল। গোকুল ধীরে ধীরে তাহার উঠানের পার্শ্বে বাবলা গাছটির তলায় আসিতেই দেখিতে পাইল, কয়েকজন উড়ে বেয়ারা একটি প্রকাণ্ড পাল্‌কী কাঁধে করিয়া নিতাই জেলের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া বিচিত্র কলরবে নিস্তব্ধ গ্রাম্য পথখানি মুখরিত করিয়া মাঠের পথ ধরিয়া চলিয়া যাইতেছে। যতক্ষণ দেখা গেল গোকুল সেই বাবলা গাছটির তলায় তেমনি ভাবে ঠায় দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে সেই পাল্‌কীখানির দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু সেই পাল্‌কীখানির বন্ধ দুয়ারটি ঈষৎ ফাঁক করিয়া কাহারও একজোড়া কালো চোখের সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি তাহার কুঁড়েখানির দিকে ঝরিয়া পড়িল না।

—

থিয়েটারের গুপ্তকথা

[নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২১)

তিনখানা বক্সের জন্য দুশো টাকা! কি শুভক্ষণেই আজ ম্যানেজার রাত পুইয়েছিল! ন মাসে ছমাসে কখনো কোন বড়লোকের সখ হ'ল—দু'একখানা বক্স কিনে বসে থিয়েটার দেখেন বটে! কিন্তু সে রকম বড়লোক ক'টা? বড়লোক কলকেতার সহরে বিস্তর আছেন বটে; অকাতরে তাঁরা পয়সা খরচ ক'র্ত্তে পারেন,—করেনও বটে! কিন্তু সে সব খরচ অন্যত্র! বাগান বাড়ীতে কিম্বা "অমুক বিবির" বিলাস মন্দিরে। সেখানে একরাত্রে বসে—"ভূতের" অর্থাৎ "মোসাহেবের" দঙ্গল নিয়ে বড়লোক মশাই একরাত্রে দু'হাজার টাকা খরচ করে ফেললেন! আর থিয়েটার দেখতে পাঁচটী টাকা টিকিটের খরচ কর্ত্তেই, তাঁদের হাতে যেন পক্ষাঘাত হয়! সে দুটো চারটে টাকা খরচ বাবু মশাইদের একেবারে ভীষণ "বাজে খরচ" বলেই দৃঢ়বিশ্বাস! কেউ কেউ আবার মুরুব্বিয়ানা করে বলে থাকেন—'থিয়েটারে পয়সা খরচ ক'রে কি দেখতে যাব? তেমন ভাল "নাটক" প্লে হয় না, তেমন সব ভাল ভাল "প্লেয়ার" নেই। অথচ, কেমন "ভাল নাটক' এবং ভাল"প্লেয়ার" তিনি চান—তা তিনি নিজেই জানেন না। কোন কোন "বকধার্ম্মিক" বাবু বলেন "আমার থিয়েটার-ফিয়েটার দেখতে ভাল লাগে না। ওতে আমার মন নেই। তবে দয়াময়ের সখ হয় যদি "মিনি পয়সায়" তাঁর থিয়েটার দেখবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। তখন তাঁর একার নয়, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব যে যেখানে আছেন, ক্রমে ক্রমে সকলকার "সখ" গজিয়ে উঠতে সুরু কর্ব্বে! সেই জন্য কেউ কেউ বলেন শুনতে পাই—"অমুক বাবু পয়সা খরচ করে কখনো কোন নেশাপত্র করেন না বটে, কিন্তু পরের পয়সায় হ'লে—"বাবু" আমাদের "বিষ" পর্য্যন্ত খেতে পারেন।" পয়সা-ওলা লোক হলে কি হবে। "ফোকোটোয়" (অর্থাৎ মিনি পয়সায়) কাজ সারবার সময় তা'র মান-মর্য্যাদা জ্ঞান কিছুই থাকে না। এই কারণেই তো আমাদের বাংলা থিয়েটারের এত দুর্গতি! এ দেশের লোকেরা "বাজে খরচ" হিসাবেও দু'দশটা টাকা দিয়ে যদি বাংলা থিয়েটারের প্রতি সহানুভূতি দেখান,—তাহলে থিয়েটার গুলোর এমন অকাল মৃত্যু হয় না! অনেকগুলি ভদ্রসন্তানের ভদ্রপরিবারের এই "থিয়েটার" হতেই অন্নের সংস্থান হয়, এই ভেবে যদি ধনবান মহাশয়েরা তাঁদের বাজে খরচের (Budget) "বজেটে" গোটাকতক টাকা (Sanction) "স্যাংসন্" করেন, তাহ'লে "দশের লাঠি একের বোঝাতে" এদেশের থিয়েটার গুলো রক্ষা পায়!

থিয়েটার চল্‌ছে গৃহস্থ ভদ্রলোক, মধ্যবিৎ অবস্থার কেরাণীবাবু এবং মেসের "ছাত্রদের" পয়সায়! সামান্য আয় তাঁদের, অথচ তাই থেকেই কষ্ট করে তাঁরা বাংলাদেশের থিয়েটার গুলিকে অর্থ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এঁদের সহানুভূতি এবং সাহায্য না পেয়ে যদি দেশের থিয়েটারগুলি "বড়লোক বাবুদের" মুখ চাইতে হোতো, তাহলে এদেশে থিয়েটারের অস্তিত্ব থাক্‌তো না। এটা ধ্রুব সত্য কথা।

যাক্ অনেকটা বাজে কথা হয়ে গেল! মেজবাবু টাকা দিয়ে "বক্স" কেন্‌বার কথা শুনেই যে ম্যানেজার মশাই দু'তিনখানা "বক্স" খালি করে দিলেন, ভদ্রলোকেরা সেই সব "বক্সে" বসে থিয়েটার দেখতে দেখতে ম্যানেজার মশাইয়ের কথা শুনেই যে উঠে চলে গেলেন, কিম্বা অন্যত্র গিয়ে বস্‌লেন, তার কারণ,—ম্যানেজার মশাই মেজবাবুকে যা বলেই বোঝান। আমি কিন্তু সঠিক জানি। ভদ্রলোকগুলি ম্যানেজার মশায়ের কোনও অন্তরঙ্গ সুহৃদের বাড়ী থেকে

"ফোকোটোর" (অর্থাৎ বুঝেছেন তো—মিনি পয়সায়) থিয়েটার দেখতে এসেছেন। এমন হামেষাই তাঁরা অভিনয় রাত্রে আসেন,—বসেন,—থিয়েটার দেখেন। আবার দরকার হ'লে (অর্থাৎ যে জায়গায় তাঁরা গিয়ে বসেন) কোন ভদ্রলোক টিকিট কিনে এসে জায়গা না পেলে—সেই জায়গা খালি করে দিয়ে অন্যত্র (জায়গা পেলে) বসেন, (জায়গা না পেলে) দাঁড়ান। তাঁরা নিজেরাই জায়গা ছেড়ে দেবার সময় "কাষ্ঠহাসি" হাসতে হাসতে বলেন—"তার আর কি! আমরা হ'লুম ঘরের লোক!"

বুঝতে পারি না—"কার ঘরের লোক" ব'লে তাঁরা নিজেদের প্রচার করে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা গাঢ় করে নেন্! "থিয়েটারের না,—ম্যানেজার মশায়ের? না,—থিয়েটারের মালিকদের?"

মেজবাবুর আজ্ঞামত ষ্টেজের ভেতর ফুলের ঝাঁকা পৌছে দিয়েই—আমি দোতলার ওপরে উঠে গেলুম। বারান্দায় গিয়ে পৌছেছি,—এমন সময় দেখি—সেই "নারাণ ঘোষ"—(পুরো গয়লা নয়—জাতে সদ্গোপ) একটা মদের গেলাস হাতে নিয়ে একধারে দাঁড়িয়ে আছে, বোধহয় একটু একটু খাচ্ছে। তাকে দেখে আমি ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছি দেখে—সে তাড়াতাড়ী আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে বল্লে—"কি বাবা দীনুরাম,—পাশ কাটিয়ে যাচ্ছো? আমি তোমার জন্তে হন্তে হয়ে দাঁড়িয়ে আছি বাবা!"

আমি। "কেন? আমাকে আপনার কি দরকার?"

নারাণ। "বুঝতে পাচ্ছ না? আমি যে তোমার দোস্ত! আমার বখ্‌রাটী এইবার ঝাড়ো দিকি বাবা!"

আমি। "কিসের বখ্‌রা আপনার?"

নারাণ। "চেঁচাচ্ছ কেন বাবা? ভাগীদার বেড়ে যাবে যে! চুপি চুপি তোমায় আমায় ভাগ্‌-বাটোয়ারা হ'য়ে যাক্‌না বাবা! দু-দুশো টাকা—"

আমি। "আপনি কি বলছেন নারাণবাবু? আমি মেজবাবুর দুশো টাকা, বকৃসের দাম ব'লে যেটা তিনি ম্যানেজার মশাইকে দিতে বল্লেন, আমি সে টাকা চুরি করলুম?"

নারাণ। "আহা—সবটা গ্যাড়া দিলে চ'লবে কেন বাবা? তিনখানা ভাড়া বকৃসের দাম কত হয় বাবা? চল্লিশ না হয় বড় জোর পঞ্চাশ টাকা! আচ্ছা—আরও না হয় দশটাকা দিচ্ছি! তা হ'লে বাকী থাকে ১৪০৲ টাকা। চল্লিশ টাকা তুমি ট্যাঁকে গোঁজো, আমি একশ টাকা নিয়েই খুসী হ'চ্ছি বাবা!"

মাতালটার সঙ্গে বেশী কথা কওয়া যুক্তিসিদ্ধ নয় মনে করে, আমি সেখান থেকে চলে যাবার উপক্রম ক'চ্ছি! বেটা যেন ছিনে জোঁক! কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়ে না! —কেবল বলে—"দেবে তো দাও—নিদেন অর্দ্ধেক, নইলে এখুনি বাবুকে এ কথা জানিয়ে দোবো কিন্তু! তা ব'লে দিচ্ছি, হ্যাঁ—"

আমি খুব রুষ্টভাবে বল্লুম,—"বাবুকে আমি নিজেই জানিয়ে দিচ্ছি! আপনার লজ্জা করে না—আপনি বাবুর কাছে সেদিন অমন ধারা অপমানিত হ'লেন—নিজের বুদ্ধির দোষে, এই আমারই জন্তে,—আজ আবার আমার সঙ্গে এইরকম ক'চ্ছেন শুনলে,—বাবু এই দেশশুদ্ধ লোকের মাঝখানে আপনার কি দুর্গতি করবেন তা ভাবছেন না?"

নারাণবাবু—পাত্রস্থিত মদ্যটুকু নিঃশেষে পান ক'রে একেবারে গেলাসটা ছুঁড়ে ফেলে রেখে ঈষৎ টল্‌তে টল্‌তে, চ'ল্‌তে চ'ল্‌তে বললেন—"কে কার দুর্গতি করে দেখাচ্ছি রে শালা,—শালার ঘরের শালা—!"

"খবরদার গালাগাল দেবেন না মশাই, ভাল হবে না বলছি,"—ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আমিও তাঁর পাছু পাছু গেলুম!

মাতালটা আপনার গোঁ ভরে একেবারে বাবুর বক্সের সামনে দাঁড়িয়ে প'ড়ল! বাবু তখন "মদের নেশায় মজ্‌গুল" হয়ে থিয়েটার দেখছেন আর মধ্যে মধ্যে চেঁচিয়ে উঠছেন—"বাঃ—বাঃ—চমৎকার—বাঃ—"কপিতেল" (capital), "বেটীর ফুল" (beautiful), "গ্যান্" (grand)! বাবুর দেখাদেখি ইয়ারের দলটীও ঠিক যাদের যাদের—(অর্থাৎ যে সব অভিনেতা অভিনেত্রীদের) বাবু "বাহবা" দিচ্ছিলেন,—তাদেরই তাঁরা তারিফ ক'চ্ছেন। "একটরদের" মধ্যে যোগীবাবু "সমরসিংহ" সেজেছিলেন,—অভিনয়ও অবিশ্যি খুব ভালই ক'চ্ছিলেন,—বাবুরা সকলেই ডাক্ ছেড়ে তাঁর সুখ্যাতি ক'চ্ছিলেন! আর "নীরোদ শুঁড়ি" আদি ক'রে অন্য অন্য

অভিনেতার দল ভাল অভিনয় কল্লেও—কেউ দেখি "টুঁ" শব্দটী ক'চ্ছে না,—অবশ্য, আমাদের বাবুদের মধ্যে থেকে! অন্য অন্য দর্শকেরা তো মেজবাবুর ইয়ার নন্,—সুতরাং তাঁরা এ্যাক্টরদের যোগ্যতা অনুসারে "বাহবা" দিচ্ছিলেন। কিন্তু অভিনেত্রীরা তো দেখি কেউই বাদ পড়ছেন না। গিরিবালা বিবির তো কথাই নেই! তিনি অভিনয় ক'র্ত্তে বেরুলেই—দর্শকদের ভেতর এমন একটা হৈ—হৈ পড়ে যে পাঁচ সাত মিনিট যায়---তার ধাক্কা সাম্‌লাতে! দর্শক মশাইরা হাত-তালি দিয়ে, "সিটি" মেরে গভীর রাত্রে পায়রার ঝাঁক্ উড়োতে আরম্ভ ক'ল্লেন,—আর আমাদের মেজবাবু মশাই সদলে চীৎকার তো লাগিয়ে দিলেনই,—উপরন্তু সেই বক্স থেকেই "ফুলের মালা", "গোড়ে", "তোড়া" ঝপাঝপ্ ষ্টেজের ওপোরই গিরিবালাকে উপহার দিতে আরম্ভ ক'ল্লেন। "গিরিবালার" পর খাতির পেলেন "শরৎকুমারী"—তারপর "যুগলময়ী,"—ওরফে "জাঁদ্রেল যুগ্‌লী"! আর সখীর দঙ্গল যখন নাচতে বেরোয় তখন যেন ওপোর থেকে (অর্থাৎ আমাদের মেজবাবু আর তাঁর ইয়ার মশাইদের কাছ থেকে) রীতিমত পুষ্পবৃষ্টি হ'তে আরম্ভ হ'ল! দেখ্‌তে দেখ্‌তে ষ্টেজের ওপোর এত ফুল জমা হ'ল যে অভিনেতা অভিনেত্রীদের তার ওপোর চলাফেরা দায় হ'য়ে উঠলো। নর্ত্তকীদের নাচা দুষ্কর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়ালো।

অভিনয় যখন এইভাবে চল্‌ছিল, তখন আমি আর নারাণ বাবু মেজবাবুর বক্সের পেছনে নির্ব্বাক হ'য়ে দণ্ডায়মান! এমন সময় খানসামা মেজবাবুর জন্যে আবার "মদের গেলাস" নিয়ে এসে—"হুজুর" বলে ডাকতেই তিনি ফিরে বললেন এবং "গেলাসটী" হাতে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—"দীনু কখন প্লে ক'র্ব্বে,—তোমার প্লে দেখতে না পেলে যে আমার ফূর্ত্তি হ'চ্ছে না!—এই দেখ—তোমার জন্য দুটো বড় বড় তোড়া রেখেছি—হা—হা—হা—!" দেখলুম—বাবু একেবারে যাকে বলে "মজায় মজ্‌গুল!"

আমি ঈষৎ হাসতে হাসতে বললুম—"আমার এখনও ঘণ্টাখানেক দেরী আছে বাবু—"

মেজ। "ফুলগুলি পেয়ে সবাই খুসী হয়েছে তো?"

আমি। "আজ্ঞে সকলেই যথেষ্ট খুসী হ'য়েছেন! অমন সুন্দর ফুল পেলে কে না খুসী হবে বাবু মশাই! আমি সকলকে দিতে বলেছি—"

মেজবাবু মদের গেলাসটী "খালি" করে গড়গড়ার নলটী মুখে দিয়ে বললেন—"বেশ করেছ—বেশ করেছ! সবাইকে দিয়েছ তো?"

প্রসাদবাবু মদের গেলাস পেয়ে একটু যেন চাঙ্গা হয়ে বললেন—"ফুলগুলো গিরিবালাকে দিলে না কেন?"

আমি একটু রুক্ষভাবে বললুম—"বাবুর সেরকম হুকুম ছিল না—"

নারাণ বাবুটী একপাশে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টাল্ খাচ্ছিলেন,—কেউই তাঁর সঙ্গে কথা কয় না,—খানসামারাও তাকে কেউ "মদ" দেয় না,—বাবুও কিছু বলেন না দেখে, বেচারী জড়ানো জড়ানো কথায় আমাকে ব'ল্লে—"বাবুকে রসিদখানা দাও—"

মেজবাবু ব'ল্লেন—"কিসের রসীদ?"

নারাণবাবু বক্সের ভেতর আর একটু মাথা গলিয়ে বল্‌তে সুরু ক'ল্লেন—"তিনখানা বক্সের দাম দুশো টাকা,—একেবারে যাকে বলে—টাকা লুটিয়ে দেওয়া হ'ল! তার ওপোর এ ছোঁড়া ট্যাকে গুজে নিয়ে গেল—"

মেজবাবু মুখ তুলে নারাণ বাবুর দিকে চাইলেন। কোন কথা না ব'লে তামাক টান্‌তে টান্‌তে ধৈর্য্য ধরে কথাগুলো শুনতে লাগলেন।

নারাণবাবু আরও একটু দেহটা বক্সের ভেতর শাঁধ্ করিয়ে বলতে লাগলেন—"ও বেটা থিয়েটারে হয়তো জমা দিয়েছে গোটা তিরিশ চল্লিশ,—বাকীটা নিশ্চয়ই গ্যাঁড়া করেছে—নিশ্চয়ই—এ যদি না হয় তা হ'লে—"

মেজবাবু। "দীনু! টাকা কি ম্যানেজার মশাইকে এখনও দাও নি?"

আমি। "আজ্ঞে হ্যাঁ—ফুলের ঝাঁকা ষ্টেজের ভেতর নিয়ে গিয়ে টাকাগুলো আগে ম্যানেজার মশায়ের হাতে গুণে দিলুম—"

নারাণ বাবুটী "হাতে হাত বাজিয়ে" বল্লে—"কক্ষনো না—কক্ষণো দেয় নি! এখুনি ম্যানেজারের কাছে লোক পাঠান; হেঁ—হেঁ বাবু, নারাণ ঘোষকে বোকা বোঝাবে

একটা ছোঁড়া ? ও মনে করেছে, বাবু কি আর মদের ঝোঁকে এ টাকার কথা মনে করে রাখবে—"

প্রসাদ বাবুটী আমার ওপোর একটু দরদ জানিয়ে নারাণ বাবুকে ব'ল্লেন—"না জেনে-শুনে ফস্ করে ভদ্রলোকের ছেলেকে চোর বলা তোমার ভারি অন্যায় নারাণ ! তুমি তো ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা ক'রে জানো নি যে ও টাকাটা সব দিয়েছে কিনা—"

নারাণবাবু খুব জোর করে বললে—"আচ্ছা ডাকাচ্ছি—এখুনি ডাকাচ্ছি—ম্যানেজারকে এখুনি ডাকাচ্ছি ! আমি বাবা নারাণ ঘোষ—খাঁটী সদ্‌গোপের বাচ্ছা,—আমি লোক চিনি না ? ও যদি সব টাকা ম্যানেজারকে দিয়ে থাকে—তা হ'লে আমায় বাপেই জন্ম দেয় নি !"

আমি তো অবাক্ ! সেকি ? এ বেটা বলে কিগো ! বাবুও কি তাই বিশ্বাস ক'চ্ছেন না-কি, যে আমি টাকাটা চুরি করেছি ?

"আমি ম্যানেজার মশাইকে ডেকে আনি বাবু"—বলেই যেই দু' পা এগিয়েছি—অমনি একটী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখি ম্যানেজারবাবু কথা কইতে কইতে আমাদের দিকেই আসছেন !

(ক্রমশঃ)

পাঁচমিনিট

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

অদ্ভুত বিজ্ঞাপন

একটী ভদ্রলোক তাহার বাগান বাড়ীখানি বিক্রয় করিবার জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন। বাড়ীখানি খুবই সুন্দর কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ একমাসের মধ্যেও ক্রেতা জুটিল না দেখিয়া তিনি পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন নাকচ করিয়া এইভাবে নূতন বিজ্ঞাপন দিলেন -

'যিনি এই বাড়ীখানি ক্রয় করিবেন তিনি যে মস্ত একটী লাভ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই—তবে তাহাকে দুইটী অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে—প্রথম গোলাপ কুঞ্জের অবিশ্রাম একঘেয়ে মর্ম্মরধ্বনি এবং দ্বিতীয় কোকিলের অশ্রান্ত বিরক্তিকর চীৎকার। এই দুই অসুবিধা সহ্য করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকেই আবেদন করিতে বলি।'

পরদিনই শতাধিক ক্রেতা জুটিয়া গেল।

বোঝা গেছে

ক্রেতা—(টিকিট ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া)—মশাই, আজকাল যে নতুন বইখানা খুলেছে, তার প্লে নাকি খুব চমৎকার হচ্ছে ?

টিকিট বিক্রেতা—সে কথা আর আমরা কি বলব ? তবে যারা এ বই দেখেছেন তাদের জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই শুনতেন এমন সুন্দর বই নাকি আগে কখনও প্লে হয় নি।

ক্রেতা—আচ্ছা তা হ'লে দেখুন.ত, আজকে একদম front rowতে ঠিক মাঝখানের দুটো সিট্ খালি আছে কি না।

বিক্রেতা—আছে বৈকি। কাটব নাকি দু'খানা টিকিট ?

ক্রেতা না থাক্ ; কেমন বই তা ওতেই বোঝা গেছে।

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(১২)

"দিদি।"

"ডোরা।"

"তুমি আজ যে সারাদিন কিছু খেলে না ?"

"আঃ যে আমার একাদশী ডোরা।"

মমতার উপবাসক্লিষ্ট মলিন, অথচ পবিত্র দীপ্তিতে উদ্ভাসিত মুখের প্রতি তাকাইয়া ডোরোথি অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইল। মমতা ডোরোথির হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল—"শুবি ডোরা একটু, শোনা ভাই সারাদিন তো খাটছিস্।"

ডোরোথি দ্বিরুক্তি করিল না। মমতার পাশটিতে শুইয়া পড়িল। ডোরোথিকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া মমতা বলিল—"ডোরা একটা কথা বলব যদি রাগ না করিস।"

বিব্রত হইয়া ডোরোথি বলিল—"কি বলবে বল না দিদি ?"

সেদিন মানসদা'র মুখে অমলবাবুর খবর শুনে, অমন করে পালিয়ে গেলি কেন ? ওকি ভাই মুখ ফেরাচ্ছিস ? ডোরোথির মুখখানা জোর করিয়া এ পাশে ফিরাইয়া মমতা দেখিল, তাহার চোখের পাতায় পাতায় শুভ্র নীহারবিন্দুর ন্যায় জলকণা টল্ টল্ করিতেছে।

"বুঝেছি...কিন্তু ছাড়লি কেন ভাই ?"

ধরা গলায় ভাঙা সুরে ডোরোথি বলিল—"বুঝতে পারি নি তখন।"

"কী চিরটা কাল বিলাতী ধরণ ধারণে অভ্যস্থা স্বদেশীয়ানা সহ্য করতে পারলি নে—না ?"

ডোরোথি মমতার বুকের মধ্যে মুখটাকে চাপিয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। মমতা পরম স্নেহের সহিত তাহার মাথার রুক্ষ চুলগুলি নাড়িয়া নাড়িয়া সাজাইয়া বলিল—"ভাল করিস নি ভাই, এটা তোর ভয়ানক বোকামী হ'য়ে গ্যাছে। এখন তোর উপায় কী ?"

"উপায় আবার কী ?"

"আর বিয়ে করবি নে ?"

ডোরোথি মুখ না তুলিয়াই জবাব দিল—"তুমি কি ক্ষেপেছ, বিয়ে না করলে বুঝি দিন কাটে না ?"

"কতকটা তাই-ই বটে, আমাদের হিন্দু ঘরে দিন অমনি কাটা বড় সহজ ব্যাপার নয়, সে বড় শক্ত কথা ভাই। হিন্দুর মেয়েছেলেদের যেমন করে হোক, একজন মাথার পরে' অভিভাবক থাকার দরকার।"

"সে তো বাবা আছেন ভাই ?"

মমতা বলিল—"সে তো বুঝলাম, কিন্তু ডোরা মা, বাপ্ কারুর চিরকাল বেঁচে থাকেন না। আজ যেন মামাবাবু বুক দিয়ে তোমাকে ঘিরে রয়েছেন, কিন্তু পরে···তোমার কী হবে ?"

ডোরোথি অস্ফুট স্বরে বলিল—"হবে আবার কি ? দেশের সেবা প্রধান কাজ মাথায় তুলে নিয়েছি, তাতেই আমার জীবন কেটে যাবে।"

"সেও তোমার একলার দ্বারায় সুসম্পন্ন হবে না।"

হতাশভরা সুরে ডোরোথি বলিল—"না যদি হয় তো যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে।"

"শুধু অদৃষ্টবাদী হয়ে বসে থাকলে হবে না, ঈশ্বর তোমাদের হাত, পা, মন দিয়েছেন—তাদের কাজে লাগাও, তা এক কাজ কর, না হয় অমলবাবুকে একবার ডেকে পাঠাবো ? সে তো তোকে অবহেলা করে নি ?"

সভয়ে ডোরোথি বলিল—"না ভাই তা হয় না, আমি তাঁকে ডাকতে পারব না।"

"অভিমানটুকু এখনও সম্পূর্ণ বজায় রয়েছে দেখছি, দূর

পাগলী এই নিয়ে তুমি দেশের সেবা করবে ? জান তো সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে হয় এ মহা পূজায়…"

ডোরোথি সে প্রসঙ্গ উল্টাইয়া বলিল—"ও সব কথা থাক্ আচ্ছা দিদি, তোমার বিয়ের কথা বলো না ভাই…মনে পড়ে ?"

পাংশু হাসি হাসিয়া মমতা বলিল—"তা, আবার পড়ে না-রে ?"

"বিয়ে হ'য়েছিল তোমার ক' বছরে ভাই ?"

"সাত বছরে…"

ডোরোথি কুণ্ঠাজড়িত স্বরে বলিল—"আর—আর এ অবস্থা হয়েছে…"

ডোরোথির কথা সম্পূর্ণ করিয়া মমতা বলিল—"মাত্র এগারো বছর বয়সে…"

ডোরোথি বলিল—"আচ্ছা দিদি, তিনি কি রকম লোক ছিলেন ভাই ?"

"লোক !" মমতার কপোল বহিয়া এক ফোঁটা জল ডোরোথির চুলের পরে' পড়িল। ডোরোথি চমকাইয়া বলিল—"দিদি আমার অন্যায় হ'য়ে গ্যাছে ভাই, ক্ষমা কর।"

"অন্যায় ! কিসে অন্যায় হ'লো ভাই।"

ডোরোথি সকাতরে বলিল—"এই তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিলাম।"

মমতা ক্লিষ্টস্বরে বলিল—না ভাই অন্যায় করবি কেন ? জানিস নে, তাই জিজ্ঞেস্ করছিস্। হ্যাঁ লোকের কথা বলছিস্…কিন্তু ক'টা দিনই বা তার সঙ্গে ঘর করেছি, সাত বছর বয়সে স্বামী যে কী জিনিষ, কাকে বলে ভাই জানতেম না, তবে এটুকু মনে পড়ে, সে যে সব সময়ে আমার সঙ্গে ছেলেমানুষী করত…কারণ অকারণে আমাকে রাগিয়ে ঝগড়া বাধাত, পরে' আমার চোখের জল দেখলেই আদরে আদরে আচ্ছন্ন করে তুলত। মরবার সময় খালি বলে গেছল—"মমতা আমাকে ভুলো না—আমি তোমারি প্রতীক্ষায় সেখানে বসে থাকব, তখন সেখানে যেন এমনি সঙ্গিনীরূপে তোমাকে পাই।" মমতার চোখ ঝাপসা হইয়া উঠিল, আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল—সে সময়টা হারিয়েও কিছু বুঝতে পারি নি, কাজকর্ম্মের বাড়ী যেতুম, অবাক হ'য়ে দেখতুম, যে সকলে আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন—মা'র গলা জড়িয়ে প্রশ্ন করতাম—মা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে কেবলই কাঁদতেন; ওরে তখনও জানি নি ডোরা যে কত বড় সর্ব্বনাশটা আমার হ'য়ে গ্যাছে।"

ডোরোথি রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—"উঃ থাক ভাই, তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে বলতে।"

"না রে শোন্, তোকেই বলি…তারপর বালিকার গণ্ডী ছাড়িয়ে, একটু একটু করে বেড়ে উঠতে লাগলাম, মা জোর করে রাধাবিনোদের সামনে বসিয়ে হাতে, বেলফুল তুলসী পাতা গুঁজে বলতেন, পূজো কর।" মা উঠে গেলেই পালিয়ে যেতুম…ঘরের কোণে বসে ভাবতুম, সে কোথায় ? ঠাকুরের কাজে মন কি করে দেব ভাই ? চঞ্চল মনকে কিছুতেই দেবতার পূজায় উৎসর্গ কর্ত্তে পারতাম না। * * * বাবার সঙ্গে মানসদা'র বাবার খুব আলাপ ছিল। সেই সূত্রে মানসদা মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ীতে আসত…আমি তাঁর কাছে গীতা নিয়ে পড়ে ব্যাখ্যা শুনতুম। এমনি করে আরও দুটো বছর কেটে গেল। লোকে আমার নামের সঙ্গে মানসদা'র নাম জড়িয়ে কুৎসা রটালে…সীমাহীন মন তখন ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল—ছিঃ, পরনিন্দাকারী গ্রাম্য লোক-দের ধিক্, ভাই ভগিনীর পবিত্র সম্বন্ধে দোষারোপ কর্ত্তে একটুও সঙ্কোচ বোধ করল না। মনে মনে বড় কষ্ট হল… পরের দিন মানসদা আসতে স্পষ্ট করে বললাম—'যে তুমি আর আমাদের বাড়ী এসো না'—মানসদা থমকে বললে—"কেন মমতা ?" তখন আমি বললাম—"আমাদের উভয়কে" আর বলতে হোল না। মানসদা বললে—"বুঝেছি সেই থেকে মানসদা' আমাদের বাড়ী আসা বন্ধ করে দিলে। ঘরের ভিতর গিয়ে বাক্স থেকে স্বামীর ফোটোখানা বের করে জপে বসলাম… আঃ ডোরা কি স্নিগ্ধ শান্তি পরশ যে তাতে পেলাম—তা আর কি করে বোঝাবো তোকে…সব মন প্রাণ দিয়ে ঐ এক দেবতাকে নিশিদিন অশ্রুর মালা গেঁথে পরাতুম, অন্তরের অতৃপ্ত নিবেদন অঞ্জলি দিয়ে বলতুম—'আমার দেবতা আমাকে পথ দেখিয়ে দাও।' মমতা ক্ষণেকের তরে নির্ব্বাক হইল। পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল—"কেন জানিনে—সেই কিশোর স্বামীর মুখখানি উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল,

ভাসা ভাসা স্বচ্ছ চোখে যেন করুণার অশ্রু ফুটে উঠল—কাঁচের ভিতর থেকে যেন স্পষ্ট শুনলাম সেই মিষ্টি মধুর বাণী—মমতা, আমি তো কোথাও যাই নি, তুমি এতদিন আমাকে খুঁজতে চেষ্টা করোনি—তাই আমাকে পাওনি···আজ খুঁজেছ তাই তোমাকে ধরা দিলুম। আমি তোমাকে ভুলিনি"—আনন্দে আবেগে সেই ফটোখানি বুকে চেপে ধরলুম - কাঁচখানা বুকের কঠিন চাপে গুঁড়িয়ে গেলো—চোখের জলে তাকে অভিষেক করে বললাম—"আঃ সত্যিই আজ এতদিনে তুমি আমাকে ধরা দিলে গো।" ডোরা আর এখন আমার মনের কোণেও অশান্তির লেশমাত্রও নেই—মা চলে গ্যাছেন, বাবাও সেই পথে—সবাই একে একে বিদায় নিচ্ছেন—কেবল আমি আছি ঐ কিশোরের মূর্ত্তি বুকে ধরে—আশা আছে ঐ কিশোরের মোহন মুরতি ধ্যান করতে করতে যদি চির কিশোরের দেখা পাই।"

মমতার অশ্রুতে রচা ব্যথার কাহিনী থামিয়া গেল···কিন্তু ডোরোথির কানে সেই কথাগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল—"বসে আছি সেই চির কিশোরের আশায়।"

ডোরোথি বলিল "শ্বশুর বাড়ীর কেউ খোঁজ নেয় না ?"

হ্যাঁ - ভাসুর কতবার আমাকে নিতে লোক পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমি যাই নি···এ যে আমার মাটীর স্বর্গ, এ যে আমার মহাতীর্থ! এখানের ধূলিকণাতে যে আমি হারানো মাণিকের সন্ধান পেয়েছি—সেখানে কেমন করে যাব ভাই ? সেখানে হারিয়েছি—এখানে পেয়েছি—এখান থেকে আমার এক পা'ও নড়তে ইচ্ছে নেই। বর্ষা ধৌত নির্জ্জন শস্য শ্যামলা পল্লীবুকে সদ্য মেঘমুক্ত পূর্ণিমার চাঁদের রজত কিরণ ধারা জননীর স্নেহাশীষের মত ঝরিয়া পড়িল। প্রকৃতির এই নগ্ন সৌন্দর্য্যে ডোরোথির অন্তর ক্ষুব্ধ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কল্যাণপুরে মাতার স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে আসিয়া ডোরোথির আজ গলা ঠেলিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল!

*　　*　　*　　*

ডোরোথি আজ বড় বেশী করিয়াই তাহার উপযুক্ত শিক্ষার অভাবটা বুঝিল। বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার পিতার আদব কায়দা···স্বজন সঙ্গিনীদের ব্যবহার—তাহারাও বিলাতী আব হাওয়ায় গঠিত···তাহাদের কাছে যেটুকু সে শিক্ষা পাইয়াছিল, আজ ডোরোথির মন বলিয়া উঠিল—"না, তাহা নকল। তাতে কিছু নৈতিক শিক্ষা সে পায় নাই। কৃত্রিম মাতার স্নেহশূন্য অঙ্কে আজন্ম পালিতা ডোরোথির হিন্দু নারীর সহিত কখনও পরিচয় হয় নাই···তাহার সমস্ত শিক্ষাটুকুই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল। আজ মমতার প্রতি কথাটি তাহার সুপ্ত মনটাকে নাড়া দিয়া বলিল—"এ তোমার মায়ের আশীর্ব্বাদ।" নব জীবনের সন্ধান পাইয়া ডোরোথি মমতার গলা ধরিয়া তাহাকেই আশ্রয় জ্ঞান করিয়া কোমল করুণ সুরে বলিল—"দিদি আমায় এমনি শিক্ষা রোজ দেবে ভাই।"

"শিক্ষা!" মমতা বড় মধুর হাসি হাসিল। বলিল—"তোর দিদি কি শিক্ষা জানে ডোরা, তাই তোকে দেব?"

"না না দিদি তুমি ঐ যেটুকু জানো, ওর কণামাত্রও আমাকে দিও ভাই··তাই আমাকে শিখিও.. ঐ আমার যথেষ্ট।"

সহসা উভয়কে সচকিত করিয়া কোথা হইতে মর্ম্মভেদী করুণ সুরে বাঁশী বাজিয়া উঠিল। আহা কোন হতভাগ্য গো···এই স্তব্ধ নির্জ্জন রাত্রির বুকে বসিয়া মনের গোপন ব্যথাটুকু নিঙড়াইয়া কোন সাথীর কাছে পাঠাও। আঃ কী বুকভাঙ্গা সুর ..এমন কান্নাভরা প্রাণ পাগল করা সুর কে তোমাকে শিখাইয়াছে গো? ওঃ এ যে কবি-সম্রাট রবীন্দ্র নাথের সব সেরা ব্যথার গান।

"আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে
দিবস শেষে করবো নিবেদন
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন

*　　*　　*　　*

অনেক দিনের অনেক কথা বাঁধা ব্যাকুল ডোরে
তারা মনের মাঝে উঠেছে আজ ভরে।"

আঃ দুইটি ব্যথাহতা ভগ্নীর ভিন্ন ভিন্ন মনোবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে অচেনা, অজানা রাতের গায়কের গানের প্রতি কথাটি মিশাইয়া গেল। তিনটি প্রাণীর গোপন ব্যথা দুর্নিবার ক্ষোভে

মাথা কুটিয়া মরিয়া আছাড়ি বিছাড়ি করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

(১৩)

তখন সবেমাত্র পূবের মেঘপুরীতে আগুন ধরিয়া উঠিয়াছে।...নীহারবিন্দু সংপৃক্ত শ্যাম দূর্ব্বাদলের বুকের প'রে তরুণারুণের কিরণ রশ্মি দ্রবীভূত স্বর্ণধারার ন্যায় ঝরিয়া পড়িয়া নানা রঙের সৃষ্টি করিতেছে। টিনের ঝাঁঝরী ঝারি লইয়া একটি শ্যামাভ তরুণী গাছে গাছে জল দিতেছিল। উপর থেকে ঝরে পড়া সোণালী রোদটুকু তরুণীর মুখের পরে' পড়িয়া তাহাকে বনদেবীর মত দেখাইতেছিল। সকালের স্নান করা এলান ভিজা চুলগুলি ভোরের বাতাস নাড়িয়া চাড়িয়া শুকাইতেছিল। রোজ এ কাজটি তরুণী নিজের হাতে না করিলে তৃপ্তি পাইত না। তাই বাগানের মালীকে সরাইয়া রোজই প্রভাত, সন্ধ্যায় বাগানের প্রসাধনের নিমিত্ত উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। সমস্ত গাছগুলিতে জল ঢালিতে ঢালিতে পরিশ্রান্ত হইয়া তরুণী নিকটেরই একটি কামিনী গাছে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তখন মেঘের আড়াল ঠেলিয়া অরুণের সপ্তাশ্ব যোজিত রথখানি ছুটিয়া আসিতেছিল ; সহসা মর্ত্ত্যলোকে তপোবনের দেববালার মত সারল্যে মণ্ডিত তরুণীর বেপথু মূর্ত্তিখানি দেখিয়া থমকিয়া থামিয়া পড়িল। পরে দুই হাতে চুণী পান্নার রাশী ছিটাইয়া চলিয়া গেল।

পিছন হইতে কচি গলায় কে বলিয়া উঠিল—"বারে—মাসীমা, আমাকে ঘুম পাড়িয়ে একেবারে চুপি চুপি পালিয়ে এসেছ ?"

তরুণীর চমক ভাঙ্গিল। ছুটিয়া সেই একরাশী ফুটন্ত জ্যোৎস্নার মত ছোট্ট মেয়েটিকে কোলে তুলিয়া হাসিয়া বলিল—"দুষ্টু মেয়ে এরি মধ্যে উঠে পড়েছ, যাও শীগ্‌গীর বাড়ীর ভেতর যাও, এখুনি ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে।"

ঠোঁট দু'খানি ফুলাইয়া অভিমানপূর্ণ স্বরে বালিকা বলিল "হুঁ অসুখ করবে না ছাই...আচ্ছা তুমি যে কত ভোরে উঠেছ, তোমার যদি অসুখ করে...বেশ হবে বাবা—দেখবো তখন, তোমার অসুখ হলে কেমন করে হাসপাতালে কাজ কর্ত্তে যাও।" আনন্দে ছোট্ট ছোট্ট কচি হাত দু'খানি দিয়া করতালি দিয়া বালিকা ঝর্ণা হাসিয়া ফেলিল।

অরুণা একটু গম্ভীর ভাবে বলিল—"তা'তো তোমার আমোদ হবেই ঝর্ণা, তুমি তো আমাকে ভালবাস না—তাই বলছ আমার অসুখ হলে বেশ হবে, আচ্ছা তাই হোক, আমার অসুখই হোক কেমন ?"

তরুণীর অভিমান মিশ্রিত অত কথার বাহুল্য বালিকার বোধগম্য হইল না। কেবল সে দেখিল—তাহার মাসীমা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নরম, ফুলের মত তুলতুলে হাত দু'খানি দিয়া তরুণীর কাপড়ের প্রান্ত ধরিয়া টানিয়া করুণ স্বরে বলিল--"ও মাসীমা, রাগ করলে ? আড়ি দিলে বুঝি, আচ্ছা আর কক্ষণো ও কথা মুখে আনব না, এই নাও চুমো দিচ্ছি।"

বালিকা ভাবিল---'চুমা দিলেই বুঝি তাহার মাসীমার রাগের পরিমাণ হাল্‌কা হ'য়ে যাবে।' তরুণী মুখ হইতে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের মেঘখানা সরাইয়া এক ঝলিক জ্যোৎস্নার মত হাসিয়া, ঝর্ণাকে কোলে তুলিয়া তাহার গোলাপ সদৃশ কোমল গণ্ডে স্নেহের চুম্বন আঁকিয়া বলিল—"বাঃ ঝর্ণা তো লক্ষী মেয়ে, আর বলো না, তা হলে আমি মরে যাব।"

মরণের ভয় একটা অবুঝ শিশুর প্রাণেও ভীতি সঞ্চার করিল। ঝর্ণা মুখখানি ম্লান করিয়া কোল হইতে নামিয়া পড়িবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। তরুণী তাহাকে আঁকড়াইয়া হাসিয়া বলিল---"পালানো হচ্ছে বুঝি আচ্ছা যাও দেখি, কেমন নেমে যেতে পার ?"

ঝর্ণা আঁকিয়া বাঁকিয়া পলাইবার নানা উপায় উদ্ভাবনা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। বিফলকাম হইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল—"আচ্ছা নামছি না --আগে ঐ বড় গোলাপটা আমার চুলে পরিয়ে দাও—আর একটা গান বল—তবে কোলে থাকব।"

"এখন কি গান বলবার সময় ঝর্ণা ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই সময়, বল, তবে কালকে এম্নি সময় গাচ্ছিলে কেন ?"

স্মিতমুখে তরুণী বলিল—"মিথ্যে কথা—কে বললে তোমায়, আমি এই সময় গান গাচ্ছিলাম।"

ঝর্ণা হাসিয়া বলিল—"হুঁঃ মিছে কথা বই কি, কালকে দেখলুম ঐ গাছের গোড়ায় বসে গাইছ; দাঁড়াও সেই গানটার একটা লাইন আমি মুখস্থ করে ফেলেছি সেই যে—

"এই করেছ ভাল নিঠুর
এই করেছ ভাল
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।"

"বল মাসীমা সেইটা।"

তরুণী কৃত্রিম দুঃখ মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল—"যা ঝর্ণা তাহলে আমার বিদ্যেটুকু সব শিখে নিয়েছ? ছিঃ এখন বিরক্ত করোনা—যাও পড়বার সময় হয়েছে…না হলে এখনি মিস্ উৎপলা দি' এসে তোমার কান মলে দেবে—যাও ঝর্ণা বাড়ী যাও, ঐ দেখ মা আসছেন।"

আশ্রমের অধিকারিণী সুমতি দেবী হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলেন—"কি মা, ঝর্ণা কি চায়।"

তরুণী বলিল—"না মা ঝর্ণা কিছু চায়নি—বলছে গান শিখিয়ে দাও।"

সুমতি দেবী বলিলেন—"গান এর পরে শিখ মা, তোমার 'টিচার' এসেছেন, ডাকাডাকি করছেন—যাও এখন।"

ঝর্ণা মুক্তি পাইয়া বাধামুক্ত ঝর্ণার মতই উচ্ছল গতিতে নাচিয়া চলিয়া গেল। সুমতি দেবী তরুণীকে কাছে টানিয়া প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল—"সত্যি মা, তোমার আগমনে আমার আশ্রমের যেমন উন্নতি হ'য়েছে, তেমনি এ বাগানটারও যথেষ্ট শ্রী ফিরে এসেছে…তোমার উৎসাহে ঐ নতুন বাড়ীটাও শীগগীর তৈরী হ'য়ে উঠছে এবার ঐ বাড়ীটা সম্পূর্ণ হ'য়ে গেলে—ওর সমস্ত রোগীর তত্ত্বাবধানের ভার তোমার উপর ছেড়ে দেব। কেমন মা পার্ব্বে তো?"

তরুণী সুমতী দেবীর স্নেহালিঙ্গনে আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ছাড়িয়া অশ্রুকাতর কণ্ঠে বলিল—"আপনি তাই আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন মা। যেন কার্য্যে সফল হ'তে পারি। সেবা নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম..সেই ধর্ম্মে আমার যেন সমস্ত সত্ত্বা পর্য্যবসিত হ'য়ে যায়।"

(ক্রমশঃ)

গ্রন্থ পরিচয়
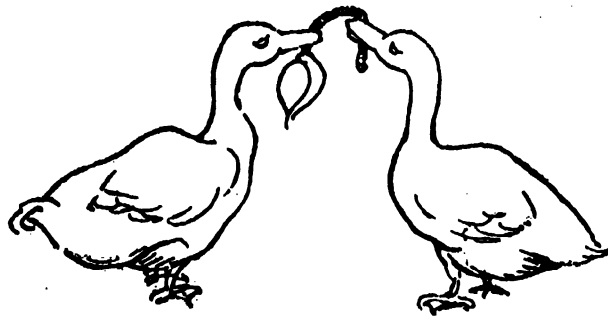
অন্ধ দেবতা—শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার বিদ্যারত্ন প্রণীত। ডবল ক্রাউন ৩৭০ পৃঃ—মূল্য আড়াই টাকা। প্রকাশক—ডি, এম, লাইব্রেরী, ৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলিকাতা।

প্রবীন লেখকের এই উপন্যাসখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। গ্রন্থকার তাঁহার সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়া এই উপন্যাসখানি লিখিয়াছেন। তিনি নভেলের আকারে একশত বৎসর পূর্ব্বের বাঙ্গলা দেশের সামাজিক ইতিহাস ও সভ্যতা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রামের কথা যাঁহারা আলোচনা করিতেছেন তাঁহারা "অন্ধ দেবতা"তে দেখিতে পাইবেন যে কি কি কারণে একশত বৎসর পূর্ব্বেই বাঙ্গলা পল্লী ধ্বংসের মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। গ্রন্থের মধ্যে আজকালকার বাঙ্গালী জীবনের সমস্যাগুলির উৎপত্তি কৌশলে বর্ণনা করিয়া লেখক তাহার সমাধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি গোঁড়া হিন্দু সমাজের লোক হইয়াও আশ্চর্য্য উদারতার সহিত সামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রয়াস পাইয়াছেন। স্বামী বিদেশে গমন করিলে, অরক্ষিতা যুবতী স্ত্রী কু-লোকের চক্রান্তে পড়িয়া নিজের চরিত্র বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্বামী দেশে ফিরিলে অনুতপ্ত স্ত্রী যখন তাহার দোষ অকপটে স্বীকার করিল তখন স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া আদরে বুকে স্থান দিলেন।

উপন্যাসখানির মধ্যে সেকালের জমিদার ডাকাতদের কীর্ত্তি কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সব ডাকাতের হাত হইতে বাঙ্গলা দেশ কেমন করিয়া রক্ষা পাইল—নীলকরের সাহেবরা কেমন করিয়া দমন হইল—তাহাও গ্রন্থকার অতি মনোরম আকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই উপন্যাস খানিতে বিলাতফেরত ঘরের স্বাধীনা যুবতী কন্যা, পতিতা বেশ্যা, ধর্ষিতা নারী প্রভৃতি না থাকিলেও, ইহা একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। লেখকের গল্প বলিবার ভঙ্গী এমনই সুন্দর যে কোথাও সমস্যা ঘটনাকে ছাপাইয়া প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই। "অন্ধ দেবতা" বাঙ্গালী পাঠকদের মধ্যে বিশেষ সমাদৃত হইবার যোগ্য। আমরা গ্রন্থখানির সাফল্য কামনা করি।

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—শ্রীনরেন্দ্র দেব প্রণীত। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৪৲ চারি টাকা।

গীয়াসুদ্দিন ইবন্ আবুল ফতে ওমর বিন্ ইব্রাহিম আল্ খৈয়াম ওরফে ওমর খৈয়াম বিশ্ববিখ্যাত পারস্য কবি। ইংরাজ কবি ফিট্‌জিরাল্ডের কাব্যানুরাগের ফলে আজ তাঁর অমৃতময় পদগুলি সকলেরই পরিচিত। বাঙ্‌লা ভাষায়ও এই পদগুলির অনেক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সুকবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব সম্প্রতি ওমর খৈয়মের পদগুলি তর্জ্জমা করেছেন। মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক তা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। মোট ৩১০টি রোবাইয়ের অনুবাদ এতে আছে এবং ৩৩খানি বহু বর্ণের সুন্দর চিত্র আছে।

পুস্তকখানির বাঁধাই, ছাপা ও চিত্রসমূহ অতিশয় সুষমাময় ও সুকল্পিত হয়েছে। পুস্তকের অঙ্গসৌষ্ঠবের অনুপাতে তা'র চার টাকা মূল্য আদৌ অধিক হয় নি। প্রিয়জনকে উপহার দিবার ও নিজে এর অধিকারী হবার মতো বই এই ওমর খৈয়মের বাঙলা অনুবাদখানি। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের পাকা হাতের গুণে কাব্যের ভাষা ও ভাব এত চমৎকার হয়েছে যে একে অনুবাদ ব'লে মনেই হয় না। যাঁরা ফিট্‌জিরাল্ডের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা উভয় পুস্তক মিলিয়ে দেখলেই জানতে পারবেন যে বহু স্থানে বাঙ্‌লা কাব্যখানি ইংরাজী অনুবাদকের কৃতিত্বকেও ভাব ও ভাষা সম্পদে ছাড়িয়ে গেছে।

কাব্যানুবাদখানির ভূমিকায় কবি অনুবাদক ওমর ও তাঁর রোবাইয়াৎ সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানগর্ভ তত্ত্ব সন্নিবেশিত করেছেন তা থেকে তাঁর অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার প্রশংসনীয় পরিচয় পাওয়া যায়। এই পুস্তকখানি কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে এই গ্রন্থ গৌরবান্বিত হলো। অনুবাদের লালিত্য ও সৌন্দর্য্য বিশদ করবার জন্য আমরা পুস্তকখানির দুটি স্থল থেকে দুটি স্তবক উদ্ধৃত করে দিলুম। এই অভিনব কাব্যখানি বাঙালার ঘরে ঘরে বিরাজ কোরে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের যশ প্রপ্রতিষ্ঠিত রাখুক:—

অকপটে যে বাসে লো ভালো
সে কভু না দেখে তা'র প্রণয়িণী রূপসী কি কালো!
হোক্ সে দরিদ্র দীন
সর্ব্ব-আভরণ-হীন

অথবা ধনীর বালা বহুমূল্য বেশ
প্রেমিকের প্রেম কিলো কম-বেশী হয় তাহে লেশ?
থাকনা পালঙ্কে শুয়ে অথবা সে পথে ধূলি-প'রে,
যায় যদি যাক্ চ'লে স্বর্গলোকে দেবতার বরে,
কিম্বা যদি কর্ম্মদোষে নরকেই হয় তা'র বাস,
যথার্থ প্রণয়ী কভু ছাড়ে নাকো প্রিয়া-বাহুপাশ।

(শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ—১৫০)

বসন্ত এসেছে আজি কণ্ঠে ল'য়ে তা'র
কোকিলের আকুল ঝঙ্কার,
দিকে দিকে ওই শোনো রাণী,
বেজে ওঠে আজি কত আকাঙ্ক্ষার অকথিত বাণী!
প্রবীণা ধরণী পুন ভুলি' ওই কপটের দু'দিনের ছলে
সুবেশে নবীনা সেজে ছুটিয়া এসেছে কুতূহলে।

(শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের অনুবাদ—২২৩)

বিভীষিকা।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৫শে আষাঢ় শনিবার, ১৩৩৩। [৩৩শ সপ্তাহ

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)

শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী ও আধুনিক নাট্যকলা

[শ্রীক্ষীরোদকুমার শর্ম্মা এম্-এ]

কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত শক্তির বলে মানুষ যে কি প্রকারে সফলতার উচ্চতম শিখরে উঠিতে পারে তাহা অভিনেতা নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর নট জীবনে সম্যক প্রকাশ পায়। সম্পাদকের লেখনী অনেক অভিনেতার অযথা প্রশংসা ও অনেক অভিনেতার অযথা নিন্দাবাদ করিয়া আসিয়াছে। সম্পাদকের ঢক্কা নিনাদ কিছুদিনের জন্য কোন অভিনেতাকে দর্শক সাধারণের নিকট বড় করিয়া তুলিতে পারে বটে কিন্তু অন্তর্নিহিত অদম্য শক্তি ধীরে ধীরে কার্য্য করিলেও মানুষকে সুদৃঢ় ভাবে যশের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করে।

বঙ্গদেশে অধুনা নূতন যুগের যে সকল অভিনেতা শ্রেষ্ঠ

আলিবাবা

বাবা মুস্তাফা—শ্রীনির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী।

বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে তিনি কলমের খোঁচার জোরে কখনও বড় হ'ন নাই। তাঁহার ভাগ্যের দোষেই হউক অথবা তাঁহার তৈলদানের অক্ষমতা নিবন্ধনই হউক কেবল মাত্র দুই চারিজন ন্যায়পর নিরপেক্ষ সমালোচক তাঁহার প্রতিভার যোগ্য সমাদর করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভিতরকার শক্তি ঢক্কাবাদক সমালোচকগণের সহস্র নিন্দাবাদ প্রতিহত করে তাঁহাকে প্রকৃত নটের গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়াছে।

নির্ম্মলেন্দু বাবুর নাট্য প্রতিভা সমালোচনা করিতে বসিলে তাঁহার নট জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময় স্থানটী সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। বেঙ্গল থিয়েটার্স কোম্পানীতে অভিনীত মহারাষ্ট্র নাটকের অপ্রত্যাশিত সাফল্য নির্ম্মলেন্দুর নট প্রতিভার উচ্চতম বিকাশ। এমন প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে পড়িয়া কয়েকজন মাত্র novice লইয়া নিজের অদ্ভুত শিক্ষকতার গুণে অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া তিনি যে নাট্য সম্প্রদায় গঠন করেছিলেন তাহা অর্থাভাব বশতঃ অল্পকাল স্থায়ী হইলেও এখনও নিরপেক্ষ দর্শক তাহার জন্য একটা সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস ফেলিবে। সদাশিব রাওয়ের অভিনয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসের একটা distinct landmark বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। নাটকখানি অভিনীত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে কয়েকজন সম্পাদক নির্ম্মলেন্দুবাবু ও নাট্যকার সুধীন্দ্র রাহাকে লইয়া নানাপ্রকার ঠাট্টা তামাসা এমন কি অশ্লীল গালাগালি পর্য্যন্ত করিয়া সেই নূতন সম্প্রদায়টীর অভ্যুত্থানের মূলে কুঠারাঘাত করিবার বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন যাহাতে দর্শক সাধারণ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব হইতে নূতন থিয়েটারটীর সম্বন্ধে অতি খারাপ ধারণাই করিয়া রাখিয়াছিল। তথাপি নির্ম্মলেন্দু বাবুর অসাধারণ প্রতিভা এবং organising capacity সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তাঁহাকে বিজয় মাল্যে বিভূষিত করেছিল। সেদিন নাট্য জগত দেখেছিল প্রকৃত প্রতিভা কাহাকে বলে, প্রকৃত অভিনয় কত সুন্দর!

নির্ম্মলেন্দু বাবুর প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী। কি বীররস, কি করুণ রস, কি হাস্যরস, কি আদিরস, কি ভক্তিরস সকল রসের অভিনয়েই তিনি অপক্ষপাত সহৃদয় দর্শকের উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতাপাদিত্য, রত্নেশ্বর, মীরকাশেম, নবকুমার, দিলদার, বিধুভূষণ, মোহিত, হাসান, সদাশিব রাও, মহিষাসুর প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় এক একটী দেখিবার জিনিষ।

নির্ম্মলেন্দু বাবুর সমস্ত ভূমিকার অভিনয়ের বিস্তারিত সমালোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। স্থানে স্থানে আমি তাহার নির্দ্দেশ করিব মাত্র। নির্ম্মলেন্দু বাবুর রত্নেশ্বর একটী অতুলনীয় সৃষ্টি। আদিরসের অভিনয় এরূপ সুন্দর ভাবে (tune to life) ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। রত্নেশ্বর সুরমার প্রথম সাক্ষাৎ দৃশ্য ও বিদায় দৃশ্য দর্শকগণের চিত্তপটে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। দিলদার চরিত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা নির্ম্মলেন্দু বাবুর নাট্যকলা জ্ঞানের প্রকৃত পরিচয়। "The alchamy of his genius turned whatever he touched into gold." গোলকুণ্ডার হাসান ভূমিকা একটী উজ্জ্বল কোহিনুর। সদাশিব রাওয়ের অভিনয় বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

অভিনেতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কণ্ঠস্বর ও চেহারা নির্ম্মলেন্দু বাবুকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার গুণাবলীতে বিভূষিত করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন উচ্চ তেমনি গম্ভীর ও মধুর। শ্রীদুর্গায় মহিষাসুর ও গোলকুণ্ডার হাসানের ভূমিকায় তাঁহার কণ্ঠস্বরের সুন্দর modulation লক্ষিত হয়।

Make-up সম্বন্ধেও নির্ম্মলেন্দুবাবু তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতাগণকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। আলিবাবার মুস্তাফার ভূমিকায় তিনি যে অদ্ভুত Make-up দেখাইয়াছেন তাহা সত্যই অপূর্ব্ব। তাঁহার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা খানিকে এমনি দক্ষতার সহিত রুগ্ন ও অস্থি-চর্ম্মসার বৃদ্ধের আকৃতিতে পরিণত করেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত এরূপ পরিবর্ত্তিত করেছিলেন যে তাঁহার নিকট আত্মীয়েরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই।

নির্ম্মলেন্দু বাবুর আর এক বিশেষত্ব এই যে তিনি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ভূমিকা লইয়াও নিজের সমগ্র শক্তি তাহাতে প্রয়োগ করিয়া ভূমিকাটী সজীব করিয়া তুলেন। তাঁহার ন্যায় ক্ষুদ্র

ভূমিকা লইয়া এ পর্য্যন্ত কোন অভিনেতাও এতদূর সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। সাজাহানে দিলদার, জনাতে অর্জ্জুন, বিষবৃক্ষে শ্রীশ, আলিবাবাতে মুস্তাফা, বিবাহ বিভ্রাটে গৌরীকান্ত তাহার নিদর্শন।

নির্ম্মলেন্দু বাবুর নাট্য সাধনার সবচেয়ে গৌরবের জিনিস তাঁহার masterly pathos. তাঁহার কণ্ঠস্বর করুণ রসের বর্ণনার সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। একঘেয়ে কাঁদুনী দ্বারা তিনি pathos সৃষ্টি করেন না তাঁহার করুণ কণ্ঠের সামান্য একটা touch সমগ্র অভিনয়কে করুণ রসে আপ্লুত করিয়া ফেলে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দিলদারের দারার সহিত কারাগারে সাক্ষাৎ দৃশ্য, অযোধ্যার বেগমে মীরকাশেমের শেষ দৃশ্য, সরলা নাটকে প্রমদার বিরুদ্ধে অগ্রজ শশিভূষণের নিকট বিধুভূষণের অভিযোগ দৃশ্য। তাঁহার pathosএ কোন Conseious effort লক্ষিত হয় কেমন একটা Spontaneity তাঁহাকে অত্যন্ত realistic করিয়া তুলে।

সত্য বলিতে কি নটের শ্রেষ্ঠ সম্পদ কণ্ঠস্বর, চেহারা, make-up প্রভৃতির কথা নিরপেক্ষ ভাবে ভাবিয়া দেখিলে বর্ত্তমান যুগের অভিনেতাদের মধ্যে কেবলমাত্র শিশির বাবুর সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে। কিন্তু তথাপি নির্ম্মলেন্দু বাবুর দিক দিয়া বলিতে হইবে যে সামাজিক নাটকে বিধুভূষণ, নবকুমার প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি যে উচ্চ শ্রেণীর কলাবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন অথবা বিল্বমঙ্গল, রামানুজ প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি যে ভক্তি রসের সুন্দর অভিনয় দেখাইয়াছেন শিশির বাবুর মধ্যে আমরা আজ পর্য্যন্ত তাহা দেখি নাই। সকল দিক ভাবিয়া বলিলে নির্ম্মলেন্দু বাবুকে আধুনিক বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের most promising অভিনেতা বলিলে কাহারও গৌরব ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।

একমিনিট

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

কোথায় ছিলুম।

নাটকের শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্য অভিনয় হইতেছে—এমন সময় ষ্টলের এক ভদ্রলোক তাহার পার্শ্ববর্ত্তী লোকটীকে বলিল—মশাই, প্রোগ্রামখানা দেবেন?

আশ্চর্য্য হইয়া দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর দিল - প্লে ত প্রায় শেষ হল, এখন আর প্রোগ্রাম নিয়ে কি করবেন?

প্রথম ব্যক্তি বলিল—বাড়ীতে ফিরে স্ত্রীকে দেখাতে হবে—আমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলুম।

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(১৪)

ভাল লাগে না। ওগো আর আমার ভাল লাগে না…এ নিছক একলা ঘরে অকেজো জীবনটা দুঃসহ হইয়া পড়িয়াছে। তরুণ হৃদয়ের সুকুমার পুষ্প নিচয় ফুটিয়াই ঝরি ঝরি করিতেছে। ওগো ন্যায় বিধানের কর্ত্তা, কেন আমাকে এমন সুন্দর পৃথিবীর বুকে অসহায় নারীরূপে সৃজন করিয়াছ দেব ? জগতের কোন কাজেই কি আমার এতটুকুও অধিকার নাই ? এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাও কি আমাকে অবহেলা করিয়া পৃথিবীর একটি কোণে ঠেলিয়া রাখিয়া দিয়াছে ? ওই যে আজ নিখিলের সমস্ত জড় প্রকৃতি নবোৎসাহে জাগিয়া কর্ম্মের পথে কিসের আহ্বানে আগাইয়া চলিয়াছে…ওগো আমিও কি এমনি করিয়া আমার সমস্ত স্বার্থের পায়ে কুঠার মারিয়া যাইতে পারিব ? নাঃ ভরসা হয় না, আমার এ চির তৃষিত বিক্ষুব্ধ হিয়া যে এখনও কাহার প্রত্যাশে বসিয়া আছে। বাসনা বিসর্জ্জন না দিলে কর্ম্মী হওয়া যায় না, কিন্তু সত্যি কি আমি আমার ঐ একটি কামনা ; যা আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় উন্মুখ হ'য়ে পাইতে চাহিতেছে, তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারিব ? উঃ কতকাল—ওগো বল গো সে কত যুগ আমাকে এমনি করিয়া পাষাণের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিতে হইবে। প্রতি পল, প্রতি অনুপল, প্রতি রতি, যেন এক একটি দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ বলিয়া মনে হইতেছে, আঃ এ জীবনের দীর্ঘ মেয়াদ যে আর ফুরাইতে চাহে না গো ? কী শাস্তি, একটি সামান্য ভুলের জন্য, একী দীর্ঘকালব্যাপী নিদারুণ অরুন্তুদ শাস্তি! চোখের উপর বিলাসিতা রঙীন হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার তীব্র আলোর নেশায় মাতাল হইয়া দিশাহারা ভাবে ছুটিয়া তাহাকেই কাম্য বলিয়া ধরিতে গিয়াছিলাম তোমায় প্রত্যাখান করিয়া। হায়, পলকে সব হাওয়ার মত উবিয়া গেল—বাস্তব শাশ্বত মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইল। পিছন ফিরিয়া তাকাইলাম, উঃ বহু দূরে, তখন তুমি বহু দূরে চলিয়া গিয়াছ—তোমার আমার মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান পড়িয়া গিয়াছে।

* * * ওগো সুদূরের প্রবাসী কর্ম্মী, ওগো দুঃখীর বন্ধু দেশভক্ত বীর, লোকে বলে তুমি করুণার অবতার…কে বলে, মিথ্যে! কই আমি তো তার এতটুকুও পরিচয় পাইলাম না…এই যে পিছনে একজন রুদ্ধ ব্যথায় গুমরাইয়া কাঁদিয়া জীবন সত্বেও প্রতি দণ্ডে মৃত্যু যাতনা অনুভব করিতেছে, তাহাকে তোমার কর্ম্মের অবসানে কী একবারও স্মরণ কর ? বরষার সজল মেঘ কাটিয়া শরতের স্বর্ণ বর্ণ রোদের আভা চিক্‌মিকিয়ে ফুটিয়া উঠিল—কিন্তু আমার এ তমসাবৃত মসী-লিপ্ত হিয়ার মাঝে এতটুকুও আলোর রশ্মি প্রকটিত হইল না ; তুমি আমার ফিরিয়া আসিলে না। ওগো অভিমানী আমার এতটুকু প্রচ্ছন্ন প্রেমপূর্ণ ব্যথার আঘাত সহিতে পারিলে না। নারীর এতটুকু ভুল সহিলে না ? আর আমি যে কত বড় বড় ব্যথার শায়ক বুক পাতিয়া অবহেলে সহিয়া লইতেছি। দিনের পর রাত, রাতের পর দিন—চক্রনেমীর কালচক্রের তলে নিষ্পিষ্ট হইয়া অনন্ত সাগরে বিলীন হইয়া যাইতেছে—আসিতেছে চিরন্তন প্রথায়, সে নিয়মের একটুও ব্যতিক্রম হইতেছে না। কিন্তু অন্তরে আমার নিত্য নূতন প্রলয়ের ঝঞ্ঝা হু হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। সে ঝড়ের দোলায় বুকখানা খান্ খান্ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। আবার সেই শত টুকরা বুক জোড়া দিয়া জোর করিয়া ধার করা হাসি মুখে টানিয়া নিত্যই সংসারের কর্ম্মে নিয়োজিতা হইতেছি এ ব্যথা যে আমাকে কতখানি যাতনা দিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছ কি ? ডোরোথির চোখ ফাটিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িল। দুপুরের মিঠা কড়া রোদের সঙ্গে সঙ্গে উদাস বাতাস আসিয়া ডোরোথির ব্যথিত চিত্তে শীতল পরশ দিয়া গেল। অতীতের প্রতি কথাটি আজ তাহার বুকে

বিষাক্ত হুলের মত বিঁধিতে লাগিল। একলা গৃহে অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আপনিই সান্ত্বনা পাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর চোখের জল মুছিয়া বাহিরে গিয়া চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে পিছনের বাগান বাড়ীর দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। কোথায় যাও ডোরো, কোন্ অনির্ণীত পথে অভীপ্সিত রত্নের সন্ধানে যাত্রা করিলে।

*　　*　　*　　*

বাহিরে খোলা মাঠের পরে' আসিয়া ডোরোথি ভাবিল —"আঃ বেড়াজাল হইতে মুক্তি পাইয়াছে সে। * * * আপন মনেই সে চলিতে আরম্ভ করিল। আশে পাশে ছোট বড় আলিপন চিত্রিত কুটীর, গাছ, মোহাবিষ্ট ডোরোথি দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইল। পাশে রাং চিত্রের বেড়ার পরে লতানে গাছ লাগানো, ছোট ছোট এক একটি শান্তিময় স্বপ্ন জড়ানো পাতার ঘর মাসিকের ছবির মত মৌন পল্লী-বুকে নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে···তাহারা যেন মৌন-বাকে ডোরোথিকে নিঃশব্দ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছিল। একপাশে সোণালী ধানের ক্ষেত, বুকে তাহার সোণার ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে। রাখাল বালকের গুন্ গুন্ করিয়া মেঠো সুরের গান···প্রকৃতির এই নিরলস শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ে এক একটি পুরাতন অশ্বত্থ গাছ তপোবন মধ্যস্থ ধ্যানমগ্ন ঋষির মত স্থির হইয়া যেন অনাদিকাল ধরিয়া অনন্তময়কে ডাকিতেছে। ডোরোথি সে সমস্ত পিছনে ফেলিয়া আগাইয়া চলিল। কিসের একটা দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনায় সে যে এমন করিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে; কেন? তাহা ডোরোথি আপনার মনকে বহু প্রশ্ন করিয়াও সদুত্তর পাইল না। যখন পথশ্রমে শ্রান্ত অলস চরণ দু'খানি বিশ্রাম লাভাশায় গতি স্থির করিল ··তখন ডোরোথির সুদূর পথ অতিক্রামী মন ফিরিয়া আসিল একি...এ কোথায় আসিয়াছে—সামনের অলকা নদীর স্নিকষ কালো জল বায়ুস্পর্শে মৃদু হিল্লোল তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়াছে; আর কোথায় সে ফিরিবে, পথও মনে নাই! দুশ্চিন্তায় অবসন্ন দেহভার পীড়িতা নদীর বুকে চড়ার উপর বসিয়া পড়িল। হঠাৎ দিক্দিগন্ত কাঁপাইয়া কাহার করুণ বাঁশরীর উদাস সুর ডোরোথির চঞ্চল নৃত্যশীল বুকের মধ্যে পশিয়া তাহাকে জাগাইয়া দিল। এ যে সেই বাঁশী...সেই সে দিনের বাদল রাতে প্রথম শোনা বাঁশী। তারপর কত রাত, কত অলস ক্লান্ত দুপুরে এই বাঁশীটির আকুল উচ্ছ্বাস শুনিয়া শিহরিয়া সে ভাবিয়াছে—কে এমন নিপুণ বাদক! কোন অভিশপ্ত বিরহীর ব্যথিত রোদন বাঁশীর তানে ঝরিতেছে জানা যায় নাই। অথচ সেই আনমনা বাঁশীর পথহারা সুর রোজই এমনি ডোরোথির পথ চলার মত কিসের বেগে ছুটিয়া চলিত। * * * বিহ্বল হইয়া ডোরোথি সম্মুখে পশ্চাতে চাহিল। * * ঐযে, ওই ধারে নদীর পরপারে ছোট্ট একখানি জীর্ণ ভগ্নপ্রায় কুটীর, সর্ব্বস্বহারা দীনের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ওইধার হইতেই সুরটা আসিতেছে না? ডোরোথি ভাবিল —তবে কি তাহারও মত হতভাগ্য জীব, এই জন পরিত্যক্ত পল্লীপ্রান্তে ছদ্মবেশে লুকাইয়া আছে? কৌতুহলী ডোরোথি চলিল সেই সুর ধরিয়া লঘু গতিতে। সহসা তাহার গতি রুদ্ধ হইয়া গেল, সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল...মানসকুমার নদীর দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া, তাহারই পরাণের প্রতিটি আকুল বাণী বাঁশীর সুরে উচ্ছ্বসিয়া বাহির হইতেছে। কী আশ্চর্য্য··· এই দেশ প্রেমিকের বুকের গোপন তলে কী এমন চিত্ত বেদন সঞ্চিত আছে...যে তাহার উদ্দেশ্যে এ তরুণ ভক্ত উপাসক নিত্য নূতন অশ্রুর অর্ঘ্য সাজাইয়া উপহার দেয়...কে সে, কাহাকে···।"

ডোরোথি তাহার নীরব উপাসনায় বাধা দিল না; সেও সুরমুগ্ধ হইয়া পিছনে দাঁড়াইয়া রহিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া অবশেষে বাঁশী নীরব হইল। কিন্তু তাহার সুরের রেশ থামিল না। মানসকুমার হাতের বাঁশী কোলে ফেলিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছন্দে আবৃত্তি করিয়া চলিল—

"চাই গো আমি তোমারে চাই
　　তোমায় আমি চাই
এই কথাটি সদাই যেন
　　বলতে আমি পাই।
আর যে কিছু বাসনাতে,
ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে
মিথ্যা সে সব মিথ্যা ওগো
　　তোমায় আমি চাই।"

মানসের অশ্রুঝরা গানে বাধা দিয়া ডোরোথি ডাকিল—মানসদা' ?"

নির্জ্জন চরের বুকে কার এ মানব কণ্ঠস্বর। মানস ফিরিয়া চাহিল। আরক্ত মুখে সে বলিয়া উঠিল—"গরীব ভায়ের কুঁড়ে দেখতে এসেছ দিদি, তবে এস।" ডোরোথির হাত ধরিয়া মানস ঘরের দরজা ঠেলিল। ছোট্ট একখানি মাটির ঘর আঃ ঘরখানির মেঝে কী ঠাণ্ডা! ঘরের মেঝেয় পা দিলে মনে হয় যেন মায়ের কোলে শুয়ে রয়েছি। কক্ষমধ্যে একখানি তক্তাপোষ, শুভ্র পালকের মত শয্যা বিছানো। দেওয়ালে র‍্যাক, র‍্যাকে ভর্ত্তি মোটা মোটা স্বর্ণাঙ্কিত ডাক্তারী পুস্তক ; ঘরের প্রত্যেকটি বাহুল্য বর্জ্জিত সামান্য উপকরণগুলি এমন সুচারু ভাবে সুসজ্জিত যে দেখিলে গৃহস্বামীর সুরুচির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ডোরোথিকে কুণ্ঠিত ভাবে সম্বোধন করিয়া মানস বলিল—"আমার এ ভাঙ্গা ঘরে অনাহূত অতিথি এসেছ বোন, কিন্তু বসতে দেব কিসে ? তোমার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করি এমন ক্ষমতা যে আমার নাই দিদি !"

আনন্দিত চিত্তে সেই মাটীর পরে'ই বসিয়া হাসিমুখে ডোরোথি বলিল—" এ যে আরও ভাল জায়গা মানসদা ? মায়ের কোলে বসব, তাহা লোভনীয় আকাঙ্ক্ষা..."

"তা হোক, চিরটা কাল সোফায় বসে কাটিয়ে, এ যে কোমল অঙ্গে ব্যথা লাগবে দিদি ?"

ডোরোথির টানা টানা চোখ অশ্রুপূরিত হইয়া উঠিল। জলভরা চোখদুটি নীচু করিয়া ডোরোথি বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল—"মানসদা, আর ও কথা বলো না···আমি ঐ কথার ঘা আর সইতে পারছি না ; সে সব কথা ভুলে যাও মানসদা—আমাকে তোমাদের ঐ সহস্র কর্ম্মের মধ্যে একটুখানি স্থান দাও। আর আমার ভাল লাগে না, আমার এ আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধন আর সইতে পারছি না, আমাকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দাও ; আমি মুক্তি চাই, আমি অনাবিল শান্তি চাই..." টস্ টস করিয়া ডোরোথির ইন্দীবর নয়ন যুগল হইতে বাদল ধারা ঝরিল। মানস অপ্রতিভমুখে নীরবে দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আপনাকে সম্বরণ করিয়া ডোরোথি বলিল—"আপনিই বুঝি রোজ বাঁশী বাজান ?"

আরক্ত মুখ মাটির সহিত মিশাইতে চাহিল। মানস খুব মৃদুস্বরে বলিল—"হ্যাঁ ডোরা, ঐ বাঁশী আমার নিরালার সাথী, ঐ বাঁশী আমার বন্ধু, ঐ আমার স্বজন, প্রিয়, এক কথায় বলতে গেলে আমার সবটুকু ঐ বাঁশী প্রতি অঙ্গে জড়ানো আছে।"

ডোরোথি প্রশংসাভরা কণ্ঠে বলিল—"সুন্দর! শুধু বাজানো নয়, আপনার সুর মানুষকে কাঁদিয়ে দ্যায়, আঃ এমন চমৎকার সুর আর বাজের কায়দা, আমি অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বাদকের বাজনায় শুনেছি বলে মনে হয় না।"

মানসের কাতর নিঃশ্বাস ডোরোথিকে ব্যথা দিল। ডোরোথি বাক্য স্রোতের গতি অন্যদিকে ফিরাইয়া বলিল—"আচ্ছা মানসদা, আপনি সেই আমাকে কাপড় দিয়ে পর্য্যন্ত আর গেলেন না কেন ? মমতা দিদিও সেদিন বলছিলো একবার খবর নিতে...ব্যাপার কি ?"

ডোরোথির সরল প্রশ্নে মানসের উত্তর দিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইয়া গেল। 'মমতা'···সে তাহার খোঁজ লইয়াছে...সে তাহার নাম এখনও করে ? মানসের মুখে আসন্ন সন্ধ্যার রাঙ্গা মেঘের একটুক্‌রা আভা ছিটকাইয়া পড়িল। মানস হঠাৎ কক্ষত্যাগ করিতে করিতে বলিল—"এক মিনিট ডোরা, একটু অপেক্ষা করো--এখনি আমি ফিরে আসছি।"

আনন্দ উদ্বেল বক্ষের হঠাৎ দোলানী থামাইবার অভিপ্রায়ে, ডোরোথির অন্তরালে পলাইয়া মানস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। ছি ছি আজ তাহার চুরি করিয়া পূজা করাটুকু লোকের চোখে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। ডোরোথি মানসের একটি নিঃশ্বাসেই তাহার মনের কথা ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ব্যথিত না হইলে, ব্যথিতের প্রাণের বেদন বুঝে না। দুঃখী না হইলে পরের দুঃখ উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকে না তাই ভুক্তভোগী ডোরোথি মানসের দুঃখ কোনখানে বুঝিয়া, অন্তরে অন্তরে নিগূঢ় বেদনা অনুভব করিল। মানসের একটি মিনিট পাঁচমিনিটে পরিণত হইল—বিলম্ব দেখিয়া ডোরোথি উঠিয়া, শয্যার উপর হইতে ব্লটিংপ্যাড্‌খানি তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে দেখিতে পাইল—পাশেই খোলা শুভ্র খাতার বুকে কালীর লেখা মুক্তা পংক্তির ন্যায় ঝক্‌ঝক করিতেছে।

পরের লেখা দেখাটা নীতি-বিরুদ্ধ ভাবিয়া ডোরোথির একবার সঙ্কোচ আসিল, পরে কি ভাবিয়া সে পড়িল— * * * "দেবী…মমতা দেবী আমার, জাননা তুমি; কিন্তু তোমার বহুদূরে নদীর বুকে বাসা বাঁধিয়া একটি অভিশপ্ত উপাসক নিত্যই তোমাকে হৃদয়ের রক্তচন্দন দিয়ে পূজা করিতেছে। গোপনে অতি গোপনে—সে তাহার মানসীকে নিত্য নূতন করিয়া কল্পনার সাজে সাজাইতেছে। তাহার কঠোর কর্ত্তব্যের মধ্যে তোমার স্নিগ্ধ বেলার মত পবিত্র দেহখানি ক্ষণে ক্ষণে বর্ণঝঙ্কার লইয়া উঁকি মারিতেছে। কিন্তু সে তোমাকে কামনার দ্বারা পাইতে চাহে না…সে চাহে নীরব নিবেদন…সে তোমাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতেও অভিলাষী নহে…সে কেবল চোখের দেখার একান্ত প্রয়াসী… তুমি তোমার বৈধব্য সাদরে আলিঙ্গন করেছ...সে তাহার নিজের সুখ ঐশ্বর্য্য দেশ মাতৃকার চরণে বিলাইয়া দেশের তরে ফকীর সাজিয়াছে, কিন্তু তাহার তলে তলে—" আর পড়া হইল না—পিছনে পদশব্দ শুনিয়া ডোরোথি ক্ষিপ্রহস্তে 'প্যাড্'খানি বন্ধ করিয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। পরে নিজের আসনে ফিরিয়া বসিয়া বলিল "একি করেছেন মানসদা' ?"

"কিছুই না—ছোট বোনটী এসে শুধু মুখে ফিরে যাবে—সেটা কি ভাল দেখায় ডোরা ?"

"তবে দিন।" বলিয়া মানস-দত্ত, অতি সামান্য জল-খাবারে পরিতুষ্টা হইয়া ডোরোথি বলিল—"কাল তাহলে যাবেন তো মানসদা।"

"পারি যদি তাহলে নিশ্চয় যাব।"

"না, 'পারি যদি' নয়, যাওয়া চাই-ই।" বলিয়া ডোরোথি বাহিরে আসিয়া হাত ধুইতে ধুইতে বলিল—"খাবার খাইয়ে তো পেট ভরিয়ে দিলেন, এখন বাড়ী যাব কি করে, পথতো মনে নেই।" আপনি একটু সাহায্য কর্ব্বেন কি ?"

"নিশ্চয় কর্ব্বো ডোরা।" বলিয়া আলনা হইতে মোটা চাদরখানি বাহির করিয়া গায়ে ফেলিয়া মানস বলিল—"এস ডোরা।" বাহির দরজায় তালা লাগাইয়া উভয়ে সরু পথে আসিয়া দেখিল—"সন্ধ্যার ফিকা আলো গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

(১৫)

"অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া—

* * * *

পিছনে ঝরিছে ঝর ঝর জল গুরু গুরু দেয়া ডাকে
মুখে এসে পড়ে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাঁকে।"

ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁস দিয়া সত্য সত্যই পথ হারাণো রোদের একটা রেখা আসিয়া কল্লোলের মুখের পরে' সোহাগের মৃদু চুম্বন দিয়া পলাইয়া গেল। এক পাশে হার্ম্মোনিয়মের নীরব 'রীড' টিপিয়া মোহন সুরে লীলাময়ী রেবেকা বা মিসেস্ বোস গান ধরিয়াছে। সম্মুখে গদী আঁটা সোফায় কাত্ হইয়া শুইয়া মিঃ রয় গান শুনিতেছিল, কি নদীর বুকের অসংখ্য লহর গুনিতেছিল তাহা ঠিক বুঝা যায় না। তাহার দৃষ্টি উদাস…মুখে অল্প বিরক্তির চিহ্ন। নদীর কালো বুকের পরে হুপাৎ করিয়া একটা দাঁড়ের আঘাতে মৃদু দোলায় পানসী খানি টলিয়া দুলিয়া উঠিল। রেবেকা একটু হেলিয়া মিহিসুরে বলিল --"বেশ লাগছে না মিঃ রয় ?"

"কি বলছেন ?"

হাসিয়া রেবেকা বলিল—"আপনি এতক্ষণ কোন রাজ্যে গেছলেন মিঃ রয় ?"

"কেন তার মানে ? আমি তো এই একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম বোধ হয়।"

"একটু। বলেন কি ! আমার এত চড়া সুরের গানেও আপনার মোহ ভাঙ্গেনি...সেটা আমি বসে বসে লক্ষ্য করেছি। সত্যি মিসেস্ রয়কে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে—আর এই আপদকে সঙ্গে নিয়ে বড় বিপদে পড়ে গ্যাছেন না মিঃ রয় ?"

"কি যে বলেন আপনি মিসেস্ বোস্, পাগল ! হ্যাঁ আপনি আমাকে কি বলতে যাচ্ছিলেন ?"

"বলছিলুম এই যে এই শান্ত নদীর বুকে দাগ কেটে কেটে চলতে বেশ আরাম লাগছে না ?"

"মন্দ কি।"

"মন্দ কি ! শুধু মন্দ কি ; এই এক কথায় এতটুকু জবাব দিলেন ? যান আপনি নেহাৎ অকবি ! দেখুন দেখি আমার এই গানের প্রত্যেক কথাটি মিলে যাচ্ছে কিনা ?

প্রথম এই যে আমাদের পানসীখানি অমল ধবল পাল উড়িয়ে কোন অচিন্ পথের উদ্দেশে ছুটে চলেছে যেন কোন অকূলে ভিড়িবার জন্ম! রাতের চাঁদের আলো নদীর কালো বুকটিতে ঝরে পড়ে হীরের গুঁড়োর মত, যেন মনে হয় সারাদিনের কর্ম্ম অবসানে বিরহী প্রণয়ী তার প্রিয়াকে সস্নেহে আলিঙ্গন করছে। প্রভাতে পুবের মেঘের আঁচল সরিয়ে রাঙা রবির বিকাশ। আকাশের বুক চিরে ক্ষণিকার মুহূর্ত্ত চাউনী যেন লাজনতা নববধূর হাসিটির মত। বাদলের টুপটাপ ধারা ছোট ছোট ঢেউকণার সাথে মিশে কোথায় বিলীন হয়ে যায় প্রকৃতির এত ভাব বৈচিত্র্য কি আপনার মনে এতটুকুও পরিবর্ত্তন আনে না।"

কল্লোল স্থির স্বরে বলিল—"জানেন মিসেস্ বোস, আমার বাস্তব জীবনে কখনো কল্পনার ছোঁয়াচ লাগেনি, তাই অতদূর তলিয়ে দেখবার সুবিধে কোনদিন পাইনি।"

কল্লোলের স্থির গম্ভীর স্বরে বিচলিতা রেবেকা ব্যথিত কণ্ঠে বলিল—"তা, হয়তো আপনার হতে পারে, কিন্তু আমার তো মনে হয় সে যাই ভেসে যাই—এম্নি করে জলের বুকে ভেসে ভেসে অসীমে চলে যাই...কি একখানা বইতে লেখা আছে জানেন মিঃ রয়—সেই—

"ভেসেছি স্রোতের টানে, কূলে কি অকূলে জানি
মনোতরী চলে বেগে বাধা না মানে।"

ঠিক আমার সেই রকম অবস্থা হ'য়েছে আমার এই সব অসংবদ্ধ বচন শুনে বোধ হয় পাগল ঠাওরাচ্ছেন না? কিন্তু কি নিঃসঙ্গ জীবন আমার......"

কল্লোল রেবেকার বাক্যের একবর্ণও ভাবার্থ করিতে পারিল না—সুতরাং এস্থলে নীরব থাকাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিল।

"মিঃ রয়, আপনার আজ কি হয়েছে বলুন তো?"

"কি হয়েছে মিসেস্ বোস।"

"তবে এমন চুপচাপ করে বসে রয়েছেন, বড় বিশ্রী লাগে আমার, এই নীরব অভিনয়! জীবনটাতে কৌতুকভরা আমোদের স্রোতে ভেসে যাবার জন্তে সৃষ্টি হয়েছে, এমন সময় কি হারাতে আছে? চলুন না মিঃ রয় একবার বাইরেটা দেখে আসি—মাঝি গুলো কি করছে।"

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে সোফার কোমল আলিঙ্গন ত্যাগ করিয়া কল্লোল উঠিল। উভয়ে নৌকার কামরা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নৌকার ছোট্ট কাঠের রেলিং ধরিয়া রেবেকা বলিল—"আপনার বোধহয় অস্বস্তি হচ্ছে না! আমি একটা ভার বোঝা উড়ে এসে আপনার ঘাড়ে চেপে বসেছি···রেবেকা থামিয়া আবার বলিল-"মিঃ রয়, দিন্ আমাকে ঐ নদীর সরু চড়াটার ওপরে বসিয়ে রেখে, আপনি বাড়ী ফিরে যান্—হ্যাঁ. আমি বেশ বুঝতে পারছি... আপনার আর ভাল লাগছে না।"

কল্লোল এইবার ফিরিল। বলিল—"আজ কি হয়েছে মিসেস বোস,···সেইক্ষণ থেকে কি সমস্ত আবোল তাবোল বকে যাচ্ছেন—আপনার কি কোন অসুখ করেছে!"

উতল হাওয়ার ঝাপটা হইতে সাজানো চুলগুলি রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে, সম্মুখের চুল হইতে পিছনে ঘুরানো জীপসী ফ্যাসনে বাঁধা 'স্কাই ব্লু' রঙের রেশমী ওড়না খানা দুরন্ত বাতাসে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কল্লোলের প্রশ্নে ফোটা পদ্মের মত রাঙা মুখখানি ম্লান করিয়া শুষ্ককণ্ঠে রেবেকা বলিল—"অসুখ—নাঃ, কি হবে আর আমার—আর যদিই বা হয়—তাহলে ওতো কারুর ক্ষতিবৃদ্ধি নেই...আমার এ দুনিয়ায় ব্যথার ব্যথী কে আছে বলুন? আমি এম্নি করেই অনির্দ্দিষ্ট পথে চলতে চলতে ডুব মারব।" রেবেকার চোখের কোনের একটি ফোঁটা জল, রোদের আভায় চিক্ চিক্ করিয়া উঠিল।

"দেখুন—দেখুন-মিসেস বোস্, ঐ পদ্মটি কি সুন্দর আর কত বড়—নেবেন আপনি,—এই বিষণ।"

ওঃ কি হৃদয়হীন কল্লোল। কল্লোলের ডাকে বাধা দিয়া রেবেকা বলিল—"থাক বিষণকে ডাকবার কোন দরকার নেই, আমি ফুল নেব না।" তাহার লাল চুনীর মত পাতলা ঠোঁট দুখানি কিসের আবেগে কাঁপিয়া উঠিল।

"মিঃ রয়।"

রেবেকা অত্যন্ত চঞ্চল সুরে বলিল—"কথার সুরটা অন্যদিকে ফেরালেই কি ভেবেছেন—আপনি সহজে নিষ্কৃতি পাবেন।"

"কি বলবেন মিসেস বোস্?"

"আপনি বিরক্ত হচ্ছেন...না না বলব না, বলবার সময় এখনও আসেনি দেখছি। আচ্ছা মিঃ রয় ঐ ছোট্ট নৌকা থেকে সানাইয়ের সাহানা সুর ভেসে আসছে কেন?"

"কই, ওঃ ঐ দিকে, বোধহয় বিয়ের বরকণে যাচ্ছে।"

"এমন অকালে বিয়ে?"

"হয় তো হিন্দুর নাও হতে পারে।"

"হুঁ, ঐ বিয়ের কণের মনে আজ কি হচ্ছে কেউ বলতে পারে কি? এই একই জলের বুকে বিচিত্র মানবের, বিচিত্র ভাবের লীলা বয়ে চলেছে—উঃ!" রেবেকার চোখে মুখে দারুণ অতৃপ্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া মোহিনী রেবেকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চাপা কান্নার অস্ফুট শব্দে কল্লোল তাহার দিগন্ত প্রসারিত দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিল রেবেকা আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

"এ কি মিসেস বোস্, কি হ'লো আপনার, এদিকটা আর ভাল লাগছে না—বলুন তাহলে কোন দিকে তরী ফেরাব?"

দুখানি হাত কল্লোলের কাঁধের উপর তুলিয়া মদালস দৃষ্টিতে চাহিয়া রেবেকা বলিল—"কল্লোল—কল্লোল, আমার মনের গতিশীল তরী কবে কূলে ভিড়বে?"

কি সর্ব্বনাশ! এ কি দুঃসাহস! কল্লোল আর কি উত্তর দিবে...সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে রেবেকার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ছুটিয়া পালায়।

"উঃ তুমি এত অকরুণ?" রেবেকার বদ্ধ অঙ্গুলীর ফাঁক দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া মুক্তাফল গড়াইয়া পড়িল।

"কল্লোল কথার উত্তর দিলে না?"

কল্লোল ব্যস্তভাবে বলিল—"নিশ্চয় আপনার অসুখ করেছে মিসেস বোস্?"

"আঃ কি একঘেয়ে মিসেস বোস বলে ডাকতে শিখেছ রয়...কল্লোল আগেকার সেই পুরাণো বন্ধু রেবাকে ভুলে যাচ্ছ কেন বন্ধু?"

"ছিঃ মিসেস বোস্, কথাগুলি আপনার অসংলগ্ন হ'য়ে পড়ছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।"

"খুব লক্ষ্য রেখেছি, আর পারলুম না বুঝি সত্যিই আমি কেমন হ'য়ে গেছি,—না হ'লে তোমার সুরের মায়ায় মোহমুগ্ধ হ'য়ে তোমার পিছু পিছু ছায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। ডাক না কল্লোল—একবার সেই অতীত দিনের স্বপ্নময় ভাষায়, তেমনি করে রেবা বলে। সেই ছেলেবেলায় কলেজের পথে আলাপ, এত শীগ্‌গীর ভুললে কি করে কল্লোল।"

"হ্যাঁ, সে কথা ভুলে যাওয়াই তোমার ও আমার পক্ষে সমিচীন—সে অতীত দিনের পুঁজি পাটা খুলে কেন আর ঘাঁটাঘাঁটি করছো মিসেস বোস্। এখন তুমি আমার বন্ধু পত্নী; আর আমিও ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অপরের স্বামী—তুমি স্বামীর বন্ধু বলে আমায় বিবেচনা কর্ত্তে পার তার বেশী নয়।"

"দয়া করো কল্লোল —তুমি যে এত নিষ্ঠুর জানতাম না—ওগো তোমার অন্তরের বিদ্রোহী ভাবটা দমন করে...একটি বার আদর করে রেবা বলো।"

গর্জ্জন করিয়া কল্লোল বলিল—"থাম, থাম, রেবেকা এমন পাগলামী করো না, আলোকের বিমল প্রেমের প্রতিদানে এমন অবিশ্বাসিনী হ'য়ো না...এখন তুমি পরস্ত্রী।"

রেবেকার চোখ ক্রোধে জলিয়া উঠিল—"পরস্ত্রী! আজ বুঝি তুমি সাধুর চোখে আমায় পরস্ত্রী দেখছো...আর এতদিন পর-স্ত্রীকে নিয়ে জলযাত্রা, সেটা কি কল্লোল?"

"সেটা দোষণীয় নয়..তোমার আমার মন শুদ্ধ থাকলে একা বেড়ানোতে দোষ কি? পাপ মনে; তোমার মন চঞ্চল দেখে, তোমাকে শান্ত করবার জন্যেই এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তা নইলে এতে আমার বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই... কেবল তোমাকে ছেলেবেলা থেকে স্নেহ করতাম বলেই!"

"স্নেহ!" রেবেকা আর্ত্তস্বরে বলিল—"শুধু স্নেহ, আর কিছু নয় কল্লোল, আলোকের সঙ্গে বিয়ে দেবার প্রস্তাব কেন তুমি বাবার কাছে করেছিলে? তার সঙ্গে শুধু মন্ত্রপাঠই হ'য়েছে, মনের মিলন তো হলো না। উঃ নারী যদি এমন করে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে বিলিয়ে দিতে চায়, তা হলে তার মনের গোপন তলে কী বিপুল ভালবাসা লুকানো থাকে তা কি বুঝতে পার?"

"বলো না, আর ও পাপ কথা বলো না রেবেকা—আলোক যে তোমার কী স্নেহময় স্বামী, তুমি এখনো বুঝতে পার নি। ছিঃ তোমার মত শিক্ষিতা মেয়ের মুখে এমন হীন প্রস্তাব শুনে; আমার লজ্জায় মাথা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। কি হলে তুমি রেবেকা?"

"কি হলুম...তোমার রূপের তীব্র আলোয় পুড়ে মরছি।"

"আলোকের স্নিগ্ধ রূপের জ্যোতিতে পুড়ে মর্তে পার নি নারী? ধিক্ তোমাকে।"

রেবেকা গর্জ্জিয়া বলিল—"সাধু পুরুষ তোমার সাধুতাকে ধন্যবাদ—কিন্তু নারীর মর্য্যাদা রাখতে শেখ নি।"

"খুব শিখেছি রেবেকা, নারীর সম্মান, মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে জানি বলেই আজ আমার হাতে তোমার এই নারীত্বের অবমাননা হ'লো না। নারীকে কি চোখে দেখতে হয় তা আমি জানি...খুব ভালরকমই জানি বলেই, তোমার এই বার বার কল্লোল ডাক্ আমার কাণে মাতার স্নেহের ডাকের মত বেজেছিল। তোমার ঐ বিষাক্ত আলিঙ্গন—মনে করেছিলুম মায়ের স্নেহ হাতের নিবিড় বন্ধন...তাই তোমাকে প্রথমে বাধা দিই নি। আজ বুঝলাম যে কেন আলোক আর সরলা ফাল্গুনীকে বাড়ীতে তিষ্ঠুতে দাও নি। রেবা, তোমার জন্যে তোমার উজ্জ্বল বংশে কালীর দাগ পড়ছে...এইখানে থেমে যাও রেবেকা,—আর বাড়িও না। আগে যদি ঘুণাক্ষরেও তোমার এই বদ মতলব জানতে পার্ত্তাম, তা হলে কক্ষণো তোমায় নিয়ে বাড়ীর বার হতুম না। আজ তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিলে...।"

কল্লোল প্রবল ঘৃণায় রেবেকার সন্নিধান হইতে দূরে সরিয়া গেল।

* * * *

সহসা কিসের একটা বিপুল ধাক্কায় পানসীখানি হেলিয়া পড়িল। উভয়ে চমকাইয়া দেখিল, শান্ত, অচঞ্চলা নদীর বুকে প্রলয়ের নৃত্য সুরু হইয়াছে...। পশ্চিমের কালো কালো মেঘগুলি স্তর বাঁধিয়া পুঞ্জীভূত হইয়া মত্ত দানবের মত অট্ট-হাসি হাসিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। হিন্দু নারীর ব্যভিচারে প্রকৃতি বিক্ষুব্ধ চঞ্চলা হইয়া বুঝি পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার মানসে মহাকালকে ডাকিয়া আনিয়াছে। যাক্ যাক্ সৃষ্টি রসাতলে যাক; লালসার পুতিগন্ধ মাখানো নর নারীকে বক্ষে ধরিয়া স্রষ্টার অপূর্ব্ব সৃষ্টি অতল সাগরে নিমজ্জিত হইয়া যাক্।

কল্লোল ভীত হইয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?"

"ঝড় উঠেছে বাবু, হবে আবার কি; দুর্গা দুর্গা হুঁসিয়ার ভাই সব—" উদ্দাম ঝড়ের আঘাত সহিতে পারিল না, শ্বেত পালখানা ছিঁড়িয়া নিশানের মত পত্ পত্ করিয়া কোথায় উড়িয়া গেল। 'ছড়, ছড়, ছড়,' বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটায় কল্লোলের সমস্ত সুটটি ভিজিয়া গেল। কল্লোল ছুটিয়া রেবেকার কাছে আসিয়া দেখিল—মৌন, মূক, চেতনা বিহীন প্রস্তর প্রতিমার ন্যায় নিশ্চল ভাবে রেবেকা সেই একই স্থানে বসিয়া রহিয়াছে। কল্লোল অস্থির হইয়া পড়িল। আর ত ভাবিবার সময়ও নাই...এখনি যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের বুকে করিয়া ছোট্ট তরীখানি সমাধি লাভ করিতে পারে।

"রেবেকা রেবা উঠে এস—নৌকায় অল্প অল্প করে জল উঠছে দেখতে পাচ্ছ, এক্ষণি ডুবে যাবে।"

রেবেকা নড়িল না। আশ্চর্য্য চিত্তে কল্লোল দেখিল যে প্রকৃতির এই তাণ্ডব নর্ত্তনেও তাহার অন্তর বাহির এতটুকুও বিচলিত হয় নাই! দুর্জ্জেয় এই নারী চরিত্র!

"রেবা শুনতে পাচ্ছ না? কি সর্ব্বনাশ আমাদের মাথার পরে' ঘনিয়ে আসছে দেখতে পাচ্ছ না? ওঠো?"

কল্লোলের প্রশ্নে রেবেকা ঈষৎ নড়িল মাত্র।

"আঃ রেবা তোমার জন্যে দেখছি আমাকে আজ প্রাণ হারাতে হবে।"

এইবার কল্লোলের অনুভূতি হইল যে তাহার হাতের মধ্যে ধৃত কোমল হাতখানিতে স্পন্দন সুরু হইয়াছে। যে মুহূর্ত্তে কল্লোল জোর করিয়া রেবেকাকে টানিয়া তুলিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে একটা ভীষণ ধাক্কায় নদীর তলদেশ পর্য্যন্ত কাঁপিয়া ছোট্ট নৌকাখানিকে উল্টাইয়া দিল। সে প্রচণ্ড আঘাতের দোলানীতে রেবেকার সুগঠিত দেহলতা কল্লোলের কম্পিত দেহের পরে' লতাইয়া পড়িল। শিহরিয়া অধর

দংশন করিয়া কল্লোল রেবেকাকে ধরিয়া তাহার রক্তলেশশূন্য পাংশু বদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। "হায় হতভাগিনী নারী, এ কি পরীক্ষায় আমাকে ফেললে দয়াময়!" সহসা অতি নিকটেই কাহার স-উচ্চ কণ্ঠস্বরে কল্লোল ফিরিয়া সাশ্চর্য্যে দেখিল—কালকার সেই বড় ষ্টীমারখানি তাহাদের মগ্ন প্রায় তরীর পাশেই লাগিয়াছে, তাহারই ভিতর হইতে কে যেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছে—"সামনেই লাইফ বোট দিয়েছি, দেরী কর্বেন না শীগ্‌গীর আপনার স্ত্রীকে নিয়ে উঠে আসুন।"

কল্লোলের সে সময় সমস্ত চেতনা শক্তি লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। সংবিতহারা রেবেকাকে টানিতে টানিতে টলিয়া টলিয়া লাইফ বোটের উপর পা দিল,—সেই সময় দমকা হাওয়ার তাল্ সামলাইতে না পারিয়া টলিয়া হেলিয়া পড়িল। বাহুবন্ধন শিথিল হওয়াতে রেবেকা ছিটকাইয়া তরঙ্গায়িত পদ্মাবক্ষে পড়িয়া গেল। চক্ষের নিমেষে অপর ষ্টীমার হইতে একটি বলিষ্ঠ যুবক ঝাঁপাইয়া জলের বুকে পড়িল।

"পার্বে না, পার্বে না মৃণাল, যেও না অত জলে।"

একখানি হাত তুলিয়া মৃণাল মধুর স্বরে বলিল—"ভয় নেই ভাই—যেমন করে পারি, ওঁকে বাঁচাবই।" দেখিতে দেখিতে মৃণাল অতল জলে তলাইয়া গেল। * * * বহুক্ষণ জলের সহিত সংগ্রাম করিয়া যখন রেবেকার মৃতপ্রায় দেহখানি টানিয়া ষ্টীমারের নিকটবর্ত্তী করিল, তখন মৃণালের সর্ব্বশরীর অবসাদে এলাইয়া আসিতেছিল। রেবেকাকে ছুড়িয়া ডেকের উপর ফেলিয়া মৃণাল বলিল—"পারলুম না ভাই—আর ফিরতে পাচ্ছি না, আলোক অমলদার সঙ্গে আর দেখা হ'লো না—বি-দা-য়।"

"মৃণাল, মৃণাল, ভাই লাইফবেল্ট দিচ্ছি পর,...কোথায় যাবে ভাই?"

দূর হইতে বিহঙ্গ কাকলীর মত মৃণালের সুমিষ্ট স্বর ভাসিয়া আসিল---"আলোক, ভাই নিয়তি আমাকে টানছে তার কোলে ফিরবার জন্য...লাইফবেল্ট পরবারও আর শক্তি নেই। আঃ কোথায় যে যাচ্ছি........."

হায় কোথায় মৃণাল! যেমন নদীর জল, তেমনিই একভাবে উচ্ছ্বলের ন্যায় দাপাদাপি করিতেছে। নাই গো, সে পরদুঃখ কাতর মহান হৃদয় মৃণালের আর চিহ্নমাত্রও নাই। আলোক ডকের পরে' আছড়াইয়া বালকের মত অধীর ভাবে রোদন করিয়া বলিল—"বন্ধু, ভাই আমার একলাই চলে গেলে? আমাকে তোমার পথের সাথী করে নিয়ে গেলে না?"

(ক্রমশঃ)
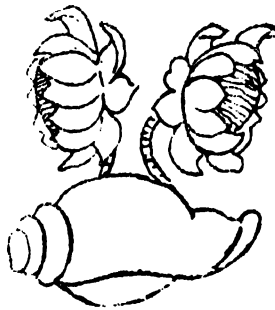
বিধাতার উপহাস

[শ্রীরবীন্দ্র নাথ মুখার্জ্জি]

—এক—

"করিম চা' বাড়ী আছ ?"

"কে, কমলা ? আয় মা ।"

দিবসের কার্য্যান্তে সবেমাত্র করিম সেখ বাড়ীতে পদার্পণ করিয়াছে, তখনও হালের গরু দুইটী গোয়াল ঘরে বাঁধা হয় নাই, তাহারা অবাধে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, করিম হালখানি যথাস্থানে রাখিতেছিল, এমন সময়ে কমলা ডাকিল, 'করিম চা' বাড়ী আছ ?'

কমলা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণ রতিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একমাত্র কন্যা, বাল্যকালে মাতৃহারা, রতিকান্ত করিমকে বড় স্নেহ করিতেন, করিমও তাঁহাকে দাদাঠাকুর বলিয়া ডাকিত ও দাদার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। তাহাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি এই প্রাণখোলা ভ্রাতৃ সম্বোধনে জাতি বিদ্বেষরূপী যে বিষ-বহ্নি শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঙ্গালী জাতীয়-জীবন-আকাশকে ঘোর মসীময় করিয়া ফেলিতেছিল, সেই বিষ-বহ্নি তাহাদের মধ্যে সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছিল, তবে পূত দেবালয়স্থিত মাধবজীর মর্য্যাদার খাতিরেই হউক অথবা সমাজের সুতীব্র কশাঘাতের ভয়েই হউক করিম তাহার স্নেহময় দাদাঠাকুরের সহিত একত্রে রন্ধনশালার দাওয়াতে বসিয়া কোনদিনই গল্প করিবার সুযোগ পায় নাই, তাহা না পা'ক তাহাতে তাহার ক্ষতি কি ? তাহার অমন স্নেহপরায়ণ দাদাঠাকুর কয়জনের ভাগ্যে মিলে ? কয়জন অমন লক্ষ্মীরূপী ভাইঝীকে বক্ষে করিয়া শীতল হইয়াছে ? করিম ইহাতেই সন্তুষ্ট ছিল

করিম জিজ্ঞাসা করিল, কেন কমলা ? আমায় ডাকচ কেন ?

কমলার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুস্রোত গড়াইয়া পড়িল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কমলা কহিল, বাবার অসুখ, তিনি ডাকচেন।

সস্নেহে কমলার বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহার অশ্রুরাশি মুছাইয়া দিয়া করিম কহিল, তাহার জন্য কাঁদিতেছ কেন লক্ষ্মী ? অসুখ হইয়াছে, সারিয়া যাইবে, চল দেখিয়া আসি।

বালিকা করিমের স্নেহপূর্ণ বাক্যে সান্ত্বনা পাইয়া ধীরে ধীরে কহিল, সে কি করিম চা' ? তুমি না এইমাত্র হাল বহে এলে, না খাইয়াই যাইবে ?

করিম সহাস্যে কহিল, হাঁ পাগলী, না খাইয়াই যাইব। দাদার অসুখ আর আমি খাইয়া দাইয়া, ধীরে-সুস্থে তাঁহাকে দেখিতে যাইব ? তা' হয় না পাগলী। চল্ দেখিয়া আসি, তার পর খাইব।

—দুই—

"কমলা ?" রোগ-শয্যা হইতে পিতা ধীরকণ্ঠে ডাকিলেন, "কমলা ?" কমলা তখন পিতৃ-পদপ্রান্তে বসিয়া বসিয়া মাধবজীর নিকট পিতার রোগ-মুক্তির প্রার্থনা করিতেছিল, অশ্রুজলে বালিকার ক্ষুদ্র বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল, বালিকা উত্তর করিল, কেন বাবা ?

"করিম, এ'ল ।"

"না বাবা, এখনও আসে নাই। শীঘ্রই ডাক্তার বাবুকে লইয়া চাচা আসবে ।"

"আমার যে সব শেষ হইতে চলিল কমলা ? বুঝি করিমের সঙ্গেও আর দেখা হইল না ! তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস পড়িল। সেই হৃদয় বিদীর্ণ দীর্ঘশ্বাস অনন্তে মিশিতে না মিশিতেই করিম ডাক্তারবাবু সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। রোগীর ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাস্য-রেখা ফুটিয়া উঠিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, 'করিম আয় ভাই, আমার কাছে আয়।'

করিম দাদাঠাকুরের শয্যাস্পর্শ করিলে, পল্লী রমণী মহলে দাদাঠাকুরকে হীন হইতে হইবে সে ভাবনা আর তখন করিমের হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিল না। আজ ও পারের যাত্রী দাদাঠাকুর তাহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিবার জন্য নিকটে যাইতে বলিতেছেন, আর সেকি রমণী

মহলের তীব্র সমালোচনার ভয়ে তাঁহার অন্তিম শয়নের শেষ আদেশ উপেক্ষা করিতে পারে? করিম ছুটিয়া যাইয়া দাদাঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার বক্ষের রক্ত জল হইয়া অশ্রুরূপে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

সেদৃশ্য বড় চমৎকার! বড় আদর্শ! মুমূর্ষু-রোগী অন্তিম শয়নে রোগ-যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, নির্ম্মম হৃদয় যমের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও জয়ী হইতে পারিতেছে না, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব মুমূর্ষুর মুখ মণ্ডলে রোগ যন্ত্রণার কালিমা দর্শন করিয়া আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতেছে, সে দৃশ্য চমৎকার নহে। বিধর্ম্মী করিম তাহার দাদাঠাকুরের চিরবিরহ আশঙ্কায় আজ সহোদর ভ্রাতায় স্তায় রোগশয্যা পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে, ইহাই আদর্শ, করিম কবি নহে, স্বদেশ প্রেমিক নহে। সে বড় বড় সভা করিয়া কোনদিন হিন্দু-মুসলমানকে এক হইবার জন্ত, একের দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ অন্তকে অনুভব করিবার জন্ত উপদেশ দিয়া, অনুরোধ করিয়া বক্তৃতা করে নাই, নিজেও কাহারও উপদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া বিধর্ম্মী দাদাঠাকুরকে ভালবাসে নাই, ভাল বাসিয়াছে সরল বিশ্বাসে, প্রাণের প্রেরণায়, সরল বলিয়াই এ দৃশ্য বড় চমৎকার, বড় আদর্শ!

রোগী ধীরে ধীরে করিমের হাত দুইটী ধরিয়া কহিলেন, করিম, আমি চলিলাম। জীবনে ধর্ম্মকে ত্যাগ করিস না ভাই, কষ্ট হইবে না মনে করিবি মানুষই দেবতা, মানুষকে সন্তুষ্ট রাখাই জীবনের প্রধান ধর্ম্ম। কখনও কাহাকে ঘৃণা করিবি না। এই আমার অন্তিম-শয়নের শেষ আদেশ, যেন ভুলিস না।

করিম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, দাদাঠাকুর কমলা,—করিম আর বলিতে পারিল না। রতিকান্ত পুনরায় কহিলেন, 'কমলার ভাবনা আমার নেই। বাল্যকালে মাতৃহারা কমলা আজন্ম তোরই যত্নে লালিত পালিত। তুই থাকিতে যে তাহার অনিষ্ট হইবে, সে ভাবনা আমার নাই।' রোগীর স্বর ক্রমে জড়িত হইয়া আসিল।

তারপর? তারপর জন্ম দুঃখিনী কমলাকে পিতৃহীন করিয়া, সরলপ্রাণ করিমের হৃদয়ে দাবাগ্নি জ্বালিয়া দিয়া রতিকান্ত কোন অজানা সৌন্দর্য্য সায়রে ডুবিয়া গেলেন।

—তিন—

পল্লীগ্রামে যদি একে অন্তের বাধ্য না থাকে, যদি তাহাদের কথামত, মনোমত না চলে তবে তাহারা কেহ মারা গেলে তাহার শব সৎকারের সময় তাহারা বুক বাঁধিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্ত অগ্রসর হয়।

ক্ষুদ্রপ্রাণ পল্লীবাসীর কথা দূরে থাকুক এমন অনেক ধনবান জমীদারও আছেন যাঁহারা এক কঠোর প্রতিহিংসার হাত এড়াইতে পারেন নাই। আমাদের কমলাও ইহার হাত এড়াইতে পারিল না।

বিধর্ম্মী করিম কমলাকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে দ্বারে ফিরিল, তাহার বড় স্নেহপরায়ণ দাদাঠাকুরের মৃতদেহটীর সৎকারের জন্ত। সকলেই নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিল, আমরা যবনের দেহ সৎকার করিতে পারিব না। কমলা তাহাদের পা ধরিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। তাহার হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদে সেই পিশাচদিগের এতটুকুও দ্রবীভূত হইল না।

করিম তাহার পরিধেয় খাদির অঞ্চল দ্বারা চক্ষুর জল মুছিয়া কহিল, চল্ মা কমলা, ইহাদের দয়া হইবে না। চ'ল্, দাদাঠাকুরের শবদেহের নিকট বসিয়া বসিয়া চাচা ভাইঝীতে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া নিই।

করিম কমলার হাত ধরিয়া চলিয়া গেল। আর পল্লী-গ্রামের ছোট বড় মজলিসগুলি এ বাৎসল্য ভাবটাকে একটা কুৎসিৎ ভাবে বর্ণনা করিয়া বড় গরম হইয়া উঠিল।

* * * *

"তুমি যাই বল কমলা, সেদিন নরেশবাবু যদি না থাকিতেন তবে ভাব দেখি আমাদের অবস্থা কি হইত? সত্যি বলছি কমলা, মদিরাসক্ত, উচ্ছৃঙ্খল বলিয়া যাহাকে এতদিন কৃপার পাত্র ভাবিতাম, সেদিন তাহারই পদতলে এই করিম সেখের মাথাটাও কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়িয়াছিল।"

"সত্যি চাচা, নরেশবাবু বেশ সুন্দর লোক। এমন লোক আর নাই।"

"কিন্তু তাঁর এই আত্মীয়তায় আমার বড় ভয় করে কমলা। কি জানি ভাঙা কপাল আমাদের, কখন কি হয় বলা যায় না। তোকে আর এখানে একেলা ফেলে রাখতে পারি না।"

সন্ধ্যার প্রাক্কালে চাচা-ভাইঝীতে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। করিম ক্ষুদ্র ঘরের বারান্দায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল, আর কমলা গৃহের মধ্যে দরজার কাছে বসিয়া ছিল। প্রত্যহ তাহারা এইরূপ কথোপকথনের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া সময় কাটাইয়া দিত।

করিম যে সন্দেহ করিয়াছিল, তাহা সত্য সত্যই ফলিল, নরপিশাচ নরেশচন্দ্র এতদিন তাহার হৃদয়ের মাঝে যে কাল-সর্প লুক্কায়িত রাখিয়াছিল আজ তাহা সহসা আত্মপ্রকাশ করিল. একধারে প্রবল প্রতাপ মোহান্ধ নরেশচন্দ্র কমলার কিশোর সুলভ রূপমাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত, অন্যদিকে স্থির প্রতিজ্ঞ করিম - সে কখনই তাহার প্রাণের প্রাণ কমলাকে পিশাচের হাতে সঁপিয়া দিতে পারিবে না, কাজেই বিবাদ বাধিল।

কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণ করিম প্রবল প্রতাপ জমিদারের সহিত কতক্ষণ ঠিক থাকিতে পারে? কাজেই তাহাদের উপর অত্যাচারের পর অত্যাচার হইতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া করিম গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে উদ্যত হইল।

—চার—

পূর্ণিমা রজনী, এই চন্দ্রকরোজ্জ্বল রজনীর দ্বিপ্রহর সময়ে করিম কমলাকে সঙ্গে করিয়া মাঠের আঁকা বাঁকা রাস্তা বাহিয়া চলিয়াছে, কোথায় যাইবে, কি করিবে তাহার স্থিরতা নাই, তবে তাহারা উপস্থিত আব্দুলপুর ষ্টেশনে যাইবার জন্য সেই রাস্তা ধরিয়া চলিয়াছে, জমির আলির উপর দিয়া বন্ধুর রাস্তা, কমলা অতিকষ্টেই সেই রাস্তা দিয়া চলিতেছিল।

করিম কমলার পশ্চাতে পশ্চাতে কত কি এলোমেলো ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছে। হায়! সামান্য শৃগাল-কুক্কুরের ভয়ে তাহার চিরবাঞ্ছিত মাতৃ-ভূমি ত্যাগ করিয়া আজ দূর বিদেশভূমে চির প্রবাসীর মত জীবন কাটাইতে হইবে। এই ভাবনা করিমের দুঃসহ হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? সে ত' নিজের জন্য ভাবে না? ভাবনা শুধু কমলার জন্য। পিশাচ-কবল হইতে কমলাকে রক্ষা করিতে হইলে গ্রামত্যাগ ভিন্ন অন্য পন্থা আর কি আছে?

"উ হুঁ—চাচা,—"

"এই যে মা, কি হইল?"

"কিসে কামড়াইল চাচা?"

করিম ব্যগ্র হইয়া তাকাইয়া দেখে,— যাঃ! সর্ব্বনাশ! এ যে বিষধর সর্প! সর্পটী কমলাকে দংশন করিয়া ধীরে ধীরে আলের নিকট হইতে সরিয়া যাইতেছিল, কমলা কাঁপিতে লাগিল, করিম কমলাকে ধরিয়া ফেলিল! কমলা ধীরে ধীরে তাহার চাচার বক্ষে হেলিয়া পড়িল, তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিল,—"চাচা, বুক যে জ্বলে গেল?"

ক্ষিপ্রহস্তে করিম দংষ্ট্রস্থান নিজের পরিধেয় বস্ত্র চিঁড়িয়া বাঁধিয়া ফেলিল। নিজে সর্পের ওঝা, নানাপ্রকার মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া সে বিষ ঝাড়িতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; কমলা তাহার চির প্রেমময় চাচার বক্ষে মাথা রাখিয়া চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল, তাহাদের সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

কমলার এই আকস্মিক মৃত্যুতে করিম একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল, সে নতজানু হইয়া উর্দ্ধ করে ভগবানকে ডাকিতে লাগিল, হা বিধাতঃ! তোমার একি উপহাস! যাহারা কমলার স্বশ্রেণী, যাহারা কমলার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, আজ তাহারাই কমলাকে ঘৃণাভরে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিল। আর আমি ভিন্নধর্ম্মী, যবন, আমাকে কমলার স্নেহে বদ্ধ করিয়া একি খেলা খেলিলে প্রভু? আমার বুকে এরূপ শেল কেন বিঁধিলে প্রভু? প্রভো! তুমি যদি সত্যের ঠাকুর হও, যদি সত্যের দেবতা হয় তবে যে পাপীষ্ঠ আমাদের এই আত্মীয়তা বন্ধনকে চিরতরে ছিন্ন করিল, সেই পাপীষ্ঠকে উপযুক্ত শাস্তি দিও!

জানিনা, তাহার কাতর প্রার্থনায় সেই মঙ্গলময় মহা-পুরুষের আসন টলিয়াছিল কি না!

———

প্রত্যাবর্ত্তন

(বড় গল্প)

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভাগ্যদেবতা কখন যে কাহার উপর বিরাগ দৃষ্টি হানিয়া বসেন তা বুঝিবার যো নাই। অরুণের ওপরও তিনি এখন একচাল চালিয়া বসিলেন যে তাহার শিক্ষিত মনেরও এক-কোণে শ্রাবণ আকাশের কালো মেঘের পুঞ্জীভূত অন্ধকার জমা হইয়া উঠিতে লাগিল।

আজ একমাস হইল অরুণ লিলিকে পড়াইতেছে—ইহার মধ্যে প্রায় প্রতিদিনই সে শুনিতে পায় লিলির ছোটমা লিলির মারফৎ মাষ্টার মশাইয়ের সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া পাঠান। মাষ্টার মশাইয়ের সাংসারিক আর্থিক ও অন্যান্য অনেক অবস্থার খবরই লিলি ভিতরে লইয়া গিয়া হাজির করে। এ সব বিষয় জানিবার ও জানাইবার আগ্রহ লিলির মনকে যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব করিয়া তুলিত তাহা বলা যায় না, সে শুধুই বার্ত্তা বাহকের কাজ করিত। এ আগ্রহের উৎস যাহাকে কেন্দ্র করিয়া উছলিয়া উঠিত তাহার সম্বন্ধে অরুণের মনে বিস্ময়ের অবধি ছিল না। তাহার নিজের বিষয় লইয়া অন্তঃপুরের এ অকারণ ঔৎসুক্যের হেতুনির্ণয়ে অরুণকে বিশেষ ভাবাইয়া তুলিল।

শরীরের অসুস্থতার জন্য দুইদিন অরুণ পড়াইতে যায় নাই। পরের দিন অরুণ উপস্থিত হইলে লিলি জিজ্ঞাসা করিল—এ দুদিন আসেন নি যে, অসুখ করেছিল বুঝি?

অরুণ বলিল—হ্যাঁ, দুদিন ছুটি পেলে আর কি!

লিলি ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—মা ঠিক বলেছিলেন—আপনার অসুখ করেছে। আমরা সত্যি ভারী ভাবছিলুম। আপনি আজ যদি না আসতেন ত ঠিক মা আমাকে রামসিংএর সঙ্গে আপনার বাড়ী পাঠিয়ে দিতেন।

অরুণ মুখে বলিল, বটে—অমন জানলে আজও আসতুম না। তুমি বেশ যেতে, কিন্তু মনের ভিতরে তার সঙ্কোচের পাহাড় জমিয়া উঠিতে লাগিল। এই অপরিচিতার এতখানি অকারণ দরদের পাত্র হইবার তার কি অধিকার আছে?

দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। প্রথমটা অর্থের স্বচ্ছলতায় অরুণ কিরণকে লইয়া দাম্পত্য জীবনের অনেক অসম্পূর্ণ সাধ মিটাইয়া লইল। এখন আর কিরণকে ছিন্ন সেমিজে তালি লাগাইয়া নিজের হাতে সাবান দিয়া পরিষ্কার করিবার দরকার হয় না। নিত্য নূতন সাজসজ্জা ও অলঙ্কারে কিরণের অনাদৃত দেহ লাবণ্যের সংস্কার সাধন চলিতে লাগিল। বাসন মাজা হইতে সংসারের সকল কাজই কিরণের স্বহস্তে সম্পাদন করিতে হইত কিন্তু এখন তাহার প্রয়োজন হয় না—একজন ঠিকা ঝি আসিয়া অনেক কাজ করিয়া দিয়া যায়। সময়ের অভাবে স্বামী সঙ্গ লাভের যেটুকু আনন্দ কিরণের অভাব ছিল এখন থেকে সেটুকুও আর রহিল না।

কিন্তু এত সুখের ভিতরও অরুণের মনে যেন একটা অস্বস্তি আসিয়া পড়িতেছিল, তাহা কিরণের চক্ষু এড়াইল না। আগে সামান্য অবসরটুকুর ভিতরও সে অরুণের সহজ সরল কথাবার্ত্তায় ও নির্ম্মল অনুরাগে যতখানি চিত্তপ্রসাদ লাভ করিত, আজকাল প্রচুর অবসরের মাঝেও তাহার এক চতুর্থাংশও অনুভব করিতে পারিত না। কিরণ বুঝিল কোথায় একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। কিন্তু সেটা যে কোনখানে তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। সে দেখিল, স্বামীর মন যেন এক পাষাণের ভারে আড়ষ্ট হইয়া পড়িতেছে। অরুণ হাসে কিন্তু তাহাতে যেন সে প্রাণখোলা হাসির সাড়া পাওয়া যায় না—অরুণ তাহাকে সোহাগ করে আদর করে কিন্তু তাহাতে যেন অন্তরের সে অমৃত পরশ মাখানো নাই! অরুণ গল্প করে কিন্তু তাহাতে তাহার পূর্ব্বেকার হৃদয়াবেগের

অভাব দেখিতে পাওয়া যায় স্বামীকে নিবিড়ভাবে পাওয়ার মাঝখানে যেন একটা ফাঁক—যেন একটা উদাস শূন্যতা আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে।

একদিন সে অরুণকে জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁগা তুমি দিনকে দিন ওরকম শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? তোমার কি হয়েছে আমায় বলবে না?

অরুণ কাষ্ঠহাসি হাসিয়া উত্তর করিল—শুকিয়ে আবার কখন গেলুম—

না সত্যি তুমি কি রকম হয়ে যাচ্ছ—

না কিরণ, ওটা তোমার চোখের ভুল। স্বামীকে বড় বেশী ভালবাস কিনা তাই ওই রকম তোমার মনে হয়—বলিয়া হঠাৎ কি কাজ উপলক্ষ করিয়া অরুণ উঠিয়া গেল।

নিজের মনটাকে লইয়া অরুণ বড়ই বিপদে পড়িল। সে যতই মুখে বলিতে থাকে—'না ও কিছু না'—ততই তার মনে সন্দেহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। যতই সে ভাবে—'না না এ অন্যায়, কিরণের প্রতি এ অবিচার আমি করতে পারি না—করতে পারব না আমি'—ততই তাহার মন মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে।

অফিস ফেরৎ তাকে পড়াইতে যাইতে হয় এই অজুহাতে একদিন সে দেখিল পরিপাটিরূপে ডিসে জলখাবার সাজাইয়া লিলি ঘরে ঢুকিল।

অরুণ উত্তপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এ সব কি আবার লিলি?

লিলি হাস্যমুখে জবাব দিল—আমি কি করব বলুন? মা পাঠিয়ে দিলেন, ঝগড়া করতে চান ত তাঁর সঙ্গে করুন গিয়ে।

অরুণ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছিল কিন্তু মনের দুর্ব্বল অংশটা তখনি সাড়া দিয়া উঠিল। সে ভাবিল জলখাবার না খাওয়াটা তাহার পক্ষে গর্ব্বের বিষয় হইতে পারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যে সেই অপরিচিতাকেও অপমান ও আহত করা হইবে। নিজে সে যাহাই হউক কিন্তু কোন ভদ্র মহিলার মনে আঘাত সে কিছুতেই দিতে পারিবে না। খাইতে আর সে আপত্তি করিল না।

এই জলখাবার উপলক্ষ্য করিয়া অরুণের অবস্থা বড় সঙ্গীন করিয়া তোলা হইল। জলখাবার আগে পড়িবার ঘরেই সম্পন্ন হইত, কিন্তু কালক্রমে তাহা সম্পন্ন করিতে অন্দর মহলে তাহার ডাক পড়িল।

সরল শিশু লিলি কিছুই বুঝিতে পারিত না—অরুণের মনের অবস্থাও তখন নিতান্ত দুর্ব্বল সে হাল ছাড়িয়া দিল।

দিনের পর দিন পড়াইবার পূর্ব্বে লিলির অনুসরণ করিয়া অরুণ অন্দর মহলে যে দালানটীতে আসিয়া খাইতে বসিত তাহারই সামনের ঘরে দরজার অন্তরালে একখানি দুগ্ধ শুভ্র হস্তের অলঙ্কারের রিনিঝিনি ও বায়ুহিল্লোলে রঙীন আঁচলের চপল নর্ত্তন অরুণের দৃষ্টিপথে আসিয়া তাহার সমস্ত শরীরে পুলক কম্পন জাগাইয়া তুলিত। শিরায় শিরায় তাহার রক্ত চন্ চন্ করিয়া উঠিত।

এমনি করিয়া যখন দিন কাটিতেছিল তখন একদিন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। সেদিন পড়াইতে গিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া লিলির পড়িবার ঘরে ঢুকিতেই অরুণ বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের ন্যায় থমকিয়া দাঁড়াইল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার সাড়া পাইয়া নব প্রস্ফুটিত কুসুমের ন্যায় এক রূপসী তরুণী সারা অঙ্গে জ্যোৎস্নার হিল্লোল তুলিয়া যখন 'বসুন লিলিকে ডেকে দিচ্ছি' বলে কণ্ঠবীণের কোমল ঝঙ্কার তুলিয়া অপরূপ বিদ্যুচ্চঞ্চল কটাক্ষে অরুণের চক্ষু ধাঁধাঁইয়া দিয়া অন্তঃপুরে অদৃশ্য হইয়া গেল তখন যেন এক তীব্র উদ্দাম উচ্ছ্বাস অরুণের সমস্ত শরীর ও মনকে সুরের ঢেউয়ে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। বাইরের সমস্ত বিশ্ব যেন তাহার চোখে অস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

ইহার পর হইতেই অরুণের মন এক অনাস্বাদিত রঙীন নেশায় মাতাল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল কতখানি অবনতি তার ঘটিয়াছে—কতখানি নির্ম্মম অবিচার সে কিরণের উপর করিতেছে—তবুও সে তার মোহিত উদ্ভ্রান্ত চিত্ত ফিরাইতে পারিল না!

কিরণ বরাবরই সব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। আজ-কাল স্বামীর বিরাগের মাত্রাটা অধিক হওয়াতে তার স্বামীগত প্রাণ অব্যক্ত বেদনা ও দুঃখে ভুইয়া পড়িতে লাগিল।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইতে গিয়া সে অরুণের পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল,—আজ তোমায় বলতেই হবে, তোমার কি হয়েছে ?

কিচ্ছু হয় নি কিরণ, পা ছাড়ো ছি !

না আমি কিছুতেই ছাড়বো না। তুমি বল আমায়, কেন আর আগেকার মত হাসি-ঠাট্টা কর না আমার সঙ্গে ? আমি কি অপরাধ করেছি—অজ্ঞাতে কি কটু কথা তোমায় বলেছি—বল বল—বলে সে অরুণের পায়ে মাথা গুঁজিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

অরুণের বুকখানা কে যেন করাত দিয়া চিরিয়া দুখানা করিয়া দিল। উঃ কি করিতেছে সে ? নিষ্ঠুর পাষাণ সে এই পতিপ্রাণা সরলা বালিকার প্রাণে কি আঘাতটাই না যে এতদিন দিয়াছে ? সে কি মানুষ না পিশাচ ?

অরুণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া কিরণকে ব্যগ্রভাবে দুই বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিয়া সাগ্রহে বুকে টানিয়া লইল।

কিরণ রাণু আমার, কেঁদোনা। মনটা আমার কদিন ভাল ছিল না তাই তোমার সঙ্গে ভাল করে হাসি গল্প করতে পারিনি—এবারটী ক্ষমা করো সোনা—আর আমি অমন হব না,—অরুণের দুই চোখে জল আসিয়া পড়িল।

অরুণের বুকে মুখ গুঁজিয়া কিরণ ফুঁপিয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—ওগো, তুমি আর মুখ ভার করে' থেক না, একদণ্ড তোমার হাসিমুখ না দেখলে আমি চারদিক অন্ধকার দেখি—তোমায় ছাড়া আমি যে আর কাউকে জানি না—ওগো আর তুমি অমন করে থেক না।

কাঁদিয়া কিরণের মন অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। অরুণ তাহাকে বক্ষে টানিয়া চুমু খাইয়া বলিল না কিরণ, আর আমি গম্ভীর হয়ে থাকব না। তোমার মনে বড় কষ্ট দিয়েছি, এখন বেশ বুঝতে পারছি আমায় এবার ক্ষমা কর।

সে রাত্রি আবার হাসি গল্প-গুজবে দম্পতীর সুখে কাটিয়া গেল।

পরদিন অরুণ ভাবিল, নাঃ আর নয়, এবারে ফিরতে হবে। উপরোপরি সে দুইদিন পড়াইতে গেল না—সে সময়টা সে কিরণের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে কাটাইয়া দিল।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা বুঝি মুখ টিপিয়া হাসিতেছিলেন। অরুণের পরীক্ষার অনেকখানি বাকি ছিল—তাই আবার দুই চারিদিন কাটিতেই সে পুনরায় আলেয়ার আলোর পশ্চাতে ছুটিল। সে আবার পড়াইতে গেল এবং কি এক মোহের আকর্ষণে তার প্রাণ আবার চঞ্চল হইয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

ভিক্ষা

[শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

বাংলা দেশের পল্লীগ্রামে যখন ছিলাম সেখানে এক সন্ন্যাসিনী আমাকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কুটীর-নির্ম্মাণের জন্য আমার কাছে ভূমি ভিক্ষা নিয়েছিলেন—সেই ভূমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হত তাই দিয়ে তাঁর আহার চলত—এবং দুই চারিটী অনাথ শিশুদের পালন করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন সংসারে—তাঁর মাতার অবস্থাও ছিল সচ্ছল—কন্যাকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্যে তিনি অনেক চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কন্যা সম্মত হন নি। তিনি আমাকে বলেছিলেন, নিজের ঘরের অন্নে আত্মাভিমান জন্মে—মন থেকে এই ভ্রম কিছুতেই ঘুচতে চায় না যে এই অন্নের মালেক আমিই, আমাকে আমিই খাওয়াচ্ছি। কিন্তু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে যে অন্ন পাই সে অন্ন ভগবানের—তিনি সকল মানুষের হাত দিয়ে সেই অন্ন আমাকে দেন, তার উপরে আমার নিজের দাবী নেই, তাঁর দয়ার উপর ভরসা।

বাংলা দেশকে বাংলা ভাষার ভিতর চিরজীবন আমি সেবা করেছি, আমার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়সের মধ্যে অন্ততঃ পঁঞ্চাশ বৎসর আমি সাহিত্যের সাধনা করে সরস্বতীর কাছ থেকে যা-কিছু বর লাভ করেছি সমস্তই বাংলা দেশের ভাণ্ডারে জমা করে দিয়েছি। এই জন্য বাংলা দেশের কাছ থেকে আমি যতটুকু স্নেহ ও সম্মান লাভ করেছি তার উপরে আমার নিজের দাবী আছে - বাংলা দেশ যদি কৃপণতা করে, যদি আমাকে আমার প্রাপ্য না দেয় তা হ'লে অভিমান ক'রে আমি বলতে পারি যে, আমার কাছে বাংলা দেশ ঋণী রয়ে গেল।

কিন্তু বাংলার বাইরে বা বিদেশে যে সমাদর, যে প্রীতি লাভ করি, তার উপরে আমার আত্মাভিমানের দাবী নাই। এই জন্য এই দানকেই ভগবানের দান বলে আমি গ্রহণ করি। তিনি আমাকে দয়া করেন, নতুবা অপরেরা আমাকে দয়া করেন এমন কোনো হেতু নাই।

ভগবানের এই দানে মন নম্র হয়, এতে অহঙ্কার জন্মে না। আমরা নিজের পকেটের চার আনার পয়সা নিয়েও গর্ব্ব করতে পারি, কিন্তু ভগবান আকাশলয়ে যে সোনার আলো ঢেলে দিয়েছেন, কোন কালেই যার মূল্য শোধ করতে পারব না সেই আলোর অধিকার নিয়ে কেবল আনন্দই করতে পারি কিন্তু গর্ব্ব করতে পারিনে। পরের দত্ত সমাদরও সেই রকম অমূল্য—সেই দান আমি নম্র শিরেই গ্রহণ করি, উদ্ধত শিরে নয়। এই সমাদরে আমি বাংলা দেশের সন্তান বলে উপলব্ধি করবার সুযোগ লাভ করি নি। বাংলা দেশের ছোট ঘরে আমার গর্ব্ব করবার স্থান ছিল, কিন্তু ভারতের বড় ঘরে আমার আনন্দ করবার স্থান।

আমার প্রভু আমাকে তাঁর দেউড়ীতে কেবলমাত্র বাঁশী বাজাবার ভার দেন নি - শুধু কবিতার মালা গাঁথিয়ে তিনি আমাকে ছুটী দিলেন না। আমার যৌবন যখন পার হয়ে গেল, আমার চুল যখন পাকল তখন তাঁর অঙ্গনে আমার তলব পড়ল। সেখানে তিনি শিশুদের মা হয়ে বসে আছেন। তিনি আমাকে হেসে বললেন, "ওরে পুত্র, এতদিন তুই ত কোন কাজেই লাগ্‌লিনে, কেবল কথাই গেঁথে বেড়ালি। বয়স গেল, এখন যে কয়টা দিন বাকী আছে, এই শিশুদের সেবা কর।"

কাজ সুরু করে দিলুম। সেই আমার শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের কাজ। কয়েকজন বাঙালীর ছেলেকে নিয়ে মাষ্টারী সুরু করে দিলুম। মনে অহঙ্কার হ'ল, এ আমার কাজ এ আমার সৃষ্টি। মনে হ'ল আমি বাংলা দেশের হিতসাধন করচি, এ আমারই শক্তি।

কিন্তু এ যে প্রভুরই আদেশ—যে প্রভু কেবল বাংলা দেশের নন্, সেই কথা যাঁর কাজ তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন। সমুদ্র পার হতে এলেন বন্ধু এণ্ড্রুজ, এলেন বন্ধু পিয়ার্সন। আপন লোকের বন্ধুত্বের উপর দাবী আছে, সে

বন্ধুত্ব আপন লোকেরই সেবায় লাগে। কিন্তু যাঁদের সঙ্গে নাড়ীর সম্বন্ধ নেই, যাঁদের ভাষা স্বতন্ত্র, ব্যবহার স্বতন্ত্র, তাঁরা যখন অনাহূত আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন, তখনই আমার অহঙ্কার ঘুচে গেল, আমার আনন্দ জন্মাল। যখন ভগবান পরকে আপন করে দেন, তখন সেই আত্মীয়তার মধ্যে তাঁকেই আত্মীয় বলে জান্‌তে পারি।

আমার মনে গর্ব্ব জন্মেছিল যে আমি স্বদেশের জন্য অনেক করচি—আমার অর্থ, আমার সামর্থ্য আমি স্বদেশকে উৎসর্গ করচি। আমার সেই গর্ব্ব চূর্ণ হ'য়ে গেল যখন বিদেশী এলেন এই কাজে—তখনই বুঝলুম এও আমার কাজ নয়, এ তাঁরই কাজ যিনি সকল মানুষের ভগবান। এই যে বিদেশী বন্ধুদের অযাচিত পাঠিয়ে দিলেন, এঁরা আত্মীয়-স্বজনদের হতে বহু দূরে পৃথিবীর প্রান্তে ভারতের প্রান্তে এক খ্যাতিহীন প্রান্তরের মাঝখানে নিজের সমস্ত জীবন ঢেলে দিলেন; একদিনের জন্যও ভাবলেম, যাদের জন্য তাঁদের আত্মোৎসর্গ তারা বিদেশী, তারা পূর্ব্বদেশী, তারা শিশু, তাঁদের ঋণশোধ করবার মত অর্থ তাদের নেই, শক্তি তাদের নেই, মান তাদের নেই। তাঁরা নিজে পরম পণ্ডিত, কত সম্মানের পদ তাঁদের জন্য পথ চেয়ে আছে, কত উর্দ্ধ বেতন তাঁদের আহ্বান করচে, সমস্ত তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেচেন—অকিঞ্চনভাবে, স্বদেশীর সম্মান ও স্নেহ হতে বঞ্চিত হ'য়ে, রাজপুরুষদের সন্দেহ দ্বারা অনুধাবিত হয়ে, গ্রীষ্ম এবং রোগের তাপে তাপিত হয়ে তাঁরা কাজে প্রবৃত্ত হ'লেন। এ কাজের বেতন তাঁরা নিলেন না, দুঃখই নিলেন। তাঁরা আপনাকে বড় করলেন না, প্রভুর আদেশকে বড় করলেন, প্রেমকে বড় করলেন, কাজকে বড় করে তুললেন।

এই ত আমার পরে ভগবানের দয়া তিনি আমার গর্ব্বকে ছোট করে দিতেই আমার সাধনা বড় করে দিলেন। এখন এই সাধনা কি ছোট বাংলা দেশের সীমার মধ্যে আর ধরে? বাংলার বাহির থেকে ছেলেরা আসতে লাগল। আমি তাদের ডাক দিইনি। ডাকলেও আমার ডাক অতদূরে পৌঁছত না। যিনি সমুদ্র পার থেকে নিজের কণ্ঠে তাঁর সেবকদের ডেকেছেন, তিনিই স্বহস্তে তাঁর সেবাক্ষেত্রের সীমানা মিটিয়ে দিতে লাগলেন।

আজ আমাদের আশ্রমে প্রায় ত্রিশজন গুজরাটের ছেলে এসে বসেচে। সেই ছেলেদের অভিভাবকেরা আমার আশ্রমের পরম হিতৈষী। তাঁরা আমাদের সর্ব্বপ্রকারে যত আনুকূল্য করেচেন, এমন আনুকূল্য ভারতের আর কোথাও পাই নি, অনেক দিন আমি বাঙালীর ছেলেকে এই আশ্রমে মানুষ করেচি—কিন্তু বাংলা দেশে আমার সহায় নাই। সেও আমার বিধাতার দয়া। যেখানে দাবী বেশী সেখান থেকে যা পাওয়া যায় সে ত খাজনা পাওয়া। যে খাজনা পায় সে যদি বা রাজাও হয় তবু সে হতভাগ্য, কেন না সে তার নীচের লোকের কাছ থেকেই ভিক্ষা পায়; যে দান পায় সে উপর থেকে পায়, সে প্রেমের দান, জবরদস্তির আদায় ওয়াশিল নয়। বাংলা দেশের বাহির থেকে আমার আশ্রম সে আনুকূল্য পেয়েচে, সেই ত আশীর্ব্বাদ—সে পবিত্র। সেই আনুকূল্যে এই আশ্রম সমস্ত বিশ্বের সামগ্রী হয়েছে।

আজ এই আত্মাভিমান বিসর্জ্জন করে, বাংলাদেশাভিমান বর্জ্জন করে বাইরে আশ্রম-জননীর জন্য ভিক্ষা করতে বাহির হয়েচি। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। সেই শ্রদ্ধার দানের দ্বারা আশ্রমকে সকলে গ্রহণ করবেন, সকলের সামগ্রী করবেন, তাকে বিশ্বলোকে উত্তীর্ণ করবেন। এই বিশ্বলোকেই অমৃত-লোক। যা কিছু আমাদের অভিমানের গণ্ডীর, আমাদের স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে থাকে তাই মৃত্যুর অধিকারবর্ত্তী। যা সকল মানুষের, তাই সকল কালের। সকলের ভিক্ষার মধ্য দিয়ে আমাদের আশ্রমের উপরে বিধাতার অমৃত বর্ষিত হোক—সেই অমৃত-অভিষেকে আমরা—তাঁর সেবকেরা পবিত্র হই—আমাদের অহঙ্কার ধৌত হোক আমাদের শক্তি প্রবল ও নির্ম্মল হোক এই কামনা মনে নিয়ে সকলের কাছে এসেচি—সকলের মধ্য দিয়ে বিধাতা আমাদের উপর প্রসন্ন হোন, আমাদের বাক্য, মন ও চেষ্টাকে তাঁর কল্যাণ সৃষ্টির মধ্যে দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করুন।

(ভারতী)

থিয়েটারের গুপ্তকথা

[নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২২)

ম্যানেজার মশাইকে দেখে আমার ধড়ে যেন প্রাণ এল। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর কাছে গিয়ে অত্যন্ত কাকুতি মিনতি করে তাঁকে বললুম—"আসুন ম্যানেজারবাবু—শিগ্‌গীর একবার বাবুর কাছে আসুন—" ব'লেই তাঁর হাত ধরে একটু টেনেও ফেললুম!

ম্যানেজারবাবু কাপড়ের কসি টান্‌তে টান্‌তে সেই ভদ্রলোকটাকে ছেড়ে আমার সঙ্গে আস্‌তে আস্‌তে বললেন —"কেন—কেন—ব্যাপার কি? কি হয়েছে দীনু—" ততক্ষণে আমরা দুজনেই মেজবাবুর সামনে উপস্থিত হয়েছি!

ম্যানেজার বাবুকে দেখেই মেজবাবু বললেন—"এই যে আপনি এসেছেন! এইখেনে বসুন বসুন, একটু জিরোন মশাই—খেটে খেটে যে সারা হ'লেন!"

ম্যানেজার। "আজ্ঞে মেজবাবু আজকের দিনে আমার কি মরবার সময় আছে? আপনারা পাঁচজন এসেছেন, তার ওপোর আজ নতুন বই খোলা হ'য়েছে—! তা যাক্,—কোন কষ্ট হ'চ্ছে না তো?"

মেজবাবু। "কিছু না! কষ্ট কি? এ তো আমার নিজেরি থিয়েটার!"

ম্যানেজার। "প্লে" কেমন লাগছে?"

প্রসাদবাবু তাড়াতাড়ী ব'লে উঠলেন—"প্লে তেমন সুবিধে হ'চ্ছে না! দুটো চারটে পার্ট মন্দ হ'চ্ছে না—"

ম্যানেজারবাবু একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন—"প্রথম রাত্রি—একটু আধটু দোষ হবে বইকি! বুঝলেন মেজবাবু—রিহার্স্যাল তেমন দেওয়া হয় নি,—তাড়াতাড়ী খোলা হয়েছে—"

প্রসাদবাবু আরও একটু বিজ্ঞের মত নেশায় "চঞ্চল" মাথাটা আরও একটু "বিচক্ষণ" করে বললেন—"বইখানা বিশ্রী হয়েছে—বুঝলেন,—তেমন লাগ্‌তাই হয় নি—"

ম্যানেজার বাবুর মুখখানা শুকিয়ে গেল! তিনি যেন একটু অপ্রস্তুত হ'লেন!

এইবার মেজবাবু (তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন) একটু সোজা হয়ে বসে প্রসাদ বাবুকে বললেন—"তুমি শালা থিয়েটারের কি বোঝো—নাটকেরই বা কি জান যে, "যা—তা" একটা ভদ্রলোকের মুখের ওপোর ব'লে ফেললে! না না ম্যানেজার মশাই, ও শালার কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। শালা মুক্ষুর ধাড়ী! চমৎকার নাটক লিখেছেন, "প্লে" খুব ফাষ্ট্ কেলাস্ হ'চ্ছে! আমি উপ্‌রো-উপরি দু'চার রাত্রি দেখব!"

ম্যানেজার মশায়ের মুখে আর হাসি ধরে না! তিনি অমনি দন্তবিস্তার করে বললেন—"আপনি খুসী হ'লেই হ'ল—আপনি খুসী হ'লেই হ'ল! এতটা টাকা দিয়েছেন—আপনি খুসী হ'লেই আমরাও প্রাণে প্রাণে খুসী—"

এমন সময় নারাণবাবু ম্যানেজার বাবুকে একটু ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—"বাবু যে টাকা দুশো পাঠিয়ে দিয়েছেন,—আপনি পান্ নি?"

ম্যানেজার বাবুর ট্যাঁকে তখনও সে নোটের তাড়াটা ছিল। তিনি তখুনি সেটাকে বের করে দেখিয়ে বললেন—"অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ পেয়েছি! শুধু দুশো টাকা? বাবু যে কুড়ি পঁচিশ টাকার ফুল পাঠিয়ে দিয়েছেন,—সকলে পেয়ে বাবুকে ধন্য ধন্য ক'চ্ছে! কেন—দীনু কি বলে নি?"

"আঃ—বাঁচলুম বাবা!"

নারাণবাবু তখনও ব'ল্‌ছেন "যাক্—টাকাটা ভালয় ভালয় যে আপনার কাছে পৌঁছেছে তাই ভাল! নইলে—

দিনকাল যে রকম,—কোনও ছোক্‌রাকে তো বিশ্বাস করা যায় না—"

ম্যানেজার। "ছি—ছি—অমন কথা বোলো না নারাণ বাবু! উনি অতি সৎ ছেলে! একটী পয়সা কখনো কারও তঞ্চক করে না। কি বলেন মেজবাবু?"

মেজবাবু হাঁকলেন—"চাপ্‌রাশি!"

দু' তিনজন তকমাধারী চাপ্‌রাশি তখুনি সাম্‌নে এসে উপস্থিত। মেজবাবু বললেন—"এই হামারা জুতি লেকে এই শুয়ার-কো-বাচ্চা নারাণ বাবুকো মারকে আভি থিয়েটারসে নিকাল দেও—"

ততক্ষণ নারাণ বাবুটী একেবারে অদৃশ্য!

ভীষণ কাণ্ড! মেজবাবু নিজে উঠে খালি পায়ে তার সন্ধানে ছুটলেন! সকলে মিলে (ম্যানেজার ও আমি শুদ্ধ) তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে চেষ্টা করলুম! একে "মেজবাবু," —তায় "মদ্য" খেয়েছেন। তার ওপোর যখন যেটা "গোঁ" ধরবেন—তখন সেটা করবেনই করবেন! ভালমানুষ আছেন তো বেশই আছেন, রাগলে তিনি আর কারও নন্! সঙ্গী লোকজনদের—খানসামাদের তখুনি হুকুম হ'ল—"যাও—যাঁহাসে হোয়,—আব্‌হি শালাকো পাকাড় লে আও—" বলতে বলতে নারাণ বাবুর "বাপ-মা'র" সম্বন্ধে বিস্তর অভিধান বর্জ্জিত কথা আওড়ে ফেললেন।

সকলে তখনকার মত (মেজবাবুকে দেখিয়ে) তাঁর সাম্‌নেই নারাণ বাবুটীকে খোঁজ করতে লেগে গেল।

ম্যানেজারবাবু মেজবাবুকে বললেন—"আমি খুঁজে এনে দিচ্ছি। আপনি বসুন। সে বেটা যাবে কোথায় আমার নজর এড়িয়ে? আহা—দেখ দিকি—এমন শিবতুল্য লোক দয়া করে এসেছেন আমার থিয়েটারে, আমার নাটকের প্লে দেখতে,—আঁটকুড়ীর বেটা দিলে কি না তাঁকে চটিয়ে—" বলেই গুটী গুটী সে হাঙ্গামের মাঝখান থেকে ম্যানেজারবাবু সরে পড়লেন। যাবার সময় আমায় একটু ইসারা করেছিলেন —"তুমিও চলে এস।" আমিও "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ—" মনে মনে আওড়ে তাঁর পাছু পাছু একেবারে ষ্টেজের ভেতর ঢুকে পড়লুম।

(ক্রমশঃ)

উদাস হাওয়া

[কে, ডি, সরকার]

(১)

এখনও সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া ধরণীর বুকে ছেয়ে পড়ে নাই। সবে মাত্র সূর্য্যদেব পাটে বসেছেন; আর তার শেষ কিরণ বৃক্ষের সবুজ পাতাগুলিকে বেশ সোনার পাতে মুড়ে দিয়াছে। দিনান্তের মৃদু সমীর ধীরে ধীরে তাদের কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তখন হচ্ছিল একটা রঙের খেলা সবুজে হলুদে—সাদায় কালায়—একটা আলোর চিক্‌মিকি রঙের ঝিক্‌ঝিকি, যেন শ্যামোর্ম্মিমালায় বালার্ক কিরণের ছটা। এমন সময় সুভাষ তাহার শয়ন কক্ষের গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত ক'রে মুগ্ধনেত্রে চেয়ে আছে ঐ প্রকৃতির পানে। সৌন্দর্য্যের ছবিখানি তখন তাহার অন্তর বাহিরে বিকশিত। দৃষ্টি ফিরিতেই দেয়ালে সংলগ্ন একখানি আলোকচিত্রের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। এই চিত্র তাহার প্রাণের হৃদয়ের সকল ভালবাসা দিয়ে আঁকা—তাহার প্রেমাস্পদ বাঁশরীর আলোক চিত্র। সন্ধ্যা প্রকৃত প্রেমাধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই সন্ধ্যায় সুভাষ প্রকৃত প্রেমিক! সুভাষ বাহিরের ঐ অসীম সৌন্দর্য্যের সহিত তাহার গণ্ডিঘেরা সৌন্দর্য্য-বিজড়িত আলোক চিত্রের মাধুরীর দরকষাকষি করিতেছে। তখন তাহার মনে উঠেছে প্রকৃতি অসীম, অসীম তার সৌন্দর্য্য, প্রাণে একটা উদাসভাব টেনে এনে দেয় আর সেই সঙ্গে প্রাণকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে মারে এক অসীম শূন্যের পানে—কবি, দার্শনিক, ভাবুক সকলেই ঐ মোহ মদিরায় মুগ্ধ হ'য়ে ছুটিয়ে দেয় নিজেকে ঐ অসীম শূন্যের পানে। তার ফল—প্রাণভরা শূন্যতা, ব্যাকুলতা, আকাঙ্ক্ষা-উদ্বেলিত অসীম চিন্তা; শান্তির অভাব

ও অশান্তির প্রকট-ছবির চির বিরাজ। এ সৌন্দর্য্য আমার প্রাণে চায় না। আমি চাই প্রকৃতিকে একটা গণ্ডিঘেরা সৌন্দর্য্যের মধ্যে আবদ্ধ। তাই আমার প্রাণের প্রতিমার চিত্র দর্শনে আমার আনন্দ ও চিরতৃপ্তি। সীমাবদ্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা অপূর্ণভাব থাকলেও ব্যক্তি বিশেষের প্রেমের টানে প্রাণের টানে সে অপূর্ণতা ভরপুর হ'য়ে উঠে' হৃদয়ে অমিয় সিঞ্চন করে। এ অপূর্ণতা সৃষ্টির মধ্যেই চিরবিরাজ। তাই চিত্রমাত্রেই এই পূর্ণতা অপূর্ণতার সমবায় বিকাশ। তাই মনে পড়ে কবিরের বাণী—"সবাই মুয়ত বীচ্ অমূরত মুরত কী বলিহারী।" সুভাষের মন যখন এইরূপ সৌন্দর্য্য গবেষণায় দোলায়মান তখন বিমল এসে ঘরে ঢুকে বল্লে—"কিহে সুভাস, তোমায় যে আর দেখি না। আমাদের উপর তোমার প্রাণের টান ক্রমেই কমে আসছে দেখছি। বলি কিছু কচিপ্রেমের সন্ধান পেয়েছো কি?" সুভাস উঠে তাকে একখানা চেয়ার দিয়ে বললে—"ভাই, ও সব বকামি ছাড়, যদি এসেছো, ঐ অরগ্যাণ আছে বেশ ভালরকম ক'রে একখানা গান গাও।" বিমল অরগ্যাণ বাজিয়ে গাইতে লাগিল—

"ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা,
ওগো তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে।
যায় যেন মোর গভীর প্রাণের আশা,
ওগো তোমার কাণে, তোমার কাণে, তোমার কাণে।"

এমন সময় চাকর এসে একখানা পত্র দিল। পত্রখানি খুলিয়া সুভাষ পড়িতে লাগিল। চিঠিখানি তাহার সমপাঠী শুভাকাঙ্ক্ষী বিভাষ লিখিয়াছে। "প্রিয় সুভাষ, ক'দিন হ'ল তোমাকে যেন একটু আনমনা ও সব কাজেই শিথিল ভাব লক্ষ্য করছি। সেদিন প্রফেসার তোমাকে কি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন—তুমি তার অসংলগ্ন ভাবে উত্তর দিলে। তোমার মত তীক্ষ্ণ মেধাবীর এই অসংলগ্ন উত্তর শুনে' সতীর্থেরা তো হেসেই কুটপাট; এবং প্রফেসার তোমায় বললেন,—"কি সুভাষ, তোমার কি অসুখ করেছে?" সেই থেকে তোমার সম্বন্ধে গভীরভাবে আমি চিন্তা করতে বসেছি। তোমার একী হ'ল। তুমি কি ভাব এবং কার ধ্যানে বিভোর। প্রাণে বড় বাজলো। তাই সন্ধান নিতে লাগ্‌লুম। বেশী-দিন ঘুরতে হ'ল না। অল্পতেই সন্ধান মিল্‌ল। তুমি বোধ হয় প্রভাতবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা বাঁশরীকে ভালবাস নয় কি? এ ভালবাসা আমি অন্যায় মনে করি না। কেবলই মনে উঠ্‌ছিল, তোমাকে যেমন আমরা ভক্তি ও ভালবাসার আধার ব'লে মনে করি তেমনি তোমার পাশে যাকে পাব তাকে ঠিক পেতে চাই তোমার অনুরূপ। তাই তোমার যে মাধুরীতে আমরা আকৃষ্ট, তার কতটুকু এই বাঁশরীতে আছে তাই দেখবার জন্যে প্রাণটা আকুল হ'য়ে উঠল। কিন্তু কি বলবো ভাই ভগবান বিরূপ। নইলে এমনও হয়? বললে বোধহয় বড়ই কষ্ট পাবে। তবুও আমায় বলতে হ'বে; যেহেতু তুমি আমার বন্ধু! বাঁশরী যতীনবাবুকে ভালবাসে। সে যতীনবাবুর কাছে যে পত্র লিখেছে, তাও আমার হস্তগত হ'য়েছে। তোমার যাতে বিশ্বাস হয় তাই চিঠিখানা গেঁথে পাঠিয়ে দিলুম।" প্রিয়তম ...। আর পড়তে পারলুম না মাথা ঘুরতে লাগলো। হৃদয়ের সমস্ত শোণিত জমাট বেঁধে আমার মুখের উপর লেপে দিল এক পোঁচ ফ্যাকাসে রঙ। আমি চোখ বুঁজে আমার সর্ব্বনাশের বিভীষিকা হতে বাঁচতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু সদাই এই তীব্র বিষাদ চিন্তা অধিকতর বিভিষিকা মূর্ত্তি ধারণ করে আমার হৃদয়ের শোণিত শোষণ করে' প্রতিপলে আমায় দুমড়ে মুসড়ে একাকার করে' দিয়ে যেতে লাগলো। অশান্তির তীব্র ব্যথা আমার মুখে প্রতিভাত দেখেই বোধহয় বিমল জিজ্ঞাসা কল্লে,—"কি ভাই অসুখ কর্‌লো নাকি? না কিছু কুসংবাদ?"

আমি তখন উত্তর দিলুম—না ভাই অসুখ করে নি। যা হয়েছে তা আজ তোমায় ব'লে এই তীব্র যাতনার উপশম করব। যা হয়েছে তা মানুষের হয় না। আর হ'লেও মানুষ বাঁচে না তোমায় বল্‌তে বাধা নেই। বল্‌ছি শোন।

(২)

সে প্রায় দুবৎসর হ'ল একদিন সন্ধ্যাবেলায় ছোট খালটির কুলঘেঁসা আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে নিজেকে চালিয়ে আন্‌ছি। তুমি বোধহয় জান আমি বাল্যকাল থেকেই নির্জ্জন ভালবাসি। তাই যে জায়গায় লোকজনের যাতায়াত কম সেই স্থানটাই আমার অধিক প্রিয়। এ পথে বড় লোকজন

আনাগনা করে না। তাই প্রকৃতির পূর্ণ সৌন্দর্য্য সমভাবে বিরাজমান। আমি কোনদিনই মানুষকে প্রীতির চোখে দেখতুম না ; আর মানুষকে দেখলে আমি বড় ভয় পেতুম। পাছে তার কুটিলতার ছোঁয়া আমার বুকে বিঁধিয়ে পালায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তো কবির গান—

"প্রেম যদি সই! শিখতে হয় মানুষের কাছে নয়।" তাই আমার আত্ম নিবেদনের স্থান ছিল ঐ নির্জ্জন নদীকূল। আর প্রাণের ব্যথা বুঝাবার চেষ্টা পেতুম তথাকার লতা-গুল্মের কাছে। এইরূপ একদিন বসে' আত্মনিবেদনে রত আছি হঠাৎ পায়ের শব্দ পেলুম মনে হ'ল কে যেন আসছে। চোখ খুলে দেখি একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক। অল্পক্ষণেই পরস্পরের পরিচয় ও ভাবের আদান প্রদান হ'য়ে গেল। পরে বিদায়কালে আগন্তুক বলে' গেলেন—"বারগণ্ডা আমার বাড়ী। সিংহদ্বারে মর্ম্মর প্রস্তরে লেখা আছে 'প্রভাত-ভবন'।" আপনার বাসা থেকে বেশী দূর হবে না। যদি আমার ওখানে যান তবে বড়ই বাধিত হ'ব। আর যদি কিছু মনে না করেন তবে বিকেলে চা পানের হাঙ্গামটা আমার ওখানেই সেরে নেবেন। যাওয়ার বেলায় তিনি বার বার বলে গেলেন—ভুলবেন না সুভাষবাবু। কাল বিকেলে যেন আপনাকে আমার কুটীরে পাই।"

(৩)

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার আগেই বাড়ী ফিরলুম। আর কেবলই মনে হ'তে লাগলো কখন সেই কালকের বিকেল আসবে। সেদিন রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। তাই উষার শিশির ভেজা সমীর স্পর্শে নিদ্রাদেবী আমায় বেশ আঁকড়িয়ে ধল্লে। তখন দশটা বাজে ভৃত্যের আহ্বানে গাত্রোত্থান করে' বারটার মধ্যেই খাওয়া দাওয়া শেষ করে' নিলুম। বিকেলে বারগণ্ডায় নির্দ্দিষ্ট বাড়ী পৌঁছিতেই দেখি দোরে প্রভাতবাবু আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যাইবামাত্র সোৎসাহে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রীর নিকট আমার পরিচয় দিয়ে বল্লেন—"সুভাষবাবু এইরূপ প্রত্যহ আসবেন। আর কথাবার্ত্তা বলতে হ'লে এঁদের সাথেই বলবেন কেন না আমি সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। আমার সাথে বড় দেখা সাক্ষাৎ হবে না।" তারপর এইরূপ যাতায়াতে এই পরিবারের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা বেশ নিবিড় হ'য়ে উঠল। প্রভাত বাবুর স্ত্রীকে আমি মা ব'লে ডাকতুম। কি বলবো ভাই মাতৃস্নেহ আমি তথায় ষোল আনা পেয়েছি। জানই ভাই আমি চিরদিনই একটু খেয়ালী,—এটা ওটা নিয়ে মন সব সময় চিন্তাকুল থাকে। কিন্তু আমার মুখে এই চিন্তার রেখা দেখলেই তিনি বলে উঠতেন—"আজ যেন আমার পাগল ছেলের কি হ'য়েছে।—ও বাঁশরী। এদিকে আয় না; দেখছিস না সুভাষ একা বসে আছে। আমি যেমন কাজে ব্যস্ত—ওর সাথে কথাটিও বলতে পারি না। আর তোরাও তেমনি মেয়ে, একজন ভদ্রলোক বাড়ী এলে তাঁর আদর যত্ন করা তো দূরে থাক, তাঁর সাথে মুখের আলাপটুকু করতেও তোদের লজ্জা করে।" পরে বাঁশরী ও তার মা কত ভাবে আমার মনস্তুষ্টি করতে চেষ্টা পেতেন যে তাঁদের অমায়িক ব্যবহারে আমার গাম্ভীর্য্য আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হ'ত না। এইরূপ নিঃসঙ্কোচে মেলামেশায় বাঁশরীর চিত্র আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত হচ্ছিল। বাঁশরীর তেমন সৌন্দর্য্য ছিল না। কিন্তু তার চূর্ণিত কুন্তলদাম ও তার অকপট ব্যবহার আমায় বিশেষরূপে মুগ্ধ করেছিল। চিত্রের ষোলকলা পূর্ণ হয় নাই। তখনও শিল্পী নিত্যি নূতন রঙ লেপে চিত্রের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করতে প্রয়াস পাচ্ছিল। পরে চিত্রাঙ্কণ সমাপন হ'ল বটে ; তখনও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। কি কথায় একদিন বিভাষ আমায় বল্লে—"সুভাষ, বাঁশরীকে আমার বেশ ভাল লাগে। কিন্তু আমায় মুগ্ধ করেছে সবচেয়ে তার ঐ আগুল্ফ দোলান অলোকরাজি আর অকপট ব্যবহার।" সেইদিন আমার প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল। তখন থেকে আমি বাঁশরীর পূজারী আর সব সময় তারই ধ্যান করতে লাগলুম।

(৪)

আমি এতখানি বাঁশরীর দিকে ঝুঁকে পড়েছি এটা আমার ক্রিয়াকলাপে যথেষ্ট প্রকাশ পেলেও স্পষ্টত: মুখে কখনও তুলি নি আর বাঁশরী আমায় ভালবাসে কি না সে হিসাব নিকাশের জমা খরচ আমি মনেও কখন আনি নি। একদিন উশ্রী জলপ্রপাতের পাশে বাঁশরীকে তাদের বাড়ীর দারোয়ানের সাথে দেখে আমি আর নিজেকে সামলাতে

পারলুম না। পায়ের দ্রুত চালনায় কার্পণ্য না করে তার কাছে গিয়ে কখন আসছো ঐ প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করতেও ছাড়লুম না। সে অতি অল্প কথায় উত্তর দিল "এইমাত্র এসেছি।" আমাকে পেয়ে বাঁশরী বেশ একটু উৎফুল্লিতা হ'ল। আমিও তাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মাধুরিমা বিশ্লেষণ করে' সেই অসীমতার রূপের অনুভূতি তার প্রাণে জাগাতে চেষ্টা পেলুম। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বের হ'য়ে পড়লো—"দেখ বাঁশরি! তুমি ভগবানের শিল্প নৈপুণ্যের একখানি নিখুঁত চিত্র। আর পাশে চেয়ে দেখ ঐ আপনভোলা উর্ম্মী কেমন ঝর ঝর ক'রে স্রষ্টার অসীম করুণা ধরণীর বুকে ঢেলে দিচ্ছে। এই যুগপৎ সৌন্দর্য্যের একখানি চিত্র জগতের ললিত কলার যে কতদূর সাহায্য করবে কি বলব! দেখ বাঁশরী যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকে তবে তুমি ঐ ঝরণার ধারে দাঁড়াও। আমাব সাথে ক্যামেরা আছে, একখানি চিত্র তুলে জগৎকে উপহার দিই।" কিন্তু মনে মনে এই কথা জাগতে লাগলো জগতের কাছে চিত্র আদৃত হোক বা না হোক আমার ব্যাকুল হৃদয়ের বাঁশরী তৃষ্ণা এ চিত্রে মেটাবে সন্দেহ নাই। বাঁশরীর কোন আপত্তি ছিল না। চিত্রখানি তুলে আনি; তার Bromide shape ঐ দেখ দেয়ালে। সেইদিন বুঝেছিলুম বাঁশরী আমায় একটু শ্রদ্ধা করে ও একটু ভালবাসে। তবে সেটা আন্তরিক কিনা জানি না। তারপর আরও কতদিন চলে যায়। আমি বাঁশরীর চিন্তায় একেবারে আত্মহারা; শয়নে স্বপনে জাগরণে তার স্মৃতি-চিত্রের চির বিকাশ আমার আশেপাশে পেতে প্রয়াস পেয়েছি। দিন কয়েক হ'ল পাটনার কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমার বিবাহ সম্বন্ধে বাবাকে লিখেছিলেন। বাবা সেই কথা মাকে জানিয়ে বলেছিলেন—"দেখ তোমার ছেলের বিয়ে যদি নির্ম্মল বাবুর কন্যা সুষমার সঙ্গে দাও তবে ভাল হয়। নির্ম্মল আমার বাল্য-বন্ধু। আমি তার মেয়েকেও অনেকবার দেখেছি। মেয়েটী কিন্তু বেশ—এক কথায় বলতে গেলে—লক্ষ্মী সরস্বতী একাধারে।" তাই মা গত রাত্রে আমার কাছে সে কথা তোলবামাত্রই আমি কাটা জবাব দিলুম। না—করবো না। মা আমায় অনেকবার বল্লেন ও বাবার আন্তরিক ইচ্ছার কথাও প্রকাশ করতে ছাড়লেন না। আমি কিছুতেই রাজী হলুম না। পরে মা ভারী দুঃখের সাথে রাগ করে বল্লেন—"তোর যা ইচ্ছে কর। আমি আর ক'দিন।" এখন বুঝেছি, মায়ের কথায় রাজী না হয়ে ভাল করি নি। বিমল! বুঝতে পেরেছ কি? আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বাঁশরীর চিত্র চির আঁকা হয়ে গেছে। তারই পূজায় আমি জীবন কাটাব এই আমার সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু আজ বিভাষের চিঠি পেয়ে আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে। এই নাও চিঠি পড়ে দেখ। ভুল ভাঙ্গলো কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমিও ভেঙ্গে যাব। আর বুঝি উঠবো না। সদাই মনে পড়ছে—

> "অতসী অশোক গাঁথিতে কি হায় গেঁথেছি অপরাজিতা।
> প্রাণের স্ফটিক পাত্রে ঢেলেছি মিঠার সঙ্গে তিতা।
> বিশ্ব কি বিস্বাদ?
> একি ভুল নয়? এই বিষময়—মোহময় অবসাদ।"

বিষাদ অশ্রু আমার চোখের বাঁধ ভেঙ্গে দরদর করে নেমে আসছিল; আর নাসিকায় বইছিল রক্ত শোষণকারী এক দীর্ঘনিঃশ্বাস। ক্ষণিকের জন্য আমি বাক্‌রোধ হয়ে বসে রইলুম। তখন ভীষণ ভাবে মাথা ঘুরছিল। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বলে উঠলুম—"বিমল! আমার ভুল ভেঙ্গেছে বটে কিন্তু আমার প্রেম ভাঙ্গে নি। প্রেম চির সত্য। ব্রহ্মের স্বরূপ—প্রেমেই বিকাশ। সে প্রেমকে আমি মিথ্যা বলব না। তাই ভাই প্রেমেই প্রাণে সেই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রেমেই সেই মূর্ত্তির সন্ধ্যা বন্দনা ও আরতি সমাপন করেছি। আর আজ সেই প্রেমের নীরে প্রতিমার বিজয়া সমাপন করে শূন্য প্রাণে গৃহে ফিরতে বসেছি। আর প্রাণ রইল নিরাশ হৃদয়ের সান্ত্বনা স্বরূপ কবির বাণী।—

> It is better to have loved and lost
> Than never to have loved at all.
> (Tennyson)

* * * *

তারপর তিন বৎসর কেটে গেল। হরিদ্বারে বিভাষ, বিমল ও সুভাষ তিন বন্ধুতে মিলিত। বিভাষ ও বিমল প্রথমতঃ সুভাষকে চিনতেই পারে নাই। পরে বহু কষ্টে সে সন্দেহ হতে মুক্ত হয়ে পরিচয়ে জানল, সুভাষ আজ দেশ-মাতৃকার সেবক। কর্ম্মই তার জীবনের লক্ষ্য। আর ধর্ম্ম জীবনের মাধুরী পানেই তাই শান্তি। পরে বিদায় কালে সুভাষ কলেরিজের কয়েক পংক্তি আবৃত্তি দ্বারা তাহার প্রাণের শান্তি বন্ধুদ্বয়ের প্রাণে ঢেলে দিয়ে গেল।

> O sweeter than the marriage feast,
> 'Tis sweeter for to me
> To walk together to the kirk
> With a goody company.

নিদ্রিত নারায়ণ।
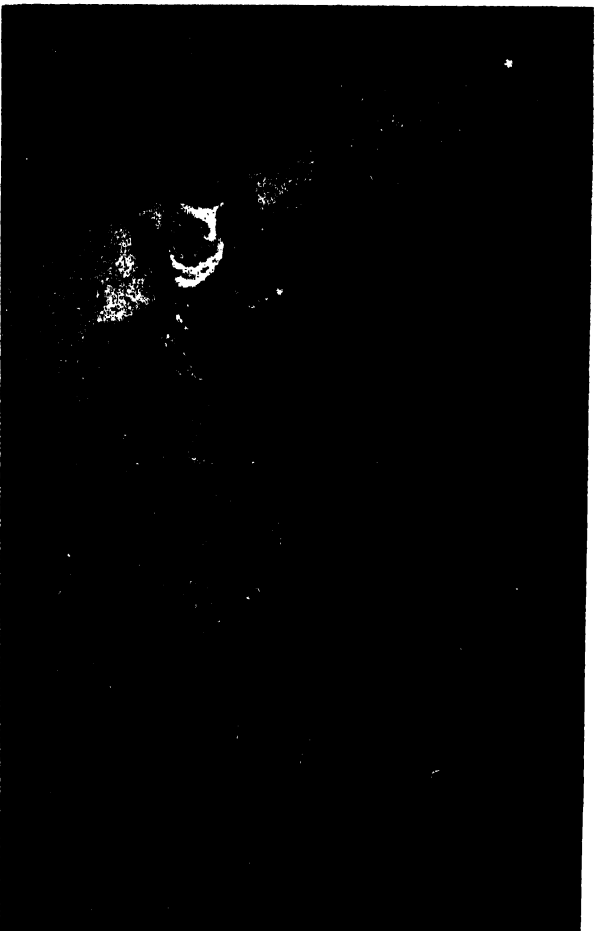
তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১লা শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৩। [৩৪শ সপ্তাহ

ভাব-বৈচিত্র্য

শিল্পী—শ্রীপাঁচুগোপাল দাস বি, এল।
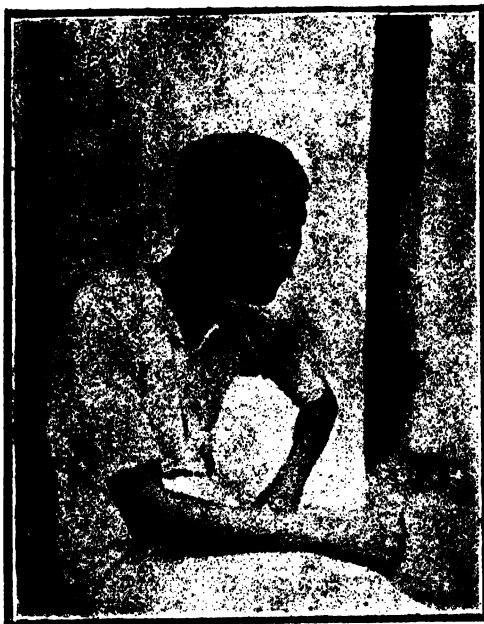
একবার হাতে পেলে হয়।

:কি ভীষণ ব্যাপার।

উঃ রে বাপ্‌রে! গেছি।

দশটী হাজার ঘোড়ায় দিয়েছি, হাঃ—হাঃ—হাঃ।

কি জান? একটু দুঃখু ভোলা।

আলোচনা

দেশের সমস্যা—

এতদিন ধরিয়া "সচিত্র শিশির" পাঠক পাঠিকাগণকে অনাবিল আনন্দ দান করিয়া তাঁহাদের স্নেহদৃষ্টি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপায় কলিকাতা ও মফঃস্বলে "সচিত্র শিশিরের" প্রসার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এখন দেশের সমস্যা ও তাহার সমাধানের কথা এই কাগজে আলোচনা করিলে তাহা বহু ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য "সচিত্র শিশিরের" আনন্দ দান নীতি অক্ষুন্ন রাখিয়া আমরা এখন হইতে দেশ বিদেশের কথা কিছু কিছু আলোচনা করিব।

নানা কারণে এখন এরূপ আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। দেশে এখন শক্তিশালী নেতা নাই। অথচ সাম্প্রদায়িক সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, স্বাস্থ্য সমস্যা, শ্রমজীবি সমস্যা প্রভৃতি বিশেষ জটিল আকারে দেখা দিয়াছে। সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যথাসাধ্য নিজ নিজ শক্তি দেশের কাজে নিয়োগ করা এখন প্রত্যেক নরনারীরই অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। নির্ব্বাচন আগত প্রায়—সেইজন্য অনেক স্বয়ংসিদ্ধ নেতাই এখন দেশের জন্য দরদ দেখাইতে ব্যগ্র হইবেন। তাঁহাদের দরদের মূল্যই বা কতখানি আর তাঁহারা যে আলো এখন লোকের চোখের কাছে ফেলিয়া তাহাদের চোখ ধাঁধিয়া দিতেছেন তাহা আলেয়া কি না সে বিষয় দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। এক এক রাজনৈতিক দল এক একখানি কাগজে প্রচার করিতেছেন যে তাঁহাদের দলই কেবলমাত্র ভারত-বাসীর হৃতস্বর্গ পুনরুদ্ধার করিতে পারে। এ সময়ে কোন দল বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিয়া নিরপেক্ষ ভাবে দেশের সমস্যাগুলি সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন মনে করিয়া এখন হইতে আমরা প্রতি সপ্তাহে "আলোচনা" শীর্ষক একটি করিয়া অধ্যায় যোগ করিয়া দিব। পাঠক পাঠিকাগণকে আশ্বাস দিতেছি দেশ বিদেশের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা সহসা গুরুমহাশয় হইয়া উঠিব না—তাঁহাদের সর্ব্বসাধারণেই—বৈঠকী ভাবেই এ আলোচনা চালাইব।

রাজনৈতিক দলাদলি—

বাঙ্গলা দেশটা নাকি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের দেশ। তাই এ দেশে যাঁরা লিখিয়ে ও বলিয়ে আছেন তাঁরা সকলেই এক একটা মত ব্যক্ত করে পথ নির্দ্দেশ করিতে চাহেন। আর সেইজন্যই আজ যাদের মধ্যে গলাগলি ভাব কালই তাঁদের মধ্যে দলাদলি আড়ি সুরু হয়। বাঙ্গলার স্বরাজ্যদলের থেকেই এর উদাহরণ পাওয়া যাইবে। স্বর্গীয় দেশবন্ধু যে দলকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অসীম শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, আজ সেই দল উপযুক্ত নেতার অভাবে ছোট বড় চারিটী খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেশবন্ধুর পরলোক গমনের পর হইতেই এই দলের মধ্যে ভিতরে ভিতরে ভাঙ্গন ধরিয়াছিল। এপ্রেল মাসের দাঙ্গার প্রচণ্ড ঢেউয়ের আঘাতে উহা চারিটী খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথম খণ্ড স্বরাজী মুসলমান—তাঁহারা এখন আর স্বরাজ্য দলে থাকিতে বড় একটা রাজী নহেন—নূতন মুসলমান দলে অনেকেই বোধ হয় যোগ দিবেন। দ্বিতীয় খণ্ড কর্ম্মীসঙ্ঘ নামে পরিচিত হইতেছেন—তাঁহাদের কার্য্যনীতি প্যাক্টের বিরোধিতা প্রকাশ পাইয়াছে—কাউন্সিলে তাঁহারা কি করিবেন বলেন নাই তৃতীয় খণ্ড ফরোয়ার্ডের ডিরেক্টার পঞ্চক—যাঁহারা স্বরাজ্যদলের রসদ জোগাইতেন ও যাঁহাদের হাতে এখনও স্বরাজ্যদলের অনেক টাকা আছে। আর চতুর্থ খণ্ড স্বরাজ্যদলের আইনতঃ নেতা শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয়ের অধীনে। বাঙ্গলার মফঃস্বলে যে সকল কংগ্রেস কমিটি আছে সেগুলি নাকি এখনও তাঁহার হাতে। তিনি সেইগুলির সাহায্যে নির্ব্বাচন ব্যাপারে কৃতকার্য্য হইবেন আশা রাখেন—আবার হিন্দু মুসলমানে মিলিত প্রবল স্বরাজ্যদল তাঁহার নেতৃত্বে কাউন্সিলে ধ্বংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ইহাই তাঁহার কল্পনা। কিন্তু এ কল্পনা কতটা কার্য্যকরী হইবে এবং কার্য্যকরী হইলেও দেশের কতটা উপকার হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

স্বরাজ্যদলের এই চারি খণ্ডের মধ্যে যা কিছু পার্থক্য, তা বেশীর ভাগ ব্যক্তিগত—মতগত নহে।

ইহা ছাড়া জাতীয় দল, স্বাধীন দল, পরস্পর সহযোগী দল ও বেদলের জমীদার প্রভৃতি আছেন। ইঁহারা কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিবেন—কোন কোন দল মন্ত্রীত্বের স্বপ্ন দেখিতেছেন। তাঁহারা কাউন্সিলে যাহা করিতে পারেন করুন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এখনও দেশের আসল কাজ জাতি গঠন। দেশের সকল লোক অন্ততঃ অধিকাংশ লোক যে পর্য্যন্ত দেশের অভাব অভিযোগ না উপলব্ধি করিতে পারে, সে পর্য্যন্ত স্বরাজ দাবী করা বৃথা। দেশের লোককে উদ্বুদ্ধ করিতে হইলে প্রথমতঃ দুইটী জিনিষের প্রয়োজন—শিক্ষা আর স্বাস্থ্য। দেশের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রসার হইলে এবং লোক সুস্থ সবল হইলে স্বরাজ আসিতে দেরী হইবে না। গ্রামে গ্রামে কাজ করিয়া জনমতকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের দাবীর অনুকূলে আনিতে হইবে। কেননা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এ দুইটী কাজ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। জনমত যখন প্রবল ভাবে এ দুইটী জিনিষ দাবী করিবে এবং দাবীর মূল্য স্বরূপ গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগীতা করিতে প্রস্তুত হইবে তখন গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্য রক্ষায় মনোযোগী হইবেন। জনমত যদি শিক্ষিত হইয়া ঐ দাবী পূরণ করাইয়া লইতে পারে, তখন স্বরাজ আন্দোলন সফল হইবে। স্বাধীনতার আলো একবার জ্বলিলে আর কখনও তাহা নিভিয়া যায় না ইহা সনাতন সত্য। সুতরাং ভারতবাসীর সম্মুখে মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি আজ যে স্বাধীনতার আলো জ্বালিয়াছেন তাহার আলোক দুর্গম ক্ষুরধারা পথ অতিক্রম করিয়া ভারতবাসী একদিন স্বাধীনতার স্বর্গে উপস্থিত হইবেই হইবে।

গরলে অমৃতে—

সমুদ্র মন্থনে যে অমৃত উঠিয়াছিল তাহা পান করিয়া দেবগণ বিলাসী হইয়াছিলেন আর উত্থিত হলাহল নিঃশেষে পান করিয়া মহাদেব নীলকণ্ঠরূপে ত্রিভুবন রক্ষা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতার সংঘর্ষে হিন্দু মুসলমানের কয়েকজন শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোক কয়েকটী চাকুরী পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। হয়তো একদল তাঁহাদের কাম্য চাকুরীলোকে উপস্থিত হইয়া দেবামৃত পান করিতে পাইবেন। কিন্তু দেশের জনসাধারণ যাহাতে এই সংঘর্ষোত্থিত গরল হজম করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে পারে তাহার চেষ্টা করাই বিশেষ কর্ত্তব্য। হিন্দু ও মুসলমান নেতাগণ যদি নিজ নিজ সম্প্রদায়কে সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারেন তবেই এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সমুদ্র মন্থনের ন্যায় বিশ্বের হিতকারী হইবে। উভয় সম্প্রদায়ই তো সংগঠনের অনেক কথা বলিতেছেন। তাঁহাদের কথা যদি কাজে পরিণত হয়, তখন সকল সাম্প্রদায়িক বিরোধ আপনিই ঘুচিয়া যাইবে। দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত হইলে তাহাদের মধ্যে মিলন বন্ধন স্থাপিত হইতে দেরী হইবে না। ইংরাজীতে বলে out of evil cometh good, মন্দ হইতেই ভালোর উৎপত্তি। ভারতের ভাগ্য বিধাতা আমাদের জন্য এই প্রবাদের সার্থকতা বিধান করুন!

সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ—

দাক্ষিণাত্যের দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা ও উত্তর ভারতের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের মুসলমানগণ এখনও হিন্দুর সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া কংগ্রেসের কার্য্য নীতিকে সফল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক—শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার মহোদয়কে দাক্ষিণাত্যের মুসলমানগণ নানা স্থানে অভিনন্দিত করিতেছেন এবং কংগ্রেসই ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাহা স্বীকার করিতেছেন। বাঙ্গলা দেশে এমন মিলন কি সম্ভব হইবে না?

মিলন প্রসঙ্গে মালব্যজী ও ডাঃ গৌর

হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মিলন স্থাপনের জন্য মালব্যজী তিনটী উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (১) হিন্দু মুসলমানের মিলিত রক্ষীদল (২) হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের ঘন ঘন মিলন বৈঠকে আলোচনা (৩) উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামার বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য সালিসী বৈঠক

স্থাপন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ মিলন বৈঠকাদি বিশেষ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। ডাঃ গৌর বলিয়াছেন যে কোন প্যাক্টের অবতারণা না করিয়াও হিন্দুরা মুসলমানদের হইয়া কথা না বলিয়া নিজেদের কার্য্যপদ্ধতি ঠিক করুন আর মুসলমানেরাও সেইরূপ করুন, তাহা হইলে উভয় সম্প্রদায়ই শক্তিশালী ও দেশের হিতকারী হইতে পারিবেন। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তাহাতে দূরীভূত না হইলেও মন্দীভূত হইবে। আমাদেরও মনে হয় মিলনের গোঁজামিল না দিয়া সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়কে উন্নত করিতে প্রয়াসী হইলে এই সঙ্কটময় অবস্থায় কিছু কাজ হইতে পারে।

ভারতীয় শ্রমিকের উন্নতি—

জেনেভার শ্রমিক কনফারেন্সের অষ্টম অধিবেশনে লালা লাজপৎ রায় বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত স্থানেও করদ রাজ্যে বাধ্যতামূলক শ্রম প্রচলিত আছে। আর ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত ভারতে শ্রমিকদের মধ্যে দ্রুত উন্নতি সাধন করিবার জন্য কোন চেষ্টা হইতেছে না। স্যার অতুল চ্যাটার্জ্জি মহোদয় লালাজীর এই দুইটী কথারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি জোর করিয়' বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ অধিকারে কোন ভারতবাসীকে জোর করিয়া কাজ করান হয় না এবং ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থার খুব দ্রুত উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে। সুদূরে বসিয়া দেশের সম্বন্ধে গোলাপী স্বপ্ন যাঁহারা দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাছেন, তাঁহাদের শান্তি নষ্ট করিতে চাহি না। কিন্তু দেশের শ্রমিকেরা যে সত্যই কেমন অবস্থায় আছে তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতাও যে তাহাদের নাই !

লালাজী জেনেভায় আশ্বাস দিয়াছেন যে তিনি শীঘ্রই আন্দোলন করিয়া ভারতীয় নারীর ভূগর্ভে কাজ করা বন্ধ করিবেন। তাঁহার আন্দোলন সফল হইলে শ্রমিকদের মাতা সুস্থ ও সবল হইবে, এবং জাতিকে বলিষ্ঠ শ্রমিক উপহার দিতে পারিবে।

বাঙ্গালীর ইংরাজী জ্ঞান—

দেড়শত বৎসর ধরিয়া আমরা ইংরাজী শিখিবার জন্য জীবনীশক্তির অর্দ্ধেক অংশ নিঃশেষ করিয়া দিয়াছি—কিন্তু তথাপি Baboo Euglish অপবাদ আমাদের ঘুঁচে নাই। ইংরাজী পুঁথিপত্র পড়িয়া তাহার মানে বুঝিতে পারিলেই জ্ঞান আহরণ করা বা কাজ চালান যায়। ইংরাজী ভাষার লায়েক করিবার আশাতেই এতদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা ইংরাজীর সাহায্যে গৃহীত হইত। কিন্তু সে লায়েকী লাভ করিতে আমরা পারি নাই। তাহাতে লজ্জার কথা কিছু নাই। এখন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজী ছাড়া সকল বিষয় পড়ান হইবে। Howlesএর ন্যায় পাকা শিক্ষাবিদ্ ত স্বীকার করিয়াছেন যে বাঙ্গলা স্কুল হইতে যে সকল ছাত্র আসে তাহাদের বিষয় জ্ঞান ইংরাজী স্কুলের ছাত্রদের অপেক্ষা বেশী হয়। আশা করা যায় বাঙ্গলার সাহায্যে অধ্যয়ন অধ্যাপনার ফলে একদিকে যেমন সহজে ছাত্রেরা জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে অন্যদিকে তেমনি দেশের জনসাধারণের সহিত তাহাদের অন্তরের যোগ সূত্র বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে না। বাঙ্গলা ভাষায় লেখাপড়া শিখাইলে আর কিছু হউক না হউক শিক্ষিতগণের কথাবার্ত্তা দেশে লোক বুঝিতে পারিবে।

পি, আর, এস্ দল—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট আলোচনা করিতে যাইয়া হিসাব বিভাগের সভাপতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় সিনেট-সভায় বলিয়াছেন যে বাঙ্গলার গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রতি অবিশ্বাস ও অনাস্থার ভাব পোষণ করেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "যদি বর্ত্তমান সদস্যগণ বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে অক্ষম হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া হউক এবং তাহাদের স্থলে সরকার যাহা-দিগকে বিশ্বাস করিতে পারেন এমন সদস্য নিয়োগ করুন। এই অনাস্থা এবং অবিশ্বাসকে যেন কিছুতেই জিয়াইয়া না রাখা হয়।" ষ্টেটস্‌ম্যানের রাজনৈতিক মন্তব্য লেখক মহাশয় ডাঃ রায়ের এই উদার প্রস্তাবের উপর কটাক্ষ করিয়া

গল্প শেষ হইলে অরুণ কহিল—আজকে একদম না পড়াটা ভাল দেখায় না—একটু ট্রান্‌স্লেশন্ কর লিলি।

লিলি রাজী হইল। খানিকটা ট্রান্‌স্লেসন্ করিতে দিয়া অরুণ কতরকম রঙ্গীন আশার জাল বুনিতে লাগিল। হঠাৎ সামনের শেল্‌ফে একখানা চক্‌চকে বাঁধানো খাতা দেখিয়া সে সেখানি তুলিয়া লইল। মরক্কোমণ্ডিত সুদৃশ্য চমৎকার খাতাখানির উপরে সোনার জলে লেখা—

'কবিতার খাতা—শ্রীমতী অণিমাসুন্দরী রায়—'

খাতাখানি যে কাহার তা অরুণ বুঝিল কেন না ঐ সুমিষ্ট নামটীর সহিত সে অনেকদিন হইতেই পরিচিত। মধুময় ঐ নামটীতে কি মধুই না সঞ্চিত আছে রে! এ বিষয়ে লিলিকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া খাতা খুলিয়া পড়িতে বসিল। কি সুন্দর কবিতাগুলি! যেমন ভাব, তেমনি ছন্দ—তবে প্রত্যেকটীতেই যেন একটা নিরাশ প্রেমের একটানা সুর! অরুণ পড়িতে পড়িতে মনে মনে হাসিল। কি ক্ষণেই যে এ বাটীতে পা দিয়াছিল। কবিতাগুলি পড়িয়া তাহার একটা কথা মনে হইল - 'বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা।'

শেষের কবিতাগুলি কাহাকে উদ্দেশ করিয়া লেখা হইয়াছে তাহা সে বুঝিল। এবং ইহাও বুঝিল কি উদ্দেশে কবিতার খাতাখানি ইচ্ছাপূর্ব্বক এ ঘরে রাখা হইয়াছে।

খাতার অনেকগুলি পাতা সাদা ছিল—সেগুলি উল্টাইতে গিয়া শেষ পৃষ্ঠায় মলাটের ভিতর দিকে একটী বিশিষ্ট স্থানে অরুণের চোখ পড়িয়া একেবারে তথায় সন্নিবদ্ধ হইয়া গেল। পাতাটীর তিন চারি স্থানে 'অরুণ' 'Orun coomer' প্রভৃতি বাংলায় ও ইংরাজীতে ছাপার হরফে কালিতে যত্নপূর্ব্বক অঙ্কিত হইয়াছে। এবং সেগুলি আবার একটী সুবৃহৎ 'অ' দিয়া পরিপূর্ণ ভাবে বেষ্টন করা হইয়াছে। দেখিয়া অরুণের রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। ইস্! কী অর্থব্যঞ্জক স্পষ্ট আত্মস্বীকার!

লিলির ট্রান্‌স্লেশন্ হইয়া গিয়াছিল। অরুণ খাতাখানি মুড়িয়া তাড়াতাড়ি গোপনে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া ট্রান্‌স্লেশন্ সংশোধন করিতে লাগিল।

সেদিন বাড়ী ফিরিয়া অরুণ দেখিল—কিরণ রান্নাবান্না সারিয়া বিছানায় শুইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল—শুয়ে আছ যে বড়?

শরীরটা বড় খারাপ ঠেকছে—উঠতে ইচ্ছে করছে না।

মোটে ছাতে টাতে উঠবে না, হাওয়া বাতাস গায়ে লাগাবে না—তাই ওরকম বোধ হচ্ছে ও কিছু নয়—বলে অরুণ মুখহাত পা ধুইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

কিরণের চোখ ফাটিয়া জল আসিল। এই কি তার সেই আগেকার স্বামী? সামান্য মাথা ধরিলে পূর্ব্বে যে একটা শক্ত অসুখ কল্পনা করিয়া সারারাত বসিয়া হাওয়া করিয়াছে—আজ তার একবার মাথায় হাত দিয়া দেখিবারও অবসর ঘটিল না। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কিরণ উঠিয়া বসিল।

কয়দিন জ্বরভাব গিয়া আজকে কিরণের জ্বরটা ভাল করেই হইয়াছিল। সে তাহা মুখ ফুটিয়া স্বামীর কাছে বলিতে পারিল না। জ্বরের উপরই খাটাখাটি করিয়া ভাত খাইয়া আসিয়া শুইল।

রাত্রে অরুণের হাতখানা কিরণের গায়ে পড়িতে অরুণের মনে হইল যেন তার গাটা বড় গরম। কিন্তু তখন তার মন কল্পনার রঙ্গীন ফানুসে চড়িয়া ভাসিয়া চলিয়াছে—অতটা খেয়াল করিবার তাহার অবসর ঘটিল না।

পরদিন পড়াইতে গিয়া অরুণ লিলিকে Task করিতে দিয়া কালিকার মত কবিতার খাতাখানি তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনোসংযোগ করিল। দেখিল তাহাতে আর একটী নূতন প্রণয়ের কবিতা সংযোজিত হইয়াছে। যতদূর নিজেকে প্রকাশ করিতে পারা যায় এবারকার কবিতাটীতে তাহা করা হইয়াছে। খাতাখানিতে আর একটী নূতন অলঙ্কার দান করা হইয়াছে—সেটি হইতেছে লেখিকার একখানি চমৎকার ফটো—প্রথম পৃষ্ঠাতেই তা আটা দিয়ে জোড়া। ফটোখানির দিকে চাহিয়া অরুণের দুই চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আহা কি টানা টানা চক্ষুদুটি! ঐ যে মরাল-গ্রীবার পাশে কানের দুলটী ঝক্‌মক্ করিতেছে—তাহারই পাশে ঐ নিটোল আপেলের মত লাজরক্তিম গণ্ডস্থল—কালো কুঞ্চিত কেশদামে আচ্ছাদিত ঐ ক্ষুদ্র সুন্দর কপোলটী—আর সারা অঙ্গের উপর যৌবন জোয়ারের উচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ—দেখিবার সামগ্রী বটে! যেন রূপের রাণী প্রতিমাখানি—ছবিটী! অরুণ

দেখিতে দেখিতে মাতাল হইয়া উঠিল—সে অতীত বর্ত্তমান সকল ভুলিল—কিরণকে ভুলিল সমস্ত বিশ্ব তাহার চোখে লুপ্ত হইয়া গেল—জাগিয়া রহিল শুধু একখানি মুখ। অতি গোপনে রূপের নেশায় মাতাল হইয়া সে নিজের ওষ্ঠ দিয়া ফটোখানি স্পর্শ করিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল!

এই রকম ভাবে কয়দিন অবিশ্রাম প্রণয়গীতির গুঞ্জনে অরুণের প্রাণ উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছিল—তাহার পর একদিন যখন সে সুবাসিত রঙীন খামে প্রণয়পত্র পাইল—

'কথা কও কথা কও
হৃদয় পরাণ হরণ করিয়া
কেন শুধু চেয়ে রও'—

তখন তাহার অকবিচিত্তেও কবিত্বের এক পুলক-স্পর্শ জাগিয়া উঠিল। কাব্যসাগর মন্থন করিয়া সে একদিন নিজেকে প্রকাশ করিয়া ফেলিল—

'যেদিন হইতে তোমারে হেরেছি
মন প্রাণ সব দিয়ে যে ফেলেছি
হৃদয় মাঝারে আঁকিয়া রেখেছি
ছবি তোমারি, ছবি তোমারি—'

ইত্যাদি নানাভাবে হৃদয়াবেগ ঢালিয়া তলায় সহি করিল—
'রূপমুগ্ধ প্রণয়াকাঙ্ক্ষী—অরুণ।'

এদিকে কিরণের মন স্বামীর যে অনাদর ও অনাসক্ত ঔদাস্তের সংস্পর্শে দিনের পর দিন বেদনা ও অব্যক্ত যন্ত্রণায় লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। আগে প্রতিদিনই তাহার একটু একটু জ্বর হইত এখন সেটা বেশ তীব্র আকার ধারণ করিল। অরুণ তখন ভাবে মত্ত—কিরণের এ অসুখের কথা জানিতেও পারিল না। কিরণও ভাবিল—থাক্ যে ইচ্ছা করিয়া জানিয়াও জানিতে চাহিল না তাহাকে আর বলিয়া লাভ কি? নিজের অসুখের কথা তাহাকে কখনও মুখ ফুটিয়া বলিতে হয় নাই—অরুণ নিজেই এতকাল তাহা খোঁজ করিয়া জানিয়া তত্ত্বাবধান করিয়াছে। আজ সেই বিমুখ স্বামীকে ডাক করিয়া নিজ হইতে সে বলিবে—'ওগো তোমার অনাদরে আমার শরীর মন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, একবার চাহিয়া দেখ? না এতখানি যাচিয়া কাঁদিয়া সোহাগ সে পাইতে চাহে না। ইহাতে তাহার যদি মরণও হয় ত সে মরণেও সুখ আছে। অভিমানে তাহার হৃদয় ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

কত নিস্তব্ধ দুপুর সে ভারাক্রান্ত পীড়িত হৃদয় লইয়া উপাধানতল অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। হায় কি হীন দশাতেই তাহাকে আজ ফেলিয়াছ ভগবান! এতই যদি তোমার মনে ছিল তবে সে নির্ম্মল সুখের আলো কেন দেখাইয়াছিলে? দেখাইয়াছিলে ত আবার ঝটিকার প্রবল বাত্যায় সে আলো নিভাইয়া সমস্ত বিশ্ব তাহার চক্ষে এমন মসীরঞ্জিত করিয়া দিলে কেন? একি পরীক্ষা দয়াময়?

জীবনের ভার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। আর পারা যায় না। অশ্রুজলে কাতরকণ্ঠে সে প্রার্থনা করিল—আমার এ ঘৃণাদৃত জীবনের এইখানেই পরিসমাপ্তি হোক্—এইটুকু করুণা শুধু তুমি কর ঠাকুর!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এমনি করিয়া যখন দিন কাটিতেছিল তখন একটী বিশেষ ঘটনা অরুণের মনোরাজ্যে তুমুল কাণ্ড ঘটাইয়া তাহার জীবনের পথ একেবারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল।

সেদিন কি একটা উপলক্ষে দুপুর বেলাতেই অফিসের ছুটি হইয়া গেল। অফিস হইতে বাহির হইয়া অরুণের তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতে ভাল লাগিল না। কাল সন্ধ্যার সময় ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে সে বাটীর বাহির হইতে পারে নাই—পড়াইতেও যাওয়া হয় নাই। তাই আজ একটু সকাল সকাল যাওয়া দরকার। কিন্তু হাজার তাড়াতাড়ি করিলেও পাঁচটার আগে যাওয়া যায় না। এখন ত সবে দুটো। এই তিন ঘণ্টা সে কি করিবে?

রাস্তায় নামিয়া অরুণ ভাবিল—এখনি গিয়া এ তিনঘণ্টা লিলির সহিত গল্প করিয়া কাটাইলে কেমন হয়? ছিঃ সে ভারী লজ্জা করিবে। সকলে ভাবিবেই বা কি? আবার তখনি মনে হইল, আর ভাবিলেই বা তাহার ত ভারী বয়ে' গেল। যে জানিবার সে ত জানিবে কতখানি অধীর আগ্রহে একদিনের পিপাসিত হৃদয় লইয়া সে ছুটিয়া আসিয়াছে! আহা খাতাখানিতে না জানি একদিনেই প্রণয়গুঞ্জনের কত

মধুই মা সজ্জিত হইয়াছে। হয়ত বা এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ দুপুরে তাহারই সেই চেয়ারটিতে বসিয়া মানসী প্রিয়া মনের গোপন কথাটী তাহারি উদ্দেশে কালির আঁচড়ে প্রকাশ করিতেছে। ভাবে বিভোর অরুণের মন শ্যামবাজারের একটী বিশিষ্ট গৃহের প্রতি উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিল। রঙ্গীন চিন্তাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে কখন যে সেই গৃহেরই দ্বারের সামনে আসিয়া সে উপস্থিত হইল তাহা খেয়ালই হয় নাই।

অসময়ে মাষ্টার মশাইকে দেখিয়া বাহিরের দ্বাররক্ষী আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া রহিল। অরুণ সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া চিরপ্রথামত দালান অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া বরাবর উপরে উঠিয়া গেল। সামনে দেখিল দ্বার বন্ধ। এ সময়ে অরুণ কখনও আসে নাই কাজেই এ সময়ে ঘরখানি যে বাড়ীর যে কোন লোকেরই দরকারে আসিতে পারে তাহা তার মনেও হয় নাই।

লিলি এ সময়ে পড়ে না এ ঘরেও বোধ হয় থাকে না। অন্য কোন ব্যক্তি হয়ত ঘরে দিবানিদ্রা দিতেছে অথবা কেহ হয়ত অন্য কোন কার্য্যে ব্যস্ত। দ্বারে টোকা দিয়া ঘরের অধিকারীকে এ হেন সময়ে বিরক্ত করা—তাও বিনা কারণে না: সে ভদ্রতা বিরুদ্ধ একেবারে অসম্ভব!

অরুণের ভারী লজ্জা করিতে লাগিল। মূর্খের মত খেয়ালের বশে অকারণে সে বৃথাই এতখানি ছুটিয়া আসিয়াছে। হায় রে!

অরুণ ফিরিল—তারপর দুএকপা চলিতেই কোণের খোলা জানলা দিয়া হঠাৎ তাহার ঘরের ভিতর দৃষ্টি পড়িল। সামনে অকস্মাৎ সর্প দেখিলে পথিক যেমন চমকাইয়া উঠে সেও ঘরের ভিতরে তাকাইয়া তেমনি স্তম্ভিত হইয়া গেল। অরুণ দেখিল ওধারের জানলায় দাঁড়াইয়া একটী যুবক এক হাতে তাহারই আকাঙ্ক্ষিতা দয়িতার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া অপর হস্তে দূরে রাস্তায় কোন জিনিসের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতেছে এবং দুইজনের নীরব অর্থপূর্ণ হাসিতে গৃহ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। দেখিয়া অরুণের চোখ পুড়িয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী যেন তাহার পায়ের তলায় ভীষণ বেগে ঘুরিয়া উঠিল।

সে যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল তেমনি নিঃশব্দে টলিতে টলিতে সকলের অগোচরে সেখান ত্যাগ করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। চাকরেরা তখন অন্য কার্য্যে ব্যস্ত—অরুণের প্রতি তাহাদের লক্ষ্য পড়িল না। পূর্ব্বকথিত দ্বাররক্ষকও ঘরের ভিতর পত্রিকা সেবনে বোধ হয় তখন তৎপর নহিলে অরুণকে তখনি ফিরিতে দেখিলে সে নিশ্চয় কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত।

খুব বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া অরুণ যখন রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার বুকে অসহ্য রকমের একটা ঝড় বহিতেছিল। একপা একপা করিয়া টলিতে টলিতে পাশেই এক পার্কের ভিতর ঢুকিয়া একটা খালি বেঞ্চিতে বসিয়া পড়িল।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তখন তাঁর প্রখর কিরণে অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিলেন। চারিদিক খাঁ খাঁ করিতেছে। রৌদ্রে অরুণের মাথা ফাটিয়া যাইতে লাগিল—তাহার সেদিকে লক্ষ্যই ছিল না। সমস্ত হৃদয়টীতে তাহার তখন জ্বালা ধরিয়াছিল। এই তাহার আকাঙ্ক্ষিতা প্রণয়িণী? এরি জন্য সে তাহার সর্ব্বস্ব তুচ্ছ করিয়া সতীসাধ্বী কিরণকে উপেক্ষা করিয়া আলেয়ার পানে ছুটিয়াছে? রাগে, ঘৃণায়, ধিক্কারে তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া একটা আগুনের শিখা হু হু শব্দে জ্বলিতে লাগিল।

তাহার একে একে সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কি সুখের সংসারই না ছিল আগে। সে সুখে আগুন জ্বালাইয়া সে কি-ই না করিতে বসিয়াছিল। আদরিণী, অভিমানিনী কিরণ। তাহার কোমল অন্তঃকরণে নিজের পৈশাচিক ব্যবহারে কি ক্ষতেরই না সে সৃষ্টি করিয়াছে? অনুতাপে তাহার মন পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

সারা অপরাহ্নের তীক্ষ্ণ রৌদ্র তাহার মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গেল। তাহার মন যখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইল তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

শান্ত হইয়া তাহার মন কিরণের প্রতি ছুটিয়া চলিল। কয়দিনেই সে লক্ষ্য করিয়াছিল কিরণের শরীর অসুস্থ। কিন্তু পাষাণ সে, তাই একবারও খোঁজ লয় নাই, একটী সামান্য মুখের কথায় অবধি জিজ্ঞাসা করে নাই, সে কেমন আছে। হায়! কি মোহের আবর্ত্তে পড়িয়াই সে এতদিন অন্ধ হইয়াছিল।

বাড়ী ফিরিয়া অরুণ দেখিল কিরণ বিছানায় জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। কপালে হাত দিয়া দেখিল—গা পুড়িয়া যাইতেছে। সে তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া এভিকলোন বাহির করিয়া কিরণের মাথায় জলপটি লাগাইয়া দিল—তাহার পর তার শিয়রে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল। রাত হইয়া গিয়াছিল। অফিসে খাটুনির পর সমস্ত দিন রৌদ্রে পথচারণে তাহার সমস্ত শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তবু আজ তাহার খাওয়ার কথা মনে রহিল না।

কপোলের উপর বিস্রস্ত কুন্তল বাম হাত দিয়া সরাইতে সরাইতে অরুণ দেখিল, কয়দিনে কিরণ কী কাহিলই না হইয়া গিয়াছে। চিন্তায় চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে! পুষ্প কোমল মুখখানি কয়দিনের জ্বরে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে! দেখিয়া অনুতাপে অরুণের চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল।

এ অবস্থায় কিরণকে একা রাখিয়া ডাক্তার ডাকিবার অবধি আজ আর অরুণের সাহস হইল না। গৃহ চিকিৎসার বাক্স হইতে একফোঁটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ জলে মিশাইয়া সে অনেক কষ্টে কিরণের মুখের ভিতর ঢালিয়া দিল। তাহার পর আবার পাখা লইয়া বসিল।

অনেক রাত্রে কিরণ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া বলিল—মা, মাগো!

অরুণ তাড়াতাড়ি তাহার মুখের কাছে মুখ আনিয়া ডাকিল—কিরণ!

কিরণ জ্বর বিকৃতকণ্ঠে বলিল—কে তুমি? এসেছ, ওগো এসেছ? আঃ!

অরুণের বুকখানা কে যেন দুমড়াইয়া পিষিয়া দিল। সে ভগ্নকণ্ঠে বলিল—রাণু, সোণামনি আমার, কিছু কষ্ট হচ্ছে কি?

কষ্ট, হাঁ এই বুকের কাছটা—কিরণ আর বলিতে পারিল না, আবার অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

যখন জ্ঞান হইল তখন সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া কহিল—তুমি জেগে বসে' আমায় হাওয়া করছ? বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, রাগ কোরো না, চল খাবে চল।

অরুণ আর পারিল না, তাহার দু' চক্ষু দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। সে দুই হাতে কিরণকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল—বুকের ধন! এবারটার মত আমায় ক্ষমা করো, আর তোমায় অনাদর করব না রাণু আমার!

কিরণের জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে স্বামীর বুকে মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল। আঃ কান্নাতে এত তৃপ্তিও ছিল রে।

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অরুণ কিরণের মাথায় জলপটি দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। কিরণের শত বারণও সে গ্রাহ্য করিল না।

শেষ রাত্রে ঠাণ্ডা হাওয়ায় অরুণের ক্লান্ত চক্ষু তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল—তন্দ্রাঘোরে সে স্বপ্ন দেখিল—যেন এক অন্ধকারময় রাজ্যে সে উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই, একটী আলোকের বিন্দু অবধি তথায় চোখে পড়ে না। সেই সূচীভেদ্য আঁধারের মাঝে এক বিরাটকায় দৈত্য যেন তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেছে।...পিছন হইতে আগুনের পোষাক পরা এক হাস্যময়ী যুবতী যেন তার একহাত ধরিয়া টানিয়া বলিতেছে—এস, আমার কাছে এস। সে স্পর্শে তাহার হাত যেন আগুনে ঝলসাইয়া গিয়াছে।...যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিতে চাহে স্বর ফুটে না...এমন সময় অদূরে যেন এক ক্ষুদ্র আলোর রেখা চোখে পড়িল। ক্রমশঃই সে আলো নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। সেই আলোকের মধ্য হইতে এক অপরূপ লাবণ্যময়ী নারীমূর্ত্তি বাহির হইল। অরুণ চিনিল সে কিরণ। সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কিরণ আমাকে বাঁচাও।...তাহার চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে দৈত্য ও যুবতী অন্তর্হিত হইল। অরুণের তন্দ্রাও ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখ চাহিয়া অরুণ দেখিল ভোরের আলো জানলা পথে প্রবেশ করিতেছে। হাত হইতে তার পাখাখানা ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছে। কিরণ তখনও নিদ্রামগ্ন।

সে পাখাখানা কুড়াইয়া লইয়া আবার বাতাস করিতে বসিল।

*　　*　　*　　*

এই ঘটনার পাঁচ সাতদিন পরে কিরণ কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে অরুণ অফিসে ছুটির দরখাস্ত করিয়া টিউসনি ছাড়িয়া দিয়া কিরণকে লইয়া পশ্চিম যাত্রা করিল। সরল শিশু লিলির জন্য তাহার একটু কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সে কষ্ট সে গ্রাহ্য করিল না। স্বামী-স্ত্রীর যে নিবিড় মিলনের মাঝখানে কিছুদিন বিচ্ছেদ পড়িয়াছিল আজ তাহা অনাবিল প্রেমের ধারায় অটুট ও অধিকতর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

সমাপ্ত

যৌবন নদীর জোয়ার

[শ্রীজিতেন দাশগুপ্ত]

—এক—

বেলা তখন প্রায় বারোটা।

বরানগর 'কুটিঘাটা' ফেরি ষ্টেশনের নিকটে একটি একতলা বাড়ীতে প্রভা অর্গান বাজিয়ে গান ধরেছিল।

"রাত্রি এসে যেথায় মেশে
দিনের পারাবারে,
তোমায় আমায় দেখা হোল
সেই মোহানার ধারে।
সেইখানেতে সাদায় কালোয়
মিলে গেছে আঁধার আলোয়
সেইখানেতে ঢেউ ছুটেছে
এপারে ঐপারে।"

প্রভা গান গেয়ে কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। তার কেবলি মনে হচ্ছিল—গানের তাল যেন ঠিক হচ্ছে না। গানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করে গাইবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টা করছিল—কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোথায় যে খাৎকি রয়েছে—তা ঠিক ধরতে পারছিল না। গানটি সে আর একবার গাইবার চেষ্টা করল—কিন্তু এবারও সে সন্তুষ্ট হতে পারল না। অগত্যা বিরক্ত হয়ে সেখান থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত ব্যাকুল আগ্রহে যেন কার প্রতীক্ষা করল—কিন্তু রাস্তার কোনদিকেই কাউকে দেখতে পেল না। আবার ঘরের ভিতর ফিরে এল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করে বেড়াল—কী একটা কঠিন বিষয় যেন সে ভেবে নিল। আবার একবার বাইরে গেল—রাস্তার দুইদিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করল, কিন্তু এবারও কাউকে দেখতে পেল না। তখন সে ফিরে এসে অর্গানটা নিয়ে আবার গান ধরে দিল।

"নিতল নীল নীরব মাঝে
বাজল গভীর বাণী,
নিকষেতে উঠল ফুটে—
সোনার রেখাখানি।
মুখের পানে তাকাতে যাই,
দেখি দেখি দেখতে না পাই,
স্বপন সাথে জড়িয়ে জাগা
কাঁদি আকুল ধারে।"

গান শেষ হতেই তার ছোট বোন বিভা এসে বলল,—দিদি, আমাকে সেদিন যে জিনিষটা দিতে চেয়েছিলে তা এক্ষুণি দাও, ও বাড়ীর প্রকাশদা' দেখতে চেয়েছে।

প্রভা বলল—কি জিনিসরে বিভা?

বিভা বলল—এখন আর মনে থাকবে কেন? সেই যে সেদিন ট্রাঙ্ক গুছোবার সময়—

কি? সাবানের বাক্স?

হ্যা— সাবানের বাক্স—উনি যেন কিছুই জানেন না। সেই যে নতুনদার ফটোখানা। তুমি সেদিন বল্লে না যে আমায় দেবে?

প্রভা বলল—তা প্রকাশদা' সে ফটো দেখে কি করবে? সে তো আর নতুনদা'কে চেনে না।

বিভা বলল—চেনে বৈকি। আমি তাকে সব কথা বলেছি। নতুনদা' তোমায় গান শেখায়—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—প্রত্যেক রবিবারে——

প্রভা বাধা দিয়ে বলল—তুই তার কাছে সে সব কথা বলতে গেছিস কেনরে বোকা মেয়ে?

বিভা বলল—বারে, দাদাবাবুর কথা বুঝি কাকেও বলতে নেই?

প্রভার মুখটা হঠাৎ রক্তজবার মত লাল হয়ে উঠল। বিভার পিঠের উপরে সজোরে এক কিল বসিয়ে দিয়ে সে বলে উঠল—লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, তোকে আমি আজ থেকে কিছুই দেব না। ভালও বাসব না।

কিল খেয়ে বিভা একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। দিদির হঠাৎ এই রাগের কারণটা যে কি—তা সে ঠিক ধরতে পারল না। সে কাঁদতে কাঁদতে চীৎকার করে বলল—আজ তো রবিবার। আজ নতুনদা' এলে তাকে আমি সব কথা বলে দেব। তখন দেখবে মজা।

প্রভা মহা বিপদে পড়ল। নতুনদার কাছে এ সব কথা বললে সেটা মহা লজ্জার কথা হবে। সে তখন তাড়াতাড়ি বিভাকে নানারকম ভাবে বুঝিয়ে, আদর করে, প্রলোভন দেখিয়ে নিরস্ত করবার চেষ্টা করতে লাগল।

— দুই —

প্রভাদের অবস্থা তত ভাল নয়। প্রভার বাবা যোগেন বাবু কলকাতার কোনও সওদাগরী অফিসে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে চাকরী করেন। বরানগরের বাসা যোগেনবাবুর পৈতৃক সম্পত্তি—সুতরাং তার আর বাসা ভাড়া লাগে না। কোন রকমে ঐ চল্লিশটি টাকার উপর নির্ভর করে সংসার চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি নিজে নেহাৎ ভালমানুষ - কোন কিছুর ধারই তিনি ধারতে চান না। সংসারের সব ভার তার স্ত্রী মানদা সুন্দরীর উপর। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যোগেনবাবু কোনদিনই কোন কথা বলেন না।

মানদাসুন্দরীর নভেল পড়বার ভয়ানক ঝোঁক ছেলে বেলা থেকে তিনি বাঙ্গলার যাবতীয় উপন্যাস পড়ে এসেছেন। বটতলার উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র কোন বই পড়তেই তার বাকী নেই।

ছেলেবেলা থেকে নভেল পড়তে পড়তে তিনিও অনেকটা নভেলি ধরণের হয়ে গেছেন তার হাব-ভাব, কথা-বার্ত্তা অনেকটা নভেলি গোছের। নভেলি নায়িকার মত প্রেম করে তিনি বিয়ে করতে পারেন নি বলে তার মনে একটা ভীষণ আপশোষ রয়ে গেছে। সেই আপশোষ মেটাবার জন্য তিনি তার মেয়েদের নভেলি নায়িকা করে গড়ে তুলেছিলেন।

তার দুই মেয়ে। বড় মেয়ে প্রভার বয়স পনেরো, আর ছোট মেয়ে বিভার বয়স নয়। নিজের যথেষ্ট ইচ্ছা থাকলেও অর্থাভাবে মেয়েদের স্কুলে পড়াতে পারেন নি। প্রভা বাড়ীতে মোটামুটি বাঙ্গলা লেখাপড়া একটু শিখেছিল। মানদাসুন্দরীর চেষ্টায় সূচিকর্ম্ম ও গৃহস্থালী কাজ সে বেশ শিখে নিয়েছিল। সম্প্রতি গান শিখতে আরম্ভ করেছে। প্রভাকে সুন্দরী বলা চলে না—কারণ তার গায়ের রং ছিল শ্যামবর্ণ। তবে মুখশ্রী, চোক, নাক, গঠন দেখে যদি সৌন্দর্য্যের বিচার করতে হয়, তাহলে সে সুন্দরী।

মায়ের দেখাদেখি প্রভারও উপন্যাস পড়বার দিকে খুব ঝোঁক হয়ে উঠেছিল। সেও ভাল মন্দ প্রায় একশ', দেড়শ' উপন্যাস পড়ে শেষ করে ফেলেছিল। প্রভার তখন সেই বয়স যে বয়সে মানুষ সমস্ত দুনিয়াটাকে রঙিন দেখে। চোখের সামনে যা দেখে—তার মাঝেই একটা প্রেমের আস্বাদ উপভোগ করতে চায়। দুনিয়ার সমস্ত দুঃখ কষ্ট উপেক্ষা করে মানুষ তখন অনাবিল সৌন্দর্য্যকে শুধু আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করে। প্রভার হৃদয়ে তখন যৌবনের বান ডেকেছে। দুনিয়ার সবটাকেই সে রঙিন দেখতে আরম্ভ করেছে। তারপর উপন্যাস পড়তে পড়তে তার ভিতরের সেই অগ্নি আরও দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছিল। সে উপন্যাসের নায়িকাদের মত প্রেম করবার জন্য ছটফট করে বেড়াচ্ছিল।

হঠাৎ তার একটা সুবিধা ঘটে গেল। তিনমাস পূর্ব্বে তার পিসতুতো ভাই অমল গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে চাকরীর খোঁজে মামার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোল। কলকাতায় অমলের দুটি বন্ধু ছিল—সুচিত ও নির্ম্মল। তাদের দুজনেরই বাড়ী অমলদের গ্রামে। সুচিতের বাবা কলকাতার কোনও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী—সুতরাং সুচিতেরা কলকাতাই থাকে। সুচিত মেডিকেল কলেজে পড়ছে। নির্ম্মল গ্রামের স্কুলের পড়া শেষ করে Bengal Technical Institutionএ পড়বার জন্য এক বছর হোল কলকাতায় এসেছে।

অমল বরানগর আসবার দু' চারদিন পরেই সুচিত আর নির্ম্মল কলকাতা থেকে অমলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ছেলে দুটিকে দেখে মানদাসুন্দরীর খুব পছন্দ হয়। তিনি অমলের কাছ থেকে তাদের সমস্ত পরিচয়ই বেশ খুঁটিনাটি ভাবে জেনে নেন। তিনি ভাবলেন,—যদি কোনরকমে এই দুটি ছেলের হাতে আমার প্রভা আর বিভাকে দিতে পারি তবে বেশ হয়। দুজনকে না পেলেও অন্ততঃ প্রভার সঙ্গে

সুচিতের বিয়ে দিতে পারলে মেয়েটা খুব সুখেই থাকবে। যেহেতু সুচিতদের অবস্থা খুবই ভাল—তার উপর সুচিত আবার মেডিকেল কলেজে পড়ছে।

কয়েকদিন পরে সুচিত ও নির্ম্মল আবার অমলের সঙ্গে দেখা করতে এল। মানদাসুন্দরী তাদের খুব আপ্যায়িত করতে লাগলেন। তিনি যেন তাদের কতদিনকার পরিচিত আত্মীয়—তার প্রত্যেক কথা-বার্ত্তা, হাব-ভাবে তিনি এইটেই ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন। তিনি বললেন—তোমরা আমাকে পর ভেব না। তোমরা অমলের বন্ধু—সুতরাং আমার অমলও যেমন, তোমরাও তেমন। আমাকে তোমরা কোন সঙ্কোচই করো না। আমাকে 'মামীমা' বলেই ডেকো।... তোমাদের এ মামীমাকে মাঝে মাঝে একবার দেখা দিয়ে যেতে ভুল করো না। প্রত্যেক রবিবারেই একবার করে এস।

মানদাসুন্দরীর এই সুমিষ্ট ব্যবহারে সুচিত ও নির্ম্মল খুব সন্তুষ্ট হোল। তারা প্রত্যেক রবিবারে আসবে বলে সম্মতি দিয়ে গেল।

সেই অবধি প্রত্যেক রবিবারে সুচিত ও নির্ম্মল এখানে আসতে আরম্ভ করল। মানদাসুন্দরী প্রভা আর বিভাকে অবাধে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ দিতে লাগলেন। তার উদ্দেশ্য—যদি কোনরকমে তারা এদের ভালবেসে বিয়ে করে বসে। তারা এলে মানদাসুন্দরী যে কী করবেন তা ভেবে পেতেন না। লোকের বাড়ীতে জামাই এলে যেমন আদর করে—মানদাসুন্দরী তার চেয়ে অনেক বেশী আদর তাদের করতেন।

ক্রমে ক্রমে প্রভা আর বিভার সঙ্গে এই দুটি লোকের খুব ভাব হয়ে উঠতে লাগল। প্রভা ইচ্ছা থাকলেও প্রথম প্রথম তাদের সামনে আসতে সঙ্কোচ বোধ করতো—ক্রমে তার সে লজ্জা আর থাকল না। তারা তাদের মায়ের আদেশমত সুচিতকে 'নতুনদা' ও নির্ম্মলকে 'নির্ম্মলদা' বলে ডাকতে লাগল।

সুচিত খুব ভাল গান বাজনা জানতো। প্রভাকে সে গান শেখাতে আরম্ভ করল। প্রত্যেক রবিবারে সে প্রভাকে তিন, চারটা নতুন গান শিখিয়ে যেত—পরের রবিবারে এসে আবার সেগুলি আদায় করে নিত। তাই প্রভা আজ সুচিত এসে পড়বার পূর্ব্বেই গানটা ঠিক করে নিচ্ছিল—আর মাঝে মাঝে সে আসছে কি না তাই দেখে আসছিল।

মানদাসুন্দরী প্রভাকে ভাল করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সুচিতের সঙ্গেই তার বিয়ে হবে। প্রভাও মনে মনে সুচিতকে তার স্বামীরূপে বরণ করে নিয়েছিল। তাকে একটু সন্তুষ্ট করবার জন্য—তার একটু অনুগ্রহ পাবার জন্য প্রভা সবই করতে পারতো। তার সব সময়েই ইচ্ছা করতো নভেলি নায়িকার মত সুচিতের কাছে একটু প্রেম জ্ঞাপন করে কিন্তু পেরে উঠত না—যদিও এতে তার মায়ের পূর্ণ সহানুভূতিই ছিল।

যোগেনবাবু ও অমল মানদাসুন্দরীর এ ব্যাপারটা মোটেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু তারা তাদের অমত থাকা সত্ত্বেও মানদাসুন্দরীর মুখের উপর কোন কথা বলতে সাহস করেন নি।

আজ সুচিতের জন্য প্রভার আগ্রহটা একটু বেশী। সে আজ যেমন করেই হোক সুচিতকে বলবে—যে সে তাকে ভালবাসে, তাকে বিয়ে করতে চায়। যদি বলতেও না পারে তবে বিভাকে দিয়ে একখানা চিঠি অন্ততঃ তার হাতে দেবে।

তাই বিভাকে নানা উপায়ে শান্ত করে প্রভা তাড়াতাড়ি একখানা চিঠি লিখতে বসল।

—তিন—

বেলা প্রায় তিনটা বাজে। সুচিত এখনও এসে পৌঁছায় নাই। মানদাসুন্দরী ও প্রভা দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মানদাসুন্দরী প্রভাকে জিজ্ঞাসা করলেন—হ্যাঁরে প্রভা, সুচিত আজ এখনও আসছে না কেন?—সে তো কোনদিনই এমন করে না, কোন অসুখ করেনি তো?

এমন সময় বিভা ছুটতে ছুটতে এসে বলল—মা, মা—নতুনদা আর নির্ম্মলদা এসেছে। শীগ্‌গীর বাইরে এস।... দিদি, তোর কথা আজ আর বলব না—আর যদি কোনদিন আমায় মারিস তবে কিন্তু বলে দেব।

এই কথা বলেই বিভা মানদাসুন্দরীকে টেনে নিয়ে বাইরে চলে গেল। প্রভা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে তাড়াতাড়ি টেবিলটা একটু ঝেড়ে অর্গ্যানের পাশে গিয়ে বসল।

সুচিত আসতেই মানদাসুন্দরী বলে উঠলেন—আজ আসতে এত দেরী হোল যে? আমি মনে করলুম বুঝি কোন অসুখ করেছে।

সুচিত ও নির্ম্মল দুজনেই ভূমিষ্ট হয়ে তাকে প্রণাম করল। সুচিত বলল না মামীমা, কোন অসুখ করে নি। আজ আমাদের কলেজে একটা খেলা ছিল, তাই দেখতে গিয়েছিলাম। তাই একটু দেরী হয়ে গেছে।

মানদাসুন্দরী বললেন—কী খেলা বাবা? এত রোদে কোন খেলা হয় বলে তো শুনি নি।

সুচিত একটু হেসে বলল—টেনিস খেলা। টেনিস রোদের ভেতরেও খেলা চলে।

মানদা বললেন—তা তুমি এই রোদের ভেতর খেলা দেখে দেখে নিজের শরীর নষ্ট কর কেন?

সুচিত বলল—আমি ক্লাবের সেক্রেটারী কিনা—তাই খেলা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমাকে থাকতে হয়।

মানদা বললেন—কত সেক্রেটারীই তুমি হলে বাবা—সেক্রেটারী হয়ে হয়েই তোমার শরীরটাকে নষ্ট করবে দেখছি।

সুচিত একটু মুচকি হেসে বলল—না মামীমা, এতে শরীর নষ্ট হবে না। আপনি কিছু ভাববেন না।

না ভেবে আমি কী থাকতে পারি সুচিত। তুমি তো আর আমার পর নও।

নির্ম্মল এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। এবার বলল—ও রোজই অমনি রোদে রোদে ঘোরে। আমি কত নিষেধ করি—তা কিছুতেই শুনবে না। আপনিই বলুন তো রোজ রোজ রোদে ঘুরে শরীর নষ্ট করা কী ঠিক?

মানদা বললেন—ঠিকই তো—অমন করে রোদে রোদে ঘুরলে দুদিনেই শরীর নষ্ট হয়ে যাবে। ছিঃ সুচিত, তুমি অমন করে আর রোদে বেরিও না।

সুচিত হাসতে হাসতে বলল—নির্ম্মল সব মিথ্যা কথা বলছে। আমি রোদে মোটেই ঘুরি না।

মানদা বললেন—না বাবা—তুমি আমার লক্ষ্মী ছেলে।... সুচিত, দেখ তো প্রভার গানটা কেমন শেখা হয়েছে—সেই বেলা দশটা থেকে তো কেবল গানই গাচ্ছে। আমি একটা কাজের ফরমাস করলেই বলে—আমার গান শেখা হয় নি, নতুনদা এসে বকবে যে? মেয়ে আমার নতুনদা নতুনদা করে একেবারে অস্থির। তুমি গানটা শোন—আমি তোমাদের জন্য চা তৈরী করে নিয়ে আসি।

মানদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

প্রভা এতক্ষণ চুপটি করে বসে কী যেন ভাবছিল। এক একবার তার মুখখানা মধ্যাহ্ন সূর্য্যের মত দীপ্ত হয়ে উঠছিল—আবার মাঝে মাঝে ছাইয়ের মত পাংশুবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।

সুচিত ডাকল—প্রভা, সেই গানটা শিখেছ?

প্রভার চমক ভাঙল। সে তাড়াতাড়ি বলল—হ্যাঁ।

আচ্ছা গাও তো?

প্রভা অর্গান বাজিয়ে গান গেয়ে যেতে লাগল।

অমল এসে বলল—এই যে সুচিত, এই যে নির্ম্মল, তোরা কতক্ষণ এসেছিস?

সুচিত বলল—এই কিছুক্ষণ হোল।

আজ এত দেরী হোল যে?

আমাদের কলেজে আজ একটা Tennis Tournament ছিল তাই—

এমন সময় মানদা চা নিয়ে এসে উপস্থিত হোলেন। অমলের দিকে ফিরে বললেন—অমল, তোকে তোর মামা ডাকছেন। শীগ্‌গীর যা, কী যেন বিশেষ দরকার।

অমল ও মানদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

*   *   *   *

সন্ধ্যার সময় সুচিত ও নির্ম্মল বাসায় ফিরবার জন্য রওনা হচ্ছে এমন সময় বিভা এসে বলল—নতুনদা, একটা কথা শুনুন।

কী, বল?

না আমি সবার সামনে বলতে পারব না—একটু বাইরে আসুন।

সুচিত বলল—সবার মাঝে তো নির্ম্মল?

বিভা বলল—না, ওর সামনে আমি তো কিছুতেই বলব না।

সুচিত অগত্যা বাইরে গেল। বিভা একখানা চিঠি তার

হাতে দিয়ে বলল—দিদিমণি দিয়েছে—চুপ করে পড়ে দেখতে বলেছে।

রাস্তায় যেতে যেতে সুচিত চিঠিখানা পড়ে ফেলল।

চিঠিতে লেখা ছিল—

প্রাণের নতুনদা,

অনেকদিন ধরে আমি একটা কথা ভাবছি—আজ আর প্রকাশ না করে থাকতে পারলাম না। আশা করি সেজন্য আমার উপর বিরক্ত হবেন না।

আমি আজ থেকে আপনাকে 'তুমি' বলবার অনুমতি চাই—অবশ্য আপনি যখন একলা থাকবেন, সেই সময় বলব। আশা করি আমায় এ অনুমতি দিতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না।

আমি আপনাকে বাস্তবিক ভালবাসি। আপনাকে না পেলে আমি মরে যাব—শীগ্‌গির শীগ্‌গির আপনি আমায় বিয়ে করুন।

আর বেশী কিছু লিখতে পারলাম না। যদি কিছু অন্যায় হয়ে থাকে তবে ক্ষমা করবেন।

ইতি

আপনার প্রভা।

চিঠিখানা পড়ে সুচিত বিস্ময়ে একেবারে অবাক হয়ে গেল। কোন কুমারী মেয়ে যে কাউকে এমন ধারা চিঠি লিখতে পারে সুচিতের আগে সেটা ধারণা ছিল না। সুচিত কোনদিনই প্রভাকে ভালবাসেনি।

আর সে ভালবাসলেও তার ধনী পিতা কখনও যোগেন বাবুর মত ঘরে তার বিয়ে দেবেন না—এটা ঠিকই জানতো। প্রভা এমন নিখুঁত সুন্দরীও নয় যে সেই লোভে তাকে বিয়ে করতে হবে। সুচিত এখানে আসতো শুধু সপ্তাহান্তে একটি তরুণীর সঙ্গ পাবার আশায়। তার মনে কোনদিনই একে বিয়ে করবার প্রশ্ন ওঠে নি। আজ চিঠিটা পেয়ে সে বুঝতে পারল যে এ ব্যাপার শুধু প্রভার দ্বারাই সংঘটিত হয় নি এর অন্তরালে নিশ্চয়ই মামদার ইঙ্গিত আছে। এতদিন সে ভাবত—মানদা খুব ভাল মানুষ,—তাই তাদের অমন যত্ন করে। কিন্তু আজ বুঝল যে এই স্বার্থের জন্যই মানদা তাকে এতদিন এমনি ভাবে যত্ন করে আসছে। দিন দিনই তাকে ফাঁদে আটক করবার জন্য প্রলোভন দেখাচ্ছে। এখনই এ সংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত—নয় তো এ সব কথা যদি ঘুণাক্ষরে তার বাবার কানে ওঠে তবে বড়ই লজ্জার কথা। আর তা ছাড়া সে হয়তো মহা ক্যাসাদেই পড়ে যাবে। যারা এতদূর করতে পারে—তারা সবই করতে পারে।

সুচিত তখনই সেই পত্রখানা অমলকে দেখান উচিত বিবেচনা করল। অমল আর নির্ম্মল কথা বলতে বলতে সুচিতের আগে আগে যাচ্ছিল। সুচিত তাদের ডেকে অমলের হাতে সেই চিঠিখানা দিয়ে বলল—এইখানা তোর মামা আর মামীমাকে দেখাস। আজ থেকে আমি আর বরানগর কোনদিনই আসব না—সে কথাটাও তাদের ভাল করে জানিয়ে দিস। আর এই চিঠি পড়ে তারা কে কি বলেন—আমাকে দয়া করে একবার জানিয়ে আসিস্।

সুচিত ও নির্ম্মল ষ্টিমারে উঠল। অমল রাগে, ক্ষোভে, দুঃখে বিমর্ষ হয়ে বাসায় ফিরে এল।

—চার—

এই ঘটনার পর প্রায় ছয়মাস কেটে গেছে। এর মাঝে অমল আর সুচিতের সঙ্গে দেখা করে নাই। সুচিতও আর বরানগরে যায় নাই। কিন্তু সেদিনকার সেই ঘটনার পরে যে কী হোল না জানতে পেরে সুচিত মোটেই শান্তি পাচ্ছিল না। সকল সময়েই তার সেই সব কথা মনে উঠছিল। প্রথম সে যেদিন অমলের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বরানগরে যায়—সেদিন তার অন্য কোন উদ্দেশ্যই ছিল না। তার পরদিন মানদার আত্মীয়তা—তাদের খাবার জন্য আগ্রহ—তাতেই সুচিত সেখানে যেতে আরম্ভ করে। তারপর প্রতি রবিবারে সেখানে যাওয়া—প্রভার সঙ্গে পরিচয়—তাকে গান শেখান—মানদার আদর, প্রভার অসঙ্কোচ ভাব—তারপর সেই চিঠি। থিয়েটারের দৃশ্যের মত একটির পর একটী এসে সকল সময়েই সুচিতকে বিব্রত করে—সে কোন সময়ে একটু শান্তি পায় না। অমলকে চিঠি দিয়ে আসবার দিন সে বার বার বলে দিয়েছিল—চিঠি পড়ে যোগেন বাবুরা যা বলেন তা তাকে জানাতে। কিন্তু আজ

পর্য্যন্ত সে একটিবার এসে দেখা পর্যন্ত করল না। এর মানে কি? অমলকে তো সে ছেলেবেলা থেকে জানে—সে যে এই ব্যাপারটা সুচিতের কাছে গোপন করিবার জন্ম তার সঙ্গে দেখা করে নাই—এটা সে বিশ্বাসই করতে পারল না। সে ভাবল—অমল হয়তো খুব কঠিন রোগে আক্রান্ত নয় বরানগর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। সে সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আবার তার চিঠিখানার কথা মনে পড়ে গেল। সে ভাবল—মানদাসুন্দরী ঐ রকম চিঠি লিখবার জন্ম প্রভাকে উত্তেজিত করেছে। প্রভার এত বড় সাহস হতেই পারে না। আবার ভাবল—হয়তো বা সে ভুল বুঝেছে। স্ত্রী চরিত্র বড়ই জটিল। প্রভারও লেখা একেবারে অসম্ভব নয়। তবে কি প্রভা সত্যিই তাকে ভালবাসে? তাহলে কি সেই অপরাধী? সে তো জানতঃ কোন অপরাধই করে নি—প্রভা যদি তাকে ভুল বুঝে থাকে, তবে কি সেটা তার অপরাধ? প্রভা হয়তো বুঝেছে যে সে তাকে ভালবাসে।

সুচিতের তখনই মনে এল—প্রভারই বা দোষ কি? সে ছেলেমানুষ—তার মনে এ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। যত অপরাধ সবই মানদা সুন্দরীর। তিনি সমস্ত জেনে শুনে প্রভাকে তার সঙ্গে অবাধে মেলামেশার সুযোগ দিয়েছিলেন—কেন তাকে রবিবার রবিবার যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কেন তাকে গান শেখাতে বলেছিলেন? তিনি জানতেন—প্রভাদের মত ঘরে সুচিতের বাবা কখনও সুচিতকে বিয়ে দেবেন না, কারণ সুচিত এই রকম আভাস তাকে অনেক দিন দিয়েছে। তবে কেন তিনি জেনেশুনে এই কাজ করেছিলেন?

সুচিত আরও কি ভাবতে যাচ্ছিল—এমন সময় অমলকে নিয়ে নির্ম্মল সুচিতদের বাড়ী এসে উপস্থিত হোল। অমলকে দেখেই সুচিত বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল—ওকে কোথায় পেলিরে নির্ম্মল?

নির্ম্মল বলল—ও আমাদের মেসে এসেছিল। সেখানে আসতেই আমি ওকে তোর বাসায় নিয়ে এলুম। বরানগর সম্বন্ধে নাকি বিস্তর নতুন খবর আছে।

সুচিতের মুখটা একটু দীপ্ত হয়ে উঠল। সে বলল—এতদিন তোর কী হয়েছিল রে অমল?...ছয়মাসের ভেতরে একটিবার দেখা পর্য্যন্ত করলি না—একখানা চিঠিও লিখলি না। আমি সেদিন বারবার—

অমল বাধা দিয়ে বলল—আমি এতদিন মোটে এখানেই ছিলুম না। সেই ঘটনার দু'দিন পরেই আমি ধানবাদে চলে যাই। তোর কাছে একখানা চিঠি লিখব মনে করেছিলুম—কিন্তু তা আর ঘটে উঠল না। সেখানে যাবার দু' তিনদিন পরেই আমার নিউমোনিয়া হয়—বাঁচবার কোন আশাই ছিল না। অনেক করে পাঁচমাস ভুগে সেরে উঠেছি। কাল এখানে এসেছি। এখনও শরীরে তেমন বল পাই না।... তোর সঙ্গে আজ কয়েকটি জরুরি কথা আছে।

সুচিত বলল—তোর এতবড় অসুখ হয়েছিল—তা তো আমরা কেউ জানতেই পাই নি। তবে আমি রোজই ভাবতুম যে অমল সুস্থ থাকলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করতো কিংবা খবর দিত।...তা যাক্—সেদিনকার সেই ঘটনার পর থেকে আমি মোটেই শান্তি পাচ্ছি না। কী হোল—কে কী বলল জানবার জন্য আমার প্রাণটা ছটফট করছে। আজ তুই এসেছিস ভালই হয়েছে।

একটু থেমে সুচিত আবার বলল—একটা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে সব শোনা যাক্—এখানে আবার যদি কেউ এসে পড়ে তবে বড় মুস্কিল হবে। উপরের ছাতটা খালি আছে—কেউ সেখানে যাবে না। চল্ ছাতেই যাই।

সুচিত অমল আর নির্ম্মলকে নিয়ে যখন ছাতে উঠল—তখন সবে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

ছাতে একটা চাদর বিছিয়ে তিনজনে বসে পড়ল। অমল বলতে আরম্ভ করল—সেদিন তোরা চলে আসবার পর আমি বাসায় গিয়ে মামাকে সব কথা বললুম—চিঠিখানাও তার হাতে দিলুম। চিঠি পড়ে তিনি ভয়ানক চটে গেলেন। মামীমাকে ডেকে তিনি সব কথা বললেন এবং চিঠিখানাও তাকে দেখালেন। তিনি সমস্তটা শুনে ব্যাপারটা একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। তাতে মামা আরও রেগে গিয়ে বললেন—তোমার আস্কারা পেয়েই মেয়েটা এমনি ভাবে বেড়ে উঠেছে। প্রথম থেকেই এমন একটা কিছু হবে

বলে ভেবেছিলাম। তুমি ভাব—তোমার বুদ্ধিই খুব ভাল, আর কেউ কোন কথা বললে সেটা গ্রাহ্যই করো না।..

মামীমা বললেন—প্রভার কোন দোষই নেই। সুচিত আগে ওকে চিঠি লিখেছিল।

আমি বললাম—অসম্ভব, সুচিত সেরকম ছেলেই নয়। আমি তাকে ভাল ভাবেই জানি। আর সে যদি চিঠি লিখবে তবে আমাকে আবার সেধে চিঠি দিয়ে যাবে কেন?

মামাও সেই কথা বললেন। প্রভাকে ডাকা হোল। মামা তাকে খুব তিরস্কার করলেন। তারপর মামীমাকে খুব শাসিয়ে দিলেন। তিনি বললেন—আর যেন কেউ তাদের বাড়ী আসে না। আর এলেও মেয়েদের যেন তাদের সঙ্গে মিশতে না দেওয়া হয়।

সুচিত বলল—আমরা তো যাবই না বলে দিয়েছি, তবে আবার আসবে কে?

অমল বলল—তা বুঝি জানিস না?...তোরা ছাড়া আরও একজন যেত। সে রবিবার ছাড়া অন্য সব কয়দিনই আসতো এবং প্রভাকে গান শেখাতো। মামীমা তাকেও খুব আদর করতেন। তার নাম 'বোথা'।

সুচিত এই কথা শুনে বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেল। এতদিনে সে এ ব্যাপারটা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি। সুচিত বলল—তা হলে দেখছি মামীমা আচ্ছা শিকারী—চারদিক থেকে শীকারের সন্ধান করছিলেন।

অমল বলল—তা কী তুই আজ জানলি? আমি তো অনেকদিন ধরেই জানি—তবে নেহাৎ আমার মামীমা বলে এতদিন তোদের কিছু বলি নি। আমার মামীমার উপরে মোটেই বিশ্বাস নেই। টাকা আর স্বার্থ এই দুটি জিনিষ পেলে মামীমা এ দুনিয়ার যে কোন কাজই হউক করতে দ্বিধা করে না। যাক্ সে কথা।...তারপর সেদিন থেকে মামীমা আমার উপর খুব চটে গেলেন। আমি আর ওখানে থাকা উচিত বিবেচনা করলুম না। তার দু'দিন পরেই আমি আমার দাদার কাছে ধানবাদে চলে গেলাম। সেখানে গিয়েই তো নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি। আমার অসুখের সময় দাদা মামার বাড়ীতে পত্র লিখে তার জবাব পর্য্যন্ত পান নি—মামীমাই সমস্ত নষ্টের মূল। অসুখ সেরে গেলে এখানে আর আসব না মনে করেছিলুম—দাদাও নিষেধ করেছিলেন। হঠাৎ মামার এক পত্র পেলুম—আমাকে একটিবার আসবার জন্য খুব অনুরোধ করেছেন—তিনি আমার অসুখের কথা কিছুই জানেন না। ভাবলুম—মামার কোন দোষই নেই—তিনি নেহাৎ ভালমানুষ। তাই আবার এখানে রওনা হলুম। এসে দেখি প্রভা বাসায় নেই। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হোল। মামার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানলুম আজ দুইমাস হোল সকলের অজ্ঞাতে প্রভা বোথার সঙ্গে কোথায় চলে গেছে। এতদিন তার কোন খোঁজই পাওয়া যায় নি। কাল পাশের বাড়ীর প্রকাশ বাড়ী এসেছে। তার নাকি 'মোগলসরাই' ষ্টেশনে বোথার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বোথা নিতান্ত আহাম্মুকের মত বেহায়া ভাবে তাকে জানিয়েছে—সেই প্রভাকে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। এতদিন তারা দুটিতে মিলে কাশীতেই ছিল। পাঁচ সাতদিন পূর্ব্বে প্রভার সঙ্গে তার কি রাগারাগি হয়েছে—তাই সে তাকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছে।

নির্ম্মল বলল—বারে—এর ভেতর এতটা হয়ে গেছে। আমি অনেকদিন আগেই এমনি একটা সন্দেহ করেছিলুম। প্রভা তার মায়ের কাছ থেকে যেমন শিক্ষা পাচ্ছিল—তাতে এরকম ঘটা মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু যোগেন বাবুর জন্য আমার বাস্তবিক কষ্ট হচ্ছে। নেহাৎ ভালমানুষ তিনি।

অমল বলল—বাস্তবিক নির্ম্মল, প্রভা কুলের বের হয়ে গেছে, তাতে আমার কোন দুঃখ নেই—কিন্তু আমার দুঃখ হচ্ছে মামার জন্য। বুড়ো বয়সে তার এমনি ভাবে মুখ ছোট হয়ে গেল—এইটেই বড় কষ্টের কথা।

সুচিত বলল—যাক্—ও সব আলোচনায় আর দরকার নেই। রাত হয়েছে—এখন ওঠা যাক্।

—পাঁচ—

দশ বছর পরের কথা।

সুচিত মেডিকেল কলেজ থেকে সম্মানের সঙ্গে এম-বি পাশ করে বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে ভবানীপুরে

প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করেছে। একবছর হোল কলকাতার একজন নামজাদা ব্যারিষ্টারের সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। বিয়েতে সুচিত খুব সুখী হয়েছে। বিয়ে করবার পূর্ব্বে সুচিত তার ভবিষ্যৎ মানসীকে মনে মনে যেমন ভাবে গড়ে তুলেছিল—নেলী ঠিক তেমনটিই হয়েছে। নেলীও সুচিতকে পেয়ে খুব সন্তুষ্ট হয়েছে—তাদের দাম্পত্য জীবন বেশ সুখেই কাটছে।

এই দীর্ঘ দশ বছরের ভিতরে সুচিতের জীবনে কত ঘটনাই না ঘটে গেল। সুচিত এম-বি পাশ করে বিলেত থেকে ডিগ্রি নিয়ে এল, প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করল, মনের মতন সুন্দরী কন্যা বিয়ে করল, নতুন সংসারে প্রবেশ করল। এত ঘটনার মাঝেও সে কিন্তু প্রভার কথা একেবারে ভুলতে পারল না। যখন তখন তার প্রথম যৌবনের অতীত স্মৃতিটি এসে তার মনের ভিতর উঁকি-ঝুঁকি মারতো। সে যেন তাকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। ছোট্ট শিশুটি যেমন কোনরকমে তার মায়ের কোল ছাড়তে চায় না—প্রভার স্মৃতিও ঠিক তেমনি সুচিতকে ছাড়তে চাইতো না। এই স্মৃতির তাড়নায় সুচিত বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

সুচিত ভাবত—প্রভা আজ ঘৃণিত কুলটার বৃত্তি বরণ করে নিয়েছে—কিন্তু সে কার অপরাধ? প্রভার না তার? সে তো জ্ঞানতঃ কোন অপরাধই করে নি—কিন্তু অজ্ঞানে যদি কোন অপরাধ করে থাকে তবে সে জন্য তো সেই দায়ী। তার অপরাধে একটা সরলা অবলার ইহপরকাল নষ্ট হয়ে গেল। প্রভা হয়তো আজ কত দুঃখে দিন কাটাচ্ছে—কত কষ্ট সহ্য করছে। মুহূর্ত্তের উত্তেজনায় সে আজ সব হারিয়ে বসে আছে। সেও তো আজ ঠিক তাদেরি মতন দাম্পত্য জীবন কত সুখেই না অতিবাহিত করতে পারতো। কিন্তু সে নিজের হাতেই সে পথ রোধ করে দিয়েছে—এখন তার ইচ্ছা থাকলেও আর ফিরবার উপায় নাই।

কখনও ভাবত—না, না, সে হয়তো বেশ সুখেই আছে। বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটিয়ে যাচ্ছে। সে ব্যাভিচারিণী কুলটার চিন্তাও পাপ। ও ধরণের মেয়েদের অসাধ্য জগতে কিছুই নেই। যে বিয়ের আগে অমন চিঠি লিখতে পারে—তার পক্ষে কুলটার বৃত্তি অবলম্বন করা তো স্বাভাবিক। সুতরাং সুচিতের কোন দোষই নেই—সে নিরপরাধ।

কখনও ভাবত—সুচিত যদি মানদাসুন্দরীর অনুরোধ না শুনতো—যদি সে প্রভার প্রথম যৌবনের ভরা জোয়ারের সামনে গিয়ে না দাঁড়াত—তবে হয়তো প্রভা অমন হয়ে যেত না। হয়তো তাকে না পেয়েই মনের দুঃখে সে বোথার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল, তবে তো তারি দোষ। কেন সে রবিবার রবিবার অমনভাবে প্রভার কাছে ছুটে যেত? কেন সে আগে এসব ব্যাপার চিন্তা করে নি?

সুচিত প্রভা সম্বন্ধে সমস্ত ব্যাপারই নেলীর কাছে বলেছে। নেলীও এ প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন মীমাংসা করে দিতে পারে নি। সুচিত প্রভার কথা ভুলে যাবার চেষ্টা করতো—কিন্তু ভুলতে পারতো না। অতীতের স্মৃতি ভুলব বললেই ভোলা যায় না—তা যদি যেত—তবে এ দুনিয়া থেকে হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, স্নেহ চিরতরে নির্ব্বাসিত হয়ে যেত। মানুষ অতীত স্মৃতি ভুলতে পারে না বলেই একজন আর একজনের বিপক্ষে প্রতিশোধ নিতে ছুটে যায়। উপকারীর প্রত্যুপকার করতে বিরত থাকে না।

* * * *

সকাল বেলা—

সুচিত সবেমাত্র বৈঠকখানার ঘরে এসে বসেছে—এমন সময় হকার এসে একখানা খবরের কাগজ দিয়ে গেল।

খবরের কাগজের পাতা উল্টাতেই সুচিত দেখল খুব বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—কাশীতে ভীষণ কাণ্ড! ভদ্রবেশী গুণ্ডার ডাকাতি! প্রভানাম্নী বারবণিতা নৃশংসভাবে নিহত!

সুচিতের মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কাশীতে প্রভানাম্নী বারবণিতা নৃশংসভাবে নিহত! কাশী—প্রভা—তবে—তবে?.........

সুচিত সাগ্রহে তাড়াতাড়ি খবরটা পড়তে লাগল—কিছুদিন পূর্ব্বে রাত্র প্রায় একটার সময় হরেন্দ্রনাথ রায় ওরফে বোথা নামক জনৈক ভদ্রবেশী বাঙ্গালী গুণ্ডা একটি রিভলভার হস্তে কাশীতে প্রভা নাম্নী জনৈক বারবণিতার গৃহে প্রবেশ

করে। সে ঘরে ঢুকিয়াই প্রভার যাবতীয় অর্থ ও গহনা প্রার্থনা করে। সে তাহা দিতে অস্বীকার করিলে বোথা তাহার হস্তস্থিত রিভলভার দ্বারা প্রভাকে গুলি করে গুলি প্রভার কর্ণদেশ বিদ্ধ করে এবং তৎক্ষণাৎ সে নিহত হয়। তৎপর আসামী প্রভার যাবতীয় অর্থ ও গহনাতে প্রায় তিন হাজার টাকা হইয়া পলায়ন করিতে যায়—রাস্তায় পুলিশ তাহাকে ধৃত করে।

গতকল্য আসামীর বিচার হইয়া গিয়াছে। আসামী বলিয়াছে—দশ বৎসর পূর্ব্বে সে কলিকাতার উত্তরে বরানগরের শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা প্রভাকে সকলের অজ্ঞাতে কাশীতে লইয়া আসিয়া কোনও বার-বণিতার নিকট বিক্রয় করে। * * * হঠাৎ তার টাকার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় প্রভার নিকট টাকা ও গহনা চাহিতে আসিয়াছিল। প্রভা দিতে অস্বীকার করিলে সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহাকে খুন করিয়াছে। বিচারে আসামীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে।

খবরটা পড়ে সুচিতের মনটা কেমন করে উঠল। তার মুখখানা হঠাৎ ছাইয়ের মত পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। হাত থেকে খবরের কাগজটা মেঝের উপর গড়িয়ে পড়ল। সুচিত বাইরের জানালাটার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। অতীতের কথা তার মনে আনবার চেষ্টা করতে লাগল—কিন্তু সম্পূর্ণভাবে মনে আনতে পারল না। মানুষের যখন খুব দুঃখ বা আনন্দ হয়—সে সময় সে কোন জিনিসই গুছিয়ে চিন্তা করতে পারে না। তাই সুচিত কোনটাকেই গুছিয়ে ভাবতে পারছিল না।

নেলী এসে সুচিতের মাথায় হাত দিয়ে বলল—অমন চুপটি করে বসে বসে কি ভাবছ? চাকরটা দুবার ডাকতে এসে ফিরে গেছে।

হঠাৎ সুচিতের চমক ভাঙ্গল। সে নেলীর দিকে তাকিয়ে বলল—ঐ খবরের কাগজখানা একবার পড়ে দেখ। বরানগরের সেই প্রভাকে বোথা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। সে আর এ দুনিয়ায় নেই। যৌবন নদীর জোয়ারে প্রভা ভেসে গিয়েছিল—তাই আজ তার শোচনীয় পরিণাম।

সুচিত আর কোন কথা বলতে পারল না। নেলী কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল। সমবেদনায় তার চোখ দিয়ে দুইফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

এমন সময় পাশের রাস্তা থেকে হকার চীৎকার করে উঠল—জবর খবর বাবু কাশীতে ভীষণ কাণ্ড।
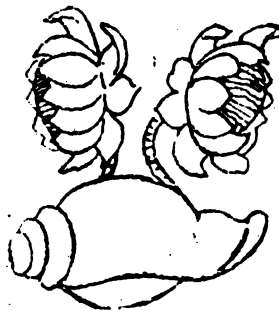
নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(১৬)

অন্নপূর্ণা সেবাশ্রমের নূতন লাল রঙের বাড়ীখানির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। বাড়ীর কোলে লাগানো জমীটা পূর্ব্বোক্ত তরুণীর একান্ত চেষ্টায় একটি সুন্দর বাগিচায় পরিণত হইয়াছে। * * * সম্প্রতি সেই নূতন আবাসে নূতন একটি রোগী আসিয়াছে। আমাদের পূর্ব্ববর্ণিতা তরুণী ফিডিং কাপে করিয়া ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ লইয়া যাইতে যাইতে বলিল —"মিসেস দত্ত, ডাক্তার সেন উপর থেকে নামলেই তের নম্বর রুমে পাঠিয়ে দেবেন "

দ্বারের লম্বিত খদ্দরের পর্দ্দাটা সরাইয়া গৃহে ঢুকিয়া রোগীর মুখপানে তাকাইতেই তরুণী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। হাত হইতে চীনা মাটির কাপটা পড়িয়া টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। থর-কম্পিত দেহভার দেওয়ালে হেলাইয়া তরুণী একদৃষ্টে যুবকের অচেতন দেহখানি দেখিতে লাগিল। তাহার মুখের ভাবে স্পষ্ট বুঝাইতেছিল যে ঐ কাঁচের কাপটার মতই তাহার তরুণ হৃদয়খানি টুকরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

"মিস বোস, একি ঘরের মধ্যে দুধ ফেললে কে ?"

ত্রস্তে আপনাকে সম্বরিয়া লজ্জিত ভাবে তরুণী বলিল— "আমারই হাত হ'তে অসাবধানে প'ড়ে গ্যাছে মা।"

"তা যাকগে, আমি এখনি নিতাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি। উঃ কালকে কী দুর্য্যোগটাই না গ্যাছে, পদ্মার মাঝখানে এসে ঝড় দেখে আমরা ষ্টীমারকে থামিয়ে ফেললাম, সারা রাতের পর ভোরের বেলা ঝড় থামলে যখন ষ্টীমার ছাড়তে যায়, তখন খালাসীরা হৈ হৈ করে উঠলো, কিনারা থেকে ঐ ছেলেটির অবশ দেহটাকে টেনে তুললাম। কিশোর অনেক নূতন প্রক্রিয়ায় ছেলেটির জল বার করে শ্বাস প্রশ্বাস ফিরিয়ে আনলে, তখন বেচারীর 'পাল্‌স' দেখে আমার ধড়ে প্রাণ এল। তারপর এইখানে পৌছেই এই নতুন ঘরটায় শুইয়ে নার্সিং করতে লাগলাম।"

"আমায় কেন ডাকেন নি মা ?"

"আঃ সারা দিনরাত খাটুনির পর একটু শুয়েছ, তাই ডাকলাম না। কিন্তু দেখ, চোখদু'টা তো জন্মের মত নষ্ট হ'য়ে গেছে; আবার ডান পা'টা তাও বোধ হয় ভাল হবার আশা নেই। আহা কার বাছা গো।"

সুমতী দেবীর মমতাপূর্ণ হৃদয় কারুণ্যে ভরিয়া উঠিল। বলিলেন—"আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি মা, আর এক কাপ দুধও পাঠিয়ে দিচ্ছি। যদি এর মধ্যে কিছু দরকার হয় খবর দিও।"

তরুণী মিনতিমাখা কোমল কাতর স্বরে বলিল—"ডাক্তার সেনকে.."

"কে, কিশোরকে, ও এক্ষণি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর বারোটার সময় হাউস সার্জ্জন এসে দেখে যাবেন।"

সুমতি দেবী বিদায় নিলেন। তরুণী রোগীর শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষায় মন দিল।

মিনিট কয়েক পরে রোগী অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে বলিল— "আলোক, অমলদা, উঃ ঘরে কি কেউ নেই!"

নাঃ আর কোন সন্দেহ নাই। তরুণী চোখের ধারায় ভাসিতে ভাসিতে বলিল—"মৃণালবাবু।"

"কে ?"

"আমি, আমি একজন সামান্য নার্স মাত্র।"

নর্স! এটা তবে কি ?"

"এটা হাসপাতাল।"

"নার্স, হাসপাতাল; এখানে আমায় কে আনলে অমলদা, আলোক, বিনীত, এরা সব কোথায় ? আঃ এমন করে দুচোখ আমায় বেঁধে দিল কে ?"

"মৃণালবাবু ওঠবার চেষ্টা করবেন না, আপনি যাদের নাম করছেন, তাঁরা কেউ এ স্থানে নেই ; এটা তারপাশা গ্রামের নারী সেবাশ্রম। আপনাদের বোধ হয় নৌকাডুবি হয়েছিল, এঁরা কালকে কি কাজে ঐ দিক যাচ্ছিলেন, পদ্মার কিনারায় আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে তুলে এনেছেন।"

"চোখে, চোখে আমার কী হয়েছে, আগে সেইটা দয়া করে বলুন না ?"

মৃণাল ক্রমশঃ চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। তরুণী ধীরস্বরে বলিল—"চোখে আপনার 'শক' লেগেছে।"

"চোখে 'শক' লেগেছে ; নৌকাডুবি ! আপনার কথা যেন হেঁয়ালীপূর্ণ ঠেকছে…এ মনে পড়েছে।"

মৃণালকে নির্ব্বাক দেখিয়া তরুণী আর কোন প্রশ্ন করিল না। অতীতের কাহিনী অনেকক্ষণ ধরিয়া স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কাতর স্বরে মৃণাল বলিল—"তবে কি আমায় অন্ধ হ'য়ে দিন কাটাতে হবে ? আর পায়ে, পায়ে আমার কী হ'য়েছে বলুন বলুন, যত বড় শক্ত কথাই হোক আমায় জানিয়ে দিন—ইঃ পরমেশ্বর !"

মৃণালের গলা ধরিয়া আসিল। আবার বড় মর্ম্মভেদী স্বরে মৃণাল বলিল—"যারা এসে আছেন, দয়া করে আমায় বলুন না, আমাকে কবে ছেড়ে দেবেন।"

তরুণী নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিল—"ব্যস্ত হবেন না, আপনার শরীর সুস্থ হলে আমরা ঠিক পাঠিয়ে দেব।"

হতাশ বেদনায় মৃণালের বুক তোলপাড় করিয়া উঠিল। বলিল—"আর পাঠিয়ে দেবেন, অন্ধ হয়ে—পঙ্গু হয়ে কোথায় যে যাব জানি না।"

তরুণী সহসা চঞ্চল ভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল—"এই যে, মিঃ সেন এসেছেন।" ডাক্তার সেন ওরফে সুমতী দেবীর পুত্র কিশোর সেন আসিয়া মৃণালকে সযত্নে পরীক্ষা করিয়া বাহিরে গিয়া তরুণীকে ডাকিল। তরুণী নত বদনে তথায় উপস্থিত হইতেই কিশোর নিম্নস্বরে বলিল—"নাঃ কোন আর আশা নেই মিস বোস্… চোখ উনি একেবারেই নষ্ট হয়ে গ্যাছে, আমাদের ওর প'রে আর কোন ক্ষমতা নাই ; তবে ঈশ্বরের কৃপায় উনি শীগ্‌গীরই সুস্থ হবেন, সে ভয় নেই ; আচ্ছা।"

তরুণী মলিন মুখে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। পদশব্দে চমকিয়া মৃণাল বলিল—"আপনি এসেছেন, ডাক্তারবাবু কি বলে গেলেন ?"

অত বড় অপ্রিয় সত্য কথাটা কহিতে তরুণীর বাধিল। অবশেষে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বলিল—"আপনি খুব শীগগীর আরাম হ'য়ে যাবেন।"

"আর চোখ ?"

"তাও দু'দিন পরে ভাল হ'য়ে যাবে। আচ্ছা এখন একটু দুধ খেয়ে ফেলুন দেখি।"

মৃণাল পাশ ফিরিয়া অসহায়কণ্ঠে বলিল—"ওঠবার তো শক্তি নেই ..কেমন করে খাব ?"

একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া তরুণী আপনার কোমল বাহুলতা খানি মৃণালের গলার নীচে দিয়া মধুর স্বরে বলিল—"এইবার মাথাটা একটু তুলুন তো ?"

নিঃসহায় মৃণাল শিশুর মত তরুণীর আদেশ পালন করিল। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় তরুণ যুবকের স্পর্শে তরুণীর কুমারী হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাহার মনে পড়িল যে, সে একজন বেতনভোগী নার্স মাত্র। আশ্রমের রোগীর সেবা তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। এখানে লজ্জাকে আশ্রয় দিলে চলিবে না। মৃণালের অতি নিকটে তরুণীর কালো চুলের মিষ্ট সুবাস মাদকতা ছড়াইয়া দিল। তরুণীর মুখে যে গোধুলীর রাঙ্গা আভার মত কী একটা আলো লাগিয়াছে… অন্ধ যুবক তাহা দেখিতে পাইল না। দেখিলে মনে মনে অন্ত একটা কিছু ধারণা করিয়া বসিত। দুধপান শেষ করাইয়া অতি সাবধানে আপনার বাহুর বন্ধন মুক্ত করিয়া মৃণালকে শয্যায় শোয়াইয়া দিল। মৃণালের হঠাৎ মনে হইল যে এই শোওয়ানর ব্যাপারটুকু আরও একটু দেরীতে হইলে ভাল হইত।

(১৭)

"উঃ সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল গো, আর পারি না, আর পারছি না এ যন্ত্রণা সহ্য কর্ত্তে।"

"কি যন্ত্রণা পাচ্ছ রেবা আমায় বলতো ?"

"কে ? তুমি কে গো, তুমি কেন এই পিশাচীকে রেবা বলে সম্বোধন করছো ?"

রেবেকার অস্বাভাবিক চীৎকারে আলোক ভীত হইয়া তাহার মুখের অতি সন্নিকটে মুখ লইয়া কোমল কণ্ঠে ডাকিল, "আমায় চিনতে পাচ্ছ না রেবা—আমি যে আলোক !"

"আলোক, আলোক আবার কে ? আমার জীবনতো দুঃস্বপ্নময় অন্ধকারে ভরা...ছিঃ ছিঃ, আলোক কি এত অন্ধকারে আসতে পারে ? সে যে পবিত্র ! রেবা...হাঃ হাঃ রেবা নেই গো—তার জায়গায় একটা কলঙ্কিনী অবিশ্বাসিনী নারী এসে দাঁড়িয়েছে...উঃ জ্বালা—ওগো বড় জ্বালা।"

আলোকের দৃষ্টি কল্লোলের দৃষ্টির সহিত মিলিত হইল। কল্লোল উঠিয়া ক্ষিপ্র হস্তে একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রেবেকার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সস্নেহে বলিল—"আচ্ছা এই ওষুধটা লক্ষ্মীটির মত খাওতো রেবা। বেশ ঘুম আসবে—আর ও জ্বালা টালা সব কমে যাবে।"

কল্লোলের হাত দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া রেবেকা গ্লাস হইতে সমস্ত ঔষধটা ফেলিয়া বিকটস্বরে বলিল—"ইস আমাকে ওষুধ খাওয়াতে এসেছে...কেন গো, আমার কি হয়েছে... ওষুধ কেন খেতে গেলাম। তুমি আবার কে বলতো... আমাকে ওষুধ খা'বার জন্যে জ্বালাতন করছো ?"

কল্লোলের চোখে জল আসিতেছিল। সে গাঢ়স্বরে বলিল—"আমি যে ডাক্তার।"

"মিথ্যে কথা, ডাক্তার কেন হবে তুমি...তোমায় চিনেছি, তুমি সেই কল্লোল...না না, মিঃ রয়—ওগো বলতে পারেন আমায়, আলোক বলে আমার কে আছে ? যে আমাকে আদর করে রেবা বলে ডাকলে, সে আমার কে হয় ? ওঃ আবার আমার মাথা গুলিয়ে গেল।"

"রেবা, তাকে চিনতে পারনি ?"

"হ্যাঁ, একটু একটু চিনেছি বোধহয়—সে খুব ফর্সা না ? তার চোখ দুটো খুব কি বড় বড়...আচ্ছা সে আমাকে কেন ডাকলে, আমার পরিচয় সে কি পায় নি ?"

রেবেকা শ্রান্ত হইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। পরক্ষণেই উঠিয়া তেমনি বিকৃতস্বরে বলিয়া উঠিল—"কই সে আলোক, কোথায় একটিবার ডেকে দাওনা তাকে দেখব একবার— উঃ বড় অন্ধকার আমার সামনে—নাঃ কি পাগলের মত বকছি, সত্যিই তো আলো তো এখানে আসবে না"

"তুমি একটু চুপ করে ঘুমাও তো রেবা, আলোককে আমি ডেকে দিচ্ছি।"

"চুপ কর্ব্বো...আচ্ছা আগে আমার কতকগুলি কথা শেষ কর্ত্তে দাও, তারপর একেবারে চুপ করে যাব, ঠিক ঠিক এইবার সব মনে পড়েছে ওগো তোমরা শোন, কল্লোলকে আমি বিয়ে হবার আগে ভালবাসতুম, তারপর সেই কল্লোলই আমার বাবার কাছে আলোককে এনে শুধু আমার সঙ্গে আলোকের বিয়ে হ'য়ে গ্যাল...কিন্তু আমি পূর্ব্বের অপমানটা ভুলতে পারলুম না, আর আমার স্বামী দেবতাকেও ভক্তি করিনি...তারপর শোন—সেই আলোককে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলুম—ছোট বোনের মত সরলা ননদকে রাস্তায় বের করে দিলুম—তারপর ভুলিয়ে একদিন কল্লোলকে নিয়ে বেরুলাম জল-অভিযান কর্ত্তে...কিন্তু জানতুম না যে সে কত বড় সংযমী পুরুষ। নদীর বুকে, কেউ কোথাও নেই— সেখানে এক তরুণীর আত্ম-নিবেদন অবহেলা ভরে উপেক্ষা করে আমাকে যেন চাবুক মেরে বিদেয় করে দিলে...আর... আমার আজ সব মনে পড়েছে—ঐ যে বলচে—আলোক আমাকে ডাকচে, সেই আলোক, সেই দেবচরিত্র আলোক আমার স্বামী ! কিন্তু আমি যে আমার সোনার ঘর সংসার ভাসিয়ে দিয়েছি, কেমন করে ফিরে পাব ? উঃ আবার এই বুকটা কেমন করছে...অনুতাপের কি ভীষণ জ্বালা ! ডাক্তার, ডাক্তার এমন ওষুধ কি তোমার নেই...যা খেলে আমি সেই পূর্ব্বের স্মৃতিটা ভুলে যেতে পারি ! নিজে নিজে এত ভুলতে চেষ্টা কচ্ছি...কিন্তু পারছি না ; সেই সমস্ত ঘটনাগুলো আমার চোখের সামনে ফুটে উঠে, আমাকে অনবরত ব্যথার হুলে বেঁধাচ্ছে...উঃ আলোক, স্বামী, তোমার স্নেহের নীড় আমি নিজের হাতে ভেঙেছি ; আর আশা নেই, আর কি করেই বা আশা করব—আমার মুখ যে পুড়ে গেল, সে আমাকে নিতে এলেও আমি যাব না—নাঃ তার পবিত্র প্রশস্ত বুকে

কৃদায় উপর আর কালী ঢালতে পারব না...আমাকে এইভেই মরতে হবে।"

উন্মাদিনীর চোখ দিয়া অজস্র অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। আলোক চোখের নিরুদ্ধ অশ্রুধারার বাঁধ মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া রেবাকে ধরিতে যাইতেছিল। কল্লোল বাধা দিয়া বলিল—"থাক ভাই, ওকে কাঁদবার সময় দাও...তাতে ওর জ্ঞানশক্তি হয়তো ফিরেও আসিতে পারে।"

(১৮)

সন্ধ্যার ধূসর আলো সবে মাত্র প্রকৃতির বুকখানিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দিক চক্রবালে অস্তগামী ক্লান্ত রবির রাঙা উত্তরীয়ের একটি প্রান্ত তখনও দেখা যাইতেছিল। দুটি হাত বুকের পরে জড়ো করিয়া অসহায় মৃণাল তাহার গত জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবিয়া দেখিতে-ছিল। পলকহারা চোখের ফাঁক দিয়া তপ্ত অশ্রু বহিয়া উপাধান সিক্ত করিতেছিল। "হায় দয়াময়! মানব জীবনের শ্রেষ্ঠরত্ন চক্ষু...সে হইতে বঞ্চিত করাইয়াছ, কিন্তু দৃষ্টিহীনের চোখের জলতো সংরোধ করিতে পার নাই। ওঃ জন্মের মত প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখে এমন মন তৃপ্ত করিবার সাধ ঘুচিয়া গিয়াছে, প্রভাতের মুক্ত আলোকে আর সারা দেহ মন জাগিয়া উঠিয়া নূতন কর্মের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে না! নিশিদিন প্রতি পলে পলে, ক্ষুব্ধ-ক্লিষ্ট ব্যাকুল ব্যর্থ বুকে তীব্র হাহাকার উদ্বেলিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে...এ অসাড় জীবনকে টানিয়া সে কোন লক্ষ্যহীন জনশূন্য বিজন নিরাশার পথে চলিতে থাকিবে! উঃ অন্ধের জীবন কি দুর্বিসহ! ঘন অন্ধকার বিভীষিকাচ্ছন্ন জীবনের অবসান কবে শেষ হইবে? মৃত্যু...আঃ সে তো মুক্তি, সে তো তৃপ্তি ..কিন্তু সে কি এত সহজে আমাকে জুড়াইতে আসিবে? কতদিন আর এ দুঃসহ কষ্ট বহন করিতে হইবে।"

"মৃণাল বাবু।"

তরুণীর আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠের সাড়া পাইয়া মৃণাল ক্ষিপ্র হস্তে চোখের বারি মুছিয়া ফেলিল। বিশ্বের সমস্ত সুখ দুঃখের অংশ হইতে পরিত্যক্ত মৃণাল কেবল একজনের অকৃত্রিম প্রাণঢালা সেবা যত্নে এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে।

"মৃণাল বাবু কে এসেছেন দেখুন।"

কে এসেছে মিস বোস্...আমার মত হতভাগ্যকে কে দেখতে আসবে?

"কেন ভাই মৃণাল কে বলে তুমি হতভাগ্য!"

"আলোক— আলোক ভাই তুমি কি এসেছ?"

আলোকের বিশাল বক্ষে মাথা রাখিয়া মৃণাল অস্ফুট কণ্ঠে বলিল—"অমলদা এলেন না?"

"তিনিতো আমাদের পাশে নেই ভাই, জেলে গ্যাছেন।"

"জেলে!"

"হ্যাঁ মৃণাল।"

"কি অপরাধে?"

"অপরাধ তিনি বিদ্রোহী। সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধরা দেবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু অমলদার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছি।"

"আলোক, দুঃখের পরে' দুঃখের বিপুল বোঝা যে আর সয়না ভাই। একতো জন্মের মত তাঁকে দেখার সাধে বঞ্চিত হ'য়েছি, তার উপর তাঁর স্নেহ কোমল স্পর্শ তাঁর সেই প্রাণোন্মাদকারী উত্তেজনাময় বাণী, তা হতেও আজ অভাগা আমি বঞ্চিত! আলোক বেঁচে থেকে এ রকম দুঃখ উপভোগ করা যে কত বড় অসহনীয়, বুঝতে পার কি? মিস্ বোস্ কোথায় গেল, একবার ডাকতো ভাই বড় পিপাসা পেয়েছে।"

বিস্ময়ে আলোক বলিল—"মিস্ বোস্! সে আবার কে মৃণাল! ফাল্গুনী তো এখানে আমাকে পৌছে দিয়ে গেল।"

বহুদিনের নিভে যাওয়া হাসি আজ মৃণালের ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করিল। পুলকভরা সুরে মৃণাল বলিল—"ফাল্গুনী, ফাল্গুনী! সেই আমাকে এত সেবা কচ্ছে?"

"হ্যাঁ।"

"আলোক আমাকে বাড়ী নিয়ে যাবে কবে ভাই?"

"এই কাল পরশুর মধ্যেই তোমায় নিয়ে যাব।"

"আর ফাল্গুনী?"

"তাকেও নিয়ে যাব। আর এখানে তার থাকবার দরকার নেই। মৃণাল সেদিন যাঁকে উদ্ধার করেছ জানো কি?"

মৃণাল বলিল—"না, কে তিনি?"

আলোক বলিল—"আমার স্ত্রী রেবেকা।"

"আপনার স্ত্রী! তিনি ওরকম অবস্থায় পড়লেন কি করে?"

আলোক বিষাদ গম্ভীর স্বরে বলিল—"সে অনেক কথা, পরে শুনো।"

মৃণাল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—"তা হলে ফাল্গুনীও বাড়ী যাবে আলোক।"

আলোক হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, নিশ্চয়।"

মৃণালের বুকের মধ্যে কী একটা পুলকের বন্যা সহসা স্ফীত উচ্ছ্বসিত হইয়া নাচিয়া উঠিল। সে গভীর আবেশে চোখ মুদিত করিয়া আলোকের বাহুর মধ্যে স্থির হইয়া পড়িয়া রহিল।

(১৯)

"ফাগুন, ফাগুনী।"

"কি বলছেন?"

"আজ কী তিথি ফাগুন্?"

মনে মনে হিসাব করিয়া ফাল্গুনী বলিল—"আজ একাদশী।"

"দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী, পূর্ণিমা। মাঝে আর কটা দিন রইল ফাগুন?"

"কিসের দিন মৃণালবাবু?"

মৃণাল তার ওষ্ঠাধরের মধ্যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব গভীর আনন্দের রেশ টানিয়া বলিল—"আমাদের মিলন রাত্রির—"

কম্পিত, স্পন্দিত স্বরে ফাল্গুনী উত্তর করিল—"মাঝে আর তিনটে দিন।"

"ফাগুন্।"

"কী।"

"হতভাগার একটা কথা শুনবে কি?"

ফাল্গুনী বুঝিল যে সে কথাটি কি, মুখ আমাইয়া ধীর স্বরে বলিল—"কি বলবেন বলুন?"

ঘরের একটি পাশে শতরঞ্চ বিছাইয়া ফাল্গুনী সুতা তুলিতেছিল। তাহার চারু হস্তের সরু সরু সোণার চুড়িগুলি রিণি রিণি করিয়া মৃণালকে প্রশ্ন করিল—"বল ওগো বল, আমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবে, তার জন্যে এত কুণ্ঠা, এত শঙ্কা কেন প্রিয়তম?"

মৃণাল অধর প্রান্তে ক্ষীণ হাস্যরেখা ফুটাইয়া বিষণ্ণ-বেদনাভরা কণ্ঠে বলিল—"ফাগুন্ তোমার দাদা অনুরোধে কিন্তু বড় অন্যায় কাজ কর্ত্তে বলেছেন।"

ফাল্গুনী সন্দিগ্ধ ভাবে বলিল—"আমার দাদা অন্যায় কাজ করছেন—এর মানে?"

মৃণাল বিষাদ ভরে হাসিয়া বলিল—"হ্যাঁ, প্রথম...আমি প্রথম দরিদ্র, অন্ধ, দেহে শক্তি থাকিতেও আমি আজ অক্ষম, পরমুখাপেক্ষী রুগ্ন পঙ্গু। আমার হাতে তোমার মত লাবণ্য-পূর্ণা তরুণীকে সমর্পণ করাটা কি তোমার দাদার যুক্তিসঙ্গত হচ্ছে?"

ফাল্গুনী গলার স্বরটাকে অত্যন্ত কোমল করিয়া বলিল—"দাদা আমার কিছু অন্যায় করেন নি,...দাদার আর বৌদির সম্পূর্ণ ইচ্ছে...আর আমারও..."

মৃণাল আকুল স্বরে প্রশ্ন করিল—"বল, বল ফাগুন, থামলে কেন?"

রক্তিম ওষ্ঠাধর কাঁপাইয়া ফাল্গুনী ধীরে ধীরে বলিল—"আমারও সম্পূর্ণ..."

ফাল্গুনীর কথায় বাধা দিয়া মৃণাল বলিল—"কী, তোমারও সম্পূর্ণ ইচ্ছে! না না ফাল্গুনী, এমন ভয়ঙ্কর ভুল তুমি হঠাৎ করে ফেলো না...দেখ তুমি আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছ, সে-হেতু আমার প্রাণদাত্রী তুমি...তোমার পরে' আমি এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার জেনে-শুনে করতে পারবো না। না না তোমরা আমায় ছেড়ে দাও। জীবন ব্যাপী দুঃখকে কেন তুমি বরণ করবে ফাগুন্? আমার এ অশান্তিময় সঙ্গ সাধ করে কেন তুমি বেছে নিচ্ছ?...আমি কিছুই বুঝতে পারছি না...শোন আমি আজ তোমার দাদাকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা করতে বলব।"

তরকার শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল...ছোট্ট একটি কাতর নিঃশ্বাস মৃণালের অঙ্গ পরমাণু কাঁপাইয়া ঝড় বহিয়া গেল।

"মৃণালবাবু...জীবন ব্যাপী দুঃখের বোঝাটি কী, তাতো বুঝতে পারলাম না।"

করুণ হাসিয়া মৃণাল বলিল—"ইচ্ছে করে যদি না বোঝ তো, সারা জীবন ধরে বোঝালেও বুঝবে না।"

মনকে চোখ ঠারিয়া মৃণাল মুখে যতই আস্ফালন করুক না কেন...সমস্ত চিত্ত অহার ঐ সেবাপরায়ণা, কর্ম্মসহিষ্ণু তরুণীটির মিলন কামনায় অধীর চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। মুখ টিপিয়া হাসিয়া ফাল্গুনী বলিল—"আচ্ছা তাই যেন হলো—আপনাকে আমরা ছেড়েই দিলাম—কিন্তু যাবেন কোথায়?"

অজ্ঞাতে একটু আহত হইয়া মৃণাল বলিল—"কোথায় কেন ফাগুন্ দেশে আতুর আশ্রমের অভাব নেই।"

হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়া ব্যাকুল স্বরে ফাগুনী বলিল—"মৃণালবাবু।"

"কি ফাগুন?"

"বেশ, বেশ, দিন দিন খুব কথা তৈরী করতে শিখেছেন তো?"

"কেন ঠিক বলিনি কি—"

ফাল্গুনী বেশ ঝাঁঝের সহিত বলিল—"হ্যা হ্যা, খুব ঠিক, খুব সত্য, এমন সত্য কথা বললেন—যে তার ধার, ধারালো ছুরীর চেয়ে কর্কেরে...বেশ তো আপনি যদি অন্য জায়গায় গেলে ভাল থাকেন, তা হলে যান্ তাই থাকুন গে; সত্যিই তো ..আমাদের পরকে বেঁধে রাখবার কী ক্ষমতা আছে...? আপনার অন্য জায়গায় যদি সুবিধে হয় একলা যদি মনের সুখে থাকতে পাবেন তাই তা হলে থাকুন—আপনি সুখী হোন...।" প্রবল অশ্রুর উচ্ছ্বাস ফাল্গুনীর বাক্যের গতি রোধ করিয়া মধ্য পথেই থামাইয়া দিল। কাপড়ের মৃদু খস্‌খসানীর আওয়াজ পাইয়া মৃণাল বুঝিল যে, আপনাকে গোপন করিতে ফাগুনী চক্ষের অন্তরালে পলাইয়াছে। পাঁচ মিনিট পরেই ফাল্গুনী ঘুরিয়া আসিয়া চঞ্চল কণ্ঠে বলিল—"আপনার ওষুধ খাবার সময় হ'য়েছে উঠুন, আর গরম হালুয়া তৈরী করে এনেছি, কাল আপনার গলায় ব্যথা হ'য়েছে বলছিলেন না?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল—"ফাগুন এখনও মমতা ছাড়তে পার নি?"

উষ্ণ স্বরে ফাল্গুনী বলিল—"না না মমতা আবার কিসের ...মমতা, দয়া, ও সবের ধার ধারি না—এ কর্ত্তব্য কাজ তাই করে যাচ্ছি।"

"ও, তাই চোখের জলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে আত্ম-গোপন করতে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলে?"

মৃণাল হাসিয়া উঠিল। ফাল্গুনী কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—"কে বললে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিলাম?"

"বলবে আবার কে, তোমার গলার ভারী স্বর, আর এখনও বলছে।"

"মিথ্যে কথা, আমার চোখের জল আপনার জন্যে কেন পড়তে গেল...দু'দিন সেবা ক'রে কি এমন অধিকার পেয়েছি?"

"অভিমানিনী!" মৃণালের হাতের মধ্যে ফাল্গুনীর স্বেদ-সিক্ত কম্পিত হাতখানি বন্দী হইল।

(ক্রমশঃ)

ফুলের সাজি।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৮ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৩। [৩৫শ সপ্তাহ

ভাব-বৈচিত্র্য

উড়ে চাকর।

আহা! কি সুন্দর!

কাল শনিবার, এতক্ষণে···

বেরো এক্ষুণি বাড়ী থেকে !

হায় ! হায় ! তিনমার্কের জন্মে···

মৃতপুত্র দর্শনে—

বাবারে !

আলোচনা

ধ্বংস না গঠন?

"মিরাবোর বিশ্বাসঘাতকতা" "মিরাবোর বিশ্বাসঘাতকতা" চীৎকারে ফরাসী বিপ্লবের প্রথম যুগে ফ্রান্সের রাজপথ একদিন মুখরিত হইয়াছিল। বিপ্লব যজ্ঞের প্রধান হোতা কাউন্ট মিরাবো যখন ফরাসী রাজশক্তির সহিত সহযোগ করিয়া ফ্রান্সের শাসন সংস্কারের সংকল্প করিতেছিলেন, তখন প্রতিনিধি সভায় তাঁহার বিপক্ষদল সংবাদপত্রের মারফতে ঐরূপ সোরগোল আরম্ভ করিয়াছিলেন। ফ্রান্সের জনসাধারণ তাহাতে মিরাবোর প্রতি যে শ্রদ্ধা পোষণ করিত তাহা হারাইল। মিরাবো মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে পারিলেন না। অথচ ফরাসী বিপ্লবের যুগে মিরাবোই ছিলেন একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যিনি ফ্রান্সের শাসন সংস্কার করিবার মতন শক্তি ধরিতেন। মিরাবোর ব্যর্থতার ফলে ফ্রান্স বিপ্লবের তাণ্ডবে কিরূপ ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। ধ্বংসের নেশা যখন লোককে পাইয়া বসে তখন গঠনমূলক কোন প্রস্তাবই সে শুনিতে চাহে না।

আমাদের দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রেও দেখা যাইতেছে যে যখনই কোন স্বরাজ্যদলের বিশিষ্ট নেতা গবর্ণমেণ্টের সহিত সহযোগ করিয়া জাতি গঠনের প্রস্তাব করেন, তখনই সাধারণের মনে সন্দেহ হয় যে তিনি বুঝি মন্ত্রীত্বের লোভে নিজের স্বার্থের কাছে জাতির স্বার্থ বিসর্জ্জন দিতেছেন। এরূপ সন্দেহ যে একেবারে অমূলক তাহা নহে। কেননা ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী ও জননায়কদের মত হইতে বুঝা গিয়াছে যে বর্ত্তমান দ্বৈত শাসন প্রণালী দ্বারা দেশের কোন উপকার হইতে পারে না। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ মন্ত্রীত্ব লইতে চাহিলে সহজেই সন্দেহ হয় তিনি বুঝি পদমর্য্যাদা ও মোটা বেতনের লোভে গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মবিক্রয় করিতেছেন। কিন্তু কোন নেতা যদি এরূপ বলেন যে তিনি জনমতের দাবীর সাহায্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অধিকতর অর্থ আদায় করিয়া হস্তান্তরিত বিভাগের কার্য্য চালাইবেন তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তাব কি ভাবে দেশবাসীর গ্রহণ করা উচিত?

স্বরাজ্যদল এতাবৎকাল দ্বৈত শাসন ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্যেই কাউন্সিলে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অনেকবার তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের দলকে ভোটের জোরে হারাইয়া দিয়া দ্বৈত শাসন ধ্বংস করিলাম বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু দ্বৈত শাসন তাহাতে ধ্বংস হয় নাই বা ধ্বংসোন্মুখ হইবার কোন লক্ষণও প্রকাশ করে নাই। আগামী কাউন্সিলে তাঁহারা মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করিলেও অন্যদল মন্ত্রীত্ব গ্রহণে পশ্চাৎপদ হইবেন না। আর খুব সম্ভব স্বরাজ্যদল এত অধিক সংখ্যক প্রতিনিধি কাউন্সিলে পাঠাইতে পারিবেন না— যাহার দ্বারা অন্য কোন দলের শাসন পরিচালনা বন্ধ বা অচল করিয়া দিতে পারিবেন।

বাঙলা কাউন্সিলে সর্ব্বসমেত ১৩৯ জন সদস্য। তাহার মধ্যে গবর্ণমেণ্টের দ্বারা মনোনীত হইবেন ২৬ জন, বিশিষ্ট নির্ব্বাচকগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইবেন ২১ জন, আর মুসলমানগণ ৩৯ জন, ইউরোপীয় ও অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ানগণ ৭ জন ও অমুসলমান সম্প্রদায় ৪৬ জনকে নির্ব্বাচিত করিবেন। স্বরাজ্যদল যদি তাঁহাদের ধ্বংসমূলক কার্য্যই চালাইবেন স্থির রাখেন তাহা হইলে ৪৬টি অ-মুসলমান প্রতিনিধির মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ১৬টি প্রতিনিধি তাঁহারা হারাইবেন। কেননা ৫,৭টী জমীদার, ৫।৭ জন পারস্পরিক সহযোগী ও ২।১ জন অন্যান্য দলের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইবেনই। ভূস্বামীদের প্রতিনিধি ৫ জনও সম্ভবতঃ তাঁহাদের দলে যোগ দিবেন না। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধি ১৫ জনের মধ্যে অনেকই তো সাহেব থাকিবেন।

মুসলমানগণের প্রতিনিধিদের মধ্যে কেহ যে স্বরাজ্যদলে যোগ দিবেন তাহা মনে হয় না। মিঃ গজনভী টাঙ্গাইলের বক্তৃতায় পুনঃ পুনঃ মুসলমানদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন

যে তাঁহারা যেন কোন মোহ ও প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দুদের সহিত যোগ না দেন। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু নানা স্থানের বক্তৃতায় হিন্দুদের প্রতি অন্যায় করিয়া মুসলমানের পক্ষপাতিত্ব করিলেও, কলিকাতা কর্পোরেশনে তাঁহার অভিনন্দনে কোন মুসলমান যোগ দেন নাই। সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য বশতঃ স্বরাজ দলভুক্ত মুসলমান প্রার্থীরা পাড়াগাঁয়ে ভোট পাইবেন না। সেইজন্য মনে হয় স্যার আব্দার রহিমের মুসলমান দল বেশ প্রবল ভাবেই কাউন্সিলে দেখা দিবে। ৩৯টী মুসলমান প্রতিনিধির মধ্যে ৪।৫টী মাত্র তাঁহাদের হাত ফস্‌কাইয়া যাইতে পারে। স্বরাজ্য দল আশা করিতেছেন যে মুসলমান সদস্যদের মধ্যে মন্ত্রীত্ব লইয়া কলহ হইবে এবং এতাবৎকাল যেমন তাঁহাদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিয়াছে, তেমনি ভাবে এবারও দেখা দিয়া স্বরাজ্যদলকে ধ্বংস কার্য্যের সুযোগ দিবে। কিন্তু যখন হিন্দু মুসলমানের বিরোধ কলিকাতার গণ্ডী পার হইয়া মফঃস্বলেও প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে তখন মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে বিরোধ বিস্মৃত হইয়া একতাবদ্ধ হইবেন বলিয়াই মনে হয়। এরূপ হইলে স্বরাজ্য দল অপেক্ষা মুসলমান দলই কাউন্সিলে সংখ্যায় অধিক হইবেন। স্বরাজ্য দল দ্বৈত শাসন অচল করিবার পক্ষপাতী আর মুসলমান দল তাহা চালাইতে ইচ্ছুক; এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টের মনোনীত ২৬ জন সদস্য, ৭জন ইউরোপীয় ও আংলো ইণ্ডিয়ান সদস্য ও কয়েকজন ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিনিধি মুসলমান দলের সহিতই যোগ দিবেন। তাহা হইলে মুসলমানেরা মন্ত্রীত্ব লইয়া শাসন কার্য্য চালাইতে পারিবে ও স্বরাজ্য দল ধ্বংসের বিশেষ সুযোগ পাইবেন না।

আর যদি কোনরকমে দৈববলে স্বরাজ্য দল ধ্বংস প্রণালীতে অগ্রসর হইতেই সুযোগ পান, তাহা হইলেও দেশের তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে তাহা নহে। অনেকে ধ্বংস কার্য্যের উপর আস্থাহীন হইয়াছেন।

সম্প্রতি "বেঙ্গলী" পত্র হিন্দুস্থান বিল্ডিংস হইতে লিখিত একজন স্বরাজীর চিঠি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। "ফরোয়ার্ড" শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের গোপনীয় চিঠি প্রকাশ করিয়া যে সদৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছেন, "বেঙ্গলী" তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র। হিন্দুস্থান বিল্ডিংসে স্বরাজ্যদলের নেতাদের মধ্যে একা শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ই থাকেন। তিনি আবার "ফরোয়ার্ডের" অন্যতম ডিরেক্টার—ফরোয়ার্ড এমন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐ চিঠি কেহ লিখেন নাই—"বেঙ্গলী" জাল করিয়াছেন মাত্র। চিঠিখানির উৎপত্তি রহস্যজনক সন্দেহ নাই। চিঠিখানির একস্থানে আছে—"আমরা চাই যে, গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে বর্ত্তমান আয়ের মোটা রকম একটা অংশ দিবেন এবং বাকী টাকাটা আমরা ঋণ অথবা কর ধার্য্য করিয়া সংগ্রহ করিব। এই টাকাটা একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি গঠন-মূলক কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।" স্বরাজ্যদল বলিতেছেন যে এরূপ সর্ত্তে মন্ত্রীত্ব গঠন করিবার প্রস্তাব তাঁহারা করেন নাই।

কিন্তু এইরূপ প্রস্তাব করিলে দেশের পক্ষে তাহা ধ্বংস-মূলক কার্য্য প্রণালী অপেক্ষা অধিকতর মঙ্গলজনক হইবে। দেশে শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইলে পূর্ণ স্বরাজ কখনই আসিতে পারে না। জনমতকে গঠন করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কিন্তু কেবলমাত্র বেসরকারী চেষ্টায় এতবড় দেশের শিক্ষার অভাব বিদূরিত হওয়া কঠিন। অবশ্য আমরা এমন মনে করি না যে দেশবাসী শিক্ষার জন্য কেবল গবর্ণমেণ্টেরই মুখাপেক্ষী হইয়া থাকুক। দেশবাসী যতটা পারেন করুন—সঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লইলে জাতীয় উন্নতি দ্রুততর বেগে সাধিত হইবে।

স্বরাজ্যদল যদি রহস্যমূলক পত্রখানিতে উল্লিখিত দাবী পূরণের সর্ত্তে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিতে রাজী বলিয়া ঘোষণা করেন—তবে সকল অ-মুসলমান প্রতিনিধিই তাঁহারা পাইবেন। ইংরাজ সদস্যেরাও তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে পারেন—কেননা তখন গবর্ণমেণ্ট বুঝিবেন যে স্বরাজ্যদল দ্বৈত শাসন প্রণালী চালাইতে ইচ্ছুক। এরূপ গঠনমূলক প্রস্তাব লইয়া স্বরাজ্যদল উপস্থিত হইলে হিন্দুদের মধ্যে যে রাজনৈতিক দলাদলি আছে তাহাও প্রশমিত হইবে। আমাদের মতে এরূপ গঠন ধ্বংস অপেক্ষা ভাল।

আর স্বরাজ্যদল যদি ধ্বংস করিব বলিয়াই জেদ ধরিয়া থাকেন তবে মুসলমান মন্ত্রীদল গঠিত হইবেই। হয়তো

তুইজন মুসলমান ও একজন অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান মন্ত্রী হইবেন মুসলমান মন্ত্রীদল গঠিত হইলে, তাঁহারা যথাসাধ্য মুসলমানদের পক্ষপাতিত্ব করিবেন—আশঙ্কা হয় শিক্ষার মধ্যেও সাম্প্রদায়িক ভাব প্রাবল্য লাভ করিবে। ইহাতে হিন্দুগণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিবেন ও দেশের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হইবে। এইসব দিক বিবেচনা করিয়া স্বরাজ্য দলের কর্ত্তব্য এখন তাঁহাদের নীতির কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করা। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক রাজনৈতিক দল নীতি পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন—তাহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদা বা প্রতিপত্তির হানি হয় না।

কলিকাতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা—

কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। কলিকাতায় ইস্কুলে যাইবার মতন ছেলে আছে একলক্ষ। বর্ত্তমানে কলিকাতায় যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তাহাতে মাত্র বিশহাজার ছেলের স্থান হইতে পারে। বাকী আশী হাজার ছেলে সামান্য লেখাপড়া শিখিবারও কোন সুযোগ পায় না। কলিকাতার ন্যায় ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সহরে শিক্ষার অবস্থা এইরূপ ইহা সমগ্র জাতির পক্ষে অপরিসীম লজ্জা ও দুঃখের ব্যাপার, এরূপ অবস্থার প্রতিকার চেষ্টা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। কর্পোরেশন যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে এই কার্য্যে ২৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয় পড়িবে। ইহার মধ্যে প্রায় তের লক্ষ টাকা একটা শিক্ষাকর নির্দ্ধারণ করিয়া তুলিবার প্রস্তাব আছে। বক্রী টাকার কতক অংশ কর্পোরেশন ও কতক অংশ গবর্ণমেণ্ট দিবেন। যদি গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে রাজী হয়েন, তবে কলিকাতাবাসীর শিক্ষাকর দিতে কার্পণ্য করা কখনই কর্ত্তব্য নহে। কর্পোরেশন দেখাইয়াছেন যে এই করের পরিমান অতি সামান্যই হইবে। দিল্লী মিউনিসিপ্যালিটির কয়েকটী ওয়ার্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কলিকাতা সহরে ইহার যাহাতে প্রবর্ত্তন হয়, সে বিষয় প্রত্যেকেরই যত্ন লওয়া কর্ত্তব্য।

কৃষক ও বেপারী—

আমাদের দেশে কো-অপারেটিভ আন্দোলনের প্রসার না হওয়ায় কৃষকদের দারিদ্র্য ঘুচিতেছে না। কৃষকেরা বহু পরিশ্রম করিয়া পাট প্রভৃতি শিল্পোপযোগী যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে তাহা বেপারীদের কাছে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। বেপারীরা অতি অল্পমূল্যেই উহা কিনিয়া থাকে। পাটের দাম যখন খুব চড়ে, তখনও কৃষকেরা বেশী লাভ করিতে পারে না। তুলা কমিশনের রিপোর্টে সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে ৭।৮ বেপারী দালালী করিয়া কৃষকের ন্যায্য প্রাপ্য লভ্যাংশ বণ্টন করিয়া লয়। কো-অপারেটিভ সোসাইটী গুলি যদি কৃষকের মাল কিনিয়া বরাবর জাহাজে চালান দিবার ব্যবস্থা করিতে পারে, তবে কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা দালাল আর ধড়িবাজী করিয়া কৃষকদিগকে ফাঁকী দিতে পারিবে না।

মুসলমান পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধির দাবী—

মুসলমান নেতা স্যার আবদার রহিম, মিঃ সুরওয়ার্দ্দি মিঃ গজনভী প্রভৃতি কাউন্সিলে দাবী করেন যে, পুলিশ-বিভাগ মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হউক। এরূপ প্রস্তাব যে কেবল অসঙ্গত তাহা নহে—ইহা দেশের শান্তিরক্ষার বিরোধী। পুলিশের উপর শান্তিরক্ষার ভার আছে। দেশের মধ্যে এখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে। এ পর্য্যন্ত সকল স্থানেই হিন্দুরা প্রথমে আক্রান্ত হইয়াছেন ও হতাহতের সংখ্যা হিন্দুদের মধ্যেই বেশী। পাবনা ও কুষ্টিয়ায় হিন্দুদের উপর মুসলমানেরা অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে ও করিতেছে। এরূপ অবস্থায় আবার যদি পুলিশ এবং পুলিশের বড়কর্ত্তাদের সংখ্যাও মুসলমানদের মধ্যে বেশী হয় তবে তো হিন্দুদের ধনপ্রাণ লইয়া বাস করাই কঠিন। অন্য সব চাকুরীতে মুসলমানের দাবী গবর্ণমেণ্ট গ্রাহ্য করুন তাহাতে আপত্তি নাই—কিন্তু এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের সময় পুলিশ বিভাগে নিয়োগ-নীতি যেন গবর্ণমেণ্ট পরিবর্ত্তন না করেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

পাবনায় বিপন্ন-হিন্দু—

পাবনায় সাম্প্রদায়িক বিরোধের যে লোমহর্ষণ সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে কেবলমাত্র পুলিশ বা ফৌজের উপর হিন্দুর মান ও প্রাণ রাখিবার ভার দিয়া রাখিলে

চলিতেছে না। পাবনা জেলায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা চার গুণ অধিক। হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদের সহিত পারিয়া ওঠা অসম্ভব। পুলিশ ও ফৌজ গ্রামগুলিকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না—হিন্দুরমণীগণ মানহানি হইবার আশঙ্কায় জঙ্গলে ও পাটের ক্ষেতে লুকাইতেছেন শুনা যাইতেছে। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের সাহায্য করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"হিন্দুকে হিন্দু রক্ষা না করিলে আর কে করিবে?"

আর কতদূরে স্বরাজ?

১৯২১ খৃষ্টাব্দে অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনায় ও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের অনুপ্রেরণায় যে স্বরাজ করতলগত আমলক খণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল—আজ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহ্নির প্রলয় আলোকে সেই স্বরাজের চিত্র দূরে অতিদূরে সরিয়া যাইতেছে দেখিতে পাইতেছি। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের দৃঢ় ভূমিতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল—কিন্তু পাঁচ বৎসর পরে আজ যেন মনে হইতেছে সে মিলন নিশার স্বপনের ন্যায়ই অলীক।

এই ভীষণ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে—স্বরাজ লাভের আশাকে সুদূর পরাহত করিয়া তুলিতেছে তাহা সকলেই উপলব্ধি করিতেছেন। আর রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুদল ও মুসলমানদল যদি গড়িয়া উঠে তাহা হইলে যে হীন স্বার্থের ক্ষুদ্র কলহেই ভারতবর্ষের সকল উৎসাহ ব্যয়িত হইবে তাহাও সকলে বুঝিতেছেন। এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান হিন্দু জননায়কদের মধ্যে কেহ কেহ যদি সাম্প্রদায়িক কলহে যোগ না দিয়া জাতীয়তার উদার ভূমির উপর রাজনৈতিকদল প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের ধীরতা ও সাধু সংকল্পকে প্রশংসা করাই কর্ত্তব্য। স্বরাজ্যদলের নায়ক শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয় ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ এইরূপ কর্ম্মপদ্ধতি অবলম্বন করিয়াই হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তির উপর স্বরাজ দলকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ চেষ্টা প্রথমতঃ সফল হওয়ার সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প, দ্বিতীয়তঃ ইহা হিন্দুর পক্ষে সর্ব্বনাশকর।

স্বরাজদল নানা উপায়ে মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলেও তাঁহারা হিন্দুদের প্রতি এতই সন্দিহান হইয়া উঠিয়াছেন যে হিন্দুপ্রধান স্বরাজদল বা অন্য কোন দলের সহিত তাঁহারা কোনরূপ সংস্রব রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। কর্পোরেশনে যে সকল মুসলমান সদস্য ছিলেন তাঁহারা স্বরাজদলভুক্তই ছিলেন—তথাপি যে তাঁহারা পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন ইহাতেই বোঝা যায় যে মিলনের সম্ভাবনা কত অল্প। অপরদিকে অনেক প্রতিপত্তিশালী হিন্দু যাঁহারা বর্ত্তমান কাউন্সিলে স্বরাজী হইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন তাঁহারা স্বরাজদলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিতেছেন।

দ্বিতীয়তঃ স্বরাজদলের উদার জাতীয়তাবাদ যে হিন্দুর কতদূর সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে তাহা পাবনার ও কলিকাতার তৃতীয় দাঙ্গা হইতেই বুঝা যাইতেছে। পাবনার মুসলমানগণ হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যায় চারগুণ বেশী বলিয়াই অকারণে তাহাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিতেছেন। সরকারী সংবাদে যদিও প্রকাশ যে ব্যাপার বিশেষ গুরুতর নহে, তথাপি হিন্দুনেতা ও বাঙ্গলা সংবাদপত্রের নিজস্ব প্রতিনিধিগণ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে যে সকল সংবাদ প্রেরণ করিতেছেন তাহা পাঠ করিয়া হিন্দুর ভীষণ দুর্দ্দশা চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে। বাঙ্গলার বুকের উপর যখন পিশাচের তাণ্ডব উদ্দণ্ড ভাবে চলিতেছে তখন আধাসরকারী ষ্টেটস্‌ম্যান প্রভৃতি সংবাদপত্র ফুটবল খেলা বা ফরাসী ফ্রাঙ্কের উপর সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতেছেন—পাবনা সম্বন্ধে তাঁহারা প্রায় নীরব। কিন্তু সংবাদপত্র গুলিতে দিনের পর দিন যে সকল মর্ম্মান্তিক সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহা পাঠ করার পরও কি কেহ বলিবেন যে মুসলমানদিগের সহিত যে কোন উপায়ে মিলন সাধন করিতেই হইবে? এই যে কোন উপায় মানে যে হিন্দুর অস্তিত্বের বিলোপ সাধন তাহা কি স্বরাজদল উদারতার মোহে ভুলিয়া যাইতেছেন? পাবনায় অনেকগুলি গ্রামে হিন্দু অধিবাসীরা এমনভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছেন যে পরদিন মাটির পাত্রে করিয়া তাঁহাদিগকে একটু জল খাইতে হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূ দারুণ বর্ষা মাথায় করিয়া জঙ্গলে যাইয়া আশ্রয় লইয়াছে—সেখানে ব্যাঘ্র ও শূকরের প্রবল ভীতি সহ্য করিয়া অনাহারে রাত্রি যাপন করিয়াছে।

এরূপ অত্যাচার যাহারা করিতে পারে তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া দেশের রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করা কেমন করিয়া সম্ভব ?

কলিকাতায় রাজরাজেশ্বরী বিসর্জ্জন উপলক্ষে যে দাঙ্গা হইল, তাহাতেও মুসলমানগণের ঐরূপ অযৌক্তিক জিদ প্রকাশ পাইয়াছে। পুলিস কর্ত্তৃক নিরূপিত নামাজের সময় বাদ দিয়া শোভাযাত্রা বাহির করিয়া কোনরূপ শান্তিভঙ্গের উদ্যম না করিয়াও হিন্দুগণ প্রথমে মুসলমানদিগের নিকট প্রহৃত হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, গঙ্গায় মূর্ত্তি বিসর্জ্জন কালে কোনরূপ মসজিদ ত্রি-সীমানায় না থাকিলেও মুসলমান মাঝিরা নৌকা হইতে শোভাযাত্রাকারীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে।

এই সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যদি রাজনৈতিক কোন সুবিধার জন্য মুসলমানদের সহিত হিন্দুরা মিলিত হয়েন, তবে হিন্দুর অবস্থা যে কি শোচনীয়তর হইবে তাহা ভাবিতেও গা শিহরিয়া উঠে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি এক সম্প্রদায় নতি স্বীকার করিয়া আত্মবিক্রয় করে, তবে তাহাদের অপমান ভার জাতীয়তার বুকে জগদ্দল পাথর হইয়া চাপিয়া সকল উন্নতির আশা প্রত্যাহত করিবে।

মুসলমানগণ যেমন নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইতেছেন ও সেই দলকে রাজনৈতিক কার্য্যে পরিচালিত করিবার সংকল্প করিতেছেন হিন্দুদেরও সেইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া রাজনীতিক্ষেত্রে ও সর্ব্বত্র অবতীর্ণ হওয়া কর্ত্তব্য। এখনও যদি হিন্দু রাজনৈতিকগণ, স্বরাজ্যদল, পারস্পরিক সহযোগী দল, স্বতন্ত্র দল প্রভৃতি নানা দলে বিভিক্ত হইয়া পরস্পরের মধ্যে কলহ করিতে থাকেন তাহা হইলে দেশের চরম দুর্দ্দশা উপস্থিত হইতে যেটুকু বাকী আছে, তাহাও অবিলম্বে ঘটিবে।

এইরূপ সাম্প্রদায়িক দল গঠনে স্বরাজ লাভের দিন অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য পিছাইয়া যাইবে। কিন্তু আগে হিন্দুর মান সম্ভ্রম ও প্রাণরক্ষা করা তারপর স্বরাজ লাভ। যদি হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে নির্ম্মূল হইয়া যায় তবে স্বরাজ ভোগ করিবে কে ?

পরাধীন জাতির পক্ষে জাতীয়তার আন্দোলন চালাইবার পক্ষে যে কত বিঘ্ন তাহা গত পাঁচ বৎসরের ইতিহাস হইতেই দেখা যাইতেছে। আজ সজল নয়নে হতাশ হৃদয়ে কেবল আক্ষেপ করিতে হইবে—আর কতদূরে স্বরাজ !

ঘর সামলাও *

[শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র রায়]

প্রায় ৮ বৎসর কাল আমি ইউরোপে বাস করেছি এবং ৪ বার যাতায়াত করেছি, আর গত ৩ বৎসরে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী অন্যূন ৪০ হাজার মাইল আমাকে ভ্রমণ করতে হয়েছে, এমন কি গত তিন মাসের মধ্যে হিসাব ক'রে দেখেছি ৮ হাজার মাইলের বেশী পর্য্যটন করেছি, এখন জীবনের সন্ধ্যা সময়ে সকল বিষয়ে আলোচনা করবার বড়ই স্পৃহা হয়েছে।

সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশবার আমার সুযোগ হয়েছে। বোম্বাই আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানের যারা বহু ক্রোরপতি ধন-মদে মত্ত তাদের থেকে যারা কুটীর বাসী তাদের সকলের সঙ্গে আমি সমানভাবে সংশ্রবে এসেছি। এই যে একটা নব জাগরণের তরঙ্গ সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয়েছে, তার সঙ্গে সঙ্গে, ঢেউতে নৌকা যেমন মাঝখানে হাবু-ডুবু খায়, উঁচু নীচু হয়, আমিও সেরূপ কিছু কিছু হয়েছি, অন্ততঃ নিজেকে হতে দিয়েছি। কি জন্য আমরা অত পিছিয়ে আছি, এখন তা বুঝতে পারছি। আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের মত এক একটা আন্দোলন উপস্থিত হয়, দেখা যায় শীঘ্রই সেটা শূন্যে বিলীন হ'য়ে যায়। আমাদের অন্তরতম প্রদেশে তার ঢেউ প্রবেশ করতে পারে না। উপরে যেন ভাসা-ভাসা। তার কারণ কি তলিয়ে দেখতে হ'বে।

আমরা বাঙ্গালী জাতি বড় ভাবপ্রবণ। কোন একটী কাজে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়ে, যাকে বলে লেগে-পড়ে থাকা, কামড়ে থাকা, তা থাকতে পারি না। এখান থেকে অনেকবার বলেছি—আমাদের আবেগ, উৎসাহ, ঠিক খড়ে আগুন লাগছে যেমন খানিক দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে কিন্তু পরক্ষণেই একেবারে নির্ব্বাপিত হয়ে যায়, তার কিছু চিহ্নও দেখা যায় না, ঠিক সেই রকম, কিন্তু এমন কাঠ আছে, যেমন তেঁতুল কাঠ, শাল কাঠ, একবার যদি জ্বেলে দেওয়া যায়, উপরে দেখা যায় ভস্ম আচ্ছাদিত, কিন্তু ভিতরে একমাস দু'মাস পর্য্যন্ত আগুন জ্বলতে থাকে। কারণ কি? বাঙ্গালী জাতির মধ্যে এমন কিসের অভাব আছে যে কারণে আমরা কোন কাজে সে রকম সফলকাম হ'তে পারি না, আমাদের দুর্ব্বলতা কোথায়, একবার আলোচনা করে দেখা যাক্।

হলাণ্ডের মত একটী দেশ, বোধ হয় বাংলার সামান্য একটী অংশ কেটে দিলে যা হয়—এক ময়মনসিংহ জেলার আয়তন হয় কিনা সন্দেহ, আবার তার অধিকাংশ সমুদ্র-গর্ভের নীচে, বাঁধ যদি ভেঙ্গে যায়, হলাণ্ডের অর্দ্ধেক সমুদ্র-নিমজ্জিত হ'য়ে যাবে—এই ছোট দেশ যার অস্তিত্ব প্রকৃতির সঙ্গে মহাযুদ্ধ সাধন করেছে, সেখানে প্রায় ৩ শত বৎসর আগে বিপুলকায় স্পেন প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছিল। যখন স্পেন সাম্রাজ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল, যখন ইউরোপের প্রায় অর্দ্ধেক স্পেনের পদতলে যে স্পেন হ'তে রৌপ্য বোঝাই হ'য়ে এসে মুদ্রায় পরিণত হ'ত, যে স্পেন একদিন ইংলণ্ড বিজয় করতে প্রবল চেষ্টা করেছিল, সেই স্পেন অতি ক্ষুদ্রকায় হলাণ্ডকে কখনও জয় করতে পারে নি, সে তার প্রটেষ্টেণ্ট ধর্ম্ম বজায় রেখেছিল, এরই বা কারণ কি, আর আমরা এতবড় একটা জাতি, সংখ্যায় পাঁচ কোটী, আমরা জগতের কাছে উপহাসাস্পদ হই কেন? আমাদের ভিতর যে কত রকম দুর্ব্বলতা আছে, গলদ আছে, বাহিরের লোক স্বপ্নেও তা ভাবতে পারে না। মানুষ মানুষের হাতে খাবে না, তার ছায়া মাড়াবে না, হিন্দু-ভারতবর্ষের বাহিরের লোক তা ধারণা কর্ত্তে পারে না। এমন কি এই ভারতবর্ষের মধ্যে সাঁওতাল, কোল, ভীল, গারো তারা পর্য্যন্ত ধারণা করতে পারে না—মানুষ মানুষকে ছুঁলে অপবিত্র হয়। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন—কুকুরকে আদর করে' মানুষ কোলে করে, কিন্তু মানুষ কাছে

* সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে বক্তৃতা

এলে তথাকথিত উচ্চশ্রেণী যাদের বলি, তারা একেবারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। সম্প্রতি মাদ্রাজে তথাকথিত একজন অস্পৃশ্য জাতীয় লোক ভাবের আবেগে মন্দিরে অর্চ্চনা করিবার জন্ম পরিচ্ছন্ন হয়ে ঢুকেছিল। মন্দিরের সম্মুখীন হয়ে দেবতাকে প্রণিপাত করল, তারপর তার স্মরণ হ'ল সে অস্পৃশ্য, তখন সে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল আর কতগুলি লোক তাকে চিনে ফেল্লে এবং অমনি চীৎকার করে উঠল—মন্দির অপবিত্র হয়েছে—সর্ব্বনাশ হল, তখন তাকে চোর ডাকাত পরহন্তার মত পুলিশের হাতে সমর্পণ করা হ'ল, বিচারপতি বোধ হয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ছিলেন; সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ, তাঁর জরিমানা হ'ল। অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান নেতা শ্রীযুত রাজগোপাল আচারিয়া যদিও তিনি আদালতে প্র্যাক্টীস বন্ধ করেছেন, নিজকে সম্বরণ করতে পারলেন না, তার হয়ে উচ্চ আদালতে আপিল করালেন, আপিলে অবশ্য সে নিষ্কৃতি পেল কিন্তু উচ্চ আদালতের বিচারপতি আসল বিচার করলেন না। ইংরাজিতে যাকে বলে টেকনিকল গ্রাউণ্ড—এ যে ইচ্ছা করে অপবিত্র ক'রেছে তার কোন প্রমাণ নাই—এই বলে নিম্ন আদালতের রায় নাকচ করলেন। দেখুন, দেবতা অর্চ্চনা করতে মন্দিরের সম্মুখীন হয়েছিল, এই অপরাধে তাকে কত নিগৃহীত লাঞ্ছিত হ'তে হয়েছে, এই একটী ব্যাপার।

তারপর অনেক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের জন্ম চাঁদা তুলতে আমি অনেকের ঘরে ঘরে ঘুরেছি, অবশ্য খুলনা দুর্ভিক্ষে, উত্তরবঙ্গ বন্যায় অজস্র টাকা পেয়েছি কিন্তু জাতীয় কাজে নানাবিধ অনুষ্ঠান—যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণ হ'তে পারে—এমন অনেক রকম কাজে দেখেছি অর্থ পাওয়া যায় না—এর কারণ তলিয়ে দেখা দরকার হয়েছে। কথা এই—দেশাত্মবোধ জন্মেছে কয়জনের মধ্যে? মুষ্টিমেয় সামান্য কয়জন, যাদের আমরা শিক্ষিত বলি—তাদের মধ্যে। তাদের সংখ্যা কত? জর্জ্জ দি থার্ডের সময় সিভিল ওয়ারের কথা আপনারা পড়ে থাকবেন। যখন ক্রমওয়েল হেমডেন প্রভৃতি জর্জ্জকে বাধা দিবার জন্ম পার্লামেণ্টে অগ্রণী হলেন, তখন এক লণ্ডন সহরে যত ধনী সব একত্র হ'য়ে স্বদেশ-সেবকের পক্ষাবলম্বন করলেন, তাঁরা অজস্র অর্থ দিলেন আর যারা নবলমেন, যাঁরা রাজার পক্ষ অবলম্বন করলেন, তাঁরা অর্থ পেলেন না—তাঁরা সাধারণের সহানুভূতি হ'তে বঞ্চিত হলেন, সাধারণ লোকেরা নিজেদের গয়না, রৌপ্য-নির্ম্মিত বাসন ইত্যাদি বিক্রী করে সাহায্য করতে লাগল, সহরে যারা ছিল তারা অজস্র অর্থ দিল। সেইরূপ স্পেন যখন হলাণ্ডের দ্বারে এসে উপস্থিত হ'ল বড় বড় সহরের যারা ধনী বাণিজ্য করে অজস্র অর্থ উপার্জ্জন করত, তারা সে টাকা দেশের কাজে নেতাদের হস্তে অর্পণ করল! কিন্তু আমরা অতি সামান্য টাকা পাই, কারণ কি? আমাদের দেশে যাদের ভিতর দেশাত্মবোধ হয়েছে তারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, কোন রকমে তারা দিনপাত করে, তাদের অর্থ দেবার সামর্থ্য নাই, বাংলা দেশে যাদের হাতে ধন, সে হচ্ছে—বড়বাজারের মাড়োয়ারী ভাটিয়া; বাঙালীর মধ্যে সাহা, তিলী, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক ইত্যাদি। এখন কথা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে আমাদের সহানুভূতি আছে কি না। সহানুভূতি কথা হচ্ছে দুটী কথার সংযোগে, স আর অনুভূতি। একটা সাড়া যখন জাতির ভিতর প্রবেশ করে বৈদ্যুতিক প্রবাহ যেমন পরিচালক ধাতুর ভিতর দিয়ে যায়, সেরূপ সেটা সমস্ত জাতিকে স্পন্দিত করে তোলে। আর অনুভূতি কিসের দ্বারা বুঝা যায়? জাতি তখন হ'ল স, যখন সকলে একটা বিষয় সমান ভাবে ভাবতে পারে, চিন্তা করতে পারে। কিন্তু আমরা যখন ওদের কাছে আবেদন করি, তারা কিছু বুঝতে পারে না। বাংলার অঙ্গচ্ছেদের সময়ের কথা মনে করুন, সে আজ ১৭।১৮ বৎসরের কথা, যখন সমস্ত শিক্ষিত বাঙালী পণ করলে, বিদেশী কাপড় পরব না, সে পণ কি টিকল? কেন টিকল না? শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ মাত্র আর নিরক্ষর অশিক্ষিত, যারা কোন রকম দেশের কথা ভাবতে পারে না, তাদের সংখ্যা ৫ কোটী। চাষারা জিজ্ঞাসা করল—"বাবুরা এখন খোসামোদ করছে কেন—বিলেতী কাপড় পরিস না; বাবুদের বুঝি দরকার হয়েছে, আর কখনও ত তারা আমাদের কাছে আসে নাই," হেসে উড়িয়ে দিল। আসল কথা—আমরা কয়জন দেশের জন্ম চিন্তা করতে শিখেছি, ওরা শিখে নি।

বাংলার অধিবাসী মোটামুটী ৫ কোটি, তার মানে ৫ শত

লক্ষ, এর মধ্যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ ২৫ লক্ষ প্রায় সমান সমান আর বৈদ্য এক লক্ষের চেয়ে কম, মোট ২৫।২৬ লক্ষ যাদের মধ্যে কিছু শিক্ষার বিস্তার আছে, তাহলে ৫ লক্ষের মধ্যে শতকরা ৫জন মাত্র শিক্ষিত। বাকী ৯৫ জন কোথায়? তারপর যখন বলি ব্রাহ্মণ কায়স্থ শিক্ষিত, তার অর্থ কি? অবশ্য যখন পাশের লিষ্টে দেখি, চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় এরা অবশ্য উচ্চশ্রেণী কিন্তু ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের মধ্যে কয়জন চট্টোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত? পাড়াগাঁয়ে গিয়ে দেখুন কত নিরক্ষর রয়েছে, প্রত্যেক কায়স্থ কি শিক্ষিত? বহুতর ঘর শিক্ষিত, আবার অনেক অশিক্ষিত আছে। কথায় বলে – জাত হারালে কায়েত, ব্রাহ্মণের মধ্যে রাঁধুনী বামুন, পূজারী বামুন, ভিখারী বামুন আছে। মজার কথা, দেখুন—ব্রাহ্মণ শব্দ, আর ঠাকুর শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তা সম্মানসূচক কিন্তু বামুন-ঠাকুর বল্লে যাদের বুঝায় তারা যে খুব সম্মানীয়—মনে হয় না। হাসি পায় বটে, কান্নাও পায়, আমি ১৫।১৬ বৎসর আগে বক্তৃতা করতে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রেরিত হয়ে বাঁকীপুরে গিয়েছিলাম, সেখানে একজন অধ্যাপক বল্লেন—বিহারে যদি অনুন্নত শ্রেণী বলতে হয়; সে ব্রাহ্মণ উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলেও তাই, তারা দোবে চৌবে পাঁড়ে কলিকাতার বড় বড় বাড়ীতে দারোয়ানগিরি করে, তাদের পৈতা আছে, দিনান্তে ময়দা গুলে' চাপাটী করে খায়, অন্ন-চিন্তায় কোন্ দেশ ছেড়ে কোথায় এসেছে। বিহারী ব্রাহ্মণদের আমরা উড়ে বামুন বলি, উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে যারা নেতা সব কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মতিলাল নেহেরু, পরলোকগত সাদিলাল এঁরা সকলে কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ, কেহ ১০০।১৫০।২০০ বৎসর ধরে বাস করছেন। উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের ব্রাহ্মণ গেল কোথায়? এদের অত হীন অবস্থা কেন, আলোচনা করা দরকার।

কথা এই—যখন কোন একটা সম্মান, কোন একটা সুবিধা, কি যা-কিছু অধিকার আয়ত্ত করি এবং সেটা যখন অভিজাত্যের সম্মান বলে' জন্মগত করা হয়, বংশপরম্পরাগত করা হয়, তখন থেকে সে শ্রেণীর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়, তখন আর লেখাপড়া শিক্ষা হবে না, অথচ পূজা করব, দক্ষিণা পাব, সে জন্য আমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি ৫৪ বৎসর আগে কলিকাতা এসেছি। যখন স্কুলে আসতাম, দেখেছি রাস্তার পাশে লোক দাঁড়িয়ে থাকত ছোট ব্রতের বাটী নিয়ে, জিজ্ঞাসা করত—মশায়, আপনি কি ব্রাহ্মণ? একটু পাদোদক দিন, এখন দেখা যায় না, সাবেক কালের বৃদ্ধ স্ত্রীলোক এখনও আছে—একাদশীর পর, ব্রতের পর পাদোদক পান না করে আহার করবে না। অর্থাৎ আমি যতই গণ্ডমূর্খ হই না কেন আমার যদি কতগুলি প্রভুত্ব থাকে ক্ষমতা থাকে তাহলে আমার আর নিজের কোন রকম চেষ্টা করবার দরকার হয় না, অলস হয়ে পড়ি, যেমন বংশগত জমীদার, দেখে দুঃখ হয়; সম্প্রতি আমাকে তাদের অনেকের কাছে যেতে হয়েছে, দেখেছি যেমন অলস তেমনি বিপুলকায়—শরীরং ব্যাধিমন্দিরং, কোন রকম ব্যায়াম করবে না, বেড়াবে না, মাটীতে পা স্পর্শ করবে না তাহলে তাদের অপমান হয়, তাতে হয় কি? ব্যামো নিত্য লেগে আছে। অথচ বিলেতে যান—বহু ক্রোরপতি—কোন শ্রেণীবিভাগ নেই—ফার্ষ্ট ক্লাস, সেকেণ্ড ক্লাসে শ্রমজীবী ক্রোরপতি পাশাপাশি বসল আধ মণ ওজনের ব্যাগ নিয়ে, অথচ আমাদের দেশে যদি একটু অর্থ হয়, বাপ যদি কিছু রোজগার করে রেখে গেল, চৌদ্দ-পুরুষ কাজে খতম, সে রকম যারা ব্রাহ্মণ বলে একবার কতকগুলি ক্ষমতা পেল, সমাজে যারা কুলীন হল—বল্লাল-সেনের সময় কুলীনের লক্ষণ দিলে—আচারোবিনয়োবিদ্যা-প্রতিষ্ঠাতীর্থদর্শনং ইত্যাদি—একি কখনও হয়েছে? হয় না কিন্তু কৌলিন্য বংশ-পরম্পরাগত হয়ে গেল। তাঁরা শাস্ত্র-কথা বলেন, পূজা করেন, সব তাঁদের হাতে। প্লেন লিভিং এণ্ড হাই থিঙ্কিং উঠে গেল, নিজের পরিশ্রমে রোজগার করে থাকে—এ রীতি উঠে গেল। বল্লালসেনের পর কুলীন, নৈকষ্য কুলীনের প্রথার সৃষ্টি হল, আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি—কুলীনের ছেলে ৫০।৬০টী বিবাহ করেছে, কখন কখন ৩।৪টী বালিকাকে এক পাত্রে একই সময়ে সম্প্রদান করা হয়েছে, এক সঙ্গে সাত পাক ঘুরিয়ে দেওয়া হল—এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। কথা এই—ব্রাহ্মণ বলে যখন কতগুলি দাবী দাওয়া করি আর তা যখন ২।৩ হাজার বৎসর ধরে চলে তখন সেখানে ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশের বীজ নিহিত থাকে, বুঝা যায় না। সেরূপ বংশানুক্রমিক কৌলিন্য প্রথার মধ্যে

অধঃপতনের বীজ নিহিত থাকে। কিন্তু বিলেতে দেখুন আর্চ্চ বিশপ অফ কেণ্টারবেরী, কত ধর্ম্মযাজক, তারা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, অন্যান্য সকল শ্রেণীর সঙ্গে তারা মাথা তুলতে পারে, খৃষ্টান মিশনারীরা রামমোহন রায়ের সময় থেকে এ দেশে এসে উচ্চশিক্ষা-বিস্তারে কত সহায়তা করেছে, এখনও কত মিশনারী কলেজ আছে, ইউরোপের ধর্ম্মযাজকগণ অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ প্রভৃতি বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি-ধারী, ধর্ম্মযাজকের পদ বংশগত নয়, যে কোন লোক—খৃষ্টানদের মধ্যে বলুন, মুসলমানের মধ্যে বলুন—ধর্ম্মযাজক হতে পারে। আর আমাদের ধর্ম্মযাজক—মোহান্তগণের চরিত্র কি রকম বলবার প্রয়োজন নাই, আমাদের পুরোহিত—যাদের দ্বারা আমরা ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করে থাকি—অনেকে সংস্কৃত জানে না, অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না, কোন রকম করে মুখস্থ করে, লক্ষ্মীপূজায় দক্ষিণা দু পয়সা কি জোর চার পয়সা, আর আলো চাউল, কলা গামছা বগলে করে অর্দ্ধেক মন্ত্র তাও উচ্চারণ করতে পারে না—করতে করতে চল্ল আরেক বাড়ীতে, মন্ত্র বুঝে না, ক অক্ষর গোমাংস, সংস্কৃতের সঙ্গে পরিচয় নাই অথচ সে উচ্চারণ করলে তবে ভগবানের কানে পৌছবে, আমি তুমি করলে পৌছবে না—যতই আমরা সংস্কৃত জানি। তাদের স্বভাব চরিত্র কি রকম—শ্লোকেই আছে—পুরীষের পু, রোষের রো, হিংসার হি এবং তস্করের ত—এ সমস্তের সার পদার্থ লইয়া আমাদের পুরোহিতের সৃষ্টি হইয়াছে, বাণভট্টের আরেক খানি বইতে পেটুক ব্রাহ্মণের বর্ণনা আছে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দীতে যখন হিউয়েন সঙ ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন তখন তিনি ব্রাহ্মণদের দুরবস্থা দেখে গেছেন! এখন দেখুন ওদের ধর্ম্মযাজক আর আমাদের মোহান্তে কত প্রভেদ।

তারপর সামাজিক অবস্থা সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করছি।

মেকলে বলেছেন—ওদের মধ্যে যে কোন লোক পিয়ার পর্য্যন্ত হতে পারে চোখের উপর দেখুন আমাদের ভাইসারয় লর্ড রেডিং—একদিন সামান্য লস্কর হয়ে জাহাজের মাস্তুলে উঠত, ডেক পরিষ্কার করত, এই রকম কাজ করতে করতে কলিকাতায় এসেছিলেন। তিনি জাস্টিতে জু, আজ তিনি ভাইসরয়; লর্ড চিফ্ জাষ্টিস ছিলেন, প্রতিভাবলে কিরূপ উন্নীত হয়েছেন। অনেক রকম দৌত্য-কার্য্যে যুদ্ধের সময় আমেরিকা-প্রেরিত হন, তাতে খ্যাতি অর্জ্জন করেন তারপর পিয়ার অব দি রিলম হয়েছেন। সুতরাং বিলেতের পিয়ার আর আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ে অনেক প্রভেদ। আমি যদি নৈকষ্য কুলীন—খড়দহের মেল হলাম, অন্য মেলের সঙ্গে আমার ক্রিয়া কলাপ হবে না, কি রকম গণ্ডীর ভিতর আমরা আপনাকে আবদ্ধ করে রেখেছি, প্রত্যেক পরিবার যেন এক একটী গড় কেটে চারিদিকে পরিখা করে রেখে দিয়েছে, পাছে বাহিরের শত্রু আসে, এ রকম করে করে আমাদের কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, আলোচনা করা দরকার।

আগে বলেছি ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য ২৫।২৬ লক্ষ, মুসলমান প্রায় অর্দ্ধেক শতকরা ৫২, নমশূদ্র ২২ লক্ষ, ব্রাত্য ক্ষত্রিয় মাহিষ্য প্রভৃতি রয়েছে, বাগদী আছে, চামার আছে, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জায়গায় আর এক সম্প্রদায়—যাদের মাল্লী বলে—তারা আছে, তারাও এক রকম অস্পৃশ্য! থার্ম্মোমিটারের যেমন স্কেল আছে, আমাদেরও সে রকম স্কেল করে গ্রেডেশান করে দেওয়া হয়েছে। ১২।১৪ বৎসরের আগে আমি একবার সোসিয়েল কনফারেন্সের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলাম, তাতে বলেছিলাম মাদ্রাজে পেরিয়া প্রভৃতি যে সকল সম্প্রদায়কে থার্ম্মোমিটারে স্কেলের মত বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা ক'রে রেখেছে তাদের মধ্যে দৃষ্টিদোষ আছে। তফাৎ থেকে দেখলেও খাদ্যদ্রব্য অপবিত্র হবে, ফেলে দিতে হবে। মাদ্রাজে একটা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঘরে গিয়ে খায় পাছে নিম্ন শ্রেণীর লোকের দৃষ্টিদোষ ঘটে, টেলিস্কোপ, মাইক্রোসকোপ লাগিয়ে দেখলেও বোধ হয় ফেলে দিবে। মাদ্রাজে বড় বড় পণ্ডিত আছে। নানাদিকে তাদের মাথা খেলে, কিন্তু মাথার ভিতর যেন ওয়াটার টাইট কম্পার্টমেন্ট আছে। সামাজিক প্রথা আর বিদ্যাবত্তা, তেল আর জলের মত আলাদা আলাদা থাকে, প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। যখন বিদ্যা জাহির করতে হবে, বড় বড় বক্তৃতা করতে হবে, তখন তাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশিত হয় কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তার কোন পরিচয় পাবেন না। সে তুলনায় বাংলা ত স্বর্গ, মাদ্রাজে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে অহি-নকুল সম্বন্ধ, সেখানে অব্রাহ্মণদলকে জাষ্টিস পার্টি বলে, তাদের বড় বড়

সত্তা হচ্ছে, কি করে যে সত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা পুনঃ লাভ করবে তার উপায় উদ্ভাবন করছে, মাদ্রাজে মিনিষ্ট্রেল থেকে ব্রাহ্মণ বিতাড়িত হয়েছে, ওয়ান ম্যান ওয়ান ভোট। সেখানে ভীষণ দ্বন্দ্ব চলছে। সে একটা আরম্ভ ঢুকেছে। কিন্তু অক্টোবর মাসে আমি নাগপুর, জব্বলপুর ও আমরাবতীতে গিয়াছিলাম, অমরাবতী বেরারের রাজধানী, বেরার মানে শূদ্র, তুলার চাষে সেখানকার ধন, তুলার দাম ক্রমাগত বাড়ছে, সব রায়তি বন্দোবস্ত, জমিদার নাই, তাদের আয় ১০'১২ হাজার টাকা, নিজেরা জোদ্দার কিন্তু তারা অনুন্নত শ্রেণী, যে রকম করে তারা আমাকে তাদের মর্ম্ম-বেদনা জ্ঞাপন করল, শুনলে পাষাণ বিগলিত হয়। নিজেরা ভুল করছে, এতদিন তারা অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। এখন জাগরিত হচ্ছে, হৃদয়ে দ্বেষ-রাগ-হিংসা পোষণ করছে কিন্তু এখনও কিছু করে উঠতে পারছে না, সম্প্রতি কন্‌ফারেন্স করেছে। নিজেদের মধ্যে লোক নাই বলে মাদ্রাজ থেকে অব্রাহ্মণ নেতাদের আহ্বান করে আনছে। সেখানে দেখলাম ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ, মানুষ মানুষের প্রতি এ রকম বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে, আগে জানতাম না। সেখানে মুসলমানের সংখ্যা খুব কম, ভেবেছিলাম সেখানে এখানকার মত কোন গণ্ডগোল নাই। জাতি-গঠনের অনেক সুবিধা আছে। কাগজে দেখেছি—অমরাবতী এই করেছে, ঐ করেছে, তারা রেসপেন্‌সিভ্‌ কো-অপারেশন করছে, কেউ বা নন্‌কো-অপারেশন করছে। সেখানে গিয়ে দেখলুম করছে জনকয়েক মাত্র মুধোলকার, যোশী, খাপার্ডে প্রভৃতি ৫।৬ জন লোক—যাকে ইংরাজিতে বলে—থ্রি টেলরস অব্‌ দি টুলীষ্ট্রীট, বাকী শতকরা ৯৯ জন অনুন্নত শ্রেণীর লোক যারা রক্তের ভিতর ভীষণ বিদ্বেষ পোষণ করছে। নাগপুরে ২টী কাপড়ের কল আছে, তাতে যারা খাটে তারা মাহারা—প্রায় পেরিয়া—অস্পৃশ্য। সেখানকার একজন ইংরাজ প্রিন্সিপাল আমাকে বল্লেন মাহারারা অন্ত্যজ শ্রেণী বলে ব্রাহ্মণেরা এমন ঘৃণার চক্ষে দেখে যে পশুর চেয়ে অধম বলে ব্যবহার করে কিন্তু তারাও মানুষ। একদিন একটী মাহারা ছেলে কলেজে এসেই প্রিন্সিপালকে বল্লে—আমাকে ছুটী দিন, গ্রামে যেতে হবে, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঝগড়া বেধেছে—আমি যদি একজন ব্রাহ্মণকে খুন করতে পারি—জীবনকে সার্থক মনে করব। ভাবুন, কি রকম বিদ্বেষ সেখানে। এর কারণ আমাদের সমাজের ভিতর গলদ আছে, সেটা দেখাতে চাই।

তারপর বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ধমনীতে এক রক্ত প্রবাহিত। মোগল পাঠান আফগানের বংশধর কয়জন মুসলমান? আপনারা জানেন, মৌলানা আক্রাম খাঁ এবং আমাদের ঠাকুর বংশ এক বংশ। তাঁরা দিল্লীর নবাব সরকারে উচ্চ পদে কাজ করতেন, ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং এই অপরাধে হিন্দু সমাজ তাঁদের সমাজচ্যুত করল। পিরালী ব্রাহ্মণের ইতিহাস আপনারা অবগত আছেন,—তাঁদের মধ্যে ধন আছে, বিদ্যা আছে, অশেষ জ্ঞান আছে, তাঁদের কত কীর্ত্তি স্থানে স্থানে আছে আপনারা জানেন—হিন্দু-সমাজ তাঁদেরও সমাজচ্যুত করেছে। সেই মৌলানা আক্রাম খাঁর পূর্ব্বপুরুষ এই ভাবে লাঞ্ছিত, নির্য্যাতিত হয়ে থাকার চেয়ে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করা ভাল, এই বিবেচনা করে স্বেচ্ছায় মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। মুসলমানেরা কারো উপর জোর জবরদস্তি করে নাই। আপনারা বলবেন মুসলমান বাদশারা জোর করে' ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়েছে। তা যদি করত তা হলে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এতদিন কোথায় থাকত, দিল্লী থেকে, মুর্শিদাবাদ থেকে যত দূরে যাবেন—ততই মুসলমানের সংখ্যা বেশী—যেমন চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি যায়গায় কোন রকম অত্যাচার এর কারণ নয়, এর কারণ—তখন অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবি ছিল, এরা অবনত শ্রেণী বলে' অত্যন্ত লাঞ্ছিত, নিগৃহিত হ'ত। তারা হিন্দু-সমাজের কোন স্বত্ব স্বাধীনতা পেত না, পদদলিত হত। তারপর যখন ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করতে বড় বড় মৌলানা এলেন তখন তারা সুবিধা দেখে গ্রামকে গ্রাম সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করল। আমাদের বাগের-হাটে দেখেছি—মুসলমান জমিদার (খুন-খুনওয়ালা?)—এখনও তাদের শ্বেত গম্বুজ রয়েছে, দীঘি রয়েছে, শত সহস্র হিন্দু সেখানে মানত করে, প্রতি বৎসর মেলা হয়, তাদের প্রতি সকল শ্রেণীর শ্রদ্ধা আছে, যদি অত্যাচার করত, যদি অসি-প্রয়োগে তাদের মুসলমান করত, তবে হিন্দুরা কখনও এই রকম শ্রদ্ধা প্রকাশ করত না, মেজাল সাহেবের কাছে হিন্দুরা মানত না করলে তিনি আপত্তি

করেন, শ্রীহট্টের একজন মুসলমান পীরকে হিন্দুরা হজরত পর্য্যন্ত বলে থাকেন। রাগ দ্বেষের ভাব থাকলে অত শ্রদ্ধা কখনও করত না। মুসলমান হলে সুবিধা কত! যেই মুসলমান হলাম, জুম্মা মসজিদে বাদশাই হউন, ফকিরই হউন, আর মুটেই হউন পাশাপাশি নমাজ পড়বে, আমির, ফকির এক পাত্র থেকে ভোজন করবে। কারলাইল বলেছেন—খৃষ্টান ধর্ম্মও ইসলাম ধর্ম্মের মত উদার নহে, যেদিন ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলাম যে কোন শ্রেণী হউক না কেন, নিগ্রো, কাফ্রী হউক না কেন, যে কোন পদবী লাভ করি না কেন, এক সঙ্গে বিবাহ ও আদান প্রদানে বাধা নাই, আর আমাদের চোখের উপর কি না কত হিন্দু ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করছে! মুসলমান ভাইদের বলি, ভয়ের কারণ নাই- ৫০টী শ্রদ্ধানন্দ এলেও ৫জন মুসলমানকে হিন্দু করতে পারবে না কিন্তু ৫০০ হিন্দু মুসলমান হচ্ছে চোখের উপর দেখছি। কত বিধবা কোন রকমে নিকৃষ্ট জীবন যাপন করছে, তার পরে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করে পবিত্র উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে, পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত। আমি জানি, এক স্বামী তার পরিণীতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে' অন্য স্ত্রী নিয়ে ঘরকন্না করছে। মর্ম্ম-পীড়িত পিতা ভাবল—এখন করব কি? হিন্দুধর্ম্মে বিবাহ-চ্ছেদ নাই, মুসলমান-ধর্ম্মে নিকা বিবাহ প্রথা আছে। তিনি মেয়েকে বল্লেন—তুমি ইসলাম ধর্ম্ম অবলম্বন কর, তাতে তালাক করা যায়, বিবাহ খণ্ডন করা যায়। এইভাবে মেয়ে আবার বিবাহ করল। ব্যাপার কি এখন বুঝুন। এভাবে ধর্ম্ম কয়দিন টিকতে পারে, ভাববার বিষয়। আজ হাজার হাজার বৎসর ধরে ব্রাহ্মণেরা সুবিধা ভোগ করছে, জাতি-ভেদের সে বিষময় ফল আমরা ভোগ করছি।

মাড়োয়ারী কলিকাতায় বাস করে সুতরাং এক হিসাবে তারা বাঙালী, তাদের ধন বিদেশে চলে যায় না, এখানে তারা বসত বাটী করে আছে। সাহা, তিলী, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, এদের মধ্যে হতে ২।৪ জন শিক্ষিত আছে, তাতে কিছু আসে যায় না। তিলি সম্প্রদায়ের মধ্যে মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর মত কয়জন আছে? কেহ কেহ বলেন তিলির মধ্যে অমুক শিক্ষিত আছে, যাহার মধ্যে অমুক শিক্ষিত আছে। আমি বলি তাতে হল কি? যত লক্ষ তিলি, সাহা, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য আছে, তাদের শিক্ষিত আর অশিক্ষিতদের পাশাপাশি রাখুন, কি দেখবেন—শিক্ষিত সংখ্যা মাইক্রস্কোপিক মাইনরিটী। যখন জাতীয় জাগরণ আসে তখন সকল লোক যদি এক ভাবে দেশের জন্য ভাবতে পারে—যেমন লণ্ডনের বণিকেরা অজস্র অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিল, যেমন হলাণ্ডের এণ্ডোয়ার্গ, লিজ প্রভৃতি করেছিল—তেমন যদি করতে পারত তবে সেটা জাতীয় জাগরণ হত। আমাদের নানা কাজে অর্থের প্রয়োজন, ওরা যদি শিক্ষিত হত এবং ওদের কাছে যদি আবেদন করতাম তোড়া তোড়া টাকা আসত, কিন্তু সব অজ্ঞান-অন্ধকারে নিমগ্ন, কিছু বুঝে না। আমার একজন ছাত্র রিসার্চ্চ স্কলার ছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের সময় দেশের কাজে নেমেছেন, পূর্ব্ব বাংলার বিক্রমপুরের দিকে আছেন; সেখানে জাতীয় বিদ্যালয় করে' দেহ মন প্রাণে কাজ করছেন, টাকা পান না। অথচ একজন বাবাজী এসে যদি বরাদ্দ করেন—এই এই চাই, তৎক্ষণি সকলে গিয়ে গললগ্নীকৃতবাসে বলবেন প্রভু কি করতে পারি, আপনার জন্য? তিনি প্রথমেই হুকুম করবেন—একসের গাঁজা চাই। তখন কে গাঁজা দিবে পরস্পর প্রতিযোগীতা হয়। গাঁজা খেয়ে বাবাজী বল্লেন—মহোৎসব করব, কাকে কাকে অধিকার দেওয়া হবে? এইরকম অবস্থা কুম্ভ মেলায় যান—বড় বড় মোহান্ত হাতী চড়ে একেবারে স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত হয়ে আছেন। বড় বড় ধনী মহাজন কৃতাঞ্জলীপুটে বলেন, প্রভু আজ যত লোক খাবে, আমার উপর অনুগ্রহ করে' ভার দিন। হুকুম হ'ল—অত মণ ঘি, এই এই সরঞ্জাম। বাস্ চরিতার্থ হ'ল। স্বর্গকে এরা যেন মৌরসী পাট্টার মত কিনেছে। সাহা, তিলী এরা কোন দেশহিতকর কার্য্যে দান করবে না, মহোৎসব, মন্দির-প্রতিষ্ঠা, শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে ১০।২০।৫০ হাজার টাকা খরচ করবে। অমুক অত টাকা খরচ করেছে আমি কি কম?

একবার নাগপুরে গিয়েছিলাম, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে, বিপিন কৃষ্ণ বোস অনেক টাকা দিয়েছেন, গভর্ণমেণ্টও দিয়েছেন। বিদ্যালয়ের নিকট একজন মাড়োয়ারী মন্দির করেছে, দুগ্ধফেননিভ মন্দির শ্বেত পাথর দিয়ে মোড়ান

হয়েছে, বহুদূর থেকে মার্ব্বেল পাথর এনে, ৮।১০ লাখ টাকা খরচ করে মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে। বৃত্তি করে দিয়েছেন তাতে দেবার্চ্চনা, দেবসেবা চলবে। অবশ্য পরকালের জন্য, ধর্ম্মের জন্য যে ব্যয়, তার মত সদ্ব্যয় আর কি হ'তে পারে কিন্তু এরা দেশের কাজে টাকা দিবে না। কথা এই—এই সব লোককে হিন্দু সমাজের যারা মস্তিষ্ক—ব্রাহ্মণ—তারা যদি পদদলিত, নির্য্যাতিত, অধঃপতিত করে' না রাখত, সমাজ কত বলীয়ান হ'ত। সকলে যদি সমানভাবে শিক্ষিত হত, সকলের মধ্যে সমবেদনা সহানুভূতির ভাব থাকত, আমাদের কোন কাজের জন্য অর্থের বা সামর্থ্যের অভাব হত না। লর্ড ডাফরিণ বিদ্রূপ করে বলেছেন—কংগ্রেস যারা করছে মাইক্রসকোপিক মাইনরিটী। এ কথা ভাবতে হবে, শাসন-কর্ত্তাদের কাছে জবাব দিতে পারি বা না পারি, নিজের কাছে কি জবাব দিব ? আমরা যে একটা জাতি বলে পরিচয় দিই, সত্য সত্যই কি আমরা জাতি ? আমাদের কি দুরবস্থা একবার ভেবে দেখুন দেখি। জাতিভেদ আমাদের কত সর্ব্বনাশ করেছে ! সাহা সম্প্রদায়ের কথা বলেছি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ এমন একজন লোক হয়েছেন যাঁকে আমরা তাঁর শিষ্য বলে' পৃথিবীর সম্মুখে গর্ব্বিত বক্ষে দাঁড়াতে পারি। মেঘনাদ সাহা সমস্ত বিদ্বজ্জনের কাছে, বৈজ্ঞানিক-মণ্ডলীর কাছে তাঁর যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। দূরবর্ত্তী নক্ষত্র কি উপাদানে গঠিত, এতদিন ইউরোপ, আমেরিকার কেহ ঠিক করতে পারে নি, বড় বড় জ্যোতির্ব্বিদরাও তা পারে নি। আজ জগতের সম্মুখে তা গূঢ়তম রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে, ২৫ লক্ষ লোকের মধ্যে মস্তিষ্ক-চালনার ফলে যদি এতটা হতে পারে, তবে ৫ কোটী লোক মস্তিষ্ক চালনা করলে কত কিছু হতে পারত, জাতটা কত বড় হতে পারত, একবার ভেবে দেখুন দেখি। পরলোকগত প্রেসিডেণ্ট উইলসনের একখানা বই আছে। তাতে তিনি বলেছেন—আমেরিকার বিশেষত্ব এই, রাস্তার মুটে, মেথর, মুদ্দফরাসের কাজ আজ যে করছে সেও আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হতে পারে। আমেরিকা শ্রমের মর্য্যাদা বুঝে। কেহ সেজন্য কাহাকে উপহাস করে না, যে ছোট কাজ করে তাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না, গ্রীষ্মাবকাশে রেলে, ষ্টীমারে মুটে হয়ে, হোটেলের খানসামা হয়ে টাকা রোজগার করে কলেজে পড়তে পারে। বহু ক্রোরপতি—যেমন রকফেলার তাঁর ছেলের সঙ্গে যার অর্থ-সামর্থ্য নাই তার ছেলে সহধ্যায়ী হয়ে এক সঙ্গে থেকে এক কলেজে পড়ে, কোনরকম বিদ্রূপ ঠাট্টা করবার উপায় নাই, করলে তখনি তাকে বিতাড়িত করে' দেওয়া হয়—সে ভদ্রতার ব্যবহার জানে না। আমেরিকা কত বড় জাতি—সেখানে শ্রমের মর্য্যাদা—ডিগনিটী অব লেবার কত বড়। আর আমাদের দেশে ॥০ আনা দিয়ে ইলসা মাছ কিনলে সেটা আনতে মুটেকে দিতে হয় আরো ৵০ আনা, সাহস করে' কেহ আনতে পারে না।

নরমেনরা যখন ইংলণ্ড দখল করে বসল তখন তারা বিজেতা, ইংলণ্ড বিজিত। বিজেতারা বিজিতদের জমিজমা জোর করে' দখল করে' নিল। নিয়ে মৃগয়ার ক্ষেত্রে পরিণত করল, তাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করল, বিজেতা-বিজিতের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি চল্ল কিন্তু কিং জনের কাছ থেকে যেদিন মেগনাকার্টা আদায় করল, দেশকে বিপদ থেকে মুক্ত করবার জন্য শ্রমজীবি, কৃষিজীবি সকলে মিলে নিজেদের অধিকার আদায় করলে, মেকলে বলেন—সেই সময় থেকে ইংলণ্ডে বিজেতা-বিজিত ভাব চলে গেল। পরস্পর আদান-প্রদান চল্ল, জাতিগঠন হ'তে লাগল, তার ফলে মনোমালিন্য দূর হয়ে গেল। আদান-প্রদান থাকলে মনোমালিন্য থাকতে পারে না, ৫০ বৎসর, জোর ১০০ বৎসর তার বেশী থাকতে পারে না, কিন্তু জাতিভেদের ব্যাপার দেখুন। শত শত বৎসর আগে যে কায়স্থ পদ্মার ওপার গিয়েছে, সে বঙ্গজ হয়েছে, পদ্মার এপার আর ওপারে, উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ীতে বিবাহ হবে না, ১০০ বৎসর আগে গিয়ে যারা জমিজমা পেয়েছে, নানা রকম সুবিধা পেয়েছে, তাদের সঙ্গে এদের বিবাহাদি আদান-প্রদান হবে না, এর ভিতর কোন রকম যুক্তি নাই। আমি পশ্চিমে নানা জায়গায় গিয়েছি। অনেক উকিল, ব্যবসাদার সে সকল জায়গায় আছে, এক একবার মেয়ের বিবাহ দিতে বেচারীদের ৬ মাস বরেন্দ্র ভূমিতে এসে থাকতে হয়, খোঁজ করতে হবে কোথায় বর পাওয়া যায়। আসা যাওয়ায় অনেক টাকা খরচ হয়।

বোম্বাইয়ে ১০।২০ জন বাঙালী আছেন, অবশ্য তাঁরা ব্যবসায়ী নন, চাকুরে মেয়ের বিবাহ দিতে হলে ৫।৭ বৎসরে যা জমিয়েছেন, কলিকাতায় এসে ৬ মাস থাকতে, ঘটক পাঠিয়ে খোঁজ খবর করতে, পরিবার নিয়ে যাতায়াত করতে, সব খরচ হয়ে যায়। জব্বলপুর নাগপুরে একই কথা। আবার আরেক রকম মুস্কিল আছে সেখানে বাংলা পড়াবার যো নাই, ২।৪ জন বাঙালী ছেলের জন্য শিক্ষক পাওয়া যায় না, তাদের লেখা পড়ারও অসুবিধা কিন্তু একজন ইংরেজ ফরাসী দেশে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য করে, ফরাসীর মেয়ে বিবাহ করে, আবার ফরাসীরা ইংলণ্ডে আসে, আমেরিকায় যায়, যেখানে যায় স্বচ্ছন্দে আদান প্রদান করে, মুসলমানের মধ্যেও এই নিয়ম, কিন্তু আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডী, কোটর করে' প্রত্যেকে যেন এক একটী খাঁচার ভিতর চুপ করে' বসে আছি। এ হচ্ছে সর্ব্বনাশের কারণ, এই সব ভাবতে গেলে মনে হয় না আমাদের কোন আশা আছে।

১৮৭০ সালে জাপানের জাগরণ আরম্ভ হয়েছে, কাউণ্ট ওকুমা প্রভৃতি জাপানের নেতারা কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন জাপানে এনেছেন, এই ৫৫ বৎসরের মধ্যে জাপান পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের সমকক্ষ হয়েছে, এক আসনে পাশাপাশি বসছে, আমরা পারি না কেন? আমাদের ভিতর গলদ আছে কিন্তু আমরা সকল দোষ গভর্ণমেণ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই, ভাবি তাতেই বুঝি আমাদের দোষ ঘুচে যাবে। ভাববেন না আমি গভর্ণমেণ্টের খোসামোদ করছি, তা নয়, নিজের দোষ ধামা-চাপা দিয়ে রাখায় বিপদ আছে, ভিতরে পূতিগন্ধময় ক্ষত, উপরে মলম দিয়ে রেখে বলি আমার কিছু হয় নাই। কত রকম বন্ধন রয়েছে, সার্জ্জিকেল অপারেশন দরকার। মলম দিয়ে হবে না।

খুলনা দুর্ভিক্ষের সময় আমি একটী গ্রামে গিয়েছি, ভদ্রলোকের গ্রাম, জ্যৈষ্ঠ মাস, কয়েকজন যুবক এসে বল্লে মশায়, আপনি ত দুর্ভিক্ষে টাকা তুলতে এসেছেন, দেখে যান — কত বিধবা পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে, আজীবনের সঞ্চিত ধন নিয়ে আজ লাঙ্গলবন্ধ তীর্থে যাবে। কথা এই—আমাদের দেশে অনেক বিধবা একবেলা অন্ন খেয়ে যে পুঁজিপাটা করে, এমন ভয়, তা কুলুঙ্গের ভিতর, কুটীরের মধ্যে রাখতে সাহস করে না, অনেক সময় মাটীতে পুঁতে রাখে। কোন রকম করে, ৪০।৫০।৬০ টাকা যেই করেছে, ভাবে একবার অর্দ্ধোদয় যোগে লাঙ্গলবন্ধ কি শ্রীক্ষেত্র গিয়ে ২।৪ জায়গায় তীর্থ করলে, গঙ্গাস্নান করলে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়ে যাবে, পরকালের গতি সুনিশ্চয় হয়ে গেল, এই তাদের সংস্কার। আমি সে কথা বলছি না, আমি অর্থনীতির দিক থেকে বলছি, দুর্ভিক্ষের সময় এক একটা তীর্থ—যেমন চন্দ্রনাথ কি শ্রীক্ষেত্র যেতে হলে যেই রেলে কি ষ্টীমারে উঠলাম তখনি তার ১৪ আনা লণ্ডনে কি মেঞ্চেষ্টারে চলে গেল, যে ২ আনা রইল তা গরীব ষ্টেশন মাষ্টার, সারেঙ্গ, খালাসী এরা ভাগ করে' নিল, এই যে প্রতি বৎসর তীর্থ-যাত্রায় কত লক্ষ কোটী টাকা ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, কোথায় হিমালয়ের উচ্চ শিখর বদরিকাশ্রম, আর কোথায় সেতুবন্ধ রামেশ্বর—এই যে তীর্থযাত্রায় কোটী কোটী টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে এতে কি দেশের দুরবস্থা আরো বাড়ছে না? অথচ সৎকার্য্যে টাকা পাওয়া যায় না, পরের হিত করা, জলাশয় করা, দীঘি পুষ্করিণী করা, রাস্তা ঘাট করা —একি ধর্ম্মের অঙ্গ নয়? পূর্ব্বকালে রাণী ভবানীর, বল্লাল-সেনের অনেক কীর্ত্তি আছে কিন্তু সে সকল লোপ পাচ্ছে। ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্মের একটা মূল ভিত্তি—

তস্য প্রিয় কার্য্য সাধন:

গ্রামে জলের অভাবে ক্রন্দন আরম্ভ হয়েছে, কলেরা দেখা গিয়াছে, রাস্তা ঘাট নাই, সেদিকে দৃষ্টি নাই, যদি বুঝতাম--রেল ষ্টীমার নাই—যেমন ৫০।৬০ বৎসর আগে ছিল না—মাঝি মাল্লার ঘরে টাকা যাচ্ছে, দেশের টাকা দেশে রয়েছে, তা হ'লে এক রকম ভাল ছিল, তীর্থযাত্রার ন্যায় অন্যায় এখানে বলছি না যদিও ব্রাহ্ম সমাজের মন্দির থেকে বল্লে কেহ দোষ দিতে পারবে না। কত রকম সর্ব্বনাশ আমাদের হচ্ছে, এই যে একটা বিশ্বাস—আমার উদ্ধার হউক, এর ভিতর কত বড় স্বার্থপরতা রয়েছে, দুনিয়া উচ্ছন্ন যাউক, আমি গঙ্গায় ডুব দিয়ে রামেশ্বরে গিয়ে, কুম্ভমেলায় গিয়ে, গয়ায় পিণ্ড দিয়ে, গঙ্গাসাগরে স্নান করে, প্রয়াগে মাথা মুড়িয়ে স্বর্গে যাব—এই যে অন্ধ সংস্কার রয়েছে, এ অপনোদন করতে পারলে কত উপকার হয়। আমরা আমেরিকাকে বলি জড়বাদী আর আমরা আধ্যাত্মিক জাতি। আমেরিকায় অনেক

ধনকুবের আছে, তাদেরকে মিলিয়নিয়ার বল্লে অপমান হয়, তারা মাল্টি-মিলিয়নিয়ার, রকফেলার প্রভৃতি অনেক ধনকুবের রয়েছেন, এঁরা প্রতি বৎসর কোটী কোটী টাকা দান করেন। রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের জন্য, ইউনিভার্সিটির জন্য, হাসপাতালের জন্য এঁরা কোটী কোটী টাকা দান করছেন। এণ্ড্রু কর্ণেজী বহু লক্ষ টাকা যাঁর দৈনিক আয়, তিনি সমস্ত টাকা পরোপকারের জন্য ব্যয় করেন। যে সমাজ থেকে কুশিক্ষা কুসংস্কার বিদূরিত হয়েছে--সে সমাজে কল্যাণকর কাজে, দেশহিতকর কাজে অজস্র অর্থ আসে, আমাদের দেশ আমাদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে মাড়োয়ারী বলুন, সাহা বলুন, তিলি বলুন, কি তথাকথিত উচ্চশ্রেণী ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য বলুন যাদের লক্ষ্মী আশ্রয় করেছে তাদের কাছ থেকেও আমরা সাহায্য পাই না, তবে মাড়োয়ারী সম্বন্ধে আমি বলিতে বাধ্য—নইলে অকৃতজ্ঞ হব—যেখানে দুর্ভিক্ষে নরনারী মরছে কিম্বা বন্যা-পীড়িত হয়ে মানুষ যেখানে না খেয়ে মরছে শুনলে মাড়োয়ারী-হৃদয় বিগলিত হয়, মুক্ত হস্তে তারা দান করে, তাদের কাছ থেকে তোড়া তোড়া টাকা পেয়েছি—একথা বলতে আমি বাধ্য। তারপর পার্সিরা সংখ্যায় বোধ হয় ১ লক্ষেরও কম, তারাও দেশের কাজে দান করে, ভাটিয়াদের মধ্যে লেখাপড়ার বিস্তার হচ্ছে, ভিটল দাস ঠাকুর ইউনিভার্সিটীর জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দান করেছেন, আরেক জন ১২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, আরও অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছে, শিক্ষিত ভাটিয়ার সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

তাই বলছি একটা জাতির সকলের মধ্যে সমান ভাবে যদি লেখাপড়ার বিস্তার না হয়, আদান-প্রদান না হয় সে জাতির উন্নতি হতে পারে না। ১৮৭১ সালের আগে জাপান আভিজাত্য গর্ব্বে গর্ব্বিত ছিল, সামুরাই বলে' এক ক্লাস ছিল, তারা জাপানের মস্তক স্বরূপ ছিল, আমাদের দেশে যেমন ব্রাহ্মণ সেরূপ। তারা দেখল বিদেশীরা জাপানে ঢুকতে চায়। ১৮৫৩ সালে তারা জাপানের এক বন্দরে এসে উপস্থিত হ'ল, বল্ল—আমাদিগকে যদি অবাধ ব্যবসা করতে না দাও—জোর করে ঢুকব, কামানের সাহায্যে ঢুকব। তখন জাপানের চোখ ফুটল। তারপর ১৮৭০ সালে সামুরাই সম্প্রদায় তাদের সমস্ত ক্ষমতা, অভিজাত সম্প্রদায়ের সমস্ত ক্ষমতা—তাদের হাতে যত ক্ষমতা ছিল, রাজার হাতেও তত ছিল না—সব ক্ষমতা রাজার হাতে অর্পণ করল। তারা দেখল -ফিউডেল সিষ্টেম থাকলে জাপান বিদেশীর সঙ্গে পারবে না, তখন সকলে নিজে স্বেচ্ছায় সম্রাটের চরণে তার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করল, সম্রাটকে সর্ব্বময় কর্ত্তা করল, সামুরাইদের সংখ্যা জাপানের লোক সংখ্যার $\frac{১}{১৬}$ আমাদের ব্রাহ্মণ কায়স্থ যেমন $\frac{১}{২০}$ সামুরাইগণ দেখল সমস্ত জাতি যদি এক হতে না পারে, সাধারণ লোকে যদি তাদের স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হয়—স্বএর অনুভূতি তারা পাবে না, মস্ত একটা অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রাচীর দেশের মধ্যে থাকবে। ৫০ বৎসর আগে জাপানেও একটা অস্পৃশ্য জাতি ছিল যাদের আমরা ডোম চামার বাগ্দী হাড়ি মুচি বলি, তারা এই রকম ঘৃণিত ছিল, ১৮৭১ সালের ১২ই অক্টোবর জাপানের একটী স্মরণীয় দিন। আভিজাত্য-দর্পে দর্পিত সামুরাই জাতি সেদিন এদেরকে আলিঙ্গন করল, বলল—আজ থেকে সমস্ত জাপান এক, আজ থেকে অস্পৃশ্য অনুন্নত ও আভিজাত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই ভাই!—বলে সকলে সকলকে আলিঙ্গন করল। আর আমাদের অবস্থা দেখুন, বিক্রমপুরের বৈদ্যদের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি বৈদ্যের ক্রিয়াকর্ম্ম হবার যো নাই। একজন ইংরেজ গণনা করেছেন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণদের মধ্যে ৫ হাজার শ্রেণী বিভাগ আছে, কেহ কারো সঙ্গে খাবে না, কলেজ অব সায়েন্স এবং বেঙ্গল টেকনিকেল কলেজে আমরা দেখছি ৪।৫ জন ব্রাহ্মণ ভিন্ন ভিন্ন উনুন করে রাঁধছে। বললাম—"আচ্ছা, তোমাদের সকলেরই ত পৈতা আছে, সকলেই ব্রাহ্মণ - কেন এই রকম অকারণ কয়লা পোড়াও, পালা করে রাঁধ না কেন?" "বাবু জাত যাবে এ বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কনৌজী ব্রাহ্মণ, সে গয়ালী ব্রাহ্মণ, কারো অন্যের হাতে খাবার যো নাই।" শিক্ষিত হয়েও আমরা এ সব দোষ ছাড়তে পারি না। পাড়াগাঁয়ে যেখানে সমাজপতিরা আছে, এদিকে বড় বড় বক্তৃতা করবে—"জাতিভেদ দেশের সর্ব্বনাশ করল।" তারাই তলে তলে ঘোঁট পাকাচ্ছে, তারাই সর্দ্দার, নাম করতে পারি করব না, আমার কাছে লিষ্টি আছে, আর যাদের যত লম্বা শিখা, তাদের ধার্ম্মিকতা তার ইনভার্স

রেসিও। বরিশাল কলেজে কি রকম হয়েছে আপনারা শুনেছেন। আমি ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি, রমনায় যে যে বাড়ীতে থাকতাম, তার বারান্দা থেকে রমনা কালীবাড়ী সন্নিকট, সন্ধ্যাকালে সেখানে আরতি হয়, ঢাক ঢোল শঙ্খ-ঘণ্টার বাদ্যে মহাকোলাহল উত্থিত হয়। আশ্চর্য্য এই কালী বাড়ী থেকে ২।৩ রশি দূরে গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে, কোন কালের জাহাঙ্গীরের সময়ের, সেয়েস্তা খাঁর সময়ের। তারা যদি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করত কালীবাড়ী হতে পারত না। ২৫০ বৎসর আগে তাদের প্রাধান্য থাকবার কথা অথচ তখন ২।৩ রশি ব্যবধানে নমাজ হত, আরতি হত, ঢাক ঢোল শঙ্খ বাজত, কিন্তু এখন ঘোরতর বিবাদ, সর্ব্বদা হৃদকম্প হয়—নূতন কোথায় কি বাধল। ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে, হিন্দু-মুসলমানে আত্মঘাতী ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, এর কারণ কি? রোগ-নির্ণয় না করলে চিকিৎসা হতে পারে না, তাই বলছি—ঘর সামলাও; বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু বেশী অনিষ্টকারী, বল্লালসেনের সময় থেকে কৌলিন্য-প্রথা আভিজাত্যের গর্ব্ব আমাদের রক্তের ভিতর প্রবাহিত হয়ে আসছে, অন্যকে কোন অধিকার দিব না এভাব আমাদের ভিতর রয়েছে। এভাব থাকলে উন্নতি হবে না, কোন কালে হবে না। জাপান দেখুন কি রকম করে পৃথিবীর সামনে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে, অস্পৃশ্যতা জাতিভেদরূপ বিষম পাপ কিন্তু ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর কুত্রাপি পাবেন না। একজন বিখ্যাত ইংরেজ বলেছেন সমস্ত পাপের মধ্যে অস্পৃশ্যতাই মহাপাপ। মানুষ মানুষকে ছুঁয়ে খাবে না—এত ঘৃণা, এত দম্ভ ভগবান সহ্য করেন না তাই আমাদের এই দুরবস্থা।

আমরা ব্রাহ্মণের হাতে খাই, উড়িষ্যা থেকে কি বিহার থেকে পৈতা গলায় দিয়ে একটা লোক এলে আমরা তার হাতে খাই, সে ডোম চামার কি বাগ্দী সে খবর রাখি না, তাদের অনেকে অনেক রকম দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে ভুগছে।

২০০০ হাজার বৎসর আগে যারা আমাদের সমাজ গঠন করেছিল, হয় ত তখন তার প্রয়োজন ছিল। যখন বিজেতা এসে বিজিতদের মধ্যে বাস করে তখন হয়ত আইন কানুনের কঠোরতার দরকার ছিল, এখন সে সকল বজায় রাখবার চেষ্টা করলে তার বিষময় ফল উৎপন্ন হবে। সেদিন দেখলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের একটি ছেলে—ব্রাহ্মণের ছেলে 'ফেল ইন লাভ উইথ এ গার্ল' মেয়েটী কায়স্থ হতে পারে। কাজেই বিবাহ হবার যো নাই, সমাজ বাধা দিল, বেচারী ছেলে আত্মহত্যা করল। আলো ও ছায়ার কবি লিখেছেন···

সংসারে......বাঁধিলে হাতে
বাঁধিতে নারিলি হৃদয়ে হৃদয়ে।

আমাদের দেশে যত রকম কৃত্রিম নিয়ম আইন কানুন তৈয়ার করে' বাঙলী মস্তিষ্কের উর্ব্বরতা প্রমাণ করছে। এক সময় বলেছি—রঘুনন্দন যে সময় গবেষণায় ব্যস্ত ছিল—৯ বৎসরের বালিকা বিধবা নির্জ্জলা উপবাস না করলে কোন নরকে পতিত হবে, কত পুরুষ নিরয়গামী হবে, অমুক সময় নৈঋত কোণে একটা কাক কা কা করে ডাকলে তার কি ফল হবে, সে সময় ইউরোপে গেলিলিও, নিউটন কি সব আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণ করেছিল। আজ পৃথিবীর বৈঠকে বাঙালীর, ভারতবাসীর স্থান কোথায়? আমরা ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, পেরিয়ার মত কুকুরের চেয়েও অধম হয়ে আছি। এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—আবার তিনি এই ভারতবর্ষে এমন একজন যুগাবতার প্রেরণ করুন—যিনি তাঁর বিশাল বক্ষে হিন্দু-মুসলমান-জৈন-খৃষ্টান সকলকে সমানভাবে আলিঙ্গন করে আপন কোলে স্থান দান করবেন, যাঁর দৃষ্টান্তে ভারত জগতের সমক্ষে আপনার মহিমান্বিত—গৌরবান্বিত স্থানে পুনরায় অধিষ্ঠিত হবে।

—ভারতী।

রোমে স্ত্রী স্বাধীনতার সুফল ও কুফল

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম এ, ভাগবতরত্ন]

শিক্ষা ও সংযমের উপর যে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা নহে সে স্বাধীনতা কখনও সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না। রোমের নারী স্বাধীনতার পথে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন তখন নিজদিগকে শিক্ষিতাও করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু সে শিক্ষা চরিত্র গঠনে সহায়তা করে নাই—মনে সংযম আনে নাই। তবে সকল নারীরই যে শিক্ষা বিফল হইয়াছিল একথা বলিলে ইতিহাসকে ভুল বুঝা হইবে। পরদেশ লুণ্ঠন জাত ঐশ্বর্য্যের ফলেই নারী তাঁহার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। আবার ঐ ঐশ্বর্য্যের বলেই তিনি উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রথম যুগে রোমে বালিকাদের চিত্রবিদ্যা ও বয়নবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। সাধারণ গৃহস্থের শিশুকন্যারা সকালে উঠিয়া গুরুমহাশয়ের নিকট পড়িতে যাইত। সেখানে বালক বালিকাদিগকে এক সঙ্গেই শিক্ষা দেওয়া হইত। এ সময়ে ছেলেমেয়েরবয়স সাত আট বৎসর হইত। গ্রন্থ পাঠ করিয়া লাটিন ও গ্রীকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারিলেই, বালিকা উচ্চশিক্ষিতা বলিয়া গণ্য হইত। নৃত্যগীতও মেয়েরা কিছু কিছু শিখিত। অনেক রমণীই বীণাবাদ্যে পটিয়সী ছিলেন।

কিন্তু রোমে যখন নূতন যুগ আসিল--নারী যখন ক্রমে ক্রমে তাহার অধিকারের ভূমিতে স্বপ্রতিষ্ঠ হইল—তখন তাহার পক্ষে বিদ্যাশিক্ষার অধিকতর সুযোগ উপস্থিত হইল। ঐশ্বর্য্যের ফলে তাহার যথেষ্ট অবসর হইল। আর সেই সময়েই গ্রীক সভ্যতা প্লাবনের ন্যায় আসিয়া রোমান সভ্যতাকে ডুবাইয়া দিতেছিল। রোমের পুরুষের ন্যায় নারীও গ্রীক সভ্যতার অমৃত আকণ্ঠ পুরিয়া পান করিতে উৎসুক হইলেন। বিদ্যামন্দিরে তখন গ্রীক কাব্য নাটকেরই আদর। গ্রীক শিক্ষকেরাই রোমের স্ত্রী-পুরুষের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিয়া রোমানগণ আরও সুমার্জ্জিতরুচি সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছিলেন। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম শতাব্দীর হাস্যরসিক জুভেনাল দেশবাসীকে এইরূপে গ্রীক-ভাবাপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত হাস্যবিদ্রূপ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত এমনভাবে গ্রীক বনিয়া গিয়াছিল যে "ওগো তোমায় আমি ভালবাসি" একথাটাও গ্রীক ভাষায় তাহারা তাহাদিগের প্রণয়ীকে বলিতেন। যাহা হউক ইহার দ্বারা এই বুঝা যায় যে নারীরা তখন গ্রীকভাষা বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন।

সম্রাট অাগষ্টাসের প্রাসাদে সাহিত্যের যে আসর বসিত, তাহাতে নারীরাও যোগ দিতেন। তাঁহার ভগিনী অক্টাভিয়ার নামে একখানি দর্শনের গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত আছে; ভার্জ্জিল ইনিড নামক মহাকাব্যের ষষ্ঠ অধ্যায় তাঁহাকে ও তাঁহার ভগ্নীকে পড়ে শুনাইয়াছিলেন। বিয়োগান্ত নাট্যকার ভারিয়াসের স্ত্রী অত্যন্ত বিদুষী ছিলেন। ওভিডের দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রীর কন্যা পিরিলা কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সম্রাট নীরোর মাতা আগ্রিপিনা একখানি নিজের জীবন-স্মৃতি লিখিয়াছিলেন—তাহা হইতে টাসির্থাস, প্লিনি প্রভৃতি ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিল।

এমন অনেক শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন যাঁহারা নিজে কিছু না লিখিলেও স্বামী বা বন্ধুর লেখায় সাহায্য বা উৎসাহও দিতেন। ছোট প্লিনির স্ত্রীর বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে রোমের স্ত্রী স্বাধীনতার তিনি একটি সুমধুর ফল। ছোট প্লিনি বলেন যে তাহার স্ত্রী তাহার লেখা বইগুলি বারংবার পড়িতেন—এমন কি মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন! যখন স্বামী আদালতে ওকালতী করিতে যাইতেন, তখন স্ত্রী সংবাদ লইতেন যে কিরূপ বক্তৃতা হইতেছে। প্লিনির কবিতাগুলিও তিনি সুর বসাইয়া নিজে গান করিতেন। অনেক নারী স্বামীদের নিকট বা বন্ধুবান্ধবের নিকট এমন সুন্দর সুন্দর পত্র লিখিতেন, যে তাহার মধ্যে প্রচুর কাব্যরস থাকিত।

প্লিনি তাঁহার এক বন্ধুপত্নীর পত্র শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে এগুলি প্লেটাস বা টিরেন্সের লেখার তুল্য।

বহুনারী কবিযশের প্রার্থিনী হইতেন। তাঁহারা সকলেই "সাফো" নামে অভিহিত হইতে ইচ্ছা করিতেন। যাঁহারা কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না তাঁহারা সমালোচনা করিতেন। জুভেনাল নারীর এরূপ কাব্যদর্শনাদি চর্চ্চা করাকে বোধ হয় মেয়ে জ্যাঠামী মনে করিতেন। তাই তাঁহার sixth satireএ বলিতেছেন যে ভোজের জায়গায় পাঁচমিনিট উপস্থিত হইতে না হইতেই মহিলারা হোম্বার ভার্জ্জিল প্রভৃতি সম্বন্ধে রসচর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিতেন—আর কাহাকেও কথা বলিতে পর্য্যন্ত দিতেন না। তাঁহারা বিদ্যা জাহির করার জন্য বড়ই ব্যগ্র—কথায় কথায় প্রাচীন গ্রন্থকারের লেখা উদ্ধার করিয়া নিজের উক্তির সমর্থন করেন—সে সব গ্রন্থকারের নামও হয়তো পুরুষবন্ধুরা জানেন না। পুরুষ বন্ধুদের একটু ব্যাকরণ ভুল হইলে আর রক্ষা নাই। মার্শিয়ালও সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিয়াছেন যে তাহাকে যেন বিদুষী স্ত্রী বিবাহ করিতে না হয়। মার্শিয়াল, জুভেনাল প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রোমের প্রাচীন রীতির উপাসক ছিলেন—তাই নারীশিক্ষা সহ্য করিতে পারেন নাই। নারীর বিদ্যার নিকট তাঁহাদের প্রতিভা খর্ব্ব হওয়ায় আত্মসম্মানে ঘা লাগিয়াছিল —তাই নারীশিক্ষার প্রসার যাহাতে বন্ধ হয়, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

রোমের যে সকল নারী দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতে চাহিলেন—তাঁহাদের অনেক সামাজিক গঞ্জনা সহ্য করিতে হইত। সেনেকার ন্যায় দার্শনিক ও তাঁহার স্ত্রীকে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র লেখাপড়া করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে আর ঘরে থাকিবে না—পুরুষদের সহিত তর্ক করিয়া বেড়াইবে। কিন্তু ক্রমে পুরুষদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞ তাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার সুফল বুঝিতে পারিলেন। তাই প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে নারীকেও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া উচিত—আর মেয়েরা যদি নীতি ও দর্শন শাস্ত্র না অধ্যয়ন করে, তবে কেমন করিয়া তাহাদের সতীত্ব রক্ষা করিবে? অনেক রমণী দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতেন। তবে হোরাস তাঁহার বিদ্রূপাত্মক কবিতায় বলিয়াছেন যে অনেক মেয়ে দর্শন লইয়া খেলা করিতেন মাত্র, তবে প্লেটোর রিপাবলিক তখন অনেক মেয়েই অধ্যয়ন করিত। কেননা তাহাতে নারীর অধিকার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে।

রোমে অনেক নারী শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভ করিয়া দেশ সেবায় নিজ নিজ শক্তির নিয়োগ করিয়াছিলেন। সুশিক্ষার ফলে তাঁহারা রাজনৈতিক সমস্যা সমূহ চিন্তা করিতে পারিতেন। তাঁহাদের পতি-পুত্রকে তাঁহাদের মনোভাব জ্ঞাপন করিয়া রাষ্ট্রীয় সংস্কারের চেষ্টা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্র সংস্কারক গ্রাকাই ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের মাতা কর্ণেলিয়ার নিকট হইতেই সংস্কার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণেলিয়া পুত্রদ্বয়কে যখন সংস্কারের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন, তখন অনেকে বলিতে লাগিল যে ঐরূপ কার্য্য করিতে গেলে তাঁহাদের প্রাণহানি হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু কর্ণেলিয়া ভাবিতেন দেশকে সুপথে পরিচালনা করিতে যাইয়া মৃত্যুলাভ করাও শ্রেয়ঃ। তাই তিনি কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া পুত্রদ্বয়কে ঐ কার্য্যে আরও প্ররোচিত করিলেন। * * *

পম্পের সহিত যখন জুলিয়াস সিজারের অত্যন্ত মনোমালিন্য চলিতেছিল, তখন সিজারের কন্যা ও পম্পের পত্নী জুলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। দেশ যাহাতে গৃহ বিবাদে উচ্ছন্ন না যায় সেজন্য তিনি সর্ব্বদা উভয়কে বন্ধুভাবে চলিতে মতি দিতেন। অ্যাণ্টনির স্ত্রী অক্টেভিয়া রাজকার্য্য পরিচালনে অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন।

* * * যখন পুত্রদ্বয় সত্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন তখন তিনি ধীরভাবে সে দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন। যে স্থানে ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করা হইয়াছিল, সে স্থানটী পবিত্র ছিল বলিয়া তিনি আরও পুত্রভাগ্যে ভাগ্যবতী মনে করিয়াছিলেন। কর্ণেলিয়ার বন্ধুবান্ধব ছিলেন অনেক। তাঁহার দ্বার তাঁহাদের জন্য সর্ব্বদাই উন্মুক্ত ছিল। বড় বড় গ্রীক পণ্ডিতদের সহিত তিনি সমান ভাবে আলাপ করিতেন। এইসকল কথাবার্ত্তার মধ্যে নিজের মৃত পুত্রদ্বয় সম্বন্ধে উল্লেখ করিতেও তিনি সঙ্কুচিতা হইতেন না।

জুলিয়াস সিজারের মাতা অরেলিয়াও এইরূপ একজন

প্রসিদ্ধা রমণী ছিলেন। তিনি শিক্ষিতা হইয়াও কিন্তু নিজের যশের জন্ম ব্যস্ত হইতেন না পুত্রের উন্নতিরই চেষ্টা করিতেন। সিজার যে অত বড় হইতে পারিয়াছিলেন, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ তাঁহার মাতা অরেলিয়া। * *

কিন্তু দেশ ও সমাজের মঙ্গলার্থে রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন এরূপ নারীর সংখ্যা খুবই কম হইতেছিল। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য বা লোকের প্রশংসা পাইবার জন্য অধিকাংশ নারী রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। রোমের কয়েকটী নারী ক্যাটেলিনিয়ান ষড়যন্ত্রের সহিত লিপ্ত ছিলেন। ঐ ষড়যন্ত্র দুশ্চরিত্র লোকদের দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল। একজন দুশ্চরিত্রা নারী পুরস্কারের আশায় এই ষড়যন্ত্রের সমস্ত কথা কর্ত্তৃপক্ষের গোচরে আনিয়াছিল। তাহাতেই ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সাজা দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল।

সুপ্রসিদ্ধ বক্তা সিসেরো তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে তিনি গৃহস্থালীর কোন খোঁজ-খবর না রাখিয়া কেবলমাত্র রাজনৈতিক চর্চ্চা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। সিসেরো যখন অন্য একজন নারীর প্রেমে মুগ্ধ হইয়া হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন, তখন তিনি সিসেরোর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত পরিণয় সম্বন্ধে আবদ্ধ হ'ন।

রোমের অনেক সম্রাট তাঁহাদের পত্নীর হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। আগষ্টাসের ন্যায় বিজ্ঞ ও সুচতুর সম্রাটও তাঁহার পত্নীর উপদেশ ব্যতীত কোন গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না বলিয়া কথিত আছে। যখন তিনি পত্নীর সাহচর্য্য পাইতেন না, তখন পত্নীকে দেখাইবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রের কথোপকথন সংক্ষেপ করিয়া স্ত্রীকে আনিয়া দিতেন।

সাম্রাজ্যের যুগে নারী তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য অনেক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন। মেসালিনা ষড়যন্ত্রকারিণী এক সম্রাটের জীবন নাশ করিয়া, আবার আর এক সম্রাটেরও—যিনি তাঁহার স্বামী—তাঁহার পদচ্যুতির জন্য গুপ্ত পরামর্শ করিয়াছিলেন। নীরোর মাতা আগ্রাপিণা রাজ ক্ষমতা স্বহস্তে রাখিবার জন্য প্রথমে বহু হত্যাকার্য্যে হস্ত কলঙ্কিত করেন। পরে যখন নীরো বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং ক্ষমতা পরিচালনা করিতে লাগিলেন, তখন আগ্রাপিণা পুত্রের উপর অধিকার স্থাপনের জন্য মাতার কর্ত্তব্য ও পদমর্য্যাদা জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। তিনি পুত্রকে যুবতী রমণী ও উৎকৃষ্ট মদ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়া নিজে রাজ্য শাসন করিবার প্রচেষ্টা করেন। তাহাতেও যখন নীরো নিজে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না, তখন—বলিতেও দুঃখ ও লজ্জায় মুখ ম্লান হয়—আগ্রিপাণা নীরোর মদোন্মত্ত অবস্থায় সম্মুখে যাইয়া নিজের দেহকে পুত্রের উপভোগের জন্য প্রদান করিতে চাহিলেন। একথা ট্যাসিটাস তাঁহার Annalsএর ত্রয়োদশ খণ্ডে বলিয়াছেন। যেখানে এরূপ লোমহর্ষণ অমানুষিক ব্যভিচার (incest) চলিতে পারে, সেখানে ধ্বংসের দেবতা যে তাঁহার উদ্যত অশনি লইয়া বসিয়া থাকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

রোমান সাম্রাজ্যে বন্ধু, আত্মীয় বা পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য নারীর বিষপ্রয়োগের শত শত উদাহরণ রহিয়াছে। কিন্তু এ গুলিকে রোমে নারী স্বাধীনতার ফল বলিয়া বুঝিলে অত্যন্ত ভ্রমে পড়িতে হইবে। মোগল সাম্রাজ্যে মেয়েদের কঠোর অবরোধের মধ্যে থাকিতে হইত, কিন্তু সে-স্থানেও তাঁহারা কি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে নিজেদের হস্ত কলুষিত করেন নাই। স্বেচ্ছাচারতন্ত্র যে সাম্রাজ্যের মূলমন্ত্র হইবে সেইখানেই গুপ্ত-ষড়যন্ত্র দেখা দিবে ইহাই ঐতিহাসিক নিয়ম।

রোমের নারী স্বাধীনতার অপব্যবহার করিয়াছিল, ইহা দেখাইবার জন্য একশ্রেণীর লেখক বলিয়া থাকেন যে রোমের নারী যেমন দুশ্চরিত্রা হইয়াছিলেন, এরূপ দুশ্চরিত্রা রমণী অদ্যাবধি জগতের আর কোন স্থানের রমণী হয় নাই। ইহার উত্তরে দুইটী কথা বলিবার আছে। প্রথমতঃ দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে যতটা শোনা যায়, তাহার সবই যে সত্য তাহা নহে। রোমের লোকেরা সাধারণতঃ প্রাচীনের পক্ষপাতী ছিলেন—নারীর বিদ্যাচর্চ্চা, পুরুষের সহিত সমান ভাবে তাহার ব্যবহার তাই তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না। ঈর্ষ্যা বা কুসংস্কার বশতঃ স্বাধীনা নারীর সম্বন্ধে অনেক অখ্যাতি প্রচার করিতেন। তারপর আমরা যে শ্রেণীর লোকের নিকট হইতে নারীর দুশ্চরিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য পাইয়াছি, সে শ্রেণীর

লোকের কথা সর্ব্বথা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। জুভেনাল, মার্শিয়াল, সুসিয়ান ইঁহারা সকলেই বিদ্রূপাত্মক কবিতা লিখিতেন। Satireএর একটী প্রধান নিয়মই হইতেছে এই যে অল্প দোষকে বেশী করিয়া বলিয়া সমাজকে কশাঘাত করা ও তাহার দ্বারা সংশোধন করা। সুতরাং ইঁহারা নারী সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই যে বেদ বাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে এরূপ কোন কথা নাই। তাহার পর St. Zerome, St. Augustine শ্রেণীর খৃষ্টান সাধুগণ রোমের নারী চরিত্রের প্রতি যথেষ্ট কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা অ-খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জাগতিক ভাব দেখিয়া এতই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়াছিলেন যে ইঁহাদের পক্ষে দুই চারিটা বেফাঁস কথা বলা অসম্ভব নহে।

তবে রোমের নারী যে নৈতিক পথভ্রষ্টা হন নাই এ কথা বলিবার উপায় নাই। ব্যভিচারের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যের প্রথম যুগে একটী আইন করা হইয়াছিল, কিন্তু সে আইন চলে নাই। একবার একব্যক্তি কেবলমাত্র যে সকল পরিবার রোমের উচ্চতম শাসনকর্ত্তার পদ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পান যে তিন সহস্র নারী ব্যভিচারিণী। সামান্য একটী গণ্ডীর মধ্যে যখন এত ব্যভিচার, তখন সমাজের মধ্যেও যে ব্যভিচার ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য। আর ঐতিহাসিক লিভি ও ট্যাসিটাসও নারীর দুশ্চরিত্রতার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

এখন আমাদিগকে অনুসন্ধান করিতে হইবে যে ঐ ব্যভিচার কি নারী স্বাধীনতার ফল? নারী সমাজ দেহের অর্দ্ধাংশ মাত্র—পুরুষ অপরার্দ্ধ। এখন যদি একার্দ্ধ পূতি-গন্ধময় কুৎসিৎ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে অপরার্দ্ধ কি তাহারই আনুসঙ্গিকভাবে রোগাক্রান্ত হইবে না?

রোমের পুরুষ রোমের চরম শত্রু কার্থেজের ধ্বংস সাধন করিয়া ও সিসিলি, গ্রীস, ম্যাসিডন, স্পেন প্রভৃতি বহু দেশ জয় করিয়া একেবারে বিলাসিতা ও ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল। রোমের সম্পদ ও ঐশ্বর্য্য তখন মানব কল্পনার অতীত—পৃথিবীর যুগ যুগান্তের সঞ্চিত অর্থ আসিয়া রোমের কোষাগার পূর্ণ করিয়াছে। অগ্নি না হইলে যেমন জীবন ধারণ করা চলে না, অথচ সেই অগ্নিই যদি প্রবল হয় তবে ধন-প্রাণ ধ্বংস করে, তেমনি অর্থ না হইলেও লোকের চলে না, কিন্তু সেই অর্থই যদি অগাধ পরিমাণে বিনায়াসে আসিতে থাকে তবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। রোমেও ঠিক তাহাই হইল। রোমের অর্থ রোমের জনশক্তির নৈতিক চরিত্রকে ডুবাইয়া দিল। পুরুষ যখন নিত্য নূতন ব্যভিচারে নিমগ্ন তখন নারী কি কতকগুলো শুষ্ক নীতির কথা স্মরণ করিয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকিবে। চোখের উপরে সে তাহার স্বামীর রিরংসার তাণ্ডব প্রত্যক্ষ করিয়া রক্ত-মাংসের শরীর লইয়া কেমন করিয়া সংযত থাকিবে? সমাজে পুরুষ যদি প্রকাশ্যে নির্লজ্জের মতন ব্যভিচার করে, তবে নারী শত উপদেশ সত্ত্বেও ভ্রষ্টা হইবেই। নীতি কথা অপেক্ষা দৃষ্টান্তের মূল্য বড় এ কথা এক্ষেত্রেই কেবল ভুলিলে চলিবে না। নারীর চরিত্র রক্ষা করিতে হইলে পুরুষকে আগে চরিত্রবান হইতে হইবে

কিন্তু রোমে আমরা কি দেখি? প্লুটার্ক একজন নব বিবাহিতা বধূকে উপদেশ দিতেছেন যে তাঁহার স্বামী যদি দাসীদের সহিত প্রণয় করিতেছেন এ যদি কোনদিন চোখে পড়ে, তবে স্বামীর সহিত যেন ঝগড়া না করেন। কেননা স্ত্রী তিনি হইতেছেন সম্মানার্হা—শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্রী—আর দাসী সে নীচ—সুতরাং তাহার উপরই পুরুষ তাঁহার নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতেছেন। হায় সকল নারী কি এমন পূজা পাইয়া সে অপূর্ব্ব পূজাশীল স্বামীর চরণপদ্ম ধ্যান করিয়া থাকিতে পারে? সে কি পাষাণী?

রোমের অগাধ ঐশ্বর্য্যই যে তাহার নর ও নারীর চরিত্র-হীনতার কারণ তাহা সেই সুশৃঙ্খলতার যুগেও রোমের চিন্তাশীল মনীষীগণ বুঝিয়াছিলেন। তাই কবি জুভেনাল বলিতেছেন—

Whence shall these prodegies of vice traced?
From wealth, my friend. Our matrons then wore chaste
When days of labour, nights of short repose
Hands still employed the tuscam wool to tase. etc

সমাজের এক স্তরে যদি অর্থ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়,

তাহা হইলে অন্ন স্তরের লোক না খাইতে পাইয়া মরিয়া যায়। কিন্তু অর্থের প্রচুর সমাগম যে সর্ব্বথা প্রার্থনীয় নহে, তাহা রোমের ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে সেখানে স্তূপীকৃত অর্থই পুরুষের চরিত্র উচ্ছৃঙ্খল করিয়াছিল ও তাহার দেখাদেখি নারী চরিত্রহীনা হইয়াছিল।

রোমের স্বাধীনা নারীদের সম্মুখে নানা প্রলোভন উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহারা সেগুলি জয় করিতে পারেন নাই। প্রথমতঃ রোমে এত বেশী ক্রীতদাস দাসীর আমদানী হইয়াছিল যে নারীকে গৃহকর্ম্ম করিতে হইত না। নারীর কর্ত্তব্যের কেন্দ্র হইতেছে গৃহ—সেই স্থানে যদি তাহাকে কোন কর্ত্তব্য করিতে না দেওয়া হয় তবে নারী সমাজের পরগাছা স্বরূপ হইয়া সমাজ দেহের রস শোষণ করে মাত্র। রোমের ধনী গৃহিণীরা সন্তানকে স্তন্য দান পর্য্যন্ত করিতেন না—সে কাজও ধাত্রী করিত। সুতরাং সময় অতিবাহিত করিবার জন্য রোমের নারীকে নানারূপ আমোদ আহ্লাদ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইত। তাহার পর পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে রোমের পুরুষেরা ক্রীতদাসী লইয়া প্রণয় খেলা খেলিতেন। তাই দেখিয়া নারীও তাহার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। সুন্দর ক্রীতদাস কিশোরের মূল্য রোমে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। নারী ক্রীতদাসীদের দ্বারা কাজ করাইতে করাইতে নির্দ্দয় হৃদয়া হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের কাজে বিন্দুমাত্র ত্রুটী পাইলে কঠোর ভাবে কশাঘাত করিতেন। হতভাগ্য হতভাগিনীদের দেহ রুধিরে রঞ্জিত হইয়া যাইত, আর গৃহস্বামিনী পরম আনন্দ ভরে তাহা লক্ষ্য করিতেন। Hardock Ellis এর Sadistic spirit রোমের রমণীদের মধ্যে আসিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

রমণী আনন্দ চাহিত—রোমে আনন্দের অভাব নাই। তাঁহারা রোমে তখন সার্কাস থিয়েটার মল্লযুদ্ধ লাগিয়াই আছে। এ সকল স্থানে নারীর অব্যাহত গতি। থিয়েটার ও মল্লযুদ্ধ দেখিবার স্থান নারীর ও পুরুষের জন্য পৃথক পৃথক ছিল। কিন্তু সার্কাসে স্ত্রী পুরুষ একত্রে বসিয়া ক্রীড়া-কৌতুক দর্শন করিতেন। ওভিড বলিয়াছেন নারী সেখানে শুধু দেখিতে যাইত না, দেখাইতেও যাইত। সার্কাসে যাইবার সময় তাহার আর বেশভূষার পারিপাট্যের সীমা পরিসীমা ছিল না। যে রমণী অপেক্ষাকৃত অসচ্ছল অবস্থার হইতেন, তিনি প্রতিবেশীদের নিকট হইতে ধার করিয়া পোষাক পরিতেন। যুবতীরা সার্কাস দেখিতে যান বলিয়াই যুবকেরা সেখানে যাইতেন। একত্রে গলাগলি ধরিয়া নর-নারী সার্কাস দেখিতে দেখিতে জীবনের নব নব সম্বন্ধের গ্রন্থিবন্ধনে বদ্ধ হইতেন। রোমের অনেক বিবাহের ঘটকালী সার্কাসেই হইত।

রোমের নারী যে শুধু খেলাই দেখিতেন তাহা নহে, খেলোয়ারদের প্রতিও তাঁহার আসক্তি কম ছিল না। মল্ল-যোদ্ধা, অভিনেতা, চিত্রকর, কবি—ইঁহারা রোমের রমণী সমাজে পরম সমাদরে অভ্যর্থিত হইতেন।

রোমের ধনীদের গৃহে ভোজ উৎসব লাগিয়াই আছে। সে সকল উৎসব যুবক যুবতীর অবাধ মিলনের প্রকৃষ্ট স্থল। পূর্ব্বে রোমে নিয়ম ছিল যে নারী মদ্য স্পর্শ করিতেও পাইবেন না। যদি কোন নারী গোপনেও এরূপ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। কিন্তু এই বিলাসিতার যুগে, উচ্ছৃঙ্খলতার পঙ্কিল আবিলে সে সুন্দর সংযত নিয়ম-গুলি কোথায় ভাসিয়া গেল? রোমের সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহিণী-গণ স্বাধীনতার চরম অপব্যবহার করিয়া মদিরার ফেনিলোচ্ছিল আবর্ত্তে লজ্জা সংযমকে বিসর্জ্জন দিলেন। পূর্ব্বে আরও নিয়ম ছিল যে পুরুষ কোচের উপর শুইয়া আরামে আহার করিতে পারিবেন, কিন্তু নারীকে বসিয়াই খাইতে হইবে। কিন্তু এখন সে নিয়মও চলিয়া গেল—নর ও নারী সমভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া দ্বিপ্রহর রজনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে উত্তেজক মদ্যমাংস আহার করিতে লাগিলেন। ইহার স্বাভাবিক ফল যাহা হইবার তাহাই হইল।

তারপর রোমের নারী স্বাধীনতা পাইয়া বিদেশের নূতন নূতন দেবদেবী রোমে আমদানী করিতে লাগিলেন। ইঁহাদের প্রতি তাঁহাদের যে ভক্তি খুব বেশী ছিল বলিয়া এরূপ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তবে বিদেশী দেবদেবীর পূজার আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান গুলি তাঁহাদের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সকল দেবদেবীর পূজা প্রায়ই গভীর

নিশীথে সম্পন্ন হইত। অনেক পূজা কেবলমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতার পর একটা স্থুল আবরণ দিবার জন্য অনুষ্ঠিত হইত। নরনারী এখানে লজ্জা ও শীলতাকে দূরে নির্ব্বাসিত করিয়া কামোন্মত্ত পশুর ন্যায় ব্যবহার করিত।

নারীর চরিত্র যখন এরূপ ভ্রষ্টা হইয়া গিয়াছে তখন স্বামী যে তাহাকে সংযত করিবে সে উপায়ও নাই। স্ত্রী অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী—তাঁহাকে চটাইলে অনেক ক্ষতি। তাই স্ত্রী যাহা করেন, স্বামীকে তাহাতে সায় দিয়াই যাইতে হয়। অনেক রমণী তাঁহাদের স্বামীদের উপর রীতিমত অত্যাচার করিতেন। স্বামী বেচারাকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিতে হইত। জুভেনাল বলিয়াছেন যে এক নারী ক্রীতদাসের সহিত ব্যভিচার করিতেছেন এমন সময় স্বামী তাঁহাকে দেখিতে পান। নারী অমনি রাগিয়া বলিলেন—"তুমি যা ইচ্ছা তাই করিবে, আর আমি বুঝি তাই চুপ করিয়া বসিয়া দেখিব? আমারও তো রক্তমাংসের শরীর?" ব্যস সব চুপ!

এই জন্যই জুভেনাল তাঁহার বিবাহকামী বন্ধুকে উপদেশ দিতেছেন যে জগতে আফিমের অভাব নাই—উঁচু দালানের—দড়ী কলসীর কিছুরই তো অভাব নাই—তবে কেন তিনি এত থাকিতে বিবাহ করিতে চাহিতেছেন?

যে সমাজে ব্যভিচার এত প্রবল, সে সমাজ তখনই ধ্বংস হইয়া গেল না কেন? কোন শক্তিতে সে চারি পাঁচশত বৎসর জগতের উপর প্রভুত্ব করিল? সমাজের মধ্যে তখন এক নূতন ভাবের বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। Stoicism নামক দার্শনিকবাদ চিন্তাশীল নরনারী মাত্রেই গ্রহণ করিতেছিলেন। ইহাতে জগতের সুখ-দুঃখের প্রতি তাঁহারা উদাসীন হইতে শিক্ষা করিতেছিলেন। প্লিনির বর্ণিত আরিয়া নাম্নী মহিলার জীবনী হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে কোন শক্তি রক্ষা করিয়াছিল। আরিয়া সিসিনা পিটাসের পত্নী পিটাস রোগশয্যায় কাতর তাহার ছেলেটীও মুমূর্ষু। সেই সুন্দর ছেলেটী মারা গেল। তখন আরিয়া এমন ভাবে পুত্রের অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন যে স্বামী সন্তানের মৃত্যু সংবাদ বিন্দুমাত্রও জানিতে পারিলেন না। যখনই স্ত্রী স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিতেন, তখনই এমন ভাব দেখাইতেন যে ছেলে যেন জীবিত আছে। পিটাস বারবার ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করিতেন—আরিয়া বলিতেন "খোকা বেশ ভাল হয়ে উঠছে—আজ বেশ খেতে পেরেছে" এমনি করিয়া স্বামীকে ভুলাইতে অভাগিনীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত। তখন ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া প্রাণ পুরিয়া তিনি কাঁদিয়া আসিতেন। আবার স্বামীর কাছে আসিবার সময় চক্ষু ধুইয়া আসিতেন। ইতিমধ্যে সম্রাট ক্লডিয়াস কোন কারণ বশতঃ পিটাসকে আত্মহত্যা করিতে আদেশ দিলেন। পিটাস ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু আরিয়া একখানি তরবারী নিজের বক্ষঃস্থলে আমূল বিদ্ধ করিয়া দিয়া বলিলেন—এই দেখ এতে কিছু ব্যথা লাগে না। সতী এমনি করিয়া স্বামীর মরণের ভয় দূর করিয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে ব.ণ করিলেন। Stoicism এমনই ধৈর্য্য, সংযম তখন শিক্ষা দিতেছিল।

এদিকে আবার তখন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টান ধর্ম্মের সংস্পর্শে আসিয়া অনেক রোমান নরনারী হৃদয়ে শান্তি পাইলেন।

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

"কই দেখি ফাগুন, তুমি কেমন সুতো তুলেছ।" ফাল্গুনীর কর্ত্তিত সুতার বাণ্ডিল লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া করুণ অথচ প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিল—"চমৎকার হ'য়েছে, কী অভাগা আমি—চোখে দেখতেও পাচ্ছি না। ফাগুন তবু কি আমায় ছেড়ে দেবে না?"

"না, দেব না।"

"কি জানি, কি ভেবেছ তুমি...।" মৃণাল থামিয়া থামিয়া বলিল—"আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাবে কি?"

"নিশ্চয় এক্ষণি—আসুন।"

"চল যে ভার স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছ, তাকে টেনে নিয়ে যাও।"

"আসুন।" ফাল্গুনী শিথিল হাত দু'খানি বাড়াইয়া দিল, মৃণালের বলিষ্ঠ দেহ সন্তর্পণে ধরিয়া, ধীরে ধীরে পা বাড়াইল। বাহিরে আসিতেই মুক্ত জ্যোৎস্না উভয়ের বদ্ধ দেহের পরে' উল্লাসে ঝাঁপাইয়া উভয়কে অভিনন্দিত করিল। ঘরের আলো আঁধারের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান রক্ষিত হইয়াছিল। বাহিরে জ্যোৎস্না আনিত আলোর রাজ্যে আসিয়া ফাল্গুনী লজ্জার ভারে জড়াইয়া পড়িল। * * * "কই ফাগুন বাইরে গেলে না?"

কাঁপিয়া দুলিয়া ফাল্গুনী বলিল "এসেছি তো।"

"হ্যাঁ ঐযে সমুদ্রের বিরাট গুরু গম্ভীর কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। আঃ ঠাণ্ডা বাতাসও গায়ে এসে লাগছে...কিন্তু এমন সুন্দর চাঁদনী রাতের শোভা সমুদ্রের মন মুগ্ধকর মহান দৃশ্য চোখেই দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধের জীবন কি কম কষ্টের?"

ফাল্গুনী মৃণালের কাতর কণ্ঠস্বরে ব্যথিতা হইল। তাহার কাঁধের পরে' মৃণালের দেহের সম্পূর্ণ ভার ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। চলিতে চলিতে শ্রান্ত হইয়া ফাগুনী থামিল। মৃণাল কাতর স্বরে বলিল - "ফাগুন আমাকে এইখানে বসিয়ে দাও, আঃ কত কষ্ট যে তোমায় দিচ্ছি—এবং দেবও যে কত, তার আর সীমা নেই।"

ব্যগ্রকণ্ঠে ফাল্গুনী বলিল—"না না কষ্ট আমার মোটেই হয় নি...আপনার কি এখানে ভাল লাগছে?"

সঘন শ্বাসে ফাল্গুনীর বুক উঠিতে পড়িতে লাগিল।

মৃণাল বলিল—"খুব ভাল লাগছে, কিন্তু একটা বিষয়ে বড় দুঃখিত হচ্ছি...যে এই অন্ধের সেবা তুমি আজীবন কি করে কর্বে?"

"আপনি কি আমার ইচ্ছেয় বাধা দেবেন?"

"না ফাগুন বাধা দিচ্ছি না—সে শক্তি আমার নেই, এতই যদি ইচ্ছে তো এই অভাগার বাকী দিনগুলো তোমার পরশে মধুর করে তোল, আমি তোমার এই দাবী আর অগ্রাহ্য করতে পারছি না, কিন্তু সংসার চলবে কি করে?"

"আমি আছি, তার জন্যে চিন্তা করবেন না, সে ভাবনা আপনাকে একদিনের জন্যও ভাবতে দেব না।"

"ফাগুন, তুমি স্ত্রী হ'য়ে আমাকে বসিয়ে খাওয়াবে, তোমার কষ্ট সঞ্চিত অর্থে আমি উদর পূর্ত্তি করবো?"

"মৃণালবাবু...আপনার অনাবশ্যক প্রশ্নগুলো বড় দীর্ঘ হ'য়ে পড়ছে...ওরকম করে বললে আমি চলে যাব।"

হা হা করিয়া সরল হাসিতে দিগন্ত কাঁপাইয়া মৃণাল বলিল—"এইবার তো তোমার পরাজয় হলো ফাগুন, নিজের মনের কথা বেরিয়ে পড়ল।"

"হুঁ মনের কথা বইকি, আপনি বড্ড রাগান, যান্।"

"যেতে তো চাচ্ছি ফাগুন, যেতে দিচ্ছ কই...? চল এইবার বাড়ী ফেরা যাক, অনেকক্ষণ ঘোরা গ্যাছে।"

* * * *

মৃণালকে শয্যায় শোওয়াইয়া সুইচটি টানিয়া লাইট নিভাইয়া ফাল্গুনী বলিল—"এইবার আমি যাই···দরকার হলে ডাকবেন, নীচে মেঝেতে গোবিন্দ শোবেখ'ন...।"

মৃণাল একটু ইতস্ততঃ স্বরে বলিল—"ফাগুন, শোন।"

ফাল্গুনী একটু সরিয়া বলিল—"বলুন, এই আমি কাছে এসেছি।"

স্নেহভরে ফাল্গুনীর হাতখানি ধরিয়া মৃণাল রুদ্ধকণ্ঠে বলিল —"দেশের কাজে প্রাণ দিয়ে চিরসুখী হও, ফাগুন এই তোমার দীন-হীন, অক্ষম স্বামীর একান্ত কামনা। আমি তো সকল কর্ম্মের বাইরে···তুমি আমার হ'য়ে আমার ঈপ্সিত অপূর্ণ সাধগুলো মিটিও; ফাগুন ঘর কি অন্ধকার?"

বাষ্পরুদ্ধ স্বরে ফাল্গুনী উত্তর করিল—"হ্যাঁ।"

হতাশ ভাবে মৃণাল বলিল—"অন্ধকার আর আলো আমার কাছে সব সমান।"

ফাল্গুনী আর স্থির থাকিতে পারিল না...প্রিয়জনের এতটুকু কষ্ট নারী বুক পাতিয়া সহিতে পারে না। মৃণালের হতাশ কাতর স্বরে ফাল্গুনীর কোমল প্রাণখানি ভাঙ্গিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। সে সিক্ত মধুর স্বরে বলিয়া উঠিল— "ওগো কেন তুমি অত ভাবছ বলত, যতক্ষণ আমার দেহে সামান্য শক্তিও অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ,—তুমি স্থির জেনে রাখ, সে তোমারই শক্তি! তুমি দেখতে পাচ্ছনা বলে ক্ষোভ করছ···কিন্তু জেনো, আর একজনের দুটি চোখ তোমার সকল অভাব পূর্ণ করবে! আমার চোখ দিয়ে তুমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত স্বরূপ দেখতে পাবে—তোমার কোন ইচ্ছাই অসম্পূর্ণ রাখব না। শুধু এইটুকু আশীর্ব্বাদ আমায় করো, যেন হাতের নোয়া—সিঁথির সিন্দুর বজায় রেখে...তোমার সেবায়···আর দশের সেবায় আমার প্রাণটুকু উৎসর্গ করে, তোমার পায়ের তলে মাথা রেখে মরতে পারি। বাঙ্গলার নারী আর এর বেশী সৌভাগ্য কামনা করে না।"

অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া মৃণালের পায়ে ভক্তিভরে মাথা রাখিয়া ফাল্গুনী নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিল।

(২০)

একরাশী ছেঁড়া কাগজের মধ্য হইতে মানসকে উদ্ধার ক'রয়া ডোরোথি বিস্ময় বিমূঢ়া হইয়া বলিল—"এসব কী হচ্ছে তোমার মানসদা?"

হাতের কাজ ফেলিয়া চট করিয়া আগন্তুককে দেখিয়া মানস বলিয়া উঠিল—"কে ডোরা, এসব হচ্ছে আমার অসার খেয়ালের পরিসমাপ্তি!"

"সে আবার কী...তার অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ যে কি, তাতো সেদিন এসে দেখেই গেছ ডোরা। আজ সেগুলি বিসর্জ্জন দিয়ে চলতি পথের যাত্রী আমি।"

সবিস্ময়ে ডোরোথি বলিল—"চলতি পথের যাত্রী! তোমার সব কথা আজকে এমন বেসুরো ঠেকছে কেন মানসদা?"

"তার আশ্চর্য্য নেই ডোরা..মানুষের চির জীবনটা কিছু ইমন কল্যাণ আর সোহিনীতে আলাপের নয়; অমন বড় বড় ওস্তাদের বীণাও মাঝে মাঝে সুরের অপলাপ করে ···তা আমার এ একটানা সুরে গেয়, ভাঙ্গা জীবন বীণা যে হঠাৎ তাল কেটে বেসুরো বেতাল হ'য়ে যাবে...তার আর বিচিত্র কী?"

ধূলার উপরেই বসিয়া ডোরোথি বলিল—"তর্কবাগীশ; তা যেন বুঝলাম, কিন্তু চারিধারে এ সমস্ত কী দেখছি, তল্পী-তল্পা বেঁধে যাওয়া হচ্ছে কোথায়?"

মানস স্মিতহাস্যে বলিল—"পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে—কপালের উপর যে ইন্দ্রিয়টা জল্ জল্ করছে সেই আমাকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে টেনে নিয়ে যাবে·· সেই আমার গন্তব্য স্থান।"

"নাঃ তোমার ও হেঁয়ালীপূর্ণ কথার একবর্ণও বোঝবার শক্তি আমার নেই মানসদা, স্পষ্ট করে ভেঙ্গে বল যে ঐ সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে কোথায় চল্লে?"

"কোমল স্বরে যে বীণাটা বাজতে বাজতে সহসা থেমে

পড়ে, তারই থেমে পড়া সুরের রেশের মত হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে অনেকদূর চলে যাব।"

ডোরোথি একটু বিদ্রূপ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না—বলিল "কোথায় ?"

"অনুমান করো দেখি ?"

"কোথায় দিল্লী - আগ্রা - লাহোর—করাচী—পুণা—কাশ্মীর—আফ্রিকা—স্যুদান—"

মানস হাসিয়া ফেলিল ; বলিল—"একে কি অনুমান করা বলে ডোরা...নাঃ মানচিত্রের সব দেশগুলি দেখবার ইচ্ছে নেই, যাব বাঙ্গলা দেশে···প্রথম অমলদার কাছে... তারপর এধার ওধার ঘুরে জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটিয়ে দেব ভাবছি···।"

"কেন হঠাৎ এ বৈরাগ্যের কারণ কি ?"

"বৈরাগ্য আবার কি ডোরা···সংসারের মায়া কাটিয়ে শ্রীভগবানের নাম নেওয়া তো জীবনের সৎ কাজ ও ষোলআনা উদ্দেশ্য......"

কিন্তু এ সৎকাজ ও জীবনের উদ্দেশ্যের মর্ম্ম বুঝেছ বোধ হয় মমতা দিদির মরণের পর হতে না ?"

মানস অধোমুখে নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল...ডোরোথি ডাকিল—"মানসদা ?"

"বল ডোরা ?"

"আমার কথা সত্যি কিনা বলুন ?"

"এক হিসাবে ধর্ত্তে গেলে কতকটা সত্যি দাঁড়ায় বটে।"

"আচ্ছা মমতা দিদি কি সব জানতো ?"

শিহরিয়া মানস উত্তর দিল—"ছি ছি সেকি ডোরা, তাকে আমি ঘুণাক্ষরেও জানতে দিই নি সে আমাকে ঠিক বড় ভায়ের মত স্নেহ ও মান্য করতো, না ডোরা আমি তার সে ভুল ভেঙ্গে দিইনি, আমার এ কথা কেবল মাত্র তুমি জানো।"

"মানসদা এত যদি ভালবাসতে, তা হলে বিয়ে কর নি কেন ?"

শুষ্ক হাসিয়া মানস বলিল—"বিয়ে! সমাজ যে প্রকাণ্ড ব্যবধান নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল দিদি, সে ছিল কুলীন কন্যা আর আমি কায়স্থ, তদুপরি আমার পিতা ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মাঝখানে বিরাট প্রাচীর...সে কি আমাদের সঙ্কীর্ণ হিন্দু সমাজে চলবার জো' আছে ডোরা ?"

ডোরোথি দুঃখিত ভাবে বলিল—"তা চলবার উপায় নেই সত্যি, কিন্তু সমাজ তো যথেচ্ছাচারিতাকে বাধা দিতে পারছে না...তার চেয়ে বিয়ে করাটা কি সমাজের পক্ষেও মঙ্গল নয় ?"

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়া মানস আপন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘরের মধ্যে কেমন যেন অস্বচ্ছন্দ্যতা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। এ অস্বস্তি-ভরা কক্ষের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া প্রথমে মানস বলিল —"মমতা যে চলে গেছে ডোরা এ খুব ভালই হ'য়েছে...কেননা সে আমার চোখের সামনে থাকলে হয়ত কোনদিন আমার প্রাণের সুপ্ত বাসনা মাথা তুলে জেগে উঠতো ..হয়তো বা মনের অবাধ গতি সংরোধ করতে না পেরে আমার অন্তরের অতৃপ্ত গোপন কামনা তাকে জানিয়ে, তার কুসুম কোমল সদৃশ পবিত্র মনখানিকে সঙ্কুচিত করে ফেলতাম। ঘৃণায় সে তখন ভাবতো—ছিঃ ছিঃ বিশ্ব জগতটাই পাপে ভরা, পবিত্র ভাই ভগিনীর ভালবাসা সকাম লালসায় পরিপূর্ণ। না ডোরা, সে অবস্থায় আমি যদি তার সামনে কোনদিন পড়তাম...তাহলে তার ভাস্বর চোখের উজ্জ্বল দীপ্তি আমি সইতে পার্ত্তাম না। না ছিঃ, ডোরা মমতা দেবী, ডোরা, সে গ্যাছে একটা প্রাণকে বাঁচিয়ে গ্যাছে। তাকে আমি ভালবাসতাম—একথা বল্লে সে দেবীর অপমান করা হয়, না তাকে আমি শ্রদ্ধা কর্ত্তাম, ভক্তি কর্ত্তাম, কেন জানো ? সে যে পুণ্যবতী···কত অল্পবয়স হ'তে সে সংযমী হয়েছিল—মানুষের মন একটা না একটা আকাঙ্ক্ষাতে ভরে থাকে, কিন্তু তার কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল না, সে পূত চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীর সামনে লোভ লিপ্সা বোধ হয় শত সুখের মূর্ত্তি ধরে দাঁড়ালেও তপঃক্লিষ্টা ব্রত-চারিণীর ধ্যান ভঙ্গ কর্ত্তে পারত না, সে তার কিশোর স্বামীর মূর্ত্তি পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে চির সুন্দরের আশায় কোন অনন্তধামের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছে - ডোরা, তার সে আশা সার্থক হ'ক··· তার পূজা সফল হ'ক, সে দেবতার আশীর্ব্বাদ পাক।"

(ক্রমশঃ)

সুর ও ভাব।

শিল্পী—কোনার্ড কিসেল।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]   ১৫ই শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৩।   [৩৬শ সপ্তাহ

বাবুদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল—একজন উত্তেজিত হইয়া বলিল—"আজ আমার মা বোন দুর্ব্বৃত্তদের হাতে লাঞ্ছিত অপমানিত—আর এখনও আমরা সব নীরব আছি—ধিক্ আমাদের জীবনে——

কিন্তু অপরাহ্নে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মাঠে "মোহন বাগান ভলাণ্টিয়ার" ম্যাচ্ দেখিতে চলিলেন,—পথে তখন হকার চেঁচাইতেছে—"পাবনায় ভীষণ কাণ্ড"—

উন্মত্তপ্রায় ম্যাচ দেখিতেছে—একজন রৌদ্রাতপ নিবারণের জন্য খবরের কাগজের টুপি করিয়া মাথায় পরিয়াছে—

বিজয় আনন্দে নাচিতে নাচিতে ফিরিতেছে—"হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে" থ্রি চিয়ারস ফর্ মোহন বাগান।

গৃহে ফিরিয়া জলযোগান্তে আড্ডায় সকলে জমিলেন—তাস খেলা চলিল—কেহ গান ধরিলেন——

ঘরের মেঝে খবরের কাগজটা পড়িয়া আছে—তাহার হেডিং দেখা যাইতেছে—

"পাবনায় ভীষণ কাণ্ড"

আলোচনা

দুয়োরাণী ও সুয়োরাণী—

ব্রিটীশ রাজনীতিতে প্রবল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দুর্ব্বল সম্প্রদায়কে দাঁড় করাইয়া দিয়া বা অধিক সংখ্যকের বিরুদ্ধে অল্প সংখ্যককে উত্তেজিত করিয়া জাতীয়তা আন্দোলন প্রতিহত করিবার চেষ্টা নূতন নহে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ব্রিটিশ সংরক্ষণশীল দল বা ইউনিয়ানিষ্ট দল প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মাবলম্বী টিউটন জাতীয় আলষ্টার বিভাগের অধিবাসীদিগকে সমগ্র কেল্টিক জাতীয় ক্যাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী আয়রল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। "Olster will fight and Olster will be right"—আলষ্টার আইরিশদের জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেই আলষ্টার ঠিক কাজ করিবে এই বাণী পুনঃ পুনঃ আলষ্টারবাসীকে শুনাইয়াছিলেন। ফলে আয়রল্যাণ্ডে যে ভীষণ গৃহবিবাদ বাধিয়াছিল তাহাতে ইংরাজদের অনেক সুবিধা হইয়াছিল—আইরিশ জাতীয় আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। এক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে আর এক ধর্ম্মকে দাঁড় করাইতে—এক জাতীয় (race) লোককে আর এক জাতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যে ব্রিটিশ রাজনৈতিকদের আইরিশ নীতি ছিল তাহা এখন প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

আয়ারল্যাণ্ডে যে নীতি চালাইয়া ইংরাজগণ বহুদিন ধরিয়া আইরিশ জাতিকে দমন করিয়া রাখিয়াছিল, আজ ভারতবর্ষেও যে ইংরাজ সেই নীতিই চালাইতেছেন তাহার আভাষ একজন ইংরাজ রাজনৈতিকই দিয়াছেন। এই রাজনৈতিকের নাম লর্ড অলিভার। লেবার পার্টির শাসন কালে ইনি ভারত সচিব ছিলেন। তিনি লণ্ডনের টাইমস্ পত্রে লিখিয়াছেন—"ভারতীয় রাজনীতির সহিত যাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তিনি অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে ভারতের ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর পক্ষপাতিত্ব করিয়া থাকেন। ইহার আংশিক কারণ মুসলমানদের সহিত তাঁহাদের সহানুভূতি—কিন্তু অধিকতর কারণ এই যে হিন্দু জাতীয়তার বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে দাঁড় করান।" গোপন নীতি এমনি করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলায় "ষ্টেটস্‌ম্যান লর্ড অলিভারের উপর বড়ই চটিয়া গিয়া তাঁহাকে "A maker of mischief" বলিয়া গালি দিয়াছেন। কিন্তু ষ্টেটস্‌ম্যান যে যুক্তিবলে লর্ড অলিভারকে গালি দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রবল বলিয়া মনে হয় না। ষ্টেটস্‌ম্যান বলেন যে পুলিস হিন্দু শোভাযাত্রার যে সময় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন তাহা কোন সম্প্রদায়ের উপর পক্ষপাতিত্ব করা হয় নাই। কেননা উভয় সম্প্রদায়ই ঐ নিয়মের বিরুদ্ধে টাউন হলে সভা করিয়াছেন। কিন্তু উভয় সভার বিবরণ পড়িলেই যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দুরা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথা ও নাগরিক অধিকার বজায় রাখিবার জন্য সভা করিয়াছেন আর মুসলমানেরা নব অধিকার লাভে প্রমত্ত হইয়া অধিকতর দাবী উপস্থিত করিয়াছেন। লর্ড অলিভার যে ঐ দুই সভার বিবরণ পড়েন নাই এমন নহে—তথাপি তিনি ঐরূপ অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

ভেদ নীতিতে সিদ্ধহস্ত ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আইরিশদিগকে চিরদিনের জন্য যেমন দমাইয়া রাখিতে পারেন নাই, তেমনি হিন্দুর জন্মগত অধিকার হইতেও তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বঞ্চিত রাখিতে পারিবেন না। সমস্ত বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া ভারতবর্ষ একদিন স্বরাজ লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবেই এ আশা আমরা পোষণ করি।

ক্ষয়গ্রস্ত কলিকাতা—

পল্লীগ্রামের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি নিবারণ করিবার জন্য কিছু কিছু আন্দোলন হইতেছে, কোন কোন প্রতিষ্ঠান কার্য্য করিতেছেন এবং বাঙ্গলা সরকার হইতে কিছু অর্থ সাহায্যও প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধান নগরী কলিকাতায় যে ক্ষয় রোগের প্রাবল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার প্রতি খুব কম লোকই মনোযোগ দিতেছেন।

সম্প্রতি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল জর্ণালে কলিকাতা ট্রপিক্যাল স্কুলের ডাঃ মুইর বাঙ্গলার ক্ষয়রোগ সম্বন্ধে প্রবন্ধে যে সকল তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সত্যই ভয়াবহ। ১৯১৯ সাল হইতে ১৯২৩ সালের মধ্যে কলিকাতা অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ২।৩ জন ব্যক্তি ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। মেয়েদের মধ্যে এই রোগের প্রভাব আরও অধিক। কলিকাতার হেলথ অফিসার মহাশয় লিখিয়াছেন যে পনের হইতে ত্রিশ বৎসর অতিক্রম করিবার সময় দশজন কলিকাতার মেয়ের মধ্যে একজন এই রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন।

কলিকাতায় প্রতি বৎসর বহু সহস্র ছাত্র মফঃস্বল হইতে অধ্যয়ন করিতে আসে। কিন্তু কলিকাতার আবহাওয়া এতই দূষিত হইয়া উঠিয়াছে যে এখানে আসিয়া অনেক ছাত্র যক্ষারোগগ্রস্ত হইয়া জীবন হারায়। কলিকাতার চায়ের দোকান, রেষ্টুরাণ্ট প্রভৃতি নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। অথচ ছাত্রদের এই দিকেই পয়সা ব্যয় করিবার ঝোঁক বেশী। এরূপ ক্ষেত্রে অভিভাবকগণ যদি ছেলেদের মফঃস্বলের কলেজে পড়াশুনা করাইবার ব্যবস্থা করেন তবে দেশের যুবকশক্তি রক্ষা পায়। মফঃস্বলের অভিভাবকগণ কলিকাতার মোহ ত্যাগ করিয়া মফঃস্বলেই ছেলেদের পড়াইবার ব্যবস্থা করিলে তাঁহাদের অর্থব্যয়ও অনেক কম হয়। কলিকাতায় যেরূপ যক্ষার প্রাদুর্ভাব তাহাতে বিশেষ বাধ্য না হইলে ছেলেদের এখানে পাঠান কর্ত্তব্য নহে।

আর অল্প বেতনের চাকুরেরা যাঁহারা ভাল আলো-হাওয়া ওয়ালা বাড়ী ভাড়া করিতে পারেন না—তাঁহাদেরও কর্ত্তব্য পাড়াগাঁয়েই পরিবারবর্গকে রাখা। ইহাতে পারিবারিক স্বাচ্ছন্দ্য তাঁহাদের হ্রাস হইবে বটে, কিন্তু পরিবারস্থ মহিলাদের জীবন রক্ষা হইবে। পুরুষেরা বাহিরে বেড়াইতে পারেন—অনেকটা বিশুদ্ধ হাওয়া সেবন করিতে পারেন। এই জন্য তাঁহাদের মধ্যে যক্ষার প্রাদুর্ভাব অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু মেয়েদের গৃহকোণে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হয় বলিয়া ও অল্পবয়সে সন্তান ধারণ ও পালনের ক্লেশ সহ্য করিতে হয় বলিয়া তাঁহাদের মধ্যেই যক্ষার প্রকোপ বেশী। পল্লীতে তাঁহাদিগকে রাখিতে পারিলে তাঁহারা মুক্ত হাওয়ায় থাকিতে পারেন—অল্পাধিক স্বাধীনভাবে বিচরণও করিতে পারেন।

কিন্তু মুস্কিল হইতেছে এই যে অনেকেরই পল্লীগ্রাম ম্যালেরিয়ার ডিপো। তাহার উপর আবার যেমন মুসলমান গুণ্ডার ভীতি দেখা দিয়াছে, তাহাতে অরক্ষিত অবস্থায় মেয়েদিগকে পল্লীতে ফেলিয়া রাখাও চলে না। এ যে ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর—বাঙ্গালী দাঁড়ায় কোথায়?

বাঙ্গলায় পাটের চাষ—

অসহযোগ আন্দোলনের সময় পাটের চাষের বিরুদ্ধে অনেক প্রচারকার্য্য চলিয়াছিল। তাহার ফলে দুই এক বৎসরের জন্য পাটের চাষ হ্রাস পাইয়াছিল। কিন্তু উক্ত আন্দোলনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় পাটের চাষ হ্রাস করার চেষ্টাও আজকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। গত বৎসর পাটের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পাওয়ায় এবার অধিকতর ক্ষেত্রে পাট বোনা হইয়াছে। ১৯২৫ সালে ২,৭১৫,৫০০ একার জমীতে পাটবোনা হইয়াছিল—কিন্তু এবারে সরকারী খবরে প্রকাশ যে ৩,১৫৬,০০০ একার জমীতে পাটবোনা হইয়াছে।

পাটের চাষে চাষী নগদ পয়সা হাতে পায় ধান বুনিয়া যাহা পায়—তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা পায়। কিন্তু ঐ টাকার অনেক অংশ যায় মহাজনের ঘরে—কিছু অংশ যায় আবগারী বিভাগের উদরে আর বাকী অংশ যায় আদালতের দরজায়। দেখা গিয়াছে যে পাট বাজারে উঠার সময়েই চাষীদের মধ্যে মামলা মোকর্দ্দমা বেশী হয় ও মাদকতা জনিত অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর ঘরে ধান না থাকায় সারা বছর ধরিয়া চাষীকে চাল কিনিয়া খাইতে হয়। এজন্য তাহাকে ধারকর্জ্জও করিতে হয়। কেননা আমাদের দেশের চাষীরা নগদ টাকা হাতে রাখিয়া সারা বৎসরের খরচ পরিমিত ভাবে চালাইতে পারে না। যখন নগদ টাকা হাতে আসে তখন তাহারা জলের মতন পয়সা ব্যয় করিয়া ফেলে। তারপর ধান বুনিলে যে বিচালী পাওয়া যায়, তাহা গরুতে খাইতে পারে। কিন্তু যে সকল চাষী পাটের আবাদ করে, তাহাদের ঘরে গরুর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। যে সকল চাষীর ঘরে বিশ বৎসর পূর্ব্বেও

১৫,২০টা গরু ছিল, আজ পাটের চাষের ফলে তাহাদের ছেলেরা দুধ খাইতে পায় না। পল্লীগ্রামের সহিত যাঁহাদেরই পরিচয় আছে তাঁহারাই এ কথার সত্যতার প্রমাণ দিতে পারিবেন।

এত দোষ সত্ত্বেও পাটের চাষ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভাইস্ চান্সেলার—

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের সংকল্প কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চান্সেলারের কার্য্য যেরূপ বাড়িয়া গিয়াছে—তাহাতে একজন বেতনভুক্ ভাইস্‌চান্সেলার নিযুক্ত করা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অন্যায় হইবে না। বাজারে গুজব নূতন কাউন্সিলে যদি স্যার আব্দার রহিম মন্ত্রী হয়েন তবে তিনি মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনের ভাইস্ চান্সেলারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করাইয়া দিবেন। অনেকে মনে করেন যে অধ্যাপক সরকার মহাশয় ঐ বেতনের লোভেই এরূপ বিপদ সঙ্কুল কর্ত্তব্যভার স্কন্ধে লইতেছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম যে তিনি সংকল্প করিয়াছেন যে বেতন নির্দ্দিষ্ট হইলেও তিনি এক পয়সা গ্রহণ করিবেন না। নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি কি নীতি অবলম্বন করিবেন—তাহার উপরই তাঁহার ইচ্ছার সফলতা নির্ভর করিতেছে।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন--

হিন্দুমুসলমানের আত্মঘাতী বিরোধ আজ দেশের সকল আন্দোলন, সকল আলোচনাকে ছাপাইয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘাতমূলক এই বিরোধকে বিদূরিত করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতির আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এই বিরোধ দূরীকরণের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের বিদেশীয় শাসকবর্গও অরাজকতার প্রাবল্য দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন ও বিরোধ দূরীকরণের জন্য নানাবিধ সদুপদেশ দিতেছেন। কিন্তু নিখরচায় মিলনের উপদেশ দেওয়া যেমন সহজ সেই উপদেশকে কার্য্যকরী করিয়া তোলা তেমনি কঠিন। শুধু কথায় চিড়ে ভিজে না ইহা সকলেই জানেন। স্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দ যে স্থানে স্থানে যাইয়া উপদেশ দিবার ও পুস্তিকাদি বিতরণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন তাহাও কেবলমাত্র কথারই কারবার—প্রকৃত কাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি অল্পই।

যাহা হউক এখন যদি দ্বন্দ্বকলহকে বিদূরিত করিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইহার যথার্থ কারণ নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। রোগ নির্ণীত হইলে, তখন তাহার চিকিৎসা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়।

লর্ড লিটন বলিয়াছেন যে চাকুরীতে ভারতীয়দিগকে অধিক পরিমাণে লওয়াতেই (Indianisation of services) দাঙ্গাহাঙ্গামার উৎপত্তি হইতেছে। কিন্তু অধিক পরিমাণে ভারতবাসীকে চাকুরী দিতে হইবে বলিয়াই যে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে চাকুরীর সংখ্যা ভাগ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। বরং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে বলিয়াছিলেন যে বর্ণ বা ধর্ম্মের বিচার না করিয়া যোগ্যতা অনুসারে ভারতীয়দিগকে চাকুরী দেওয়া হইবে। সেই উদার নীতি লঙ্ঘনকরার ফলেই আজ দাঙ্গাহাঙ্গামার আবির্ভাব হইয়াছে বর্ত্তমানে মহারাণীর ঘোষণাপত্র লঙ্ঘন করিবার কারণ মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক দাবী। সুতরাং লর্ড লিটন দাঙ্গাহাঙ্গামার মূলকারণ নির্দ্দেশ না করিয়া ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথাই যে দাঙ্গাহাঙ্গার মূল কারণ তাহা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ স্বীকার করিতেছেন। লাহোরের মুসলিম্ আউটলুক্ নামক পত্রে বলিতেছেন —"দাঙ্গাহাঙ্গামা নিবারণের (বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা দেশের পক্ষে) একমাত্র উপায় পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করা নহে—কিন্তু অতিসত্বর ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক মুসলমানদিগের ন্যায্য অধিকার প্রদান করা। যেদিন হইতে বাঙ্গলা কাউন্সিলে অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা মুসলমানদের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইবে, সেইদিন হইতেই কলিকাতার দাঙ্গাহাঙ্গামা চিরতরে বন্ধ হইয়া যাইবে। দাঙ্গাকারীরা রাজনীতির কথা চিন্তা করে না বটে, কিন্তু বুদ্ধিজীবিগণ শীঘ্রই বাঙ্গলা কাউন্সিলে তাঁহাদের সংখ্যাধিক্যের সাহায্যে মুসলমানদের প্রধান প্রধান অভাব অভিযোগগুলির প্রতিকার সাধন করিতে পারিবেন—তখন মুসলমানদের মনে তুষ্টি আসিলে আপনিই শান্তি ফিরিয়া আসিবে।" সাম্প্রদায়িক

নির্ব্বাচনে মুসলমানদের অধিকতর সংখ্যা না দেওয়াই দাঙ্গা-হাঙ্গামার কারণ ইহা মুসলিম্ আউটলুক্ স্বীকার করিতেছেন। অপরদিকে অনেক হিন্দু মনে করেন যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসনসংস্কারে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন রীতি প্রবর্ত্তন করাতেই দাঙ্গার উৎপত্তি হইতেছে।

বড়লাট লর্ড আরউইন তাঁহার সিমলা বক্তৃতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন কতদূর দায়ী তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তবে তিনি বলিয়াছেন যে কেহ কেহ মনে করেন যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন রীতিই দাঙ্গাহাঙ্গমার উৎপত্তির কারণ। তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে ভারত সরকার ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সংস্কার আইনের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না। রয়াল কমিশন বসিলে, সেই কমিশন কর্ত্তৃক ইহা বিবেচিত হইবে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন রীতি যে দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ ইহা অনেকের মত। এই মত যুক্তিসহ কিনা বিচার করিতে হইলে প্রথমে দেখা দরকার যে এই রীতি আসিল কোথা হইতে? অনেকে মনে করেন যে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন সংস্কারের অব্যবহিত পূর্ব্বে মুসলমানগণ যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন পাইবার জন্য আন্দোলন —এমন কি দাঙ্গাহাঙ্গামা করেন—তাহারই ফলে ১৯১৯ সালে উক্ত রীতি গবর্ণমেন্ট অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা আংশিক সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে—এবং অন্যান্য আংশিক সত্যের ন্যায় বিপজ্জনক। মুসলমানদিগকে সাম্প্রদায়িক দাবী করিতে শিক্ষা দিয়াছেন গবর্ণমেণ্ট নিজে। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যখন মর্লে-মিণ্টো সংস্কার প্রবর্ত্তিত হয়, তখনই প্রথমে এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনপ্রথা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছিল। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে Sir Charles Aitchison প্রথমে ধূয়া তোলেন যে "The division of the people into creeds, castes, and sects with varying aud conflicting interests rendered representation in the European sense an obvions impossibility." অর্থাৎ ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে ধর্ম্ম জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতির মধ্যে স্বার্থগত এত বিভিন্নতা দেখা যায় যে ইউরোপীয় প্রথায় নির্ব্বাচন চালান এখানে অসম্ভব। মর্লে-মিণ্টো সংস্কারে এই ধূয়াকে উদ্ধৃত করিয়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতি চালান হইল। মুসলমানগণ সেই সর্ব্বপ্রথম স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের অধিকার পাইলেন।

তখন মুসলমানদের মধ্যে যে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের জন্য বিশেষ দাবী ছিল তাহা নহে—তথাপি সরকার বাহাদুর মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী দেখাইয়া সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন রীতি অবলম্বন করিলেন। হয়তো তাঁহারা তখন ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ঐরূপ করেন নাই—আর্ল উইণ্টারটন ও লর্ড আরউইন এরূপ ভেদবুদ্ধি জাগাইয়া দিবার অভিসন্ধি গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংকল্প সাধু হইলেও বুদ্ধি তীক্ষ্ণতার অভাবই পরিলক্ষিত হইতেছে। সুইজারল্যাণ্ডে ক্যাথলিক, ক্যালভানিষ্ট, লুথারান প্রভৃতি নানা ধর্ম্মের, শ্রমিক, কৃষক ধনী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ও জার্ম্মাণ, ফ্রান্স কেল্টিক প্রভৃতি নানা জাতির লোক বাস করে—তথাপি সেখানে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতি নাই। তাঁহাদের এজন্য কোন অসুবিধাও হয় না। আমাদের দেশেও হিন্দু মুসলমান শান্তিতে বাস করিতেছিলেন—কিন্তু সাম্প্রদায়িক নীতিই বিভীষণের ন্যায় ভেদবুদ্ধি ঘটাইয়া দিল।

যখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনরূপ বিষবৃক্ষের বীজ একবার বপন করা হইল—তখন তাহা অবিলম্বে শাখাপ্রশাখা যুক্ত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত হইল। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু-মুসলমানদলের নেতারা পরস্পরের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে লক্ষ্ণৌ কমপ্যাক্ট স্থির করিলেন। Lucknow compactএ স্থির হয় যে ভারতীয় প্রতিনিধি সংখ্যার মধ্যে পাঞ্জাবে শতকরা ৫০ জন, যুক্তপ্রদেশে ৩০ জন, বাঙ্গলায় ৪০ জন, বিহার উড়িষ্যায় ২৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ১৫ জন, মাদ্রাজে ১৫ জন ও বোম্বেতে ৩৩ জন মুসলমান গৃহীত হইবেন।

লক্ষ্ণৌ কমপ্যাক্টের উপর ভিত্তি করিয়াই ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন সংস্কারে মুসলমানদিগকে প্রতিনিধি সংখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে মর্লে-মিণ্টো সংস্কারই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের জন্মদাতা। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে এরূপ নীতি অবলম্বন না করিলে মুসলমানেরা এরূপ

অদ্ভুত দাবী করিতে কখনই সাহসী হইতেন না। সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের দাবী অদ্ভুত অপূর্ব্ব—কেননা পৃথিবীর কোন গণতন্ত্রশাসিত দেশে এরূপ রীতি নাই। আর এ নীতি একবার অনুসৃত হইলে যে কোথায় দেশকে লইয়া যাইবে তাহারও কোন স্থিরতা নাই। আমরা মুসলিম আউট লোকের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে মুসলমানগণ লক্ষ্মৌ কমপ্যাক্টের অপেক্ষা আরও অনেক বেশী প্রতিনিধি দাবী করিতেছেন। মানুষের লোভের সীমা নাই—আমরা যত পাই ততই বেশী চাই। সুতরাং আজ এক প্যাক্ট কাল আর এক প্যাক্ট করিয়া ক্রমাগত মুসলমানদিগকে অধিকতর নির্ব্বাচন ক্ষমতা দিলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রভূত ক্ষতি হইবে এবং দেশের সর্ব্বনাশ সাধিত হইবে।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন যে দেশের পক্ষে বিষময় হইবে তাহা মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে'ও (পৃষ্ঠা ২২৭—২৩০) স্বীকৃত হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্টে নিম্নলিখিত তিনটী দোষ দেখান হইয়াছিল। (১) সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতি কোন স্বাধীন দেশে নাই—ইহা ইতিহাসের শিক্ষার বিরুদ্ধে—প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই জাতি ও ধর্ম্মের অপেক্ষা দেশের উপরই অধিক টান দেখা যায়। ধর্ম্ম এখন আর রাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী নহে। (২) সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ চিরস্থায়ী হয় এবং যথার্থ নাগরিক ভাবের প্রতিবন্ধক হয়। দেশের সকল লোক এবং তাহাদের স্বার্থও এক এই মহাসত্য আর হৃদয়ে স্থান পায় না। (৩) যেখানে কোন সম্প্রদায় সংখ্যায় অল্প অথচ তাহার দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার জন্য যদি তাহাকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন দেওয়া যায় তাহা হইলে সে সম্প্রদায় নিজ অবস্থাতেই তুষ্ট হইয়া আর উন্নতির কোন চেষ্টা করে না (A minority which is given special representation owing to its weakness and backwardness is positively enconraged to settle down into a feeling of satisfied curiosity, it is under no inducement to educate and qualify itself to make good the ground which it has lost compared with the stronger mazority).

কিন্তু মণ্টেগু—চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের এই তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও Franchise committee মুসলমানদিগকে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন প্রদান করেন। কারণ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন সংস্কার আইন প্রবর্ত্তিত হইবার কিছু পূর্ব্বে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের জন্য বেজায় দাবী করেন।

গবর্ণমেণ্ট বলিয়া থাকেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই দেশকে স্বায়ত্ত শাসন শিক্ষা দিয়া উপযুক্ত করিয়া তোলা। তাঁহারা আরও বলেন যে ভারতবাসীরা স্বায়ত্ত শাসনের কিছুই জানেন না। যখন আমরা অনভিজ্ঞ—তখন আমাদের এক সম্প্রদায়ের আবদারে গণতন্ত্র শাসন বিরোধী নীতি অবলম্বন করা কি তাঁহাদের উচিত হইয়াছে?

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতির ফলে হিন্দু নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা মুসলমানদিগকে ও মুসলমান নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা হিন্দুদিগকে বুঝাইয়া শিখাইয়া স্বমতে আনিবার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে দূরে থাকিতে পারেন। ফলে কলহ, অন্তর্বিবাদ চিরস্থায়ী হইবে। দেশের মঙ্গল কামনায় এখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতি পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

মুসলমানগণ—বিশেষতঃ নির্ব্বাচনপ্রার্থী তথাকথিত মুসলমান নেতারা হয়তো ইহাতে এখন চটিবেন। কিন্তু যদি গবর্ণমেণ্ট দৃঢ়তার সহিত সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথার উচ্ছেদ করেন তাহা হইলে দুই এক বৎসরের মধ্যে সব গোলমাল মিটিয়া যাইবে।

মুসলমানগণ একটা নূতন কিছু দাবী করিতেছেন—আর হিন্দুরা সকল দেশে যেরূপ প্রথায় নির্ব্বাচন হয় তাহারই প্রচলন এদেশে চাহিতেছেন। কাহার দাবী এক্ষেত্রে অধিকতর সঙ্গত তাহা গবর্ণমেণ্ট বিচার করিবেন।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ও শিক্ষাব্যয়—

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ভার অনেক পরিমানে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলির উপর ন্যস্ত আছে। কিন্তু টাকার অভাবে

তাঁহারা উপযুক্ত পরিমাণ স্কুল স্থাপন করিতে পারেন না। ১৯২৪—২৫ সালের ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলির যে কার্য্য বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড অর্থাভাবে অনেক ভাল কাজ করিতে পারিতেছেন না এবং সম্প্রতি এই অর্থাভাব দূর করিবার কোন উপায়ও নাই। সুতরাং দেশে শিক্ষা বিস্তারের সম্ভাবনা যে কিরূপ তাহা সকলেই বুঝিতেছেন।

ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলির মোট আয় হইয়াছিল ১৩৩ লক্ষ টাকা। তাহার মধ্যে মাত্র ২৯ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা শিক্ষা বিষয়ে ব্যয় করা হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশের পক্ষে এই ব্যয় যেন সাহারায় বারি বিন্দুপাত। কলিকাতা সহরের সকল ছেলেকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে হইলে ২৮ লক্ষ টাকা লাগে আর সেই জায়গায় সমগ্র বঙ্গদেশে ২৯।·০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কতটুকু ফল পাওয়া যাইতে পারে? আলোচ্য বর্ষে এই ২৯·৯ লক্ষ টাকার মধ্যে গবর্ণমেণ্ট দিয়াছিলেন ১৬·৪ লক্ষ আর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডগুলি দিয়াছিলেন ১২·৪ লক্ষ টাকা। গত বৎসর প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল ৪০,৮৫৯টী এবার কিছু বৃদ্ধি পাইয়া ৪১৪৯০টী হইয়াছে তাহার মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় মাত্র নয় হাজার সাতশত চল্লিশটী।

এরূপ ভাবে শিক্ষা বিস্তার হইলে দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে কত শত বৎসর লাগিবে? ভারতবর্ষ কি শিক্ষার অভাবে অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকাল তিমির গর্ভে বিলীন রহিবে? দেশের রাজা, জমীদার, ব্যবসায়ীরা কি তাঁহাদের দেশবাসীকে শিক্ষিত করিবার জন্য কোন চেষ্টাই করিবেন না?

আত্মরক্ষা করিবার প্রার্থনা—

বর্ষাকাল—আকাশে যেমন মেঘ ও রৌদ্রের খেলা লাগিয়াছে, কলিকাতাতেও তেমনি দাঙ্গাহাঙ্গামা ও শান্তির পালাক্রমে আবির্ভাব হইতেছে। পুনঃ পুনঃ দাঙ্গার ফলে বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের যে কত লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলিবার নহে। ধন ও প্রাণ লইয়া তাঁহাদের কলিকাতায় থাকাই কঠিন হইয়াছে। সম্মুখে পূজা—এ সময়ে তাঁহাদের খুব জিনিষপত্র বিক্রয় হইয়া থাকে। কিন্তু এবারে তাঁহারা বড়ই ভীত হইয়া পড়িয়াছেন।

পূজার বাজার আর কয়েকদিন পর হইতেই আরম্ভ হইবে। সেই সময়ে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ব্যবসায়ীগণের ১৪টি সভা কয়েকজন মান্যগণ্য প্রতিনিধি পাঠাইয়া গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এক আবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা চাহেন যে সাহাবাদ, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে যেরূপ দাঙ্গাকারীদিগকে শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল সেইরূপ মুসলমান দাঙ্গাকারী-দিগকে লুণ্ঠনের জন্য হিন্দুদের ক্ষতিপূরণ করিতে বাধ্য করা হউক। আর সশস্ত্র পুলিশ চীৎপুর, কাশীপুর, হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলে মোতায়েন রাখা হউক। পাটের ব্যবসায়ী প্রভৃতি দিগকে বন্দুক রাখিবার অনুমতি দেওয়া হউক।

হিন্দুরা এ পর্য্যন্ত বিনা কারণে বন্দুকের ব্যবহার করেন নাই। আত্মরক্ষার জন্য তাঁহাদের হাতে অস্ত্র দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট খুব সম্ভব এ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন না।

প্রেমের নেশা

(অমিত্র ছন্দে)

[শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়]

তখনও ছিল ম্লান সোনালীর রেখা
বিটপীর শ্যামল পল্লবে। গোধূলী ধূসর
রাখাল পাঁচনী করে উষর প্রান্তর
অতিক্রমি প্রত্যাগত গোপাল সংহতি,
উল্লসিত ক্ষুধিত বিব্রত,—তুলি মেটো তান
কাঁপাইয়া জলস্থল বাঁশবন আদি।
ব'সেছিল নিষ্ঠুর ছাতার বাবলার ডালে,
অশ্বত্থে কোকীল, বাঁধা ঘাটে ছিপ হাতে।
উকীল জনৈক, ডেলি প্যাসেঞ্জাররূপী
মফস্বল বাসী। তাল বৃক্ষহীন সেই
তাল পুকুরের অন্য পাড়ে ছিনু আমি
ছিপ হাতে একমনে ফাত্না পানে চেয়ে।
আচম্বিতে টুক্ টুক্ নড়িল ফাৎনা
বাগায়ে ধরিনু ছিপ ; হায় হেন কালে
এলো কানে কণ কণ কাঁকনের ধ্বনি
লুব্ধ দৃষ্টি অমনি ছুটিল বাঁধা ঘাটে!
হায়রে যেমতি ছুটে ছিলা রামচন্দ্র
সন্ধানেতে মায়ামৃগ দণ্ডক কাননে।
কি দেখিনু কি বর্ণিব আমি ভ্রান্তমতি
কুমারী কলসী কক্ষে মরালগামিনী
মুখুজ্যে নন্দিনী মেনী মধুপুর হ'তে
প্রত্যাগতা বহুদিন পরে শৈশব সঙ্গিনী!
ফাৎনা ডুবিল—খসিয়া পড়িল ছিপ
মম হস্ত হতে আমার অজ্ঞাতসারে!
ভুলিনু সকলি—বহিল তুমুল ঝড়
হৃদয় মাঝারে! হায়রে যেমতি ঝঞ্ঝা
ব'য়েছিল তিরিশ সালেতে। জীবনের
এতগুলো দিন গেছে ডুবে অতীতের কোলে

পড়েনি কখনো মর্ম্মে এমন নিষ্ঠুর
প্রেমের চাবুক। আত্মহারা উন্মাদের প্রায়
শূন্য প্রাণে এক দৃষ্টে রহিনু চাহিয়া—
মেনীর মুখের পানে—হায়রে যেমতি
দুগ্ধ পানে চেয়ে থাকে প্রলুব্ধ মার্জ্জার!
চকিতে চাহিল মেনী ফিরায়ে বদন
অধরের হাসি ফোটো ফোটো না ফুটিল
বুঝি হায় উকীলের ডরে! গেল চলি
কলসী লইয়া কক্ষে মানসমোহিনী।
হতাশে তুলিনু ছিপ—হায় দুরদৃষ্ট
বড়শী নিয়েছে কাটি নিষ্ঠুর কর্কট!
মাছ ধরা ইতি করি শূন্য প্রাণে ধরে
আনমনে পড়িতে বসিনু। মেনী ধ্যান
মেনী জ্ঞান হলো যেন স্বপ্নে জাগরণে
হোম টাস্ক ফেলি লিখিতে বসিনু লিপি
মনপ্রাণ ঢালি কিনে আনি 'প্রেমপত্র'
বটতলা হতে। লিখিয়া সুদীর্ঘ পত্র
খামে পুরি লিখি শিরোনাম সযতনে
উপাধান পাশে রাখি অমূল্য রতন
শয্যাপরে ঢালি দেহ মুদ্রিত নয়নে
ডুব দিনু ভাবনা সাগরে। কিন্তু হায়
চটাস্ চটাস্ শব্দে দারুণ আঘাত—
পড়ে পীঠে মেলিনু নয়ন—কি দেখিনু!
ভৈরব মুরতি পিতা সম্মুখে আমার
উত্তোলিয়া কে এম দাসের চটি—
বাম হস্তে প্রেম পত্রখানি! কেটে গেল
প্রণয়ের নেশা হায় চিরদিন তরে
সুরা নেশা কাটে যথা রুলের গুঁতোয়।

উপেক্ষিতা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

সংসারে একটা প্রবল ধাক্কায় বড় বেদনা পেয়েই যখন আমি জেগে উঠলুম তখন তাকিয়ে দেখলুম, দিন কখন শেষ হয়ে গেছে; একমাত্র পশ্চিমদিকে সূর্য্যাস্তের একটু লাল আভা জেগে আছে মাত্র, আর তিনদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে।

হায় রে, কখনই বা দিন এল, কখনই বা চলে গেল তা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না।

যখন আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলুম তখন বেলা দুপুর, কে জানত, মাথার পরে যে দীপ্ত সূর্য্য তখন স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল তা আকাশের কোলে দোলা খেতে খেতে পশ্চিমের কোলে হেলে পড়ে তার শেষ হাসি হেসে চলে যাবে। এ সূর্য্য কাল আবার উঠবে, আবার হাসবে, কিন্তু আমি আর তা দেখতে পাব না। আমার যেদিন চলে গেল তা আর ফিরে আসবে না।

কাঁধের পর দিয়ে একগোছা চুল কখন আমার অগোচরে সামনের দিকে এসে পড়েছিল, তার পানে চেয়ে আমি আচমকা স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম—কই,—আমার চুল তো সাদা ছিল না, এ যে কালো ছিল, হঠাৎ সাদা হ'য়ে গেল কি করে?

ছুটে বড় আয়নাখানার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম,—উঃ, কি বীভৎস মূর্ত্তি। সেই কি আমি—এই মাথাভরা সাদা চুল মুখে শত রেখা বার্দ্ধক্যে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে,—এই কি সেই আমি? ওগো দেবতা; আজ কোথায় নিয়ে এসে চেতনা দিলে প্রভু?

কাল—হ্যাঁ, কাল পর্য্যন্ত আমার দৃষ্টি এদিকে পড়েনি, কাল পর্য্যন্ত অন্তর আমার রঙিন নেশায় মসগুল হয়ে ছিল, কাল পর্য্যন্ত আমি ভাবিনি, আমার যৌবন চলে গেছে, সন্ধ্যা এসেছে—ডাক এসেছে যেতে হবে।

আয়নাখানার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালুম। নাঃ, সইতে পারি নে, বীভৎস মূর্ত্তি বৃদ্ধার সৌন্দর্য্য - ছিঃ।

দুই হাতের মধ্যে মাথাটা রেখে আমি ভাবতে লাগলুম—কি ছিলুম, কি হয়েছি।

উঃ, এই দেহটারই না কত অহঙ্কার করেছি আমি, নিজের সৌন্দর্য্য ওই আয়নায় দেখে নিজেই বিমোহিত হয়ে গেছি, আরও কত না উপায়ে সৌন্দর্য্যকে বাড়াতে চেষ্টা করেছি। পথে চলেছি বিজয় ডঙ্কা বাজিয়ে; বিজয় নিশান উড়িয়ে। হায় রে, কত রূপান্ধ এই গর্ব্বিতার দরজায় এসে কেঁদে ফিরে গেছে, কত হতভাগ্য মোহান্ধ ধনীকে পথের ভিখারি করে ছেড়ে দিয়েছি,—যার গর্ব্বে আত্মহারা ছিলুম আমি—সে আজ কোথায়?

বন্ধু—এতদিন ছিলে, তোমার গর্ব্বে গর্ব্বিতা হ'য়ে কত কাজই করেছি, যাওয়ার আগে কেন জানিয়ে দিয়ে গেলে না—যাওয়ার সময় হয়েছে, কেন এই সত্য চেতনাটুকু সময় থাকতে জানিয়ে দিলেনা গো?

আজ আমি বিশ্বের পরিত্যক্তা। আজ জানতে পারছি, কেউ আমার কাছে নেই। একদিন যারা আমার একটা কথা শুনতে পেলে—একটী আদেশ পালন করতে পেলে তাদের জীবনকে ধন্য মনে করত, আজ তারা কেউ নেই। তারা আমার ঘৃণা অবহেলা সয়েও আমার করুণার প্রত্যাশায় আমার একটী দৃষ্টিপাতের প্রত্যাশায় গেটের ধারে বসে থাকত, যেদিন আমার দেহে জরার আক্রমন দেখেছিল—সেই দিনই তারা চলে গিয়েছিল। তারা বুঝেছিল—কালের ডাক এসেছে, ফুলের গায়ে কালের ছোপ লেগেছে, এইবার তাকে শুকিয়ে উঠতে হবে, এইবার তাকে ঝরে পড়তে হবে। হায় রে, তারা তো তা বুঝেছিল, কিন্তু আমি যদি সেদিন বুঝতে পারতুম।

কিন্তু একেবারেই যে শুনিনি—দিন চলে গেলে আর আসে না, একথা তো সত্য নয়। আমি কি নিজের চোখেই দেখি নি, রজনীর তিমির সূর্য্যের কিরণে টুটে যায়, সেই

তরুণ সূর্য্য দুপুরে যে আকৃতি ধরে, সন্ধ্যায় তাকে দেখলে কেউ ধারণাও করতে পারে না। শুনি নি—একথা বললে মিথ্যা বলা হবে, শুনেছি, কিন্তু নিজের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কোনদিন তার তুলনা করিনি।

আজ আমার কেউ নেই, কিছু নেই। এই যে ত্রিতল হর্ম্ম, দাস-দাসী, কিছুই আজ আমার নয়। উঃ, জীবনে যাকে প্রথম আর শেষ প্রাণ ঢেলে ভালবেসেছিলুম—সেই আমায় প্রবঞ্চনা করে কখন কোন ফাঁকে আমার মোহাবস্থায় সর্ব্বস্ব নিয়েছে। চিরকাল সকলকে মোহমুগ্ধ করেই এসেছি, এই রকমই মোহমুগ্ধ হতে হবে। তিলে তিলে আপনার মনুষ্যত্ব নষ্ট করে—ধরতে গেলে আত্মহত্যা করে, পরলোকের কথা ভুলে ইহলোককেই একমাত্র সার মনে করে জমিয়ে তোলা বিপুল অর্থ এমনি করে একটি নিমিষে ঘুচিয়ে ফেললুম। আমাদের মত পাপিষ্ঠা যারা,—যারা পরের হৃদয়ের পানে না চেয়ে শুধু রক্তশোষণ করে তাদের এমনি করেই সব যায়।

আমায় সব ফেলে রেখে বার হ'তে হ'ল উপস্থিত আশ্রয়ের সন্ধানে, তারপর পেটের ভাবনা,—সে পরের কথা। আগে মাথা রাখবার স্থানটুকু চাই, দাঁড়াব কোথায় ?

কোথায় স্থান ? আমার স্থান বিশ্বে এতটুকু নেই। মহাভারতে পড়েছিলুম ছোটবেলায়—দুর্য্যোধন নাকি বলেছিল বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র পরিমাণ ভূমী সে পাণ্ডবদের দেবে না, ভগবান বোধ হয় আমার জন্যেও সেই ব্যবস্থা করেছেন। ধর্ম্মবলে বলীয়ান পাণ্ডব যুদ্ধ করে নিজেদের স্থান ঘুরে পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি,—আমি কি বল নিয়ে,—কোন সাহস নিয়ে যুদ্ধ করব ?

আশ্রয় পেলুম গাছতলায়। পেলুম না এ কথা বলতে পারলুম না। সব হারিয়ে আমার পথে এই পাওয়াটাই যে আমার মত পাপিনীর পক্ষে যথেষ্ট—পর্য্যাপ্ত। এই আশ্রয়টুকু পেয়ে কৃতজ্ঞতায় হৃদয় আমার ভরে উঠেছিল, আমি এই জীবনে প্রথম ভগবানের দয়ার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিলুম। এই সময়টিতে আমি চোখের জল রাখতে পারলুম না। অনুতাপে জর্জ্জরীভূতা আমি—দুই হাতে মুখ ঢেকে আর্ত্তকণ্ঠে কেঁদে বললুম, "ভগবান,—এমন করে আমার জন্মটাকে কেন ব্যর্থ করে দিলে প্রভু, কেন আমায় পবিত্রা রাখলে না ? আমায় পাঁকের মধ্যে জন্ম দিয়ে কেন ওপরে তুলে ধরলে না। তুমিই না পাঁকের মধ্যে পদ্মফুলকে ফুটিয়ে তুলেছ, সে ফুলে কি তোমার পূজা চলে না নাথ ?

বৃষ্টির জল গাছের পাতা ভেদ করে ঝর ঝর করে মাথায় গায়ে পড়তে লাগল ; রোদের সময় গাছের পাতার ফাঁকে রোদ তেমন ভাবে এসে পড়তে পারল না বটে, কিন্তু সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় সূর্য্য হেলে ওঠার ও ডোবার সময় যেটুকু পেলুম তাই যে যথেষ্ট

পেট তো মানে না, চাইতেই হবে লোকের কাছে, হাত পাততেই হবে।

আমারই সুমুখের পথ দিয়ে যে কয়টি লোক যাচ্ছিল এরা সবাই আমার পরিচিত। এরা আমার গেটের কাছে কতদিন বসে থাকত ; একবার চাওয়ার প্রত্যাশায়, একটি কথা শোনবার প্রত্যাশায়। আজ এরা কি কেউ এতটুকু দয়া করবে না ? যার গান শুনতে নীচে পথের উপর সারি দিয়ে লোক দাঁড়িয়ে থাকত, সে আজ ভিক্ষা চাইলে এরা কি তার মাথার সাদা চুলের পানে চেয়ে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে যাবে ?

মুখে কথা ফুটছিল না, হাত নড়তে চাচ্ছিল না তবু বুকে একটুকু শক্তি, সাহস জাগিয়ে তুলে হাত পাতলুম।

তারা আমার মুখের পানে তাকিয়ে বিকট হেসে উঠল। উঃ, কি সে হাসি, সে হাসির ধাক্কা আমার বুক কেটে কেটে অন্তর হ'তে অন্তরতম স্থানে গিয়ে পৌঁছাল, আমার চোখে বিশ্ব অন্ধকার হয়ে এল। কিন্তু বিরাট ক্ষুধা, খাওয়া যে চাই। আমি তাদের একজনের হাত চেপে ধরলুম,—আর্ত্তকণ্ঠে বলতে গেলুম—"ওগো আমায় কিছু দাও,—সামান্য কিছু—"

তারা আবার সেই নরকের হাসি হাসলে, আমার হাত হতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। কেউ তারা চেয়েও দেখলে না। যার কথা শুনবার জন্যে তারা একদিন উৎসুক ছিল, আজ সেই যে তাদের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। আমি যেমন করে ঘৃণার হাসি হেসেছি—তাদের বুক দলে চলে গিয়েছি, তারাও তেমনি করে চলে গেল।

উপযুক্ত প্রতিশোধ—কিন্তু কে নিলে, মানুষ না প্রকৃতি ?

যে আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে সংসারে আজ বড়লোক—নিজের উদ্ধতা ভুলে গিয়ে, ঘৃণা, লজ্জা ত্যাগ করে তারই পায়ের কাছে গিয়ে আছড়ে পড়লুম,—"এত নিষ্ঠুর হয়ো না, আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে এমন করে আমায় পথে তাড়িয়ে দিয়ো না।"

সে হাসলে সেই একই হাসি, কেমন উপেক্ষার হাসি উপেক্ষিতের দল হেসে গেল।

দিব্য শান্তভাবে সে আমারই ঘরে আমারই সোফায় আরাম করে বসে বললে, "দেখ স্থ, বেশী কথা বলো না বলছি। তবু যে স্বাধীন ভাবে পথেও বেড়াতে পাচ্ছো এই তোমার মত নারীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত পাওয়া হয়েছে। তুমি যে নারীত্বের দাবী নিয়ে আজ মানুষের চোখের সামনে কৃপার পাত্রীরূপে পরিচিতা হতে চাও, মানুষের করুণা আকর্ষণ করতে চাও, সেই নারীত্ব তোমার আছে কি ? যা থাকলে লোকে তোমায় করুণার চোখে না দেখে শ্রদ্ধার চোখে দেখত তার বিনিময়ে তোমার লাভ হয়েছে এই। দুঃখ করো না, এই হচ্ছে ভগবানের চাবুক সেটা মনে করে রেখো। তুমি দশজনকে ভিখারী করে তাদেরটা নিয়ে সুখে রাজত্ব করবে এ কখনই হতে পারে না তাই আমি ছিলুম তোমারই মত বিশ্বের ঘৃণিত জীব, আমার হাতে তিনি এই ভার দিয়ে তোমায় সরিয়ে নিয়েছেন। আমিও পাপিষ্ঠ বটে, তবে তোমার মত অন্ধ নই, পরকালের জন্যে কিছু রাখতে পারছি, এটুকু জ্ঞান আমার আছে। বিরক্ত করো না, মুষ্টি ভিক্ষা করে খাওগে, তাতে তোমার অগাধ পাপের একটু প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

উঃ,—ওরে নারী, নারীত্ব তোর তো সত্যই নেই। তুই তোর শ্রেষ্ঠ ধন নারীত্বের বিনিময়ে কি পেয়েছিলি, ঘুম ভেঙে দেখলি সব ছায়া হয়ে গেছে। স্বপ্নের একটা দাগই মনে রইল, আর তো কিছুই রইল না।

ফিরে এলুম পথের ওপর। চলবার সামর্থ ছিল না, পড়ে রইলুম।

আজ সবাই চলে গেল আমায় বিদ্রূপ করে। পাঁচদিন আগে যে আমার জন্যে শত শত টাকা ব্যয় করতে পেরেছে, আজ সে আমায় একটা পয়সা দিতে পারলে না। আজ যে আমার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই, আজ আমার চুলে রং নেই, মুখে রঙ নেই।

"স্থ—"

মুখ তুলে চাইলুম।

"ওঠো, বিশ্বের পরিত্যক্তা তুমি, বিশ্বের পরিত্যক্ত আমি তাই আমি তোমায় আমার পাশে পেতে চাচ্ছি। ওঠো—"

কানে আর যেন শুনতে পারলুম না, দুই হাতে কান চেপে ধরে আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠলুম—না না, আমি তোমায় একদিন সর্ব্বস্বহারা করেছি, তোমায় সকলের কাছে ঘৃণিত করেছি। তারপর তোমায় কি করে তাড়িয়ে দিয়েছি সে কথা একবার মনে করে দেখ, আমার পরে করুণার পরিবর্ত্তে ঘৃণাই আসবে। হ্যাঁ, ঘৃণা কর, আমায় ঘৃণা কর। যাদের সব দিয়েছি তারাও যদি ঘৃণা করতে পারে, তোমার সব নিয়েছি—তুমি কেন না আমায় ঘৃণা করতে পারবে ?"

শান্তস্বরে চন্দন বললে, "ঘৃণা করতে পারিনি সুভা কারণ আমি তোমার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য দেখেই ভালবাসিনি, তোমার কথা তোমার গানে আমি তোমায় ভালবেসেছিলুম, ছলনা করেও তুমি যে আমায় আদর করেছ আমি তাই প্রকৃত ভেবেছিলুম অন্ততঃ ভাববার চেষ্টা করেছিলুম। তোমায় ভালবেসেছিলুম বলেই আমার যথাসর্ব্বস্ব তোমার হাতে তুলে দিয়েছিলুম, কিন্তু তাতেও তোমার ভোগের তৃষা মেটে নি, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। এই দেখছ—ভোগের চরম পরিণতি। তুমি যদি আমার সবটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে স্থ, আজ তো তোমায় সব হারাদের দলে গিয়ে মিশতে হতো না। আজ বুঝতে পারছ—জগতে কেউ কারও নয়, তুমিই তোমার নিজের—সেও শুধু নিজেকে রক্ষা করবার জন্যে, সকল বিপদ হতে বাঁচাবার জন্যে। ত্যাগের পথে এসো—যা হারিয়েছ তা পাওয়া যাবে না, কিন্তু নূতন জীবন লাভের ফলে এ জন্মে তা হারিয়ে যাওয়ার ব্যথাও তোমায় কষ্ট দিতে পারবে না।"

আমি সন্ন্যাসীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়লুম, চোখের জলে তার পা দুখানা ভিজিয়ে দিলুম।

সন্ন্যাসী চন্দন খানিক নিমীলিত নেত্রে দাঁড়িয়ে রইল—

"বুঝতে পারছ অভাগিনী, পাপের দহন এইবারে অনুভব করতে পেরেছ, দুনিয়া সব নিয়ে কেমন ঘৃণা করে, কেমন তার সেই উপেক্ষা প্রাণে কি কঠোর ভাবেই বাজে তাও অনুভব করছো তো ? হায় নারী, তোমরাই মানুষের জননী, তোমাদের গর্ভে থেকে ভ্রূণাবস্থা থেকে মানুষ এই উপেক্ষা শিক্ষা করে,—জন্মে বড় হয়ে পৃথিবীর বুকে শেখা বিদ্যার পরিচয় পৃথিবীকেই দিয়ে যায়। এসো, আমার পেছনে—ঠিক আমার পায়ের দাগে পা রেখে এসো। মানুষের অনেক নিয়েছিলে, কতক মানুষকে ফিরিয়ে দিয়েছ, আর কতক যা আছে ভগবানকে দেবে চল। জীবনের যেখানি নষ্ট করেছ, ঠিক সেইখানি পুরিয়ে দিতে হবে।"

দেখলুম চন্দনের মুখে অপূর্ব্ব দীপ্তির বিকাশ, কিছু হারার ব্যথা তার বুকে আজ নেই, পূর্ণতার আনন্দে সে আত্মহারা।

হাতখানা বাড়িয়ে দিলুম—"আমার হাত ধর চন্দন, আমার দীক্ষা গুরু—"

"এসেছ—"

আমার হাতখানা সে টেনে নিলে।

পূজা

(রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে)

[শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী]

পূজার তরে যখনি যাই
দেব-দেউলে,
দেবতা আমার! তোমায় তখন
থাকি ভুলে।
কুসুম-মালা, প্রদীপ, ধূপের আয়োজনে
ব্যস্ত থাকি ; তোমায় তখন রয় না মনে।
মন্ত্র-প্রাচীর গেঁথে তোমায়
দূরে রাখি,
তোমার পূজায় বসে তোমায়
ভুলে থাকি।

পূজার তরে আর যাব না
মন্দিরেতে,
পূজ্‌ব তোমায় হৃদয়-মাঝে
আসন পেতে।
শুভ্র ভক্তি-ধূপ্‌টী সেথা থাক্‌বে জ্বালা,
পরিয়ে দেব প্রেমের ফুলের গন্ধমালা।
ডাকব তোমায় ব্যাকুল প্রাণের
মৌনস্বরে,
তখন সত্য মন্ত্রহারা
পূজা হবে।

নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

মানসের বিলাপ গাথা মৃদু গুঞ্জনে থামিয়া গেল। ডোরোথি তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বেদনাবিদ্ধ স্বরে বলিল—"শেষ সময়ে তোমাকে কি সে বলছিল ?"

মানস নত মস্তকে বলিল—"হ্যাঁ সে আমাকে অনুনয় করে বলে গেল একটি সৎ-স্বভাবা মেয়ের পাণিগ্রহণ করতে — আমি তার কাছে সে সময়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'য়েছিলাম, কিন্তু ডোরা এ দুর্ব্বল হৃদয় আমার সে অঙ্গীকার পালন করতে অক্ষম...তাই, আমি অন্তত: কিছুদিনের জন্যে এ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছি..."

"দেশ ছেড়ে পালালেই কি তোমার সকল ব্যথা ঘুচবে ?"

"ঘুচুক আর না ঘুচুক···চেষ্টা তো করব। আর আমাদের বাঙ্গলা দেশের অধিকাংশ স্ত্রীলোক অশিক্ষিতা... তাদের হাতেই সন্তানের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করা আছে.. তাঁরা না শিক্ষিতা হইলে, বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ মানুষেরা যথার্থ মানুষ হ'বে না—আর যদিই বা কতক নারী শিক্ষিতা আছেন, তাঁদের মধ্যে কতকগুলি শিক্ষার নাম নিয়ে বিলাতের বিলাসিতা, আর কতকগুলি ফাঁকা কথা শিখে বসে আছেন। সেইজন্যেই যাদের এখনও মন তরুণ, যারা শিখতে পারবে—তাদের মমতার আদর্শে প্রকৃত শিক্ষিতা নারী গড়ে তুলব-- এখন মঙ্গলময়ের করুণা সাপেক্ষ।"

"মানসদা, এই পল্লীগ্রামে এসে আমি যে এমন সুখী হব, এ আমার কল্পনাতীত···মানসদা আমারও প্রকৃত শিক্ষা হ'য়েছে মমতা দিদির, আর তোমার শিক্ষার গুণে—আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যাও মানসদা - যেন এই জ্ঞানটুকু আমার আর না হারায়।"

মানস পায়ের উপর হইতে ডোরোথির হাতখানি সরাইয়া স্নিগ্ধ সরলকণ্ঠে বলিল—"কেন তোমার জ্ঞান হারাবে দিদি তোমরাই পারবে আমার, আমাদের এই পতিত হিন্দু সমাজটাকে তুলে ধরতে। জন্ম জন্ম তোমার এই পল্লীমায়ের কোমল বুকে জন্ম হোক, তোমাদের পুণ্য চরণ পরশে আমাদের পল্লীভূমি নূতন করে গড়ে তোল···দেশের দুঃখ বুঝতে শেখ, সকলের ব্যথায় তোমার নয়ন ব'য়ে মমতার অশ্রু ঝরুক, সকলের কষ্ট নিজের বলে ভাবতে শেখ, নর যে শুধু মানব নয়, নরের মধ্যে যে ব্রহ্ম বিদ্যমান—নর যে নারায়ণ সেটুকু অনুক্ষণ ভেবো···তবে আসি ডোরা।"

ডোরোথি উঠিয়া কান্নাঝরা গলায় বলিল—"এসো মানসদা, যেখানে থাক, দুঃখিনী ছোট বোনটির খবর নিতে ভুলো না যেন, আমার আর কেউ নেই।"

(২১)

"উঃ কী দারুণ অন্ধকার—আশে পাশে চারিধারে পুঞ্জে পুঞ্জে অন্ধকারের রাশি এসে এই ঘরটার মধ্যে জড়ো হ'য়ে ঠেসাঠেসি করছে...উঃ এই ঘরখানার সমস্ত বাতাস যেন বিষাক্ত বাষ্প বলে মনে হচ্ছে। ওগো আজ আমার প্রাণে যে কতখানি ব্যথার জমাট অন্ধকার ঐ বর্ষার আঁধার আকাশ খানির মত ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠেছে তা কি কেউ বলতে পারে! ওগো আলোর দেশের আলোয় গড়া মানুষরা··· আর কি তোমরা এমনি করে, জগতের যা কিছু মধুর, যা কিছু সুন্দর থেকে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করে একলাটি, নিছক একলা, অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহের ভিতর বন্দী হ'য়ে? শুধু তাই নয় সামনে একজন অনবরত রোগের যন্ত্রণায় অসহ্য চীৎকার করছে···কে সে, তাকি তোমরা জানো? সে আমার পিতা, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য দেবতা···যে পিতা আমাকে একদিন এতটুকু হ'তে বুকে করে মানুষ করে, এই পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত করেছিলেন! না না, সে কথা তোমাদের বোঝাতে পারব না, ওগো সে অসীম ক্ষমতা আমার নাই গো, যে

আমি আমার স্নেহশীল পিতার সীমাহীন স্নেহের গতি নির্ণয় করবো? আজ আমি এ দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করতে বসেছি কেন জান? বড় দুঃখের বোঝা! উঃ এ বোঝা কারুর কাছে নামাতে না পেরে আজ আমি সাদার বুকে কালীর আঁচড় টেনে কাগজের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি।"

"তোমরা, ওগো সজীব প্রকৃতির সজীব দেহীরা, বলে দাও গো আমায়, আমার এ অভিশপ্ত জীবনের শেষ কবে—ওগো বল গো, আমার পাগল মন আর আপনাকে ধরে রাখতে পারছে না—সে গতিশীল, ছন্দশীল ভাবে বেগে ছুটে চলেছে তার প্রাণের নিগূঢ় সত্য কাহিনীটুকু খুলে বলবার জন্য, শুধু বলা নয়, সঙ্গে সঙ্গে শোনবার শোনাবার আশেও অধীর আবেগে আকুলি বিকুলি করছে। আঃ তোমরা সত্য শাশ্বতকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে আমাকে জানিয়ে দাও যে এ অভাব দুঃসহ জীবনের শীগ্‌গীরই সমাপ্ত ঘটবে। সে মোক্ষের দিন আমার কবে আসবে? * * * * *" প্রথম প্রথম এই আঁধারের মধ্যে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হ'ত, কিন্তু এখন আমি এই কালো যবনিকার মধ্যে নিজেকে গোপন করে রাখতে সর্ব্বদা সচেষ্ট রয়েছি...আর সহ্য হয় না! তীব্র আলোর জ্যোতিঃ এখন চোখে পড়লে চোখ ঝলসে যায়... কিন্তু—আঃ এই কিন্তু এসেই সমস্ত মাটি করে দ্যায়। কিন্তু যেন একটা সরল কথার প্রকাণ্ড প্যাঁচ, কথা বলতে বলতে এমন গেরো পাকিয়ে তাল জড়িয়ে যায় যে কথার আর খেই খুঁজে পাওয়া যায় না। সত্য করে বল দেখি—তোমরাও কি এই কিন্তুর হাত হতে এড়িয়ে যেতে পেরেছ কখনও? যাক্‌গে—কিন্তু তবু 'আর পারছি না' এই কথাটা সর্ব্ব সময়ে গলা চিরে বেরুতে চাচ্ছে,—ওঃ বল দেখি এই মাত্র একুশ বছরের ক'টা মেয়ে-জীবন ক'দিনের তরে' তার হিসাব চেয়ে বসে? বোধ হয় শতকরার মধ্যে এই একটা আমি। কি মুস্কিল এই আমিত্বটাও তো ঘোচে না? জানছি বুঝছি সব যে আমি জিনিষটা একেবারে নিছক মিথ্যা, আমার হাত পা ইন্দ্রিয়াদি যদি আমারই না হ'লো তবে আমি বা আমার বলে অহঙ্কার করি কেন? লোকে যদি এই 'আমি'টাকে ভুলতে পারত, তা হলে, তা হলে আমার মত অনেক হতভাগ্য নরনারীর অস্তিত্বটা লুপ্ত হয়ে যেত। * * * * * * আঃ ভাবনায় ভাবনায় অকূলে এসে এখন থৈ পাচ্ছি না। এ অথৈ জল থেকে তুলে নেবার লোকও তো সামনে দেখছি না। তবে—তবে কি এমনি করে হাওয়ার দোলে দোল খেতে খেতে আমায় ভেসে চলতে হবে! উঃ বুকটাকে সজোরে টিপে ধরছি, কিন্তু পারছি কি ফোঁটা ফোঁটা করে এর সমস্ত রক্তবিন্দু নিংড়ে বার করতে? আলো—না না চাই না রঙীন আলোর ক্ষণিক দপ্‌দপানী, যা সারা জীবনটা ভোর কষ্ট দ্যায়। আঃ মাঝে মাঝে (অবশ্য লোকচক্ষুর অগোচরে) মাথাটা সজোরে কঠিন শিলায় ঠুকে দেখি সাড় আছে কি না—কই লোকে একটু সামান্য আঘাতে ব্যথায় কাতর হয়, আমার তো তা হয় না—বরঞ্চ লাগল না বলে আরও নূতন উদ্যমে মাথা ঠুকি; বুঝতে পারি যে আঘাতিত স্থানটা চড়চড়িয়ে ফুলে উঠছে—উঃ তবু জ্ঞান নেই, সংজ্ঞা বোধ হয় লুপ্ত হ'য়ে যায় তখন। কী তোমরা বলছ পাগলের প্রলাপ বচন! ওগো না বিশ্বাস করো, আমার বেশ জ্ঞান আছে তাই এত কথা লিখতে সক্ষম হ'য়েছি সত্যি আমার জীবনের প্রত্যেক ঘটনাটি যদি তোমরা শোন—তা হলে বুঝতে পারবে যে কী অরুন্তুদ বেদনায় আমার অন্তর বাহির ভেঙ্গে পড়ছে। দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে একই নিয়মে—আর আমিও ঠিক সমতালে পা ফেলে চলেছি স্কুলে পড়া ছেলেদের "রুটিন" মত।"

*　　*　　*　　*

"এই অন্ধকারময় রাজ্যে আমার একাধিপত্য বিস্তার করা রয়েছে, এখানে আমি রাণী। এই তিনটে বছর কল্যাণপুরে এসে সব যেন ছন্নছাড়া হ'য়ে গেল—মমতাময়ী মমতা দিদির সাথে প্রথম পরিচয়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই তিনি পালালেন। স্নেহপ্রতিম সহোদর তুল্য মানসদা, সেও গেল,...আছি আমি আর ঐ শয্যায় শায়িত অনন্তলোক যাত্রী পিতার কঙ্কালসার দেহখানি স্তিমিত প্রদীপের মত ক্ষীণ রশ্মি বিকীর্ণ করছে। উঃ বুকটা দমে যায়...চিড় খাওয়া প্রাণটা শতধারে বিভক্ত হয়ে পড়ে।"

* * * "আর পারি না গো এ মর্ম্মচ্ছেদী হাহাকার আর করতে পারি না। ঐযে আমারই সামনে আমারই বয়সের মেয়েরা রঙীন প্রজাপতির মত বিচিত্র পাখা মেলিয়ে লঘু-

গতিতে উড়ে বেড়াচ্ছে...উঃ তাদের সঙ্গে আমার এই একঘেয়ে একটানা গতিতে চলা ছন্দোহীন জীবনটা ঢের তফাৎ, তাই তাদের এড়িয়ে চলি খুব সাবধানে...তারা নির্ম্মল আনন্দে আবেগে, হাওয়ার তালে প্রথম কুঁড়িটির মত ফুটে উঠেছে—নিখিলের প্রেমের করস্পর্শে।...কাজ কি আমার এই দৈন্যতায় ভরা প্রাণশূন্য সাজিটা নিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াবার? হয়তো তাদের মধ্যে কেহবা নারীত্ব সফল করে মাতৃত্বের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত, আমায় দেখে তাদের মধ্যে কারুর বা একটু সহানুভূতি জেগে উঠলো..আবার কেহবা মুখটা একটু টিপে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপভরা হাসির বানে আমাকে বিদ্ধ করে চলে গেল। ওগো তারা জানে না জানে না যে হাসির তলে লুকানো ব্যথার শায়কটা বুক পেতে গ্রহণ করতে মর্ম্মপীড়িতার বুকের ক্ষতিটা নূতন ব্যথায় কিরূপে টন্‌টনিয়ে উঠে।"

• • • •

"ওগো বিশ্বস্রষ্টা দয়াময়, আমায় মুক্তি দাও—আর না হয়তো তোমার এই চির পুরাতন সৃষ্টিটা উল্টে-পাল্টে একটা নূতন সৃষ্টি গড়ে তোল ..."

"ডোরা।"

ডোরোথির অতীত বর্ত্তমান ঐ একটি স্নেহ সম্বোধনে অতলে নিমজ্জিত হইল। ডায়েরী ও হাতের কলম ফেলিয়া দ্রুতপদে বারান্দা পার হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পিতৃ সমীপে জানু পাতিয়া বসিয়া বলিল—"এই যে বাবা আমি এসেছি, বড় কষ্ট হচ্ছে কি?"

"কে মা ডোরা এসেছ, এস, এস...মমতা কোথায়?"

"বাবা বাবা, কোথায় তাঁকে পাবেন...সে নেই।"

"ওঃ তাও তো সত্যি—মানস, অমল।"

ডোরোথি আর্ত্ত কম্পিতকণ্ঠে বলিল—"নেই, নেই বাবা কেউ নেই, যাদের খুঁজছেন—তাঁরা কেউ এখানে নেই।"

মুমূর্ষুর ক্ষীণ কণ্ঠ হইতে ধ্বনিত হইল—"কেউ নেই, তবে তুই এত বড় বাড়ীটায় একা পড়ে আছিস!"

উদ্গত অশ্রু চাপিতে চাপিতে বিকৃত স্বরে ডোরোথি বলিল—"হাঁ বাবা।"

"সেকি মা, ম্যানেজার বিলাসবাবু, কর্ম্মচারীরা, এত চাকর দাসী - কোথায় সব গেল?"

"তারা গ্রামের সমাজপতিদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।"

"কী, তারা কাজ কর্ত্তে আসে না?"

"না বাবা, আপনি যেদিন হতে রোগশয্যায় শুয়েছেন, সেইদিন হতে ওরা নূতন নূতন ষড়যন্ত্র করে আমাদের একঘরে করে রেখেছে।"

"তুমি কাউকে খবর দাও নি কেন?"

"কাকে খবর দেব বাবা, কে আছে আমাদের?"

যন্ত্রণা কাতর স্বরে মিঃ মুখার্জ্জী বলিলেন—"যে অমর মুখুর্জ্জের নামে গাঁয়ের লোক শশঙ্কিত থাকতো, আজ তাকে একঘরে কেন করেছে ডোরা?"

ডোরোথি বলিল—"আপনি মানসদার সঙ্গে চলেছেন বলে?"

"কী?"

"মানসদার সঙ্গে জাতি বিচার করেন নি।"

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি বায়ুস্পর্শে দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল—মাথা তুলিয়া মিঃ মুখার্জ্জী বলিলেন—"ওঃ 'ষ্টুপিড্‌রা' এখনও হরকুমারের সেই কথাটা ভোলে নি দেখছি।"

ডোরোথি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল—"মানসদার বাবা কি করেছিলেন বাবা?"

মিঃ মুখার্জ্জী বলিলেন—"এ গাঁয়ের যিনি আগে জমীদার ছিলেন তিনি ইন্দ্রিয় পরবশ—পরশ্রীকাতর—প্রজাপীড়ক - মত্তপ, দুশ্চরিত্র ছিলেন। সে অনেক দিনের কথা—জমীদার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা, সমাজ পরিত্যক্তা ধর্ষিতা এক হতভাগিনী ব্রাহ্মণ কুমারীকে উদার হৃদয় হরকুমার গৃহে এনে প্রতিপালন করছিল—দুরাত্মা, ভণ্ড সমাজপতিরা ক্ষেপে উঠলো—দলাদলির ফলে হরকুমার সমাজচ্যুত হ'ল। রাগে, দুঃখে, অপমানে হরকুমার ব্রাহ্মমতে সেই উৎপীড়িতা ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করল; তার পরের বছরে মানস জন্মগ্রহণ করে। ওঃ সে আজ তেইশ, চব্বিশ বছরের কথা হ'লো—তবু এরা সেই কথাগুলো মনের কোণে গেঁথে রেখেছিল। আজ আমায় হাতে পেয়ে আমার পরে' বিষের ঝাল ঝাড়লে। এখন এ কর্ম্মের অগ্রণী কে?"

ডোরোথি বলিল—"ভুবন সরকার।"

"হুঁ—সেই তো চাই, মা ডোরা, তোকে মেরে ফেলতে আমি এখানে নিয়ে এলাম।"

"আপনি কেন আনবেন বাবা, আমিই যে নিজের সর্ব্বনাশের পথ নিজে করেছি।" ডোরোথি নীরবে রোদন করিতে লাগিল।

"পাগলী মা আমার তুই ভেবেছিস কি, কলকাতায় থাকলে আমায় এ কালরোগে ধরত না—সেখানে কি তুই আমাকে ভাল করতে পারিস?"

মাথা নাড়িয়া ডোরোথি দৃঢ়স্বরে বলিল—"হ্যাঁ বাবা, সেখানে কত বড় বড় ডাক্তার রয়েছেন।"

"মা তুই বুদ্ধিমতী হ'য়ে এমন কথা বললি! আমার যে ওপার থেকে ডাক আসছে মা; এখন তুমি দশটা সিবিল সার্জ্জন বাড়ীতে এনে বসিয়ে রাখলেও আমাকে ফেরাতে পারবে না। কিন্তু ডোরা, আমি তোর উপায় কিছু করে যেতে পারলাম না—মা আমার একটা কথা রাখবি, উঃ অমল, অমল।"

"বাবা বাবা, অমন করছেন কেন?" অসহায়া ডোরোথি তাহার একমাত্র আশ্রয় পিতার রুগ্ন দেহখানি চাপিয়া ধরিল। ব্যথার অদমনীয় যন্ত্রণা প্রাণপণে সংরোধ করিয়া মিঃ মুখার্জ্জী বলিলেন—"অমলের নামের সঙ্গে বাল্যের অনেক পুরাণো স্মৃতি জড়ানো আছে কিনা—তাই বুকটা বড় ছটফটিয়ে উঠেছিল। ডোরা দৌলতপুরে একবার খবর দিলি নে কেন মা?"

পিতার পা দু'খানি বক্ষে চাপিয়া অশ্রুমুখী ডোরোথি বলিল—"বাবা, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছি।"

"তুমি অন্যায় করেছ মা? কি, বল?"

আনত আরক্ত বদনে ডোরোথি বলিল—"আপনি যখন ভাল ছিলেন তখন আপনার 'ষ্টেট' থেকে মাসে পাঁচশো করে টাকা নিয়ে স্বরাজ ফণ্ডে দিয়েছি...আমায় ক্ষমা করুন বাবা সেজন্যে।"

"সে কোন জায়গায় মা?"

"দৌলতপুরে।"

"সে সমিতির অধ্যক্ষ কি অমলকুমার?"

লজ্জানম্র কণ্ঠে ডোরোথি বলিল—"হ্যাঁ বাবা।"

কন্যাকে পরম স্নেহে নিকটে টানিয়া মিঃ মুখার্জ্জী আনন্দাপ্লুত কণ্ঠে বলিলেন—এ আবার তোর অন্যায় মা, যে অভিমানীকে কত মাস টাকা পাঠিয়ে নেওয়াতে পারি নি—সেই অভিমানী তোর দান গ্রহণ করেছে; অভিমানী দর্পীর দর্পচূর্ণ কেমন করে করলি মা?"

"আমি তো নাম দিই নি বাবা, বেনামীতে পাঠিয়েছিলাম।"

"ডোরা মা আমার একটা কথা শোন—কালকে অমলকে একখানা 'টেলিগ্রাফ' করে দে, সে এসে তোর ভার হাতে তুলে নিয়েছে দেখে আমি নিশ্চিন্তে মরতে পারব। দিবি কি মা ডোরা?"

"বাবা বাবা, কিন্তু—আমাকে ছেড়ে আপনি কোথায় যাবেন বাবা, কে আমাকে দেখবে?"

"তোমাকে দেখবার অভাব কি আছে মা? যিনি বিশ্বের পিতা, তিনিই তোমাকে পালন করবেন; আঃ তবু আবার কাঁদছিস ডোরা? ভগবান, এ মোহের বাঁধন যে কাটিয়েও ছাড়াতে পারছি না প্রভু। শেষ পথে পা দিয়েছি—তবু এ সোণার শিকল পায়ে পায়ে জড়িয়ে ধরে আমাকে সতত বাধা দিচ্ছে। ডোরা আজ অনেকটা ভাল আছি; আজ আর এ অন্ধকারের মধ্যে থাকতে পাচ্ছি না, প্রাণ যেন হাঁপিয়ে উঠবে...ঐ সামনের জানলাটা খুলে দেতো মা।"

পিতার আদেশে ডোরোথি উঠিয়া বহুকালের বন্ধ বাতায়ন টানাটানি করিয়া মুক্ত করিয়া দিল। বহুদিনের জমাট আঁধারের পরে মুক্ত আলোর উৎস অলক্ষ্যে কোন দেবতার আশীষ ধারার মত উচ্ছ্বলিয়া পড়িল। রোরুদ্যমানা কন্যাকে বক্ষে চাপিয়া কলিকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার মিঃ এ, মুখার্জ্জী...কল্যাণপুরের প্রসিদ্ধ ধনী অমর মুখুজ্যো তাঁহার জন্মভূমির স্নেহ শীতল বক্ষে পরম নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া রহিলেন।

(২২)

"গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ'।
ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশাময় বর্ত্তমান
বিশ্বময় জাগিয়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান
ভুলিয়ে যারে আত্মপর পরকে নিয়ে আপন কর
বিশ্ব তোর নিজের ঘর আবার তোরা মানুষ হ'।"

"ঠিক বলেছ রাবেয়া···আত্মপর ভুলে পরকে আপন করতে না শিখলে আর এ বর্ত্তমান যুগের উদ্ধারের আশা নেই।"

সহসা মানসের আগমনে স্তম্ভিত, লজ্জিত, আনন্দিত রাবেয়া দোলায়মান বক্ষে চরকার হাতলটা শক্ত করিয়া চাপিয়া নির্নিমেষনেত্রে ভূমিপ'রে ন্যস্ত করিল।

মানস তাহার শতরঞ্চের কিয়দংশ দখল করিয়া বসিয়া সহাস্যমুখে বলিল—"আজ তো সমস্ত বেলাটাই অমলদার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে তোমার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, খদ্দর সমিতি, আশ্রম দেখে এলাম রাবেয়া···বাঃ সুন্দর তোমার ছাত্রীগুলি —কী নবোৎসাহেই তাদের মাতিয়েছ রাবেয়া।"

রক্তমুখী রাবেয়া কাঁপা গলায় উত্তর দিল—"আমাকে শুধু শুধু ওরকম প্রশংসায় লজ্জিত করে তুলবেন না—ও প্রশংসাটা প্রাপ্য আপনার।"

"আমার, সে কিরকম; কাজ করলে তুমি—আর তোমার সেই কাজের প্রশংসার পাত্র হলাম আমি! সেকি রাবেয়া?"

রাবেয়া মাথা নামাইয়া বলিল—"তার কারণ এ কাজের প্রবর্ত্তক আপনি যে।"

আশ্চর্য্য হইয়া মানস উৎসুকভরে বলিল—"সেকি রাবেয়া?"

"সেই যে, আপনি যখন প্রথম অমলদার সঙ্গে এখানে এসেছিলেন, সেই সময় বলে গেছলেন যে এখানে স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের আবশ্যক..."

"ওঃ সে যে অনেকদিনের কথা রাবেয়া, সেই কথাটুকু নির্ভর করে তুমি এতটা পথ এগিয়েছ? হ্যাঁ আর একটা কথা রাবেয়া, সকালবেলায় দাদাভায়ের মুখে আর একটা নূতন কথা শুনলাম—সে কথাটা কি সত্য রাবেয়া—বল?"

সলজ্জ কণ্ঠে রাবেয়া বলিল—"কি কথা?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মানস বলিল—"তুমি সকল বিষয়ে আমার অনুবর্ত্তিনী এবং অনুরাগিণী হ'য়ে পড়েছ?"

রাবেয়ার বাক্য নিঃসরণ হইল না—একি অদ্ভুত প্রশ্ন মানসের...না না ছিঃ, এর উত্তর সে কি নির্লজ্জা হইয়া বলিবে—ওগো তোমার এ সত্যি কথা! রাবেয়া ক্ষণে ক্ষণে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। রাবেয়ার নিকট হইতে উত্তর আসিল না দেখিয়া মানস অত্যন্ত ক্লিষ্টস্বরে বলিল—"তা হলে সত্যি রাবেয়া তুমি আমায় অনুরক্তা···সুখের কথা—কিন্তু বড় দুঃখের সহিত জানাচ্ছি রাবেয়া তোমার এ আত্মদান অপাত্রে ন্যস্ত হ'য়েছে···"

রাবেয়া তড়িৎপৃষ্টের মত চমকিয়া চক্ষু নত করিল। মানস তেমনিই একস্বরে বলিল—"রাবেয়া তোমার এ অমূল্য দানের প্রত্যুপকার স্বরূপ দেবার মত আমার কাছে কিছুই নেই। আমি বড় হতভাগ্য—আমি মহাপাপী—রাবেয়া আমাকে ক্ষমা করো।" মানসের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া উঠিল। আর রাবেয়া সজলকণ্ঠে বলিল—"আপনার সঙ্গে তো আমার সম্বন্ধ দাতা ও গ্রহীতার নয়—আমি যা দিয়ে ফেলেছি তার কোন মূল্যই নেই। আমি ফিরে পাবার আশা, বা সে স্পর্দ্ধা করি না।"

"রাবেয়া, রাবেয়া, তুমি যেন নিঃস্বার্থ ভাবে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জয়ী হয়ে বসে আছ; আমার কিন্তু এ বড় ব্যথা দিচ্ছে—আমি তো নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। আর অমলদা কি বলছে জানো—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে তবে অন্য দেশে বেরুবেন।"

শিহরিয়া রাবেয়া বলিয়া উঠিল—"না না তা হয় না, হতে পারে না—আমি যে মুসলমানী।"

ম্লানমুখে হাসিয়া মানস বলিল—"তুমি কি ক্ষেপেছ রাবেয়া—জাতি বিচার আমি করি না। কিন্তু আমার মন অশুদ্ধ...কেমন করে তোমায় শুধু কষ্ট দিতে বরণ করব তাই ভাবছি।"

সহসা রাবেয়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"তুমি নিশ্চিন্ত হও—আমি তোমাকে বাঁধন বেড়ী পরাব না। তোমার যেখানে ইচ্ছে,

সেখানে যাও—আমি ধরব না। শুধু মাঝে মাঝে আমাকে স্মরণ ক'রো।"

মানস বিস্মিত সুরে বলিল—"আর তুমি ?"

"আমি ! আমার জন্যে ভাবছ ? আমার হাতে যে কাজের ভার তুমি তুলে দিয়েছ, তাতো এখনও সাঙ্গ করতে পারি নি। সত্যিই, এখন তো আমাদের সংসার পেতে বিলাসের স্রোতে গা ভাসালে চলবে না। আমার মুখ চেয়ে আমার যে অনেক সন্তান বসে আছে। আগে তাদের নবযুগের আহ্বানের মোহে অনুপ্রাণিত করে তু'ল, তারপর এ জন্মের সুকৃতির ফলে যদি পরজন্মে তোমার সেবা করতে পাই তাহলে কৃতার্থ হব।"

মানস মুগ্ধনেত্রে রাবেয়ার শুভ্রোজ্জ্বল শান্ত গরিমাদীপ্ত মুখখানি দেখিয়া বলিল—"রাবেয়া তোমার প্রাণ এত উঁচু তারে বাঁধা...না রাবেয়া তোমার এ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের নিকট আজ আমার সমস্ত শক্তি, সমস্ত গর্ব্ব পরাজিত হ'লো .. চল রাবেয়া, তোমার দাদাভায়ের কাছে আমাকে নিয়ে চল, আমাকে সেবা করে যদি তুমি এতটুকুও তৃপ্তিলাভ করতে পার, তা হলে বুঝব—এ চির অভাগ্যের দ্বারায় একটা কাজ হ'ল।"

আনন্দের অশ্রুতে বুক ভাসাইয়া রাবেয়া যুক্তকরে বলিল—"পথের ধূলিকে এর বেশী মমতা দেখিও না গো···আর লোভ দেখিও না। তা হলে আমার বা তোমার সমস্ত সাধনা পণ্ড হ'য়ে যাবে আজ যে গুরুতর কর্ম্মের ভার নিয়ে দীন দুঃখিনী ভারত মাতার উদ্ধারকল্পে আমরা নেমেছি, তা সিদ্ধ হবে না। তার চেয়ে তুমি দূরে থাক, তোমার দেবসম মূর্ত্তিখানিকে মনে মনে পূজো করে মাতৃভূমির পূজায় আত্মাহুতি দি', বল, আমার এ যজ্ঞের তুমি প্রধান হোতা হবে···তুমি আমাকে একবার আশীর্ব্বাদ কর।" রাবেয়া মানসের পদতলে অবলুণ্ঠিত হইল। আপনার কম্পিত দক্ষিণ হস্ত রাবেয়ার মস্তকের পরে' তুলিয়া মানস চক্ষু মুদ্রিত করিল।

রাবেয়া হাতখানি পরম স্নেহে, গভীর আবেগে চাপিয়া বলিল—"আঃ এই আমার ইহ-পরকালের কাম্য; তুমি আমার জন্যে একটুও ক্ষোভ করো না। ঐ দেখ উপরে জ্যোৎস্না বিচ্ছুরিত উন্মুক্ত নীলাকাশ ভেদ করে একজন দিব্য দেহ সম্পন্ন জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কী দেখাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছ কি ?"

মানসের হাত ধরিয়া ফুল্লকণ্ঠে রাবেয়া বলিল "তুমি বোধ হয় দেখতে পাচ্ছ না...কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তাঁর হাতে আগুনের অক্ষরে লেখা ত্যাগ ও সংযম—নারী ও পুরুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।"

"রাবেয়া তবে আমি অমলদার সঙ্গে ধরা দি ?"

"হ্যাঁ যাও, কিন্তু একটুখানি দাঁড়াও।" রাবেয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া সযত্নে মানসের পদধূলি গ্রহণান্তে বাষ্পভরা সুরে বলিল—"আমার জীবন পথের পাথেয় সংগ্রহ করে নিলাম—যদিই আর ইহজীবনে দেখা না হয়।" রাবেয়ার বিশাল নয়ন এইবার কোন বাধা মানিল না, সময়ের মূল্য নিরূপন করিল না—বড় বড় পল্লব ভেদ করিয়া ঝর ঝর করিয়া মানসের দু'খানি চরণের প'রে অজস্র অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। মানস একটু কাতর ভাবে রাবেয়ার হাত ধরিয়া তুলিয়া ভগ্নস্বরে বলিল—"যাবার সময় এমন ক'রে কাতর হ'লে, আমি যে সমস্ত কর্ম্ম ভুলে যাব রাবেয়া।"

"কোন কর্ম্ম তোমাকে ভুলতে হবে না—আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। দাদাভাই, আপনার হাফেজ কোরাণ সব ফেলে একবার এদিকে চট করে আসুন।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

গণতন্ত্রের আধুনিক সমস্যা

[অধ্যাপক শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, ভাগবতরত্ন]

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীকে আজকাল গণতন্ত্রমুখী করিবার চেষ্টা হইতেছে। এদেশে গণতন্ত্রের প্রবর্ত্তন হইলেই সকল দুঃখ দৈন্যের অবসান হইবে এরূপ ধারণা অনেকে পোষণ করেন। ফরাসী বিপ্লবের সময় যখন সাম্য স্বাধীনতা ও সৌভ্রাত্রের আদর্শ ঘোষিত হইয়াছিল, তখনও অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে জনসাধারণের কর্ত্তৃত্বে শাসনযন্ত্র আনিতে পারিলেই বুঝিবা সত্যযুগ ফিরিয়া আসিবে। দেড় শত বৎসর হইতে চলিল, আমেরিকায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তারপর উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই ইউরোপের অনেকগুলি রাষ্ট্রে ও জাপানে গণতন্ত্রমূলক শাসন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেখা গেল যে সত্যযুগ ফিরিয়া আসে নাই। মানুষের মধ্যে প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা, ধনবলে গরীয়ান্ হইবার ইচ্ছা সমভাবেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। দরিদ্রের মর্ম্মভেদী ক্রন্দন আজও দেশে দেশে ধ্বনিত হইতেছে।

তথাপি মানুষের মনের উপর গণতন্ত্রের প্রভাব বিশেষ শিথিল হয় নাই। বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রণালী কেবলমাত্র ইউরোপে নহে এসিয়াতেও রাজতন্ত্রের উপর জয়লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রস্থল হইতে বহুদূরে অবস্থিত চীনদেশে যখন প্রবল প্রতাপ সম্রাটের ক্ষমতা ধ্বংস হইয়া গেল, তখন সেখানে গণতন্ত্রেরই প্রতিষ্ঠা হইল। বিগত মহা সমরের পরে ইউরোপে যে কয়েকটী নূতন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাতটীতে গণতন্ত্র প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে। সেই সাতটী দেশের নাম—জেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রীয়া, পোল্যাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, ল্যাটভিয়া, ইস্থোনিয়া ও ফিনল্যাণ্ড। মহাযুদ্ধ অবসানের পর বৎসর ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের শাসন যন্ত্রের উপর গণতন্ত্র নীতির তৈলবিন্দু প্রক্ষেপ করিয়া যন্ত্রটীকে সুচারুরূপে চালাইবার সংকল্প করেন। যদি গণতন্ত্রের উপর লোক শ্রদ্ধাহীন হইত, তাহা হইলে গত আট বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর এত বিভিন্ন স্থানে অল্পাধিক পরিমাণে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইত না। এখনও অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে যে রাজনৈতিক হিসাবে বর্ত্তমান যুগ গণতন্ত্রের যুগ—এবং গণতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার শাসন প্রণালী সমাজের কল্যাণকর হইতে পারে না।

এই বিশ্বাসের মূলে যে অনেকখানি সত্য নিহিত আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু গণতন্ত্রের আধুনিক প্রসার দেখিয়াই তাহাকে নির্দ্দোষ মনে করিবার কোন কারণ নাই। গণতন্ত্রের সমক্ষে এখন এমন অনেকগুলি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, যাহার উপযুক্তরূপ সমাধান করিতে না পারিলে ইহার স্থায়ীত্ব বা কল্যাণকরত্ব বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা করা যাইতে পারে।

গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যা হইয়াছে প্রতিনিধিমূলক মহাসভা লইয়া। এতাবৎকাল গণতন্ত্রমূলক প্রত্যেক রাষ্ট্রেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপক মহাসভার হস্তে শাসন পরিচালনার ভার প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রতিনিধি সভার উপর জনসাধারণ আজকাল শ্রদ্ধা হারাইয়াছে। কোন কোন দেশে এই মহাসভা শাসন কার্য্যের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত প্রমাণিত হইয়াছে—কোথাও বা প্রতিনিধিবর্গ অর্থ বা ক্ষমতার লোভে কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করিয়াছেন, কোথাও বা তাঁহারা স্বীয় স্বীয় দলের স্বার্থের নিকট জাতির স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহাদের হাত হইতে ক্ষমতা অপসারিত করিয়া অন্যত্র ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা জনসাধারণ করিয়াছে ও করিতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই ইংলণ্ডে ক্যাবিনেট বা মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে হাউস্ অফ কমন্স এখন কেবলমাত্র মন্ত্রী পরিষদের আদেশ বিধিবদ্ধ করিবার প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত হইয়াছে। ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি প্রতিনিধি সভাকেই শাসন কার্য্যের উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহা হইলে কখনই মন্ত্রী পরিষদের হস্তে মূল ক্ষমতা ন্যস্ত করিতেন না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের পৃথক পৃথক রাষ্ট্রগুলিতেও দেখা যায় যে ব্যবস্থাপক সভার ক্ষমতা গভর্ণর বা শাসনকর্ত্তার হাতে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মহাযুদ্ধের পরেও যে সকল রাষ্ট্রে ব্যবস্থাপক সভার

ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল, তাহাদের মধ্যে ছয়টী প্রধান রাষ্ট্রে সম্প্রতি ক্ষমতাভার একজন ব্যক্তির হস্তে দেওয়া হইয়াছে। হাঙ্গেরী, ইতালি, স্পেন, গ্রীস, তুরস্ক ও পারস্যে গণতন্ত্র প্রথা বর্ত্তমান থাকিলেও, সমগ্র রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একজন ব্যক্তির দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। প্রতিনিধি সভা যদি শাসন দণ্ড পরিচালনার উপযুক্ত হইত, তাহা হইলে এক ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র ক্ষমতা অধিকার করা সম্ভবপর হইত না। ফ্রান্সে প্রতিনিধি সভা বা চেম্বার অফ্ ডিপুটিস্ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া সর্ব্বদা পরস্পরের মধ্যে কলহ করিতেছে। জাতীয় প্রয়োজনের দিকে তাঁহারা মনোনিবেশ করিতেছেন না বলিয়াই সাধারণে মহাসভার উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়াছে। অধুনা ফ্রান্সে শাসন সংস্কারের নানারূপ জল্পনা কল্পনা চলিতেছে। কেহ কেহ এক ব্যক্তিকে সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া রাজনৈতিক দলাদলির মূলোচ্ছেদ করিতে চাহিতেছেন। প্রথম ও তৃতীয় নেপোলিয়ন যেমন গণতন্ত্রের অবসান করিয়া স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তেমনি আজও কেহ কেহ আশা করিতেছেন যে কোন প্রখর ব্যক্তিত্বশালী জননায়ক রাজনৈতিকক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া ফ্রান্সকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবেন। কিন্তু অনেকেই এই স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে ফিরিয়া যাইবার বিরোধী। তাঁহারা ফরাসী রাষ্ট্রের সভাপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহাকেই যথার্থ পরিচালক করিতে চাহেন। আবার ইংলণ্ডে যেমন ক্যাবিনেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, ফ্রান্সেও তেমনি মন্ত্রী সভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার পরামর্শ কেহ কেহ দিতেছেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সভাপতি পঁয়েকার একটি প্রস্তাব পেশ করেন যে মন্ত্রী পরিষদের হাতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের ভার অর্পিত হউক। এই প্রস্তাব আইনে পরিণত হয় নাই। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, যে ফরাসী দেশ হইতে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্র গণতন্ত্র তথা প্রতিনিধি সভার দ্বারা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহের অনুপ্রেরণা পাইয়াছিল, সেই ফ্রান্সেই আজ প্রতিনিধি সভার ব্যর্থতার কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষিত হইতেছে। ফলতঃ ইউরোপ ও আমেরিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে আজকাল প্রতিনিধি সভার উপর আর কোন বিশ্বাসই নাই। ১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসের The Nineteenth Century পত্রিকায় একজন লেখক বলিয়াছেন—"We witness a grawing mistrust in that particular mode of governance which had, until a recent period, proved, on the whole, very beneficial—the parliamentay system."

প্রতিনিধি সভার দ্বারা শাসন কার্য্য যে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, তাহা আর একটী রাজনৈতিক ব্যবস্থা হইতেও বুঝা যাইতেছে। যখন গণতন্ত্রের প্রথম প্রবর্ত্তন হয়, তখন রাষ্ট্রীয় সমুদয় ক্ষমতা প্রতিনিধি সভার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে প্রতিনিধি সভা সর্ব্বসাধারণের অভিমত কার্য্যে পরিণত করিতে অপারগ বা অনিচ্ছুক। তাই বিশেষ প্রয়োজনীয় আইন প্রবর্ত্তন করিবার সময় অনেক রাষ্ট্রে নির্ব্বাচকগণের নিকট অভিমত লওয়া হইতেছে। এইরূপ মত গ্রহণের নাম Referendum সুইজারল্যাণ্ডে ও আমেরিকার পৃথক পৃথক রাষ্ট্রগুলিতে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে এই প্রথা প্রবর্ত্তনের জন্য অনেক যুক্তি পরামর্শ চলিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ড ফ্রান্স বা অষ্ট্রেলিয়ার ন্যায় বড় বড় রাষ্ট্রে এরূপ প্রথা প্রবর্ত্তন করা অত্যন্ত দুরূহ। কেননা এইসব রাষ্ট্রে ভোটারের সংখ্যা এত অধিক যে প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাহাদের মত লইয়া কার্য্য করিতে হইলে বহু অর্থ ও সময় ব্যয়িত হইবে।

আবার ইহার প্রবর্ত্তন না করিলে মন্ত্রী-পরিষদের হস্তে অনেক পরিমাণে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা প্রদান করিতে হয়। ইংলণ্ডে তাহাই করা হইয়াছে। ইতালী স্পেন গ্রীস হাঙ্গেরী তুরস্ক ও পারস্য রাষ্ট্রে ক্ষমতাভার একজনের হস্তে অর্পণ করিতে হইয়াছে। এইরূপে জনসাধারণ চিরদিন যে এক সর্ব্বশক্তিযুক্ত নেতার পরিচালনা মানিয়া চলিবে তাহার সম্ভাবনা অল্প। আর মুসোলিনি বা কামালপাশার ন্যায় শক্তিশালী নেতাও সর্ব্বদা মিলিবে না। তাহা হইলে গণতন্ত্র-প্রথা প্রচলিত রাখিবার উপায় কি?

আধুনিক গণতন্ত্রের সমস্যাগুলির মধ্যে ইহা একটী মাত্র। আরও এমন অনেক সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে গণতন্ত্রের

ক্ষমতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত বা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে।

গণতন্ত্রের প্রথম আবির্ভাবের সময় শ্রমিকবৃন্দ আশা করিয়াছিল যে এইবার তাহাদের দুঃখ কষ্টের অবসান হইবে। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে তাহারা একদিকে সামান্যমাত্র মাহিনা মজুরী স্বরূপ পাইয়া অতিকষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, অপরদিকে তাহাদেরই পরিশ্রমের ফলভোগ করিয়া তাহাদের নিয়োগকর্ত্তারা অপরিমিত অর্থ সঞ্চয় করিয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতেছে। গণতন্ত্রের মধ্যে এইরূপ অবস্থা বৈষম্য মানিয়া লইতে শ্রমিকবৃন্দ রাজী নহে। তাহাদের অসন্তোষের ফলে যে সমস্ত রাজনৈতিক মতবাদের সৃষ্টি আছে, তাহা কার্য্যে পরিণত হইলে গণতন্ত্রের পক্ষে বিশেষ বিপজ্জনক হইবে।

ফরাসী দেশে Syndicalism বা শ্রমিকসঙ্ঘতন্ত্র নামক একপ্রকার মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহার প্রভাব ইউরোপের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়াছে। এই মতবাদীরা বলেন যে শাসনভার কোন মহাসভার উপর অর্পণ না করিয়া শ্রমিক সঙ্ঘের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। প্রধান প্রধান বাণিজ্য দ্রব্যের উৎপন্নকারীগণ বিভিন্ন বিভিন্ন সঙ্ঘ গঠন করিয়াছে। আবার ঐ সঙ্ঘগুলি অনেক দেশে এক মহাসঙ্ঘের সহিত মিলিত হইয়াছে। ফ্রান্সে Confederation general on Travail, অষ্ট্রেলিয়ার Labour Leagues, আমেরিকায় Federation of Labour ও গ্রেটব্রিটেনে খনি, রেল ও যান সম্বন্ধীয় শ্রমিকদের মধ্যে তিনটী union স্থাপিত হইয়াছে। এ সুযোগে ধর্ম্মঘট করিয়া তাহারা জাতীয় জীবনের গতি স্থগিত করিয়া দিবার ইচ্ছা পোষণ করে।। এইরূপে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ধ্বংস সাধন করিয়া তাহারা শ্রমিকসঙ্ঘের দ্বারা শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চাহে। এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইলে প্রত্যেক শ্রমিকসঙ্ঘ বা Syndic কেবলমাত্র যে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করিবে তাহা নহে—সমাজ জীবনের প্রত্যেক বিষয় তাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। অথচ শ্রমিক সঙ্ঘের যাহারা অন্তর্ভুক্ত নহে, তাহাদিগকেও এই শাসন মানিয়া লইতে হইবে। যে সমস্ত শ্রমিকসঙ্ঘ এ পর্য্যন্ত গঠিত হইয়াছে—তাহারা ভবিষ্যতের শাসন প্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা আপাততঃ ধর্ম্মঘটের দ্বারা বর্ত্তমান শাসনযন্ত্রকে ধ্বংস করিয়া দিতে চাহে। গণতন্ত্রের নানারূপ অক্ষমতা দেখিয়াই তাহারা এরূপ কার্য্য নীতি গ্রহণ করিয়াছে। গণতন্ত্র যদি তাহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে চাহে, তবে তাহার কার্য্য প্রণালীকে অনেকখানি পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

একদিকে Syndicalism রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রমিকসঙ্ঘের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দিতে চাহে অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদ বা Socialism রাষ্ট্রের হস্তে সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রন করিবার সমস্ত ভার অর্পণ করিতে চাহে। যাহা কিছু হইতে অর্থ উৎপন্ন হইতে পারে, যেমন জমী, কলকারখানা প্রভৃতি তাহা ব্যক্তি বা সঙ্ঘ বিশেষের হাতে না রাখিয়া রাষ্ট্রের হাতে দিতে হইবে। সকলকেই জীবিকা নির্ব্বাহের জন্ত সমাজের হিতকারী কোন কার্য্য করিতে হইবে। রাষ্ট্রকে এইরূপে সর্ব্বশক্তিমান করিয়া তুলিলে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার হ্রাস হইবে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ চরম আকারে বলশেভিজিম রূপে দেখা দিয়াছে ও সমাজতন্ত্রের নীতিকে কার্য্যে পরিণত করিতেছে। কিন্তু ইহার ফলে তথায় গণতন্ত্র একরূপ লোপ পাইয়াছে। Socialism, Communism, Bolshevism প্রভৃতি আধুনিক গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

গণতন্ত্রকে যদি বাঁচিয়া থাকিতে হয় তবে তাহার সম্মুখে যে সমস্ত সমস্যা এখন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার সমাধান করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সাধনের জন্য প্রত্যেক গণতন্ত্রেই নানারূপ পন্থা অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সমস্যা সমাধান করিতে হইলে প্রধান প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির কার্য্য প্রণালী আলোচনা করিয়া, তাহার তুলনামূলক সমালোচনা করা প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী লইয়া এখন নানারূপ পরীক্ষা করা হইতেছে! শীঘ্র হউক বা দেরীতে হউক এদেশে গণতন্ত্রের আবির্ভাব হইবেই। সেইজন্য বৈদেশিক গণতন্ত্রগুলির সম্বন্ধে যে সকল সমস্যার উদয় হইয়াছে ও যেরূপ তাহা সমাধানের চেষ্টা চলিতেছে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন।

সুর সাধনা।

শিল্পী—নাথনিয়েল সিচেল।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　২২শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৩।　　[৩৭শ সপ্তাহ

আর কেন ?

[স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]

আর কেন, খুলে লও, মায়াজাল খানি,
হে ঐন্দ্রজালিক্ প্রিয় ফিরে যাই ঘর,
মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে আজীবন খানি
হেরিনু কতই খেলা বিচিত্র সুন্দর।
কিছুইত বুঝিনু না, অতৃপ্ত বাসনা ;
রয়ে গেল, চলে গেল, যুগ-যুগান্তর,
বিপুল ভাণ্ডারে তব বিচিত্র খেলনা!
অনন্ত-বৈচিত্রময়—হে বর সুন্দর।
এবে রসালের অগ্রভাগে স্বর্ণময় বেলা
মাগিছে বিদায়-গীতি—শেষ কর খেলা।

আলোচনা

মিলন কোন পথে ?

বাঙ্গলার লাটসাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া বড়লাট লর্ড আরউইন, সহকারী ভারত সচিব লর্ড উইণ্টারটন, ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেড্ প্রভৃতি ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা সকলেই সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ভারতবর্ষের হিন্দুমুসলমানকে মিলিত হইবার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন যে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা গবর্ণমেণ্ট ভিতর হইতে উস্কাইয়া দিতেছেন ইহা অপেক্ষা বড় মিথ্যা কথা আর হইতে পারে না। লর্ড বার্কেনহেড্ স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন যে "The power responsible for India had nothing but discredit to reap from these disorders" অর্থাৎ এরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামায় যে শক্তি ভারতের জন্য দায়ী, সে শক্তির নিন্দা ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না। ভারতের শাসক সম্প্রদায়ের এরূপ স্বীকার উক্তিতে ও তাঁহাদের উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন ঘটাইবার আগ্রহে সত্যই আমরা আশান্বিত ও আনন্দিত হইয়াছি। এই সঙ্কট সময়ে গবর্ণমেণ্ট যে কোনদলের পক্ষপাতিত্ব করিতেছেন না বা করিবেন না এরূপ ঘোষণার সত্যই প্রয়োজন ছিল।

গবর্ণমেণ্ট মিলন স্থাপনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন, আমরাও মিলন প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয়তার ভূমিকে দৃঢ় করিতে কিছু কম উদ্গ্রীব নহি। আমরাও বুঝি যে এরূপ দাঙ্গাহাঙ্গামায় কেবলমাত্র যে গবর্ণমেণ্ট কলঙ্কিত হইতেছেন তাহা নহে, সমগ্র সভ্য জগতের সমক্ষে ভারতবাসী ধিক্কৃত হইতেছে। আমাদের প্রাচীন জ্ঞান গরিমার অহমিকা অতলতলে ডুবিতেছে। দাঙ্গার এক এক দফায় ভারতের জাতীয় আন্দোলন দশ দশ বছর পিছাইয়া যাইতেছে। এজন্য আমরাও মিলন স্থাপনের প্রয়াসী—বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে হিন্দুমুসলমান যেমন প্রীতিসৌহার্দ্দ্যে বাস করিয়াছে, তেমনি ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য আমরা অনেক দুঃখ কষ্টকেও বরণ করিয়া লইতে রাজী আছি। কিন্তু আজ যদি হিন্দুরা মসজিদের সামনে বাজনা বাজান একদম বন্ধ করিয়া দেয় তাহা হইতেই কি আবার সেই হিন্দু-মুসলমানের সদ্ভাব ফিরিয়া আসিবে ? বাজনাই কি বিরোধের মূল কারণ ?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বাজনার বায়না একটা উপলক্ষ্য মাত্র—বিরোধের মূল কারণ আরও গভীরতর আরও ব্যাপক। লজিকের ভাষায় বলিতে গেলে বিরোধের উৎপত্তি সম্বন্ধে বাজনাটা একটা accident বা অবান্তর কারণ মাত্র—মূল কারণ বা cause নহে। আজ যদি মিলনবৈঠকে হিন্দুর বাজনা বাজান বন্ধ হইয়া যায়—তবে মুসলমানেরা কালই যে হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিবেন—তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না। বরং মনে হয় যে মুসলমানগণ ভাবিবেন যে একটা বিষয় যখন হিন্দুকে তাঁহারা পরাজিত করিয়াছেন, তখন এই ভাবে অন্যান্য বিষয়েও তাঁহারা হিন্দুদিগকে কোণঠেসা করিতে পারিবেন। কেননা এখনই তাঁহারা দাবী করিতেছেন যে—(১) শান্তিরক্ষক পুলিশের মধ্যে তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হউক। (২) সমস্ত চাকুরী মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। (৩) সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে রীতিকে বজায় রাখিয়া ও দৃঢ়তর করিয়া তাঁহাদিগকে অধিকতর প্রতিনিধি কাউন্সিলে বা আসেম্বিলিতে পাঠাইবার ক্ষমতা প্রদান করা হউক।

এই তিনটী দাবীর মধ্যে তৃতীয়টী যেমন মারাত্মক, প্রথম ও দ্বিতীয়টী তেমন ভীষণ মারাত্মক নহে। কেননা অধিক সংখ্যক মুসলমান কর্ম্মচারীর নিয়োগ হইলেও, তাঁহাদের অজ্ঞতা অক্ষমতা বা পক্ষপাতিত্ব কিয়ৎ পরিমাণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সংযত ও সংশোধিত করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু ব্যবস্থাপক সভায় যদি মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন ক্ষমতা বজায় রাখা হয় ও তাঁহাদের প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে হিন্দুর স্বার্থ চিরতরে বিনষ্ট ও বিসর্জ্জিত হইবে—এবং তদপেক্ষাও আশঙ্কার কথা এই যে উভয়

সম্প্রদায়ের মিলনের উপর প্রতিষ্ঠিত জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের আশা নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। কেননা মুসলমানগণ হিন্দু ভোটারদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার বা করিবার কোন প্রয়োজন বোধ করিবেন না এবং আইনের সাহায্যে হিন্দুদের অবস্থা শোচনীয় করিতে পারেন।

অথচ এই সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের উপরই মুসলমানেরা জোর দিতেছেন সব চেয়ে বেশী। আজ যদি হিন্দুগণ তাঁহাদের বাজনা বন্ধ করেন, তবে কাল মুসলমানগণের অন্যান্য দাবীকেও মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই জন্যই বাজনার দাবী আমরা এখন ছাড়িতে পারি না। যদি মুসলমানগণ অন্য কোন দাবী লইয়া উপস্থিত না হইতেন—তাহা হইলে বাজনা সমস্যার একটা মীমাংসা হইতে পারিত। কিন্তু তাঁহারা যখন নিজদিগকে "উন্নতিশীল" সম্প্রদায় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—তখন তাহাদের নিত্যনূতন উন্নতির দাবীতে হিন্দুদের প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে বলিয়া আশঙ্কা হয়।

গবর্ণমেণ্ট মনে করিতেছেন বাজনা সমস্যার মীমাংসা হইলেই বুঝি সব মিটমাট হইয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহারা নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে "It would be untrue to deny the connection between the reforms and the present state of tension between Hindus and Moslems" (বার্কেনহেড্) অর্থাৎ বর্ত্তমানের হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্যের সহিত যে শাসন সংস্কারের সম্পর্ক রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে অসত্য বলা হইবে। গবর্ণমেণ্টও বুঝিয়াছেন যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনই গোলমালের মূল কারণ। তাহা হইলে সেই মূল কারণকে দূরীভূত না করিয়া তাঁহারা বাজনা সম্বন্ধে কেবল নিখরচায় উপদেশ (advice gratis) দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করিতেছেন কেন? তাঁহারা আশঙ্কা করেন যে এখন সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বন্ধ করিয়া দিলে মুসলমানেরা অত্যন্ত রুষ্ট হইবেন। কিন্তু মণ্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টেও বলা হইয়াছিল যে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্য চিরস্থায়ী হইবে—লর্ড বার্কেনহেডও তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে "It was doubtless true, that the system of communal representation tended to stereotype cleavage." সুতরাং সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা যতদিন বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মিলন স্থাপিত হইতে পারে না বাজনা সমস্যার উপর কোন বৈঠক বসাইয়া লাভ নাই। প্রতীকার গবর্ণমেণ্টের হাতেই রহিয়াছে। তাঁহারা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বন্ধ করিয়া দিলে নির্ব্বাচনপ্রার্থী মুসলমান হিন্দুর দ্বারস্থ হইয়া তাহার মঙ্গলচেষ্টা করিবেন আবার হিন্দু নির্ব্বাচনপ্রার্থীরা মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন। উভয় সম্প্রদায় তখন নিজেদের মধ্যে সকল গোলমাল আপোষে মিটাইতে পারিবেন মুসলমানেরা হয়তো দুপাঁচ বছর বড় জোর অসন্তুষ্ট থাকিতে পারেন কিন্তু এ অসন্তোষ চিরস্থায়ী হইবে না। অথচ সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বজায় রাখিলে সাম্প্রদায়িক বিরোধই হইবে ভারত ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন বন্ধ করিলেই যে মুসলমানদিগকে হিন্দুস্বেচ্ছাচারীতার মধ্যে বাস করিতে হইবে একথার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। **যোগ্যতার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ** লাভ করিয়া মুসলমানেরা যদি অধিকাংশ কেন সমস্ত চাকুরীই পান তাহা হইলে হিন্দুরা বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। আর সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেও মুসলমানদিগকে কেহ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে বাধা দেন নাই। স্কুল বা কলেজের দ্বার হিন্দু-মুসলমানের জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত ছিল। হিন্দুরা দলে দলে আসিয়া স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন—মুসলমানেরা দুই দশজন মাত্র পড়িতে লাগিলেন এজন্য গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা বা হিন্দুর ব্যবহার দায়ী নহে। যদি কেহ দায়ী থাকে—তবে মুসলমান সম্প্রদায়ের ঔদাসীন্যই দায়ী।

এখন মুসলমান নেতারা যদি তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোককে শিক্ষালাভের জন্য প্রবুদ্ধ করিতে পারেন তবে তাঁহারা যোগ্য হইয়া অনেক চাকুরী পাইবেন—কাউন্সিলে অনেক যোগ্য প্রতিনিধি পাঠাইতে সমর্থ হইবেন।

মিলনের জন্য হিন্দুদের নিকট অনুরোধ করা বৃথা কেননা —হিন্দুরা বিরোধ বাধায় নাই। মিলন স্থাপনের ক্ষমতা গবর্ণমেণ্ট ও মুসলমান সম্প্রদায়ের। গবর্ণমেণ্ট যদি সাম্প্র-

দায়িক নির্ব্বাচন বন্ধ করিয়া দেন এবং মুসলমানেরা যদি স্বসম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন তবেই যথার্থ মিলন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তাহা না হইলে কেবলমাত্র বাজনার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিলে মিলন কোনদিনই সংসাধিত হইবে না।

দলাদলি ও গালাগালি—

আমাদের দেশে গণতন্ত্র নূতন। এখন আমাদের উচিত ইউরোপীয় গণতন্ত্রের দোষগুলির অনুকরণ না করিয়া গুণ-গুলির অনুসরণ করা। কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত দেখিতে পাইতেছি। পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও পারত-পক্ষে তাহা সহ্য করিয়া চলা উচিত। মতের মিল না হইলেই গালাগালির আশ্রয় লওয়া সুশিক্ষার পরিচায়ক নহে। স্বরাজ্যদলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আমরা পারস্পরিক সহযোগী দলের প্রতি কটূক্তি দেখিয়া বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়াছি।

ভারতীয় রাজনীতির বর্ত্তমান বর্ষের নেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, যন্ত্রতন্ত্র পণ্ডিত মালব্যজী ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন। এরূপ করা তাঁহার পদমর্য্যাদার অনুপযুক্ত। তিনি তো হিন্দু মুসলমানের মিলনের অনেক বুলি আওড়াইলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফলই হইল না। এখন যদি পারস্পরিক সহযোগীদল হিন্দুর স্বার্থরক্ষার জন্য চেষ্টা করেন, তবে তাঁহারা যে বিশেষ অপরাধী হইবেন, তাহা মনে হয় না। তাঁহারা আগামী নির্ব্বাচনে ভোটের লোভেই হিন্দুদিগকে উস্কাইয়া দাঙ্গা বাধাইয়া দিতেছেন এরূপ ইঙ্গিত কেবল যে ভদ্রতা বিরুদ্ধ ও সত্যের অপলাপকারী তাহা নহে—ইহা জাতীয়তার ভিত্তি-ধ্বংসকারী। হিন্দুরা দাঙ্গা বাধাইতেছে না তবে চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রভৃতি হিন্দুকে উস্কাইয়া দিতেছেন কেমন করিয়া? আর পারস্পরিক সহযোগীদল যে কেবলমাত্র ভোটের জন্যই হিন্দুদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন এ-কথাও ঠিক নহে। হিন্দুরা এইরূপ একটি দল চাহিতেছিল বলিয়াই পারস্পরিক সহযোগীদলকে স্বেচ্ছায় সমর্থন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পারস্পরিক সহযোগীদল কংগ্রেসের নীতি মাথা পাতিয়া লইয়াছেন—তথাপি তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া ঘোষনা করায় কংগ্রেসকেই দুর্ব্বল প্রতিপন্ন করা হয়।

তারপর শ্রীমতী নাইডু মহোদয়া কর্ম্মীসঙ্ঘের প্রতি যে নীচতা আরোপ করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিতা মহিলার উপযুক্ত হয় নাই। বাঙ্গলার স্বরাজ্যদল শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তিকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে তাই তিনি এইরূপ গালাগালির আশ্রয় লইতেছেন ও স্বরাজ্যদলকে ঐরূপ কার্য্যে প্রশ্রয় দিতেছেন। আমাদের দেশে দলাদলির ফলে যদি এরূপ গালাগালি প্রকাশ পায়, তবে দেশের অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত ভোটাররা নেতাদের সম্বন্ধে কি ভাবিবেন?

জয় পরাজয়—

বাঙ্গলার স্বরাজ্যদলের নেতা শ্রীযুক্ত জে, এম, সেনগুপ্ত মহাশয় কয়েকদিনের জন্য ডিক্টেটার হইয়াছিলেন। তখন তিনি তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদিগকে পরাজিত করিয়া বড়ই খুসী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার এ জয় পাইরাসের রোমের উপর বিজয় লাভের মতনই হইয়াছে। গ্রীকবীর পাইরাস রোমদেশ জয় করিতে গিয়াছিলেন। রোমানগণ পাইরাসকে প্রাণপণে বাধা দিলেন—পাইরাসের অধিকাংশ সৈন্য ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পাইরাস সম্মুখ সমরে জয়লাভ করিলেন। জয়লাভের পর পাইরাস্ বলিয়াছিলেন "এমন জয় আর একবার করিলেই আমার দফা নিকাশ।" কেননা পাইরাসের এই জয়লাভ করিবার মূল্যস্বরূপ অধিকাংশ সৈন্যের জীবন দিতে হইয়াছিল। তারপর পাইরাস ভগ্ন-মনোরথ হইয়া রোম হইতে ফিরিয়া যান।

শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয় জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল অর্থাৎ কর্ম্মীসঙ্ঘ তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে তখন গুপ্তচর মার্কামারা বিদ্রোহী প্রভৃতি অপবাদ দিয়া বিদূরিত করা হইয়াছিল। কিন্তু আবার যখন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের একচ্ছত্র অধিপতিত্বের অবসান করিবার জন্য বি, পি, সি, সির (বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি) নির্ব্বাচন হইল তখন দেখা গেল যে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস প্রভৃতি কর্ম্মীসঙ্ঘের নেতারা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাঙ্গলার কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দ কর্ম্মীসঙ্ঘের প্রতি শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাশয়ের প্রদত্ত অপবাদ বিশ্বাস করেন নাই—তাই তাঁহারা উঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন।

কিন্তু "বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে।" এবারে কর্ম্মীগণ সাদরে নির্ব্বাচিত হইলেও এ নির্ব্বাচন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। পাইন্নাসের ন্যায় শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকেও ইহার ফলে স্বরাজ্যদল হইতে একদিন অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। এ জয় পরাজয়ের খেলার অবসান কোথায় কে জানে ?

শিক্ষা ও ধর্ম্ম—

ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াই ভারতবর্ষের ইতিহাসের ক্রম-বিকাশ হইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত ভারতবাসীর উন্নতি অবনতির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। ধর্ম্মহীন যে উন্নতিপ্রচেষ্টা তাহাকে ভারতবাসী চিরদিনই সন্দেহের চক্ষে দেখে। অথচ আজ ইউরোপের অনুকরণে আমরা ধর্ম্মকে রাজনীতিক্ষেত্র হইতে বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। এরূপ চেষ্টা করা মানে ভারতের অতীত ইতিহাসকে অস্বীকার করা।

আজকাল আমাদের ছেলেরা স্কুল কলেজে যে শিক্ষালাভ করে, তাহার সহিত ধর্ম্মের নামগন্ধও নাই। এরূপ শিক্ষা লাভের ফলে যুবকদের মধ্যে অসন্তোষের ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে —তাহাদের বিলাস বাসনা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাদের কামনাকে সংযত করিবার কোনই চেষ্টা হইতেছে না। এরূপ শিক্ষার দ্বারা জাতীয়গঠন কার্য্য অধিকতর অগ্রসর হইতে পারে না।

প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ ডাঃ ডাফ্ এইরূপ ধর্ম্মহীন শিক্ষার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবাদের কারণ ছিল অবশ্য রাজনৈতিক। অর্থাৎ তিনি ভারতবাসীকে ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া শান্ত, শিষ্ট, সুবোধ বালক করিয়া রাখিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন— "If in that land you do give the people knowledge without religion, rest assured that it is the greatest blunder, politically speaking, that ever was committed. Having free unrestricted access to the whole range of our English literature and science, they will despise and regect their own absurd system of learning. Once driven out of their own systems, they will inevitably become infidels in religion. And shaken out of the mechanical round of their own religions observances, without moral Principles to balance their thoughts or guide their movements, they will as certainly become discontented, restless agitators, ambitous of power and official distinction, and possessed of the most disloyal sentiments towards that government which in their eye, has usurped all the authority that rightfully belonged to themselves. This is not theory, it is fact." ইহার সার মর্ম্ম এই যে "ভারতবর্ষের লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা না দিয়া মাত্র জ্ঞান বিতরণের নীতির অপেক্ষা রাজনৈতিক হিসাবে সাংঘাতিক ভুল আর কিছু হইতে পারে না। তাহারা নিজেদের প্রথা যখন না শিখিবে, তখন নিশ্চয়ই তাহারা নাস্তিক হইয়া পড়িবে। তাহারা তাহাদের ধর্ম্মে বিচলিত হইলে নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হইবে, অনবরত আন্দোলন চালাইবে, পদ ও মর্য্যাদার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবে, এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি বিদ্রোহভাব পোষণ করিবে। কেননা তাহারা ভাবিবে যে তাহাদের যাহা ন্যায্য অধিকার তাহা গবর্ণমেণ্ট দখল করিয়াছে। ইহা কথার কথা মাত্র নহে—বাস্তব ঘটনা।" সত্যই ডাফ সাহেব ৯০ বৎসর পূর্ব্বে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন আজ তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। ইহাতে ভারতবাসীর কিছু লাভ হইয়াছে সত্য—কিন্তু ক্ষতিও যে একেবারে হয় নাই তাহা বলা যায় না।

ধর্ম্মশিক্ষা না দিলে চরিত্র গঠন হয় না—পরোপকার স্পৃহা জাগে না—আত্মত্যাগের সামর্থ্য হয় না। এইজন্যই আজ যখন হিন্দুর ধর্ম্ম নানাস্থানে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতেছে,

হিন্দুর যুবকগণ তাহাতে দৃক্‌পাতও করিতেছে না। নারী নির্য্যাতন দূর করিবার জন্ম বদ্ধপরিকর হইতেছে না। একদিকে বাঙ্গালীর সর্ব্বনাশ হইয়া যাইতেছে, অপর দিকে বাঙ্গলার যুবকদল ম্যাচ ও বায়স্কোপে মত্ত রহিয়াছে। ধর্ম্মশিক্ষার অভাবেই এই শোচনীয় মনোবৃত্তি।

আমরা অবশ্য ধর্ম্মশিক্ষা বলিতে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী বা হিংস্রতামূলক প্রতিরোধের কথা বলিতেছি না। যে ধর্ম্মশিক্ষার দ্বারা অপর সম্প্রদায়ের মতকে সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মিবে—আর্ত্ত ও পীড়িতের সেবার জন্ম প্রাণদান করিতে হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠিবে—দুর্ব্বলের সাহায্য করিবার জন্ম যুবকদের মধ্যে প্রতিযোগীতা বাধিয়া যাইবে—আমরা সেই ধর্ম্মশিক্ষা চাই। নীতি ও ধর্ম্মের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যাঁহারা শিক্ষা দিতে পারিবেন, আমরা তাঁহাদিগকেই আচার্য্যের পদে বরণ করিতে চাই।

স্কুল কলেজের ক্লাসে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া কঠিন আর তাহাতে ফলও বিশেষ হয় না। কিন্তু হোষ্টেলে হোষ্টেলে যদি ত্যাগশীল ধর্ম্মপ্রাণ অধ্যাপকবৃন্দ সপ্তাহে দুইদিন করিয়াও ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষা দেন – তবে যুবকদের বর্ত্তমান শোচনীয় মনোভাব বিদূরিত হইতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা করা বিশেষ কঠিন নহে—কেননা হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের বোর্ডিং পৃথক পৃথক। সুতরাং পৃথক ভাবে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। আশা করি কলেজের কর্ত্তৃপক্ষগণ এ সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিবেন।

তপ্তশ্বাস

[শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ]

বাতায়ন পাশে বসিয়া কিশোরী
ভাবিছে আপন মনে,
আর কি প্রানেশ আসিবে ফিরিয়া
দেখিবে সে এ জীবনে ॥

বরষের পর বরষ কেটেছে,
বিষাদে যে অবলার।
নয়নের মণি ফিরিল না তবু,
মুছাতে নয়নধার ॥

প্রতীচীর কোলে বলে গেছে সে যে,
শিক্ষা লভিতে বলে।
সে শিক্ষা তারে শিখাল যে শুধু
অহং কাহারে বলে ॥

রূপের পশরা খুলেছে যেথায়,
তরুণী রূপসী দল।
তরুণ দেখিলে নিমেষে ভুলাতে,
জানে অপরূপ ছল ॥

রঙীন নেশার মধুর আবেশে,
হ'ল সে আপন হারা।
দুঃখিনীর হায় মরমের ব্যথা,
দিলে না সে হৃদে সাড়া ॥

রিক্ত হইয়া তিক্ত হৃদয়ে,
ফিরিলে আপন বাসে।
বরিয়া লইল অভাগারে যেন,
কাহার তপ্তশ্বাসে ॥

মিলনের আশা ফুরাইল যবে,
ছাড়িয়া এ মরদেশ।
চ'লে গেল বালা সে দেশে যেথায়,
নাহিক বিরহ লেশ ॥

প্রাচীন যুগের গ্রীক সাহিত্য

[শ্রীক্ষিতিনাথ সুর]

কবিতার উৎপত্তি গদ্য সাহিত্যের আগেই হইয়া থাকে। অন্যান্য দেশের ন্যায় গ্রীসেও ইহার অন্যথা হয় নাই। ইলিয়াড্ (Illiad) বা অডিসি (Odessy) রচিত বা সঙ্কলিত * হইবার আগেও গ্রীসে কবিতার প্রচলন ছিল। কারণ হোমারের এই দুইখানি Epicএর ভিতর আমরা চারণ কবিদের (Ministrels) কথা দেখিতে পাই। চারণদের রচিত গাথা বা যুদ্ধাদির কাহিনী কবিতায় রচিত হইয়া বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসিত। এই সমস্ত গাথা প্রভৃতি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ভাবে রচিত না হইলেও—ইহারাই গ্রীসের কবিতাকে গড়িয়া উঠিতে সম্পূর্ণ সাহায্য করিয়াছে। আর এই প্রকারের গাথা প্রভৃতি উপলক্ষ্য করিয়াই হোমারের গ্রন্থাবলীর সৃষ্টি হইয়াছে।

হোমারের অব্যবহিত পরে খৃঃ পূঃ ৮০০ ৫০০ অব্দের মধ্যে আর একশ্রেণীর লেখক দেখা যায়; তাঁহারা 'Cyclic Poets' নামে পরিচিত। ট্রয়কে ঘিরিয়া যে সমস্ত Legend ছিল, তাঁহারা তাহাই কবিতায় লিখিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত কবিতা নষ্ট হইয়া গেলেও, তাঁহাদের সংগৃহীত সেইসব কাহিনী পরবর্ত্তী কালে গ্রীক সাহিত্যিক, শিল্পী ও ভাস্করের মনের খোরাক যোগাইয়াছে। এই সময়ে গ্রীসে দেবদেবী সম্বন্ধে অনেক কবিতা রচিত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সভা, সমিতি বা উৎসবের সময় এইসব কবিতা পঠিত হইত। এই সময়েই Heroid নামে একজন Boeotian কবির কবিতায় আমরা সে-দেশের কৃষকদের দুরবস্থা, কৃষিকার্য্যের নিয়ম ও সময়, সমুদ্র যাত্রার নিয়মাবলী ও সম্রাটের খরচ খরচার একটা তালিকা পাই। ইনি নীতিমূলক কবিতা লিখিতে ভালবাসিতেন এবং 'Works and days' নামে এই ধরণের একটা কবিতার বইও লিখিয়াছিলেন। ইহার অনেকগুলি Mythological কবিতাও আছে।

খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দের পর হইতে কবিতার ধারা পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময়েই প্রথম Elegiac ও Iamfic ছন্দে কবিতা লেখা সুরু হয়। সর্ব্বপ্রথম Elegiac কবি Callinus, কিন্তু Tyrtaensএর নামও বেশ প্রসিদ্ধ। বিদ্রূপ কবিতাও (Satirical Poems) এইসময় প্রথম রচিত হয়। Archilochus বিদ্রূপ-কবিতা লিখিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই শতাব্দীতে সঙ্গীত শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয় ও সঙ্গে সঙ্গে Lyric poems (গীতি কবিতা) এরও প্রসার বেশ বাড়িয়া যায়। মনের কোন ভাব বা উচ্ছ্বাসকে ছন্দ রূপে দিয়া, যদি যন্ত্রের সাথে গীত হয় তবে তাহাকে গীতি-কবিতা বলে। Terpenderকে গ্রীক গীতি-কবিতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার কবিতার বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। Lyric Poetsদের মধ্যে ভাষার মাধুর্য্য ও উচ্ছ্বাসে Sappho সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার লেখা প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, যাহা সামান্য কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই ইহা বেশ সহজেই প্রমাণিত হইবে। তিনি যে ছন্দে কবিতা লিখিতেন সে ছন্দকে Sapphoic metre বলে। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে Anacreon, Arion প্রভৃতির নাম বেশ প্রসিদ্ধ।

যাহার নিজের ইতিহাস নাই, সে দেশকে নাকি সভ্য বলা চলে না। খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রীস বেশ সভ্য দেশ বলিয়া পরিগণিত হইলেও, তখনও তাহার ইতিহাস লেখা সুরু হয় নাই। এই সময়ের পূর্ব্বে তাহার গদ্য সাহিত্যেরও জন্ম হয় নাই। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গদ্য সাহিত্যের বেশ প্রসার

* অনেকে মনে করেন Illiad, হোমারের রচনা নয়—There is a good reason to believe that the Illiad was not composed all at once just as we have it, but has been brought to its present form by 'episodes' added on different dates; perhaps between 1000 and 800 B. C."

হয় আর এই সময়েই গ্রীস ইতিহাসের জন্মদাতা (The father of Greek History) Herodotus তাঁহার ইতিহাস লেখা সুরু করেন। Herodotus বেশ প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ছিলেন। ইনি গ্রীসের ও এসিয়া মাইনরের সমস্ত সহর, এমন কি সুদূর ইটালি ও ঈজিপ্ট অবধি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। Herodotusএর লিখিবার ক্ষমতা ও ধরণ খুব সুন্দর ছিল। তাঁহার ভাষার মাধুর্য্য ও স্বচ্ছন্দতা, তাঁহার নিজের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব অনুশীলন তাঁহার ইতিহাসকে সবদিক দিয়া অতুলনীয় করিয়া রাখিয়াছে। এশিয়া মাইনর ইঁহার জন্মস্থান। এশিয়া মাইনরের গ্রীক ও পারসীকদের জাতীয় যুদ্ধই ইঁহার ইতিহাসের আলোচনার বিষয়। এবং সে ইতিহাস ইনি বেশ ভাল ভাবেই দিয়াছেন। এই যুগের ঐতিহাসিক Thucydides ও Xenophon গ্রীসের ইতিহাসে বেশ প্রসিদ্ধ। Thucydidesএর সময়ে Peloponnesian War সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধ সম্বন্ধে Thucydidesএর লেখা তথ্যের দাম সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। Xenophonএর 'Retreat of the ten thousand' তাঁহার প্রসিদ্ধ বই Analasisএর একটা অধ্যায়।

নাটকের জন্ম গ্রীস দেশে না হইলেও এখানেই ইহা নাটকীয় রূপ পাইয়াছিল। গ্রীসের নাট্য সাহিত্য এত সুন্দর ও মনোহর যে ইহা গ্রীক সাহিত্যের অতুলনীয় নমুনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নাটককে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—Tragedy ও comedy * প্রাচীনকালে Dionysus পূজার সময় তাঁহার বেদীর চারিদিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাঁহারই উদ্দেশে যে সমস্ত গান গাওয়া হইত, তাহার দলপতি নিজে Dionysus সাজিতেন। পরবর্ত্তীকালে Pasistratusএর সময়ে Thepsisএর যুক্তি অনুসারে গ্রীক নাটকে কথাবার্ত্তা (Dialogue) প্রচলিত হয়—একজন প্রশ্ন করিত, অন্যে তাহার উত্তর দিত। গান কমাইয়া দিয়া এইভাবের কথাবার্ত্তা বা অভিনয় বেশীক্ষণ চলিত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে গ্রীসের নাটক আধুনিক নাটকীয় রূপ পাইতেছিল। Thepsisএর পর Pratinus, Tragidical নাটকের মধ্য হইতে অপদেবতা প্রভৃতির স্থান তুলিয়া দেন। কিন্তু তিনি জনমত ও শাস্ত্রমত রক্ষা করিবার জন্ম Satirical নাটক রচনা করেন। এই Satirical নাটক হইতে আধুনিক প্রহসনের সৃষ্টি হইয়াছে। Tragedical নাটকের অভিনয়ের পর এ-গুলির অভিনয়ে সাধারণের মন আমোদে সিক্ত হইয়া উঠিত।

পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই নাটক রচিত হইত। সুতরাং জানা ঘটনা বলিয়া সকলেই বেশ আমোদের সঙ্গে এই সমস্ত অভিনয় উপভোগ করিত। তখন দৃশ্যপটের কোন হাঙ্গামা না থাকিলেও, উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অভিনয় না করিলে তাহার আদর হইত না। Dionysusএর পূজার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে নাটকের অভিনয় হইত না। গ্রীসের এই সময়ের নাটক আমাদের 'কবি' গান প্রভৃতির অপেক্ষা উন্নত ছিল বলিয়া মনে হয় না। আর ঠিক এই-ভাবেই অভিনয় হইত।

Periclesএর সমসাময়িক Aristophanes একজন নামজাদা নাট্যকার ছিলেন। তিনি সাময়িক কোন ঐতিহাসিক ঘটনা, সামাজিক কুসংস্কারের চিত্র অতিরঞ্জিত করিয়া বা দেশবাসীর অন্য কোন স্পৃহনীয় বিষয় লইয়া লিখিতেন। একটু বিদ্রূপের ভাব থাকিলেও তাঁহার এই উপহাস চিত্রগুলির (Caricature) সাহিত্যিক দাম খুব বেশী। তারপর গ্রীস যখন ম্যাসিডনের অধীনতা স্বীকার করিল, তখন হইতে রাজনৈতিক ঘটনার স্থানে কাল্পনিক বিষয় নিয়া নাটক লেখা সুরু হইল। এই শ্রেণীর দু'জন লেখক বেশ প্রসিদ্ধ। Philomen ও Menander. শতাধিক বই লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

গ্রীক সাহিত্যে গ্রীক বাগ্মীগণের দানও খুব সামান্য নয়। গ্রীক বাগ্মীদের মধ্যে Isocrates, Hypereides ও Demosthenes সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। প্রসিদ্ধ রোমান

* Tragedy—(the goat song), so called because the sacrifice of a goat was a part of the ceremony.

Comedy—(The Village song) though also of religious origin, preserved the merinment and licence of a rustis festival, rightly compared in some aspect to a carnival.

বাগ্মী Cicero, Isocratesএর লেখা দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন এবং ইঁহারই মধ্য দিয়া ইয়োরোপের গদ্য সাহিত্যে Isocrates দান যথেষ্ট। Hypercides ও Demosthenes একই যুগের লোক, কিন্তু Demosthenesএর প্রতিভা ও বক্তৃতা শক্তির নিকট Hypercides সর্ব্বপ্রকারে পরাজিত হইতেন। তাঁহার সমসাময়িক ও পরবর্ত্তীকালের লেখকরা তাঁহাকে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বলিয়া সম্মান করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা অন্যায় হয় নাই।

এখন গ্রীক দার্শনিকদের সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিলেই আমাদের আলোচনা শেষ হইবে। প্রাচীন দার্শনিকদিগের মধ্যে Socretes, Plato, Aristotle সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

সক্রেটিশ ভাস্করের পুত্র হইলেও গ্রীক দর্শনের তিনিই জন্মদাতা এবং তিনি যে শ্রেষ্ঠ গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে একজন তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখা কিছু নাই, কারণ তিনি কিছু লিখিতেন না। তাঁহার প্রাত্যাহিক কাজ ছিল এথেন্সের যুবকদের উপদেশ দেওয়া। তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য Platoর লেখা হইতে আমাদের তাঁহাকে বুঝিতে বা জানিতে হইবে। Plato প্রথমে কবিতা লেখা সুরু করেন কিন্তু কুড়ি বৎসর বয়সে সক্রেটিসের সংস্পর্শে আসিয়া দর্শন শাস্ত্র তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সক্রেটিশের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি ছাত্র হিসাবে তাঁহার কাছে বাস করিয়াছিলেন। সক্রেটিশের মৃত্যুর পর তিনি দেশ ভ্রমণে বাহির হ'ন এবং কুড়ি বৎসর পরে গ্রীসে ফিরিয়া আসিয়া প্রচার আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক Aristotle ইঁহার শিষ্য। অল্প বয়সে মাতা-পিতা হারাইয়া Aristotle এথেন্সে আসেন ও Platoর শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। Platoর মৃত্যুর পর তিনি Macedonএ গিয়া Alexander the Greatএর গৃহ শিক্ষক হ'ন। Alexander সিংহাসনে আরোহন করিলে, তিনি এথেন্সে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার লেখা প্রায় সমস্ত বই এই সময়ে লেখা। তারপর নানা রাজনৈতিক কারণে জড়িত হইয়া তিনি বিদেশে পলায়ন করেন ও সেখানেই মারা যান। তিনি দার্শনিক হইলেও—তাঁহার লেখা ইতিহাস, বৈজ্ঞানিক, প্রবন্ধ ও সমালোচনা প্রভৃতিও বেশ উঁচুদরের জিনিষ।

জগতের সাহিত্যে গ্রীক ভাষার দান খুবই বেশী। সেই অতুলনীয় সাহিত্য সম্পদের সামান্য একটু আভাস মাত্র দিলাম প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের সমালোচনা আমি করি নাই, খালি কেমন করিয়া তিলে তিলে দিনে দিনে বিরাট গ্রীক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সম্বন্ধে দু' একটী কথা বলিয়াছি।

গ্রীক সাহিত্য সম্বন্ধে সব কথা বলিতে হইলে যত সময় ও শক্তি দরকার তাহার অভাব বলিয়া এইটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে হইল।

ফরাসী বেহুলা

শুনা যায় মৃত স্বামীকে বাঁচাইবার জন্ম বেহুলা দেবসভায় নৃত্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নৃত্যে সন্তুষ্ট হইয়াই দেবগণ লক্ষীন্দরের প্রাণ দান করিয়াছিলেন। সম্প্রতি প্যারিসের একজন সুপ্রসিদ্ধা সুন্দরী তাঁহার প্রণয়ীর জীবন রক্ষার্থ এক অভিনব নৃত্য করিয়াছেন। এই ব্যাপার লইয়া আথেন্সে ও প্যারিসে খুব হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল।

আথেন্স গ্রীসের কলা-নিকেতন—ইউরোপীয় সভ্যতার জন্মভূমি। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আথেন্সে যে সকল কলাভবন নির্ম্মিত হইয়াছিল—সেগুলি বহুযুগ ধরিয়া সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছে। সম্প্রতি সেগুলি ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রীসের অধিবাসীরা এখনও সেগুলিকে দেবমন্দিরের ন্যায় পবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন। এহেন পবিত্র স্থানে প্যারির সুন্দরী শ্রীমতী মোনা পৈভা যেভাবে নৃত্য করিয়াছিলেন, তাহাতে আথেন্সবাসীরা তাঁহাদের পবিত্র স্থানের অবমাননা হইয়াছে মনে করিয়া শ্রীমতীর উপর বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়েন। তাঁহারা ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট মোনা পৈভার বিরুদ্ধে নালিশ করিন। প্যারিসের লোকে জানিত শ্রীমতী লাজুক প্রকৃতির মেয়ে—তিনি যে অমন নির্লজ্জভাবে গ্রীসের শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি পার্থেনন ভবনের ধ্বংসের উপর নৃত্য করিয়াছেন তাহা শুনিয়া তাঁহারা যারপর নাই বিস্মিত হইলেন। আর তাঁহারা ততোধিক বিস্মিত হইলেন শ্রীমতী কেন নৃত্য করিয়াছেন তাহা শুনিয়া।

শ্রীমতী স্বীকার করেন যে তিনি পার্থেননে নিতান্ত নির্লজ্জার মতন নাচিয়াছিলেন। তিনি গ্রীসে বেড়াইতে গিয়াছিলেন—সঙ্গে ছিলেন তাঁহার সখী শ্রীমতী ডেলিস্। শ্রীমতী মোনা পৈভা নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী আর শ্রীমতী ডেলিস্ খুব ভাল ফটোগ্রাফ তুলিতে পারেন। শ্রীমতী ডেলিসের সখ হইল যে সেকালে গ্রীকেরা যেমন বেশে পার্থেননের ধ্বংসের উপর নৃত্য করিতেন শ্রীমতী মোনা সেইভাবে নৃত্য করেন আর তিনি তাহার ফটো তুলিবেন। শ্রীমতী মোনা এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহারা পার্থেননের অধ্যক্ষের অনুমতি লইলেন যে দুপুর বেলায় যখন পার্থেননের গেট বন্ধ থাকে—সাধারণে প্রবেশ করিতে পায় না তখন তাঁহারা দুই ঘণ্টা কাল প্রত্যহ পার্থেননে থাকিবেন।

ইতিমধ্যে একজন গ্রীক্ শ্রীমতী মোনা পৈভার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইতে লাগিলেন, এমন কি তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কিন্তু শ্রীমতী ইতিপূর্ব্বেই ম্যাক্স

Mlle. Mona Paiva.

ভিলাজি নামে একজন প্যারিসের ভদ্রলোককে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। মোনা পৈভা গ্রীকের প্রণয়ের প্রতিদান দিতে পারিলেন না। গ্রীক্ যুবকের আসক্তির কথা ম্যাক্স ভিলাজির কাণে পৌঁছিল। তিনি আথেন্সে আসিয়া গ্রীকের সহিত ডুয়েল যুদ্ধ করিয়া প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীতার অবসান করিতে চাহিলেন। স্থির হইল যে দুপুর বেলায় লুকাইয়া তাঁহারা পার্থেননে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবেন। যেদিন দুই প্রণয়ী যুদ্ধ করিবার জন্ম পার্থেননে প্রবেশ করিয়াছেন—সেই দিন শ্রীমতী মোনা পৈভা ও ডেলিসও সেখানে নাচের ফটো তুলিবার জন্ম গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীমতীরা জানিতেন না যে প্রণয়ীদ্বয় সেখানে যুদ্ধ করিবার জন্ম আসিয়াছেন।

তাঁহারা পার্থেননের এককোণে ফটো তুলিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। শ্রীমতী মোনাপৈভা সেকালের গ্রীক নর্তকীদের ন্যায় সামান্য মাত্র পাতলা নেটের কয়েকখানি টুকরা পরিয়াছিলেন। তাঁহাকে ঠিক একটি প্রজাপতির ন্যায় দেখাইতেছিল। তিনি যখন তালে তালে নাচিতেছিলেন, তখন হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি পড়িল দুই প্রণয়ীর তরবারি যুদ্ধের প্রতি। গ্রীক্ যুবক তাঁহার দিকে মুখ করিয়া শাণিত তরবারী হস্তে যুদ্ধ করিতেছিলেন আর যাঁহাকে শ্রীমতী যথার্থ ভালবাসিতেন তিনি শ্রীমতীর দিকে পিছন দিয়াছিলেন।

শ্রীমতী দেখিতে পাইলেন যে তাঁহার প্যারিসের প্রণয়ী যুদ্ধে তেমন আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহা দেখিয়া শ্রীমতী যেন হতভম্ব হইয়া গেলেন। তাঁহারই চোখের সামনে তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামী নিহত হইবেন ভাবিতেই তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। কিন্তু প্রত্যুৎপন্ন মতি ছিল তাঁহার অসাধারণ। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামীর জীবন রক্ষার উপায় ঠিক করিলেন।

শ্রীমতী মোনা পৈভা ধীরে—অতি ধীরে নাচিতে লাগিলেন। কোন শব্দ শুনিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামী পিছন ফিরিয়া তাকাইলে সেই অবসরে গ্রীক যুবক তাঁহাকে নিহত করে এই ভয়ে তিনি অতি মৃদু পদক্ষেপে তালে তালে নাচিতে লাগিলেন। গ্রীক্ যুবক তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন। এখন তরবারি যুদ্ধের মধ্যেও চকিত দৃষ্টিতে ক্ষণে ক্ষণে মোনাপৈভার নৃত্য দেখিয়া লইতে লাগিলেন। কিন্তু যুদ্ধের প্রতি তিনি অনবধান হইলেন না। শ্রীমতী দেখিলেন তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়—তাঁহার ভবিষ্যৎ স্বামীর বুঝি প্রাণরক্ষা হয় না। তখন তিনি নাচের তালে তালে তাঁহার পরিধানের নেটের টুকুরা একে একে ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। একে তিনি অপূর্ব্ব সুন্দরী—গ্রীসের মনোরম শরৎকালের উজ্জ্বল অপরাহ্নে তাঁহার নৃত্য—আবার ততোধিক তাঁহার নগ্ন সৌন্দর্য্যের লাস্য।

বেচারা গ্রীক এই ত্র্যহস্পর্শের মোহ আর কাটাইতে পারিল না। সে কামবিহ্বল চিত্তে শ্রীমতীর প্রতি সতৃষ্ণ ভাবে যেই তাকাইল—অমনি তাহার অসাবধানতার সুযোগে ম্যাক্সভিলাজি তাঁহাকে আহত করিলেন। তখন শ্রীমতীর সখী দৌড়াইয়া যাইয়া শ্রীমতীর পথে বাহির হইবার পোষাক লইয়া আসিলেন। শ্রীমতী তাড়াতাড়ি তাহা পরিধান করিয়া আহত গ্রীকের শুশ্রূষার জন্য সখার সহিত চলিলেন। যে নেটের টুকুরা নৃত্যকালে তিনি একে একে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেইগুলিই কুড়াইয়া আহত ব্যক্তির ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিলেন। গ্রীক্ যুবকের আঘাত গুরুতর হয় নাই।

ব্যাপারটার এইখানেই যবনিকাপাত হইত, কিন্তু শ্রীমতী যখন ঐরূপ ভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, তখন সহসা পথের কয়েকটী লোক দেখিতে পায়। তাহারাই খবরের কাগজে হৈচৈ করিয়া শ্রীমতীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে। ফরাসী সরকার অবশ্য শ্রীমতীর এই উত্তর শুনিয়া বুঝিতে পারেন যে শ্রীমতী নিজের প্রণয়ীর জীবন রক্ষার জন্যই দায়ে পড়িয়া নগ্ন নৃত্য করিয়াছিলেন—গ্রীসের পবিত্র মন্দিরকে কলুষিত করিবার কোন সংকল্প তাঁহার ছিল না। এই ঘটনার অতি অল্পকাল পরেই মোনাপৈভার সহিত ম্যাক্সভিলজির বিবাহ হইয়াছে।

শ্রীমতী মোনাপৈভার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের তারিফ করিলেও আমরা তাঁহার নির্লজ্জ ব্যবহার ও অপরের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিবার চেষ্টাকে সমর্থন করিতে পারি না।

নির্য্যাতিতা

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

অভাগিনী বোনগুলি মোর,
এতদূরে থাকি শুনে তোদের দুর্দ্দশা হায়
বয়ে যায় মোর আঁখিলোর।
রমণীর সারধন হারাইয়া কেমনেতে
দেখাইবি মুখ আর তোরা বল এ জগতে,
তাই ভেবে আঁখিজল ফেলছিস অবিরল,
জীবন দারুণ বোঝা প্রায়,
ভাবছিস—লুকাবি কোথায় ?

এ তোদের দোষ নয় ভাই।
দোষ এ দেশের হায়, যারা আজও বেঁচে আছে
তাহাদের দিকে আজ চাই।
এদের দুর্ব্বল বাহু, বুকেতে সাহস নাই,
পদে পদে নারী আজ নির্য্যাতিতা হয় তাই ;
পরে করে অপমান তাও সয়ে থাকে প্রাণ,
হায় তাহা জানাবে কাহারে—
তোরা নোস দোষী এ সংসারে॥

হিন্দু আজও আছে চুপ করে ;
জাগে নি বুকের মাঝে তীব্র অগ্নি,—তার দাহ,
হিন্দু জাতি গেছে বুঝি মরে।
মায়ের বুকের দুধ কখনও করেনি পান,
তা হলে কি সে মায়ের রাখিত না আজ মান ?
পায়নি মায়ের স্নেহ বক্ষমাঝে অহোরহ,
তাই বুঝি এখনও ঘুমায়,
সেই হিন্দু,—সে আজি কোথায় ?

এই কি সে খ্যাত হিন্দুবীর,—
যাহাদের বীরত্বের আলো গেছে দেশে দেশে ?
আজ সে যে শান্ত, নম্র ধীর।
পূত্রশৌর্য্যে ছিল যার হৃদয় সাহসে ভরা,
আজ সে সাহস নাই, আজ যে সে জাতি মরা,
ম্লেচ্ছ আজি অবহেলে সতীধর্ম্মে পায় দলে
পুত্রের সম্মুখ দিয়া যায়,
হিন্দু কোথা,—হিন্দু যে ঘুমায়।

কাঁদো বোন, কর হাহাকার ;
নাই তোমাদের কেহ রক্ষিতে গো বাংলাতে
হিন্দুর সে তেজ নাই আর।
এই সেই হিন্দুবীর, এই সেই পুণ্য দেশ ?
বিশ্বাস নাহিকো হয়,—মানুষ হয়েছে মেষ ;
শান্তিসুখ এরা চায়, মা বোনের ধর্ম্ম যায়
দেখিয়াও তবু আছে স্থির—
বিশ্বজয়ী সেই হিন্দুবীর।

হায় প্রভু, কতকাল আর,
নারীরে সহিতে হবে এমনই অপমান
করিবে সে শুধু হাহাকার ?
উঠিবে মায়ের ছেলে কোনদিন বল হেথা
ঘুচাতে করিবে যত্ন জননী জাতির ব্যথা ;
যতদিন নাহি উঠে বিধাতার পায়ে লুঠে
কাঁদ নারী, বেদনা জানাও,
কেঁদে তুমি সবারে জাগাও।

মায়া-মৃগ

[শ্রীমতী মঞ্জরী দেবী]

— এক —

সুপ্তি-মগনা নিশীথিনীর বুক কাঁপিয়ে ঝরা-পাতার বিদায়-মর্ম্মর শোনা যাচ্ছিল···

রুগ্না স্ত্রীর পাশে বিজয় স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিল। তার দীর্ঘ রুক্ষ চুলগুলো এলোমেলো, চোখদুটো রাত-জাগার দরুণ ঈষৎ আরক্ত আর দীপ্তিহীন মুখে শীতের আকাশের মত একটা দারুণ উদ্বেগ-শঙ্কার ম্লানিমা মাখা।

বিছানার ওপর একটী রোগ শীর্ণা তরুণীর অবসন্ন দেহ-লতাটী গতদিনের বাসি রজনীগন্ধার গুচ্ছের মত লুটিয়ে পড়েছিল। তার মেঘলা-রাতের জ্যোৎস্নার মত পাণ্ডুর মুখের পরে দৃষ্টিস্থাপন ক'রে বিজয় ভাবছিল···সত্যিই তার ইন্দু যদি তাকে ছেড়ে চলে যায়, তা হ'লে কি করে সে একলা জীবন কাটাবে?···তার বিদ্রোহী হৃদয় নিষ্ঠুর নিয়তির উদ্দেশ্যে বলে উঠল—না, না—ইন্দুকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে দেব না···কিন্তু পরক্ষণেই ডাক্তারের মেঘ-গম্ভীর কণ্ঠের কথাগুলো রক্ত-পিপাসী দানবের বিকট অট্টহাস্যের মত ব্যঙ্গ করে উঠল—আশা নেই!......

সহসা ইন্দু চোখ মেলে ক্ষীণস্বরে ডাকল—"ওগো—"

তার চন্দ্রকলার মত ছোট কপালখানির ওপর থেকে চূর্ণ-কুন্তলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে বিজয় স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বলল—"কি বলচ ইন্দু?"

"শিওরের জানলাটা খুলে দাও না গো—শেষ বারের মত চাঁদের আলো দেখে নিই—"

বিজয় বাতির শিখাটা মৃদু করে দিয়ে জানলাটা খুলে দিতেই এক ঝলক্ শুভ্র জ্যোৎস্না বিছানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দু বলল—"দেখ দিকি, এমন সুন্দর জ্যোৎস্নাকে তুমি এতক্ষণ ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে!"

তারপর গোধুলির আলোর মত করুণ হেসে বলল—"দেখ আমি যদি মরি, তাতে দুঃখ নেই,—কিন্তু তুমি যে ভারি কষ্ট পাবে—তুমি যে আমায় ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পার না—"

বাধা দিয়ে বিজয় ম্লানস্বরে বলল—"ওসব কথা কেন বলচ ইন্দু?"

"তুমি এমন আপন-ভোলা মানুষ, যে কেবলই ভাবনা হচ্চে···আমি মরে গেলে তোমায় যত্ন করবে কে? কে তোমার টেবিল রোজ গুছিয়ে দেবে, খেতে বসলে পাখা নিয়ে কে বাতাস করবে?...লক্ষীটি নিজের শরীরের ওপর একটুও অবহেলা, অযত্ন করবে না, বল—নইলে মরণের পরেও আমি শান্তি পাব না—"

কিছুক্ষণ মমতা-কোমল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের পানে চেয়ে ইন্দু বলল—"কি বিশ্রী শুকনো চেহারা হয়েছে তোমার! রাত জেগে চোখের কোলে কালি পড়েচে, মুখের সে লাবণ্য ঝরে গ্যাচে...কাল থেকে কিছুতেই তোমায় এই অন্ধকার ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে দেবনা···শুধু আমার জন্যেই তোমার এত কষ্ট! কবে যে তোমায় মুক্তি দেব তা জানি নে—"

আহত স্বরে বিজয় বলে উঠল—"আমায় ব্যথা দিতে তোমার ভাল লাগে ইন্দু?" তার চোখের কূল ছাপিয়ে অশ্রু-বর্ষার ধারা নেমে এল।

ইন্দু তাড়াতাড়ি তার শীর্ণ দু'খানি করপুটের মধ্যে বিজয়ের একখানা হাত ধরে বলে উঠল—"ছি, ওকি?... তোমার চোখের জল আমি যে সইতে পারিনে! তোমার পায়ে মাথা রেখে মরতে পাব, এত আমার সৌভাগ্য আমার মত অভাগীর হবে কি? আচ্ছা থাক্ ও সব কথা। আঃ, কি ঠাণ্ডা তোমার এই সেবা-নিপুণ হাতের পরশটুকু! তোমার এত স্নেহ-আদর ছেড়ে আমার কিন্তু মরতেও সাধ হয় না—"

পাশের ঘরে বুঝি বা স্বপ্নের ঘোরে খোকন হঠাৎ 'মা মা'

বলে কেঁদে উঠল। ইন্দুর কানে তার কান্না বাজতেই, সে ব্যস্ত হ'য়ে স্বামীকে বলল—"মুকুলকে একবার এখানে নিয়ে এস না গো—বড় দেখতে ইচ্ছে হচ্চে—"

"আচ্ছা নিয়ে আসছি"—বলে বিজয় উঠে পাশের ঘরে গেল। পালঙ্কের উপর শুভ্র বিছানায় চ্যুত মুকুলটীর মত মুকুল অকাতরে ঘুমোচ্ছিল ; বিজয় অতি সন্তর্পনে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে কোলে তুলে ইন্দুর কাছে নিয়ে এল।

অস্ফুট ফুল-কলির পরে জ্যোৎস্না পড়লে যেমন সুন্দর দেখায়, মুকুলের কচি মুখখানি চাঁদের কিরণে তেমনি অপরূপ দেখাচ্ছিল। ইন্দু নিমেষহারা চোখে চেয়ে রইল সন্তানের মুখের পানে···মরণ সাগরের পরপার হ'তে যেদিন তার ডাক আসবে, সেদিন সে এ মুখ আর দেখতে পাবে না···তার সজল দুটী চোখে অতৃপ্তির ব্যথা!

খানিকক্ষণ পরে ইন্দু বলল—"এইবার ওকে শুইয়ে রেখে এসো—আর লখিয়ার মাকে বল, খোঁকা কাঁদলে যেন বাতাস করে—"

* * * *

শেষ রাত্রির দিকে বিজয়ের জাগরণ-ক্লান্ত চোখের পাতা-দুটো তন্দ্রার মৃদু আবেশে বুজে এসেছিল। সহসা সে চকিত হ'য়ে উঠল ইন্দুর কাতর ডাকে—"ওগো বুকটা কেমন করচে যে!"

উৎকন্ঠিত স্বরে সে জিগ্যেস করল—"কি কষ্ট হচ্চে ইন্দু?"

"নিঃশ্বাসটা—কেমন বন্ধ—হয়ে...আস্‌চে—"

বিজয় ক্ষিপ্রহস্তে একটা শিশি থেকে কাঁচের গেলাসে একদাগ ওষুধ ঢেলে ইন্দুর মুখের কাছে ধরে বলল—"এটুকু খেয়ে ফেল তো—"

রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে থেমে থেমে ইন্দু বলতে লাগল···"আর কেন ওষুধ দিচ্ছ গো...আজ যে আমার মুক্তির ডাক এসেচে··· আমায় যে যেতেই হবে···তোমার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দাও···মুকুল···রইল তাকে···মানুষ করে···তুলো··· আর...মাগো..."

অস্বাভাবিক বিকৃত কণ্ঠে বিজয় চীৎকার করে উঠল— "রঘুয়া জলদি ডাক্তার বাবুকো বোলাও—আভি যাও—"

কিন্তু ততক্ষণে ইন্দুর তুহীণ শীতল ওষ্ঠ প্রান্তে পরিপূর্ণ তৃপ্তির প্রসন্ন হাসিটুকু ফুটে উঠেচে...

—দুই—

একটা 'সোফায়' এলিয়ে পড়ে বিজয় পুরোণো স্মৃতির পৃষ্ঠাগুলো উল্টে দেখছিল।

গৃহ-লক্ষ্মীর কল্যাণশ্রীটুকু হারিয়ে নিস্তব্ধ শোকাতুর বাড়ীখানা যেন মৌন হাহাকার করছিল। বাড়ীর প্রত্যেকটী জিনিষ ইন্দুর স্মৃতির সৌরভে ভরপুর হ'য়ে আছে! ঘরের মর্ম্মর-পাথরের বুকে ইন্দুর রক্ত-চরণের অলক্তক-রাগ এখনও আঁকা আছে—আল্‌নার ওপর তার ময়ূর-কণ্ঠি শাড়ীখানি তেমনি কোঁচান রয়েছে—'ড্রেসিং টেবিলের' ওপর তার মাথার অনাদৃত কাঁটা ফিতে মুখ গুঁজে কাঁদছে—তারা আর ইন্দুর শ্রাবণ আকাশের মত ঘন-কালো কেশের কোমল পরশ পায় না...মুকুরের স্বচ্ছ বুকে আর তার ফুল্ল মুখের ছায়াপাত হয় না!

টেবিলের ওপর থেকে ইন্দুর নীল-সিল্কে-বাঁধানো সুদৃশ্য গানের খাতাখানি বিজয় কোলের পরে টেনে নিল ; দু'একটী পৃষ্ঠা উল্টাতেই তার হাতের মুক্তামালার মত সুন্দর নিটোল অক্ষরগুলি জলজল্ করে উঠল।

বিজয় থেকে থেকে চমকে ওঠে—ওই বুঝি ইন্দুর কর্ম্ম-রত হাতের চুড়িগুলি মৃদু রুনুঝুনু গেয়ে উঠল, তার চটুল হাসি সেতার-ঝঙ্কারের মত বাতাসে কেঁপে উঠল! হায়, সব ভুল— যে চলে গেছে, সে আর ফিরে আসে না—শুধু দমকা শূন্য ঘরে আর্ত্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলে যায়—সে নেই—সে নেই......

তাদের যুগল ফটোখানার দিকে বিজয়ের নজর পড়ল— ফুলশয্যার দিন এখানি তোলান হ'য়েছিল। নব-বধু ইন্দুর মুখে সলাজ হাসির আভাষটী কি সুন্দর সুষমাময় হ'য়ে ফুটে উঠেছে!

সে রাতটী তার স্মৃতির সাজিতে একটী অম্লান গোলাপের মত সাজানো রয়েছে...

উৎসব শেষে যখন নিমন্ত্রিতেরা একে একে বিদায় গ্রহণ করল, সমস্ত কল-কোলাহল স্তিমিত হ'য়ে এল—সেই সময় জ্যোৎস্না-বিবশা রজনীর মত রূপের লহরী তুলে ইন্দু লাজ-

অলস চরণে ঘরে এল। ইন্দুর কবরীতে-জড়ান যুঁইফুলের 'গোড়ের' গন্ধের সঙ্গে বিছানায়-ছড়ান চাঁপার মদির সৌরভ মিশে বিজয়কে মাতাল করে তুলেছিল। তার মনে পড়ল, সেই রাতে সে ইন্দুকে এক নিমেষের তরেও চোখের পাতা বুজতে দেয় নি—সারারাত ধরে তার যৌবন-চঞ্চল প্রাণের গল্প ইন্দুর কানে কানে গুঞ্জন করেছিল।

বিজয়ের বিরহ-তপ্ত বুক ঠেলে একটা করুণ বিলাপ বেরিয়ে এল—"কোথায় চলে গেলে রাণু আমার!"

প্রথম যৌবনে তারা দুটীতে মিলে যে রঙিন স্বপ্নপুরী রচনা করেছিল, আজ তা' ধুলোয় মিশিয়ে গেছে বিচ্ছেদের কঠিন আঘাতে! তপ্ত মরু-পথের ওপর দিয়ে তাকে একলা নিঃসঙ্গ জীবনের বোঝা টেনে নিয়ে চলতে হবে—কে জানে কবে তার এই ক্লান্তিকর পথ-চলার অবসান হবে—কবে সে চির-মিলনের ছায়া-স্নিগ্ধ রাজ্যে গিয়ে পৌঁছবে, যেখানে ইন্দু দুটী ব্যাকুল বাহু বাড়িয়ে বসে আছে তারই প্রতীক্ষায়!

এম্‌নি সময় দুরন্ত ফাগুন হাওয়ায় উচ্ছ্বাসের মত মুকুল দৌড়ে এসে ডাক্‌ল—"বাবা—"

দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে তাকে কোলের কাছে টেনে এনে বিজয় বলল—"কি বাবা?"

মার অসুখ কি এখনও ভাল হয় নি বাবা? লখিয়ার মা বলল—মা তাই মামার বাড়ী চলে গেছে—কবে আসবে?"

কথাগুলো শাণিত ছুরির মত বিজয়ের প্রাণে বিঁধল। মুকুলকে আদর করতে করতে সে বল্‌ল—"অসুখ সেরে গেলেই আসবে মাণিক—"

"না, তুমি এক্ষুনি মাকে নিয়ে এস...মাকে বোলো যে খোকন বড্ড রাগ করছে—কেন তুমি লুকিয়ে চলে গেলে?" অভিমানে মুকুলের ডাগর চোখ দুটী ছলছল্ করে এল, তার গোলাপ-পাপ্‌ড়ির মত টুক্‌টুকে ঠোঁট দুখানি কেঁপে কেঁপে উঠল।

বিজয়ের বেদনা-বিধুর প্রাণটা হা হা করে উঠল—ওরে মা হারা স্নেহ-কাঙাল শিশু......

– তিন—

বৃষ্টি ধোওয়া রোদের সোনালি-আভাটুকু রান্নাঘরের সুমুখে রকটার ওপর এসে পড়েছিল। সেইখানে একটী শ্যাম-কান্তি তরুণী একপিঠ সদ্য-স্নান-সিক্ত চুল এলিয়ে বসে বসে কুট্‌নো কুট্‌ছিল। আর মাঝে মাঝে রন্ধন-রত ঠাকুরের সঙ্গে রান্নার সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলছিল।

টং টং করে দশটা বাজার শব্দ শোনা গেল। তরুণী একবার ডাকল—"লখিয়ার মা—অ লখিয়ার মা—"

"যাই মা—" বলে লখিয়ার মা এসে উপস্থিত হোল।

তরুণী বললে—"মুকুল বাইরে পড়চে বুঝি? ওকে ডেকে আনো, চান করবে—বেলা হ'য়ে গেছে—"

লখিয়ার মা মুকুলের সন্ধানে চলে গেল এবং একটু পরেই মুকুলকে ডেকে নিয়ে এল।

তরুণী মুকুলের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌ল—"হাাগা মুকুল বাবু, আজ কি চান করতে হবে না? বেলা হ'ল যে! ভাঁড়ার ঘর থেকে তেলের বাটীটা নিয়ে এস তো লখিয়ার মা—"

মুকুল বিরক্তি-বিরস মুখে বল্‌ল—"আমি তোমার কাছে নাইব না।"

তরুণী আদর-মাখা সুরে বল্‌ল—"আমি খুব ভাল করে তোমায় নাইয়ে দেবো সোনা—এস তেল মাখিয়ে দি—"

প্রবল ভাবে ঘাড় নেড়ে আপত্তি জানিয়ে মুকুল বল্‌ল—"না, আমি লখিয়ার মা'র কাছে নাইবো—"

তরুণী ক্ষুব্ধস্বরে লখিয়ার মাকে বল্‌ল—"আচ্ছা, তুমিই ওকে নাইয়ে দাওগে।"

সে এক আষাঢ়ের বাদল-ঝরা সন্ধ্যায় বিজয় মালতীকে বিয়ে ক'রে এনেছিল। নব-বধূকে বরণ করতে মঙ্গল-শঙ্খ বেজে উঠল না।

মালতী ধনীর ঘরে জন্মগ্রহণ করবার সৌভাগ্য-লাভ করে নি; ষাট টাকা মাহিনার দরিদ্র কেরাণীর সংসারে এই উনিশ বছরের শ্যামা মেয়েটী ভার-স্বরূপ হ'য়ে পড়েছিল। বিজয় কেরাণী-পিতাকে কন্যাদায় হ'তে অব্যাহতি দিয়ে মালতীকে বিয়ে করে নিয়ে এল—তার শ্রীহীন, বিশৃঙ্খল সংসারের মাঝখানে।

প্রথম পক্ষের শোকোচ্ছ্বাসের এই অভাবনীয় পরিণতিতে বন্ধু-বান্ধবের ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের চাপা হাসি ফুটে উঠল,

আত্মীয়-স্বজন সখেদে বলাবলি করলেন—"এখনও ছ'টা মাস কাটল না, এরি মধ্যেই..."

কিন্তু বিজয়ের অন্তরের আসল পরিচয় পেতে মালতীর দেরী হয় নি। যেদিন সে বুঝল, বিজয়ের স্মৃতি-মন্দিরে শুধু ইন্দুর প্রতিমাখানি বিরাজ করছে, সেখানে অন্য প্রতিমার প্রতিষ্ঠা হওয়া অসম্ভব—সেদিন তার যৌবন-কুঞ্জের ফুল-সম্ভার বৃথাই শুখিয়ে ঝরে গেল...কিন্তু নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ দাবী হারিয়েও সে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে মনে মনে শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের কুসুমাঞ্জলি নিবেদন করত। নিত্য নব-পুষ্পের মধু-পান করতে যারা চায়, তারা তো প্রকৃত প্রেমিক নয় ; প্রকৃত প্রেমিকের হৃদয়ে প্রেমের শিখাটী মিলনে যেম্‌নি উজ্জ্বল হ'য়ে থাকে, বিচ্ছেদেও তেম্‌নি তার দীপ্তি এতটুকুও ম্লান হ'য়ে যায় না।

সংসারের নিতান্ত তুচ্ছ খুঁটি-নাটি কাজ-কর্ম্মের মধ্যে মালতী আপনার দীনতা গোপন করবার চেষ্টা করে। ব্যর্থতাকে সে নীরবে বরণ করে নিয়েছে।

বিয়ের পরদিন বিজয় মালতীকে বলেছিল—"তোমায় পরিপূর্ণ ভাবে স্ত্রীর মর্য্যাদা দিতে পারি নি বলে হয়তো ক্ষমা চাইবার অধিকারটুকুও আমি হারিয়েছি ; কিন্তু আমি তোমাকে আমার সংসারে এনেছি শুধু মা-হারা, স্নেহ-বঞ্চিত মুকুলের জন্যে—তুমি তোমার মাতৃত্বের সুধা দিয়ে মুকুলের সে তৃষ্ণা মেটাও! জানি আমি, নিতান্ত স্বার্থপরের মত কথা এ—কিন্তু তুমি নারী..."

সেদিন এই স্বামী-প্রেম-বঞ্চিতার অন্তরে মাতৃত্বের উন্মেষের সঙ্গে কচি সুরে 'মা—' ডাক শোনবার একটা ব্যগ্র ক্ষুধা জেগে উঠল। সে ভাবল বিজন বনের এই অস্ফুট মুকুলটীকে স্নেহ-সিঞ্চনে ফুটিয়ে তুলে মাতৃত্ব গৌরবে তার নারী জীবনের সার্থক করে তুলবে।

কিন্তু মালতী যতই মুকুলকে তার তৃষিত বুকে চেপে ধরবার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, মুকুল ততই মায়া মৃগের মত দূরে সরে যায়। অভিমানী মুকুল অপরিচিতা মালতীকে তার মায়ের স্থানটী দখল করতে দেখে, তার ওপর অপ্রসন্ন, বিমুখ হ'য়ে উঠেছিল।

* * * *

সেদিন কর্ম্মহীন নিরালা দুপুরবেলায় মালতী চুপটি করে জানলার ধারে বসেছিল। সহরের কর্ম্ম-কোলাহল নীরব তন্দ্রার মাঝে ডুবে গিয়েছিল, গলির মোড়ে পসারীর ক্লান্ত-অলস ডাকটী উদাস হ'য়ে উঠছিল।

কে জানে কেন, দুপুরের এই স্তব্ধতার মাঝে মালতীর আজ নিজেকে বড় একা বোধ হচ্ছিল। ব্যর্থতার বোঝা যেন পাষাণের মত দুর্ব্বহ ভার নিয়ে তার অতৃপ্ত বুকের মাঝখানে চেপে বসেছিল...সে হঠাৎ উঠে গিয়ে মুকুলকে তার ঘরে ধরে নিয়ে এল। তার নবনী-কোমল দেহখানি বুকে জড়িয়ে ধরে মালতীর প্রাণ এক অপূর্ব্ব সিগ্ধতায় জুড়িয়ে গেল! তাকে কোলে বসিয়ে, তার পদ্মকলির মত সুন্দর মুখখানা চুমোয় চুমোয় রাঙিয়ে দিয়ে সে আগ্রহান্বিতকণ্ঠে বলল—"একটীবার আমায় মা বলে ডাক তো মাণিক—"

বিস্ময়ে চোখদুটী ডাগর করে মুকুল বলল—"বারে, তোমায় কেন মা বলব? আমার মা তো মামার বাড়ী গেছে—"

স্নেহ-স্নিগ্ধ নয়নে তার মুখের পানে চেয়ে মালতী বলল—"বোকা ছেলে, আমিও যে তোর মা হই—"

কিন্তু মালতীর উচ্ছ্বসিত স্নেহকে উপেক্ষা ক'রে মুকুল ইন্দুর ফটোখানার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলে উঠল—"ওই যে আমার মা! আমায় ছেড়ে দাও—আমি যাই—"

ব্যথাহতা মালতীর বাহু-বন্ধন শিথিল হ'য়ে এল, তার বুকের মাঝে দীর্ঘশ্বাসের ঘন-অন্ধকার ঘনিয়ে এল...ওরে নিঠুর মায়ামৃগ—ওরে অবুঝ শিশু! তোর মা কি আমার চেয়ে তোকে বেশী ভালবাসত?...

—চার—

প্রবল জ্বরে অচেতন মুকুলের মাথায় বরফের ব্যাগটা ধরে মালতী মূর্ত্তিমতী সেবার মত তার শিয়রে বসেছিল! মুকুলের রোগ-ম্লান মুখে বেলা-শেষের আলোর মত পাণ্ডুরতা মাখা।

বিছানার পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর কতকগুলো ওষুধের শিশি, একটা কাঁচের 'মেজার গ্লাস', একটা প্লেটে কয়েকটী আঙুর আর আধখানা বেদানা—এইসব সাজানো

রয়েছে। অদূরে একটা চেয়ারে একজন প্রৌঢ় ডাক্তার মনোযোগ দিয়ে রোগীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করছিলেন

বিছানার একপাশে বিজয় একহাতে কপালটা টিপে ধরে বসেছিল। ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্ত জাহাজের মত বিশৃঙ্খল তার চেহারা, চোখদুটো রক্ত-জবার মত লাল। একটা গম্ভীর স্তব্ধতা অসহ্য পাষাণ-ভারের মত ঘরের মধ্যে বিরাজ করছিল।

সহসা সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে বিজয় ভগ্নস্বরে জিগ্যেস করল --"কেমন বুঝছেন ডাক্তারবাবু? আশা আছে কিছু?"

ডাক্তার বল্লেন—"দেখুন, 'টাইফয়েড পেসেণ্টের' সম্বন্ধে কিছুই স্থির করে বলা যায় না—তবে 'কেশটা' বিশেষ শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—"

ডাক্তারের একখানা হাত চেপে ধরে বিজয় মিনতি-ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠল—"মুকুলকে বাঁচিয়ে দিন ডাক্তারবাবু—ও আমার একটী মাত্র সন্তান—"

স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্বরে ডাক্তার বল্লেন—"হতাশ হবেন না, আমার যথাসাধ্য আমি তো করছি—তারপর ভগবানের হাত—"

মালতী মুকুলের গায়ে হাত দিতেই আগুনের মত অসহ্য উত্তাপে তার হাতখানি যেন পুড়ে গেল। এ ক'দিনই মালতী বিনিদ্র চোখে মুকুলের রোগ-শয্যার পাশে বসে অক্লান্ত শুশ্রূষা করছে; তার কল্যাণ পরশ-মাখা করযুগ নিরন্তর উন্মুখ হ'য়ে মুকুলেরই সেবার প্রতীক্ষায়।

কিন্তু অপরাহ্নের দিকে রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ মন্দের পথে অগ্রসর হ'তে লাগল। অস্ফুট স্বরে সে মাঝে মাঝে প্রলাপ বক্‌তে সুরু করল—"আঃ, মাকে নিয়ে এলে না কেন বাবা?...মার অসুখ কি এখনও ভাল হয় নি?...বাঃ, কি সুন্দর আলো! বাবা দেখ, দেখ...মা আমায় কোলে নিতে এসেচে..."

মুকুল আর ফুটল না—নিয়তির বিষাক্ত পরশে এই নীরব সন্ধ্যার আঁধারে শুখিয়ে ঝরে পড়ল...

পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যারতির শিখাটী তখন ম্লান হ'য়ে এসেছে, সেই সময় ডাক্তারের মুখের ওপর মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত একটা বিষণ্ণ ছায়া নেমে এল। ডাক্তারের মুখের পানে চেয়ে বিজয়ের প্রাণে অমঙ্গল আশঙ্কায় বিদ্যুৎ খেলে গেল ..উন্মাদের মত সে মুকুলের কুসুম-পেলব দেহখানি বুকে আঁকড়ে ধরে দেখল—সে হিম-শীতল বুকের তলে প্রাণের স্পন্দন চিরতরে নীরব হ'য়ে গেছে!...বুক ফাটা স্বরে সে আর্ত্তনাদ করে উঠল—"মুকুল—চলে গেলি মাণিক আমার—"

শরাহতা পাখীর মত মালতী মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়ল —আর বিজয়ের অশ্রুহীন চোখ থেকে অনল অগ্নিদীপ্তি ঠিক্‌রে বেরোচ্ছিল...

দিনের আলোয় যে মায়ামৃগকে মালতী ধরতে পারে নি, রাতের তিমির-যবনিকার আড়ালে সে চিরতরে লুকিয়ে পড়ল...
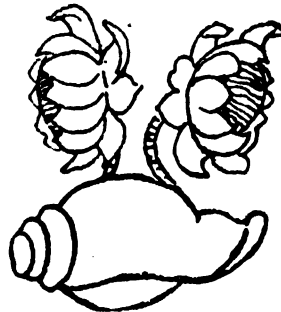
নবযুগের আহ্বান

(বড় গল্প)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

অমলের ডাকাডাকিতে মোহাম্মদ ফজলুল হক বাহির হইয়া প্রসন্ন মুখে বলিলেন—"কি হ'লো অমল।"

"বলব, না কাজে দেখাবো আগে বলুন ?"

"শোনার চেয়ে কাজটাই দেখি।"

অমল অগ্রসর হইয়া মানস ও রাবেয়ার যুগ্ম হাত ধরিয়া টানিয়া হাসিয়া বলিল—"দাদাভাই আপনার স্নেহের রাবেয়াকে আমরা নিলুম। মানস রাবেয়া আমার ভগ্নী... আমি আমার ভগ্নীকে তোমাকে দিয়ে দিলাম একেবারে—আর রাবেয়ার প'রে আমার বা দাদাভা'য়ের কোন দাবী রইল না। দাদাভাই আজ ফাল্গুনের পৌর্ণমাসী তিথিতে দুটি তৃষাতুর প্রাণ সম্মিলিত করে দিলাম ; এখন ঘটক বিদায় করতে আপনাকে হবে।"

মানস ও রাবেয়া একসঙ্গে অস্ফুটকণ্ঠে বলিল—"একি করলেন অমলদা ?"

অমল স্নিগ্ধ ভাবে হাসিয়া বলিল—"কিছু অন্যায় কাজ করিনি ভাই...যে কাজটা তোমরা অর্দ্ধসমাপ্ত করে রাখছিলে আজ আমি তা শেষ করে দিলাম - প্রার্থনা করি তোমরা ঈশ্বরের চরণ প্রান্তে দুটি নির্ম্মল কুসুমের মত চিরদিন অমলিন ভাবে ফুটে, সারা জগতটা স্নিগ্ধ সুবাসে মাতাও···কিন্তু রাবেয়া আমাকে এখন চারটি ভাত রেধে দিতে হবে, আমি খেয়েই খুলনায় যাব।"

কৃতজ্ঞ ভাবে রাবেয়া বলিল "অমলদা, আপনি আমার হাতে ভাত খাবেন – আমি যে মুসলমানী—"

অমল হাসিয়া বলিল—"কে বললে, তুমি আমার ভগ্নী, তুমি মানসের সহধর্ম্মিণী—তুমি অন্নপূর্ণা, তোমার হাতে খেলে আমার জাত যাবে না ভয় নেই...সেটা এত ক্ষণভঙ্গুর নয়। অন্নপূর্ণার দ্বারে আজ অতিথি এসেছে রাবেয়া, কি কর্ব্বে, তাকে বিমুখ কর্ব্বে ? তাহলে বল চলে যাই।"

"সে সাধ্য আমার নয়—আসুন দাদা।" রাবেয়া ধীর পদে রন্ধনের যোগাড় করিতে চলিয়া গেল।"

ফজলুল হক উচ্ছ্বাস ভরে গদগদ ভাবে বলিলেন—"অমল, তুই ঘটক বিদায় চাইলি, কিন্তু তোর মত ঘটককে উপযুক্ত সম্মান দিয়ে বিদায় করবার মত জিনিষ আমার নেই, আছে এই বুড়োর মুক্ত প্রাণটা, নে ভাই তাই নে তোরা দুজনে, রাবেয়াকে ঠাঁই দিয়েছিস্—আমাকেও একটু আশ্রয় দে।" ফজলুল হকের স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ অমল ও মানস নীরবে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

(২৩)

বাটীর একমাত্র চাকর মধুর সাহায্যে পিতার মৃতদেহ বহন করিয়া যখন অলকা নদীর তীরস্থ শ্মশান ঘাটে আসিয়া ডোরোথি উপস্থিত করিল—তখন ক্লান্ত দিবা অসিত অবগুণ্ঠন টানিয়া পৃথিবীর চারিপাশে ঘন প্রহেলিকাচ্ছন্ন কুহেলী জাল রচনা করিতেছিল। মুখাগ্নি সম্পন্ন করিয়া নদীতটে চলোর্ম্মির ন্যায় হাহাকার করিয়া লুটাইয়া পড়িল। কতক্ষণ এমনিই কাটিয়া গেল। কিয়ৎকাল পরে ঝটিকা প্রবাহের পর সংক্ষুব্ধা প্রকৃতির ন্যায় বিধ্বস্ত হৃদয়ে ডোরোথি উঠিয়া বসিল। সম্মুখে প্রজ্জ্বলিত হুতাশন প্রতিকূল বাতাসে লকলক শিখা বাহির করিয়া সম্মুখবর্ত্তিনী ডোরোথির সমস্ত অঙ্গ ঝলসাইয়া দিতেছিল। সেই চিতানলের পার্শ্বে ডোরোথি উভয় করে গণ্ড স্থাপনা করিয়া বসিয়াছিল। তাহার দৃষ্টি হতাশব্যঞ্জক, চক্ষে একবিন্দু অশ্রু নাই, কেমন যেন প্রাণহীন কাগজের পুতুলের ন্যায় অবিচলিতা। ডোরোথি ভাবিতেছিল—এই তো মানব জীবন ক'টা দিনের নিমিত্ত পৃথিবীর বুকে আসে ..এরই তরে কত দ্বন্দ্ব, কত ভোগাশা, কত অহঙ্কার - অশান্তি, হায় ভ্রান্ত মানব—এই অমূল্য সময়টুকুর মূল্য না বুঝিয়া পার্থিব সুখের

সমল স্রোতে গা ভাসান দেয়, হায় তারা কি একটি বারের তরেও যে শেষক্ষণটিই সত্য—সেই শেষ সময়টির কথা স্মরণ করে? ওই চিতায় তাহার পিতার নশ্বর দেহাবশিষ্ট এখনও বর্ত্তমান...কিন্তু মুহূর্ত্তেই একমুষ্টি ভস্মাবশেষে পরিণীত হইবে। হায় শেষ চিহ্নটুকুও ডোরোথিকে আপন হাতে লুপ্ত করিতে হইবে। নিভন্ত-চিতার শেষ ধূমটুকু ধূসর সন্ধ্যাকাশে ঠেলিয়া বিলীন হইয়া গেল। ডোরোথিকে ডাকিয়া মধু বলিল—"দিদিমনি!"

মুখ ফিরাইয়া ডোরোথি বলিল—"কি বলছ মধুদা?"

"এইবার বাবুর শেষ কাজটুকু করে দাও...আহা বড় জ্বালা পেয়ে তিনি গ্যাছেন।"

"শেষ কাজ। মধু...আমার দেওয়া জলে কি অত আগুন নিভবে? বাবাগো।"

"দিদিমনি—দিদিমনি...ছিঃ সোনার দেহ কি চিতের উপুর লুটিয়ে দিতে আছে—ওঠ?"

"না মধুদা ওকথা আমায় বলিস নি—এইখানে বাবার আমার শেষ শয্যা...এ আমার পুণ্যতীর্থ এ ছেড়ে আমি উঠবো না মধু—আমাকে ডাকিস্ নি।"

"দিদিরে।" মধুর কোঠরগত চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।"

* * * *

"দিদি, ডোরা, ওঠ বোন।"

রক্ত আঁখি মেলিয়া ডোরোথি বিকৃত কণ্ঠে বলিল—"কে—কে।"

"আমি মানস।"

"মানসদা' এই তিনটে বছর কোথায় ছিলে ভাই? বোনের চরম অবস্থা দেখতে এসেছ বুঝি—উঃ তোমার জন্যে আর—আর একজনের জন্যে শেষ পর্য্যন্তও বাবা—"

মানস সাশ্রনয়নে বলিল—"থাম ডোরা—আমি বুঝেছি। আর বলোনা, কিন্তু আমাদের অদৃষ্ট বড় মন্দ ডোরা—আমরা একটা জরুরী কাজে কলকাতায় গেছলুম - সেখান হ'তে ফিরে এসে তোমার টেলিগ্রাফ পেয়েই আমরা ছুটে এলাম।

আমরা! বহুবচন টীকা শুনিয়া ডোরোথি সপ্রশ্ন নয়নে মানসের মুখের প্রতি তাকাইল। মানস বলিল—"আমি একা আসিনি ডোরা—অমলদা, আর আমি রাজদ্বারে অভিযুক্ত, আমাদের নামে ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে...পুলিস আমাদের পিছু পিছু ঘুরছে—কেমন করে তোমার কাছে আসব দিদি!"

"তিনি—তিনি এসেছেন?"

"হ্যাঁ, আমি এসেছি ডোরা।"

ডোরোথির একরাশী রুক্ষকেশ অমলের পদদ্বয় ঢাকিয়া ফেলিল। অমল রুদ্ধ স্বরে বলিল—"ছিঃ পা ছেড়ে ওঠ ডোরা।"

"না না ছাড়ব না, এই পা দুখানি ভিন্ন আজ আমার অপর কোন আশ্রয় নেই...আমি কোথায় যায় বলে দিন।"

অমলের পায়ের উপর ডোরোথি আপনার মুখটাকে সজোরে চাপিয়া ধরিল। অমল বলিল—"বাড়ী যাও ডোরা।"

"বাড়ী যাব। বাড়ী আমার কই, সেখানে গিয়ে আজ কার কাছে দাঁড়াবো?"

উদ্ধমুখী ডোরোথির সে করুণ হৃদয়ভেদী দৃশ্য দেখিলে পাষাণেরও অশ্রু সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। ডোরোথি যন্ত্রণা কাতরস্বরে বলিল—"আপনি আমার ডোরা নাম ভুলে যান—সেই এক নামের জন্যে আজীবন দুঃখ পেয়ে এলাম, দয়া করুন, আমাকে আর দুঃখ দেবেন না?"

এইবার পাষাণ গলিল—যে রুদ্ধমুখী অন্তঃশীলার ন্যায় শুভ্র প্রেমের মন্দাকিনী অমলের হৃদয়তলে সঞ্চিত ছিল। আজ তাহা সহস্র ধারে গলিয়া উচ্ছলিয়া বেগে প্রবাহিত হইল। মৃদুগুঞ্জনে অমল বলিল—"নীতি এতদিন পরে তোমাকে আজ আপনার বলে পেলাম—কিন্তু আমি যে এখন অপরাধী...আসামী। ধরা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি।"

ডোরোথি ক্ষণকাল তাহার স্বাস্থ্যপূর্ণ উন্নত বলিষ্ঠ দেহখানি অনিমিষে দেখিয়া ভাবিল—'পুলিসের লোক কী নিষ্ঠুর.. এই দেবতাকে দলিবার জন্য পিষিবার জন্য কত না আয়োজন করিতেছে। সহসা ডোরোথি সংশয়ভরা স্বরে বলিয়া উঠিল, তুমি অপরাধী...তুমি আসামী। কেন তুমি ধরা দিতে যাচ্ছ?"

ডোরোথির এই চির পরিচিতের ন্যায় তুমি সম্বোধন

অমলের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিল। বিগলিত স্বরে অমল বলিল—"তাদের চোখে আমি যে দোষী সেই জন্যে—"

বাধা দিয়া ডোরোথি জোরের সহিত বলিল—"না তুমি দোষী নও—কিসের দোষী। মাতৃভূমির সেবা করেছ বলে তুমি রাজদ্রোহী, তুমি যে এমন করে সরকারের অন্যায় আইনে ধরা দিতে চাচ্ছ, তোমার আরব্ধ কর্ম্ম শেষ হয়েছে—যে ব্রতের মাত্র অনুষ্ঠান করেছ, সে ব্রতের পূজা তোমার উদ্‌যাপন করেছ? তবে তুমি কিসের আহ্বানে, বন্ধনের দড়ী গলায় পরতে যাচ্ছ? এদিকে নবযুগ যে তোমায় মুক্তির জন্যে ডাকছে?"

শিথিল কবরীর ফাঁক দিয়া ডোরোথির সুগৌর দীপ্তিপূর্ণ মুখখানি ঊষার প্রথম করস্পর্শে আরও প্রভান্বিত, আরও মধুময় হইয়া উঠিল। ডোরোথির শুভ্রসিক্ত কুন্দপুষ্পের ন্যায় লজ্জারুণ মুখখানি অমল দেশ কাল পাত্র ভুলিয়া দুই হাতে চাপিয়া ধরিল। পরে চঞ্চল সুরে ডাকিল—"ডোরা—না না, নীতি, ঠিক এই কথাগুলি পূর্ব্বে আমারও মনে উদয় হ'য়েছিল—কেবল তোমাকে একটু পরীক্ষা করবার লোভ সামলাতে পারলাম না। তবে এস নীতি, আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের ভার তোমার হাতে তুলে দিলাম—আজ দেখছি তুমিই আমার কর্ম্ম পথের যোগ্য সহকর্ম্মিণী। আজ এই মহা শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে তোমার হাত ধরলাম—এই আমাদের যথার্থ মিলন—আর কোন বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের আবশ্যক দেখি না—ওঠো নীতি চোখ মুছে ফেল—কেন আর কান্না—যখন তোমার আমার মনের গতি একই ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে—তবে চল তুমি আমার ভবিষ্যত পথের সহায়তা করবে চল। সত্যিই এখন আমার ঢের কাজ প'ড়ে রয়েছে, সেগুলি আমার একার দ্বারায় গুছিয়ে নেওয়া সম্ভবপর নয় এস নীতি আজ প্রথম ঊষার উন্মিলীত আঁখির সঙ্গে সঙ্গে তোমার সাহায্য গ্রহণ করলাম।" কম্পিতা ডোরোথিকে আপনার বাম পার্শ্বে স্থান দিয়া অমল অনুচ্চস্বরে ডাকিল—"মানস।"

পিছন হইতে ঘুরিয়া মানস আসিয়া বলিল—"কি ভাই?"

"ধরা দিলাম না মানস, আজ যদি আমি ধরা দি, তাহলে দেশের অনেক কাজে ক্ষতি হবে, অনেক কাজই পিছিয়ে পড়বে—আলোর আর রেবাকে খুলনার কাজে দিয়ে এসেছি—ফাল্গুনী আর অন্ধ মৃণালকে রাবেয়ার সঙ্গী করে দিয়ে এসেছি, এইবার তুমি দৌলতপুরে রাবেয়ার কাছে ফিরে যাও—আর আমরা অন্যদিকে বেরিয়ে পড়ি, বঙ্গমাতা যুগলক্ষ্মী আমাকে মুক্তির ডাক দিয়েছে—সে আহ্বান উপেক্ষা করবার সাধ্য আমার নাই, এইবার একবার বল ভাই—

"এসহে আর্য্য এস অনার্য্য হিন্দু-মুসলমান
এস এস আজ তুমি ইংরাজ এস এস খৃষ্টান
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার
এসহে পতিত হ'ক অপনীত সব অপমান ভার।"

"এস এস তবে।"

ডোরোথি মৃদু মধুর কণ্ঠে বলিল—"আয় মধু।"

ওঃ তাইতো, মধু তুমিও এস ভাই, তোমাকেও আমার দরকার।"

অমলের গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সঙ্কুচিত ভাবে মধু বলিল—"করছেন কি বাবু, আমি যে নীচ—ছোট জাত।"

"কে বলে ভাই তুমি ছোটজাত...অস্পৃশ্য, তুমি আমার ভাই, তোমার মত মহৎপ্রাণ একজন বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের থাকলে সে ধন্য হ'য়ে যেত। এস এস আর দেরী নয় "

ডোরোথির শিথিল হাতখানি মুঠার মধ্যে চাপিয়া দেশ-প্রেমিক অমলকুমার অগ্রসর হইল। পিছনে পিছনে নত-মস্তকে মানস আর মধু তাহার অনুগামী হইল। প্রভাতের মুক্ত আলোয় তরল ধারা ভালো করিয়া প্রকৃতির বক্ষে ঝরিতে না ঝরিতেই সেই আধো আলো—আধো ছায়ায় মহা-সম্মিলনে—চারিটি মহান প্রাণ কোন আলোকের দেশে নবযুগের আহ্বানে বাহির হইল কে জানে!"

সমাপ্ত

মায়ের দরদ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(১)

পদ্মার দিগন্তবিস্তৃত প্রবাহ মধ্যে এক বিশাল চরভূমি, ক্ষুদ্র একটী দ্বীপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথায় চারিধারে নিবিড় কশাড় বনে ঘেরা একখানি গ্রাম নাম তাহার "নবীর চর"। সেইখানে পীনা মানুষ হইয়াছিল।

যেদিকেই চাও যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু আবর্ত্তসঙ্কুল তরঙ্গের খেলা। তাহার উপর দিয়া ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের নানাবিধ নৌকা কেহ পাল খাটাইয়া, কেহবা দাঁড় টানিয়া নানাদিকে যাইতেছে,—মাঝীরা কেহবা পীরের গান ধরিয়াছে, কেহবা কীর্ত্তনের সুরে বেসুরো চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে,—কচিৎ বা মকর কুম্ভীর শুশুকের ধাবন কুর্দ্দন জলচর পাখীর মেলা,—এইসব দেখিতে শুনিতে পীনার শৈশব কাটিয়াছিল। শুধু তাই নয়, জ্ঞান হইয়া অবধি সে যে কয়টা নিদাঘ বর্ষা, শীত, বসন্ত দেখিয়াছে তাহারই মধ্যে সে অনেক শিক্ষালাভও করিয়াছিল। প্রকৃতির পাঠশালে ছাপার কিতাব না পড়িয়া যাহারা শিক্ষালাভ করে, তাহাদের যাহা কিছু জানা সম্ভব সবই পীনা জানিত। গ্রীষ্ম শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে বলিয়া দিতে পারিত সেবার বর্ষা ঠিক সময়ে আরম্ভ হইবে কি না, সকাল বেলায় আকাশের দিকে চাহিয়া সে বলিয়া দিতে পারিত সেদিন ঝড় আসিবে কি না, আবার বর্ষা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে শীতের আগমনকাল সম্বন্ধে একটা মোট মুটী রকম ধারণা করিয়া লইতে পারিত। পদ্মার চরে যাহাদের বাস, আর কোন ঋতুর সহিত তাহাদের বড় একটা পরিচয় নাই, তাহারও ছিল না।

তাহার সবচেয়ে ভাল লাগিত গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালটা। গ্রীষ্মের মাথা ফাটা রৌদ্রে, যখন বিশ্ব সংসার ত্রাহি ডাক ছাড়িত, মাঝীরা নৌকা বাহিতে বাহিতে গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিত, এবং ক্রমাগত জলপান করিয়া উদর পূর্ণ করিয়া তুলিত—পীনার কিন্তু কোন আপদ বালাই-ই থাকিত না। সে তাহাদের উঠানের একপাশে ঘরের ছায়ায় মাটীতে চাটাই অথবা ময়লা আঁচলখানা বিছাইয়া চৌদ্দপোয়া হইয়া পড়িয়া থাকিত, কখনও বা আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে কশাড় বনের ফাঁকে ফাঁকে নদীর বুকে হাওয়ায় ভরা পালগুলির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, আর রাজ্যের আগুন হাওয়ার ঢেউগুলি নদীর জলে স্নান করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তাহার গায়ে আসিয়া লাগিত, তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া যাইত, সে ঘুমাইয়া পড়িত। আবার যখন কাল-বৈশাখীর ভীষণ ভ্রুকুটী দেখিয়া দেশের লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিত, সে পিতার নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া জলের ধারে ছুটিয়া যাইয়া নদীবক্ষে মেঘের কাল ছায়া দেখিত, ঝটিকার প্রাক্কালে জলে স্থলে আকাশে প্রকৃতির সেই স্থির অচঞ্চল ভীষণ গম্ভীর ভাবটা চমৎকার উপভোগ করিত। তারপর যখন সোঁ সোঁ করিয়া চারিদিক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঝড় নামিয়া আসিত, কীর্ত্তিনাশা রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে নাচিয়া উঠিত, মাঝীরা পাড়ীর পথে 'সামাল সামাল' ডাক ছাড়িয়া কেহবা তাহাদের চরে আসিয়া আশ্রয় লইত, কেহবা ঝড়ের বেগে তাড়িত হইয়া দৃষ্টির বাহিরে কোথায় চলিয়া যাইত; পীনা তখন কি জানি কি ভাবে বিভোর হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া দেখিত, সেখান হইতে নড়িবার নামও করিত না। পিতা আসিয়া জোর করিয়া পাঁজাকোলা করিয়া না তুলিয়া লইয়া গেলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখান হইতে যাওয়া হইত না। তাহার মত আজগুবি স্বভাবের ছেলেমেয়ে সারা নবীর চরে একটীও ছিল না, তাই তাহার খেলার সাথীও কেহ ছিল না। কাহারও সহিত ভাব করিবার জন্য কখনও তাহার কিছুমাত্র ব্যস্ততাও দেখা যাইত না। ফলে সেই একফোঁটা মেয়ে তাহার একফোঁটা প্রাণের একফোঁটা সুখশান্তি আনন্দ লইয়া একাকিনী খেলা করিত,

ছুটাছুটী করিত, নদীর জলে সাঁতার কাটিত,—বিধাতার অমোঘ বিধানে অনন্যসঙ্গিনী হইয়াও সে অনুকূল জল-হাওয়ার মধ্যে সরস ভূমির চারা গাছটীর মত সতেজে বাড়িয়া উঠিতেছিল।

তাহার খেলার সাথী কেহ ছিল না। কিন্তু তবু কি জানি কেন গ্রামের মোড়ল মাণিক ব্যাপারীর ছেলে টেঁপা কিছুতেই তাহার পিছন ছাড়িত না। সে গালাগালি দিলেও না, ঝগড়া করিলেও না। অনেক সময় এমন ঘটিত, সে হয়তো কেহ কোথাও নাই দেখিয়া কাপড়খানি তীরে রাখিয়া একটু স্নান করিতে নামিয়াছে, হয়তো বা একটা জলচর পাখীকে তাড়া করিয়া, সাঁতার কাটিতে কাটিতে উহা উড়িয়া গেলে, আপন মনে খিল খিল করিয়া হাসিতে হাসিতে উহাকে যাহা বলিবার নয় তাই বলিয়া গালি দিতেছে, এমন সময় তাহার নজর পড়িল, খানিকটা দূরে কশাড় বনের ভিতর গা ঢাকা দিয়া টেঁপা একটা প্রকাণ্ড ছিপ ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাহার দিকে মিট্‌মিট্‌ করিয়া চাহিতেছে। এমন অবস্থায় স্বভাবতঃই টেঁপার উপর তাহার অত্যন্ত রাগ হইত,—সে তাহাকে কাদার ডেলা ছুঁড়িয়া মারিত, মুখ ভেংচাইয়া বেশ একটু কড়া করিয়া দশ কথা শুনাইয়া দিত, তাহার মত অসভ্য বেহায়া জীবের যে জীবন ধারণ অপেক্ষা পদ্মার জলে ডুবিয়া মরা শ্রেয়ঃ তাহাও বেশ স্পষ্ট প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝাইয়া দিত। টেঁপা কিন্তু তাহা গ্রাহ্যই করিত না, উপরন্ত কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিত। তাহাতে তাহার রাগ আরও বাড়িয়া যাইত। সে জল হইতে উঠিয়া তাহার উপর দস্যুর মত পড়িয়া তাহাকে কীল চড় ঘুসিতে নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিত। কিন্তু যে নির্লজ্জ, তাহাকে দুরস্ত করিবার ঔষধ বিধাতা পুরুষ সৃষ্টি করেন নাই, দুই চারিটা কীল চড়ে তাহার কি হইবে? সে এক পীঠ মার খাইয়াও পীনাকে কিছু বলিত না, কিম্বা তাহার গায়ে হাত তুলিত না,—বেহায়ারা চিরকাল যাহা করিয়া আসিয়াছে তাহাই করিত, পীনার দিকে চাহিয়া দাঁত বাহির করিয়া শুধু হাসিত আর হাসিত। এক একদিন টেঁপাকে নির্দ্দয় করিয়া মারিবার পর নিজের নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও কি জানি কেন হঠাৎ পীনার দয়ার উদ্রেক হইত, তখন সে টেঁপার কাছটীতে বসিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে, তাহার অসংখ্য দোষ কীর্ত্তন করিতে করিতে তাহার পীঠে হাত বুলাইয়া দিত, তারপর কোন এক সময় তাহাকে টানিয়া জলে নামাইয়া দুইজনে "নল-ডুবানী" খেলিতে সুরু করিত কিম্বা জলের ধারে ধারে চিংড়ি মাছের সন্ধান করিয়া ফিরিত।

এমনই করিয়া তাহারা বড় হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমে পীনা ষোলয় পা দিল, টেঁপা কুড়ি বৎসরে পড়িল।

(ক্রমশঃ)
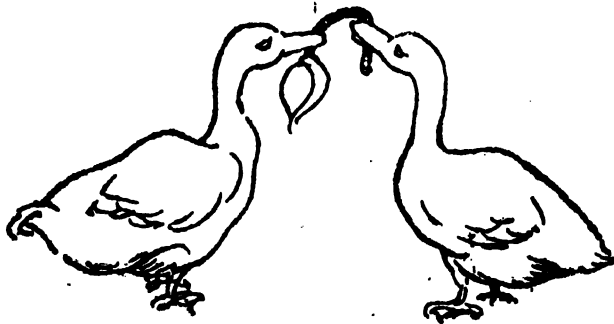
বিভ্রাট

[শ্রীকালীকৃষ্ণ বিশ্বাস]

আমাদের College hostelএর ছাদে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে একটি ছোটখাট রকমের বৈঠক বসিত। তাহাতে লাভ কিছু হউক না হউক,—লোকসান হইত যথেষ্ট; যথা—সিগারেটের বংশনষ্ট, চা, চিনি ইত্যাদির আয়ুক্ষয়—পানের সপরিবারে ধ্বংস ইত্যাদি।

যাহাই হউক, আমরা সকলে, বিশেষতঃ, অর্দ্ধেন্দু আর মল্লিক যেদিন উপস্থিত থাকিতাম,—সেইদিন যে আসরটা বাসরঘর অপেক্ষা জমিয়া উঠিত—সেটা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয়, মল্লিককে আমরা রোজ পাইতাম না; কারণ সে যাদবপুর হইতে Collegeএ আসিত। Amherst Streetএ তাহার এক বড় ভগ্নী থাকিতেন। প্রায় প্রতি শনিবারই সে কলিকাতায় থাকিত—এবং সেইজন্যই আমাদের আড্ডাটিও সেই দুইদিন বিশেষভাবে জমিয়া উঠিত।

তখন সবেমাত্র ৫টা বাজিয়া গিয়াছে। Cigarette লইয়া অর্দ্ধেন্দু, এবং তিনুদার মধ্যে তর্কটা যেরূপ গড়াইতেছিল, আর কয়েকমিনিট সেরূপভাবে চলিলেই সেটা বোধ হয় হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হইত।

অর্দ্ধেন্দু কহিতেছিল Common use এর জন্যে—Imperial Specialই হ'চ্ছে best and cheapest.

সুরেশও মাঝে মাঝে তাহাকে Support করিতেছিল—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয়।"

তিনুদার অবস্থাটি তখন বাস্তবিকই একটু শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। চীৎকার করিতে সে যত না পারিতেছিল, মেঝের উপর প্রবলবেগে মুষ্ট্যাঘাত করিতেছিল ততোধিক। হঠাৎ সে আমার দিকে ফিরিয়া একটু উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল "আচ্ছা অশোকদা, তুমিই বলত—Passing Show Imperial specialএর চেয়ে ভাল নয়?"

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বাধা দিয়া অর্দ্ধেন্দু কহিয়া উঠিল—"By no means! Imperial special আরও mild".

আমি আর কি উত্তর দিব? আমি ওরসে একেবারেই বঞ্চিত। ইহাদেরই পাল্লায় পড়িয়া আমাকে একবার Cigarette টানিতে হইয়াছিল। কিন্তু তারপর কি কাসি। উঃ মারা যাবার যোগাড় আর কি। কহিলাম, "কি জানি ভাই। তবে ছবি দেখে ত মনে হয় Passing showই ভাল।"

এমন সময়ে মল্লিক আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনুদা ত একেবারে লাফাইয়া উঠিল—"এই যে মল্লিক—আচ্ছা বলত ভাই, Passing show—Imperial special চেয়ে better নয়?"

মল্লিক হাতের নস্যের টিপটির সদ্ব্যবহার করিয়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—"কোনওটাই ভাল নয়—তার চেয়ে নস্য সহস্র গুণে ভাল।"

তাহার কথায় আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম।

সুরেশ একটু হাসিয়া কহিল—"যাক্ গে—নস্যই ভাল হোক—কি Cigarette ভাল হোক—এখন drop that matter—তার চেয়ে কাজের কথা বল দেখি?"

মল্লিক তাহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কি কাজের কথা?

সুরেশ একটু হাসিয়া কহিল—"বলি বিয়েটা ত' বেশ নভেলী ধরণের করলে হে?"

মল্লিক একটু বিস্ময়ান্বিত ভাবে উত্তর দিল "বিয়ে! কই না।"

সুরেশ একটু রুক্ষস্বরে কহিয়া উঠিল—"তুমি দেখছি—great lier। bluff দেবে আমার কাছে? পরশু দিন আমাদের পাড়ায় Berhampur Collegeএর একটি ছোকরা এসেছিল—তার মামার বাড়ীতে। তার সঙ্গে আলাপও

হ'য়ে গেল বেশ। নানা কথার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলুম—"আপনি ভূপেন মল্লিককে চেনেন? তিনি বল্লেন বিলক্ষণ চিনি। আমাদেরই সঙ্গে তিনি third yearটা পড়েছিলেন। তারপর একটু হেসে বল্লেন "তাঁর যে সেদিন বিয়ে হয়ে গেল।" আমি ভয়ানক আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম জিজ্ঞেস করলুম—"কি রকম করে বিয়ে হ'ল।" তিনি বল্লেন "তা প্রায় এক বছর হবে" তারপর হেসে বল্লেন "বিয়েটি বেশ funny ব্যাপারের জিজ্ঞেস করবেন না তাকে?"

আমরা ত' সকলে একেবারে অবাক। অর্দ্ধেন্দু, মল্লিকের পিঠ চাপড়াইয়া হাসিয়া কহিল—"বটে। এতদূর, না বাবা—আর তোমাকে ছাড়া হচ্ছে না—তোমায় courtship থেকে সুরু কর।"

মল্লিক মুখটি ম্লান করিয়া বসিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল—"আচ্ছা শোন, বলছি—কিন্তু God's sake—আর কারুর কাছে প্রকাশ ক'রনা কিন্তু। হ্যাঁ—সে ভদ্রলোকটির নাম কিহে সুরেশ?"

"তার নাম তোমার গিয়ে—ঐ যে কি বলে—হ্যাঁ,—বীরেন্দ্রনাথ বসু—কি মিত্তির—ঐ রকম যা হয় একটা হবে।"

"ওঃ বুঝেছি। সেই Rascalটাই—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া মল্লিক চুপ করিল।

আমি বলিলাম—"কিহে—এবার আরম্ভ কর—"

মল্লিক ম্লানমুখে একটু হাসিয়া বলিতে আরম্ভ করিল—"তখনও বাবা pension নেন নি—জান। I. A. পাশ করবার পর বাবা বদলী হলেন Nalhatiতে। আমি Berhampur Collegeএ ভর্ত্তি হলাম। বন্ধুও কিছুদিনের মধ্যে অনেক জুটে গেল। তবে হ্যাঁ—আমাদের classটিতে বেশীর ভাগই ছিলেন বিবাহিত। সেইজন্য আমাদের third year classটিকে অনেকে "Married class" বলত। অনেকেই আমাকে শনিবারে রবিবারে তাঁদের প্রিয়ার চিঠি দেখাতেন—চিঠি পড়া হয়ে গেলে পর, সকলেই যে যার নিজের স্ত্রীর গুণকীর্ত্তন করতে আরম্ভ করতেন। কেউ বলতেন—আমার স্ত্রী second Cleopetra—কেউ বলতেন—আমার স্ত্রী বড় চমৎকার গান গাইতে পারেন—কেউ বলতেন—আমার স্ত্রীর মত love letter খুব কম মেয়েই লিখতে পারেন—ইত্যাদি। আমি খালি চুপ করে শুনে যেতুম—কোনও উত্তর দিতুম না। আমার খালি মনে হ'ত—তাইত'—এদের সকলেরই বিয়ে হয়ে গেল—আমার হ'ল না! মনটা সময়ে সময়ে বড়ই উদাস হ'য়ে উঠত।"

সুরেশ একমুখ ধূম উদ্গীরণ করিয়া হাসিয়া কহিয়া উঠিল—"আহা তা' ত' হবারই কথা—তারপর?"

"আমাদের hostelএর—হ্যাঁ ঠিক কথা—আমি সেখানে hostelএই থাকতাম। যাক্‌গে, শোন। আমাদের hostelএর পাশের বাড়ীতেই একটি ভদ্রলোক তাঁর নব পরিণীতা যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন।"

তিনুদা একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিয়া তাহাতে একটু টান দিয়া কহিয়া উঠিল—"এই-রে! তবেই হয়েছে।"

"আহা শোনই না আগে" এই বলিয়া মল্লিক বলিতে লাগিল—"সেদিন একটু মেঘলা মেঘলা ছিল,—আমি ছাদের উপর বেড়াচ্ছিলাম। হঠাৎ সেই বাড়ীটার উপর নজর পড়ে গেল।"

তারক কহিল—"তারপর, চুপ করলে কেন—বল না?"

মল্লিক একটু নীরব থাকিয়া কহিল—"হ্যাঁ—শোন তারপর। বাড়ীটা দোতালা—জানালা খোলা ছিল। চেয়ে দেখি যে, ভদ্রলোকটি একটি easy chairএ শুয়ে আছেন, আর তাঁর স্ত্রী তার handleএর ওপর বসে তাঁকে একখানি রুমাল দিচ্ছেন আর হাসতে হাসতে বলছেন—"দেখ দেখি এখানা কি রকম হ'ল?" ভদ্রলোকটি কিছু বললেন না, তবে হেসে—যাক্‌গে, আমি আস্তে আস্তে সরে এলুম। খালি মনে হতে লাগল হায়রে—"

তাহার মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়া আমি একটু হাসিয়া কহিয়া উঠিলাম—"কবে আমার Better half আসবে—কবে সে আমাকে ঐরকম করে present করবে।"

"Exactly! বাস্তবিক, সেইদিন থেকে আমার মনটা যেন কিরকম হয়ে গেল। Annual Examination এগিয়ে আসতে লাগল—আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। একদিন আমার একজন bosom friend বললেন—"অশোকদা, এর মধ্যেই "বিয়ে" "বিয়ে" করে ক্ষেপলে চলবে কেন? আগে একটি

মনের মত "She" যোগাড় করে নাও—কিছুদিন courtship কর—"...আমি কিছু বললাম না। ভাবলুম এইতেই এই—না জানি courtship করতে গেলে আবার কি হবে। হ্যাঁ—ইতিমধ্যে আর একটি ছোকরারও বিয়ে হয়ে গেল। সে মাঝে মাঝে যাক্—ওসব বাজে কথায় দরকার নেই। ক্রমশঃ আমার মনটা বাস্তবিকই যেন কিরকম হয়ে গেল—কিছু ভাল লাগত না।"

অর্দ্ধেন্দু কহিয়া উঠিল—"খালি প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠত—বুকভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস পড়ত..."

"হ্যাঁ—একরকম তাই বটে। শেষে একদিন বাড়ী চলে গেলুম। কারুর সঙ্গে প্রায় কথা বলতুম না জানালার ধারে বসে থাকতুম—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতুম। কিন্তু হায়! কিছুতেই কিছু হ'ল না—আমার মনের কথাটি কেউ জানবার চেষ্টা করলে না।"

তিনুদা একটু সুর করিয়া কাহয়া উঠিল—"আহা-হা—দাদারে আমার। তারপর ?"

"সেবার আমার এক বৌদি এলেন দিনকয়েক বেড়াবার জন্য। এসব বিষয়ে যার বৌদি নেই—সে অতি অভাগা। যাই হো'ক, তিনি আমার ভাবগতিক দেখে সমস্তই জেনে নিলেন—আমিও বাঁচলুম—ভগবানকে অশেষ ধন্যবাদ দিলুম—আর বিয়ে হয়ে গেলে কালিকা দেবীর কাছে একটা পাঁঠা মানত করলুম। বৌদি মাঝে মাঝে আমাকে বেশ দু'কথা শোনাতে ছাড়তেন না। আমার তখন শাপে বর গোছের—আমি কোনও উত্তর দিতুম না।"

গল্পটি বেশ জমিয়া আসিতেছিল, বালিশটা একটু কোলের দিকে টানিয়া লইয়া বলিলাম—"তারপর ?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হাতে নস্য ঢালিতে ঢালিতে মল্লিক কহিল—"বৌদির ঘটকালীর গুণেই হউক, কিংবা অন্য কারণেই হোক, আমার বিয়ে হয়ে গেল।"

সুরেশ কহিয়া উঠিল—"বাঃ। এত short cut করছ কেন বাবা ? এর মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল ?"

"আরে দুত্তোর। আগে সবটা শোনই না ছাই" এই বলিয়া মল্লিক বলিতে লাগিল—"বৌটি সুন্দরী না হলেও—তাকে খারাপ বলা যেত না। তার ছোট্ট সরল মুখখানি আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু কি করব—এদিকে Annual Examination এগিয়ে আসতে লাগল। বিয়ের কিছুদিন পরেই আমি Berhamporএ চলে এলাম। সেবার গরমও পড়েছিল ভীষণ—আমরা সকলেই প্রায় রাত্রে ছাদের ওপর শুতুম। প্রায় সকলেই খানিক পরে ঘুমিয়ে পড়ত—আমার চোখে আর ঘুম আসত না। আমি খালি প্রিয়ার কথা ভাবতুম,—আর Principalএর মুণ্ডপাত করতুম। বাস্তবিক, কি অন্যায় বলত—Annualটা Summerএর পরে করলেই চলত।"

ধ্বংসাবশেষ সিগারেটটি মুখ হইতে নিক্ষেপ করিয়া তিনুদা কহিল—"নিশ্চয়"—"নিশ্চয়।"

"যাই হো'ক—Annual হয়ে যাবার পরদিনই সকাল-বেলা একেবারে পাত্তাড়ী গুড়িয়ে বাড়ী এসে হাজির। বাড়ীতে সকলে জিজ্ঞেস করলেন—"কিরে পরীক্ষা হয়ে গেল ?" বললাম—"হ্যাঁ।" বৌদি তখনও ছিলেন—একটু হেসে বললেন—"ঠাকুরপো পাশ করতে পারবে ত' ?" আমি কোনও উত্তর দিলাম না। খাওয়া দাওয়ার পর দুপুরবেলা ঘরে গিয়ে ঘুমুবার ছল করে জেগে রইলুম। কিন্তু হায়—একটিবারও দেখা পেলাম না। মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল—বুকে আমার মাঝে মাঝে একটি ব্যথা ধরত—সেটাও বেশ বেড়ে গেল। বিকালে কোথাও বেরুলাম না—খালি এপাশ ওপাশ করতে লাগলুম।"

আমি একটু হাসিয়া কহিলাম—"আর ঘন ঘন দরজার দিকে কটাক্ষপাত করতে লাগলুম।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আধঘণ্টা হয়ে গেল—একঘণ্টা হয়ে গেল—কারুর দেখা নেই। মনে মনে ভারী রাগ হ'ল। শেষে বাস্তবিকই বিরক্ত হয়ে উঠলুম। এ ত আর সত্যিই বুকের ব্যথা নয়। কিছুক্ষণ পরে দেখি—সর্ব্বনাশ। মা একবাটি সরষের তেল গরম করে নিয়ে আসছেন। আঃ কি বিপদ। মা ত' কিছুতেই ছাড়লেন না—খুব করে মালিশ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে আর থাকতে পারলুম না—বললুম "মা, এইবার যাও—আমার ঘুম পেয়েছে।"

অর্দ্ধেন্দু একটি সিগারেট ধরাইয়া তাহাতে একটু টান দিয়া কহিল—"বাঃ—দাদার আমার বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ প্রখর।"

হাতের নস্তের টিপটির সদ্ব্যবহার করিয়া মল্লিক কহিল—"নিশ্চয়। যাই হোক, কিন্তু ঘুম যে কোথায় সেটা বোধহয় বলতে হবে না। এদিকে আটটা বেজে গেল—নয়টা বেজে গেল—তবু দেখা নেই। এমন সময়ে হাতের—সেই যাকে বলে—"

বাধা দিয়া সুরেশ কহিয়া উঠিল—"যাই বলুক—তারপর কি হ'ল বল ?"

"হ্যাঁ—আমি ত ঠিক করলুম—আগে একচোট বেশ করে বকে দোব, তারপর অন্য কাজ। কিন্তু দূর হো'ক ছাই। এযে বৌদি। রেগে পাশ ফিরে শুলুম। বৌদি কি একটা জিনিষ নিতে এসেছিলেন। যাবার সময় হাসতে হাসতে বলে গেলেন, "আর পাশ ফিরতে হবে না গো—এবার বুকের ব্যথা ঠিক সেরে যাবে।" কোনও উত্তর না দিয়ে যেমন শুয়েছিলুম তেমনই রইলুম। খানিক বাদে দরজা দেবার শব্দে ফিরে দেখি যে, আমার স্ত্রী দরজা বন্ধ করছেন। কোনও কিছু না বলে ঘুমুবার ভাণ করে পড়ে রইলুম। সে কিছুক্ষণ বিছানার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল—বোধ হয় জেগে আছি কি-না দেখলে, তারপর আলোটা কমিয়ে দিয়ে চুপ করে এসে শুয়ে পড়ল।"

অর্দ্ধেন্দুর হাত হইতে সিগারেটটি লইয়া তাহাতে একটি টান দিয়া তিমুদা কহিল—"বেশ বেশ—তারপর ?"

"কিন্তু আমার যেন কি রকম সব ওলট-পালট হয়ে গেল। ভেবেছিলুম, আচ্ছা করে বকে দোব..."

আমি হাসিয়া বলিয়া উঠিলাম, "তা' আর হ'ল না—তার মুখ দেখে সব রেল একেবারে ভেস্তে গেল"

এদিকে ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। পশ্চিম দিকের রক্তবর্ণটুকু চারিদিকেই একটি স্নিগ্ধ লাল আভা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। আমি কহিলাম—"ওহে সুরেশ, সন্ধ্যে হ'য়ে এল ; হরিহরটাকে বল—চায়ের জলটা চাপিয়ে দিক।"

সুরেশ কহিল "তা হোক্—আজ নয় একটু রাত্রেই ওঠা যাবে—" তাহার পর মল্লিকের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—"তারপর কি হ'ল বল না হে ?"

"বলছি। কি বলছিলুম ঐযে—হ্যাঁ, হ্যাঁ। বাস্তবিক, সেদিন রাত্রে সেই সামান্য আলোতে তাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছিল যে কি বলব। আমি তার একখানি হাত নিজের হাতের ভেতর নিয়ে বললাম—"তুমি কি নিঠুর বল ত' ? আমি তোমার জন্য সকাল থেকে বসে আছি, একটিবারও কি দেখা দিতে নেই ?" সে কোনও উত্তর দিলে না। আমি তখন তাকে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিতেই সে একটু রেগে বলে উঠল—"আঃ কি করছ—ছাড় না।" আমি বললুম—"এখানে অত লজ্জা কিসের—এখানে ত আর কেউ নেই" এই বলে আমি তার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে যেতেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "আচ্ছা মুস্কিলেই ত পড়েছি যাহে'াক—ছাড়।" কিন্তু একি। ধ্যেৎ। এযে বীরেন।"

আমরা ত' একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। সুরেশ হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিল—"তারপর ?"

"তারপর আর কি। দেখি যে, বিছানার একপাশে রোদ এসে পড়েছে। বীরেন হাসতে হাসতে বললে—"দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটাচ্ছিলে নাকি অশোকদা ?" আমার তখন মনের অবস্থাটা বুঝতেই ত' পারছ ? এমন চমৎকার married lifeটা কিনা শেষে স্বপ্ন—আর তাও শেষে ঘোড়ার ডিম কিরকম জায়গায় টুটে গেল। আমি কিছু না বলে উঠে পড়তেই বীরেন খপ্ করে হাতটা ধরে হেসে বলে উঠল—"আরে যাচ্ছ কোথা অশোকদা - দাঁড়াও—চা-টা খাও।" আর চা খাওয়া—আমি তখন—"

আমি হাসিতে হাসিতে কহিলাম—"বাঃ। এ ত' বড় মজার বিয়ে। তা হ্যাঁহে মল্লিক—বীরেন তোমায় আর কিছু বলত না ?"

মল্লিক একটু হাসিয়া কহিল—"না। তেমন কিছু বলত না—তবে আমার কাছে আর কখনও শোয় নি।"

আমরা হাসিয়া উঠিলাম। অর্দ্ধেন্দু হাসিতে হাসিতে কহিল—"বুদ্ধিমানের কাজই করেছে। এখন চল—একটু চায়ের বন্দোবস্ত করা যাক।"

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৯শে শ্রাবণ শনিবার, ১৩৩৩। [৩৮শ সপ্তাহ

তাহাতে আমাতে

[স্বর্গীয়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]

সে, কি আমি নাহি জানি
এক সাথে ফুটে উঠি!
তাহাতে আমাতে যেন
এক বৃন্তে ফুল দুটী!
এক সাথে দোলা দুলি,
এক সাথে পড়ি খুলি,
দোঁহার সৌরভে দোঁহে
মাতোয়ারা লুটো পুটী!

———

আলোচনা

টাকার মূল্য

পশ্চিমমুখী সিদ্ধান্ত

বিদেশের সহিত ব্যবসা ব্যানিজ্য করিবার জন্ম ইংরাজী পাউণ্ড শিলিং পেন্সের হিসাবে টাকার মূল্য স্থির করিতে হয়। এতদিন টাকার বিনিময়ে কত বিদেশী মুদ্রা পাওয়া যাইবে তাহার স্থিরতা ছিল না—বাজারের অবস্থা অনুসারে কোন সময়ে টাকার দাম হইত ১ শিলিং ৪ পেন্স আবার কোন সময়ে ১ শিলিং ৮ পেন্সও হইত। এইরূপ অনির্দ্দিষ্টতার ফলে ভারতীয় ব্যবসা বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা হইত—ভারতীয় আমদানী রপ্তানী অনেকটা টাকার বিনিময় মূল্যের উপর নির্ভর করিত। বিলাতী বই কিনিবার সময় এইজন্ম আমরা বুঝিতে পারিতাম না যে কত দাম পড়িবে—কেননা কখনও শিলিংএর দাম দশ আনা হইত আবার কখনও চৌদ্দ আনা হইত। বই কেনার এই সামান্য উদাহরণ হইতেই বুঝিতে পারিবেন যে ব্যবসা বাণিজ্যের সম্বন্ধে কতটা অনির্দ্দিষ্টতা ছিল।

কারেন্সী কমিশন টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। এই কমিশনের ১২ জন সদস্য মধ্যে বাঙ্গলার স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি ও প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক জে, সি, কয়েজী ছিলেন। টাকার মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া কমিশন আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই কিন্তু যে হারে বিনিময় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহাতে আমাদের উপকার অপেক্ষা অপকার হইয়াছে অনেক বেশী।

কিছুদিন ধরিয়া টাকায় ১ শিলিং ৪ পেন্স হারে বিনিময় মুদ্রা পাওয়া যাইতেছিল। অর্থাৎ ১ শিলিং মূল্যের বিদেশী জিনিষের জন্ম আমাদিগকে বার আনা দিতে হইত। এখন সে স্থলে। আমাদিগকে ।৵১৫ পয়সার কিছু কম দিতে হইবে। সুতরাং প্রতি শিলিংএর বিদেশী জিনিষ কিনিবার সময় আমাদের প্রায় দুই পাঁচ পয়সা লাভ হইবে। বিলাতী কলকব্জা, বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম, ঔষধ, পুস্তক প্রভৃতি এইরূপ সস্তা দরে পাওয়ায় আমাদের খুব সুবিধা হইবে সন্দেহ নাই। গবর্ণমেণ্ট রেলের ও অন্যান্য কার্য্যের জন্ম যে সকল জিনিষপত্র কেনেন তাহাও এইরূপ সস্তাদরে পাইয়া অনেক টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবেন। সেই সঞ্চিত, উদ্বৃত্ত অর্থ যদি গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্যোন্নতি প্রভৃতিতে ব্যয় করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীর প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এ টাকা কি ভাবে ব্যয় করিবেন তাহা বলা কঠিন।

এদিক দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের অনেকখানি সুবিধা হইবে—কিন্তু এই সুবিধা ভোগের জন্ম আমাদিগকে ভারতীয় কল কারখানায়, কৃষি ও শিল্পের উন্নতির আশা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যে-সব জিনিষ ভারতে উৎপন্ন হয় না, সে সব জিনিষের দাম কমিয়া যাওয়ায় আমাদের উপকার হইবে। কিন্তু ভারতে যে সব জিনিষ উৎপন্ন হয়—অথচ বিদেশীর তৈয়ারী জিনিষও আসে—সে স্থলে সাধারণ লোকে বিদেশী জিনিষই সস্তা বলিয়া কিনিবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেশী ও বিলাতী কাপড়ের কথা ধরা যাউক। মিলের কাপড় ও বিলাতী কাপড় ধরুন এখন তিন টাকা জোড়া বিক্রয় হইতেছে। অর্থাৎ বিলাতী কাপড়ওয়ালারা এখন ৪ শিলিং (১ টাকায় ১ শিলিং ৪ পেন্স হিসাবে ৩ টাকায় ৪ শিলিং) জোড়ায় কাপড়ের দাম লইতেছে। টাকার মূল্য যখন ১ শিলিং ৬ পেন্স হইল, তখন তাহারা নিজেদের ঘরে ৪ শিলিং তুলিলেও, ভারতের খরিদ্দারেরা তাহাদের একজোড়া কাপড় ৪ পাই কমদরে পাইবে। যে বিলাতী কাপড়ের জোড়া এখন তিন টাকায় বিক্রয় হইতেছে, সেই কাপড় দু'দিন বাদে ২৸৵৮ পাই দামে বিক্রয় হইবে। ইহাতে বিলাতী কলওয়ালাদের কোন ক্ষতি হইবে না—কেননা নূতন বিনিময়ে ২৸৵৮ পাইয়েই তাহারা ৪ শিলিং পাইবে। মিলের কাপড়ের

দাম এখন বিলাতী কাপড়ের সহিত সমান বলিয়াই লোকে মিলের কাপড় কিনিতেছে। কিন্তু যখন মিলের কাপড়ের জন্ত ৩ টাকা লাগিবে অথচ বিলাতী কাপড় ২।৵৮ পাইতে পাওয়া যাইবে তখন লোকে বিলাতী কাপড়ই কিনিবে। মিলগুলির পক্ষে প্রতি জোড়ায় হঠাৎ পাঁচ আনা চার পাই দাম কমান সম্ভব হইবে না। সুতরাং মিলগুলি বিলাতী কাপড়ওয়ালাদের সহিত প্রতিযোগীতায় পারিয়া উঠিবে না। ইহার ফলে ভারতীয় মিলের বস্ত্রশিল্প কমিয়া যাইবে—অনেক মিল বন্ধ হইয়া যাইবে। মিল বন্ধ হওয়ার দরুণ হাজার হাজার মজুর বেকার বসিয়া থাকিবে। কাপড়ের মিল সম্বন্ধে যেমন বলিলাম, অন্তান্ত দ্রব্যের ভারতীয় কারখানা সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। ভারতীয় কারখানাগুলির বিষম সঙ্কটকাল সমুপস্থিত।

এইরূপ বিনিময় প্রথা অবলম্বনের ফলে বিদেশী যে সব জিনিষ ভারতে আমদানী হয়, তাহার প্রতি গবর্ণমেন্টের শতকরা ১২॥০ সাড়ে বার টাকা সুবিধা দেওয়া হইবে। অথচ ১৯২৩ সালের Fiscal commission ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণ করিবার জন্তই গবর্ণমেণ্টকে সুপারিশ করিয়াছেন—গবর্ণমেণ্ট তুলার উপর হইতে শুল্ক তুলিয়া দিয়া এই সংরক্ষণ নীতিই প্রতিপালন করিয়াছেন। ভারতীয় বস্ত্রের উপর শুল্ক তুলিয়া দেওয়ায় বিলাতী বস্ত্র ব্যবসায়ীদের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল। ম্যাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারের ব্যবসায়ীরা এই শুল্ক বজায় রাখিবার জন্ত অনেক আন্দোলন করিয়াছিল। এইবার এই নূতন বিনিময় প্রবর্ত্তনের ফলে তাহাদের আন্দোলন অন্তদিক দিয়া সফল হইল। পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া তাহারা ভারতীয় মিলের প্রতিযোগীতা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আজ বুঝি তাহাদের সে চেষ্টা কৃতকার্য্য হইবে। ১৯১৯ সালে ভারত সরকারকে যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার ফলে কোথায় ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষিত হইবে—না এখন বিসর্জ্জিত হইতেছে? এই যে ১ শিলিং ৬ পেন্সের সিদ্ধান্ত ইহা পশ্চিমের ব্যবসায়ীদের দিকে তাকাইয়া করা হইয়াছে বলিয়াই আমাদের সন্দেহ হয়। বোম্বে মিল সমূহের প্রতিনিধি স্তার পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস টাকার মূল্য ১ শিলিং ৬ পেন্স রাখিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহার মত গ্রাহ্য হয় নাই।

এই বিনিময়ের ফলে কেবল যে কলওয়ালারাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে তাহা নহে—ভারতীয় কৃষিরও বিশেষ ক্ষতি হইবে। ভারতীয় গম, তুলা, সিল্ক প্রভৃতির দর বিদেশী বাজার অন্তান্ত দেশের উৎপন্ন দ্রব্য অপেক্ষা ২ পেন্স বাড়িয়া যাইবে। তাহাতে ভারতীয় জিনিষ বিক্রয় করিবার অসুবিধা হইবে।

তারপর টাকার কথা। হায় আমাদের চিরপরিচিত বন্ধু রৌপ্যচক্র! তোমাকে এইবার সজলনয়নে বিদায় দিতে হইবে। আর তোমার সেই সুমধুর ধ্বনি আমাদের কর্ণ-কুহর পরিতৃপ্ত করিবে না—তোমার উজ্জ্বল শুভ্র রূপ আর আমাদের নয়নের আনন্দ বিধান করিবে না। কারেন্সী কমিশনের সিদ্ধান্ত ফলে তোমার জায়গা অধিকার করিবে আবার সেই এক টাকার এক টুকুরা নোট। আমরা গরীব ভারতবাসী, আমাদের কোট নাই, প্যাণ্ট নাই—ব্যাগ নাই—আমরা কাগজের টুকরা রাখি কোথায়? তেলে জলে এ টুকুরা নষ্ট হইয়া যায়—আমাদের কাজকর্ম্মা ময়লা হাতের স্পর্শে কাগজের টুকুরা যে রূপ ধারণ করে, তাহা আর দেখিতে ইচ্ছা করে না—ছোঁয়া ত দূরের কথা! এসব অসুবিধার কথা বহুবার ভারতবাসী সরকারের চরণে নিবেদন করিয়াছে। কিন্তু সরকার বাহাদুর আমাদিগকে ঠেলিয়া উচুতে তুলিবেনই—বর্ত্তমান অর্থনৈতিক জাতের সহিত আমাদের অবস্থার সামঞ্জস্ত করিবেনই। তা সে উন্নতি লাভ করিবার জন্ত আমাদের প্রাণ যাক্ আর থাক।

হিন্দু কি গণতন্ত্র শাসনের অযোগ্য—

১৯২৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের যে ব্যবস্থা হইবে তাহা লইয়া এখনই বিলাতে যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা আরম্ভ হইয়াছে। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈ-মাসিক পত্র রাউণ্ড টেবলের বর্ত্তমান সংখ্যায় (জুন ১৯২৬) "ভারতীয় সমস্তার ভিতরের কথা" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে অনেক ব্যঙ্গোক্তির সহিত কয়েকটা অসার যুক্তি দেখাইয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে হিন্দুগণ গণতন্ত্র

শাসনের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত—অতএব ১৯২৯ সালে যেন আর দ্বৈত শাসন, সায়ত্ব শাসন প্রভৃতি অবান্তর বিষয়ের আলোচনা না করিয়া একেবারে গণতন্ত্র ভারতবর্ষে চলিতে পারে কি না তাহাই বিচার করা হয়। "রাউণ্ড টেবলের" যুক্তি নিম্নলিখিত কয়েক দফায় বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) ভারতবর্ষে বহুকাল ধরিয়া অবরোধ প্রথা, জাতি বিভাগ ও একান্নবর্ত্তী পরিবার রহিয়াছে। এইজন্ত সামাজিক হিসাবে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের আদর্শ চলিতে পারে না।

উত্তর—এরূপ যুক্তি না দেখাইয়া যদি বলা হইত যে ভারতবাসী হিন্দুগণ যেহেতু ভাত খায় ও কাপড় পড়ে, সেই হেতু গণতন্ত্রের অযোগ্য, তাহা হইলে অধিকতর শোভন হইত। অবরোধ প্রথা বলিতে হয়তো বিলাতের লেখক মহাশয় কল্পনা করেন যে হিন্দুরা স্ত্রীলোককে খাঁচার ভিতর পুরিয়া রাখে—আর জাতিভেদ বলিতেই তিনি উচ্চ জাতির পক্ষে নীচ জাতির প্রতি আন্তরিক ঘৃণা বুঝিয়াছেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার আছে বলিয়াই তিনি ধরিয়া লইয়াছেন ভারতে বুঝি রোমের প্রথম যুগের Patri Potestris এর স্তায় পরিবারের কর্ত্তাকে দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা করিয়া রাখা হইয়াছে। এইসকল ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লেখক যে যুক্তি টানিয়াছেন তাহা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা তাহা হিন্দুদের আধুনিক অবস্থার সম্বন্ধে যাহাদের বিন্দুমাত্র জ্ঞান আছে তাঁহারাই স্বীকার করিবেন। যদি সত্যই জাতিভেদ প্রভৃতি দোষ ?) থাকার জন্য ভারতবাসীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিকাশের সুযোগ না থাকিত তাহা হইলে হিন্দুদিগকে গণতন্ত্রের অযোগ্য বলা চলিত। কিন্তু এ দেশে যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বিলাতের চেয়ে কিছু কম প্রখর নহে তাহা হিন্দুদের মধ্যে বিশেষতঃ অব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে উচ্চতম বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ইতিহাসের গবেষণা হইতেই প্রমাণিত হইবে। একজন হিন্দুনারী আজ ভারতের জাতীয় মহাসভায় নেতৃত্ব করিতেছেন, তাহাতেই ভারতের অবরোধ প্রথার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

(২) লেখকের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে হিন্দুদের মধ্যে পুরোহিত শ্রেণীর ও তাহাদের ব্যবস্থার প্রভাব এত বেশী যে জনসাধারণ নিজেদের জন্ত চিন্তা করিবার সুযোগ পায় না —সুতরাং তাহারা গণতন্ত্রের অযোগ্য।

উত্তর—কোন দেশেরই জনসাধারণ বা নিম্ন শ্রেণীর মুটে মজুরেরা স্বাধীন চিন্তা করে না। স্বাধীন চিন্তা করিতে হইলে যে শিক্ষার আবশ্যক আছে তাহা লেখকও স্বীকার করেন। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা শিক্ষা পায় নাই বলিয়া তাহারা স্বাধীন চিন্তা করিতে পারে না এ কথা সত্য। কিন্তু শিক্ষা পায় নাই তাহারা—সে দোষ কাহার? পৌনে দুইশত বৎসর ধরিয়া ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এ দেশ শাসন করিতেছেন—সুতরাং দেশে শিক্ষার অভাবের কথা তুলিতে প্রত্যেক ইংরাজেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। পুরোহিতেরা বা তাহাদের ব্যবস্থা যে এ দেশে লোকেরা এখন নির্ব্বিচারে মাথা পাতিয়া লয় তাহা ঠিক নহে। পরন্তু পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি সাধারণের মনোভাব এখন নিতান্ত বিরূপ। পুরোহিতেরা ইউরোপে Reformationএর পূর্ব্বে যেমন মানুষ ও ভগবানের মধ্যে মধ্যস্থ বা দালাল স্বরূপ ছিল, এখানে সেরূপ কোনদিন ছিল নাই। প্রত্যেক মানুষকে ভারতবর্ষে ভগবানকে নিজের ইচ্ছামত উপাসনা করিবার স্বাধীনতা চিরদিন দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইউরোপীয় ইতিহাসের কথা মনে রাখিয়া লেখক যে যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন তাহা ভিত্তিশূন্ত।

(৩) এদেশে ব্রাহ্মণেরা চিন্তা বা ধ্যানের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগ দেখাইতে যাইয়া কর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য আদর্শকে বস্তুতান্ত্রিক বলিয়া ঘৃণা করেন, সুতরাং তাঁহাদিগের দ্বারা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের নীতি চালান যাইতে পারে না।

উত্তর—ব্রাহ্মণেরা সেকালে ধ্যানপরায়ণ ছিলেন সত্য, কিন্তু সেইজন্য এখনও যে তাঁহারা কর্ম্মপ্রবণ হয়েন নাই তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে এখন কর্ম্মজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন। লেখকের ও লেখকের জাতির সুপরিচিত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জীর নাম করিলেই এ বিষয়ে যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া হইবে। আর যদি ধরিয়াই লওয়া যায় যে অনেক ব্রাহ্মণ এখনও ধ্যানে অনুরক্ত—তাহা হইলেও প্রমাণিত হয় না যে হিন্দুরা সকলেই কর্ম্মবিমুখ। কোন জাতির অতীত ইতিহাসের ব্যাপারের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত টানা মূর্খতার পরিচায়ক।

(৪) সিপাহী বিদ্রোহের পরের আমলে ভারতবর্ষে অনেক ইংরাজ শিক্ষক ছিলেন—তাঁহাদের সংসর্গে আসিয়া শিক্ষিত হিন্দুগণ ইংরাজী সভ্যতার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন হইত। কিন্তু এখন ছাত্রসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিকাংশ ছাত্র ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ পায় না। সেই জন্ম শিক্ষিত ব্যক্তিরা ইংরাজের প্রতি বিরাগভাজন হইয়াছে। তাহাদের এরূপ বিরাগভাব থাকার দরুণ গণতন্ত্ররীতি ভারতবর্ষে সফল হইতে পারে না।

উত্তর—জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া পরানুকরণ যে কোন জাতির কল্যাণকর হইতে পারে না—তাহা ইউরোপীয়গণই স্বীকার করিতেছেন। হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় আত্মস্থ হইবার চেষ্টা করিতেছে বলিয়াই তাহারা গণতন্ত্র শাসনের অযোগ্য হইবে? এখন তো প্রতি বৎসর বহু ছাত্র বিলাতে যাইয়া প্রতি বৎসর শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছে, তথাপি ভারতবাসীর ইংরাজী সভ্যতার প্রতি অনুরাগ কমিতেছে কেন?

(৫) কথায় বলে "ওস্তাদের মার শেষের দিকে" Round Tableএর লেখকের শেষ যুক্তিই সবচেয়ে চমৎকার। তিনি বলিয়াছেন "To the orthodox Hindu it (democracy) means frankly the antithesis of all the essentials of social existence. Every man, he admits has a right to justice and fair dealing; but to give equality, even of opportunity, to the fit and the unfit, the twice born and the out caste is unthinkable with perfect honesty he looks upon the whole conception as madness." অর্থাৎ গোঁড়া হিন্দুর নিকট গণতন্ত্রনীতি সামাজিক জীবনের সকল বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধবাদী। প্রত্যেক ব্যক্তির সুবিচার ও সদ্ব্যবহার পাইবার অধিকার গোঁড়া হিন্দু স্বীকার করিলেও প্রত্যেক ব্যক্তিকে—দ্বিজ ও নিম্ন জাতিকে—সমান সুযোগ দেওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে করে। সে এমন ধারণাকে নিছক পাগলামী বলিয়া মনে করিতে সঙ্কোচ বোধ করে না।

উত্তর—জানিনা লেখক এমন গোঁড়া হিন্দুর দেখা কোথায় পাইয়াছিলেন। আমরা হিন্দুসমাজের কথা যতটুকু জানি তাহাতে বলিতে পারি যে আজ বাস্তবজীবনে অব্রাহ্মণ সমাজের সকল বিভাগে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছে—ব্রাহ্মণ তাহাতে বিশেষ দুঃখিত নহে। ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মিয়াছে বলিয়াই কেহই আজ আর সকল সুযোগ ও সুবিধা একচেটিয়া করিয়া লইবার দাবী করে না। হিন্দু সমাজের কোন কথাই লেখক জানেন না—কেবলমাত্র নিজের কতকগুলা মনগড়া যুক্তির উপর সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষের হিন্দুর গণতন্ত্রশাসনের অযোগ্যতা প্রমাণের হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছেন।

লেখকের চেষ্টা আরও হাস্যকর হইয়াছে যখন তিনি ভারতবর্ষের মুসলমানদিগকে গণতন্ত্রের উপযুক্ত বলিয়াছেন। "Democracy is already familiar to them; for Islam is, in practice noless than in theory, the most democratic religion in the world. Parliamentary institutions interest them; and they are quite willing to take a hand in the game, provided the stokes are not too high." অর্থাৎ মুসলমানেরা গণতন্ত্রের সহিত আগে হইতেই পরিচিত, কেননা মুসলমান ধর্ম্ম আদর্শে ও ব্যবহারে সর্ব্বাপেক্ষা গাণতন্ত্রিক ধর্ম্ম। মুসলমানেরা পার্লামেণ্টের অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে আকৃষ্ট হয় এবং তাহারা উহা চালাইতে রাজী আছে যদি বেশী কিছু স্বার্থনাশের আশঙ্কা না থাকে। মুসলমানদের ধর্ম্ম খুবই ভাল একথা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু কেবলমাত্র সেই ধর্ম্মের জোরে কি মুসলমানদের বেলায় শিক্ষার একান্ত অভাব, মোল্লা ও মৌলবীর অসাধারণ প্রভাব, একান্নবর্ত্তী পরিবার ও পর্দ্দা-প্রথার দোষগুলি খাটিবে না? মুসলমানগণ গণতন্ত্রের সহিত পরিচিত আর হিন্দুর বেলায় কি লিচ্ছবি, মালব, যৌধেয় প্রভৃতি প্রাচীন গণতন্ত্রের কথা ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কথা ভুলিয়া যাওয়া লেখকের কর্ত্তব্য হইয়াছে।

আসল কথা হইতেছে এই যে এই সকল রাবিশজাতীয় প্রবন্ধ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় আন্দোলন সফল করিতে পারিলে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তনে বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করিবে না। এ জাতীয় প্রবন্ধের প্রতিবাদ করার

প্রয়োজন এইমাত্র যে ইংরাজদের মধ্যে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে ও হিন্দু মুসলমান সমস্যা বিষয়ে কিরূপ মনোভাব তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখান।

আমেরিকা কি আবার মদ ধরিবে ?

১৯২০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় মদের ব্যবহার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা করিয়া সমস্ত জগতের ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছিলেন। এত বড় সামাজিক উন্নতির চেষ্টা আর কোনদেশ কখনও করে নাই। আমাদের দেশের কলিকাতা কর্পোরেশন ও অন্যান্য মিউনিসিপ্যালিটী মদের দোকান বন্ধ করিবার প্রস্তাব করিয়া আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু আমেরিকাতেই আবার মদ্য ব্যবহার আইনসঙ্গত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমেরিকাবাসীদের মধ্যে অনেকে এই ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিয়াছেন যে আইন করিয়া মানুষের চরিত্র সংশোধন করা যায় না। মানুষের মনে ধর্মভাব ও নৈতিক জ্ঞান প্রবলভাবে জাগরিত করিতে না পারিলে, কেবলমাত্র আইনের দ্বারা নিবারণ করা যায় না।

১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে Literary Digest নামক আমেরিকার সাপ্তাহিক পত্র মদ্য নিবারণ সম্বন্ধে ৯২২৮৩৩ জন লোকের মত লইয়াছিলেন। তাহাতে দেখা গিয়াছিল যে শতকরা ৩৯ জন লোক মদ্য নিবারণী আইনের পক্ষপাতী, শতকরা ২০ জন নিবারণ আইন উঠাইয়া দিতে চাহেন আর শতকরা ৪১ জন অল্প পরিমাণে মদ ব্যবহারের অনুমতি দিবার ব্যবস্থা চাহেন। কিন্তু এই বৎসর (১৯২৬) মার্চ্চ মাসে সংবাদপত্র সঙ্ঘ ১৭৪০০৬২ জন লোকের ভোট লইয়া দেখিয়াছেন যে শতকরা মাত্র ১৯ জন নিবারণ আইনের পক্ষে, ৩১ জন নিবারণ আইন উঠাইয়া দিবার পক্ষে আর ৫০ জন অল্প পরিমাণে মদ ব্যবহারের পক্ষে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে ৪ বৎসরে কতলোকের মন মদ ব্যবহারের পক্ষে হইয়াছে।

আইনতঃ মদ ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকিলেও বহুলোক প্রকাশ্যে মদ ব্যবহার করিতেছে। এমন কি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের আগে যতটা মাতলামী ছিল, তাহার চেয়ে এখন ঢের বেশী মাতলামী করিতেছে। নিষিদ্ধফল খাইবার একটা স্বাভাবিক স্পৃহা মানুষের মনে আছে—তাহারই ফলে আমেরিকার এখন মদের এত প্রসার। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্ণী বুকলার সাহেব বলিয়াছেন যে তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যেই পঞ্চাশ হাজার মদ্য নিবারণ আইনের ভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে। এই আইন ভঙ্গ করার জন্য এত লোক অভিযুক্ত হইয়াছে যে পাঁচ মাসের আগে অভিযুক্ত লোকের এখনও বিচার করিয়া উঠা যায় নাই। তিনি আরও বলেন যে মদ্য নিবারণ আইন রক্ষা করিবার জন্য একমাত্র নিউইয়র্কেই ৭০,০০০,০০০ ডলার খরচ করা প্রয়োজন।

মদ্য নিবারণের ফলে দেশের মধ্যে যে পাপ বা আইনভঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি আসিয়াছে তাহাও নহে। কেননা ১৯২০ সালে লোকসংখ্যার অনুপাতে ৭৮ জন লোক জেলে গিয়াছিল আর ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ৯৮ জন লোক জেলে গিয়াছে।

আমেরিকার বর্ত্তমান সিনেট মদ্যপানের অত্যন্ত বিরোধী। কিন্তু কয়েকজন সদস্য সিনেটে অনেকগুলি বিল উত্থাপন করিয়াছেন যাহা কার্য্যকরী হইলে আমেরিকায় আবার মদ আইনতঃ চলিবে। কিন্তু এ সব বিল আইনে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অল্প কেননা সিনেটের অধিকাংশ সভ্য মদ্যপানের বিরোধী। সিনেটের সভ্য মিঃ ব্রুস বলিয়াছেন—"I knew this, whither we like it or dislike it the opulent portion of the American population are going to have their wine, constitution or no constitution, statute or no statute. That has been demonstrated." অর্থাৎ ইহা মানিত হইয়াছে যে আইন বলুক আর না বলুক আমেরিকার ধনীলোকেরা মদ খাইবেই—তাহা আমাদের ভাল লাগুক কি না লাগুক।

সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগীতা পরীক্ষার হিন্দু মুসলমান—

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে বাঙ্গলার প্রাদেশিক ও জুনিয়ার সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ করিবার জন্য যে পরীক্ষা হইয়াছিল, তাহাতে ১৫০ জন হিন্দু, ও ৫৮ জন মুসলমান পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ৪৫টী পদে লোক বাহাল করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট এক তৃতীয়াংশ মুসলমানদের মধ্য হইতে লইবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে যত নম্বর পাইলে অন্ততঃ পাশ বলিয়া ঘোষণা করা যায় তত নম্বর ৫৭ জন হিন্দু ও ১৫ জন মুসলমান পরীক্ষার্থী পাইয়াছেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে হিন্দুদের মধ্যে মোটামুটী ভাবে শতকরা ৫৫ জন পাশ করিয়াছেন —সে স্থলে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ২৫ জনের কিছু বেশী পাশ করিয়াছেন। এই তো গেল পরীক্ষার কথা। তারপর নিয়োগ করিবার সময় যাহারা সবচেয়ে বেশী নম্বর পাইয়াছে তাহাদিগকে নিয়োগ করা উচিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট বেশী নম্বর পাউক বা না পাউক মুসলমানদিগকে শতকরা তিন ভাগের একভাগ পদ দিবেনই মনস্থ করিয়াছিলেন। তদনুসারে ৩০টী পদ হিন্দু ও অনুন্নত শ্রেণীকে দেওয়া হইল আর ১৫টী পদ মুসলমানদের দিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু পাশের উপযুক্ত নম্বরই পাইয়াছে মাত্র ১৫ জন মুসলমান—সুতরাং হিন্দুদের মধ্যে অনেক ছেলে পাশ নম্বর পাইয়া চাকুরী পাইল না—কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যাহারা পাশ নম্বর পাইয়াছে তাহাদিগকেই চাকুরী দিবার প্রস্তাব হইল। কিন্তু মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৫ জনের মধ্যে ৩জন মেডিকেল বোর্ডের পরীক্ষায় অনুপযুক্ত স্থির হইল। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট শতকরা তিন ভাগের একভাগ চাকুরী দিতে রাজী থাকিলেও শতকরা ২৫টীর বেশী চাকুরী মুসলমানেরা পাইবার যোগ্যতা দেখাইতে পারিলেন না।

অবস্থা যখন এইরূপ তখন কাউন্সিলে আর মিছামিছি মুসলমানদিগকে শতকরা ৫০, ৫৫ বা ৮০টী চাকুরী দেওয়া হউক বলিয়া দাবী করিয়া লাভ কি? চাকুরী লইয়াই হিন্দুর সহিত মুসলমানের বিরোধ। এখন কি মুসলমান বুঝিবেন যে শতকরা ৫০।৫৫টী চাকুরী রিজার্ভ করিয়া রাখিলেই তাঁহাদের সমাজের উন্নতি হইবে না? তাঁহাদের এখনও বোঝা উচিত যে বিরোধ করিবার পূর্ব্বে আগে নিজের সমাজের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করা দরকার।
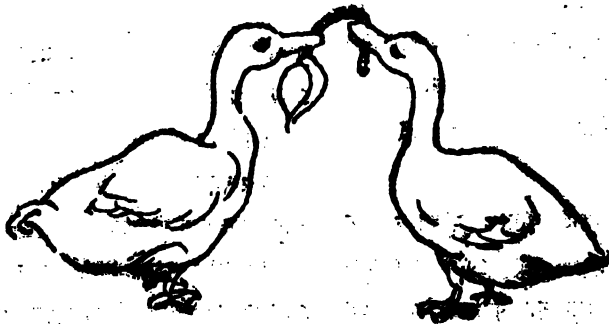
পাষাণ প্রিয়া

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

তার সারা জীবনের মাঝে একমুহূর্ত্ত সে তার আশা হারায় নি। অবিশ্রান্ত কাজের মাঝে ডুবে থেকে হঠাৎ সে চমকে উঠতো, সকল কাজের বাঁধন হ'তে মনটাকে মুক্ত করে সে একবার চারিদিক চাইত,—কই, তার আশাপুর্ণ হতে আর কত দেরী।

সে ছিল রাজসভার কবি। রাজাকে নিত্য তাকে নূতন কবিতা গেঁথে শুনাতে হ'তো। তার জীবন নিংড়ে সে যে রসটুকু সঞ্চিত ছিল তা কবিতাকারে গেঁথে তুলছিল, আর্ত্ত-হৃদয় শূন্যতার পানে তাকিয়ে মাঝে মাঝে হাহাকার করে উঠতো—আর না গো, আর না, মালা গাঁথা এখন স্থগিত রাখ।

কবিত্বের আধারকে সে মাতৃভাবে ভাবতে পারে নি, সে ধারণা কখনও কবির মনে জেগে ওঠে নি। সে কি ভাবে পেতে চেয়েছিল সে তাই জানে।

নিত্য সে যে বুকের রস আর চোখের ছেঁচে মালা গাঁথত তা আগে পড়ত তার আরাধ্যার চরণের তলে, তারপর রাজার কানে গিয়ে উঠত। রাজা খুসি হয়ে কবিকে যথেষ্ট পুরস্কৃত করতেন কিন্তু কবি তাতে কোনদিনই তৃপ্তি পায় নি।

পাষাণ প্রিয়া কবিতাটি হয়েছিল বড় সুন্দর। কবি এখানে যে নিজের ভাবটাই ফুটিয়ে তুলেছিল তা সে ছাড়া আর কেউই বুঝতে পারবে না।

কবিতার বিষয়টি ছিল—একটি পাষাণ মূর্ত্তির সামনে পাষাণীর বেদীর পরে অলক বাহুমূলে মাথা রেখে উপাসনা-রত একটি যুবক। সে যেন কত যুগ যুগান্তর ধরে এই পাষাণীকে এমনই গোপনে নীরবে পূজা করে যায়, নীরব চোখের জলে পাষাণীর পা দু'খানা প্রত্যহ ধুইয়ে দিয়ে যায়, কিন্তু পাষাণীর অন্তরে তার প্রেমের স্পর্শ লেগে তাকে জাগাতে পারলে না।

কবি লিখেছিলে—

হে মোর পাষাণ প্রিয়া—
চিরদিন তোমা পূজিব এমনি
নিরাশা অশ্রু দিয়া।

তার বুকের গোপন ব্যথা এই কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছিল, এই কবিতার মধ্যে দিয়ে সে ব্যক্ত হ'য়ে পড়েছিল।

রাজা কবিতা পড়ে ভারি খুসি হয়ে উঠলেন। সেদিন তিনি নিজের কণ্ঠ হ'তে বহুমূল্য মুক্তার মালা খুলে স্বহস্তে কবির গলায় দুলিয়ে দিলেন।

শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেয়েও কবির মুখে হাসি ফুটল না। সে তো এ পুরস্কার রাজার কাছ হ'তে পেতে চায় নি, তার পাষাণপ্রিয়া----

ফিরে বাড়ী এসে সে ঘরের দরজা খুলে দিল। মেঝের বেদীর 'পরে সেই পাষাণী মূর্ত্তি। বাল্যকালে এই মূর্ত্তিকে সে পেয়েছিল, পূজা করবার উপদেশ ছিল, কিন্তু দুর্দ্দান্ত হৃদয় কোনদিন মাতৃরূপে এ মূর্ত্তিকে ভাবতে পারে নি।

কবির মনে হত—যেন সে কত জন্ম-জন্মান্তর হতে এই পাষাণীকে ভালবেসে আছে, প্রত্যেক জন্মই তার ব্যর্থ হয়ে গেছে, পাষাণীর বুকে প্রাণ সঞ্চার করতে সে পারে নি।

সে দিনে রাজপ্রসাদ লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সে শুনতে পেলে গুণমুগ্ধা রাজকুমারী তার কণ্ঠে বরমাল্য পরিয়ে দেবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন, রাজারও তাতে অমত নেই।

পাষাণীর পায়ের কাছে সে বসল, রাজপ্রদত্ত মালা ছড়া সে পাষাণীর গলায় পরিয়ে দিলে, অপলক দৃষ্টিতে সে পাষাণীর পানে তাকিয়ে রইল।

ওগো,—একবার চেতনা জাগাও তোমার বুকের মধ্যে, তোমার অন্তরের পরশ ভক্তকে একটিবার মুহূর্ত্তের জন্য দাও। সে আর কিছু চায় না; রাজ প্রদত্ত সম্মান, রাজকুমারীর

প্রেম সব সে তুচ্ছ করে, কেবল তুমি,—ওগো পাষাণপ্রিয়া—তুমি একবার জাগো—একবার জাগো।

কবি কি উন্মাদ,—নইলে সে পাষাণীর মুখে হাসি দেখবে কেন, পাষাণীর চোখে কটাক্ষ দেখবে কেন ?

একনিষ্ঠ প্রেমিকের একান্ত সাধনা পাষাণীর বুকে সত্যই চেতনা জাগালে, মরার রাজ্যে জীবিতের সাড়া পড়ল।

বাঁশীর মত সুর ভেসে এল—"আমায় কি যথার্থ ভালবাস, আমায় পেলে কিছু চাও না ? ভেবে দেখ—যশ, মান, ঐশ্বর্য্য, সুন্দরী স্ত্রী, তোমার সামনে আকাঙ্ক্ষিত জিনিস সব পড়ে।"

উন্মাদ কবি চীৎকার করে উঠল, "না, আমি কিছু চাইনে প্রিয়া, আমি শুধু তোমায় চাই।"

"কিন্তু আমায় পেতে গেলে তোমায় সব ছাড়তে হবে, সংসারে বাস করেও সংসারের মধ্যে তো থাকতে পাবে না।"

কবি বলে উঠল, "আমি কিছু চাইনে প্রিয়া, সংসার আমার কাছে মরে যাক, তুমি একা আমার কাছে জীবন্ত থাক।"

"তবে এস—"

পাষাণী তার পাষাণ বুকের 'পরে কবিকে টেনে নিলে। কবি তার বুকে পাষাণের মধ্যে কোমলতা শীতলতার উষ্ণতা অনুভব করলে। প্রবল সুখে তার চোখ মুদে এল, সে পাষাণীর বুকে লুটিয়ে পড়ল।

পরদিন সকলে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল কবি উন্মাদ হয়ে গেছে। কি বলছে, কি করছে তার ঠিক নেই।

সেকালের নর্ত্তকীর বেশ

আমাদের থিয়েটারগুলিতে সখী সম্প্রদায়ের বা ব্যালেট গার্লদের সমাবেশে সম্প্রতি অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও পৌরাণিক নাটকাদির অভিনয়ে ঠিক সেকালের নর্ত্তকীদের নাচ দেখিতেছি বলিয়া মনে হয় না। কেননা তাঁহাদের বেশভূষা বড্ড বেশী আধুনিক ঘেঁসা হইয়া পড়ে। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষেরা নর্ত্তকীদের প্রসাধন ও বেশ বিন্যাসে প্রাচীনকালের রীতি-নীতির প্রতি খুব মনোযোগ দেন বলিয়া মনে হয় না। মথুরা মিউজিয়মে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম শতাব্দীর অনেকগুলি নর্ত্তকীর ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি আছে। সেগুলির ফটো আনাইয়া পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ের সময় নর্ত্তকীদের বেশ তদনুযায়ী করিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। মথুরার নর্ত্তকী মূর্ত্তির কেশ প্রসাধন এতই মনোহর যে অনেক মেমসাহেব তাহার সামনে ক্রমাগত কয়েকদিন ধরিয়া বসিয়া সেই প্রসাধন কৌশল আয়ত্ত করেন।

আমাদের প্রাচীন বাঙ্গলা কাব্যেও সেকালের নর্ত্তকীদের বেশ সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যে প্রাচীন নৃত্যের বেশভূষার বর্ণনা পাইলে, তাহা পৌরাণিক যুগের প্রথানুযায়ী বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে। আমরা নিম্নে ষোড়শ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাস কৃত পদ্মপুরাণ হইতে নর্ত্তকীর বেশের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করিতেছি। থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্গত বোধ করিলে বর্ণিত বেশের অনুরূপ বেশ বাঙ্গলা ষ্টেজে পৌরাণিক নাটকের অভিনয়ে চালাইতে পারেন। হয়তো ইহা আধুনিক রুচির

সকল দেবের খাপ খাইয়ে না—কিন্তু একটু আধটু অদল বদল করিয়া এরূপ বেশ প্রবর্তন করিলে অবশ্য তাহা প্রাচীন আর্যদের বেশ হইবে।

বেহুলা দেবসভায় নৃত্য করিতেছেন। নিম্নে তাঁহাদের বেশের বর্ণনা দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মপুরাণ হইতে দেওয়া যাইতেছে—

মণিময় কর্ণফুল শোভে কর্ণমূলে।
তদুপরে মুক্তাবলী ঝলকে উজ্জ্বলে॥
নাসিকা অগ্রেতে চারু গজমুক্তা দোলে
কুঙ্কুমে লেপিয়া স্তন ঢাকিল কুঙ্কুমে॥
গলে পরে গ্রিবাপত্র মুকুতার মালা।
মণি মরকতে গাঁথা মধ্যে স্বর্ণমালা॥
হাতে পায়ে বাজুবন্ধ মুখতল বেড়া।
তাড় বাহুটী আর সুবর্ণের চূড়া॥
অঙ্গদ বলয় পরে কেয়ূর কঙ্কণ।
রতন অঙ্গুরী পরে অতি সুশোভন॥
নেতের চলনার উপরে পাটশাড়ি।
তার উপরে ঘাঘর পরিল কটি বেড়ি॥
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা আর ঝাঝর কিঙ্কিণী।
নাভির উপরে পরে নীবিবন্ধ ঘনি॥
চরণ যুগলে পরে নূপুর পঞ্চম।
উধ্যাট পরিল আর নালুয়া উত্তম॥
হাতে পায়ে পরিলেক আলতার বোল।
চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ সৌরভে অতুল॥
বিচিত্র উড়নী দিয়া ঢাকে কলেবর॥
তাতে কত চিত্র আছে দেখিতে সুন্দর॥

(৩৭২ পৃষ্ঠা)

এই বেশের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে নর্ত্তকীদের চারিপ্রস্থ পরিধান পরিতে হইবে—(১) সর্বনিম্নে নেতের চালনা—খুব সম্ভব আজকালকার পেটিকোট গোছ কিছু (২) তাহার উপর শাড়ি ও বুকে কাঁচুলি ৩) ঘাঘরা—তাহা "নীবিবন্ধ ঘনি" দিয়া আঁটা থাকিত (৪) উড়নী। এরূপ বেশে তাহাদের সৌন্দর্য্য পরিস্ফুট হইত অথচ দর্শকদের মনে কাম লালসা জাগরিত হইত না।

স্বর্গের নর্ত্তকী ঊষা দ্বিজ বংশীর বর্ণনা অনুসারে কেমন করিয়া নাচিয়াছিল, তাহা বলাও বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মাথায় জলের ঘটি দুই হাতে তাল বাটি
নাচে কাঁচা সরার উপরে।
একপায়ে করি ভর ফিরিছে যেন ভ্রমর
মনসা তখন মন হরে।

"কাচা সরার উপর" নাচিতে বোধ হয় এ যুগের শ্রেষ্ঠ নর্ত্তকীও সমর্থ হইবে না।

মায়ের দরদ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

যখনকার কথা আমরা বলিতেছি যখন পদ্মার তীরে পরগণা বিক্রমপুরের এলাকার মধ্যে বহর নামে এক সমৃদ্ধি-শালী জনপদ ছিল। বহু দিন পূর্ব্বে উহা কীর্ত্তিনাশার জঠরে লীন হইয়া গিয়াছে, আজ তাহার নাম মাত্র অবশিষ্ট আছে। বর্ত্তমানে বিক্রমপুরের যে স্থানকে রাজবাড়ী বলে, সেখানে অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও, স্বনামখ্যাত চাঁদ রায় কেদার রায় কর্ত্তৃক তাঁহাদের জননীর শেষ পার্থিব শয্যার উপর প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্ববঙ্গে "রাজবাড়ীর মঠ" নামে প্রসিদ্ধ, এক সুবৃহৎ গগন-স্পর্শী ইষ্টকস্তূপ বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাদের মাতৃভক্তির পরিচয় প্রদান করিত। ঐ ইষ্টকস্তূপ পদ্মার অনাবৃত সলিলবক্ষের উপর দিয়া দূর দূরান্তর হইতে দৃষ্ট হইত এবং বিক্রমপুরের তটভূমির একটী বিশেষ চিহ্ন (Landmark) বলিয়া সমাদৃত হইত। আজ তাহার চিহ্নমাত্র নাই, সর্ব্বনাশিনী কীর্ত্তিনাশার গর্ভে কোথায় তলাইয়া গিয়াছে! যেখানে "রাজবাড়ীর মঠ" ছিল, এক্ষণে তাহারই সন্নিকটে একটী ষ্টীমার ষ্টেসন আছে। লোকে উহাকে "রাজবাড়ী ষ্টেসন" বলিলেও ষ্টীমার কোম্পানী কাগজপত্রে এবং টিকেটে উহা "বহর" অথবা "বোহার" নামে লিখিত হইয়া থাকে। আমরা বহর নামে যে স্থানের কথা বলিতেছি সেস্থান উপরোক্ত বহর বা বোহার হইতে অনেকটা দূরে অবস্থিত ছিল। আসল রাজবাড়ী যাহা ছিল তাহাও এখন পদ্মার গর্ভে। যাহা হউক সে বিচার আমাদের নিষ্প্রয়োজন।

তৎকালে বহরের জমীদার চৌধুরী বাবুদের প্রবল প্রতাপ,—তাঁহাদের শাসনে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাইত। তাঁহাদের প্রতিবেশী রাজাবাড়ীর বাবুদের ঐশ্বর্য্য এবং ক্ষমতাও তাঁহাদের অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। সুতরাং উভয়ে যে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বি হইয়া উঠিবে, নিজেকে অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অচিরকালের মধ্যেই পরস্পরের এই প্রতিযোগিতা ঘোরতর শত্রুতায় পরিণত হইয়া উঠিল।

পদ্মার স্বভাব এই যে সে যেমন ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে একপারেরভূমি ভাঙ্গিয়া চূরিয়া নির্ম্মূল করিতে থাকে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে আবার অন্য কোথাও গড়িতেও থাকে ফলে তাহার বক্ষে দুই চারি বৎসর পরপর দুই একটা করিয়া নূতন ভাসিয়া উঠে, তাহার কোন কোনটা দুই চারি বৎসর পর আবার তলাইয়া যায়, কোন কোনটা বা টিকিয়াও যায়। নূতন চর দেখা দিলেই তাহা দখল করিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী জমীদারগণের হুড়াহুড়ি লাগিয়া যায়,—সকলেই বলে—"ইহা আমার মুক্ত জমিদারীর সীমানার অন্তর্গত সুতরাং ইহা আমার"। তখনকার দিনে জোর যার মুলুক তার। দেশটা তখনও এমন ভাবে চারিদিক হইতে আইনের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ে নাই, যত্র তত্র জমপুলিসের আড্ডাও স্থাপিত হয় নাই।—সুতরাং এমন অবস্থায় সালিশী সাব্যস্ত মীমাংসার কথা কেহ কহে না, সকলেই গায়ের জোরে লাঠী সড়কীর সাহায্যে নিজ নিজ অধিকার কায়েমী করিয়া লইতে চায়, এবং তার জন্য প্রয়োজন হইলে দুই দশটা খুন জখম করিতেও কিঞ্চিন্মাত্র পশ্চাৎপদ হয় না।

এই সমস্ত চর লইয়া, জমিদারীর সীমানা লইয়া এবং নানাবিধ ছোট বড় খুটীনাটী বিষয় লইয়া প্রায়ই এই দুই ঘর জমিদারের মধ্যে বিবাদ হইত। তাহারা নিজেরাই নিজেদের

বিচারক তাই তাঁহাদের বিবাদ অনেক সময় রাজদ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছিত না।

তাঁহাদের শত্রুতার বোধ হয় আরও একটা বিশেষ কারণ ছিল। একথা সকলেই জানে যে বাংলাদেশে এমন একটা সময় ছিল যখন সম্ভ্রান্ত ক্ষমতাপন্ন লোক মাত্রেই সুযোগ পাইলে দুই চারিটা ডাকাতি করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেন। তখনকার দিনে ডাকাতি করাটা কেহই লজ্জার বিষয় মনে করিতেন না, পরন্তু উহা পৌরুষের লক্ষণ বলিয়াই বিবেচিত হইত। অবশ্যই বহর এবং রাজাবাড়ীর বাবুরা ডাকাতি করিতেন এমন মানহানিকর কথা সাহস করিয়া প্রকাশ্যে তৎকালে কেহ বলিত না, এখনও বলে না। নানা লোকে নানারূপ কানাকানি তখনও করিত এখনও করে। আমরা ছেলেবেলায় ঠাকুরমা দিদিমা'র কাছে এ সম্পর্কে দু' একটা রূপকথাও শুনিয়াছি।

ডাকাতি তাঁহারা করুন আর না করুন তখন দেশে জলে স্থলে ডাকাতি হইত প্রচুর। কাহারও ঘরে অনেক নগদ টাকা আসিয়াছে বা জমিয়াছে এরূপ সংবাদ রটিলেই ডাকাত মহাশয়গণের টনক নড়িত, যেখানকার যে সকলেই উহা গ্রাস করিবার জন্য সচেষ্ট হইতেন। এমন অবস্থায় যে দল আগে যাইয়া পড়িতে পারে তাহাদেরই জিত। সুতরাং সকলেই আগে যাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত এবং কখনও কখনও প্রতিপক্ষের অগ্রগমনের পথে বাধা উৎপাদনে সচেষ্ট হইত। কখনও কখনও একই গৃহস্থের দ্বারে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যাইত এবং যতক্ষণ না একদল পরাভূত হইয়া বিদূরিত হইত ততক্ষণ বিবাদ মিটিত না। গৃহস্থ এরূপ সুযোগ উপস্থিত দেখিলে প্রায়সঃ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিত, কচিৎ বা একদলকে উৎকোচে বশীভূত করিয়া অপর দলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইত। ছোট বড় দল যদিও অনেক ছিল তথাপি বহরের অথবা রাজাবাড়ীর বাবুদের নাম শুনিলে অপর কেহ সে-মুখো হইত না।

সেকালে জমিদারী বজায় রাখিতে হইলেই উপযুক্ত লোকজন পুষিতে হইত। 'নবীর চর' তখন বহরের বাবুদের অধীনে। ঐ স্থানটা ছিল তাঁহাদের লোক পুষিবার আড্ডা। নবীর চরে তখন এমন গৃহস্থ ছিল না, যাহার ঘর হইতে প্রয়োজন পড়িলে দুই চারিগণ্ডা লাঠী সড়কী কিম্বা দুই চারিখানা রাম দা' বাহির হইত না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব নৌকা ছিল, তন্মধ্যে কেহ কেহ বা একাধিক নৌকার মালিক ছিল। বর্দ্ধিষ্ণু যাহারা তাহারা বড় বড় নৌকায় নানাবিধ মাল বোঝাই দিয়া নিকটস্থ বন্দরে বন্দরে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইত, এবং যাতায়াতের পথে সুযোগ সুবিধা জুটিলে দুই একটা রাহী নৌকা মারিতেও কুণ্ঠিত হইত না। সুতরাং বলা বাহুল্য নবীর চরে তখন নিতান্ত গরীব কেহ ছিল না।

নবীর চর হইতে কিছুদূরে তে-মোহনার চর নামে আর একটা চর ছিল। তথায় রাজবাড়ীর বাবুদের লোক পুষিবার অমনি একটা আড্ডা ছিল। উভয় দলই পরস্পরের এই দুই গুপ্ত আড্ডার সংবাদ রাখিত এবং মাঝে মাঝে পরস্পরের সর্ব্বনাশ সাধন মানসে প্রতিপক্ষের আড্ডা আক্রমণ করিয়া লুঠতরাজ করিবার প্রয়াস পাইত। ফলে কখনও কখনও দুই চারিটা খুন জখমও হইয়া যাইত। এইরূপ হইতে হইতে ক্রমশঃ মুনিবদের শত্রুতা ছাড়াও তে-মোহনার চর এবং নবীর চরের মধ্যে আপনা আপনি একটা ভীষণ শত্রুতা গজাইয়া উঠিয়াছিল। এক চরের লোক অপর চরের কোন লোককে বাগে পাইলে ছাড়িয়া দিত না—তা সে যেখানে যে অবস্থায়ই হউক।

পুরুষেরা অনেক সময় ঘরে থাকিত না, তাই এই দুই চরের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলকেই সকল সময়ে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত। তাহারা সকলেই অল্প-সল্প লাঠী ধরিতে জানিত, ঢাল সড়কী ব্যবহার করিতে পারিত এবং প্রয়োজন পড়িলে নৌকা চালনায়ও পশ্চাৎপদ হইত না। পীনা এবং টেঁপা কেহই এ-সকল বিষয়ে তাহাদের সমবয়স্ক কাহারও অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন ছিল না।

(ক্রমশঃ)

কোকিলের কেরামতি

[শ্রীমতী সরসীবালা দেবী]

পাত্রপাত্রীগণ

বন্ধুত্রয় {
ডাঃ গুণসিন্ধু বটব্যাল M. B.
কোকিলেশ্বর রায় M. A. B. L.—উকীল
বিজলীভূষণ বসু M. A.—কবি ও সাহিত্যিক
}

পশুপতি সেন—এ্যাটর্ণী

সুরমা—বিজলীর স্ত্রী

প্রথম দৃশ্য।

বিজলীর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম—

[বিজলীর বয়স আন্দাজ ২৫।২৬—বিজলী একখানি ইজি চেয়ারে সাহিত্য চিন্তায় মগ্ন—পরিধানে গরদের কাপড়, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে নাগরাই লপেটা, মুখে সিগারেট, মাথায় বাবরি চুল, মাঝখানে সরু সিঁথি চোখে চশমা।]

সুরমার প্রবেশ—সুন্দরী, বয়স, ১৯।২০।

সুরমা। বলি হ্যাঁগা—দিন নেই, রাত্তির নেই—চব্বিশ ঘণ্টাই কি কালী, কলম আর কাগজ নিয়ে খেলা করতে হয়?

বিজলী। একে তুমি খেলা বল সুরমা? বাণী বীণাপাণির সেবা, যাঁর প্রসাদের এককণা লাভ করে, ব্যাস, বাল্মীকি, হোমর অমর, সেটা হোলো খেলা আর হাতা এবং বেড়ী খেলাটাই হোলো মস্ত কাজ! বেশ বলেচ!

সুরমা। কে বললে? তবে একথা ঠিক যে ঐ দুটি যন্ত্র আমাদের হাতে নিয়মিতরূপে না চললে তোমাদের হাতের কলম যে আপনা হ'তেই খসে পড়বে। বীণাপাণির বাণীর হাজার ঝঙ্কারেও তার সাড়া মিলবে না।

বিজলী। তা যা বলেচ। এখন একটু ভেতরে যাও—এইমাত্র inspiration এসেছে—একটু বকলে কবিতার মিল কিছুতেই জুটবে না।

সুরমা। তা ত যাচ্ছি—কিন্তু যে কথা বলতে এসেছিলুম। এইবার একটা চাকরী বাকরীর চেষ্টা করো। পুঁজি যা ছিল, তা ত ফুরিয়ে এল। তাই বলছি,—

ভারতীরে ছাড়ি ধর এইবেলা লক্ষ্মীর উপাসনা, নইলে চারিদিক সামলানো দায় হয়ে উঠেছে!

বিজলী। বুঝলুম সুরমা, কিন্তু চাকরী কে আমায় দেবে? M. A. first classএ পাশ করেছি—সোণার মেডেল পেয়েছি—কিন্তু তা'তে কার কি এল গেল? ভদ্রলোকের চলে এমন মাইনের চাকরী তাদেরই একচেটে যাদের পিছনে মোটা মুরুব্বি বা জোরালো সুপারিস আছে। সময় সময় মনে হয় যে লেখাপড়া শিখে, এরকম সময় ও শক্তির অপব্যয় না করে যদি কোনো সুদূর পল্লীগ্রামে গিয়ে চাষবাস করে জীবিকা অর্জ্জনের সহজ এবং সরল পন্থা শিখে নিতে পারতুম! তাতে সুখ না পাই শান্তি পেতুম। সেখানে একখানি ছোট কুটীর বেঁধে নিতুম—সারাদিন মাঠে মাঠে খেটে এসে সন্ধ্যেবেলার চাঁদের আলোয় বসে তোমার মুখের গান যখন শুনতুম, তখন—

সু। থাক্ থাক্, কবি-কল্পনা যে রাশ ছিঁড়ে ছুটেছে সহর ছেড়ে একেবারে পল্লীগ্রামের ক্ষেতে, মাঠে, বাটে! আমার মুখের গান তোমার যদি অত ভালোই লাগে তবে তোমারই লেখা একখানা গান না হয় শুনিয়ে দিচ্ছি—

গান

পাগল হলেম খুঁজে খুঁজে
খুঁজে হলেম দিশেহারা,
কমল বনে খুঁজে এলেম,
খুঁজে এলেম গ্রহতারা!
চোখে তোমার পাইনে দেখা
বীণাটি শুনি কাণে;

তোমার অমল রূপের রেখা
লেখা সে চিত্রে গানে !
তোমার ঐ সোনার চাবি তায় খুলে তায়
ওগো তায় খুলে তায়
অন্ধকারের বদ্ধ কারা !
চোখে তোমার পাইনে দেখা,
তোমার কমল ফুলের পাপড়িগুলি ;
এ বন ওবন সে বন করে
আমরা তুলি আমরা তুলি !
তুলে তুলে হলেম সারা !
পাগল হলেম——

বিজলী। নাঃ বেশ গেয়েছ সুরমা। আমার কথাগুলো সুর দিয়ে এমন প্রাণবন্ত করে তুলেছ !

[গুণসিন্ধুর বেগে প্রবেশ। কোকিলেশ্বর গুণসিন্ধুকে ধরিয়া আসিতেছে—উভয়েরই বয়স আন্দাজ ২৫.২৬—নব্য যুবক। গুণসিন্ধু ইউরোপীয় পোষাকে ভূষিত—Open breast coat, half pant, মাথায় হ্যাট্, টাই বা বো নাই। কোকিলেশ্বরের পরিধানে নরুণ পাড় কাপড় ও গায়ে গেঞ্জি —পায়ে চটি।]

(সুরমার সলজ্জ প্রস্থান)

গুণসিন্ধু। ছাড় ভাই ছাড়—একটু জিরিয়ে হাঁফ ছেড়ে নি। বেদম হয়ে গেছি একেবারে।

কোকিলেশ্বর। কেন কি হয়েছে, তুমি যেরকম ছুটে আসছিলে।

বিজলী। কহ বিবরণ কি-সের কারণ
করিছ এমন হে গুণসিন্ধু !
উঠিছ ফুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া
আকাশে ত কই ওঠেনি ইন্দু !

কো। কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল,
শির তার উড়াইব আন খাঁড়া ঢাল।

গুণ। (হাঁফ ছাড়িয়া) তবে তোমরা ছড়া কাটাকাটি কর, আমি চলি এখন।

কো। আরে তাও কি হয় ? কথাটা বলেই ফেল না একবার।

গুণ। আর ভাই বলো কেন ? বড়লোকের বাড়ী practice এবার উঠিয়ে দিতে হোলো—আর চললো না।

বিজলী। কেন কি হ'ল আবার ?

গুণ। হবে আবার কি ? কস্মিনকালে ডাকে না। কাল রাত্তির দুটোর সময় যখন কোন ডাক্তার মিলল না—তখন আমায় এসে হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। ব্যাপারটা সামান্য—পাকড়াসী সাহেবের ছোট ছেলের তড়কা হয়েছে।

কো। তারপর ? তারপর ?

গুণ। গেলুম—একটা prescription করে এলুম—কুইনিন ক্লোরোডিন mixture। বাড়ীতে এসে সবেমাত্র ঘুমিয়েছি, এমন সময় যমদূতের মতন এক দরোয়ান এসে হাজির। এসে বললে—দাওয়াইখানাকে বোললো, ওষুধ ভুল লিখা আছে। পাকড়াসী সাহেব বহুত গোসা করছে আর আপনার লিখাটা ফিরৎ দিয়েছে।

বিজলী। তারপর ?

গুণ। তারপর আবার কি ? এইখানেই কি যবনিকা পতন ? ব্যাপার আরো অনেকদূর গড়িয়েছে। ভাবছি কলকাতা ছেড়ে পালাই। বাড়ী ভাড়ার খরচ আর মোটরের খরচা কি করে জোগাই, অথচ পাওনাদারের তাগাদার বিরাম নেই।

কো। সহর ছেড়ে পালাবে বোলছো—আমাকে ভাই সঙ্গে করে নিয়ো।

গুণ। আমারও তাই ইচ্ছে। সত্যি ভাই বিশ্ববিদ্যালয় এই যে বছর বছর হাজার হাজার গ্রাজুয়েট বার করে দিচ্ছে—তাদের ভবিষ্যৎ কি ? দেশের যারা মাথা, তাঁরা স্বরাজ লাভ কি করে হয় তাই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কিন্তু দেশের এতগুলো ছেলে যে বেকার বসে আছে, খেতে পাচ্ছে না, তার জন্য কি একবারও ভাবে ?

কো। Exactly so, একটা ভালো রকম Scheme আমার মাথায় আছে, যেটা "আবাদ করলে ফলবে সোণা।" পারো ত এগিয়ে এস।

বিজলী। আমি প্রস্তুত। আমার অবস্থাটা ত জানো—
দিন যায় রাজে কাজে রাত বিনা নিদ্রে,
আনিটাও আসে না'ক কভু কোন ছিদ্রে।

তোমাদের ত professional qualification আছে—আমি যে ভাই merely a graduate হায়!

গুণ। Schemeটা প্রকাশ করেই বল না, একবার discuss করে দেখা যাক্ চলবে কিনা।

কো। শোন তবে ডাক্তার। Schemeটা খুবই সাধারণ। তুমি তোমার কুইনিন ক্লোরোডিন mixtureএর মতন টাইকো ক্যাম্বারাইডিন গোচের একরকম ট্যাবলেট করে ফেল। ক্যানভাস করবার ভার আমি নিচ্ছি।

গুণ। আরে রামঃ—আজকাল ত ট্রেণে ক্যানভাসারের জ্বালায় অস্থির। দাঁত কামড়ানো, পা কামড়ানো এমন কি সাপে কামড়ানো—সবরকম ওষুধের ক্যানভাসিং চলছে। আবার দেখেছি বই উপহার দিয়ে তেল চালাবার চেষ্টাও চলেছে। আর নামের কি বাহা! কোনটা শান্তিজল, কোনটা অগ্নিবল, কোনটা pure and antiseptic carbolic tooth-powder, কোনটা বা বিশুদ্ধ দন্তমঞ্জন যা দাঁতে দিলে নাকি মান ভঞ্জনের দায় হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

বিজলী। ওটা তোমার ভুল। আমি সেদিন মুকুন্দপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি হয়ে যাচ্ছিলুম। ট্রেণে দেখলুম খুব জোর canvassing চলেছে। ওটা একটা আর্ট।

কো। Bravo! canvassing যে একটা আর্ট জানি, তবে তাতেও রস তথা অর্থসৃষ্টির জন্য প্রতিভা আবশ্যক।

গুণ। ঠিক কথা, তবে এটাও সত্যি যে প্রতিভার ভিন্ন ভিন্ন দিক আছে। তোমারা উকীল মানুষ—একটা যুৎসই ideaই দাও না।

কো। Ideaর রাজত্বে কবিবর বিজলীভূষণ বাস করেন। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর।

গুণ। বিদ্রূপ রাখ। এই যে এত M. A. B. A. পাশ করে বেরুচ্ছে—University তাদের কি বিষয়ে equip করছে? তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনও ব্যবস্থা করে দিচ্ছে?

কো। ভুল ক'চ্ছ ভাই। University বিদ্যা ও বুদ্ধি দান করতে পারে। কিন্তু সেই বিদ্যা ও বুদ্ধি practically apply করতে পারো না বলেই এত কষ্ট। এমন সহর, পয়সা ছড়ানো রয়েছে, শুধু লোটবার অপেক্ষা। মাথা খাটাও, কি উপায়ে লুটতে পারো। কিহে কবি? Shelly, Browring, Keatsএর কর্ম্ম নয়।

গুণ। তুমিই ভাই একটা আইডিয়া দাও না—আমরা না হয় সেটা কি করে practically apply কর্ত্তে হয়, তার চেষ্টা করব।

কো। আচ্ছা তবে শোন। আমাদের একটা Association form করা যাক। নাম দাও Literary Legalmedical Association. ক্যানভাস করে তার সভ্য সংখ্যা বাড়াও। ভাল করে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দাও। আর ভ্যাটাভাল,-যা Suggest করেছি। তুমি কালই কতকগুলো বড়ি তৈরী করে ফেল—আমি বেরিয়ে পড়ি। Starve করার চেয়ে এতে সম্মান আছে। মক্কেলের আশায় আদালতে হাঁ করে বসে সময়ের অপব্যবহারের চেয়ে, সময়ের সদ্ব্যবহার হবে এতে।

গুণ। উকীলের বুদ্ধির দৌড় কতদূর দেখা যাবে।

কো। Just as you please. ওষুধের নাম দিয়ো টাইকো ক্যাম্বারাডাইন ট্যাবলেট। হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ো হাজার পাচেক—তার মর্ম্ম এই হবে যে এই ট্যাবলেট ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রয়োগ করলে ভিন্ন ভিন্ন রোগের উপশম হবে। আর স্তাখ, তোমাদের শাস্ত্র হাতড়ে একটা খুব ভালো ঘুমের দাওয়াই দিয়ো। পথে ঘাটে চলতে ওটা খুবই আবশ্যক হতে পারে।

(স্বগতঃ)—বুদ্ধির প্রয়োগ না অপ-প্রয়োগ? বিজ্ঞের মাথা নাড়াতে ভুললে উপোসী ছারপোকা হয়ে কাটাতে হবে। পেট যাদের ভর্ত্তি, তারাই নীতি শাস্ত্রের কর্ত্তা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রকাশ্য রাজপথ

নাগরিকগণের প্রবেশ ও গীত।

[নাগরিকগণের পরণে গেরুয়া, সঙ্গে খোল, খঞ্জনী ইত্যাদি *]

হরি তুমিই ধন্য ধন্য হে !
তোমার কৃপায় ওড়াই ফূর্ত্তি
পাণ দিয়ে খাই জরদা সুরতি
করি ঠেসে ঠুসে উদর পূর্ত্তি
সে শুধু তোমারই জন্য হে !
হরি তুমিই ধন্য ধন্য হে !

হরি তুমিই ধন্য ধন্য হে !
ধোঁয়া, জল আদি তোমারই সৃষ্টি
কল্‌কে বোতলে লাগে কি মিষ্টি
নেশা বলে গালি দেয় পাপিষ্ঠি
মূর্খ যাহারা বন্য হে।

হরি——
নিজের ভার্য্যা পরের বণিতা
ভেদ নাহি করি তুল্য গণি তা
প্রেম-ভাগিরথী তোমারই আনীতা
কে পারে তরিতে অন্য হে।

কারে দিব ফাঁকি করিয়া চাতুরী
সর্ব্বদা সেই সন্ধানে ঘুরি
ধাড়বাজি আর জাল জুয়াচুরি
করি না'ক পাপ গণ্য হে !

এ-সকল প্রভু পাপ হবে যদি
কেন তবে ওগো হেরি নিরবধি
রাম উপবাসী—নেপা মারে দধি
যার ধন তার ধন্ নহে !
হরি তুমিই ধন্য ধন্য হে !

তৃতীয় দৃশ্য—হাওড়া ষ্টেশন।

[প্ল্যাটফর্ম্মে গয়া প্যাসেঞ্জার। গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়া কলিকাতার বিখ্যাত এ্যাটর্ণী পশুপতিবাবু। কোকিলেশ্বর সুসজ্জিত হইয়া একটি নাতি-বৃহৎ সুটকেস লইয়া ঐ কামরায় উঠিল।]

কো। কি ভীষণ গরম পড়েছে।

পশু। গাড়ী ছাড়্‌ল বলে, এইবার একটু হাওয়া পাওয়া যাবে বলে আশা হয়। বাজে কাজের ঠেলায় অস্থির করে তুলেছে।

কো। আপনি বোধ হয় অপরের কাজে কোথাও যাচ্ছেন ?

পশু। হ্যাঁ ; বাসুদেবপুরে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় খুলছে—তার উদ্বোধনের ভার আমার উপর পড়েছে কিনা।

কো। বাসুদেবপুর বেশ বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ওখানকার অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত ও pullie-spirited.

পশু। বাসুদেবপুরে যাবার সৌভাগ্য এর পূর্ব্বে আমার ঘটে ওঠে নি—ওরা আমায় telegram করে সভাপতি হবার জন্য অনুরোধ করেছে।

কো। আপনি দেশের একজন গণ্যমান্য লোক। সাধারণ কাজে আপনার সহানুভূতি যথেষ্ট, সাধারণেরও তাই আপনার উপর দাবী আছে।

পশু। ফ্যানটা খুলে দেবেন একবার অনুগ্রহ করে ?

কো। বিলক্ষণ ! (উঠিয়া ফ্যান খুলিয়া দিল)

পশু। যা গরম পড়েছে ! পিপাসায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। এত বড় ষ্টেশন, একটা বরফ লেমনেডের ভেণ্ডারকেও দেখতে পাচ্ছি না।

(গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল)

কো। গাড়ী চল্‌তে আরম্ভ করেছে—আর পাবেন না। দেখুন শিক্ষিত হয়ে আপনারা এইসব ভেণ্ডারদের হাতে যা তা' কি করে যে খান বুঝতে পারি না। ওতে তৃষ্ণা ত ভাঙ্গেই না—উল্টে যত রোগের সৃষ্টি করে।

পশু। তৃষ্ণা যে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না।

কো। পথে চলতে গেলে একটু ব্যবস্থা করে সকলেরই বেরুনো উচিত। আমার কাছে দু' একটা খোট পিল

* (পূজনীয় কবি শ্রীযুক্ত কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের অনুমত্যানুসারে।)

আছে—এতে গলাও ভেজে, তৃষ্ণাও ভাঙে। একটা ব্যবহার করে দেখবেন কি ?

পশু। আপনার ত কোন অসুবিধা হবে না ?

কো। অত দ্বিধাবোধ করবেন না। একটা try করেই দেখুন না।

পশু। দিন তবে একটা—

কো। (একটা pill দিল) (স্বগতঃ) বেশ হ'ল একরকম। ঘুমিয়ে পড়বে এখুনি নিশ্চয়—বাসুদেবপুর পেরিয়ে না গেলে ঘুম ভাঙবার সম্ভাবনা নেই। আমিই যদি পশুপতিবাবু হয়ে বাসুদেবপুরে নাবি ? সুফলের সম্ভাবনা। না হয় ত আদর আপ্যায়নটা ত ভোগ করা যাবে।

পশু। (একটা pill খাইয়া) আঃ শরীরটা স্নিগ্ধ হয়ে গেল। কি সুন্দর pill আপনার। (অচিরে নিদ্রাভিভূত—ট্রেণ বাসুদেবপুরে থামিল। পশুপতিবাবু তখনও ঘোর নিদ্রাভিভূত—অতি সন্তর্পণে কোকিলেশ্বর ট্রেণ হইতে নামিল।)

কো। grand success ! কই লোকজন ত দেখছি না, যে আমায় অভ্যর্থনা করে সভাস্থলে নিয়ে যাবে।

(ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে দু' চারজন ভদ্রলোক কাহাকে যেন খুঁজিতেছিল—কোকিলেশ্বরকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া—আপনারই নাম কি পশুপতিবাবু ?

কোকিলেশ্বর। (ব্যস্ত হইয়া) আজ্ঞা হাঁ ; আপনাদের কাজ আরম্ভ হতে বিশেষ বিলম্ব হবে কি ? যা গরম পড়েছে ! অনুগ্রহ করে আমায় একটু শীঘ্র বিদায় করলে বাধিত হব।

১ম ব্যক্তি। আপনাকে বেশীক্ষণ কষ্ট দেবো না। সব প্রস্তুত—সভায় লোক আর ধরে না। আপনার উপস্থিতির অপেক্ষা মাত্র।

কো। ট্রেণ একটু লেট্ করেছে কিনা।

২য় ব্যক্তি। আপনার caseটা আমায়—

কো। মাপ করবেন—এটা বয়ে নিয়ে যাবার শক্তি আমার আছে।

৩য় ব্যক্তি। কি সৌজন্য।

চতুর্থ দৃশ্য পল্লীপথ।

পল্লীবালাগণের প্রবেশ ও গীত।

আমরা সবাই পল্লীবালা পল্লীগ্রামে বাস
ফলছে যেথা সোনার ফসল ফলছে বারোমাস
ধানের ক্ষেতে কোথা সোনার ঢেউএর খেলা গো
পুকুরেতে শঞ্চী শাক আর মাছের মেলা গো
দিনের বেলা সূর্য্যিমামা, রাত্রে সোনার থালা
মাথার উপর ঘোরে সদাই—আমরা পল্লীবালা।

সহরবাসী আমরা তোমার ঘৃণার পাত্রী নই
এমন সুখ ও শান্তি তোমার সহরেতে কই ?
কোথা এমন দীঘির ছায়া, লীচু আমের বন
গরম দিনে নরম করে, উদাস করে মন।
দিনের বেলা সূর্য্যিমামা——

পুকুরঘাটে পল্লীবালার এমন মিলন স্থান
এমন খোলা গলাগলি, এমন সরল প্রাণ
সহরেতে মিলবে নাক খুঁজলে হাজারবার
পল্লীগ্রামের কণামাত্র সরল সভ্যতার।
দিনের বেলা সূর্য্যিমামা——

পঞ্চম দৃশ্য।

সভাস্থল—বহুলোক সমবেত।

১ম ব্যক্তি। আমাদের এই সভায় আজ স্বনামধন্য এ্যাটর্নী পশুপতি বাবুকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে প্রস্তাব করি।

২য় ব্যক্তি। আমি এই প্রস্তাব সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। (করতালি)

(কোকিলেশ্বর সভাপতির আসন গ্রহণ করিল। দুজন বালিকা কোকিলেশ্বরের গলায় মালা পরাইয়া দিল)

উক্ত বালিকাদ্বয় কর্ত্তৃক উদ্বোধন গীত।

আজি শুভ এ লগনে মধুর রাত্রে
হৃদয় স্ফটিক কনক পাত্রে—
প্রীতি-সুরা প্রেম-মদিরা
ঢাল ঢাল ঢাল লো!
কর সকল কণ্ঠ-সিক্ত সরস
আনো সকল প্রাণে পুলক পরশ
বিবশ অঙ্গ চরণ অবশ
প্রীতি সুরা ----
ক্ষণেকের তরে ভুলাইয়া দে রে
তুমি আর আমি দুজনে দুধারে,
ধর সকল কণ্ঠে সকল অধরে
প্রীতি সুরা——
সঙ্গীত রব আম্র বকুল
করুক সুরভি করুক আকুল
প্রীতি সুরা——

(কোকিলেশ্বর বক্তৃতা করিতে উঠিল)

সমবেত সভ্যমণ্ডলী ও ভদ্রমহিলাগণ, আপনারা আজ আমায় যে সম্মানে ভূষিত করেছেন, সে সম্মানের যোগ্যতা লাভ করতে হলে, শত জন্ম তপস্যা করতে হয়। আমি সেই তপস্যা করেছি—তারই পুণ্যফলে আমি আজ এই আসনে আসীন। আপনাদের শুভ কামনায় এই তপস্যা ভঙ্গ করবার ইচ্ছা আমার আদৌ নেই।

এখন প্রথাগত ভণিতা ত্যাগ করে আসল কথায় নামা যাক্। ঐ যে কোণে জীর্ণ কঙ্কালসার গুটিকতক ব্যক্তি দেখছি, তার জন্য দায়ী আমাদের ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট নয়, একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি। যে ভণ্ড বলে যে বাংলা দেশ অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেনি, তার ঘর-দুয়ার লণ্ডভণ্ড করতে কারুর কিছুমাত্র কাতর হবার কারণ দেখি না। প্রকৃতির নিয়মের সহিত অসহযোগ করতে জগতে কোন জাতি এমন দক্ষতা লাভ করেছে? মহাত্মা গান্ধীর চেয়েও অসহযোগ দেখিয়েছেন, আমাদের দরিদ্র এই গ্রামবাসীরা (করতালি) উদরে অন্ন নেই, পিলে আছে, গায়ে বস্ত্র নেই, রোগ আছে—এই যে সমবেত ভাইবৃন্দ প্রকৃতির নিয়মের সহিত অসহযোগ করে স্বার্থশূন্য হয়ে এত কষ্ট নীরবে ভোগ কচ্ছেন—তাঁদের আমি প্রণাম করি। তাঁরা আমার প্রণম্য, মহাত্মা গান্ধীরও প্রণম্য (জোর হাততালি) আমার ধারণা এই আইডিয়া মহাত্মাজী চুরি করেছেন, আমাদের বাংলাদেশের কাছ থেকে। জানি এইরূপ দুঃসাহসিক বাণীর ফল কি—জানি এই কথা শুনলে ভদ্রমণ্ডলী আমায় যষ্টি তাড়না করে সভাগৃহ থেকে বহিষ্কৃত করে দেবেন, কিন্তু সব সইতে পারি—চুরি অসহ্য, অসহনীয়।

অনেক বাজে কথা বললুম—কিছু মনে করবেন না। মনে যদি করেন ত আপনাদের দিবা, রাত্রে আমার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটবে। চরম অসহযোগীর জীবন্ত নমুনা ভাইবৃন্দ, এখন অসহযোগের কর্ম্ম নয়। ইংরাজরাজ সইলেন না, রাজাধিরাজ সইবেন কেন? তাই আজ এত রোগের উৎপত্তি। আমার এই বিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে রোগ নিবারণকল্পে প্রথম ওষুধ নীরোগ হওয়া। দ্বিতীয় ওষুধ এই যে প্রকৃতির নিয়মের সহিত পুরামাত্রায় সহযোগ যদি সম্ভব না হয়, ত Responsive Co-operation পন্থী হলেও চলবে। তৃতীয়তঃ হাসপাতাল, যেখানে ভাল ডাক্তার ভাল ওষুধ বিতরণ করবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় পয়সা দিতে গেলে চিকিৎসালয় এবং ডাক্তারের উপকার নেই বললেই চলে। সুতরাং আবশ্যক দাতব্য চিকিৎসালয় যার ভিত্তিপ্রস্তর বহুপূর্ব্বে স্থাপিত হয়েছে, তার উদ্বোধনের জন্য আপনারা আমায় তার করে কলকাতা থেকে সাদরে নিমন্ত্রণ করে এনেছেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে এনসাইক্লোপিডিয়া থেকে বড় বড় কোটেশন করে আপনাদের ধৈর্য্যহীন করতে চাই না। শুধু এই কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে এই বিংশ শতাব্দীতে পচা হাসপাতালের স্থান মানুষের জন্য নাই—যদি থাকে ত ঐ সব শুভ্রকায় ডিম্ব প্রদায়িনী হাঁসের জন্য আছে। বিজ্ঞান এত উন্নতি লাভ করেছে যে সভ্যদেশে আজকাল রেল উঠে গেছে, জাহাজ ডুবে গেছে, এরোপ্লেন উড়ে গেছে—আছে কেবল এক অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ যা উদরকম্প থেকে ভূমিকম্প পর্য্যন্ত, হিমালয় থেকে কুমারিকা

অন্তরীপ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সব কাজে লাগে। এখন আর হাসপাতালে পড়ে পড়ে রোগ যন্ত্রণা ভোগ করবার বা বহুমূল্য সময় কর্ত্তনের আবশ্যক নেই। এই যে tablet দেখছেন, এর নাম টাইকো-ক্যাম্বারাভাইন ট্যাবলেট—পৃথিবীর বিখ্যাত চিকিৎসক মিঃ ভ্যাটাভালের আবিষ্কার। একমাত্র সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগের আশু উপশম হবে, এবং এমন কি স্বর্গ বলে যদি কোন জায়গা থাকে ত ইহা সেবনে তা আপনাদের সশরীরে প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ ঘটবে।

সুতরাং সভ্য এবং সভ্যাবৃন্দ, নব্য এবং নব্যা মণ্ডলী, বুঝতেই পাচ্ছেন, আপনারা এই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠান করে কত অর্থ এবং সময়ের অপব্যয় করেছেন। অপব্যয় করুন, তা'তে দুঃখ নেই, কিন্তু কষ্ট আছে। সেই কষ্ট যাতে সইতে না হয়, তার জন্য মাত্র একটাকা মূল্যে এক এক বটিকা কিনে রাখুন এবং এই যে বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেছেন, মানব-হিতকল্পে তাকে এই ট্যাবলেট প্রস্তুত করণের কর্ম্মশালায় পরিণত করুন। আমার সহানুভূতি স্বরূপ এই মুহূর্ত্তে আমি এক শত বটিকা কিনিয়া লইতেছি। আসুন, কে নেবেন এই বড়ি। মাত্র একটাকা নগদ মূল্য এক টাকা—দেরী করবেন না, দেরী করলে বুঝব, আমি উলুবনে এতক্ষণ বক্তৃতাই ছড়িয়েছি।

(বড়ি কিনিবার জন্ত ব্যস্ততা ও কোলাহল, অনেক টাকা উঠিল)

(একটু ঠাণ্ডা হইলে) আপনাদের সহানুভূতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আপনারা কালই সংবাদ পত্রের স্তম্ভে আপনাদের বদান্যতার বিশেষ বিবরণ পাঠ করে মোহিত এবং আত্মহারা হবেন। পুনরায় প্রকৃতিস্থ হতে হলে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এই বটিকা নিজে হাতে করে মুখে ফেলে দেবেন। দেখবেন কি আশ্চর্য্য ফলপ্রদ বটিকা আজ আপনারা পেয়ে ধন্য এবং কৃতার্থ হলেন।

আমার কাজ শেষ হয়েছে—গলাও ভেঙ্গে এসেছে। বড়ই দুঃখিত হচ্ছি যে ভাইবৃন্দের নিকট এত শীঘ্র বিদায় নিতে বাধ্য হচ্ছি। পাষাণ রেল যে আমার জন্ত অপেক্ষা কর্ব্বে না—এতই পাষাণ জানবেন। আমার বুকে রক্ত নেই, চোখে জল নেই—যা ছিল, এই বক্তৃতায় সব খরচ করে ফেলেছি—নইলে এতক্ষণে সভাস্থলে রুধিরাশ্রুতে প্লাবিত এবং ভাসিত হয়ে যেত।

(করতালি ও সভাভঙ্গ)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিজলীর ঘর—সুরমা গান গাহিতেছিল—

বরিষে বারিধারা শ্রাবণ নিশা
বিরহ জলে বুকে মিলন তৃষা
বিজলী—চারিধারে চমকি উঠে
হৃদয় তারে তারে প্রবাহ ছুটে
পড়ি লুটে ওগো পড়ি লুটে
খুঁজে পাইনা দিশা
মেঘেরি গরজন শ্রবণে আসে
একাকী নিরজনে শিহরি ত্রাসে
প্রাণেরি প্রিয়বঁধু কোথা হে তুমি
এসো হে এস বুকে—আদরে চুমি বনভূমি
জলে আঁধারে মিশা
বরিষে বারিধারা—

(বিজলীর প্রবেশ)

সুরমা। আমার এমন গানটাই মাটি—সন্ধ্যেবেলা একটু বিশ্রাম করব তার যো নেই—খালি বকর বকর। নাঃ ভাল লাগে না বাপু। তার চাইতে যদি আমার ঐ বেহালাটার সঙ্গে বিয়ে হ'ত ত সুখে থাকতুম। একটু দুষ্টুমি করলেই কানমলা খেত।

বিজলী। একদণ্ড তোমার শান্তমূর্ত্তি দেখলুম না।

সুরমা। অগ্নিমূর্ত্তি সাধে কি হয়?

বিজলী। আগুনকে জল করবার মন্তর জানি আমি। দেখবে? (পকেট হইতে একছড়া নেকলেশ বাহির করিয়া সুরমাকে পরাইয়া দিল)।

সুরমা। তুমি ভাবছ, আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাব। তুমি বুঝি মনে করেছ, আমি কিছুই জানি না। তোমার বন্ধুর বাসুদেব পুরের কীর্ত্তি কিছু কিছু জেনে ফেলেছি।

(চাকর আসিয়া খবর দিল একজন ভদ্রলোক সাক্ষাৎ-প্রার্থী)

ছিঃ ঐ প্রবৃত্তি ত্যাগ কর। এই নেকলেস ছড়া বিক্রী করে সেই টাকা থেকে একটা ছোটখাটো ব্যবসা কর। তাতে কিছু হবে। অসতের ভাল কখন হয় না। যাই ভিতরে, আবার কোন মহাপুরুষ আসছেন। (প্রস্থান)

(পশুপতি বাবুর প্রবেশ)

পশুপতি। নমস্কার !

বিজলী। নমস্কার আপনি আমায় খুঁজছেন ?

পশুপতি। আজ্ঞা হাঁ ; আমার নাম শ্রীপশুপতি সেন—পেশা আইন নিয়ে নাড়াচাড়া—অর্থাৎ কিনা এ্যাটর্নীগিরি, জাল, জুয়াচুরি।

বিজলী। আপনার নাম কলকাতার সহরে কে না জানে ? আপনার সঙ্গে আলাপ করে ধন্য হলুম।

পশু। অনুগ্রহ করে বিনয় একটু তুলে রাখুন। আপনাদের Literary Legal Medical Associationএর অধিবেশন কি এই ঘরেই হয় ?

বিজলী। হাঁ, এর সভ্য—

পশু। হবার জন্য উৎসুক হয়ে আপনাদের দ্বারস্থ হয়েছি।

(কোকিলেশ্বরের প্রবেশ। পশুপতিবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত)।

ইনিও কি আপনাদের Associationএর একজন সভ্য নাকি ? আসুন, পেছিয়ে গেলে চলবে না। ট্রেণের আলাপ এত শীঘ্রই কি ভুলে যেতে হয় ? উহু। Literary Legal Medical—কোনটির representation আপনি ? বা বা বা,—মনে হয় Legal ঠিক নয় ? কি চুপ করে রইলেন যে ?

কো। চুপ না করে থাকবার জো কি ?

পশু। চুপ করে থাকবার আদৌ আবশ্যক নেই কোকিলেশ্বর বাবু ? চমকে উঠলেন যে ? মনে করছেন আমি একজন পাকা ডিটেকটিভ—তাই আপনার নামটা জেনে ফেলেছি।

বিজলী। আমি ত রহস্য কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

পশু। রহস্য বোঝবার কিছুমাত্র আবশ্যক নেই—টাইকো-ক্যাম্বারাডাইন ট্যাবলেটের হ্যাণ্ডবিলগুলো যে প্রেস থেকে ছাপিয়েছিলেন, সেখানে ভুল করে বোধ হয় ঠিকানা রেখে এসেছিলেন।

কো। Idiot and fool that I am.

পশু। তাই থেকে আপনাদের ঠিকানাটা জেনে ফেললুম—আর আজকের খবরের কাগজে আমার বাসুদেব পুরে বক্তৃতার সারমর্ম্মও পাঠ করলুম। তাই আজ আপনাদের Association গৃহে পশুপতি বাবুর পায়ের ধূলো পড়েছে।

বিজলী। আমরা ধন্য হলুম।

পশু। অত সহজেই ধন্য চট্ করে হলে ত চলবে না। আইনজীবির মাথায় এতটা Flaw ত থাকা উচিত হয় না।

কো। মাপ করবেন—আমাদের আর লজ্জা দেবেন না।

পশু। লজ্জা দেবার মতন কাজ যে করেছেন আপনারা। কোনও কাজে নাববার আগে তার পূর্ব্বাপর ভাববার শক্তি আপনাদের থাকবে বলে আশা করি।

বিজলী। কোকিল, উনি এত কথা বলছেন—এ থেকে ওঁর পেশা কি ধারণা করা শক্ত নয়। উনি হচ্ছেন মিঃ পশুপতি সেন, কলকাতার বিখ্যাত এ্যাটর্নী—

পশু। অর্থাৎ কিনা কোকিলেশ্বর বাবুর সম ব্যবসায়ী—যাই হোক্, আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে থাকতে পাচ্ছি না।

বিজলী। ভাই ভাইয়ের তারিফ কর্ব্বে না ত কে কর্ব্বে ? সম্বন্ধটা তা হলে কি রকম দাঁড়াচ্ছে ?

পশু। মাসতুত ভাই—বুঝলেন। (কোকিলেশ্বরের প্রতি)—এস ভাই ; তুমি যা দেখিয়েছ, তাতে তোমার, বয়সে ছোট হলেও দাদা বলতে ইচ্ছে করে। একবার এগিয়ে এস কোলাকুলি করে বিদায় গ্রহণ করি।

(পশুপতি ও কোকিলেশ্বর পরস্পরের আলিঙ্গন বদ্ধ)

যবনিকা পতন।

ব্যথার পূজা

[শ্রীঅমিয়কুমার সেন]

—এক—

কলেজ হোষ্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিখিল বাবুর একমাত্র সুন্দরী কন্যা সুজাতার সঙ্গে সুনীলের প্রথম দেখা চার বছর আগে, ফাগুনের এক স্নিগ্ধ প্রভাতে।

হোষ্টেলের দোতালায় যে ঘরটায় সুনীল থাকত, ঠিক তার নীচেই ছিল সুজাতাদের একটা ফুলের বাগান। সেদিন পড়তে পড়তে হঠাৎ জানলার দিকে চেয়ে সুনীল দেখতে পেলে একটী কিশোরী সেই বাগানের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফুল তুলছে। তরুণ অরুণের রক্তিম আভা সেই মেয়েটীর মুখের উপর পড়ে খানিকটা আবির মেখে দিচ্ছিল—কৈশোরের লালিমায় তা আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুনীল ধীরে ধীরে জানলার কাছে এসে খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত অপলক দৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ মনের চঞ্চল আবেগে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, বাঃ—কি সুন্দর! সে শব্দে মেয়েটী উপরের দিকে চাইতেই দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল, আর মেয়েটীর সমস্ত মুখের উপর একটা লজ্জা মিশ্রিত মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিয়ে সে ধীরে ধীরে নতমস্তকে বাগান থেকে বেরিয়ে গেল।

এই হ'ল তাদের প্রথম দেখা। এমনি ভাবে রোজ তাদের চারটী চোখের মিলন হতে লাগল। এই নীরব চাওয়া-চাওয়ির মাঝ থেকে যে কি করে তাদের আলাপ হয়ে গেল, তা তারা কেউ বুঝে উঠতে পারল না।

সুনীল তখন ফাষ্ট ইয়ারে পড়ত। ভাল ছেলে বলে প্রফেসর মহলে সে অচেনা ছিল না, নিখিলবাবুও তাকে চিনতেন। তারপর সুজাতার সঙ্গে আলাপ হতেই তাঁর বাসায় গিয়ে অল্পদিনের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর স্নেহও আকর্ষণ করে ফেলল। সেই থেকে সুজাতার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলবার এতটুকু বাধাও সে পেত না।

এই বলা-কওয়ার মাঝ থেকে তারা আপনি ছেড়ে তুমি ধরলে। এমনি ভাবেই চারটী বছর ধরে শান্ত স্নিগ্ধ নদীর স্রোতের মত তাদের ভালবাসা এগিয়ে চলল।

কৈশোরের আধফোটা পদ্মকলিকার মত সুজাতার সুন্দর রূপটুকু চার বছর পরে এখন যৌবনের হাওয়া লেগে প্রস্ফুটিত পদ্মফুলটীর মত আরও সুন্দর হয়ে উঠেছে।

সুনীলের কলেজ জীবনের চারটী বছর ধীরে ধীরে কেটে গেছে। সে এবার বি-এ দেবে। পরীক্ষার যখন দু' মাস বাকী তখন বাড়ী থেকে পিসীমার অসুখের টেলিগ্রাম পেয়ে সেই সময়ই বাড়ী রওনা হয়ে গেল। যাওয়ার সময় সুজাতা স্কুলে ছিল, তাই তার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারল না।

এই পিসীমাই ছিল সুনীলের সংসারের একমাত্র আশ্রয়।

ঠিক একমাস পরে পিসীমাকে বিসর্জ্জন দিয়ে সুনীল যেদিন হোষ্টেলে ফিরল, সেইদিনই বিকালবেলায় সুজাতার সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সুজাতা তখন একটা ঘরে একাকী চুপ করে শুয়ে ছিল। সুনীল আসতেই তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

সুনীল এসেই খাটের একপাশে বসে পড়ল। দেখলে, এই এক মাসে সুজাতা কেমন ম্লান ও শীর্ণ হয়ে গেছে—চোখে মুখে যেন একটা ক্লান্তির ছায়া। সুনীল ভাবল, হয়ত তাদের এই একটা মাসের অ-দেখায় সুজাতার এই অবস্থা।

সুজাতা সুনীলের দিকে একবার চেয়ে ধীরে ধীরে মাথা নত করল। অনেক কথাই সে বলতে চাইছিল, কিন্তু কোন কথাই বলতে পারল না। একটা অজানিত কুণ্ঠা ও সঙ্কোচে তার সারা মুখখানি ছেয়ে ফেলল। পাতলা ঠোঁটদুটী কাঁপছিল।

সুজাতাকে নীরব দেখে সুনীল বড় অধীর হয়ে পড়ল। তার হাত দু'খানি নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে সুনীল বলল—সুজাতা, তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ। তোমার নীরবতা যে আমায় বড্ড ভাবিয়ে তুলেছে। কিন্তু কি করব

বল, সেদিন তুমি স্কুলে ছিলে, তাই তাড়াতাড়ি যাবার সময় তোমাকে বলে যেতে পারি নি। বাড়ীতে গিয়ে দেখি, পিসীমা মৃত্যুশয্যায়—তাই তোমার কাছে একখানা চিঠি লিখবারও অবকাশ পাই নি। এত করেও পিসীমাকে বাঁচাতে পারলাম না—অভাগিনী পিসীমা আমাদের ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছেন—সুনীলের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না, অশ্রুতে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

এমনি সময় সুজাতার মা একটী সুন্দর তরুণ যুবককে সঙ্গে নিয়ে সেই কক্ষে প্রবেশ করতেই সুনীল তাড়াতাড়ি সুজাতার হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, সুজাতাও তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুনীলকে দেখেই সুজাতার মা বলে উঠলেন—সুনীল, প্রায় একমাস তোমায় দেখি নি, বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি?

সুনীল বলল—আজ্ঞে বাড়ীই গিয়েছিলাম। বাড়ী থেকে পিসীমার—

তিনি সুনীলকে বাধা দিয়ে বললেন—কিন্তু শীঘ্র তুমি আর বাড়ী যেতে পাচ্ছ না। এই বোশেখেই আমরা হিরণের সঙ্গে সুজাতার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। তোমার কিন্তু সে বিয়েতে না থাকলে চলবে না, সে আমি বলে দিচ্ছি। হিরণ, এবার মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম, বি, পাশ করেছে। বাবা এটর্ণী—

আর কোন কথাই সুনীলের শুনতে ইচ্ছা ছিল না। বিনামেঘে বজ্রপাত হলে লোকে যেমন হতভম্ব হয়ে যায়, সুজাতার বিয়ের কথা শুনে সুনীলের সেই অবস্থা হোল। সে মুহূর্ত্ত মধ্যে নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বলল—তার আর কি, আমি বিয়েতে নিশ্চয়ই থাকব, বলে আর কিছু শুনবার অপেক্ষা না রেখেই তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

* * * *

পরদিন। তখনও সন্ধ্যা হয় নাই।

চুপটী করে নিজের খাটখানির উপর শুয়ে সুনীল ভাবছিল, কেন এমন হ'ল? কেন এত করে সুজাতাকে ভালবাসলেম? যার প্রতি কার্য্য—প্রতি বাক্য—সারা মনখানি প্রতিনিয়ত আমায় চাইছিল, সে কি করে মুহূর্ত্তে জীবনটা ব্যর্থতায় ভরিয়ে দিতে পারলে? ছেয়ে ছেয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওয়াকে টেনে যদি বুকের কাছে আনছিলাম, কিন্তু মুহূর্ত্তে কালবোশেখীর ঝড় এসে তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।...উঃ—মানুষ এমন নিষ্ঠুর হতে পারে, নইলে সুজাতার বাপ মা কি করে আমার বুকে এমন নিষ্ঠুর বজ্র হানলেন? সুজাতা! একের তরে উৎসর্গীকৃত জীবন তুমি কি করে অন্যের তরে দান করলে -

সুনীল আর ভাবতে পারল না, একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তার অন্তর মথিত করে বেরিয়ে গেল।

আজ ভোরে সুজাতা সুনীলকে যে চিঠিখানা পাঠিয়েছে সেখানা তখনও সুনীলের হাতের মধ্যে ছিল। কি ভেবে চিঠিখানা আবার পড়তে লাগল।

সুনীলদা,

আজ লিখতে গিয়ে হার মানতে হচ্ছে—গোছান জিনিষ সব গুলিয়ে যাচ্ছে, সবই যদি সফল হতে চলেছিল, তবে আজ এত ব্যাকুলতা কেন?

পিসীমার অসুখের সংবাদ পেয়ে যেদিন তুমি বাড়ী রওনা হলে, তার পরদিন থেকে হিরণবাবু রোজই আমাদের বাড়ী আসতে লাগলেন। শুনলাম, তাঁরা আমাদের প্রতিবেশী, বড়লোক। ক'দিন পরে বুঝলাম তাঁদের আভিজাত্যের গর্ব্ব ও টাকার মোহ দিয়ে বাবা মা'র মনটাকে বশে এনে ফেলেছেন। নইলে সব সময় আমার কাছে থাকতে চাইতেন কেন? বাবা মা ত বাধা দিতেন না?

একদিন শুনতে পেলাম, ওঁর সঙ্গেই আমার বিয়ে, মনটা ছ্যাৎ করে উঠল। কথাটা শুনে একদিন মা'র কাছে সব বলে ফেললাম। ফল হ'ল না। বুঝলাম, টাকায় তাদের মন ভুলিয়েছে। ভাবলাম, একদিন বাবাকে সব বলে ফেলি, কিন্তু পারলাম না, বিশ্বের লজ্জা এসে আমার সে সাহসকে মাথা তুলতে দিলে না। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালেম, কিন্তু তখন ফেরার পথ নেই—অনেক কিছুই ঠিকঠাক। তারপরই কাল তুমি এসেছিলে। হিরণবাবু তখন মা'র ঘরে ছিলেন। ঠিক ঐ আশঙ্কায় তোমাকে কিছু বলতে পারি নি। নিজের ইচ্ছা থাকলেও তোমাকে কিছু বলতে পারলাম না।

আসছে সোমবারে আমাদের বিয়ে।

জানি এ নিদারুণ সংবাদ তোমার বুকে শেলের মত বিঁধবে, কিন্তু আমার কি খুবই দোষ? বলতে পার, আমি ইচ্ছা করলে সবই হ'ত। কিন্তু ইচ্ছাকে সফল করার শক্তি ত আমি পেলাম না। বুঝতে পারছি, আমার উপর দেবতার অভিশম্পাত পড়েছে, নইলে সফল হ'ল না কেন? সুনীলদা, আমায় ভুল বুঝ না—আমায় ক্ষমা করো। আর আমার একটী অনুরোধ, জীবনে কখনও আমায় আর তুমি দেখা দিও না। প্রণাম—আসি।

হতভাগিনী—সুজাতা।

চিঠিখানা পড়ে নির্জ্জীব পাথরের মত সুনীল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, শুধু তার চোখদুটী জলে ভরে আসছিল, কোন কথাই সে আর ভাবতে পারলে না।

সন্ধ্যার ছায়া তখন ধরণীর গায় ধীরে ধীরে নেমে আসছিল।

কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মনে পড়ল তার জীবন খাতার কতকগুলি পাতা—যেদিন সুনীলের পিতা মরণ শয্যায় শুয়ে ছল্ ছল্ চোখে মাতৃহীন দশ বছরের শিশু সুনীলকে তার পিসীমার হাতে সঁপে দিয়ে অচীন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, সেইদিন থেকে এই দশটী বছর তার উপর তার পিসীমার অগাধ স্নেহ। এই পিসীমাকে পেয়ে সে তার পিতা মাতার অভাব ভুলে ছল।...তাঁকে কাঁদিয়ে সুনীল কলকাতায় আই, এ পড়তে এল। কিন্তু চার বছর যেতে না যেতেই তাকে নিঃসহায় করে নিষ্ঠুর কাল তার পিসীমাকে ছিনিয়ে নিলে। এই গভীর দুঃখের মধ্যে সুনীল এই কথাটী ভেবে সান্ত্বনা পেল, এই দুঃখ কষ্টে দরদী বন্ধুর মত সুজাতা তার সামনে এসে দাঁড়াবে—তার বুকের এই অসহনীয় ব্যথার উপর সুজাতা তার কোমল হস্তে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগিয়ে দেবে। কিন্তু তাত হল না। তার সে বুকভরা আশা নিরাশায় ভরে গেল—তাকে সে জন্মের মত হারাল—

সুনীল আর কিছুই ভাবতে পাচ্ছিল না। দারুণ অভিমানে অসহনীয় ব্যথায়, কান্নার আবেগে তার সারা বুকটা ফুলে উঠছিল। হতাশ হয়ে বিছানার উপর পড়ে রইল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আকাশ তারার জ্যোতি দিয়ে অনেকক্ষণ তার সিঁথি সাজান আরম্ভ করে দিয়েছে।

—দুই—

পুরী।

শান্ত নীল সাগরের জলে অস্তগামী রক্তিম রবির সোনালী আলোর ধারা ঝরে পড়ে ময়ূরকণ্ঠী বেনারসী শাড়ীর মতই ঝলমল্ কচ্ছিল।

সিক্ত-মসৃণ বালুবেলার উপর দিয়ে কত যে নরনারী যাওয়া-আসা কচ্ছিল তার ইয়ত্বা নাই।

দূরে চক্রবাল সীমায় সাগর ও আকাশ গভীর আলিঙ্গনে দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে। গোধূলির স্বর্ণাভ মণ্ডিত বিশালে বিশালে এ মাখামাখিটুকু অপূর্ব্ব, সুন্দর, মনোরম।

সুনীল সমুদ্রতীরে বসে এই সব দেখছিল, কিন্তু আকাশ বাতাস, জলে স্থলে এই যে শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীটুকু এসব তার কিছুই ভাল লাগছিল না, সে ভাবছিল তার অতীত জীবনের কথা। সেই যেদিন, ফাগুনের প্রথম প্রভাতে তার তরুণ জীবনের স্বর্ণতন্ত্রীতে যে জয়গান বেজে উঠেছিল, তরুণ জীবন পার হতে না হতেই গানের সে সুর, সে ছন্দ বুক চাপা কান্নার মত তার তরুণ বুকেই থেমে যেতে বসেছে—

হঠাৎ পৃষ্ঠে কার অঙ্গুলি স্পর্শে সে চম্‌কে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দেখে সহাস্য মুখে তার স্কুলের সহপাঠী শিশির দাঁড়িয়ে। 'এ কি শিশির যে' বলে উঠে দাঁড়িয়ে শিশিরকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর এখানে কবে এসেছিস্ সুনীল?

এই ত বোধ হয় এক হপ্তা হবে।

বাস্তবিক, আগে ত আমি তোকে চিনতেই পাচ্ছিলাম না। এমন চেহারা কি করে হল? হঠাৎ যে এখানে, সঙ্গে কে কে এলেন?

সংসারে ছিলেন একমাত্র পিসিমা, তাঁকে বিসর্জ্জন দিয়েই পড়াশুনা ছেড়ে ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরছি। ঘুরতে ঘুরতে ইচ্ছা হল পুরীটা একবার ঘুরে আসি—

আমি যে এখানে ডাক্তারী করছি, তা ত তুই জানিস, তবে আমার ওখানে না গিয়ে—

সুনীল বাধা দিয়ে বলল—কে আছে তোর বাসায়?

কে আর থাকবে, বৌটী আর বোন্‌টী আছে।

সুনীল হেসে বলল—ওই জন্যই ত যাই নি। শরৎবাবুর 'গৃহদাহ' পড়েছি যে। গেলে, কোন্‌দিন হয় ত সুনীলের সঙ্গে শিশিরের বৌর অন্তর্ধান, আর বৌয়ের অভাবে শিশিরের ভীষণ ছট্‌ফটানি—

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল। এমনি সময় খুব কাছ থেকে মৃদুকণ্ঠে ডাক আসল—"দাদা।"

দুজনেই ফিরল। হঠাৎ চোখের সামনে দুটী অপরিচিতা সুন্দরী তরুণী মূর্ত্তি দেখে সুনীল লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তরুণীদ্বয়ও সুনীলকে দেখে সলজ্জ মুখে মাথা হেঁট করল।

শিশির বলে উঠল—আসতে পারলি? কি পা টিপে টিপে হাটতেই না তোরা শিখিছিস। ভাগ্যি তোদের আগে এসে পড়েছিলাম, তাই এই বন্ধুটীকে পেয়ে বসলাম। এই এতক্ষণ তোদের কথাই সুনীলকে বলছিলাম। সন্ধ্যা, সুনীলকে প্রণাম কর। মমতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তুমিও একটা নমস্কার করে ফেল।

একজনকে নমস্কারের প্রতি নমস্কার দিয়ে, অন্যের প্রণাম গ্রহণ করে তাকে আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে সুনীলের মুখখানি লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠল—সন্ধ্যাকে আশীর্ব্বাদ করতে সে পারল না, চকিতে শুধু তাকে একবার দেখে নিল।

সন্ধ্যা খুব সুন্দরী। তার স্বপ্নময় চাহনি, সুন্দর মুখশ্রী, ছিপ ছিপে গড়ন, গৌরবর্ণ দেহলতা মুহূর্ত্তে সুনীলের মনটাকে একবার আলোড়িত করে দিলেও, কেন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস তার অন্তর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে শিশির বলল—মমতা, সুনীল পুরী এসে আমার বাসায় না যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় ও কি বলেছে শুনবে—

সুনীল তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল—থাক্, থাক্ সে কথা তোকে বল্‌তে হবে না।

শিশির হেসে বলল—বেশ, তবে আমার বাসায় আসবি ত?

সুনীল বলল—সে পরে দেখা যা'বে, কটা দিন ত রেহাই দে।

বেশ ক'দিন সময় দিলুম। কিন্তু আজ সন্ধ্যায় চায়ের আসরে তোমার হাজির দিতে হবে, কি রাজী না গররাজী?

সুনীল হেসে বলল—রাজী।

তারা সবাই মিলে যখন স্বর্গদ্বারে শিশিরের বাসায় পৌছিল তখন সন্ধ্যার হাল্কা আঁধার চারিদিক ছড়িয়ে পড়েছে। সমুদ্র তীর হতে বৈকালীন বায়ু সেবন করে অনেকেই বাসায় ফিরছিলেন। মিউনিসিপালিটির লোকেরা সবে মাত্র রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালাতে সুরু করেছে।

* * * *

ক'দিন পরের কথা।

ভোরে ঘুম ভেঙ্গে গেলেও বেলা ৮টা পর্য্যন্ত সুনীল বিছানায় পড়ে রইল। সাতদিন ধরে রোজ সকালে একবার শিশিরদের ওখানে গেলেও দিন চারেক আর যায় নাই। ভেবেছে, এতদিন ধরে গিয়ে তার লাভ যা হয়েছে তার পক্ষে মস্ত বড় একটা লোক্‌সান। আবার ভেবেছে, তার ক্ষুদ্র জীবনে লাভ লোক্‌সান খতিয়ে দেখেও বা সে কি করবে? তাই ঠিক করেছিল আজ ভোরেই একবার যাবে, কিন্তু কাল সন্ধ্যা থেকে ভয়ানক মাথা ধরে কেন যে তার জ্বর এল তা সে বুঝে উঠতে পারে নি। জ্বর যদি হ'ল তবে তার যন্ত্রণা এত অসহ্য কেন? ভেবে ভেবে সারা রাত্রিটা চোখের পাতা বোজে নি। এত বেলা হলেও অলসভাবে শয্যায় শুয়ে রইল।

সত্যি কি মানুষের ব্যর্থ জীবনে কখনও সুখ আসে না? শান্তি আসে না? যে সবটুকু হারিয়ে ভাবনার আঘাতে আঘাতে বুকখানাকে ব্যথায় ভরে রাখে, কেউ কি তার ব্যথার সান্ত্বনা দিতে চায় না?

ভাবতে ভাবতে পায়ের কাপড়টা টেনে সুনীল গায় দিল—শীত করে জ্বর আসছিল।

"সুনীল—"

ডাক শুনে সুনীল তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলে দিতেই শিশির ঘরে ঢুকে বলল—কি এতক্ষণ শুয়ে আছিস্ যে? অসুখ করেছে নাকি?

শুষ্ক মুখে হাসি এনে সুনীল বলল—কাল রাত্রে মাথা ধরে একটু জ্বর হয়েছে।

— দেখি — সুনীলের ললাটে হাত দিতেই শিশির চমকে উঠল। উঃ—এই তোর একটু জ্বর। ডাক্তারের কাছে কি আর ফাঁকি চলে? এখন উঠ্‌ত—আমার বাসায় চল্। এখানে তোকে দেখবে কে?

—কিন্তু কেন তোদের সুখের সংসারে একটা বোঝা বয়ে বেড়াবি?

—আরে, আমি কি বইব। যারা বইবে, এ আজ্ঞা তাদেরই, এই যে কদিন যাসনি, তাতে তারা কতই চিন্তিত হয়ে পড়েছে, আর যদি জানতে পারে যে অসুস্থ অবস্থায় তোকে এখানে ফেলে গেছি তবে আমার আর রক্ষে নেই।

সুনীল আর কোন উপায় না দেখে অগত্যা শিশিরের কথায় সম্মত হ'ল।

সুনীলকে নিয়ে শিশির যখন তার বাসায় পৌঁছিল তখন বেলা ঠিক বারটা।

— তিন —

বিকেলের দিকে সুনীলের জ্বরটা ছেড়ে গেলেও রাত্রে আবার সেটা বেড়ে গেল। একে জ্বর, তার উপর মাথা ধরা, হাত পা বেদনা সুনীলকে একেবারে নিস্তেজ করে ফেলল। শিশির নিজে ডাক্তার হলেও সুনীলের জ্বরের অবস্থা দেখে সে বুঝতে পারলে সহজে জ্বরটা ছাড়বে না। ডাক্তার মানুষ বেশী চিন্তিত না হলেও একটা কথায় তাকে বড় ভাবিয়ে তুলল, তাদের তিনজনের অক্লান্ত সেবায় কি সুনীলকে তার বাপ মা ভাই বোনের অভাব পূরণ করে তাকে শান্তি দিতে পারবে?

ভোর বেলায় জ্বরের অবস্থা তেমনিই রয়ে গেল। শিশির তখন বাসায় ছিলনা। মমতা সুনীলের অসুখের জন্য সকাল সকাল করে সংসারের কাজটা সেরে নিচ্ছিল। সন্ধ্যা সুনীলের শিয়রের কাছে বসে ধীরে ধীরে এক হাতে বাতাস করছিল, অন্যহাতে মাথা টিপে দিচ্ছিল।

মাথার জানলাটা দিয়ে উষার মৃদু আলো ঘুমন্ত সুনীলের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখখানির উপর এসে পড়ছিল।

সন্ধ্যা এক দৃষ্টে সুনীলের মুখখানিই দেখ্‌ছিল। কি পরিবর্ত্তন, প্রস্ফুটিত কমলের মত সুন্দর মুখখানি পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে। ডাগা ডাগা সুন্দর চোখ দুটী কোটর গত। দু'একদিনের জ্বর, মানুষের স্বাভাবিক চেহারাকে যে এমন অস্বাভাবিক করে দেয়, সত্যি করে সন্ধ্যা তা আজ নিজের চোখে দেখে নিল। কাল তার দাদা বৌদির কাছে যখন সুনীলের কথা বলছিলেন তখন সে সব কথা শুনে নিয়েছে। মায়ের স্নেহটুকু হারিয়ে পিতার স্নেহ পেতে না পেতে তাও শেষ হল। ছিল একমাত্র পিসীমা, কিন্তু তাকেও হারিয়েছে আজ তিন বছর। পিতা ছিলেন কন্‌ট্রাক্‌টার। যা কিছু সঞ্চয় করেছিলেন, তাই দিয়েই পড়াশুনা চালাত। তারপর পিসীমা মরে গেলে দুঃখে কষ্টে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পুরী এসে পড়েছে।

মানুষ সব করতে পারে, কিন্তু পারেনা বুঝি তার হারান আনন্দকে ফিরিয়ে আনতে। চেষ্টা করে তবুও পারে না। চেষ্টা করে করে যখন না পেয়ে চোখের জলে বুক ভাসায়, তখন একদিন দেবতার প্রার্থিত বরলাভের মতই একজন এসে তার চোখের জলে সাড়া দেয়। সান্ত্বনা দিয়ে, শান্তি দিয়ে, আশা দিয়ে সে তার হারান আনন্দকে বুকের কাছে পাইয়ে দেয়।

সন্ধ্যা আর ভাবতে পারলনা। সজল নয়নে প্রার্থনা জানালে, ওগো বিশ্বের ঠাকুর, আঘাতে আঘাতে বুকখানাকে ব্যথায় ভরে যদি একটী তরুণ প্রাণ যেতে বসেছে, সে চায় না দুনিয়ার সুখ, শান্তি, মিথ্যা আনন্দ, যেন সে তার নারী হৃদয়ের শক্তি দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে ওই ব্যথিত তরুণ জীবনের চোখের জলকে মুছিয়ে দিতে পারে।

হঠাৎ ঘুমের ঘোরে শিউরে উঠে চক্ষু মেলেই সুনীল প্রচণ্ড আবেগে সন্ধ্যার একখানি হাত চেপে ধরে চীৎকার করে উঠল—সুজাতা সুজাতা। চীৎকারে ভীত হয়ে সন্ধ্যা দেখ্‌ল, সুনীলের সারা দেহটা থর থর করে কাঁপছে, চোখ দুটী রক্তরাগে দীপ্ত।

সন্ধ্যা আর্ত্তকণ্ঠে বলে উঠ্‌ল—সুনীল বাবু, কি বলছেন—খুব কষ্ট হচ্ছে কি?

সন্ধ্যার হাতখানা তখনও সুনীলের হাতের মধ্যে ছিল। সন্ধ্যার কথার সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শুধু তার লাল চক্ষু দুটী দিয়ে সুনীল সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে রইল—কোন কথা বললনা। সন্ধ্যা, সুনীলের মাথায় হাত দিতেই চমকে উঠল—জ্বরে তার সারা গা পুড়ে যাচ্ছে। পাখাখানা নিয়ে

ধীরে ধীরে মাথায় বাতাস করতে লাগল। একটু পরে সুনীল একটা ছোট্ট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে চোখ বুজ্‌ল।

* * * *

স্মৃতির তাড়নায় জর্জ্জরিত হয়ে সুনীল দেশ দেশান্তরে পরিভ্রমণ করল—কিন্তু কিছুতেই সে তাকে ভুলতে পারল না।

যাকে প্রকৃত ভালবাসা যায়—তার চিন্তা বোধ হয় কিছুতেই ভোলা যায় না। তাই আজ সুনীলের এই অবস্থা। সে কোথাও শান্তি পেল না—তার শান্তি বোধ হয় আর এ দুনিয়ায় নেই।

যেদিন সে এ জগতের সমস্ত হিসাব নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে ঐ অনন্তপথে চলে যাবে—বোধ হয় সেইদিনই তার এ যাতনার অবসান হবে।

জল আনা

[শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়]

জল নাহি ব'লে, আনিবার ছলে
গেনু নদী কূলে, সে যে তরু মূলে
বাজায় বাঁশরী, সকলি বিস্মরি—
এনু গৃহে ফিরি গাগরী না ভরি।

ননদিনী এসে বসি মোর পাশে
মুখে মৃদু হেসে যদি জিজ্ঞাসে ;—
কোথা বধূ জল ? দেখাবিরে চল্,
কি করিব ছল্ ? ভাবিছি অতল।

পথে বারি ঝরে ঝর ঝর স্বরে
লইব কি ভরে ? কলসীটী ওরে ;
যদি হয় আধা নাহি কোন বাধা
পথে ছিল কাদা, বলিছে শ্রীরাধা—

পড়িনু পিছলে গাগরী উঠলে
জল দিনু ফেলে, এনু ঘরে চলে।
কবি কহে রাই ; কত ছলনাই
জান তুমি ভাই ; ভাবি আমি তাই।

—**—

মায়ের দান।

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন দে।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　৪ঠা ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৩।　　[৩৯শ স

ভাবের অভিব্যক্তি।

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]
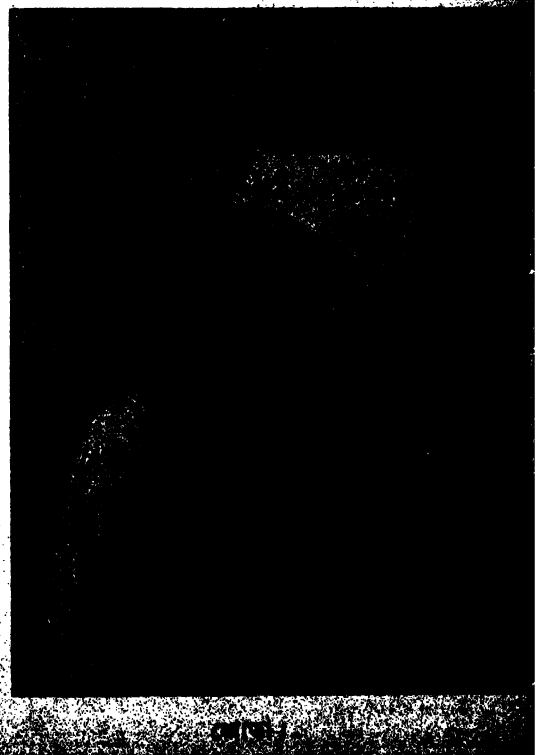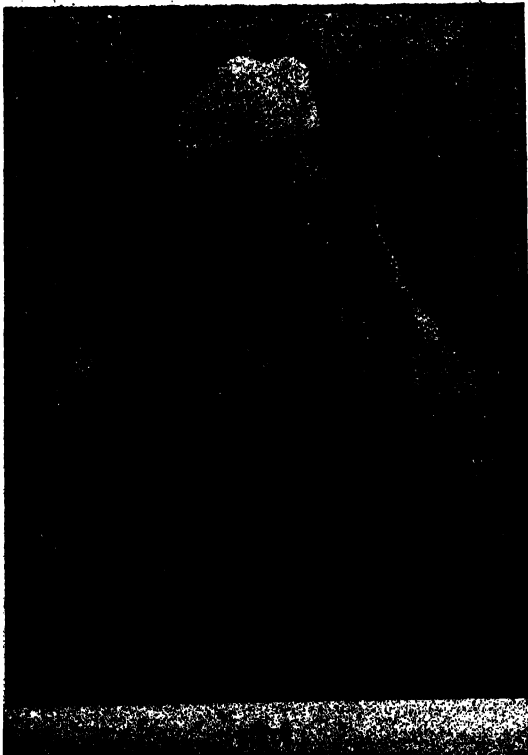
আলোচনা

বেকার সমস্যার জন্য দায়ী কে ?

বেকারের হাহাকারে ভারতের সকল প্রদেশ আজ প্রতিধ্বনিত। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ছেলেরা অনেক পয়সা খরচ করিয়া স্বাস্থ্য ও শক্তির বিনিময়ে যে ডিগ্রি অর্জ্জন করিল, চাকুরীর বাজারে তাহার চাহিদা নাই। পাশকরা ছেলেরা তাহাদের স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঞ্চিত জ্ঞান লইয়া চাকুরীর অভাবে ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। চাকুরী না পাইয়া তাহাদের উৎসাহ, উদ্যম সব অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া যাইতে বসিয়াছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই বেকার সমস্যার জন্য দায়ী কে ? মুসলমান সম্প্রদায় বলেন যে গবর্ণমেণ্ট হিন্দুদিগকে বেশী চাকুরী দিতেছেন বলিয়া মুসলমান পাশকরা ছেলেরা বসিয়া রহিয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের হাতে যত চাকুরী আছে সেসকলগুলিও যদি মুসলমানদিগকে দেওয়া যায় তাহা হইলে হয়তো এখন তাঁহাদের কাজ মিলিতে পারে, কিন্তু দশ বৎসর বাদে আরও অধিক সংখ্যক মুসলমান ছাত্র শিক্ষিত হইলে তাঁহাদের চাকুরী মিলিবে কোথায় ? হিন্দুরাও বলেন, গবর্ণমেণ্ট অনেক চাকুরীতে ইংরাজ লয়েন বলিয়া অনেক ছেলে বেকার বসিয়া থাকে। কিন্তু সকল ইংরাজকে ভারতে চাকুরী দেওয়া বন্ধ করিলেও সকল বেকারের চাকুরী জুটিবে না। অনেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট কেবল মাত্র তত্তৎ প্রদেশের লোককে চাকুরীতে লইতেছেন—যোগ্যতার ক্ষেত্রে সকল ভারতবাসীকে সমান অধিকার দিতেছেন না। ইহাতেও কোন প্রদেশে বেকার সমস্যার সমাধান হয় নাই। ইহার ফলে কেবলমাত্র প্রদেশগুলির মধ্যে রেষারেষির ভাব বাড়িয়াছে ও ভারতে একরাষ্ট্র স্থাপনের বিঘ্ন ঘটিতেছে। অনেকে বলেন বাঙ্গলা দেশের সরকারও এইরূপ প্রাদেশিক নীতি অবলম্বন করিলে বাঙ্গালীর বেকার সমস্যা দূরীভূত হইতে পারে। এই বৎসর খুলনা যুবক সমিতির সভাপতি প্রস্তাব করিয়াছেন যে কাউন্সিল কর্ত্তৃক এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ হউক যে বাঙ্গলার বাহিরের কোন লোক যেন বাঙ্গলায় চাকুরী না পায়। সরকারী চাকুরীতে এক হিসাব-বিভাগ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে অ-বাঙ্গালীকে লওয়া হয় না। বিদেশী বণিকদের আফিসে অনেক অ-বাঙ্গালী চাকুরী করেন বটে, কিন্তু আইন দ্বারা বণিক আফিসের নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কোন দেশের কোন গবর্ণমেণ্ট বেকার সমস্যা দূর করিতে পারে না। যুদ্ধের পর ইংরাজ সরকার ইংলণ্ডের বেকারদিগকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করিতেন—কিন্তু তাহাতে বেকারের চাকুরী জুটে নাই। সুতরাং আমাদের দেশে বেকার সমস্যার জন্য গবর্ণমেণ্টকে দায়ী করা ঠিক নহে। অবশ্য ভারত সরকার কেবলমাত্র ভারতবাসীকে সকল কাজে নিয়োগ করিলে সমস্যা আপাততঃ কিয়ৎ পরিমাণে মন্দীভূত হইতে পারে।

এক শ্রেণীর লোক বেকার সমস্যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কেই দায়ী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের মতে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জীবিকা অর্জ্জনের উপযোগী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি কেবলমাত্র ঐরূপ শিক্ষাই দেন তাহা হইলে দুইটী অসুবিধা হইবে। (১) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কার্য্য দেশে উচ্চতম চিন্তার বিস্তার করা, আনুসঙ্গিক ভাবে ব্যবহারিক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। (২) ব্যবহারিক শিক্ষা দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতীর কাজ শিখাইলে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা হইবে বটে—কিন্তু তাহারা আর মধ্যবিত্ত শ্রেণী নামের যোগ্য থাকিবে না। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রধান কার্য্য উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মধ্যস্থ স্বরূপ হওয়া। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর জ্ঞান বিজ্ঞানের চিন্তাকে নিম্নশ্রেণীর [illegible] লাগান। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহারিক শিক্ষার ফলে মধ্য শ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর পেশাগুলিকে অধিকার করিয়া লইবে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এখনও অধিক সংখ্যায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে আসিতেছে না। [illegible] আমরা নিম্নশ্রেণী বলিতে কোনরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছি

না—কেবলমাত্র চলতি সংজ্ঞা ব্যবহার করিতেছি। আর ছুতার, কামারের কাজ করিয়া কয়টা লোকই বা জীবিকা করিতে পারে? সুতরাং যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা বেকার সমস্যা দূর করিতে চাহেন, তাঁহারা সমস্যাটিতে কেবলমাত্র আংশিক ভাবে দেখিয়া থাকেন। ইহার দ্বারা আমরা এমন কথা বলিতেছি না যে দেশে ব্যবহারিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা নাই। কিন্তু ব্যবহারিক বিদ্যালয় স্থাপনের দায়ীত্ব ও সামর্থ গবর্ণমেণ্টের আছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ও তাঁহার মতানুবর্ত্তীগণ বাঙ্গালীর মধ্যবিত্ত ছেলেদিগকে ব্যবসা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। চাকুরীর উপর কেবলমাত্র নির্ভর না করিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের চেষ্টা করিলে বেকার সমস্যা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু মাড়োয়ারীরা যে শ্রেণীর ব্যবসা করে তাহা বিদেশী মালের দালালী করা মাত্র। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কগুলি যদি সহজে জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজিতে যাইয়া শুধু বিদেশী মালের দালালী করে তবে দেশের ক্ষতি ভিন্ন লাভ হইবে না।

বেকার সমস্যার জন্য যদি কেহ দায়ী হয় তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোবৃত্তিই দায়ী। সম্প্রতি মাদ্রাজের রামনদ জেলার কলেক্টার মিঃ এস্, ভি, রামমূর্ত্তি আই, সি, এস্ মহাশয় মাদ্রাজে একটি বক্তৃতায় এই বিষয়টী অতি স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন। মিঃ রামমূর্ত্তি গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী হইয়াও, দেশের সমস্যাকে দেশের স্বার্থের দিক দিয়াই বিচার করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে ভারতবর্ষে মধ্যশ্রেণীর লোকেরা মধ্য শ্রেণীর উপযুক্ত কাজ করেন না বলিয়াই তাঁহাদের মধ্যে এত বেশী বেকার হইতেছে। ইউরোপের প্রত্যেক দেশে মধ্য শ্রেণীর লোকেরা নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যের উন্নতি, কৃষিকর্ম্মের উন্নতি ও রাস্তা, ঘাট, খাল, সেতু প্রভৃতির উন্নতি বিধান করিয়া থাকেন। মধ্য শ্রেণীর লোকেরা কলা বিজ্ঞানের যে জ্ঞান আহরণ করেন, তাহাই নিম্নশ্রেণীর লোকের কাজে লাগাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যশ্রেণীর ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা বিদ্যাকে কেবলমাত্র চাকুরী লাভের উপায় স্বরূপ মনে করেন। তাঁহারা এ পর্য্যন্ত ইংরাজী বিদ্যাকে দেশের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন নাই। ফলে তাঁহাদের মধ্যেই যে কেবল বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নহে, দেশের নিম্নশ্রেণীর দুর্দ্দশাও বিদূরিত হইতেছে না।

নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কৃষিকর্ম্ম করিতে তাহাদের সমস্ত সময় ব্যয়িত হয় না। বৃষ্টির অভাবে বা অতিবৃষ্টির সময়ে তাহাদিগকে ঘরে বসিয়া থাকিতে হয়। সেই সময় যদি তাহারা কুটীর শিল্পে মনোনিবেশ করে, তবে তাহাদের উপরি দু' পয়সা রোজগার হইতে পারে—তাহাদের সংসারে স্বাচ্ছল্য আসিতে পারে। কিন্তু তাহাদিগকে এ বিষয়ে শিক্ষা দিবে কে? মধ্যবিত্ত ছেলেরা অর্থনীতির সকল সূত্রগুলি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া কুটীর শিল্প শিক্ষা দেন তবে তাঁহারাও কিছু কিছু রোজগার করিতে পারেন। তাঁহারা উন্নততর কৃষিবিদ্যাও কৃষকদিগকে শিখাইতে পারেন।

গ্রামে গ্রামে এখনও প্রাথমিক শিক্ষাদানের কত প্রয়োজন। মধ্যবিত্ত ছেলেরা গ্রামের নাবালক ও সাবালকদিগকে যদি শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জন্মাইয়া দেন ও দিনে বা রাত্রে ইস্কুল করিয়া তাহাদিগকে পড়ান তবে দেশে মানুষ তৈয়ারী হয়—আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর ছেলেরা শিক্ষাদান করিয়া কিছু কিছু রোজগারও করিতে পারেন।

গ্রামের স্বাস্থ্য আজকাল খারাপ। অনেক ছেলে ডাক্তারী পাশ করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছেন। তাঁহারা পল্লীর স্বাস্থ্য ভাল করিতে যতটা পারেন, অন্যে তাহা পারে না। অথচ ডাক্তারী পাশ ছেলেরা চাকুরীর মোহ ও ফিঃয়ের লোভ ত্যাগ করিয়া পল্লীসেবায় মনোনিবেশ করেন না।

নিম্নশ্রেণীর উন্নতি সাধন না হইলে মধ্যশ্রেণীর দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে না। দেশে মানুষের অভাব নাই—অভাব কেবল কাজের। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা যতদিন নিম্নশ্রেণীর সেবায় আত্মনিয়োগ না করিবে, ততদিন তাহাদের বেকার সমস্যা মিটিবে না।

মধ্যশ্রেণীর লোকেরা ইংরাজ শাসনের প্রথম আমলে ইংরাজী শিখিয়া অনেক পয়সা রোজগার করিয়াছে। এখন

আর তাহা সম্ভব নহে। মধ্যশ্রেণীর লোকেরা নিতান্ত স্বার্থপরের মত শুধু নিজের সুখ সুবিধা খোঁজে—দেশের স্বার্থের দিকে তাকায় না। যদি দেশের স্বার্থ তাহারা বজায় রাখিতে চায় তবে তাহাদের অনেকখানি সুখ সুবিধা বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যে পণ্ডিত কালিদাস পড়ান, তিনি মাসিক কুড়িটাকা আয়ে সন্তুষ্ট থাকেন, আর যে পণ্ডিত সেক্সপীয়র পড়ান তিনি একশত টাকা পাইয়াও খুসী হয়েন না। এই স্বার্থপর মনোবৃত্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

দেশের বেকার সমস্যা দূর করিতে হইলে চাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরাট স্বার্থত্যাগ। লেখাপড়া শিখিতে তাঁহাদের অনেক পয়সা খরচ হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে পয়সা চাকুরী করিয়া উসুল করিয়া লইবার ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদের সমস্যা আরও কঠিনতর হইবে। এখন মধ্যশ্রেণীর লোকেরা নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের কাজে লাগিলে অদূর ভবিষ্যতে বেকার সমস্যার সমাধান হইবে।

— —

করদরাজ্যের শাসন প্রণালী—

করদরাজ্যে সুশাসন হয় না এই অজুহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট নাভানরেশ ও ইন্দোরকে হোলকারের গদি হইতে অপসারিত হইতে বাধ্য করিয়াছেন। সম্প্রতি নিজামরাজ্যের উচ্চতম পদগুলি ইংরাজকে না দিলে নাকি হায়দ্রাবাদের শাসন কার্য্য ভালভাবে চলিতে পারে না এইরকম দাবী ভারত সরকার করিয়াছেন। বিলাতেও দেশীয় রাজ্যের শাসন প্রণালীকে স্বেচ্ছাচারিতা ও অত্যাচারের প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হয়। ভালমন্দ সকল গবর্ণমেণ্টেরই আছে—কোন শাসন প্রণালীই নির্দ্দোষ হইতে পারে না। তবে সাধারণের মনে একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে করদরাজ্যগুলির শাসন প্রণালী নিছক মন্দ।

এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্ত তাহা দাতিয়ার দেওয়ান কাজী আজিজুদ্দিন আহমেদের লিখিত ও জুলাইয়ের ইণ্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়িলেই বুঝা যাইবে। নিম্নে আমরা তাঁহার কয়েকটি মত ব্যক্ত করিতেছি।

ব্রিটিশ ভারতে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা লাগিয়াই আছে। কিন্তু কি হিন্দু কি মুসলমান কোন করদরাজ্যেই এরূপ দাঙ্গা হয় নাই। কেবলমাত্র করদরাজ্যেই হিন্দুমুসলমানের যথার্থ মিলন বর্ত্তমান রহিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিরোধের সূচনা দেখা গেলে রাজা স্বয়ং তাহার মীমাংসা করিয়া দেন।

ব্রিটিশ ভারতে ব্যবসায়ের বাধাস্বরূপ যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে, করদরাজ্যে তাহা নাই। করদরাজ্যে তুলার উপর শুল্ক নাই আয়কর নাই। মুদ্রা বিনিময়ের বাজারের উপর করদরাজ্যের ব্যবসাবাণিজ্য নির্ভর করে না। করদরাজ্যে ট্যাক্সের বড় বেশী উপদ্রব নাই। সেখানে বাড়ীর উপর, আয়ের উপর বা কুকুরের উপর ট্যাক্স দিতে হয় না। জিনিষ পত্রের দাম করদরাজ্যে অসম্ভব রকম সস্তা। মথুরায় যখন টাকায় ৬ সের গম বিক্রয় হয়, তখন মথুরার নিকটবর্ত্তী ভরতপুর রাজ্যে টাকায় ১২ সের গম বিক্রয় হয়। আগ্রায় টাকায় ছয় ছটাকের বেশী ঘি পাওয়া যায় না, কিন্তু ধোলপুরে টাকায় দশ ছটাক ঘি বিক্রি হয়। ব্রিটিশভারতে বার আনার কম মজুর মেলে না, করদরাজ্যে পাঁচ ছয় আনায় মজুর পাওয়া যায়। ব্রিটিশভারত অপেক্ষা করদরাজ্যে জীবন সংগ্রামের ভীষণতা অনেক কম।

চিকিৎসা বিষয়েও করদরাজ্যে ব্রিটিশভারত অপেক্ষা অনেক সুবিধা। করদরাজ্যে সরকারী হাঁসপাতাল হইতে সকল ঔষধ বিনামূল্যে দেওয়া হয়। লোকে সেখানে ঔষধের দোকান হইতে বড় একটা ঔষধ কিনে না। সরকারী বৈদ্য ও হাকিম উনানী ও আয়ুর্ব্বেদিকমতে বিনামূল্যে ঔষধ ব্যবস্থা করেন। অধিকাংশ করদরাজ্যেই দেশীয় ভাষায় সরকারী কার্য্য চালান হয়। সুতরাং বেশী বেতন দিয়া ইংরাজী-নবিশদের রাখিতে হয় না। করদরাজ্যে গোহত্যা খুব কমই হইয়া থাকে। হায়দ্রাবাদের ন্যায়—মুসলমানপ্রধান রাজ্যেও গোহত্যা নিবারিত হইয়াছে। করদরাজ্য হইতে গোরু রপ্তানী করার উপর বাধা দেওয়া হইয়া থাকে।

করদরাজ্যে চাকুরীতে প্রবেশ করিবার কোন বয়সনির্দ্দিষ্ট নাই। তাহার ফলে অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ অধিক বয়সেও সরকারী কাজে প্রবেশ করিতে পারেন। দক্ষতা,

অভিজ্ঞতা, সচ্চরিত্রতা ও পারিবারিক দাবীর উপর নির্ভর করিয়া করদরাজ্যে চাকুরী দেওয়া হইয়া থাকে। করদরাজ্যে মামলা-মোকদ্দমা করিতে যাইয়া প্রজারা সর্ব্বস্বান্ত হয় না। উকীলেরা সেখানে শকুনির ন্যায় মক্কেলকে খাইয়া ফেলে না।

করদরাজ্যের শাসনকর্ত্তারা ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার ধারা অপ্রতিহত রাখিবার জন্য আগ্রহান্বিত। তাঁহারা দেশের শ্রেষ্ঠ কবি, শিল্পী, ভাস্কর ও সাহিত্যিককে সর্ব্বদা উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয় না যে করদরাজ্যগুলিতে বাস করা একেবারে অপ্রীতিকর। করদরাজ্য সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা জ্ঞাত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃষকের পঞ্চশত্রু—

কৃষকের উন্নতির উপর জাতীয় উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কৃষকের উন্নতি সাধন করিতে হইলে প্রথমে তাহার উন্নতির প্রতিকূলে কি কি অবস্থা কার্য্য করিতেছে তাহা দেখা প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে দেখিতে গেলে আমাদের দেশের কৃষকের শত্রু পাঁচটী (১) অজ্ঞানতা বা শিক্ষার অভাব (২) ঋণ (৩) রোগ (৪) নেশা (৫) দাঙ্গাহাঙ্গামা মোকদ্দমা প্রভৃতি করিবার প্রবৃত্তি। ইংরাজীতে এই পঞ্চ-শত্রুকে পঞ্চ ডকার বলা যাইতে পারে, যথা—Darkness, Debt, Disease, Drink and Devil.

ভারতীয় কৃষির উন্নতির জন্য যে রয়াল কমিশন বসিতেছে তাহাতে কৃষির উন্নতি, গ্রামবাসীর আর্থিক উন্নতি, অনুসন্ধান গবেষণা ও কৃষিবিদ্যার উন্নতি, নূতন শস্যের উৎপাদন, কৃষিকর্ম্মের ব্যবহারিক জ্ঞানের উন্নতি, যানবাহনের উন্নতি, ও কেনাবেচার সুবিধা বিষয়ে আলোচনা হইবে। কিন্তু কৃষকের ঐ পঞ্চ-শত্রু দূর করিতে না পারিলে কোন উন্নতিই সম্ভবপর হইবে না।

কৃষকের উন্নতি করিতে হইলে সমগ্র দেশেরই উন্নতি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশ হইতে ম্যালেরিয়া কালাজ্বর কলেরা বসন্ত প্রভৃতির প্রকোপ দূর করিতে না পারিলে, কৃষকের উন্নতি শুধু কথায় কথাই রহিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্ট রয়াল কমিশনই বসান আর বিশ পঞ্চাশ লাখ টাকা খরচই করুন, তাহাতেই যে কৃষকের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইবে তাহা নহে। গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য প্রয়োজন বটে, কিন্তু দেশবাসীর আত্মত্যাগমূলক সংহতশক্তির প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে কোন দেশের কৃষকের উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। এখন চাই স্বার্থশূন্য কর্ম্মী যিনি কৃষকের দুঃখবেদনার সহিত নিজেকে জড়িত করিয়া, যাহার উপকার করিতে যাইতেছেন তাহার অনাদর অবহেলা সহ্য করিয়া, দেশের কল্যাণের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে পারিবেন। বিদেশী সাহেবের বা ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোকের দ্বারা কৃষকের রোগ দূর করা বা শিক্ষা-বিস্তার করিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। গবর্ণমেণ্ট গবেষণা প্রভৃতি কাজের জন্য যাহা ব্যয় করিতে রাজী থাকেন করুন। কিন্তু তাহারই উপর নির্ভর করিলে আমাদের চলিবে না। কৃষি বিষয়ে গবেষণার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। গবেষণা ব্যতিরেকে শস্যের ও ভূমির উন্নতি সাধন সম্ভবপর নহে। — বর্ত্তমানে সরকারী গবেষণায় কোন সুফল পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া অনেকেই গবেষণা বিভাগকে অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু গবেষণা ঠিক পথে চালাইলে একদিন না একদিন তাহাতে ভারতীয় কৃষির উন্নতি হইবেই। রয়াল কমিশন খুবসম্ভব গবর্ণমেণ্টের টাকা গবেষণা কৃষি-বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ব্যয় করিবারই পরামর্শ দিবেন। কেননা কৃষি কমিশন যে স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য টাকা ব্যয় করিতে বলিবেন তাহা মনে হয় না কিন্তু কৃষকের উন্নতির সহিত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কৃষকেরা যদি একটু লেখাপড়া না শিখে, তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর কৃষি তাহারা প্রবর্ত্তন করিতে পারিবে না। লেখাপড়া না শিখিলে ব্যাপারীর চাতুরী হইতে, উকীলের টাউট হইতে, ভাঁটীওয়ালার দোকান হইতে তাহাদের মুক্তির আশা নাই। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এত বড় দেশের সমগ্র কৃষককে লেখাপড়া শেখান বড় সহজ কথা নহে। ভারতবর্ষের সমগ্র রাজস্বের অর্দ্ধেকের বেশী যদি ব্যয় করা যায় তবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা সম্ভব হয়। কিন্তু রাজস্বের অর্দ্ধেকাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এরূপ ক্ষেত্রে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই কৃষকের শিক্ষার ভার গ্রহণ

করিতে হইবে। ছবি দিয়া, হাটের দিনে বক্তৃতা দিয়া, Circulating Libraryর বই দিয়া ও নৈশ বিদ্যালয় দ্বারা কেবলমাত্র বালকদিগকে নহে—যুবক ও প্রৌঢ় কৃষকদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। এই কাজ যতদিন না রাজনৈতিকগণ সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ না করিবেন, ততদিন দেশের উন্নতি হইতে পারে না। বোলপুরের শ্রীনিকেতন বা বঙ্গীয় হিত-সাধন মণ্ডলীকে অর্থ দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, জনশক্তির দ্বারা সাহায্য করিয়া জীবন্ত শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে।

কৃষককে শিক্ষা না দিয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তার একজনের স্থানে দশজন করিয়া গ্রামে গ্রামে রাখিলেও কৃষকের ব্যাধির প্রতীকার হইবে না। কেননা কৃষকেরা যতদিন পর্য্যন্ত না স্বাস্থ্যের মূল সূত্রগুলি জানিতে না পারে ততদিন পর্য্যন্ত রোগের প্রকোপ মন্দীভূত হইবে না।

কৃষকের পঞ্চ শত্রু নিবারণ করিতে পারে দেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়—রয়াল কমিশন নহে। আমাদের আত্মত্যাগ ব্যতীত আমাদের মুক্তির উপায় নাই।

গো-রক্ষা ও গো-মঙ্গল—

গো-রক্ষা ও গো-মঙ্গল মাড়োয়াড়ী সম্প্রদায়ের একটা খেয়াল বলিয়া আমরা বিজ্ঞ বাঙ্গালী বিদ্রূপের হাস হাসিয়া থাকি। কিন্তু মাড়োয়াড়ীদের এই খেয়াল অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিষ নহে। গোরুর উন্নতি না হইলে ভারতীয় কৃষির ও ভারতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে না। অষ্ট্রেলিয়াতে প্রতি শত মানুষের অনুপাতে ২৫৬টী লাঙ্গলের গরু আছে, দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেনটাইনে প্রতি শত মানুষের অনুপাতে ৩০২টী লাঙ্গলের গরু আছে আর সেই জায়গায় ভারতে মাত্র ৫৭টী লাঙ্গলের গরু আছে। এরকম অবস্থায় আর কৃষির উন্নতি হয় কিরূপে? আমাদের দেশের গবাদি পশুকে খাটান হয় এত যে তাহাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি অতি অল্পদিনেই নষ্ট হইয়া যায়। এদেশে ২৬ কোটী ১০ লক্ষ একর ভূমিতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে, অথচ গবাদি পশু আছে মাত্র ২ কোটী ৪০ লক্ষ অর্থাৎ প্রত্যেকটী পশুকে গড়ে ১১ একর জমী চাষ করিতে হয়। তাই আমাদের লাঙ্গলের পশুগুলির হাড়গিলের মতন চেহারা হইয়া থাকে। ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশের লোকে গড়ে ৬ ছটাক দুধ খায় আর ভারতবাসী জনপিছু দেড় ছটাকের বেশী দুধ পায় না। গত ষাট বৎসরের মধ্যে অন্যান্য জিনিষের দাম সাতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু দুধের দাম ৪০গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। যে-সব দেশের শিশুরা প্রচুর পরিমাণে দুধ পায়, সে-সব দেশে শিশু মৃত্যুর হার খুব কম। নরওয়ে ও সুইডেনে শতকরা ৭জন, আমেরিকায় ৫জন, নিউজিল্যাণ্ডে ৩জন শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেই স্থলে ভারতবর্ষে শতকরা ২৫জন শিশু উপযুক্ত পরিমাণে দুধের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে।

এখন গোরুর সংখ্যা কি করিয়া বৃদ্ধি করা যায়, এবং বিদেশে গোরু রপ্তানী ও দেশের মধ্যে গো হত্যা নিবারণ কি করিয়া করা যায় তাহা সত্যই গভীর সমস্যার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশের খবরের কাগজে দলাদলি ও মতভেদের বিষয় এত বেশী আলোচনা হয় যে এইসকল গভীরতম সমস্যার কথা আলোচনা করিবার সময় ও সুযোগ থাকে অতি অল্প। অথচ গো-মঙ্গলের পক্ষে জনমত গঠন করিতে না পারিলে ভারতবাসীর অধঃপতনের দ্রুতগতিকে প্রতিহত করা যাইবে না।

সম্প্রতি পণ্ডিত শ্যামলাল নেহেরু ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে গো-রক্ষা সম্বন্ধে আইন করিবার প্রস্তাব করিবেন। আইনের দ্বারা যতটুকু সুবিধা পাওয়া যাইতে পারে তাহা লইবার জন্য প্রত্যেক ভারতীয় সদস্যের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদেও ডাঃ মনরো গো-চর ভূমির আইন করিবার প্রস্তাব করিবেন। গো-চর ভূমির প্রয়োজন যে দেশে কত বেশী তাহা কলিকাতাবাসীরা না বুঝিলেও মফঃস্বলে যাঁহাদের গরু আছে তাঁহারা বুঝিবেন। গো-চর ভূমি স্থাপন করিতে হইলে দেশবাসীকে কিছু কর দিতে হইবে। কিন্তু এই সামান্য করের ভয়ে যদি গো-চর ভূমি আইনীকৃত করিতে সদস্যগণ অস্বীকার করেন, তবে দেশের অত্যন্ত ক্ষতি হইবে।

মায়া

(বড় গল্প)

[শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়]

(১)

সুবোধ চক্রবর্ত্তীকে বড়লোক বলা বোধ হয় চলে না। গরীব বলিলে ভুল হয়; মধ্যবিৎ লোক বলিলে বোধ হয় কথায় একটু খোঁচা থাকিয়া যায়। কিন্তু তাঁর চাল-চলন, আচার ব্যবহার, "আদব কায়দা", এই তিনটী রেষারেষীর ভিতর দিয়া এমন সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছে যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে যে দেখে সেই তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়ে। তাঁহার অহঙ্কার দেখিয়া যদি কাহার মনে ঘৃণা বা বিরক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহার ধার্ম্মিকতা দেখিয়া পরক্ষণেই তাহা ধুইয়া মুছিয়া যায়। তাঁহার কৃপণতা দেখিয়া যদি কেহ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হয় তাঁহার অমায়িকতা স্মরণ করিয়া তাহাকে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। তাঁহার খালি গা ও আধ ময়লা থান ধুতি দেখিয়া যদি কোন অনভিজ্ঞ লোকের মনে দয়ার অথবা বিরক্তির সঞ্চার হয়, তাঁহার স্থূল দেহ, গৌর কান্তি, উন্নত ললাট ও কেশের পারিপাট্য দেখিয়া যুগপৎ ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহাকে বিচলিত করিয়া ফেলে। এহেন চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে যে তাঁহার সতীসাধ্বী স্ত্রী সুশীলা দেবী ভক্তিগদ্‌গদ্‌ চিত্তে ও কায়মনোবাক্যে সেবা করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? চক্রবর্ত্তী মহাশয় আড়ম্বরহীন লোক। তিনি সংসারে থাকিয়াও বৈরাগী।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা চারিটী ভাই। বড়টী জমিদার। পৈতৃক সম্পত্তি বাদে শ্বশুরের বিস্তর সম্পত্তি তাঁহার স্ত্রী লজ্জাবতী দেবী একমাত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়ায় তাহা অঘোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অল্প বিস্তর দায়মুক্ত হইয়া গঙ্গা যমুনা সঙ্গমে ভাগীরথীর বক্ষ বিস্তারের ন্যায় অঘোর বাবুর ভাণ্ডার ধনধান্যে বর্দ্ধিত করিয়াছে। অঘোর বাবু সাদাসিদে লোক। লোকের সাত পাঁচে থাকেন না বলিলেও চলে। ঘন ঘন চা পান করিয়া, গল্প-গুজব করিয়া, কখন বা দেশের Politics চর্চ্চা করিয়া নিজের আনন্দে নিজেই বিভোর হইয়া থাকেন।

সেজ ভাই রাখাল চক্রবর্ত্তী বিহার অঞ্চলে অনেকেরই পরিচিত। তাহাকে ইংরাজীতে যাহাকে Ladies man বলে তাহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাই বলিয়া তাহার চরিত্র সম্বন্ধে কাহাকেও কোনদিন কাণাঘুসা করিতে শুনা যায় নাই। রাখাল শিক্ষিত যুবক, দূরদর্শী, চতুর ও বিষয় বুদ্ধিতে প্রবীণ। রাখাল একটা ভাঙ্গা কারবার এমন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে যে তাহার বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন এবং পরিচিত লোকেরা তাহার বিদ্যা বুদ্ধি, উদ্যম, সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছে। বড় ঘরের মেয়ে প্রভাবতী দেবী রূপে অপ্সরা না হইলেও গুণে সংসারে সকলেরই প্রিয় হইয়াছেন।

ছোট ভাই নবীন চক্রবর্ত্তী দোষে গুণে মানুষ। তাহার কোন কথার প্রতিবাদ না করিলে এবং একটু খোসামোদ করিয়া চলিলেই তাহাকে বন্ধু হিসাবে পাওয়া দুষ্কর বলিয়া মনে হয় না।

এই কৃশকায় উগ্র স্বভাবের লোকটীর আত্মমর্য্যাদা বড়ই প্রবল।

(২)

এঁরা কারা? এই দুর্গম পথ 'হুড়কলে' এতগুলি কোমলাঙ্গি কোথা হইতে আসিলেন? ইঁহাদের মধ্যে প্রৌঢ়া, যুবতী, চয়নিকা সব রকমই আছেন দেখিতেছি। ঐ ক্ষুদ্র বালকটী ইঁহাদের অভিভাবক নাকি? না পিছনে আরও কেউ আছেন? ওই যে অদূরে অভিভাবকটী ধীর মন্থর গতিতে আসিতেছেন। সঙ্গে তাঁর ওকি চিত্র—কি মনো-

মুগ্ধকর বেশ—চলিবার কি মনোহর ভঙ্গী। চিত্রকর তাঁহার সুকোমল তুলিকা গোলাপী আভায় রঞ্জিত করিয়া এই চিত্র-লেখার সুললিত অঙ্গে এমন একটী মন ভোলান ভাবের সৃষ্টি করিয়াছেন যে তাহাকে দেখিয়া পুরুষের মন স্বতঃই প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সেই প্রকৃতির বিশাল বিস্তৃত উদ্যানে কোন অজানা পূর্ব্ব পারদর্শীর অদ্ভুত দৃশ্যাবলী খচিত মহিমাময় অতি রমনীয় লোভকর স্থানে স্থানে পান্থর্য্য স্বরূপ কোন এক ভক্তের নিদর্শন, অধুনা উপেক্ষিত জীর্ণ মন্দিরের চতুঃপার্শ্বস্থিত বেদীর উপর দণ্ডায়মান আমোদম্বেষি কতিপয় বাঙ্গালী যুবকের দৃষ্টি একযোগে সেই লবঙ্গ লতিকার উপর ধাবিত হইয়া কি জানি কি যাদুবলে পরক্ষণেই তাহা অলক্ষিতে সাজা পাইয়া সংযতাকার ধারণ করিল। সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী ধীর ও সংযত পাদক্ষেপে অভিভাবক ভদ্রলোকের সহিত সুমধুর বাক্যালাপে স্বভাব সুন্দরী প্রকৃতির মনে ঈর্ষা জাগাইয়া—মন্দিরের নিকট আসিতেই মুগ্ধদৃষ্টি যুবকদের সসম্ভ্রম ভাব লক্ষ্য করিয়া ও সেই দুর্গম স্থানে আসিয়া অবধি মনের নিভৃত কোণে যে একটা ভয়ের সাড়া দিতেছিল তাহা এতগুলি স্বদেশীর অভাবনীয় সাক্ষাৎ পাইয়া মন্ত্রতাড়িতের মত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই প্রফুল্ল মুখ আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সেই কুমারীর অভিভাবকটীরও মুখে যেন একটা আনন্দের রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি প্রথমেই সকলের লজ্জাবিজড়িত স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া তাঁহার স্বভাব নম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, মেয়েরা কোন পথে গেলেন দেখেছেন কি?" নবীন একবার, অতি সন্তর্পণে, সেই কুমারীর লজ্জারক্তিম মুখের দিকে চকিতে চাহিয়া মন্দিরের সোপান অতিক্রম করিয়া একটু অগ্রসর হইয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "মেয়েরা সব ওই পথে গেছেন।"

ভদ্রলোকটী সহাস্যে নবীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কতক্ষণে ফিরিবেন।" নবীন ও তাহার বন্ধু সন্তোষ সমস্বরে উত্তর দিল—"আরও এক ঘণ্টা আছি। ফিরিবার পথে রামগড়ের ডাক বাঙ্‌লায় এক ঘণ্টা থাকিয়া চা টা খাইব।" নবীনকে অতিক্রম করিয়া সন্তোষ বলিল,—"আমরা রাঁচীতেই থাকি, আপনিও কি রাঁচীতে থাকেন? ভালই হ'ল—আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।" নরেশ বাবু বলিলেন,—"এখন আর আমরা একলা নই, ইঁহাদের সহিত একসঙ্গে রামগড় হয়ে রাঁচী ফিরা যাবে। রামগড় রাঁচীর পথও দেখা হবে—কি বল মায়া?"

মায়া সানন্দে বলিল—"হঁা বাবা সেই ভাল,—চিটুবালু পাহাড়টার গা বয়ে যখন ৭ মাইল মটর দৌড়িবে তখন কি মজাই হবে।"

(৩)

নরেশ চট্টোপাধ্যায় পূজার ছুটির সঙ্গে privilege leave যোগ করিয়া রাঁচিতে আসিয়া সহরের প্রায় এক মাইল দূরে হাজারিবাগের পথে ছোট একটি বাঙ্‌লা ভাড়া করিয়া সপরিবারে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছুটিটা উপভোগ করিতেছিলেন। নরেশ বাবুর সঙ্গে তাহার স্ত্রী কমলমণি ও দুইটী কন্যা, অপরাজিতা ও মল্লিকা এবং ৮৷৯ বৎসর বয়সের কুলের প্রদীপ, রমণীমোহন আসিয়াছিল। অপরাজিতার স্বামী মিষ্টার সুধীন্দ্র নাথ বানার্জ্জি গত বৎসর I. C. S. পাশ করিয়া সম্প্রতি মান্দ্রাজে ভিজিগাপটমে মহাকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হওয়ায় এখনও তাঁহার স্ত্রীকে সেখানে লইয়া যাইতে পারেন নাই। মল্লিকার, অরুণোদয়ে স্বচ্ছ সরোবরের ন্যায় স্নিগ্ধ ও তরল মুখচ্ছবির শান্ত কোমল দৃষ্টি এবং ধীর ও মধুর স্বভাবের জন্য তাহাকে সকলে আদর করিয়া 'মায়া' বলিয়া ডাকিত। মায়া মায়ার স্বপ্নরাজ্য বিস্তার করিয়া প্রবাসের নৈরাশ্যতাকে আজিও একদিনের জন্য কাহার মনকে অধিকার করিতে দেয় নাই। তাহারই আগ্রহে নরেশ বাবু সস্ত্রীক আজ শিবমন্দির কাল ঠাকুর বাড়ী ঘুরিয়া ফিরিয়া ছুটির অবসরটাকে পুরাদস্তুর তাঁহার অধীন করিয়া ফেলিয়াছেন।

নরেশ বাবু বড় সাদাসিদে লোক। বেশভূষায় সাহেব সাজিয়া থাকিলেও অন্তরটা তাঁহার খাঁটী স্বদেশী। সরকারী আফিসে বড় চাকরী করেন বলিয়া অনেকেরই মত একটা ভুল ধারণার বশীভূত হইয়াই হোক কিংবা বড় সাহেবদের সঙ্গে মেলামেশা করেন বলিয়া তাহাদের পোষাকে একটা উদ্যম, তৎপরতা ও সাহসিকতার আভাস পাইয়াই হোক, তিনি সদাসর্ব্বদা সাহেবী পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন।

নরেশ বাবুর স্ত্রী কমলমণি বড় ঘরের মেয়ে। তাঁহার অমায়িকতায় ও মধুর আলাপে, স্নেহ ও যত্নে, তিনি পরকেও এমন আপন করিয়া লইতে পারিতেন যে তাঁহার গুণে সকলেই মুগ্ধ। নরেশ বাবুর ত কথাই নাই। নরেশ বাবুর স্বভাব যেমন শান্ত ও ভীরু, কমলমণির তেমনি মধুর অথচ দৃঢ়।

তাঁহাদের সুখের সংসারে সদাই শান্তি বিরাজিত।

(৪)

সন্তোষ বন্দোপাধ্যায় নবীন চক্রবর্ত্তীর একজন কলেজ বন্ধু। সন্তোষ রাঁচীতে হাওয়া খাইতে আসিয়া missionএর নিকট একটা বাড়ীতে থাকিত। সে বাড়ী নবীন তাহার জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সন্তোষ বালীগঞ্জ নিবাসী জমিদার গুরুসদয় বাবুর একমাত্র পুত্র; অতএব বিপুল সম্পত্তির অধিকারী। তাহার বেশ ভূষায় কিন্তু তাহা আদৌ প্রতীয়মান হইত না। বেশ ভূষার অনুকরণে তাহার মনটাও বোধ হয় সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে নাই। জমিদার পুত্র বলিয়া তাহার একটা অভিমান ছিল, কিন্তু তাহা কোনদিন তাহাকে অভিভূত করে নাই। পিতার 'মাপ কাঠির' অনুশাসনে পীড়িত সন্তোষ রাঁচিতে আসিয়া জীবনে প্রথম বেশ সুস্থ বোধ করিল।

'হুতরু ফল' দেখিয়া সেইদিন একটু গভীর রাত্রে বাসায় ফিরিয়া সন্তোষ মনে যুগপথ আনন্দ ও বিষাদ অনুভব করিতে-ছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের এক পশলা বৃষ্টির জলে স্নান করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিবার পরক্ষণেই গাত্রজ্বালা।

মায়ার সুন্দর মুখ ও সুকোমল দেহলতা ধ্যান করিতে করিতে সন্তোষ সবে নিদ্রা গিয়াছে, বাহিরে সদর দরজার কড়া সজোরে নাড়িয়া নবীন "কিহে সন্তোষ, এখনও ঘুমচ্চ না কি" বলিয়া ডাকিতেই সন্তোষ শশব্যস্তে উঠিয়া অপ্রসন্ন মুখে দরজার খিল খুলিয়া দিতেই নবীন সহাস্তে বলিল, "কিহে কত বেলা অবধি তুমি ঘুমাও বল ত ?"

সন্তোষ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে নবীনের দিকে চাহিয়া বলিল—"এত সকালেই আজ যে আবির্ভাব—'আজ কেন বঁধূ অধর কোণেতে ফুটিল হাসির রেখা—"

নবীন বলিল—"নাও—নাও, তোমার ইয়ারকী রাখ, চল একটু বেড়িয়ে আসি।"

সন্তোষ। কোথায় হে, 'যমুনারি কাল জলে'।

নবীন। এই ক' ঘণ্টার ভিতরেই দেখছি তুমি একেবারে কবি হয়ে উঠেছ।

সন্তোষ। কোথায় যাবে ?

নবীন। চল, নরেশ বাবুর বাঙলার দিকে যাওয়া যাক্।

সন্তোষ। লাল পাখীর খোঁজে নাকি ?

নবীন ছোলা দেবে কে ?

সন্তোষ। কেন, আমি।

নবীন। ছোলার যোগাড় করতে পারবে ? সমঝে চল ভায়া, শেষে শূন্য খাঁচা না মাটিতে গড়াগড়ি যায়। চল, চল, বেরিয়ে পড়ি, বেলা হয়ে গেলে ফিরতে কষ্ট হবে।

সন্তোষ ক্ষুণ্ণমনে নবীনের অনুসরণ করিল। কিছুদূর যাইতে না যাইতে নবীন উৎসাহকণ্ঠে বলিল, "ওই যে হে, তোমার লাল পাখী এইদিকেই আসছে।" সন্তোষ বলিল, "কিহে তুমি ক্ষেপে উঠলে নাকি ? একটা কথা ঠাট্টার মুখে বেরিয়ে গেছে বলে তার রসটা নিংড়ে বার করতে হবে না কি ?" নবীন বিদ্রূপ কণ্ঠে 'weather-cock' বলিয়া রাগে ও অভিমানে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতেই নরেশ বাবুকে দেখিয়া অভিবাদন করিতে নরেশবাবু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় বেড়াতে, না কোথায় কাজে বেরিয়েছেন ?"

নবীন ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমরা—।" কমলমণি প্রতীতিকর বচনে বলিলেন, "বাধা পড়লে একটু বসে যেতে হয়।" নরেশবাবু, "সে কথা সত্য, আমাদেরও আর যাওয়া হবে না। চলুন, আমার বাসাটা দেখে আসবেন চলুন। না না—কোন আপত্তি আমি শুনব না।"

(৫)

দুইটা ট্রেণ কোন জংশন ষ্টেশন ছাড়িয়া কিয়দ্দূর পাশাপাশি উল্লাসে ছুটিয়া ক্রমেই ভিন্নাভিমুখে ধাবিত হইয়া যেমন ব্যবধানটা উত্তরোত্তর বাড়াইয়া চলে, তেমনি নবীন ও সন্তোষ একই উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া কিছুদিন নরেশ বাবুর বাসায় একত্রে যাওয়া আসা করিয়া ক্রমেই একে অন্যের প্রতি সন্দিহান ও ঈর্ষাপরবশ হইয়া ছলনার আশ্রয় লইতে

তাহাদের বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। একদিন চা আনিয়া মায়া সন্তোষকে পূর্ব্বে দেওয়ায় নবীন আর সেদিন ভাল করিয়া সন্তোষের সহিত কথা কহিল না। একদিন দূরে কোথাও 'বন ভোজনের' কথা উঠিতে মায়া বলিল, "সন্তোষদা', এবারকার feastএর পালা আপনার, আপনি রোজই বলেন খাওয়াব।" সন্তোষ 'খরচ' স্বীকার করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে রাঁধবে কে?" অপরাজিতা হাসিতে হাসিতে বলিল, রাঁধবেন নবীনদা, মোট বইবেন আপনি।" নবীন বিদ্রূপকণ্ঠে বলিল, "ও মোটা বসে বসে রাঁধবে, মোট বইব আমি।" অপরাজিতা বলিল, "না—না, আপনার মত রোগা লোকের কাজ নয় মোট বওয়া। নবীন মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার ঐ ভাব লক্ষ্য করিয়া মায়ার মুখের হাসি মিশাইয়া গেল। অপরাজিতা তাহা লক্ষ্য করিয়া চুপি চুপি মায়াকে বলিল,—"মোট বয় কুলীতে,—রাঁধে বামুনে।"

মায়া প্রফুল্ল চিত্তে দিদির গলা জড়াইয়া ধরিল।

(৬)

নবীন তাহার আফিসে একাকী বসিয়া আজ কি ভাবিতেছে? ভাবনার যেন আর অন্ত নাই। তাহার মুখ কখন বা উৎসাহে দীপ্ত হইয়া পরক্ষণেই আবার অবসাদে মলিন হইয়া যাইতেছিল। সে আজ যেন কিছু বেশী বাবু সাজিয়া বসিয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছে। মাঝে মাঝে আফিসের ঘড়ির দিকে চাহিয়া বিরক্তি ও হতাশায় একটা কলম দাঁতের মধ্যে ধরিয়া চিন্তাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিবার জন্য চেয়ারে হেলান দিয়া বসিতেই দেখিতে পাইল সন্তোষ ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া আছে। দুজনের চারি চক্ষুর মিলনের সঙ্গে সঙ্গেই সন্তোষ একটু রসিকতার সুরে বলিল, "কিহে ভায়া, আজি কাহারি উদ্দেশে যেতেছ ভাসিয়ে?"

নবীন আজ এই বন্ধুর আগমনে বিশেষ বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া তাহার স্বাভাবিক কঠিন স্বরে উত্তর দিল,—"ওহে আমরা ব্যবসাদার লোক, কত লোক চরিয়ে খাই, আমাদের প্রাণে কবিত্বের স্থান নাই; ভালবাসা, প্রেম ওসব বস্তু তোমাদের মত নিশ্চিন্ত আলস্যে যাহারা সময় কাটায় তাহাদের ঘরে ঘরে বিরাজ করে। আমাদের ভালবাসাও নাই, বিচ্ছেদও নাই, প্রেমও নাই, ধিক্কারও নাই।" যাক্—হঠাৎ এ সময় যে? তাইত ক'টা বাজল? হ্যাঁ আমার যে বিশ মিনিট বাদেই একবার একটা বিশেষ কাজে যেতে হবে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বড়বাবু এসে এই খানিক আগে বলে গেল—ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডেকেছেন। আমার যেতে ইচ্ছা নেই, আমার খোসামোদ করা অভ্যাস নেই তা জান ত? হা—হা।" সন্তোষ বলিল—"তা' ত নেই, মাঝে মাঝে খা ডালিটা আসটা দিতে হয়। ওহে বড়বাবু, আজ সকালে কি রকম মনে হ'ল চাকর বেটা কত চুরি করে দেখি—তাই বেড়াতে বেড়াতে হাটে গিয়া চাকর বেটাকে নজরে নজরে রেখে এদিক ওদিক ঘুরছি, দেখি নরেশ বাবু আমার খুব নিকটেই একটা কচি পাটার দর করছেন। আমি গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই তিনি দর দস্তুর ভুলে গিয়ে আমাকে একেবারে হিড়্ হিড়্ করে টান্‌তে টান্‌তে তাহার বাঙ্‌লায় নিয়ে গিয়ে উপস্থিত। মায়া—আমাদের দেখেই জিজ্ঞাসা করলে,—"বাবা এঁকে এমন সময়ে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এলেন"—সন্তোষকে কথা শেষ করিতে না দিয়া নবীন যেন আহত ফণীর ন্যায় হঠাৎ দাঁড়াইয়া টেবিলের উপর হইতে ছোঁ মারিয়া একটা কাগজের তাড়া লইয়া এক নিংশ্বাসে ঘরের বাহিরে যাইতে যাইতে বলিয়া গেল "সন্তোষ, আমার আর ১ মিনিট অপেক্ষা করিবার সময় নাই—তুমি রাত্রে বাড়ী থাক্‌বে ত—আমি দুএক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিব"—এবং বাহিরে আসিয়া এক লাফে মোটরে উঠিয়া নিমেষে অদৃশ্য হইয়া গেল।

(৭)

অঘোর চক্রবর্ত্তী রাঁচীতে ষ্টেশনের নিকট একটা বাঙ্‌লা বাড়ীর বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে বসিয়া এক পেয়ালা চা খাইতে খাইতে অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে ১৫২০ বৎসর পূর্ব্বে সেই অঞ্চলে বাঘের প্রাদুর্ভাব, ভাল্লুকের উৎপাত, ৫।৭ জন কুলি চালিত দুই চাকার রথ অর্থাৎ পুষপুষে রাঁচী হইতে হাজারিবাগে যাতায়াতের পথে কখনও বা ১০।১২ হাত লম্বা হাড়ি

সাপের সহিত পথে দেখা সাক্ষাৎ ও তাহার প্রতি লোষ্ট্রক্ষেপণ ইত্যাদি, বাঘের ভয়ে কুলিদের 'পুষ পুষ' ছাড়িয়া পলায়ন, এক পাল বন্য বরাহ দেখিয়া ভয়ে দুর্গানাম জপ—কখনও বা একটা Som' reএর চকিতে পথ অতিক্রম করিয়া পলায়ন ও ততোধিক দ্রুতগতিতে আক্রমণকারী প্রভুর অনুসরণের মর্ম্মস্পৃক অভিজ্ঞতার ইতিহাস স্মরণ করিয়া যখন বড়ই অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন সেই সময় সেখানে সুবোধ চক্রবর্ত্তী আসিয়া দাদার তন্ময়ভাব দেখিয়া নিকটে একটা বেতের চেয়ারে বসিতেই অঘোর বাবু স্বপ্নরাজ্য হইতে আপনাকে কোনরকমে টানিয়া আনিয়া মেজ ভাইয়ের মুখের দিকে তাঁহার গোল দুটী চক্ষু ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু বলবার আছে নাকি ?"

সুবোধ কহিল,—"কিছু নয়—হ্যাঁ বলছিলাম কি—আজ একবার নরেশ বাবুর বাসায় যাবেন না কি ? চলুন না আলাপ করে আসবেন। আমি তাঁহার সঙ্গে দুদিন দেখা আলাপ জমিয়ে এসেছি। তাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই বেশ অমায়িক। নবীন সেখানে প্রায় যাওয়া আসা করে। আমাকে দুদিন খাওযাবার জন্য কি জেদ্। পাউরুটী ডিমের ব্যাপার, সেখানে কে খাবে। নরেশবাবু যদিও সাহেবী ধরণে থাকেন তবু কথা কহিলেই বুঝিতে পারিবেন তাঁর মনটা একেবারে খাঁটী হিন্দু। হাঁ তার একটি আইবুড়ো মেয়ে আছে, যেন অপ্সরা। নবীনের সঙ্গে তার বিয়ে দিলে হয় না ?"

অঘোর। "তা বেশ ত, দেখ না- তবে প্রথমে তুই কথাটা পাড়িস্ নি।" দাদার মন্তব্যটা সুবোধের অপ্রিয়কর হইলেও সে মনের বিদ্রোহ ভাবটা দমন করিয়া বলিল,— বেশ ত, আমি আজই রাখালকে এ বিবাহের ঘটকালি করিতে বলিব, সে যেমন চালাক, সে নরেশবাবুকে এমন কি নরেশ বাবুর স্ত্রীকে অবধি আত্মীয়তায় আপ্যায়িত করিয়া সহজেই কাজটা উদ্ধার করিবে।"

অঘোর—'কাজ উদ্ধার' কথাটা শুনিয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল,—"কাজ উদ্ধার আবার কিসের ? কে সে তোমার নরেশবাবু ? একটা বড় চাকুরে অর্থাৎ বেশী বেতনের কেরাণী। অমন কত কেরাণী নবীনকে মেয়ে দিবার জন্য আমার পায়ে এসে মাথা খুঁড়বে।" সুবোধ দাদার কথা শুনিয়া কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে (দুষ্টলোকে বলে ইচ্ছা সত্ত্বেই) আর এক পেয়ালা চা দাদার জন্য আনিবার হুকুম দিয়া মনে মনে দাদার বুদ্ধিহীনতার নিন্দা করিয়া, কিন্তু বাহিরে দাদার প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়া, রাখালের খোঁজে তাহার বন্ধু শৈলেশ্বর বাবুর বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

অঘোরবাবু একটা স্বস্তির হাঁফ ছাড়িয়া ছিন্নসূত্রে আবার যোগ দিবার চেষ্টায় তাঁহার বড় বড় চোখ দুইটী দূরে একটা জঙ্গলের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

(৮)

নবীন সেই যে মোটরে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গেল তাহার হ'ল কি ? সে যদি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাঙলায় না গিয়া থাকে ত গেল কোথায় ? সন্তোষ কি কিছু অনুমান করিয়াছে ? আজ কি জন্য দুই বন্ধুতে এমন ছাড়াছাড়ি ভাব ? কেনই বা সন্তোষকে দেখিয়া নবীন আজ তাহাকে অবজ্ঞা করিয়া যেন পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইল ? সন্তোষই বা তাহার বন্ধুকে এমন ভাবে যাইতে দিল কেন ? এমন ত কতবার হইয়াছে, নবীন কোন বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজে বাহির হইয়া সন্তোষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাসত্ত্বে সঙ্গে লইয়া গিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। আর সন্তোষও কতবার নবীনকে প্রয়োজনীয় কাজে যাইতে না দিয়া অযথা তাহার কাজের ক্ষতি করিয়া একসঙ্গে গল্পগুজবে সময় কাটাইয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছে।

কিন্তু আজ একি ? সন্তোষও আজ যেন বন্ধুর এমন বিসদৃশ ভাব দেখিয়া নিজ উদ্ধত স্বভাব অনুযায়ী রাগে ও অভিমানে আত্মহারা না হইয়া মনে মনে যেন একটু বিজয়ীর গর্ব্ব ও আনন্দ উপভোগ করিয়া একবার স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া দ্রুতপদে হাজারিবাগের পথে অগ্রসর হইল।

(৯)

নরেশবাবু এই কতকক্ষণ সপরিবারে সন্ধ্যাভ্রমণ শেষ করিয়া বাঙলায় ফিরিয়া বাহিরে বারাণ্ডায় ইজি চেয়ারে

বসিয়া রমণীমোহনের সহিত মল্লিকার যে কথাবার্ত্তা হইতেছিল তাহা সানন্দে উপভোগ করিতেছিলেন। দূরে আর একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া কমলমণি ও অপরাজিতা সন্তোষ ও নবীনের সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। কমলমণি বলিলেন, "মায়ার নবীনের সহিত বিবাহ হইলে মন্দ হইবে না। কিন্তু সন্তোষকে যদি জামাই করতে পারি তাহা হইলে আর মেয়েটার ভবিষ্যৎ ভাবতে হবে না।" অপরাজিতা বলিল—"বড়লোকের ছেলের সঙ্গে মা—." কমলমণি—"কেন তোর শ্বশুরও ত বড়লোক, সুধীন—।" অপরাজিতা লজ্জা-রক্তিম মুখে বলিল—"আমি কি তাই বলছি—।" কমলমণি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে ?" অপরাজিতা বলিল,—"আগে বাবার কি মত শুনি।" কমলমণি কৌতুহল দৃষ্টিতে অপরাজিতার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ওঁর স্বভাব কি জানিস্, সবই হচ্ছে, হবে, তবে ওঁর ভাবে, ভঙ্গিতে ও কথায় যাহা বোঝা যায় তাহাতে বোধ হয় ওঁর সন্তোষের প্রতি টানটা কিছু বেশী।" অপরাজিতা ভগ্নোৎসাহে বলিল, "আমি আর কি বলব।" কমলমণি শূন্যদৃষ্টিতে একবার চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, "সন্তোষের কথাবার্ত্তা বড় মিষ্টি, যেমন রূপ, তেমনি—।" অপরাজিতা বলিল, "তুমি যাহাই বল মা, মোটা চেহারায় ছিরি থাকে না ; মহাদেবের মতন গড়ন আর একালে শোভা পায় না ; হঠাৎ মোটারের ভোঁ ভোঁ শব্দে তাহাদের আলোচনা থামিয়া গেল।

মোটর সরাসরি নরেশ বাবুর বারাণ্ডার সামনে আসিয়া থামিয়া গেল ও তাহার ভিতর হইতে নবীন একলাফে বাহির হইয়া নরেশ বাবুর নিকটে আসিয়া একটী ছোট্ট নমস্কার করিয়া একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল। নরেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রী নবীনকে প্রত্যহই আসিতে অনুযোগ করেন বলিয়াই বোধ হয় নবীন পাঁচ সাতদিন অন্তর সন্ধ্যাযোগে আসিয়া ব্যস্ততার ভাব দেখাইয়া ও বেশীক্ষণ থাকিতে পারিব না জানাইয়া অনেক রাত্রাবধি সেইখানে তাস খেলিয়া, গল্পগুজব করিয়া কাটাইয়া দেয়।

প্রথম কয়েকদিন নবীন ও সন্তোষ একসঙ্গে আসা যাওয়া করিত ; কিন্তু এখন দুই বন্ধুতে যেন সময় ভাগ করিয়া লইয়াছে। সন্তোষ কখন বা সকালে কখন বা বেলা দুই তিনটার সময় আসিয়া নরেশ বাবুর সঙ্গে সন্ধ্যাভ্রমণে বাহির হইয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

বাঙ্‌লার বাহিরে গেটের নিকট বৃক্ষান্তরাল হইতে একটা আলো দেখিয়া মায়া একটু ভীত চকিত দৃষ্টিতে অপরাজিতার অতি নিকটে আসিয়া বসিতে উপস্থিত সকলেই তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিতে প্রথমেই নরেশ বাবু হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন—"বাঘ নয় রে মায়া বাঘ নয়"—"বাঘের চোখ কি হ্যারিকেনের আলো ? কে দুইজন আসছে।"

চাকর সঙ্গে লইয়া সন্তোষকে আসিতে দেখিয়া অপরাজিতা মায়াকে 'বাঘ' ধরাইয়া দিবার ভয় দেখাইল। সেই হাসিতে সকলেই বেশ আনন্দের সহিত যোগ দিলেন, কিন্তু নবীন মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল। নবীনের মুখভাব কিন্তু একজন ছাড়া কেহই দেখিল না। মল্লিকা একবার কাতর দৃষ্টিতে নবীনের মুখের দিকে চাহিয়া মস্তক নত করিয়া বসিয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

পাওনাদার

[শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী]

তেমাথার মোড়ে মনোহারী দোকান। ছোট্ট, ছিটে বেড়ার দেয়াল, গোলপাতায় ছাওয়া।

তা হলেও ছুঁচ, সুতো, লাটাই, লাল ঘুনসী, কাঠের পুতুল, কাচের গেলাস, চায়ের বাটী ইত্যাদি করে গ্রামের ছেলে বুড়ো যার যা কিছু দরকার সবই সেখানে মেলে।

বেলা তখন দুপুর।

দোকানী, খরিদ্দারের প্রতীক্ষায় বসে থেকে থেকে অবশেষে তন্দ্রাবশে ঝিমুতে আরম্ভ করেছিল।

ও-পাড়ার ছিদাম ঘোষের ছেলে নেড়া অবসর বুঝে চুপি চুপি এসে কতকগুলা মার্বেল গুলি আর খানদুই ঘুঁড়ি লুকিয়ে তুলে নিয়ে পালাবার যোগাড় দেখছিল।

এমন সময় তের চোদ্দ বছরের একটী মেয়ে শশব্যস্তে দৌড়তে দৌড়তে এসে দোকানীকে হাত ধরে তুলে দিয়ে বললে "শীগগির বাড়ী চল বাবা। দেখবে এসো কে এয়েছে।"

চমকে উঠে দোকানী জিজ্ঞাসা করলে "কে এয়েছে রে শিউলি ?"

পরক্ষণেই নেড়ার দিকে নজর পড়তেই সে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ছেলেটার কাণ ধরে দু' গালে বিরাশী সিক্কা ওজনের দুটী চড় মেরে বলে উঠল "পাজী বেটা নচ্ছার! দিনে ডাকাতী করতে এয়েছিস ?"

নেড়া অমনি ভালমানুষের মত "ও মাগো! বাবা গো! মেরে ফেললে গো!" বলে চেঁচিয়ে কাঁদতে সুরু করে দিলে।

শিউলি অতিষ্ঠ হয়ে বললে "কাল ওকে মের' বাবা। চলে এস এখন শীগগির। কাকা এসেছে আজ কত বছর পরে—আর তুমি এখনও···"

"কে এসেছে বললি ? কানাই ? ফিরে এয়েছে ? সত্যি ? কেমন আছে দেখলি ? তোকে চিনতে পারলে ত ?...আচ্ছা চ, আমি ঝাঁপিটা বন্ধ করেই যাচ্ছি। তুই ততক্ষণ এই সিকিটা নিয়ে চিনিবাসের দোকান থেকে চার পয়সার মুড়ি, দু'খানা ভাল কাঁচাগোল্লা, দু' পয়সা বাতাসা, আর ছ' পয়সার ভাল দেখে মাছ কিনে নিয়ে আয়।"

দোকানীকে অন্যমনস্ক দেখে নেড়া তার হাত এড়িয়ে পালিয়ে গেল। ভাবলে 'আচ্ছা ফাঁকি দিয়েছি।'

দোকানী সেদিকে তাকিয়ে দেখলে না। তার প্রাণ তখন বাড়ীর দিকে পড়ে রয়েছিল। ভাবছিল কতক্ষণে এই দু' রশি পথ ছুটে গিয়ে ছোট ভাইকে দীর্ঘ অদর্শনের পর আলিঙ্গন করে বুকে জড়িয়ে ধরবে।···

"ভাই কানাই এসেছিস ?"—এই বলে বলাই দোকানী এগিয়ে এসে অনুজকে আলিঙ্গন করতে এল।

কানাই অমনি সত্রাসে দাদার কাছ থেকে পাশ কাটিয়ে সরে দাঁড়াল। বললে "আহা! কি কর দাদা! দাঁড়াও হাত পা ধুয়ে এস আগে। আমিও আমার শান্তিপুরে দিশি ধুতি, সিল্কের পাঞ্জাবী, সব ছেড়ে বদলে ফেলি। তোমার হাতের ময়লা কাদা লেগে খারাপ হয়ে গেলে, এই পাড়াগাঁয়ে আবার তা পরিষ্কার করে দিতে পারবে এমন ভাল ধোপা পাওয়া দায়!"

ছোট ভাইএর কথা শুনে বলাই বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়ে একবার তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল। পরে মুখ নীচু করে সরে এসে দাঁড়াল।

শিউলি খাবার হাতে করে সানন্দে হাসতে হাসতে বাড়ী ফিরে ঢুকেই পিতার অপমান দেখে মর্ম্মাহত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। খানিক চুপ করে থেকে সে তখন আস্তে আস্তে বলাইএর ডান হাত ধরে বাড়ীর ভেতর ডেকে নিয়ে গেল।···

সন্ধ্যার সময় হরিদাস উকীল বলাইকে জানিয়ে গেলেন, কানাই তাকে ভাগ বাঁটোয়ারার জন্যে আদালতে আর্জ্জি করতে অনুরোধ করেছে।

বলাই সেই কথাটী মেয়ের কাছে রাত্রে গল্প করে একটু হেসে বললে "ভাই আমার একেবারে লাঠিয়াল ডেকে বাড়ী

ছেড়ে দিয়ে উঠে যেতে বলে নি এই আমার সৌভাগ্য, কি বলিস্ রে শিউলি? কিন্তু এটা জেনে রাখিস পৈতৃক এই কুঁড়েটুকুর মাঝখানে পাঁচীল তুলতে আমি কিছুতেই দেব না। পাঁচ বছর বয়স থেকে যে ভাইকে নিজের ছেলের মত মানুষ করে এসেছি, আজ দু' তিন বছর সহরে চাকরী করেই সে আমায় চোখ রাঙাবে? আমি করব কি জানিস? এই বোশেখের ভেতরই তোর বিয়ে দেব। তারপর আমার যা কিছু আছে মায় সিকি কড়িটা পর্য্যন্ত ওর নামে লিখে দিয়ে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাব। সে যদি নিয়ে সুখী হয় হোক। আমার এ দুটো হাতে জোর যতদিন আছে, যেখানে হোক একটা আস্তানা গেড়ে নিজের সংস্থান করে নেব। আমার ভাবনা কি বল? তাই বলে ছোট ভায়ের সঙ্গে মামলা করব? ছিঃ!"...

তিনশ' টাকা পণ দিতে স্বীকার পেয়ে বলাই বরদা মিস্তিরের ছেলে সুরেনের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করলে।

সুরেন ছেলেটা ভাল। ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডে ছোটখাট কেরাণীর কাজ করে দু' পয়সা পায়। দেখতে শুনতে এবং কথা-বার্ত্তাতেও বেশ।

বিয়ের দিনটাতে বলাই সাধ্যমত উৎসবের কোন ত্রুটী রাখে নি।

কানাই সারাদিনটা ভিন্ গাঁয়ে বেড়িয়ে, সন্ধ্যা নাগাদ বাড়ী ফিরল।

তখন ঝমঝম করে বেশ এক পশলা বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল। কাজের বাড়ী সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ল। আগে থাকতে ঝড়জলের সম্ভাবনা মোটেই বোঝা যায় নি। কাজেই পাল টাঙিয়ে উঠানে খাওয়াবারও ব্যবস্থা করা হয় নাই। অগত্যা ঘরের মেঝেয় ও দালানে নিমন্ত্রিতদের বসতে দেওয়া এবং খাওয়ান ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। কানাই যে ঘরে শোয় তারই সামনে দাওয়ায় পাত পাতা হচ্ছিল। প্রচণ্ড রোষে কানাই গর্জ্জন করে উঠল "এ সব তোমার কি মতলব দাদা? আমি দুটো দিনের জন্য তোমাদের এখানে এসেছি, আমাকে না তাড়িয়ে কি ছাড়বে না?"

বলাই হাত জোড় করে অনেক বলে কয়েও কানাইকে নরম করতে পারল না। গাঁয়ের লোকেরাও সবাই কানাইএর ব্যবহারে চটে গেলেন। তাঁরা পাতা হাতে করে তুলে নিয়ে সেই জল কাদা ভেঙে প্রতিবেশী আর এক ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে নিজেরাই নিজেদের আহারাদির ব্যবস্থা করে নিলেন।.....

বিয়ের লগ্ন ছিল রাত বারোটার পর।

জলের ঝাপটা তখন কমে গিয়েছিল। কিন্তু এদিকে আর একটা খাঁড়া বলাইএর মাথা লক্ষ্য করে উঁচু হয়ে ছিল। দানের টাকা আনতে গিয়ে সে দেখলে তার সিন্দুক ভাঙা পড়ে রয়েছে আর টাকা কড়ি যা কিছু তাতে ছিল সমস্তই অন্তর্হিত হয়েছে।

প্রায় হাজার খানেক টাকা ছিল সিন্দুকে।

বলাই মাথায় হাত দিয়ে বসল। ভিড়ের মাঝখানে কে যে এই সর্ব্বনাশ করে গেল বোঝা গেল না।

পুরোহিত ঠাকুর চীৎকার করে বলছিলেন "নিয়ে এসনা বাপু শীগ্‌গির করে। লগ্ন যে বহে যায়। কতক্ষণ বসে থাকব?"

বরদা মিস্তির গর্জ্জন করে বলল "বেশ জুয়াচুরী ফন্দী করেছ ত? টাকা নিজেই কোথাও সরিয়ে রেখে মায়া কান্না কাঁদা হচ্ছে। এমন ছোটলোক জানলে কি আর এখানে সম্বন্ধ করি!"

বলাই ক্ষুব্ধস্বরে বলল "দেখুন! জীবনে কখনো আমি কাকেও ফাঁকি দিই নি। আজ কপালের দোষে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। আপনি রাগ করবেন না। আমি ধার করে যেখান থেকে হোক টাকা আপনাকে এনে দিচ্ছি।"

বলাই নিতান্ত গরজে পড়েই একবার কানাইএর কাছেও হাত পাততে গিয়েছিল। সে কিন্তু কোন কথাই কইল না। ব্যাপার শুনে মহাখুশী হয়ে নিশ্চিন্ত মনে নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগল।

বলাই ম্লান মুখে ফিরে এল।

ততরাত্রে কোথা থেকেই বা টাকার যোগাড় করবে, ভেবে পাচ্ছিল না।

পাড়ার একধারে নেহাল নামে এক পাঞ্জাবী মুসলমান বাসা করে ছিল। চাষাদের টাকা ধার দিয়ে আর সুদ গুণে সে দিন কাটায়।

লোকটী অনেকদিন আগে কলিকাতায় ট্যাক্সি চালাত। অনবধানতা বশতঃ দু তিনবার মানুষ চাপা দেওয়ায় তার লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সে তার পর থেকে এই গ্রামে এসে বাস করছে। আজ প্রায় ছ সাত বছর সে এই পাড়াগাঁয়েই রয়েছে। তার নিজের দেশ আর কোথাও আছে বা ছিল সে খবর কেউ জানে না। তার সংসারে কেউ নেই। টাকা যেমন দুহাতে সে রোজগার করে তেমনি দুহাতে খরচ করতেও জানে। টাকা ধার নিয়ে কেউ তাকে সুদের এক পয়সাও ছাড়াতে পারে না। অথচ লোকের বিপদ আপদে তাকে গোপনে সাধ্যমত সাহায্য করতেও সকলে দেখেছে।

বলাই নেহালের বাড়ীতেই শেষকালে হাজির হল। বললে "আমার দোকান বাড়ী সমস্ত বাঁধা রেখে তিনশ টাকা তুমি আমায় দাও—আমি ছমাসের মধ্যে কড়ায় গণ্ডায় তা শোধ করে দেব।"

নেহাল বললে "বাবু বাঁধা রাখবার কথা কেন বলছ? আমি মানুষের মাথা ছাড়া আর কিছু বাঁধা রাখি না। নির্দ্দিষ্ট দিনে টাকা না পেলে খুন করতেও আমি পিছু হটি না। আমার এই একমাত্র সর্ত্ত। তোমরা আমাকে ঘৃণা কর জানি। কিন্তু মানুষের কাছে বিশ্বাস আমি হারিয়েছি। অথচ মজা দেখ মানুষের এই বিশ্বাস নিয়েই আমার কারবার। বেশত! টাকা আমি দিচ্ছি। লেখাপড়া বাঁধা রাখা ও সব আমি বুঝি না। ঠিক ছমাস সময় আজ থেকে—এইত? বেশ!"………

শিউলির বিয়ে হয়ে গেল।

কিন্তু এতেই কি নিশ্চিন্ত?

বলাই এখন দরিদ্র, জামাই বাড়ী ভাল করে তত্ত্ব পাঠাতে পারল না।

সুতরাং প্রথম থেকেই শিউলি তার শ্বশুর বাড়ীর সকলের বিষনয়নে পড়ল। পিতার গৃহে সে নয়নের মণি ছিল। এখানে সকলকার লাঞ্ছনা ও হতাদরের ব্যথায় তার বুক ভরে গেল।

মাস কয়েক পরে শিউলি যখন পিতার কাছে আসবার অনুমতি পেলে তখন আর তাকে চেনবার উপায় ছিল না।

বলাই তার দিকে দেখে শিউরে উঠল।

একে শিউলির জ্বর। শরীরের যা অবস্থা সে যে বাঁচবে, একথা সাহস করে কেউ আশা দিতে পারত না।

বলাই ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছিল এমন সময় আদালতের পেয়াদা এসে সমন দিয়ে গেল কানাইএর সঙ্গে তার মোকদ্দমার দিন পড়েছে ৫ই আশ্বিন সোমবার।

তাদের বিষয়ের ভাগ হবে। তাদের পৈতৃক ভিটার মাঝখানে পাঁচীল উঠবে—সেত কই বারণ করতে পারল না?

এদিকে নেহালের পাওনা শোধ করে দেবারও সময় এসেছে।

বলাই এদিক ওদিক থেকে শ দুই টাকা যোগাড় করে রেখেছিল। নেহালের জন্যই আরও শ দেড়েক চাই। তাছাড়া মেয়ের অসুখে ডাক্তার খরচও কত পড়িবে তা কে জানে?

বলাই কানুকে বললে "আমায় দুশ টাকা দে। আমি আমার বাড়ী ঘর দোকান সমস্তের ভাগ তোকে লিখে দিচ্ছি।"

কানাই দেড়শ টাকার বেশী দিতে রাজী হল না। বলাই তাইতেই স্বীকার পেয়ে সমস্ত লেখাপড়া করে দিলে। কথা রইল একমাসের মধ্যে বলাই বাড়ী ছেড়ে দেবে।

এদিকের সমস্তই একরকম যোগাড় ত হল। কিন্তু এবার মেয়ের চিকিৎসার উপায় কি হবে? নেহালের সাড়ে তিনশ তখনো দিয়ে আসা হয় নি। বলাই একবার ভাবলে সেই টাকা থেকে চিকিৎসা করাবে। আগে মেয়ে ত বাঁচুক। তারপর নেহাল যদি না শোনে তার কথামত তার মাথাটাই চেয়ে বসে সে তাই দেবে।

কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে করে সে টাকা কটা আলাদা করে তুলে রেখে দিয়ে ভাবলে, না! ফাঁকি দেব না! কথা দিয়েছি যখন কড়ায় গণ্ডায় তার টাকা তাকে বুঝে দেব আমাদের অদৃষ্টে যাই থাক!

শয্যাশায়ী মেয়ের চেহারা দেখে পিতার প্রাণ নীরবে কাঁদছিল।

ডাক্তার বাবুকে ডেকে এনে হাতে ধরে বললে "আমার আজ কিছু নেই। সর্ব্বস্ব গিয়েছে। এই একটীমাত্র মেয়ে—আপনি দয়া করে বাঁচিয়ে দিন।"

ডাক্তার বাবুর মন বড় ভাল। তিনি বললেন "টাকার জন্য ভেবনা। তুমি যখন হুক পরে দিলে চলবে। আমার সাধ্যমত ক্রটী করব না। তবে—সময় নেবে। টাইফয়েডে দাঁড়িয়েছে। ব্যায়রামটা শক্ত। যদি একবার কলিকাতায় নিয়ে যেতে পারতে ত ভাল হত।"

বলাই একথা শুনে বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগল।......

বরদা মিত্র এল।

শিউলির জরাতিসার হয়েছে। বাঁচে কিনা সন্দেহ। একথা শুনে অবধি তার অত্যন্ত চিন্তা হয়েছিল। তার নিজের ও বলাইএর দেওয়া পাঁচ ছশ টাকার গহনা তখন শিউলির গায়ে ছিল। শিউলি যদিই না বাঁচে - এসময় গহনাগুলা হাতছাড়া করে রাখা যুক্তিসিদ্ধ নয়। তাছাড়া, বলাই হয়ত সে সব বাঁধা দিতে অথবা বেচে নষ্ট করতেও পারে এ ভয়টাও ছিল!

শিউলির অঙ্গ হতে সে নিজের হাতে অলঙ্কার খুলে নিতে যাচ্ছিল।

বলাই মেয়েকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে চেঁচিয়ে বলছিল "ওগো তুমি মানুষ না পিশাচ? মরে যদিই যায়—সব আমি নিজে তোমার বাড়ী গিয়ে দিয়ে আসব। তার আগে এরকম শ্রীহীন করে তার সমস্ত অলঙ্কার খুলে নিতে আমি কিছুতেই দেব না।"

ঠিক সেই সময় কানাই নিজে আদালতের পুলিশ সঙ্গে করে বলাইকে বাড়ী ছেড়ে দিতে বলতে এল।

শিউলির এত অসুখ সে জানত না। বরদার নৃশংসতা দেখে নিজের আচরণের কথা ভেবে লজ্জিত হয়ে অবনতমুখে সে দাঁড়িয়ে রইল।

নেহালেরও ছমাসের কড়ারের শেষ হয়ে যেতে দুয়ারের কাছে এসে সে হাঁক দিয়ে ডাকল "বাবু! বাড়ী আছ?"

বলাই উত্তরে বলল "নেহাল। ভেতরে এস।"

নেহাল তখন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে উপস্থিত ব্যাপারটা দেখে সব বুঝে নিলে। রাগে তার সর্ব্ব শরীর জ্বলে গেল!

পুলিসকে হাত দিয়ে দূরে ঠেলে, সে গম্ভীর স্বরে বলল "শিগ্‌গির যা! বাইরে গিয়ে দাঁড়া! ভদ্রলোকের বাড়ী বুঝে সুঝে কাজ করবি!"

কানাইকে উদ্দেশ করে নেহাল বললে "বাবু! চুপ করে দেখছ কি? মেয়েটার বুকে চড়ে মারতে বসেছে ঠেলে ফেলে দেবার মুরদ নেই?"

তারপর নেহাল নিজেই বরদাকে সবলে টেনে এনে গলা ধাক্কা দিয়ে বাড়ী থেকে বার করে দিলে।

বরদা শাসিয়ে গেল "ছোট লোক বেটাকে এর প্রতিশোধ দেব।"

নেহাল ভ্রূক্ষেপও করলে না। বরদাকে সেখানে খুন করলেও তার রাগ যেত না। কিন্তু তখনি একটা কথা মনে পড়তে আর বেশী নিগ্রহ দিতে পারলে না। সে ভাবলে "দেনা যার শোধ দিতে সে পারুক আর না পারুক পাওনাদার তা ছাড়বে কেন? আমিও ত আমার প্রাপ্য আদায়ের জন্য কত নিষ্ঠুর কাজ করেছি। এজন্য কত লোককে বাড়ী ছাড়া করে পথে বসিয়েছি। একদিনও ত আমার চোখে জল আসে নি। বরদা বা কানাই তাদের প্রাপ্য ছাড়বে কেন? শিউলি মরতে বসেছে দেখে দয়া করবে? আমি নিজেই বা কবে কাকে দয়া করেছি?"

অপরাধীর মত সসঙ্কোচে বলাই সাড়ে তিনশ টাকা সামনে ধরে দিতে আসতেই নেহাল পেছিয়ে গেল। বললে "দেনা পাওনা হিসাব নিকাশের অনেক সময় হবে বাবু! আমরা আমাদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নেবার জন্য ভেবে মরছি আর আমাদের চোখের সামনে এই ছোট্ট মেয়েটা জগতের সব দেনাপাওনা মিটিয়ে চলে যাচ্ছে!"

কানাই তখন আর থাকতে না পেরে বলাইএর পা দুখানা জড়িয়ে বললে "আমায় তুমি ক্ষমা কর দাদা। আমার মাথায় ভূত চেপে ছিল। শিউলির এত অসুখ তা আমি জানতুম না যে!"

তারপর শিউলির শীর্ণ হাতখানা কোলের উপর তুলে ধরে বললে "মা রে! এত রোগা হ'য়ে গেছিস! আমি আজই তোকে কলিকাতায় নিয়ে যাব। তুই যে আমাকে

নিমিত্তের ভাগী রেখে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার অবসর না দিয়ে পালিয়ে যাবি—তা যেতে দেব না।"......

দেড় মাস পরের কথা।

শিউলির জ্ঞান ফিরে এল। ডাক্তার সাহস দিলেন আর ভয় নেই।

কানাই নেহাল ও বলাই ছাড়া আর একজন সেখানে উৎকণ্ঠিত হয়ে দিনের পর দিন এইটুকুর প্রতীক্ষায় বসে ছিল। শিউলির চোখ খুলতেই প্রথমেই তার পানে নজর পড়ল।

যুবক শিউলিকে বললে "চিনতে পারছ আমাকে? বাবা, তোমাকে ঘরে নেবেন না আর। আমি তাঁর এই অন্যায় অত্যাচার সইতে পারলুম না। বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে এলুম। তিনি আমাকে ত্যাগ করেছেন। তাতে আমার কোন দুঃখ নেই! তোমায় যে ফিরে পেয়েছি এই আমার সব চেয়ে লাভ!"

নেহাল বললে "সুরেন, তুমি সরে এস। এসময় বেশী আনন্দ ভাল নয়। রোগা শরীরে, হঠাৎ হার্টফেল করে যেতে পারে।"

সুরেন উঠে সরে আসছিল

শিউলি তার শীর্ণ হাতখানা তোলবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করে বললে "যেওনা তুমি আমায় আর একটু দেখতে দাও।"

একবার চোখ দুটা বিস্ফারিত করে স্বামী, পিতা ও নেহালের দিকে ভাল করে দেখবার দুর্ব্বল প্রয়াস পেয়ে, অবশেষে যেন নিতান্ত অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়েই সে ঘুমিয়ে পড়ল!

সুরেন ভয় পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বলাই রুদ্ধ কণ্ঠে এক অব্যক্ত ভাষাহীন চীৎকারে কাঁদতে লাগল, "মাগো! ফিরিয়ে দিয়েও আবার কেড়ে নিলি!"

নেহাল বললে "কাতর হচ্ছ কেন তোমরা! দেখছ না ঘুমুচ্ছে! আর কোন ভয় নেই!"

শিউলির পাণ্ডুর মুখখানার উপর স্বপ্নদেবীর বিচিত্র প্রভাবে কতরকমেরই না ছবি ফুটে উঠছিল। চোখের পাতা দুটা আর একবার কেঁপে উঠল।

বলাই ডাকলে "শিউলি? মা?"

শিউলি চোখ না খুলেই, কাতর কণ্ঠে উত্তর করল "বাবা!"
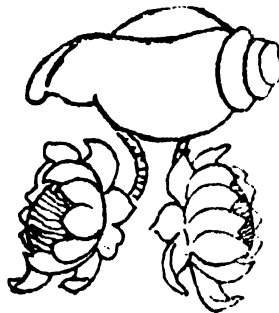
আত্মঘাতী মোহ

[শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

কতকগুলা সোজা কথা বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিবার সময় আসিয়াছে। লোকের মনে নানা রকমের সন্দেহ জাগিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সেই সন্দেহগুলাকে গলা টিপিয়া মারাই ভদ্রতাসঙ্গত প্রথা। সেই সন্দেহের কথা মুখ ফুটিয়া বাহির করিলেই সবাই মুখ চাপিয়া ধরেন, আর বলেন, "চুপ্, চুপ্! ওকথা বলিতে নাই।" কিন্তু এ পোষাকী লোক-দেখান ভদ্রতা লইয়া আর বেশীদিন ঘর করা চলিবে না। কথাটা এই, "রাজনৈতিক ব্যাপারে এ দেশে মুসলমানদের সহিত হিন্দুদের সম্বন্ধটা কি ?" প্রশ্নটা তুলিলেই জনকতক লোক চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন—"আরে থাম, থাম! এটা কি আবার একটা জিজ্ঞাসা করিবার মত কথা ? সবাই ত জানে মুসলমান আমাদের ভাই; আমরা এক মায়ের দুই ছেলে, এক সুন্দরীর দুটি নয়নতারা, এক মাতৃস্তন-প্রসূত দুই ক্ষীর-ধারা! একথা ত বড় বড় অনেক পূজনীয় নেতাই বলিয়া গিয়াছেন! আজ আবার একথা তুলিবার সার্থকতা কি ?"

কথাটা তুলিবার সার্থকতা এই যে আমরা যত জোর করিয়া গায়ে পড়িয়া কবিত্ব-মাখা সম্বন্ধ স্থির করিবার জন্য ব্যস্ত, মুসলমানেরা আদৌ তত ব্যস্ত নয়। কংগ্রেসের গোড়ায় গোড়ায় কংগ্রেসী নেতারা নিজেদের দলে এক আধ-জন মুসলমানকে পাইলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইতেন; কেমন করিয়া ঢাক ঢোল পিটাইয়া তাঁহাদের নেতৃত্বপদ কায়েমী করিবেন সেই চিন্তাতেই বিভোর হইয়া থাকিতেন। কিন্তু তেল সিঁদুর দিয়া ভবীর মন পাওয়া যায় নাই। পাছে কংগ্রেসে মিশিলে তাঁহাদের নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় না থাকে এই ভয়টা তাঁহাদের বরাবরই ছিল। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়েও দুই একজন ভিন্ন কোন মুসলমানই সে আন্দোলনে যোগ দেন নাই। স্বনামধন্য মৌলানা মহম্মদ আলিও তখন স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিলেন। বাঙলা দেশ বা বাঙ্গালী জাতির অবস্থা যাই হো'ক, পূর্ব্ববঙ্গে একটা মুসলমান রাজত্ব স্থাপিত হইবে এই আনন্দেই তাঁহারা নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ১৯২০ সালের পূর্ব্বে খুব অল্পসংখ্যক মুসলমান নেতাই কংগ্রেসে যোগ দিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯২০ সালে যে মুসলমানেরা কংগ্রেসে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন তাহা স্বরাজের খাতিরে নয়, খিলাফতের খাতিরে—খিলাফৎ রক্ষাই মূল উদ্দেশ্য, স্বরাজ লাভ তার উপায় মাত্র। হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলিয়া যে কংগ্রেসকে এতদিন তাঁহারা পাশ কাটাইয়া আসিয়াছিলেন সেই কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের কারণ নির্দ্দেশ করিবার সময় আগে নাম করিলেন খিলাফতের, কিন্তু তবুও মুসলমানেরা স্বতন্ত্র খিলাফৎ সভা স্থাপন করিতে ছাড়িলেন না। খিলাফৎ নষ্ট হইলে কি যে ভীষণ অনর্থ ঘটিবে তাহা হিন্দুরা বুঝুক না বুঝুক, মুসলমানদিগকে নিজেদের সঙ্গে পাওয়ার আনন্দেই অনেকে কাঁদিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। খিলাফতের জন্য যাহাদের প্রাণটা অতটা কাঁদিয়া উঠে নাই, তাহারাও কতকটা দেখাদেখি, কতকটা মহাত্মা গান্ধীর ভয়ে দুই একফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল। কিন্তু যেদিন কামাল পাশার কল্যাণে খিলাফৎ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইল, সেদিন আর হিন্দুর সহিত মিশিয়া স্বরাজ্যলাভের জন্য বিশেষ একটা আগ্রহ মুসলমানদের মধ্যে দেখা গেল না। খিলাফৎকে লক্ষ্য করিয়া ছোট বড় মৌলানা মৌলভী মুসলমানদের মধ্যে যে তীব্র স্বাতন্ত্র্যবোধ ও গোঁড়ামী ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন সেইটুকুই দেশের ভাগ্যে রহিয়া গেল। স্বরাজ কথাটা বাঁচিয়া রহিল, কিন্তু মুসলমানদের মনে তাহার অর্থ হইল খিলাফতী স্বরাজ। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানকে মিলাইবার জন্য যত চেষ্টা হইয়াছে—তিলক মহারাজের লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, মহাত্মাজীর খিলাফতী ক্রন্দন, দেশবন্ধুর বেঙ্গল প্যাক্ট, দিল্লীর ইউনিটী কন্‌ফারেন্স—আজ মনে হয় সবই ভস্মে ঘি ঢালা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মুসলমানদের মনে দেশাত্মবোধ অপেক্ষা নিজ সমাজের স্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল যে এক উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা লইয়া হিন্দু ও মুসলমানের পক্ষে দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে যাওয়া একরূপ অসম্ভব। খিলাফৎ সভার গত অধিবেশনে মৌলানা মহম্মদ আলি প্রমুখ নেতৃবর্গের মুখে একথা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বাহির হইয়াছে।

কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে অনেকেই যেন কতকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে একথাটা অনেকেই স্বতঃসিদ্ধবৎ মানিয়া লইয়াছেন যে দেশের স্বাধীনতা লাভে অহিংস পথটাই প্রশস্ত। খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করিয়া আমলাতন্ত্রকে অচল করিয়া দেওয়ার হুমকিটা মাঝে মাঝে কোন কোন নেতার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেটা সম্ভবপর করিয়া তুলিতে হইলেও হিন্দু মুসলমানে একযোগে কাজ করা চাই। সুতরাং ঐ সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স কথাটাই যাঁহাদের রাজনৈতিক মূলধন, ঐটাকে ভাঙ্গাইয়াই যাঁহাদের রাজনীতির ব্যবসা চালাইতে হয়, তাঁহারা মনে মনে যাই বুঝুন, বাহিরে হিন্দু-মুসলমানের একতার ভড়ং তাঁহাদের বজায় রাখিতেই হয়। যাঁহারা মনে মনে বুঝিয়া রাখিয়াছেন যে ইংরেজকে কাবু করিবার জন্য আমাদের চীৎকার মাত্রই সম্বল, তাঁহারা নিজেদের সুরের সঙ্গে মুসলমানের সুর মিলাইতে পারিলেই কৃতার্থ হন; কাজেই মুসলমানদের পিঠে হাত চাপড়াইয়া, অত্যাচার দেখিলে চোখ বুজিয়া, ভাল ভাল ফাঁকা ফাঁকা কথায় হিন্দু-মুসলমানের মিলন প্রচার করিয়া তাঁহাদের দুই কুড়ি সাতের খেলা বজায় রাখিতে হয়। সত্যকথা বলিতে গেলে বলিতে হয় আজকালকার কংগ্রেসী নেতাদের অধিকাংশই এই দলে।

হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা বাধিলে আমরা হয় মুসলমানদের গালি পাড়ি, না হয় মিলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে গোটা-কতক সদুপদেশ দিয়া নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু কেন যে মিলন হয় না, এ কথাটা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করি না। আমি ধরিয়া লই যে যাহারা মারামারি করে তাহারা গুণ্ডা, যাহারা ভেদ প্রচার করে তাহারা হয় পাজি, নয় ইংরেজের খয়ের খাঁ; তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিতে লাগিয়া যাই যে ঐ ইংরেজ বেটারাই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করিয়া দিতেছে। ইংরেজ রাজত্বের প্রভাবে যে হিন্দু-মুসলমানের একটা পাকা বোঝাপড়ার দেরী হইয়া যাইতেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, আর হিন্দু-মুসলমানের ভেদের সহিত ইংরেজের শাসন নীতির যে কোন সম্বন্ধ নাই, একথাও বলা চলে না। কিন্তু সব দোষটা ইংরেজের ঘাড়ে চাপাইলে যে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা হয়, তাহাও মনে হয় না। শুধু ইংরেজের খয়েরখাঁ গুলিই যদি হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইত তাহা হইলে ওকথা বলা চলিত; কিন্তু খিলাফতের যাঁহারা বড় বড় পাণ্ডা, ইংরেজকে তাড়াইয়া দেশকে স্বাধীন করিতে যাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহারাও ইসলামী প্রাধান্য স্থাপন করিতে না পারিলে হিন্দুর সহিত মিলিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইতে পরাঙ্মুখ। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের মিলন কেন হয় না একথা বুঝিতে গেলে শুধু ইংরেজের ভেদনীতির উপর দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। গোড়ার কথাটা বলিতে গেলে বোধ হয় মুসলমান ধর্ম্ম লইয়াই টানাটানি করিতে হয়।

মুসলমানেরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীকে, বিশেষতঃ মূর্ত্তিপূজক হিন্দুকে একেবারে কাফের বলিয়াই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের মতে পারলৌকিক সদ্গতির পথ হিন্দুর কাছে একেবারেই রুদ্ধ। সমস্ত জগৎই যে এককালে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে, আর বিধর্ম্মীকে এই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে যে পরম পুণ্য সঞ্চয় হয়, এ বিশ্বাস অধিকাংশ মুসলমানের মনেই বর্ত্তমান। তাহার উপর মুসলমান ধর্ম্মটা এদেশের জিনিষ নয়; বিদেশ হইতে বিজেতাকর্ত্তৃক আনীত। পাঠান মোগলেরা এদেশ জয় করিয়াছিল বলিয়া মোগল পাঠানের বংশধরেরা, এমন কি যাহারা নিজেদের ধর্ম্ম ছাড়িয়া মোগল পাঠানের নিকট হইতে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তাহারাও, ধর্ম্মবিষয়ে ও পরাক্রমে হিন্দুদিগকে আপনাদের অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে করে। পাঠান ও মোগল রাজত্ব-কালে মুসলমানেরা যে প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ভোগ করিত, ইংরেজ রাজত্বকালেও সে প্রাধান্য ভোগ করিবার ইচ্ছা মুসলমানদের মন হইতে যায় নাই। কাজেকাজেই পূর্ব্ব গৌরবের দোহাই দিয়াই হোক, আর নিজেদের বিশেষত্ব বজায় রাখিবার দোহাই দিয়াই হোক, তাহারা অপর সকলের

অপেক্ষা কিছু বেশী বেশী অধিকার পাইবার আব্দার প্রায়ই করিয়া থাকে। যেখানে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য সেখানে ব্যবস্থাপক ও স্থানীয় সভায় সংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি ও রাজসরকারে চাকরী দেওয়া হোক; যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় কম সেখানে আর সংখ্যার অনুপাতের কথা তোলা হয় না; সেখানে বলা হয়, প্রতিনিধির সংখ্যা এমন হোক মুসলমানেরা যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে পারে। এরূপ ব্যবস্থা করিলে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকেদের উপর যে অবিচার করা হয় তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত মনোভাব মুসলমানের নয়। সব বিষয়ে এরূপ একটা বাঁধাধরা ভাগাভাগি থাকিলে যে কস্মিনকালে এদেশে জাতীয়তা গড়িয়া উঠিবে না, সেদিকেও তাহাদের লক্ষ্য নাই। অপরের যাই হোক, মুসলমানের প্রাধান্য বজায় থাকা চাই-ই চাই।

এরূপ মনোভাবের আরও একটা প্রচ্ছন্ন কারণ আছে। দেশে হিন্দুর সংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িতেছে তাহার বেশী পরিমাণে। সেইজন্য মুসলমানদের মনে আশা আছে যে একদিন না একদিন এদেশ মুসলমানপ্রধান হইয়া উঠিবে। তাহার উপর তাহারা মনে করে যে যদি একটু জোর করিয়া উঠিয়া পড়িয়া প্রচার কার্য্যটা চালান যায় তাহা হইলে হয়ত অল্পদিনের মধ্যেই হিন্দুস্থানকে মুসলমানের দেশ করিয়া তোলা যাইতে পারে। এ কল্পনাটা যে অসম্ভব নয় তাহা পাঞ্জাব, বাংলা, সিন্ধু, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের দিকে চাহিলেই বুঝা যায়। ওসব দেশেই এককালে হিন্দুর সংখ্যা বেশী ছিল। কেমন করিয়া হিন্দুর সংখ্যা কমিয়া গেল বা লোপ পাইল তাহা পাবনার দিকে চাহিলেই বুঝিতে বিলম্ব হয় না। মেয়ে চুরি, হিন্দু স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, গুণ্ডার দাঙ্গা প্রভৃতি যে সমস্ত জিনিষ আমরা রোজ রোজ খবরের কাগজে পড়ি সে সবই হিন্দুস্থানকে মুসলমানের দেশে পরিণত করিবার এক একটি উপায়। নারী-নির্য্যাতনই বলুন, আর গুণ্ডার অত্যাচারই বলুন কোন জিনিষটাকে কখনও মুসলমান নেতারা প্রকাশ্যভাবে নিন্দাবাদ করিয়া দমন করিবার চেষ্টা করেন না। একটা না একটা অজুহাতে তাঁহারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে মুসলমানদের খুব বেশী দোষ নাই—হিন্দুরা এমন একটা কিছু করিয়াছিল যাহার ফলে মুসলমানেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অপকর্ম্মটা করিয়া ফেলিয়াছে। মুসলমান নেতাদের এটা একেবারে বাঁধাধরা পলিসি। এ ব্যাপারটা হিন্দু নেতাদের কাহারও কাহারও চোখে পড়িয়াছে। সেইজন্য তাঁহারা সংগঠন ও শুদ্ধির উপর জোর দিয়াছেন। সংগঠনের অর্থ হিন্দু সমাজের অবান্তরভেদ দূর করিয়া সমাজটাকে সবল ও আত্মরক্ষাসমর্থ করিয়া গড়িয়া তোলা; আর শুদ্ধির অর্থ যাহারা হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে পুনরায় তাহাদের হিন্দুসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া। একবার যেন-তেন-প্রকারেণ মুসলমান করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাদের যদি আবার হিন্দু সমাজে ফিরিয়া লইবার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে মুসলমানদের বড় আশায় ছাই পড়ে। সেইজন্য তাঁহারা শুদ্ধিব্যাপারটার উপর একেবারে হাড়ে হাড়ে চটা। মারধোর করিয়া ভয় দেখাইয়া যদি শুদ্ধি ব্যাপারটাকে থামাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ভবিষ্যতের পথ খোলা থাকে। মৌলানা মহম্মদ আলি-ই বল, আর ডাঃ কিচলু-ই বল, সকলকারই মনের ভাব এইরূপ। খোঁজ করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে আজমীর হইতে আরম্ভ করিয়া পাবনা পর্য্যন্ত যে সমস্ত দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়াছে তাহার মূলে ঐ এক চেষ্টা। এখন প্রশ্ন এই—মুসলমানেরা যদি মনে করেন যে ভারতবর্ষের বাহিরের মুসলমানেরা এদেশের হিন্দুর চেয়ে তাঁহাদের বেশী আত্মীয়, ভারতবর্ষে মুসলমান-প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য তাঁহারা হিন্দুদের অপেক্ষা বেশী রাজনৈতিক অধিকার না পাইলে যদি সন্তুষ্ট না হন, আর সেই প্রাধান্য বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা দল পাকাইয়া মারামারির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, তাহা হইলে হিন্দুদের কর্ত্তব্য কি? শুদ্ধি ও সংগঠন দ্বারা আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রসার, না একতার নামে আত্মঘাতী গোঁজামিল?

(বঙ্গবাণী)

সন্ধ্যা

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

লজ্জাজড় সৌম্যমুখী প্রকৃতির ঐ শ্যামলা মেয়ে
দিনের শেষে চুপটীসারে আসছে নেমে আকাশ বেয়ে।
পরণে তার নীলাম্বরী,
ঝিলিক মারে জোনাক্-জড়ি,
উড়ে তাহার প্রণয়ভরা কোমল কচি বুকটী ছেয়ে।
প্রকৃতির ঐ শ্যামলা মেয়ে।

(২)

অপরাজিতা মুখখানি তার মানানো বেশ চাঁদের টিপে ;
সিঁথির পাশে এঁটেছে তার ছায়াপথের টায়রাটীকে।
কালো চুলের খোপায় আলা
দিচ্ছে তারা মতির মালা ;
কাজল আঁকা ডাগর চোখে ঘোম্‌টা ফাঁকে দেখ্‌ছে চেয়ে,
প্রকৃতির ঐ শ্যামলা মেয়ে।

(৩)

সুরপুরীর পারিজাতের আতর মাখা রুমাল হাতে ;
সুদূর হ'তে মলয় বায়ে আসছে ভেসে গন্ধ তাতে।
চরণ যুগে নূপুর বাজে,
মন্দিরেতে ঘণ্টা বাজে ;
নদীর বুকে মধুর স্বরে বেহাগ রাগে গানটী গেয়ে,
প্রকৃতির ঐ শ্যামলা মেয়ে।

(৪)

কোন্ কুটীরে যুবতীটির জাগ্‌লো বুকে মিলন-তৃষা ?
ভাবছে কে সে প্রণয়ীটির বাহুর পাশে কাটবে নিশা ?
গোপনে কোন্ তরুণ হিয়া
উঠ্‌লো প্রেমে দুলদুলিয়া ?
মধুর হেসে দেখ্‌লো যবে ধরার কোলে আসছে ধেয়ে,
প্রকৃতির ঐ শ্যামলা মেয়ে ?

(৫)

নিরালা কোন্ কবির মাথা উঠ্‌লো ভ'রে কল্পনাতে ?
ব'স্‌লো নিয়ে খাতাটী তার, বাণীর দেয়া কলম হাতে ?
কি গান তারই মনটী জুড়ে
বাঁধ্‌লো কবি ছন্দে সুরে ?
রাখ্‌লো বেঁধে ভাষার তারে, জান্‌লা দিয়ে দেখ্‌তে পেয়ে,
প্রকৃতির ঐ শ্যামলা মেয়ে ?

(৬)

সরম ভরা মরম হরা প্রকৃতির ঐ শ্যামলা মেয়ে
চুপটীসারে চরণ ফেলে আসছে নেমে আকাশ বেয়ে।
পরণে তার নীলাম্বরী,
চুম্‌কি-দেয়া জোনাক-জড়ি,
উড়ে তাহার আঁচল খানি কোমল কচি বুকটী ছেয়ে।
প্রকৃতির ঐ শ্যামলা মেয়ে।

মায়ের দরদ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

নবীর চরের মোড়ল মাণিক ব্যাপারীর সংসারিক অবস্থা ইদানিং খুবই সচ্ছল হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বাড়ীঘর ক্ষেত খামার ছাড়া মোট আড়াই খানি নৌকা ছিল। আড়াই খানি অর্থাৎ একখানি ছোট পারঘাটার ডিঙ্গি আর দুইখানি বড় মহাজনি কিস্তি। ঐ দুইখানি নৌকায় সে ধান চাল গুড় সুপারী লবণ প্রভৃতি নানাবিধ পণ্য লইয়া নানাস্থানে হাটে বাজারে বিক্রয় করিত, তাহাতে তাহার প্রচুর অর্থাগম হইত। ইহা ছাড়া সে বাবুদের বাড়ী হইতে লাঠীয়ালীর সর্দ্দার হিসাবে মাহিনা পাইত, আর যোগে-যাগে দুটা একটা মোটা রোজগার সে তো ছিলই। সুতরাং তাহার অবস্থা খুব শীঘ্রই ফাঁপিয়া উঠিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মাণিকের কচিলা টেঁপার মাতা "খপসুরৎ" বিবির এক গা রূপার গহনা দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা ঈর্ষায় মরিত এবং মনে মনে যে তাহার সর্ব্বনাশ কামনা করিয়া পীরের সিন্নি মান্ত করিত না এমন কথাও বলা যায় না।

টেঁপারা তিন ভাই। বড় কাদের, মেঝো দেদার বক্স আর সকলের ছোট টেঁপা। কাদের ছিল ঠিক তার বাপের মত তেমনি নির্ভিক, তেমনি বলবান, তেমনি স্বার্থপর এবং সকল বিষয়ে দ্বিধাশূন্য। পৃথিবীতে তাহার নিজের স্বার্থকেই সে খুব বড় করিয়া দেখিত। নিজের স্বার্থসাধনের জন্য প্রয়োজন হইলে অপরের সর্ব্বনাশ সাধনেও সে কুণ্ঠিত ছিল না। একে মাণিক ব্যাপারীর বড় ছেলে, তাহাতে অসুরের মত তাহার শক্তি, আর গোখ্রো সাপের মত তাহার রাগ, —লোকে বড় সহজে তাহার কাছে ঘেঁসিত না, তাহার জোর জুলুম অত্যাচার নীরবে পরিপাক করিয়া ফেলিত। কিম্বদন্তি এইরূপ, একবার তাহার একজন প্রতিবেশী তাহার অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া হইয়া বাবুদের সরকারে তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করিতে গিয়াছিল; কিন্তু বাবুদের বাড়ী পর্য্যন্ত তাহাকে কষ্ট করিয়া যাইতে হয় নাই, পথেই নৌকা-ডুবি হইয়া সে সকল অত্যাচারের হাত হইতে রেহাই পাইয়াছিল। অবশ্যই এ বিষয়ে কাদেরের কোন হাত ছিল কিনা তাহা নিঃসংশয় বলা যায় না। তবে এ বিষয় লইয়া অনেকে অনেকদিন পর্য্যন্ত কাণাঘুষা করিয়াছিল। ফল কথা কাদেরের নাম শুনিলে লোক সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিত,—অন্য পরে কা কথা, তাহার বাপ মাণিক ব্যাপারী পর্য্যন্ত তাহার সহিত হিসাব করিয়া কথা কহিত। কাদের বাবুদের সরকারে লাঠীয়ালি কর্ম্ম করিত, মোটা মাহিনা পাইত, আর সময়ে অসময়ে গরীব প্রজার উপর জুলুম করিয়া চাঁদা মাথট তহরি বাটপাড়ি আদায় করিত। এ হেন কাদের যে ধরাকে সরা জ্ঞান করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? মেঝো দেদার বক্স লোকটা ছিল একটু শান্তিপ্রিয়। সে গণ্ডগোল হ্যাঙ্গামা লাঠীবাজী ডাকাতি এ সব বড় পছন্দ করিত না। বিধাতা তাহার দেহে অসুরের মত বলও দেন নাই। সে পিতার কারবারে সহায়তা করিত, নৌকা লইয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইত। টেঁপা বাড়ীতেই থাকিত, মাঝে মাঝে "আলেফ্ বে পে তে সে" একটু আধটু পড়িত, আর বড় একটা কিছু করিত না।

ছোট ছেলে মাত্রেই মাতার অত্যধিক প্রিয় হইয়া থাকে টেঁপা ছিল তাহার মাতার নয়নের মণি। সে কুড়ি বৎসরের ঢেঁকী হইয়াও মার কাছে ছিল যেন পাঁচ বছরের শিশুটী। মা কোলে বসাইয়া খাওয়াইয়া না দিলে তাহার খাওয়া হইত

না, রাত্রিতে মার বুকের কাছটায় না শুইলে তাহার ঘুম হইত না, যেদিন কোন কারণে মাতার মেজাজ খারাপ থাকিত সেদিন তাহার কিছুই ভাল লাগিত না, খেলা ধূলা কিছুতেই মন বসিত না, সে কেমন একরকম হইয়া যাইত। অত বড় ছেলের এই ন্যাণ্টাপনা মাণিক এবং কাদের মোটেই পছন্দ করিত না। তাহারা যখন তখন এজন্য তাদের উভয়কে, মা ও ছেলেকে ভৎর্সনা করিত, এক একদিন রাগের মাথায় প্রহার পর্য্যন্ত করিয়া বসিত। একে নারী তায় মাতা,—পাঠক পাঠিকা হয়তো পতিপুত্রের হাতে তাহার এবম্বিধ নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া আঁৎকাইয়া উঠিবেন। কিন্তু যখনকার কথা আমরা বলিতেছি তখন নবীর চরের মত স্থানে এমন একটা ব্যাপার খুব গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হইত না, এবং খুঁজিয়া দেখিলে প্রায় প্রতি ঘরেই এমন ঘটনা মাঝে মাঝে দৃষ্ট হইত। ফল কথা ক্রমশঃ অবস্থাটা দাঁড়াইল এই, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই টেঁপা ও তাহার মাতা মাণিক ও কাদেরের চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রতি উহাদের অত্যাচারের মাত্রা যতই বাড়িয়া চলিল ততই তাহারা দৃঢ়তর আকর্ষণে পরস্পরকে আঁকড়িয়া ধরিতে লাগিল, তাহাদের স্নেহের বন্ধন ততই দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

এই অত্যাচারের পেষণ টেঁপা অপেক্ষা তাহার মাতাকে শতগুণ বেশী পীড়িত করিতেছিল। সে সব সহিতে পারিত, শুধু তাহার নয়ন পুত্তলি টেঁপার কষ্ট দেখিতে পারিত না। নৃশংস অত্যাচারীরা যেন জানিয়া শুনিয়াই নানা ছুতানতা করিয়া তাহার চোখের সম্মুখে টেঁপাকে বেশী করিয়া পীড়ন করিতে লাগিল। উহারা তাহাকে প্রহার করিত, তাহার সম্মুখ হইতে ভাতের থালা টানিয়া ফেলিয়া দিত, তাহার হাত পা বাঁধিয়া উঠানে রোদের মধ্যে ফেলিয়া রাখিত, আরও কত কি করিত। অভাগিনী দেখিয়া শুনিয়াও কোন প্রতিকার করিতে পারিত না, শুধু নীরবে খোদাকে স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলিত। মেঝো ছেলে দেদার বক্স কোন কালেই কোন কথায় থাকিত না। সে এ সব দেখিয়া শুনিয়াও কিছু বলিত না, শুধু আপনমনে দাওয়ায় বসিয়া গুড়ুক সেবন করিত, দীর্ঘ দীর্ঘ টান দিয়া সশব্দে কুণ্ডলীকৃত ধুম নির্গত করিতে থাকিত।

যখন কিছুতেই কিছু হইল না তখন মাণিক এবং কাদের পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে টেঁপাকে বাবুদের বাড়ীতে কোন একটা চাকরীতে বহাল করিয়া দিতে হইবে এবং যাহাতে সে শীঘ্র বাড়ী ফিরিতে না পারে এমন ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহারা ভাবিল মাতাপুত্রে বিচ্ছেদ হইলেই তাহাদের স্নেহের টান কাটিয়া যাইবে এবং অচিরেই টেঁপার মন শোধরাইয়া গিয়া পুরুষোচিত পথে চলিতে চলিতে আপনা-আপনি মানুষের মত হইয়া গড়িয়া উঠিবে। তাহাদের মৎলব কার্য্যে পরিণত করিতে বেশী বেগ পাইতে হইল না, অবিলম্বেই টেঁপার চাকরী হইল, সে মাতার বস্ত্রাঞ্চল ছাড়িয়া বাবুদের বাড়ী যাইয়া কাজে বহাল হইল।

ফল কিন্তু হইল ঠিক উল্টা। টেঁপা ও তাহার মাতা উভয়েই আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল, তদুপরি টেঁপা আবার কাঁদিয়া কাঁদিয়া জ্বরে পড়িল। তখন বাবুদের তাড়নায় মাণিক ও কাদের তাহাকে বাড়ী আনিয়া ফেলিতে পথ পাইল না। আবার মাতাপুত্রে মিলন হইল। নীরব নিভৃত নিশিথে মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া টেঁপা কাঁদিতে কাঁদিতে বিনাইয়া বিনাইয়া কত কথাই কহিল, মাতা চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাহাকে কত সান্ত্বনাই দিল,—কেহ জানিল না, কেহ শুনিল না, পরস্পরের স্নেহের প্রলেপে তাহাদের হৃদয়ের ক্ষত আপনাআপনি শুকাইয়া উঠিল, অনতিবিলম্বে তাহারা আবার যেমন ছিল তেমনি হইয়া উঠিল। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের উপর মাণিক ও কাদেরের রাগ পড়িল না, পুনরায় তাহারের উপর অত্যাচার চলিতে লাগিল।

এমনি করিয়া দিন যাইতেছিল। ক্রমে অত্যাচারের মাত্রা এত বাড়িয়া গেল যে সে আর সহিতে পারে না। অভাগিনীর পত্নী-হৃদয় মাতৃ-হৃদয় নারী-হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল।

সে এক একসময় ভাবিত পদ্মার জলে দেহ বিসর্জন করিয়া এ জ্বালার অবসান করে। কিন্তু টেঁপার মুখখানি মনে পড়িলে আর তাহা কল্পনা করিতে পারিত না। তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে মনে হইলেই তাহার বুকটা ভরিয়া উঠিত, হাড়গোড় ভাজিয়া কান্না আসিত, চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া যাইত। সে আপনাআপনি বলিয়া উঠিত—না না

টেঁপাকে ছাড়িয়া সে কোথাও যাইতে পারিবে না, স্বর্গেও না। সে না থাকিলে কে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিবে, কে তাহাকে কোলে বসাইয়া খাওয়াইয়া দিবে, বুকে করিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিবে? এক একবার ভাবিত টেঁপাকে লইয়া কোথাও চলিয়া যায়, কিন্তু কোথায় যাইবে? কে তাহাদিগকে আশ্রয় দিবে? কি উপায়ে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলিবে? সে নিজে উপবাস করিতে পারে কিন্তু তাহার চোখের সম্মুখে টেঁপা ক্ষুধার জ্বালায় ছটফট করিবে তা তো সে সহিতে পারিবে না। তা, ছাড়া, যাইতে যাইতে পথেই যদি ধরা পড়িয়া যায়? সর্ব্বনাশ! না না, তা ওতো হইতে পারে না। একবার ভাবিল যা হইবার হইবে, মাণিক ও কাদের রাত্রিতে ঘুমাইলে মুগুর মারিয়া উহাদের মাথা গুঁড়া করিয়া দিবে। একদিন সন্ধ্যাবেলা একটা মুগুর আনিয়া শয্যাপার্শ্বে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে উহা স্পর্শ করিবার মত সাহস সে কোনমতেই সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন এ সব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সে অদৃষ্টের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিল—যাহা হইবার তাহাই হইবে, যেন কিছুতেই কিছু আসিয়া যায় না।

ঠিক এই সময়টায় তাহাদের জীবনের দাবাবড়ে খেলার ছকে একটা গজের কিস্তি পড়িয়া সব ওলট পালট করিয়া দিল, নৌকা সামলাইতে ঘোড়া যায়, ঘোড়া সামলাইতে দাবা যায়—এমনি বেসামাল অবস্থা হইয়া উঠিল।

(৪)

পীনার বাপ করিম মুন্সী ছিল নবীর চরের মৌলবী। আগে তাহার বাড়ী ছিল তেমোহনার চরে। কোন কারণে রাজাবাড়ীর বাবুরা তাহার প্রতি রুষ্ট হওয়ায় সে সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। তারপর অনেকদিন তাহার কোন ঠিকানা ছিল না। প্রায় বছর দশ এগার আগে কোন কি বন্দরে মাণিক ব্যাপারীর সহিত তাহার আলাপ হয়। তাহারই অনুরোধে সে মেয়েটীকে বুকে লইয়া এখানে চলিয়া আসে। তদবধি সে এখানেই বাস করিতেছে। পৃথিবীতে তাহার এক কন্যা ছাড়া কেহ কোথাও নাই, থাকিলেও এতদিন কেহ তাহার খোঁজ লয় নাই, সেও একটী দিনের জন্য নবীর চর ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই। তাহারা এখানে কায়েমী হইয়াই বসিয়াছিল। তাহারা যে এখানে আগন্তুক তাহা অল্প লোকেই জানিত,—তাহারা নিজেরাও সে কথা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল।

প্রথমটা মাণিক জমিদারকে বলিয়া কহিয়া খানিকটা জমি তাহাকে লইয়া দিয়াছিল। তাহারই একপাশে একটু কুঁড়ে বাধিয়া বাকীটুকুর বুক চিরিয়া যাহা দু' একমুঠা ফসল সে পাইত তাহাতেই কোনপ্রকারে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। সে সময়টা তাহার খুব কষ্টেই কাটিয়াছে।

মাণিক ব্যাপারী যে তাহাকে আনিয়া নবীর চরে স্থান দিয়াছিল তাহার একটু বিশেষ কারণও ছিল। মাণিক কোন প্রকারে একটু আধটু বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছিল, সখ করিয়া নহে, দায়ে পড়িয়াই তাহাকে শিখিতে হইয়াছিল, নহিলে কারবার চলে না। কিন্তু তাহার লোকজন আর কেহ কালীর আঁচড় পাড়িতে জানিত না। কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া একজন সরকার রাখিতে হইয়াছিল। সরকার যদিও মুসলমান, তাহার স্বজাতি—তথাপি ভিন্ন স্থানের লোক। মাণিকের উপর তাহার এতটুকু আন্তরিক মায়া ছিল না, মাণিকেরও নিজ এলাকার বাহিরে তাহার উপর কোন জোর চলিত না, কিন্তু সেও মাণিকের শাসনের ভয় রাখিত না। অথচ লোকটা এমন ভাব দেখাইত যেন সে তাহার বড় আপনার। তাই সেবার যখন মাণিক অসুখে পড়িল তখন দেদার বক্স সরকারকে সঙ্গে করিয়া নৌকা এবং টাকা লইয়া বাহির হইয়া গেল, মাণিক কোন আপত্তি করিল না,—নিশ্চিন্ত মনে গৃহে বসিয়া তাহাদের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দিনকয়েক পরে যখন দেদার বক্স একাকী খালি নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন, মাণিক শুনিল সরকার চাকরীতে ইস্তাফা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। মাণিক হিসাব খতাইয়া দেখিল মোট সাতশত তের টাকা চালানের মধ্যে প্রায় দুইশত টাকা ঘাটতি। মাণিক রাগে জ্বলিতে জ্বলিতে একটায় তিনটা হইয়া দেদার বক্সকে কারণ জিজ্ঞাসা করিল, মূর্খ দেদার বক্স কিছুই বলিতে পারিল না, শুধু বলিল তাহারা মাত্র তিনটা মোকাম ঘুরিয়াছে, দুই দফা চাউল এবং তামাক খরিদ বিক্রয় করিয়াছে। খাতার খরচের

দিকটা খতাইয়া গলদ বাহির করিতে মাণিকের বেশী সময় লাগিল না। কিন্তু তখন সরকারকে আর কোথায় পাওয়া যায়? সেই অবধি সে প্রতিজ্ঞা করিল যেমন করিয়াই হউক, দেদার বক্স এবং টেঁপাকে অন্ততঃ কারবার চালাইবার মত লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। কিন্তু উপায় কি? গোটা নবীর চরে সে ছাড়া এমন একজন লোক নাই যে আলেক বে কিম্বা 'ক খ' লিখিতে পারে। ঠিক এই সময়টায় করিম মুন্সীর সহিত তাহার আলাপ হইল এবং তাহাকে এলেমদার দেখিয়া সে নবীর চরে আনিয়া স্থান দিল।

কিছুকাল বাদে করিম যখন একটু স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ পাইল তখন মাণিকের উপদেশে এক মক্তব খুলিয়া দিল এবং গ্রামের লোক কেহবা স্বেচ্ছায়, কেহবা মাণিকের প্ররোচনায় নিজ নিজ ছেলেদের তাহার নিকট পড়িতে পাঠাইয়া দিল। তাহারা নগদ মাহিনা দিত না বটে কিন্তু কেহ ধানটা, কেহ মুগটা, কলাইটা কেহ তামাকটা ইত্যাদি নানা আকারে গুরু দক্ষিণা প্রদান করিত এবং উহা হইতে করিমের ক্ষুদ্র সংসার বেশ সচ্ছল ভাবেই চলিয়া যাইত। এখনও সেইরূপ চলিতেছে সম্ভবতঃ ভবিষ্যতেও চলিবে। এমনি করিয়া সে এতদিন ধরিয়া জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে, তাহার পীনাকে এত বড়টী করিয়া তুলিয়াছে, নবীর চরের মত স্থানে বাস করিয়াও সে তথাকার অধিবাসীদের ভাল দিকটাই বড় করিয়া দেখিয়া আসিয়াছে খারাপ দিকটা কখনও দেখে নাই। তাই পীনা এতখানি বড় হওয়া সত্ত্বেও সে তাহাকে গ্রামের ছেলে মেয়েদের সহিত অবাধে মিশিতে দিয়াছে, সে কোথায় গেল না গেল, কাহার সহিত মেলামেশা করিল না করিল, তাহার কোন খোঁজই রাখে নাই। পীনা যে একলা থাকিতে ভালবাসে, সাধ্যপক্ষে কাহারও সহিত আত্মীয়তা করিতে চাহে না তাহাও সে জানিত। তাই ও বিষয়ে তাহার বিশেষ দুশ্চিন্তাও ছিল না। তবে সম্প্রতি একটা চিন্তা তাহার মাথায় ঢুকিয়াছিল। করিমের ক্রমাগত মনে হইতেছিল যে পীনার বিবাহের বয়স উপস্থিত, তাহার বিবাহ দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে বিষয়েও এক বাধা।

তাহারা পিতাপুত্রী, করিম এবং পীনা অনন্যগজ হইয়াও অনায়াসে তথায় বাস করিতেছিল, নির্ব্বিবাদে জীবন ধারণ করিতেছিল, কখনও কোন আপনার লোকের অভাব এতটুকু অনুভব করে নাই। করিম নিজ জমিটুকু চাষ করিত, হাট বাজার করিত, জ্বালানি কাঠ এবং গরুর ঘাস সংগ্রহ করিয়া আনিত, বাহিরের কাজ যাহা কিছু সবই করিত। আর পীনা রন্ধন করিত, গরু দুহিত, ঘর দ্বার পরিষ্কার করিত, ঘরের কাজ যাহা কিছু সমস্তই করিত। যদি কোনদিন কোন কারণে করিম বাহিরে যাইতে না পারিত তবে বাহিরের কাজ সব প্রায় পড়িয়াই থাকিত, যাহা নিতান্ত না হইলে চলে না তাহাই পীনা কোনপ্রকারে করিয়া লইত। যদি কোনদিন পীনার সামান্য একটু অসুখ করিত তবে ঘরের কাজও প্রায় সব পড়িয়াই থাকিত, যাহা নিতান্ত না হইলে চলে না তাহাই করিম নিজে কোনপ্রকারে করিয়া কাজ চালাইয়া লইত। কাজেই পীনার বিবাহের কথা মনে হইতেই তাহার ভাবনা হইল, পীনাকে যে তাহার নিজেরই নিতান্ত প্রয়োজন, তাহাকে নহিলে যে তাহার দিন কাটে না, তাহাকে বিবাহ দিয়া পরের ঘরে পাঠাইয়া দিলে তাহার সংসার চলিবে কি প্রকারে? অবশ্যই তাহার উপার্জ্জন হইতে আরও একটা লোককে সে ভরণপোষণ করিতে পারে। তাহাদের জাতির মধ্যে এমন সহায়-সম্বল-বান্ধবহীনা স্ত্রীলোকেরও অভাব নাই যে দুটী উদরান্নের বিনিময়ে তাহার সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া রন্ধন করিয়া দিবে। অথবা তাহার যে নিকার বয়স একেবারে গিয়াছে তাহাও নয়। কিন্তু তাই বলিয়া তাহার পীনাকে যে পর করিয়া বিদায় করিয়া দিবে, আর তাহার স্থান অধিকার করিবে আসিয়া বাহিরের একটা স্ত্রীলোক, যাহার সহিত দু'দিন আগে তাহার পরিচয়ও ছিল না? তাহারই চক্ষের উপর সে পীনার ছেলেমী হাতের এলোমেলো সংসারটাকে গুছাইয়া তুলিবে, হয়তো পীনার অপরিপক্ক গৃহিণীপণার জন্য তাহাকে দু' একবার তিরস্কারও করিবে। সেই কচি হাতের কাজগুলি সে করিবে, তাহারই সম্মুখে ক্ষুধার সময় ভাতের থালা ধরিয়া দিবে, হাটের দিনে সওদার ফর্দ্দ লিখাইয়া দিবে, আর তাহাকে দেখিয়া শুনিয়াও চুপ করিয়া থাকিতে হইবে? না না, তা তো হইতেই পারে না। আর নিকা? এতকাল পরে আবার! ছিঃ ছিঃ! পীনার

জন্যই যাহার মৃত্যুর কারণ, তাহার নীরস কঠোর প্রাণের ভিতর যাহার স্মৃতি আজও তেমনি অক্ষুণ্ণ উজ্জ্বল রহিয়াছে, তাহার অবমাননা! তাহার বয়স যায় নাই তো কি? নিশ্চয় তাহার বয়স গিয়াছে, না গিয়া থাকিলেও গিয়াছে। নিকার কথা মনে করিতেও তাহার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চক্ষু বুঁজিয়া একটু ভাবিতেই তাহার মনে হইল যেন স্বর্গ, নরক, পৃথিবী সবাই একজোট হইয়া সমস্বরে তাহাকে ধিক্কার দিতেছে, টিটকারী দিতেছে। এমন অবস্থায় কর্ত্তব্য কি?

করিম ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিল, পীনার বিবাহই দিবে না। অন্ততঃ যতদিন সে বাঁচিয়া থাকে ততদিন পীনা অবিবাহিতই থাকিবে। তারপর সে মরিবার পূর্ব্বে মাণিক ব্যাপারীর পরিবারের হাতে মেয়েটাকে তুলিয়া দিয়া যাইবে; তারপর—তারপর কি হইল না হইল সে দেখিতে আসিবে না। হাঁ তাই ঠিক। মাণিক তাহার পরম উপকারী, একমাত্র সুহৃদ্। পীনা, যে সহজে কাহারও প্রশংসা করিতে চাহে না, সেও মাণিকের বিবির প্রশংসা করে। অতএব সে তাহার অনুরাগিনী সন্দেহ নাই। তাহার হাতে পীনাকে তুলিয়া দিয়া গেলে, আর কোন ভয় ভাবনার কারণ থাকিবে না। তবে যদি তাহার জীবিত কালের মধ্যে এমন পাত্র সে পায় যাহার তিনকুলে কেহ নাই, যে তাহার আপনার জন হইয়া তাহার গৃহে বাস করে এক কথায় ঘর জামাই হইয়া থাকে তবে অবশ্যই স্বতন্ত্র কথা।

করিম একদিন পাকে-চক্রে সুযোগ বুঝিয়া মাণিককে মনের কথাটা খুলিয়া বলিল। মাণিক তাহাকে ভরসা দিয়া কহিল—"তার আর ভাবনা কি? আমি একটী পাত্রের সন্ধান দেখিতেছি, যার সহিত বিবাহ হইলে কন্যার সহিত তোমার ছাড়াছাড়ি না হয়।" মুখে সে শুধু এইটুকুই বলিল মনে মনে ভাবিল কিন্তু অনেক কথা। তাহার তিন পুত্রই অবিবাহিত। মনোমত পাত্রীর অভাবে কাদেরের বিবাহ হয় নাই, কাদেরের বিবাহ না হইতে দেদার বক্সের বিবাহ হইলে গৃহ বিবাদের সম্ভাবনা,—তাই তাহারও বিবাহ হয় নাই। টেঁপার তো বিবাহের যোগ্যতাই নাই। ফলে তাহারা তিনজনেই অবিবাহিত ছিল।

পীনাকে মাণিক ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিয়াছে, সে যে সুন্দরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। তাহার মত মুখ চোখ, গড়ন, গায়ের রং নবীর চরের কোন মেয়ের তো নাই-ই, পদ্মার আর কোন চরের আর কোন মেয়ের আছে কিনা সন্দেহ। এমন মেয়েকে পুত্রবধূ করিতে কাহার না সাধ হয়? তা ছাড়া সে নেহাৎ ছেলেমানুষটীও নয়। আর ঘরকন্নার কাজকর্ম্মও সবই জানে। কাদেরের সহিত পীনাকে নেহাৎ বেমানানও দেখাইবে না। অতএব —আরও একটা বড় কথা, করিমকে একদিন মরিতে হইবে নিশ্চয়। সে গত হইলে তাহার বাড়ী এবং জমিটুকু তাহার জামাতারই হইবে। অতএব—তাইতো এই সোজা কথাটা এতদিন তাহার মনেই হয় নাই!

(ক্রমশঃ)

—•—

স্বপন বিভোরা।

শিল্পী—এ, এফ্, ই, বেগার্স।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১১ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৩। [৪০শ সপ্তাহ

ভাবের অভিব্যক্তি।

[শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়]

"খুসী"

পহেলে বহিন্—পিছে জরু—
খোদা কা কসরৎ—ম্যায় ক্যোয়া করু !!

"কুযুক্তি"

গলিকা সাম্‌নে আনেসেই কাম্ ফতে কর দেনা।

"ক্রোধ"

একদম্‌সে জান্‌ লে লেয়ে—

"কু অভিপ্রায়"

ক্যোয়া বিবি—আভি সাম্‌ঝে ?

"হাবার সঙ্গীত"

তুম্‌ হামারা—হাম তু—মা—রা—

"গোলাপী নেশায়"

ক্যোয়া মজেদার গানা !! তুম্‌ হামারা জানি—

আলোচনা

জনমতের জয়—

দুর্দ্দান্তপ্রতাপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রোষকষায়িত ভ্রুকুটিকে অনায়াসে অবহেলা করিয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও ডাঃ মুঞ্জে ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মর্য্যাদার মূল্য জগতের সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছেন হিন্দুমুসলমানের মিলন স্থাপনের জন্য যাঁহারা সকল স্বার্থ ও সুবিধা বিসর্জ্জন দিয়া উত্তর ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অনবরত ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদেরই বক্তৃতার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিরোধ বর্দ্ধিত হইবে এই মিথ্যা দোষারোপ করিয়া গবর্ণমেণ্ট সমগ্র হিন্দুসমাজকে অপমানিত করিয়াছিলেন। ভারতের জনমত গবর্ণমেণ্টের অন্যায় আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া যে আন্দোলন সৃষ্টি করিয়াছিল গবর্ণমেণ্টকে তাহার নিকট মস্তক অবনত করিতে হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এখন স্বীকার করিয়াছেন যে "সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিতে পারে এই বক্তৃতা (৭ই আগষ্টের পণ্ডিতজীর বক্তৃতা) এরূপ ধরণের নহে। তারপর যদিও তাঁহার কলিকাতা আগমনের পর এক পক্ষকাল গত হইয়াছে তাহা হইলেও এ পর্য্যন্ত কোন দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধে নাই। এজন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুসারে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছে, তাহা আদালতের অনুমতি লইয়া গবর্ণমেণ্ট প্রত্যাহার করিতে অনুমতি দিতেছেন।"

পণ্ডিতজী হিন্দুসমাজের বরণীয় ও মাননীয় নেতা। তিনি হিন্দুজাতির সংগঠন আন্দোলন চালাইয়া ভারতবর্ষের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। তাঁহার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেণ্টের যে কত বড় ভুল হইয়াছিল তাহা বোধ হয় এখন তাঁহারা বুঝিতে পারিতেছেন।

আর পণ্ডিতজী ও ডাঃ মুঞ্জে এই আদেশের প্রতিবাদ করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে নৈতিক যুদ্ধ করিলেন, তাহার মূল্য স্বরাজ্যদলের তথাকথিত কাউন্সিল ধ্বংসের মূল্য অপেক্ষা অনেক বেশী। কেননা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ব্যতিরেকে জাতীয় স্বাধীনতা কখনই আসিতে পারে না। মন্ত্রীর বেতন বন্ধ করিলে জাতীয় স্বাধীনতা আসে না, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পদদলনের প্রতিবাদ করিলে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি আপনিই গড়িয়া উঠে। ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতাব্দীর ষ্টুয়াট রাজগণের সহিত পার্লামেণ্টের দ্বন্দ্বের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইলিয়ট, পিম্, হ্যাম্পডেন প্রভৃতি পার্লামেণ্টের নেতৃবৃন্দ ইংরাজগণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইংলণ্ড আজ গণতন্ত্র শাসিত দেশ হইতে পারিয়াছে। পণ্ডিত মালব্য ও ডাঃ মুঞ্জেকে শত ধন্যবাদ যে তাঁহারা জনমতের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বাধা—

বাঙ্গলার দ্বিতীয় কাউন্সিল তাহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে। এই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিলে যে আমাদের দেশের অর্থ উৎপাদনের শক্তি বৃদ্ধি হইবে না, স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হইবে না, জাতীয় আন্দোলনকে সফল করা যাইবে না তাহা আমরা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি এবং সকলেই ইহার অত্যাবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া সুবিধাজনক হইলেও ঘণ্টা বাঁধে কে? গবর্ণমেণ্ট স্পষ্টই বলিতেছেন তাঁহারা টাকা দিতে পারিবেন না—তোমরা প্রাথমিক শিক্ষা চাওতো অতিরিক্ত কর দাও। গবর্ণমেণ্ট অনুমান করেন যে বাঙ্গলাদেশে বৎসরে দেড় কোটী টাকা ব্যয় করিতে পারিলে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। তাঁহাদের মতে টাকা পিছু ৪।৫ পাই কর বসাইয়া প্রাথমিক শিক্ষার অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

বাঙ্গলার লোক যেরূপ দরিদ্র তাহাতে এত কর দেওয়া

যে খুবই কঠিন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গবর্ণমেণ্ট এখন মেষ্টনী দেয় হইতে অব্যাহতি পাইলেন—সেদিকে তাঁহাদের যে টাকা বাঁচিবে তাহা এবং অন্যান্য দিকে ব্যয় কমাইয়া শিক্ষার জন্য অধিকতর টাকা যদি সরকার দেন তবে করের পরিমাণ অনেক কমিতে পারে। ব্রিটিশ ভারতের ২৪ কোটী ৭০ লক্ষ অধিবাসীর শিক্ষার জন্য সর্ব্বসমেত মাত্র ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় অর্থাৎ প্রতি বৎসর জনপিছু গণ্ডা বার পয়সা মাত্র শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইয়া থাকে অথচ সৈন্যের জন্য প্রতি অধিবাসী পিছু এক টাকা বার আনা ও পুলিশের জন্য নয় আনা ব্যয় করা হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ নীতি পরিবর্ত্তন না করিলে প্রাথমিক শিক্ষা চালান কঠিন তবে গরজ আমাদের। গবর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন ও আবদার করিয়াও যদি তাঁহাদের নিকট হইতে বেশী সাহায্য না পাওয়া যায়, তাহা হইলেও প্রাথমিক শিক্ষা-দান নীতি ত্যাগ করা উচিত নহে। এখন আমরা ৪ খানা কাপড় পরিতেছি—দুইবেলা ভাত খাইতেছি—সে জায়গায় আমাদিগকে ২ খানা কাপড় পরিয়া ও একবেলা ভাত খাইয়াও যদি শিক্ষাকর জোগাইতে হয় তাহাতেও পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া আমাদিগকে এ কষ্ট স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তক টাকার বাধাই একমাত্র বাধা নহে। আরও অনেকগুলি বাধা আছে যাহা দূর করিবার ভার লইতে হইবে দেশের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে।

প্রথম বাধা স্কুলে যাইবার উপযোগী ছেলেমেয়েদিগকে স্কুলে উপস্থিত করান যায় কি করিয়া? যে দুই চারিটী স্থানে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে, সেখানেও শতকরা ৮০ জন কখনও উপস্থিত হয় না একথা সদ্য প্রকাশিত ভারতবর্ষের শিক্ষা রিপোর্টে স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণের মনে এখনও একটা ধারণা আছে যে চাকুরীজীবী ভদ্রলোকের ছেলেরাই লেখাপড়া শিখিবে—চাষী ও শ্রমিকদের ছেলের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন নাই। অথচ দেশের শতকরা ৭৫ জন লোকই চাষবাস করিয়া জীবন ধারণ করে। তাহাদের মধ্যেই প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। অথচ যাঁহাদের উপর বাধ্যতারীতি কার্য্যকরী করিবার ভার আছে তাঁহারা এ বিষয়ে অবহিত নহেন।

দ্বিতীয়তঃ চাষীরা জানে লেখাপড়া শিখিলে ছেলে বাবু বণিয়া যাইবে—তাহার দ্বারা চাষবাসের কাজ চলিবে না। আজকাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে এরূপ ভাবা অন্যায় নহে। প্রাথমিক শিক্ষাকে উপকারী করিয়া তুলিতে হইলে কৃষকের ব্যবহারিক জীবনের সহিত শিক্ষার সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষার মধ্যে কৃষির উন্নতিমূলক শিক্ষাও দিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক রাখিলে চলিবে না। একজন শিক্ষকের পক্ষে চারিটী শ্রেণী পড়ান অসম্ভব! আজকাল সেইজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীতে অনেক ছেলে থাকিলেও শতকরা ২০ জনের বেশী চতুর্থ শ্রেণীতে প্রমোশন পায় না। কেননা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষার প্রতি শিক্ষক মনোযোগ দিতে পারেন না। সেই জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্ততঃ দুইজন শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে। ইহার জন্য খরচ আরও বাড়িয়া যাইবে!

প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনা প্রসঙ্গে সাহসৈয়দ এমাদাদুল হক মহাশয় বলিয়াছেন যে অন্ততঃ প্রতি থানায় একটি করিয়া বিদ্যালয়ও স্থাপন করিতে হইবে। কিন্তু একটি থানার অধীনে ৮০।৮৫টি গ্রাম পর্য্যন্ত আছে। প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে না পারিলে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার করা যাইবে না। রাস্তাঘাটের এমন দুরবস্থা যে ছোট ছোট ছেলের পক্ষে দূর গ্রাম হইতে বিদ্যালয়ে যোগ দেওয়া সম্ভব নহে।

আমাদের শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা গ্রাম ছাড়িয়া সহরে চলিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা গ্রামে না থাকিলে শিক্ষা প্রচারের সুবিধা কিছুতেই হইতে পারে না। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও অনেকের লেখাপড়া শিখিবার উৎসাহ হইতে পারে - তাঁহাদের চেষ্টায় গ্রাম্য বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারু রূপে চলিতে পারে। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকদিগকে গ্রামে ফিরাইবার জন্য রীতিমত জনমত গঠন করিতে হইবে।

বিলাতে ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ধর্ম্মযাজক গ্রামে বাস করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও আদর্শ হইতে গ্রামবাসী অনেক শিক্ষালাভ করিতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশের পুরোহিত সম্প্রদায় অশিক্ষিত ও স্বার্থান্ধ। পুরোহিতগণ আবার যাহাতে পুর বা গ্রামের হিত সাধনে মনোযোগী হইয়া নিজ নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করেন সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে।

তারপর প্রাথমিক স্ত্রীশিক্ষার কথা। বালিকাদিগকে মেয়েরাই শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদের দেশে অতিরিক্ত পর্দ্দাপ্রথার জন্য ও সামাজিক নিন্দার ভয়ে মেয়েরা শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন না। এ সম্বন্ধেও সমাজের সংস্কার আবশ্যক।

বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার ফল যেমন ব্যাপক তাহা লাভ করিতে হইলেও তেমনি ব্যাপক ভাবে সব দিক দিয়া আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি জনসাধারণকে আকৃষ্ট না করিতে পারিলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রস্তাব দেশে সফল হইতে পারে না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ঐকান্তিকতা, উৎসাহ ও স্বার্থত্যাগের উপরই দেশের শিক্ষা বিস্তার সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে।

আগামী সাম্রাজ্য বৈঠক—

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভাঙ্গনের অস্পষ্ট সূচনা দেখা দিয়াছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যাণ্ডের সহিত ইংলণ্ডের যে সৌহার্দ্দ্য যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছিল, তাহা বুঝি লোকার্ণো যুক্তির ধাক্কায় ধসিয়া যায়! তাই এই বৎসর ১৯শে অক্টোবর তারিখে সাম্রাজ্য বৈঠকের অধিবেশন হইবে। কলিকাতা হইতে বিদায় ভোজ খাইয়া বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ভারতের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে সাম্রাজ্য বৈঠকে যোগ দিতে যাইতেছেন। রাগবীর সরকারী খবরে প্রকাশ যে এই বৈঠকে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে ও সাম্রাজ্য সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা হইবে। বৈঠকে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের পরামর্শ ও সংবাদের আদান প্রদানের অধিকতর সুবিধা কি করিয়া হয়, তাহাও আলোচিত হইবে। অর্থনৈতিক বিষয়ের মধ্যে সাম্রাজ্যের ভিতর বাণিজ্যের আলোচনা, বাণিজ্য চালাইবার জন্য বিমান ব্যবহার, গবেষণা সাম্রাজ্যের ভিতর সাম্রাজ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত শিল্পাদির উপর কর নির্দ্ধারণের যুক্তি-যুক্ততা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে।

এইরকম বিষয় আলোচনার জন্য সাম্রাজ্য বৈঠক ইহার পূর্ব্বে আরও আটবার বসিয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন উপনিবেশের মন্ত্রীরা ভোজ খাইয়া ও আড্ডা দিয়াই নিজেদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। সাম্রাজ্যের মধ্যে যে সকল গুরুতর সমস্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার একটিরও এ পর্য্যন্ত সুমীমাংসা হয় নাই। গোটাদুই দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সাম্রাজ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানী শুল্ক কমাইবার প্রস্তাব ১৯০১ সাল হইতে চলিতেছে। এই নীতি অবলম্বন করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জার্ম্মাণী, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতির সহিত বাণিজ্যে প্রতিযোগীতা বজায় রাখিতে পারে ও সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে। কিন্তু কোনও উপনিবেশই নিজেদের স্বার্থত্যাগ করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য রাজী হয় নাই। যেখানে স্বার্থের এত সংঘাত সেখানে বৈঠক করিয়া ফললাভ করা কঠিন। দ্বিতীয়তঃ সাম্রাজ্য বৈঠক এ পর্য্যন্ত সাম্রাজ্য রক্ষার উপযোগী ও সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত নৌ-বহর স্থাপন করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ নৌবহরই সাম্রাজ্য রক্ষার কাজ করিয়া আসিতেছে।

ভারতবাসী অনেক অর্থব্যয় করিয়া পুনঃ পুনঃ সাম্রাজ্য বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াও সাম্রাজ্যের মধ্যে কোন সুবিধা লাভ করিতে পারেন নাই। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও বিশেষ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর যে কিরূপ লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হয় তাহা সকলেই জানেন। সেই দুর্দ্দশার অবসান করিবার জন্য ১৯২১ সালের সাম্রাজ্য বৈঠকে এক প্রস্তাব করা হয়। তাহাতে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যতীত অন্যান্য উপনিবেশের প্রতিনিধিগণ মত দেন যে—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একতা রক্ষার জন্য উপনিবেশে প্রবাসী ভারতবাসীকে নাগরিক অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। দক্ষিণ আফ্রিকাতেই ভারতবাসীর অবস্থা দিন দিন শোচনীয় হইতে

শোচনীয়তর হইতেছে। অথচ সেই দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধি সাম্রাজ্য বৈঠকে ভারতবাসীর দুর্দ্দশা মোচন করিতে স্পষ্ট অস্বীকার করিলেন। অন্যান্য উপনিবেশের প্রতিনিধিরা বা ব্রিটিশ জাতির নেতারা দক্ষিণ আফ্রিকার মতকে বদলাইয়া দিতে পারেন না। যাহা হউক শ্রীযুক্ত ভি, এস, শাস্ত্রী মহাশয় মিঃ জি, এস, বাজপায়ীকে সঙ্গে লইয়া সমগ্র সাম্রাজ্য ভ্রমণ করিলেন—প্রবাসী ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা উপনিবেশিক গবর্ণমেণ্টের কাছে সাবস্তারে বর্ণনা করিলেন। কিন্তু সাম্রাজ্য বৈঠকের উদার প্রস্তাব সত্ত্বেও কাজে কিছুই হইল না। প্রবাসী ভারতবাসী যেমন লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিতেছিল, সাম্রাজ্য বৈঠকের প্রস্তাব সত্ত্বেও সেইরূপই করিতে থাকিল। তারপর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে আবার সাম্রাজ্য বৈঠক বসিল—ভারতবাসীর নিবেদন আবার উপস্থিত করা হইল—উক্ত উদার প্রস্তাব আবার দৃঢ়ীকৃত হইল। কিন্তু প্রবাসী ভারতবাসীর দুঃখ ঘুচিল না। দক্ষিণ আফ্রিকা এবারও ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে স্পষ্ট অস্বীকার করিল। নাটালে ভারতবাসীর যে মিউনিসিপ্যাল ভোটের অধিকার ছিল তাহাও আর নূতন ভারতীয় নাটাল বাসীকে দেওয়া হইবে না এইরূপ আইন হইয়াছে। ট্রান্সভালে যেরূপ আইন হইতেছে তাহাতে ভারতবাসী সেখানে কোনরূপ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে না—নাগরিক অধিকার তো দূরের কথা। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী ও পারঞ্জেপ প্রবাসী ভারতবাসীর কোন সুবিধা দিতে পারেন নাই—এখন বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কি করেন দেখা যাউক। তবে উপনিবেশগুলির ভারতের উপর যেমন মনোভাব তাহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে সাম্রাজ্য বৈঠকে আমাদের প্রতিনিধির ব্যয়ভার বহন করাই সার হইবে।

বিভিন্ন উপনিবেশের মধ্যে একতা বন্ধন কি করিয়া দৃঢ় করা যায় তাহাই হইবে এবারকার সাম্রাজ্য বৈঠকের প্রধান সমস্যা। একতার দুইটী বাধা উপস্থিত—(১) কয়েকটী উপনিবেশের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী দেখা দিয়াছে। (২) লোকার্ণো চুক্তির ফলে উপনিবেশের স্বার্থের সহিত ইংলণ্ডের কার্য্যের সংঘাত।

কানাডার ভিতর পূর্ণ স্বাধীনতার ইচ্ছা দেখা যাইতেছে। জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থীরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অস্থির নীতি ও কানাডার দাবী এড়াইবার কৌশল দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। এই বিরক্তির ফলে কানাডা তাহার নিজের ভাগ্য সম্পূর্ণভাবে নিজের হাতে লইবে এই দাবী উপস্থিত হইতে পারে। এই কথার সমর্থনকল্পে আমরা মার্চ্চ মাসের রাউণ্ড টেবলে প্রকাশিত কানাডার একজন প্রতিষ্ঠাবান লেখকের উক্তি উদ্ধার করিতে পারি—"There is beginning to appear an organised left wing of the nationalist movement. This reflects a mood of exasperation with the present policy of drift, evasion and denial, which may develop into a definite advocacy of separation as the only possible means of securing for Canada the right to live her own life, dream her own dreams, pursue her own ambitions, establish her own standards, cultivate her own loyalties, and ensure the continuance for all time of Canada as a distinct country with her own culture and characteristics." দক্ষিণ আফ্রিকাতেও স্বাধীনতার দাবী দেখা দিয়াছে। জেনারেল হার্টজগ সাম্রাজ্য বৈঠকে যাইতেছেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষপাতী। তিনি যাহাতে এরূপ স্বাধীনতার দাবী সাম্রাজ্য বৈঠকে না করেন তাহার জন্য জেনারেল স্মাটস্ জোহানসবর্গে এক বক্তৃতা দিতে উঠেন। কিন্তু সভায় তাঁহার বিরুদ্ধ মতের এত লোক ছিল যে তিনি বক্তৃতা দিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা কত তীব্র।

কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ ইংরাজদেরই অধ্যুষিত দেশ—তথাপি তাহারা কেহ কেহ সাম্রাজ্যের নাগপাশ হইতে মুক্তি চায় কেন? সম্প্রতি পার্লামেণ্টের বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত শাকলাতওয়ালা বলিয়াছেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মানে এখন ভারতবর্ষ মাত্র। ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট রাখা সেইজন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ত্তব্য। সাম্রাজ্য

বৈঠকের কাজের যেমন নমুনা আমরা পূর্ব্বে পাইয়াছি তাহাতে ভারতকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বজায় রাখিতে হইলে এখন ইংরাজ সরকারের চারিদিকে উদার নীতি অবলম্বন করিতে হইবে।

তারপর লোকার্ণো চুক্তির কথা। গত বৎসরের লোকার্ণো চুক্তিতে স্থির হয় যে পশ্চিম ইউরোপে জার্ম্মাণী ফ্রান্স বেলজিয়ম প্রভৃতির মধ্যে কোন যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড অত্যাচারকারীর বিপক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের পর হইতে ইংলণ্ড ইউরোপীয় রাজনীতির সহিত নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে নানা কারণে বাধ্য হইয়া ইংলণ্ড মহাসমরে যোগ দিয়াছিলেন। তখন ভারতবর্ষ ও উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহার ফলে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সাম্রাজ্য বৈঠকে স্থির হয় যে বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি (Foreign policy) পরিচালনায় ইংরাজ সরকার উপনিবেশগুলিও ভারত সরকারের সহিত যুক্ত পরামর্শ করিবেন। কিন্তু লোকার্ণো চুক্তির ফলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আর উপনিবেশগুলি ও ভারতবর্ষের সহিত যুক্তি করিবার অবসর বা সুযোগ পাইবেন না। কেননা যখনই ফ্রান্স ও জার্ম্মাণীর মধ্যে যুদ্ধ হইবে—লোকার্ণো চুক্তি অনুসারে ইংরাজকে এক পক্ষ অবলম্বন করিতে হইবেই। উপনিবেশগুলি যুদ্ধ করিতে মানা করিলেও ইংরাজ সরকার যদি তাঁহাদের চুক্তি বজায় রাখেন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইবেই। ইংরাজ যুদ্ধে নামিলে উপনিবেশগুলিরও ভারতবর্ষের নিরপেক্ষতা নষ্ট হইয়া যাইবে—কেননা আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে এগুলি ইংরাজের অধীন মাত্র। তাহার ফলে কানাডা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির বাণিজ্যের হানি হইবে। এইরূপে ইংরাজের স্বার্থের সহিত উপনিবেশের ও ভারতবর্ষের স্বার্থের সংঘাত বাধিতেছে। এই গুরুতর সমস্যা সমাধান করিতে না পারিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বজায় রাখা কঠিন হইবে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিলেও তাহাতে কোন ফল হইবে না। কেননা ভারতবর্ষের পক্ষে "অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন" সব সমান।

আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিজ্ঞতা—

ভারতবর্ষের মুসলমানেরা আজকাল সময়ে অসময়ে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে আরব তুরস্কই তাঁহাদের যথার্থ বাসস্থান—সেখানে যাইলে তাঁহারা ভাইয়ের মত আদর অভ্যর্থনা পাইবেন ভারতবর্ষে তাঁহারা প্রবাসী মাত্র। ভারতবাসী মুসলমানদের মধ্যে শতকরা কয়জনের পূর্ব্বপুরুষ আরব তুরস্ক হইতে আসিয়াছিলেন সেই খোঁজ লইলেই তাঁহাদের মনের ধাঁধা ঘুচিতে পারে। সম্প্রতি মৌলানা মহম্মদ আলী ও সৌকত আলী মক্কার মুস্‌লিম্ কংগ্রেস হইতে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহাতেও অন্ততঃ ভারতীয় মুসলমানদের ভারতবর্ষের সহিত কি সম্বন্ধ, তাহা উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য।

মক্কার মুস্‌লিম্ কংগ্রেসের সকল প্রতিনিধিই আরবী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন—কিন্তু মৌলানা মহম্মদ আলী সম্ভবতঃ আরবী ভাষায় বক্তৃতা দিবার অক্ষমতাবশতঃ ইংরাজীতে বক্তৃতা দেন। তিনি আরবীতে বলিতে পারিবেন না ভাবিয়া একজন প্রতিনিধি তাঁহাকে উর্দ্দুতে মনোভাব ব্যক্ত করিতে বলেন—কিন্তু মৌলানা সাহেব কাফেরের ভাষা ইংরাজীর প্রতি সহসা অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়ায় ইংরাজীতেই বক্তৃতা চালাইতে থাকেন। তাহাতে সভায় অত্যন্ত গোলমাল হয়। ভাষা হইতেছে ঐক্যবন্ধনের সেতুস্বরূপ। ভারতের মুসলমানেরা উর্দ্দু ও বাঙ্গলা প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষা অবলম্বন করিয়া বহুকাল পূর্ব্বে ভারতের বাহিরের মুসলমান জগতের সহিত সেই ঐক্য সম্বন্ধ হারাইয়াছেন। ইংরাজেরা জার্ম্মাণী হইতে আসিয়াছিল বলিয়া এখন জার্ম্মাণীকে নিজেদের বাসস্থান বলিয়া দাবী করে না।—ভারতবর্ষের সহিত ভারতীয় মুসলমানদের আজকাল অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ—ভাষা ভাব ও অবস্থার কঠিন ডোরে তাঁহারা সমগ্র ভারতের ভাগ্যের সহিত বাঁধা পড়িয়াছেন। মুখের কথায় আরব তুরস্কের সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ করিলেই কি এখন সেখানকার লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে?

মৌলানা মহম্মদ আলী বিশ্ব মুস্‌লিম কংগ্রেসে দাবী করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে মুসলমানের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলিয়া মুস্‌লিম কংগ্রেসেও ভারতীয় মুসলমানের

প্রতিনিধি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হওয়া প্রয়োজন। সংখ্যানুপাতের নীতি বা সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন নীতি ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে ভূতের মতন চাপিয়া বসিয়াছে। যত্র তত্র তাঁহারা এই দাবী করিতেছেন। কিন্তু বিশ্ব মুসলিম কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দেরা তো আর Divide and Rule নীতি চালাইতে বসেন নাই যে তাঁহারা ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র দাবী স্বীকার করিবেন? তাই মৌলানা সাহেবকে সভার মধ্যে "স্বার্থপর—আত্মাভিলাষ পরিপূরণকারী" প্রভৃতি আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মৌলানা সাহেব গতিক সুবিধা নয় দেখিয়া অবশেষে বলেন যে ভারতীয় মুসলমান সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহারা পরাধীন বিধায় তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা কম প্রতিনিধি দেওয়া হউক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এরূপ সাধু প্রস্তাবেও মক্কার মুসলিম কংগ্রেস কর্ণপাত করেন নাই। ইহাতে ভারতীয় মুসলমানদের বোঝা উচিত যে পরাধীন বলিয়া স্বাধীন মুসলমানেরা তাঁহাদিগকে কতটা ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। এই পরাধীনতার গ্লানি দূর করিতে না পারিলে তাঁহারা নিজেদের ধর্ম্ম রক্ষার জন্যও অন্যান্য মুসলমানের সহিত একতাবদ্ধ হইতে পারিবেন না। পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হিন্দুর সহিত জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেওয়া—চাকুরীর জন্য হিন্দুর সহিত মারামারি করা নহে। একথাটা মৌলানা সাহেব মক্কার অভিজ্ঞতার পর একটু সমঝাইয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। মক্কায় যাওয়ার পূর্ব্বে তাঁহারা হিন্দুকে কাফের বলিয়াছিলেন—ভাই বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। মক্কা হইতে ফিরিয়া করাচীর মিউনিসিপ্যালিটির অভিনন্দনের উত্তরে তিনি আবার হিন্দুকে ভাই বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ধর্ম্মের নামে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি হিন্দু মুসলমান শিখ ও পার্শী সকলকে একতাবদ্ধ হইয়া দেশের স্বার্থসাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। মক্কার বিষাদময় অভিজ্ঞতার ফলে আলী ভ্রাতৃদ্বয় যদি এইরূপ নীতি মন প্রাণ দিয়া প্রচার করেন তবে মুসলমানগণের মধ্যে জাতীয়তার ভাব জাগিতে পারে।

তারপর মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের অভিজ্ঞতার কথা। ভারতবর্ষে তো মসজিদের সামনে বাজনা বাজাইলেই মুসলমানদের ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় আর মুসলমানদের প্রধান তীর্থ মক্কায় এই মুসলমান ধর্ম্মের কি অত্যাচারই না হইতেছে? মোঃ মহম্মদ আলী করাচীতে অশ্রুসজল নয়নে পয়গম্বরের আবাসস্থানের কদর্য্য অবস্থার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে প্রত্যহই সেখানে একশ্রেণীর লোক অত্যন্ত কুৎসিৎ কার্য্য করিয়া থাকে। ইসলামের সাধু ব্যক্তিগণের সমাধিস্থলগুলি এমন ভাবে অপবিত্র করা হইতেছে যে, যাহারা পুরাতন স্মৃতির কোনপ্রকার সম্মান করে না, সেরূপ বর্ব্বর দস্যুরাও ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা না করিয়া পারে না। মুসলমানদের প্রধান তীর্থ ও পবিত্র স্থানগুলির যখন এরূপ অবস্থা তখন ভারতীয় মুসলমানদের তাহাই রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ঘরে যখন আগুন লাগে তখন যদি কেহ ইঁদুর মারিবার জন্য সকল শক্তি ব্যয় করে তবে লোকে তাহাকে যেমন পাগল বলে, তেমনি প্রধান তীর্থ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে আর মসজিদের সামনে বাজনা বাজান বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারা এত ব্যগ্র ইহা দেখিয়া লোকে তাঁহাদিগকে কি ভাবিবে?

মৌলানা সাহেবেরা যদি তুরস্কের একটু খবর লইতেন তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন সেখানে মুসলমান ধর্ম্মের অবস্থা ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান ধর্ম্মের অবস্থা অপেক্ষা অনেক খারাপ। তুরস্কে মুসলমান ধর্ম্ম আর রাষ্ট্রীয় ধর্ম্ম নহে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সেখানে সমভাব দেখান হইতেছে। এমন কি কোরাণ ও হজরতের জীবনীর মূল উপাদানগুলিকেও আর বিশ্বাস না করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহার সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। নব্য তুরস্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞ লেখক রেভারেণ্ড এ, এম্, চিরগউইন্ সাহেব ১৯২৬ সালের মার্চ্চ মাসের Nineteenth Century পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"Investigation has not stopped short at textual criticism of the Islamic scriptures. The turks themselves are beginning to look into and examine the character of Muhammad as no Moslem ever dreamed of doing before. The very sources on which his first great Biography were based are

being challenged, and many are openly saying that they can no longer believe that the great collections of Muhammedan tradition, which profess to give the words and acts and life of Muhammad in Arabia, are to be relied as trustworthy" অর্থাৎ ইসলাম শাস্ত্রের পাঠ সমালোচনা করিয়াই যে গবেষণা ক্ষান্ত হইয়াছে তাহা নহে। তুর্কীরা নিজেরাই এমন ভাবে মহম্মদের চরিত্র পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, যাহা করিবার স্বপ্নও কোন মুসলমানের মনে কোনদিন উদয় হয় নাই। যে সকল উপাদানের উপর বিশ্বাস করিয়া মহম্মদের প্রথম জীবনী লিখিত হইয়াছিল সেই সকল উপাদানকেই অবিশ্বাস করা হইতেছে। অনেকে স্পষ্ট বলিতেছে যে আরবে মহম্মদের বাণী কার্য্য ও জীবনী সম্বন্ধে যেসকল প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে সেগুলি আর এখন তাঁহারা বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না।" এরূপ সমালোচনা ভারতবর্ষে কেহ করিলে ধর্ম্মের প্রতি আঘাত করার অভিযোগে নিশ্চয়ই তাহার শাস্তি হইত।

আসল কথা হইতেছে এই যে এ যুগে ধর্ম্মকে সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সমষ্টিগত জীবনে ধর্ম্ম অপেক্ষা জাতীয়তা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভারতীয় মুসলমানগণের মুসলমান আন্দোলন বর্ত্তমান যুগের বিরোধী। আমরা মুসলমান ভ্রাতৃগণের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণ করি না—তাঁহাদের উন্নতিতে আমাদেরও উন্নতি এই বিশ্বাস আমাদের আছে। এইসব আলোচনার ফলে তাঁহাদের উন্নতি কোন পথে হওয়া উচিত সেই কথা যদি তাঁহারা বুঝেন তবেই ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে।

ভক্তি-পুষ্প

[শ্রীশ্রীচরণ ঘোষ]

কোন বা অবলা, লয়ে ফুলমালা
বসিলেন সতী পূজিতে হরে।
একাগ্র হইয়ে, নয়ন মুদিয়ে,
তুলিয়া লইল মালাটী করে॥

ভাবেতে মগনা করিয়ে বন্দনা,
শিবের চরণে দিল হে ডালি।
দেখিলা সে সতী, নহে সে মুরতি,
স্বামী পদে শোভে কুসুমগুলি॥

মায়ের দরদ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৫)

মাণিক বড় ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাকু সেবন করিতে করিতে এইসব কথা ভাবিতেছিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিয়াছে, হাটুরিয়ারা হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। জলে, স্থলে, আকাশে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। দেদার বস্ত্র কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র গিয়াছে, কাদেরও বাড়ী ছিল না, সেদিন সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া ছোট ডিঙ্গিখানা ও জনকয়েক সঙ্গী লইয়া নিকটেই একটা ছোট চরে মাছ ধরিতে গিয়াছিল। মাণিক একটা ছিলিম নিঃশেষে পোড়াইয়া সবে আর একটা ছিলিমে গোটাকয়েক টান দিয়াছে, এমন সময় কাদের সদলবলে হৈ হৈ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করিয়া দিল। কাদেরের দুইজন সঙ্গী একটা বাঁশে ঝুলান প্রকাণ্ড একটা শঙ্কর মাছ ধপ্ করিয়া উঠানের উপর ফেলিয়া গায়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে দাওয়ার একপাশে উঠিয়া বসিল। কাদের পূর্ব্বেই রণজয়ী বীরের মত গম্ভীর ভাবে উঠিয়া বসিয়া পিতার হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া টানিতে আরম্ভ করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সঙ্গীদ্বয়ের দিকে একটু তামাক ও একটা কল্কে রাজপ্রসাদরূপে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া পুনরায় তাম্রকূট সেবনে মনোনিবেশ করিল। সঙ্গীরা কাদেরকে ভালরূপেই জানিত, তাহারা বিনা বাক্যব্যয়ে তামাকটুকুর সদ্ব্যবহার করিয়া নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

কাদের কোন কথা কহিল না, শুধু বসিয়া বসিয়া ছিলিমের পর ছিলিম তামাক পোড়াইতে লাগিল। মাণিক পুত্রের স্বভাব উত্তমরূপেই জানিত, বুঝিল এ সময় বাক্যালাপ পুত্রের অভিপ্রেত নয়, তাই সেও চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এদিকে কাদেরের মাতা রন্ধন সমাপন করিয়া হেঁসেলেই বসিয়াছিল, আহারার্থ পতিপুত্রকে ডাকিতে সাহস হয় নাই, জানিত ডাকিলেই ধমক খাইতে হইবে, কাজেই তাহাদের অনুগ্রহ প্রতিক্ষা করা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর ছিল না।

রাত্রি যখন প্রায় দেড় প্রহর তখন কাদের সহসা গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বদনাটা হাতে লইয়া হাতমুখ ধুইতে চলিল। উঠানের উপর দিয়া যাইতে যাইতে সে দেখিল শঙ্কর মাছটা তখনও উঠানের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। সে যে নিজের হাতেই উহার মৎস্য লীলা শেষ করিয়াছে, উহার যে নিজের গতিশক্তি নাই, কেহ তুলিয়া না নিলে কাজেকাজেই উহাকে উঠানে পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহা তাহার মাথায় আসিল না, মাছটাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াই রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। সে একটা হুঙ্কার দিয়া মাতাকে কহিল—"ভাল চাস তো শীগগির মাছটা ঘরে তুলে রাখ।"

মা ব্যাচারি আর কি করে? অগত্যা হেঁসেল হইতে বাহির হইয়া উঠানে আসিয়া মাছটা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। কিন্তু যে মাছটা বহিয়া আনিতে দুইজন জোয়ান পুরুষের দরকার হইয়াছে, তাহা সে নাড়িতেও পারিল না। সে উপায়ান্তর না দেখিয়া টেঁপাকে সাহায্য করিতে ডাকিল। টেঁপা আসিলে দুইজনে মিলিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতেও বড় সুবিধা হইল না। টেঁপা তখন মনে মনে একটা মতলব আঁটিয়া কহিল—"মা! তুই একটু সবুর কর, আমি একটা বাঁশ লইয়া আসি, তা হলে এটাকে সহজে তুলিতে পারিব।" এই বলিয়া টেঁপা একটা বাঁশের সন্ধানে চলিল, তাহার মাতা তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

টেঁপা সবেমাত্র একটা বাঁশ যোগাড় করিয়া আনিয়াছে এমন সময় কাদের হাতমুখ ধুইয়া ফিরিয়া দেখিল মাছটা

তখনও উঠানে পড়িয়া, আর মাতা এবং টেঁপা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। ইহা দেখিয়াই তাহার রাগটা সপ্তমে চড়িয়া গেল। সে আর বরদাস্ত করিতে পারিল না, মাতাকে একটা কুৎসিৎ গালি দিয়া ধাক্কা মারিয়া তারস্বরে জানাইয়া দিল, যে সে বৃথাই এতকাল কাঁড়ি কাঁড়ি অন্ন ধ্বংস করিয়া আসিয়াছে, সেই ভাতগুলি একটা কুকুরকে খাওয়াইলেও ইহা অপেক্ষা বেশী কাজ হইত। মাতা ধাক্কা খাইয়া উঠানের অপর প্রান্তে ছিটকাইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল, কাদের দৃক্‌পাতও করিল না। টেঁপা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দিকে একটা অগ্নিময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মাতাকে তুলিবার জন্ম ছুটিয়া যাইতেছিল সহসা দক্ষিণ গণ্ডে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া ব্যাচারি বসিয়া পড়িল। খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত সে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে কিম্বা উঠিতে পারিল না। মাণিক দাওয়ায় বসিয়া বসিয়া সবই দেখিতেছিল,—এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে মাতাপুত্রের সাহায্যে অগ্রসর হওয়ার কিম্বা এই জুলুমের বিরুদ্ধে একটীও কথা বলিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই। এইবার সে কি ভাবিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং বার দুই তিন হাই তুলিয়া স্ত্রীর হাত ধরিয়া এক হেঁচকা টান মারিয়া বলিল—"ওঠ্‌ নারে হারামজাদী!" সে উঠিয়া দাঁড়াইতেই মাণিক তাহাকে অবিলম্বে ভাত বাড়িবার আদেশ দিয়া রান্নাঘরের দিকে ঠেলিয়া দিল। সে কোনপ্রকারে রান্নাঘরে পৌছিয়া পতি দেবতার আদেশ পালনে যত্নবান হইল। কাদের ততক্ষণে একলাই শঙ্কর মাছটার ল্যাজ ধরিয়া টানিয়া দাওয়ার উপর তুলিয়াছে। সে আর কোন বিষয়ে মনোযোগ না দিয়া পুনরায় একছিমিল তামাক সাজিয়া টানিতে প্রবৃত্ত হইল। টেঁপা তখনও উঠানের মাঝখানটায় চুপ করিয়া বসিয়াছিল, পিতাকে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সহসা তাহার চলচ্ছক্তি ফিরিয়া আসিল, সে পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিয়া সুর করিয়া কড়াঙ্কিয়া মুখস্থ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ঠিক এই সময় চারিদিকে একটা সোরগোল উঠিল—"মার্ মার্ মার্" এবং তার সঙ্গে শ্রুত হইল আহতের আর্ত্তনাদ। কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তেমোহনার চরের লোকেরা নবীর চর লুটিতে আসিয়াছে। মাণিকের বাড়া ভাত তেমনি পড়িয়া রহিল, কাদেরের তামাক খাওয়া বন্ধ হইল, টেঁপার আর কড়াকিয়া মুখস্থ করা হইল না, সকলে তাড়াতাড়ি হাতিয়ার লইয়া প্রস্তুত হইয়া উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। চারিদিকে ঘুরঘট্টি অন্ধকার, অনতিদূরে মাঝে মাঝে মশালের আলো দেখা যাইতেছে গোলমাল চারিদিকেই, মাণিক ও কাদের ঠাহর করিতে পারিল না কোন দিকে যাইবে।

আগেই বলিয়াছি রাত্রি তখন অনেক। নবীর চরের প্রায় সব লোকই তখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্ম কেহই প্রস্তুত ছিল না। তাহারা শত্রুকে বাধা দিতে পারিল না। গোলমাল ক্রমশঃ মাণিকের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল। দেখিতে দেখিতে বিভিন্ন দিকে কয়েকখানি চালাঘর জ্বলিয়া উঠিল। টেঁপার মাতা টেঁপাকে লইয়া কশাড়বনের ভিতর লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে অনেকক্ষণ হইতে তাহাকে ধরিয়া টানাটানি করিতেছিল, কিন্তু টেঁপার মনের ভিতর বোধ হয় তখন পুরুষত্বের গর্ব্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল, সে কোনক্রমেই পলায়ন করিতে রাজী হইল না। দেখিতে দেখিতে শত্রুরা মাণিকের বাটীতে আসিয়া পৌছিল তখন তাহার আর কিছুই রক্ষা পাইল না। টেঁপা এক ঘা লাঠী খাইয়াই হুমড়ী খাইয়া সেই যে উঠানের একপাশে যাইয়া ছিটকাইয়া পড়িল আর উঠিল না। মাণিক ও কাদেরকে তাহারা পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া নির্দ্দম করিয়া প্রহার করিল, ঘরের জিনিসপত্র লইয়া যাইবার মত যাহা কিছু পাইল লুঠিয়া লইল, বাকী সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তচনচ করিয়া ফেলিল, সর্ব্বশেষ সব কয়খানি ঘরে আগুন ধরাইয়া দিল।

তাহারা কার্য্য শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সহসা তাহাদের মধ্যে একজন টেঁপাকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"দেখ দেখ, ছোড়াটা কাবার হয়ে গেল নাকি?" টেঁপার মাতা মাণিক ও কাদেরের দুর্দ্দশার প্রতি দৃক্‌পাতও করে নাই, টেঁপা আহত হওয়া মাত্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার চৈতন্ত সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছিল। আততায়ীরা দেখিল লাস ফেলিয়া যাওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। তাহারা মাতার কোল হইতে টেঁপাকে ছিনাইয়া আনিতে গেল—টেঁপার মাতা রুখিয়া দাঁড়াইল। শত্রুরা নারী বলিয়া

তাহাকে কিছুমাত্র রেহাই করিল না, তাহার উপরও এক ঘা লাঠী পড়িল, তাহার চোখের সম্মুখে পৃথিবীটা ঘুরিয়া উঠিল, তারপর সব অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার আর বাধা দিবার শক্তি রহিল না, আততায়ীরা টেঁপাকে লইয়া চলিয়া গেল।

বাকী রাতটুকু যে নবীর চরে কেমন করিয়া কাটিল তাহা ভাষায় বুঝাইবার নয়। অবশ্য রাত প্রত্যহ যেমন করিয়া পোহায় সেদিনও যথাসময়ে তেমনি পোহাইল কিন্তু তথাকার অধিবাসীরা অন্যদিন এ সময় যাহা করে আজ তাহা করিতেছিল না। সকাল হইলে দেখা গেল নবীর চরের আর সে শ্রী নাই, গ্রামের অধিকাংশ বাড়ী ঘর বিধ্বস্ত, কয়েকখানি একেবারে ভস্মীভূত; অধিকাংশ লোক আহত—কাহারও আঘাত সামান্য, কাহারও আঘাত বা গুরুতর; স্ত্রীলোকেরা বেশীর ভাগ কশাড় বনে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছে, কেহ কেহ বা আহত অবস্থায় এখানে সেখানে পড়িয়া আছে; জিনিষপত্র কতক কোথায় চলিয়া গিয়াছে কোন সন্ধান নাই, বাকী সব ভাঙ্গাচুরা, অর্দ্ধদগ্ধ অবস্থায় ইতস্ততঃ পড়িয়া আছে। শুধু কোন অনিষ্ট হয় নাই করিমের। আততায়ীরা তাহার ঘরের দ্বার বাহির হইতে আবদ্ধ করিয়া পিতাপুত্রীকে বন্দী করিয়া রাখিয়া গিয়াছে মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি করিম এক সময়ে তে-মোহনার চরে বাস করিত তথাকার বয়স্ক ব্যক্তিরা সকলেই তাহার পরিচিত। হাজার হোক একটা চক্ষুলজ্জা আছে তো।

টেঁপার মাতা চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া টেঁপাকে সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইল না। তখন সে যেন কেমন একরকম হইয়া গেল। সে কাহারও সহিত কোন কথা কহিল না, মাণিক ও কাদেরের শুশ্রূষার কোন উদ্যম করিল না, কিম্বা তাহার নষ্ট সংসার গুছাইয়া তুলিবারও কোন চেষ্টা করিল না, শুধু একস্থানে চুপ করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল।

* * * *

করিমও তাহার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটুকু সম্ভব গ্রামবাসী-দিগকে সহায়তা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে কয়জন লোক অপেক্ষাকৃত কার্য্যক্ষম ছিল তাহাদিগকে লইয়া সে একটা ছোটখাট দল বাঁধিয়া বাড়ী বাড়ী যাইয়া আহতদের শুশ্রূষা করিতে লাগিল এবং যাহাদের মাথা রাখিবার ঠাঁই ছিল না তাহাদের জন্য কোনপ্রকারে দুই একটা চালা খাড়া করিয়া দিল। এদিকে পীনা পিতার উপদেশে হেঁসেলে যাইয়া ভাত রাঁধিতে বসিল। তাহাদের ঘরে চাউল ছিল। সে ক্রমাগত ভাত রাঁধিতে লাগিল আর তাহার পিতা গ্রামের লোককে ডাকিয়া খাওয়াইতে লাগিল। যাহারা আসিতে পারিল তাহারা তাহাদের উঠানে বসিয়া আহার করিল আর যাহারা পারিল না তাহাদের ভাত বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইল। আহারের উপকরণ ছিল শুধু নুন আর লঙ্কা।

(ক্রমশঃ)

কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস

[শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী]

সচিত্র শিশিরে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "কবিকুল চূড়ামণি কালিদাস" শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে মহাকবির প্রতিভা বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া বড় সুখী হইলাম। প্রবন্ধের মধ্যে তিনি অনেক সত্য প্রকাশ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন ইহাতে ভুল নাই। আমি মহাকবি সম্বন্ধে দুই একটী সত্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার সহায়তা করিতেছি।

আমাদের একটা ধারণাও তাহাই বদ্ধসংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, হয় কালিদাস সম্বৎপ্রচারক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময় প্রাদুর্ভূত হ'ন নয় খ্রীষ্টাব্দের ৫০০ হইতে ৫২৪ বৎসরের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন !! ইউরোপীয় লেখক-গণ ইহার পথপ্রদর্শক এবং আমাদের এমনি বিবেকমূঢ়তা যে তাহাই বেদবাক্যরূপে নির্ব্বিচারে অনুসরণ করিয়া যাইতেছি! মহাকবি তাঁহার কাব্য ও নাটকে তাঁহার সময় তাঁহার স্বভাব চরিত্রের আভাষ রাখিয়া গিয়াছেন। একবার তন্ময় হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া বিচারপূর্ব্বক সেগুলি পাঠ করিলে অজ্ঞ ব্যক্তিও তাহা জানিতে সমর্থ হইবে, পণ্ডিতের ত কথাই নাই।

মহাকবির জীবন উজ্জয়িনীপতি মহারাজ ভর্ত্তৃহরির জীবনের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। মহাকবি ভর্ত্তৃহরির শিক্ষাগুরু, হিতৈষী বন্ধু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। ভর্ত্তৃহরি উজ্জয়িনী রাজধানীর সম্রাট্। বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি তাঁর সামন্ত ভূপতি। বর্ত্তমান সম্বতের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে ভর্ত্তৃহরি জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হ'ন। তিনি ১৪ বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া প্রিয় মহিষীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুন্ন হইয়া রাজ্যত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

মহাকবি কালিদাস মগধবাসী ছিলেন। তিনি বিদ্যা-শিক্ষার পর দারপরিগ্রহনান্তর জীবিকার্জ্জন চেষ্টায় দেশভ্রমণে বহির্গত হ'ন। অবন্তিরাজের সভায় উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তাঁহার পুত্র ভর্ত্তৃহরির গুরুপদে বরণ করেন। বালক ভর্ত্তৃহরি উজ্জয়িনীতে থাকিতেন না, কোন কারণবশতঃ ভৃগুবংশীয়গণের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেন। মহাকবিও তাঁহার সহিত সেইস্থানেই থাকিতেন। এইস্থানেই অবস্থিতি-কালে মহাকবি কিশোর ভর্ত্তৃহরির চিত্তবিনোদনার্থ মেঘদূত রচনা করেন। কুবের-অনুচর যক্ষের বিরহ বর্ণনচ্ছলে মহাকবি নিজ প্রবাস কাহিনীই বর্ণন করিয়াছেন। ইহাতে মহাকবি সুন্দর ছন্দ নির্ব্বাচনান্তর যে চিত্তাকর্ষক ভাবধারার প্রবাহ প্রবাহিত করিয়া স্বভাবোক্তি ও ভৌগোলিক সংস্থানের বর্ণন করিয়াছেন তাহা পাঠক মাত্রকেই বিমুগ্ধ করে। ইহাতে তিনি নিজ সময়ের ঋতু নির্দ্দেশ করিতেও ভোলেন নাই, তাহাই যে তাঁহার যথার্থ সময় নিরূপণের শ্রেষ্ঠ উপজীব্য। তিনি লিখিয়াছেন "প্রত্যাসন্নে নভসি দিবসে মেঘমালোক্য-সানুং" ১ অর্থাৎ শ্রাবন মাস পড়িতেই পর্ব্বতের গায়ে মেঘ দেখিয়া—আবার গ্রন্থ শেষে লিখিয়াছেন যে যক্ষ চারমাস পরে শারদীয়া পূর্ণিমার রজনী প্রিয়ার সহিত প্রবাসের দুঃখ বর্ণন করিয়া উপভোগ করিবেন। এই লিখনভঙ্গির দ্বারা বুঝা যায় যে কালিদাসের সময় আষাঢ় পূর্ণিমায় গ্রীষ্মের অবসান হইয়া শ্রাবণের কৃষ্ণা প্রতিপদে বর্ষারম্ভ হইত অথবা মাস পূর্ণিমান্তরূপে গণিত হইত। রামায়ণের আরণ্য ও কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের ঋতু বর্ণন, মহাভারত বর্ণপর্ব্বস্থ মার্কণ্ডেয় সমস্যার ঋতুবর্ণন ও বর্ত্তমান মনু স্মৃতির উপাকর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট ঋতুর দ্বারাও সেইভাবের উপলব্ধি হয়। অথচ বেদাঙ্গ জ্যোতিষ লেখক মহাত্মালগধ দৃগ্‌গণিত ঐক্য দ্বারা নিরূপিত করিয়া গিয়াছেন যে পৌষ অমাবস্যায় দক্ষিণায়ণ শেষ হইয়া

১ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" পাঠটী প্রামাদিকঃ। উহা দাক্ষিণাত্যের পাঠ। প্রাচীন টীকাকার বল্লভ পণ্ডিত—প্রত্যাসন্নেনভসি পাঠ ধরিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

মাঘ শুক্ল প্রতিপদে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত অথবা ধনিষ্ঠার আদিতে উত্তরায়ণ ও অশ্লেষার অর্দ্ধ হইতে দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইত এবং চিরকাল তাহা মাঘ ও শ্রাবণ মাসে সংঘটিত হইত।১ মহাভারতে বিরাট পর্ব্বে মহাত্মা ভীষ্মদেব দুর্য্যোধনের ভ্রম নিরাকরণার্থে নক্ষত্র চক্রের গতির যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষেরই প্রতিধ্বনি রহিয়াছে। এইসকল বিরোধ দেখিয়া পাঠক হয়তো বিভ্রান্ত হইবেন; কিন্তু একটু চিন্তা করিলেই এই বিরোধের সমাধান হইবে। কবি প্রচলিত রীতি নীতি দেখিয়া তাঁহার কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেন; সুতরাং তাঁহার সময় ঋতুর নির্দ্দেশ যেরূপ পূর্ব্ব পরম্পরায় চলিয়া আসিয়াছিল তিনি তাই প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যোতিষী তো সেরূপ করিতে পারেন না; তাঁকে ঠিক নক্ষত্রের সহিত ঠিক ঋতুর নির্দ্দেশ করিতে হইবে কারণ তাঁহার যাথার্থ্যের উপরই বৈদিক ক্রিয়াকলাপ—যাত্রারম্ভ, বিষুব একাষ্টকা প্রভৃতি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ইহার দ্বারা আর একটী সত্য প্রকাশিত হইল যে মহাত্মা লগধ রামায়ণের ঋতুবর্ণন লেখক মার্কণ্ডেয় মুনি ও ভৃগুদেবের অব্যবহিত পরবর্ত্তী ছিলেন। লগধ ইংরাজ জ্যোতিষী ডেবিসের মতে খৃষ্টাব্দের ১৩৯১ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হন।

এরূপ অবস্থায় কালিদাসের নির্দ্দেশও যথার্থ নহে—তিনি প্রাচীন প্রথারই অনুবর্ত্তনকারী। উহা মহাপণ্ডিত চাণক্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়। চাণক্য লোককে শিক্ষা দিতেন যে অসম্ভব দৃশ্য প্রত্যক্ষ দেখলেও লোকের নিকট প্রকাশ করিবে না—যেমন বানরের গীত গাওয়া ও পাথরের জলে ভাসা;২ অথচ বেদের নিকট তাঁর সকল আত্মিক বল কুণ্ঠ হয়ে গেল। তিনি ন্যায়দর্শনের বাৎসায়ণ ভাষ্যে বেদকে অপৌরুষেয়ও অনাদি বলিয়াছেন!!! অথচ মহর্ষি গৌতম বেদকে ঈশ্বর বচন স্বীকার করিলেও অপ্রামাণ্য বলিয়াছেন কিন্তু আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় উহাকে ঋষি বচন ধরিয়াই শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত স্বীকার করিয়াছেন সুতরাং এস্থলে ভাষ্যকার সূত্রকার মহর্ষির বিরুদ্ধে যাইতেছেন। যাহা হউক চাণক্যের নিকট যখন বেদ অনাদি তখন তার অঙ্গ জ্যোতিষও অনাদি সুতরাং তিনি তার আমাবস্যা তিথির পূর্ণিমার সংস্কার করিয়া মাঘ শ্রাবণ মাসের সংস্কারে আর সাহসী হইলেন না। তাই কালিদাসের সময়ও তাহাই প্রবহমাণ থাকে।

কালিদাসের সময় যে পূর্ণিমান্ত মানই প্রচলিত ছিল তাহার পরোক্ষ আভাবও তিনি রঘুবংশে দিয়াছেন। দিলীপ সুদক্ষিণার সহিত রথারোহণ করিয়া বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিতেছেন। মহাকবি যুগলমূর্ত্তির শোভা শীতনির্মুক্ত বসন্তকালের চিত্রাযুক্ত পূর্ণচন্দ্রোদয়ের সহিত তুলিত করিয়াছেন।৩ এস্থলে পূর্ণচন্দ্রের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও উহা যে পূর্ণ তাহার সন্দেহ নাই কারণ প্রতিপদের চন্দ্রের সম্পূর্ণ দর্শনাভাব সুতরাং একটী দৃষ্ট ও অন্যটী অদৃষ্ট এরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ দুটী বস্তুর উপমা হইতে পারে না—মহাকবি তো সেরূপ উপমা দিতেই পারেন না কাজেই মহাকবির সময়ে যে চিত্রাযুক্ত পূর্ণিমায় শিশির ঋতুর অবসান হইয়া বসন্ত ঋতুর বিষুব আরম্ভ হইত অথবা ইহারই একমাস পরে অর্থাৎ বিশাখাযুক্ত পূর্ণিমায় বা বৈশাখী পূর্ণিমায় বসন্ত ঋতুর অবসান ঘটিত ইহা স্বীকার না করিয়া আর গত্যন্তর নাই। সুতরাং ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে তাহার দুইমাস পরে অর্থাৎ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গ্রীষ্মের অবসান হইয়া শ্রাবণ কৃষ্ণ প্রতিপদে বর্ষা বা দক্ষিণায়ণ আরম্ভ হইত। ইহা ভ্রমযুক্ত গণনা ও ভ্রান্ত প্রথা, কিন্তু শিষ্টসম্মত বলিয়া বহুকাল যাবৎ প্রবহমাণ থাকে। তাহাই মহা জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট কালিদাসের ৬০০ বৎসর পরে সংশোধন করেন। আমাদের সময়ের নিরয়ণ গণনাও অযথার্থ অথচ বরাহের আদেশমত আমরাও তাহা অনুসরণ করিয়া আসিতেছি! ইহারও সংস্কার হওয়া একান্ত বিধেয়।

মহাকবির দ্বিতীয় গ্রন্থ বিক্রমোর্ব্বশী। ইহাতে পুরুরবা ও উর্ব্বশীর প্রণয় ব্যাপার বর্ণিত। ইহা ভর্তৃহরির বিবাহ ও

১ প্রবিষ্ঠাদৌপ্রপদ্যেতে সূর্য্যাচন্দ্রামসাবুদক্। সার্পার্দ্ধে দক্ষিণার্কস্তু মাঘশ্রাবণয়োঃ সদা। বেদাঙ্গ জ্যোতিষ।

২ অসম্ভবং ন বক্তব্যং প্রত্যক্ষমপি দর্শিতম্। শিলা তরতি পানীয়ং গীতং গায়ন্তি বানরাঃ।

৩ তদপ্রামাণ্য সনৃতব্যাঘাত পুনরুক্তি দোষেভ্যঃ। আয়ুর্ব্বেদবদৃষি বচনাৎ প্রামাণ্যং। ন্যায়দর্শন।

রাজ্যাভিষেক কালে রচিত হয়। পুরুরবা পুত্র আয়ু ভর্তৃহরি স্বয়ং তিনি ভৃগু আশ্রমে বাস করিতেন। ভৃগু আশ্রম জব্বলপুরের ১৩ মাইল দক্ষিণ, মীরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে নর্মদার চতুঃপার্শ্বস্থ সংলগ্ন ভূমি ভৃগুক্ষেত্র বা বর্ত্তমান "ভেড়াঘাট"। এই স্থানেই নর্মদার "ধুয়াধার" নামক জলপ্রপাত অবস্থিত। ইহার দ্বারা মহাকবি দম্পতিকে পরস্পরের প্রতি তন্ময় ভাবের উপদেশচ্ছলে পুরুরবার উর্বশীকে অন্বেষণে হৃদয় ব্যথা প্রাচীন গীতে বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যাবর্ত্তের কবিগণ যুবরাজের বিবাহ ও অভিষেক কালে আদিরস ঘটিত কথাবস্তুর বর্ণন করিতেন। বিক্রমোর্বশী তাহার প্রাচীন নিদর্শন। বোধ হয় শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকও তাই—আর্য্যক ভূপতির অভিষেক কালে উহা রচিত হয়। এই প্রাচীন প্রথার আধুনিক দৃষ্টান্ত একমাত্র লক্ষ্মণসেন নামক বঙ্গাধিপের সময় পাওয়া যায়। তিনি ১০৩০ শক মাঘ মাসে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হ'ন। তিনি মিথিলার নান্যদেবের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থে তাঁর পঞ্চ সভাসদের মধ্যে ধোয়ী পবনদূতে তাঁর প্রতি কলিঙ্গাধিপের কন্যার আসক্তি বর্ণন করিয়াছেন। গোবর্দ্ধনাচার্য্য আর্য্যাসপ্তশতীতে নায়ক নায়িকার কথা বর্ণন করেন এবং সেন ভূপতিকেই এইরূপ সৎসাহিত্যের পৃষ্ঠ পোষক বলেন। জয়দেব তাঁর অমর গীতকাব্যে গীত-গোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় বর্ণন করিয়া রাজার চিত্ত প্রসন্ন করেন।

মহাকবির তৃতীয় গ্রন্থ কুমার সম্ভব। ইহার দ্বারা মহাকবি দম্পতীকে সংযম শিক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। সংযমের পর বিষয় ভোগ নির্ম্মল ও আনন্দবর্দ্ধক হয়—উমা শঙ্করের চরিত্র বর্ণন দ্বারা মহাকবি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

মহাকবির চতুর্থ গ্রন্থ শকুন্তলা। ইহাতে কবি হিন্দুর পবিত্র গৃহের ছবি আঁকিয়াছেন। তাহাতে সকলকেই ত্যাগের মর্য্যাদা রাখিয়া কাজ করিতে হইত। জীবজন্তু, বৃক্ষলতা সকল প্রাণীর প্রতি দয়া শিক্ষা দেওয়া হইত। ভারতে নারী জাতির প্রতি যদবধি কঠোর ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে তখন হইতেই ভারতের অধঃপতন ঘটিয়াছে। কালিদাসের সময় কন্যা গৃহের অলঙ্কার ছিলেন, তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন, যৌবন সময়ে তাঁর বিবাহ হইত—গৌরী দানের কপট বচন তখন প্রচলিত ছিল না। গৃহী যে কন্যাকে কিরূপ স্নেহ করিতেন তাহা মহাকবি শকুন্তলার পতিগৃহে বিদায় কালে কণ্বমুনির ছলছল চোখ, জড়তাপূর্ণ অস্পষ্ট ভাষা ও হৃদয়ের উৎকণ্ঠার দ্বারা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

এই চারখানি গ্রন্থের রচনা ভর্তৃহরির রাজ্যকালেই হয়। তাঁর শেষ গ্রন্থ রঘুবংশ। উহা ভর্তৃহরির সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাকবির নিবাসভূমি মগধে অবস্থিতিকালে রচিত হয়। তখন মগধে পরন্তপ নামা কোন ব্রাহ্মণ নৃপতি রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। খুব সম্ভব রঘুবংশ ৫৬ সম্বতে রচিত হয়।

এই পাঁচখানি গ্রন্থ ব্যতিরেকে মহাকবি অন্য কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মালবিকাগ্নিমিত্র, ঋতুসংহার ও শ্রুতবোধ দ্বিতীয় কালিদাসের রচনা। ইনি কান্যকুব্জের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যের মধ্যকালে প্রাদুর্ভূত হন। উদ্ভট শ্লোকে ভবভূতি কালিদাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা শুনা যায়—"কবীনাং কালিদাসাদ্যা ভবভূতিমহাকবিঃ। তরবঃ শাল-তালাদ্যা স্নুহিবৃক্ষমহাতরুঃ॥" দ্বিতীয় কালিদাস নিজ পুরুষকারের প্রভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন ইহা সর্ব্বথা প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন বিষয়ের অতিশয় ভাল নহে। গ্রন্থ শেষে তিনি লিখিয়াছেন অগ্নিমিত্র দেশ শাসন করিতে থাকিলে ঈতির উপদ্রব হইবার কোন সম্ভাবনা নাই!!—যেন প্রাকৃতিক উৎপাত নিবারণ মানুষের সাধ্যায়ত্ত। যে মানুষ বৃষ্টিপাত, মেঘনির্ঘোষ, অশনি-সম্পাত প্রতিরোধ করিতে পারে না তার অহঙ্কারের দৃপ্ত কথা বলা সাজে না। ইহা বলিয়া কবি আপনাকে খাটো করিয়াছেন—তিনি যে অপরিণত যুবা তাহার আভাষ দিয়াছেন। তিনি হয়তো পাতঞ্জল মহাভাষ্য পাঠ শেষ করিয়াই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন; তাতে এক স্থানে উদাহরণ স্বরূপে লিখিত আছে "পুষ্যমিত্রং যাজয়ামি"। এই মাত্র দেখিয়া তাঁর পুত্র বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের কল্পনা করা হইয়াছে। আবার নর্মদার তটভূমিতে তাঁর পুত্র বসুমিত্রের যবনবিজয়ও কল্পিত হইয়াছে। এসকল দেশ কাল বিপর্য্যয় ও অনৈতিহাসিক কথা—কারণ পাতঞ্জলি "যবনা অরুণৎ সাকেতং" "যবনা অরুণৎ মাধ্যমিকান্" এইরূপ লঙ অতীত-কালের উদাহরণও দিয়াছেন সুতরাং এগুলি যে তিনি প্রত্যক্ষ

করিয়াছিলেন তাহার ভুল নাই। তারপর সাকেত অর্থে অযোধ্যা উহা আর্য্যাবর্ত্তে ও নর্ম্মদার তট দাক্ষিণাত্যে অথবা বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে। যদি যবন প্রতিরোধ হয়ে থাকে তাহা হইলে তাহা আর্য্যাবর্ত্তেই হওয়া সম্ভব। বেদান্তভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যও একজন অগ্নিমিত্রের কথা লিখিয়াছেন খুবসম্ভব এই অগ্নিমিত্রই দ্বিতীয় কালিদাসের নায়ক ও পৃষ্ঠপোষক বিদিশাপতি অগ্নিমিত্ররূপে কল্পিত হইয়াছেন। পাণিনির জনৈক টীকাকার হরদত্ত মিশ্রের কথা শুনা যায় তাঁর গ্রন্থের নাম পদমঞ্জরী। এই দ্বিতীয় কালিদাস এঁকে মালবিকার অঙ্গ শিক্ষকের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থকে প্রাচীনতামণ্ডিত করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন কিন্তু পারেন নাই। যিনি নিবিষ্টচিত্তে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারিবেন যে ইহা মহাকবি কালিদাসের চিত্তপ্রসূত নহে। গ্রন্থারম্ভে নান্দীশ্লোকই প্রথমে পাঠকের মনে শঙ্কা আনয়ন করে। যে মহাকবি ভগবান শঙ্করকে ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তরূপে পঞ্চ মহাভূত জীবাত্মা প্রভৃতি অষ্ট মূর্ত্তিভাবে জ্ঞাত হইয়া মোক্ষ প্রার্থনা করিতেন সেই শঙ্কর দ্বিতীয় কালিদাসের নিকট যোগী শ্রেষ্ঠমাত্র বিভূতি বিভূষিত হলেও তাঁর অহঙ্কার নাই !! তাঁর নিকট তিনি চিত্তের অন্ধকার শান্তিরই প্রার্থনা করিয়াছেন। যেন শঙ্করে তাঁর আন্তরিক ভক্তি নাই চিরাগত প্রথাবলেই তাহা পালন করিতে হইয়াছে। তারপর মহাকবি বিক্রমোর্ব্বশীর রচনাকালে রাজা শিষ্টসমাজ ও জন সাধারণের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাই তিনি বেশ জানিতেন যে তাঁহারা তাঁর গ্রন্থের অভিনয়ে দাক্ষিণ্য গুণেই প্রদর্শন করিবেন প্রস্তাবনায় একথা বর্ণিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু দ্বিতীয় কালিদাস পারিপার্শ্বিকের মুখে নব কবি তাঁর নিজের প্রতি ভাস সৌমিল্ল প্রভৃতি কবিপুত্রগণের খ্যাতি তুলনা করিয়া আক্ষেপ তুলিয়াছেন। ইহার দ্বারা আভাসে জানাইয়াছেন যে তিনি ঐ কবিদ্বয়ের পরভবিক। মম্মটের কাব্য প্রকাশের টীকাকার লিখিয়াছেন যে সৌমিল্ল কবি শ্রীহর্ষের নিকট অর্থ গ্রহণ করিয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ভাসের স্বপ্ন বাসবদত্তা ও শ্রীহর্ষে রত্নাবলীর কথা বস্তুপ্রায় এক। উভয় গ্রন্থেই বৎসরাজ উদয়নের চরিত্র ও প্রণয় কাহিনী বর্ণিত। ইহাতে বোধ হয় ভাসই রত্নাবলীর রচয়িতা—তিনিও অর্থগ্রহণ করিয়াই উহা রচনা করেন—রত্নাবলীতে যেরূপ কবির আত্মপ্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে উহা কখন কেহ নিজে বর্ণণ করিতে পারে না।

ভাসের কথা হর্ষচরিতের প্রস্তাবনায় বাণভট্ট প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন। আবার চোর কবির কথাও লিখিয়াছেন—তিনি নির্ণামা থাকিয়া শিষ্ট সমাজের নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। এই দুই কথা ভিন্ন ভিন্ন স্থলে কথিত হইলেও একটী অপরের সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ ভাসই চোর কবি—তিনি তাঁর নাটকে নিজ নামের উল্লেখ করেন নাই। তিনি প্রাচীন কবিগণের কথা ও বচন বিনা কৃতজ্ঞতায় অপহরণ করিয়াছেন। এই কারণে তিনিও শিষ্ট সমাজে ধিকৃত হইয়া আছেন। কবি রাজশেখর লিখিয়া গিয়াছেন যে স্বপ্ন বাসবদত্তা ব্যতীত তাঁর সকল নাটক অগ্নিসাৎ করা হয়। অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ না হলে কবির গ্রন্থ কোন ধার্ম্মিক নৃপতি অগ্নিদাহের আদেশ করিতে পারেন না। সম্প্রতি কোলাপুরের রাজ গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ গণপতি শাস্ত্রী ভাসের সকল লুপ্ত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া জগতের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন কিন্তু তিনি ভাসকে বাড়াইতে গিয়া ইংরাজী সংস্কৃত মুখবন্ধে মহাকবি কালিদাস, শূদ্রক, চাণক্য প্রভৃতি কবিগণকে অপদস্থ করিয়া বড় অন্যায় কাজ করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসকে ভাসের বচন অপহারক বলিয়াছেন। ভাস কর্ণভার নামক একাঙ্ক নাটকে ইন্দ্রের প্রশংসায় বিশেষণরূপে লিখিয়াছেন—"ঐরাবতাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলিঃ" এই বচনটী মহাকবি রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবেও ব্যবহৃত করিয়াছেন। এইমাত্র দেখিয়াই গণপতি শাস্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে কালিদাস ভাস হইতে এই বচন অপহরণ করিয়াছেন! তিনি না বুঝিতে পারিয়া এরূপ ভ্রম করিয়াছেন না ইহা তাঁর ইচ্ছাকৃত অভিমত তাহা তিনিই জানেন। তবে তিনি যে অনেক পাঠককে বিবেকবিমূঢ় করিয়া দিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই—তাঁহারাও ভাবিতে শিখিয়াছেন যে ভাস সত্যসত্যই মহাকবির পূর্ব্বভবিক অথবা মালবিকাগ্নিমিত্র মহাকবিরই রচনা। মহাকবির প্রয়োগ বড় সুন্দর, তিনি এই পদটী ভুজ বা হস্তের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত করিয়াছেন এবং ইহাই যে সঙ্গত তাহারও সন্দেহ নাই। কারণ প্রত্যঙ্গের নিকট অঙ্গের

সহিতই সম্বন্ধ রাখিয়া প্রয়োগই স্বাভাবিক ও সঙ্গতিযুক্ত দেখায়—গোটা মানুষের বিশেষণরূপে প্রত্যঙ্গের ব্যবহার অপপ্রয়োগ বলিয়া বোধ হয়. ১ অপহারক ভাস নিজে—তিনি পদটী গ্রহণ করিয়া পরিপাক করিতে না পারিয়া অপপ্রয়োগরূপে উদ্‌গার করিয়াছেন। মহাকবি এরূপ করেন নাই, করিতে পারেন না। রঘু ও কুমারে তিনি অন্য অন্য স্থলেও এইরূপ ভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন—কুশক্ষতাঙ্গুলি হস্ত দ্বারা উমা অক্ষসূত্র ধারণ করিতেন। ইন্দ্র মহাদেবের চরণে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া প্রস্ফুটিত মন্দার কুসুমের পরাগ দ্বারা তাঁর পদাঙ্গুলি অরুণ রাগে রঞ্জিত করিয়া দেন। ২ পরশুধারের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ দেখিয়া যদি ব্যথিত হইয়া থাক তাহালে বৃথাই জ্যাকর্ষণে কঠিন অঙ্গুলি ধারণ করিতেছে। তাহার দ্বারাই প্রণামাঞ্জলি বদ্ধ কর। ৩ তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে কালিদাস চোর নন চোর ভাসই।

ভাস বাণভট্টের বয়োজ্যেষ্ঠ সমসাময়িক কবি। বাণ বড় বিনয়ী কবি ছিলেন—তিনি রূঢ়ভাবে কাহাকেও কথা বলিতে পারিতেন না, তাঁর হর্ষচরিতে তিনি তাঁর এই গুণের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। এই কারণেই ভাসের প্রতিও স্পষ্টভাবে কিছু বলেন নাই। বাণ, ভবভূতি, কুমারিল, দণ্ডী মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। ভাস শঙ্করাচার্য্য দ্রাবিড় ছিলেন। মেধাতিথি মালব দেশের ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় কালিদাস খুব সম্ভব দ্রাবিড় বা গুজরাটের লোক ছিলেন। ইঁহারা সকলেই প্রায় সমসময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

ভারতের প্রাচীন আলঙ্কারিক দণ্ডী। ইনি কাব্যাদর্শে মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলা ও শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মৃচ্ছকটিকের একটী বচন ভাসের বালচরিতে সম্পূর্ণ উদ্ধৃতদৃষ্ট হয়। ইহাই উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের উদাহরণ স্বরূপ দণ্ডী উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাতেও গণপতি শাস্ত্রী কটাক্ষ কবিতে ছাড়েন নাই। তাঁর মতে ভামহ প্রাচীন আলঙ্কারিক তিনি ভাসের বচনাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন কিন্তু মহাকবি কালিদাসের বচন তোলেন নাই!! ইহাতে প্রমাণ করিয়াছেন ভামহও মহাকবির পূর্ব্বভবিক!!! যাঁহারা মিথ্যার ভিত্তির উপর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন তাঁহারা অসম্বদ্ধ প্রগল্‌ভতা করিতে কুণ্ঠিত হ'ন না। শাস্ত্রী লিখিয়াছেন অমর টীকাকার ১০৮০ শকের লোক, সর্ব্বানন্দ ভামহ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। এস্থলেও শাস্ত্রী পাঠকের চক্ষে ধূলি দেবার চেষ্টা করিয়াছেন। সর্ব্বানন্দ দেবীবরের পিতা এঁর টীকার নাম সর্ব্বস্ব,ইহা প্রায় লুপ্ত অধুনা পাঠক সমাজে উহার বড় পঠন-পাঠন হয় না। ইনি রায় মুকুটের সমবয়সী তবে এঁর টীকা রায় মুকুটের টীকার পূর্ব্বে রচিত হয়। রায় মুকুট এঁর টীকা হইতেও মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১০৮০ শকে সিদ্ধান্ত চূড়ামণি নামে জ্যোতিষ গ্রন্থ কোন বঙ্গদেশীয় মণীষী রচনা করেন। তারই কথা সর্ব্বানন্দ বলিয়াছেন মাত্র। তাঁর কথার অনুকূল হইবে বলিয়া শাস্ত্রী তাহাই সর্ব্বানন্দের কালরূপে ধরিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। হেমচন্দ্র সূরিও অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন। ভামহ তাঁর পরবর্ত্তী। অধুনা যে বৃহৎ ভরত মুনির অলঙ্কার গ্রন্থ দেখা যায় উহা ভরত মুনির রচনা নহে—কোন দাক্ষিণাত্য বাসীর রচনা, কারণ ইহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল আলঙ্কারিকের মতের আভাস পাওয়া যায়। ভরতমুনি মহাকবি কালিদাসের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হ'ন—এঁর চেষ্টাতেই নাটক ও কাব্যে বিয়োগান্তভাব রহিত হয়। এঁর সময়েই পৌলস্ত্যবধ নাম পরিত্যক্ত হয় ও তাহার রামায়ণ নামকরণ হয় এবং সীতাদেবীকেও অক্ষত শরীরে চিতা হইতে উদ্ধার করা হয়।

দ্বিতীয় কালিদাস মহাকবির কুমারসম্ভব, রঘুবংশ হইতে পদ ও বচন ব্যবহৃত করিয়াছেন—ইহ পাঠকের বিবেককে বিমূঢ় করিবার যে অভিসন্ধি তার ভুল নাই। ইহাতে

---

১ হরেঃ কুমারোঽপি কুমারবিক্রমঃ সুরদ্বিপাস্ফালনকর্কশাঙ্গুলৌ।
ভুজে শচীপত্রবিশেষকাঙ্কিতে স্বনাম চিহ্নং নিচখান সায়কং॥ রঘু ৩।৫৫
ঐরাবতাস্ফালনকর্কশেন হস্তেন পস্পর্শতদঙ্গমিন্দ্রঃ॥ কুমার ৩।২২

২ কুশাঙ্কুরাদানপরিক্ষতাঙ্গুলিঃ কৃতোঽক্ষসূত্র প্রণয়ীতয়া করঃ। কুমার ৫।১১
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্র মন্দাররজোঽরুণাঙ্গুলী। কুমার ৫।৮০

৩ কাতরোঽসি যদিবোদগতার্চিষা তর্জিতঃ পরশু ধারয়া মম।
জ্যানিঘাত কঠিনাঙ্গুলির্বৃথা বধ্যতামভয়যাচনাঞ্জলিঃ॥ রঘু ১১।৭৮ এস্থলেও অঙ্গুলিযুক্ত সমাস পদটী অভয়যাচনাঞ্জলির বিশেষণরূপে প্রযুক্ত। পদ্মকোরকবৎবদ্ধকরই অঞ্জলি।

পাঠকের মনে এই ভাব হওয়া স্বাভাবিক যে উভয় কবি এক ও অভিন্ন, কিন্তু উভয়ের রীতি ও ভাব প্রয়োগ বিচার করিয়া দেখিলে পরস্পরের আকাশ পাতাল প্রভেদ লক্ষিত হইবে। কুমার রঘুর উপমার সৌন্দর্য্য ঋতু সংহারে কোথায়? আর মেঘদূতের স্বভাবোক্তির চিত্তাকর্ষণই বা উহাতে কই? প্রাচীন কবিগণ শিশির বা বসন্ত হইতে বর্ষারম্ভ করিতেন। ভর্ত্তৃহরি শৃঙ্গার শতকে প্রাচীন প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন। ঋতু সংহারে গ্রীষ্ম হইতে বর্ণন আরম্ভ করা হইয়াছে। মহাকবি সর্ব্বত্র প্রাচীন মাসের ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয় কালিদাস তাহার অনুকরণ করিতে গিয়া সামঞ্জস্য রাখিতে পারেন নাই—তাঁর অভিসন্ধি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। বর্ষায় নভস্ নভস্য দিয়া বসন্তে ফাল্গুন চৈত্র করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁর ভাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় তাঁর সময় আষাঢ়ের প্রথমে বর্ষারম্ভ হইত। আর ইহা যে তিনি জ্যোতিষী আর্য্যভট্ট বা বরাহ মিহিরের সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আর্য্যভট্ট লিখিয়াছেন তাঁর সময় চৈত্র শুক্লা প্রতিপদে ও মেষের আদিতে বাসন্তিক বিষুব সংঘটিত হইত।[১] সুতরাং তাঁর মতে তাঁর সময় শুক্লা আষাঢ়ে বর্ষারম্ভ হইত। এই মতই অনুসরণ করিয়া দাক্ষিণাত্যের টীকাকারগণ মেঘদূতের পাঠ পরিবর্ত্তন করিতে সাহসী হইয়াছেন।

পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি কালিদাসের জীবন তাঁর শিষ্য হিতৈষী বন্ধু ও আশ্রয়দাতা মহারাজ ভর্ত্তৃহরির জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট। এক্ষণে সেই ভর্ত্তৃহরির সময় নিরূপণ করিতে পারিলে কালিদাসেরও সময় নিশ্চিতভাবে নিরূপিত হইয়া যাইবে। ভারতময় একটা সর্ব্ববাদিসম্মত প্রবাদ প্রচলিত আছে যে ভর্ত্তৃহরি উজ্জয়িনীর সম্রাট সম্বৎ প্রবর্ত্তক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন—স্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতায় ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। ভারতে দুই প্রকার সম্বতের কথা অধিক শ্রুত হওয়া যায়। প্রথম ভগবান বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ সম্বৎ; দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য প্রচারিত সম্বৎ। এই শেষটীই কেবল পূর্ণ ও সাংকেতিক সং নামে অধিক প্রচলিত। মথুরা কাঙ্কালিটীলায় প্রাপ্ত কণিষ্ক, অশ্বঘোষ, বাসুদেব প্রভৃতি নৃপতিগণের শিলালেখে সং বা সম্বৎযুক্ত অব্দ দৃষ্ট হয়। ইউরোপীয়গণের মতে কণিষ্ক, বাসুদেব প্রভৃতি রাজগণ শকের পরে প্রাদুর্ভূত হন; তাহাই আমরাও বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়া সেইরূপ প্রতিধ্বনি করি! কিন্তু এ মতটী সম্পূর্ণ ভুল। যবনেশ্বর শুচিধ্বজ তাহার অকাট্য প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন। ভট্টোৎপল বড় সুন্দর বিবৃত্তিকার। তিনি ৮৮৮ শকে বরাহ মিহিরের বৃহজ্জাতক ও বৃহৎ সংহিতার টীকা লেখেন। ঐ দুইখানিতে তিনি অনেক প্রাচীন ও নব্য ফলিত জ্যোতিষীগণের বচন ও নাম উদ্ধৃত করিয়া তাঁদের চিরস্মরণীয় করিয়া দিয়া পুণ্যার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যবনেশ্বরের কথা উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে শুচিধ্বজ শক কালের পূর্ব্বেও একখানি তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। সে বচনটী ভ্রান্ত মত ও বিশ্বাস নিরকণ করিতে ব্রহ্মাস্ত্র; তাই উহা এই স্থলেই লিখিত হইল—

গতেষু সাধ্যর্দ্ধ শতেষু যুক্তং একেন কেষাং স্থ গতাব্দ সংখ্যা।
কালঃ শাকোম্নাং (১০৪৪) শ বিশোধ্য তস্মাদতীতবর্ষাদ
* যুগবর্ষ জাতং॥

(বর্ত্তমান ১৬ শকে) কোন নৃপতির ১৫১ বৎসর যে গত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত। ১০৪৪ সংখ্যা হইতে শক কাল বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই যুগাব্দ বলিয়া স্বীকৃত। শুচিধ্বজ যবন দেশের অধিপতি ছিলেন—খুব সম্ভব তিনি সম্রাট শালিবাহনের সামন্ত ভূপতি। পঞ্চনদের পুষ্পপুর বা পেশোয়ার ও তৎসংলগ্ন সীমান্ত দেশগুলি যবনগণ দ্বারা অধ্যুষিত ছিল, এই কারণে সেগুলির অধীশ্বরকে যবনেশ্বর বলিত। শুচিধ্বজ যখন তাদের রাজা তখন তথায় পূর্ব্ব নৃপতিগণের প্রচলিত অব্দ প্রবহমান ছিল। তাঁর গ্রন্থ রচনা কালে উহার ১৫১ বৎসর চলিতেছিল। শক সম্বতের অন্তর ১৩৫ বৎসর—এই বৎসর ১৫১ হইতে বাদ দিলে ১৬ বৎসর হয়, সুতরাং ঐ শকে শুচিধ্বজ তাঁর দ্বিতীয় ফলিত জ্যোতিষ গ্রন্থ রচনা করেন। পুষ্পপুর বা পেশাওয়রে মহারাজ কণিষ্ক রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁর রাজ্যাব্দ সম্বৎ বলে

১ যুগবর্ষমাসদিবসাঃসমং প্রবৃত্তাস্ত চৈত্রশুক্লাদেঃ।...(১) কালক্রিয়া
মেষাদেঃ কাতাং যবং উষরা অপমণ্ডলার্দ্ধমপথাতং।...১ গোলপাদ

প্রচলিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বাসুদেব প্রভৃতি নৃপতিগণ তাহা প্রবাহমান রাখেন তাহাই কালক্রমে বর্ত্তমান সম্বতের আকার ধারণ করে। শুচিধ্বজের সময়ে ১৫১ বৎসরটী যে মহারাজ কণিষ্কেরই রাজ্য অব্দের প্রবহমান স্বরূপ তার তিলার্দ্ধ সন্দেহ নাই কারণ ঐ অঞ্চলে অন্য কোন নৃপতির শকের পূর্ব্বে, প্রচলিত অব্দের ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। এই ব্যতিরেক প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত হইল যে কণিষ্কই সম্বৎ অব্দের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি চীন দেশের য়ুচী বংশের শক নৃপতি; প্রবাদ তাঁর উপাধি কান্নাফিস ছিল। উহার অর্থ বিক্রমশীল সূর্য্য—তাহাই বিক্রমাদিত্য রূপ ধারণ করিয়াছে।

দেশাধিপতি বলিয়াই ভর্ত্তৃহরি ও এই বিক্রমাদিত্য ভাইরূপে কথিত হইয়াছেন নতুবা উভয়ে সহোদর ছিলেন না ভর্ত্তৃহরি চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, আর ইনি শক বংশীয়। কালিদাসের সময় চন্দ্র সূর্য্যবংশীয় রাজা বর্ত্তমান ছিলেন। তারপর প্রায় ৫০০ বৎসর যাবৎ ভারতময় রাষ্ট্র বিপ্লব বর্ত্তমান থাকিয়া সেই প্রাচীন বংশদ্বয় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও নূতন নূতন ক্ষত্রিয় বংশের উদ্ভব হয়। এই বিপ্লবের সময় সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতিও রুদ্ধ হয়—এবং সনাতন আচার ব্যবহারেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। ভর্ত্তৃহরি তার শতকেও তাহার সূত্রপাঠের আভাস দিয়া দিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি বহুকাল জীবিত ছিলেন। তাঁর সন্ন্যাসের পর তাঁর পিতামাতা গতাসু হন, তাঁর বাল্যসখাগণও ভবলীলা শেষ করেন এবং তিনিও নদী-সৈকতস্থ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় সর্ব্বদা পতনের প্রতীক্ষায় যে কাল কাটাইতেছেন তার আভাস দিয়া দিয়াছেন।[১] দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় লেখকগণ বলেন ভর্ত্তৃহরি চন্দ্রগুপ্ত নামা কোন ব্রাহ্মণের চার ভার্য্যার মধ্যে শূদ্রাগর্ভজাত সন্তান—ব্রাহ্মণীর গর্ভে বররুচি, ক্ষত্রিয়ার গর্ভে বিক্রমাদিত্য, বৈশ্যার গর্ভে ভট্টি জন্মগ্রহণ করেন!!! ইহা যেমন আশ্চর্য্য তেমনি কলুষ হৃদয়ের অভিব্যক্তি সুতরাং এ মতটী সর্ব্বথা অগ্রাহ্য। হিংসুকে বরাহমিহির তাঁর বৃহৎ সংহিতায় ভর্ত্তৃহরির প্রতি কটাক্ষ করিয়া গালি দিয়াছেন, যে স্ত্রীর প্রতি সন্দেহ করে তার সুভাষিত রচনা বৃথা।[২] বৃদ্ধ বিষ্ণুশর্ম্মাও তাঁর পঞ্চতন্ত্রে বরাহের মনস্তুষ্টির জন্য দমনকের মুখে ভর্ত্তৃহরির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া দুর্জ্জন বলিয়াছেন কিন্তু উহা তাঁর আন্তরিক মনের ভাব নয় কারণ তিনি ভর্ত্তৃহরির শতক হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ভর্ত্তৃহরি রাজর্ষি ছিলেন। ভট্টিকাব্য প্রণেতা ভট্টি তাঁর প্রতি সম্মানার্থে নিজ প্রাকৃত নাম গ্রহণ করেন। পতঞ্জলির মহাভাষ্যের বাক্য ও পদের বাক্যপদীয় নামা টীকাকার ভর্ত্তৃহরি ও আপনাকে রাজর্ষির সম্মানার্থে মাত্র 'হরি' নামেই প্রচারিত করেন। টীকাকার কৈয়ট ইঁহাকে হরি বলিয়া সম্মানিত করিয়া গিয়াছেন। ভট্টি বল্লভীপতি শ্রীধর সেনের পোষ্য ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৫১৯ হইতে ৫৩৫ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। শেষে পারস্য অধিপতি নৌশেরখাঁ খুঁসরো বল্লভী ধ্বংস করে ও রাজা নিহত হ'ন। নৌশের খাঁ বরাহকে পারস্যে লইয়া যায়। সেস্থলে তিনি তাহার মন্ত্রী হ'ন ও "চুজুর্গ যে মেহের" নামে পরিচিত হ'ন। বরাহের চেষ্টাতেই বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র পারস্য বা প্রাচীন পহলবী ভাষায় অনুবাদিত হয় উহা পারস্যে "কলীলদিমনা" বলে পরিচিত। চীন পরিব্রাজক ইৎসীন ৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আগমন করেন। ম্যাক্সমূলর বলেন ইনি লিখিয়া গিয়াছেন তাঁর ভারত আগমনের ৪০ বৎসর পূর্ব্বে বাক্যপদীয়কার ভর্ত্তৃহরি দেহত্যাগ করেন। সমকালবর্ত্তী মেধাতিথি ভর্ত্তৃহরির বাক্যপদীয় হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কালিদাস সুকবি, পুণ্যশীল ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বাংলায় তাঁর নামে মূর্খ ও লম্পট বলিয়া অখ্যাতি আছে, উহা সর্ব্বৈব কল্পনা ও মিথ্যাকথা—উহা অসৎ হৃদয়ের প্রচারিত গল্প। কালিদাস পশুহনন ভালবাসিতেন না এবং কেহ তাহা করে

---

১ বয়ং যেভ্যো জাতাশ্চির পরিগতা এব খলুতে, সমং যৈঃ সংবৃদ্ধা স্মৃতি
বিষয়তাংতেহপিগমিতাঃ।
ইদানীং এতেস্ম প্রতিদিবসমাসন্ন পতনাদ্ গতাস্তুল্যাবস্থাং বিকতিল
নদীতীরতরুভিঃ। বৈরাগ্যশতক

২ যেহপ্যঙ্গনানাং প্রবদন্তি দোষান্ বৈরাগ্য মার্গেন গুনান বিহায়।
তে দুর্জ্জনা মে মনসো বিতর্কঃ সদ্ভাব বাক্যানি নতানি তেষাং॥
বৃহৎসংহিতা ৭৪।৫

তাহাও দেখিতে পারিতেন না। দুষ্মন্ত অনুসৃত মৃগকে তাপসগণের মধ্যবর্ত্তিতায় দ্বারা রক্ষা করেন। ধীবরের মুখে পশুহত্যার নিষ্ঠুরতার কথা জ্ঞাপন করেন। অশ্বমেধীয় ঘোটককে ইন্দ্রের মধ্যস্থায় রক্ষা করেন। আবার দশরথকে করুণাবিষ্ট করিয়া শাবক মাতা হরিণীর প্রাণরক্ষা করেন। কালিদাসের শিষ্য ভর্ত্তৃহরিও গুরুর সকল গুণই লাভ করিয়াছিলেন।

কালিদাস সম্বন্ধে আরো সত্য লিখিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বৃদ্ধ আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে অধিক কুলাইবে না। তাই এই স্থানেই নিরস্ত হইলাম।

প্রিয়তম

[শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

আমারি সে প্রিয়তম,
কোন গুণ থাক বা না থাক
আমি তবু তারে ভালবাসি,
জগতের মাঝে তার দীপ্তি উজলিতে নাহি পাক,
আলো দেয় মোরে রাশি রাশি।
হোক না কুরূপ অতি—তবু সে আমারই প্রিয়,
লোকে যারে করে ঘৃণা,—মোর কাছে রমণীয়,
আমার প্রাণের পূজা একেলা সেই তো পায়
মোর মুখে সে ফুটায় হাসি,
আমি যে গো তারে ভালবাসি।

সে তবু দূরেতে যায় আপনারে হেয় মনে করি,
সেই যে গো বড় ব্যথা লাগে।
সে কেন আসে না কাছে, কেন মোরে রাখেনাকো ধরি
এ বেদনা বুকে বড় জাগে।
হোক না সে হেয়,—তবু মোর কাছে পূজনীয়
যে তাহার স্নেহ দিয়ে করেছে গো কমনীয়
আমি তারে উচ্চ ভাবি, সকলের চেয়ে সে মহৎ,
সে সর্ব্বদা বুকে আছে ভাসি,
আমি যে গো তারে ভালবাসি।

আমারি সে প্রিয়তম, দুনিয়ায় আর কারও নয়,
সে আমার আমি শুধু তার ;
তাহার সে প্রেম দিয়া দুর্দ্দান্তেরে করেছে সে জয়,
একমাত্র প্রিয় সে আমার।
হোক সে যতই হীন,—হোক না কুরূপ কালো
আমার চোখে সে শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে সেই ভালো,
আমার জীবন খানা ভরিয়া নিয়েছি তার প্রেমে
তার মুখই হৃদে আছে ভাসি ;
আমি যে গো তারে ভালবাসি।

মায়া

(বড় গল্প)

[শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১০)

সন্তোষ নিকটে আসিতেই নরেশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আজ যে সাহস করে রাত্রিতে বেরিয়ে পড়েছেন? একজনের ত এখানে দূরে আপনার চাকরের হাতে লণ্ঠন দেখে বাঘের চোখ ভেবে ভয়ে মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছিল। বাঙ্গালীর মেয়েরা বড় ভীরু।"

সন্তোষ নরেশ বাবুর কথায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কোন এক সার্কাসে বাঘের খেলার সময় বাঘ খাঁচার বাহির হইয়া পড়ায়, সাহেব মেমের ভয়ে চীৎকার ও সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিটী মেমের মূর্চ্ছা ইত্যাদি একটা ঘটনার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করিয়া বিজয় গর্ব্বে নিকটে একটা টেবিলের উপর বসিয়া পড়িল; এবং পরক্ষণেই নবীনকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিহে ভায়া ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাড়ী থেকে কতক্ষণ ফিরলে? দেখা হ'ল না বুঝি? তা এখানে আসবে আমায় বলতে হয়, তা হলে আর বৃথা এতটা পথ হাঁটতে হ'ত না।" নবীন রাগে কি উত্তর দিবে ঠিক করিতে না পারিয়া বলিল,—"আমার সব কথায় তোমার দরকার কি? তুমি আপনার চরকায় তেল দাও না। যেখানে যাব তোমাকে নিয়ে যেতে হবে কিংবা কৈফিয়ৎ দিতে হবে এমন কোন লেখাপড়া আছে কি? আমি কি তোমার 'মোসাহেব'?"

সন্তোষ বিদ্রূপকণ্ঠে বলিল,—"আহা চট কেন, তুমি আজকাল দেখছি মিথ্যা কথারও ব্যবসা আরম্ভ করেছ?" নবীন রাগে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই সন্তোষ হাসিতে হাসিতে তাড়াতাড়ি সেই চেয়ার দখল করিয়া বসিল। রমণীমোহন তাহা দেখিয়া সানন্দে হাততালি দিয়া উঠিতেই কমলমণি হাসি চাপিয়া উঠিয়া গেলেন। অপরাজিতা ও মায়া হাসির বেগ দমন করিতে না পারিয়া কমলমণির অনুসরণ করিল। মেয়েদের ঐভাবে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া সন্তোষ শঙ্কিতচিত্তে চেয়ার ছাড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নরেশবাবু উভয়ের লজ্জিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সহাস্থে বলিলেন, "নবীন তোমার চেয়ার খালি, বসে পড়; সন্তোষ তুমি ঐ ইজি চেয়ারটায় বস" ও সস্নেহে রমণীমোহনকে বলিলেন, "যা তোর মাকে ও দিদিদের ডেকে আন।"

কমলমণি আসিলেন কিন্তু অপরাজিতা ও মায়া আসিল না। তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য দুইটী ভদ্রলোক এক মোটরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন সুবোধ ও অন্যটী রাখাল চক্রবর্ত্তী। তাহাদের আগমন নবীন ও সন্তোষের পক্ষে শাপে বর হইল। তাহারা নিজ নিজ আচরণে বড়ই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ইত্যবসরে সরিয়া পড়িল।

পাঠক পাঠিকা যাহারা আপনাদের মধ্যে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং বিবাহ জীবনের সুখ দুঃখ, সংসারের অনাটন, নিত্য অর্থাভাব ইত্যাদি কত কি মনে মনে সদাই আলোচনা করিতেছেন তাঁহাদের আর পরবর্ত্তী আলোচনায় যোগ দিয়া লাভ নাই। তবে আপনাদের ভিতর যাঁহারা মনোনীত বর বা কনে পাইবার জন্য উতলা হইয়া আছেন তাঁহাদের আমি চুপি চুপি একটা কথা বলিব—রাখাল বাবুর কাজে সহায় হউন, এমন পাকা ঘটক দেশ-বিদেশে নাই, আপনাদের মনোবাসনা নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে।

(১১)

পরদিন প্রাতে নরেশবাবু চা পান করিতে করিতে তাঁহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা কি করা যায়? সুবোধেরা ভায়ে ভায়ে দেখিতে পাই বড়ই সরল প্রকৃতির লোক। সুবোধবাবু ত মাটির মানুষ। আজকালকার দিনে

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিনাপণে কে এমন সোণার চাঁদ ছেলে বিবাহ দিতে রাজী হয়। তিনি ত বলিয়া গেলেন আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই দিবেন। যাবার সময় একটা ফর্দ্দ দিয়া গিয়াছেন, মেয়ের গহনা, বরাভরণ, নগদে পনের হাজার টাকা হবে ; কিন্তু সেই সঙ্গে বলে গেলেন, তাঁহাদের একটা ফর্দ্দ দিতে হয় তাই দিয়া গেলেন। তাঁহাদের কিছুরই অভাব নাই, আমি ইচ্ছা করিলে এক পয়সাও না দিতে পারি। নবীনের বড়দাদা পণ গ্রহণের বিরোধী তাই তাঁহাকে ফর্দ্দের কথা জানাতে মানা করিয়া গেলেন।"

কমলমণি ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যদি বিনা-পণেই বিবাহ দিতে সুবোধের এত আগ্রহ তবে পনের হাজার টাকার এক ফর্দ্দ তোমাকে আড়ালে ডাকিয়া দিয়া যাইবার অভিপ্রায় কি শুনি ?" নরেশবাবু একটু রাগত ভাবে বলিলেন,—"তোমার ওইসব কেমন কথা। ফর্দ্দ দেওয়াটা কি এমন বিষম দোষের কথা ? লোকটি শুনি যে ত্রিসন্ধ্যা না করে জল খায় না, লোভ তা একেবারেই নাই—একদিনও কি তাঁহাকে কিছু খাওয়াতে পেরেছ ? ভদ্রলোকটি একটা Principleএ চলেন।"

কমলমণি পূর্ব্বের মত হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"পুরুষের চোখে মেয়েমানুষই সহজে ধূলা দিয়া থাকে ; তোমার চোখে দেখিতে পাই সকলে হাসিতে হাসিতে ধূলা দিয়া যাইতে পারে।" নরেশবাবু অপ্রীতিকর আলোচনা চাপা দিবার জন্য বলিলেন,—"মায়া ত এখন ছেলেমানুষ। ওর বিবাহের জন্য এত তাড়া কেন।" কমলমণি স্বামীকে ভালরকমই চিনিতেন। এমন একটা গুরুতর বিষয়ের ভাল মন্দ আলোচনার প্রয়োজন বোধ করিয়া তিনি বলিলেন, "একবার সন্তোষের বাপকে চিঠি লিখে দেখ না। জমিদারের এক ছেলে, বিস্তর পয়সা, লেখাপড়াও বেশ জানে, স্বভাব চরিত্র যে ভাল তা তুমিও ত দেখছ, যদি কামড় বেশী না হয় তা আমি বলি অমন পাত্র হাত ছাড়া কর না। দেখ, নবীনকেও হাতে রাখতে হবে।"

নরেশ বাবু বলিলেন, "কলিকাতায় ফিরে গিয়ে যা হয় করা যাবে। কাল জগন্নাথ মন্দিরে বেড়াতে যাবে নাকি ?"

নরেশ বাবুকে বিবাহের কথা চাপা দিতে না দিয়া কমল-মণি বলিলেন, "তোমার সব বিষয়েই হচ্ছে হবে, না—না—একটা স্থির করে ফেল ও ওই কথা প্রসঙ্গে কাল সকালেই রাখালের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতে হইবে সেই কথা বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিলেন।

(১২)

আজ সকালে অঘোর অতি প্রত্যুষে চা খাওয়া শেষ করিয়া একটা মালির সাহায্যে তাহার বাঙলার চারি পার্শ্বের জঙ্গল পরিষ্কার করাইতে বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুবোধ তাহার স্ত্রী সুশীলা দেবীকে বাজারের খরচ বুঝাইয়া দিয়া ও বৌদিকে ও রাখালের স্ত্রীকে সুশীলা দেবীর সহায়তা করিতে বলিয়া, ঝি চাকরদের বিছানপত্র পরিষ্কার করিতে ও চেয়ার টেবিল যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিতে আদেশ দিয়া বাহিরে যাইবার মুখে দাদাকে বলিয়া গেল দাদা আমি রাখালের খোঁজে যাইতেছি। রাখালটা কি বোকা, তার কেবল কাজ আর কাজ, কেন আজকের কাজটা বুঝি কাজ নয় ? যাই তাকে তাড়া দিয়ে মোটরে নরেশ বাবুর বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আসি।" অঘোর বাবু একবার মেজ ভায়ের দিকে কৌতুহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিজের কাজে মন সংযোগ করিলেন।

তাঁহাকে একবার কোন কাজে লাগাইয়া দিলে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া তিনি সেই কাজটা 'যেন তেন প্রকারেন' সম্পূর্ণ না করিয়া শান্তি অনুভব করেন না ; এবং হাতের কাজ সারা হইলে তাঁহার পূর্ব্বের কাজের বিস্তৃত পরিচয় ছাড়া আর কোন নূতন কাজের সাড়া পাওয়া যায় না।

এটা বাঙ্গালী চরিত্রের বিশেষত্ব। তাই আজ বাঙ্গালী অন্য অন্য জাতির সহিত প্রতিযোগিতায় এখন পিছাইয়া পড়িতেছে ও দারুণ অন্নকষ্ট অনুভব করিতেছে।

অঘোরবাবু সবে মাত্র কাজ শেষ করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইতেই একটা মোটর তাঁহার সম্মুখে আসিয়া থামিতে রাখাল সম্মুখের সিট্ হইতে নামিয়া সরিয়া দাঁড়াইল ও নরেশ বাবু পিছনের সিট হইতে সস্ত্রীক অবতরণ করিয়া তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

অঘোরবাবু সসম্ভ্রমে তাঁহাদের নিজ-শয়নকক্ষে লইয়া গিয়া দুই

একটা কথার পর একেবারে বাঘ ভাল্লুকের গল্প জুড়িয়া দিল। রাখাল বেগতিক দেখিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া, সকলকে সজাগ করিয়া দিয়া, বড় বউকে ডাকিয়া মেয়েদের অন্য ঘরে লইয়া গিয়া বসাইতে ইঙ্গিত করিয়া এবং চুপি চুপি কি একটা উপদেশ দিয়া দাদার ঘরে ফিরিয়া গিয়া, দাদার পাশে বসিয়া, দাদার প্রাণহীন গল্পকে এমন সজীব করিয়া তুলিল যে উপস্থিত সকলেই তাহার 'কথকথায়' বড়ই আনন্দ উপভোগ করিলেন। গল্প শেষ করিয়া সকলকে হাসাইয়া উঠিতেই আচম্বিতে বড় বউকে দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া ভঙ্গিমার সুরে বলিল—"আহা—হা বউদিদি, দাদার যেমন আক্কেল আপনাকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছেন আহা কত কষ্টই না হয়েছে। আমি কত শীঘ্র দেখুন গল্প শেষ করে দিলুম। এখন আপনার অতিথিদের আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারেন।" নরেশ বাবুকে চা পাঠিয়ে দিন, না—না আপনি নিজেই নিয়ে আসুন। নরেশ বাবুত এখন আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেছেন; এবং কমলমণির দিকে চাহিয়া ভক্তিনম্র-স্বরে হাসিতে হাসিতে বলিল—"মা আপনার দুটি মেয়ে—আরও তিনটী আজ থেকে বাড়ল।" কমলমণি সস্নেহে রাখালের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বেশ ত বাবা, সে ত সুখের কথা, আমি ত তাই চাই; এবং অগ্রসর হইয়া লজ্জাবতীর চিবুক স্পর্শ করিয়া সস্নেহে চুম্বন করিয়া বলিলেন, —চল মা চল—আমার আর দুটী মেয়ে কোথায়?

লজ্জাবতী, অপরাজিতা ও মায়ার হাত ধরিয়া সেজ বউয়ের সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিল।

(১১)

গুরুসদয় বাবুর বাড়ী বালিগঞ্জে। বাড়ী বলিলে যাহা বুঝায় তাহা নহে—প্রাসাদ। তাঁহার পিতা ৺অক্ষয়কুমার বন্দোপাধ্যায় তেজারতি ব্যবসা করিয়া বালিগঞ্জ, গড়িয়া ও আশে পাশে অনেক জমি মাটির দরে খরিদ করিয়াছিলেন ও সাহেবদের বাসোপযোগী তিনখানি বাঙলা বাড়ী ও অনেক টাকার কোম্পানীর কাগজ রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র গুরুসদয়বাবু এখন পায়ের উপর পা দিয়া সেই সকল বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। লোকে বলে স্বোপার্জ্জিত ধন না হইলে টাকার মায়া মমতা থাকে না, কিন্তু গুরুসদয় বাবুর সম্বন্ধে সেকথা বলা আদৌ চলে না। প্রতিবেশীরা তাঁহাকে কৃপণ আখ্যা দিয়াই সন্তুষ্ট নহেন। প্রাতে তাঁহার নাম করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন। গুরুসদয় বাবু বালিগঞ্জে থাকিয়াও সাজসজ্জা ও বাহুল্যতার ভয়ে মিষ্টার গুরুসদয় নামে পরিচয় দিতে কোনদিনই আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। গুরুসদয় বাবু ধনী জমিদার অতএব বড় বড় গার্ডেন পার্টিতে তাঁহার নিমন্ত্রণের ত্রুটী হয় না। তিনিও যে কোন দেশ হিতকর কাজে চাঁদার খাতায় নিজের পদ ও মর্য্যাদা অনুযায়ী টাকার প্রতিশ্রুতি দিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয়েন না। কিন্তু টাকার তাগাদা আসিলেই তিনি অসুস্থতার ভাণ করিয়া কিছুদিনের জন্য আর বড় বাড়ীর বাহির হয়েন না—কখনও বা শরীর সারিবার জন্য "ডায়মণ্ডহারবার" কিংবা "বজবজে" গিয়া এক বন্ধুর Boat এ কিছু দিন অজ্ঞাত বাসে থাকেন।

এবার কিন্তু শরীর সারিবার জন্য তিনি একেবারে রাঁচী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এত দূর—এত খরচা করিয়া? হিসাবী চতুর লোক অকারণ অর্থব্যয় একটা কোন কারণে করেন এত বড় একটা দেখা যায় না। তবে? গুরুসদয় বাবু বড় আশায় বংশধরের নাম রাখিয়াছিলেন সন্তোষ; কিন্তু সন্তোষ গুরুসদয় বাবুর সন্তোষের কারণ না হইয়া অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল। তাঁহার বিপুল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, পিতার অধীন ও আজ্ঞাবহ না হইয়া ও তাঁহারই শিক্ষায় আদর্শে মন, প্রাণ ও দেহ গঠিত না করিয়া একি ভিন্ন ও ভুলপথে সে তাহার জীবনকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। গুরুসদয় বাবু সকল ভোগ বিলাস ও বাহুল্যতা বিসর্জ্জন দিয়া স্তরে স্তরে অর্থ সঞ্চিত করিয়া একটার পর আর একটা স্তূপ গড়িয়া তুলিতেছিলেন সে কাহার জন্য? গুরুসদয় বাবু কতদিন আক্ষেপ করিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিনী প্রভাবতীকে বলিতেন—"হায়রে! মূর্খ ছেলেটার আর কিছু কাল সবুর সইছে না; স্তূপ পর্ব্বতাকার ধারণ করিলে তখন না হয় সিকি, আনি, পয়সার ঝরণার জলে স্নান করিয়া দৈহিক ও মানসিক সুখ উপভোগ করতিস্।"

সন্তোষ অনেক আবদার করিয়া বৎসরাধিক মান অভি-মানের পালা জাগাইয়া রাখিয়া স্নেহময়ী জননীর আনুকূল্যে

নবীনের পুনঃ পুনঃ সাহুরোধ আহ্বানে রাঁচীতে বেড়াইতে আসিয়াছিল ; কিন্তু আজ ছয় মাসোপরি তাহার বাড়ী ফিরিবার কোন অভিসন্ধি না দেখিয়া এবং তাহার প্রবাসের খরচের হিসাবের গুরুভারে পীড়িত গুরুসদয় বাবু চিন্তিত ও সন্দিগ্ধমনে অতর্কিতে রাঁচীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

(১৪)

গুরুসদয় বাবু বড় সংসর্গপ্রিয় লোক। রাঁচীতে কয়দিন আসিয়াই তিনি নরেশ বাবু ও অর্থশালী প্রবাসী বাঙ্গালীদের সহিত আলাপ বেশ সমুজ্জল করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাঁচীতে আসিয়া তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাভ্রমণে বাহির হইতেন। নরেশ বাবুর বাঙ্‌লার দিকটার রাস্তা তাঁহার সন্ধ্যা ভ্রমণের অনুকূল ছিল ; সেই হেতু প্রত্যহই তাঁহার নরেশ বাবুর বাসার সম্মুখ দিয়া যাইবার সুযোগ ঘটিত ও নরেশ বাবু বাসায় থাকিলেই তিনি প্রত্যহ তাঁহার খোঁজখবর লইয়া যাইতেন ; কিন্তু নরেশ বাবুর স্ত্রী ও কন্যাদ্বয়ের সহিত তাঁহার একদিনও সাক্ষাতের সুযোগ ঘটে নাই।

কমলমণি শুনিয়াছিলেন, গুরুসদয় বাবু মেয়েদের 'পরদার' অত্যন্ত পক্ষপাতী। সন্তোষের ধারণা কিন্তু অন্যরূপ ছিল। আজ 'চা'এর নিমন্ত্রণে তিনি নরেশ বাবুর বাঙ্‌লায় সকলের পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া একথা সেকথার পর সন্তোষের বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দিয়া বলিলেন—"কিন্তু বুঝলেন কি না ছেলেটা ঐ চক্রবর্ত্তীদের ছোট ভাই নবীনটার মেজাজ, বাবুয়ানা ও অপব্যয়িতার হিড়িকে পড়িয়া সম্প্রতি যেন কেমন একটু স্বাধীন ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে" এবং নরেশ বাবুর মুখের প্রতি একটু বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া জিজ্ঞাসাচ্ছলে কহিলেন—"আপনিও বোধ হয় সেটা লক্ষ্য করিয়াছেন—এর একটা কি বিহিত করা যায় বলুন দেখি ?"—এবং নরেশ বাবুর উত্তরের কিংবা মতামতের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিয়া গেলেন—"ছেলেটা বুঝলেন কিনা, তাহার গর্ভধারিণীর বড় আদুরে—আর আমারও ত ওই এক সন্তান—আর ত হয় নি—গিন্নীর এ বয়সে হবার আর সম্ভাবনাও নাই—হি—হি—চেষ্টার বুঝলেন কিনা, ত্রুটি করি নাই—তা হোক, বেশী ছেলেপুলে হওয়াও পাপ, হ্যাঁ, তা বলছিলুম—আমার বুঝলেন কি না, আমার যৎসামান্য, এই অন্নবিত্তর—যা কিছু আছে ঐ ছেলেটাই তাহার একমাত্র অধিকারী। ওর যেমন বিদ্যা বুদ্ধি ও স্বভাব আশা করি ও আমার সব দিক বজায় রাখিয়া বংশের মুখোজ্জল করিবে। এখন ওর একটা বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে পারিলেই আমি সংসারের নানা ঝঞ্ঝট হইতে অবসর লইয়া ঐ মুরাবাদী পাহাড়টার গায়ে একটা কুটীর বাঁধিয়া কর্ত্তা গিন্নিতে, বুঝলেন কিনা,—"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ"—ব্যবস্থা করি।

নরেশ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"তা আপনার পঞ্চাশ পার হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আপনার স্ত্রীর তা এখন হয় নি বোধ হয়—আপনাকে দেখছি এখন কিছুদিন একাই এই পাহাড়টার গায়ে অপেক্ষা করে বসে থাকতে হবে—তা মন্দ হবে না—আমিও মাঝে মাঝে ছুটী নিয়ে এসে আপনার সাহায্য করব।"

গুরুসদয় বাবু অট্টহাস্য করিয়া বলিলেন,—"তা হলে ত বেশ মজাই হবে—আমি স্বামীজি সেজে বসব—আপনি বুঝলেন কিনা, হবেন আমার প্রধান শিষ্য ও আপনার অধীনে কর্ম্মচারীরা হবে আমার মক্কেল। আপনাকেও আর চাকুরী করে খেতে হবে না—এবং সন্তোষকেও ব্যবসা ব্যবসা করে আর পাগল হতে হবে না। ছেলেটার মাথায় দেখছি হঠাৎ কে ব্যবসার খেয়াল ঢুকিয়ে দিয়েছে। গুরুগিরির চেয়ে কি আর ব্যবসা আছে ? ঐ একটা ব্যবসাই এই মন্দার বাজারে বেশ জোরে চলেছে। ওকেই পরে আমার গদীতে বসিয়ে যাব। বেটার দুনিয়ায় আর কোন ভাবনা চিন্তা থাকবে না" —বলিয়া উৎসাহে পিছনে হেলান দিয়া বসিতে গিয়া একেবারে চেয়ারশুদ্ধ উল্টাইয়া পড়িতেই যন্ত্রণাসূচক একটা চীৎকার করিলেন।

নরেশবাবু শশব্যস্তে তাঁহার হাত ধরিয়া তুলিয়া নিজের শয়ন কক্ষে লইয়া গিয়া একটা 'ইজি চেয়ারে' বসাইয়া মায়াকে ডাকাইয়া তাঁহায় শুশ্রূষা করিতে আদেশ দিয়া নিজে একটা চেয়ার টানিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিবার উপক্রম করিতেই গুরুসদয়বাবু তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বাহিরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আদর উপচার করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

(১৫)

নরেশবাবু চলিয়া গেলে গুরুসদয়বাবু সোজা হইয়া বসিয়া নির্নিমেষ নয়নে মায়ার মুখের প্রতি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সহসা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মায়া, তোমার বয়স কত হয়েছে? মায়া গুরুসদয় বাবুর বদ্ধদৃষ্টির তীব্র চাহনি লক্ষ্য করিয়া মনে মনে অশান্তি অনুভব করিতেছিল; এখন তাঁহার এই অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে শঙ্কিত হইয়া কহিল—"বাবাকে ডেকে আনব কি?" বৃদ্ধ গুরুসদয় তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না—না—তোমার বাবাকে আর ব্যস্ত করে দরকার নেই। তোমার বাবা আজ যে হাঙ্গামার সৃষ্টি করেছেন তারই এখন ঠেলা সামলান।" মায়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি একটু সুস্থ বোধ করছেন কি? গুরুসদয়বাবু একটু থমকিয়া বলিলেন,—হ্যাঁ, তোমার মত, বুঝলে কিনা, নার্স যখন কাছে বসে তখন শরীরের পীড়া কি আর থাকে।

মায়া। সন্তোষবাবু এখনও এলেন না কেন?

গুরুসদয়। কে জানে সে হতভাগা ছোঁড়া কোথায় গেছে। সেই বদমায়েস ছোকরা নবীনটার সঙ্গে বোধ হয় গিয়ে মিশেছে। হ্যাঁ, সন্তোষ তোমাদের এখানে নিত্যই আসে—না?

মায়া। হ্যাঁ।

গুরুসদয়। নবীনটাও আসে নাকি?

মায়া। আমি বাবাকে ডেকে আনি বলিয়া গুরুসদয় বাবুর 'একটা কথার' প্রতীক্ষা না করিয়া সদর্পে বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কে একজন পর্দার অন্তরাল হইতে সরিয়া গেল।

গুরুসদয়বাবু ক্ষণিক বিস্ময়ে অবাক হইয়া থাকিয়া নিজের মনোবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য বাহিরে আসিয়া ত্রস্তপদে অভ্যাগত ব্যক্তিদের সহিত মিশিয়া গেলেন; কিন্তু তাঁহার মনের চঞ্চলতা মাঝে মাঝে তাহার চিত্তবিক্ষোভ আনিয়া তাঁহাকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিল। মায়ার সুন্দর মুখ তাঁহার হৃদয়ে আকাশ কুসুমের স্বপ্ন জাগাইয়া বৃদ্ধের মনে যুগপৎ আনন্দ ও অবসাদের সৃষ্টি করিল। বৃদ্ধের মনে কৌলিন্যভাব উঁকিঝুঁকি মারিয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিল। গুরুসদয় অস্থিরচিত্তে বাগানের এক নিভৃত কুঞ্জে গিয়া বসিতেই শ্যেনপক্ষীর মত রাখাল আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি এখানে একা বসে যে? আপনাকে নরেশবাবু যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।" গুরুসদয়বাবু অপ্রসন্নকণ্ঠে বলিলেন, "বড় মাথাটা ধরেছে—একা খানিকক্ষণ এখানে বসে থাকলে বোধ হয় ছেড়ে যাবে—আমাকে একা একটু থাকতে দাও।" রাখাল সহানুভূতিকণ্ঠে বলিল,—"আপনাকে একটা Lime juice এনে দেব কি? সন্তোষকে পাঠিয়ে দেব কি?" গুরুসদয়বাবু উষ্ণকণ্ঠে বলিলেন,—"না—না—তোমাকে ও-সব কিছু করতে হবে না। সন্তোষ কোথায়?" রাখাল কহিল,—"আজ্ঞে সে নরেশ বাবুর বাড়ীর ভিতরেই আছে। গুরুসদয়বাবু কোন কথা কহিলেন না।

রাখাল সুযোগ ছাড়িবার পাত্র নহে। সে গুরুসদয়বাবুর মনোভাব অনুমান করিয়া বলিল,—"আপনার সঙ্গে নির্জ্জনে দুইটা কথা বলিবার সুযোগ আমি এতদিন খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, আজ ঈশ্বরের কৃপায় তাহা পাইয়াছি;"—এবং ইতস্ততঃ না করিয়াই বলিল,—"সন্তোষ আমার ছোট ভাইয়ের বন্ধু, অতএব আমার স্নেহের পাত্র। এই দুই বন্ধুতে যাহাতে বিচ্ছেদ না হয়, তাহারই একটা উপায় আপনাকে করিতে হইবে। নরেশ বাবুর মেয়ে মায়াকে আপনি দেখিয়াছেন ত? একটা চন্দ্রকণা যেন মূর্ত্তিমান হইয়া পৃথিবীতে তাহার রূপ ও মাধুরীর পরিচয় দিতে আসিয়াছে; কিন্তু ও রূপ, ও মাধুরীর, ও নিশীথ সৌন্দর্য্যের উপভোগের সামর্থ্য নবীন কিংবা সন্তোষের নাই। নবীন ও সন্তোষ কুহকে পড়িয়া উভয়ের সখ্যভাব ও জীবন মরুময় করিয়া তুলিবার জন্য যেন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। নরেশবাবু কি মতির মালা একটা পথের ভিখারীর গলায় পরাইয়া দিবেন? সন্তোষের কথা যদিও স্বতন্ত্র কিন্তু সেও ত এখন পরাধীন—পিতার অন্নদাস। রাজা ও রাজকুমারের ভিতর অনেক প্রভেদ।" গুরুসদয়বাবু সন্দিগ্ধ নয়নে রাখালের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"না—না—আমি সন্তোষকে সঙ্গে লইয়া তবে কলিকাতায় ফিরিব, আপনিও আপনার ভাইটিকে সাবধান করিবেন। একটা গরীবের মেয়ে দেখিয়া ছোকরার বিবাহ দিয়া সংসারী করিতে পারিলে তাহার পাগলামী সারিয়া যাইবে।" রাখাল বলিল,

"আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি নবীনের বিবাহ এই ফাল্গুন মাসেই দিব, পাত্রী দেখা হইয়া গিয়াছে।" গুরুসদয়বাবু অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, নরেশ বাবুর কিরকম ইচ্ছা জানেন? মেয়েটা ত বেশ ধাড়ী হয়েছে, আমাদের হিন্দুর ঘরে আর তাকে একদিনও রাখা চলে না।" রাখাল কহিল, —"নরেশ বাবুর ইচ্ছা মেয়েটী এমন পাত্রে দেন যে সে নুরজাহানের মত যশস্বীনী হয়?"

(১৬)

পরদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে নরেশবাবু তাহার বাঙ্‌লার বারাণ্ডায় বসিয়া যখন কমলমণির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে-ছিলেন তখন এক ভদ্রলোক তাঁহার সম্মুখীন হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার কি চাই?

আগন্তুক নমস্কার করিয়া বলিল,—আমি কি আপনার সঙ্গে পাঁচমিনিট কথা কহিতে পারি?

নরেশবাবু। স্বচ্ছন্দে, আসুন—বসুন।

ভদ্রলোক। আমার নাম শৈলেশ্বর ঘোষ। আমি ইন্‌সিয়োরের এজেন্ট। আমি কলিকাতা থেকে আজ এক সপ্তাহ এসেছি; এরি মধ্যে আমি ২৫০০০৲ টাকার কাজ যোগাড় করেছি—হ্যাঁ আপনি সন্তোষবাবুকে চেনেন কি?

নরেশবাবু। আমাদের সন্তোষ? গুরুসদয় বাবুর ছেলে?

শৈলেশ্বর। আজ্ঞে হ্যাঁ। ছোক্‌রা চালাক চতুর। শুন্‌লাম এখানে নবীনের সাহায্যে সুন্দর একটা কাজের যোগাড় করেছিল। গুরুসদয় বাবু যদি সামান্য কিছু মূলধন দিতেন তাহা হইলে ঐ কাজে ও বেশ দু'পয়সা রোজগার করতে পারত; কিন্তু গুরুসদয় বাবু টাকা দেওয়া ত দূরে থাক তাহাকে আজ জোর করিয়া কলিকাতায় রওনা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

নরেশবাবু। অ্যা—সন্তোষ চলে গেছে—রাঁচী মেলে বোধ হয়? কই কাল সন্তোষ কি গুরুসদয় বাবু কোন কথা বল্‌লেন না ত?

শৈলেশ্বর। না—আমার সঙ্গে আজ সকালে সন্তোষ বাবুর চার্চ্চ রোডে দেখা হয়েছিল। তিনি আমায় সন্ধ্যা-বেলায় ডেকেছিলেন। ৫টার সময় তাঁর বাসায় গিয়ে শুনলাম গুরুসদয় বাবুর তাড়ুতায় তাঁকে আজ কলিকাতায় যেতে হয়েছে। বড় লোকেরা কখন কি মেজাজে থাকেন বলা কঠিন।

"হ্যাঁ—আপনি রাখালবাবুকে চেনেন কি। অনেক টাকা রোজগার কর্‌ছেন। নবীনবাবুও মাসে প্রায় পাঁচ সাতশ টাকা রোজগার করেন।"

যাহারা নিজের রোজগারে বড় হয় এবং যাহারা পিতা পিতামহের টাকার বড় বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাদের ভিতর সকল বিষয়েই এমন একটা সজীব পার্থক্য প্রতীয়মান হয় যে তাহা সহজেই নয়ন গোচর হয়।

পুরুলিয়ার জমিদার অভয়চরণ বাবুর বাড়ী থেকে নবীন বাবুর জোর একটা সম্বন্ধ এসেছে। তাঁহারা এই ফাল্গুন মাসেই বিবাহ দিতে চান।

কমলমণি এতক্ষণ বসিয়া সকল কথাই শুনিতেছিলেন; কিন্তু শৈলেশ্বরের এই শেষ সংবাদটী শ্রবণ করিয়া বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সম্বন্ধটা আপনি এনেছেন না কি?" শৈলেশ্বর কমলমণির বিচলিত কণ্ঠ ও প্রশ্নের গুরুত্ব অনুভব করিয়া সংক্ষেপে বলিল,—"নবীন সেখানে বিবাহ করিবে না।" হ্যাঁ, আপনার একটা ইন্‌সিয়োর—ঐ যে গুরুসদয় বাবু এইখানেই আসছেন। আমি তবে কাল সকালে আসিব। নমস্কার।

(ক্রমশঃ)

অনন্তের ধ্যান।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　১৮ই ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৩।　　[৪১শ সপ্তাহ

আলোচনা

হিন্দু অপেক্ষা কি মুসলমান রাজকার্য্যে বেশী দক্ষ ?

সম্প্রতি একখানি মুসলমান সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে যে মুসলমানগণ সাতশত বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ শাসন করিয়াছেন, সুতরাং রাজকার্য্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অধিক। এ জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদিগকে অধিক পরিমাণে চাকুরী দেন, তবে শাসন কার্য্য উৎকৃষ্টতররূপ চলিতে পারে।

চাকুরীর জন্য শেষে যে মুসলমান শিক্ষিত লোকেরাও ইতিহাস ভুল করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন ইহা অপেক্ষা শোচনীয় বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। এলফিনষ্টোন (৪৭২ পৃঃ) ভিনসেণ্ট স্মিথ (Oxford History of India—২৫৮ পৃঃ) লেনপুল প্রভৃতি সর্ব্বজন পরিচিত ইতিহাসগ্রন্থ পাঠ করিলেই তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে মুসলমান আমলেও রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যের ভার প্রধানতঃ হিন্দুদের উপর ন্যস্ত ছিল। অধিকাংশ স্থলেই হিন্দু জমীদারেরা অর্দ্ধ স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন ও মুসলমান সম্রাটদিগকে কর প্রদান করিতেন। আভ্যন্তরীণ শাসন কার্য্যে মুসলমানেরা কিরূপ পটু ছিলেন তাহা ভিন্সেণ্ট স্মিথের নিম্নোদ্ধৃত মত হইতেই বুঝা যাইবে। তিনি বলেন "Some sort of civil government had to be carried on, and the strangers (the Muhammedans) had not either the numbers or the capacity for civil administration except in a limited area." অর্থাৎ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন কোনরূপে চালাইতেই হইত কিন্তু মুসলমানদের এমন সংখ্যা বা সামর্থ্য ছিল না যে অল্পস্থান ব্যতীত সমগ্র দেশে তাঁহারা

শাসন চালান। মোগল যুগের অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার Mughal administration of India গ্রন্থে বলিয়াছেন যে দেশের রাজকার্য্যের ভার প্রধানতঃ হিন্দু কর্ম্মচারীদের উপরই ন্যস্ত ছিল। মোগল যুগের সবচেয়ে বড় ব্যবস্থা হইতেছে রাজস্ব ব্যবস্থা। তাহা হিন্দু টোডরমলেরই অনুসন্ধান ও পরিশ্রমের ফল। হিন্দুরা গায়ের জোরে বা একতার অভাবে মুসলমান-দিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতেও মুসলমানদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন তাহা নহে।

ব্রিটিশ আমলে মুসলমান কর্ম্মচারীরা যে দক্ষতা দেখাইতে পারিতেছেন না এমন নহে। কিন্তু হিন্দুরাও সমান বা অধিক দক্ষতা দেখাইতেছেন। এজন্য সাতশত বৎসরের মুসলমান অধিকারের ইতিহাসকে টানিয়া খাড়া করিবার প্রয়োজন নাই। এ যুগের শিক্ষা, দীক্ষা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুসারে কর্ম্মচারীরা কাজ করিয়া থাকেন। শিক্ষা ও মনোবৃত্তিতে উন্নত হইলে মুসলমানেরা রাজকার্য্যে দক্ষতা লাভ করিতে পারিবেন—সাতশত বৎসরের ইতিহাসের জোরে নহে। মোগল যুগে মুসলমান রাজ্যের শাসন প্রণালী অপেক্ষা শিবাজীর মারহাট্টা রাজ্যের শাসন প্রণালী যে অনেক ভাল ছিল তাহা প্রত্যেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। ইতিহাসের কথা তুলিলে মুসলমানদের বিপদই বাড়িবে—চাকুরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না।

জন্মগত অধিকার পাইবার ঘুস—

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীরা মিউনিসিপ্যালিটির ভোটার পর্য্যন্ত হইতে পারিবে না—এমন কি অর্থব্যয় করিলেও ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে পারিবে না এইরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবাসীকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট নিত্য নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। আফ্রিকার অসভ্য বাণ্টু জাতির সহিত ভারতবাসীকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ভারতবাসী স্বাধীন না হইলেও প্রাচীনতম জ্ঞান বিজ্ঞানের উত্তরাধিকারী এ কথা কে না জানেন? ভারতের প্রত্যেক শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই সেই বিরাট সভ্যতার উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। ভারতবাসীর এই জন্মগত অধিকারের কথা দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে জানাইবার আশায় ভারত সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় একটি ডেপুটেশন আমন্ত্রণ করিয়াছেন। ভারত সরকার আশা করেন যে এই ডেপুটেশন ভারতবাসীর সভ্যতা দেখিয়া তৃপ্ত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীকে ন্যায্য অধিকার প্রদান করিবেন।

এই ডেপুটেশনের ভারত আগমনের সমস্ত খরচ আমাদিগকে দিতে হইবে। ডেপুটেশনের সভ্যগণ সস্ত্রীক এ দেশে বেড়াইতে আসিবেন। তাঁহারা ১৮ই সেপ্টেম্বর আসিয়া ১৩ই অক্টোবর চলিয়া যাইবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। এই ২৫ দিনের ভারত বাসের ফলেই তাঁহারা ভারতের সভ্যতা ঠিক ঠিক বুঝিয়া ফেলিবেন। কত বড় মাথাওয়ালা লোক ইঁহারা। ভারতবর্ষকে তাঁহাদের সমক্ষে সভ্যতার পরীক্ষা দিতে হইবে। অতএব খরচের বেলায় কার্পণ্য করিলে চলিবে না। সেইজন্য স্থির হইয়াছে যে ইঁহাদিগকে স্পেশাল ট্রেণে আসা যাওয়ার জন্য আটচল্লিশ হাজার টাকা, প্রত্যেক লোকের দৈনিক তিরিশ টাকা হিসাবে খাই খরচের জন্য চৌদ্দ হাজার টাকা, মোটর ভাড়া দুই হাজার টাকা, ভারত সরকারের প্রতিনিধির বেতন প্রভৃতি বাবদ পাঁচ হাজার টাকা, বিবিধ একহাজার টাকা ও অন্যান্য খরচ বাবদ অতিরিক্ত একান্ন হাজার আটশত টাকা দেওয়া হইবে। এত টাকা ২৫ দিনে খরচ হয় কিরূপে তাহা আমাদের সামান্য বুদ্ধিতে আসে না। এই ঘুস দিয়াও যদি আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয়গণের কিছু সুবিধা হয় তাহা হইলে ভগবানকে ধন্যবাদ! কিন্তু ডেপুটেশনের যাঁহারা সভ্য হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই অত্যন্ত ভারতীয় বিদ্বেষী বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পূজা অর্চ্চনা করিয়াও যে তাঁহাদের নিকট হইতে কোন বর পাওয়া যাইবে তাহা মনে হয় না।

বিদায়! বাঙ্গলার দ্বিতীয় কাউন্সিল!

বাঙ্গলার দ্বিতীয় কাউন্সিলের কার্য্য শেষ হইল! তিন বৎসরের মধ্যে ঝগড়া, গোলমাল, হর্ষ ও বিষাদ অনেক হইল

কিন্তু বাঙ্গলা দেশের একটুখানি উন্নতিও কাউন্সিল করিতে পারিলেন না। আবার সভ্যেরা ভোটের আশায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে আরম্ভ করিবেন—কাউন্সিলে প্রস্তাব করিয়া ভোটারদের হাতে স্বর্গের চাঁদ আনিয়া দিবার প্রলোভন দেখাইবেন। অস্থায়ী লাট বাহাদুরকে পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে যে বাঙ্গলার দ্বিতীয় কাউন্সিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও হাওড়া ব্রিজের আইন ছাড়া আর কোন স্থায়ী ভাল আইনই করিতে পারেন নাই। কাউন্সিল এমন ব্যর্থ হইল কেন এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে আসে। কাউন্সিলের দ্বারা দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইবে না এ কথা ঠিক, কিন্তু সামান্য যাহা কিছু সুবিধা নূতন শাসন সংস্কারের দ্বারা পাওয়া গিয়াছে তাহাও দেশের কাজে লাগান হইল না কেন? স্বরাজ্যদলই ছিলেন এ কাউন্সিলের প্রধান দল—তাঁহারা তো কাউন্সিলের দিকেই সমগ্র শক্তি ব্যয় করিয়াছেন। কাউন্সিলের বাহিরে তাঁহারা কোন কাজ করেন নাই। তাঁহারা যে বাধাদান নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহার ফলে যদি কাউন্সিলের হাতে অধিকতর ক্ষমতা আসিত বা আসিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে না হয় কিছু সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু এমন ভাবে শুধু শুধু বাধাদান নীতি অবলম্বন করিয়া লাভ কি? কাউন্সিলে যদি তাঁহাদের বিশ্বাস না থাকে তবে তাঁহারা গঠনমূলক কার্য্য করুন—আর যদি কাউন্সিলে বিশ্বাস থাকে তবে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির সুপরিচালনার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষির যতটুকু উন্নতি করিতে পারেন করুন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যর্থ বাধাদানের প্রহসন চালান কেন?

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে জার্ম্মাণীর প্রবেশ-সমস্যা।

লীগ অফ্ নেশনস্ বা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গত ছয় বৎসরের মধ্যে নিজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে নাই। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও জার্ম্মাণীর ন্যায় তিনটী প্রবল শক্তি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ না দেওয়ায় বা না দিতে পারায় বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ কেবলমাত্র একটা কথার কথাই রহিয়া গিয়াছে। ইউরোপের অনেক শক্তি এমন কথাও বলিতেছেন যে এই লীগ কেবলমাত্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের স্বার্থ বজায় রাখিবার ফন্দী মাত্র। কিন্তু আমরা পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলিকে এতটা মন্দ ভাবি না। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ ইউরোপের শান্তি স্থাপনের জন্য সত্যই সচেষ্ট—যদিও অনেক স্থলেই তাঁহারা অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু ইউরোপের শান্তিরক্ষার জন্য জার্ম্মাণীকে বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের সভ্য করা ও তাহাকে সঙ্ঘের কাউন্সিলে স্থায়ীভাবে স্থানদান করা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা পশ্চিম ইউরোপে জার্ম্মাণী প্রবল শক্তি—তাহার মত ও পরামর্শ অবহেলা করিলে ইউরোপে অশান্তি দেখা দিতে পারে।

কিন্তু জার্ম্মাণীর বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশের নানান্ বাধা। প্রথমে তো জার্ম্মাণীর কমিউনিষ্ট দল বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ করিতেই চাহে নাই। এখন জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনায়ক হাওষ্ট্রাস্মানের প্রভাবে জার্ম্মাণীর বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতি বিরুদ্ধ ভাব অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ব্রেজিল জার্ম্মাণীর সঙ্ঘে প্রবেশের বাধাস্বরূপ হইয়াছিল। জার্ম্মাণীকে বিশ্বরাষ্ট্র-সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য জেনেভাতে যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহাতে গত মার্চ্চ মাসে ব্রেজিল তাহার ভেটো বা নাকচ করিবার ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া জার্ম্মাণীর প্রবেশ পথ বন্ধ করিয়াছিল। ব্রেজিল লীগের কাউন্সিলের অস্থায়ী সভ্য। কাউন্সিলের কোন সভ্যের অমতে কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় না। সুতরাং ইউরোপীয় শক্তিবৃন্দ জার্ম্মাণীকে সভ্য করিতে চাহিলেও ব্রেজিলের জন্য তাহা পারেন নাই। ব্রেজিল বলেন যে তাঁহারাই লীগের আমেরিকান্ সভ্যদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান—সুতরাং লীগের কাউন্সিলে তাঁহাদের স্থায়ী আসন চাই। তাঁহারা স্থায়ী আসন না পাইলে অন্য কাহাকেও পাইতে দিবেন না। এইজন্যই জেনেভাতে তাঁহারা নাকচ ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তারপর যখন ব্রেজিল বুঝিলেন যে কাউন্সিলে তাঁহার স্থায়ী আসন পাইবার সম্ভাবনা অল্প তখন তিনি লীগের সভ্য পদই ত্যাগ করিলেন। ইহাতে লীগের অঙ্গহানি হইয়াছে সন্দেহ নাই কিন্তু জার্ম্মাণীর প্রবেশ পথ সুগম হইয়াছে।

কিন্তু স্পেন ও পোলাণ্ডের দাবী আবার জার্ম্মাণীর প্রবেশে নূতন বাধা উপস্থিত করিয়াছে। স্পেন ১৯২১

খৃষ্টাব্দ হইতে কাউন্সিলে স্থায়ী আসন চাহিতেছেন—এখনও তাঁহার কেবলমাত্র অস্থায়ী আসন আছে। স্পেনকে যদি স্থায়ী পদ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে এবারও যে স্পেনের ভেটো ক্ষমতায় জার্ম্মাণীর প্রবেশ পথ রুদ্ধ হইবে না তাহা কে বলিতে পারে ?

এই মাসের (সেপ্টেম্বরের) অধিবেশনে জার্ম্মাণীর প্রবেশ ও কাউন্সিলে স্থায়ী আসন লাভের কথা বিবেচিত হইবে। পোলাণ্ড তাহার নিজের জন্য একটা স্থায়ী আসন পাইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। ফ্রান্স বোধ হয় পোলাণ্ডের দাবী সমর্থন করিবেন। কেননা পোলাণ্ড জার্ম্মাণীর পূর্ব্বাধিকৃত রাজ্য লইয়াই গঠিত হইয়াছে—এ জন্য পোলাণ্ড শক্তিশালী থাকিলে জার্ম্মাণীর ক্ষমতা মাথা তুলিতে পারিবে না। জার্ম্মাণী দুর্ব্বল হইয়া থাকিলেই ফ্রান্সের দিন নির্ভয়ে কাটিতে পারে।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সিসিল প্ল্যান অনুসরণ করিবেন। জার্ম্মাণী আশা করেন যে সিসিল প্ল্যানের অনুসারেই লীগের সেপ্টেম্বর অধিবেশনের আলোচনা হইবে। সিসিল প্ল্যানের মূল কথা হইতেছে এই যে কাউন্সিলে ৬টার পরিবর্ত্তে ৯টী অস্থায়ী আসন থাকিবে। নয়টী রাষ্ট্রের মধ্যে তিনটী করিয়া প্রতি বর্ষে অবসর গ্রহণ করিবে ও তিন বৎসরের মধ্যে পুনঃ নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না। তবে লীগের সাধারণ সভায় দুইয়ের তিন অংশ সভ্য দ্বারা যদি সমর্থিত হয় তবে তিনটী রাষ্ট্র পুনঃ নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। ইহার ফলে লীগের সাধারণ সভা বা অ্যাসেম্বিলীর ভোটের উপর নির্ভর করিয়া তিনটী অর্দ্ধস্থায়ী আসন গঠিত হইবে।

সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে সেপ্টেম্বরের জেনেভা অধিবেশনে বিনা আপত্তিতে জার্ম্মাণীকে সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া কাউন্সিলে স্থায়ী আসন না দেওয়া পর্য্যন্ত জার্ম্মাণী কোন প্রতিনিধি পাঠাইবে না। এখন পোলাণ্ড ও স্পেন যেমন ভাবে নিজেদের অধিকার দাবী করিতেছেন তাহাতে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে জার্ম্মাণীর প্রবেশ যে নির্ব্বিবাদে সাধিত হইবে তাহা মনে হয় না। লোকার্ণো চুক্তির প্রধান কথাই ছিল জার্ম্মাণীকে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থান দেওয়া। যতদিন পর্য্যন্ত এইরূপ স্থান দেওয়া না হইতেছে ততদিন পর্য্যন্ত লোকার্ণো চুক্তি সর্ব্বতোভাবে কার্য্যকরী হইবে না।

স্বর্ণমাণের ভেল্‌কী—

কারেন্সী কমিশনের সিদ্ধান্ত লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা কাটাকাটি হইতেছে। কেহ বলিতেছেন কারেন্সী কমিশনের সিদ্ধান্তের ফলে এইবার ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী—আবার কেহ বলিতেছেন ঐ সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলে ভারতবর্ষ রসাতলে যাইবে। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা একটু লেখাপড়া শিখিয়াছে তাহারা মতের ভিড়ে পথ হারাইয়া ফেলিতেছে। আর দেশের শতকরা ৯৫জন নেতা এসব বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও খোঁজ খবর লইতেছে না —লইবার উপায়ও তাহাদের নাই। অথচ হঠাৎ একদিন তাহারা দেখিতে পাইবে বাজারে সোনার নাম গন্ধ নাই—মোহর আর কিছুতেই মেলে না—কাগজের টাকা দিলেও সোনার টাকা আর পাওয়া যায় না—সোনার গহনা আর অভাবে পড়িয়া বিক্রয় করা চলে না। তখন তাহারা নিরুপায় ভাবে মাথা চাপড়াইতে থাকিবে—ভদ্রলোকের মুখের পানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিবে—অথচ কোন প্রতিকার পাইবে না। অ্যাসেম্বিলির প্রস্তাবে সাধারণের মত জানিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কিছু সময় দিয়াছেন। সাধারণের মতামতে যে গবর্ণমেণ্টের নীতির বিশেষ পরিবর্ত্তন হইবে তাহা মনে হয় না। তথাপি আমাদের টাকা লইয়া গবর্ণমেণ্ট কেমন ছিনিমিনি খেলা করেন তাহা দেশবাসীর জানিয়া রাখা উচিত।

মুদ্রার উন্নতি করিবার চেষ্টা সরকারের পক্ষে নূতন নহে। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত পাঁচটি কমিটি বা কমিশন এজন্য বসিয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে হার্সেল কমিটি ও ১৮৯৮ সালের ফাউলার কমিটিতে একজনও ভারতীয় সদস্য ছিল না—এমন কি একজন ভারতীয়েরও সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় নাই। তৃতীয় কমিশন ১৯০১ খৃষ্টাব্দের চেম্বারলেন কমিশন পূর্ব্বের দুই কমিটির ন্যায় ইংলণ্ডে বসিয়া কাজ সারিলেও একজন ভারতীয় সদস্য ও কয়েকজন ভারতীয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্থ ব্যাবিংটনস্মিথ কমিটি ১৯২০ খৃষ্টাব্দে একজন

ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। পঞ্চম কমিশন আমাদের আলোচ্য হিল্টনইয়ং কমিশন—ইহাতে ১২ জনের মধ্যে ৪ জন ভারতীয় সদস্য স্থান পাইয়াছিলেন। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে বর্ত্তমান কমিশনের সিদ্ধান্ত ভারতের মতানুযায়ী। কিন্তু উক্ত ৪জন সদস্যের মধ্যে ২জন সদস্য—Fiscal commission ভারতীয় কমিশনারদের বিরুদ্ধে মত দিয়া অভারতীয় সদস্যদিগকে সংখ্যাধিক (mazority) করিয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ সদস্যদের মত যে ভারতের মত নহে তাহা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের এই কমিশন পঞ্চকের ইতিহাস হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী সত্য ১৯২৬ সালের কমিশনের রিপোর্টেই আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে :—

(১) কমিশন বা কমিটিগুলির জন্য ভারতবর্ষের টাকা জলের মতন খরচ হইলেও, গ্রেটব্রিটেনের স্বার্থরক্ষার জন্য যখনই দরকার হইয়াছে তখনই কমিটি বা কমিশনের সিদ্ধান্ত অবহেলা করা হইয়াছে।

(২) ভারত সেক্রেটারী ভারত গবর্ণমেণ্টের কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া ভারতবর্ষের স্বার্থকে গ্রেটবিটনের স্বার্থের নিকট বিসর্জ্জন দিয়াছেন।

এইরূপ ইতিহাস যে সত্য তাহা কমিশনের রিপোর্টে প্রদত্ত ইতিহাসের ৮টি প্যারাগ্রাফ ও স্যার পুরুষোত্তম ঠাকুর দাসের মন্তব্যের ৩ হইতে ৪৯ প্যারাগ্রাফ পড়িলেই বুঝা যাইবে। যে মুদ্রার উন্নতির পিছনে এমন ইতিহাস লুকাইয়া আছে, তাহার কোন নূতন প্রস্তাব যদি আমরা সন্দেহের চোখে দেখি, তাহা হইলে হয়তো আমরা ন্যায়ের নিকট অপরাধী হইব না।

বর্ত্তমান কমিশনের প্রধান কথা হইতেছে এই যে দেশে স্বর্ণমাণ রাখিতে হইবে অথচ সোনার টাকার প্রচলন থাকিবে না। স্বর্ণমাণ অর্থে সোনার দামের মাপে নোট প্রভৃতির দাম স্থির করা হইবে—নোটের দামের অনুপাতে সোনা গবর্ণমেণ্ট জমা রাখিবেন। কমিশন বলেন যে সোনাকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করা অবৈজ্ঞানিক ও বর্ব্বরোচিত প্রণালী। সেই জন্য ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক ও সভ্যরীতি অনুসারে সোনার মুদ্রা ব্যবহার ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই যে ইউরোপ ও আমেরিকার কোন দেশে সোনার মুদ্রারূপে ব্যবহার একেবারে ত্যাগ করা হয় নাই। সভ্যতার আদর্শ বলিয়া বিজ্ঞানের লীলাভূমি বলিয়া যে সকল দেশকে আমাদের শাসকগণ প্রশংসা করেন, সে সকল দেশেও যে সভ্য ও বৈজ্ঞানিক স্বর্ণমাণের অনুসরণ করিতে পারিল না আমরা দরিদ্র কুসংস্কারাপন্ন ভারতবাসী তাহা করিব কিরূপে? আমাদের দেশের বাপ মা নাই—সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যেমন পশুপাখী কাটিয়া experiment চালাইয়া থাকেন, তেমনি ভারতের উপর ব্রিটিশ অর্থনৈতিকগণ একটা বিশাল experiment করিয়া দেখিবেন যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন বন্ধ করিয়া স্বর্ণমাণের দ্বারা কাজ চলে কি না চলে। জীবিত দেহের ব্যবচ্ছেদ করিয়া experiment চালান যায় না—তাই ভারতের মৃতদেহকে গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র মনে করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষে স্বর্ণমুদ্রা না চালাইয়া কেবলমাত্র স্বর্ণমাণ রাখিবার স্বপক্ষে কমিশন যে সকল যুক্তি দিয়াছেন সেগুলি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। কমিশন বলেন যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকিলে জমার (Reserve) সোনার উপর টান পড়িবে ও জমা ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইয়া বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইবে। কিন্তু সত্যই কি সোনার মুদ্রা প্রচলিত থাকিলে আমাদের জমারী সোনায় হাত দিবার প্রয়োজন আছে?

বিদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে যাইয়া আমরা আমদানী অপেক্ষা ১৫৫ কোটী টাকা বেশী রপ্তানী করিয়া থাকি। ঐ টাকাটা যদি আমাদিগকে গবর্ণমেণ্ট সাধুভাবে সরল অন্তঃকরণে সোণায় লইতে দেন তাহা হইলে আমাদের সোনার অভাব কি? আমদানী অপেক্ষা রপ্তানী করিয়া আমরা যত টাকা বেশী পাইবার অধিকারী হই ও যতখানি সোণা রূপা বিদেশ হইতে আসে তাহা সরকারী বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিলে বিষয়টী পরিষ্কার হইবে।

বৎসর	ব্যবসায়ে বেশী পাই (কোটী টাকায়)	সোণার আমদানী (কোটী টাকায়)	রূপার আঃ (কোটী টাকায়)
১৯২৩—২৪	১৪৪' ৮৮	২৯' ১৮	১৮' ৩৯
১৯২৪—২৫	১৫৫' ০১	৭৩' ০৩	২০' ০৬
১৯২৫—২৬	১৬১' ২৪	৩৪' ৮৫	১৭' ১৫

অর্থাৎ গড়ে ১৫৫ কোটী টাকা আমাদের বেশী রপ্তানী হয়, কিন্তু আমরা সোণা রূপায় বিদেশ হইতে পাই মোটে ৬৪'৫২ কোটী টাকা।

তারপর কমিশন বলেন যে ভারতবর্ষে যদি স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়, তাহা হইলে বিদেশের অধিকাংশ সোণা ভারতে চলিয়া আসিবে—ফলে সোণার দাম কমিয়া যাইয়া ভারতবর্ষের মহা অনর্থ-সাধিত হইবে। কিন্তু সত্যই কি ভারতবর্ষে অধিকাংশ সোণা চলিয়া আসিবে? পূর্ব্বোক্ত হিসাব হইতে দেখা যায় যে ভারতবর্ষ ১৫৫ কোটী টাকা ন্যায্য হিসাবে বিদেশের নিকট পাইতে পারে—কিন্তু তাহার মধ্যে Home charges নামক বিলাতী খরচা বাবদ ভারতবর্ষকে ৫৫ কোটি টাকা দিতে হয়—তাহা হইলে ভারতবর্ষ মাত্র ১৩০ কোটী টাকা বা ৬'৫ কোটি পাউণ্ড পায়। কিন্তু কমিশন হিসাবের জারীজুরি দেখাইয়া বলিয়াছেন যে ১০৩ কোটি পাউণ্ড ভারতবর্ষ লইয়া থাকে। কমিশনের ঐ হিসাব মিথ্যা। সুতরাং বছরে ৬'৫ কোটি টাকার সোণা রূপা লইলে পৃথিবীর সমস্ত সোণা ভারতে চলিয়া আসিবে না। আর ৬'৫ কোটি পাউণ্ডের সব মুদ্রাই যে আমরা সোণা রূপায় পাইব তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই।

তারপর কমিশন বলেন যে স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকিলে ভারতবাসী সোণা ঘরে জমা করিয়া রাখিবে—সে সোণায় দেশের কোন কাজ হইবে না। সরকারী পক্ষ ভারতবাসীর এই জমা করা স্বভাবের কথা যখন তখন সময়ে অসময়ে বলিয়া থাকেন। কিন্তু দরিদ্র ভারতবাসী—যাহার গড়ে বার্ষিক আয় ৭৫ টাকার বেশী কিছুতেই নহে—সে যে কেমন করিয়া টাকা জমা রাখিবে তাহা বুঝিতে আমরা অক্ষম। যাহারা দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না—পরণে যাহাদের কাপড় নাই—তাহারা ঘরে সোণা জমাইয়া রাখিতে পারে কিরূপে তাহা আমাদের সর্ব্বজ্ঞ শাসক সম্প্রদায়ই বলিতে পারেন। আর বড়লোকেরা সোণা যদি জমাইয়াই রাখেন তাহা কি কমিশনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলেই বন্ধ হইবে? কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৪০০ আউন্স সোণা একসঙ্গে বিক্রয় হইতে পারিবে অর্থাৎ ২৩২০০ টাকা মূল্যের সোণা একসঙ্গে গবর্ণমেণ্ট বিক্রয় করিবেন। বড়লোকেরা সোণা জমাইবার ইচ্ছা করিলে অনায়াসে ২৩ হাজার ২ শত টাকা দিয়া সোণা কিনিয়া সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারিবেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের বিপক্ষে কোন প্রবল যুক্তি নাই। তথাপি স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন বন্ধ করিবার জন্য কমিশন এত ব্যস্ত কেন? এ ব্যস্ততার কারণ ইংলণ্ড ও তাহার বন্ধুদের স্বার্থরক্ষা। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ লিণ্ডসে Richard's Exchange Remedy নামক পুস্তিকায় কি কারণে স্বর্ণমাণ ভারতে প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার করিলে কমিশনের সিদ্ধান্তের কারণ বুঝা যাইবে। মিঃ লিণ্ডসে লিখিয়াছেন—"In this way a gold standard might be established in India without risk and with considerable profit to the state and the Bank of England and with advantage to the London money market. There would be no increase in the demand for gold and little decrease, if any, in the demand for silver." অর্থাৎ এইরূপে ভারতে স্বর্ণমাণ প্রচলন করিলে কোন আশঙ্কার কারণ নাই বরং ইহাতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ও ইংলণ্ডের ব্যাঙ্কের লাভ হইবে ও লণ্ডনের টাকার বাজারের সুবিধা হইবে। ভারতে সোণার দাবী আর বাড়িবে না, সম্ভবতঃ রূপার দাবীও কমিবে।

সুতরাং ভারতবর্ষকে কাগজের টুকরা দিয়া ইংলণ্ডের লোকে সোণা লইতে চাহে। কমিশন বলেন যে ভারতে সোণার দাবী বাড়িলে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সোণা পাওয়া কঠিন হইবে। ইউরোপের লোকে যুদ্ধ করিয়া সোণা খরচ করিয়া ফেলিয়াছে তাহার জন্য কি ভারতবাসী দায়ী? এখন ভারতের স্বার্থের ক্ষতি করিয়া

বিদেশের স্বার্থ রাখিবার ব্যয়ভার কি ভারতের প্রজা বহন করিবে ?

ভারতে সোণার মুদ্রা চলিলে আমেরিকার রূপার চাহিদা কমিয়া যাইবে—আমেরিকার রূপা আর ভারতবর্ষ কিনিবে না ইহাই এ দেশে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের বিরুদ্ধে ভারত সরকারের প্রধান আপত্তি। আহা যুদ্ধের সময় আমেরিকা ইংলণ্ডের কত উপকার করিয়াছে এখন তাহার কিছু প্রতিদান না করিলে কি চলে ? তাই ইংরাজেরা আমেরিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য এখন ভারতবর্ষরূপী কামধেনু দোহন করিয়া আমেরকার রূপার চাহিদা বজায় রাখিতে চাহেন।

যদি ভারতবর্ষে স্বর্ণমাণ প্রচলনের ফলে ইউরোপ আমেরিকার কিছু সুবিধা হয় তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই—কিন্তু ইহাতে যেন ভারতবাসীর অসুবিধা না হয়। এখন দেখা যাউক ইহাতে ভারতবাসীর অসুবিধা হইবে কি না। অর্থনীতির অ, আ, ক, খ, যাহারা পড়িতেছে তাহারাও জানে যে স্বর্ণমাণ বলিলে তিনটী জিনিষ বুঝায়—(১) সোণার মূল্যে মুদ্রা নির্দ্ধারণ ও মুদ্রায় সোণার ওজন ও গুণ নির্দ্ধারণ (A definition of the monetary unit in terms of gold, a definition of weight and fineness of the gold content of the monetary unit) (২) যখন ইচ্ছা তখন নোট বা অন্য মুদ্রাকে আইন নির্দ্দিষ্ট হারে স্বর্ণে পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা (the paper currency and subsidiary coin shall be convertible at any time into gold at a fixed legal ratio) (৩) সোণার টাকা তৈয়ারী করার অব্যাহত ক্ষমতা (the free coinage of one metal—gold.)

কিন্তু কারেন্সী কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতবর্ষে সাধারণ ও মধ্যবিত্ত লোকে কখনই কাগজের নোটের পরিবর্ত্তে সোণা পাইবে না। কেননা গবর্ণমেণ্ট ৪০০ আউন্স বা ১০৬৬ দুইয়ের তিন তোলার কমে সোণা কেনাবেচা করিবেন না—ঐ সোণা কিনিতে ২৩০০০ হাজার টাকার প্রয়োজন। অত টাকা খুব বড়লোক না হইলে কেহই দিতে পারিবে না। ফলে স্বর্ণমাণের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য নোট বা টাকাকে ইচ্ছামত সোণায় পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতা তাহা থাকিবে না। সোণার কোনরূপ মুদ্রাও তৈয়ারী হইবে না এমন কি ইংলণ্ডের সভরেণ, অর্দ্ধ সভরেণ স্বর্ণমুদ্রাও এ দেশে চলিবে না। সুতরাং স্বর্ণমাণ বলিতে অর্থনীতিতে যাহা বোঝে কারেন্সী কমিশন তাহা এ দেশে চালাইতেছেন না—কেবল স্বর্ণমাণের একটা ভেল্‌কী দেখাইতেছেন।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে ভারতবর্ষ—

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে এবার ভারতবর্ষের নিম্নলিখিত ছয়জন প্রতিনিধি যাইবেন বলিয়া ভারত সরকার ঘোষণা করিয়াছেন —(১) স্যার উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট (২) কর্পূরতলার মহারাজা (৩) সেখ আবদুল কাদির (৪) স্যার এডওয়ার্ড চামিয়ার (৫) স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ার (৬) স্যার বি, কে মল্লিক।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ স্বাধীন জাতিদের সম্মিলনী। সেখানে ইউরোপ ও আমেরিকার রাজনীতির প্রধান প্রধান সমস্যার আলোচনা হয়। স্বাধীন রাষ্ট্রদের মধ্যেও যাঁহাদের ক্ষমতা খুব বেশী তাঁহাদেরই মতের সেখানে মূল্য আছে। ভারতবর্ষ পরাধীন দেশ। তথাপি ১৯১৮ সালের সন্ধিতে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষকে প্রীতিভরে সহি করিতে দিয়াছিলেন বলিয়া ভারতবর্ষ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থান পাইয়াছে। এই স্থান পাওয়ার জন্য প্রতি বৎসর ভারতবর্ষকে সাতলক্ষ টাকা বা ৫৪ হাজার ৫৮০ পাউণ্ড দিতে হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষ বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের ৯৩৭ ভাগ ব্যয়ের মধ্যে ৫৬ ভাগ ব্যয় বহন করে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বাধীন উপনিবেশগুলি ভারতবর্ষের অর্দ্ধেকেরও কম খরচা দেয়—অষ্ট্রেলিয়া ২৭ ভাগ, কানাডা ৩৫ ভাগ, নিউজিল্যাণ্ড ১০ ভাগ, দক্ষিণ আফ্রিকা ১৫ ভাগ দিয়া থাকে। এমন কি ইউরোপ আমেরিকার অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রও ভারতবর্ষের দেয় ৫৬ ভাগের অনেক কম খরচা দিয়া থাকে। যথা—অষ্ট্রীয়া ৮ ভাগ, বেলজিয়াম ১৮ ভাগ, ব্রেজিল ২৯ ভাগ, বুলগেরিয়া ৫ ভাগ, ডেনমার্ক ১২ ভাগ, হাঙ্গেরী ৮ ভাগ, নরওয়ে ৯ ভাগ, পোলাণ্ড ৩২ ভাগ। কেবলমাত্র গ্রেট ব্রিটেন (১৫৫ ভাগ) ও ফ্রান্স (৭৯ ভাগ) ভারতবর্ষ অপেক্ষা বেশী খরচা দেয়—কেননা বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে তাঁহাদেরই প্রভুত্ব বেশী। জাপান ও ইতালী ৬০ ভাগ দিয়া থাকে—অর্থাৎ ভারতবর্ষ অপেক্ষা কিছু বেশী।

ভারতবর্ষ এত খরচা দিলেও বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে তাহার কোনই ক্ষমতা নাই। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতি বা কাউন্সিলে ৪ জন স্থায়ী সভ্য আছেন। (গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ইতালী) আর ৬ জন অস্থায়ী সভ্য আছেন। অস্থায়ী সদস্যের সংখ্যা ৯ জন করিবার কথা হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কার্য্যকরী সমিতিতে গ্রহণ করিবার কোনও প্রস্তাব এতাবৎ হয় নাই—হইলেও গৃহীত হইবে না—গৃহীত হইলেও ইংরাজের ক্ষমতা বৃদ্ধি ছাড়া ভারতবাসীর কোন লাভ হইবে না।

ভারতবর্ষের ছয়টী প্রতিনিধির ব্যয়ভার আমাদের দিতে হয়—লীগের খরচ দিতে হয়—অথচ লীগ অফ নেশনে আমাদের প্রতিনিধি চায় না। ভারত সরকার প্রতিনিধি মনোনয়ন করিয়া পাঠান। অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টও অবশ্য প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন—নির্ব্বাচন করেন না। কিন্তু ভারত সরকারের সহিত অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্টের আকাশ পাতাল তফাৎ। অন্যান্য দেশের গবর্ণমেণ্ট জনসাধারণের নিকট দায়ী। আমাদের ভারতীয় শাসকগণ ভারতবাসীর নিকট বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন। এস্থলে অন্যান্য সরকার জনসাধারণের মতের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিনিধি মনোনয়ন করেন আর আমাদের সরকার বাহাদুর খেয়ালমত প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। অবশ্য ভারতবাসী দুই তিন জন প্রতিনিধিও কিন্তু রাষ্ট্র সঙ্ঘে যাইবার সৌভাগ্য লাভ করে—কিন্তু তাঁহাদের মুখপাত্র থাকেন স্যার উইলিয়ম ভিন্সেণ্টের মতন একজন গবর্ণমেণ্টের নিজের লোক। এই জন্য ভারতবাসী প্রতিনিধি বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে যাইয়াও ভারতের দুঃখদৈন্য ও দাবী উপস্থিত করিতে পারেন না।

বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের সহিত আমাদের সম্বন্ধ রাখা খুবই দরকার—কিন্তু এই সম্বন্ধ যাহাতে প্রকৃত হয় তাহাও করা প্রয়োজন। আমাদের এরূপ দাবী করা উচিত যে ভারতীয় অ্যাসেম্বিলির নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে গবর্ণমেণ্ট বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রতিনিধি ও তাঁহাদের মুখপাত্র নির্ব্বাচন করিবেন। তাহা হইলে জনসাধারণের প্রতিনিধিই বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘে যাইতে পারিবেন।

ভারতীয় মুসলমানের ভ্রম—

ভারতবর্ষে এখন যত মুসলমান আছেন তাহার অধিকাংশই যে একসময়ে হিন্দু ছিল তাহা ঐতিহাসিক সত্য। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কৃত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" বিভিন্ন খণ্ডে প্রদত্ত বংশ তালিকাগুলি ধৈর্য্য সহকারে পাঠ করিলেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে বাঙ্গলাদেশে এমন অনেক পরিবার আছেন যাঁহাদের এক শাখা হিন্দু আর একশাখা মুসলমান। আরব পারস্য তুরস্ক ভারতীয় মুসলমানের বাসস্থান মনে করা ভ্রম মাত্র। ভারতবর্ষই তাঁহাদের একমাত্র বাসস্থান। আলীভ্রাতৃদ্বয় সম্প্রতি করাচীতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতাতেও একথা স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের সহিত ভারতীয় মুসলমানের উন্নতি অবনতি অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। সেই জন্য ভারতে যাহাতে স্বরাজ আন্দোলন সফল হয় তাহাই তাহাদের করা কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান ভাদ্রমাসের "প্রবাসী"তে দেওয়ান একলিমুর-রাজা চৌধুরী সাহেব একখানি পত্রে নিজেকে আর্য্য হিন্দুর বংশধর বলিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন। পত্রখানি বর্ত্তমান সমস্যাপ্রসঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধে উদ্ধার করিলাম।

"ভারতীয় মুসলমানের ভ্রমশীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম যে—কোন কোন মুসলমান ভারতবিজেতা মোগল-পাঠান বা আরব জাতির বংশধর বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিয়া গৌরবান্বিত মনে করিয়া থাকে। ইহা সত্য হইলে তাহারা যে নিতান্ত ভ্রমক্রমেই এরূপ করে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবে আমার মনে হয় এরূপ ভুল ধারণা অধিকাংশ আর্য্যবংশীয় মুসলমানই করে না এবং করা উচিতও নয়। কেননা যাহাদের শরীরে হিন্দুরক্ত প্রবাহিত তাহাদের হিন্দুদের বংশধর বলিয়াই গৌরব অনুভব করা উচিত। ইহার কারণ এই যে, এ দেশীয় হিন্দুগণ আর্য্যবংশোদ্ভূত এবং আর্য্যগণ অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সুতরাং এহেন প্রাচীন সভ্যজাতির যাহারা প্রকৃত বংশধর তাহারা কেন যে নিজের প্রকৃত বংশ পরিচয় গোপন করিয়া

"সেমেটিক" বা অন্য কোন অপেক্ষাকৃত অসভ্য জাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবে, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম বরং আমি ব্যক্তিগত ভাবে ভরদ্বাজ গোত্রীয় আর্য্য সন্তান বলিয়া আপনাকে মহা গৌরবের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করি এবং এইজন্য আরোও অহঙ্কার করি যে, আমারি পূর্ব্বপুরুষ কুসংস্কারের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন বিচার-শক্তির সাহায্যে ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

চৌধুরী সাহেবের মতন যদি অন্যান্য মুসলমান নিজেদের বংশের ইতিহাস একটু ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখেন তবে সাম্প্রদায়িক বিরোধের অনেকটা প্রশমন হয়।

জীবন-বেদ

(বাউল)

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

(ও মন) কেমন করে' জীবনটারে দিস্ ফাঁকি
(মন বল দেখি)
কোন কাজই করলি না শেষ রইল পড়ে' সব বাকি।
(ভেবেছিস্) এমনি করেই কাল
(কি তোর) কাটবে চিরকাল
জীবন পথে জমবে না তোর বিপদ জঞ্জাল
(তোরে) কালশমনে ধরবে যখন বেরিয়ে যাবে চালাকী।
(ও তোর) গর্ব্ব হবে চুর
(শেষে) হবি রে ফতুর
বিশ্ব তোকে ঘৃণাভরে করবে রে দূর দূর
(ও মন) ভুলবি তখন আত্মাভিমান মরবি লাজে মুখ ঢাকি।
(সুখে) দিচ্ছ হাওয়া গায়
(কাটাও) দিন যে গো হেলায়
মনুষ্যত্ব বিকায়েছ বিলাসিতার পায়
(তোর) এমনি সুখে কাটবে না দিন শিক্ষা ঠেকেও
পাও নাকি ?
(কাজে) লাগবে না কি মন
(মোহে) অন্ধ অচেতন
জড়তাকে আঁকড়ে ধরে রইবি চিরন্তন
(মনে) জাগবে কবে উচ্চ আশা ফুটবে কবে জ্ঞান-আঁখি ?
(নিজের) শক্তিকে বিশ্বাস
(করে) থাকবি বারোমাস
পরের উপর নির্ভরতায় হবি রে হতাশ
(ওরে) একলা ভবে এসেছিলি যেতে হবে একাকী।
(সমাজ) দলাদলি ছার
(বৃথা) জাতিভেদ অসার
উচ্চ নীচের বর্ণ নিয়ে করিস রে বিচার
(পড়ে') থাকবে রে তোর বর্ণবিচার উড়ে যাবে প্রাণপাখী।
(মায়ের) জাতিকে ভক্তি
(করলে) পাবি রে শক্তি
বিশ্বমায়ের চরণতলে করবি রে নতি
(মায়ের) স্নেহের কোলে দুঃখ ভুলে শান্তি পাবি
ভাবনা কি ?
(পরের) ব্যথাতে ক্রন্দন
(করা) মহত্ত্বের লক্ষণ
পরের হিতে শিখবি কর্ত্তে জীবন বিসর্জ্জন
(ও মন) তরে' যাবি মুক্তি পাবি তাঁর পদেতে মন রাখি।

মায়ের দরদ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বেলা যখন শেষ হইয়া আসিল তখন পীনার কার্য্য শেষ হইল। পীনা পিতাকে ভাত বাড়িয়া দিয়া টেঁপার মাতার জন্য ভাত লইয়া তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিল। অনেকেই টেঁপার মাতাকে আহারের জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিল কিন্তু সে আহার করা দূরে থাক কাহারও কথায় কোন উত্তর দেয় নাই। পীনা ভাবিল একবার সে নিজে যাইয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবে। যাইবার সময় করিম জিজ্ঞাসা করিল "খেয়ে গেলিনে?" পীনা উত্তর করিল, "আসিয়া খাইব।"

পীনা যাইয়া টেঁপার মাতাকে অনেক সাধ্যসাধনা করিল, কিন্তু সে পূর্ব্ববৎ নির্ব্বাক রহিল। পীনার তখন একটু রাগ হইল। সে একটু ঝাঁঝের সহিত কহিল—"দেখ, আমি সারাদিন ভাত রাঁধিয়াছি, আমার নিজের এখনও খাওয়া হয় নাই। তোকে খাওয়াইয়া গিয়া নিজে খাইব ভাবিয়াছিলাম। কিন্তু খোদার কসম আমি তোকে সত্য বলছি, তুই যদি না খাস তবে আমিও খাব না। দেখি তুই বা কত উপাস করিতে পারিস আর আমিই বা কত উপাস করিতে পারি।"

পীনার কথা শুনিয়া টেঁপার মাতা কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার মুখের দিকে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল—তারপর তাহার দুটী চক্ষে বাণ ডাকিয়া গেল—শীর্ণ শুষ্ক দুটী গণ্ড বাহিয়া মুক্তা ঝরিতে লাগিল। অভাগিনীর পাষাণ বুক গলিয়া জল হইয়া চোখ দিয়া বাহির হইতেছিল, সে আর থাকিতে পারিল না, পীনাকে কোলে টানিয়া লইয়া স্নেহরসে অভিসিক্ত করিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে পীনা আবার কহিল—"মা, ওঠ, ভাতখা, তুই না খেলে যে আমি খেতে পাচ্ছি না।"

টেঁপার মাতা এইবার প্রথম কথা কহিল। সে উত্তর দিল—"যদি টেঁপাকে আবার দেখতে পাই তবেই আবার ভাত খাব, নইলে আর খাব না।"

পীনা। আমি বলছি তুই ভাত খা, টেঁপার জন্য কোন ভাবনা নাই, আল্লাতাল্লার মেহের বাণীতে তাকে নিশ্চয় দেখতে পাবি?

টেঁ-মা। তুই কেমন করে জানলি মা?

পীনা। আমার মন বলছে।

টেঁ-মা। আমারও একবার মনে হচ্ছে তাকে আবার দেখতে পাব আবার এক একবার মনে হচ্ছে দেখতে পাব না। কোনটা যে ঠিক তা কেমন করে বুঝব? জানিস পীনা, সে তাদের লাঠীর ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল—আমি তাকে কোলে নিয়ে বসেছিলাম। তারা আমার কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিল আমি তাকে ছেড়ে দিতে চাইনি—তাই তারা আমার মাথায় লাঠী মেরে তাকে নিয়ে চলে গেছে। তারা কি আর তাকে জ্যান্ত ছেড়ে দেবে? কেমন করে তাকে ফিরে পাব পীনা? আমি যে কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না।

পীনা। খোদা উপায় করবেন। বাবা বলেন যেখানে কোন উপায়ই থাকে না সেখানে খোদাকে ডাকলে তিনি উপায় করে দেন। আগে তুই ভাত খা, তারপর আয় তুই আর আমি দুজনে মিলে খোদাকে ডাকি, তিনি অবশ্যই পথ দেখিয়ে দেবেন।

টেঁ-মা। মা, তোর কথায় আমার প্রাণে ভরসা হচ্ছে। তোর কথাই শুনব কিন্তু তুই স্বীকার কর, তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য তুইও আমার সঙ্গে খোদাকে ডাকবি?

পীনা। নিশ্চয় ডাকব। শুধু ডাকব কেন, তাঁর হুকুমে তাকে তোর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।

ইহার পর টেঁপার মাতা আহার করিতে আর কোন আপত্তি করিল না। মাণিক ও কাদেরের ভাত চিবাইয়া খাইবার শক্তি ছিল না পীনা দুমুঠা ভাত চটকাইয়া মণ্ডপ্রস্তুত করিয়া কাপড় দিয়া ছাঁকিয়া সরবতের মত করিয়া তাহাদিগকে খাওয়াইল তারপর বাড়ী চলিয়া গেল।

(৬)

তে-মোহনার চরের লোকদের বুঝিতে দেরী হইল না যে টেঁপা তখনও মরে নাই। তখন তাহাদের মধ্যে পরামর্শ চলিতে লাগিল উহাকে লইয়া কি করা যাইবে। কেহ বলিল— উহার যাতনার অবসান করিয়া দিয়া উহাকে পদ্মার গর্ভে সমাধিস্থ করা হউক। কেহ বলিল—"ও আর কতক্ষণ বাঁচিবে? যা লাঠীর ঘা খাইয়াছে তাহাতে অচিরেই উহার ভবলীলা সাঙ্গ হইবে, অতএব বৃথা আর একটা গুনাহ করিয়া লাভ কি?" একজন অতিরিক্ত বুদ্ধিমান লোক কহিল—"উহাকে মারিয়া কাজ নাই। চেষ্টা করিয়া উহাকে বাঁচান যাউক, তারপর আর একদিন সুযোগ বুঝিয়া সকলে মিলিয়া নবীর চরে যাওয়া যাইবে, সেখানে মাণিক কাদের ও ইহার মাতার সম্মুখে ইহাকে জবাই করা যাইবে। তাহা হইলে মাণিক ও কাদের খুব জব্দ হইবে। নবীর চরে ওই দুই ব্যাটাই সব চেয়ে বেশী বদমায়েস। উহারা ঠাণ্ডা হইলে আর কেহ টঁ্যা ফোঁ করিতে পারিবে না, ফলে তে-মোহনার চরের একাধিপত্য হইবে।"

এ কথাটা কাহারও কাহারও মনে লাগিল, ফলে টেঁপা তখনকার মত বাঁচিয়া গেল। শত্রুরা টেঁপাকে লইয়া গিয়া তাহাদের সর্দ্দার রহিম খাঁর বাটীতে গোয়াল ঘরের মাচার উপর ফেলিয়া রাখিল। সেখানে টেঁপা একটা ছেঁড়া চাটার উপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া রহিল, তদুপরি তাহার ভয়ানক জ্বর হইল।

এখানে রহিমের কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রয়োজন। রহিম রাজবাড়ীর বাবুদের বেতনভোগী লাঠীয়াল সর্দ্দার। বয়স প্রায় পঞ্চাশ, একটা চক্ষু নাই অবশিষ্ট চোখটা দেখিলে মনে হয় যেন একটা ক্রুর সর্প গভীর গর্ত্তের মধ্য হইতে উঁকি মারিতেছে, তাহার একটা চক্ষু জল্ জল্ করিতেছে। পৃথিবীতে এমন দুষ্কর্ম্ম নাই যাহা মুনিবের হুকুমে বা নিজ প্রয়োজনে রহিম না করিতে পারিত। তাহার ছেলে পুলে কেহ নাই। একে একে তাহার দুইটা কবিলা গত হইয়াছে, তাহার বর্ত্তমান কবিলাকে সে তৃতীয় বারে নিকা করিয়াছে। রহিমের কবিলার নাম লয়লা বিবি, দেখিতে শুনিতে মন্দ নহে, বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, একটু বেঁটেসেঁটে গোলগাল। বয়স প্রায় ৩৫।৩৬ তাহার দৃষ্টির ভিতর এমন একটা কিছু ছিল, যাহাতে লোক বশীভূত হইত—এমন কি রহিম নিজেও নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার কথার প্রতিবাদ করিত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি রহিম নিঃসন্তান। লয়লা পূর্ব্ব স্বামীর নিকট থাকিতে তাহার একটী ছেলে হইয়াছিল। ছেলেটী দশ বার বৎসর বয়সে মারা যায়। তদবধি তাহার স্নেহপ্রবণ মাতৃহৃদয় ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল। সে নিজের একটী ছেলের জন্য নিয়ত খোদার নিকট প্রার্থনা করিত, পীরের সিন্নি মানত করিত, গুনী ফকির পাইলে তাবিজ, শিকড়-মাকড় গ্রহণ করিত আর প্রতিবেশিনী বৃদ্ধাদের পরামর্শ মত রহিমের অজ্ঞাতসারে নানারূপ তুকতাক্ করিয়া সন্তান ভাগ্যে ভাগ্যবতী হইবার প্রয়াস পাইত। এততেও কিন্তু খোদা-মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। লয়লা সময় সময় পরের ছেলেকে আদর করিত, কোলে লইত, মুখ চুম্বন করিত, কখনও কখনও স্বামীকে লুকাইয়া কোনও কোনও দরিদ্রা পুত্রবতী প্রতি-বেশিনীকে চালটা, মুগটা, কড়াইটা, হইল বা গুড়টুকু তেঁতুলটুকু দিয়া আনুকূল্য করিত কিন্তু কখনও পরের ছেলেকে আপন করিবার প্রয়াস পাইত না। কেননা সে ধ্রুব জানিত যে পরের ছেলে কখনও আপনার হয় না। রহিমের আর্থিক সচ্ছলতায় আকৃষ্ট হইয়া প্রতিদান পাইবার আশায় দু'একজন নিঃস্ব লয়লাকে একটী ছেলে দান করিবার প্রস্তাবও করিয়াছিল কিন্তু সে গা করে নাই। রহিমের কিন্তু ও বিষয়ে কোন দুর্ভাবনাই ছিল না। প্যান্-ঘেনে প্যান্-পেনে ছিঁচকাঁদুনে ছেলেপিলে সে মোটে পছন্দই করিত না।

রহিমরা টেঁপাকে গোয়াল ঘরের মাচার উপর একখানি ছেঁড়া চাটায় ফেলিয়া রাখিয়াই আপাততঃ কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে মনে করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল এবং সকলে মিলিয়া তামাকু ধ্বংস করিতে করিতে পরামর্শ করিতে লাগিল পুলিস আসিলে কি করিতে হইবে, কে কিরূপ জবাব দিবে। টেঁপার সম্বন্ধে কাহারও কোন দুর্ভাবনা ছিল না। প্রয়োজন হইলে তাহার গলায় একটা কলসী বাঁধিয়া পদ্মার জলে ডুবাইয়া দিতে কিছুমাত্র দেরী হইবে না। আর একবার ডুবাইয়া দিতে পারিলে পুলিসের বাবাও তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না।

লয়লার ভারি কৌতুহল হইল। তাহার স্বামী এবং তদীয় সঙ্গীরা কাহাকে আনিয়া গোয়ালঘরের মাচার উপর রাখিয়াছে তাহা না দেখিয়া সে কোনমতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাই সে গরুকে জাব দিবার সময় স্বামীর নিষেধ সত্বেও চুপিসারে একবার টেঁপাকে দেখিয়া লইল। সে দৃশ্য দেখিয়া তাহার মাতৃহৃদয় গলিয়া গেল।

লয়লা দেখিল যেন তাহার নিজের দশ বার বৎসর বয়স সেই হারাণ শিশুটী বড় হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নিষ্ঠুর পিশাচেরা তাহার মাথায় আঘাত করিয়া সেইস্থানে ফেলিয়া রাখিয়াছে। তাহার সেই কাঁচা ঘা তখনও দপ্ দপ্ করিতেছে, আশে পাশে রক্ত শুকাইয়া লম্বা চুলগুলির সঙ্গে জড়াইয়া জটা পাকাইয়া গিয়াছে, চক্ষু দুইটী নিমীলিত, কথা কহিবার শক্তি নাই, শুধু এক একবার অতিকষ্টে অস্ফুটস্বরে কহিতেছে—"মা! জল।" মায়ের প্রাণ আর কি স্থির থাকিতে পারে?' সে ছুটিয়া গিয়া ঘরের মৃৎকলসী হইতে এক বদনা জল লইয়া গোয়াল ঘরে ফিরিয়া আসিল। সে সযত্নে টেঁপাকে জলপান করাইল, তারপর আস্তে আস্তে তাহার ক্ষতস্থান ধোয়াইয়া দিল। টেঁপা ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। প্রথমে শুশ্রূষা কারিণীর মুখের দিকে তারপর চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। সে যে কোথায় কেন আসিয়াছে তাহা কিছুতেই তাহার মনে পড়িল না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শুশ্রূষা কারিণীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার ঠোঁট নড়িল কিন্তু কথা বাহির হইল না। পাছে টেঁপা কথা কহিয়া ফেলে, পাছে তাহার স্বামী কিম্বা অন্য কেহ সে কথা শুনিতে পায় এই ভয়ে লয়লা তাড়াতাড়ি কহিল,—"কথা কহিও না, চুপ করিয়া থাক।" টেঁপা পুনরায় চক্ষু বুজিল। লয়লা তাড়াতাড়ি গরু দুহিয়া একটু দুধ লইয়া গোপনে উহা গরম করিয়া টেঁপাকে খাওয়াইতে গেল। তখন তাহার মনের ভিতর কি হইতেছিল কে জানে— যত রাজ্যের অশ্রু আসিয়া তাহার চোখে জমা হইতেছিল তাহার বুকের ভিতরটা যেন থাকিয়া থাকিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, সে কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছিল না। একটীর পর একটী অশ্রুবিন্দু তাহার গণ্ড বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, আর সে একটা ছোট ঝিনুকে করিয়া গরম দুধের আকারে মাতৃবক্ষের অমৃত পীযুষ তাহাকে পান করাইতেছিল। টেঁপা অর্দ্ধেক জ্ঞানে অর্দ্ধেক অজ্ঞানে উহা পান করিল তারপর যেমন চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল তেমনি পড়িয়া রহিল। লয়লা তখন খানিকটা বিচালী লইয়া আসিয়া টেঁপাকে একটু সরাইয়া তাহার শয্যার সেই ছেঁড়া চাটার উপর বিছাইয়া দিয়া তাহার উপর একখানি ছেঁড়া কাপড় পাতিয়া তাহার উপর টেঁপাকে শোয়াইয়া দিল।

(ক্রমশঃ)

প্রতিকার

[শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়]

—এক—

পূব আকাশের কোল হইতে তখনও সবটুকু অন্ধকার মুছিয়া যায় নাই, তাহারই উপর অনাগত সূর্য্যের রক্ত-জ্যোতি আসিয়া পড়িয়াছে।

পল্লীর পথ।

তাহারই একধারে উঁচুনীচু জায়গার উপর ছোট মাটীর ঘরগুলি গভীর সুপ্তিতে মগ্ন; পথের আর একটা পাশে শান-বাঁধানো পুকুর-ঘাট বিলীনমান রাত্রির বিদায়ের ফিকা হাসি বুকে ধরিয়া স্থির হইয়া রহিয়াছে। পুকুরের উপরের একটা ধাপে কোন্ একটা ঘর ছাড়া মেয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে!......

ভোরের আলো প্রকৃতির গৃহপ্রাঙ্গনে চারিদিক হইতে উঁকি দিল। পথে কয়েকটা লোকও চলিল; কয়েকটা গরুর গাড়ী পর্ব্বত প্রমাণ শাক-সব্জী বোঝায় লইয়া গঞ্জের দিকে চলিয়াছে; গাড়ীর চালক নিশ্চিন্ত মনে তৈল-ধূলা-মলিন চাদরখানা আগাগোড়া মুড়ি দিয়া তাহারই একপাশে ঘুমাইতেছে। গাড়ীর নীচে যে কালীপড়া আলোটা ঝুলিতেছে, তাহা যে নিভাইতে হইবে মনে নাই। গরুগুলা যেন গন্তব্য পথ চিনে।

সুমুখের একটা চালা হইতে একটী মেয়ে জল লইতে আসিতেছিল, দূর হইতে ঘাটের ধারে মেয়েটাকে অমন করিয়া ঘাড় মাথা গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া ত্বরিৎপদে ঘরে ফিরিল; এবং অনতিবিলম্বে দু'চারজন সখী সহচরিদের সহিত পুনরাগমন করিল।

তাহাদেরই একজন চাপাস্বরে বলিল,—হ্যাঁলা, মুখুয্যে-দের টেঁপী না?

অপর একজন বলিল, তা মুখুয্যেদের মেয়ে অমন করে পড়ে থাকবে কেন! ওদের ত' আর ঘর দোরের অভাব পড়েনি।

বহুক্ষণ নিরীক্ষণ পর্য্যবেক্ষণের পর স্থির হইল টেঁপীই বটে। জল লওয়া স্থগিত রহিল; বামুন পাড়ায় খবর ছুটিল।

একটী মোটাসোটা তাকিয়া ক্লাসের লোক বলিলেন,—হ্যাঁহে মুখুয্যে তাহ'লে এল না?

আর একজন, সে বেচারা চওড়ার অনুপাতে লম্বাই ঢের বেশী, সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, না এল আর কোই! মুখুয্যে-গিন্নি ভেতর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'কর্ত্তার মাঝরাত থেকে বড় জ্বর, চলা-ওঠা সব বন্ধ।' ক্যাবলা তবু বললে,—টেঁপীকে পাওয়া গেছে ঘাটের ধারে, আপনারা আসুন।

কিন্তু গিন্নি যখন বললেন,—আর ঘাটের ধারে কেন বাবা! ও কালামুখীর জায়গা আর খানিক নীচে হ'লেই হ'ত! ওর মুখ আর আমরা দেখব না। তখন বাধ্য হয়ে ফিরতে হ'ল।

অত্যাচারিতা নারীর সহায় হীনতায় মাতৃত্বও একটু ঘা খায় না! এমন পৌরুষ, এমন বাৎসল্য, সবই এই জাতটার ভাগ্যের গুনে জুটিয়াছিল!

মোটা লোকটী বলিলেন,—কিন্তু এখন মেয়েটাকে নিয়ে করা যায় কি! খুব সমাজ-নিষ্ঠা দেখালে মুখুয্যে যা' হ'ক! বললুম, জানাজানি হ'বার আগে ঘরে নিয়ে গে তোল, সব চুপ্ চাপ হয়ে যাক্। তা সে টেঁপীর অদৃষ্ট! ও ধারটা হইতে একদল ছেলে, তা'দের ক্লান্তপ্রায় বিক্রম যাহাতে অচল না হইয়া পড়ে তাহারই জন্য মহা কলরবে, পথের ধূলিকে সচকিত করিতে করিতে আসিতেছিল! তাহারা পদব্রজে সমুদ্র দেখিতে বা'র হইয়াছে। চোখে চশমা, মাথায় চাদর বাঁধা তাহাদের একজন জিজ্ঞাসা করিল, মশাই এটা কোন্ গ্রাম বলতে পারেন?

পাশ হইতে একজন ঠেলিয়া দিয়া তাহাকে বলিল,—এই

থাম ।— দেখছিস না ভয়ঙ্কর কি একটা ঘটেচে এখানে। চ' চ', খানিক এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেই হ'বে বিপিন।

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছে জানতে পারি কি ?

ক্ষয়িষ্ণু লোকটী বলিল,—আর জেনে কি করবেন মশাই। ব্রাহ্মণের মেয়ে, সন্ধ্যেবেলায় রাজবাড়ীতে কৃষ্ণকথা শুনতে গিয়েছিল। পথ থেকে কটা ছোঁড়া মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যায়। এখন এই শেষরাত্রে ঘাটের ধারে ফেলে দিয়ে গেচে। এখনও ত জ্ঞান হয়নি।

ধীরেশ জিজ্ঞাসা করিল, মেয়েটীর কেউ নেই বুঝি ?

বিলক্ষণ! তাঁরা সকলেই বর্ত্তমান, কিন্তু অকারণে। মেয়েকে তাঁরা আর ঘরে স্থান দিতে চান না। পরকালে যাই হ'ক না, সমাজের ভয়টা বড্ড কিনা।

কেন ?

অতশত জানিনে ম'শায়, বললুম টেঁপীকে আপনাদের পাওয়া গেচে, তাতে ঐ উত্তর এল।

ধীরেশ দলের মধ্যে সকলের চে' অবস্থাপন্ন। সে সঙ্গীদের প্রতি চাহিয়া বলিল, চলহে একটা অভিযান করে আসা যা'ক্। রাজকন্যা যদিও পথের ধারেই রইলেন, তবু চল! টু দি রেস্কু!

সকলে উহার প্রতিধ্বনি করিল—টু দি রেস্কু!

ধীরেশ বলিল, এঁদের বাড়ীটা দেখিয়ে দেবেন কি একবার!

ক্ষীণকায় লোকটী বলিল, চলুন দেখিয়ে দিতে আর আপত্তি কি থাক্‌তে পারে। তবে আমাদের নামটা তাঁদের কাছে করবেন না; তাঁরাই গ্রামের মাথা কিনা—

সেদিন অতি প্রত্যুষেই গ্রামটা ভয়ানক ব্যস্ত হইয়া পড়িল। পুকুরঘাটে জল আনিতে আসিয়া, সকলেই ঘাটে আসিবার উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া টেঁপীর অনাগত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়া উঠিলেন।

মুখুয্যে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া বিপিন ডাক দিল—নিবারণ বাবুকে একবার বাইরে আসতে হচ্চে! নিবারণ বাবু!

নারী কণ্ঠের উত্তর আসিল,—তাঁর বড্ড জ্বর।

বিপিন চীৎকার করিয়া বলিল,—জ্বর হ'লেও বাড়ীর বা'র হওয়া যায়; তাঁকে আসতে একটু অনুমতি দিন! আমরা সকলেই ব্রাহ্মণ সন্তান, মুখ দেখলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'বে না।

খানিক পরে ভেতর হইতে কে কাহাকে বলিল, ও খেঁদী, বেশ মোটা দেখে একটা লেপ দে' দেখি—

উত্তেজিত বিপিন বলিল, শিগ্‌গির আসতে বলুন তাঁকে, নইলে বাড়ী চড়াও হ'য়ে লেপের ভেতর থেকে টেনে আনব।

"কোত্থেকে আসচেন আপনারা ?"

বললে বুঝতে পারবেন না। আমরা পথিক।...

একটা চেক্‌কাটা র‍্যাপার গায়ে দিয়া নিবারণবাবু বা'র হইলেন। বিপিন অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, জ্বর হয়েচে না শুধু কাঁপন ধরেচে ?

মুখুয্যে কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

ধীরেশ জিজ্ঞাসা করিল, আপনারই নাম নিবারণবাবু বুঝি ?

মুখুয্যে গোড়াগুড়িই চটিয়াছিলেন, বলিলেন, অধীন দশজনার কাছে ঐ নামেই পরিচিত।

আপনার মেয়ের নাম টেঁপী ?

মুখুয্যে হঠাৎ তড়িৎস্পৃষ্টের মত বলিয়া উঠিলেন, সে কথা কেন ?

বিপিন ঘুরিয়া ফিরিয়া মুখুয্যের বাড়ীখানি দেখিতেছিল; সে ফিরিয়া বলিল, আর জিজ্ঞাসা করতে হ'বে না হে। উনি স্বীকার পেলেন যে উনিই টেঁপীর পিতৃদেব।

নিবারণ আর একমাত্রা চটিলেন।

ধীরেশ বলিল, আপনি টেঁপীকে ঘরে নিতে অস্বীকৃত হয়েচেন কেন ?

আমার ইচ্ছা।

বিপিন বলিল, কিন্তু ওরূপ ইচ্ছাকে ত ঠিক সদিচ্ছা বলে না।

নিবারণ বলিলেন, "আপনি থামুন ম'শায়, একজনকেই বলতে দিন।" বিপিন আবার গৃহ পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হইল।

ধীরেশ বলিল, আপনি যে মেয়েটীর দোষ কোথায় খুঁজে পাচ্চেন, তা' ত বুঝতে পারি না ম'শায়। তার ওপর দিয়ে যে অত্যাচারের ঝড় হয়ে গেল, সে'ত তার সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় এবং সম্পূর্ণ অভাবিত! আপনার এখন উচিত মেয়েটীকে

ঘরে এনে সান্ত্বনা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, সুখী করে তোলা—কাল সন্ধ্যার স্মৃতির হ'তে মুক্তি দেওয়া। তা নইলে এর যে কি পরিণাম হবে, সেটা একটু ভাবলেই বুঝবেন, বোধ করি বেঁচে থাকাও তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠবে।

নিবারণ স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, সে আমি যথেষ্ট বিবেচনা করে দেখেছি। ও হারামজাদীকে ঘরে ঢোকালে আমায় জাতে পতিত হ'তে হবে না!

ধীরেশ বলিল, জাত, সমাজ সমস্তই ত আপনার হাতে—! এবং আরও অনেকেই আমার কথাই বলছিলেন।—

ওরা অমন বলেই থাকে; আবার ঘরে এনে স্থান দিলে জোট হয়ে আমার অন্ন মারবার চেষ্টাও ওরাই দেখবে। আমি ইচ্ছে করে জাতটা দিতে পারি না ত!

বিপিন আশুর কাণে কাণে বলিল, 'ভদ্দরলোকের বোধ হয় অনেক ক'টী খুচরো মেয়ে আশু, এমনি করে তাদের একটীর হাত এড়ালেন।' তারপর ধীরেশকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দোল দুর্গোৎসবে নেমন্তন্ন আসটা, ঘটীটা, বাটীটা বৎসরে এই ঘরে এসে থাকে। মেয়েকে ঘরে স্থান দিয়ে ত সেগুলি থেকে উনি আপনাকে বঞ্চিত করতে পারেন না! এ তোমাদের বড় অন্যায় ধীরেশ—"

"যাক্। এখন কাজের কথা হ'ক—আপনার মেয়েটীর কি করতে চান আপনি?" ধীরেশ নিবারণকে জিজ্ঞাসা করিল।

নিবারণ শুষ্কভাবে বলিলেন, ও মেয়ের নামও আমি করি নে। তার যেখানে ইচ্ছে হয় যাক।

বিপিন সহসা উদ্দীপ্ত হইয়া বলিল, বলুন নিবারণবাবু আর একবার, কি বললেন। 'যেখানে ইচ্ছা যাক!' আপনার মত তাঁর ইচ্ছেটা এখনও অত সম্ভব হয় নি! আর যদিই বা তিনি ইচ্ছেমত যেখানে সেখানে যান, তা হ'লে তাতে আর আপনার জাত ধর্ম্ম কিছু যাবে না, কেমন? আপনার ধর্ম্মনিষ্ঠার খ্যাতি একেবারে দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে!—

ধীরেশ বাধা দিয়া বলিল—আহা বিপিন, থাম। কথা হ'ক—

বিপিন তেমনই সুরে কহিল, কথা আমরাও বলতে জানি হে। শুনুন ম'শায়, মেয়েটিকে যদি নিতে সত্যিই আপনার মত না থাকে ত' আমাদের সঙ্গে তাঁকে ছেড়ে দিন। আমাদের পূজা পার্ব্বণের নিমন্ত্রণ বন্ধ হবার ভয় নেই। কেমন রাজী আছেন?

না। তা'তে আমার আপত্তি নেই।

তা হ'লে আমরা তাই করি?

'বেশ, তাই করুন।' বলিয়া নিবারণবাবু ভিতরে ঢুকিবার উদ্যোগ করিতেই বিপিন বলিল, এরি মধ্যে ভেতরে চললে হবে না নিবারণবাবু। আমরা ক'জনে খেয়েদেয়ে যেতে চাই। আপনি ভেতরে গিয়ে তা'রি একটু জোগাড় দেখুন গে। শুধু নিয়ম রক্ষার মত করলে হবে না—উত্তম মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন করবেন, নইলে হয়ত উত্তম মধ্যমের প্রয়োজন হবে।

—দুই—

ধীরেশ ও টেঁপীকে খালের ধারে পৌঁছাইয়া দিতে বিপিন, আশু প্রভৃতি সকলেই আসিয়াছে। বন্ধুরা স্থির করিয়াছিল ধীরেশ মেয়েটীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলে তাহারা সমুদ্রের প্রতি যাত্রা করিবে।

বিপিন বলিল, আমরা গিয়েই একেবারে তোর ওখানে উঠব। যাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছ, তার শ্রীহস্তের আহার্য্য দিয়ে এমন ক্লান্তদের পরিতৃপ্ত করতে হবে। আশা করি, এর মধ্যে তিনি সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারবেন।

আশু ও মহেশ একখানি শালতি ঠিক করিতে গিয়াছিল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কাল সকালের আগে পৌঁচে দিতে পারবে বলে ত মনে হয় না। এইখানেই ত' সন্ধ্যে হ'ল।

তা হ'ক, কোনোরকমে নিয়ে যেতে পারলেই হ'ল। আর হ্যাঁ, তোরা ফিরছিস কবে?

মহেশ বলিল, পরশু ত বটেই। তুমি কি বল বিপিনদা'?

বিপিনেরও সেইরূপই ইচ্ছা, তাহা সে জানাইল।

নিবারণের মেয়ে গীতা বা টেঁপী সঙ্কুচিত লজ্জায় এতগুলা পুরুষের মধ্যে দাঁড়াইয়া ক্রমাগত ঘামিয়া উঠিতেছিল। তাহার ক্ষুদ্র ধারণা দিয়া সে বুঝিতে পারিল না, তাহাকে

তাহার গ্রাম হইতে কেন ইহারা লইয়া যাইতেছে। তাহার পিতা, মাতা, ছোট ছোট ভাই বোনগুলি সকলেই ত পূর্ব্বের মত রহিলেন, তবে! এক একবার পূর্ব্ব রাত্রির স্মৃতি মনে পড়িতেছিল···সেই বুড়া শিবতলা—কতকগুলা যুবক···কিন্তু ইহারা ত তারা নয়, তবে ?...

মুখ ফিরাইয়া গীতা যখন আপনাকে ঘৃণা করিবার চেষ্টা করিতেছিল, বিপিন হঠাৎ বলিল, ওঁকে উঠতে বল ধীরেশ !

ধীরেশ রাঙা হইয়া বলিল, দূর ! সে আমি পারব না—

ধীরেশ লজ্জায় ঐ আপত্তি করিল, কিন্তু গীতার অন্তরে তার যে আঘাতটা লাগিল, সেটা সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে। তাহার ধর্ষিত দেহটার উপর নিমেষে সে বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, সমস্ত সুন্দর বিশ্ব আজ তাহাকে প্রতিনিয়ত ঘৃণার্হ করিতেছে ! সেখানে তাহার জন্য স্নেহ নাই, সহানুভূতি নাই।

বিপিন ধীরেশের কথার উত্তরে বলিল, শাল্‌তিতে উঠতে বলা ছাড়া আরও অনেক কথা হয়ত আজকে পথেই বলতে হবে—

সে তখন দেখা যাবে। এখন তুই উঠতে বল ভাই—

অগত্যা বিপিন গীতার কাছে গিয়া বলিল, চলুন···উঠতে হবে।

অপরিচিত পুরুষের কথায়, বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ের পা এমনিই উঠে না, তাহার উপর গীতার সমস্ত অন্তঃকরণটা বিশ্রী কদর্য্যতায় ভরিয়া গিয়াছিল, সে তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল।···বিপিন গীতার হাত ধরিয়া শালতিতে বসাইয়া দিল। বসাইয়া দিয়া করজোড়ে কহিল, ধীরেশ, আমি আশা কচ্ছি তুমি মাপ করেচ। তোমার আদেশ নিয়েই আমি যেন—

ধীরেশ একটা মিষ্টি ধমক দিল।

বিপিন কহিল, আর মায়া বৃদ্ধি করতে হবে না, উঠে পড়। দেখো যেন পথে 'নৌকাডুবি' করে বস না।...

সন্ধ্যার রক্ত-সূর্য্য অনতিপ্রশস্ত খানাটার গুল্ম-লতাকীর্ণ দু'ধার রাঙাইয়া দিতেছিল। জলের বুকে রঙের খেলা—স্রোতের হাসি। মাঝি নৌকা খুলিয়া দিল।...

বিপিন ডাঙা পাড় হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—সন্ধ্যা-সূর্য্যের রক্তকিরণ তোমাদের যাত্রাপথে আশীষ বর্ষণ করবে। তোমাদের পথ সুগম হ'ক।

শালতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল।

তীরে দাঁড়াইয়া বিপিন, আশু, মহেশ তাদের ছুটাকে দেখিতে দেখিতে হাসিতে লাগিল।...

* * * *

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া রাত্রিতে রূপান্তরিত হইল।

খালের দু' পাশে ছোট ছোট গ্রাম ; ছোট ছোট খোলার ঘরগুলি। সেই কুটীরগুলির বুক হইতে উঠিয়া ধুঁয়ার রাশ ঊর্দ্ধে বিশ্বের খবর জানাইতেছিল। চারিধার সন্ধ্যারই মত শান্ত, স্তব্ধ ; শুধু জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ দাঁড় ফেলার।...

গীতা বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—তাহাকে লইয়া এত হাসি-পরিহাস, অথচ সে নিজে তাহা হইতে একেবারে বাদ ! এই কর্ম্ম-চঞ্চল ছেলেগুলির সহিত কিসের যোগ তাহার ?

শাল্‌তিখানা যত অগ্রসর হইতে লাগিল, গীতাদের গ্রামটাও ততই যেন পিছু হাটিতে লাগিল।...হয়ত এখনও তাদের বাড়ীতে ক্রন্দনের রোল থামে নাই ; মা এখনও গা ধুইতে যান নাই, সারাদিন সেখানে কেহ খায় নাই...

ছইখানার বাহিরে বসিয়া, বিস্তৃত সম্মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া ধীরেশ ভাবিতেছিল, এই যে একটী দিন পূর্ব্বেরও অপরিচিতা, আনতমুখী মেয়েটাকে সে দয়াপরবশ হইয়া সঙ্গে লইয়া চলিল, তাহার পরিণতি কোথায় ; কি ভাবে তাহাকে সে আপনার গৃহে স্থান দিবে ! তাহাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটায় সে ছাড়া অন্য কেহ পুরুষও নাই, মেয়েও নাই, অষ্টপ্রহর এই মেয়েটীর কাছে কাছে হয়ত তাহাকে থাকিতে হইবে। তাহার সম্মুখে কর্ম্ম-জীবনের কল্পনা রঙীন যে আশাপথ তাহাও এমনই গাঢ় অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া যাইবে।...

শাল্‌তির গতির সহিত রাত্রিও বাড়িতে লাগিল। তারা-খচিত আকাশের দিকে চাহিয়া ধীরেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল।

আরও একটু দূরে, আর একটী প্রাণী রাত্রির অন্ধকারে কাঁদিয়া আপনার বুক ভাসাইতেছিল !...

হোগ্‌লার রাশ জলে গা' ডুবাইয়া পড়িয়াছিল।

দু'ধারে ঘন বন ; ঘন অন্ধকার। গীতা মনে মনে ভাবিল

এরা ভারী অদ্ভুত লোক। এত স্নেহ দয়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে, অথচ সহজ সম্পর্কটার মধ্যে একটা বেড়া তুলিয়া দিয়া বসিয়া আছে, সমস্ত পথে একটী কথাও বলিল না।... এমনি করিয়া কিছুকাল মনে মনে কাটিল।

বুড়া মাঝি হঠাৎ বলিল, হ্যাঁগো ছেলে, মাকে কিছু খেতে দিলে না ?

সারারাত ধরিয়া জলপথে চলিতে গেলে যে আহার্য্য বলিয়া একটা পদার্থের আবশ্যক হয়, ইহা ধীরেশের প্রথম মনে পড়িল। সে একটু লজ্জিত হইয়া বলিল -- মাঝি, খাওয়া দাওয়ার জোগাড় ত' আমাদের কিছুই নেই। তোমরা রাঁধবে না ?

মাঝি জিব কাটিয়া বলিল, গঙ্গা গঙ্গা! মা আমাদের দ্বিজ ব্রাহ্মণের মেয়ে, ওনারে রাঁধা ভাত দেবার ভাগ্যি কি আমাদের!

মাঝি গীতাকে চিনিত; প্রায়ই সে মায়ের সহিত ঘাটে মাছ কিনিতে যাইত।

মাঝি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিল,—তা কিছু পয়সা দিও —সামনে গাঁ সেইখান থেকে কিছু এনে দেব।

তাহাই হইল। সে আপন ছোট ছেলেটাকে পাঠাইয়া দিয়া শাল্‌তিখানা তীরে ভিড়াইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে মাঝি এক সময়ে জিজ্ঞাসা করিল, মা আমাদের ফিরবেন ক'বে বাবু ?

ধীরেশ বলিল,—বোধ হয় আর ফিরবেন না!

মাঝির হাত হইতে আচম্‌কা কলিকার আগুন পড়িয়া গেল; সে হুকা সামলাইতে সামলাইতে বলিল, কেন গো বাবু, মা আমাদের ফিরবেন না ?

ধীরেশ বলিল,—সে কথা আর এক সময়ে বলব মাঝি।

অদূরে মুক্ত আকাশের তলে, মুক্ত ক্ষেতের ধারে ছোট একটি গ্রাম। তাহারও কুটীর গুলার দ্বার সব প্রায় বন্ধ। গ্রামটার মধ্যস্থলে কয়েকটা কুকুর গলা সাধিবার ছলে পল্লী-মহিমা কীর্ত্তন করিতেছিল। আকাশে অল্প মেঘ করিয়াছিল; শীতল নৈশ বায়ুর পরশে ক্ষুধিত অবসন্ন গীতাকে ঘুম পাড়াইয়া দিল।

ছেলেটা ফিরিয়া আসিল।

বিশেষ কিছুই মিলে নাই; গোটা ছ'য়েক সন্দেশ এবং পয়সা চারেকের মুড়কি একটা দোকানে অবশিষ্ট ছিল, তাহাই ছোকরা অনেক করিয়া দোকানীর ঘুম ভাঙাইয়া আনিয়াছে।

ধীরেশ বলিল,—যা তুই দিয়ে আয়—

বুড়া বলিল,—সেকি হয় বাবু! আপনি নিজে ধরে দাওগে—মা আমার সারাটাদিন কিছু খাননি...ওঠ...ওঠ...

আর কোন উপায় না দেখিয়া ধীরেশ উঠিল। গীতা তখন অকাতরে ঘুমাইতেছিল—ধীরেশ বাঁচিয়া গেল। খাবারের ঠোঙাটা মাথার কাছে রাখিয়া দিয়া চলিয়া আসিতেই মাঝি জিজ্ঞাসা করিল, দিলেন বাবু ?

ধীরেশ বলিল,—হাঁ এলুম—

"খেতে নেগেচেন ত' ?"

"না—হয় ত এতক্ষণ খাচ্চেন।"

নৌকার আবার দৌড় দিল।

গাছের ফাঁক দিয়া শেষরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের খণ্ডচন্দ্র উঁকি মারিতেছিল; দূর, অতিদূর কোন এক গ্রামের বুক হইতে একটা বেসুরো বাঁশী তালমান কাটিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল... বুড়া মাঝি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মা কেন আর দেশে ফিরবেন না, সেকথা ত কইলে না বাবু ?

ধীরেশ সব কথা খুলিয়া বলিল। স্তব্ধ মাঝি বসিয়া বসিয়া তামাক পোড়াইতে লাগিল। কেহ দেখিল না বুড়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখের জলে কলিকার আগুন নিভাইয়া ফেলিল।

ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া গীতা জাগিয়া উঠিল। চোখ মেলিয়া দেখিল, দুধারে অস্পষ্ট ভাঙাপাড়, তাহারই নীচে একগলা জলে হোগলার ঝাড় দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে, মনে পড়িল, ও গাঁ নয়, এ তাদের বাড়ী নয়, কোন্ অদেখা অজানার উদ্দেশে নৌকা ছুটিতেছে।

আঁচল লাগিয়া খাবারের ঠোঙাটা নড়িয়া উঠিল। গীতার ছোট্ট বুক অভিমানে আকুল হইয়া উঠিল। নিঃশব্দে সে আসিয়া তাহার শিয়রে আহার্য্য রাখিয়া নীরবে সে চলিয়া গিয়াছে, একটী মিষ্ট কথা কহিবার প্রয়োজনও যে বোধ করে নাই, তাহার পায়ের তলে পড়িয়া গীতার বলিতে ইচ্ছা করিল,

এই সাথীহীন অবস্থায়, গভীর রাত্রে নদীর বুকে এই ছাই-প্যাশের বদলে, তুমি যদি কাছে বসিয়া সহানুভূতিভরা দু'টী কথা বলিতে, তাতেই আমার সব ক্ষুধা মিটিয়া যাইত।

পূর্ব্বতট হইতে অন্ধকার যবনিকা কোন অদৃশ্য হস্তের সঞ্চালনে বিলীন হইয়া গেল। উপরের আকাশ, নীচে জলের বুক, গাছপালা আলো করিয়া, প্রাচীর গগনে জ্যোতির্দেবতা রক্তবস্ত্রে দেখা দিলেন।

মাঝি বলিল, আর দেরী নেই বাবু, আমরা বড় গঙ্গায় এসে পড়েছি।...

ক্রমে কলিকাতা আসিয়া পড়িল। ধীরেশ একটা নোট বাহির করিয়া বুড়ার হাতে দিতে গেলে মাঝি বলিল, ওঠা আপনার কাছেই রাখুন।

বিস্মিত ধীরেশ বলিল, কেন!

বুড়া বলিল, মাকে আমরা এইটুকু পৌঁচে দিলুম, তার আবার ভাড়া কি বাবু!

না, সে হ'বে না মাঝি, তোমার ভাড়া তুমি ছাড়বে কেন?

মোটা কালো হাত দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মাঝি বলিল, 'মাজ্জনা করো বাবু। ওই টেকা দিয়ে তুমি টেঁপীর বাপের প্রা'চিত্তির করো।'...

—তিন—

ধীরেশের বাড়ীর দরজায়, দ্বারবান সেলাম ঠুকিতে গিয়া সঙ্গে স্ত্রীলোক থাকায় খানিকটা হটিয়া গেল।

ধীরেশ ভিতরে ঢুকিয়া পুরাতন ঝীটাকে বলিল, এঁকে স্নান করিয়ে দিয়ে কিছু খেতে দাও। কাল থেকে কিছু খাওয়া হয় নি।

দাসী বিস্মিত হইয়া কি একটা জিজ্ঞাসা করিতে গেল, ধীরেশ ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত করিল।

দ্বিপ্রহরে দু'জনার দু' ঘরে কাটিল। গীতার কাছে সারাদিন গিরি ঝি বসিয়া রহিল।

রাত্রি আসিল—সম্মুখে অন্তহারা চিন্তার রাশ লইয়া।

ধীরেশের মনে হইল, এই মেয়েটীকে এত কাছে রাখিয়াও এমনি দূরে ফেলিয়া রাখা উচিত হইবে না। যাহার সহিত একঘরে এমন কতদিন কাটাইতে হইবে, তাহাকে তাহার অধিকার সীমা বুঝাইয়া দেওয়া ভাল, নতুবা গীতা কোন অসতর্ক অবসরে হয়ত তাহারই উদ্দেশে অগ্রসর হইয়া পড়িবে।

গিরিকে ডাকিয়া বলিল, তা'কে একবার এই ঘরে ডেকে দে'—

গিরির সহিত গীতা আসিয়া দ্বারের পাশটাতে দাঁড়াইল। এই সামান্য ব্যাপার, ধীরেশের কাছে তাহা অচিন্ত্য মধুর রূপ ধরিয়া দেখা দিল। অমনি সলজ্জ ভঙ্গীমায় গীতা একদিন আপনি আসিয়া ধীরেশের পাশে দাঁড়াইতে পারিত। আজ সেই প্রতিরোধ করিতে হইবে, তাহাকেই। কতদিন—কত-কাল এমনি পাশাপাশি রাখিয়া কাটিবে, অথচ অন্য কোনো উপায় নাই।

গিরির পাশে দাঁড়াইয়া গীতা স্বেদাক্ত হইয়া উঠিতেছিল; ধীরেশ সুমুখের একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, বস।

গিরি চলিয়া গেল। গীতা সেইখানেই রহিল।

অনেকক্ষণ পরে ধীরেশ বলিল,—এখন তোমাকে থাকতে হবে এইখানেই। সব কথা গিরিকে খুলে বলবে, আর...এ বাড়ীকে পরের বাড়ীর মত দেখো না।

গীতা চুপ করিয়া রহিল। তাহার বড় ইচ্ছা করিল, একবার তার বাপমা'র কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু পরশুকার ঘটনার পর তার পুষ্পিত অন্তরটা একেবারে কদর্য্য উদরতায় ভরিয়া গিয়াছিল, আপনার উপরেই তার একটা গ্লানি জন্মিয়াছিল। সে তার পাপ-স্পর্শলেশহীন পিতামাতার কথা মুখেও আনিতে পারিল না। অন্তর চক্ষে সে কলিকাতার গৃহ প্রকোষ্ঠে বসিয়া তার পল্লীভূমিকে দেখিতে লাগিল—দেখিতে লাগিল তার ছোট বোনগুলি খেলা সারিয়া ধূলা মাখিয়া রাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া চুপি চুপি ঘরে ঢুকিতেছে।

ঘরটা স্তব্ধ হইয়া রহিল এবং সেই স্তব্ধতার বুক চিরিয়া দেয়াল ঘড়ীটা টিক্ টিক্ করিয়া কত কি বলিতে লাগিল।

ধীরেশ বলিল, আমার এই শূন্যপুরীতে মেয়েমানুষের মধ্যে তুমি একলা। তোমাদের অভাব অভিযোগের কথা আমি

ভাল জানিনে, খুলে সব বোলো। তোমায় হয়ত চিরকাল এইখানেই থাকতে হবে।

চিরকাল! উঃ সে কত দীর্ঘকাল!

গীতা আর নীরব থাকিতে পারিল না। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, বাবা আমায় দেখতে আসবেন না?

মূঢ় মেয়ে জানিত না—তার পিতার ভিটার দ্বার আর তাহার জন্য পূর্ব্বের মত উন্মুক্ত ছিল না।

ধীরেশ বলিল, তোমার সব আত্মীয়েরা তোমায় ত্যাগ করেছেন। সেইজন্যে আমি তোমায়—

গীতা এ আঘাত সহ্য করিতে পারিল না। তার চক্ষের কুয়াসার একটা পর্দ্দা নামিয়া আসিল।

এমনি সময় নীচে হইতে কে চীৎকার করিয়া উঠিল, ধীরেশ চাটুয্যে আছ হে।

ধীরেশ জানালা হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল, চট করে উপরে আয় ভাই একবার।

বিপিন, আশু সকলেই উপরে ছুটিয়া আসিল।

বিপিন গীতার মাথাটা কোলে লইয়া বলিল, 'ধীরেশদা', আজকেই ওঁকে অধীর করতে গিয়েছিলে! কি বলেছিলে কি?' বলিয়া মুখে চোখে জল দিতে লাগিল।

কিছু না ভাই।—জিজ্ঞেস কল্লে, ওর বাবা কখনও ওকে আর দেখতে আসবে কি না। আমি বল্লুম, না তাঁরা আসবেন না। তাতেই এই—

বিপিন বলিল, সে খবরটা আজ না দিলেই কি চলছিল না?

গীতা চোখ মেলিয়া চাহিল; যেন রহস্য সাগরের বুক হইতে একটা যবনিকা সরিয়া গেল। সেই আয়ত চোখের কৃষ্ণ তারাদুটীর অতল রহস্যের মধ্যে ধীরেশ দিশেহারা হইয়া গেল।

সব কথা মনে পড়িয়া যাওয়ায়, গীতা কাপড় চোপড় ভাল করিয়া টানিয়া দিল।

বিপিন বলিল, লজ্জা করবেন না, ভাইয়ের কোলে মাথা রাখতে কোনো বোনেরই ত লজ্জা হয় না। এখন এঁকে বিছানায় শুইয়ে চল একটু বাইরে যাওয়া যাক।

তুমিও এসো ধীরেশ। বিরক্ত করবার ফুরসৎ এর পরে ঢের পাওয়া যাবে।

বাহিরে আসিয়া ধীরেশ বলিল, আজই ফিরলি যে!

বিপিন কহিল, বৌদির জন্য বড্ড মন কেমন করতে লাগল ভাই। তুমি ত জড় ভরত, ভয় হ'ল বৌদির—

ধীরেশ হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, সে তোর বৌদি হ'ল কার সম্পর্কে?

সেটা তোমারই আমাদের চেয়ে বেশী জানা উচিত। আমরা এখনও 'আপনি' চালাচ্ছি, তুমি কিন্তু প্রথম থেকেই—

আবার না কেন? যাক্। বৌদির জন্য মনটা খারাপ হয়ে পড়ায় পল্টনের গতিমুখ ফিরিয়ে দিলাম, একেবারে,—উজল করিয়া আছে যেথা তোমার কুটীরখানি—

ধীরেশ স্থির হইয়া বলিল, মাপ করো। গীতাকে আমি ...না ভাই—

বিস্মিত বিপিন বলিল, সর্ব্বভুক! কোন অপরাধে বঞ্চাইছ দাসে? নিরাকারা ন'ন কভু গীতা দেবী—

কেন তা' জানি না! বিবাহের কল্পনায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়ি—

বিপিন বলিল, হতাশ হচ্চ কেন? বিয়েটা হয়ে গেলেই পুনর্ব্বার বিস্ফারিত হয়ে উঠবে।

তা হয় না বিপিন, ও আমার কাছে এমনিই থাক। কোনো কিছুর অভাব—

বিপিন বলিল, রাগিস নি ভাই, বিবেচনা করে দেখ। দু' মুঠো ভাত, বছরে চারখানা কাপড়, এত সকলেই দিতে পারে, কিন্তু এতে কি অন্তরের ভিক্ষাবৃত্তি ঘোচে?

ধীরেশের মূর্চ্ছিতা গীতার প্রস্ফুট চোখদুটী মনে পড়িতেছিল। কি বিচিত্র রূপ-রহস্যের দেশ সে।

বিপিন কিছুকাল চুপ করিয়া বলিল, আজ চটছ, পরে কিন্তু সে অবকাশ পাবে না। তুমি তাঁকে তোমার অংশ দিয়ে পুণ্য, পূর্ণ করে তোল, শুভসুন্দর করে তোল—নইলে বিপিনের সঙ্গে এই পর্য্যন্ত......

বিপিনকে লোকে এমনি ভাবে প্রথম কাঁদিতে দেখিল!

ঐ ভ্রমর-কালো চোখ ধীরেশকে পাগল করিতেছিল, তবু আর একবার আপত্তি করিয়া বলিল, কিন্তু তা'র যদি মত না থাকে—

আমি কথা দিচ্ছি, তুই তাঁকে ডাক্‌।...

গিরি গীতাকে দিয়া চলিয়া গেল। বিপিন কহিল, 'আচ্ছা বৌদির যদি নীচুর দিকে ঘাড় নামে, তাহলে বুঝতে হবে মত, নইলে অমত।' তারপর গীতাকে বলিল,—বৌদির ধীরেশদাকে বে' করতে বড্ড ইচ্ছে নয় ?

লজ্জা নাকি বাঙ্গালীর মেয়ের শিরোভূষণ! সেই শিরের ভূষণ গীতার মাথায় এত ভারি হইয়া উঠিল, যে সেটা নীচু না হইয়াই পারিল না।

বিপিন উল্লাসে চীৎকার করিয়া বলিল,—দেখলে হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে গেল। আর কি! মধুপুর হইতে তোমার দিদিকে আসতে লিখে দাও।...বাহ'ক এর আগে কিন্তু খুব কবিত্ব করা গেছল নয়? পুণ্যকর, পূর্ণকর, শুভকর, সুন্দর কর......

চুম্বন

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

শান্তি আর তৃপ্তি নামে দুটী ভগিনীরে
বিরলে গড়িয়া ভগবান,
পড়িলেন এক মহা সমস্যা ভিতরে,
কোথা হবে তাহাদের স্থান।

কহিলেন, "বিশ্বমাঝে তোমরা দুজনে
আপনার স্থান খুঁজে লহ ;
না লভিয়া তোমাদের যেন এ সৃজনে
ম্রিয়মান নাহি হয় কেহ।"

শান্তি তৃপ্তি ভ্রমিয়া বেড়ায় চারিদিকে,
কোথা রবে ভাবিয়া না পায় ;
প্রণয়ী লইয়া তার প্রণয়িণীটীকে
হেনকালে সেই পথে যায়।

মাঝে মাঝে বিরলে বসিয়া তারা দুটী
পরস্পরে বাঁধে বাহুপাশ ;
হেরিয়া হাসিল শান্তি শান্তির হাসিটী,
তৃপ্তি ফেলে তৃপ্তির নিঃশ্বাস।

রহিল ভগিনী দুটী স্বপ্ন স্বরগের
সুধা হয়ে সেই শুভক্ষণে,
প্রেমময় চারিটী অধর কুসুমের
সুনিবিড় ব্যগ্র আলিঙ্গনে।

মায়া

(বড় গল্প)

[শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(১৭)

গুরুসদয় বাবুর পরণে ছিল Vyella পাঞ্জাবী। এক জোড়া দোরখা শাল গলায় মালার মত ঝুলান ছিল। শান্তিপুরের মিহি ধুতির পরিপাটী কোঁচা পম্পসুর উপর সানন্দে আছাড়ি পিছাড়ি খাইয়া অবজ্ঞাভরে খদ্দর সুন্দরীর বৈধব্য ঘোষণা করিতেছিল। গুরুসদয় বাবুর বয়স আজ অনুমান করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার গৌরকান্তি, আবেগ ও উৎকণ্ঠায় উত্তেজনার রক্তিমাভায়, বেশ পরিপূর্ণ দেখাইতেছিল গুরুসদয় বাবু নিকটে আসিতেই কমলমণি ভ্রূকুঞ্চিত ও ওষ্ঠাধর একটু বিস্তৃত করিয়া উঠিয়া গেলেন।

গুরুসদয় বাবু একটু থমকিয়া দাঁড়াইয়া বারাণ্ডায় প্রবেশ করিতেই নরেশ বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই আপনার স্বামীজির বেশ নাকি?" গুরুসদয় বাবু বলিলেন—"আজকাল এই বেশই প্রচলিত হয়েছে। কেওড়াতলায় (Mysore মাইশোর) এর বাগানে আপনি গেছেন কি? এই বেশে সেখানে সেদিন এক স্বামীজি কত লীলাই করে গেলেন—" বলিয়া হাসিতে হাসিতে, কাশিতে কাশিতে রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—"জ—ল—মা—য়া—কে একটু।"

নরেশবাবু ব্যস্তকণ্ঠে ডাকিলেন—"এই কে আছিস, শীঘ্র এক গেলাস জল নিয়ে আয়।"

অপরাজিতা এক গেলাস জল লইয়া তাড়াতাড়ি বাহিরে যাইবার উপক্রম করিতেই কমলমণি ইসারায় তাহাকে নিরস্ত করিয়া ভৃত্য রামলোচনকে দিয়া জল পাঠাইয়া দিলেন। রামলোচনের হাত হইতে জলের গেলাস লইয়া নরেশবাবু গুরুসদয় বাবুর মুখের নিকট ধরিতেই তিনি হতাশকণ্ঠে বলিলেন—"না আর জল দরকার হবে না ও পানের বিষম লেগেছিল"; ও চারিদিক একবার সচকিতে চাহিয়া বলিলেন—"কি জ্বালা—এখানে এলেই একটা না একটা উপদ্রব এসে জুটবে।" যাক্ হ্যাঁ কাল সন্তোষ কলিকাতায় চলে গেছে। তার মার আবার অসুখ বেড়েছে। তাঁর শরীরে নিত্যই একটা না একটা রোগ লেগে আছে। দেখুন, একটী স্ত্রী নিয়ে ঘর করা ও একটীমাত্র সন্তানের আশায় জীবন ধারণ করা দুই অশান্তিকর।

নরেশ বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আর যদি স্ত্রী বলেন, একটী স্বামী নিয়ে ঘর করায় সুখ নাই, তাহা হইলেই ত বিপদ।"

গুরুসদয় বাবু উত্তেজিত কণ্ঠে বলিলেন,—"মেয়ে মানুষ কোন সাহসে ওকথা বলবে।" এখন হিন্দুধর্ম্ম বজায় আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। হিন্দুধর্ম্মে পুরুষের বহু বিবাহ অনুমোদন করে, মুসলমান ধর্ম্মও তাহা স্বীকার করে, এক খৃষ্টান ধর্ম্মে তাহা অপরাধ বলে বিবেচিত হয়—সেটা কি জানেন পয়সা খরচের ভয়ে—হা—হা—হা।"

নরেশবাবু রহস্যচ্ছলে বলিলেন—"হিন্দু মুসলমান যখন অন্ততঃ এই বিষয়ে এক দিল' তখন স্বরাজ লাভ অনিবার্য্য।

আপনার কিন্তু বনে যাওয়া এখন হচ্ছে না—'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ।' আপনি জমিদার লোক—আপনার একটা থাকবে বসত বাটী, একটা বাগান বাড়ী—দু'দশটা ভাড়া বাড়ী, তেমনি সব বিষয়ে সামঞ্জস্য রাখা দরকার বই কি।"

গুরুসদয় বাবু নরেশ বাবুর মুখের দিকে সানন্দে ও সোৎসাহে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি তাহা হইলে বহু বিবাহের পক্ষপাতী?"

নরেশ বাবুর মুখ সহসা গম্ভীর হইল—তিনি মনে মনে

গুরুদাস বাবুর প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে বিদায় দিতে পারিতেছিলেন না।

কমলমণি তাঁহাকে সে দায় হইতে উদ্ধার করিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে রামলোচন আসিয়া বলিল,—"৬টা বেজে গেছে বাবু—আপনি ভুলা যাবেন না।"

নরেশবাবু হাঁপ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুরুদাস বাবু শশব্যস্তে উঠিয়া সোনার wrist watch আলোর অতি নিকটে ধরিয়া বলিল,—"ওঃ বড় ভুল হয়ে গেছে—হ্যাঁ— ৭টা বেজে গেছে Birla houseএ যে আজ আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে। আচ্ছা নমস্কার।"

(১৮)

গুরুদাস বাবু চলিয়া গেলে কমলমণি বাহিরে বারাণ্ডায় আসিয়া বলিলেন,—"চল না, আজ একবার রাখালদের বাড়ী বেড়িয়ে আসি আহা বৌ তিনটিকে অনেকদিন দেখিনি। আঃ! বুড়োটা যেন চিনে জোঁক।"

নরেশবাবু অনুযোগ সহকারে বলিলেন,—"আচ্ছা তোমার আক্কেলটা কি বল ত? ভদ্রলোক এতক্ষণ বসে রইলেন, দুটা সন্দেশ, এক কাপ চাও কি পাঠাতে নেই।"

কমলমণি উষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, "যার মুখ দেখলে পাপ হয় তাকে আমি চা-সন্দেশ দেওয়া ত দূরের কথা—না, আর থাক। হ্যাঁগা, তুমি কোন আক্কেলে এত বড় চাকুরী কর।"

নরেশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—চাকুরী আমরা করি না, আফিসের বাবুরা করে। আমরা কেবল কাগজে সহি করি—আর বড় জোর লিখি—'ঠিক হ্যায়।'

কমলমণি সহাস্যে বলিলেন—"সেই ভাল, আজ থেকে আমি যা করব তুমি কথা কহিতে পাবে না; তুমি কেবল বলবে—'ঠিক হ্যায়।'

নরেশবাবু বলিলেন,—'তথাস্তু।'

কমলমণি বলিলেন, "আচ্ছা তবে চা-টা খেয়ে নিয়ে প্রস্তুত হও।"

নরেশবাবু কহিলেন, "আমি প্রস্তুত আছি, চা সেখানে গিয়ে খাব" বলিয়া ভাবিলেন, মায়া, অ—। কমলমণি বাধা দিয়া বলিলেন, না—ওরা বাড়ী থাক।

নরেশবাবু কহিলেন,—"তথাস্তু।"

(১৯)

নরেশবাবু ও কমলমণি যখন রাখালদের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন তখন সুবোধ চক্রবর্ত্তী বাহিরে বাগানে একটা টুলে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছিল। সে উঁহাদের দেখিয়া একমিনিটে পূজা সাজ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাদের আপ্যায়িত করিতে করিতে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। রাখাল তখন বাড়ীতেই ছিল। সে তাঁহাদের দেখিয়া, চোখে ও মুখে হাসি ফুটাইয়া করযোড়ে মাথা ঈষৎ নত করিয়া, এমন ভঙ্গিমার সহিত দাঁড়াইল যে, কমলমণি তাহার সেই বিনয় নম্রভাব ও সস্মিত বদন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সুবোধ ব্যস্তসমস্ত হইয়া ডাকিল, "ওগো গালচেটা কোথায়? শীঘ্র নিয়ে এস—না—না—চলুন—চলুন দাদার ঘরে বসবেন চলুন। দাদা—দাদা— অঘোর বাবু উত্তর দিলেন—"কি রে?"

রাখাল স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "চলুন মা আপনি আপনার মেয়েদের কাছে বসবেন চলুন। নরেশবাবু মেজদার সঙ্গে দাদার কাছে যান"—বলিয়া কমলমণিকে নিজের শয়ন কক্ষে লইয়া গেল। সেখানে বউয়েরা আসিয়া একে একে কমলমণিকে প্রণাম করিল। রাখাল তখন হাসিতে হাসিতে বলিল, "এইবার তবে আমি দাদার ঘরে যাই।"

কমলমণি বলিলেন, "না বাবা, তুমি একটু দাঁড়াও তোমার সঙ্গে কথা আছে"; একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "নবীনকে আমায় দিতে হবে—মায়ার সঙ্গে আমি তার বিবাহ দিব।" বলিয়া রাখালের মুখের দিকে উৎসুক নয়নে চাহিলেন।

রাখাল হৃদয়ের স্পন্দন কষ্টে দমন করিয়া ও মুখে গাম্ভীর্য্য আনিয়া কহিল, "সে ত সুখের বিষয়। দাদা মত করলেই হবে। নবীনের মতও একবার নিতে হবে। কি বউদি, আপনি কি বলেন?"

বড় বউ লজ্জাবতী বলিল, আমরা কি বলব ঠাকুরপো, তোমরা ভায়ে ভায়ে যা করবে তাই হবে।

কমলমণি ভয়ে ও বিস্ময়ে অবাক হইয়া রহিলেন। একি? এ বাড়ীতে কি বউদের কোন বিষয়ে মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুবিধা দেওয়া হয় না? অথবা সুশিক্ষার ফলে তাহারা স্বল্পভাষী, বিনয়ী ও সংযত। রাখাল কমলমণির মনের ভাব অনুমান করিয়া লইয়া বলিল, "কি মেজ বউদি আপনিও যে কোন কথা বলছেন না? কিগো, তুমি চুপ করে বসে বসে কি ভাবছ? "ছোট দেবরটীর বিয়ে—উঠ উঠ—শাঁক বাজিয়ে দাও। যাই দাদার কাছে কথাটা পাড়ি গিয়ে।"

দাদাকে গিয়া সব কথা বলিতে অঘোর অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "দে লাগিয়ে দে, এই ফাল্গুন মাসেই বিয়েটা হয়ে যাক।"

নরেশবাবু সব শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাখাল তাড়াতাড়ি ভাঁড়ার ঘরে গিয়া শাঁক বাজাইয়া দিল।

সুবোধ ইসারায় মেজবউকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গিয়া শশব্যস্তে কহিল,—সেই ফর্দ্দটা কোথায় রেখেছি জান?" সুশীলা দেবী তাঁহার সদা প্রফুল্লমুখ ঈষৎ একটু মলিন করিয়া বলিল, "তোমার কত ফর্দ্দ তোলা আছে কোন ফর্দ্দের কথা বলছ?" সুবোধ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অস্থিরকণ্ঠে কহিল, "তোমার এমন মোটা বুদ্ধি কেন? মেয়েমানুষের যদি কিছু বুদ্ধি থাকে, আঃ—শীঘ্র বলনা ছাই।"

মেজবউ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তা চাবিটা দাও।" সুবোধ নিজেকে Stupid ইত্যাদি করুণ আখ্যা দিয়া কহিল,— "চাবিগুলো সব পইতায় জড়িয়ে গেল যে, ওগো, খোল না, রাগ করলে।"

মেজ বউ প্রসন্ন মুখে বলিল,—"একটা Ring কিনতে পার না? বাবা কি তোমায় পইতা দিয়াছিলেন সংসারের চাবির হেফাজত করিবার জন্য?"

মেজ বউ অনায়াসে ক্যাসবাক্সের চাবির বন্ধন আলগা করিয়া দিতে সুবোধ বাক্স খুলিয়া সযত্নে রক্ষিত একটী কাগজ ডান হাতের মুঠার ভিতর আলগা করিয়া ধরিয়া তাহা দুই তিনবার ভক্তিভরে মাথায় ঠেকাইয়া ডাকিল,—"রমেন।" দশ এগার বৎসরের একটি সুন্দর বালক দৌড়িয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আমায় ডাকছেন কাকাবাবু।" সুবোধ—"হ্যাঁ—চট্ করে তোর সেজকাকাকে ডেকে আন ত।"

রাখাল আসিলে সুবোধ ফর্দ্দের কথা তাহাকে বলিল। রাখাল কহিল, "না আপনি বড় গণ্ডগোল বাধান। আপনি যদি সব বিষয়ে এত উতলা হন তা হলে আপনি সব করুন। সুবোধ শঙ্কিতকণ্ঠে বলিল,—"না না—তুই যা ভাল বুঝিস্ তাই কর। তবে ফর্দ্দটা।" রাখাল ফর্দ্দটা সুবোধের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া চলিয়া গেল।

(২০)

বাসায় ফিরিবার পথে নরেশ বাবু কমলমণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাজটা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হ'ল কি? মায়ার এই চৌদ্দ বৎসর বয়স চলছে—আরও দুই তিন বৎসর রাখলে চলত। ব্যাঙ্কে টাকাই বা কই?"

"কমলমণি বলিলেন, "কেন ব্যাঙ্কে তিন হাজার টাকা আছে, তোমার ইনসিয়োরের পলিসি বন্ধক দিলে পাঁচ হাজার টাকা পাবে নাকি? তা হলেই বিয়েটা হয়ে যাবে।"

নরেশ বাবু বিষাদকণ্ঠে কহিলেন,—"শেষে পলিসি বন্ধক দিতে হবে।"

কমলমণি অভিমান কণ্ঠে বলিলেন, "ইনসিয়োরের পলিসি কি যমের পরদা না উঠলে ছুঁতে নেই। যদি দরকারের সময় পলিসির টাকা কাজে না লাগল ত তোমার ইনসিয়োর বন্ধ করে দাও।" নরেশ বাবু হাসিতে হাসিতে কহিলেন, "আমি যদি হঠাৎ মরে যাই তখন তুমি মোটা টাকা পাবে— তোমাদের কষ্ট হবে না"—বলিতে বলিতে কিন্তু নরেশবাবুর চোখের পাতা ভারি হইয়া উঠিল।"

আঃ! কি জ্বালা—কোথাও কিছু নাই, একখণ্ড শ্লেষ্মা আসিয়া কমলমণির কণ্ঠরোধ করিল। কমলমণি গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিলেন "সুধীনকে কাল এক সপ্তাহের ছুটী নিয়ে আসতে লিখে দিই। তোমারও ত ছুটী ফুরিয়ে এল। ১৮ই ফাল্গুন বিবাহের একটা দিন আছে।"

নরেশবাবু কহিলেন,—"আজ ত হল ২০শে মাঘ। কলিকাতায় ফিরে গিয়ে সব যোগাড় যাত করে এ ক'দিনের ভিতর বিবাহ দেওয়া কি সম্ভব হবে। হাঁ—দেখ কাজটা তুমি একটু তাড়াতাড়ি করে ফেল্লে। সন্তোষ।"

কমলমণি অস্বাভাবিক তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "আর কথা বাড়িয়ো না বলছি।"

গুরুসদয় বাবুর অসদৃশ ব্যবহার ও অসম্বদ্ধ বাক্যালাপ নরেশ বাবুর মনে পীড়া দিয়াছিল। সন্তোষ তাহাদের না বলিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাঁহার মনটা তাহার প্রতি বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিল। কমলমণির বুদ্ধি বিবেচনার উপর মায়ার ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া দিয়া সহাস্যে বলিলেন, 'ঠিক হায়।'

কমলমণি বলিলেন—"বল, তথাস্তু।"

নরেশবাবু সহাস্যে কহিলেন—"তথাস্তু।"

নরেশবাবু ও কমলমণি চলিয়া গেলে রাখাল নিজ মোটরে শৈলেশ্বরের খোঁজে বাহির হইল।

শৈলেশ্বর তখন তাহার স্থূলদেহ ও হাত নাড়িয়া একটা Stationery দোকানের ভিতর দাঁড়াইয়া খরিদ্দার অখরিদ্দার ও আধাবয়সি দোকানের মালিককে তাহার স্বাভাবিক উচ্চ-কণ্ঠে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের শবযাত্রার বিস্তৃত বিবরণ দিতেছিল। কেমন করিয়া শৈলেশ্বর অসম্ভব ভিড় ঠেলিয়া Volunteer দের বাক্‌চাতুরীতে মোহিত করিয়া একেবার শিয়ালদহ ষ্টেশনের প্লাটফর্মে মহাত্মা গান্ধীর নিকট গিয়া দাঁড়াইয়াছিল—এ অভাগা দেশের শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অমার্জ্জিত লোকের অকারণ কৌতূহলের আবর্ত্তে পড়িয়া মহাত্মা গান্ধীর প্রাণ কিরূপ সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল, কি অদম্য উৎসাহে ও প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া শৈলেশ্বর মহাত্মাকে অপমৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল ইত্যাদি।

রাখাল আসিয়া শৈলেশ্বরের নিকট দাঁড়াইতেই সে যথাসম্ভব সংক্ষেপে তাহার কথকথা শেষ করিয়া রাখালের সহিত তাহার মোটরে গিয়া বসিল।

রাখালের মোটর গুরুসদয় বাবুর শৈল নিবাসের অনতি-দূরে গিয়া দাঁড়াইল। শৈলেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল "ব্যাপার কি হে? এখানে দাঁড়ালে?"

রাখাল কহিল—"নরেশ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী এই আমাদের বাড়ী থেকে যাচ্ছেন। আজ বুড়ো বোধ হয় কিছু একটা কাণ্ড করেছে। তাহা না হইলে অকস্মাৎ নবীনের সহিত মায়ার বিবাহের স্থির করিয়া গেলেন কেন।"

শৈলেশ্বর রাখালের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল—"এঁ্যা, বল কি? বুড়োটাকে ত খবরটা দিতেই হবে—আজই। তুমি যাবে না কি? না—না—তুমি থাক, তুমি গেলে রগড় হবে না।"

শৈলেশ্বর চলিয়া গেলে রাখাল একা মোটরে বসিয়া হৃদয়ে কেমন একটা স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিল। স্বকার্য্য সিদ্ধয়েৎ প্রাজ্ঞঃ—নীতিবিরুদ্ধ কাজ ত সে কখনই করে নাই—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ। নরেশ বাবু লোকটা বড় সরল প্রকৃতির।

অস্থিরচিত্তে রাখাল পাঁচ সাতবার Horn বাজাইতেই শৈলেশ্বর বিষণ্ণমুখে আসিয়া কহিল—"না, বুড়ো বড় ধড়িবাজ তার অন্ত পাওয়া দায়। কাল তাকে একটু নজরে রাখতে হবে। দেখি একটা সিগারেট।"

পথে দুই বন্ধুতে আর কোন কথা হইল না।

(২১)

পরদিন প্রাতে গুরুসদয়বাবু শৈলেশ্বরের বাসার খোঁজ করিয়া সশরীরে উপস্থিত হইয়া ডাকিলেন—"শৈলেশ্বরবাবু বাড়ী আছেন কি?"

শৈলেশ্বর উত্তর দিল,—"কে, যাই।" বাহিরে আসিয়া গুরুসদয়বাবুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সদর রাস্তার উপর তাহার একত্রে বৈঠক ও আফিস ঘরে লইয়া গিয়া বসিতে অনুরোধ করিয়া বলিল, "আমার কি সৌভাগ্য, আপনার পায়ের ধূলা আজ এ গরীবের বাড়ীতে পড়িল। চা খাবেন কি—এই কে আছিস্ শীঘ্র এক পেয়ালা চা নিয়ে আয়।"

গুরুসদয়। আবার চাএর হাঙ্গামা করলে কেন? তা—তোমাদের ব্যবসায়ে ওসব Formality পালন করতে হয়; হ্যা—হ্যা—। আমার একটা insure করে দাও, মোটা টাকার বুঝলে কিনা।

শৈলেশ্বর। আপনি insure করবেন? আপনাদেরই

ত করা দরকার—'যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনাঃ।' তা আপনার বয়স কত হয়েছে ?

গুরুসদয়। তুমি কি অনুমান কর ?

শৈলেশ্বর। এই ৪০।৪২।

গুরুসদয়। হ্যা—হ্যা—ঠিক ধরেছ, তোমার ইলেম আছে দেখছি।

শৈলেশ্বর। কি সুন্দর শরীরটি আপনি রেখেছেন। আচ্ছা—আপনার দাঁতগুলি কি বাঁধান ?

গুরুসদয়। আমি ছেলে বয়সে, বুঝলে কি না, ভয়ানক গুণ্ডা ছিলাম, একবার চারটে গোরাকে এমন প্রহার দিই—

শৈলেশ্বর। তাইতেই বুঝি আপনার দাঁত সব খসে যায়।

গুরুসদয়। Nonsense! আমি খুব ভাল ঘোড়া চড়তে পারতাম। একদিন মাঠে ঘোড়াটা খুব ছুট করাচ্ছি—ঘোড়াটা, বুঝলে কিনা, Babugarh breed—ছুটছিল যেন তীরের মত—ব্যাটা মাঠে এক জায়গায় বেশ কচি ঘাস দেখে একেবারে dead stop; আমি হ্যা—হ্যা—হ্যা শূন্যে ঝুলতে লাগলাম, বাঁ পা'টা গেছল stirrupএ জড়িয়ে, হাতদুটো ঠেকে রইল মাটিতে, চেঁচাতে সাহস হয় নি, পাছে বুঝলে কিনা ঘোড়াটা আবার ছুট দেয়। দু' চারটি বাঙ্গালীবাবু সেই সময় মাঠ পার হচ্ছিলেন, তাঁরা 'শত হস্তেন বাজিনঃ' মন্ত্র জপ করতে করতে দূরে দাঁড়িয়ে আমায় উপদেশ বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন। সেই সময় এক সাহেব ছুটতে ছুটতে এসে—ডান হাতে বুঝলে কিনা ঘোড়ার লাগামটা জোর করে ধরে বাঁ হাত বাড়িয়ে দিতে আমি তাহার সাহায্যে প্রায় ঘোড়াটার পিঠে উঠে বসেছি তখন বাবুরা হৈ হৈ করতে করতে এসে আমায় ঠেলাঠেলি করতেই আমি বাঁয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাই, দাঁতে সেই যে আঘাত পেলুম—বুঝলে কিনা।

শৈলেশ্বর। আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে।

গুরুসদয়। এই যে,—হ্যাঁ—তুমি ত দালালী কর, একটা ঘটকালী করতে পারবে ? আমার এক জমীদার বন্ধুর, নরেশ বাবুর ঐ মেয়েটার—কি বলে তাকে যে ছাই—হ্যাঁ—হ্যাঁ—মায়ার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে পারবে ? যদি পার ত হাজার টাকা বুঝলে কিনা—দালালী পাবে।

শৈলেশ্বর। তা আপনি যদি আজ্ঞা করেন ত একবার নয় চেষ্টা করে দেখি।

গুরুসদয়। হাঁ—দেখ, দেখ—কি ছাই insure করে বেড়াও। একেবারে হাজার টাকা বুঝলে কি না।

শৈলেশ্বর। পাত্রের পরিচয়টা না পেলে—

গুরুসদয়। পরিচয়, পরিচয় আবার কি—জমীদার।

শৈলেশ্বর। তাঁর কি এই হাতে খড়ি।

গুরুসদয়। না—না তাঁর প্রথম স্ত্রী বর্ত্তমান আছেন, তবে তিনি—

শৈলেশ্বর। Cast horse।

গুরুসদয়। আমি কি Cast horse ?

শৈলেশ্বর। আপনি কেন হবেন, আপনার স্ত্রী, সন্তোষ বাবুর মা।

গুরুসদয়। ছি! ছি! তুমি দেখছি নীরেট, এই বুদ্ধিতে দালালী করে খাও বুঝি ?

শৈলেশ্বর। দেখুন,—আপনি রাখালকে চেনেন ত ? তার মারফত কাজটা হাসিল করবার চেষ্টা করুন। তবে কি জানেন রাখালের ছোট ভাই নবীনের সঙ্গে কাল রাত্রে মায়ার বিবাহের কথা সব ঠিক হয়ে গেছে। কিন্তু হাজার টাকা আজই পেলে একবার ঘুষ চালিয়ে চেষ্টা করে দেখতুম।

গুরুসদয়। আহা টাকার জন্য ভাবছ কেন ?

শৈলেশ্বর। ভাবনা শুধু টাকার জন্য নয় সন্তোষবাবুর জন্য একটু চিন্তা আসছে।

গুরুসদয়। সে কি রকম ?

শৈলেশ্বর। আহা বেচারা আজ ছয়মাস কাল নরেশ বাবুর বাড়ী যাওয়া আসা করলে—মুখের গ্রাসটা নবীন কেড়ে নিলে—নবীনও বুঝি কুমীরের পেটে যায়।

গুরুসদয়বাবু রাগে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—You are a bloody spy—বলিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইতেই শৈলেশ্বর তাঁহাকে মেজে নিক্ষেপ করিল।

পিছন হইতে মাথায় লাঠির আঘাত পাইয়া শৈলেশ্বর

একটা চীৎকার করিয়া গুরুসদয়বাবুর দেহের উপর পড়িল। শৈলেশ্বরের চীৎকারে তাহার স্ত্রী, পুত্র দৌড়াইয়া আসিয়া শৈলেশ্বরের রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া ক্রন্দন করিতে নরেশবাবু, রাখাল ও সেই মহল্লার ভদ্র, ইতর লোক আসিয়া সন্তোষকে ধরিয়া তাহার লাঠি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে কুলোপেটা করিবার যোগাড় করিল।

শৈলেশ্বর রক্তাক্ত কলেবরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সকল কথা বিবৃত করিল।

ক্ষোভে ও অভিমানে সন্তোষ শৈলেশ্বরের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাতরকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা চাহিল নরেশবাবুর দিকে চাহিয়া সে অপরাধীর কণ্ঠে বলিল—"আপনি আমায় সন্তানের মত—না—না—আপনি আমায় বড় স্নেহ করেন। দেবতার করুণা আপনার নিকট আমি পাইয়াছি। বড় আশা ছিল আমি আপনার স্নেহের ঋণ বাড়াইয়া লইব। আমি দুঃখিনীর সন্তান হইয়া মোহবশে বড় উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষন করিয়াছিলাম। আমার সকল আশা ভরসা কুঠারাঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। কেন আমি কলিকাতায় না গিয়া এখানে লুকাইয়া থাকিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলাম—।"

নরেশবাবু ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের সুযোগ সন্তোষ?"

সন্তোষ কহিল, "সন্তোষ, না—না—বলুন অসন্তোষ। আমি আপনাদের নিকট বিদায় না লইয়া—" সন্তোষ আর কথা বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। ক্ষোভে, দুঃখে ও লজ্জায় তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুজল শ্রাবণের ধারার মত ঝরিয়া পড়িয়া সকলকে অভিভূত করিল। রাখাল সস্নেহে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার হৃদয়ের ক্ষত সান্ত্বনা বাক্যে ধুইয়া মুছিয়া দিতে যত্নবান হইল। সে ক্ষত সান্ত্বনা বাক্যে আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সে অধোবদনে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

গুরুসদয়বাবু কখন যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিল না। সন্তোষ চলিয়া গেলে নরেশবাবু শৈলেশ্বরের রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া এবার শিহরিয়া উঠিলেন। নরেশবাবুকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া রাখাল ডাক্তারের খোঁজে বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)
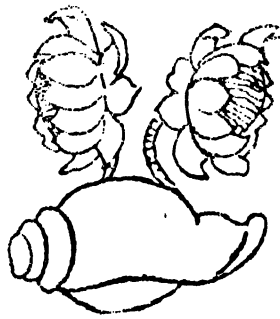
রাধাকৃষ্ণ।

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ২৫শে ভাদ্র শনিবার, ১৩৩৩। [৪২শ সপ্তাহ

প্রাচীন ভারত

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার প্রাচীন চিত্র।

প্রাচীন ভারতের নারী।

প্রাচীন ভারতের কারুকার্য্য।
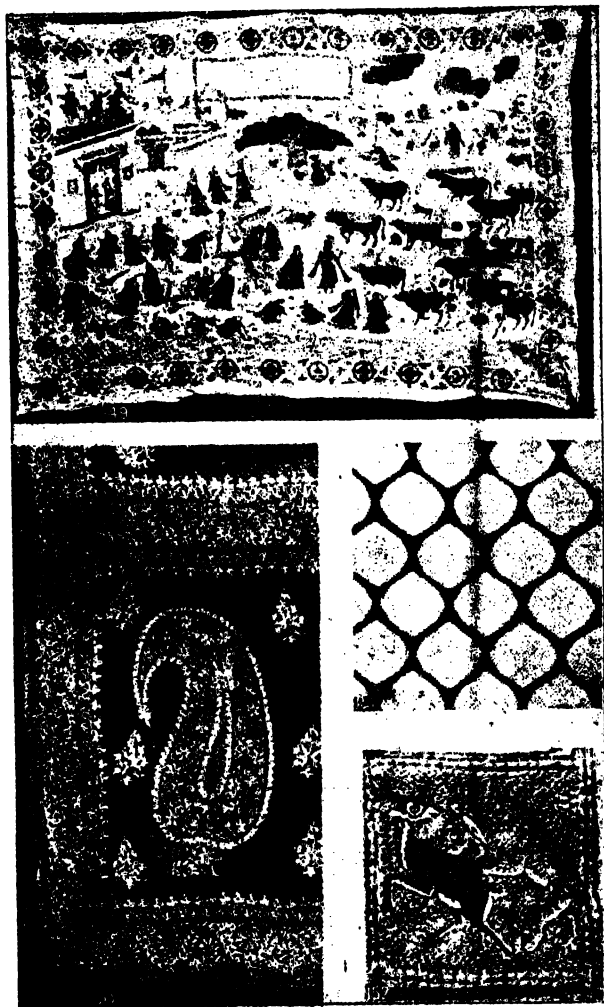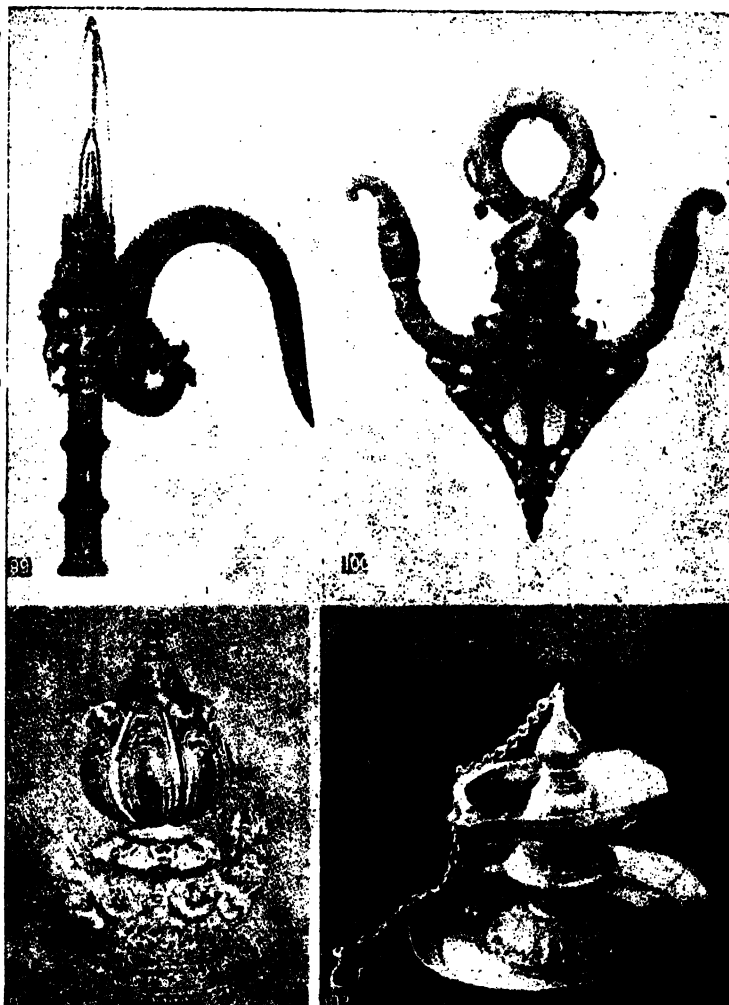
প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য্য।
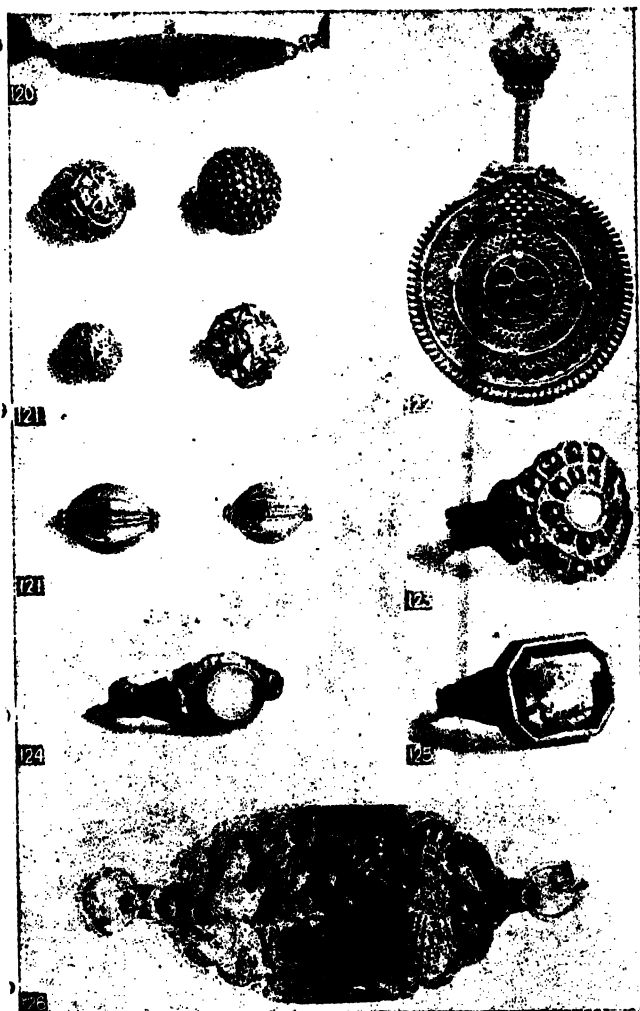
প্রাচীন ভারতের শিল্প।

আলোচনা

ভারতের ভাগ্যবিধাতাদের ঔদাসীন্য—

ভারত সরকার ভারত শাসনের জন্য ভারতবর্ষের লোকের নিকট দায়ী নহেন। ভারত সরকারের নীতি ভারতবাসী পছন্দ না করিলে মন্ত্রীদল বা কার্য্যকরী সমিতির পরিবর্ত্তন হয় না। কেননা ভারতবাসী নিজেদের দায়ীত্ব বা ভালমন্দ বুঝে না—তাহারা responsible বা দায়ীত্বসম্পন্ন গবর্ণমেণ্ট পাইতে পারে না। এই অজুহাতেই ভারত সরকারকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট দায়ীত্বসম্পন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ ভারত সরকার ভাল বা মন্দ কাজ করিলে তাহা বিচার করিবেন গ্রেট ব্রিটেনের অধিবাসীদের প্রতিনিধিগণ। ইংলণ্ড সুসভ্য দেশ—সেখানকার লোকেরা পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও রাজনৈতিক দায়িত্বসম্পন্ন। সুতরাং পার্লামেণ্ট বা হাউস অফ কমন্সের হাতে ভারত শাসনের চরম ভার দিয়া ভারতবাসী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। আমরা ভারতবাসী—ভারত সরকারের কৈফিয়ৎ তলব করিতে পারি না, কিন্তু ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের প্রতিনিধিরা এই কৈফিয়ৎ লইতেছেন জানিলে কতকটা আশ্বস্ত থাকিতে পারি—বুঝিতে পারি যে আমাদের শাসকগণ স্বেচ্ছাচারী নহেন, তাঁহাদিগকেও পার্লামেণ্টের নিকট নিজ নিজ কাজের জন্য জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু পার্লামেণ্টের সদস্যগণ—আমাদের ভাগ্যবিধাতাগণ—ভারতবর্ষ বিষয়ক প্রস্তাব সম্বন্ধে যখন গভীর ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন, তখন আমরা গভীরতর বিষাদ ও নিরাশা ব্যতীত আর কিছুই অনুভব করি না।

ভারতবর্ষ-বিষয়ক প্রস্তাবের আলোচনার সময় পার্লামেণ্টের সদস্যগণ কিরূপ উদাসীনতা ও দায়ীত্বজ্ঞান-হীনতার পরিচয় দেন তাহা শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায় মহাশয় সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। এ বৎসর যেদিন ভারত বিষয়ক আলোচনা হইতেছিল, সেদিন তিনি হাউস অফ কমন্সে দর্শক-রূপে উপস্থিত ছিলেন। আমরা তাঁহার বর্ণনার কিয়দংশের অনুবাদ নিয়ে দিতেছি—"ভারতের সহকারী সচিব ভারতীয় আলোচনা আরম্ভ করিবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেও সভা সদস্য-পূর্ণ ছিল—বিশেষ প্রয়োজনীয় কিছু আলোচিত না হইলেও চারিদিকে আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা যাইতেছিল। যেই ভারতের সহকারী সচিব বক্তৃতা দিতে উঠিলেন, অমনি সভা একরকম খালি হইয়া গেল। প্রথম কয়েক মিনিট প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার দুই তিনজন সহযোগী সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়া ছিলেন। বিপক্ষ দলের সম্মুখ বেঞ্চেও ঐরকম দুই তিনজন সদস্য ছিলেন—যদিও বিপক্ষ দলের নেতা ছিলেন না। কিন্তু অতি অল্পক্ষণের মধ্যে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলের সম্মুখ বেঞ্চি খালি হইয়া গেল—(অর্থাৎ মন্ত্রীরা ও তাঁহাদের বিরোধীদের প্রধানেরা কেহই আর সভায় থাকিলেন না)। মন্ত্রীদলের বেঞ্চে কেবলমাত্র ভারতের সহকারী সচিব তাঁহার লিখিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। বিরোধী দলের দ্বিতীয় বেঞ্চে কর্ণেল ওয়েজউড্, মিঃ স্নেল, মিঃ স্কার মিঃ জনষ্টন ও আর দুই তিনজন মাত্র ছিলেন।

* * * *

সমস্ত দৃশ্যটাই প্রাণহীন ও অবসাদকর হইয়াছিল। কোথাও প্রাণের একটু চিহ্নও দেখা যায় নাই। এরূপ গুরুতর বিষয়ে এরূপ নিষ্ফল ভাবে বলা শুনিয়া গায়ে যেন জ্বর আসে। "(it was really sickening to see such a great subject being handled so poorly and ineffectively.)" (The People p. 139 - 140)

স্বরাজ্যদলের চূড়াপাত—

পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায় স্বরাজ্যদলের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি স্বরাজ্যদলের ডেপুটি লিডার বা সহকারী নেতা ছিলেন। তাঁহার ন্যায় সর্ব্বজন মান্য নেতাকে হারাইয়া স্বরাজ্যদল যে বিশেষ শক্তিহীন হইয়া পড়িবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

লালাজী যে যে কারণে স্বরাজ্যদল ত্যাগ করিয়াছেন

তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐসকল কারণগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে সত্যই বুঝা যাইবে যে স্বরাজ্যদল দেশের কল্যাণকর নীতি অনুসরণ করিতেছেন না। স্বরাজ্যদল দেশে সংগঠনমূলক কার্য্য করিবেন বলিয়া কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বিলির বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহারা দেশের ভিতর কোন কাজ আরম্ভ করেন নাই। দেশে সংগঠনের কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে লেখালেখি ও চেঁচামেচি করিয়া কোনই ফল নাই। তারপর ব্যবস্থাপক সভাতেও স্বরাজ্যদল যে নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা দেশবাসীর মঙ্গলজনক নহে। আমরা আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপেই স্বরাজ্যদলের প্রার্থীগণকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমাদের স্বার্থ আইন সভায় তাঁহারা রক্ষা করিবেন উহাই আমাদের আশা ছিল। কিন্তু তাঁহারা দণ্ডবিধি সংশোধক বিলের ন্যায় প্রয়োজনীয় বিলের আলোচনার সময় নিতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনের ন্যায় বাহিরে চলিয়া আসিয়াছেন।

এইরূপ বাহিরে আসা নীতির ফলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর অনেক বেশী ক্ষতি হইয়াছে। কেননা অ্যাসেম্বিলীর চল্লিশ পঞ্চাশজন স্বরাজী সদস্যের মধ্যে মাত্র পাঁচ ছয়জন মুসলমান সদস্য ছিলেন। হিন্দুরাই স্বরাজ্যদলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। অথচ স্বরাজ্যদল অ্যাসেম্বিলীর বাহিরে চলিয়া আসায় হিন্দুরা প্রতিনিধি বিহীন হইয়াছে। হিন্দুদের নানারূপ স্বার্থ সম্বন্ধীয় আইন অ্যাসেম্বিলীতে প্রণয়ণ হইয়া থাকে। এ সব আইন প্রণয়ণের সময় যদি হিন্দুরা কথা বলিতে না পারে তবে তাহাদের স্বার্থ রক্ষিত হইবে কিরূপে ?

লালাজী প্রস্তাব করিয়াছেন যে আগামী নির্ব্বাচনে দলাদলি না করিয়া সকলে মিলিয়া একত্র ভাবে যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হউক। কিন্তু এ প্রস্তাবে কি বিভিন্ন দল রাজী হইবেন ?

আত্মশক্তির অবমাননা—

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্বন্ধে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা যে সুদীর্ঘ পাঁচঘণ্টাব্যাপী আলোচনা করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া কেবলই মনে হইতেছে ভারতবর্ষ আজ আত্মশক্তির উপর কতদূর শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িয়াছে—পরাধীনতার নিগড় জড়িত পরাবলম্বনকেই কেমন করিয়া একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। আমাদের উপনিষদের শাশ্বত বাণী "আত্মনা আত্মানম্ উদ্ধরেৎ" আমরা বুঝি একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি ! হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিরোধ প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে। সেই অন্তর্কলহ মিটাইবার জন্য আমরা বিদেশীয় শাসকশক্তির সাহায্য লাভের আশায় কত না কাকুতি মিনতি জানাইতেছি। মিঃ কে, সি, রায় ১৯১৯ সালের ভারতীয় শাসন সংস্কারের উপর Joint committeeর মন্তব্য উদ্ধার করিয়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণের জন্য ভারত সরকারের সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছেন। পার্শী সদস্য মিঃ জুমাশিয়া দুঃখ করিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না চাহিয়া উভয় সম্প্রদায় কাটাকাটি করিতেছে। মুসলমান সদস্য মিঃ কবিরুদ্দিন বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান কালের দুর্ভাগ্য এই যে গত ৪০ বৎসর কাল ধরিয়া গবর্ণমেণ্ট দেশের নেতৃত্ব হারাইয়া আসিতেছেন। সাম্প্রদায়িক কলহ নিবারণের জন্য হিন্দু, মুসলমান, পার্শী সদস্যদের গবর্ণমেণ্টের নিকট এই যে আকুল আর্ত্তনাদ—তাহা ভারতবাসীর কি মনোভাব প্রকাশ করিতেছে ? ইহার দ্বারা কি বুঝাইতেছে না যে ভারতবাসী এখন বিদেশীয় শত্রু হইতে আত্মরক্ষা করার কথা ভাবা দূরে থাকুক—নিজেদের গৃহবিবাদ মিটাইবার জন্য যেটুকু আত্মাবলম্বন থাকা প্রয়োজন তাহাও আজ হারাইয়া বসিয়াছে ? হিন্দু ও মুসলমানের বিবাদ নেতারা এ পর্য্যন্ত মিটাইতে পারেন নাই বলিয়াই কি আজ পুলিশের লাঠির সাহায্যে তাহা মিটাইবার জন্য আবেদন জানাইতে হইবে ? উভয় সম্প্রদায়ের সদ্‌বুদ্ধির উপর আমাদের যে আর একটুও শ্রদ্ধা নাই তাহাই কি এই আবেদনের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে না ? মানুষ কতদূর হীন, কতদূর মেরুদণ্ডবিহীন হইলে এইরূপ গৃহবিবাদের মীমাংসার জন্য তৃতীয় পক্ষের শক্তি সাহায্য ভিক্ষা করে !

আমাদের আজ যে এই নিরলম্ব ভিক্ষুকের অবস্থা হইয়াছে, ইহার জন্য দায়ী কে ? ইস্কুলের ছেলেরা ইতিহাসে পড়িয়া থাকে যে ব্রিটিশ শান্তি (Pax Britannica)

প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে এ দেশের লোক নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি, মারামারি করিয়া মরিত—ব্রিটিশরাজ ভারতবর্ষে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু এই শৃঙ্খলার সঙ্গে সঙ্গে যে লৌহ শৃঙ্খলও ভারতবর্ষের আত্মশক্তিকে নিষ্পেষিত করিয়াছে সে কথা ইস্কুলের ছেলেদের জানান হয় না। কিন্তু সত্যের খাতিরে দুই একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক বেফাঁসভাবে সে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছেন। আজ যে আমাদের প্রতিনিধিরা ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া আত্মশক্তি হীনতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টই দায়ী একথা ইংরাজ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "The country dependent upon the government and we have made it incapable of depending on anything else" অর্থাৎ ভারতবর্ষ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করিতেছে এবং আমরা (ইংরাজেরা) ইহাকে অন্য কিছুর উপর নির্ভর করিতে অসমর্থ করিয়া তুলিয়াছি। তিনি আরও বলিয়াছেন, "It is to be feared that our rule may have diminished what little power of evolving out of itself a stable govt. India may have originally possessed. Our supremacy has necessarily depressed those classes which had anything of the talent or habit of government. (Seeley's Expansion of England P. 196 Colonial Edition). অর্থাৎ আশঙ্কা হয় যে আমাদের (ইংরাজদের শাসনের ফলে ভারতবাসীদের নিজেদের ভিতর সুশৃঙ্খল শাসন স্থাপনের যে ক্ষমতা ছিল তাহা বুঝি অপসারিত হইয়াছে। যে সকল শ্রেণীর ভিতর শাসন কার্য্য চালাইবার ক্ষমতা ও অভ্যাস ছিল তাহা আমাদের প্রাধান্য স্থাপনের ফলে অবশ্যই কমিয়া গিয়াছে।

আমাদের ইংরাজ শাসকেরা যখন তখন বলেন যে ভারতবাসী আত্মশাসনের অযোগ্য সুতরাং তাহারা সম্পূর্ণ দায়ীত্ব সম্পন্ন শাসনভার পাইতে পারে না। কিন্তু ঐতিহাসিক সিলির উদ্ধৃত বাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে ক্রমাগত শাসনের চাপে চাপেই আমাদের স্বাবলম্বনবৃত্তি একেবারে অপহৃত হইয়াছে। আজ যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিগণ গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মকলহ দমনের জন্য কাতর ক্রন্দন করিতেছেন তাহাই হয়তো ভবিষ্যতে নজীর স্বরূপে উপস্থিত করিয়া ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসনের অযোগ্যতা কোন ভারত সচিব প্রমাণ করিবেন।

হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় গবর্ণমেণ্টের সহায়তা লওয়া সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর দুইটী পুরাতন ও সনাতন বাণী উদ্ধৃত করিতেছি। "ব্রিটিশ শান্তির (Pax Britannica) আশীর্ব্বাদকে আমি অভিশাপ বলিয়া মনে করি। যদি ব্রিটিশ শাসন সশস্ত্র শান্তি না চাপাইত তবে আজ অন্ততঃ আমরা এইরূপ অসহায় হইবার পরিবর্ত্তে অন্যান্য জাতির ন্যায় সাহসী নরনারী হইয়া থাকিতে পারিতাম" (Young India—December 29, 1920)। মহাত্মা তাঁহার Indian Home Rule নামক গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় আরও বলিয়াছেন "আমি কাপুরুষের ন্যায় রক্ষণ ভিক্ষা করা অপেক্ষা একজন ভীলের তীরে মৃত হওয়া ভাল মনে করি। যখন এমন রক্ষণ ছিল না তখন ভারতে বীরত্বে পূর্ণ ছিল। মেকলে ভারতবাসীকে কাপুরুষ বলিয়া গালি দিয়া নিজের মূর্খতাই প্রকাশ করিয়াছেন। যে দেশে পার্ব্বত্য অসভ্যেরা বাস করে, যেখানে ব্যাঘ্র, ভল্লুকের নিবাসভূমি, সেখানে যদি ভীরুরা বাস করিত, তাহা হইলে কোনদিন তাহারা ধ্বংস হইয়া যাইত। পিণ্ডারী ও ভীলের ভীতি এমন একটা কিছু ভীষণ জিনিষ ছিল না। যদি খুব ভীষণ জিনিষই হইত তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য লোকেরা ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বেই মরিয়া যাইত। তারপর অপরের দ্বারা রক্ষিত হওয়ার ফলে দুর্ব্বল হওয়ার অপেক্ষা পিণ্ডারীদের অত্যাচার সহ্য করা অনেক ভাল। এই তথাকথিত রক্ষণই আমাদিগকে কাপুরুষ করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ রক্ষণের ফলে দুর্ব্বল কেবলমাত্র দুর্ব্বলতরই হইয়া থাকে।"

আজ আমরা মহাত্মাকে ভুলিয়াছি—মহাত্মার সকল বাণীকে ভুলিয়াছি। ১৯২০ ও ২১ খ্রীষ্টাব্দে যে বিরাট আদর্শ সমগ্র ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, আজ আমরাই তাহাকে পদদলিত করিতেছি। হিন্দু মুসলমানের বিরোধ মিটাইবার জন্য রাজদ্বার হইতে সৈন্য বা পুলিশের সাহায্য

গ্রহণ করিলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মিটিবে না—কেবলমাত্র আমাদের আত্মশক্তিরই অধিকতর অবমাননা করা হইবে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সুবুদ্ধি ও সহিষ্ণুতা ফিরিয়া না আসিলে দাঙ্গা হাঙ্গামা মিটিতে পারে না।

দাঙ্গা হাঙ্গামা মিটাইবার জন্য স্যার অ্যালেকজাণ্ডার মুডিম্যান গবর্ণমেণ্টের যে নীতির কথা বলিয়াছেন তাহা আমাদিগকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে। তিনি বলেন যে দাঙ্গা হাঙ্গামার স্থানে স্থানীয় কর্ম্মচারীরা স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যুক্তি করিয়া যথাযথ উপায় অবলম্বন করিতেছেন—অন্য স্থান হইতে দাঙ্গার স্থানে নেতাদের যাওয়া ভাল নহে। অর্থাৎ ভারতবাসী দাঙ্গা হাঙ্গামা মিটাইবার জন্য কেবলমাত্র গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের উপর নির্ভর করিয়া থাকুক—দেশের শ্রেষ্ঠ নেতাদের কথা শুনিয়া আপোষে গোলমাল মিটাইয়া কাজ নাই।

দাঙ্গা হাঙ্গামা মিটাইতে হইলে আমাদের নিজেদের মধ্যে আপোষ করিবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনও উপায় নাই এ কথা সকলের এখনও বুঝা উচিত।

মায়া
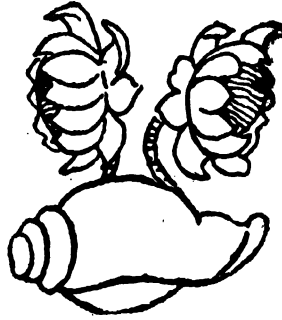
(বড় গল্প)

[শ্রীচন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(২২)

সেইদিন সন্ধ্যায় নবীন শৈলেশ্বরকে দেখিতে আসিয়া বলিল,—"হাঁ, আপনারা কি রকম লোক আমি বুঝিতে পারি না। পুলিস ডেকে গুরুসদয়কে ও তাহার গুণধর ছেলেটিকে ধরিয়ে দিতে পারলেন না। আমি থাকলে কি করতুম জানেন; আচ্ছা করে বাপ বেটাকে চাবকে, মাথায় ঘোল ঢেলে রাঁচীর সীমানা পার করে দিয়ে আসতাম। এবার একবার দেখা হয়, আচ্ছা করে দু' কথা শুনিয়ে দেব।"

শৈলেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল,—"ভগবান যা করেন ভালোর জন্তেই; তোমার পথ একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল।"

নবীন স্পর্দ্ধার সহিত বলিল,—"ওঃ, বুঝলেন এ শর্ম্মা ঘটে অনেক বুদ্ধি ধরে। এক পথ বন্ধ হলে আর এক পথের স্বষ্টি একদিনে করতুম।"

শৈলেশ্বর। ওরে কে আছিস্, নবীনের জন্তে বড় কাপে এক কাপ চা দিয়ে যা। নাও, ততক্ষণ সিগারেট চালাও।

নবীন। চা আর সিগারেট এই দুটী হ'ল আমার জীবন। বউদির হাতে চা খেতে তোমার বাড়ীতে আসা। দেখ— শৈলেশ্বরদা, মেয়েরা সেকালের মত রান্নাবান্না করবে সে আমি পছন্দ করি না- ওতে মেয়েদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। আগুনের তাতে ও ধোঁয়ায় শুকিয়ে কুড়িতেই বুড়ী হয়ে যায়।

শৈলেশ্বর। আমারও ত তাই দুঃখ ভাই। তোমার বউদি কোন মতেই রান্না ছাড়বে না, আমি বলি, কেন? যে সময়টা রান্নায় নষ্ট কর সেই সময়টায় আমার দুটো ফতুয়া সেলাই করে ফেলতে পার। তবু মাস গেলে বার আনা বাঁচে।

নবীন উৎসাহিত কণ্ঠে বলিল, ঠিক তাই—এই সামান্ত জিনিষটা মেয়েরা কোন মতেই বুঝবে না।

শৈলেশ্বর। আমি কত বুঝাই, সেলাই শেখ, সংসারে আয় দেবে গান বাজনা শেখ দু' দণ্ড শুনে প্রাণ ঠাণ্ডা হবে। আমি অনেক সময় বাড়ী থাকি না, বন্ধুবান্ধবরা এসে ফিরে যায়—তোমার গান বাজনা শুনলে তারাও দু' দণ্ড আমার অপেক্ষায় বসে থাকবে। ব্যাবসা, ব্যাবসা কি আমাদের দেশে চলে। আমার এক বন্ধু Eye specialist হয়ে এসেছে। পা'লে পার্ব্বণে তোমার বউদির মাথা ধরে। আমি বন্ধুকে সেদিন কথায় কথায় সে কথা বলতে সে কতরকম যন্ত্র আমার বাড়ী বয়ে নিয়ে এসে তাঁর চোখ Examine করলে। প্রায় আধঘণ্টা Examine করবার পর বললে, "তোমার wifeএর চোখ খারাপ হয়ে এসেছে, ছোট বড় লেখা যখন সব অনায়াসেই পড়তে পারেন তখন বুঝতে হবে তাঁর হয়েছে "কেরাণীর চোখ।" সস্তা করে একটা চশমা দিয়ে গেছে, কিন্তু কি একগুঁয়ে মেয়েমানুষ, চশমা কোন মতেই পরাতে পারলাম না। এখন বলত ভাই সে বেচারীর ব্যবসা কেমন করে চলে? একদিন বিছানায় শোবে না যে ডাক্তার ডাকি। কতরকম নূতন নূতন দামী ঔষধ বেরিয়েছে, খা, তা নয়। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী বলেন, "মেয়েটাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেললে, বাবুদের বাড়ী পড়লে মেয়েটা কত ঔষধ খেতে পেত।" প্রসব হবি, দু' চারমাস বিছানায় শুয়ে পড়ে থাক, এলোপাথিক ও হোমাপাথিক, জল চিকিৎসা ঘটা করে চলুক, তা নয়, সুতিকাগারে যাবার দিন পর্য্যন্ত খুঁটিনাটি কাজ। বার্লি আর বিস্কুট খেয়ে চিঁ চিঁ কর, তা নয়, সেঁক-তাপ নিয়ে, শুঁটের নাড়ু খেয়ে একমাস না যেতে যেতেই রান্নাঘরে প্রবেশ—

নবীন। সেকালের বর্ব্বরতা।

শৈলেশ্বর। ঠিক তাই, বই কিনে এনে দিই, রান্নাঘরে

বসে কিংবা শোবার ঘরে বসে পড়বে, কেন, ছাদে দাঁড়িয়ে বেণী দুলিয়ে পড় না, তা নয়, লজ্জা।

নবীন। ওই লজ্জায় আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। আমার স্ত্রীকে আমি এমন গড়ে তুলব যে দেখবেন লজ্জার মাথাটি তার খেয়ে দেব।

শৈলেশ্বর। বিয়ের আর ক'দিন রইল।

নবীন। সে ত আপনাদের হাত। বিয়েটা না হওয়া পর্য্যন্ত আমার আর কাজে মন বসছে না। বউদি! একটা পানও দিলেন না, আচ্ছা আমারও বউ আসছে। 'এয়সা দিন নেহি রহেগা।'

(২৩)

পাকাদেখায় বরপক্ষীয়েরা অনেক বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রণ করেছিল। সেই রাত্রেই স্থির হইল, বিবাহ রাঁচিতেই সুসম্পন্ন হইবে। রাঁচিতে বিবাহের নানা অসুবিধার কথা উঠিতে অঘোর নরেশ বাবুকে আশ্বস্ত করিল ও কন্যাপক্ষের সকল ভার সে সানন্দে গ্রহণ করিল।

শুভদিনে শুভলগ্নে নবীনের সহিত মল্লিকার বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ-বাসরে রমার পিসী খাঁদি মাসীকে গা টিপিয়া চুপি চুপি বলিল, কি বাপু, মেয়ে উর্ব্বশীও নয়, মেনকাও নয়, আমার সেজ ভাজের পিস্তুত বোনকে দেখেছিস ত?

খেঁদি বলিল, "হঁ্যা—তুই ত ভাই আমার ঠাকুমার মাসীকে দেখেছিস, ঠাকুমা বলেন, "তাঁর রূপ দেখে একবার চারটে গোরা তার পিছু তাড়া করেছিল।"

আড়ি পাতিয়া শুনিয়া লবঙ্গের দিদিমা কহিল, "কেন গো রমার পিসী, তোর রঙটাই কি কিছু কম না কি? সাতটা ছেলে বিয়োলে ওর রং আমার নাতীর মত দাঁড়াবে তা তোরা দেখিস, পুঁটির কি কম রং ছিল না? পুঁটি যখন বরের পাশে বাসরে বসেছিল তখন সকলকে বলতে হয়েছিল, যেন বিদ্যা ও সুন্দর। হঁ্যালা পুঁটি, তুই ওরকম নাক তুলছিস্ কেন লা?"

কানে মাকড়ী ও নাকে টানা নথ দুলাইয়া পুঁটি সুন্দরী বলিল, "কনের পাশে ও বর বাপু মানাচ্ছে না, যেন সলতে কাটির সঙ্গে সোণার পিদ্দিমের বিয়ে হয়েছে।"

খেঁদির মাসী মুখে আঁচল দিয়া বলিল, "না বাপু, মেয়েটা হাসালে, আমার বড্ড হাসি রোগ, বাহিরে যাই চল না গো পুঁটির ঠাকুমা।"

পুঁটির ঠাকুমা বলিল, "ওঠ না ছুঁড়ী, বাড়ী চল, নাত-জামাই হয়ত রেগে বসে আছে।"

অসমাপ্ত

কবির অতিরঞ্জনপ্রিয়তা

[শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ]

কবিরা সামান্য সত্যের উপর এমন এক অতিরঞ্জনের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং সেই বোঝা আমাদের ধারণাটাকে এমন দৃঢ়ভাবে অধিকার করে বসে যে আমরা পুরুষানুক্রমে বাস্তব সত্যের উপর আর একটা কাল্পনিক জগত সৃষ্টি করে বসে আছি।

মানুষ অপেক্ষা ইতর প্রাণী পশুপক্ষী বা মৎস্যাদির উপরই কবিদের কল্পনাধিক্য দেখা যায়। তাঁরা যে পাখীকে যেমন ভাবে বর্ণনা করেন আমরা বিনা বিচারে সেই পাখীকে তেমনটি বলেই ভেবে থাকি, অর্থাৎ প্রকৃতির উপর কলম চালাতে চেষ্টা করি। দুই একটা নমুনা দিয়ে আমার বক্তব্যটা বুঝিয়ে দি।

জগতের সমস্ত কবিই কোকিলের ডাক শুনলে পাগল হয়ে যান্। এ সম্বন্ধে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা বা গান প্রত্যেক জাতির সাহিত্যের অনেকটা অংশ দখল করে বসে আছে। কোকিলের ডাকমাত্রই 'সঙ্গীত', ইহাই সকলের ধারণা। কোকিল একবার 'কুহু' করে উঠল ত আশ-পাশের স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতি কাণ খাড়া করে সেই কুহুতান শুনতে লেগে গেল, ঘরে বসে নবীন কবি নবীন উৎসাহে নূতন পদ্য লিখতে সুরু করে দিলে ও জগৎ তানমান লয়ে পরিপূরিত হয়ে উঠল!

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই, কোকিল কি শুধু গানই করে? সে কি কাহেও ডাকে না? কথা কয় না? আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু শোকে কিম্বা রোগ-যন্ত্রণায় চীৎকার করে কাঁদে না? অবশ্য কোকিল যে আনন্দপ্রিয় তা কবিদের মতো আমরাও স্বীকার করে নিতে পারি, নইলে বসন্তকালেই 'কুহুস্বের' বাহুল্য দেখা যায় কেন? কিন্তু তার প্রত্যেক ডাকটিই যে 'গান' একথা বাস্তব বলে মনে হয় না। এই সম্বন্ধে এক সময়ের একটা ঘটনা বলি।

আমাদের বাসার পার্শ্বে কোন বাড়ীতে খাঁচায় পোষা একটা কোকিল থাকত। যদিও তার ডাক বছরের মধ্যে সব সময়ই শোনা যেতো এবং শুনে শুনে আমাদের পেট ভরে গিছল তথাপি সময় বিশেষে এবং মনের অবস্থা বিশেষে, বসে বসে সেই বহুশ্রুত ডাকই শুনতে ইচ্ছে যেত, কারণ কবি শিখিয়েছেন ডাকমাত্রই গান এবং গানমাত্রই চিত্তাকর্ষণ করে।

একদিন সেই কোকিলটার 'কুহুতানের' মাত্রা যেন সকাল হতে কিছু বেড়ে যেতে লাগল, আর আমাদের শ্রবণ যুগলের তৃপ্তির পরিমাণও সেই পরিমাণে বাড়তে লাগল। এমন কি সেই দিনের কোন সময়ে কতকগুলি লোক একত্র হয়ে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির এই মনোমোহনকারী সঙ্গীত বিভোর হয়ে শুনতে লাগল।

সমস্ত দিন ডেকে ডেকে সন্ধ্যার সময় সে ডাক যখন কমতে সুরু করলে আমরা মনে করলাম কোকিল এবার চীৎকারে ক্লান্তি বোধ করবে। আহা! আর কি গাহিতে পারে? আজ রাত্রে বেশ করে নিদ্রা দিক্ কাল আবার আমাদের আমোদ দেবে!

পরদিন প্রত্যুষে উঠেই কোকিলের দিকে নজর পড়ল, কিন্তু একি এ দৃশ্য! কোকিল যে চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়েছে; সে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েছে! গান গাহিতে গাহিতে মৃত্যু! এ কি সম্ভব? আমার মন একথা নিলে না। মন যেন বলতে লাগল, কাল 'গান' বলে যা শুনেছি তা তার গান নয়, মৃত্যু যন্ত্রণার চীৎকার!

সে কাল কি বলে চীৎকার করেছিল? সে বোধ হয় এই কথাগুলিই বলেছিল—"ওগো! জল দাও, জল দাও, প্রাণ বেরিয়ে গেল। ওগো! বড় যন্ত্রণা, আমায় রক্ষা কর রক্ষা কর! ওগো মানুষ! তোমরা দাঁড়িয়ে কি দেখছ? এস, আমার পাশে এসে দাঁড়াও, আমার গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও। বুঝি আর বাঁচব না, উঃ গা জ্বলে গেল, আর

পারি না। অকৃতজ্ঞ মানুষ! এলে না! সেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ আর হাসচ। উঃ ভগবান! আর এ যন্ত্রণা সহ্য হয় না।"

কোকিল এই সব বলে কাল সারাদিন চীৎকার করেচে, আর আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হেসেচি। প্রাণটা আমার বিষাদময় হয়ে উঠলো। আহা! সেই পাখীটীর শব দেহখানি আজও আমার চোখের সামনে ভাসচে!

এই ত গেল কোকিলের কথা। তার পরে ধরুন পাপিয়া। পাপিয়াকে আমাদের দেশের কবিরা দীনদুঃখিনী কাঙালিনী মেয়ে সাজিয়ে বসে আছেন। সে যেন ব্রহ্মার অভিশপ্ত প্রাণী যমের দূত, অনন্ত লৌহশলাকায় তার চোখ দুটো যেন গুঁজে দিচ্ছে, তাই সে চীৎকার কচ্চে—'চোখ গেল, চোখ গেল।'

তাকে এমন হতভাগা প্রাণী খাড়া করে তোলা, এ কেবল কবিতেই সম্ভব। উচ্চবৃক্ষের শেষ সীমায় বসে, বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত হতে হতে স্ফূর্তির আধিক্যে সে হয় তো আনন্দে চীৎকার করে কবিতা আওড়াচ্ছে—

> কি আনন্দ মরি মরি। বসিয়া এ তরুপরি।
> পবন হিল্লোলে গাত্র, ভাসিতেছে দিবারাত্র,
> আমাদের মত সুখী আছে কেবা, বলদেখি।

আর আমরা নীচেয় দাঁড়িয়ে মনগড়া কাণে শুনতে পাচ্ছি, চোখ গেল,—চোখ গেল,—চোখ গেল। আর সহানুভূতি-পূর্ণ হৃদয়ে ভাবচি, ঐ বুঝি যমের দূত এসে বেচারীর চোখে লোহার শলাকা পুরে দিচ্ছে গো। আহা, ওকে নীচে নামিয়ে আনলে হয় না?

শুধু কোকিল পাপিয়া বলি কেন, পাখীদের স্বরমাত্রই যে 'গান' এ বিশ্বাস আমাদের মনে একপ্রকার গেঁথে গেছে। কিন্তু মানুষ অপেক্ষাও ঘোরতর সংসারী যে পক্ষীকুল, তাদের দৈনন্দিন জীবনে গান গাহিবার অবসর যে খুবই কম সেটা আর আমাদের ধারণায় আসে না। তারা একে অপরকে ডাকচে, চীৎকার করে সাংসারিক আলোচনা কচ্চে, পরস্পর কলহ কচ্চে, শোকে যন্ত্রণায় কাঁদচে, আর আমরা শুনচি গান।

পক্ষীদের মত মৎস্যের কথাও ধরা যেতে পারে। কবি আমাদের শিখিয়ে রেখেছেন মৎস্যেরা সদাসর্ব্বদা ক্রীড়া করে, আর আমরাও মৎস্যের গমনাগমন মাত্রকেই তাদের ক্রীড়া বলে মেনে নিয়েচি। যেন সারাদিন তারা কেবল খেলিয়েই বেড়াচ্চে। ঘাটে নেমে পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে একটু নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় মৎস্যের দল ছুটাছুটি কচ্চে আর তাদের রজত বিনিন্দিত শুভ্র উদরগুলি ক্ষণেকের জন্য চিক্‌মিক্ করে উঠচে। সে দৃশ্য অতি মনোরম, বাস্তবিক, দেখলেই মনে হয় যেন তারা খেলিয়ে বেড়াচ্চে। কিন্তু তারা যে তাদের পোকা-মাকড় প্রভৃতি খাদ্যকে ধরার জন্য ছুটাছুটি কচ্চে না তার প্রমাণ কি? তাদের দলকে একসঙ্গে দেখলেই কি মনে কর্ত্তে হবে তারা দল পাকিয়ে খেলা কচ্চে? এমনও কি হতে পারে না, আমাদের হাট-বাজারে যেরূপ ঘটে তারাও অসংখ্য প্রাণী একত্র হয়েচে বটে কিন্তু কেউ কারোর ধার ধারে না, কেউ কাকেও চিনে না, যে যার নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত।

এমনো হতে পারে, উপরের সামান্য শব্দে তারা ভীত চকিত হয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে ছুটাছুটি কচ্চে। তাদের চিত্ত ত্রাস বহুল হওয়াই সম্ভব, কারণ জাল ও বড়শী দেখে আর তাদের সকলেরই অকাল মৃত্যু দেখে তারা যে সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন মনে থাকে তা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে। তবেই বলতে হয়, কবি তাদের যে সব সময়ই খেলিয়ে বেড়ান সেটা বাস্তব নয়—অর্থাৎ মাছের গমনাগমন মাত্রই তাদের খেলা নয়।

এরূপ আরো উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যাতে করে আমরা বুঝতে পারি কবির কল্পনা আমাদের উপর কিরূপ আধিপত্য করে বসে আছে। তাঁদের বলিহারি। নিজের মানসিক শক্তিবলে তাঁরা আমাদের এমনিই অভিভূত করে রেখেছেন। তাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিও সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অধিকতর প্রখর তবে একটা কথা এই, তাঁদের অতি-রঞ্জনের স্পৃহা খুব প্রবল হলেও সেই অতিরঞ্জন কিছু না কিছু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নিছক মিথ্যাকে ভিত্তি করে কবি কখনো কোন বিষয় বলেন না। তবে আমাদেরও কবি-গণ্ডীর বাহিরে যেতে হবে এবং যথার্থকে যথার্থরূপে দেখতে শিখতে হবে।

প্রাণের সাথী

(গল্প)

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(ক)

"লালী—"

"তমালী।"

"ছাখ, ছাখ, লালী ওই পশ্চিম দিকটা কেমন রাঙা আবীরের মত লালচে হ'য়ে আসচে, কেন বলত? আঃ তবু তুই হাঁ করে আমার মুখের পানে চেয়ে থাকবি? কি এত দেখছিস রে লালী, আমার মুখে দেখবার মত কি জিনিষ আছে?"

"তমাল! ওই লাল রঙটা আমার চোখে পড়ছে না কেন জানিস্—তোর মুখখানার গোলাপী রঙ আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে যে রে।"

"আঃ লালী তুই যদি এমন করে জ্বালাতন আরম্ভ করবি তা হলে সত্যি বলছি আমি এক্ষুণি উঠে যাব।"

লালী অনুনয়ের সুরে করুণ ভঙ্গীতে বলল—"যাস্‌নে তমাল—আচ্ছা আমি আর না হয় তোকে বলব না, কিন্তু সত্যি করে বল দেখি তমাল রাণী—আমাদের এই গয়লার ঘরে তোর মত সুন্দরী মেয়ে কি খুঁজলে পাওয়া যায়? হ্যাঁ রে তমাল, তুই নাকি কেষ্টনগর যাচ্ছিস?"

তমাল রাণীর মুখখানা এইবার অকস্মাৎ শ্রাবণের ঘন মেঘের মত থম্‌থমে সজল হ'য়ে উঠল। জলভরা কালো কাজল মাখা চোখদু'টি,...নদীর পরপারে যেখানে সবুজ গাছের কচি পাতাগুলো বাতাসের মৃদুল স্পর্শে ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছিল—সেইখানে তার কাজল আঁখির সলাজ দিঠি ঠিক্‌রে প'ড়ল। লালী তমালীর একখানি সুগঠিত হাত পরম আবেগে চেপে ধরে কাতর কণ্ঠে বলল—"তমাল, তুই যে কেষ্টনগরের কথায় জবাব দিলি নে? ওঃ বিয়ে হচ্ছে বড় ঘরে কিনা? তাই আমার কথায় আর কাণ দেওয়া হ'লো না—আমি কি আর বুঝতে পারি নে, সব পারি তমালী অত বোকা ভাবিসনে।"

লালীর কথার মাঝে যে ছোট্ট অভিমান ভরা আঘাতটুকু ছিল সেই আঘাতটুকু তমালীর বুকে বাজের মতই বাজল। মুখখানাকে অসম্ভব রকমে গম্ভীর করে তমালী কঠিন স্বরে বলে উঠল—"হ্যাঁরে মুখপোড়া, তোর মতন সেয়ানা আর দুনিয়ায় দু'টি নেই...যাঃ তুই আমার সামনে থেকে উঠে যা দেখি লালী...দিনরাত আমায় কেন জ্বালাতে আসিস্ বলত— আমি তোর কি করেছি? আমার যখন খুসী যাবে, তখন সেখানে যাব, কেষ্টনগর যাই বা না যাই, সেজন্যে তোর এত মাথা ব্যথা কেন রে হতভাগা?"

লালীর কঠিন হাতের বাঁধন থেকে এক ঝটকায় নিজের কোমল হাতখানি মুক্ত করে নিয়ে তমালী উঠে দাঁড়াল। লালী তার মুখের প্রতি চেয়ে ফিক করে হেসে বলল—"তোর এ রাগ অন্য লোকের কাছে সাজে তমাল কিন্তু আমার কাছে লুকোতে পারবি নে...তোর এ রাগ জানতে আমার বাকী নেই...কিন্তু তমালী, তুই আর এ তিনটে দিন পরে গাঁ ছেড়ে চলে যাবি ভাবতেও আমার শরীর কেঁপে ওঠে; একেবারে আঁধার করে চলে যাবি, কিন্তু তোর কি বল, তুই বিয়ে করবি, মনের আনন্দে সব ভুলে যাবি, কিন্তু আমার কি হবে ...আর কি তখন আমায় মনে পড়বে তমাল?"।

হাতের উল্টা পিঠ দিয়ে ব্যথার অশ্রু চট করে মুছে নিয়ে লালী বিষাদ করুণস্বরে বলল—"তমালী, আজ যদি আমাদের মা থাকত?"

লালীর কণ্ঠে বেদনা ও বিষাদমাখা সুরের ঝঙ্কার... মুখখানি শীতের পাংশু গগনের মত মলিন, নিষ্প্রভ।

তমালী নিদাঘ তপ্ত শুষ্ক মুকুলটির মত ম্লান মুখখানি ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে নিল। মায়ের পুণ্য স্মৃতির কথা নূতন করে

মনে জাগতে তার চোখদুটি বেয়ে অশ্রুর ঝরণা নেমে এল। তমালীর চোখে জল দেখে নিরক্ষর কৃষক যুবকের সবল কঠিন বুক মুহূর্ত্তে আঘাত পেয়ে স্তব্ধ নির্ব্বাক হ'য়ে গেল। ক্ষণেক পরে চারিদিকে ইতস্ততঃ দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লালী কোঁচার খুঁটটা দিয়ে তমালীর অশ্রুসিক্ত ডাগর আঁখিদুটো মুছে নিয়ে ধরা গলায় বলল—"কাঁদিস্‌নে তমাল, তোর আমার মনের দুঃখ ভগবানই বুঝতে পারছেন। আবার তোর মামী যদি এসে পড়ে তা হলে তোকে 'আস্ত' রাখবে না, যা বাড়ী যা লক্ষীটি, তবু দাঁড়িয়ে রইলি? হ্যাঁ, একটা কথা আমার রাখবি কি? যদি সত্যিই তুই কেষ্টনগরে যাস—তা হলে যাবার আগে আমাকে একবার দেখা দিয়ে যাস, না আর কিছু না, আমি তোর জন্যে সেদিন কাজে যাব না, এইখানে দাঁড়িয়ে থাকব বুঝলি?"

তমালীর হাতটা চাপ দিয়ে লালী তার মনের কথা জানিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গাছে বাঁধা গরুর দড়ীটা একমনে খুলতে লাগল।

তমালী কলসীটা তুলে নিয়ে লালীর কাছে দু' পা এগিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে বলল—"যদি সত্যিই এ গাঁ ছেড়ে জন্মের মত চলে যাই লালী, তোকে তা হলে কথা দিচ্ছি ঠিক দেখা করে যাব...আর যদিই না পারি তা হলে—"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে লালী বলল—"না যদি পারিস—তা হলে আমি তোকে কথা দিচ্ছি তমাল, তোর সঙ্গে শেষ দেখা করবই করব।"

লালী পিছিয়ে গিয়ে দড়ীটা ধরে গুন্ গুন্ করে এলোমেলো সুরে গাইতে গাইতে চলল—

"কানু কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই।"

(খ)

তমালীর মা যখন চব্বিশ পেরিয়ে পঁচিশের কোঠায় পা দিয়েছিল, তখন পাড়াশুদ্ধ লোক একবাক্যে বলেছিল—"নাঃ নিতাই ঘোষের বংশরক্ষা আর হলো না—এইবার ঘোষ বংশে বাতী দেবার কেউ থাকবে না দেখছি।" নিতাই ঘোষ সে মন্তব্য শুনে শুধু হাসত। শেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় নিতাই ঘোষ হাসতে হাসতে বাড়ী ঢুকে উচ্চ কণ্ঠে ডাকল—"ওরে তরী—এই নে তোর ছেলে এনে দিয়েছি।"

তরী ওরফে তরঙ্গিনী সহাস্য বদনে এসে স্বামীর কোল হ'তে সদ্যজাত শিশুটিকে পরম স্নেহে বুকে চেপে সমুৎসুক নয়নে স্বামীর প্রতি চেয়ে সোৎসাহে বলল—"হ্যাঁগা, এ সোণার চাঁদকে কোথায় কুড়িয়ে পেলে গা?"

নিতাই ঘোষ সস্নেহে পত্নীর মাতৃমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে গর্ব্বস্ফীত বক্ষে উত্তর দিল—"যিনি দেবার মালিক তিনিই দিয়েছেন রে তরী। তবে শোন কথাটা খুলেই তোকে বলি—গেছলুম আজ ভিনগাঁয়ে—বাবুদের বাড়ী—সেখান হতে ফিরে আসবার পথে আমারই চেনা লোক একটি একে আমাকে দিয়ে বললে—'নিতুদা তুমি রাতদিন ছেলের কামনা করছো এই নাও, একে মানুষ কর গিয়ে। আমাদেরই স্বজাতীর ছেলে, মা বাপ কলেরায় মরে গ্যাছে—কারুর কাছে এই অনাথ শিশুটিকে রাখতে ভরসা হলো না। তুমি যদি একে মানুষ কর তা হলে আমি দায় থেকে উদ্ধার হই ভাই।' ভগবানের দান তরী, আমি কি ফেলতে পারি? বুকে করে নিয়ে এলুম—কিরে মন্দ কাজ করিছি কি?"

তরঙ্গিনী লালীর মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিয়ে পুলকপূর্ণ-কণ্ঠে বলে উঠল—"এ আবার মন্দ কাজ! এতদিনে আমার বুক ঠাণ্ডা হলো যে গো। হ্যাঁগা, এত সুখ কি আমার সইবে?"

বুভুক্ষু নারী হৃদয়ের অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে একটু একটু করে লালী যখন পাঁচ বছরে পা দিল তখন একদিন নিতাই ঘোষ লালীর হাতে নারকেলের নাড়ু ও মুড়কীর মোয়া তুলে দিয়ে হাসতে হাসতে বলল—"লালী তুই তোর বোন দেখবি নে?"

সদ্য নিদ্রোত্থিত লালী মায়ের পাশে ছোট্ট একটি পুষ্প স্তবকের মত ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখে সোৎসাহে বলে উঠল—"বাবা ঐ আমার বোন, দাও না বাবা আমার কোলে আমি ওকে নেব।"

* * * *

দিনের পর দিন লালী ও তমালী দু'টি ছোট্ট মুকুল তরঙ্গিনীর বুক আলো করে প্রস্ফুটিত হ'তে লাগল। নিতাই ঘোষ আর তরঙ্গিনী ভেবে রাখল এদের দু'টিকে আর জন্মে বিচ্ছিন্ন হতে দেব না। হায়! মানুষে ভাবে—বিধাতা

অলক্ষ্যে ভাঙ্লেন। উভয়ের মনের সাধ অপূর্ণ-ই রয়ে গেল। সে বছর গ্রামে প্রবলভাবে মহামারী দেখা দিল। সেই কাল ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'য়ে দু'টি সংসার অনভিজ্ঞ কোমল কুসুম কলিকে সংসারের শুষ্ক কঠিন বুকের মাঝে চিরদিনের তরে নিক্ষেপ করে নিতাই ঘোষ ও তরঙ্গিনী এক তরীতে কোন অচিন্ রাজ্যে মহা শান্তির আশায় চির শান্তিময়ের উদ্দেশে পাড়ি দিল। পিতৃমাতৃহীনা অনাথা বালিকার কষ্ট দূর করতে রক্ষক বেশে শয়তানরূপী পিশাচ কাকা কোথা হ'তে নিতাই ঘোষের সাজানো সংসারে নিজের রাজ্যপাট তুলে এনে জাঁকিয়ে বস্‌লেন।

অদৃষ্টের পরিহাসে লালী উভয়ের চক্ষের শূল হ'য়ে দাঁড়াল। পাড়ার মধ্যে যে যত গভীর অপরাধে অভিযুক্ত হ'ক না কেন তমালের পরম স্নেহময়ী গুণবতী (?) কাকীমার সূক্ষ্ম ন্যায় বিচারে লালীই অপরাধী বলে সাব্যস্ত হ'ত। অবশেষে লালীর সঙ্গে তমালীর বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করেই তমালীর অভিভাবকদ্বয় ক্ষান্ত হ'লেন না—তীব্র অভিযোগ এনে লালীকে গ্রাম হ'তে বিতাড়িত করে সেদিন তাঁরা জলগ্রহণ করলেন।

(গ)

আকাশে জল...গাছের পাতায়, ফুলের বুকে, ঘাসের মাথায়, মাঠের প'রে যতদূর দৃষ্টি চলে অসীম জলরাশি, চারিদিকে জল থৈ থৈ করছে···। কিসের বেদনায়, কিসের বিরহে, কি মানসিক বেদনায় নিপীড়িত হয়ে তমালী আজ গোপন কান্নায় বসে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছে! চলে গেছে···কে, লালী···যাক্‌না, তাতে কার কি ক্ষতি! পৃথিবীতে কত লোক আসছে যাচ্ছে, এই ত চিরন্তন নিয়ম... এ জগতে কেবল যাওয়া আসার লুকোচুরী খেলা যুগের পর যুগ ধরে হচ্ছে...মানুষের অভাবে মানুষ কি কাঁদে? কাঁদে বইকি, মানুষ যখন সর্ব্বপ্রিয় ধনটিকে জন্মের মত হারিয়ে ফেলে, তখনই বুঝি তার চোখের জলে সাগর সৃষ্টি হয়ে যায়... তার অন্তরের বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাসের ঝড় তখনই বুঝি ব্যাকুলভাবে গর্জ্জন করতে থাকে নিরুদ্ধ রোষে...ক্ষুব্ধ ক্রন্দনে, সারা বিশ্ব সংসার তখনই বুঝি টলমল করে ওঠে রিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্...পল্লীবালার কাঁকন ধ্বনির মিঠা আওয়াজের মত বাদল ধারা অবিশ্রান্তভাবে ঝরেই চলেছে—আর তমালী ভাঙা জানলার গরাদ চেপে ব্যাকুল অন্তরে সর্ব্বস্ব ধনের প্রতীক্ষা করছে—দমকা হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে মাটীর প্রদীপটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল—ওগো সেও কি তমালীর মত কোনও বিপুল দুঃখের ভারে জর্জ্জরিতা? সেও কি এমনি কারুও আশায় উদ্বেগ চঞ্চল হৃদয়ে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত রুদ্ধশ্বাসে গুনে যাচ্ছে...আবার না পাওয়ার হতাশে—অন্তর্বেদনায় মুশড়ে—দুমড়ে প্রতি পলে মৃত্যু কামনা করছে...। কে জানে হয়ত বা হ'তেও পারে...! তমালী চেয়েছিল দূর পথের পানে, যে ফুলে ছাওয়া পথের বুকে তার অভিশপ্ত অনাদৃত প্রিয়তম বেদনা-ব্যথিত উদাস পরাণে পায়ের চিহ্ন ফেলে থুয়ে বিদায় নিয়েছে। তার অবুঝ প্রাণের ব্যথার চঞ্চলতা ছন্দহারা গানের মত ব্যাকুল বেগে ছুটে চলেছিল সেই পথহারা গৃহহারা তরুণ পথিকটির পায়ে অর্ঘ্য দেবে বলে। তার প্রাণ যেন আজ ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে বলতে চাচ্ছিল—"ওগো আমার চির জনমের খেলার সাথী প্রাণের দেবতা...নাও নাও আমার প্রাণের আরতি নাও। আমার বুকের যে বন্দনা গীত তোমার তরে রচেছি তাকেও তোমার চরণ তলে আশ্রয় দাও...পথ ভোলা ওগো এ পথ তোমার চিরদিনের তরে মুক্ত রইল গো···মৌন নিশায়...গভীর অন্ধকারে, বৃষ্টিভেজা মেদুর দিনে, প্রাচীন বেশে···অথবা কোন অপরিচিতের রূপ ধরে যখনই আসবে তুমি প্রিয় এ আঙিনায় তোমার তরে প্রাণের দীপ জ্বালা থাকবে। সেদিন আমার সকল বেদনার বাণী গানের রূপ ধরে তোমায় হৃদয় মন্দিরে বরণ করে নেবে গো সখা!"

গোধূলীর রক্তিম রাগ মাখা···গাছের মাথায় সন্ধ্যা ধীরে ধীরে তার ধূসর আঁচল মেলিয়ে দিয়ে আসন পেতে বসছিল। বনের সভাতলে জোনাকীর দীপ একটি একটি করে জলে উঠছিল। সহসা পিছন হ'তে কে ডাকল—"তমাল, তমালী, তমাল রাণী!"

একি! বিশ্বাস কি হয়, সে এসেছে। না,—হ্যাঁ—সেই-ই তো—সেই আবেশ মাখা মধুর কণ্ঠস্বর। সে যে চির পরিচিত চির নূতন গো···তমালী শিউরে উঠল—ফিরে দেখব কি...না...যদি এ সোনার স্বপনজাল বাস্তবের রূঢ়ের

ছোঁওয়া লেগে ছিঁড়ে যায়!…আবার সেই ডাক, আর কি ভুল হয় গো…তমালী চোখ দুটো মুছে নিয়ে ভাল করে চেয়ে দেখল, হাঁ সেইতো বটে…কিন্তু কেন চেনা যায় না বলে মনে হয়, একি মুখের ভাব…যেন যুগ যুগান্তরের পুঞ্জীকৃত ব্যথার আঁধার লালীর সেই চির প্রফুল্ল হাসি ভরা মুখখানিতে আধিপত্য বিস্তার করে বসেছে। উভয়ের মনের মধ্যে কত অকথিত সঞ্চিত বাণী গুমরে উঠল লালী অনেকক্ষণ চেয়ে চেয়ে বলে উঠল —"তমালী তুই তাহলে কাল সত্যিই চল্ল?"

তমালীর মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল—চোখে তার বুঝি জল তখন উপচে পড়তে চাচ্ছিল মুখের উপর আঁচলটা জোর করে চেপে রুদ্ধস্বরে তমালী বল্ল—হ্যাঁরে লালী, যমের বাড়ী কালকেই যাচ্ছি তুই কি করে খবর পেলি বলত?"

সুদক্ষ নিপুণ ভাস্করের খোদিত কালো পাথরের মূর্ত্তির মত লালী স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। তমালীর কথায় বুঝি তার চমক ভাঙল। দাওয়ার খুঁটিটা সজোরে চেপে লালী বসে পড়ল।

তমালী আঁচলের খুঁটটা টেনে টেনে সোজা কর্ত্তে কর্ত্তে কাঁপা গলায় উত্তর দিল—"লালী…কাল একটিবার গাঁয়ের পথে দাঁড়াস…যদি যাবার সময় দেখা হয়।"

লালী বাধা দিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—"সব ঠিক হ'য়ে গেল তমালী?"

তমালী মাথা দুলিয়ে করুণ কণ্ঠে বলল,—"হাঁ। আমার শ্রাদ্ধের জোগাড় সব হয়ে গেছে লালী।"

লালী মুখটা বেঁকিয়ে বলল,—আঃ ও কী 'ছাইপাঁশ' বকছিস, লালী বেঁচে থাকতে তোর শ্রাদ্ধ হবে…পাগল! কে করছে রে?"

তমালী ম্লানমুখে বলল—"কি, আমাকে উদ্ধার…ও—সে আমার কাকীর অপগণ্ড…ভাইপো…লালী…"

ঝর ঝর করে শিশির বিন্দু তমালী নিটোল কপোল বেয়ে ঝরতে লাগল। লালী উত্তেজিত হয়ে অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—"কাঁদিসনে—কাঁদিসনে তমাল—ভগবান কি নেইরে… এমনি দুঃখই কি চিরদিন আমরা পাব?"

তমালী রুক্ষ চুলগুলো দু'হাতে গুছিয়ে নিয়ে বাঁধতে বাঁধতে—অস্ফুটকণ্ঠে বলল—"আর হবে না লালী…সেদিন আমাদের ফুরিয়ে গেছে।"

পাশের ঘরখানিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশে দেখিয়ে লালী সজল-কণ্ঠে বলল -"থাক্ বুঝেছি তোর কথা—তমালী আজ যদি আমাদের মা বেঁচে থাকত।" আবার সেই পূর্ব্বস্মৃতির খোঁচা! 'লালী, লালী—'

তমালী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল—"তোর পায়ে পড়ি লালী, ও কথা আর বলিসনে…উঃ—বুক ভাঙা নিঃশ্বাস তপ্ত অগ্নিশিখার মত বেরিয়ে গেল। তমালী তাড়াতাড়ি বলে উঠল "এইবার যা লালী, কাকী গেছে পিড়ী রঙ্ কর্ত্তে…এখনি এসে তোকে দেখলে রক্ষে থাকবে না—আচ্ছা একটু দাঁড়া"—তমালী একটু চঞ্চল পদে ঘরের মধ্যে ঢুকে গ্যাল—পরমুহূর্ত্তে একটা পাথর বাটী হাতে করে এসে অনুনয়ের সঙ্গে বলল—"লালী, তুই আমের আচার খেতে ভালবাসিস্ বলে আমি খানিকটা লুকিয়ে রেখে দিয়েছিলুম— এই নে, নিয়ে যা—"

লালীর হাতে পাথরের বাটীটা তুলে দিয়ে তমালী ত্বরিত-পদে ঘরের মধ্যে চলে গিয়ে মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। লালী ক্ষণকাল হতবুদ্ধির ন্যায় দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

"পেরণাম হই দা ঠাকুর।"

"কেরে লালী…তুই এ গাঁয়ে কবে এলি…তোর হাতে ওটা কিরে আচারের গন্ধ বেরুচ্ছে…আহা আচার জিনিষটা অতি উপাদেয় খাদ্য…শাস্ত্রে বলেছে - আচারো…"

লালী মুখ টিপে অলক্ষ্যে একটু হেসে নিয়ে বললে— "আজ্ঞে দা-ঠাকুর আমরা হচ্ছি মুরুখ্খু লোক শাস্তরের বাক্যি বুঝবার ক্ষেমতা নেই…তা আচারটা আপনাকে দিতেই যাচ্ছিলুম এই নেন।"

লালীর হাত হতে আচারের বাটীটা খপ্ করে তুলে নিয়ে শিবু ভটচায্যি এক গাল হেসে বললেন—"আহা বেঁচে থাক বাবা…প্রাতর্বাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি…তোর মনের ইচ্ছে পুন্ন হ'ক; তোর দিদিমার মুখটা খারাপ হয়েছিল—যাই এই আচারটুকু তোর নাম করে দিইগে মুখটা সারবে…শিবু ভটচায্যি বাটী নিয়ে লালীর চক্ষের অন্তরাল হ'য়ে মনে মনে

বললেন—"সকাল বেলা গয়লা ছোড়াটাকে ছুঁতে হ'ল—আবার ডুব দিয়ে আসিগে। আমের আচারে আর কি দোষ আছে, একটু গঙ্গাজলের ফোঁটা দিলেই সব শুদ্ধ হ'য়ে যাবে অখন—আহা, মা আমার পতিত পাবনী—"

পল্লীগ্রামের অনেক লোকের মনে এখনও এমনি কুসংস্কার আছে। হায় কতদিনে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ঘুচে যাবে।

*　*　*　*

পরদিন বিকেলবেলায় নদীর বুকে একখানি ছোট্ট নৌকা যখন দুলতে দুলতে অগ্রসর হচ্ছিল ঠিক সেই সময় লালী হাঁফাতে হাঁফাতে এসে দেখতে পেল—তার বড় সাধের তরী তখন মাঝ দরিয়ায়—হায়রে আর ধরবার উপায় নেই। লালী চারিদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত চাইতে লাগল—নাঃ কোথাও না, নৌকার জানলা দিয়ে সেই গৌরবর্ণ সুন্দর মুখের এতটুকুও তার তৃষাতুর চোখের সাম্নে পড়্‌ল না—হাতের পাঁচন বাড়ীটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে লালী বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করে ডাকল—"তমালী ...."

নদীর বাঁকে তখন নৌকাখানা হেলে দুলে বেঁকতে আরম্ভ করেছে—ওপার থেকে নির্ম্মমভাবে প্রতিধ্বনি ভেসে এল—"লালী—"

দূর···আরও দূর, ঐ নৌকাখানার একটু এখনও দেখা যাচ্ছে—ঠিক ছোট পদ্মের পাতার মত। ঐ যা চলে গেলরে, লালীর প্রাণের দোসর জন্মের মত ছেড়ে চলে গেল। লালী নদীর পাড়ে লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদতে লাগল। কালবৈশেখীর উদ্দাম অসংযত ঝড় মত্ত দানবের মত অট্টহাস করে ফিরতে লাগল। রূপালী নদীটি ছলাৎ ছলাৎ করে নৃত্য জুড়ে দিল আকাশের বুক চিরে বৃষ্টিধারা নেমে এল ঝর—ঝর-ঝর।

(ঘ)

"হ্যাঁ গা আর কতদূর গেলে কেষ্টনগর পাব গা—বলতে পার ?"

সারা দিনরাত অবিশ্রান্ত পথ চলে লালীর জ্বরতপ্ত দেহটা মাটীর সঙ্গে মিশতে চাচ্ছিল। তার ওপর গা ভরা বসন্ত! সর্ব্বাঙ্গ ব্যথায় আড়ষ্ট...তবু তবু তাকে কেষ্টনগর যেতেই হবে—তমালীর সঙ্গে যে শেষ দেখা করবার কথা ছিল। যাবার সময় দেখাটি পর্য্যন্ত যে হয়নি আজ তমালীর বিয়ে। এইবার সে পর হয়ে যাবে চিরদিনের মত। এই তো ঠিক শেষ বিদায় নেবার সময়। আলসে অবশ শ্লথ চরণ দুটাকে টেনে টেনে চলতে চলতে লালী একটি পথিককে উক্ত প্রশ্ন করল। লোকটি বিস্ময় নয়নে তার মুখের প্রতি চেয়ে বলল—"এই অবস্থায় যাবে তুমি ? কেন গা—সেখানে বুঝি তোমার আপন জন কেউ আছে ? কেষ্টনগর আরও আধকোশটাক পথ হবে।"

হতাশ ব্যঞ্জক কণ্ঠে লালী বলল—"আরও আধ কোশ পথ। ভগবান! তবে বুঝি আর দেখা হলো না—তমালী।"

*　*　*　*

রাত চারটেয় বিয়ের লগ্ন। রাত বারোটার সময় কেষ্টনগরে যদুঘোষের বাড়ী একটা মহা হৈচৈ পড়ে গেল। সকলে বলছিল—"আরে এ বসন্ত রুগীটা আবার এখানে কোথা থেকে মরতে এল দাওতো হে ওর পা দুটো ধরে ঐ পুকুরে ফেলে—ব্যাটার সব জ্বালা ঘুচে যাবে।"

গোলমাল শুনে তমালী বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখছিল ব্যাপার খানা। সহসা কি ভেবে বাইরে এসে জিজ্ঞেস করল, "ও কে কাকা ?"

কাকা অনেকক্ষণ চিনেছিল। কিন্তু ভেঙ্গে বললে তমালী যদি কোন গণ্ডগোল বাধিয়ে বসে সেই ভয়ে অবজ্ঞাপূর্ণ কণ্ঠে বলল—"কে জানে কে,—তুই এখানে কি করতে এলি বলত ?"

তমালী তখন লোকটাকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করছিল। চকিতে সে লোকটির বাঁ হাতের উল্কীটা দেখে নিয়ে উন্মাদিনীর মত আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল।

"সর—সর"—দু'হাতে পাশের লোকগুলোকে ঠেলে তমালী সেই মূর্চ্ছিত রোগীটির মুখের উপর হাত রেখে কান্না-ভরা সুরে বলল—"লালী—লালীরে -"

সকলে অবাক! মুখ চাওয়া চাওয়ি করে সকলে একে একে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বিপদ অবশ্যম্ভাবী দেখে যদু ঘোষ চোখ রাঙিয়ে ধমক দিয়ে বলল—"এই হতভাগা মেয়ে ওঠ বলছি—তোর না আজ বিয়ে।"

তমালী কোন উত্তর দিল না। সে তখন একাগ্রমনে তার লাল চেলীর আঁচলটা দিয়ে সযত্নে লালীর সর্বাঙ্গের ক্ষতের মুখ মুছিয়ে দিচ্ছিল। রাঙা মুখখানি তার তখন পাওয়ার সার্থকতার রঙীন রাগ মেখে লোধফুলের মত রাঙিয়ে উঠেছিল। বরের বাপ তখন তমালীর কাকাকে কটুবাক্যে বিলক্ষণ ভর্ৎসনা করে তিক্তকণ্ঠে বললেন—"ছোটলোক কোথাকার···মেয়ে গছাবার জায়গা পাওনি বটে...চলহে সব...।"

দলবলে বরসহ বরকর্তা ফিরে গেল। ঝনাৎ করে সদরের কপাটটা বন্ধ করে তমালীর কাকা বললে—"কালামুখী থাক্ ঐখানে—তোর এ বাড়ীতে আর জায়গা হবে না।"

তমালী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে খসা চুলগুলো মুখের উপর হতে সরিয়ে ঈষৎ নত হয়ে কোমলকণ্ঠে ডাকল—"লালী।"

লালী এইবার তার রাঙা চোখ দুটো মেলে বলল—"কে তমালী—আঃ ঠিক পৌঁছেছি তাহলে তমাল, আমার কথার ঠিক আছে তো?"

"কিসের কথার ঠিক লালী?"

"এই তোর সঙ্গে আমার শেষ দেখা—মনে পড়ে—সেই যে তুই বলেছিলি যাবার সময় একবার দেখা দিয়ে যাস।"

তমালী উচ্ছ্বাসভরে বলল—"আছে রে লালী তোর কথার ঠিক আছে—কিন্তু...এ কী করে তুই কথার ঠিক রাখলি লালী?"

"কাঁদছিস কেন তমাল—তুই কি ছেলে মানুষ রে? হাঁরে রাত এখন ক'টা? বোধ হয় তিনটে না? বাঃ তুই কি সুন্দর চেলী পরেছিস, ওঃ—তোর যে আজ বিয়ে না? এই যে গলায় বেলফুলের মালাও রয়েছে—তমাল ঐ মালাটা একবার আমাকে পরিয়ে দিবি?"

তমালী আপনার গলার বেলফুলের গোড়ে খুলে লালীর গলায় পরিয়ে দিল।

লালী মিষ্টি হেসে বলল—"বাঃ এইবার ঠিক হয়েছে—তমাল আজ বুঝি আমাদেরই বিয়ে, না? তমালী ঐ দেখ চাঁদটা কি রকম মেঘের আড়াল থেকে একটু একটু করে বেরুচ্ছে···রাণী তুইও এম্নি করে মেঘের আড়ালে লুকিয়েছিলি—আজ বিপদের মেঘ কাটিয়ে শেষ বিদায়ের দিনে উজলে উঠছিস এত কথা আজ কি করে মনে পড়েছে তমাল বুঝতে পারছিস কিছু?"

একটু দম নিয়ে লালী আবার বলতে লাগল—"তমাল, তুই আমার সঙ্গে যেতে পারবি?"

তমালী সাশ্রুনয়নে ধরা গলায় বলল—"কোথায় লালী?"

পাণ্ডুবর্ণ মেঘের দিকে কম্পিত আঙুল তুলে লালী বলল—ঐখানে—ঐ দেখ মা আমাদের ডাকছে—আয়রে তমাল আয় আমরা এ পৃথিবী ছেড়ে মায়ের বুকে ফিরে যাই। দু'জনেই যাই চ..."

"লালী লালী—" তমালী লালীর মুখটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখল—লালীর চির অতৃপ্ত জীবনের বোঝাটা তার বড় সোহাগের তমাল রাণীর পায়ের তলায় ফেলে দিয়ে কোন্ ব্যথা হরণের ডাকে—কোন্ অজানা পথের উদ্দেশে যাত্রা সুরু করে দিয়েছে—তমালী সবেগে লালীর স্পন্দহীন রক্তশূন্য দেহটাকে জড়িয়ে ধরল।

রাত শেষে পূব গগনের প্রান্তভাগে উষাদেবীর সোনালী কাজ করা রাঙা সাড়ীর রঙের আভাস প্রকাশ পেল। সন্ত-সুপ্তি ভঙ্গে প্রভাত তখন নূতন সুরে বীণা বাঁধছিল। শুক-তারাটা তখনও যেন কার নীরব প্রতীক্ষায় উৎসুক আঁখি মেলে কার পায়ের ধ্বনি শুনছিল। নদীর কালো জলের দিকে চেয়ে তমালী দেখল তার মা যেন লালীকে কোলে নিয়ে ডাকছে—"আয়রে অভাগী আয়—আমার কোলে জুড়োবি আয়।"

ঝির ঝির করে ভোরের শীতল বাতাস নদীর জলে কাঁপন তুলে মৃদু কলতানে যেন তার প্রতিধ্বনি তুলে সুর মিলিয়ে ডাকছিল—'আয়—আয়—আয়।'

আলো ঝলমল জ্যোতির্ম্ময় দীপ্ত প্রভাতে যখন সকলে স্নানের ঘাটে এসে দাঁড়াল তখন সকলে সবিস্ময়ে দেখল নদী সৈকতে সিক্ত বালুকা রাজির বুকের পরে লাল কাপড়ে ঢাকা কি একটা বস্তু পড়ে আছে। দু'চার জন সাহসী যুবক এগিয়ে গিয়ে সেই লাল কাপড়ের বস্তুটা নেড়ে চেড়ে খুলে সাশ্চর্য্যে দেখতে পেল—লালীকে বাহুবন্ধনে বেষ্টিত করে তমালীর শুভ্র দেহলতাখানি নিশ্চল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। মৃত্যু এসে উভয়কে মিলনের স্বর্ণসূত্রে গেঁথে নিয়ে কোন স্বপন বনে কোন ছায়ার দেশে—পুণ্য প্রেমের সঙ্গম তীর্থে নিয়ে চলে গেছে—সেথায় প্রেমের অনির্ব্বাণ দীপ জ্বালবে বলে। বিচ্ছেদ ভয়ে ভীত দু'টি শঙ্কিত, ক্ষুধিত প্রাণ আজ তাদের চির জনমের পরিচিত সাথীটিকে খুঁজে পেয়েছে।

মায়ের দরদ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

লয়লা এক বর্ষিয়সীর মুখে শুনিয়াছিল, মা যদি সন্তানের মঙ্গল কামনা করিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দেন তবে সন্তানের সকল আপদ বালাই দূর হইতে পারে। তাহার সন্তান নাই তাই সে এ কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে নাই। আজ তাহার ইচ্ছা হইল যে পরীক্ষা করিয়া দেখে এ কথাটা ঠিক কিনা। অবশ্য টেঁপা যে তাহার পেটের ছেলে নহে তাহা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হয় নাই তবু সে যে তদপেক্ষা একটুও কম তাহা সে কোনমতেই স্বীকার করিতে পারিল না। সে টেঁপার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে গেল।

টেঁপার গায়ে হাত দিয়াই দেখিল, জ্বরে গা পুড়িয়া যাইতেছে। তখন তাহার আর এক নূতন চিন্তা দেখা দিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণ ভাবিল, কিন্তু কোনই উপায় দেখিতে পাইল না। সে অসহায়া স্ত্রীলোক, একা কি করিবে? আর কেই বা তাহাকে সাহায্য করিবে? স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় একমাত্র সহায় থাকে স্বামী। তাহার স্বামী এ বিষয়ে তাহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক হয়তো ছেলেটাকে তৎক্ষণাৎ মারিয়া ফেলিবে, আর তাহাকে যে কি করিবে তাহা সে ভাবিয়াই পাইল না। ভাবিতে ভাবিতে তাহার আর এক সহায়ের কথা মনে পড়িল—যিনি অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল, যাঁর চেয়ে সহায় আর কেহ নাই। যে যত বড়ই হউক কি যত ছোটই হউক, তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করিলে তিনি কাহাকেও বিমুখ করেন না—আশ্রয় না চাহিলেও আশ্রয় দেন। লয়লা মনে মনে তাঁহার শরণ লইল। ঠিক এমন সময় তাহাদের গ্রামের জটী পাগলী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—"লয়লা বিবি কোথায় গো?" তাহার ডাক শুনিয়া লয়লা অকূলে কূল পাইল, মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল, তাহার অন্ধকার অন্তরের অন্তস্থলে আলো দেখা দিল, সেই প্রস্ফুট আলোকে দেখিল নিরুপায়ের উপায় এ বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়াছেন। সে গোয়াল হইতে বাহির হইয়া জটী পাগলীর নিকট গেল।

লোকে তাহাকে ডাকিত জটী পাগলী। বাস্তবিক একেবারে সে পাগল ছিল না তবে তাহার বেশ একটু পাগলামীর ছিট ছিল। সে তে-মোহনার চরের একপ্রান্তে একখানি কুটীরে একাকিনী বাস করিত। তাহার আপনার জন কেহ ছিল না—তাই সে গ্রামের সকলকেই আপনার জন মনে করিত। তাহার বয়স কত তাহা কেহই জানিত না, সে নিজেও না—তবে একথা সকলেই স্বীকার করিত যে তাহার বয়স অনেক, তে-মোহনার চরে তত বয়স আর কারু ছিল না। তাই সে গ্রামের পুরুষদের অধিকাংশকে বড় খোকা, মেজ খোকা, ছোট খোকা, ঝড়ো খোকা, বাদলা খোকা, রদ্দুরে খোকা ইত্যাদি অদ্ভুত নামে ডাকিত, আর যাহাদের একটু বেশী খাতির করিত তাহাদের ডাকিত ভাই,—যেমন বড় ভাই, মেজো ভাই, ছোট ভাই, রাঙ্গা ভাই, কাল ভাই, লম্বা ভাই ইত্যাদি। আর আর সকলকে সে নাম ধরিয়াই ডাকিত। গ্রামের স্ত্রীলোকরা কেহ তাহাকে ফুফু, কেহ নানী, কেহ চাচী বলিয়া ডাকিত, আর সকলেই তাহাকে আনুকূল্য করিত। এই সব কারণে তাহার এ'টা পেটের জন্য তাহাকে কখনও ভাবিতে হয় নাই। সে ঘরে থাকিত খুব কম সময়। প্রায়ই সে যখন তখন সময়ে অসময়ে পাড়ার এর তার বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইত কাহারও ধান ভানিয়া দিত, কাহারও মুড়ি ভাজিয়া দিত, কাহাকেও বা দরকার মত ভাত রাঁধিয়া দিত—আবার এক এক সময় পাগলামী চাপিলে যাহাকে

সম্মুখে পাইত তাহাকেই গালি পাড়িত, কখনও বা তাড়া করিয়া মারিতে যাইত। তাহার উপকারের কথা স্মরণ করিয়া কেহ তাহার উপর রাগ করিত না, লোক গালি খাইয়াও চুপ করিয়া থাকিত, তাড়া করিয়া মারিতে গেলে পলাইয়া যাইত। এ জটীর একটা বিশেষ গুণ ছিল, এই যে কাহারও বাড়ীতে বিবাহ ইত্যাদি কোনরূপ ব্যাপার উপস্থিত হইলে কিম্বা কাহারও কোন শক্ত ব্যায়রাম হইলে সে বাড়ী হইতে সে নড়িতে চাহিত না, যতক্ষণ সেই ব্যাপার শেষ না হইত কিম্বা অসুখ ভাল না হইত কি রোগী না মরিত। ইহা ছাড়া সে নানারূপ ঔষধ ও ঝাড়ফুঁক জানিত। গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহারা কখনও জটীর ঔষধ ব্যবহার করিয়াছে কিম্বা মন্ত্রতন্ত্র পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছে তাহারা অনেক সময় স্বীকার করিত যে উহা একেবারে নিস্ফল হয় না, উহা দ্বারা কিছু কাজ হয়। এ হেন জটীকে কাছে পাইয়া এই দুঃসময়ে লয়লা যেন অকূলে কূল পাইল!

লয়লা জটীকে একটু দূরে ডাকিয়া আনিয়া আনুপূর্ব্বিক অবস্থা বিবৃত করিল। জটী নিঃশব্দে আগাগোড়া শুনিল, তারপর বিড়্ বিড়্ করিয়া রহিম ও তাহার সঙ্গীদের গালী পাড়িতে পাড়িতে লয়লার সহিত গোয়াল ঘরে প্রবেশ করিয়া মাচায় উঠিয়া টেঁপাকে দেখিল। জটী নানাভাবে টেঁপাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিল—কি দেখিল সেই জানে—তারপর দেখা শেষ হইলে একটীও কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে মাচা হইতে নামিয়া গোয়াল ঘরের বাহিরে আসিল। লয়লা পিছু পিছু আসিতে আসিতে তাহাকে কত কথাই জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেটী কেমন আছে, সে এযাত্রা সারিয়া উঠিবে কি না, এক্ষণে কি করিতে হইবে ইত্যাদি বিষয় কত প্রশ্নই করিল, কিন্তু জটী একটী কথারও জবাব দিল না, আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিতে করিতে একদিকে চলিয়া গেল। লয়লা আবার অকূলে ভাসিল।

খানিকক্ষণ পরে জটী আবার ফিরিয়া আসিল। এবার সে খালি হাতে আসে নাই। কাপড়ের আঁচলের গাঁট খুলিয়া সে দুইখানি শিকড় বাহির করিল, একখানি লয়লার হাতে দিয়া কহিল—"এখানি বাটিয়া লইয়া আয়।" লয়লা আদেশ পালন করিতে গেল, সে নিজে তৎক্ষণে গোয়াল ঘরে যাইয়া আর একখানি শিকড় টেঁপার কোমরে বাঁধিয়া দিল। পরে লয়লা আসিলে সেই বাটা শিকড়টুকু দিয়া তাহার মস্তকের ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিয়া দিল।

সেই রাত্রে টেঁপার জ্বর খুব বাড়িয়া গেল। সে বিকারের ঘোরে প্রলাপ বকিতে লাগিল। সেই প্রলাপের সব কথার মধ্যে শুধু "মা" আর "মা" মা ছাড়া কোন কথা নাই। কখনও সে বলিতে লাগিল—"মা! ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত দেনা।" কখনও বলিতে লাগিল—"ও মা! আর তো পারি না, দাদা যে আমায় মেরে ফেল্লে।" কখনও বলিতে লাগিল—"ও মা! পালিয়ে আয়, বাবা তোকে মারবে।" আবার কখনও বা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল, "মা, তুই এসে আমাকে নিয়ে যা, আমি বাবুদের বাড়ী চাকরী করিব না, তোকে ছেড়ে আমি থাকিতে পারিব না—ইত্যাদি ইত্যাদি। লয়লা দেখিয়া শুনিয়া নীরবে অশ্রু-মোচন করিল আর তাহার মঙ্গলের জন্য একমনে পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিল।

এইভাবে আরও দুইদিন কাটিল, তৃতীয় দিনে ভক্তের ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিলেন। জটীর ঔষধের গুণেই হউক, কি লয়লা এবং জটীর শুশ্রূষার গুণেই হউক, কিম্বা লয়লার প্রার্থনার ফলেই হউক, টেঁপার জ্বর ছাড়িল, মস্তকের ক্ষত স্থানের অবস্থাও অনেকটা ভাল দেখা গেল। জটী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"আর ভয় নাই।" লয়লাও বিশ্বাস করিল—আর ভয় নাই।

এই তিনদিন লয়লা স্বামীর অসন্তুষ্টির ভয়ে সব সময় টেঁপার কাছে থাকিতে পারিত না, দিনের বেলা সুযোগ বুঝিয়া স্বামীর অজ্ঞাতসারে মাঝে মাঝে আসিয়া দেখিয়া যাইত। জটী কিন্তু তাহার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিত না দিন রাত সেই একভাবে সেইখানে বসিয়া থাকিত আর মাঝে মাঝে কি মাথামুণ্ড মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া টেঁপাকে ঝাড়িত অবশিষ্ট সময় খেয়াল মত আপন মনে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে রহিম ও তাহার সঙ্গীদের জাহান্নমের ব্যবস্থা করিত। এই তিন দিন তাহার নিদ্রামাত্রই ছিল না, লয়লা সেইখানে ভাত আনিয়া দিয়া বিস্তর খোসামোদ করিলে আহার হইত—তাহাও নাম মাত্র।

রহিম ও তাহার সঙ্গীরা প্রথমদিনে টেঁপার অবস্থা দেখিয়া স্থির বুঝিয়াছিল যে কাহাকেও আর কষ্ট করিয়া দুষমণকে জাহান্নামে পাঠাইতে হইবে না, খোদা নিজেই সেই কার্য্য করিবেন। সুতরাং তাহারা খোদার উপর খোদকারি করিবার কোন প্রয়োজন দেখিল না, তাহারা শুধু অপেক্ষায় রহিল, কার্য্য শেষ হইলে লাসটা জলে ফেলিয়া দিবে। রহিম স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারে নাই যে সে নিজে যে দুষমণের মৃত্যুর প্রতিক্ষা করিতেছে, তাহার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গোপনে এত চেষ্টা চলিতেছে, আর সেই চেষ্টার মূলে আছে তাহারই নিজের বিবাহিতা কবিলা। অবশ্যই জটী পাগলী যে উহার শিয়রের কাছে দিন রাত বসিয়া থাকিয়া শুশ্রূষা এবং ঝাড়ফুঁক করিতেছে তাহা তাহার জানিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় নাই। ইহাতে সে প্রথমটা চটিয়াছিলও খুব এবং জটী পাগলীকে এই চেষ্টা হইতে বিরত করিবার জন্য কিঞ্চিৎ ধমক ধামকও করিয়াছিল কিন্তু জটীর গালাগালীর চোটে তাহা আর বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। জটীর কাছে অল্পাধিক উপকৃত তে-মোহনার চরের সকলেই— বিশেষ তাহারা তাহাকে যেমন যথেষ্ট খাতির করিত ভাল বাসিত তেমনি কি জানি কেন কিঞ্চিৎ ভয়ও করিত। সুতরাং তাহার মুখের কাছে দাঁড়াইবে কে? তারপর রহিম ভাবিয়াছিল ছোড়াটা মরিবে নিশ্চয়ই জটীর সাধ্য নাই যে সেই মরণ পথের যাত্রীকে বাঁচাইতে পারে—তবে আর মিছামিছি একটা পাগলের সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া ফল কি? অতএব সে আর এই বৃথা চিন্তাকে তাহার অন্ন পরিপাকে বাধা জন্মাইতে দিল না। সে জানিত না যে যাহাকে খোদা রাখেন তাহাকে মারে কে? আর যাহাকে তিনি মারেন, কাহার সাধ্য আছে তাহাকে রাখিতে পারে? তাই তিনদিন পরে সে যখন দেখিল টেঁপা ক্রমশঃ আরোগ্যের পথে চলিয়াছে তখন সে বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল।

রহিমের এ বিস্ময় অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, শীঘ্রই উহা বিরক্তিতে পরিণত হইল। সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল এ সম্বন্ধে একটা হেস্ত নেস্ত করিবেই, একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন বুড়ী পাগলীর জন্য সে শত্রুকে জীবিত রাখিয়া নিজেদের বিপদগ্রস্থ করিতে পারিবে না। তবে যদি তাহার সঙ্গীরা সত্য সত্যই ইহাকে লইয়া গিয়া মাণিক ও কাদের সম্মুখে হত্যা করিয়া তাহাদিগকে জব্দ করিতে চাহে তবে অবশ্যই স্বতন্ত্র কথা। রহিম ভাবিয়া চিন্তিয়া সেদিন রাত্রিতে তাহার গৃহপ্রাঙ্গনে এক পরামর্শ বৈঠক আহ্বান করিল এবং গ্রামের সকল "কাজের লোক"কে তাহাতে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিল। এদিকে ময়না ও জটী মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল। রহিমের সঙ্গীরা যদি অবিলম্বে টেঁপার মৃত্যুই চাহিয়া বসে তাহা হইলে তাহারা দুইটী অবলা তাহাদের ক্ষুদ্রশক্তি লইয়া কেমন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। নিরুপায় হইয়া পুনরায় তাহারা তাহাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল নিরুপায়ের উপায় খোদাতাল্লার চরণে আত্মসমর্পণ করিল।

(৭)

দেখিতে দেখিতে চারিদিন কাটিয়া গেল টেঁপার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। নবীর চরের লোকেরা আগেই অনুমান করিয়াছিল যে টেঁপা আততায়ীদের প্রহারে মরিয়া গিয়াছে, তাহারা তাহাকে পদ্মার জলে বিসর্জ্জন দিয়াছে। তথাপি কর্ত্তব্যের খাতিরে গ্রামের কয়েকজন লোক মিলিয়া আশেপাশের দুই একটা জনশূন্য চরে তাহার অর্থাৎ তাহার মৃতদেহের সন্ধান করিয়াছিল। এমন কি তাহাদের চারিধারে কতকদূর পর্য্যন্ত নদীতে জাল ফেলিয়াও দেখিয়াছিল। তে-মোহনার চরের লোকেরা যে তাহাকে আহত অবস্থায় নিজেদের গ্রামে লইয়া গিয়াছে, সে যে এখনও জীবিত আছে ইহা তাহারা কল্পনা করিতে পারে নাই, আর পারিলেও তাহাদের মধ্যে কাহারও এমন সাহস ছিল না যে তে-মোহনার চরে তাহার সন্ধানে যায়—বিশেষ মাণিক ও কাদের তখনও উত্থানশক্তি রহিত। সুতরাং যথাসাধ্য অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহারা তাহার অথবা তাহার মৃতদেহের কোন সন্ধান পাইল না তখন তাহাদের পূর্ব্বোক্ত অনুমান স্থির বিশ্বাসে পরিণত হইল। তখন তাহারা ও-সম্বন্ধে সকল ভাবনা চিন্তা ছাড়িয়া দিল। পদ্মার গর্ভে মৃতদেহ সমাধিস্থ করিলে তাহা নাকি আবার পাওয়া যায়। টেঁপার মাতা এবং পীনা কিন্তু ইহা কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তাহাদের দৃঢ়

বিশ্বাস ছিল টেঁপা কোথাও না কোথাও বাঁচিয়া আছে, আবার সে ফিরিয়া আসিবে, আবার তাহার দেখা পাওয়া যাইবে।

পীনা এ কয়দিন প্রায় সারাদিনই টেঁপার মাতার নিকট রহিয়াছে, দুইদিন রাত্রিও কাটাইয়াছে, এবং এই সময়ের মধ্যে যতবার তাহাদের দুইজনে টেঁপার কথা হইয়াছে ততবারই পীনা খুব জোর করিয়া বলিয়াছে যে টেঁপা নিশ্চয় বাঁচিয়া আছে আর টেঁপার মাতাও সে কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আর সে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছে না, তাহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়া আসিয়াছে। তাই সে আজ আর থাকিতে পারিল না,—পীনাকে কহিল—"পীনা, তবে বুঝি সে নাই—বুঝি আর তাহার দেখা পাওয়া যাইবে না।" অভাগিনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—তাহার মুখে আর কথা জোগাইল না। পীনার বুকের ভিতর কি হইতেছিল সেই জানে। সে কোন প্রত্যুত্তর দিতে পারিল না, মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল, ধীরে ধীরে পদ্মকোরক সদৃশ তাহার নয়ন পল্লবদুটী সিক্ত হইয়া উঠিল, তারপর দুটী সুকোমল গণ্ড বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া সেই অপাপবিদ্ধ হৃদয়ের পুত: অশ্রুবারি তাপদগ্ধ শুষ্ক মাটীতে পড়িয়া শুকাইয়া যাইতে লাগিল।

স্নেহার্দ্র হৃদয় যখন স্নেহাস্পদকে হারাইয়া তাহার পুনঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হয় তখন তাহার নিদারুণ ব্যথা ঘুঝাইতে পারে কে? তাহার গভীর ক্ষত শান্তি প্রলেপে শুকাইয়া তুলিতে পারে কে? পারে একমাত্র সে যাহার হৃদয়ে সেই ব্যথা অনুরূপ ব্যথার স্পন্দন তোলে, যাহার হৃদয়ে সেই ক্ষত অনুরূপ ক্ষত সৃষ্টি করে। তুমি যদি আমার ব্যথার ব্যথী না হও তবে শুধু তোমার মুখের কথার ফাঁকা প্রবোধ বাক্য আমার হৃদয় স্পর্শ করিবে না, তাহাতে আমার ব্যথা বাড়িবে বই কমিবে না। তুমি যদি আমার সহিত কাঁদিতে না পার, আমার চোখের জলের সহিত তোমার সত্যিকার চোখের জল না মিশাইতে পার তবে আমার দুঃখের সময় আমার কাছে আসিও না, আমাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিও না, কেননা তোমার সেই সহানুভূতিহীন সান্ত্বনা বাক্য নিষ্ঠুর পরিহাসের মত আমার অন্তরকে বিদ্ধ করিবে।

টেঁপার মাতার বুকে যে দারুণ ব্যথা বাজিয়াছিল, পীনা নিজের ক্ষুদ্র হৃদয়ে সত্যই তাহার অন্ততঃ কতকটা অনুভব করিতেছিল। তাহার চোখের জলে কৃত্রিমতা ছিল না, সেইজন্য এই দুইটী হৃদয় পরস্পরের স্পর্শ অনুভব করিল, উভয়ে উভয়কে আপনার বলিয়া চিনিতে পারিল,—উভয়ে যে একই ব্যথার ব্যথী। পীনা কিম্বা টেঁপার মাতা কেহই বুঝিতে পারে নাই, বুঝিবার চেষ্টাও করে নাই এ সহানুভূতি কোথা হইতে আসিল, ইহার উৎপত্তি স্থান কোথায়। তাহারা মূর্খ, সভ্যতার সংস্রবে আসে নাই, তত্ত্ব জিজ্ঞাসা কিম্বা মনোবিজ্ঞানের ধার ধারে না—তাহারা শুধু বোঝে সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বেদনা, হাসি, কান্না, তাহারা সবচেয়ে বড় করিয়া দেখে প্রাণ, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করে না। সন্তানের জন্য মায়ের ব্যথা স্বাভাবিক, টেঁপার মাতা যে টেঁপার জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু পিতার এবং ভ্রাতার চক্ষুশূল মাতার অঞ্চলের নিধি সেই অকর্ম্মণ্য কালকিষ্টে ছেলেটা যে কবে কেমন করিয়া পীনার হৃদয়ে এতখানি স্থান দখল করিয়া বসিয়া আছে তাহা সে নিজেও জানিতে পারে নাই। পীনা স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে টেঁপাকে পাওয়া না গেলে তাহার মাতা প্রাণে বাঁচিবে না, আর সে নিজে যে কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিবে তাহাও বুঝিতে পারিল না।

পীনার মাথায় একটা মতলব আসিল। সে অনেকক্ষণ ভাবিয়া বুঝিতে পারিল মতলব করা যত সহজ কাজটা করা তত সহজ নয়। অগত্যা সে চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু সারাদিন ধরিয়া উহার চিন্তা তীক্ষ্ণ সূচের মত তাহার মনের ভিতর খোঁচা মারিতে লাগিল। সে আরও ভাবিয়া দেখিল কাজটা সহজ নয় বটে কিন্তু অসাধ্যও নয়। সহজ কাজও মানুষে করে, শক্ত কাজও মানুষে করে। যেখানে প্রাণের দায় সেখানে কাজ শক্ত দেখিয়া পিছাইলে চলিবে কেন? অতএব মতলবটা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। কিন্তু তাহার একার শক্তিতে তাহা সম্ভব নয়, একজন উপযুক্ত দোসর চাই। করিম বাবুদের বাড়ীতে এই বিপদের সংবাদ দিতে গিয়াছিল—তখনও ফিরিয়া আসে নাই। সে ভাবিয়া ভাবিয়া ঠিক করিল পিতাকে মনের কথা খুলিয়া বলিয়া

সাহায্য চাহিবে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই লজ্জা আসিয়া তাহার মাথা নোয়াইয়া দিল, তাহার গাল হইতে কাণ পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাহার নিজের উপর তাহার বড় রাগ হইল। কিন্তু তথাপি সে কোনমতেই পিতার কাছে টেঁপার নাম মুখে আনিবার কথা ভাবিতে পারিল না।

সারাদিন এইভাবে কাটিল, সন্ধ্যাবেলা সে যাইয়া টেঁপার মাতার কাছে কথা পাড়িল। পীনা কহিল—

"মা! আমি ভাবছিলেম কি যদি একখানা নৌকা আর একজন সঙ্গী পাইতাম তবে আমি নিজে একবার খুঁজিয়া দেখিতাম। আমার বিশ্বাস তাহাকে উহারা ভাল করিয়া খোঁজে নাই, তাই কোন সন্ধান পায় নাই। আমি কি বলছি মা, সে তে-মোহনার চরেই আছে। ভুষমণরা তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। হ্যাঁ মা, বাবাকে একবার বলে দেখব কি?"

টেঁপার মাতা ভূমিতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিল, কয়েক মুহূর্ত্ত পীনার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—

"পীনা, আমিও ঠিক এই কথা ভাবছিলাম। আমি ঠিক করিয়াছি আমি একাই যাইব। রাত্রিতে সবাই ঘুমাইলে ছোট ডিঙ্গিখানা লইয়া বাহির হইয়া পড়িব। তে-মোহনার চর আমি চিনি, কিছুদিন আগে একবার কুটুম্ব বাড়ী যাইবার সময় দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। আমি একাই টেঁপাকে উদ্ধার করিয়া আনিব। আমি মা, আমি না পারিলে আর কেহ পারিবে না।"

পীনা। সত্য মা, তুমি না পারিলে আর কেহ পারিবে না, কিন্তু তুমি একা কেমন করিয়া যাইবে? তে-মোহনার চর তো কাছে নয়, তাতে পদ্মার জল—উজান বাহিয়া যাইতে হইবে। তোমার শরীরের তো এই অবস্থা। যদিই বা কোনরকমে সেখানে পৌঁছিতে পার, সে ভুষমণের গাঁ, সেখানে তুমি নিজে যদি বিপদে পড় তবে কে দেখিবে? তাকেও বাঁচাতে পারিবে না, লাভের মধ্যে তুমি নিজেও যাইবে। নাঃ এ কোন কাজের কথাই নয়। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

টেঁপার মাতা বড় দুঃখেও হাসিল, বলিল,—"তুই এক ফোঁটা মেয়ে আমার সঙ্গে গিয়ে আমাকে কি সাহায্য করিবি? তা ছাড়া—" একটু থামিয়া বলিল—"তা ছাড়া তোর এই সোমত্ত বয়েস, মেয়েমানুষের যত কিছু বিপদ এই বয়েসেই হয়। খোদা না করুন যদি তোর বিপদ উপস্থিত হয় তবে যে ছেলের চেয়ে, আমার নিজের প্রাণের চেয়ে তোকে রক্ষা করা আমার সবচেয়ে বড় কাজ হয়ে দাঁড়াবে। চাই কি, যদি তেমন অবস্থা হয় তবে হয়তো আমি নিজেই তোকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম তোকে পদ্মার জলে চুবাইয়া মারিব। না পীনা, তোর যাওয়া হইবে না, তোকে লইয়া যদি আমাকে বিব্রত হইতে হয় তবে আমার যাওয়া না যাওয়া সমান হইবে। আমার কোন বিপদ হইবে না ভয় নাই। আর যদিই হয় তাহাতেই বা কি? আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি, তাহাকে না লইয়া ফিরিব না। তাহাকে না পাইলে আমার বাঁচিবার প্রয়োজনই বা কি আছে। জানিস পীনা, এ সংসারে বড় দুঃখ, বড় জ্বালা,—এর চাইতে পদ্মার জল ঢের বেশী ঠাণ্ডা, পদ্মার পেটে জায়গাও অনেক। কত লোককে সে পেটে পুরেছে, কত সুখের সংসার ছারখার করিয়াছে, তাহার পেটে আমারও একটু ঠাঁই হবে।

টেঁপার মাতার কথা শুনিয়া পীনা একেবারে বাঁকিয়া বসিল। সে তাহাকে সোজা কথায় স্পষ্ট শুনাইয়া দিল যে সে তাহার সহিত যাইবেই, তা সে রাজী হউক চাই নাই হউক। সে কোন বাধা মানিবে না। টেঁপার মাতা নৌকার হাল ধরিবে আর সে ঠেকা মারিবে। সঙ্গে দু'জনে দু'খানি রাম দা' লইয়া যাইবে, তারপর সে দেখিতে চায় কোন বিপদ তাহার সম্মুখীন হয়। তবে অবশ্যই টেঁপার মাতা যদি তাহা অপেক্ষা ভাল সঙ্গী কাহাকেও পায় তবে স্বতন্ত্র কথা।' পীনা তাহাকে কোনমতেই একা যাইতে দিবে না।

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা হইল, অনেক তর্কবিতর্ক হইল, শেষটা পীনারই জয় হইল। টেঁপার মাতাকে পীনার কথাতেই রাজী হইতে হইল। গভীর রাত্রিতে সেই দুই অসহায়া, অবলা নারী দুইখানি মাত্র রামদা' সম্বল করিয়া খোদার নাম লইয়া পদ্মার বক্ষে তাহাদের ক্ষুদ্র তরণী ভাসাইয়া দিল।

(৮)

করিম এই দুর্ঘটনার সংবাদ দিবার জন্য সদরে অর্থাৎ বহর বাবুদের বাড়ী গিয়াছিল। বাবুরা বিস্তারিত বিবরণ শুনিয়া রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তে-মোহনার চরের লোকদিগকে ইহার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু সহসা কিছু করিলেন না। আপাততঃ পুলিসে সংবাদ দেওয়াই স্থির হইল। কাজেই করিমকে কয়েকদিন দেরী করিয়া পুলিসের নিকট হাঁটাহাঁটি করিতে হইল। রাজাবাড়ীর বাবুরা পূর্ব্বাহ্নেই পুলিসকে হস্তগত করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের জাগ্রত নিদ্রা ভাঙ্গিতে একটু সময় লাগিল। এদিকে বহরের বাবুরাও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তাঁহারাও পুলিসের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে যথাসাধ্য যত্নবান হইলেন। পরিশেষে উভয় পক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণ পূজা গ্রহণ করিবার পর প্রভুদের দয়া হইল, তাঁহারা এ ব্যাপারের তদন্ত করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। করিম নবীর চরে ফিরিয়া আসিল।

বাড়ী ফিরিয়া করিম দেখিল পীনা নাই। সর্ব্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিবার পরও যখন তাহার কোন সন্ধান মিলিল না, তখন তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পীনার সঙ্গে সঙ্গে যে মাণিক ব্যাপারীর পরিবারও নবীর চর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে এ সংবাদ পাইতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। ইহাতে সে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে বুঝিতে পারিল না ইহাও শত্রুর কৌশল কি না। আর তাই বা কেমন্ করিয়া সম্ভব হইতে পারে? দুর্ঘটনার রাত্রিতে শত্রুরা ইচ্ছা করিলেই তো তাহার উপরও অত্যাচার করিতে পারিত। পীনাকে কিম্বা মাণিকের পরিবারকে ধরিয়া লইয়া যাওয়াই যদি তাহাদের অভিপ্রায় হইত, তবে তাহাও অনায়াসেই করিতে পারিত কিন্তু তাহা তো তাহারা করে নাই। তবে ইহা কি? করিম কিছুই বুঝিতে পারিল না। তথাপি তাহার মনে হইতে লাগিল যে তে-মোহনার চরে একবার অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, কিন্তু নিজে যাইতে পারিল না, কেননা পুলিস তদন্ত করিতে আসিয়া যদি তাহাকে না পায় তবে আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইবে। তাহারা যে কোন মুহূর্ত্তে আসিয়া পড়িতে পারে। অগত্যা সে দুই একজন যুবককে গোপনে তে-মোহনার চরে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিল কিন্তু কেহই স্বীকৃত হইল না।

পরদিন সকালে কতিপয় নন্দি-ভৃঙ্গি কনষ্টেবলসহ দেবাদিদেব দারোগাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীর চরের মত স্থানে ক্বচিৎ বহু ভাগ্যে তাঁহার ন্যায় দেবতার দর্শন মিলে। সুতরাং তাঁহার আগমনে যে গ্রামবাসী সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

দারোগাবাবু ও তদীয় সঙ্গীগণ নৌকায় আসিতে আসিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই সে বেলা আর তাঁহারা নৌকা হইতে অবতরণ করিতে পারিলেন না, নৌকাতেই বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। গ্রামবাসীরা সেই দুর্দ্দিনেও তাঁহাদের জন্য দুগ্ধ, ডিম্ব, মুরগী, হাঁস, পাঁঠা, মৎস্য, শাকশব্জ প্রভৃতি জোগাইতে কিছুমাত্র ত্রুটি করিল না। তাহারা জানিত তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। বোধহয় হিন্দুদের শনি পূজার, মনসা পূজার বিবরণ তাহারা জানিত। শনি ঠাকুর যথোচিত পূজা না পাইলে এক নজরে গৃহস্থের যথাসর্ব্বস্ব ভস্মসাৎ করিয়া দিতে পারেন, মা মনসা পূজা না পাইলে গৃহস্থকে সবংশে নিধন করিতে পারেন, আর দেবাদিদেব দারোগাবাবু কি পারেন না?

দারোগাবাবু ও তাঁহার সঙ্গীগণ দ্বিপ্রহরে ভূরিভোজনান্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। পরে বেলা যখন অপরাহ্ণ অতীতপ্রায়, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িবার আয়োজন করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন তাঁহারা হাতমুখ ধুইয়া তদন্তে বাহির হইলেন। প্রথমেই তাঁহারা সমুদায় গ্রামটী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া হাল নির্ণয় করিলেন। ইহাতেই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তখন তাঁহারা মাণিকের গৃহ প্রাঙ্গনে মশালের আলোকে সভা করিয়া বসিলেন। দারোগাবাবুর বসিবার উপযুক্ত অন্য আসনের পরিবর্ত্তে মাণিকের গৃহভ্যন্তর হইতে একটী আম কাঠের সিন্দুক বাহির করা হইল, দারোগাবাবু তাহার উপর উপবেশন করিলেন, তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ সব তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, তখন কার্য্য আরম্ভ হইল। মাণিক ও কাদের তখন কোনপ্রকারে লাঠী ভর করিয়া উঠিতে পারে, প্রথমেই তাহাদের

জবানবন্দি লওয়া হইল, তৎপর একে একে গ্রামের সকলকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করা হইতে লাগিল। এইসকল জবানবন্দি কতক বা লেখা হইল, কতক বা লেখা হইল না। ইহাতে নূতন কথা কিছু প্রকাশ পাইল না, করিম এজাহারে যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সকলে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে লাগিল। দারোগাবাবু বিরক্ত হইয়া সেদিনের মত কার্য্য শেষ করিলেন। কিন্তু একটা সন্দেহ তাঁহার মনের ভিতর উঁকি ঝুঁকি মারিতে লাগিল। গ্রামবাসী সকলের উপরই আততায়ীরা অত্যাচার করিল শুধু করিম ও তাহার কন্যাকে রেহাই করিল কেন? অবশ্যই করিম একসময়ে তে-মোহনার চরে বাস করিত—কিন্তু তাহাই ত আরও সন্দেহের কারণ। করিমের কন্যা এবং মাণিকের পরিবারই বা সহসা কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল? দারোগাবাবু কিছু বুঝিতে পারুন বা না পারুন মাণিকের পরিবার, করিম ও তাহার কন্যা যে অপরাধীদের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে এ বিষয়ে তাঁহার স্থির বিশ্বাস জন্মিল। অতএব করিমকে একটু চাপ দিলেই যে সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত সহজ সরল হইয়া আসিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই তিনি প্রথমে করিমকে ডাকাইলেন। করিম আসিলে আর সকলকে বিদায় করিয়া দিয়া নির্জ্জনে তাহাকে নানাভাবে জেরা করিতে লাগিলেন। কেন যে শত্রুরা করিম ও তাহার কন্যাকে রেহাই দিয়াছে, এবং বর্ত্তমানে তাহার কন্যা ও মাণিকের কবিলা যে কোথায় আছে তাহার কোন সন্তোষজনক নূতন কৈফিয়ৎ করিম দিতে পারিল না। দারোগা বাবুর করিমকে এরূপ গোপনে জিজ্ঞাসাবাদ করার একটা গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। সে উদ্দেশ্যটা আর কিছু নয়, করিমকে চাপ দিয়া কিছু আদায় করা এবং নিজের সঙ্গীদিগকে তাহার ভাগ হইতে বঞ্চিত করা। দারোগা বাবু তাহাকে পাকে চক্রে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে এমন অবস্থায় তাঁহাকে তাহার ভালরূপ পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, নতুবা বিপদ ঘটিতে পারে। করিম সাদাসিধা লোক, ঘুরান ফিরান কথা বুঝিতে পারিল না, কাজেই দারোগা বাবুকে স্পষ্ট বলিতে হইল যে তিনি নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছেন যে করিম ডাকাইতদের সহিত সংশ্লিষ্ট আছে, এমন কি, সে নিজেই সংবাদ দিয়া তাহাদিগকে আনাইয়াছিল। এমন অবস্থায় সে যদি দারোগা বাবুকে নগদ ৫০৲ টাকা দিতে পারে তবেই সে রক্ষা পাইতে পারে নচেৎ তাহার রক্ষা পাইবার কোনই উপায় নাই। করিম চারিদিক অন্ধকার দেখিল। কাদা মাখিয়া থাকিলে যমে ছাড়ে না—অগত্যা করিম টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য কিছু সময় লইল। দারোগা বাবু তাহাকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সময় দিলেন।

করিম বাটী আসিয়া তাহার পুঁজিপাটা বাহির করিয়া দেখিল, তাহার তহবিলে মোট পঁচিশ টাকা সাড়ে ছয় আনা মজুত আছে। করিম মহা ভাবনায় পড়িয়া গেল, কোথা হতে এত টাকা সংগ্রহ করিবে। টাকা দিবার একমাত্র লোক মাণিক ব্যাপারী—সে তো শয্যাগত, আর তাহারও যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত। তথাপি করিম সম্ভব অসম্ভব দুই চারি জায়গায় চেষ্টা করিল। শেষটা সকলের নিকট হইতে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া টাকাটা পুরাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কোন ফল হইল না। কেহই কিছু দিল না। করিম মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল—যাহারা অল্প লইয়া থাকে তাহাদের যাহা যায় তাহা যায়।"

করিমের মাথার ভিতর আগুন জ্বলিতেছিল। তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধক, তাহার কলিজার চেয়ে, জানের চেয়ে প্রিয় একমাত্র কন্যা পীনা আজ নিরুদ্দেশ, ইহাতেই তাহার পাগল হইয়া যাইবার কথা। কোথায় সে তাহার সন্ধানে যাইবে, না এ আবার কি অপ্রত্যাশিত বিপদ! সে যদি সকলের অনুরোধে সদরে না যাইত তবে তাহার পীনাকে হারাইতে হইত না। সকলের ভাল করিতে যাইয়াই আজ তাহার এই দুর্দ্দশা। অথচ যাহাদের ভালর জন্য সে এতটা করিল, এরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইল, তাহারা তো তাহার মুখের দিকে চাহিল না, নচেৎ সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে কি আর এই সামান্য টাকাটা যোগাড় হইত না? কথায় বলে দশের লাঠী একের বোঝা। নবীর চরের উপর, সংসারের উপর, সারা পৃথিবীর উপর করিমের বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলা করিম তাহার যথাসর্ব্বস্ব সেই পঁচিশ টাকা সাড়ে ছয় আনা লইয়া দারোগা বাবুর হুজুরে হাজির হইল।

দারোগা বাবু করিমের আবেদন শুনিলেন, তাহার দুর্দ্দশায় সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন, পরে সেই টাকা কয়টী ট্যাকস্থ করিয়া অম্লান বদনে বাকী টাকার দাবী করিলেন। করিম অবাক হইয়া গেল। সে জানিত সংসারটা শিক্ষার স্থান। এখানে অনেক জিনিস লোক ইচ্ছা করিয়া শিখে, আবার অনেক জিনিস—বোধ হয় বেশীর ভাগ জিনিস—লোকে অবস্থায় পড়িয়া ঠেকিয়া শিখে। কিন্তু তাহাকে যে এমন ভাবে ঠেকিয়া এমন চমৎকার শিক্ষালাভ করিতে হইবে তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

দারোগা বাবুর নবীর চরের তদন্ত শেষ হইয়াছিল, এইবার তিনি তে-মোহনার চরে যাইয়া অনুসন্ধান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী দারোগাগিরি চাকরীর অভিজ্ঞতা হইতে তিনি ভালরূপেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন যে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিলেই কিছু না কিছু রোজগার হয়। সেই রাত্রেই আহারাদির পর নবীর চর হইতে তাঁহার নৌকা ছাড়িবার কথা। রওনা হইবার সময় পর্য্যন্ত যখন তিনি দেখিলেন যে করিম তেমনি নির্ব্বাক্ হইয়া জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া আছে, সে যে বাকী টাকা দিবে এমন কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না, তখন তিনি আর কি করেন অগত্যা বাধ্য হইয়া কর্ত্তব্যানুরোধে তাঁহাকে করিমকে গ্রেপ্তার পূর্ব্বক হাতকড়ি পরাইয়া নৌকায় তুলিয়া লইয়া যাইতে হইল। তিনি সরকারী কর্ম্মচারী, অপরাধীকে হাতে পাইয়া তো আর তিনি ছাড়িয়া দিতে পারেন না।

(ক্রমশঃ)
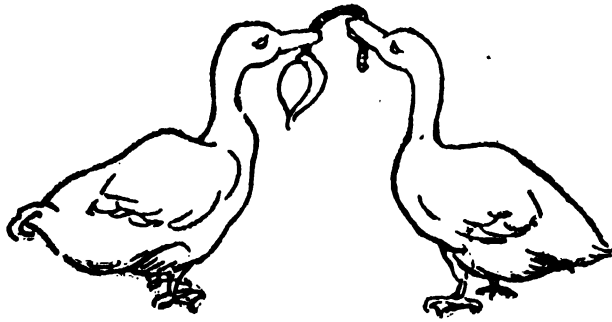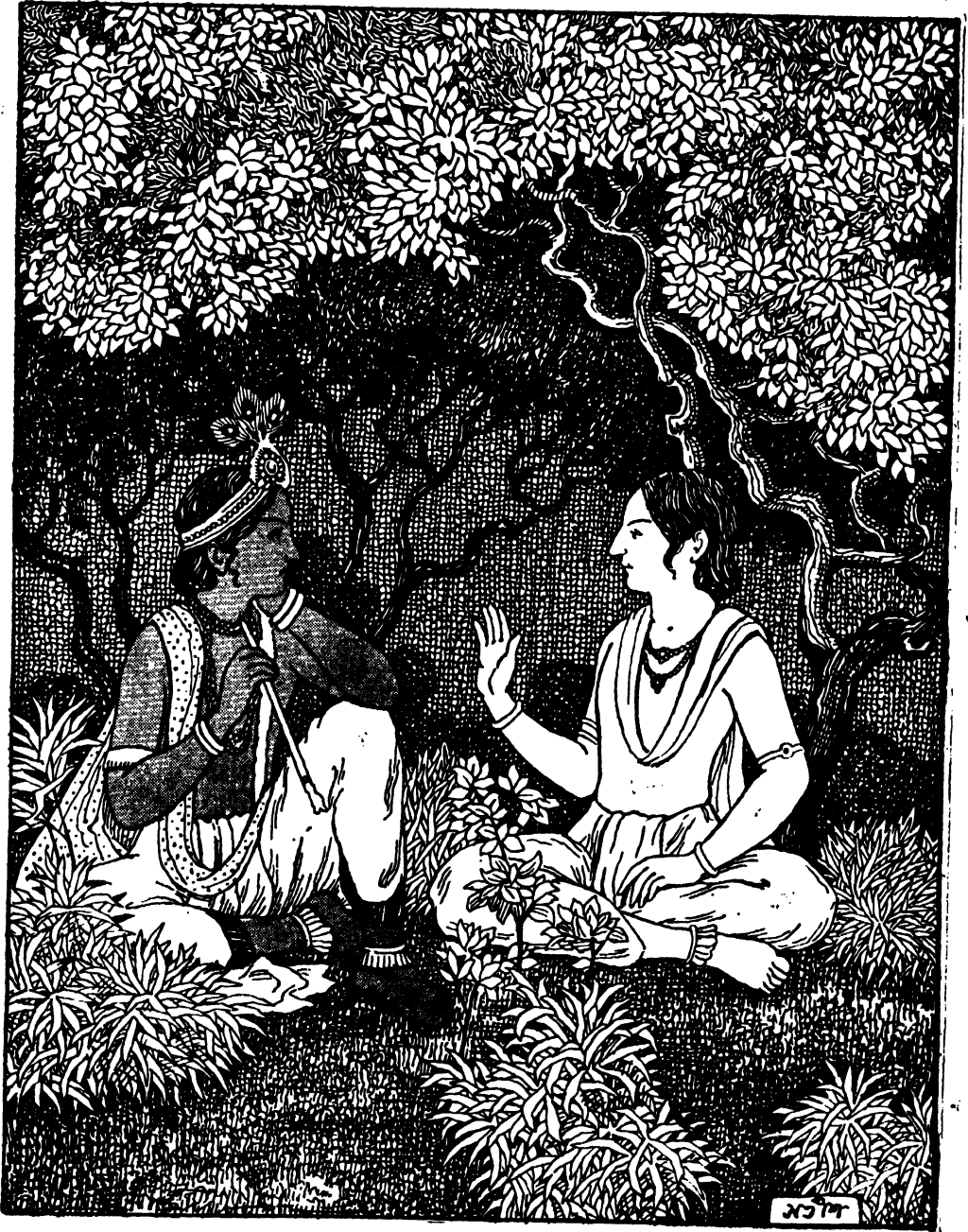
রাধাকৃষ্ণ।

সুবল শ্রীকৃষ্ণকে আশ্বাস দিতেছে,—"বিশ্বাস কর বন্ধু, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার করে তাহাকে আমি যেমন করিয়াই হউক অর্পণ করিব। আমার চেষ্টা কখনও বৃথা হয় না।"

শিল্পী—শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ।

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ১লা আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৩। [৪৩শ সপ্তাহ

প্রাচীন ভারত

গ্রীক হেলিওদোরাসের নির্ম্মিত গরুড়ধ্বজ।

মহাদেবের তাণ্ডব।

পরী।
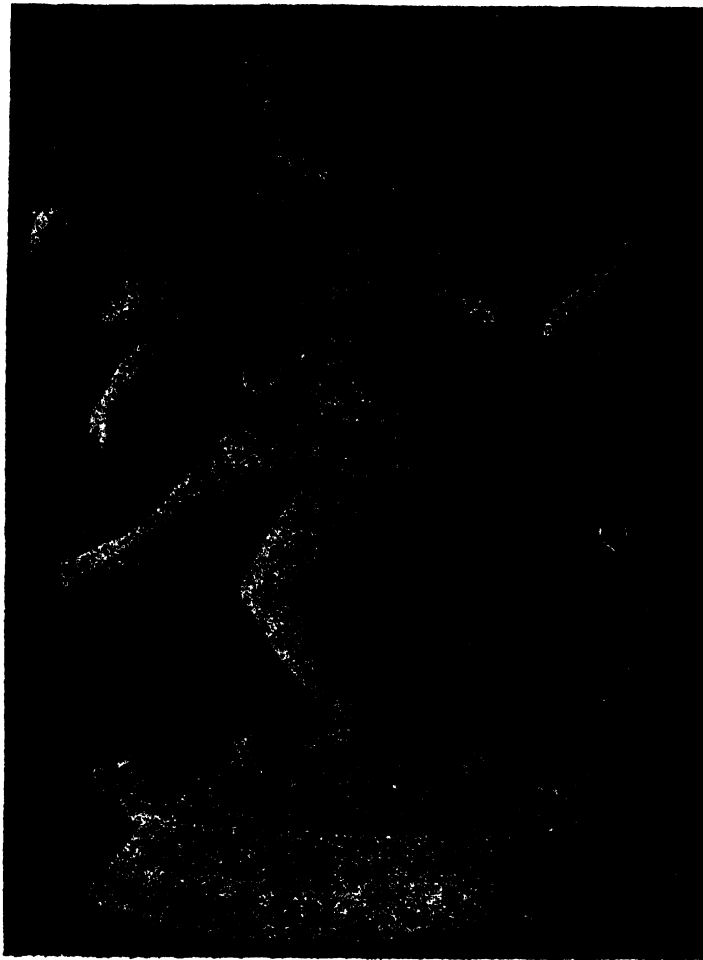
আলোচনা

সেকালের পুলিশ ও একালের পুলিশ—

আজকাল বাঙ্গলার প্রাদেশিক রাজস্বের অধিকাংশ পুলিসের উদরপূরণ করিতে ব্যয়িত হয়। শান্তিরক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে যাইয়া দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অর্থ পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন পুলিশের জন্য এত টাকা ব্যয় করা হইত না, তখন কি সত্যই আমাদের ধন-প্রাণ নিরাপদ ছিল না? ভারতবাসীকে রাজভক্ত করিয়া পুলিশের জন্য জলের মতন টাকা ব্যয় করিবার জন্য এইরকম কথাই ইস্কুলের ছেলেদের শিখান হয় বটে। কিন্তু সত্য কথাটা একবার ইতিহাসের কষ্টিপাথরে কসিয়া দেখা যাউক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্যার টমাস্ মুনরো বলিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষে যে দেশীয় পুলিশ আছে তাহাতে সকল প্রকার কাজ চলে। তিনি আরও বলিয়াছেন—"প্রত্যেক গ্রামে বংশানুক্রমিক চৌকীদার আছে। তাহাদের কাজ গ্রামবাসীর ধনসম্পত্তি রক্ষা ও পথিক এবং বিদেশী লোককে অত্যাচার হইতে রক্ষা করা। যখন কোন জিনিষ হারাইয়া যায় বা চুরী যায় তখন তাহারা উহা পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা করে। পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোনও জাতীয় লোক চোর বাহির করিবার সম্বন্ধে এমন কৌশলী নহে (there is perhaps no race of men in the world equally dexterous in discovering thieves)। চৌকীদারদের ভরণ-পোষণের জন্য ইমাম জমী দেওয়া হয়, প্রতি গৃহ হইতে সামান্য কিছু কর লওয়া হয় এবং বিদেশীয় পথিকদের জিনিষপত্র রক্ষা করিতে হইলে সামান্য পয়সা লওয়া হয়। যুদ্ধ বা অন্য কোন ভীষণ বিপদ আসিলেও তাহারা তাহাদের বংশানুক্রমিক কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করে না। যখন বাধ্য হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিতে হয়, তখন অল্পদিনের মধ্যেই তাহারা ফিরিয়া আসে—যখন সকল লোকও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যায়, তখন তাহারা গ্রামে থাকে।"

আমরা মেগাস্থিনিস্ বা ফাহিয়ানের ভ্রমণ কাহিনী হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম না—কেননা তাহা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু স্যার টমাস্ মুনরো গবর্ণমেণ্টেরই কর্ম্মচারী ছিলেন—এ দেশের সহিত ভাল করিয়া পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন তিনি যখন দেশের গ্রাম্য চৌকীদারদের সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়াছেন, তখন তাহা অতিরঞ্জিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আজকাল পুলিশেরা চুরী, ডাকাতির কয়টা কেসে চোর, ডাকাত ধরিতে পারে? কিন্তু স্যার মুনরোর মতে গ্রামের চৌকীদারেরা এ বিষয়ে পারদর্শী ছিল।

তারপর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজে পুলিশের ভার গ্রহণ করিলেন। তাহার ফলে গ্রাম্য মণ্ডলের পদমর্য্যাদা হ্রাস পাইল এবং চৌকীদার গ্রামের সেবক ও ভৃত্য হইতে দারোগার অল্প বেতনের চাকর হইয়া দাঁড়াইল। ব্রিটিশগণ ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিবার দুইশত বৎসর পরে ঠগী ও পিণ্ডারীর দমন হয়। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের পুলিশ কেমন কার্য্যক্ষম ছিল। যাহা হউক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই পুলিশ নীতিতে ব্যয়ভার এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ও চৌকীদারদের অক্ষমতা এমন সুস্পষ্ট আকারে দেখা দিয়াছিল যে এলফিনষ্টোন ও মুনরোর প্রতিবাদে তাহা ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পরিত্যক্ত হয়।

পুলিশের বর্ত্তমান প্রথা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবর্ত্তিত হয়। আয়ারল্যাণ্ডের Irish constabularyর আদর্শে ভারতীয় পুলিশ গঠিত হয়। গ্রামের চৌকীদার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীন হয় এবং প্রায়ই একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরিত হওয়ায় কোনও গ্রাম বিশেষের প্রতি দায়ীত্ব বোধ করে না। যখন গ্রামের প্রত্যেক লোকে তাহাদিগকে বেতন দিত, তখন গ্রামবাসীদের নিকট তাহারা কাজের কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হইত। আর এখন তাহারা বেশ স্বাধীন বলিয়া নিজেদের মনে করে ও গ্রামবাসীর কাজে আর পূর্ব্বের ন্যায় আত্মনিয়োগ করে না। লর্ড কার্জ্জনের

আমলে যখন পুলিশ কমিশন বসিয়াছিল, তখন তাহার রিপোর্টে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর নিম্নলিখিত মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছিল—"There is no part of our system of which such universal and bitter complaint is made and none in which for the relief of the poor and the reputation of the government is reform in anything like the some degree sourgently called for. The evil is essentially in the investigating staff. It is dishonest and it is tyrannical." অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন প্রথার মধ্যে পুলিশের বিরুদ্ধে যেমন সকল দিক হইতে কঠোর অভিযোগ শোনা যায়। এমন আর অন্য কিছুর জন্য শোনা যায় না। গরীবদিগকে নির্য্যাতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং গবর্ণমেণ্টের সুনাম রক্ষার জন্য ইহার সংস্কার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। যে সকল পুলিশ কর্ম্মচারীরা অনুসন্ধান করে তাহাদের দোষ সবচেয়ে বেশী। তাহারা অসাধু ও অত্যাচারী।"

সেকাল ও একালের পুলিশের তুলনা টানিবার জন্য আমরা নিজে কিছুই বলিলাম না কেবলমাত্র কয়েকটী পুরানো সরকারী রিপোর্টের কিছু কিছু পাঠকদের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। মুনরো ও কার্জ্জন কমিশনের মন্তব্যের উপর অন্য কিছু বলাও নিষ্প্রয়োজন।

দুর্গম পথের যাত্রী—

ঘন তমসাচ্ছন্ন রজনী—ঝঞ্ঝা ও বজ্রের নিরন্তর গর্জ্জন—ভ্রাতৃবিরোধের বিভীষণ অগ্নিশিখা—তাহার মধ্যদিয়া আত্ম-শক্তির অমিত জ্যোতিঃ অন্তরে বইয়া চলিয়াছেন জাতির মুক্তি কামী সাধক— মহাত্মাগান্ধী। স্বাধীনতার দুর্গম ক্ষুরধারা পথে তিনি সাবধানে ধীরমন্থর গতিতে চলিতেছেন—চলার পথে শব্দ নাই, কোলাহল নাই, ঢক্কা নিনাদ নাই, দেখিয়া অনেকে মনে করিতেছেন তিনি বুঝি আর অগ্রসর হইতেছেন না, হতাশার আক্ষেপে বুঝি আলস্যে দিন যাপন করিতেছেন। কিন্তু এই যে নীরবে নিঃশব্দে ধীর অথচ স্থির গতিতে মহাত্মা-গান্ধী জাতীয় মুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছেন, ইহাই নির্ব্বাচনের বিরাট কোলাহল অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী কল্যাণ-প্রসূ হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।

রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে একটা মাদকতা আছে। কাউন্সিল ও অ্যাসেম্বিলিতে সভ্য হইয়া দেশের উন্নতির চেষ্টা করা সহজ আরামপ্রদ ও বিপদ বিহীন। ইহাতে যেমন কম কষ্ট করিতে হয়, তেমনি বেশী নাম হয়। সহজ ও সুলভের পথে মানুষ যেমন সহজে প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট হয়, দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল পথে সেরূপ হয় না। সেই জন্যই দেশের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক গুলি আজ উঠিয়া পড়িয়া নির্ব্বাচন যুদ্ধেই লাগিয়াছেন। নির্ব্বাচন যুদ্ধ প্রয়োজন—তাহাতেও রাজনৈতিক শিক্ষা কিছু হয়, কিন্তু তাহাতেই যদি সমগ্র শক্তি ব্যয়িত হয়, তবে জাতি সংগঠনের কার্য্য করিব কি লইয়া? কাউন্সিলে যাইয়া যতটুকু সুবিধা করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন—কিন্তু ভারতের মুক্তির জন্য তাহাই একমাত্র প্রয়োজন বা সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন এই ভুল অনেক রাজনৈতিক নেতাই করিতেছেন। দেশের যুবক শক্তিকে দেশবাসীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রতি নিয়োজিত করিতে হইলে চাই আদর্শ —নির্ব্বাচনী ও কাউন্সিলী দ্বন্দ্বে সে আদর্শ থাকিতে পারে না।

মহাত্মা গান্ধী রাজনীতির কল কোলাহল হইতে দূরে দাঁড়াইয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবার কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া যুবক শক্তির কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন। ডাক্তার সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি মাহাত্মা গান্ধীকে রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরে মহাত্মা গান্ধী বলিতেছেন—"ভারতবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়াছেন, এ সব দলকে সম্মিলিত করিবার কার্য্যে আমি আমার অযোগ্যতা স্বীকার করিতেছি। তাঁহাদের নীতি, আমার নীতি নহে। আমি নিম্নদিক হইতে উন্নয়নের কার্য্য করিতে চেষ্টা করিতেছি, যাঁহারা দর্শক মাত্র তাঁহাদের পক্ষে আমার এই কার্য্যের মন্থর গতি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবে। তাঁহারা উপর হইতে নীচুর দিকে কার্য্য করিতেছেন। এই পথ আরও দুরূহ, আরও জটিল। তাঁহাদের পক্ষে চরকাই একমাত্র অবলম্বনীয়। -একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে—ঈশ্বরের

চক্র ধীরে ধীরে ঘুরে, কিন্তু উহা অত্যন্ত কার্য্যকর হইয়া থাকে, ঈশ্বরের এইসব ছোট ছোট চাকার কাজ লইয়াই আমি আছি। এই ঝড় যখন কাটিয়া যাইবে, বিভিন্ন দল ঐক্যবদ্ধ হইবে, হিন্দু এবং মুসলমান, ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ, উৎপীড়িত এবং উৎপীড়ক যখন মিলনসূত্রে আবদ্ধ হইবেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে নিঃশব্দ করস্পর্শে এই দেশ পীড়নমূলক এবং হিংসামূলক বয়কটের জন্ত নহে—স্বাস্থ্যপ্রদ অহিংসা এবং গঠনমূলক বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্তই প্রস্তুত হইয়াছে। এই জাতিকে কিছু সার্ব্বজনীন শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হইবেই, তাহা যত সামান্তই হউক। ইহা হইল বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন। অনুরোধকারীগণ নিজদিগকে আমার অনুগামী বলিয়া মনে করেন। আমি তাঁহাদিগকে চরকার নেতৃত্ব অনুমোদন করিতে আমন্ত্রণ করিতেছি। এই সাদাসিদে চরকা আমার কর্ণে প্রত্যহ এদেশের জনসাধারণের দুঃখকষ্টের গুঞ্জন ধ্বনি গান করিয়া থাকে, এই চরকার উপর আমি আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছি, ঐ চরকা আমাকে দরিদ্র নারায়ণের কথাই স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে।"

লালা লজপৎ রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, স্তার আবদার রহিম প্রভৃতি বিভিন্নদলের নেতৃগণ জাতি সংগঠন চেষ্টা না করার দোষ কেবল পরস্পরের উপর নিক্ষেপ করিতেছেন। কিন্তু নেতারা সার্ব্বজনীন শক্তির প্রতীকস্বরূপ কিছুই দেশকে দিতে পারেন নাই। চরকার দ্বারা জাতিয় আন্দোলন মূর্ত্ত হইয়া উঠিতে পারে। নিজের উপর নিজেদের নির্ভর না করিলে জাতীয় উন্নতি আসিতে পারে না। আত্মনির্ভরতার জন্ত সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়-তার ভাব জাগাইয়া দেওয়া। চরকাই—ইহার অর্থনৈতিক দিক নহে—এরূপ জাতীয় ভাব জাগাইয়া দিতে পারে। সশব্দ আন্দোলনের মুখর পথ পরিত্যাগ করিয়া মহাত্মা গান্ধী যে দুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছেন, তাহার অনুবর্ত্তন আমাদিগকে করিতে হইবে।

আগামী কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি—

মান্দ্রাজের ভূতপূর্ব্ব অ্যাডভোকেট জেনারেল শ্রীযুক্ত এস্, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় আগামী গৌহাটি কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। ইচ্ছা ও শক্তি থাকিলে ইহার সভাপতি দেশের অনেক কাজ করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার মহাশয়ের যে শক্তি আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। তবে তাঁহার ইচ্ছার গতি কোনদিকে যাইবে তাহা বলা কঠিন। তিনি স্বরাজ্য দলের অন্ততম নায়ক। কংগ্রেসের ন্তায় সর্ব্বজনীন জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে কোন দল বিশেষের কুক্ষিগত করা কর্ত্তব্য নহে। কংগ্রেসের মূল-নীতিকে এমন ভাবে গঠন করা উচিত যে সকল দলই যেন তাহার মধ্যে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। মান্দ্রাজের "সত্যাগ্রহী" পত্রিকা লিখিয়াছেন যে শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার পারস্পরিক সহযোগীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পক্ষপাতী। তিনি গৌহাটি কংগ্রেসে এই মত গৃহীত করাইবার জন্ত চেষ্টা করিবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার মহাশয় যদি সত্যই এরূপ চেষ্টা করেন ও তাঁহার মত গৃহীত হয়, তাহা হইলে কংগ্রেস অধিকতর ক্ষমতাশালী হইবে—কেননা সকল দলের সদস্তই ইহাতে তখন যোগ দিতে পারিবেন। স্বরাজ্য দলেরও নিছক বাধাপ্রদান নীতি পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার মহাশয় যদি কংগ্রেসের সভাপতিরূপে ১৯২৭ সালের ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজীদের নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারেন, তবে কাউন্সিল হইতে কিছু কাজ আদায় করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তবে কংগ্রেসের কাজ কেবলমাত্র ব্যবস্থাপক সভা পরিচালনা করা নহে—কংগ্রেসের আসল কাজ জাতি সংগঠন করা। কংগ্রেসের কর্ম্মীগণ যাহাতে বর্ত্তমানের ন্তায় কেবল মাত্র আত্মকলহে ব্যাপৃত না থাকেন ও ব্যবস্থাপক সভার উপরই সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ না রাখেন, সেরূপ ব্যবস্থা সভাপতির করা কর্ত্তব্য। এক বৎসরের জন্ত ভারতবাসী যাঁহাকে রাজনৈতিক নায়ক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, তিনি সদ্‌বুদ্ধি ও সদিচ্ছা প্রণোদিত হইয়া সুস্থদেহে জাতীয় কল্যাণ বিধান করিবার সুযোগ লাভ করুন ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

নাগরিক অধিকারের অপব্যবহার—

গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক নরনারীকে ভোটের অধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড ও আমেরিকায় এইরূপে জনসাধারণকে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। ভোট নাগরিক অধিকারের চিহ্ন বা প্রতীক্। কিন্তু এই নাগরিক অধিকার যথাযথরূপে ব্যবহার করিতে হইলে বুদ্ধি বিবেচনা প্রয়োজন—বিদ্যাবুদ্ধি না থাকিলে কোন ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিলে দেশের মঙ্গল হইবে তাহা ভোটার বুঝিতে পারে না। সেইজন্য সাধারণতঃ যে দেশে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হয় নাই, সে দেশের প্রত্যেক নরনারীকে ভোটেই অধিকার দেওয়া হয় না। শিক্ষার অভাব বলিয়াই ভারতবর্ষে মাত্র শতকরা দশজন লোককে ভোটের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কিন্তু সমগ্র লোকের দশমাংশ এই ভোটারগণও এ দেশে ভোটের অধিকারকে ব্যবহার করেন না। ভারতবর্ষের ভোটারগণ নিজেদের অল্লাধিক শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারে ভোট দিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন। সুতরাং আশা করা যাইতে পারে যে তাঁহারা এই নাগরিক অধিকারের সদ্ব্যবহার করিবেন। কিন্তু এরূপ সদ্ব্যবহার তাঁহারা করেন না। অনেকেই অনুরোধে পড়িয়া ভোট দিয়া থাকেন—দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া ভোট দেন না। যাহা হউক তবু তাঁহারা নাগরিক অধিকারের ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু বহু সংখ্যক ভোটার ভোট দিতে মোটেই যান না। নাগরিক হিসাবে এইরূপ লোককে মৃত বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ গত নির্ব্বাচনের সময় এইরূপ মৃত নাগরিকের সংখ্যা কত অধিক হইয়াছিল তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নিম্নে আমরা শতকরা যত লোক ভোট দেন নাই তাহার বিবরণ দিতেছি।

বাঙ্গলা দেশ

নির্ব্বাচক মণ্ডলী	ভোট না দেওয়ার শতকরা (১৯২৩ খৃঃ অঃ)	ভোট না দেওয়ার শতকরা (১৯২১ খৃঃ অঃ)
অমুসলমান সহর	৪৯·৯	৬০
অমুসলমান পল্লী	৪৭·২	৬১·৮
মুসলমান সহর	৫০·৬	৭৩·৯
মুসলমান পল্লী	৬৭·৬	৭৩·৬
জমীদার	১৭·১	১৬·৫
বিশ্ববিদ্যালয়	২৩·২	৩৩·৬
ইউরোপীয় বণিক	৮·৮	—
ভারতীয় বণিক	২২·৯	৯·৬
	মোট ৬১	৬৬·৬

উক্ত বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে একশতজন ভোটারের মধ্যে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৩·৪ জন ভোটার ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৯জন ভোটার ভোট দিয়াছেন। তাহা হইলে কাউন্সিলে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহারা সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে কয়জন লোকের প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন? বাঙ্গলা দেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৪কোটি ৬৬লক্ষ ৯৫হাজার ৫৩৬ তন্মধ্যে যে সকল স্থানে নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব হইয়াছে সেখানকার ভোটার সংখ্যা ১০৪৪১৬৬—ইহার মধ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে ভোট দিয়াছেন মাত্র ৪০৭২২৪জন। বাঙ্গলা দেশের দশলক্ষ চোয়াল্লিশ হাজার একশত ছেষট্টিজন

ভোটারের মধ্যে ছয়লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শত বেয়াল্লিশজন লোক ভোট দেন নাই। যে দেশে দশলক্ষ ভোটারের ভিতর ছয়লক্ষ ভোটার ভোট দেন না—সে দেশে গণতন্ত্রমূলক শাসন নীতি প্রবর্ত্তিত হইবে কিরূপে? আমাদের দেশে রাজনৈতিক দলের সুপ্রতিষ্ঠা হয় নাই—দলের শাখা গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হয় নাই। সেইজন্যই এত লোক ভোট না দিয়া থাকিতে পারে। মফঃস্বলের ভোটারদের মধ্যে যাঁহারা ভোট দেন নাই তাঁহাদের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। হিন্দুদের মধ্যে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে শতকরা ৪৭'২জন ভোট দেন নাই—আর সেই স্থলে মুসলমানদের মধ্যে শতকরা ৬৭'৬জন ভোট দেন নাই—অর্থাৎ মফঃস্বলে হিন্দু অপেক্ষা শতকরা ২০জন বেশী মুসলমান ভোট দেন নাই। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা ও নাগরিক অধিকার লাভের যোগ্যতা যে হিন্দুদের অপেক্ষাও অল্প ইহাই তাহার অন্যতম প্রমাণ।

এ সম্বন্ধে বাঙ্গলা দেশে যেমন অবস্থা সমগ্র ভারতবর্ষেই প্রায় সেইরূপ অবস্থা - কেবল বোম্বাই ও মধ্য প্রদেশের অবস্থা একটু ভাল। নিম্নের বিবরণ হইতে তাহা প্রমাণিত হইবে।

প্রদেশ	সমগ্র ভোটার	১৯২৩	১৯২১
		শতকরা যত জন ভোট দিয়াছে	শতকরা যত জন ভোট দিয়াছে
মাদ্রাজ	১২৯৩৯২৩	৩৬·১	২৫
বোম্বাই	৬৩০৪৭৮	৪৮·২	৩৪·৯
যুক্তপ্রদেশ	১৫০৯১২৭	৪২·২	৩৩
পাঞ্জাব	৬২৭৫১৩	৪৯·৩	৩২·২
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৩৮৫১৩	৫২·২	৩৯·৭
মধ্যপ্রদেশ বেরার	১৫২৫৬৮	৫৭·৭	২২·৫
আসাম	২২৪০৬৩	৪২·১	২৪·২

এই তো গেল কাউন্সিলের ভোটারদের কথা। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভোটদাতাগণের রাজনৈতিক কর্ত্তব্যবোধও ইঁহাদের অপেক্ষা বেশী নহে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচনে ভোট দিতে পারেন তাঁহারাই যাঁহাদের বার্ষিক আয় দুই হাজার টাকার উপর। এরূপ ব্যক্তিদের দায়ীত্ববোধ সাধারণ লোকদের অপেক্ষা বেশী হইবে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার ভোটার সংখ্যা ছিল ৮লক্ষ ১৮ হাজার ৭শত ৪৬জন, তাহার মধ্যে ভোট দিয়াছেন মাত্র ৩ লক্ষ ৪৩ হাজার ৫শত ১৬ন। কোন প্রদেশে শতকরা কতজন ভোটার ভোট দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাদ্রাজ	৪০·৯
বোম্বাই	৩৮·৩
বাঙ্গলা	৪১
যুক্ত প্রদেশ	৪৪·৭
পাঞ্জাব	৬০·৩
বিহার ও উড়িষ্যা	৪৪·১
মধ্য প্রদেশ ও বেরার	৪৪·১
আসাম	৪৪·৫
বর্ম্মা	২৩·৩
দিল্লী	৩০
আজমীর মারওয়াড়	৭৪·৫

বাঙ্গলা দেশ ও অন্যান্য কয়েকটী প্রদেশে সম্প্রতি মেয়েদিগকে ভোট দিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাই, মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের নির্ব্বাচনেই মেয়েরা ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছিলেন। কিন্তু পুরুষদের এক চতুর্থাংশ নারী এই অধিকার ব্যবহার করিয়াছেন।

নির্ব্বাচক মণ্ডলী	মাদ্রাজে শতকরা	বোম্বাইয়ে শতকরা
অমুসলমান সহর	৪৫' ৮	২১' ৯
অমুসলমান পল্লী	৬৯	১৭' ৪
মুসলমান সহর	২২' ৫	২১' ১
মুসলমান পল্লী	৪' ৭	৭' ২
ভারতীয় খৃষ্টান	৪৪' ৬	—
	মোট ১১' ৪	মোট ১৮' ৩

ভারতবর্ষে শতকরা দশজন লোক ভোটার হওয়া সত্ত্বেও এত কম ভোটার ভোটের অধিকার ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে প্রত্যেক নরনারী ভোটের অধিকারী অথচ সেখানে ভোটারদের মধ্যে খুব কম লোকই ভোট না দিয়া থাকেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের নির্ব্বাচনে নিম্নলিখিত রূপ ভোটার অনুপস্থিত ছিলেন—

নির্ব্বাচক মণ্ডলী	শতকরা ভোট দেয় নাই
লণ্ডনের বরো	৪১' ৯
ইংলণ্ডের বরো	১৬' ২
ওয়েলসের বরো	২১' ৭
স্কটল্যাণ্ডের বরো	২১' ২
ইংলণ্ডের কাউন্টি	২৮' ৭
ওয়েলসের কাউন্টি	২৩
স্কটল্যাণ্ডের কাউন্টি	৩১' ৩

প্রাচীন এথেন্সে নিয়ম ছিল যে যদি কেহ নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে কোন পক্ষে ভোট না দেয়, তবে তাহাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইত। সেই জন্য প্রত্যেক নাগরিকই রাজনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করিতেন ও উপযুক্ত ব্যক্তিকে ভোট দিতেন। বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, এথেন্সের ন্যায় বাড়াবাড়ি নিয়ম করা হয় নাই। কিন্তু নাগরিকদিগের কর্ত্তব্য রাজনৈতিক অধিকারের ব্যবহার করা। আমাদের দেশে যে কয়েকজন লোককে ভোট দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, সে কয়জন ব্যক্তিও যাহাতে তাঁহাদের ক্ষমতা ব্যবহার করেন, তাহার চেষ্টা রাজনৈতিক দলগুলির করা কর্ত্তব্য।

আলো-ছায়া

(গল্প)

[শ্রীমতিলাল দাস এম-এ]

(১)

সারা গগনে কালো মেঘ জমে গেছে, শীতল বাতাস থেকে থেকে মৃদুভাবে বইছে। বৃষ্টি নামেনি, তবে আসন্ন বর্ষার উদাস রাগিণী যেন কাণে একটু একটু আসিতেছিল, আমরা তখন মজলিস ঘরে বসেছিলাম। সান্ধ্য চায়ের ধোঁয়া উড়িতেছিল, তাহাতে যেন কেমন একটু নেশা আসিতেছিল। তখন সমর বলিয়া উঠিল, "না, আজ আর খেলা জমবে না এস গল্প করা যাক।"

অমরেশ উত্তর করিল—"গল্পই বা কোথায় পা'বে, কাগজগুলো ত সব পড়া শেষ হয়ে গেছে। বাসি গল্প ত আর ভাল লাগবে না।"

নীপেশ গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল, বাইরের কালো মেঘের ছায়া যেন তার মুখে মাখিয়া গিয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম, "কি হে, আজ যে এমন গুরুগম্ভীর ?"

তার উত্তরে নীপেশ একটী করুণ নিশ্বাস ছাড়িল ও বলিল—"তোরা গল্প শুনতে চাইছিস, তবে শোন, আমার জীবনের একটী করুণ কাহিনী তোদের শুনিয়ে দিই। গল্প নয়, এটা প্রাণের রাঙা রক্তে তাজা।"

নীপেশ আমাদের দলের মধ্যে সবার চেয়ে সরল, সবার চেয়ে চপল। তার প্রাণে যে লুকানো কোন বেদনা আছে, তাহা আমরা জানিতাম না।

হেনা ফুলের মদির গন্ধ বাতাসে ঠেলিয়া আনিতেছিল। সেই হেনার বাসের মত মাতোয়ারা স্বরে নীপেশ বলিতে লাগিল—"আমার ছন্নছাড়া জীবনটা উদ্দাম কৌতুককে সঙ্গী করে নিয়েছে। তাই তোরা, ভিতরে যে আগ্নেয় গিরি লুক্কায়িত আছে তার খবর রাখিস নে। সেবার আমি বি-এ পাশ করে বেরিয়ে পড়লাম, দেশটাকে একবার নিজের চক্ষে দেখিতে। সহরে অনেক সময় বাস করিলেও, আমার মনে পল্লীর প্রতি একটা গোপন টান, একটা আন্তরিক আকর্ষণ ছিল। এই আকর্ষণই বোধ হয় আমাকে ঘরের বাহির করিয়াছিল। শস্য-শ্যামলা বাংলার স্বর্ণশ্রী আজিও লোপ হয় নি। উন্মুক্ত আকাশ তলে অবারিত মাঠ ঘাট পড়িয়া রহিয়াছে। অজস্র বনজ তরুলতা সবুজ বসনের মতন পল্লী মায়ের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া রহিয়াছে। বন্য পুষ্পসম্ভার পল্লী পথকে সুগন্ধে মাতাইয়া রাখিয়াছে। স্ফটিক শুভ্র তোয়ধারা নদীর বুক ভাসাইয়া বহিয়া যাইতেছে। আর এই শোভা-সম্পৎ—এই মাধুরী—এই ঐশ্বর্য্য অজ্ঞাতসারে উপভোগ করিয়া পল্লীবাসীরা সেই সনাতন সরল জীবন যাপন করিতেছে। আমি যেখানেই যাইতাম, সেখানেই মধুর আতিথ্য আমাকে মুগ্ধ করিত। পল্লীতে পল্লীতে 'জামাই আদর' পাইয়া আমার মনটা বড়ই সুখী হইতেছিল। এই সুখ আমাকে একটা উচ্চ ভাব, একটা সতেজ আগ্রহ, একটী তীব্র উন্মাদনা আনিয়ে দিয়েছিল। তাই আমি পল্লীতে পল্লীতে বর্ত্তমান জগতের বিশ্বপ্রেমের বাণী, মুক্তির আহ্বান, মনুষ্যত্বের সাধনা, যুগসন্ধির কর্ত্তব্য প্রভৃতি উচ্চতম বিষয়ে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতাম। পল্লীবাসীগণ আমার মহাভাবগুলি বুঝিত, শুনিত ও মনের মাঝে অনুভব করিতে চেষ্টা করিত ইহা আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তাই স্থানে স্থানে দু' দশদিন থাকিয়া যুবকগণকে মাতাইয়া সেবাশ্রম, দরিদ্র ভাণ্ডার প্রভৃতি খুলিলাম। কতকগুলি বিষয়ে আমার মতের সহিত তাঁহাদের মত মিলিত না। জাতিভেদের নিষ্ঠুরতা ও অমানুষিক হীনতা তাহারা উদাসীন ভাবে মানিয়া লইত। গ্রামে গ্রামে, জাতিতে জাতিতে হিংসাভাব কমিতে লাগিল বটে, কিন্তু অতীতের এই জীর্ণ কঙ্কাল চুর্ণ করিয়া যে বিরাট সাম্য গড়িতে চাহিয়াছিলাম তাহা হইল না। এইরূপে মাস ছয় কাটিয়া গেল। আশা ও আনন্দে ও সাফল্যের উৎসাহে আমাকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল তাই কোথা দিয়া যে এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেল তা বুঝিতে পারি নাই। অবশেষে মায়ের চিঠি পেয়ে বাড়ী ফিরিতে সংকল্প করিলাম।"

এই সময় নীপেশ একটু থামিল। সমর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—এই তোর গল্প, সত্যোটাই মাটী করলি দেখছি। এ যে মস্ত বড় একটা বক্তৃতা দেখছি।

"অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন, 'সবুরে মেওয়া ফলে' এ প্রবাদ বাক্যটা ত জানিস।" এই কথায় আমরা সকলেই হাসিয়া উঠিলাম।

(২)

হাসি থামিলেই নীপেশ বলিতে লাগিল তখন মনসাপুরে ছিলাম। সেখান থেকে শক্তিগড় ষ্টেশন মাইল চার। বেলা শেষে যাত্রা সুরু করিলাম। দু' মাইল যেতে না যেতে আকাশ কালবৈশাখীর মেঘে কালিমাময় হয়ে গেল। ঈশান কোন্ হ'তে প্রবল ঝড় উঠিল। এদিকে সন্ধ্যার তিমির ছায়াও নিবিড় হয়ে নামিয়া আসিল। সেই অন্ধকারে ও ঝড়ে পথ চলা অতি কষ্টকর মনে করিয়া একটী আশ্রয় স্থান খুঁজিতে লাগিলাম। আমার পথ প্রান্তরবিলম্বী, পাশে ঘনতরু ছায়ায় ঘেরা একটা গ্রাম দেখা যাইতেছিল—সেই দিকেই দৌড়াইলাম। যাইতে যাইতেই ঝড় তীব্র হইয়া আসিল। ধূলা উড়িয়া চক্ষে লাগিতে লাগিল। অতিকষ্টে একটী দালানের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দালানের দরজা বন্ধ, তবে একটা ভাঙা জানালার ফাঁকে ভিতর হইতে সন্ধ্যা দীপের ক্ষীণ আলো আসিতেছিল। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে মুসলধারে বৃষ্টি নামিল। তখন ভিজা বিড়ালের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে দরজার সুমুখে উপস্থিত হইয়া ডাকিলাম "ওগো ঘরে কে আছ? দরজা খোল।" আমার কথা বোধ হয় বাতাসে উড়িয়া গেল, পুনরায় ডাকিলাম, কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না। তখন জানালার ধারে মুখ দিয়া জোরে ডাকিলাম। কিছু পরে পদ সঞ্চালনের শব্দ শুনিলাম। তারপর দরজা খুলিয়া একটী সপ্তদশ বর্ষীয়া তরুণী প্রদীপ আঁচলে ঢাকিয়া দরজা খুলিল ও বীণানিন্দিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"কে?" সেই প্রকৃতির বিপ্লবময়ী রুদ্রমূর্ত্তির পাশে একি কোমলতা আসিয়া দাঁড়াইল। প্রদীপের ক্ষীণ আলো বাতাসে কাঁপিতেছিল, আধ-আলো আধ-ছায়ায় অপরিচিতা আলো-ছায়ার মতই মহিমা মণ্ডিত হইয়া দাঁড়াইল। সহসা বিদ্যুৎ চমকিল, সেই ভাস্বর আলোকে তরুণীর মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ডালিম রঙের গণ্ড, নয়ন যেন ভারাক্রান্ত। বিদ্যুৎ চমকে একজন অপরিচিত যুবককে সম্মুখে দেখিয়া তরুণীর অরুণ মুখমণ্ডল আরও অরুণাভ হইল। সেই স্তম্ভিত বিস্ময় দমন করিয়া সে বলিল "ঘরের ভিতর আসুন।"

ঘরের ভিতর ঢুকিলাম। অপরিচিতা আমাকে লইয়া একটী অনতিপ্রশস্ত ঘরে বসিতে বলিল। সেখানে নিম্নে ভূশয়নে একটী বৃদ্ধা শুইয়াছিলেন। অনুমানে তাহাকে পীড়িতা বলিয়া মনে করিলাম। প্রদীপের আলোকে সেই তরুণীর পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম। বালিকা অনূঢ়া—যৌবন তাহার পূর্ণতায় তাহার সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়াছিল। হিন্দু ঘরের এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে, তাহার সহিত আলাপ করিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু অবস্থাগতিকে কথা না বলিলেও চলে না—কারণ গৃহে অন্য জনপ্রাণী কাহাকেও দেখিলাম না। তাই বাধ বাধ স্বরে কুণ্ঠিতচিত্তে বলিলাম—"আপনাকে বড় অসুবিধায় ফেলিলাম, দেখিতেছি।"

তরুণী লাজনম্র স্বরে কহিল,—"অসুবিধা বিশেষ কি, তবে আমার মা মরণাপন্ন, আপনাকে যত্ন অভ্যর্থনা দূরে থাকুক, একটু ক্ষণিক আরাম হয় ত দিতে পারব না।"

শরৎশিশির-ভেজা দুর্ব্বার মত সজল নয়ন পল্লব দুটী ব্যথায় আনত হয়ে উঠেছিল। তরুণীর কথা শেষ হ'তে না হ'তে বৃদ্ধা যন্ত্রণাসূচক চীৎকার করিলেন, কাজেই তাঁহার সেবার জন্য তরুণী রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে গেল। এদিকে ঘনঘটা আরও জাঁকিয়া বসিল। বর্ষার প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইল যে বাহির হইবার আর জো নাই। তখন কি করিব, বুঝিয়া পাইলাম না। একলা অনূঢ়া কিশোরী, আর রুগ্না মাতা মৃত্যুর তীরশায়িতা। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়ে বলিলাম, "দেখুন ভদ্রতা আমাকে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব আমায় থাকিতে বলছে। এই দুর্য্যোগ আর আপনি একা, আপনাকে ফেলে যেতে আমার মন সরছে না। আমার প্রগল্ভতা ক্ষমা করবেন বোধ হয়।"

বৃদ্ধাকে ধীরে ধীরে বাতাস করিতে করিতে তরুণী উত্তর করিল—"না, আপনি সঙ্কোচ অনুভব করবেন না, আমরা একা, সংসারে বড় একা—বাইরে আমাকে মিশতে হয় আর সমাজ তাকে আমি ভয় করিনে।"

একি কথা শুনিতেছি। যেন চলিতে চলিতে উন্নত

সর্পের কণার সম্মুখে পড়িলাম। সমাজকে ভয় করে না, মা জানি কত তীব্র নির্যাতনে! বৃদ্ধার কষ্ট কাসি কাসিতে কাসিতে তাঁহার প্রাণান্ত হইতেছিল, শরীর কৃশ ও ক্ষীণ হইয়া যেন বিছানায় মিশিয়া গিয়াছে। তদুপরি বোধ হইল যেন বহুদিন বৃদ্ধার রীতিমত আহারাদি হয় নাই। বৃদ্ধার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায় তরুণী আর কথা কহিল না। তাঁহার শুশ্রূষায় রত হইল। আর আমি বসিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। বাইরে বর্ষণ সমভাবেই চলিতে লাগিল।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধার যন্ত্রণা যেন বাড়িতে লাগিল আমি আর থাকিতে না পারিয়া কহিলাম, "দেখুন, আমি আপনার মায়ের পাশে বসি আপনার মায়ের কষ্ট লাঘব না হ'ক—আপনার অন্ততঃ—"

যুবতী না জানি কেন আমাকে বাধা না দিয়া বলিল—"আজ্ঞে তবে একটু দয়া করে বসুন।" এই বলিয়া তরুণী চলিয়া গেল। মুহ্যমান বৃদ্ধা এতক্ষণ অজ্ঞানাবস্থায় ছিলেন, সহসা তিনি যেন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন ও ক্ষীণস্বরে ডাকিলেন—"মা, নীলিমা!"

"ডাকছেন কেন তাকে?"

"কে তুমি বাবা?"

"আজ্ঞে আমার নাম নীপেশ,—জলঝড়ে এখানে এসে পৌছেছি।

বৃদ্ধা কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপরে করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "বাবা! অনেকদিন মানুষের মুখ দেখিনি তোমায় দেখে বড় সুখী হলুম বাবা, সুখে থাক, রাজ-রাজেশ্বর হও।"

থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—মৃত্যু আমার ঘনিয়ে এসেছে, মরণের বাজনা বেজে উঠেছে, মরলে সকল দুঃখ যাবে, কিন্তু নীলিমা রইল, কে ওকে দেখবে? তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে। আমি মরলে দেখো যেন ও ভেসে না যায়—এই বলিয়া বৃদ্ধা ভাবাবেগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। এমন সময় নীলিমা একখানা রেকাবে করিয়া দুখান পেঁপে, চারিখান বাতাসা আর একটী ছোট বাটীতে একটু দুধ লইয়া আসিল, ও আমাকে জলযোগ করিতে অনুরোধ করিল। তাহার দৃষ্টি সহসা তাহার মায়ের উপর পড়িল—"কি মা, কাঁদছ কেন, কেঁদনা, বলেছি ত মা আমার জন্য তোর ভাবতে হ'বে না। ভগবানের পায় আমায় স'পে দেছ তাকি ভুলে গেছ। মায়ের অশ্রু ঝর ঝর করিয়া গড়াইতে লাগিল। আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া রহিলাম।

কোনরকম রাতটা কাটিয়া গেল, প্রভাতে মায়ের জরুরী চিঠী অবহেলা না করিতে পারিয়া চলিয়া আসিতে হইল। আসিবার আগে নীলিমাকে বলিলাম—"নীলিমা! আমি আবার আসব, দুঃখের দিনে তোমার এ অযোগ্য বন্ধুকে ভুলো না।"

সিংহীর মত গ্রীবা ভঙ্গী করিয়া নীলিমা বলিল—"দেখুন আপনি আমার রূঢ়তা মার্জ্জনা করবেন, আপনার দয়া আমার চিরকাল মনে থাকবে, কিন্তু নিজের ঋণ আর বাড়াব না—আপনি আমার কে যে আপনার করুণা চাইব, সমাজ তা চাইতে দেবে না—আসুন, নমস্কার।

এই বলিয়া নীলিমা ঘরে চলিয়া গেল। আমিও গম্ভীর হয়ে চিন্তার ভার বয়ে ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলাম।

তারপর নানা কাজে কয়েকমাস কাটিয়া গেল। শরতের এক রৌদ্রোজ্জ্বল অপরাহ্নে নীলিমাদের বাড়ী গেলাম। পুরীখানি নিস্তব্ধ, জনহীন। বিজন প্রান্তরের মত খাঁ খাঁ করছে। গ্রামে খোঁজ করিলাম, কিন্তু সন্ধান হইল না। শুনিলাম নীলিমার মার মৃত্যুর পর, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, কেহ তাহা জানে না। তারপর কত খোঁজ করিয়াছি, কত দেশ বিদেশ ঘুরিয়াছি কিন্তু নীলিমার আর উদ্দেশ পাই নাই। জানিনা কোন অজানা পথে সে কলসী কাঁখে জল আনিতে যায়, আর থাকিয়া থাকিয়া অতীতস্মৃতির পানে ফিরিয়া চায়। জানিনা সে এই এক নিশীথের অতিথির কথা স্মরণ করে কিনা—তবে সেই দুর্য্যোগ রাত্রির অপূর্ব্ব আলো-ছায়া, সেই অনুপমা রূপসীর আলো-ছায়ার সঙ্গে মিশে এখনও মনকে ঘিরে রেখেছে।"

নীপেশ থামিল। বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, তবে একটা উদাস হাওয়া আমাদের প্রাণটাকে কাঁপিয়ে বহিয়া গেল আর বাইরের হেনা ঝাড়ের মদির গন্ধে ঘরটাকে ভরিয়া ফেলিল।

মায়ের দরদ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৯)

পাঠকের স্মরণ আছে যে তে-মোহনার চরের মোড়ল রহিম খাঁর বাটীতে এক পরামর্শ বৈঠক বসিয়াছিল। টেঁপাকে লইয়া কি করা যাইবে ইহাই ছিল বৈঠকের আলোচ্য বিষয়। রহিম ও তাহার সঙ্গীগণ অনেক বাক্-বিতণ্ডার পর স্থির করিল যে আপাততঃ যখন ছোকরার মরিবার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না, বরঞ্চ সারিয়া উঠিবারই লক্ষণ দেখা যাইতেছে তখন আরও দু' একদিন চুপ করিয়া থাকা যাক, দেখা যাক কি হয়। ছোকরা যদি ভাল হইয়া উঠে তবে পূর্ব্ব পরামর্শ মত তাহাকে নবীর চরে লইয়া যাইয়া মাণিকের উপর আর এক চাল দেওয়া যাইবে। তবে একটা কথা এই যে উহাকে আর তে-মোহনার চরে রহিমের বাটীতে রাখা আর নিরাপদ নয়। সত্য বটে যে রাজাবাড়ীর বাবুরা পুলিসকে হাতে রাখিয়াছেন, আর পুলিসের গজেন্দ্র-গমনও চির প্রসিদ্ধ—তথাপি বিশ্বাস কি,—যে কোন মুহূর্ত্তে দারোগাবাবু সাঙ্গোপাঙ্গসহ আসিয়া পড়িতে পারেন। অতএব অবিলম্বেই উহাকে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। তখন পরামর্শ চলিল উহাকে কোথায় লইয়া যাওয়া যায়। রহিমের ফুফুর বাড়ী রাজবাড়ীর সন্নিকট পদ্মার তীরস্থ কোন গ্রামে, স্থির হইল আপাততঃ উহাকে সেইখানে নিয়া রাখা হইবে।

পরের দিন হাটবার। রহিম ও তাহার সঙ্গীদের মধ্যে অনেককেই হাটে যাইতে হইবে। বিশেষ দিনের বেলা এ সকল কার্য্য করা নিরাপদ নহে। হাট হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে, অতএব স্থির হইল, হাট হইতে ফিরিয়া বিশ্রামান্তে আহারাদির পর রওনা হইতে হইবে। বলা বাহুল্য জটী পাগলী লয়লার মারফৎ অচিরেই এ সংবাদ জানিতে পারিল।

টেঁপা যতই আরোগ্যের পথে আসিতেছিল ততই অল্পে অল্পে নিজের অবস্থা উপলব্ধি করিতেছিল। জটী এবং লয়লাও তাহাকে কতক কতক বলিয়াছিল এবং সে যেন কোনরূপ সাড়া-শব্দ করিয়া রহিমের বিরক্তি উৎপাদন না করে সে বিষয়েও সতর্ক করিয়া দিয়াছিল।

কয়েক দিনের পর সেদিন টেঁপা অঘোরে ঘুমাইতেছিল, সে রাত্রিতে তাহার সে গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিবার কোনই সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। রহিমদের বৈঠক যখন ভাঙ্গিল তখন রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর। তাহার খানিকক্ষণ পরে লয়লা আসিয়া জটীকে বৈঠকের স্থিরীকৃত সংকল্পের সংবাদ দিয়া গেল। জটী সে রাত্রির মত টেঁপার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইল। তখন সে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বাড়ীর দিকে চলিল।

পাঠকের স্মরণ আছে যে জটীর কুটীর তে-মোহনার চরের একপ্রান্তে অবস্থিত। সে বাড়ী গিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া ছেঁড়া পাটীখানা বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া নিদ্রার আয়োজন করিল। কোন বিষয়ে দুশ্চিন্তা করা জটীর কোষ্ঠীতে লেখে না। আজ রাত্রির মত টেঁপার সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত—কাল কি হইবে সে ভাবনা কাল, অতএব তাহার নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ছিল না, কিন্তু কি জানি কেন তাহার নিদ্রা আসিল না, তাহার নিমীলিত চক্ষুর সম্মুখে সেই লক্ষ্মীছাড়া আত্মীয়-স্বজনহারা আহত রুগ্ন ছেলেটার মুখখানি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে মনে মনে টেঁপাকে নরকে যাইবার উপদেশ দিয়া উঠিয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া খানিকক্ষণ ছটফট করিবার পর যখন তাহার খেয়াল হইল যে আপাততঃ হাতে কোন কাজ নাই তখন সে সেই ক্ষুদ্র উঠানটুকুর মধ্যে ক্রমাগত পায়চারী করিতে লাগিল।

জটীর বাড়ীতে আর কোন লোক না থাকিলেও সে নিঃসঙ্গ ছিল না, তাহার একটী পোষা কুকুর ছিল। কুকুরটী নিতান্ত

শিশুকাল হইতে তাহার নিকট বাস করিয়া তাহার অভ্যাস সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিল। সে জানিত মাসের অর্দ্ধেক দিন জটীর হাঁড়ী চড়ে না—সে এর ওর তার বাড়ী যাইয়া আহার করিয়া আসে। কাজে কাজেই সেই নিতান্ত প্রভুভক্ত বুদ্ধিমান সারমেয় নন্দনও মুনিবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আহার কার্য্যটা পরের আস্তাকুড়েই সম্পন্ন করিত। কার্য্য শেষ হইলে কিন্তু আর সে পরের বাড়ীতে থাকা মোটেই পছন্দ করিত না অবিলম্বে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিত, তা তাহার মুনিব বাড়ীতে থাকুক কি না থাকুক। এহেন সারমেয় কুলপ্রদীপ জটীর সেই পোষ্যপুত্র সম্প্রতি দাওয়ার একপার্শে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল। বোধ হয় সে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। হয়তো বা নিদ্রার ঘোরে পূর্ব্বজন্মের সুখস্মৃতির স্বপ্ন দেখিতেছে। সহসা তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, পরম নিশ্চিন্ত ভাব দূর হইল, সে মাথা তুলিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "ঘেউ! তৎপর উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত্ত শুনিবার পর সে আর দাওয়ার উপর থাকিতে পারিল না, একলম্ফে উঠানে নামিয়া জটীর পায়ের কাছে আসিয়া বিকট স্বরে ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। জটী এতক্ষণ উঠানে পায়চারী করিতে করিতে আনমনে আপন গোষ্ঠীর মাথামুণ্ডু বকিতেছিল, সহসা তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হওয়াতে সে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া পোষ্য-পুত্রকে একটা কুৎসিৎ গালি দিয়া মারিতে গেল। সারমেয় নন্দন কিন্তু ইহাতেও নিবৃত্ত হইল না, ক্রমাগত ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। জটী আশ্চর্য্য হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল, কিন্তু কিছু দেখিতে পাইল না। সহসা যেন মানুষের পদশব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সারমেয় নন্দন তত্ক্ষণে তাহার পরিধেয় বস্ত্রের এককোণ কামড়াইয়া ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়াছে। জটী তাহার নির্ব্বাক অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া এক বৃহৎ যষ্ঠি লইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল।

তখন রাত্রি শেষ হইতে অল্প সময় বাকী আছে। জ্যোৎস্নালোকে চারিদিক উদ্ভাসিত। কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখা যায় অল্প দূরের বস্তু অস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। কুকুর জটীকে [illegible] ঝোপঝাড় বনের দিকে লইয়া যাইতে লাগিল। অল্পদূর যাইয়া জটী থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্নালোকে সে দেখিল সম্মুখে দুই নারীমূর্ত্তি। কয়েক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, সেই দুই নারীমূর্ত্তিও বালুকায় প্রোথিত কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ নিশ্চল রহিল।

পাঠকের অবশ্যই বুঝিতে বাকী নাই এই দুই আগন্তুক নারী কে। ইহারা পীনা এবং টেঁপার মাতা। অন্যলোক হইলে হয় তো ভয়পাইয়া চেঁচামেচি করিয়া একটা গোল বাধাইয়া বসিত, কিন্তু জটী তাহা করিল না। সে তাহাদের সম্মুখীন হইয়া কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—"তোমরা কে?" পীনা কিম্বা টেঁপার মাতা কেহই সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না। জটী পুনরায় অধিকতর কর্কশস্বরে বলিল—"শীঘ্র বল্ তোরা কারা। নতুবা এই লাঠীর একঘায়ে মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।" পীনা ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—"আমরা নবীর চর হইতে আসিয়াছি।" জটীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। পীনা যদি বলিত—"আমরা আকাশ হইতে নামিয়া আসিয়াছি তাহা হইলেও বোধ হয়, সে এতদূর বিস্মিত হইত না। কায়দার তেমোহনার চরের লোকেরা যে নবীর চরের লোকের কাঁচা মাথা চিবাইয়া খাইতে চায়, সেই নবীর চরের দুইটী নিঃসহায় অবলা কিনা এই রাত্রিকালে তেমোহনার চরের মাটীতে পা দিয়াছে! ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় আর কি আছে? জটী পাগলী ছিটগ্রস্থ হইলেও স্ত্রীলোক। তাহার মধ্যেও নারীর চিরপ্রসিদ্ধ কৌতুহলের অভাব ছিলনা, তাহার কৌতুহল তাহার বিস্ময়কে চাপাইয়া উঠিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল, নিশ্চয় এই দুইটী নারীর পশ্চাতে উপযুক্ত রক্ষক আছে, নিশ্চয় ইহারা কোন গূঢ় উদ্দেশ্য লইয়া আসিয়াছে, নিছক বায়ু সেবনের উদ্দেশ্যে আসে নাই। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমরা কি চাও?"

পীনা। আমাদের একটী লোক—

টেঁপার মাতা কথাটা শেষ হইতে দিল না। হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া জটীর পা দুইটা জড়াইয়া ধরিল, কহিল—"আমার ছেলে—আমার ছেলে।"

জটী কিছুই বুঝিতে পারিল না, বলিল—তোমার ছেলে কি?"

পীনা। তাহাকে এখানকার লোকেরা ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে।

টেঁপার মাতা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ,—তাহার মাথায় ইহারা লাঠী মারিয়াছিল, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল, আমি তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলাম। তারপর ইহারা আমার মাথায় লাঠী মারিয়া আমাকে অচেতন করিয়া ফেলিয়া বাধিয়া আমার কোল থেকে বাছাকে আমার কাড়িয়া আনিয়াছে।"

এইবার জটীর মনের অন্ধকার কক্ষ আলোকিত হইয়া উঠিল। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে সে টেঁপার মাতার সহিত কথা কহিতেছে। তথাপি সাবধানের মার নাই। কি জানী যদি পুলিশের গুপ্তচরই হয়। বলা তো যায় না। শত্রুর দেশের লোককে সহসা বিশ্বাস করা কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। সে ইহাদিগকে আরও ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইবার জন্য বলিল—"সে ছেলেটা তো মরিয়া গিয়াছে, তাহাকে ইহারা পদ্মার জলে ফেলিয়া দিয়াছে।" টেঁপার মাতার কলিজার ভিতর কে যেন একটা তীক্ষ্ণধার কুঠার দিয়া নিদারুণ আঘাত করিল। তাহার মাথাটা ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, চোখের সম্মুখে পীনা, জটী সেই কশাড় বণ অদূরে সেই জ্যোৎস্নালোকিত উচ্ছলিত গলিত রজত সমুদ্রের মত পদ্মার তরঙ্গায়িত চঞ্চল জলরাশি আকাশে চন্দ্র ও তারকা-মণ্ডল সব ম্লান হইয়া অন্ধকার হইয়া গেল। তাহার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল এক মর্ম্মভেদ অস্ফুট আর্ত্তনাদ—মা গো! সে ছিন্নমূল দ্রুমের ন্যায় ভূপতিত হইল।

আশায় মানুষ জীবন ধারণ করে। এক মাত্র টেঁপা ভিন্ন এ সংসারে অভাগিনীর সুখশান্তি আশা ভরসা আকাঙ্খা আর কি আছে। যখন সে তাহাকে ফিরিয়া যাইবার আশা করে নাই তখন সে বাঁচিতেও চাহে নাই, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। তারপর পীনার কথায় তাহার আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সে বিশ্বাস করিয়াছিল যে টেঁপা বাঁচিয়া আছে, তাই সেও বাঁচিতে চাহিয়াছিল, যে লোকে টেঁপা নাই, সেখানে সে যাইতে চাহে নাই আর এখন?

পীনার মুখেও কোন কথা ছিল না। সে সংসারানাভিজ্ঞা বালিকা, শৈশব হইতে এযাবৎকাল মনের আনন্দে কাটাইয়াছে। কয়েকদিন আগেও টেঁপাকে হারাইবার আগে টেঁপার মাতার প্রাণের সহিত তাহার প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে সে দুঃখের বার্ত্তা জানিত না এই কয়দিন ধরিয়া দুঃখের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে, এই কয়দিনে সে অনেক শিখিয়াছে। দুঃখ এবং অভিজ্ঞতার মত শিক্ষক সংসারে কে আছে? উন্মুখযৌবনা বালিকার কোমল প্রাণের মত নূতন বীজ এত সহজে আর কোথয় অঙ্কুরিত হয়?

টেঁপার মাতার অবস্থা দেখিয়া পীনার ছোট বুকটা ফাটিয়া গেল, কিন্তু মুখ দিয়া কথা সরিল না। সে স্থান কালপাত্র বিস্মৃত হইল। টেঁপাকে ভুলিল, নিজেদের ভুলিয়া গেল, ভূমিতলে বসিয়া পড়িয়া টেঁপার মাতার মাথাটী কোলে লইয়া মুখ নত করিয়া বাষ্পরুদ্ধ গদগদ কণ্ঠে তাহার কাণের কাছে ডাকিল—মা! "মা! মা!" সে কাতর আহ্বানের সঙ্গে পীনার প্রাণটা গলিয়া বাহির হইতেছিল।

টেঁপার মাতার বোধ হয় মনে হইল যে তাহার নয়নের মণি টেঁপা ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার কাণের কাছে কাতর কণ্ঠে ডাকিতেছে "মা! মা! মা!" সে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পীনাকে বুকে চাপিয়া ধরিল, চক্ষু বুঝিয়া আপন মনে বার বার বলিতে লাগিল "টেঁপা! বাপ আমার!"

জটী এতক্ষণ একটীও কথা কহে নাই, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ইহাদের কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছিল। এইবার কহিল,—"তোমার টেঁপা বাঁচিয়া আছে। কিন্তু তোমরা তাহাকে পাইলেই বা কি করিবে?"

পীনা টেঁপার মাতার বাহুবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া কহিল,—"কেন, তাহাকে নৌকায় তুলিয়া বাড়ী লইয়া যাইব।"

টেঁপার মাতা কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে পীনার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল,—"হ্যাঁ তাহাকে বাড়ী লইয়া যাইব।"

জটী। তোমরা তো দেখিতেছি দুইটী সহায়হীনা অবলা। তোমাদের সঙ্গে পুরুষ মানুষ কেহ আছে?"

টেঁপার মাতা। না।

জটী। তবে তোমরা পদ্মার উপর দিয়া এতটা পথ কেমন করিয়া যাইবে?

পীনা এই দুঃসময়েও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না।

কহিল—"যেমন করিয়া আসিয়াছি। উজান বাহিয়া আসিয়াছি আর ভাটী বাহিয়া যাইতে পারিব না ?"

জটী প্রশংসমান দৃষ্টিতে পীনার মুখের দিকে চাহিল—তারপর একটু ভাবিয়া কহিল—"তাহাকে বহিয়া আনিয়া নৌকার তুলিতে পারিলে তোমরা নিরাপদে তাহাকে বাড়ী নিয়া পৌঁছাইতে পারিবে তাহা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু তাহাকে আনা যাইবে কেমন করিয়া ? যেখানে সে আছে তাহাকে বাঘের বাসা বলিলেই হয়।"

পীনা। তাহা তো জানি না।

টেঁপার মাতা পুনরায় জটীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তুমি উপায় কর। তুমি তাহাকে আনিয়া দাও। তুমি কে তাহা জানি না। তোমার কথা শুনিয়া শুধু এইটুকু বুঝিতে পারিয়াছি যে তোমার প্রাণ আছে, সে প্রাণ দিয়া তুমি মায়ের প্রাণ বুঝিতে পার। তোমার নিজের ছেলে আছে কি না, তাও জানি না, কিন্তু তুমিও তো এককালে মায়ের কোলে ছিলে। আমি তাহার মা, তাহাকে হারাইয়া আমার প্রাণের ভিতর কি হইতেছে তাহা বুঝিয়া আমার প্রতি দয়া কর।" টেঁপার মাতা কাঁদিয়া ফেলিল, তাহার চোখের জলে জটীর পা ভিজিয়া গেল।

সেই ছিটগ্রস্ত জটী পাগলীর প্রাণের ভিতর কি হইল সে খবর আমরা রাখি না। কিন্তু একটা কিছু যে হইল তাহা নিশ্চয়। তা যদি না হইবে তবে তাহার কর্কশকণ্ঠে এত কোমলতা, এত মধু আসিল কোথা হইতে ? সে টেঁপার মাতার হাত ধরিয়া তুলিয়া কহিল—"তুমি একটু স্থির হও। অমন পাগলাম করিলে কোন কাজ হইবে না। কেহ টের পাইলে তোমার ছেলে তো বাঁচিবেই না, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। আমি যাহা বলি মনোযোগ দিয়া শোন। রহিমের বাড়ীর পশ্চাদ্দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"তোমরা দুইজনে নৌকা লইয়া ঘুরিয়া ওইখানে যাও। ওইটা রহিম সর্দ্দারের বাড়ী। ওই বাড়ীতে টেঁপা আছে। তোমরা যাইয়া নৌকা লইয়া কশাড় বনের আড়ালে লুকাইয়া থাক। তারপর আমি নিজের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিয়া চেঁচামেচী করিতে থাকিব। তাহাতে গ্রামের সব লোক এখানে ছুটিয়া আসিবে। সেই সুযোগে আমি তোমার ছেলেকে তোমাদের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিব।"

টেঁপার মাতা। সেকি! তুমি নিজের হাতে নিজের ঘরে আগুন ধরাইয়া দিবে ?"

পীনা। তোমার ঘর পুড়িয়া গেলে তুমি থাকিবে কোথায় ?

এইবার জটীর ঘাড়ে পাগলামীর ভূত চাপিল। সে ভয়ানক রাগিয়া দাঁত খিঁচাইয়া কহিল—"আহা! কি আমার দরদী রে।" তাহার মুখ ছুটিল, সে পীনা ও টেঁপার মাতাকে মনের সাধে গালি পাড়িয়া স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার আদেশ পালন না করে তবে সে তৎক্ষণাৎ লোকজন ডাকিয়া তাহাদিগকে ধরাইয়া দিবে, তাহাদের বুজরুকী ভাঙ্গিয়া দিবে। যাহার ঘর সে যদি নিজে উহা পোড়াইয়া দেয় তাহাতে অপর কাহারও বাপের ধন সাপে খাইবে না।

পীনা কিম্বা টেঁপার মাতা কাহারও সাহস হইল না যে জটীর কথার উপর কথা কহে। তাহারা অবিলম্বে নৌকাখানাকে ঘুরাইয়া রহিমের বাটীর পশ্চাদ্দিকে চলিল। জটী যখন বুঝিল উহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পৌঁছিয়াছে তখন সে নিজের ঘরের মটকার আগুন ধরাইয়া দিল। পাগল আর কাহাকে বলে ? পাঠক, পরের ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য নিজেরি ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়, এমন পাগল কখনও দেখিয়াছেন কি ?

(১০)

রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। তে-মোহনার চরের লোকেরা কেহ কেহ তখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, কেহ বিছানায় পড়িয়া আড়মোড়া ভাঙ্গিতেছে, কেহ উঠি উঠি করিতেছে, কেহ বা উঠিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। জটীর চেঁচামেচী শুনিয়া সকলে বাহিরে আসিয়া দেখিল জটীর খড়, বাঁশ ও হোগলা নির্ম্মিত কুটীরখানা দাউ দাউ করিয়া জলিতেছে। সকলে ছুটিয়া আসিয়া আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তখন বৈশাখ মাস। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে গ্রামের সকল ঘরগুলিই বারুদের ন্যায় দাহ্য হইয়া রহিয়াছে। সেই সময়

পদ্মার চরে পবন দেবের প্রবল প্রতাপ। তাঁহার সখা অগ্নিদেব মুখরোচক লঘুপাক খাদ্য পাইয়া মনের আনন্দে ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এ সংবাদ পাইয়া তিনি কি আর স্থির থাকিতে পারেন, একেবারে উনপঞ্চাশ ভাই একযোগে আসিয়া হাজির হইলেন, সখার শ্রম লাঘব করিবার নিমিত্ত প্রবল বেগে ব্যজন করিতে লাগিলেন। চারিদিকে বড় বড় ফিন্‌কি উড়িতে লাগিল। সকলে সভয়ে দেখিল সর্ব্বনাশ উপস্থিত। যাহার চালে একটী ফিন্‌কি পড়িবে তাহার মাথা গুঁজিবার ঠাঁই থাকিবে না। জটীর ঘরের পাশেই কশাড় বন। সেই কশাড় বনও তখন রৌদ্রের তেজে শুষ্ক তৃণে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। যদি কোনমতে কশাড় বনে আগুন ধরিয়া যায় তবে আরও বিপদ, কাহারও কিছু রক্ষা পাইবে না।

আগুন নিবাইতে হইলেই জল চাই। পদ্মায় জলের অভাব ছিল না, কিন্তু জল আনিবার পাত্র তো চাই। তখনকার দিনে মৃতকলসীই তে-মোহনার চরের অধিবাসীদের একমাত্র জলপাত্র ছিল, তাহাও কাহারও ঘরেই দুই তিনটীর বেশী থাকিত না। আগুনের তেজ ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। তখন যাহাদের বাড়ী কাছে তাহারা নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইয়া চালের উপর উঠিয়া, কেহ কেহবা ভিজা কাঁথা বিছাইয়া দিয়া আত্মরক্ষায় মনোনিবেশ করিল, কয়েকজন কলসীর সন্ধানে গেল আর বাকী সকলে সেইখানে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতে লাগিল। রহিমের বাড়ী সেখান হইতে কিছু দূরে, তাহার ভয়ের বিশেষ কারণ ছিল না, সে সেইখানে দাঁড়াইয়া খামখা সকলের উপর তম্বি করিতে লাগিল। জটীকে কেহ দেখিতে পাইল না, কেহ খুঁজিলও না।

লয়লা নিজের বাটীর উঠানে দাঁড়াইয়া দেখিল জটীর ঘর পুড়িতেছে। তাহার বড় দুঃখ হইল। একবার ভাবিল সেও ছুটিয়া যায়। কিন্তু সে স্ত্রীলোক, গোটা বাড়ীটা খালি রাখিয়া এত পুরুষের মাঝখানে যাইয়া সে কি করিবে? আহা! জটী দুঃখী মানুষ, তাহার কেহ নাই, তাহার ঘরখানি পুড়িয়া গেল, ছেঁড়া-খোড়া পাটী, বালিস, কাঁথা যাহা ছিল তাহাও গেল—সে কোথায় থাকিবে? লয়লা এইসব ভাবিতেছিল, এমন সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে জটী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে লয়লাকে কিছু বলিবার কিম্বা জিজ্ঞাসা করিবার অবকাশ দিল না—শুধু বলিল—"শীগ্‌গির আয়।" এই বলিয়া তাহার কাপড় ধরিয়া টানিতে টানিতে গোয়াল ঘরে লইয়া গিয়া টেঁপাকে ধরিয়া তুলিতে বলিল। লায়লা কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। জটী অন্ধকারে গরুর খোঁটা পুতিবার একটা মুগুরের উপর পা রাখিয়াছিল, তাড়াতাড়ি সেটা তুলিয়া লায়লার মাথায় ঠেকাইয়া বলিল—"আমার হাতে কি আছে দেখেছিস? একটা মুগুর। যদি আমার কথা না শুনিস তবে ইহার এক এক আঘাতে তোকে এবং ইহাকে দু'জনকেই জাহান্নামে পাঠাইব।—নে ধর তোল।" লায়লা জটীকে ভালরূপই জানিত। সে বিনা বাক্যব্যয়ে জটীর আদেশ পালনে তৎপর হইল। দু'জনে মিলিয়া টেঁপাকে তুলিয়া লইয়া চলিল।

আগুনের গোলমালে টেঁপার ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল, কিন্তু সে কিছু বুঝিতে পারিতেছিল না। তারপর নিজেকে উত্তোলিত হইতে দেখিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেল। এ আবার কোন নূতন বিপদ উপস্থিত মনে করিয়া যথেষ্ট ভীতও হইল। কিন্তু যে নিজে উত্থানশক্তি রহিত, বিপদের স্রোতে গা ভাসাইয়া দেওয়া ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর কি? অতএব সে চুপ করিয়া রহিল। জটী এবং লায়লা সকলের অজ্ঞাতসারে তাহাকে পীনাদের নৌকায় তুলিয়া দিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পীনা ও টেঁপার মাতা খোদাকে ধন্যবাদ দিয়া, জটীকে ও লয়লাকে বহুত বহুত সেলাম করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। ক্ষুদ্র তরণী যেন প্রাণ পাইয়া ঢেউয়ের কোলে নাচিতে নাচিতে স্রোতের বেগে ও পীনার ক্ষেপণী চালনায় নবীর চরের দিকে ছুটিয়া চলিল।

জটীর ঘর পুড়িয়া নিঃশেষ হইতে পাঁচ সাত মিনিটের বেশী সময় লাগে নাই। গ্রামবাসীর সৌভাগ্যবশতঃ প্রতিবেশী কাহারও কোন অনিষ্ট হয় নাই, কশাড় বনেও আগুন ধরে নাই। কিন্তু সকলের অজ্ঞাতে একটী ফিন্‌কি উড়িয়া আসিয়া রহিমের শয়ন ঘরের চালে পড়িয়াছিল। একটু কাল ধুঁয়াইয়া সহসা উহা দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তখন সকলে ছুটিয়া আসিল, কিন্তু রহিমের গৃহ কোনমতেই রক্ষা পাইল না, দেখিতে দেখিতে সকলের চোখের সম্মুখে উহা ভস্মস্তূপে

পরিণত হইল। রহিম কপালে করাঘাত করিয়া হায় হায় করিতে লাগিল।

(১১)

পীনা বাড়ী ফিরিয়া যখন শুনিল যে তাহার পিতাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তখন তাহার মনের ঠিক কি অবস্থা হইল তাহা ভাষায় বুঝান যায় না। বৎস হারা গাভীর উপমা আমরা যত্র তত্র দেখিতে পাই কিন্তু সদ্যপ্রসূত বৎসকে দেখিতে না পাইলে গাভীর মনের অবস্থা সত্য সত্যই কিরূপ হয় তাহা কে বলিতে পারে? অবশ্য করিমও বৎস নয়, পীনাও প্রসূতী গাভী নয়—কিন্তু ইদানিং উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা সেইরূপই দাঁড়াইয়াছিল। পীনা প্রতিবেশীদের নিকট সমস্ত ব্যাপারটার বিস্তারিত বিবরণ শুনিল, কিন্তু একটীও কথা বলিল না, কিম্বা একফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না, চুপ করিয়া দাওয়ায় বসিয়া গালে হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল।

পীনা অনেক ভাবিল কিন্তু কূল-কিনারা কিছু দেখিতে পাইল না। যখন টেঁপাকে পাওয়া যায় নাই তখন সে এবং টেঁপার মাতা অনুমান করিয়া লইয়াছিল যে তাহাকে তে-মোহনার চরের লোকেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া সেই দুইটী অনন্য সহায়া নারী কাল-বৈশাখীর কালছায়া মাথায় করিয়া একখানি ক্ষুদ্র তরণী বাহিয়া ভ্রূকুটী ভীষণা পদ্মার বুক চিরিয়া সেই শত্রুপুরীতে যাইতেও পশ্চাদপদ হয় নাই। সেই পীনা কিন্তু পিতাকে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া বসিয়া রহিল, তাহাকে মুক্ত করিবার কোনই পন্থা খুঁজিয়া পাইল না। সেকালে নবীর চরের মত স্থানের নিরক্ষরা কৃষক বালিকার কাছে পুলিস এবং যম একার্থবাচক ছিল। বরঞ্চ পদ্মার প্রবাহ মধ্যে একটা কুম্ভীরের মুখ হইতে একটা মানুষকে উদ্ধার করিয়া আনা সম্ভব কিন্তু পুলিশের গ্রাস হইতে—ওরে বাপরে! তাও কি হয়! তবে হ্যাঁ একটা কথা সে শুনিয়াছিল—সব রোগেরই যেমন ওষুধ আছে, তেমনি পুলিশ-আক্রমণেরও একটা দাওয়াই আছে। সে দাওয়াই আর কিছু নয়—টাকা—কড়্‌কড়ে নগদ টাকা। কিন্তু পীনা টাকা কোথায় পাইবে? তাহার পিতা নিজে প্রাণের দায়ে নবীর চরের অধিবাসীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারে নাই, তাহা সে একফোঁটা মেয়ে কোথায় পাইবে?

সহসা পীনা শুনিল দেদার বক্স খালি নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। সে যে বন্দরে কিস্তি খালাস করিয়া নূতন মাল খরিদ করিতে যাইতেছিল, তথায় তাহার এক প্রতিবেশীর জনৈক আত্মীয়ের নিকট হইতে গ্রামের এই বিপদের কথা, এবং তাহার পিতা ও ভ্রাতার অবস্থার কথা শুনিতে পায়। তাই সে মাল খরিদ না করিয়াই চলিয়া আসিয়াছে। পীনার বুঝিতে বাকী রহিল না যে দেদার বক্সের নিকট টাকা আছে। কিন্তু সে যে প্রকৃতির লোক তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না। সে যে তাহাকে তাহার পিতার মুক্তি ক্রয় করিয়া দিবে এমন আশা সে করিতে পারিল না। তথাপি মজ্জমান ব্যক্তি যেমন তুচ্ছ তৃণখণ্ডও আঁকড়িয়া ধরে সেও তেমনি দেদার বক্সের করুণা ভিক্ষা করিতে চলিল।

দেদার বক্স স্নেহ মমতার ধার যতটা ধারুক আর না ধারুক, ঝঞ্ঝাট মোটেই পছন্দ করিত না। সে ইহাও বুঝিত যে সংসারে বাস করিতে গেলে মানুষকে কতকগুলি ঝঞ্ঝাট ঘাড় পাতিয়া লইতেই হয়, অন্য উপায় নাই। তাই সে যখন মাণিক ও কাদেরের অবস্থার কথা শুনিল তখন কতকগুলি নাহক ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে চাপিল ভাবিয়া সে বেশ একটু শঙ্কিতই হইয়াছিল। প্রথম ঝঞ্ঝাট উহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। নবীর চরের মত জায়গায় কাহারও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে হইলে বিশেষ আয়াস স্বীকার করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় ঝঞ্ঝাট উহারা যদি দীর্ঘকাল শয্যাগত থাকে তবে চাষ আবাদ, মুনিব বাড়ী যাতায়াত, কাজ-কারবার প্রভৃতি সকল কার্য্য একা তাহাকেই করিতে হইবে। তৃতীয় ঝঞ্ঝাট, যদি উহারা না বাঁচে তবে দ্বিতীয় দফার সবগুলি ঝঞ্ঝাট তাহার ঘাড়ে আমরণকাল কায়েম হইয়া থাকিবে, কেননা টেঁপাকে দিয়া যে কোনকালে সংসারের কিছু কাজ পাওয়া যাইবে সে আশা দুরাশা মাত্র।

এ হেন দেদার বক্স যখন বাড়ী আসিয়া মাতার নিকট শুনিল যে শুধু মাণিক ও কাদের নয়, টেঁপাও শয্যাগত তখন সে নিজেকে নিতান্তই নিরুপায় বিবেচনা করিল। কিন্তু স্বচক্ষে উহাদের অবস্থা দেখিয়া তাহার সেভাব কাটিয়া গেল।

সে দেখিল তিনজনেই অনেকটা সুস্থ হইয়াছে—যদিও বিছানা হইতে উঠিয়া হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইবার কিম্বা বেশী কথা কহিবার শক্তি কাহারও নাই। সে বুঝিল, যে উহাদের জন্য নূতন করিয়া কোনরূপ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে না—উহারা শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিবে। সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া স্নানাহার সারিয়া দাওয়ায় বসিয়া তাম্রকুট সেবনে মনোনিবেশ করিল।

করিমকে যে পুলিশে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে তাহা টেঁপার মাতাও শুনিয়াছিল। সে চুপ করিয়া বসিয়া মনে মনে নিজের কিস্‌মৎকে ধিক্কার দিতেছিল। সে অভাগিনী নারী, সহায় সম্বলহীনা, ঈশ্বর তাহাকে কোন শক্তিই দেন নাই। যে পীনা তাহার টেঁপাকে উদ্ধার করিবার জন্য নিজের জীবনকেও বিপন্ন করিতে এতটুকু দ্বিধা করে নাই, তাহার পিতাকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য সে কিছুই করিতে পারিল না। এই চিন্তা অভাগিনীর বুকে শেলের মত বাজিতেছিল।

পীনা যখন তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ন। একে তে-মোহানার চরে যাতায়াতের সময় পথে যথেষ্ট পরিশ্রম ও কষ্ট হইয়াছে, তাহার উপর এই আকস্মিক বিপদ। একরত্তি মেয়ে আর কত সহিতে পারে? টেঁপার মাতা দেখিল তাহার মুখ শুখাইয়া গিয়াছে, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে; চুল রুক্ষ, সর্ব্বাঙ্গ ধূলি-মলিন। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে পীনা তখনও মুখে জল দেয় নাই। তাহাকে দেখিয়া টেঁপার মাতার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার ঘরে জল দেওয়া ভাত ছিল। সে পীনাকে আহারের জন্য অনেক সাধাসাধি করিল, কিন্তু পীনা কিছুতেই খাইতে চাহিল না। সে দৃঢ়ভাবে বলিল—"যদি বাবাকে ফিরিয়া পাইবার কোন উপায় হয় তবেই আবার ভাত খাইব, নতুবা এ পৃথিবীর খাওয়া পরা আমার শেষ হইয়া গিয়াছে।

টেঁপার মাতার মনে পড়িল—টেঁপাকে হারাইয়া তাহারও মনের অবস্থা ঠিক এইরূপই হইয়াছিল, পীনা তাহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিলে সেও তাহাকে এমনি একটা উত্তর দিয়াছিল। তাহার মনে পড়িল তাহার নিজের মনের ঐ অবস্থায় অনাহারে প্রাণত্যাগের দৃঢ় সঙ্কল্প সত্ত্বেও পীনা নিজের কাজ ভোলে নাই, টেঁপাকে ফিরাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহাকে আহার করাইয়াছিল। সে অঙ্গীকার পীনা পালন করিয়াছে,—টেঁপাকে সেই ফিরাইয়া আনিয়াছে। পীনা অল্পবয়স্কা বালিকা হইলেও তাহার সাহস বুদ্ধি ও বলের দশ ভাগের একভাগও তাহার নিজের নাই। হায়! সেও যদি তেমনি পীনাকে আহার করাইতে পারিত, তেমনি তাহার পিতাকে ফিরাইয়া দিবার অঙ্গীকার করিতে পারিত, তেমনি সে অঙ্গীকার রাখিতে পারিত।

পীনা কহিল—"মা! আমার বাবাকে ফিরাইয়া আনিবার এক ভিন্ন দ্বিতীয় উপায় আমি দেখিতে পাইতেছি না। আর সে উপায় তোমার বাড়ীতেই আছে।"

টেঁপার মাতা আশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করিল—"কি?"

পীনা। আমি শুনিয়াছি, পুলিস টাকার জন্য সব করিতে পারে। কোন রকমে কিছু টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে আমার বাবাকে বাঁচান যায়।

টেঁপার মাতা। কিন্তু টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? স্ত্রীলোককে কে টাকা ধার দিবে?

পীনা। দেদার বক্সের কাছে টাকা আছে, সে দিলে দিতে পারে।

দেদার বক্স যে টাকা দিবে এমন আশা খুব জোর করিয়া তাহার মাতাও করিতে পারিল না তথাপি সে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে একটু ক্ষীণ আলো দেখিতে পাইল। সে দেদার বক্সকে কাছে ডাকিয়া প্রচুর ভণিতা সহকারে টেঁপার উদ্ধার বৃত্তান্ত এবং পীনা যে নিজেকে কিরূপ বিপন্ন করিয়া তাহাদের কতখানি উপকার করিয়াছে সে কাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়া পীনার বর্ত্তমান বিপদের কথা কহিল। এ বিপদে পীনাকে সাহায্য করা যে আহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে গুনাহ্‌গারীর চরম হইবে তাহাও তাহাকে বিধিমতে বুঝাইয়া দিল। দেদার বক্স এ পর্য্যন্ত সব কথা বেশ নির্ব্বিকার ভাবে শুনিয়া যাইতেছিল। এইবার তাহার মাতা টাকার কথা বলিল। সে দেখিল আর এক নূতন ঝঞ্ঝাট উপস্থিত। কিন্তু প্রকাশ্যে মাতার কথার প্রতিবাদ করিল না, শুধু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তাঁহার মাতা কিয়ৎক্ষণ তাহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া

পরে জিজ্ঞাসা করিল—"কি ভাবিতেছ? এখন ভাবিবার সময় নাই। ঘরে আগুন লাগিলে অবিলম্বে জল দিতে হয়, তখন চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিলে চলে না।"

দেদার বক্স। তাইতো টাকা কেমন করিয়া দেওয়া যায়? বা'জান কি বলিবে?

মাতা। যাহা বলে বলিবে। আমি তোমার মা, আমি বলিতেছি—

দেদার। তুমি মেয়েমানুষ, তুমি তো বলিয়া খালাস। তারপর যখন তাহারা ভাল হইয়া টাকার কথা জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কি বলিব?

মাতা। বলিবে, টাকা চুরী হইয়া গিয়াছে। এমন অবস্থায় মিথ্যা কথা বলিলে পাপ নাই।

দেদার। পাপ পুণ্যের কথা আমি ভাবিতেছি না। আমি ভাবিতেছি বাপজানের কথা আর বড় ভাইয়ের কথা। তাহাদিগকে তুমিও জান, আমিও জানি। তুমি কি মনে কর, আমি যদি বলি টাকা চুরী হইয়া গিয়াছে তবে তাহারা আমাকে আস্ত রাখিবে?

এইবার পীনা কথা কহিল। সে খুব জোর করিয়া দেদার বক্সকে বলিল,—"আমার বাবার জন্ত তোমার যে টাকা খরচ হইবে, তোমার বাপ এবং বড় ভাই ভাল হইয়া তাহার কৈফিয়ৎ চাহিবার পূর্ব্বে তাহা আমি তোমাকে ফিরাইয়া দিব।" দেদার বক্স এমন আশ্চর্য্য কথা তাহার জীবনে শোনে নাই। সে একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। পীনা তাহাকে টাকা ফিরাইয়া দিবে? এখন যদিও বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত লম্বা লম্বা কথা কহিতেছে, কিন্তু সে টাকা পাইবে কোথায়? পীনা পুনরায় কহিল—"তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? না হইবারই কথা। আমি একে স্ত্রীলোক, তাতে ছেলেমানুষ। কিন্তু আমি তোমায় কথা দিতেছি। আমি যাহাই হই, কথা দিলে সে কথা রাখিতে জানি। বিশ্বাস না হয় তোমার মাকে জিজ্ঞাসা কর।"

(ক্রমশঃ)
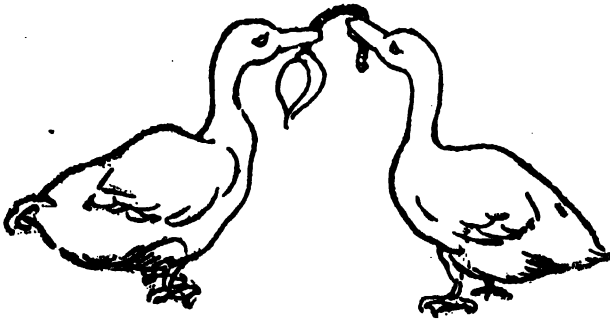
ভোলানাথের মুক্তি

(গল্প)

[শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী বি-এ]

ভূমিকা

সেদিন রবিবার। সকাল বেলায় সংবাদ পত্রখানি হাতে লইয়া চা'য়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে জার্ম্মাণীর সমস্যার কি করিয়া সমাধান করা যায় সেই সম্বন্ধে মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতেছি এমন সময় আমার বাল্যবন্ধু ভোলানাথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে একখানি পত্র হাতে করিয়া উপস্থিত। ঘরের ভিতর পদার্পণ করিয়াই ভোলানাথ বলিলেন, "ভাই, মুক্তির উপায় কি বল ?"

আমি তখন জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যাকুল হইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু ভোলানাথের সহসা আবির্ভাবে ও ঈদৃশ প্রশ্নে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মুক্তি কিহে ? হঠাৎ মুক্তিলাভের এমন উৎকট আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল যে ? দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বস, একটু চা'টা খাও।"

ভোলানাথ প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "না ভাই, আর চা'টা নয়, এ জীবন দুর্ব্বহ, দুঃসহ, বিপদসঙ্কুল ! তুমি আমার বাল্যবন্ধু, আজ মুক্তির একটা সহজ উপায় বলে দিয়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজ কর।"

ভোলানাথের এই মুমুক্ষু অবস্থা দেখিয়া আমি আর হাস্য-সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মুখের হাসি চোখে নাচাইয়া কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিলাম, "মুক্তি চাও, ভাল কথা। হঠযোগ সাধন ক'রে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত কর,—মুক্তি সহজেই মিলবে।"

ভোলানাথ বলিল, "নাহে না, আমি সে মুক্তির কথা বলছি না—"

আমি তাড়াতাড়ি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "না হয় গঞ্জিকা সেবন আরম্ভ কর, তারপর একটা সাধু সন্ন্যাসী জুটে গেলেই লোটা কম্বল নিয়ে এবার ৺পূজার ছুটীতে হরিদ্বার বেড়িয়ে এসো,—তা হলে অনেক তত্ত্বকথা জেনে আসতে পারবে। তখন যে কোন একটা পন্থা ধরলেই চলবে।"

ভোলানাথ এবার বড়ই চটিয়া গেল। বলিল—"দেখ, তোমার সব গুণ মাটী হয়েছে তোমার এই লঘুচিত্ততায়। কী বিপদে যে পড়েছি তা যদি বুঝতে তা হলে আর ঠাট্টা করতে না। আজ সাতদিন থেকে কেবল ভাবছি, কিন্তু কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছি নে। কি করা যায় বলত ? আপিসের হাড়-ভাঙা খাটুনিও আর পোষায় না,—ওদিকেও সংসার বন্ধন।"

আমি কহিলাম, "এ আর নতুন কথা কি ? এতে ভাববারই বা কি আছে ?"

ভোলানাথ চটিয়া কহিল,—"তুমি ত বেশ সোজা বলে দিলে এতে ভাববার কি আছে ! এই নাও, এই চিঠিখানা পড়ে দেখ, তা' হলেই সব বুঝতে পারবে। আমি এখন চললাম,—চিঠিখানা ভাল করে পড়ে বেশ ভেবেচিন্তে একটা মুক্তির উপায় ঠিক করে কালকেই আমায় জানিয়ো।"

এই বলিয়া পত্রখানি আমার হাতে দিয়া ভোলানাথ হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভোলানাথ চলিয়া যাইবার পর বড়ই উদাস হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম এমন মধুর, মোলায়েম কেরাণী বাঞ্ছিত রবিবারটি দার্শনিক তত্ত্বের গবেষণার মাঠে মারা যাইবে। ভোলানাথের "ফিলজফিতে" ভারী ঝোঁক। নিশ্চয় তার চিঠিতে ফিলজফির ব্যাপার কিছু আছে। চিঠিখানি খুলিয়া দেখিতে হঠাৎ সাহস হইতেছিল না,—না জানি ইহার ভিতর কি কঠিন দর্শনের কূট প্রশ্ন রহিয়াছে,—আমাকে আবার ইহার মীমাংসা করিতে হইবে। যাহা হউক, ভয়ে ভয়ে ছিন্ন খাম হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। দেখিলাম ভোলানাথের

স্ত্রী একটি সুদীর্ঘ তালিকাসহ পত্র লিখিয়াছেন। এই পত্রাঘাতেই বন্ধুবরের প্রাণে প্রবল বৈরাগ্য সঞ্চার হইয়াছে। এখন মুক্তি-প্রয়াসী না হইয়া আর অন্য উপায় নাই। স্ত্রী লিখিয়াছেন যে এবার ৺পূজার সময় সার্দ্ধ দুই বৎসরের কন্যার জন্য এক ডজন ভাল জামা চাই এবং তদুপরি দুই একখানি সোণার গহনারও নিতান্ত আবশ্যক—নহিলে না কি ভাল দেখায় না। পত্রপাঠ করিয়া বুঝিলাম যে বঙ্গললনা বেদান্ত দর্শনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। অলঙ্কার প্রভৃতি অসার অনিত্য বস্তুর প্রতি লালসা যে মুক্তির পরিপন্থী ইহা না বুঝিয়া তিনি ভোলানাথের বৈদান্তিক প্রাণে আঘাত করিয়াছেন। সেই জন্যই বন্ধুবর আমার নিকট মুক্তিলাভের উপদেশ চাহিয়াছেন।

উপদেশ আর কি দিব! রন্ধন নিপুণা কেরাণীকুল-বধূদিগকে কোনরকমে খুসী রাখিতেই হইবে,—নচেৎ তাঁহারা যদি বলিয়া বসেন যে আর বিনা তৈলে রন্ধন করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে মজিবে—কেরাণীকুল নিশ্চয় মজিবে। আমাদের গৃহিনীগণ বিনা তৈলে রহস্যময় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে পারেন বলিয়াই আমরা "বড়বাবু সম্প্রদায়ের" পদপল্লব মসৃন করিবার তৈল সঞ্চয় করিতে পারি, —নতুবা তৈলাভাবে চাকুরী ও সংসার এই দু'টি বস্তু একসঙ্গে বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিত। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে মুক্তি বিষয়ে ভোলানাথকে কোন উপদেশ দিতে পারিলাম না।

পাঠক পাঠিকাগণ, মার্জ্জনা করিবেন। আপনারা হয়ত ভাবিতেছেন, "গল্পের 'প্লট' কই? এ যে শুধুই ভূমিকা,—কেবল বাজে কথার সমষ্টি!" কিন্তু এ কথা মনে রাখিবেন যে 'প্লট' জিনিষটা গল্পের প্রধান অঙ্গ নহে। কথাই হইতেছে গল্প সাহিত্যের প্রাণ। কথাই মানবের জীবনীশক্তির পরিচায়ক,—কারণ, বোধ হয় অনেকেই জানেন যে মরিয়া গেলে মানুষ আর কথা বলে না। সুতরাং প্রথমেই গল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিলাম। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত 'প্লট' একটা নিশ্চয় দিব,—ছাড়িব না তবে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিতেছি উপসংহারে 'প্লট' জমাইবার বিশেষ চেষ্টা করিব। আর যদি শেষ পর্য্যন্ত তাহা খুঁজিয়া না পান তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই সমান দুর্ভাগ্য, এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য "সচিত্র শিশিরের।"

গল্পের ধারাবাহিক 'প্লট' দিতে হইলে ভোলানাথের বর্ত্তমান জীবনের পূর্ব্ব অধ্যায় কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং "দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ" লিখিতে বাধ্য হইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সে অনেকদিনের কথা। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট্ হইয়া ভোলানাথ সবে মাত্র বাহির হইয়া আসিয়াছে। "ফিলজফি"তে অনার্স ছিল বলিয়া সে কখনও ক্ষুদ্র ও সহজ ইংরাজী বলিত না। অতি কঠিন ও বড় বড় কথা বলিত। সেজন্য ছাত্র মহলে তাহার খুব নাম ডাক ছিল এবং কলেজের Debating Societyতে লম্বা লম্বা Speech দিয়া সহপাঠিগণের প্রশংসা লাভ করিয়া সে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। প্রফেসারগণ তাহাকে একটু বাতিকগ্রস্ত (eccentric) বলিয়া জানিতেন। কিন্তু যখন সে "ফিলজফি"তে অনার্স লইয়া ইউনিভার্সিটি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া গেল তখন প্রফেসারগণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ হইলেন, বন্ধুবর্গ 'বাহবা' দিল, এবং বি-এ, পাশ করিয়া তাহাকে "বেকার-সম্প্রদায়ে" নাম লিখাইতে দেখিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজন অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইল। দরখাস্ত হাতে করিয়া চাকুরীর জন্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সে ক্লান্ত, অবসন্ন হইয়া পড়িল তখন সংবাদপত্রে গরম গরম ইংরাজী লিখিয়া সাহেবদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অদৃষ্টের কী বিড়ম্বনা! সেই সাহেব যে ডি, এল, রায়ের সময়ে একদিন "নন্দলালের" গলা টিপিয়া ধরিয়াছিল এখন আবার হঠাৎ আসিয়া ভোলানাথের গলাটি "টিপিয়া ধরিল খালি।" সুতরাং ভোলানাথ এ পথ পরিত্যাগ করিল। তাহার পর দেশ উদ্ধার করিবার একটি অদ্ভুত পন্থা আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ঠিক করিল যে সাহেবদের ইংরাজী রচনার idiom ও grammarএর ভুল ধরিয়া চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিবে। তাহা হইলেই সাহেবগণ চক্ষু লজ্জায় এদেশ

ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, দেশ স্বাধীন হইবে, চাউল সস্তা হইবে, সুতরাং আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট হইবে না। কিন্তু ইংরাজ জাতির আদৌ চক্ষু লজ্জা নাই,—ভোলানাথের এত লেখা সত্ত্বেও তাহারা এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেল না।

খবরের কাগজে লিখিয়া, 'পাবলিক স্পীচ' দিয়া, রাজনীতি চর্চ্চা করিয়া যখন দেখিল যে অর্থ-নীতি-সমস্যার কোন সমাধান হইল না—তখন সে কেবল ভাবিতে আরম্ভ করিল।

ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বন্ধুগণ উপদেশ দিলেন যে বিবাহিত জীবনের প্রথম অবস্থায় কেবল কবিতা ও সঙ্গীত চর্চ্চা করিতে হয়। কাজেই ভোলানাথ সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিল, কিন্তু তাহার দিবারাত্র রাগ রাগিনীর আলাপ শুনিয়া পাড়ার লোক সকলে কেন যে রাগিয়া উঠিল তাহা বেচারী বুঝিতে পারিল না। কি আর করিবে? সঙ্গীত ছাড়িয়া কবিতা ধরিল। পদ্য লেখার রীতি-নীতি আদব কায়দাগুলি বেশ আয়ত্ত করিয়া যখন সে "অসীমে সসীমে" লিখিল তখন চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়িয়া গেল। মাসিকপত্র সমূহে নানারূপ সমালোচনা ও ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল—অসীমের মাঝে সসীম, সসীমের মাঝে অসীম, দেহের মাঝে মন, মনের মাঝে হৃদ্‌পিণ্ড, তাহার মাঝে অণু, তন্মধ্যে পরমাণু পরমাণুর ভিতরে "ইলেক্‌ট্রন,"—তাহার ভিতরে হাত পা ছড়াইয়া শুইয়া আছেন বিরাট নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম।

সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মধ্যে গুরুতর গবেষণা আরম্ভ হইল গজেন্‌দা'র আড্ডায় তুমুল তর্ক চলিতে লাগিল। অনেকে বলিল – mystic poet, গজেন্‌দা বলিলেন—'ছাই হয়েছে,কোন মানেই হয় না, অপরপক্ষে বলিলেন—'যদি মানেই করা যাবে, তা'হলে আর কবিতা হ'ল কই?' চারিদিকে এবম্বিধ সমালোচনায় অখ্যাত ভোলানাথ অতি শীঘ্রই 'উদীয়মান তরুণ সুকবি' বলিয়া বিখ্যাত হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন জুন মাসের মাঝামাঝি একদিন "অলোক" পত্রিকায় তাহার "জরাবাদরে" বাহির হইল তখন শ্রীউপেন্‌দা অযাচিত ভাবে আসিয়া তাহার কর্ণমর্দ্দন করিয়া compliment দিয়া গেলেন।

ভোলানাথের কবিতা চর্চ্চায় সকলেই খুসী হইল,—কিন্তু গৃহে বনিতা অত্যন্ত চটিত হইলেন। প্রথমটা ইহার কারণ সে বুঝিতে পারিল না,—কিন্তু ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতে লাগিল যে কাব্যের প্রেম অপেক্ষা উদরের ক্ষুধা অধিকতর সত্য। যখন ভাল করিয়া বুঝিল যে শুধু কবিতা লিখিয়া, মলয় সেবন করিয়া, কোকিলের ঝঙ্কার শুনিয়া, ছাদের উপর 'চন্দ্রাহত' হইয়া পড়িয়া থাকিলে বাস্তব সংসার চলে না তখন সে পুনরায় দরখাস্ত হাতে লইয়া 'ক্লাইভ ষ্ট্রীটে' ঘুরিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মার্চ্চেণ্ট আপিসের সাহেবরা গ্রাজুয়েটের merit বুঝিতে পারে না,—সুতরাং ওদিকে ভোলানাথ কোনই সুবিধা করিতে পারিল না। সরকারী চাকুরীও not so plentiful as black berries, উপরন্তু pushing backing প্রভৃতির নিতান্ত আবশ্যক। ভোলানাথের সে সব সুবিধা কিছুই নাই। কাজেই সে সহসা দেখিল যে সমগ্র পৃথিবীটা তাহার চক্ষের সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড সরিষা ক্ষেত্র—রাশী রাশী পীতাভ কুসুম ফুটিয়া আছে।

আহা কী সুন্দর মনোরম দৃশ্য! এমন সুন্দর ফুল,—কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে এ পর্য্যন্ত কোন কবি ইহার সম্বন্ধে কবিতা লিখেন নাই। সত্যেন্দ্রনাথের "কদলী কুসুম" পর্য্যন্ত আছে,—উহা খাদ্য হিসাবে খুবই উপাদেয়, কিন্তু উহার সৌন্দর্য্য কোথায়? সরিষা ফুলের অনির্ব্বচনীয় উদাস করুণ সৌন্দর্য্যের কাছে নন্দনের ফুল পারিজাত (অবশ্য যদিও কখনও উহা দেখি নাই) লজ্জায় ম্লান হইয়া যায়। তাহা ছাড়া এরূপ মাধুর্য্যময়ী অনুভূতি আর কোন ফুলের সৌন্দর্য্য দিতে পারে না।

* * * *

কি করিবে কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া ভোলানাথ অর্থ সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত আমাদের পূজনীয় দাদাঠাকুর শ্রীযুক্ত শরৎ পণ্ডিতের শরণাপন্ন হইল। দাদাঠাকুর অতি সজ্জন, পরোপকারী, সহজ স্পষ্টবাদী ব্যক্তি। ভোলানাথের মলিন চেহারা ও কাতর দৃষ্টি দেখিয়া বিগলিত হইয়া উপদেশ

দিলেন—"কি আর করবে বল? চাকরী বাকরীর বাজার ত এই রকম। আপাততঃ আমার কাছেই থাক, আমার কাজকর্ম্মের একটু সাহায্য কর, একরকম করে চলে যাবেই। তারপর নিরুপায়ের উপায় ভগবান ত আছেনই,—তাঁকে দিনান্তে একবার করে ডাকিস্—একদিন না একদিন একটু সুবিধা করে দেবেন। তবে দেখ, এক কথা বলে রাখি,—ভগবানের কাছে তা' বলে দিনরাত "অর্থ অর্থ" করিস না। এখন থেকেই যদি বেশী অর্থ চেয়ে রাখিস তা হলে শেষকালে পরমার্থ চাইতে বিশেষ চক্ষুলজ্জা হবে। জানিস্ ত নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে যারা প্রথমেই দু' থালা অন্ন মেরে বসে থাকে, পরমান্ন খাবার সময় তাদের কি রকম অনুতাপ হয়?"

দাদাঠাকুরের এইরূপ আধ্যাত্মিক উপদেশ শুনিয়া ভোলানাথ কহিল—"সব ত বুঝলাম, কিন্তু এখন সংসার চলে কিসে?"

দাদাঠাকুর কহিলেন—"এত বড় নীরেট পৃথিবীটা যদি চলে, তা হলে তোর ক্ষুদ্র সংসারও চলে যাবে।"

ইহার উপর আর কথা নাই। ভোলানাথ সেখান হইতে ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় করিয়া উপেনদা'র নিকটে গিয়া কহিল—"দাদা, একটা বুদ্ধি বাৎলে দিন, নইলে আর চলে না।

উপেনদা সোজাসুজি বলিয়া দিলেন—"ব্যবসাতে নেমে পড়, কিচ্ছু ভাবতে হবে না।"

ভোলানাথ। "ভারী চমৎকার বললেন ত! ব্যবসা করা সোজা কথা নাকি? টাকা কই যে ব্যবসাতে নেমে পড়ব?"

এইবার উপেনদা কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া ভোলানাথের কর্ণ-দ্বয়ের উপর তাঁহার পদ্মহস্তের কসরৎ দেখাইয়া কহিলেন—"ওরে হতভাগা, টাকা খরচ করে কি আর ব্যবসা করতে বলছি? যাতে capital দরকার হয় না এমন একটা কিছু কর্ না।"

ভোলানাথ। "তাও আবার হয় নাকি? ভারী বুদ্ধি দিলেন ত!"

উপেনদা। "বাপু, এ সহজ কথাটাও বুঝতে গলদ্ঘর্ম্ম হতে হচ্ছে! তা না হলে তোদের এই গ্র্যাজুয়েট বুদ্ধি! যা' একটু বিদ্যেবুদ্ধি ছিল তা এই বিশ্ববিদ্যালয়েই লয়প্রাপ্ত হয়েছে।"

এইবার ভোলানাথের অনার্স প্রাণে আঘাত লাগিল। সে কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল—"দেখুন উপেনদা, আপনাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করি যথেষ্ট,—তাই বলে এ রকম ভাবে ইউনিভারসিটির নিন্দে করবেন না।"

উপেনদা জিভ কাটিয়া বলিলেন—আরে রামঃ, তোদের ইউনিভারসিটির কি নিন্দে করতে পারি? যে ইউনিভার্সিটিতে সেয়ার মার্কেটের দালাল ও মার্চেণ্ট আপিসের কেরাণীকে Physics, Chemistry পড়ানো হয়, যেখানে পুলিসের দারোগা Philosophy পড়ে সে ইউনিভারসিটির নিন্দে করবার মত দুঃসাহস আমার নেই।

এইবার ভোলানাথ উত্তর দিতে গিয়া দেখিল যে উপেনদা ক্রমশঃ জামার আস্তিন গুটাইতেছেন। তাহার ভাল করিয়া নীতি শাস্ত্র পড়া ছিল বলিয়া সে আর কালবিলম্ব না করিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চম্পট দিল।

* * * *

তাহার পর কিছুদিন পরে শুনিলাম যে ভোলানাথ জোড়াসাঁকোর কোন জমিদার বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটর হইয়াছে। স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র জমিদার তনয় মাণিক-চাঁদ তাহার কাছে পড়ে। জমীদার বাবুটিও অনারস গ্র্যাজুয়েট পাইয়া খুব খুসী হইয়াছেন এবং মনশ্চক্ষে পুত্রের ভাবী উন্নতি দেখিয়া নিতান্ত গদগদ হইয়া পড়িয়াছেন।

আমিও ভাবিলাম এতদিনে বোধ হয় ভোলানাথের ভাগ্যবিধাতা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। বেচারী বড়লোকের আশ্রয় পাইয়াছে,—বোধ হয় এবার নিজের কিছু সুবিধা করিয়া লইতে পারিবে।

কিন্তু হরিষে বিষাদ হইল। হঠাৎ একদিন সকালবেলায় মলিন বদন ভোলানাথ আমার বাসায় আসিয়া বলিল—"ভাই, গোটা দশেক টাকা ধার দাও ত, আজ পশ্চিম রওনা হব।"

আমি ভাবিলাম এ আবার কি! তাহার জমিদার বাড়ীর মাষ্টারী কি হইল! কথাবার্ত্তায় জানিলাম যে বন্ধুবর তাহার ফোর্থ ক্লাসের ছাত্রকে Phenomenon, Noumenon, Relativity প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বুঝাইবার

চেষ্টা করাতে জমীদারবাবু নিতান্ত খুসী হইয়া তাহাকে বিদায় দিয়াছেন। ব্যাপার শুনিয়া হাসিও পাইল দুঃখও হইল। বলিলাম—"তোমার এ সমস্ত পাগলামী কি কখনও সারবে না?"

ভোলানাথ কিন্তু তর্কে পরাজয় স্বীকার করিল না। সে যাহা ভাল বুঝিয়াছে তাহাই করিয়াছে।

আমার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম যাত্রা করিল, কিন্তু কোথায় যে যাইতেছে তাহা বলিয়া গেল না।

* * * *

তাহার পর বহুদিন ভোলানাথের কোন সংবাদ পাই নাই। আমি একটি চাকুরী পাইয়া পাটনায় আসিলাম। সহসা একদিন সব্জীবাগের মোড়ে দেখিলাম যে বন্ধুবর ভোলানাথ রাস্তা দিয়া হন্ হন্ করিয়া ছুটিয়া চলিতেছে। আমি গিয়া তাহাকে ধরিলাম। আমাকে দেখিয়াই দন্ত-বিচ্ছেদ করিয়া একগাল হাসিয়া কহিল,—"আরে একি, তুমি যে এখানে!"

আমিও জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সখা, তুমি যে এখানে?" তাহার পর জানিলাম যে বন্ধুবর বেহারের রাজধানীতে আসিয়া "Secretariatএ একটি চাকুরী জুটাইয়াছে। বেশ ভালই আছে,—কিন্তু তাহার সেই আগেকার উদাস ভাব, অবিন্যস্ত রুক্ষ চুল ও চিবুক নিম্নে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি অসংযত দাড়ী ঠিক সেইরূপই আছে। যাহা হউক, তাহার সহিত এইরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হওয়ায় বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। তাহার পর মাঝে মধ্যে প্রায়ই তাহার বাসায় গিয়া আড্ডা দিতে আরম্ভ করিলাম। এইরূপে বেশ আনন্দেই দিনগুলি কাটিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই যে গল্পের প্রথম পরিচ্ছেদে ভোলানাথ আমার বাসায় উপদেশ লইতে আসিয়া আমাকে তাঁহার স্ত্রীর পত্রখানি দিয়া গেল তাহার পর অনেকদিন আর তাহার কোন সংবাদ লইতে পারি নাই। সেও আমার নিকট আর আসে নাই। আজ একবার তাহার সহিত দেখা করিতে যাইব ভাবিতেছি এমন সময় তাহার দূর সম্পর্কীয় ভাগিনেয় শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মামাবাবুর কোন খবর জানেন? "আজ দশ বারোদিন হ'ল কোথায় চলে গেছেন তার কোন পাত্তাই নেই। সেইজন্যে আপনার কাছে এলাম একবার খবর জানতে। আমি ত বাসার ঝি চাকরদের বিদেয় দিয়ে সেখানে তালাবন্ধ ক'রে উপস্থিত একটা মেসে উঠে এসেছি।"

আমি ত ব্যাপার শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত ও চিন্তিত হইলাম। ভাবিলাম এ আবার কি হইল! সে যেরকম খামখেয়ালী লোক তাহার পক্ষে চাকুরী ছাড়িয়া হঠাৎ কোথাও চলিয়া যাওয়াও বিচিত্র নহে। আপাততঃ শচীন্দ্র-নাথকে আমার বাসায় থাকিতে বলিয়া আমি ভোলানাথের সন্ধানে প্রথমতঃ তাহার আপিসে যাইলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম যে সে তিন মাসের জন্য sick leaveএর দরখাস্ত করিয়াছে এবং প্রায় দুই সপ্তাহ যাবৎ আপিসে আসে নাই। বিশেষ চিন্তিত হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম বৈঠকখানার ঘরে টেবিলের উপর একখানি পত্র রহিয়াছে বুঝিলাম ডাকপিয়ন আমাকে দেখিতে না পাইয়া এইখানেই রাখিয়া গিয়াছে। পত্রখানি লইয়া দেখিলাম যে খামের উপরে পোষ্ট অফিসের শীলমোহর রহিয়াছে—"Benares City"। ভাবিলাম কাশী হইতে কে আবার আমায় পত্র লিখিল! উৎসুক হইয়া তাড়াতাড়ি খামখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেখিলাম যে বন্ধুবর ভোলানাথ লিখিতেছে—

ভাই,

সংসারের ঝঞ্ঝাট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছি। আর সুদীর্ঘ তালিকাসহ পত্রাঘাত সহিব না। জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছি। পাটনার আপিসে আপাততঃ তিন মাসের ছুটীর দরখাস্ত করিয়া সম্প্রতি কাশীতে আসিয়াছি। দরখাস্ত মঞ্জুর হইল কি না তাহা জানি না। না হইলেও কিছু ক্ষতি নাই, কারণ শীঘ্রই চাকুরীতে ইস্তফা দিব ঠিক করিয়াছি। শচীনকে বাড়ী যাইতে বলিয়ো। এখানে ৭নং দশাশ্বমেধ ঘাটে আছি। যদি কখনো এখানে

আইন তাহা হইলে সাক্ষাতে সব জানিতে পারিবে। অধিক লেখা বাহুল্য।

ইতি—

তোমাদের ভোলানাথ।

চিঠি পড়িয়া ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অধিকতর চিন্তিত হইলাম। ভাবিলাম ভোলানাথ শেষটা সন্ন্যাসী হইল নাকি! স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি ছাড়িয়া এ আবার কি করিয়া বসিল! এইসব চিন্তা করিয়া মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গেল। স্থির করিলাম তাহাকে কাশী হইতে ধরিয়া আনাই একমাত্র কর্ত্তব্য। সুতরাং সন্ন্যাসী ভোলানাথের সন্ধানে আজই রাত্রের গাড়ীতে কাশী রওনা হইলাম।

* * * *

হিন্দুর পবিত্র তীর্থ ৺বারানসীতে আসিয়া পঁহুছিয়াছি। কী সুন্দর, মনোরম স্থান। ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে অবিরাম শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি—চতুর্দ্দিক বম্ বম্ শব্দে নিনাদিত। কোথাও ভৈরবীর মধুর সুরে সানাই বাজিতেছে। উত্তর বাহিনী সুরধুনী পাপী-তাপীর কলুষ ধৌত করিয়া কুলু কুলু নিনাদে বহিয়া যাইতেছে। "জয় বাবা বিশ্বনাথ" বলিয়া যাত্রীরা গঙ্গাস্নানে ছুটিয়া চলিয়াছে। গঙ্গাতীরে কোথাও গৈরিক বসন পরিহিত কোন বৈরাগী খঞ্জনী বাজাইয়া হরিনাম গান করিতেছে। কেহবা একটি বীণা লইয়া মধুর রাগ-রাগিণী আলাপ করিতেছে। সেই অমৃতনিস্যন্দিনী বীণার মধুর ঝঙ্কারে শ্রোতৃগণ তন্ময় হইয়া গিয়াছে,—তাহাদের চোখে মুখে আনন্দের দিব্য জ্যোতিঃ। তাহাদের তন্ময়তা দেখিয়া মনে হয় যেন তাহারা বিশ্বনাথের চরণে আত্মনিবেদন করিয়া সংসারের সকল কষ্ট, সকল দুঃখ ভুলিয়াছে।

আমিও মুগ্ধ হইয়া চলিয়াছি। যাইতে যাইতে দশাশ্বমেধ ঘাটের রাস্তায় পঁহুছিলাম। ৭ নম্বর বাড়ী খুঁজিয়া লইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

কিন্তু, হরি হরি, একী! কোথায় দেখিব জটাজুটসমন্বিত ভস্মবিভূষিত দেহ, কৌপীন পরিহিত, গঞ্জিকা-কলিকা-হস্ত, কম্বলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী ভোলানাথ,—কিন্তু একি দেখিলাম! কে ওই অ্যালোনিয়ান্-টেরীবিশিষ্ট, বাটারফ্লাই-গুম্ফ ছাটিত, দাড়ি কামায়িত, চক্ষে পাস্‌নে-চশমা-আঁটিত, লুঙ্গি-পরিহিত, ফতুয়া-গাত্র তরুণ যুবা আরাম কেদারায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় সংবাদপত্র পাঠ করিতেছে? অগ্রসর হইয়া দেখিলাম এ যে আমাদেরই ভোলানাথ। সহসা দেখিলে প্রৌঢ় ভোলানাথ বলিয়া আর চেনা যায় না। অনেক কারুকার্য্য করিয়া প্রৌঢ়ত্ব ঢাকিয়াছে।

সহসা আমাকে দেখিয়া ভোলানাথ বলিয়া উঠিল—"হ্যালো ব্রাদার যে! কখন এলে!"

আমি ত অবাক্। এ যে সেই নিরীহ বাতিকগ্রস্থ ভোলানাথ ইহা যেন সহসা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। আমি স্তব্ধ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে তাহার প্রতি খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিলাম। আমার তদবস্থা দেখিয়া ভোলানাথ হাসিয়া কহিল—"আমার চেহারার একটু change দেখে খুব surprised হয়ে পড়েছে, না? এতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নেই। আমি যে আবার Student life begin করেছি কিনা তাই এ রকম সাজতে হয়েছে।"

(আগামীবারে সমাপ্য)
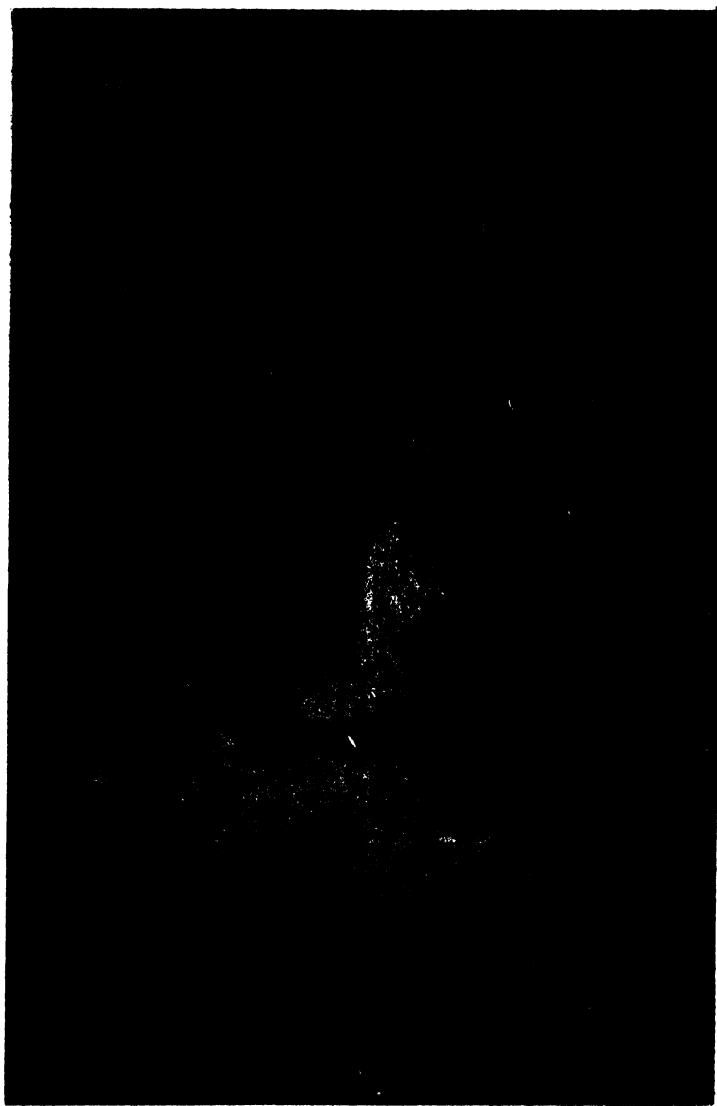
"চাঁদ গগনে যদি তোরে পাই লাগি।
লোহার মুষলে ভাঙ্গিয়ে তোমারে
করিমু শতেক ভাগি।"

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড] ৮ই আশ্বিন শনিবার, ১৩৩৩। [৪৪শ সপ্তাহ
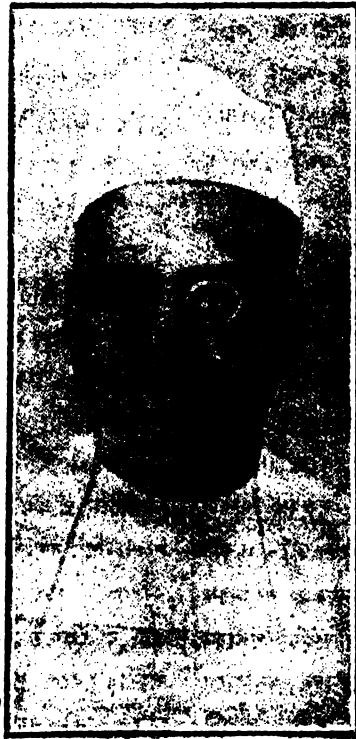
শ্রীযুক্ত এস্ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার,
আগামী কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি।

আলোচনা

আর্ত্তেরে করিবে কেবা ত্রাণ।

মেদিনীপুরের ভীষণ বন্যায় তথাকার নরনারী ও শিশুদের কি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কেবল দুই একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহাদের দুরবস্থার কথা দেশবাসীর সমক্ষে স্পষ্টতররূপে উপস্থিত করিতে চাই। মেদিনীপুর জেলায় সুজামুঠা পড়াচিংড়া গ্রামের শ্রীযুক্ত শশিভূষণ জানা লিখিয়াছেন—বর্ত্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন্, মারোয়াড়ী ভ্রাতৃবৃন্দ, বেঙ্গল রিলিফ পার্টি, স্বরাজ্য পার্টি প্রভৃতি হইতে ডাল, চাল, চিড়া প্রভৃতি দান খয়রাতের ব্যবস্থা সুরু হইয়াছে। কিন্তু যে সকল গৃহে কেবল মেয়েরা ও শিশুরা অবস্থান করিতেছে তাহারাই উক্ত দান খয়রাত হইতে বঞ্চিত হইতেছে। তাহার কারণ সন্তরণে অপটু লজ্জাশীলা মেয়েরা বাড়ীর বাহির হইয়া সাহায্য-কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারে নাই। কাজেই তাহারা সন্তান বুকে লইয়া গৃহমধ্যেই ক্ষুধায় শুকাইতেছে। আমি একদিন নৌকাযোগে যাইতেছি দেখিলাম ২০।২৫ জন স্ত্রীলোক তাহাদর সন্তান সন্ততি লইয়া একটি উঁচু ঢিপির উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা নৌকার আরোহীগণের দৃষ্টি তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ৬।৭ বৎসরের দশ বারটী বালককে অগাধ জলে ঠেলিয়া দিল। সন্তরণ অপটু বালকগুলি জলে ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া তাহাদের নিকট গিয়া তুলিয়া ফেলিলাম। তখন মেয়েরা তাহাদের দুরবস্থার কথা জানাইল। আমি তাহাদিগকে খয়রাতী কেন্দ্রে যাওয়ার উপদেশ দেওয়ায় তাহারা তিন মাইল পথ সন্তরণ করিয়া কেন্দ্রে যাইবার অক্ষমতা জানাইল। আর এক স্থানে একটি অতি অল্পবয়স্কা রমণী তাহার বৎসর খানেকের সন্তানকে আমাদের পায়ের তলায় রাখিয়া নীরবে দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। অনুসন্ধানে জানা গেল, মেয়েটী দুইদিন অনাহারে পড়িয়া আছে। এদিকে মায়ের বুকে দুধ নাই, ছেলেটী আধমরা হইয়া পড়িয়াছে। ধীরে ধীরে জল কমিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট গৃহগুলিও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামে গ্রামে অধিবাসীরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া লুঠতরাজের জল্পনা কল্পনা করিতেছে। দেড় বৎসর কাল লোক কেমন করিয়া জীবন ধারণ করিবে এ কথা ভাবিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠি।

মেদিনীপুরে বন্যার প্রকোপ প্রশমিত হইলেও অধিবাসীদের দুর্দ্দশার হ্রাস হইবে না। তাঁহাদিগকে বাঁচাইতে হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সাহায্য করা প্রয়োজন। তাই আজ প্রত্যেক বাঙ্গালী—প্রত্যেক ভারতবাসীকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়া বলিতেছি এস! আর্ত্তেরে করিবে কেবা ত্রাণ!

বাঙ্গলাদেশে গণতন্ত্রের প্রহসন।

যে দেশে কোন শ্রেণী বা ব্যক্তি বিশেষের উপর শাসনভার ন্যস্ত না থাকিয়া সমগ্র জনসাধারণের উপর শাসন দণ্ড পরিচালনার ক্ষমতা অর্পিত থাকে, সেই দেশকে গণতন্ত্রশাসিত বলা হয়। ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তিই ভোটের অধিকারী। আর আমাদের দেশে গণতন্ত্রের নামে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের শাসন সংস্কারের দ্বারা কি বিরাট প্রহসনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বাংলাদেশের শতকরা কতজন লোক ভোট দিয়া থাকে দেখিলেই বুঝা যাইবে। বাঙ্গলাদেশে ৪ কোটি ৬৬লক্ষ ৯৫হাজার ৫৩৬জন লোকের বাস, তন্মধ্যে গত নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা হইয়াছে এমন নির্ব্বাচন কেন্দ্রে ভোটার সংখ্যা ছিল দশলক্ষ ৪৪ হাজার ১৬৬ জন। শতকরা হিসাব কসিলে ১০০জন অধিবাসীর মধ্যে মাত্র ২'২জন ভোটার দাঁড়ায় এই যে একশত জন লোকের মধ্যে ২জন ভোটার তাঁহারাও আবার সকলে ভোট দিতে যান না। গত নির্ব্বাচনে ছয়লক্ষ ছত্রিশ হাজার নয়শত বেয়াল্লিশ জন ভোটার ভোটদেন নাই। এজন্য শাসনসংস্কার আইন দায়ী না হইলেও, ভারতের শাসন

যন্ত্র যে অনেক পরিমাণে দায়ী তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কেননা কোন দেশের লোকের যদি নাগরিক অধিকার বোধ না জন্মে, সেজন্ত গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কেহ দায়ী হয়েন না। যাহা হউক সমগ্র অধিবাসীর তুলনায় যত-লোক ভোট দিয়াছিলেন, তাহা হিসাব করিয়া দেখা যায় যে বাঙ্গলাদেশে একশত জন লোকের মধ্যে ভোট দিয়াছেন—৪ লক্ষ ৭২হাজার অর্থাৎ মাত্র অধিবাসী ৪ কোটি ৬৬ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮৮ জন লোক গত ইলেকশনে ভোট দিয়াছেন। কাউন্সিলে যাঁহারা দেশের প্রতিনিধি সাজিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা শতকরা একজন লোকেরও কমের প্রতিনিধি। যখন বাঙ্গলাদেশের প্রতিনিধি মূলক শাসনের গোড়াতেই এমন গলদ তখন শাসন সংস্কার যে নিতান্ত ভূয়া সে সম্বন্ধে কোন জাতীয় মঙ্গলকামী ব্যক্তির সন্দেহ থাকিতে পারে না গবর্ণমেণ্ট যদি ভারতের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীকে এই দ্বৈতশাসনমূলক শাসনেও ভোটের অধিকারী করিতেন, তাহা হইলে প্রতি-নিধিরা বুঝিতে পারিতেন যে দেশের সমগ্র জনশক্তি তাঁহাদের পিছনে আছে। সেই জোরে তাঁহারা তাঁহাদের দাবী কাউন্সিলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষীয় লোকের ভোটের জোরে প্রত্যাখ্যান হইলে বা গবর্ণর কোন দাবী নাকচ করিয়া দিলে দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন করিতে পারিতেন ও সম্ভবতঃ কৃতকার্য্য হইতেন। বর্ত্তমান নিয়মে কেবল যে অশিক্ষিত লোকেই ভোটার হইবার ক্ষমতা হারাইয়াছে তাহা নহে,অনেক এম-এ, বি-এ, পাশ করা লোকও ভোটার হইতে পারে না। যাঁহারা ৭ বৎসরের কর্ম্মচারী বি-এ, পাশ করিয়াছেন অথচ নিজেদের নামে বাড়ীঘর নাই, তাঁহারাও ভোট দিতে পারেন না। আমাদের অনেক তরুণ অধ্যাপকবন্ধু ও এইরূপে ভোটের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া আছেন। যে দেশের সেন্সাস রিপোর্টে শতকরা ৮জন লোকের মাত্র অক্ষর পরিচয় আছে বলিয়া জানা যায়,সে দেশে প্রত্যেক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে ভোটের অধিকারী করার কোন বাধা থাকিতে পারেনা। যাহা হউক সমগ্র দেশবাসীকে ভোটার না করিতে পারিলে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন সফল হওয়া কঠিন। ভোটার হইলে আর কিছু হউক না হউক, বিভিন্ন নির্ব্বাচন প্রার্থীর নিকট দেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যেক ব্যক্তি কিছু কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে।

সহযোগীতার সর্ত্ত।

ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমধ্যে আবেদন নিবেদনের পালা শেষ হইয়া এখন চোখ রাঙ্গানির পালা গাহনা হইতেছে। দুর্ব্বল যদি প্রবলের প্রতি চোখ রাঙ্গাইয়া কাজ আদায় করিতে চায়, তবে প্রবল তাহার প্রতি বিদ্রূপের হাসিই হাসিয়া থাকে, দুর্ব্বল যদি প্রবলের সহিত সত্যই লড়াই করিয়া কাজ হাসিল করিতে চায়, তবে তাহাকে কথা ছাড়িয়া নামিতে হয়—দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া প্রবলের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা করিতে হয়। দুর্ব্বল যখন শক্তিশালী হইয়া উঠে প্রবল তখন আপনিই তাহার নিকট মাথা নত করে। আমাদের স্বরাজী ধুরন্ধরগণ দেশে জনমত গঠন করিবার জন্ত শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়া, জাতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা না করিয়া, কেবল মাত্র চোখ রাঙ্গাইয়া ভারতে স্বরাজ আনিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট ভাল রকমেই জানেন যে এই চোখ রাঙ্গানির মূল্য কতটুকু। যদি ধরা যায় যদিও তাহা অসম্ভব যে স্বরাজীরাই আগামী নির্ব্বাচণের ফলে প্রবলতম দলরূপে সকল কাউন্সিলে ও অ্যাসেম্বিলীতে উপস্থিত হইবেন ও ক্রমাগত গবর্ণমেণ্টের সকল প্রস্তাবে বাধা প্রদান করিবেন, তাহা হইলেও যে গবর্ণমেণ্ট ভয়ের চোটে ভারতকে স্বরাজ দিয়া ফেলিবেন তাহা নহে। কেননা গবর্ণমেণ্ট জানেন যে এই যে ব্যবস্থাপক সভার প্রতিনিধিদল, ইহা কেবল মাত্র দেশের শতকরা একজন লোকের প্রতিনিধি মাত্র—৯৯জন লোকের মত ইহাদের পিছনে নাই। সুতরাং প্রতিনিধিদের হুমকীতে তাঁহাদের ভয় পাইবার কিছুই নাই। ভারতবর্ষে যদি যথার্থই গণতন্ত্র নীতি প্রচলিত থাকিত—অথবা ভারতবর্ষের সকল নর-নারীই যদি শিক্ষা ও সংস্কারের গুণে স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষন করিত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট প্রতিনিধি দলকে ভয় করিয়া চলিতেন। কিন্তু এখন ভারতের জনমত এত বিচ্ছিন্ন এত অসংবদ্ধ যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ন্তায় প্রবল শাসন যন্ত্র তাহার ভয়ে বিকল হইয়া যাইবে না। দাবী যদি গবর্ণমেণ্টের দ্বারা স্বীকার করাইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে দেশের ঐ অবহেলিত অনাদৃত শতকরা ৯৯জনের মূককণ্ঠে ভাষা দিতে হইবে—তাহাদের দেহে ও মনে বল

সঞ্চার করাইতে হইবে। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীনের দ্বারা স্বাধিকার লাভ হয় না। স্বরাজ লাভ করিতে হইলে আমাদের সমগ্র শক্তি জাতি গঠনে নিয়োজিত করিতে হইবে।

কিন্তু স্বরাজ্য দলের নেতা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরু মহাশয় এ সকল কথা ভুলিয়া আবার কতকগুলি সর্ত্ত লইয়া দেশবাসী ও গবর্ণমেণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে ভোট লাভ করিবার পক্ষে এই সর্ত্তগুলি খুবই কার্য্যকরী হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ সর্ত্তগুলি গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এখনই মানিয়া লওয়া সম্ভব কি না এবং সম্ভব হইলেও গবর্ণমেণ্ট কেন তাহা মানিয়া লইবেন, তাহা একটু ভাবিয়া দেখা যাউক।

পণ্ডিত নেহেরু বলিতেছেন যে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি বা তদনুরূপ অন্য কিছু গবর্ণমেণ্ট না মানিলে স্বরাজ্য দল মন্ত্রীত্ব প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের কোন চাকুরীই গ্রহণ করিবেন না।

(ক) যে সকল রাজবন্দী বিনা বিচারে শাস্তিভোগ করিতেছেন তাহাদিগকে হয় মুক্তি দিতে হইবে, না হয় আইনতঃ বিচার করিতে হইবে।

(খ) সকল প্রকার দমনমূলক আইন পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(গ) যে সকল ব্যক্তি কোনপ্রকার অপরাধের দরুণ শাস্তি পাইয়াছে, তাহাদের নির্ব্বাচনে যে বাধা আছে তাহা উঠাইয়া দিতে হইবে।

(ঘ) মনোনীত বে-সরকারী সদস্যদের পদ উঠাইয়া দিয়া সেই স্থানগুলি বে-সরকারী নির্ব্বাচিত সদস্যদের দ্বারা পূরণ করাইতে হইবে।

(ঙ) হস্তান্তরিত বিভাগে মন্ত্রীদিগকে পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হইবে—কেবলমাত্র গবর্ণরের নাকচ করিবার ক্ষমতা রহিবে। মন্ত্রীগণকে ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বসম্পন্ন করিতে হইবে।

(গ) সাধারণের উপর নূতন কর না বসাইয়া মন্ত্রীদিগকে নিজ নিজ বিভাগ পরিচালনা করাইবার জন্য রাজস্বের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ ছাড়িয়া দিতে হইবে।

(ঘ) গবর্ণমেণ্ট যতদিন না এই সর্ত্তগুলি পালন করেন, ততদিন স্বরাজ্যদল গবর্ণমেণ্টের অর্থ সংগ্রহ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে বাধাদান নীতি অবলম্বন করিবেন।

এই প্রস্তাবগুলি যে অত্যন্ত ভাল এবং বর্ত্তমান দ্বৈত শাসন যে খুবই খারাপ এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রথম তিনটী দাবী গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে পূরণ করিতে পারিলেও শেষের দাবীগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নাই দ্বৈত শাসনের মূলগত কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের আইন দ্বারাই তাহা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট শেষের চারিটী দাবী পূরণ করিবার জন্য কোনও আগ্রহ প্রকাশেরও প্রয়োজন বোধ করিবেন না। কেননা স্বরাজ্য দল যদি মন্ত্রীত্ব নাই লয়, তাহা হইলেও মন্ত্রীত্ব লইবার লোকের অভাব হইবে না। মুসলমান দল তো হাত পাতিয়া বসিয়াই আছেন। যদি মুসলমান দল মন্ত্রীত্ব পাইবার অধিকারী হয়েন, তখন স্বরাজ্যদল আবার হয়তো কোন কোন স্থলে তাঁহাদের বেতন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবেন। বেতন বন্ধ করিবার চেষ্টায় এবার তাঁহাদের সফল হওয়া কঠিন হইবে—কেননা এবার পূরা স্বরাজী ছাড়া আর কেহ তাঁহাদের সহিত ভোট দিবেন না। যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়াই যায় যে স্বরাজীরা কোনরকমে মন্ত্রীর বেতন বন্ধ করিয়া দিবেন, তাহা হইলেও যে গবর্ণমেণ্ট অধিকতর ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতে দিবেন তাহা নহে। সুতরাং স্বরাজ্য দলের বর্ত্তমান নীতির ফলে কোন কাজই হইবে না।

তারপর স্বরাজ্য দলের হুমকী দেখান নীতি এই নূতন নহে। এই বৎসরের প্রথমেও তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে একটা নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের দাবী না শুনিলে তাঁহারা civil disobedience দেশে প্রবর্ত্তন করাইবেন। গবর্ণমেণ্ট এরূপ ভয় দেখানর অসারতা জানিতেন বলিয়াই কোনরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই। তখন স্বরাজ্যদল কাউন্সিলের বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু ফের তাঁহাদিগকে লোক হাসাইয়া কাউন্সিলে যাইতে হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের সহিত এই মিলিটারী কায়দায় ultimatum দিয়া নৈতিক যুদ্ধ চালান ব্যাপারটা যে একটা প্রহসনে পরিণত হইয়াছে তাহা দেশবাসী ভাল রকমেই বুঝিয়াছেন এবং সেইজন্য আগামী নির্ব্বাচনে তাঁহারা তদনুরূপ কার্য্যই করিবেন।

ভোলানাথের মুক্তি

(গল্প)

[শ্রীরামরঞ্জন গোস্বামী বি এ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

Student life ! আমার বিস্ময়ের মাত্রা বাড়িল। আমি বলিলাম—ভাই ভোলানাথ, দোহাই তোমার, হেঁয়ালী ছেড়ে দিয়ে কথা বল।

সে বলিল,—"সত্যিই তাই, দেখলাম যে চাকরী ক'রে আত্মা ও সংসার এ দুটো পরস্পর বিরোধী জিনিষকে সমান ভাবে বজায় রাখা যায় না। চাকরী করেছি কি সংসার ঘাড়ে এসে পড়েছে,—যত অভাব অভিযোগ সব একসঙ্গে এসে জুটবে। এর চাইতে Student life far better,—কোন ঝোঁকি সামলাতে হয় না। মাতাপিতা, কন্যা, পরিবার প্রভৃতি mere phenomena,—এ সব দ্রব্যে অত্যধিক আসক্তি মানবের মুক্তির পরিপন্থী। সুতরাং অনেক ভেবে চিন্তে আবার ছাত্র জীবন আরম্ভ করেছি। "হিন্দু ইউনিভার-সিটি"তে admission নিয়েছি,— philosophyতে M.A. পড়ছি। সন্ধ্যেবেলা বাসায় ব'সে দুটো স্কুলের ছেলেকে পড়াই,—তাতেই এখানকার খরচ এক রকম বেশ চ'লে যাচ্ছে। স্ত্রীকেও বেশ বুঝিয়ে চিঠি লিখে দিয়েছি যে "ছাত্রানাং অধ্যয়ণং তপঃ"—সুতরাং পার্থিব টাকাকড়ির বিষয়ে চিঠি লিখে যেন আমার তপস্যা ভঙ্গ না করে। কেবল মাঝে মাঝে নিছক প্রেমের কথা লিখে আমার mental equilibriumটা ঠিক রাখতে ব'লে দিয়েছি: সেও আর্য্য-নারী, সনাতন পতি-ভক্তি ত আছেই, তা'ছাড়া কথাটা যখন সংস্কৃত করে লিখে দিয়েছি তখন উপলব্ধি করবেই। এই দেখনা, দুচার দিনের মধ্যেই একটা অনুকূল উত্তর এল ব'লে।"

বুঝিলাম এবার ভোলানাথের বায়ু অধিকতর উগ্র হইয়াছে,—চিকিৎসার নিতান্ত প্রয়োজন। প্রকাশ্যে কহিলাম, "এ সব ত বুঝলাম, কিন্তু এম-এ পাশ করার পরেও ত সেই সংসারের বোঝা নিতেই হবে। ইহলোক থেকে সরে না পড়লে ত আর চিরন্তন মুক্তি হয় না ?"

তদুত্তরে ভোলানাথ কহিল,—"এই সামান্য কথাটা বুঝলে না ? অনন্তপারং কিল শব্দশাস্ত্রং—Student life এর কি আর শেষ আছে দাদা ! এখনও Law P. H. D.র thesis লেখা প্রভৃতি কত কি আছে। তারপর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে গেলেই ত শেষ বয়সে এক রকম গুছিয়ে নিলাম বলতে হবে।

আমি কহিলাম—এসব সর্ত্তে তোমার স্ত্রী রাজী হবেন ত ? সে কহিল—"দেখ, তুমি নেহাৎ অর্ব্বাচীন আর্য্য-নারীদের হৃদয়ের খবর কিছুই রাখ না,—তাই এ রকম বলছ। দু'দিন থেকেই যাওনা এখানে,—তাঁর উত্তরটা কি আসে দেখ্‌লে আমায় দু'শো তারিফ্‌ না করে আর থাকতে পারবে না। অনেক ভেবে-চিন্তে এ মতলব বের করেছি,—বুঝলে ?"

আমিও ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় তাহা দেখিবার জন্য দিন কয়েক কাশীতেই রহিলাম।

* * * *

আজ বৃহস্পতিবার। গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে ভোলানাথ বৈঠকখানা ঘরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছে এবং তাহার বদনমণ্ডল একেবারে বেগুনীবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সহসা এরূপ ভাব-বৈলক্ষণ্য দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কিহে, অত ভাবছ কি ? কলেজ গেলে না যে।

ভোলানাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া কহিল—"আর কলেজ! আর্য্য-নারীদের কি আর আগেকার মত পতি-ভক্তি আছে ? দেশটা একেবারে উচ্ছন্ন যেতে বসেছে।

আমি কহিলাম—"এ আবার তোমার কি রকম ভাবান্তর হল ? ব্যাপারটা সহজ করেই বলনা কেন ?"

সে একখানি পত্র আমার দিকে নিক্ষেপ করিয়া কহিল—

"এই দেখনা কি লিখেছে। একটু আগে ডাকপিয়ন চিঠিখান দিয়ে গেল। ফিলজফি-চর্চ্চা আর হয় না দেখছি ?"

ব্যাপার কতকটা পরিষ্কার হইয়া আসিল। চিঠিখানি লইয়া দেখিলাম ভোলানাথের স্ত্রী লিখিয়াছেন—

প্রিয়তম আর্য্যপুত্র,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দিত হলাম। শুনেছি কাশী অতি সুন্দর স্থান। সেখানে গিয়ে বাস করেছ তা' বেশ ভালই হয়েছে। আমিও শীঘ্রই তোমার কাছে গিয়ে থাকব,— নইলে বিদেশে একলা তোমার বড় কষ্ট হবে। আমি আর্য্য-নারী হয়ে কেমন করে তা' সইব ? সুতরাং পূজার ছুটিতে বাড়ী এসে আমায় নিয়ে যেয়ো—নতুবা নরুদা'কে সঙ্গে নিয়ে আমায় নিজেই যেতে হবে। মোটের ওপর আমি নিশ্চয় যাচ্ছি। সেজন্যে ভেব না। আমার ভালোবাসা ও প্রণাম নিয়ো। ইতি তোমারই অনুগতা

শ্রীচরণের দাসী—মল্লিকা।

পুনশ্চঃ—

খুকী ভাল আছে। আসবার সময় কাশীর নতুন জিনিস ভাল যা' পাও খুকীর জন্যে নিয়ে এসো। আর আমার জন্যে একজোড়া জরদা রঙের 'বেনারসী'—বুঝলে ?

আমি পত্র পাঠ করিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম। ভোলানাথ বলিল "ভাই, এসব serious ব্যাপার নিয়ে হাসি-ঠাট্টা নয়। কি রকম ফ্যাসাদে ফেললে বল দেখি। বিশেষ চিন্তার কারণ হ'য়ে পড়ল। এখন ইয়ার্কী ছাড়, উপস্থিত কি করা যায়, গম্ভীর হ'য়ে উপদেশ দাও দেখি।

আমি কহিলাম—"ভোলানাথ, তুমি একটা নেহাৎ অপদার্থ,—নিতান্ত বাঁদর, তাই এ রত্ন চিনলে না একেই বলে খাঁটী আর্য্যনারী। যাক্, ও সব কথা। পাটনার আফিসে ত ছুটীর দরখাস্ত ক'রে এসেছিলে। পরে পদত্যাগ পত্রও পাঠিয়েছ নাকি ?

ভোলানাথ—না, এখনও ইস্তফা দিই নি। কিন্তু চাকরীতে আর ইচ্ছে নেই। জীবনটা—বুঝলে কিনা—স্রেফ্ মরুভূমি !

আমি আর বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন বোধ করিলাম না। সেই দিনই বন্ধুবরের কর্ণ-আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে ষ্টেশনে লইয়া আসিলাম এবং পাটনা রওনা হইলাম। পাটনায় আসিয়া তাহার departmentএর বড় বাবুকে সমস্ত কথা বলিয়া তাহার ছুটীর দরখাস্ত সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। ভোলানাথ পুনরায় ভাল মানুষের মত আফিসের dutyতে মনোনিবেশ করিল।

উপসংহার

আমি পাটনা হইতে বদলী হইয়া মজঃফরপুরে আসিয়াছি। এখানে আসিবার পূর্ব্বে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় ভোলানাথের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে পারি নাই, - কেবল তাহাকে আমার মজঃফরপুরের ঠিকানা দিয়া একটি পত্র লিখিয়া আসিয়াছিলাম। বহুদিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। পুনরায় পত্র লিখিব ভাবিতেছি এমন সময় 'পোষ্টম্যান' একখানি চিঠি দিয়া গেল। দেখিলাম ভোলানাথের চিঠি। পত্রপাঠ করিয়া জানিলাম ভোলানাথ অতি মনোযোগ সহকারে আপিসের কার্য্য করিতেছে। তাহার কার্য্যে উপরওয়ালা সকলেই খুব সন্তুষ্ট। আপিসে একটি উচ্চপদ খালি হওয়াতে সাহেবের সুপারিসে সে উহা লাভ করিয়াছে। বেতন অনেক বাড়িয়াছে,—সুতরাং তাহার আর্য্যনারী ও আর্য্যকন্যা লইয়া সে পাটনায় সুখনীড় বাঁধিয়া বাস করিতেছে। বেতন বৃদ্ধি হওয়ায় অনটনের দায় হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। তাহার আর্য্যনারীও বেশ হিসেবী— বুঝিয়া সুঝিয়া সংসার চালাইয়া থাকেন। কন্যাটির প্রতি ভোলানাথের অত্যন্ত স্নেহ মমতা হইয়াছে। যতক্ষণ সে বাসায় থাকে মেয়েটি তাহার কাছেই থাকে। রজত মুদ্রার কিঞ্চিৎ সংখ্যাধিক্যহেতু ভোলানাথের চেহারায় বেশ লালিত্য' ফিরিয়াছে,—কিন্তু পুনরায় দাড়ি রাখিয়াছে। যাহা হউক, চাকুরে বাঙালীর জীবনে ইহা অপেক্ষা আর বড় মুক্তি কি হইতে পারে ? তাই বন্ধুবর পত্রের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"

সমাপ্ত।

থিয়েটারের গুপ্তকথা

[নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

তৃতীয় বর্ষ ২য় খণ্ড—২৫শে আষাঢ় ১৩৩৩
৩১শ সপ্তাহে প্রকাশিতের পর

(২৩)

মেজবাবু যে রকম রেগেছেন (তার ওপোর মদের ঝোঁক) আজ যদি এ অবস্থায় কোন রকমে "নারাণ বাবুটীকে" তাঁর সামনে পান, তা হ'লে নিশ্চয়ই তাকে একেবারে (যাকে বলে সেই) "কীচক বধ" করে ফেলবেন। "নারাণবাবু" সদ্‌গোপের ছেলে;—মদই খান আর যত বেহায়াই হোন্, মেজবাবুর এতকাল "মোসায়েবী" কচ্ছেন, সুতরাং তাঁর "ধাত" তিনি ভালরকমই বোঝেন বইকি! তাই ঠিক "তাল" বুঝে তিনি সুড়ুৎ করে সরে পড়েছেন। ম্যানেজার মশাইয়ের ইঙ্গিতে আমি ষ্টেজের ভেতরে গিয়ে দেখি,—বাইরের এই "মেজবাবু নারাণবাবু সংবাদটা" ভেতরে এর মধ্যে পৌঁছে গেছে। তখন "ড্রপ্"সিন্ পড়ে কন্‌সার্ট বাজছিল। ষ্টেজের ওপোর চারদিকে মেয়ে পুরুষরা সবাই জড় হয়ে এই কথা নিয়েই খুব "গুলতুনি" লাগিয়ে দিয়েছে। ভিতর দিকে যেখানটা নীরোদ বাবুর ঘর, তার সামনে ভিড়টা কিছু বেশী। সেখানে দেখি ম্যানেজার মশাই দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে খুব বক্‌ছেন! আমি ষ্টেজে যেতেই সবাই আমাকে জেরা করতে সুরু কল্লে,—"কি ব্যাপার হয়েছিল?" "নারাণ বাবুর সঙ্গে তোমার ঝগড়া হ'ল কেন?" "মেজবাবু নারাণ বাবুকে খুব নাকি মেরেছেন?" যার যা মনে এল সে আমাকে সেইরকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ কল্লে। আমি যেন কেমন "হক্‌চকিয়ে" গেলুম। একসঙ্গে এতগুলো প্রশ্নের কত জবাব একা দোবো বলুন! কাকেও কিছু না বলে, বড় জোর "কি জানি কি হয়েছে—" এই সোজা উত্তরটা দিয়ে বরাবর ম্যানেজার মশায়ের দিকে চললুম।

শুনতে পেলুম, কেউ কেউ বল্‌ছে—"এ ছোঁড়া যেখানে যাবে সেইখানেই একটা না একটা গণ্ডগোল বাধাবে।" কেউ বল্‌ছে—"বোধ হয় ভেতোরে কিছু রহস্য আছে।" একজন বললে—"মেয়েমানুষ ঘটিত ব্যাপার নিশ্চয়ই।"

আমি ম্যানেজার মশাইয়ের পাশে এসে দাঁড়াতেই শুনলুম তিনি নীরোদ বাবুকে বল্‌ছেন—"যাক্—যাক্ নীরোদ বাবু, বাইরের ঝগড়া ঘরে আন্‌বার দরকার কি?"

নীরোদবাবু খুব চড়াস্বরে বললেন—"না—না—আপনিই বলুন না, নারাণ বেচারার অপরাধ কি? টাকা দেওয়া হয়েছে, রসীদ চেয়েছে। এতেই একেবারে তাকে গালাগাল, মারধোর?"

ম্যানেজার মশাই বললেন—"না—না—তিনি তো মারেন নি! দুটো একটা কটু কথা বলেছেন বটে—"

ও হরি! এতক্ষণ দেখতে পাই নি। ম্যানেজার মশায়ের কথা শেষ না হ'তে সেই নারাণ মাতালটা নীরোদ বাবুর সাজঘরের এককোণ থেকে বেরিয়ে এসে সেইরকম জড়ানো কথায় বলতে আরম্ভ কল্লে—"আমাকে মারবে? কোন্ শালা আমার গায়ে হাত তোলে একবার দেখি! ওঃ ··ভারী শালার মেজবাবু! শালার পয়সা আছে ব'লে খোসামোদই না হয় করি, তা বলে কি ওর মোসায়েব? না ওর চাকর?"

ম্যানেজারবাবু তাকে একটু ধাক্কা মেরে বললেন—"বোসো—বোসো নারাণ—আর বেশী মর্দ্দানি করতে হবে না! ভাগ্যে বুদ্ধি ক'রে এখানে ঢুকে পড়েছিলে—তাই এ যাত্রা রক্ষে পেয়ে গেছ। আর ওস্তাদি ফলিয়ে বেরুতে হবে

না। মেজবাবু যে রকম রেগেছেন,—মেরে এখুনি তক্তা বানিয়ে দেবেন।"

নীরোদবাবু বললেন—"হ্যাঁ - রেখে দিন্ না মশাই—মারে সব শালা! কি বলব—আমার পোষাক পরা রয়েছে! নইলে আমি নিজে সঙ্গে করে নারাণকে ও শালার সামনে নিয়ে যেতুম। দেখতুম—ওর কত ক্ষমতা,—আর কত পয়সা।"

নারাণ বসে বসে বলতে লাগলো—"নীরো, চল্‌না একবার পোষাকপরা শুদ্ধু,—শালা মণ্ডল গুষ্টিকে দুই ইয়ারে একেবারে নিকেশ করে দিয়ে আসি—"

ইত্যবসরে যোগীবাবু এসে বললেন—"কি হচ্ছে এখানে নীরোদ? এদিকে আধ ঘণ্টার ওপোর যে কন্‌সার্ট বাজছে,—ড্রপ তুলতে হবে না?"

ম্যানেজার মশাই বললেন—"আমি এত করে বলছি যে, ও সব কথা ষ্টেজের ভেতর আমাদের দরকারই বা কি? তা কেই বা আমার কথা শোনে?"

যোগীবাবু বললেন—"আপনি বাইরে যান্ দিকি ম্যানেজার মশাই ঐ মাতালটাকে সঙ্গে নিয়ে! নইলে আমাদের কাজের বড়ই গণ্ডগোল হচ্ছে।"

নীরোদবাবু বললে—"ও একপাশে পড়ে আছে, তাতে তোমাদের কি ক্ষতি হয়েছে যোগীবাবু? বন্ধু মানুষটাকে একা পেয়ে শালারা খুন করবে, আমি এখানে থাকতে?"

ম্যানেজার। "তা ওকে চুপি চুপি গাড়ী ডাকিয়ে বাড়ী পাঠিয়ে দোবো?"

নী। "ও একা বাড়ী যেতে পারবে না,—বিশেষ এ অবস্থায়।"

ম্যানেজার মশাই বিশেষ রকম অপ্রসন্ন হয়ে যোগীবাবুকে বললে—"তা হ'লে নাচাব! দিন যোগীবাবু ড্রপটা তুলে দিন। এ রকম করে থিয়েটার চালানো আমার বাবারও সাধ্য নেই।" বলেই তিনি বাইরে চলে গেলেন।

ম্যানেজার মশাই চলে যাবার পর আমিও সাজঘরের দিকে আমার "পার্ট" (বীরবল) সাজতে চলে গেলুম। সেখানে যাবামাত্রই সকলেই যেন আমাকে একেবারে ছেঁকে ধরলে! আমিও বলব না,—তারাও ছাড়বে না। অগত্যা আমাকে সমস্ত ভেঙ্গে বলতেই হ'ল।

তখন "ড্রপ" উঠে থিয়েটার আরম্ভ হয়ে গেছে। আমার চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে বেরুতে হবে। আমি পোষাক টোষাক প'রে সাজঘর থেকে যেমন বেরিয়ে এসেছি,—সামনে দেখি নীরোদ বাবু। আমাকে দেখেই নীরোবাবু বলে উঠলো—"এই যে মেজকর্ত্তার পেয়ারের মোসাহেব? ভদ্রলোকের ছেলেকে একলা পেয়ে খুব একচোট নিয়ে নিলে।"

আমি ভয়ে থতমত খেয়ে বললুম—"তা আমার কি অপরাধ বলুন? আমি তো মেজবাবুর মোসাহেব নই,—তাঁর চাকর।"

একটু শ্লেষের হাসি হেসে নীরোদবাবু বললে—"কি রকম চাকর বাবা? মনিবকে কি "গুন্" করলে নাকি? চাকরের জন্যে বন্ধুকে গালাগাল দেয়—খুন করতে যায়,—সেতো বড় সাধারণ মনিব নয়।"

কোথা থেকে আমার বরাৎক্রমে গিরিবালা বিবি সেখানে উপস্থিত হ'লেন। নীরোদবাবুর কথা শুনে তিনিও একটু শ্লেষ ক'রে তার দিকে চেয়ে বললেন—"মনের মতন বিশ্বাসী চাকর হলে মনিব ছেলের মতন ভালবাসে নীরোদ বাবু। চাকরকেই লোকে ভালবাসে আর মোসাহেবকে শ্যাল কুকুরের মতন ঘেন্না করে, এটা কি আপনি জানেন না?"

ব'লেই তিনি আপনার সাজঘরের দিকে চ'লে গেলেন। নীরোদবাবু তবু ছাড়েনা। আমার পানে চেয়ে সেই রকম শ্লেষ করেই বলতে লাগলো—"অমন বড়লোক মনিবকে এত বশ করলে কি ক'রে হে ছোকরা? বিধবা বোন্ টোন্ কিছু গছালে নাকি?"

রাগে আমার আপাদমস্তক জ্বলে উঠলো। আমি তখুনি বলে ফেললুম—"বামুন কায়েতের ছেলে সেকাজ করে না মশাই। সে সব কাজ ছোট জাতের,—বুঝলেন?"

বলেই আমি অন্যদিকে চলে গেলুম। নীরোদবাবু সে কথা শুনে আমাকে তেড়ে মার্ত্তে এলোনা বটে,—কিন্তু শুনতে পেলুম অত্যন্ত ইতরের মত আমায় গালাগাল দিচ্ছেন।

সে সবগুলো এত জঘন্য—এত অশ্লীল—যা' হাড়ী মুদ্দো-ফরাসেও বোধ হয় মুখে আনতে লজ্জাবোধ করে।

থিয়েটার সুশৃঙ্খলে হচ্ছে। আর কোনও গোলমাল নাই। কেবল যখনই আমি নীরোদ বাবুর ঘরের কাছে যাই তখুনি শুনি, দুই বন্ধুতে (সেই মাতাল "নারাণ" আর নীরোদ বাবু মিলে) আমাকে আর সেই সঙ্গে "মেজবাবুকে" ঐ রকম অশ্লীল গালাগালি ক'চ্ছে। শুনতে শুনতে এক একবার মনে হ'ল,—যা থাকে কপালে, মারি গিয়ে ঝুবেটার মুখে দু'চার ঘুসো। কিন্তু জোরে তো পারব না। কাজেই গায়ের রাগ গায়ে মেরে সয়েই গেলুম। থিয়েটারের লোক গুলোও সবাই "পাজির পাঝাড়া।" দলের অধিকাংশ লোক দেখি—নীরোদ বাবুকে এ রকম গালাগালি "মুখখারাপ" কর্ত্তে নিরস্ত করবার চেষ্টা না করে, উল্টে তারা সবাই মিলে তাকে "উস্‌কে" দিয়ে আরও রগড় দেখছে।

হঠাৎ সেখান দিয়ে "শরৎবিবি" যাচ্ছিল,—আমাকে দেখে—আমার হাতটী ধরে বললে—"এখানে দাঁড়িয়ে মিছে মাথা গরম করছ কেন? ও এখন সমস্ত রাত্তির ঝাঁঝাবে,—এইবার দুপাত্র পেটে পড়েছে কিনা। আমি ওর ব্যাপার এতদিন তো দেখে নিলুম।"

শরৎবিবির সঙ্গে নীরোদবাবুর সেই সেদিনের ঘটনার পর থেকে আর কোনও সম্বন্ধ নেই,—লোকের মুখে শুনে-ছিলুম। আমি তার সঙ্গে সেখান থেকে একপাশে সরে এসে বললুম—"উঃ, এ রকম গালাগাল আর সহ্য হয় না। দেখছেন—কি বিশ্রী অশ্রাব্য গাল দিচ্ছে। অথচ আমাদের কোন দোষ নেই।"

শরৎবিবি আমাকে একটা পান খেতে দিয়ে বললে—"কি করবে ভাই? থিয়েটার করতে এলে অনেক সহ্য করতে হয়। মুখপোড়া (সেদিন দেখলে তো) আমাকে কাটতেই এসেছিল। খ্যাংরা মারি অমন বাবুর মাথায়। সাতজন্ম কেউ না জোটে ত ও রকম লোক যেন কেউ বাড়ীতে কখনো ঢুকতে না দেয়।"

গিরিবালা সেখানে এসে বললেন—"শরৎ! এ থিয়েটারটা কি হ'ল বল দিকি ভাই? এর যেন "মা-বাপ" কেউ নেই। শুনছিস্ সাজ ঘরে বসে একটা বাইরের মাতালকে নিয়ে নীরোদবাবু কি রকম কেলেঙ্কারী কচ্ছে।"

শরৎ বললে—"কি বলব বল দিদি? সাত বছর ঐ ছোটলোকের সঙ্গে ঘর ক'রে আমার হাড় ভাজা-ভাজা হ'য়ে গেছে। বিস্তর দুঃখে তবে ওকে ছেড়েছি।"

আমার দিকে ফিরে গিরিবিবি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন—"তুমি বাপু কাল থেকে আর থিয়েটারে এসো না! তুমি তো বড় ঘিরেতে আছ। মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে, ঐ মেজবাবুরই কাছে তো তুমি "রাজার চাকরি" কর, কেন এ পাপের ভোগ তোমার? আমি তোমাকে ভাল কথাই বলছি,—তুমি এ জ্যায়গায় আর এসো না! ছিঃ—এখানে মানুষে কাজ করে" বলিতে বলিতে গিরিবালা সেখান থেকে চলে গেলো।

মনটা আমার বেজায় খারাপ হয়েছিল। শুধু আমাকে গালাগালি দিলে আমার এত কষ্ট হ'ত না; তার কারণ,—এই ছোটলোকের জ্যায়গায়,—এই থিয়েটারে যত ইতরের সংসর্গে এরকম গালাগাল আমার একরকম "গা সওয়া" হয়ে গিয়েছিল। আমার বড় রাগ—বড় দুঃখ—বড় গায়ের জ্বালা হ'ল, এক বেটা শুঁড়ী আর এক বেটা "শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল" ঐ নারাণ, আমার চোখের সামনে মেজবাবুর মত দেবতাকে অযথা গালাগাল দিচ্ছে! থিয়েটারের লোকগুলো এমনি নেমকহারাম, কেউ বেটাদের কিছু বলছেও না,—বারণও করছে না। অথচ ঐ মেজবাবুর জন্মে মণ্ডল বাবুদের বাড়ীতে বছরে তিন চারদিন তোরা থিয়েটার করতে যাস্—চোব্য-চোষ্য খেয়ে আসিস্,—মেজবাবু তোদের থিয়েটার দেখতে এসে "মোটা মোটা" টাকা দিয়ে যান। সেই মেজবাবুকে এইরকম "পিতৃ উচ্ছন্ন, মাতৃ উচ্ছন্ন" ক'রে তোদেরই সামনে গাল দিচ্ছে, আর তোরা সকলে অম্লানবদনে দাঁড়িয়ে শুনছিস্—আর তাই নিয়ে মজা কচ্ছিস্? আমি ছেলেমানুষ, তার ওপোর একা—আমি এর কি শোধ দোবো? আমার দ্বারা এর কি প্রতীকার হতে পারে? কিন্তু—হয়। এর খুব প্রতীকার এখুনি হয়, যদি একবার আমি এ ব্যাপারটা মেজ-বাবুকে জানিয়ে দিয়ে আসি! তা হ'লে এখুনি দুশোটা "নীরোদ শুঁড়ির" আর পাঁচশো "নারাণ মাতালের" মাথা

মাটীতে গড়াগড়ি খায়। কিন্তু না। অতটা করে কাজ নেই। সে একটা মহা কেলেঙ্কারীর ব্যাপার হয়ে যাবে। এইসব কথা ভেবে আমি "গায়ের রাগ গায়েই মেরে" চুপ করে সহ্য করতে লাগলুম। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম, মা কালীর নামে দিব্বি করলুম,—"কাল থেকে আর এ থিয়েটারে আসবো না।"

(২৪)

আমাকে চুপ করে ভাবতে দেখে শরৎকুমারী একটু হেসে বললে—"ভেবে ভেবে কি পাগল হয়ে যাবে নাকি? এই বেঞ্চিটায় একটু ঠাণ্ডা হয়ে বোসো দিকি!" বলেই আমার হাতটা ধরে একরকম জোর করে আমাকে উইংসের পাশে যে বেঞ্চিখানা পাতা ছিল, তার ওপোর বসিয়ে নিজে আমার পাশে বসে পোড়লো! সত্য কথা বলতে কি, এরকম ভাবে একজন মেয়েমানুষের পাশে বসে আমার ভারী লজ্জা করতে লাগলো। তার আবার সে বেঞ্চিটায় তখন কেউ বসে ছিল না। অ্যাক্‌টার, অ্যাক্‌ট্রেসরা সকলেই যে যার কাজে ব্যস্ত, বিশেষতঃ নতুন নাটকের প্রথম অভিনয় রাত্রি। আমি শরৎকে—(মাথাটা নীচু করে) বললেম—"নিশ্চিন্তি হয়ে বসে পড়লেন যে? আপনার এ "সিনে" বেরুতে হবে না?"

শরৎ। "নাঃ। আমার "ফুল বেগমের" পার্ট একেবারে সেই পঞ্চম অঙ্কে। এই তো মোটে তৃতীয় অঙ্ক শেষ হবে। তোমার তো "বীরবলের" পার্ট—চতুর্থ অঙ্কের শেষে।"

আমি। "হ্যাঁ। তারও তো বিশেষ দেরী নেই।"

শরৎ। "ওমা—কি বলে দেখ! দেরী নেই কি? এখনও একটা ঘণ্টা যায় নাম। তা এরই মধ্যে তুমি ও সব "জাব্বা-জোব্বা" এঁটে বসলে কেন?"

আমি। "কর্ম্ম এগিয়ে রাখাই ভাল। নতুন পার্ট,—আজ প্রথম ষ্টেজে বেরিয়ে দুটো কথা বলতে পাব, বীরত্ব দেখাতে পারব! আগে থাকতেই প্রস্তুত হয়ে নিলুম।"

শরৎ। "তা বেশ করেছ। ধীরে-সুস্থে সেজে নেওয়াই ভাল। নইলে সেই তাড়াতাড়িতে "পাউডার" মাখতে "ভুষো কালী" মেখে ফেলবে, তরোয়াল নিতে গিয়ে শুধু "খাপ"খানা নিয়ে বেরিয়ে যুদ্ধ করতে লেগে যাবে?" বলেই শরৎকুমারী খিল্ খিল্ করে হেসে আমার গায়ে একরকম ঢলেই পোড়লো।"

আমি তার ভাবগতিক দেখে যেন সিঁটকে গেলুম। কিন্তু তখুনি মনে হ'ল—"এতে দোষই বা কি? ওর মনে তো কোন পাপ নেই! নিতান্ত বন্ধুভাবেই এরকম সরল প্রাণে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইছে। আমার এতে লজ্জা করবার কারণ কি?"

আমাকে কোন কথা কইতে না দেখে শরৎ ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বলে উঠলো—"হ্যাঁ ভাই দীনু! সত্যি কি গিরি দিদির কথা শুনে কাল থেকে আর তুমি থিয়েটারে আসবে না?"

আমি। "সেই রকমই তো মনে করেছি।"

শরৎ। "না—না—অমন কাজও কোরো না। থিয়েটার ছাড়তে যাবে কি দুঃখে? ঐ একটা ছোটলোক মাতালের জন্যে তোমার "আখের" নষ্ট করবে?"

আমি। "আমার আবার এ থিয়েটারে "আখের" কি আছে বলুন? এসে পর্য্যন্ত "কাটা সৈন্য" সাজছি। আজ হঠাৎ দু' লাইন পার্ট একটু ভদ্রলোকের মত পেয়েছি—"

শরৎ। "ঐ দু' লাইন পার্ট থেকেই তো বড় "পার্ট" পায়! আজ তুমি ভাল করে "প্লে" করতে পারলে, নিশ্চয়ই তুমি দর্শকদের নজরে পড়ে যাবে। তা হ'লেই ম্যানেজার মশাই, যোগীবাবু তোমাকে পরের পরে নতুন নাটকে বড় পার্ট সাজতে দেবে। তোমার এমন সুন্দর চেহারা—" বলেই শরৎ বিবি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। আমিও প্রথমটা তার কথাবার্ত্তা গুলো তার দিকে চেয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছিলুম। কিন্তু সে এইভাবে খুব গম্ভীর হ'য়ে আমার দিকে চেয়ে থাকতেই আমি মুখ নীচু করে ফেললুম।

খানিকক্ষণ পরে শরৎ বলতে আরম্ভ করল—"তোমাকে যা সাজাবে, তাতেই সুন্দর দেখাবে! তার ওপোর তোমার গলার স্বর মিষ্টি,—কথাবার্ত্তা খুব শুদ্ধ! বাংলা লেখা-পড়াও জানো। আমি বলছি,—তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করে দেখ,—একদিন তুমি যোগীবাবুর চেয়ে বড় অ্যাক্‌টার হবে।"

আমি হেসে বললুম—"সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না। আমি থিয়েটারে বড় অ্যাক্‌টার হব, এই সব মহা-মহা রথীরা থাক্‌তে? তবেই হয়েছে?"

শরৎ। "ও—তাহ'লে গিরিদিদির কথাই তোমার শুন্‌তে হবে! আমি তাহ'লে তোমার কেউ নয়।"

আমি এ কথাটা শুনে যেন চম্‌কে উঠলুম। "শরৎবিবি আমার কেউ নয়—গিরিবালা আমার সব।" এক ঘবে মানে কিরে বাবা? বেশ্যার সঙ্গে ভদ্রলোকের ছেলের—কায়স্থের ছেলের আবার কুটুম্বিতে কি? আমি এ প্রসঙ্গটা একেবারে চাপা দেবার জন্যে বললুম—"আপনি যে এখানে এমন নিস্পরোয়া হ'য়ে আমার সঙ্গে আমার পাশে বসে—এত কথাবার্ত্তা কইছেন—নীরোদ বাবু যদি—"

কথা শেষ হ'তে না হ'তেই শরৎকুমারী একেবারে লাফিয়ে উঠে ব'লে—কে নীরোদ বাবু? তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? তার কি কোন ধার ধারি নাকি—যে সে আমাকে আর একটী কথা বলবে?"

ছি—ছি—কথাটা বেজায় বেতালা ব'লে ফেলেছি। এখন বুঝতে পাচ্ছি,—জেনে-শুনে এ রকম ন্যাকামো করাটা আমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে। শরৎ হঠাৎ যে রকম চ'টে উঠে—গলা ছেড়ে বললে,—ভাগ্যে এখানে সে সময় কেউ ছিল না, নইলে এই কথা নিয়ে আবার একটা গণ্ডগোল হ'তে পারত। আমি একটু কাকুতি মিনতি করে বললুম—"থাক, থাক—শরৎবিবি,—ও কথায় আর দরকার নেই। আমি গরীব মানুষ,—আমার ও সব বড়লোকের বড় কথায় দরকার কি?"

একটু মুচকে হেসে শরৎ খুব নরম সুরে বললে—"হ্যাঁ—থিয়েটারে বড় লোক তো সবাই! বড় লোক না হ'লে বেশ্যার সঙ্গে নাচতে আসে? তা ভাই দীনু—তুমি খুব গরীব লোক তা জানি, কিন্তু জাতে "শুড়ী" তো নও?" বলেই আবার খিল্ খিল্ করে সেই রকম আমার গায়ে ঢলে পড়ে হাসতে লাগলো। এবার কিন্তু আমার ততটা লজ্জা বা ভয় হ'ল না!

হঠাৎ শরৎ বললে—"প্রসাদ দত্ত বলে তুমি কাউকে চেনো?"

আমি। "কই না!"

শরৎ। "হ্যাঁ—হ্যাঁ—চেনো বই কি? তোমার মেজো বাবুর পেয়ারের লোক;—এখনও ব'সে মেজবাবুর সঙ্গে থিয়েটার দেখছেন।"

এতক্ষণে চিন্‌তে পারলুম—আমাদের সেই "পেসাদ" বাবু, যিনি আমার মারফতে শরৎ বিবিকে "পান আর ফুলের বোকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। তার নাম শুনে আমার মনে মনে একটু ভয় হ'ল। আমি মনের ভাব ভেবে বললুম—"হ্যাঁ চিনি! মেজবাবুর কাছে আসেন—বসেন। কেন বল দিকি?"

শরৎ বিবি মুখ টিপে টিপে হাসতে হাসতে বললে—মুখ-পোড়া মোসাহেবের আস্বা কম্ নয়।" বলেই আবার হাসি।

আমি। "কি, ব্যাপার বলুন দিকি?"

শরৎ। "ওস্তাদজি বলতেন,—কুরূপা বেশ্যা আর নির্ধন লম্পট,—দুই-ই সমান! মুখপোড়া রোজ একবার করে আমার দরজায় ঘুরে আসবে।"

আমি। "রোজ তিনি তোমার বাড়ী যান?"

শরৎ। "একদিন সদর দরজা পার হয়ে ঢুকে পড়েছিল বটে,—তারপর থেকে,—রাস্তায় দাঁড়িয়ে সদর দরজা ছুঁয়ে চলে আসে।"

আমি। "কেন? কি চান্ তিনি?"

শরৎ মুখে ওড়নার কোনটা চাপা দিয়ে বিকট হাসি দমন করে বললে "আমাকে চান্—বুঝতে পাচ্ছ না বোকারাম!" বলেই আমাকে ঈষৎ একটু ধাক্কাই মেরে দিলে।

লজ্জায় আমার মুখটা খুব নীচু হয়ে গেল।

শরৎ হাসি চেপে আর একটু যেন গম্ভীর হয়ে বললে—"পোড়া কপাল! ঐ বেপ্যাটেন্ট চেহারা, এক পয়সার মুরোদ নেই, বড়লোকের মোসাহেব,—ঐ মিন্‌সে হবেন আমার বাবু? গলায় দড়ী আমার!"

এ সমস্ত কথার জবাব আমি জানি না, জানলেও দেবার ভরসা আমার নেই। তবে একবার মনে উদয় হ'ল—"হ্যাণ্ডবিল পেলাকাঠ-বিলি-ওলা কেষ্টা তো কন্দর্প নয়! তার সঙ্গে সেদিন—" যাক্ মনের কথা মনেই রয়ে গেল।

শরৎ আমার দিকে না চেয়েই বলতে সুরু করলে—"যাকে

তাকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছি না! বাবু-টাবুর মায়া একরকম ছেড়েই দিয়েছি। দরকারই বা কি তার? এই বয়সে যা রোজগার করেছি, একটা পেট খুব চলে যাবে। তার ওপোর—আমরা থিয়েটারের এ্যাক্‌ট্রেস্। থিয়েটার করবার গতর থাকলে, বাবুর পয়সার কোন তোয়াক্কা রাখতে হবে না। "বাবু" দু' দিনের,—"থিয়েটার" চিরদিনের। কি বল?"

আমি এ কথায় খুব খুসী হয়েই বললুম—"সে তো সত্যি কথা! এতে বরং গৌরব আছে—নাম আছে, আর পয়সা তো আছেই।"

শরৎ আপন মনে বলে যেতে লাগলো,—"পয়সা দিয়ে বাবু আসে,—তার সঙ্গে মেয়েমানুষের বাধ্য হয়ে লোক দেখানো সম্বন্ধ রাখতে হয়। সেটা পুরোদস্তুর ব্যবসাদারী—দোকানদারী ব্যাপার। সেখানে সমস্ত জোর জোরাবতি ব্যাপার। বাবু ভাবেন—"পয়সা দিই—মেয়েমানুষ আমার গোলাম থাকতে বাধ্য।" মেয়েমানুষ ভাবে—"পয়সা খাই,—মন না চাইলেও বাবুর গোলামী করতে আমি বাধ্য।" সব স্থলে,—তুমিই বল না ভাই দীনু, মনের মিল,—প্রাণের ভালবাসা-বাসি কখনো পুরুষ মানুষ—মেয়েমানুষে হ'তে পারে?"

আমি তন্ময় হ'য়ে শরৎকুমারীর কথাবার্ত্তা শুনছিলুম। এমন চমৎকার কথার বাঁধুনি,—এমন সুন্দর তার কথা কইবার ভঙ্গিমা, আমি শুনতে শুনতে যেন মুগ্ধ হয়ে গেলুম। হঠাৎ ব'লে ফেললুম—"তা হ'লে আপনি কি বলতে চান, বেশ্যারা বাবুদের ভালবাসে না? পছন্দ করে না?"

শরৎ। "ভালবাসা আর পছন্দ করা দুটো যে সম্পূর্ণ আলাদা জিনিষ ভাই! ভালবাসা হ'ল প্রাণের জিনিষ, এর সঙ্গে পয়সা, টাকাকড়ির কোন সম্বন্ধ নেই। পাঁচজন পয়সা দিচ্ছে, তার মধ্যে একজনকে হয়তো পছন্দ হ'তে পারে। বাজারে যেমন মাল খরিদ করতে গিয়ে—পাঁচটা ভালমন্দ জিনিষের ভেতর থেকে লোকে একটা পছন্দ করে দাম দিয়ে জিনিষ নিয়ে যায় না? সেটাকে ঠিক ভালবাসা বলে না। একটা গান আছে জানো?—

"কত সোণার মানুষ মেলে, মন মেলে না!"

আমি হেসে বললুম—"আপনার তা হ'লে সোণার মানুষ বিস্তর মিলেছে, কেবল "মন" অর্থাৎ মনের মত মানুষ মিলছে না, এই দুঃখু?"

শরৎ আরও গম্ভীর হয়ে নীচের দিকে চেয়ে আঙুল খুঁটতে খুঁটতে বললে—"আমার মনের মানুষ মিলেছে—কিন্তু—"

আমি। "কিন্তু কি?"

শরৎ। "কিন্তু আমি তার মনের মতন নই।"

আমি। "সত্যি নাকি? সে এই কথা আপনাকে বলেছে নাকি?

শরৎ। "স্পষ্ট মুখের ওপোর বলে নি। তবে তার কথার ভাবে বুঝতে পেরেছি।"

আর বেশী কথা কইতে ভরসা হ'ল না। কি জানি—কি বলতে কি বলে ফেলব। আস্কারা পেয়ে অনেকটা অনধিকার-চর্চ্চা করে ফেলেছি। আমি চুপ করে রইলুম।

(ক্রমশঃ)

ঘোড় দৌড়

[শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষ বি-এ]

(১)

শনিবার সকালে ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ে কতকগুলি হকার নীল মলাটের বই লইয়া হাঁকিতেছিল "বাবু, রেসিং গাইড।" দেবেনবাবু মার্চ্চেণ্ট অফিসে চাকরী করেন। ট্রাম হইতে নামিয়া দুই এক পা যেমন অগ্রসর হইয়াছেন অমনি একজন হকার তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আসিল এবং সুমুখে বইখানা ধরিয়া বলিল "বাবু, রেসিং গাইড চাই?" দেবেনবাবু দাঁড়াইলেন, হকারের নিকট হইতে বইখানি লইয়া এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টাইয়া দেখিয়া তাহা পকেটের মধ্যে পুরিয়া চলিতে লাগিলেন। হকার তাঁহার পিছনে পিছনে আসিয়া বলিল "বাবু দামটা?"

দেবেনবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "ও: ভারী ভুল হয়ে গেছে!" তাহার পর একটা সিকি হকারের হাতে গুঁজিয়া দিয়া তিনি দ্রুত চলিতে লাগিলেন, কারণ অফিস বসিবার নির্দ্ধারিত সময়ের আর মাত্র দুইটী মিনিট বাকী ছিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে অফিসে আসিয়া দেবেনবাবু দেয়াল ঘড়িটীর দিকে একবার তাকাইলেন, শঙ্কায় তাঁহার বুকটা ভরিয়া উঠিল। তিনি তাড়াতাড়ি আপিস ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নিকটের এক সহকর্ম্মীর হাত হইতে কলম ছিনিয়া লইয়া সই করিবার জন্য সাহেবের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাহেব তখন ষ্টেটস্ম্যান কাগজখানির এ-পিঠ ও-পিঠ উল্টাইয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা "ডাইভোর্স কেস"টায় মনোযোগ দিয়াছেন এমন সময় দেবেনবাবু মাথাটী হেঁট করিয়া কপালে হাতের পাঁচটী আঙুল ছুঁইয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

আড়চোখে দেবেন বাবুর দিকে সাহেব একবার তাকাইলেন, তাহার পর ছাই ঝাড়িয়া সিগারেটটী মুখে দিয়া বলিলেন, "বাবু পনের মিনিট হয়ে গেছে, এত দেরী করলে তোমার চাকরী রাখা দায় হবে।"

সাহেবের সুমুখে খোলা ঘড়িটীর উপর সকরুণ দৃষ্টি রাখিয়া দেবেনবাবু হাত দুইটী কচলাইয়া বলিলেন "স্যর, এবারটী আমায় মাপ করুন।" সাহেবের নিকট সেলামবাজী ও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াও দেবেন বাবুর ভয় ঘুচিল না। তিনি দেখিলেন কাঁচের আবরণ ভেদ করিয়া আগুনের ভাঁটার মত দুইটী জ্বলজ্বলে চোখ যেন তাঁহার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তিনি ভয়ে ভয়ে বড়বাবুর নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলেন। বড়বাবু দেখিতে অতি সুপুরুষ অর্থাৎ তাঁহাকে অতি সুশ্রী বলা যাইতে পারিত যদি তাঁহার বেউড় বাঁশের মত দেহখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ না হইয়া প্রভু সাহেবের মত ফিকে হইত। যাহা হউক বড়বাবুর সুমুখে দেবেনবাবু যুক্তকরে দাঁড়াইলেন। দিন কয়েক পূর্ব্বে কোথায় এক গার্ডেন পার্টির নিমন্ত্রণে ঠাণ্ডা লাগিয়া বড়বাবুর গলাটা একটু ভাঙ্গিয়াছিল। তিনি একটু কাশিয়া ভাঙ্গা কাঁশির মত মধুর স্বরে বলিলেন "রোজ এত লেট হলে কি করে চলবে দেবেনবাবু? সে কাগজগুলো সব তৈরী হয়েছে ত?"

হাত দুইটী একটু বেশী কচলাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া দেবেন বাবু বলিলেন "আজ্ঞে একটু"—

বীরপুঙ্গব শ্রীরামের অনুচর অশোক বনে সীতা দেবীকে বন্দিনী দেখিয়া রাবণ রাজার প্রতি আক্রোশ দেখাইবার জন্য যেমন দুই পাটী দন্তের সাহায্য লইয়াছিল, বড়বাবুও তেমনি খুনীর চেয়েও বেশী অপরাধী দেবেন বাবুর প্রতি মুখখানি বিকৃত করিলেন, এবং সেই সঙ্গে সাহেবের সম্মান রক্ষা করিয়া জলের মধ্যে কামান ছোঁড়ার মত চাপা অথচ অনভিজ্ঞ কোরাস গায়কদের মত পাঁচটী সুরের মূর্চ্ছনা দিয়া জোর করিয়া বলিলেন "আজ যে ডেসপ্যাচ করতে হবে, মনে থাকে না বুঝি?"

বিনীত দেবেনবাবু ধীরে ধীরে বলিলেন "আজ্ঞে সবই প্রায় কমপ্লিট, একটু খানি যা বাকি, তা এখুনি সেরে দিচ্ছি।"

বড়বাবু বলিলেন "যান শীগ্‌গীর; বারটার আগে চাই।"

বড়বাবু অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছেন, দেবেন বাবুর বুকখানি দিগ্বিজয়ী বীরের মত ফুলিয়া উঠিল। তিনি নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া একটা শান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

টেবিলের উপর জলভরা গ্লাসের সমস্তটা এক নিঃশ্বাসে শেষ করিয়া দেবেনবাবু বড় বড় ডেবিট বইএর পাতা উল্টাইয়া কাজে মনোযোগ দিলেন কিন্তু নীল মলাটের ছোট্ট বইখানা তাঁহার অতিষ্ঠ মনটাকে আজ কাজহারা করিয়া দিতেছিল—দেবেন বাবুর আজ বড় ভুল হইতে লাগিল। জরদা পানে রঙিন বড়বাবুর বিশাল দন্তের অপরূপ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাগাদা আসিল, "আজ কি ডেসপ্যাচ হবে না ?"

"আজ্ঞে এই যাই" দেবেনবাবু একতাড়া কাগজ লইয়া বড়বাবুর সুমুখে উপস্থিত হইলেন,—ভয়ে তাঁহার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল, পাছে যদি কোন ভুল বাহির হইয়া পড়ে! দুই চারিবার উল্টাইয়া বড়বাবু ডেবিট নোটের কোণে একটা ছোট্ট সই করিয়া দিলেন। দেবেনবাবুও আরামের নিঃশ্বাস ছাড়িয়া নিজের যায়গায় আসিয়া বসিলেন।

"বেয়ারা—বেয়ারা, দরোয়ান!"

বুকের উপর লাল সুতায় "জি" মার্কা সাদা চাপকান পরিয়া একটী লোক দুইটী হাত দিয়া পাগড়ীটা মাথায় আঁটিতে আঁটিতে দেবেন বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। তখনও লক্ষ্ণৌ ঠুংরীর এক কলি তাহার বিশাল কণ্ঠের মৃদু নর্ত্তনের সঙ্গে ঠোঁটের ফাঁক দিয়া বাহিরে আসিতেছিল। দেবেনবাবু বলিলেন, "দেখ রামসিং একগ্লাস পানি লে আও।"

রামসিং বিশাল গুম্ফে একটা চাড়া দিয়া মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "উসি বাৎ মাৎ বলিয়ে বাবু, হাম দরোয়ান হ্যায় "

দেবেনবাবু অপ্রতিভ হইয়া গেলেন, ভয়ও হইতে লাগিল পাছে দরোয়ান সাহেবের নিকট কোন কথা বলিয়া দেয়, কেননা সাহেব পূর্ব্ব হইতেই বাবুদের সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যেন দরোয়ান, বেয়ারাদের কোনরূপ ফরমাস খাটান না হয় এবং এটুকুও জানাইয়া দিয়াছিলেন যে বেয়ারারা বাবুদের জন্য নিয়োজিত হয় নি।

অফিস ঘরের একটা অন্ধকার কোণে একটা মাটীর কলসী ছিল, অফিসের জন্মদিন হইতে তাহা এ পর্য্যন্ত ব্যবহার হইয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহার গায়ের লাল রংটা কিছু পাকাশে, কিছু সবুজ হইয়া পড়িয়াছিল। কলসীটির গায়ের "চাচ" যদি কোন বটানিষ্ট দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিতেন তাহা হইলে হয়ত তিনি একটা এমন জিনিষ আবিষ্কার করিতে পারিতেন যাহা বৈজ্ঞানিক জগতে সম্পূর্ণ নূতন এবং অভাবনীয় হইত। যাহা হউক সেই কলসী হইতে একগ্লাস জল লইয়া দেবেনবাবু চোখ, মুখ ও কাণ উত্তমরূপে ধুইয়া অবশিষ্ট জলটুকু দ্বারা তাঁহার উত্তপ্ত বুকের দারুণ পিপাসা নিবারণ করিলেন। ছোট্ট বুক সাইজের একটা টিনের কৌটা পকেটে ছিল, দেবেনবাবু সেইটী খুলিয়া দুইটী পান মুখে দিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিজের আসনে দুইটা বাজিবার প্রতীক্ষায় আসিয়া বসিলেন।

(২)

সাড়ে তিনটার সময় হাঁপাইতে হাঁপাইতে দেবেনবাবু ঘোড়দৌড়ের মাঠে আসিলেন। তখন চারিদিকে লোক সমাগম হইয়াছে—মাঠের সকল দিকেই মানুষের ভীড়। রাস্তাগুলো অফিস যান ও মোটর গাড়ীতে ভরিয়া গিয়াছে। এখনও লোক সমাগমের বিরাম নাই। এদিকে বিব্রত মোটর চালক প্রভুকে শীঘ্র পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সুমুখে জনস্রোতের মাঝ দিয়া মোটর চালাইতেছে ও বিপদজ্ঞাপক "হর্ণ" ঘন ঘন বাজাইতেছে; ওদিকে কাল মিশমিশে ঘোড়ার লাগাম টানিয়া ধরিয়া সহিস চীৎকার করিতেছে, "হট্ বাঙ্গালী"। যাহা হউক জীবনের অনেকগুলি বিপদের মুখে নিরাশার কালিমা মাখাইয়া দেবেনবাবু টিকিট ঘরের পথে উপস্থিত হইলেন। সুমুখে অগণিত মানুষ—পিছনটাও দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল। পিছনের ব্যগ্র টিকিট ক্রেতাগণ আগ্রহের আতিশয্যে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করিয়া সুমুখের দিকে ধাক্কা দিতে লাগিল। দেবেনবাবু কোন রকমে একখানা টিকিট কিনিয়া বাহির হইলেন এবং খোলা মাঠের একটুখানি গরম হাওয়া খাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার কপাল হইতে ফোয়ারার মত ঘাম ছুটিতেছিল। তিনি পকেটে হাত দিলেন, কিন্তু তল্লাসী হাতখানা রুমালের অনুসন্ধানে নিরাশ হইয়া বাহির হইয়া পড়িল। দেবেনবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন, ব্যাকুল চোখ দুইটী জনস্রোতের উপর দিয়া একবার ঘুরিয়া

আসিল ; তাঁহার ঠোঁট দুইটী একটু কাঁপিয়া উঠিল। টিকিট হাতে করিয়া একটী ভদ্রলোক ব্যস্ত হইয়া বসিবার গ্যালারীর দিকে ছুটিতেছিলেন, দেবেনবাবু কাটা পকেটটীতে হাত ঢুকাইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া বলিলেন "দেখছেন মশায়, পিক্ পকেট।"

ভদ্রলোকটী একটু দাঁড়াইলেন, বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন "পাঞ্জাবীর পকেটে টাকা নিয়ে ভীড়ে আসা আমাদের মত গরীবদের কাজ নয়।" ভদ্রলোকটী দ্রুত চলিতে লাগিলেন।

"আরে মশাই দাঁড়ান না।"

বক্রদৃষ্টিতে দেবেন বাবুর দিকে লোকটী তাকাইয়া বলিল, "পিছু ডাকছেন কেন! আজ আর কিছু হবে না দেখছি।"

হাত দুইটী জোড় করিয়া দেবেনবাবু বলিলেন "মশায়, মাপ করবেন।"

ভদ্রলোকটী দাঁড়াইলেন, দেবেনবাবু তাঁহার কাছে যাইয়া বলিলেন "আজ "বারবারা" বাজী মারবে।"

ভদ্রলোকটী বিস্মিত হইয়া গেলেন, বলিলেন "আরে মশায়, ওটা যে একেবারে রোতো ঘোড়া।"

দেবেনবাবু একটু হাঁসিলেন। বুকখানির সব স্থানটুকু অধিকার করা গুপ্ত বিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তিটা মনের উচ্ছ্বাসে একটু খানি হালকা হইয়া পড়িল। দেবেনবাবু বলিলেন, "আমি কি বাজে খবর দি' মশায়!" এই বলিয়া দেবেনবাবু পকেট হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিলেন, ভদ্রলোকটীর হাতে দিয়া বলিলেন "আমি "বারবারার" সহিসের কাছে খবর পেয়েছি—না হলে দেখছেন না ওর দাম আজ এক টাকায় আট টাকা।" ভদ্রলোকটী কোন কথা বলিলেন না, গ্যালারী হইতে নামিয়া বাজীর ঘোড়া বদলাইয়া দেবেন বাবুর পাশে আসিয়া বসিলেন।

দেবেনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়ের নাম?"

ভদ্রলোকটী বলিলেন "আমার নাম কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমি অফিসে কাজ করি।" তৎপরে দেবেন বাবুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া কার্ত্তিকবাবু বলিলেন "আচ্ছা "বারবারার" বংশ পরিচয়টা আপনার জানা আছে?"

দেবেনবাবু একটু হাসিলেন, বলিলেন "তা আর নেই, ওর বোন ভার্জীতে বাজী মেরেছে, বাপ যদিও বুড়ো হয়েছে কিন্তু এখনও আমেরিকায় বাজী মারছে।"

কার্ত্তিকবাবু বলিলেন, "হাঁ "বারবারার" বংশ পরিচয়টা খুব আশাপ্রদ বটে, কিন্তু আজ যে বাজী মারবে তা কি করে জানলেন?"

দেবেনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "আপিসে ছুটী হলে পাঁচটার পর কি আর বাড়ী যাই,—ঘুরে ঘুরে সব আস্তাবলে খোঁজ নি। একদিন গোকুল দাসের আস্তাবলে "বারবারার" সহিসের কাছে খবর পেলাম "ভাইসরয়" কাপ "বারবারাই মারবে, নইলে ব্যারাকপুরে ননুটাটার জেনেও কি আমি সর্ব্বস্ব "বেট" করতে পারি।"

ক্রমে দুই একটী করিয়া ঘোড়া ময়দানে আনান হইল। যাঁহার যেটী প্রিয় তাঁহাকে দেখিয়া তিনি উল্লাস করিতে লাগিলেন। "বারবারা" মাঠে আসিল। দেবেনবাবু ও কার্ত্তিকবাবু আনন্দে হাততালি দিতে লাগিলেন। দেবেনবাবু বলিলেন, "দেখছেন, "বারবারার" দাঁড়াবার ভঙ্গিটা দেখছেন।"

নির্দ্ধারিত সময়ে "ষ্টার্টের" হুইসিল পড়িল। ঘোড়াগুলি দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কার্ত্তিকবাবু পকেট হইতে "বাইনাকুলার" বাহির করিলেন, দেখিলেন "বারবারা" সবাইকে পিছনে ফেলিয়া দৌড়াইতেছে। আনন্দে তাঁহার দুইটী চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি "বাইনাকুলার"টা দেবেনবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন "বন্ধু, আজ ত রাজা!" দেবেনবাবু বাইনাকুলার চোখে ধরিলেন, তাঁহার হাত কাঁপিয়া উঠিল, আতঙ্কে চোখ দুইটী আয়োতন ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম হইল, মুখখানা কাগজের মত সাদা হইয়া গেল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেবেনবাবু অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিলেন—"হায় হায়, বারবারার প্লেস নেই।" জয়ন্তীয়া ব্রীজের উপর পাঞ্জাব মেলের বিধ্বংসী আর্ত্তনাদে যাত্রীগণের হৃদয়ে ভীতি চাঞ্চল্যের মত কার্ত্তিকবাবু চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন—সেকি মশায়, বারবারা যে ফার্ষ্ট যাচ্ছিল।" দেবেনবাবু হতাশ হইয়া বাইনাকুলারটা চোখ হইতে নামাইলেন। কার্ত্তিকবাবু তাড়াতাড়ি চোখে ধরিলেন। "কি সর্ব্বনাশ ফার্ষ্ট থেকে একেবারে ফোর্থ!" তাঁহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির

হইবার মত হইল। কার্ত্তিকবাবুর সমস্ত রাগ দেবেনবাবুর উপর গিয়া পড়িল। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, এক ধাক্কায় অপয়া লোকটাকে গ্যালারী হইতে নীচে ফেলিয়া দেন! দেবেনবাবু হাঁটুর উপর হাত রাখিয়া তলা দিয়া মাথাটা চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার দুইটী চোখ দিয়া তখন জল পড়িতেছিল।

(৩)

রেস কোর্স হইতে বাহির হইয়া দেবেনবাবু গঙ্গার একটা ছোট ভাঙ্গা ঘাটের পৈঠার উপর আসিয়া বসিলেন। তাঁহার পা মদ্যপানে অনভ্যস্থ নূতন মাতালদের মত টলিতে লাগিল। গঙ্গার স্নিগ্ধবায়ু তাঁহার উত্তেজিত স্নায়ু মণ্ডলীর উপর ধীরে ধীরে নিজের অধিকার ছড়াইয়া দিল—দেবেনবাবু কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন; কিন্তু সতত দুর্ব্বল মনটাকে তিনি কিছুতেই নিজের আয়ত্তে আনিতে পারিতেছিলেন না—উদ্বেগ ও অনুতাপ তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল। কল-নাদিনী জাহ্নবীর স্নেহময়ী ক্রোড়ে চিরবিশ্রাম লাভ করিবার জন্য তাঁহার অনুতপ্ত মনটা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—অশ্রু প্রবণ চোখ দুইটী দিয়া অনর্গল জলধারা বহিতে লাগিল। দেবেনবাবু জামা জুতা উন্মোচন করিয়া পৈঠার উপর রাখিলেন দুই একটী ভাঙ্গা ধাপ অতিক্রম করিয়া নামিয়া পড়িলেন। তাঁহার চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল—বিদ্রোহী মনটা অবরুদ্ধ নগরীর বন্দিনী রমণীর মত অসহায় ক্রন্দনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দেবেনবাবু আরও দুই ধাপ নামিলেন। বাল্যাবধি রোগজীর্ণ এবং সহরের আলো ও বাতাস বর্জ্জিত অপ্রশস্ত গৃহপ্রাঙ্গণে পরিবর্দ্ধিত তাঁহার রুগ্ন দেহের অনুরূপ ছোট বক্ষটীতে তরঙ্গের মৃদু স্পর্শ হইল। তখন আকাশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে—মাঝে মাঝে দুই একটি মিট্‌মিটে তারা মেঘের ঘন আড়ম্বরের ফাঁক দিয়া একটু বাহির হইয়া আবার ডুবিয়া যাইতেছিল। দেবেনবাবু তখনও কাঁদিতে-ছিলেন। জল ভরা চোখের ঝাপসা জ্যোতির ভিতর দিয়া বায়স্কোপের ফিল্মের মত আত্মীয় অনাত্মীয় স্ত্রী-পুত্রের সকল ছবিগুলো একে একে ফুটিয়া উঠিল; বিশেষতঃ রুগ্ন শিশুটীর ম্লান মুখখানি তাঁহার বুকে যেন সজোরে আঘাত করিতে লাগিল। তিনি জল হইতে উপরে উঠিলেন। সিক্তবসনে দেবেনবাবু ইতস্ততঃ একটু কি ভাবিলেন, তাহার পর জামা জুতা লইয়া তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন।

আম কাঠের ছোট দরজার বহিঃপ্রদেশে লাগান ছোট লোহার কড়াটী সজোরে নাড়িয়া দেবেনবাবু ডাকিলেন—"দরজা খোল।" তখন রাত ১১টা বাজিয়া গিয়াছে। কড়াটী উন্মত্তরূপে নাড়িয়া দিয়া দেবেনবাবু দরজায় ধাক্কা দিলেন। ভিতর হইতে অস্ফুট বামাকণ্ঠে উত্তর আসিল, "কে?"

দেবেনবাবু বলিলেন—"আমি।" তৎপরে দুইটী হাত দিয়া কপাটের উপর ভর করিয়া তিনি একটু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কপাটের ফাঁক দিয়া সরু আলোর রেখা বাহির হইয়া পড়িল, ভিতরের মৃদু পদক্ষেপে চুড়ির ঈষৎ কম্পন দেবেন বাবুকে আত্মহারা করিয়া ফেলিল, আজ যে তিনি কপর্দ্দক হীন পথের ভিখারী! দুয়ার উন্মুক্ত হইল—দেবেন বাবু ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেলেন।

কেরোসিনের ল্যাম্পটী তাড়াতাড়ি ভূতলে নামাইয়া রমণী দেবেন বাবুকে ধরিয়া ফেলিলেন, বিস্মিত আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"একি তোমার কাপড় ভিজল কি করে?"

দেবেনবাবু কোন কথা বলিলেন না, শুধু ম্লান চক্ষু দুইটী পত্নীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিলেন।

দেবেনবাবুকে একখানি শুষ্ক বসন পরিতে দিয়া তাঁহার পত্নী ব্যথিত করুণস্বরে বলিলেন, "একটু বস—তোমার খাবারটা আনি।"

গমনোদ্যতা পত্নীর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া দেবেনবাবু বলিলেন—"আজ আর কিছুই খাব না অনু!"

(৪)

পরদিন প্রাতে তাপমান যন্ত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে দেবেনবাবুর ১০৫ ডিক্রীর উপর জ্বর হইয়াছে। পত্নী অনিমা স্বামীর আকস্মিক জ্বরের ক্রম বর্দ্ধিত উত্তাপে বিশেষ ভীতা হইয়া পড়িলেন। রোগ-কাতর স্বামীর মুখখানা তাঁহার নয়ন ও মনে বিষম উদ্বেগের চিহ্ন আঁকিয়া দিল। অনিমা রুগ্ন স্বামীর মস্তকের বিধ্বস্ত চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে বলিলেন, "হরেন ডাক্তারকে ডাকতে পাঠিয়েছি, কই এখনও তো এলেন না!

হতাশাময় চোখ দুইটী পত্নীর মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়া দেবেনবাবু ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন—"আবার ডাক্তার!" তিনি পাশ ফিরিয়া শুইলেন, বলিলেন "একটু জল।" অনমা জল দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার একটু পরেই দেবেনবাবুর কন্যা আসিয়া সংবাদ দিল, "মা, ডাক্তার বাবু আসছেন!"

ক্ষণপরে হ্যাট কোট পরিহিত একটী বাঙ্গালী সাহেব গৃহে প্রবেশ করিলেন—তাঁহার জুতা যোড়াটী মিশমিশে কালো, নীচে রবার হীল বসান—হাতে একটী ছোট ব্যাগ—চোখে বিজ্ঞতা সূচক পুরু কাঁচের হাতলহীন চশমা কাণের সঙ্গে সরু সোণার চেন দিয়া আটকান। হরেণ ডাক্তার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেবেনবাবুর নিকট গমন করিলেন। বিছানার উপর শুইয়াই দুইটী শীর্ণ হাতদিয়া দেবেন বাবু ডাক্তারকে নমস্কার করিলেন। হরেণ ডাক্তার টুপিটা বগলে চাপিয়া ধরিয়া একটু মাথা নাড়িয়া প্রতি নমস্কার জানাইলেন এবং হাতের ব্যাগটী উন্মোচন করিয়া তাপমান যন্ত্রে শরীরের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া মুখখানি বিশ্রী রকমে বিকৃত করিয়া বলিলেন, "তাইত নম্বরটা একটু বেশী দেখছি। ইয়েস (yes) আর কোন কমপ্লেন আছে নাকি?" দেবেন বাবু মৌন দৃষ্টিতে ডাক্তার বাবুর দিকে তাকাইলেন, তাঁহার রক্তহীন চোখ দুইটীর কোণে দুই-ফোঁটা অশ্রু জমিয়া গেল। হরেণ বাবু বক্ষ পরীক্ষা করিলেন সঙ্কুচিত ওষ্ঠ তাঁহার নাসাগ্র স্পর্শ করিবার উপক্রম করিল। পকেট হইতে সেন্ট মাখান রুমাল বাহির করিয়া তিনি চশমার কাঁচ দুইটী মনোযোগের সহিত মুছিয়া একটা ঢোক গিলিলেন, "তাইত কেসটা একটু বেয়াড়া গোছ, ইয়েস, তা ভয় নেই"। তৎপরে হরেণ বাবু দাঁত দিয়া অধরোষ্ঠ চাপিয়া ধরিয়া কি একটু ভাবিলেন এবং এক টুকরা কাগজ লইয়া তাহার উপর দুই চারিটী আঁচড় কাটিয়া বলিলেন, "ইয়েস্ আধঘণ্টা অন্তর তিনবার খাওয়াতে হবে; তাতে কিছু না হলে, ইয়েস্ আমার আর একবার আসতে হবে। ভিজিটের টাকাটা"—অনিমা চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তাইত হাতে তাঁহার একটী পয়সাও নাই। দেবেনবাবু পাশ ফিরিয়া শুইলেন। হরেণ ডাক্তার একটু জোর করিয়া বলিলেন, "কই টাকাটা?" অনিমা দুয়ারের আড়াল হইতে চাপা গলায় বলিলেন, এখন হাতে নেই শীগগীর পাঠিয়ে দেবো"। হরেণবাবু একটু কষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন, "ইয়েস্, সবাই ওই কথা বলে থাকে, কিন্তু কাজে হয়ে ওঠে না। টাকা না পেলে, ইয়েস্, ওষুধ দিতে পারব না"। প্রেস্‌ক্রিপসনটা হাতে লইয়া হরেণবাবু উঠিয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "ইয়েস্, এটা তাহলে ছিঁড়ে ফেলি?" হরেনবাবু ঔষধের ব্যাবস্থা পত্র ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া অনিমা অস্থির হইয়া পড়িলেন—ব্যাকুল মনের রুদ্ধ আবেগ তাঁহার সর্ব্ব শরীরটা কাঁপাইয়া দিয়া গেল। লজ্জা ও অপমানে তাঁহার মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিল। নিঃশব্দে দরজা উন্মুক্ত করিয়া তিনি হরেণবাবুর সম্মুখে আসিয়া কাতর-কণ্ঠে বলিলেন "ওষুধটা দয়া করে পাঠিয়ে দিন। আমি এক্ষুনি দাম পাঠিয়ে দিচ্ছি"। হরেণ ডাক্তার চলিয়া গেলে অনিমা স্বামীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন কেমন বোধ হচ্ছে"? দেবেনবাবু কোন উত্তর করিলেন না, নিস্ফল আক্রোশে তাঁহার বুকের ভিতরটা তখনও টিপ টিপ করিতে ছিল।

(৫)

"ওগো শুনছ"

অনিমা হাতের কাজ ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দেবেনবাবুর নিকট আসিলেন, মুখের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন"? দেবেন বাবু পত্নীর মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। অনিমা বিছানার উপর বসিয়া দেবেনবাবুর শীর্ণ হাতখানি তুলিয়া লইলেন, বলিলেন, "বুকের যন্ত্রণাটা একটু কমেছে কি"? "হুঁ" বলিয়া দেবেনবাবু নীরব রহিলেন, একটু পরে বলিলেন, মিছামিছি আর ডাক্তার ডাকছ কেন অনু"? অনিমার বুকখানি ধড়াস্ করিয়া উঠিল, চোখ মুখে এক অব্যক্ত ব্যথা গভীর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া অনিমা বলিলেন "ডাক্তার বাবু বলেছেন, রোগটা এমন কিছু সাংঘাতিক নয়, তবে একটু ভোগাবে"।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া দেবেনবাবু বলিলেন, "সুরোকে একবার আনলে না কেন"?

সুর অর্থাৎ সুরবালা দেবেনবাবুর জ্যেষ্ঠা কন্যা। আজ দুই বৎসর হইল সুরবালার বিবাহ হইয়াছে। এই সুরবালার বিবাহে দেবেনবাবুকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে। বসত বাটী খানি পর্য্যন্ত বন্ধক রাখিয়া দেবেনবাবুকে তিনটী হাজার টাকা

এক একটী করিয়া সুরবালার শশুরকে গণিয়া দিতে হইয়াছিল, ইহা ছাড়া প্রত্যেক পূজা পার্ব্বণে যথেষ্ঠ তত্ত্ব তাঁহাকে করিতে হইত, নইলে বালিকা বধূর সামান্য দোষগুলি তার প্রমাণ হইয়া—দেবেনবাবুর চৌদ্দ পুরুষের উদ্ধার সাধন হইত। সুরবালার বিবাহের পর হইতেই সুদখোর পাওনাদারগণ দেবেনবাবুকে তাগাদার পর তাগাদা করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল. ঘোর অমানিশার অন্ধকারে পথহারা পথিক যেমন দূরস্থিত অল্পোজ্জল আলেয়ার আলো দেখিয়া সেই দিকেই ছুটিয়া যায়, আশা লইয়া যদি নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে উপনীত হইতে পারে; দেবেনবাবুও তেমনি পাওনাদারগণের মধুর আপ্যায়নে দিশেহারা হইয়া জুয়াড়ীর দলে মিশিলেন, ক্ষীণ আশা লইয়া যদি তিনি কখন একটা দাঁও মারিতে পারেন! দুই চারি দিন হার জিতের পর দেবেনবাবু পাকা জুয়াড়ী হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি যখন মনে স্থির করিলেন যে সর্ব্বনাশের সোপানে তিনি ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছেন তখন তাঁহার মনের বিপুল আবেগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার ক্ষমতা তাঁহার সঙ্কুচিত সঙ্কল্পের ছিল না। ভৌতিক গ্রস্ত মানুষের মত—বিবেকবুদ্ধিহীন হইয়া তিনি জুয়া খেলায় আত্মনিয়োগ করিলেন।

উপর্য্যুপরি হারিবার পর দেবেনবাবু একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন—পত্নীর অলঙ্কার গুলি পর্য্যন্ত তিনি ঘুচাইয়া আসিলেন। দেবেনবাবু পাশ ফিরিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, "সুরোকে একবার আনাও"। কিয়ৎক্ষণের জন্য দেবেনবাবু নীরব রহিলেন, কিন্তু স্থির থাকিতে পারিলেন না। মনোবেদনা তাঁহাকে একরূপ পাগল করিয়া তুলিয়াছিল। দেবেনবাবু একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "অনু, আর কখন রেসে যাব না"। দেবেনবাবুর ছোট মেয়েটী তাঁহার কাছ ঘেঁসিয়া বসিল, বলিল, "হাঁ বাবা, রেস কি করে খেলে ? টাকা পয়সাগুলো বুঝি মাঠের উপর ছড়িয়ে দেয়!" দেবেনবাবু একটু কাসিলেন, বলিলেন "এবার তোমায় একটা হার গড়িয়ে দেবো"। বিভা বলিল, "অফিস থেকে টাকা এনে বুঝি। অফিসের কথা শুনিয়া দেবেনবাবুর বুকখানা তোলপাড় হইয়া উঠিল, তাইত ছুটীর জন্য ত সাহেবের নিকট আবেদন করা হয় নাই, এতদিনে নিশ্চয়ই চাকরীর অবসান হইয়াছে! সাহেবের রোষ কষায়িত নয়ন দুইটী বার বার তাঁহার মনটীকে একটা বিপুল আশঙ্কার ভীষণ অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিল—পরক্ষণেই স্ত্রীকন্যার অনাহার ক্লিষ্ট বিশুষ্ক বদন তাঁহার চোখের জ্যোতিহীন পর্দ্দার উপর অঙ্কিত হইয়া উঠিল। দেবেনবাবু উঠিয়া বসিবার জন্য চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দেহের দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে একেবারে সর্ব্বশক্তি হীন করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়ের গভীর উন্মাদনা আজ বিবেকের তপ্ত কটাহে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিবার আর একবার নিস্ফল চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শক্তিহীন হাত দুইখানি তাঁহার দেহের ভার রাখিতে সমর্থ হইল না। তিনি বিছানার উপর পড়িয়া গেলেন। দুর্ব্বল শরীরে এতখানি পরিশ্রমের ফলে হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়া গেল, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তাঁহার চোখ মুখ দিয়া—যেন ছুটাছুটী করিতে লাগিল। ক্রমে দেবেনবাবুর দেহটী আনন্দহীন হইতে লাগিল চোখ দুইটী বৃহৎ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। দেবেনবাবুর কন্যা পিতার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বড়ই ভয় পাইল। সে চীৎকার করিয়া উঠিল। অনিমা পাশের ঘরে কোলের মেয়েটীকে দুধ খাওয়াইতেছিলেন, ছুটিয়া আসিলেন। তিনি দেবেনবাবুর হাতখানি একটু নাড়িয়া দিয়া ডাকিলেন, "ওগো।" দেবেন বাবু কি একটা অজ্ঞাত ইঙ্গিত করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া তখন জল পড়িতেছিল। অনিমা অর্দ্ধশুষ্ক চোখের জল আঁচল দিয়া মুছাইয়া দিয়া দেবেন বাবুর বক্ষ স্পর্শ করিলেন, দেখিলেন সেখানকার স্পন্দন থামিয়া গিয়াছে।

মায়ের দরদ

(ধারাবাহিক উপন্যাস)

[শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত]

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

দেদার বক্স নাহক্ কথা কাটাকাটি করিবার কোন প্রয়োজন দেখিল না। সে সংক্ষেপে বলিল—"না আমি টাকা দিতে পারিব না।" এই বলিয়া সে পুনরায় ধূমপান মানসে দাওয়ার দিকে চলিল।

পীনার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইল, সে কোন মতেই উহার গতিরোধ করিতে পারিল না। একমুহূর্ত্ত মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, পরে ছুটিয়া যাইয়া দেদার বক্সের গতিরোধ করিয়া কহিল—"আমার বাবা তোমাকে পড়াইয়াছেন। সে জন্যও কি তাঁর প্রতি তোমার কোন কৃতজ্ঞতা কিম্বা কর্ত্তব্য নাই? টাকাটাই তুমি বড় দেখিলে? তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিলে না, কিন্তু আমি সত্যই তোমার টাকা শোধ করিতে পারিতাম।"

দেদার বক্স হাঁ করিয়া পীনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার মুখ দিয়া আর একটীও কথা বাহির হইল না। সে পীনাকে এতটুকু বয়েস হইতে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এমনটী তো কখনো দেখে নাই। হঠাৎ তাহার মনে হইল পীনা আর ছেলেমানুষটী নাই, সে বড় হইয়াছে, সে এখন পূর্ণ যৌবনা নারী। অতএব বুঝি তাহার কথার কিছু মূল্য আছে। সে তাহার অশ্রুপ্লাবিত মুখখানি দেখিল, তাহার মিনতিভরা চোখদু'টি দেখিল, ক্রমাগত অশ্রুর বেগ রোধ করিবার চেষ্টায় নাসিকার অগ্রভাগ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিল, বক্ষের দ্রুত উত্থান পতনে উহার ভিতর ঝড় বহিয়া যাইতেছে বুঝিল,—তাহার মনের ভিতর কি হইল অন্তর্য্যামী জানেন। মরুভূমিতেও ওয়েসিস্ থাকে, পাষাণের বুক ফাটিয়াও প্রস্রবন বাহির হয়—এখানেও তেমনি কিছু হইল কি না কে জানে।

দেদার বক্সের সহসা মনে হইল, চুপ করিয়া থাকা অকর্ত্তব্য। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল—"আমি টাকা দিতে পারি, যদি তুমি—যদি তুমি—তুমি—" তাহার পর আর যে কি বলিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। তাহাকে বেশীক্ষণ ভাবিতে হইল না, পীনা কহিল—"যদি তুমি এই উপকারটী কর, তবে চিরকাল তোমার কেনা হইয়া থাকিব, তোমার বাঁদী হইয়া থাকিব। কিন্তু শুধু তো টাকা দিলে হইবে না—আমাকে সঙ্গে লইয়া তোমাকে পারে যাইতে হইবে, থানায় যাইয়া দারোগা বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া সব বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

আবার এক ঝঞ্ঝট,—তাই কি ছাই ছোটখাট ঝঞ্ঝাট? থানায় যাইয়া দারোগার সহিত কথা কওয়া! অন্য সময় অন্য কেহ তাহাকে এমন অসম্ভব অনুরোধ করিলে সে সোজা কথায় বলিত—"পারিব না।" কিন্তু তাহার মনে হইল—ঝঞ্ঝাট একটু আছে বটে—তাই বা এমন বেশী কি? আর পীনা যখন বলিতেছে তখন যাওয়াই যাক। কি আর হইবে? দারোগাবাবুও তো মানুষ,—ধরিয়া তো আর আস্তই গিলিয়া ফেলিবে না।

দেদার বক্স রাজী হইল। সেই রাত্রেই তাহারা রওনা হইল। নৌকায় দেদার বক্স, পীনা ও নৌকার দাঁড় টানিবার জন্য একজন মাত্র লোক এই তিনজনে চলিল।

(১২)

থানার দারোগাবাবু দেখিলেন, মেয়েটী দেখিতে বেশ, বয়েসও কাঁচা—ঠিক তিনি যেমনটী চান। অতএব তিনি দেদার বক্সের সহিত নগদ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকায় রফা করিয়া

করিমকে মুক্তি দিতে অঙ্গীকার করিলেন। দেদার বক্স কাপড়ের খুঁট হইতে পঞ্চাশটি টাকা গুণিয়া দারোগা বাবুর শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিল। দারোগাবাবু টাকাগুলি উত্তমরূপে গুণিয়া এবং বাজাইয়া লইয়া উহা বাটীর ভিতর গৃহিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পরে নূতন এক সর্ত্ত উপস্থিত করিলেন। তিনি বলিলেন এরূপ প্রকাশ্য দিবালোকে সর্ব্বসমক্ষে তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে পারেন না, অতএব রাত্রি এক প্রহরের পর পীনা একাকিনী আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলে তিনি আসামীকে তাহার হস্তে অর্পণ করিবেন। মূর্খ দেদার বক্স বুঝিতে পারিল না, রাত্রিতে পীনাকে একাকিনী কেন আসিতে হইবে। সে দারোগা বাবুকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে পীনা ছেলেমানুষ, রাত্রিতে একাকিনী আসিতে পারিবে না—বরঞ্চ প্রয়োজন হইলে সে নিজে আসিতে পারে। দারোগাবাবু হাসিয়া বলিলেন—"তাও কি হয় ?"

দারোগাবাবু যখন একবার বলিয়াছেন তাহা হয় না, তখন তাহা কোন মতেই হইতে পারে না। অতএব পীনাকে আসিতেই হইবে। পীনা এতক্ষণ চুপ করিয়া দারোগা বাবুর কথা শুনিতেছিল, কি ভাবিতেছিল সেই জানে। সহসা দারোগা বাবুকে কহিল—"আমি আপনার সহিত গোপনে দু' একটা কথা কহিতে চাই।" দারোগাবাবু হাতে স্বর্গ পাইলেন।

পীনা দারোগা বাবুকে আড়ালে বলিল—"এখানে অনেক লোক থাকিবে আমি পারিব না। তার চেয়ে আপনি আমার বাপকে লইয়া আমাদের নৌকায় আসুন না।"

দারোগাবাবু হাসিয়া বলিলেন—"এখানে কেহ থাকিবে না, আমি একাকী তোমার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিব।" পীনা কোন মতেই শুনিল না, দারোগা বাবুকে নৌকায় আসিবার জন্ত কোমল অথচ দৃঢ়ভাবে জেদ করিতে লাগিল।

দারোগা। তোমাদের নৌকায়ও তো লোক থাকিবে।

পীনা। না উহাদিগকে এইবেলা ওই সামনের চরে পার করিয়া দিবার ব্যবস্থা করুন।

দারোগা। তোমার বাবা ?

পীনা। তিনি সন্ধ্যার পর চোখে কিছু দেখিতে পান না। কাণেও বড় একটা শুনিতে পান না।

দারোগা বাবু অগত্যা রাজী হইলেন। এমন সুন্দর মুখের কাতর অনুরোধ অবহেলা করা যায় কি ? তৎক্ষণাৎ তাহার আদেশে একজন লোক পীনাদের নৌকা দেখিয়া আসিতে এবং দেদার বক্স ও তাহার সঙ্গীকে নিকটস্থ চরে পার করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে গেল। দারোগাবাবু পীনাকে বলিয়া দিলেন তুমি যাইয়া ভাল করিয়া স্নানটান করিয়া পরিষ্কার হইয়া থাক। তোমার মুখে বড় পেঁয়াজের গন্ধ। ভাল করিয়া মুখ ধুইতে ভুলিও না। পীনা নৌকায় যাইয়া দারোগা বাবুর আদেশ পালনে যত্নবান হইল।

দারোগা বাবুর দোষ কি ! অনেক সময় অতিরিক্ত বুদ্ধিমান লোকও অনেক সোজা কথা বুঝিতে পারে না।

(১৩)

রাত্রি একপ্রহর অতীত হইয়াছে। পীনা একাকিনী নৌকার ছইয়ের ভিতর বসিয়া আপন মনে কি ভাবিতেছিল, আর মাঝে মাঝে মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছিল। তাহার মাথার উপর যে একটা গুরুতর বিপদ ঝুলিতেছে, তখন তাহার মুখ দেখিয়া কেহই তাহা অনুমান করিতে পারিত না ; বরং সাফল্যের আনন্দ যেন তাহার মুখের উপর খেলা করিতেছিল। নৌকায় একটী কালীমাখা লণ্ঠনে একটী কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছিল। তাহা হইতে প্রচুর ধূম ও যৎসামান্ত আলোক নির্গত হইতেছিল। সেই আলোটুকু হাওয়া লাগিয়া মাঝে মাঝে কাঁপিতেছিল এবং পীনার মুখের উপর লুকাচুরি খেলিতেছিল। পীনা স্নান করিয়াছে, চুল আঁচড়াইয়াছে, দারোগা বাবুর প্রেরিত একখানি ডুরে সাড়ী পরিধান করিয়াছে, প্রচুর মসলা দিয়া পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়াছে, তাহাকে দেখিয়া সে পীনা বলিয়া আর চিনা যায় না।

একটু পরে দুইজন রক্ষী ও করিমকে লইয়া দারোগা বাবু উপস্থিত হইলেন। রক্ষী দুইজন তীরে রহিল, দারোগা বাবু ও করিম নৌকায় উঠিল।

প্রথম দর্শনেই করিম পীনাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল—চোখের জলে তাহাকে স্নান করাইয়া দিল, আর ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। পীনার মুখে কথা ছিল না, চোখের জলে তাহার দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া গিয়াছিল। দারোগা বাবুর কিন্তু এসব বাড়াবাড়ী মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। তিনি কহিলেন—"করিম, এই কয়দিনের অনাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় তুমি কাতর হইয়া পড়িয়াছ। তোমার বিশ্রাম প্রয়োজন তুমি একটু নিদ্রা যাও।"

করিম দারোগা বাবুর এই অপ্রত্যাশিত দরদের কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহার বিশ্বাস ছিল, সে নৌকায় উঠিলেই নৌকা ছাড়িয়া দিবে, তারপর সে বিশ্রাম করিবে. এখন সে দেখিল, নৌকায় পীনা ভিন্ন আর কেহ নাই, আবার দারোগা বাবু এমন ভাবটা দেখাইতেছেন, যেন তিনি নৌকায় কায়েমীভাবেই বসবাস করিতে চাহেন, তিনি যে সেখান হইতে শীঘ্র নড়িবেন এমন কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। তার উপর আবার তিনি তাহাকে নিদ্রা যাইবার জন্য বারবার অনুরোধ করিতেছেন ইহারই বা অর্থ কি? সে কিছু বুঝিতে পারিল না, তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল।

পীনা নিজ ইচ্ছাশক্তির বলে চোখের জল রোধ করিল, তারপর দারোগা বাবুকে নৌকার ছইয়ের উপর যাইয়া বসিতে বলিয়া পিতার সান্ত্বনায় প্রবৃত্ত হইল। ব্যাচারা করিমের মনের কোনে একটা সন্দেহ উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছিল, আর মাঝে মাঝে কামড় দিতেছিল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় টুঁটি টিপিয়াও তাহাকে বধ করিতে পারিতেছিল না। ক্রমশঃ উহার বিষ দাঁতের কামড় তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। পীনা দেখিল সে শত চেষ্টায়ও পিতাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। তখন সে তাহার কানের নিকট মুখ লইয়া চুপি চুপি কহিল—"বাবা, তুমি ভয় পাইও না। আমি ছইয়ের উপর দারোগার কাছে যাইতেছি! উহাকে একটু জব্দ করিতে হইবে। তোমাকে একটা কথা বলি শোন। আলো নিভাইয়া দিয়া চুপি চুপি গুড়ি মারিয়া নৌকার গলুয়ের কাছে যাও। উপর হইতে যখন আমার উচ্চহাস্য শুনিতে পাইবে তখন তাড়াতাড়ি নোঙ্গরের দড়িটা ;কাটিয়া দিও। পরে যা করিতে হয়, আমি করিব। আমার জন্য ভাবিও না। আমি আত্মরক্ষা করিতে পারিব, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার সব সময় মনে আছে যে আমি মুসলমানী, আমি তোমার মেয়ে।"

করিম যেন অকূলে কূল পাইল। সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া পীনাকে উপরে যাইবার অনুমতি দিল। পীনা উঠিয়া গেলে সে আলোটা নিবাইয়া দিয়া পীনার উপদেশ পালনে যত্নবান হইল।

একটু পরে করিম পীনার উচ্চহাস্য শুনিতে পাইল। সে তৎক্ষণাৎ পীনার উপদেশ মত নোঙ্গরের দড়ি কাটিয়া দিল। স্রোতের বেগে নৌকার গলুয়ের মুখ ঘুরিয়া গেল। দারোগা বাবু তখন সাফল্যের আনন্দে মসগুল, তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। তীরে তাঁহার যে দুইজন রক্ষী ছিল তাহারা অন্ধকারে কিছু দেখিতে পাইল কিনা বুঝা গেল না, কেননা, তাহারা কোনরূপ সাড়া শব্দ করিল না। তারপর কয়েক মুহূর্ত্ত যাইতে না যাইতেই ঝপাং করিয়া একটা শব্দ হইল,—যেন একটা কিছু ভারী জিনিষ জলে পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে নৌকার গলুই একেবারে ঘুরিয়া গেল। পীনা উপর হইতে ডাকিয়া বলিল—"বাবা, দাঁড় ধর, আমি হাল ধরিয়াছি।" করিম ঠিক কিছু বুঝিতে পারিল না, কিন্তু তাই বলিয়া কাজ করিতে দেরী হইল না। দেখিতে দেখিতে নৌকা অনেক দূরে চলিয়া গেল।

অনেকদূর যাইয়া যখন একটু হাঁফ ছাড়িবার সময় পাইল তখন করিম জিজ্ঞাসা করিল,—"পীনা! কি হ'ল বল দেখি?"

পীনা। দারোগাকে জলে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছি।

করিমের বুকের ভিতর হইতে একটা পাষাণের ভার নামিয়া গেল,—কিন্তু সে মুখে বলিল—"করেছিস কি সর্ব্বনাশী?"

পীনা। বেশ করেছি, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। ভয় নাই প্রাণে মরবে না। খুব খানিকটা নাকানি চুবানি খাবে, একপেট জল খাবে, তারপর তার লোকেরা তাকে চুলের ঝুঁটী ধরে টেনে তুলে বাড়ী নিয়ে গিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

ফলতঃ পীনার অনুমান মিথ্যা হয় নাই। দারোগাবাবু জলপান করিয়াছিলেন প্রচুর, আর নাকানি চুবানিও খাইয়া-

ছিলেন যথেষ্ট। স্রোতের বেগে অনেকটা দূর চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে।

যে চরে দেদার বক্স ও তাহার সঙ্গীকে পূর্ব্বাহ্নে পার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এতক্ষণে পীনার নৌকা তথায় আসিয়া ভিড়িয়াছিল। এইবার তাহারা উহাদিগকে নৌকায় তুলিয়া লইয়া নবীর চরের দিকে চলিল।

কলির জাগ্রত দেবতা দারোগা বাবুকে ধাক্কা দিয়া পদ্মার জলে ফেলিয়া দেওয়া যে কিরূপ গুরুতর অপরাধ এবং তাহার ফল যে কিরূপ ভীষণ হইবে তাহা ভাবিয়া করিম ও দেদার বক্সের হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। তাহারা ভাবিতেছিল বুঝি এইবার নবীর চর হইতে বাস উঠাইতে হইল। ভয় ভাবনা ছিল না শুধু পীনার। সে বরং করিম ও দেদার বক্সকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল যে দারোগা বাবুকে এখন আট দশ দিন বিছানায় থাকিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই। তাহার পরে যাহা হইবার হইবে। যদি নবীর চর হইতে বাস উঠাইতেই হয় তবে তাহার জন্য উপযুক্ত বিলি ব্যবস্থা করার যথেষ্ট সময় আছে। তাহারা যথাকালে নবীর চরে যাইয়া পৌঁছিল।

(১৪)

দেখিতে দেখিতে আরও কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে মাণিক কাদের ও টেঁপা প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। এখন তাহারা হাঁটিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারে। মাণিক ও কাদের কতদিনে তে-মোহনার চরের লোকদের উপর প্রতিশোধ লইবে তাহা ভাবিয়া মনে মনে গর্জ্জন করিতেছে, টেঁপা দিনরাত পীনার মুখখানি স্বপ্ন দেখিতেছে আর শূন্যে প্রাসাদ রচনা করিতেছে, আর টেঁপার মাতা দিনরাত খোদাকে ডাকিয়া প্রার্থনা করিতেছে যাহাতে নির্য্যাতিত দারোগা হইতে পীনা, করিম ও দেদার বক্সের কোন বিপদ না ঘটে। দেদার বক্স কোন কালেই বেশী কথা কহে না, আজকাল যেন তাহার বাক্‌শক্তি একেবারেই লোপ পাইয়াছে। পীনা দিনে তিন চারিবার টেঁপাদের বাড়ী টেঁপার মাতার কাছে আসে। দেদার বক্স সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রায় সারাদিন দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানে আর আশাপথ চাহিয়া থাকে কখন পীনা আসিবে। পীনাকে দেখিতে পাইলে তাহার মুখের উপর আনন্দের জ্যোতিঃ খেলিয়া যায়, আবার সে চলিয়া গেলে সেই আলোটুকু নিবিয়া গোধূলির মত ম্লান হইয়া যায়।

সে এটা ঠিক বুঝিয়াছে যে সংসারে বাস করিতে হইলে নানারকম ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করিতেই হইবে। তাহা যে করিতে না চায় তাহাকে হয় আত্মহত্যা করিতে হয় নয় তো সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে হয়। সে নিজে ঝঞ্ঝাটকে ভয় করে, পীনা কিন্তু একটুও ভয় করে না। ঝঞ্ঝাট বহন করিতে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তিও পীনার ঢের বেশী, আর স্থল বিশেষে উহা এড়াইতে কিম্বা উৎরাইয়া বাহির হইতে যে পরিমাণ বুদ্ধির দরকার, তাহা তাহার নিজের মোটেই নাই কিন্তু পীনার যথেষ্ট আছে। অতএব সংসার বাস করিবার জন্য পীনাকে যদি সে সঙ্গিনীরূপে পায়, সোজা কথায় পীনার সহিত যদি তাহার বিবাহ হয়, তবে বেশ হয়। এ সব কথা দেদার বক্স বেশ ভাল করিয়া মনে মনে হিসাব করিয়া খতাইয়া দেখিয়াছে। কথায় বলে হিসাবের কড়ি বাঘে খায় না। তাহার পীনাকে বিবাহ করিবার এই প্রচণ্ড ইচ্ছার অন্তরালে ব্যাঘ্রের অভ্যস্থ এই সব হিসাব ছাড়া আর কিছু ছিল কি না তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন, আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা শুধু এইটুকু জানি যে পীনার দারোগা বাবুকে জলে ফেলিয়া দিবার বৃত্তান্তটা সে যতবার মনে মনে চিন্তা করিয়াছে ততবারই সে ভারী খুসী হইয়াছে এবং পীনাকে মনে মনে হাজার তারিফ করিয়াছে। উহার ফলে যে কোন মুহূর্ত্তে নূতন বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপিতে পারে তাহাও সে জানিত, তবু কিন্তু একবারও সে খুসী না হইয়া থাকিতে পারে নাই। তাহার আরও মনে আছে পীনার অঙ্গীকার—"তুমি আমাকে সাহায্য কর, আমি তোমার বাঁদী হইয়া থাকিব।" কিন্তু পীনার অঙ্গীকারে কি আসিয়া যায়? সকলের আগে দরকার তাহার নিজের পিতার অভিমত, তারপরে দরকার পীনার পিতার অভিমত।

পীনা যেন দিন দিন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, সে কথা কহিতে কহিতে উঠিয়া গিয়া চারিধার দেখিয়া আসে,

কিম্বা কাণ খাড়া করিয়া দূরের শব্দ অথবা কথোপকথন শুনিবার চেষ্টা করে। সে যেন একটা মৃগী, কয়েকটী শাবক লইয়া শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় বনে বাস করিতেছে—যেন যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন দিক হইতে তাহার শাবকদের উপর আক্রমণ হইতে পারে—তাই সে পূর্ব্বাহ্নে সতর্ক হইতে চাহে। তাহার নিজের জন্য কোনরূপ ভয় বা চিন্তা ঈশ্বর তাহাকে দেন নাই, তাহার যত ভয় তার শাবকদের জন্য।

টেঁপার প্রতি তাহার ব্যবহার নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। টেঁপার নিতান্ত ইচ্ছা সে তাহার কাছে আসিয়া বসে, আগেকার মত দুই চারিটা কথা কয়, কিন্তু তাহার সে ইচ্ছা কোন মতেই পূর্ণ হয় না। সে কাছে আসিলেই পীনা চলিয়া যায়। সে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে, সে যখন পীনার দিকে চাহে না, তখন পীনা দূর হইতে আড়চোখে তাহার দিকে তাকায় কিন্তু চোখাচোখি হইলে চোখ ফিরাইয়া লয়। পীনা অপরের সহিত কথা কহিতে কহিতে টেঁপার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলে চকিতা হরিণীর মত যেদিক হইতে শব্দ আসে সেইদিকে তাকায়, আবার কেহ তাহা টের পাইয়াছে বুঝিতে পারিলে লজ্জায় তাহার গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠে। পীনার চরিত্রে এবং টেঁপার প্রতি তাহার ব্যবহারে এই নূতনত্ব টেঁপার মাতার চক্ষু এড়ায় নাই। সে এতকাল সংসারে বাস করিয়া অন্ততঃ এটুকুর অর্থ বুঝিবার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে! কিন্তু সে কি করিবে? ঈশ্বর যে তাহাকে নেহাৎ ছোট নেহাৎ অক্ষম করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। তাহার নিজের সংসারেও কোন বিষয়ে তাহার এতটুকু স্বাধীনতা নাই। থাকিত যদি, তবে সে অবিলম্বে পীনার সহিত টেঁপার বিবাহ দিয়া তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া ধন্য হইত। কিন্তু হায়, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার এ সাধ পূর্ণ হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। কাদেরের ও দেদার বক্সের বিবাহ না হইতে যদি টেঁপার বিবাহ হয়, বিশেষ পীনার মত সুন্দরী মেয়ের সহিত তবে টেঁপা প্রাণে বাঁচিবে না, তারপর পীনার ভাগ্যে কি ঘটিবে তাই বা কে বলিতে পারে? টেঁপার মাতা মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এ সব বৃথা চিন্তা মন হইতে উড়াইয়া ফেলিবার প্রয়াস পায়, কিন্তু চিন্তা মন হইতে উড়াইয়া ফেলিতে চাহিলেই কি উড়াইয়া ফেলা যায়!

করিম নবীর চর ত্যাগ করিয়া যাইবার সংকল্প স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। তাহার সামান্য জমিজমাটুকু মাণিককে মবলক একশত টাকায় বিক্রয় করিয়া যাইবে, স্থির করিয়াছে, মাণিকও রাজী হইয়াছে। এ বিক্রয়ের দলিল রেজেষ্টারী করিবার কোন প্রয়োজন ছিল না, শুধু জমিদার বাবুদের সেরেস্তায় নিজের নাম খারিজ করিয়া মাণিকের নাম জারি করিয়া দিলেই চলিবে। আপাততঃ সে পীনাকে লইয়া এক দূর গ্রামে তাহার বহু দূর সম্পর্কিত কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাইয়া উঠিবে, তারপর যেখানে হয় একখানি সামান্য কুঁড়ে বাঁধিয়া বাস করিবে। স্থির হইয়াছে আজ সন্ধ্যার পর লিখাপড়া হইবে, তারপর ভোরবেলা তাহারা রওনা হইবে। আপাততঃ দেদার বক্সও তাহাদের সঙ্গে যাইবে, সে নিজে করিমের সঙ্গে থাকিয়া বাবুদের সেরেস্তায় নাম খারিজ ও নাম জারী করাইয়া লইবে, তারপর কারবার সূত্রে কোন মোকামে যাইয়া গা ঢাকা দিয়া থাকিবে, তারপর গোলমাল মিটিয়া যাইলে নবীর চরে ফিরিয়া আসিবে। পীনা করিমকে বলিয়া রাখিয়াছে যে জমির বিক্রয়লব্ধ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা দেদার বক্সকে দিয়া তাহার ঋণ শোধ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার পর করিম মাণিকের বাড়ীতে বসিয়া তাহার জমিটুকুর বিক্রয় কবালা লিখিয়া দিতেছে এমন সময় নিঃশব্দে দলবল লইয়া দারোগাবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দারোগা বাবুর আদেশে করিম ও দেদার বক্স তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার হইল। পীনা কিন্তু তত সহজে গ্রেপ্তার হইল না। সে যেখানটায় বসিয়াছিল তাহার পাশেই একখানি দা পড়িয়াছিল—যেন কেহ তাহারই জন্য ইচ্ছা করিয়া সেখানে রাখিয়া গিয়াছিল। সে দা'খানি তুলিয়া রুখিয়া দাঁড়াইল। যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হইয়াছিল, সে তাহার মূর্ত্তি এবং মাথার উপর একখানি চকচকে দা উদ্যত দেখিয়া ভয়ে পাঁচহাত পিছাইয়া গেল। টেঁপা তাহার দুর্ব্বল দেহ লইয়া দাওয়ার একপাশে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, এক্ষণে পীনাকে বিপদের মুখে পতিত দেখিয়া সহসা তাহারও রক্ত গরম হইয়া উঠিল। তাহার শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ

খেলিয়া গেল, সে আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার ভর করিয়া চলিবার মোটা লাঠিগাছটা উদ্যত করিয়া পীনাকে যে ধরিতে গিয়াছিল তাহার মাথায় মারিতে গেল। সহসা তাহার পার্শ্ব হইতে অন্য একজন প্রহরী তাহার লাঠী ধরিয়া ফেলিয়া তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। তারপর সকলে মিলিয়া পীনাকে ও টেঁপাকে বন্দী করিয়া ফেলিল। দারোগাবাবু কেদার বক্স, টেঁপা ও করিমকে হস্তপদ আবদ্ধ করিয়া উঠানের একপাশে ফেলিয়া রাখিতে আদেশ দিয়া পীনাকে নৌকায় পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। তৎক্ষণাৎ দারোগা বাবুর আদেশ পালিত হইল। তিনি তখন গোঁফে চাড়া দিয়া মাণিকের নিকট হইতে উৎকোচ আদায়ের জন্য দর কশাকশি আরম্ভ করিলেন। দরে না বনিলে যে তাহার নিজের এবং কাদেরের কি অবস্থা হইবে তাহা বুঝিতে তাহাদের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সহসা পদ্মার গর্ভ হইতে একটা বিরাট শব্দ উঠিল—শোঁ শোঁ শোঁ। সকলেই বুঝিল কাল-বৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে, এখনই ভীষণা প্রকৃতির তাণ্ডব নর্ত্তন সুরু হইবে। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে যে লোক পীনাকে দারোগা বাবুর নৌকায় রাখিতে গিয়াছিল সে এবং নৌকার মাঝিমাল্লারা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে পীনাও ফিরিয়া আসিল। তাহারা হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। একটু সুস্থ হইয়া কহিল, নদীতে ভয়ানক ঝড় উঠিয়াছে, তাই তাহাদের নৌকায় থাকিতে সাহস হইল না। ঝড়ের প্রারম্ভ দেখিয়া বোধ হয় উহা বেশ বড় রকমই হইবে এবং অনেকক্ষণ স্থায়ী হইবে।

সেদিন বিকাল হইতে আকাশের অবস্থা দেখিয়া সকলেরই স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল যে ঝড় উঠিবে। কিন্তু তাহা যে এত শীঘ্র আরম্ভ হইবে তাহা কেহ অনুমান করিতে পারে নাই। দারোগাবাবু সকাল বেলা যাত্রা করিয়াছিলেন, তাঁহার মাঝি মাল্লারা আসন্ন ঝড়ের সম্ভাবনা বুঝিতে পারে নাই।

এদিকে কাদের ও তাহার সমবয়স্ক যুবকগণ দারোগাবাবুর ব্যবহারে হাড়ে চটিয়া গিয়াছিল। পুলিশের কোপ যে মা শীতলার কোপের চেয়েও ভয়াবহ তাহা তাহারা জানিত কিন্তু তথাপি তাহারা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিল না। তাহারা দল পাকাইয়া দারোগা বাবু ও তাহার মুষ্টিমেয় পুলিস প্রহরী কয়টীকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। দারোগা বাবু এমন একটা অসম্ভব ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, এক্ষণে উহা বুঝিতে পারিয়া চোখের সম্মুখে ক্রমাগত সর্ষে ফুল দেখিতে লাগিলেন। এদিকে ঝড়ের বেগ দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছিল—তাড়াতাড়ি নৌকায় পলাইয়া যাইয়া যে আত্মরক্ষা করিবেন তাহারও উপায় ছিল না।

চারিদিক হইতে ব্যাপারটা বেশ জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নদীগর্ভ হইতে ভোঁ করিয়া একটা লঞ্চের সিটী শুনা গেল। যেদিক হইতে শব্দ আসিল সেদিকে তাকাইয়া দারোগা বাবু দেখিলেন সরকারী জল পুলিসের লঞ্চের আলো দেখা যাইতেছে। লঞ্চখানি ধীরে ধীরে নবীর চরের দিকেই অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া দারোগাবাবুর ধড়ে প্রাণ আসিল, নবীর চরবাসীরা নূতন বিপদ সমাগত দেখিয়া ভয়ে কম্পিত হইল।

(১৫)

বহরের বাবুরা দারোগা বাবুর তদন্ত করিবার প্রণালী দেখিয়া নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তিনি অপরপক্ষ হইতে মোটা রকম কিছু গলাধঃকরণ করিয়াছেন। প্রথমটা তাঁহারা বিষের প্রতিশেধক বিষ, এই বিবেচনায় তাঁহাকে পান খাইবার জন্য কিছু প্রদান করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় ছিলেন —কেননা দারোগা বাবু সরেজমিনের মালিক তাহাকে চটাইলে ভবিষ্যতে অসুবিধা ঘটিতে পারে,—কিন্তু তাঁহারা যখন দেখিলেন দারোগাবাবুর মতলব ভাল নহে, তিনি সিন্নিও আহার করিবেন, ভরাও ডুবাইবেন এইরূপ তাঁহার উদ্দেশ্য তখন তাঁহারা বাধ্য হইয়া অন্যপন্থা অবলম্বন করিলেন। নবীর চরের উপর তাঁহাদিগকে পদে পদে নির্ভর করিতে হয়, তাহাদের অসময়ে তাহাদিগকে না দেখিলে তাহারাই বা ভবিষ্যতে বাবুদের জন্য প্রাণ দিতে অগ্রসর হইবে কেন? তা ছাড়া রাজবাড়ী বাবুদের অধীনস্থ তে-মোহনার চরের লোকেরা যে নবীর চরের উপর এই অত্যাচার করিয়াছে ইহাতে তাঁহাদেরও অপমান। অতএব তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতেই হইবে। এই সব চিন্তা করিয়া তাঁহারা

সদরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়াছিলেন, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবও সমুদায় শুনিয়া স্বয়ং এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন বলিয়া তাঁহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সম্প্রতি পদ্মার অন্যান্য চর হইতেও প্রায়ই মাঝে মাঝে এইরূপ ঘটনা দারোগাদের গাফিলতির সংবাদ তিনি পাইতেছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব খাস গোরা সিভিলিয়ান। সর্ব্বত্র ন্যায় বিচার সমদর্শিতা এবং লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ করাই যে ইংরাজ রাজের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য তাহা তিনি উত্তমরূপেই জানিতেন। এই তদন্তে কালবিলম্ব করা তিনি কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন না, একটু ফুরসুৎ পাইয়াই জল পুলিসের লঞ্চে সরেজমিনে অনুসন্ধান করিবার জন্য নির্গত হইলেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে লঞ্চের কথা বলা হইয়াছে সেই লঞ্চে যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ছিলেন তাহা অবশ্যই পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন।

ধীরে ধীরে লঞ্চখানি আসিয়া নবীর চরে সংলগ্ন হইল। যেখানে দারোগাবাবুর নৌকা বাঁধা ছিল, তাহার পার্শ্বে নোঙ্গর করিল। জল পুলিসের লঞ্চ দেখিয়া দারোগাবাবুর বুকে দশটা হাতীর বল হইয়াছিল। তাহার বিশ্বাস ছিল যে লঞ্চে তাহার এক গেলাসের ইয়ার জল পুলিসের দারোগা কিম্বা ইনস্পেক্টার বাবু আছেন অতএব আর ভয় কি? তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া, অতঃপর মাণিক কাদের ও কাদেরের সঙ্গীগণের যে কি হাল করিবেন তাহাই তাহাদিগকে নানা প্রকার মুখভঙ্গী সহকারে প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। তৎপর বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া পূর্ব্বোক্ত বন্ধুগণের সাহচর্য্যে আনন্দে রাত্রি অতিবাহিত করিবার মানসে লঞ্চে যাইবার জন্যে বহির্গত হইলেন। ইহার জন্য অবশ্যই তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, জল পুলিসের লঞ্চে যে জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিবেন তাহা তিনি কেমন করিয়া অনুমান করিবেন? তখনও ঝড়ের বেগ সমভাবেই ছিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নিতান্ত অল্প ছিল না—কিন্তু তেমন অবস্থায় তাঁহার ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত পুলিসের দারোগাকে যদি ঝড়বৃষ্টির ভয়ে নড়ন চড়ন রহিত হইয়া সেই পাপিষ্ঠ মাণিক ব্যাপারীর দাওয়ায় বসিয়া সময় অতিবাহিত করিতে হয়, তবে কি আর মান থাকে? অতএব তিনি ঝড় বৃষ্টি গ্রাহ্য করিলেন না। কিন্তু তাঁহাকে বেশীদূর যাইতে হইল না। যে লোকটীকে বেগার ধরিয়া লণ্ঠন হাতে দিয়া আগে আগে লইয়া যাইতেছিলেন তাঁহার মাথা হইতে টোকাটি উড়িয়া গেল, সে নিজে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আলোটীও নিবিয়া গেল। বেয়াদপ পবনদেব দারোগা বাবু এবং তাঁহার ছত্রবাহক কনষ্টেবলটীকেও কিছুমাত্র খাতির করিল না। কনষ্টেবলের হাত হইতে ছাতাটী কাড়িয়া লইবার উদ্দেশ্যে টানাটানি সুরু করিল। কনষ্টেবল পুলিশের লোক সেই বা ছাড়িবে কেন, সে ছাতাটী দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিল, তাহার ফল এই হইল যে ছাতাটী উল্টাইয়া গেল, তাহার মুখ একেবারে ভিন্নদিকে ঘুরিয়া গিয়া তাহার এমন চেহারা হইল যে সৃষ্টির আদিম যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত কোন জরা-মরণশীল মানুষ সে ভাবে ছত্র ব্যবহার করে নাই। পবন দেব ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না, ছাতাটী ধরিয়া জোরে একটান দিলেন, তখন উহা যে কনষ্টেবল বাবাজীবনের হস্তচ্যুত হইয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান করিল তাহা কাহারো বোধগম্য হইল না। অগত্যা দারোগা বাবুকে ফিরিয়া আসিয়া মাণিকের দাওয়ায় আসন গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা এবং মুখের আকৃতি বর্ণনা করিবার শক্তি আমাদের নাই, আমরা শুধু এইমাত্র বলিতে পারি, তখন কথা কহিবার মত মনের অবস্থা তাঁহার ছিল না। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া আছেন দেখিয়া অগত্যা মাণিক খাতির করিয়া তাঁহাকে একছিলিম তামাক সাজিয়া দিল, তিনিও আপাততঃ হাতে অন্য কাজ নাই দেখিয়া তাহাতেই মন সংযোগ করিলেন।

রাত্রি শেষে ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়া আকাশ পরিষ্কার হইল। তখন দারোগা বাবু সারা রাত্রি জাগরণের পর একটু গড়াগড়ি দিবার মানসে নৌকায় চলিলেন। কয়েদীরা সকাল না হওয়া পর্য্যন্ত কনষ্টেবলদের প্রহরায় মাণিকের বাড়ীতেই রহিল। এদিকে সকাল হইবামাত্রই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কতিপয় সঙ্গী সহ লঞ্চ হইতে অবতরণ করিলেন। গোটা নবীর চরে একটা সাড়া পড়িয়া গেল—সাহেব আসিয়াছে।

নবীর চরের মত স্থানে খাস বিলাতী গোরা সাহেবের

শুভাগমন একটা যুগপ্রলয় ব্যাপার। সেখানকার অতি বৃদ্ধ অধিবাসীও গ্রামে কখনও সাহেব দেখে নাই। তাহারা যখন শুনিল এই সাহেব আর কেহ নহে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তখন তাহাদের ভয় ও বিস্ময়ের অবধি রহিল না। বাঘকে লোকে ভয় করে, তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব দেখিলে কথঞ্চিত বিস্মিতও হয়, কিন্তু তাই বলিয়া তাহাকে দেখিবার কৌতুহল লোকের কম হয় না। মাণিকের বাড়ীতে যে কয়জন লোক ছিল তাহারা ছাড়া এমন লোক নবীর চরে সেদিন প্রায় কেহই ছিল না যে কিয়ৎদূরে নিরাপদ স্থানে থাকিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে দেখিবার কোন না কোন উপায় অবলম্বন করে নাই। কেহ কশাড় বনের ভিতর লুকাইয়া বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, কেহ নিজের ঘরের ভিতর-কার মাচার উপর বসিয়া হোগলার বেড়া একটু ফাঁক করিয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, আবার কেহ বা গোয়াল ঘরের পিছনে ঘরের ভিটার আড়ালে মাটীর উপর বুকে শুইয়া ঘাড় উঁচু করিয়া তাহাকে দর্শন করিতে লাগিল। কেহ মনে মনে তাহার গোঁফের তারিফ করিতে লাগিল, কেহ সুগৌর বদন মণ্ডলের তারিফ করিতে লাগিল, কেহ তাঁহার শ্রীকর-কমলের রামরম্ভাতরু বিনিন্দিত আঙ্গুলগুলির প্রশংসা করিতে লাগিল, আবার কেহবা তাঁহার টুপী ও বুট জুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। কিন্তু কাছে কেহই ঘেঁসিল না।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দেখিলেন গ্রামের মধ্যে মাণিকের বাড়ী খানিই ভাল এবং বড়। তাঁহার সঙ্গের লোকজনরাও অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল, যে মাণিক ব্যাপারীই গ্রামের মোড়ল। তখন তিনি মাণিকের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় যাইয়া তিনি যে ব্যাপার দেখিলেন তাহাতে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন।

(ক্রমশঃ)
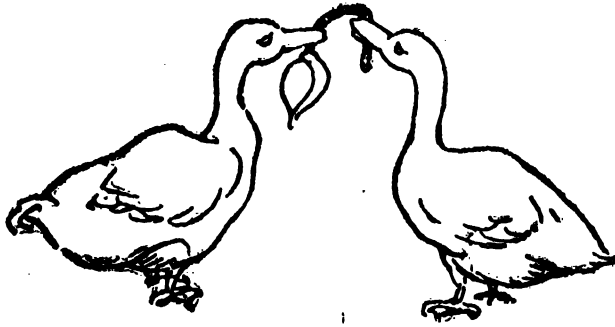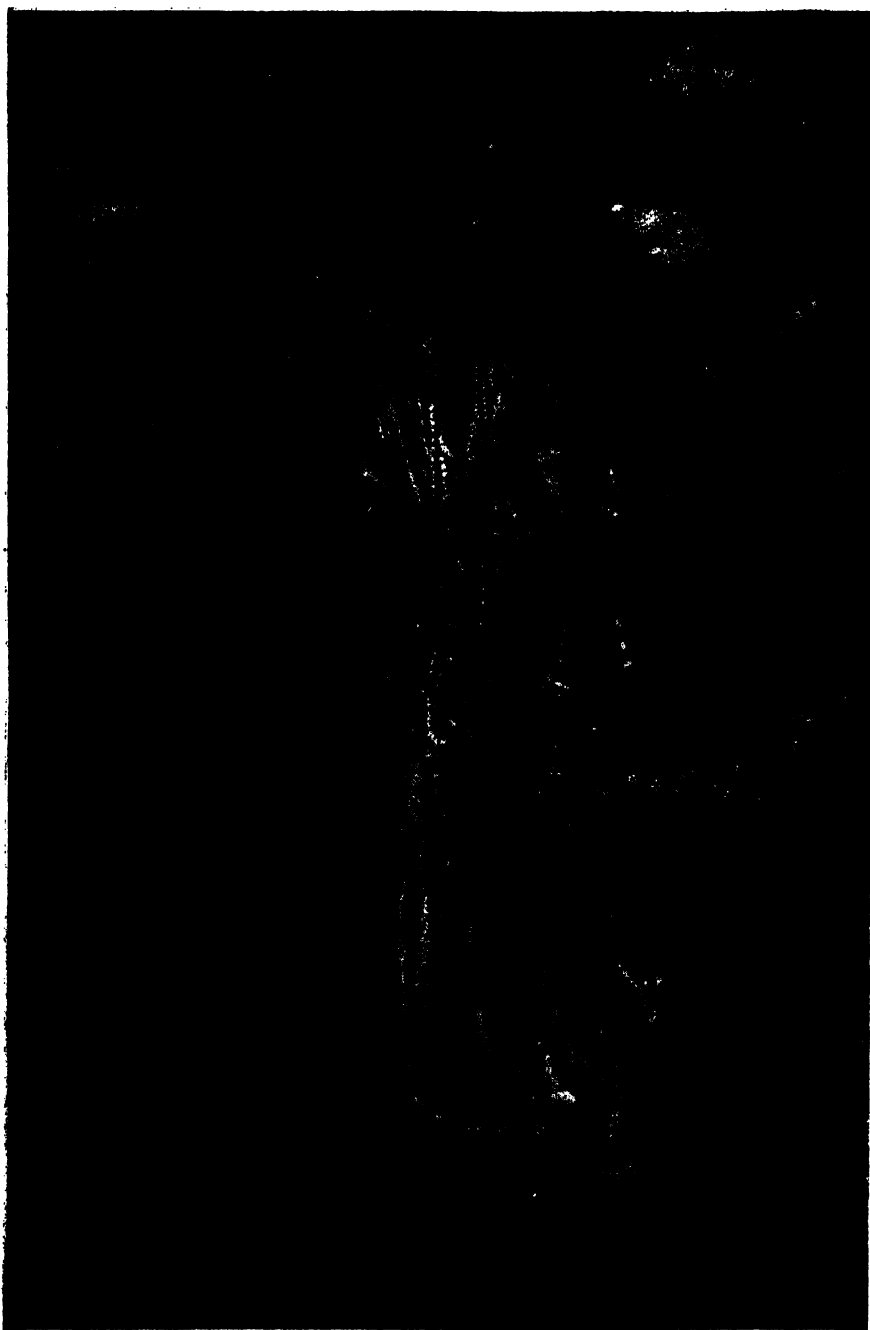
লক্ষ্য

শিল্পী—শ্রীভুবনমোহন দে।

নিবেদন

এই সংখ্যায় "সচিত্র শিশিরে"র তৃতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। একমাস পূজাবকাশের পর আবার চতুর্থ বর্ষের ১ম সংখ্যা বাহির হইবে। আশা করি তৎপূর্ব্বেই গ্রাহকেরা "সচিত্র শিশিরে"র বার্ষিক কিম্বা ষাণ্মাষিক মূল্য মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইবেন। যাঁহাদের টাকা না পাইব তাহাদের ১ম সংখ্যা কাগজ ভি, পি, ডাক যোগে প্রেরিত হইবে। যাঁহারা আর গ্রাহক থাকিতে অনিচ্ছুক তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এখনই জানাইবেন—নতুবা ভি, পি. পাঠাইয়া অনর্থক আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

আগামী বৎসরে দুইখানি রোমাঞ্চকর ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে বাহির করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। তদ্ব্যতীত বড়দিন সংখ্যা আরও বর্দ্ধিতাকারে এ বৎসর বাহির হইবে। বলা বাহুল্য গ্রাহকদের তজ্জন্য কিছু অতিরিক্ত দিতে হইবে না।

কার্য্যাধ্যক্ষ—

সচিত্র শিশির।

শারদ্ শিশির

নিশির শিশির ভরে কোমল শেফালি ঝরে
ছড়ায়ে বিছায়ে শোভে চারু তরুতল।
উষার শিশির জল তরলিত সিতোপল,
নবীন দুর্ব্বার দলে করে ঝলমল ॥

শ্যামল শস্তের শীষে, শিশির সোহাগে মিশে,
প্রেমদানে আনে ধানে সোণার বরণ।
সদ্যজাত পদ্মপাতে মুকুতার মালা গাঁথে,
সাজাতে ফুলের সাথে মাতার চরণ ॥

শিশিরে দোপাটি ফোটে জবা রাঙা হয়ে ওঠে,
রঙায়ে সে স্থলপদ্মে পাদপদ্মে ধরে।
মাখিয়ে শশীর হাসি, শিশির হইলে বাসি,
বালার বেঁধানো-কাণে ব্যথা লয় হ'রে ॥
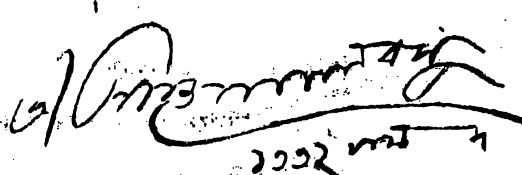
শিশির জীবন বয়, তাইতো সোদরাচয়,
চন্দন কস্তুরী সঙ্গে মিশাইয়ে রঙ্গে।
হেমন্ত উদয় হ'লে "অমর অমর" ব'লে,
সোদরে আদর করে ঘরে ঘরে বঙ্গে ॥

শিশির সাহিত্য ক্ষেত্রে, চাহি স্নেহমাখা নেত্রে,
পত্রে ঢালি ছত্রে ছত্রে শান্তি সুধাজল।
ফুটাইয়ে কান্তি চিত্রে, সম্ভাষি' স্বদেশী মিত্রে,
ধোয়াবে দুর্গতি-হরা দুর্গা পদতল ॥

আনন্দময়ীর নাম, করিলে আনন্দ ধাম,
শরত-শিশির-সিক্ত ভারত প্রভাত।
করুণা শিশির ধারা, বরষি মা হরদারা,
হরষে ভাসান ধনী বিমর্ষ অনাথ ॥

পূজার পোষাক অঙ্গে, "শিশির" সাজিয়া রঙ্গে,
আনন্দ-তরঙ্গ তুলি বঙ্গ হৃদি-নদে।
আজিকার মহোৎসবে, বাণীর বীণার রবে,
প্রমোদে পূরিবে প্রাণ স্মরিয়া শারদে ॥

[illegible signature] বসু
১৩৩২ সন

তৃতীয় বর্ষ ; দ্বিতীয় খণ্ড]　　শারদীয়া সংখ্যা ।　　[৪৫—৫০শ সপ্তাহ

মনীষা-মন্দিরে

স্মৃতি-তর্পণ

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

[আজ মহালয়া—পিতৃপক্ষের অমাবস্যা। আজ ভারতবর্ষের কুড়ি কোটি হিন্দু পিতৃ-তর্পণে ব্যস্ত। কেবল পিতৃ-তর্পণই নহে, জাতি-তর্পণ, বিশ্ব-তর্পণ করিবে। তাই আজ—পূজার সংখ্যার 'সচিত্র শিশিরে' আমার জাতির গৌরব যাঁহারা তাঁহাদের মৃত্যু-দিন মাসের পর মাস হিসাব করিয়া তাঁহাদের স্মৃতি-উদ্দেশ্যে তর্পণ করিলাম। যাহার দ্বারা তৃপ্তি সাধন হয়, তাহাই তর্পণ।]

বৈশাখ ঃ—

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

[মৃত্যু—১লা বৈশাখ, ১২৯৪]

রঙ্গলাল, ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য হইলেও ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব তাঁহার কাব্যে ও কবিতায় প্রথম দেখা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন বটে,—"পুরাতন দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী; মধুসূদন ডাহা ইংরাজ। দীনবন্ধু ইঁহাদের সন্ধিস্থল।" আমাদের কিন্তু মনে হয়, বঙ্কিম এস্থলে দীনবন্ধুর নাম না করিয়া রঙ্গলালের নাম করিলেই যুক্তি-যুক্ত করিতেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে উষার আলোক দেখা যায়, রঙ্গলাল সেই উষার আলোক, আর মধুসূদন সেই উষার সূর্য্যস্বরূপ।

রঙ্গলালের উপর আর একটা অবিচার আমরা করিয়া

আসিতেছি।—তিনিই যে সর্ব্বপ্রথম ভারত-ইতিহাসের উপকরণ লইয়া বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, এ কথা কেহই মুক্ত কণ্ঠে বলেন না। কবিবর নবীনচন্দ্র তাঁহার 'পলাশীর যুদ্ধে' বলিতেছেন,—

"দুরাশার মন্ত্রে মুগ্ধ আমি মূঢ়মতি!
অদ্যাবধি যে পথে কোন কবি বিচরণ
করে নি, সে পথে কেন হবে মম গতি?"

- এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়া স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ও বলিয়াছেন,... "নবীনচন্দ্র যে পথে গমন করিয়াছেন, সে পথে কেহই তাঁহার পূর্ব্বে পদার্পণ করেন নাই।" কিন্তু কথাগুলা ঠিক নহে। রঙ্গলালই নূতন ফুলে নূতন মালা গাঁথিবার আশায় ভারত-ইতিহাসের 'মণিপূর্ণ খনিতে' সাহস-সহকারে সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ করেন। 'পদ্মিনী-উপাখ্যান'ই প্রথম বাঙ্গালা ঐতিহাসিক কাব্য। তাঁহার 'কর্ম্মদেবী' ও 'সুরসুন্দরী'র উপাখ্যানটুকুও রাজস্থান হইতে গৃহীত।

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন,—"আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমেই ইংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতি-বৈর ঘটিয়াছে।" সাহিত্যে সেই "সৌভাগ্যে"র সূত্রপাত ঠিক হেমচন্দ্রের কবিত্ব হইতে হয় নাই,—হইয়াছিল রঙ্গলালের কবিত্ব হইতে। রঙ্গলাল জাতি বৈর ভাবের সর্ব্বপ্রধান না হউন,—প্রথম ও প্রধান ঘটক। "আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এইক্ষণেই বা কি হইয়াছি"—একথা বাঙ্গালীকে রঙ্গলাল নানা রকম করিয়া শুনাইয়া গিয়াছেন জাতি-বৈর-ভাবের তিনি প্রথম প্রচারক।

অনুবাদেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত কাব্যকে যথাযথভাবে বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ রঙ্গলালই সর্ব্বপ্রথম করিয়াছেন বলিয়া মনে হইতেছে। সে অনুবাদিত গ্রন্থ—কুমারসম্ভব। ভাষা ও ছন্দের উপর রঙ্গলালের যে কি অদ্ভুত অধিকার ছিল, তাহা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলেই বুঝা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদৃচ্ছাক্রমে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—যথা—

"কনক কমল যায় পীড়িত পার্ব্বতী কায়,
কররুহে বিম্বিত লোচন,
নাম্বিলে নদীর জলে, কটি ঘেরি মীনদলে
করে পুনঃ মেখলা-রচন।"

রঙ্গলালের 'কুমারসম্ভবে'র পূর্ব্বে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের "বাসবদত্তা" বাজারে বাহির হইয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানি সংস্কৃত কাব্যের ঠিক অনুবাদ নহে—ভাবানুবাদ মাত্র।—মূলের সহিত অনেক স্থলেই ইহার মিল নাই।

রঙ্গলাল-সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবুকে বিশেষ কিছু কখনও বলিতে শুনি নাই। তবে সঞ্জীব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একবার লিখিয়াছিলেন যে,—"রঙ্গলালের পদ্মিনী উৎকৃষ্ট উচ্চ অঙ্গের ভাবমালায় পরিপূর্ণ; উহাতে সর্ব্বপ্রথম হিন্দু-মহিলার সতীত্ব ও দেশানুরাগ পবিত্রানুরাগ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতার মোহিনী শক্তির ছটা দেখাইয়া দিয়াছেন। ৩।৪ বৎসর হইল, বঙ্গদর্শনে ইনি 'নীতি-কুসুমাঞ্জলি' নামে কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন, তাহার মত পরিষ্কার, ইংরাজিতে যাহাকে smart বলে তেমন কবিতা আর কখন দেখি নাই। তাঁহার কবিতার দৌড় ঠিক পোপের মত। পরিষ্কার টিকল, অথচ সম্যক সম্পূর্ণ।"—ইহা ছাড়া আর একজন মনীষীও রঙ্গলালের সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম - রমেশচন্দ্র। রমেশচন্দ্র তাঁহার "Literature of Bengal" নামক গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"His পদ্মিনী উপাখ্যান, কর্ম্মদেবী and সুরসুন্দরী are full of spirited descriptions of war and heroism. No authentic history perhaps affords to the poet such stirring tales of heroism and valour as that of Rajasthan and our poet has served his country well by embalming passages from the annals of Rajasthan in admirable verse."—কিন্তু এসব কথা এখনকার কয়জন পাঠক জানে?

রাধাকান্ত দেব

মৃত্যু—৭ই বৈশাখ, ১২৭৪।

"ধার্ম্মিক-তিলক তুমি, ভুবন-বিদিত
তব নাম, হে রাজন্, ধন্য জনমিলে
বঙ্গের মাঝারে! কত সাধিলে সুহিত
স্বদেশের, তব সম জ্ঞানী নাহি মিলে।
হে বিদ্বান-কুল ধন, যতন প্রচুর
করিলে উন্নতি হেতু বাঙ্গালা ভাষার!
প্রকাশিলে অজ্ঞানতা করিবারে দূর
"শব্দ-কল্প-দ্রুম" নাম অভিধান সার;
অপূর্ব্ব এ অভিধান।" *　*

রাজকৃষ্ণ রায়।

ইংরাজ-শাসনের প্রথম যুগে যে কয়টি পুরুষ কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে ঐরাবত-শক্তি সঞ্চালিত করিয়াছিলেন, রাধাকান্ত তাঁহাদেরই অন্যতম। বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে, হৃদয়ের মহত্ত্বে ও উদারতায় তিনি এক দিন বাঙ্গালীর শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। রাজা রামমোহনের সঙ্গে রামকমল ও রাধাকান্তের নাম দুইটিও উল্লেখযোগ্য।

তবে রাজা রামমোহনের সহিত এই দুই মনীষীর এক বিষয়ে একটু পার্থক্য ছিল। রামমোহন এদেশে শিক্ষা-বিস্তার-কল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির বিশিষ্টতাকে তিনি কখনও মমত্বের দৃষ্টিতে দেখেন নাই। ফেরঙ্গ ভাব আনিয়া তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার ভাব-ধারাকে সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রামকমল ও রাধাকান্ত খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন। ইঁহারা দুই জনেই স্বধর্ম্মে সুপুষ্ট হইয়া বঙ্গজাতিকে আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। এই দুইটি পুরুষই বাঙ্গালার ধারা, বাঙ্গালার বিশিষ্টতা, বাঙ্গলার সামাজিক স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিয়া বাঙ্গালীকে আত্ম-রক্ষার পথ দেখাইয়াছিলেন। রাধাকান্তের জীবন-কথা আলোচনা করিবার ইহাই সময়। তাহা রচিত হইলে আমরা তাহা হইতে জীবন গঠনের উপযোগী অনেক মূল্যবান উপাদান পাইব।

—

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[মৃত্যু—১০ই বৈশাখ, ১২৯৬]

প্রায়ই দেখিতে পাই যে, দুই-তিনটি ভাইয়ের মধ্যে একটির খ্যাতির বিস্তার যদি খুব বেশী হয়, তাহা হইলে তাঁহার অন্য কোনও ভ্রাতা প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ হইলেও তিনি কেমন একটু হীনপ্রভ হইয়া যান;—তিনি আপন কৃত কার্য্যের যথাযোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হন না। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর ঈশানচন্দ্রকে আজ আমাদের মনেই পড়ে না; অথচ তাঁহার চেয়ে ছোট-দরের অনেক কবিকেও আমরা তাঁহার অপেক্ষা অধিক সমাদর করিয়া থাকি। রমেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যোগেশচন্দ্রকেও আমরা ভুলিয়া গিয়াছি; কিন্তু তাঁহার শক্তি-সাধনার কথা—তাঁহার 'রাজ-তরঙ্গিণী'র ইংরাজী অনুবাদ নিতান্ত ভুলিবার বিষয় নহে। কেশবচন্দ্রের অনুজ কৃষ্ণবিহারীর কথাও কাহাকে আজ বলিতে শুনি না, কিন্তু তাঁহার ন্যায় উন্নত চরিত্র মনীষী ও মনস্বী অধ্যাপক ইদানীং কালে দুই-চারিটির বেশী হইয়াছে, কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজদ্বয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথও পাঠক-সমাজে যথাবিহিত সম্মান ও আদর পান নাই, অথচ এই উভয় সাহিত্য-রথীই বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা দিয়াছেন, তাহার মূল্য সামান্য নহে। এই সকল অর্দ্ধ-উপেক্ষিত ও অনাদৃত পুরুষের সহিত সঞ্জীবচন্দ্রের নামোল্লেখও আমরা করিতে পারি। যশ বা খ্যাতির হিসাবে বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবের ভাগ্যও ইঁহাদের অনুরূপ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং "সঞ্জীবনী সুধা" প্রকাশ করিলেও তাহার রসাস্বাদনের জন্য বাঙ্গালার পাঠক-সমাজ কখনও তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। সঞ্জীববাবুর জীবন-কথা সংক্ষেপে বলিতে গিয়া বঙ্কিমবাবু এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই জীবিতকালে আপন আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনেকের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। যাঁহাদের কার্য্য দেশ-কালের উপযোগী নহে, বরং যাঁহারা অগ্রগামী; তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। যাঁহারা লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না। যাঁহাদের প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ

ম্লান, কখন অন্ধকার, কখন প্রদীপ্ত— তাঁহাদের ভাগ্যেও ঘটে না; কেন না, অন্ধকার কাটিয়া দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে।" কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্ কারণে সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার জীবিতকালে, বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজে যথাযোগ্য সমাদর লাভ করেন নাই, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। যাহা হউক, আমরা কিন্তু বঙ্কিমের সিদ্ধান্তকে প্রত্যক্ষ দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। তাঁহার কথা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তিনি নিজেই জীবিত কালে উপেক্ষিত হইয়া থাকিতেন। তাঁহার ন্যায় এদেশে আর কোন লেখক 'লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছে কি? তাঁহার কাব্য দেশ-কালের অগ্র-গামী যতটা ছিল, তেমন আর কাহার ছিল? 'প্রতিভার এক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান' কথাটা যদি সঞ্জীব সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে কবি বিহারীলালের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করিব। শুধু তাহাই নহে, উহার প্রত্যুত্তরে ইহাও বলিব যে—৩৭ বৎসর গত হইল, সঞ্জীবচন্দ্রের দেহান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু এত-দিনেও অন্ধকার কাটিয়া তাঁহার দীপ্তি লোক-লোচনের গোচর হইল না কেন?—এ জন্য আরও কি কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে? কিন্তু কালবশে, বাঙ্গালার উপন্যাস-সাহিত্যে যে পরিবর্তন-লীলা দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় না যে, সঞ্জীবচন্দ্রের গল্প ও উপন্যাসের পাঠক-সংখ্যা কখনও বৃদ্ধি হইবে। আসল কথা, তাঁহার আদর তাঁহার জীবিতকালেই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু ভাগ্য-দোষে তাহা হয় নাই। এ যুগের বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস যখন রচিত হইবে, তখন তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তি অবশ্য সগৌরবেই উল্লিখিত হইবে। পাঠক সমাজে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার লাভ ভবিষ্যতে সম্ভবপর না হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার সাহিত্য-শক্তি অস্বীকার করিবার নহে। ভ্রমণ-বৃত্তান্ত কেমন করিয়া লিখিতে হয়, তাহা তিনিই আমাদিগকে প্রথম শিখাইয়াছেন। তাঁহার 'পালামৌ' লেখার পর বঙ্গভাষায় কত ভ্রমণ-কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না; কিন্তু পালামৌ আজিও বঙ্গভাষায় আদর্শ ভ্রমণ-কাহিনী হইয়া আছে। তাঁহার 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' নামে গল্প দুইটি এখনকার পাঠকগণের ভাল লাগিতে না পারে, কিন্তু এ দুইটিকে এদেশের ক্ষুদ্র গল্পের প্রথম চেষ্টা বলিয়া মনে করিলে অন্যায় হইবে না। তাঁহার সমস্ত রচনার মধ্যেই এক অনন্যসাধারণ লিপি-ভঙ্গী ও অসামান্য পর্য্যবেক্ষণ-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

১৮৩১ খৃষ্টাব্দের অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন তিনি জন্মগ্রহণ করেন

তাঁহার মনীষা ও মনস্বিতা, তাঁহার জাতি-প্রীতি ও দেশ-ভক্তি জনসাধারণকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তিনি মনে মনে নিজেকে একটা অসাধারণ পুরুষ ভাবিয়া জন-সাধারণ হইতে কখনও দূরে সরিয়া থাকিতেন না। জীবন-সায়াহ্নেও তাঁহাকে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া 'পূর্ণিমা-সম্মিলনে' যোগদান করিতে দেখিয়াছি। তাঁহার গৃহে ছোট বড় বা ধনী নির্ধনের ভেদাভেদ ছিল না। সকলকেই তিনি সমাদর করিয়া বসাইতেন। সকলের সহিতই মিষ্ট ভাষায় আলাপ করিতেন। সামাজিকতায় তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন।

দেশে যখনই কোনও সদনুষ্ঠানের উদ্যোগ আয়োজন হয়, তখনই তাঁহার কথা মনে পড়ে। দেশের বহু প্রতিষ্ঠানের মূলেই তাঁহার হস্ত-প্রেরণা দেখিতে পাই। তাঁহারই উদ্যম-উৎসাহে বঙ্গদেশে বিলাতী প্রথা-অনুসারে থিয়েটারের সূত্র-পাত হয়। কনিষ্ঠ সহোদর শৌরীন্দ্রমোহনকে সহকারী করিয়া তিনিই থিয়েটারে ঐক্যতান-বাদনের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন।

বাণীর ও কমলার তিনি সমান স্নেহের অধিকারী ছিলেন। অথচ এ স্নেহের অসদ্ব্যবহার কখনও করিয়া যান নাই। তিনি যেমন বিদ্যানুরাগী ছিলেন, তেমনই বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। তাঁহারই উৎসাহ-প্রণোদনে মাইকেল মধুসূদন বাঙ্গালায় অমৃতাক্ষর ছন্দের প্রবর্ত্তন করেন। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় উৎসাহিত হইয়া কয়েকখানি

বাঙ্গালা নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি নিজেও একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার 'উভয়-সঙ্কট,' 'চক্ষুদান' ও 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি প্রহসনগুলি বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে মধ্যে মধ্যে অভিনীত হইয়া দর্শকবৃন্দের চিত্ত বিনোদন করে।

তাঁহার হৃদয় কোমল ছিল। ব্যথিতের বেদনায় তিনি কাতর হইতেন। তিনি বঙ্গ-বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণ জন্য একলক্ষ টাকা ও মেয়ো হাসপাতালে দশ হাজার টাকা, দাতব্য সভায় আট হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত গোপন-দানও তাঁহার অনেক ছিল।

জ্যৈষ্ঠ ঃ—

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

১৩০১ সালের প্রথম দিনে জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর ভূদেব বঙ্গমাতার অঙ্কদেশ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। যে স্বর্গীয় জ্যোতিঃ পঞ্চাশ বৎসরের উপর অন্ধ তমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে মনুষ্যত্বের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিল, তাহা আজি ৩৩ বৎসর গত হইল, জ্যৈষ্ঠ মাসের

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

দেশের ও জাতির জন্য যিনি এতটা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে আমাদের ভুলিলে চলিবে না।

এই তারিখে অস্তমিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পত্রিকার ইহা একটা স্মরণীয় দিন।

স্মরণীয় দিন বটে, কিন্তু তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ এ দিনে

আমরা কিছুই করি না। এই কলিকাতা সহরে সপ্তাহে সপ্তাহে কত সভা-সমিতি হইয়া থাকে, কিন্তু ভূদেবের মৃত্যু-দিনে ভূদেবের নাম করিয়া কেহ কোথাও কিছু করে না। বৎসরে বৎসরে তাঁহার অনন্ত সাধারণ জীবন-কথা—তাঁহার অপূর্ব্ব চিন্তারাশি আধুনিক শিক্ষা-বিভ্রান্ত বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে পারিলে লাভ আছে- কিন্তু সে কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমাদের নাই।

ভূদেবের জীবন—আদর্শ জীবন। বাক্যে ও কার্য্যে এমন সামঞ্জস্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি কখনও কোনও বিষয় আজ 'হাঁ' বলিয়া কাল আবার 'না' বলিতেন না। 'ভাবের ঘরে চুরি' করিতে আদৌ তিনি জানিতেন না। আন্তরিকতা ও সহৃদয়তায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থ সকল সেই সহৃদয়তা ও আন্তরিকতারই ফল। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ ও বিবিধ প্রবন্ধ প্রভৃতি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, বাঙ্গালায় আর কোনও মনীষী এমন সহৃদয়তার সহিত সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেশের ও জাতির কথা কহিতে পারেন নাই।

তিনি বিলাতী শিক্ষায় পরম পণ্ডিত হইয়াও কখনও আত্মবিস্মৃত হইয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করেন নাই। কেশবচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বিলাতী শিক্ষার নয়নাভিকারী উজ্জ্বল চাকচিক্যে একবার না একবার অল্প-বিস্তর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিচার কুশল ভূদেব চিরদিনই স্বদেশের শাস্ত্রে, স্বদেশের ধর্ম্মে, স্বদেশের আচারে ও স্বদেশের সাহিত্যে শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিয়া এবভাবেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালীকে আচারে ব্যবহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে সাহেব সাজিতে দেখিলেই তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। তিনি এজন্য স্বজাতিকে নানাভাবে বহুবার সতর্কের বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। তিনিই সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছিলেন,—'আমরা যতই কেন সাহেব সাজি না, ইংরাজ কিন্তু নানা ইসারা ইঙ্গিতে প্রায়ই আমাদের জানাইয়া থাকে—"তুমি ইংরাজ নও। তুমি আমার ধর্ম্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ, আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।"—এই উপদেশই আমাদের জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। এ উপদেশ অনেকের নিকট আজ পুরাতন ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু ভূদেব যখন বলিয়াছিলেন, তখন উহার মর্ম্ম বুঝিবার মত সামর্থ্যই আমাদের অনেকের ছিল না। আজ যে আমরা নিজেদের চিনিবার চেষ্টা করিতেছি, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছি, তাহার মূল ভূদেব। ভিওরোপীয়-শিক্ষার প্রতিক্রিয়া তাঁহাতেই প্রথম প্রকট হয়।

ভূদেব স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন বলিয়া গোঁড়ামি যে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, এমন কেহ মনে করিবেন না। স্বজাতির দোষ ও গুণ দুই-ই তিনি দেখাইয়া বিদেশীয়ের গুণটুকু আত্মসাৎ করিতে সদাই উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন—"প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের প্রকৃতির একতা নাই। ইংরেজ কার্য্যকুশল অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্রস্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরাজের নিকট হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।"—এই প্রকার কত সময়োপযোগী সারপূর্ণ কথা যে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। শুধু উপদেশ নহে,—নিজের জীবনে তাহা ফুটাইতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে তিনি ধরিয়াছিলেন, তাহা উন্নতি-পথের পথ-প্রদর্শক। ভক্তি-ভরে তাহা স্মরণ করিলে জীবন স্বতঃই মহত্বের পথে আকৃষ্ট হয়। কাজেই বলিতে হয়, ভূদেবকে ভুলিলে আমাদের চলিবে না। যুগধর্ম্মের যিনি অন্যতম প্রবর্ত্তক, মাতৃপূজার যিনি অন্যতম পুরোহিত, তাঁহার তিরোধানের দিনে তাঁহার স্মৃতি-পূজা করা বাঙ্গালীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। আজ তাঁহারই ভাষায় এই প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে সকলকে আহ্বান করিতেছি,—"ভারতবাসীকে সর্ব্বতোভাবে স্বজাতি-বিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। স্বজাতির সহানুভূতিকেই পরমধন ভাবিয়া ভোগ করিতে হইবে।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

মৃত্যু – ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০

স্বদেশপ্রেমমূলক দেশীয় গান বা কবিতার কথা উঠিলেই বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার গান মনে পড়িয়া যায়, যাঁহার 'আমার দেশ' ও 'আমার জন্মভূমি' শুধু সহরে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে নহে,—সুদূর পল্লীর হাটে মাঠেও নিরক্ষরের মুখে গীত হইতে শুনা যায়, তাঁহার সাহিত্য-কীর্ত্তির কথা একটু কীর্ত্তন করিব। আজ ১৩ লেখকের অবশ্য অভাব নাই, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের আসন আজিও শূন্য পড়িয়া আছে। তাঁহার নাটকসমূহ নাটকীয় কলাকৌশল-হিসাবে তেমন উচ্চাঙ্গের না হইতে পারে, কিন্তু সে সকল গ্রন্থের সর্ব্বত্র মানসিক স্বাস্থ্য-বিধানের যে উপকরণ সঞ্চিত আছে, সে উপকরণ আধুনিক নাটক-নভেলে একান্তই দুষ্প্রাপ্য। বাঙ্গালার লেখকেরা এখন এদেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রেমের নাম করিয়া কুৎসিত কামেরই চাষ দিতেছেন। এ কাজটাকে দ্বিজেন্দ্রলাল আন্তরিক ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। তিনি গানে যেমন বলিতেন, "মানুষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বৎসর হইল, এই কীর্ত্তিমান কবি দ্বিজেন্দ্রলাল "পরিহরি' ভব সুখ-দুঃখ" "পতিতোদ্ধারিণী সুরধুনি"র কোলে আশ্রয়লাভ করিয়াছেন,—এই ১৩ বৎসরকাল সমানভাবেই তাঁহার অভাব-বেদনা অনুভব করিতেছি। বাঙ্গালা দেশে কবি ও আমরা, নহিত মেষ", তেমনি তাঁহার নাট্য-সাহিত্যেও সেই ছবি ফুটাইয়া তুলিতেন। সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতিকে তিনি জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ প্রচেষ্টা এখন আর কাহারও মধ্যে তেমন দেখিতে পাই না বলিয়াই

দ্বিজেন্দ্রলালের অভাব-বোধটা অনেক সময়েই আমাদিগকে ব্যথিত করে।

মাতৃসেবা ও মাতৃভাষার সেবাকে দ্বিজেন্দ্রলাল সমান চক্ষেই দেখিতেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই, তোমার কাছে মা
এসেছি ছুটি;
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাবো তোমার চরণ দুটি,
চাহিনাকো কিছু তুমি মা আমার, এই জানি, কিছু নাহি
জানি আর;
...তুমি গো জননী হৃদয় আমার; তুমি গো জননী
আমার প্রাণ।"

এই প্রগাঢ় প্রীতি ও ভক্তি লইয়া তিনি মাতৃভাষার পূজায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। কাজেই সাহিত্যের হাটে তিনি কুরুচি বা দুর্নীতির ফেরী করিয়া বেড়াইতে পারেন নাই; পরন্তু কোথাও যখন উহা দেখিয়াছেন, তখনই ভাষার সুতীব্র কশা লইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছেন। ন্যাকামী ও ভণ্ডামির তিনি চিরশত্রু ছিলে। তাঁহার উপদেশই ছিল—"শত্রু হোক্ সে, মিত্র হোক্ সে, দূর করে দে ভণ্ড যে!" এই উপদেশটুকু শুধু মুখে বিতরণ করেন নাই—আত্ম-জীবনে ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।

মৌলিকতা বলিতে যাহা বুঝায়; দ্বিজেন্দ্র-সৃষ্ট সাহিত্যে তাহার যথেষ্টই নিদর্শন আছে। সাহিত্যাকাশে তিনি যে সময়ে সমুদীয়মান, মধুসূদন সে সময়ে পরলোকগত। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সে সময়ে জীবিত থাকিলেও, কবিবর বিহারীলালের শিষ্যবর্গের অভ্যুদয়ে তাঁহাদের 'জারিজুরী' তখন কমিয়া আসিতেছিল। হেম-নবীনের অনুকারিগণ তখন জলবুদ্বুদের মত উঠিতেছিলেন আর কালসাগরের জলে মিশাইতেছিলেন। সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অন্য কাহারও প্রদর্শিত পথ অনুসরণ না করিয়া, কাহারও মতামতের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, অপূর্ব্ব সাহসিকতার সহিত স্বতন্ত্র ও স্বাবলম্বিত ক্ষেত্রে উদিত হইয়াছিলেন। এই নূতন পথে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রতারিত হন নাই। তাঁহার 'হাসির গানে'র নূতনতায় বাঙ্গালী মুগ্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালী পাঠক—তাঁহার 'হাসির গান'কে সাহিত্যের আসরে সাদর-অভিবাদনের সহিত আহ্বান করিয়া আনিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্য-সাহিত্যে যে শুধু একটা অপূর্ব্ব রূপ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। বাঙ্গালার কাব্য-ভাষাতেও তিনি একটি বিশেষ শক্তি সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। আমাদের কাব্য-ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গে রূপময়ী করিয়া তুলিবার আশায় যে সকল কবি নিজেদের প্রতিভা নিয়োজিত করিয়াছিলেন, সেই সকল কবির মধ্যে মধুসূদন ও দ্বিজেন্দ্রলালের নামই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। কারণ, ইঁহারা দুই জনে বঙ্গভাষার যে অন্তর্নিহিত শক্তির আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সে শক্তির কথা কেহ কখনও ভাবে নাই বা আশাও করে নাই। বঙ্কিমের 'বন্দে মাতরং' সঙ্গীতে আমরা যে তেজ, যে পৌরুষ (Masculinism) দেখিতে পাই; সেই তেজ, সেই সঞ্জীবতা, সেই পৌরুষ, দ্বিজেন্দ্রলাল সংস্কৃত ভাষার সাহায্য না লইয়া বঙ্গভাষার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ইহাই দ্বিজেন্দ্রলালের সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তি। ইহাই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

বঙ্গভাষায় এই পৌরুষের আভাস যদিও বিবেকানন্দের 'বীরবাণী'তেই সর্ব্বপ্রথম আমরা দেখিয়াছি, কিন্তু জনসাধারণে সে সংবাদ রাখে না। বিবেকানন্দের হস্তে যাহার উন্মেষ ঘটিয়াছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা-প্রভাবেই তাহা বিকশিত হইয়াছে। তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে খুব বেশী না হইলেও—গুণে অসামান্য।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু—১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১।

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে অনন্য-প্রতিযোগী প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা সহসা সংঘটিত হয় নাই। মীরজাফর খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা বা ঐরূপ কোনও একটা কারণবশতঃ এদেশে ইংরাজ-শাসন সহসা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এইরূপ মনে করিলে ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ অজ্ঞতা

প্রকাশ পায়, সেইরূপ আশুতোষের এই অদ্ভুত প্রতিষ্ঠা-লাভের কারণ নির্দেশ করিতে গিয়া তাঁহার আট বৎসরব্যাপী ভাইস-চ্যান্সেলারী বা তাঁহার জজীয়তীর উল্লেখ করিলে মানব-চরিত্র-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। পাকা খেলোয়াড় সহসা এক বলেই "আউট" হইতে পারে, কিন্তু আনাড়ী খেলোয়াড় 'সহসা'র অনুগ্রহে বহুকাল ধরিয়া ক্রীড়া-কৌশল দেখাইতে পারে না।

ও মহেন্দ্র রায় তাঁহার অপেক্ষা হীন প্রতিভার ছিলেন না; পরীক্ষা-ক্ষেত্রে স্যর গুরুদাস, আনন্দমোহন ও জানকীনাথ তাঁহার অপেক্ষা কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তবু ইঁহারা কেহই আশুতোষের প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, ইহার কারণ কি? একটু তলাইয়া দেখিলেই ইহার কারণ বুঝিতে পারা যায় যে, যে অবিচলিত ধৈর্য্য নিন্দাস্তুতি উভয়কে সমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার
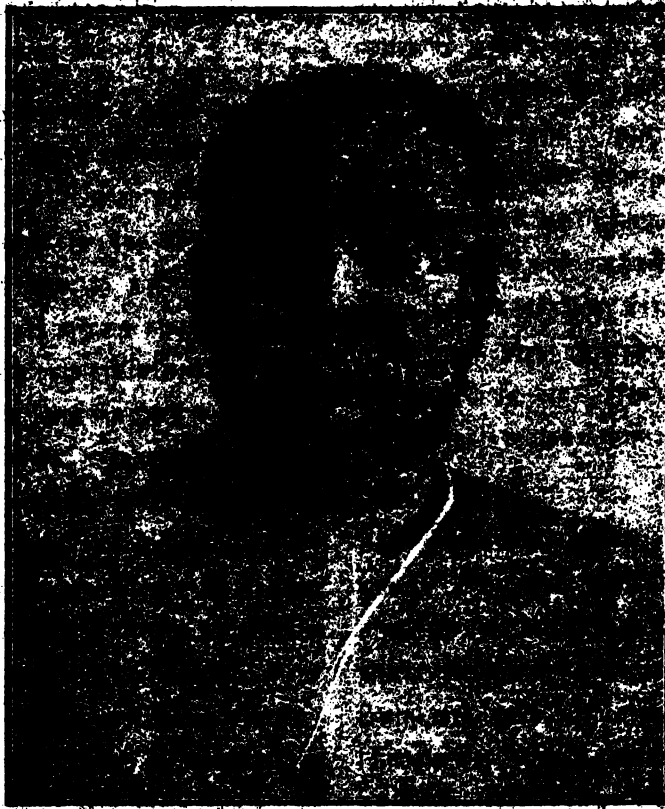
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

আসল কথা, কলিকাতা-বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আশুতোষের যে প্রতিপত্তি হইয়াছিল, তাহা কেবল বিদ্যা, বুদ্ধি বা উচ্চপদের প্রভাবে লাভ করা যায় না। বিদ্যায় তিনি ব্রজেন্দ্রশীলের সমকক্ষ নহেন, আইনজ্ঞতায় তিনি স্যর রাসবিহারীর খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় স্বর্গীয় সারদাচরণ

অভীষ্টসিদ্ধির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়, তাহা আশুতোষের মধ্যে যেমন ছিল, তেমন আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। যে মনের বল থাকিলে, মানুষ বিরোধী-শক্তির আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু কখনই তাহার নিকট নত হয় না, সে আত্মঘাতী মানসিক বলের পরিচয় আশুতোষ কখনও প্রদান

করেন নাই। পরন্তু তিনি মান ও অপমান, শ্রম ও কষ্ট, ও সময়কে অগ্রাহ্য করিয়া সকল অবস্থাতেই, সেই অবস্থার সঙ্গে যথাসম্ভব যুক্তি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, আপনার লক্ষ্যের আজীবন অনুসরণ করিয়াছিলেন। অসামান্য কর্ম-কুশলতা, ধৈর্য্য ও বৈর্য্য গুণেই তিনি জীবন-সংগ্রামের জয়-টীকা ললাটে ধারণ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এইটুকুই তাঁহার বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব। আশুতোষ তোষামোদ-প্রিয় ছিলেন বলিয়া যাঁহারা তাঁহার কেবল নিন্দা করিতেন, তাঁহারা জগতের কোনও কর্মবীরের কর্ম-জীবনের ধারা কখনও আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। উইলিয়ম পিট অত্যন্ত দাম্ভিক ছিলেন, থিয়োডর রুজভেল্টের অর্থলোলুপতা অতি প্রবল ছিল, লয়েড জর্জ অন্যান্য দলপতিগণের শক্তি সংযত করিয়া তাঁহাদের প্রভাব বিনষ্ট করিতে ভালবাসেন। লর্ড কর্জন সকারণে বা অকারণে যেমন করিয়াই হউক উচ্চবংশসম্ভূত পুরুষের মর্য্যাদা-বৃদ্ধিতে আঘাত দিতে পারিলেই তৃপ্তি বোধ করিতেন প্রভৃতি এইরূপ তুচ্ছ কথা ধরিয়া কর্মবীরকে বিচার করিতে গেলে কর্মবীরের প্রতি কেবল অবিচার করাই হয়। দুরদৃষ্টক্রমে আশুতোষকে আমরা অনেক সময় এইভাবেই বিচার করিয়া থাকি।

আশুতোষ ভাবপ্রবণ ছিলেন না। ভাবের বশে কখনও কোনও কার্য্যে হঠাৎ তিনি যোগদান করেন নাই। যে সময় জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সৃষ্টি হয়, সে সময় তাহাতে গুরুদাস ও রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি দেশের মনীষী-প্রধানগণ যোগদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আশুতোষ তাহা হইতে দূরে থাকিয়া আপনার হাতের কাজকেই গড়িয়া তুলিতেছিলেন। শিক্ষা-পরিষদ অনুকূল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের বড় বড় লোকের সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়াও আজ তাহা এক প্রকার নামমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, কিন্তু আশুতোষের হাতে গড়া জিনিষ আজ যে বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে, সমগ্র ভারতবর্ষে তাহার তুলনা নাই। কেন এমন হয়? এ 'কেন'র উত্তর কঠিন নয়। আশুতোষের চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই সে উত্তর সহজে পাওয়া যায়।

ধনে, মানে বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে আমাদের দেশে যিনি যত বড়ই হউন, আশুতোষের কর্ম্ম-জীবনের আদর্শ সকলেরই অনুকরণযোগ্য। তাঁহার জীবন দেখিয়া আমাদের যদি অনুকরণ-প্রবৃত্তি না জন্মে, তবে তাহা আমাদের ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দিবে।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

মৃত্যু — ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১২১৩।

যাঁহাদের মনীষা ও মনস্বিতার প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিস্তার ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের নাম করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে কেশবচন্দ্রের এবং তৎপরেই প্রতাপচন্দ্রের নাম আমাদের মনে পড়িয়া যায়। ইঁহারা উভয়েই যেন একই ভাব-বৃক্ষের দুইটি ফুল। কেশব-প্রভাবে প্রতাপ-চরিত্র যে অনেকটা গঠিত হইয়াছিল, ইহা যেমন সত্য; আবার প্রতাপের প্রভাবে কেশবের ভাব-প্রবাহ যে কতকটা বিপুল আকার ধারণ করিয়াছিল, ইহাও তেমনই সত্য। ইঁহারা উভয়ে যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের পতাকা লইয়া একসঙ্গে না দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালী-খ্রীষ্টানের সংখ্যা আজ যাহা দেখিতেছি, তাহার চেয়ে যে কত বেশী দেখিতাম, তাহা বলা যায় না। গুরু মায়া বিদ্যা'র প্রভাবে আধুনিক অনেক ব্রাহ্মই অবশ্য কেশব ও প্রতাপকে ছোট করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু যাহা সত্য, যাহা পবিত্র ও যাহা আদর্শ, তাহাকে চাপিয়া রাখিবে কে?

কেশব ও প্রতাপের প্রাত্যহিক জীবন-ঘটনার ভিতর হইতে যে নিষ্ঠার ও সংযমের উদাহরণ পাওয়া যায়, তাহা সর্ব্বত্র ও সকল সময়েই আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ইহাদের সমসাময়িক হইয়া, —এমন কি, একটু বাঁকা তন্ত্রীর মানুষ হইয়াও, এই দুই মহাত্মার চরিত্র-মাহাত্ম্যে মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি ইহাদিগকে 'বাঙ্গালার গৌরব' বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন

প্রতাপের মৃত্যুর অনতিকাল পরে 'নব্যভারত' সম্পাদক লিখিয়াছিলেন,—"খ্রীষ্ট ক্রুসে নিহত হইবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, 'পিতঃ ইহাদিগকে ক্ষমা কর, ইহারা জানে না,

কি করিতেছে।' এ কথা আমরা বাইবেলে পড়িয়াছি, সত্যতার সাক্ষী দিতে পারি না। কিন্তু প্রতাপচন্দ্র যখন ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির হইতে তাড়িত হইলেন, তিনি সংযত ও শান্তিভাবে গোলদীঘিতে গমন করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের অনেক লোক তাঁহার অনুসরণ করিল। তাঁহাকে সকলে ধরিয়া পৃথক সমাজ করিতে অনুরোধ করিলে তিনি কাতর-ভাবে সকলকে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্ম-মন্দিরে উপাসনা করিতে অনুরোধ করিলেন এবং ধীরে ধীরে জনতা পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন গৃহে গমন করিলেন। আমরা এই অসাধারণ ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, সংযম, আত্মত্যাগ দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম। তিনি খ্রীষ্টের অনুপ্রাণনে খ্রীষ্টের আত্মত্যাগ-পথে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত ওরিয়েণ্টাল ক্রাইষ্ট তাঁহার একমাত্র পরিচয় নয়; এই ঘটনাই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।"

ইংরাজীতে ও বাঙ্গালায় বহু গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। মৃত্যু শয্যায় পড়িয়াও তিনি তাহার শেষ গ্রন্থ—'আশীষ' লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার পাঠক-সমাজ এ গ্রন্থের সংবাদ রাখেন না বটে, কিন্তু বঙ্গ-সাহিত্যে এমন উপাদেয় গ্রন্থ বেশী আছে বলিয়া মনে হয় না।

অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমার দত্ত

মৃত্যু—১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯০।

আদর্শ বাঙ্গালা-গদ্যের তিনি অন্যতম জন্মদাতা ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় তাঁহার পুস্তক পড়িয়া বাঙ্গালা শিখিবার চেষ্টা

করে নাই, এমন বাঙ্গালী-পাঠক কেহ আছে বলিয়াত মনে হয় না।

বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে তিনি যে সামগ্রী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্যও সামান্য নহে। "ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ে'র মত উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর একখানিও আজ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। তিনি কুম সাহেব-প্রণীত "Constitution of Man" নামক পুস্তক অবলম্বনে "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" নাম দিয়া যে পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাঁহার লিপি-ভঙ্গীর গুণে মৌলিক রচনা বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীকে নূতন তত্ত্ব শিখাইবার জন্য বিলাতী সাহিত্য [illegible] আহরণ করিয়াছিলেন। আ[illegible] বাবুর Indian Shipping' পড়িয়া [illegible] করিতেছি বটে, কিন্তু প্রায় ৭০ বৎসর [illegible] সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয় কুমারই 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা [illegible]তে বহু ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগের সাহায্যে বা[illegible]কে শুনাইয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানের নাবিক বহুশত বর্ষ [illegible], এসিয়ার সকল সমুদ্র ও সমুদ্রাকূলে একাধিপত্য করিয়াছে। 'ভারতের অর্ণবযান' নাম দিয়া সে প্রবন্ধ 'তত্ত্ব-বোধিনী'র পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, অক্ষয়কুমারের লেখনী-প্রভাবেই 'তত্ত্ববোধিনী'র প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল।

অক্ষয়কুমার অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বলিলে তাহার সাহিত্য-সাধনার পরিচয় [illegible] হয় না। সাহিত্য-সাধনাই তাঁহার ধর্ম্ম ছিল। প্র[illegible] প্রেরণায় তিনি সাহিত্য-সেবী হইয়াছিলেন। নহিলে, [illegible] ভগ্ন-হৃদয় লইয়া তিনি 'উপাসক সম্প্রদায়ে'র মত [illegible] কখনও লিখিয়া যাইতে পারিতেন না।

নানা বিষয়ে তিনি গুরুত্ব[illegible] বাঙ্গালীর পাঠোপযোগী করিয়া বিজ্ঞান [illegible] তিনিই বাঙ্গালীকে প্রথম দেখাইয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট বহু শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া গিয়াছে।

সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

মৃত্যু—২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১।

জ্ঞানে, গুণে, গানে, শিষ্টাচারে ও সামাজিকতায় রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাঙ্গালার এক প্রধান পুরুষ ছিলেন। সাহিত্যে ও সঙ্গীত-কলায় আজীবন চর্চা করিয়া ১৩২১ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ তিনি ৭৪ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

শৌরীন্দ্রমোহন হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ও মহারাজা বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা। অগ্রজের আনুকূল্যে [illegible] তিনি [illegible] কন্সার্ট-বাদ্য-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করেন। [illegible] ও সঙ্গীত-শাস্ত্রে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। [illegible] সম্বন্ধে জটিল প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কত সময় যে [illegible] দেশ-দেশান্তর হইতে তিনি অনুরুদ্ধ হইতেন, তাহার [illegible] হয় না। হিন্দু-সঙ্গীতের পুনরুদ্ধার ও [illegible] প্রচারকল্পে তিনি যে পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, বাস্তবিকই [illegible]শে তাহা তুলনা-বিহীন। প্রথম তিনি '[illegible]-সঙ্গীত বিদ্যালয়' এবং ইহার ঠিক দশ বৎসর পরে "Bengal Academy of Music" নামে দুইটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। [illegible] উভয় অনুষ্ঠানই তাহার ব্যয়ে বহুকাল যাবৎ পরিচালিত হইয়াছিল। গীতবাদ্য-বিষয়ক বহু পুস্তকও তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ফিলেডেলফিয়া ও অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে "Doctor of Music" উপাধি প্রাপ্ত হন। আজ পর্য্যন্ত আর কোনও ভারতবাসীর [illegible] এ সম্মান-লাভ ঘটে নাই। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে [illegible]পর অসংখ্য উপাধি বর্ষিত হইয়াছিল।

শুধু সঙ্গী[illegible] তাহার প্রবল অনুরাগ [illegible] তাহার বয়স, তখন তিনি 'ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত' নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি 'মুক্তাবলী' নামে একখানি নাটিকা রচনা করেন। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা পঞ্চাশের কম হইবে না। শুধু

পরিমাণে বেশী নহে, গুণেও তাঁহার রচিত এমন অনেক গ্রন্থ আছে, যাহা অতুলনীয়। তাহার 'সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ' অপূর্ব্ব গ্রন্থ। তাঁহার 'মণিমালা', তাহার 'রসায়নবিদ্যার বুদ্ধক' প্রভৃতি পুস্তকও তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

তাঁহার সমস্ত গ্রন্থের নাম-নির্দ্দেশ বা পরিচয় প্রদান করা এখানে অসম্ভব। তবে এটুকু না বলিলে অন্যায় হইবে যে, বঙ্গ-ভাষায় গীত-বাদ্য বিষয়ক পুস্তক লিখিবার পথ বাঙ্গালীকে তিনিই প্রথম দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইলে মাতৃ-ভাষার এক অংশ একেবারেই আজ শূন্য হইয়া থাকিত।

রজনীকান্ত গুপ্ত

মৃত্যু—৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৭

বঙ্গ-সাহিত্যের ঐতিহাসিক বিভাগে রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়কে স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার প্রকৃত পথ-প্রদর্শক বলিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু বঙ্গ-ভাষায় সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রচারের প্রথম উদ্যম যে তিনিই করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার 'সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে এমন পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর একখানিও ছিল না। ইহা তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম অধ্যবসায়ের অপূর্ব্ব নিদর্শনরূপে বহুকাল সমাদর লাভ করিবে।

রজনীকান্ত আজীবন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। যখন তাঁহার ছাত্র-জীবন, তখন হইতেই তিনি সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁহার 'জয়দেব-চরিত' প্রকাশিত হয়। এই প্রথম পুস্তক লিখিয়াই তিনি সুযশ-অর্জ্জন করিয়াছিলেন। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র তাহার 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠায় এ পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

কিন্তু বাহিরের প্রশংসা লাভ করিলেও গৃহে তিনি এজন্য সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাবকগণ তাঁহাকে সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত করিয়া তাঁহাকে কবিরাজ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। রজনীকান্ত পুস্তক লিখিয়াই জীবিকা অর্জ্জন করিবেন, ইহাই তাঁহার জীবনের সাধ ছিল।

তাঁহার সে সাধ পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি 'আর্য্যকীর্ত্তি', 'নবভারত' 'ভারত-প্রসঙ্গ,' 'ভীষ্ম-চরিত', 'বীরমহিমা', 'প্রতিভা' প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কেবল খ্যাতি নহে—যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ পঠিত হইত না, ১৫।১৬ বৎসর পূর্ব্বে এমন বিদ্যালয় বোধ করি বাঙ্গালায় ছিল না। তাহার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনি প্রাঞ্জল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদও তাঁহার নিকট ঋণী। পরিষদের প্রতিষ্ঠা-কার্য্যে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। পরিষদকে বৃহৎ অনুষ্ঠানে পরিণত দেখিবার জন্য তাঁহার বড় আগ্রহ—বড় উৎসাহ ছিল। কিন্তু নিষ্ঠুর কাল তাঁহাকে তাহা দেখিবার অবসর দিল না।

আষাঢ় :—

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু—১লা আষাঢ়, ১২৬৮

এখনকার পাঠকেরা হরিশচন্দ্রের নামটুকু ছাড়া তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানেন না। কিন্তু ছিল একদিন, যখন তাঁহার গুণের ও তেজের কথা বাঙ্গালীর মুখে মুখে আলোচিত হইত। বাঙ্গালার অনেক গানে, কবিতায় ও পাঁচালীতে তাঁহার নাম অমর হইয়া আছে। একজন লিখিয়াছিলেন,—

"নীল বানরে সোণার বাংলা করলে এবার ছারখার।
অসময়ে হরিশ মলো—লংএর হলো কারাগার।

আর একজনের গানে আছে,—

"নীলে নীলে সব নিলে প্রজার বল ভাই কি রেখেছে।
তাই নিয়ে বার বার, লিখে লিখে হরিশ মরেছে।"

* * * *

এইরূপ গান আরও অনেক আছে, বাহুল্য ভয়ে সে-সব উদ্ধৃত করিলাম না। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে দেশবাসী যে

কিরূপ অনুভব করিয়াছিল, তাহারই একটু পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে ঐ কয়ছত্র উদ্ধৃত করিলাম। যাঁহারা ঐ শোক করিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি আজ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে আজিকার দিনেও তাঁহারা পাবনার কথা শুনিয়া হরিশচন্দ্রের অভাববোধে রোদন করিতেন। তখনকার দিনে চিত্তরঞ্জন ছিলেন না সত্য—কিন্তু হরিশচন্দ্রের শূন্য আসন যে এতদিনেও পূর্ণ হইল না; তাহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হইয়া সম্পাদক-জীবনের যে আদর্শ তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও এদেশে অতুলনীয় হইয়া আছে। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত;—অর্থাৎ সবেমাত্র এই চারি বৎসর কাল তিনি সম্পাদকের পদে ব্রতী ছিলেন; কিন্তু এই অল্পকালমধ্যে তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা শুধু অতুলনীয় নহে,—অসামান্যও বটে। ভারতের বহু স্মরণীয় ঘটনার সহিত তাঁহার স্বল্প সম্পাদক-জীবনের কীর্ত্তি বিজড়িত আছে। সনন্দ পত্রের পুনঃ সংস্কার অযোধ্যাকে অধিকার-ভুক্ত করন, সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকরগণের অত্যাচার, রাজহস্তে রাজ্য-শাসন-ভারের পরিবর্ত্তন ও বিশ্ব-বিদ্যালয়-সংস্থাপন প্রভৃতি ঘটনা এই সময়েই ঘটিয়াছিল। হরিশচন্দ্রের নির্ভীকতা ও নিরপেক্ষতা ঐ সকল ঘটনার ভিতর দিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তখন প্রতিনিয়তই আত্ম-প্রকাশ করিত। সিপাহী বিদ্রোহের উপশান্তি ঘটিলে পর একদিন কলিকাতায় বড়লাটের প্রাসাদ হইতে হরিশচন্দ্রের ভবানীপুরের বাসা-বাটীতে এক চিঠি যায় যে, "আপনি কোন দিন সময় করিয়া, কখন লর্ড কানিঙের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারেন। বড়লাট বাহাদুর আপনার সহিত শাসননীতি-সম্বন্ধে আলাপ করিতে চাহেন।" ৺ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অমনি সদ্য সদ্য উত্তর লিখিয়া দিলেন "আমি দরিদ্র সাধারণ ব্যক্তি। আমার পক্ষে বড়লাট দর্শন শোভন হইবে না। তিনি এদেশে ব্রিটিশ-রাজের প্রতিনিধি; ব্যক্তিগত এবং পদ-গত অতি প্রবল মহিমার দ্বারা আমার মতন দরিদ্রের মন আচ্ছন্ন এবং বিমুগ্ধ হইতে পারে। পাছে বিমূঢ় অবস্থায় আমি বাজে কথা করিয়া ফেলি, সেই ভয়ে আমি লাট-প্রাসাদে যাইব না। দরিদ্রের প্রতিনিধি আমি, আমার জাতির ও দেশের সম্বন্ধে হিন্দু পেট্রিয়টে আমি যাহা লিখিয়া থাকি, তাহাই আমার বক্তব্য; হিন্দু পেট্রিয়ট যখন লর্ড ক্যানিং নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকেন তখন আমার তাঁহাকে নূতন কিছু বলিবার নাই। আমার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের কথা, অভাব অভিযোগের কথা আমি বড়লাট বাহাদুরকে শুনাইতে চাহি না। অতএব আমি তাঁহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিলাম না।" এ তেজস্বিতা, এ আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞান সকল দেশে সকল সময়েই সুদুর্লভ। আধুনিক নেতাদের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায় যে, প্রাতঃস্মরণীয় হরিশচন্দ্র কত বড় তেজস্বী—কত বড় দৃঢ়চেতা পুরুষ ছিলেন। রাজ-নীতিক্ষেত্রে তিনি শুধু আমাদের প্রথম গুরু নহেন সর্ব্ব প্রধান গুরুও বটেন। তাঁহার স্মরণ-স্তম্ভে যাহা লিখিত আছে, তাহাই তাঁহার কীর্ত্তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইলেও প্রকৃত পরিচয় পাঠক-সাধারণের অবগতির জন্য এখানে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

স্বর্গীয় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

যিনি "হিন্দু পেট্রিয়ট" পত্রিকার সম্পাদক ও "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান" সভার অধিনায়ক ছিলেন এবং সমকালে বহুবিধ বিষয়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে দক্ষতা তাঁহার সময়ে ও নিঃস্বার্থ-ভাবে বিচার-বিতর্ক দ্বারা স্বদেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন।

যিনি অসামান্য সাহস, সত্যনিষ্ঠা ও স্বাধীনতার সহিত অন্যায় পক্ষের পরাজয়ে প্রবৃত্ত হইতেন ও ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতেন;

যিনি বিদ্রোহসঙ্কুল-সঙ্কট সময়ে রাজপুরুষগণকে সৎপরামর্শ দিয়াছিলেন ও রাজনীতির প্রকৃত অভিপ্রায় সাধারণের গোচর করিয়াছিলেন;

যিনি উৎপীড়িত দীন দরিদ্রের পিতৃস্বরূপ ছিলেন এবং তাহাদের সহায়তা করিতে সাধ্য পক্ষে কখনই বিমুখ হইতেন না;

যিনি স্বীয় জীবনের স্বার্থত্যাগ ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন;

যিনি একবার প্রজাবৃন্দের শরণ্য পৃষ্ঠপোষক ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবলম্বনীয় স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন-;

সেই মহাপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন
এই কীর্ত্তিস্তম্ভ।

তদীয় চিরকৃতজ্ঞ স্বদেশবাসিগণ কর্ত্তৃক সাধারণের প্রদত্ত অর্থ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইল।

কলিকাতা ভবানীপুরে সন ১২৩১ সালে তাঁহার জন্ম ও সন ১২৬৮ সালে মৃত্যু হয়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
মৃত্যু—২রা আষাঢ়, ১৩৩২।

দশ বৎসর গত হইল, চিত্তরঞ্জনকে যখন বাঙ্গালার জনসাধারণ বড় ব্যারিষ্টার ও বড় কবি বলিয়া জানিত, তখন আমি আমার 'রমিয়ানা' গ্রন্থ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলাম,—"আপনি বড় ব্যারিষ্টার, বা বড় কবি বলিয়া যে আমার চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছেন, তাহা নহে। আমি মুগ্ধ হইয়াছি আপনার হৃদয়-মাহাত্ম্য দেখিয়া। আপনার জীবন-ঘটনায় যে ত্যাগ যে সাহস ও যে হৃদয়বত্তার পরিচয় পাইয়াছি, বাঙ্গালীজীবনে তাহা দুর্লভ।"—এই উক্তি কাহারও কাহারও নিকট তখন অত্যুক্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু আজ উহাকে অত্যুক্তি বলা দূরে যাউক, উহা যে তাঁহার স্বরূপ পরিচয়, এ কথা বলিতেও বোধ করি সকলে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। বাস্তবিক তাঁহার ত্যাগ, তাঁহার সাহস ও তাঁহার হৃদয়বত্তা দেশবাসীর নিকট আজ এত পরিচিত যে, কেবল 'বাঙ্গালী জীবনে উহা দুর্লভ' বলিলে তাঁহাকে ছোট করাই হয়। তাঁহার জীবনের ন্যায় জীবন সর্ব্বদেশে সকল সময়েই দুর্লভ।

বুদ্ধদেবের ন্যায় তিনি যেদিন পরিপূর্ণ ভোগের মাঝখানে জাগিয়া উঠিয়া বিলাস মন্দিরের সমস্ত আলোকে অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, সেদিন দেশবাসীর চক্ষে এক নূতন আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেশের লোক যখন সভাস্থলেই তাহাদের প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র এবং ইংরাজী ভাষায় বাগ্মিতাকেই তাহাদের জীবনের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া মনে করিত, তখন এই মহাপুরুষের বিপুল প্রাজ্ঞতার সহিত অপূর্ব্ব ত্যাগশীলতা, বিচিত্র কর্ম্মশীলতার সহিত অটল প্রশান্তি, অগাধ বিদ্যাবত্তার সহিত পরিপূর্ণ বিনয় মিশ্রিত হইয়া এবং তাঁহার সমস্ত জ্ঞান চিন্তা ও চেষ্টার উর্দ্ধভাগে একটি পবিত্র ও ধ্রুব ধর্ম্মভাবের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া যে এক উন্নত উজ্জ্বল উদার আদর্শের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া মুখরতা-গর্ব্বিত দেশবাসী তাঁহার চরণপ্রান্তে প্রণত না হইয়া থাকিতে পারে নাই। তাঁহার নিন্দুক দল তাঁহার নামে নিত্য নূতন কুৎসা রটাইতে অবশ্য ত্রুটী করে নাই; এমন কি, তারকেশ্বরে যখন তাঁহার নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ সংগ্রামের নিষ্পত্তি হইবার আয়োজন হইতেছিল, তখন ত তাঁর নামে মোহান্তের নিকট হইতে ঘুষ লওয়ার কলঙ্ক পর্য্যন্ত রটিয়াছিল। এজন্য তিনি একটু ব্যথিতও হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন,—"আমার নামে অনেক কাগজে নানা কুৎসা প্রচারিত হইতেছে, অনেকে এমন কথাও বলিতেছেন যে, আমি নাকি মোহান্তের নিকট হইতে ঘুষ লইয়াছি, কিন্তু আমি আপনাদিগকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, আমি অহঙ্কারী হইতে পারি, অভিমানী হইতে পারি, হয়ত আমার অনেক দম্ভ আছে, কিন্তু আপনারা ঠিক জানিবেন, টাকার থলির উপর দিয়া আমার চরণই চালিত হইতে পারে, হস্ত আমার কখনই ঐ ঘৃণিত টাকার থলি স্পর্শ করিবে না। তারকেশ্বর সমস্যায় আমি জড়িত আছি, বাঙ্গালার সত্যাগ্রহ আমার গর্ব্বের বিষয়। এই সত্যাগ্রহের যূপকাষ্ঠে আমি আমার প্রাণাধিক একমাত্র পুত্রকে বলি দিয়াছি, আপনারা আদেশ করিলে আপনাদের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া সত্যাগ্রহ করিতে প্রস্তুত।"

কিন্তু এ কথা তাঁহার মুখ দিয়া না বাহির হইলেও ক্ষতি ছিল না। কারণ, তাঁহার হৃদয়-মাহাত্ম্য ও কর্ম্মজীবনের প্রভাব দেশবাসীর অন্তরের উপর এমনই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, নিন্দুকদলের সমস্ত কুৎসা-প্রচারই উপেক্ষায় ফুৎকারে নিমেষে উড়িয়া যাইত। "টাকার থলির উপর দিয়া তাঁহার চরণই যে চালিত হইতে পারে; তাঁহার হস্ত যে

কখনই ঐ ঘৃণিত টাকার থলি স্পর্শ করিবে না," এ কথা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধবৎ সত্য বলিয়া লোকে এখনও যেমন মনে করে, তখনও তেমনই মনে করিত।

শুধু তাহাই নহে, ব্যারিষ্টার-মহলে যখন তিনি একচ্ছত্র সম্রাট, যখন রাশি রাশি টাকার থলি তাঁহার পায়ের কাছে আসিয়া গড়াগড়ি যাইত, তখন সেই টাকার থলির সদ্ব্যবহার দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতাম। যখন যাঁহার অভাবের কথা তাঁহার কাণে আসিয়া পৌছিত, তখনই সেই টাকার থলি তাহার হাতে গিয়া পড়িত। এ বিষয় তাঁহার শত্রু মিত্র ভেদ ছিল না। মনে পড়ে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহের সময় তিনি যখন নারায়ণ শিলা গৃহে আনিয়া হিন্দু মতে কন্যার বিবাহ দেন, তখন শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় তাহাতে বিরক্ত হইয়া সে বিবাহে যোগদান করেন নাই। ফলে, গুজব রটে যে, চিত্তরঞ্জন বিপিনবাবুকে যে মাসিক সাহায্য করিতেন, তাহা তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমি এই গুজব সম্বন্ধে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি হাসিয়া উত্তর করিয়াছিলেন যে,—"বিপিন বাবু আমার যত শত্রুতাই করুন না কেন, ভগবান যতদিন আমাকে দিবার ক্ষমতা রাখিবেন, ততদিন তাঁহার টাকা বন্ধ হইবে না।"—বিপিন বাবু নিজেও একবার চিত্তরঞ্জনের সাহায্যোপলক্ষে 'নায়ক' পত্রে লিখিয়াছিলেন,—"যারা যখন আমার ভার বহনে বিধাতার বাহন হইয়াছেন, তারা তখন সকলেই আমার নিকটে 'চোরের মতন' থাকিয়াছেন।" কিন্তু চিত্তরঞ্জন শুধু বিপিন বাবুর নিকট নহে, যাঁহাকে কিছু দিতেন, তাহারই নিকট 'চোরের মতন' থাকিতেন। জীবনে অনেকবারই দেখিয়াছি যে লোক তাহাকে গালি দিতেছে, সেই লোকই এদিকে আবার তাহার নিকট হাতও পাতিতেছে, তিনি কিন্তু নির্ব্বিকার চিত্তে সে শূন্য হাত পূর্ণ করিয়া দিতেছেন। এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও দেখি নাই, আর কখনও ঘটিয়াছে কি না, তাহাও শুনি নাই। সত্যই তিনি মানব-দেবতা ছিলেন।

তাঁহার সাহস ও তেজস্বিতারও তুলনা হয় না। লোকের মুখ চাহিয়া চলিবার কৌশল তিনি কখনও শিক্ষা করেন নাই। যে সাহস অসাধ্য সাধনের প্রয়াস করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পরিণামে হয়ত নিস্ফলতা মাত্র লাভ করে, তাহার মধ্যে সেই সাহসই ছিল। তিনি একবার বলিয়াছিলেন,—"সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্," এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিও না। সে ত কাপুরুষের কথা, দেশ-ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোন অনুতাপও হয় না।"—এ কথা তাহার অন্তরের কথা। এ কথা তাহার জীবন দিয়া তিনি অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন! মহাত্মার অসহযোগ নীতি হইতে সরিয়া আসিয়া স্বরাজ দল-সংগঠনের চেষ্টা তাঁহার ঐ উক্তিরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৯১৭ সালে তিনি যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি হন, তখন তিনি সভাপতির আসন হইতে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে যে ভাবে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাও তাঁহার ঐ উক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভাবের ঘরে তিনি চুরি করিতে জানিতেন না বলিয়াই তাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে কখনও অসামঞ্জস্য দেখিতে পাই নাই। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে তিনি লিখিয়াছিলেন,—"আমাদের দেশে এমন অনেক উপহাস-রসিক আছেন, যাঁহারা বলেন, তোমরা কি করিতে চাও? তোমরা কি Companyর রাজত্ব উল্টাইয়া দিবে?" এ কথার উত্তর অতি সহজ। আমরা আর কিছু চাই না—আমরা আমাদিগকে মানুষ করিতে চাই। ইংরাজের সহিত আমাদের শুধু রাজাপ্রজাসম্বন্ধ। ইংরাজের আইন আমাদিগকে মানিয়া চলিতেই হইবে কিন্তু ইংরাজকে আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন কখনই অধিকার করিতে দিব না। ইংরাজের আইনের গণ্ডীর বাহিরে, ইংরাজের সহিত আমাদের যে ক্ষেত্রে সম্বন্ধ তাহারও বাহিরে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা সেইখানে আমাদের মাতার বিজয় নিশান উত্তোলিত করিব। আমরা সেইখানেই বাঙ্গালীর কলঙ্ক ঘুচাইব। আমরা সেইখানেই আপনাকে মানুষ করিয়া তুলিব। তারপর যে অনন্ত মহান্ পুরুষ আপনাকে সকল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে, সকল জাতির মধ্যে, সকল জাতীয়

কটাক্ষ।

শিল্পী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ বসু।
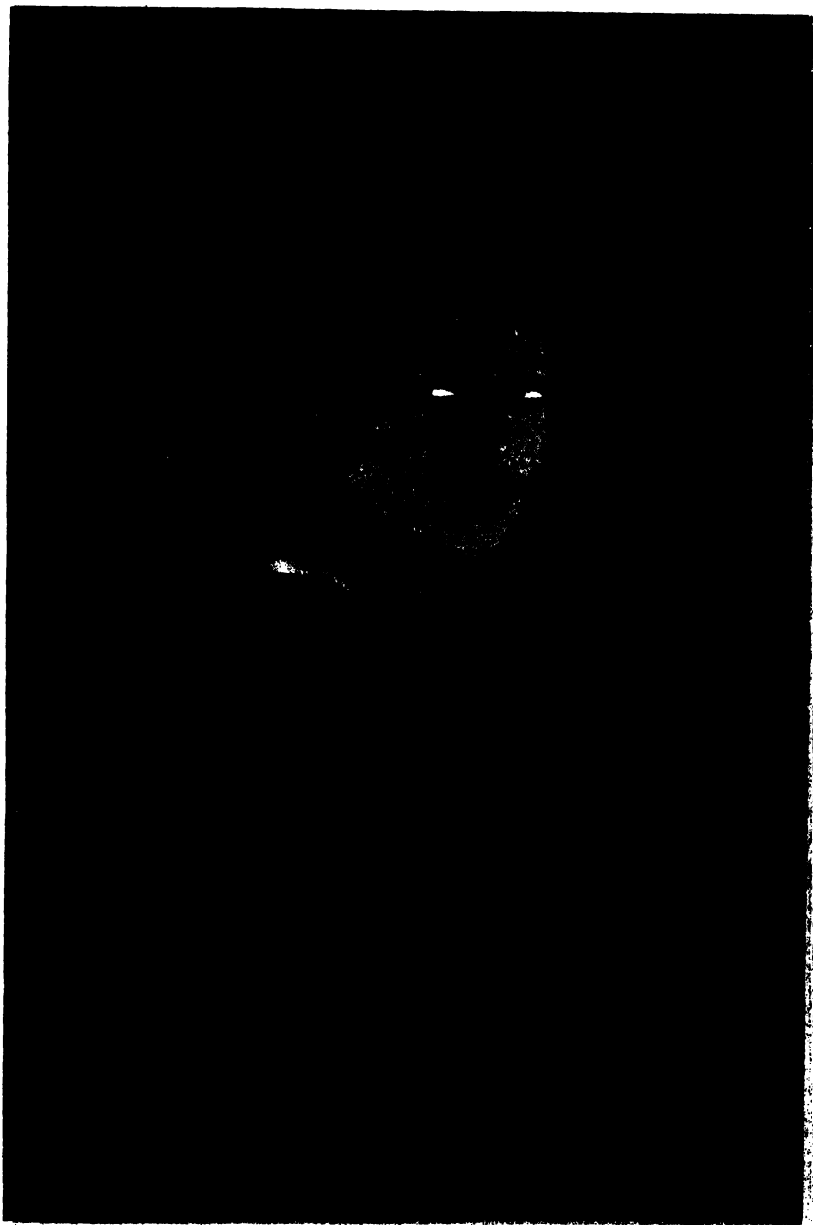
ইতিহাসের মধ্যে প্রকাশ করিতেছেন, তিনি কি ভাবে—কিরূপে বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিবেন, তাহা তিনিই জানেন—শুধু তিনিই জানেন।"—এই তাহার প্রথম কথা—সমস্ত জীবন ধরিয়া এই কথাই তিনি নানাভাবে আমাদিগকে শুনাইয়া গিয়াছেন। ভগবানে তাঁহার অটল বিশ্বাস ও অচলা ভক্তি ছিল। জগৎ যাহা ইচ্ছা বলুক, তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহা ভগবানের নির্দ্দেশ মনে করিয়া তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িতেন। তাঁহার অন্তর্যামীর উদ্দেশে তিনি যে সকল কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকল কবিতা সখ বা ফরমাইস-বুদ্ধিতে লেখা নহে। তাহার মধ্যে তাঁহার ঐ মর্ম্মোক্তির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,—

"যে পথেই ল'য়ে যাও" স পথেই যাই,
মনে রেখ আমি শুধু তোমারেই চাই!

* * *

সুখের মাঝারে শুধু সুখ খুঁজি নাই!
তুমি জান দুঃখ মাঝে করেছি সন্ধান
তোমারে তোমারে শুধু পাই বা না পাই,

* * *

চরণে বিঁধুক কাঁটা তাতে ক্ষতি নাই!
যদি প্রাণে ব্যথা লাগে, চোখে আসে জল,
ফিরিয়া ফিরিয়া তোমা ডাকিব কেবল।

* * *

দরশন নাই দিলে কাছে কাছে থেক।
যদি ভয় পাই বঁধু! মাঝে মাঝে ডেক!

সকল কাজে, সকল সময়ে ইহাই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

———

চন্দ্রনাথ বসু

মৃত্যু—৬ই আষাঢ়, ১৩১৭

পৃথিবীতে একটির অধিক দুইটি চন্দ্র নাই;—এক চন্দ্রেই সমস্ত জগত আলোকিত। কিন্তু বাঙ্গালার সাহিত্য-চন্দ্রের সংখ্যা অগণিত না হউক,—অত্যধিক বটে। ভারতচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত বহুচন্দ্রের আলোক-সম্পাতেই এ সাহিত্যাকাশ সমুজ্জ্বল। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে কোনও চন্দ্রের কথা মনে পড়ে না, এবং তাঁহার সমকালে তিনিই বোধ হইতেছে 'একচন্দ্র' ছিলেন, কিন্তু তারপর আর একটি মাত্র চন্দ্র নহে,—এক সঙ্গে দুই দিক হইতে দুইটি চন্দ্র উদিত হইয়া বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশকে আলোকিত করিয়াছিল। সে আলোক-সৌন্দর্য্য ৬০।৬৫ বৎসরের পুরাতন হইলেও এখনও মলিন হয় নাই;—এখনও তাহা আমরা সানন্দে উপভোগ করিয়া থাকি। গুপ্ত কবি ঈশ্বরচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্রকে বিস্মৃত হইবে কে?

ঐ দুই চন্দ্রোদয়ের পর বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশে চাঁদের হাট বসিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র ও চন্দ্রশেখরের উদয় ঘটিয়াছিল। এই অষ্টচন্দ্রের সহিত চন্দ্রনাথের নামও আমরা উল্লেখ করিতে পারি। শোভায় ও প্রভায় এই কয়টি 'চন্দ্র' সমতুল্য না হইলেও ইহাদের কেহই উপেক্ষার যোগ্য নহেন। এ যুগের বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস যদি কখনও লিখিত হয়, এবং সে ইতিহাসে ঐ কয়টি চন্দ্রের" মধ্যে কোনও একটি যদি বাদ পড়ে, তবে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইবে। চন্দ্রনাথের অনেক লেখা হয়ত অনেকের নিকট এখন ভাল লাগে না, কিন্তু যাঁহারা দেশের ও সাহিত্যের পূর্ব্বাপর অবস্থা মনে রাখিয়া তাঁহার সাহিত্য-সাধনার আলোচনা করিবেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, চন্দ্রনাথ যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা প্রচুর না হইলেও তাহার দ্বারা সাহিত্যের-পুষ্টি ও পাঠকের উপকার হইয়াছিল! এখনকার সাহিত্য-রথীরা আলোচনা-হিসাবে যাহা লিখিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশেই বদহজমের দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। বিলাতী লেখকদের মতামত ঠিক মত না বুঝিয়া ইহারা কেবল কালির আঁচড় পাড়িয়া থাকেন। কিন্তু চন্দ্রনাথ এরূপভাবে কখনও আত্ম-প্রবঞ্চনা করেন নাই; বরং ও কাজটাকে আন্তরিক ঘৃণার চক্ষেই দেখিতেন। নিজে যাহা চিন্তা করিতেন, যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই তিনি পরিষ্কার ভাষায় নির্ভীকতার সহিত বলিয়া যাইতেন। সে আলোচনার ফলে, মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার এককালে ঘোর

বিচার-বিতণ্ডা ঘটিয়াছিল—সাহিত্য ক্ষেত্রে সে সজীবতা এখন নাই। মাসিক-রাজ্যে কেবল ছুঁচোবাজিরই খেলা চলিতেছে।

গোড়ায় চন্দ্রনাথ ইংরাজী-য়ানার ও ইংরাজী ভাষার ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার সে সময়কার কথা বলিতে গিয়া তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন যে, "বাঙ্গালা লিখিতে অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল, তখন ইংরাজী লিখিয়া বড় সুখ হইত।" —কিন্তু এ সুখ-বোধ বেশী দিন তাঁহার স্থায়ী হয় নাই। যেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের প্ররোচনায় তিনি 'শকুন্তলা-তত্ত্ব' লিখিতে আরম্ভ করেন, সেই দিন হইতে তাহা: মনের গতি আর একরূপ হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন যে "শকুন্তলা-তত্ত্ব" লিখিবার পর সরকারী কার্য্যের জন্য ভিন্ন আর ইংরাজী লিখি নাই—লিখিতে আর ইচ্ছাও হয় নাই। লিখিতে হইলে মাতৃভাষার ন্যায় অন্য কোন ভাষা লেখা স্বাভাবিক ও সুখকর নয়। যখন বাঙ্গালায় লিখি, তখন যাহা লিখি তাহা সম্মুখে দেখি; যখন ইংরাজীতে লিখি, তখন যাহা লিখি তাহার এবং আমার মনশ্চক্ষুর মধ্যে যেন একখানা পর্দ্দা বিলম্বিত দেখি।"—এমন অকপটতা, এমন সত্যবাদিতা, মাতৃভাষার প্রতি এমন মমত্ব-বোধ এদেশে সত্যই কি দুর্লভ নয়?

চন্দ্রনাথ ছাত্রজীবনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন, তাহা অনন্যসাধারণ হইলেও তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না। কারণ দেশের ও দশের হিতসাধনের সহিত সে কৃতিত্বের কোনই সম্বন্ধ নাই। তাহার সমসাময়িক স্বর্গীয় কালী বাঁড়ুয্যে ও কালীপদ গুপ্ত—ইহারা উভয়েই বিশ্ব বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন; কিন্তু চন্দ্রনাথের তুলনায় ইঁহাদের স্মৃতি আজ কতটুকু উজ্জ্বল হইয়া আছে? চন্দ্রনাথ 'শকুন্তলা তত্ত্ব,' 'ত্রিধারা,' ও সাবিত্রী তত্ত্ব' না লিখিলে, তাঁহার কথাও লোকে ভুলিয়া যাইত। ঐ কয়খানি গ্রন্থই তাঁহার নামকে আজিও বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

মৃত্যু—১৯শে আষাঢ়, ১৩০৯।

(১)

দিন যত গত হইতেছে, বিবেকানন্দকে ততই চিনিতে পারিতেছি। রামমোহন ও কেশবচন্দ্রের প্রভাব তাঁহাদের জীবিতকালে যেমন ছিল, এখন তাহার শতাংশের একাংশও নাই। ৩৫।৩৬ বৎসর পূর্ব্বে, পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন ও পণ্ডিত শশধরের নামও এদেশে কম ছিল না, কিন্তু এ দুইটি নামের সহিত আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীর তেমন কোনও পরিচয় নাই বলিলেও চলে। অথচ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ, যে ভক্ত-সংখ্যা রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার কত গুণ ভক্ত যে এখন বাড়িয়া গিয়াছে, তাহার হিসাব হয় না। স্বামী বিবেকানন্দকে কখনও চোখে দেখে নাই, অথচ তাঁহাকে গুরু-বোধে নিত্য মনে মনে পূজা করিয়া থাকে, এমন ব্যক্তি এদেশে অল্প নাই। সামান্য মুদির দোকান হইতে স্যর সুরেন্দ্রের কক্ষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার বহু গৃহ-প্রাচীরেই তাঁহার চিত্র বিলম্বিত দেখিয়াছি। এতটা সমাদর—এমন প্রভাব-প্রতিপত্তির বিস্তার লাভ এ যুগে একমাত্র দেশবন্ধু ব্যতীত আর কোনও মৃত মনীষী, কর্ম্মী বা সাধকের ভাগ্যে ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কালের কাছে ফাঁকি চলে না। আমাদের স্মৃতি-স্তম্ভে যে আজ বিবেকানন্দেরই স্মৃতি-ফলক সর্ব্বোচ্চে আসন লাভ করিয়াছে, কাল-বশে তাহা ঘটিয়াছে। কালের বিচারে তাঁহার কর্ম্ম-জীবন অতুল ও অদ্বিতীয় বিবেচিত হওয়াতেই দেশবাসীর হৃদয়ে তিনি এমন উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। তিনি দেশকে যতটা আগাইয়া ও জাগাইয়া দিয়া গিয়াছেন, ততটা তাঁহার পূর্ব্বজগণের বা সম-সাময়িকগণের মধ্যে আর কেহ পারেন নাই।

বিবেকানন্দকে যাঁহারা বিপ্লববাদী বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা তাঁহাকে আদৌ চিনিতে পারেন নাই। দেশবাসীকে তিনি কেবল অগ্রসর হইবার পথই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কোনও কিছু ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার তিনি

পক্ষপাতী ছিলেন না। মানুষ হইতে পারিলে, আমাদের সব হইবে, আমরা সব পাইব, এই আশার কথাই তিনি আমাদের কর্ণকুহরে কেবল ঢালিয়া গিয়াছেন। তিনি বারবার বলিয়াছেন—"বঙ্গীয় যুবক, বিশ্বাস করো তোমরা মনুষ্য;

স্বামী বিবেকানন্দ

বিশ্বাস করো তোমরা অপরীসীম কার্য্যক্ষম। বিশ্বাস করো ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী। অগ্রসর হও! পশ্চাদপদ হইও না।"—এই বাণী যদি বিপ্লববাদের নামান্তর হয়, তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ মহাপুরুষের উপদেশই বিপ্লববাদে পরিপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

আসল কথা, তিনি বিপ্লববাদীও ছিলেন না; আবার কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মম সন্ন্যাসীও ছিলেন না। তাঁহাকে আমরা মনুষ্যত্বের প্রকৃত প্রচারক বলিয়া মনে করি। তিনি যেমন সেবাব্রতে ধর্ম দেখিতেন, তেমনই স্বদেশ-প্রেমকেও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। ভগিনী নিবেদিতা তাঁহার সম্বন্ধে একবার লিখিয়াছিলেন,—'যে কয় বৎসর ধরিয়া আমি প্রায় প্রতি দিনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, সে সময় সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি যে, জন্মভূমির চিন্তা যেন শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহাতে অনুপ্রবিষ্ট ছিল।...ভারতবর্ষে এমন একটি

জগতের আর্ত্তনাদ, দুর্ব্বলতার কম্পন ও বেদনার সঙ্কোচ ছিল না, যাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব না করিতেন।"—বাস্তবিক কথাই তাই। তাহা না হইলে এমন মহাবাক্য তাঁহার মুখ হইতে কখনও নিঃসৃত হইতে পারিত না—"সদর্পে ডাকিয়া বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেব-দেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ।"—মাতৃভূমির উদ্দেশে এমন প্রাণভরা উক্তি, এমন প্রগাঢ় ভক্তি, এমন নিঃশেষ আত্মদান ও এমন নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা আজ পর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় আর ব্যক্ত হইয়াছে কিনা জানি না।

(২)

বাঙ্গালায় মনীষী, মেধাবী, প্রতিভাশালী পণ্ডিতের অভাব ছিল না, বাঙ্গালায় বিচক্ষণ প্রবীণ চতুর রাজনীতিক পুরুষের অভাব ছিল না, বাঙ্গলায় ভাবুক বক্তা ও শক্তিশালী লেখকের অভাব ছিল না;—বাঙ্গলায় ছিল না কেবল একটি বিবেকানন্দ। দেশাত্মবোধের মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নব-জীবনের উদ্বোধন-কুম্ভ দেশ মাতৃকার মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করিবার পুরোহিত ছিল না। ছিল না শব-সাধনায় অগ্রধারক—মহা ভয়ের সময়ে আশ্বাস দিবার বীর-আসন-বীর সিদ্ধ সাধক। ছিল না দেশের জন্য, জাতির জন্য সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী কর্ম্মী। দেশের সেই অভাব এযুগে স্বামীজি হইতেই প্রথম দূর হইয়াছে। কেমন করিয়া দরিদ্র নারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হয়, কেমন করিয়া দেশের ও দশের অঙ্গীভূত হইয়া তাদাত্ম্যের সাধনা করিতে হয়, কেমন করিয়া আপনার জীবনে দীনতার প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রবল পুরুষকারের প্রভাবে শত সিংহ-বিক্রমের অধিকারী হইয়া দেশের হীনতা চূর্ণ করিতে হয়, দেশবাসীকে তাহা তিনি শিখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবন—কঠোর সাধনার জীবন। তাঁহার কথা ও কার্য্য, মন ও মুখ, বাহির ও ভিতর এক ছিল। তোমার ত্যাগ—সাধনা-সিদ্ধ সাধকের ত্যাগ। তাই তিনি যেদিন দেশ-বাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন..."যদি ভাল চাও তো ঘণ্টা-কণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান নররারায়ণের··· মানব দেহধারী হরেক মানুষের পূজা কর গে। সকলের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা...এই আমাদের ব্রত। তাহাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।"—সেই দিন হইতে বাঙ্গালী যুবক জড়তার পাশ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াসী হইয়াছে। সেই দিন হইতে তাহারা রোগীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে বসিয়া দিবানিশি সেবা করিতে শিখিয়াছে; প্লেগে ভয় করে না, বসন্ত বা কলেরা রোগী দেখিলে সঙ্কুচিত হয় না, বিপন্নকে উদ্ধার করিবার জন্য উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল সাগর সলিলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেও ইতস্ততঃ করে না। অতএব, তোমার নিষ্কাম কর্ম্মেই ভারতের নিষ্কাম ধর্ম্ম যে আজ পারিজাতের মত ফুটিয়া ভারতের নৈমিষ আলো করিতেছে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

স্বদেশ-প্রেমের অবতার তিনি। ভারতের স্বদেশ ভক্তি-সাধনের পবিত্র মন্দিরের দ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি তন্ময়চিত্তে বলিয়াছিলেন,—"হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারী-জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী। ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিওনা—তোমার বিবাহ তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়-সুখের বা নিজের ব্যক্তি-গত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই মায়ের বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র; অজ্ঞ, মুচি মেথর তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদাই বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই। সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু-শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই; ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ, আমার কল্যাণ।" এ প্রাণময়ী মহতী বাণী কি ভুলিবার? এত তেজ, এত গর্ব্ব, এত প্রগাঢ় ভক্তি, এত নিঃসঙ্কোচ আত্মীয়তা ও এমন নিঃশেষ আত্মদান আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গলাভাষায় আর কখনও কাহারও দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে কি?

তিনি যে শুধু এদেশের মুক্তিমন্ত্রের প্রচারক—নবযুগের প্রধান প্রবর্ত্তক, তাহা নহে। কন্যা কুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবাসী আজ তাঁহার মানে মানী। ভারত হইতে প্রাতীচ্যে গিয়া তিনিই সর্ব্ব প্রথম গুরুর আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, জননীর লাঞ্ছনা-লাঞ্ছিত শিরে মানের মুকুট পরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই বলিতে ইচ্ছা হয়, বাঙ্গলার, তথা ভারতের গৌরব-রবি তুমি। তোমার মতন মনের মানুষ, তোমার মতন অনুকম্পার আধার সন্ন্যাসী, তোমার মতন শাস্ত্রদর্শী সমাজ চিকিৎসক এ যুগে আর একটিও এদেশে হয় নাই। তোমার লোকোত্তর চরিত্র কেমন করিয়া বুঝিব,—কেমন করিয়া বুঝাইব? তোমার মহান্ চরিত্র দেবতার বিগ্রহের ন্যায় দুরবগাহ—কেমন করিয়া সে চরিত্রের বিশ্লেষণ করিব?—দেবতার বিগ্রহ তো বিশ্লেষণ করা যায় না। তবে সে চরিত্র যে জাতির আরাধনার সামগ্রী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই আজ জাতির এই যুগসন্ধি-ক্ষণে সেই পূত চরিত্রের পূজা-উপলক্ষ্যে মনে কেবল মনে কেবল এই কামনাই জাগিতেছে যে, তোমার চরিত্র জাতীয়তার মন্দিরে হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হউক, তাহার প্রভাবে জাতি প্রভাবিত অনুপ্রাণিত হউক!

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

মৃত্যু—২০শে আষাঢ়, ১৩১৪।

"হিতং মনোহারি চ দুর্ল্লভং বচঃ"—এই বাক্যকে মূলমন্ত্র করিয়া যিনি 'হিতবাদী' পত্রিকার পরিচালন-ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ ষোল বৎসর হইল তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছেন।

'হিতবাদী' কালীপ্রসন্নের কীর্ত্তিস্তম্ভ। তাঁহার রচিত ভাল ভাল গান ও কবিতা অনেক আছে, তাঁহার সম্পাদিত 'বিদ্যাপতি' তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক।

তিনি একজন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ নির্ভীক সম্পাদক ছিলেন। ন্যায় হউক, অন্যায় হউক, তিনি যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে কখনও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। কোনও প্রকারের ভয় বা কোন প্রকারের প্রলোভন, তাহাকে কখনও কর্ত্তব্য-পথ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

মাতৃভূমি তাহার একমাত্র উপাস্য দেবতা ছিল। তিনি অন্য কোনও দেবতা মানিতেন না। প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে বসিয়া তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবসেও জন্মভূমির উদ্দেশে এই কবিতাটী লিখিয়াছিলেন—

"এই কি জীবন শেষ? জীবন-রঙ্গিনি!
কোথা প্রিয় জন্মভূমি?
কোথা আমি? কোথা তুমি?
পড়িল কি যবনিকা সহসা এখনি?

*   *   *

তোমার মহিমা গা'ব, ওমা জন্মভূমি!
লাঞ্ছিত তোমার নাম,
দেখে তবু চলিলাম,
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা—দেখিলে ত তুমি!
এ দুঃখ রহিল মনে,
তোমার সন্তানগণে,
না দেখিয়া সমাদৃত,—শমন সদনে
যেতে হ'ল—মনসাধ রহিল মা মনে!

—এ স্বদেশ-প্রেম সর্ব্বত্রই দুর্ল্লভ। মাতৃভক্ত কর্ম্মবীর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বদেশের কথাই ভাবিয়াছিলেন।

শ্রাবণ ঃ—

উমেশচন্দ্র বটব্যাল

মৃত্যু—১লা শ্রাবণ, ১৩০৫

ছাত্র-জীবনে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া যে আজ তাঁহার স্মৃতি-পূজা করিতেছি, তাহা নহে। কারণ, বঙ্গদেশের এমন ছাত্র-জীবনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ২৪ বৎসর বয়সে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া ডেপুটি

ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ তিনি গ্রহণ করেন, এবং এই কাজ করিতে করিতে ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি চাটুটাদি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ম-লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপ ঘটনা তাঁহার মনীষা ও মনস্বিতার পরিচায়ক হইলেও এতদ্ তাঁহার মৃত্যুর একুশ বৎসরকাল পরে আজ সে কথা তুলিয়া তাঁহার গৌরব-গান করিবারও আবশ্যকতা অনুভব করি না। কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়া বাঙ্গালীকে তিনি যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহার কথা বাঙ্গালী ভুলিতে পারিবে না। সে দানের পরিমাণ প্রচুর না হইলেও তাহার মূল্য অসামান্য। তাঁহার 'সাংখ্য-দর্শন' ও 'বেদ-প্রবেশিকা' গ্রন্থ দুইখানি বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারের মূল্যবানসামগ্রী।

তিনি কখনও চর্ব্বিত-চর্ব্বণের পুনঃচর্ব্বণ করিতে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার প্রথম লেখার দ্বারাই তিনি দেশের বিদ্বজ্জন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া তিনি যখন বৈদিককালের গোহত্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার লেখায় গভীর গবেষণা ও অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া দেশের পণ্ডিতমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তারপর তিনি সাংখ্য, বেদ ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তখনই তাহা বিশেষজ্ঞ পাঠক সমাজ কর্ত্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছে। তিনি যাহা লিখিতেন তাহাই নূতনত্বে ঝলমল করিত। বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহার সাহিত্য-সাধনা অপূর্ণ রহিয়া গেল। তিনি যাহা দিবেন মনে করিয়াছিলেন, নিষ্ঠুর কালের তাড়নায় তাহার সমস্তটুকু দিয়া যাইতে পারেন নাই।

কৃষ্ণদাস পাল

মৃত্যু—৮ই শ্রাবণ, ১২৯১

(১৮)

এই বাগ্মী, সুলেখক, স্বাধীনচিত্ত ও বাগ্মী-কৃষ্ণদাস পরলোক গমন করেন।

ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে শিক্ষালাভের পর ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার মেধা, বিদ্যানুরাগিতা ও সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা দর্শনে অধ্যাপক কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন্ তাঁহাকে বড়ই স্নেহ করিতেন। অধ্যাপক মণ্ডলীর প্রিয়পাত্র হইলেও অবস্থা-বিপর্য্যয়-হেতু কৃষ্ণদাস দীর্ঘ কাল কলেজের শিক্ষা লাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু কলেজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেও তিনি বিদ্যানুশীলন ও জ্ঞানার্জ্জনে ক্ষান্ত হন নাই। জ্ঞানার্জ্জনে এই অদম্য উৎসাহ ও মনুষ্যত্ব বিকাশের বলবতী স্পৃহাই তাঁহাকে বরেণ্য ও অমর করিয়া রাখিয়াছে।

অল্প বয়সেই তিনি বাঙ্গালার সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সহিত সংসৃষ্ট হন এবং 'হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার' ইণ্ডিয়ান ফিল্ড 'সিটিজন্' 'ফিনিক্স' 'সেণ্ট্রাল ষ্টার' প্রভৃতি পত্রে নিয়মিত ভাবে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ২২ বৎসর বয়সেই তিনি তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংবাদপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়েট' সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। লর্ড লিটনের আমলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যখন কঠোর মুদ্রাযন্ত্র বিধান প্রবর্ত্তিত হয়, তখন কৃষ্ণদাস পাল তীব্র ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ইলবার্ট বিল্ যখন বিধিবদ্ধ হয়, সে সময়ে তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ইলবার্ট সাহেব বলেন, "ইহার তুল্য লোক পৃথিবীর যে কোন দেশে যশস্বী হইতে পারেন।" বাঙ্গালার ভুতপূর্ব্ব ছোটলাট স্যর রিচার্ড টেম্পল্ তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন, "রাজা স্যর ট্যাঞ্জোর মাধব রাও ছাড়া কৃষ্ণদাসের সমকক্ষ ব্যক্তি ভারতে আমি দেখিতে পাইলাম না।"

পাঁচকড়ি বাবু লিখিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি নিজের বাপকে বাপ বলিতে পারিতেন, নিজেরাই জননীকে জননী বলিতে পারিতেন। ভাল হউক, মন্দ হউক সুন্দর হউক, কুৎসিত হউক আমার জনকজননী আমারই জনকজননী, আমার দৃষ্টিতে অতি সুন্দর, অতি মনোহর—সজীব, সাকার দেবতা! কৃষ্ণদাস নিজের জনককে ইংরেজি দৃষ্টিতে সুন্দর করিয়া লইবার কোন চেষ্টাই কখনও করেন নাই, নিজেও কখনই সাহেব সাজেন নাই। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড লিটন, লর্ড রিপন প্রভৃতি উদার—শিষ্টাচারপরায়ণ বড়লাটের পাল্লায় পড়িয়াও তিনি কখনই লাটবাড়িতে এক পেয়ালা চা পান করেন নাই।

সেই চুরুট মুখে দিয়া, চুরুটের ফাঁক দিয়া গড় গড় করিয়া ইংরেজী বলিতেন, দেশের কাজ করিতেন এবং নিজের প্রভার গণ্ডীর মধ্যে সগর্ব্বে এবং সতেজে আবেষ্টিত থাকিতেন। তাহার পর তিনি খাঁটি ডিমক্রাট ছিলেন। পাড়ার বামার মা ক্ষেমীর পিসী বেদো মেধো যেমন তাহার কাছে অবাধে যাইতে পাইত; তিনি তাহাদের সুখ-দুঃখের কাজ অম্লানমুখে করিতে পারিতেন—করিতে সুখ বোধ করিতেন, তেমনই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার কাজে প্রাণ ঢালিয়া লিপ্ত হইতেন। তিনি দেশটাকে সমাজটাকে সাকল্যে—সর্ব্ববিষয়ে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বুকের উপর রাখিয়াছিলেন বলিয়া তিনি জাতিবর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ইতর ভদ্র সকলের সেবা করিতে পারিতেন। সত্যই তিনি সেকালের হিসাবে বড়লোক ছিলেন—সকলের মুরুব্বী ছিলেন। তিনি একালের হিসাবে ধনী বড়মানুষ ছিলেন না, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে ঘণ্টা নাড়িতে হইত না, কার্ড পাঠাইতে হইত না, মুহুরীর বা খানসামার সহিত মোলাকাৎ করিয়া উপদেবতার স্তব ও পূজা করিতে হইত না। খাঁটি বাঙ্গালার বড়লোক তিনি, তাঁহার সকল দরজা সকল সময় খোলা থাকিত, দেশবাসী সকলের সকল কথা তিনি শুনিতে ভাল বাসিতেন—শুনিতে চাহিতেন। তাঁহার বিরক্তি ছিল না, দেশের জন্য "খাটিয়া খাটিয়া প্রাণ গেল" বলিয়া তাঁহার মুখে অহঙ্কারের স্পর্দ্ধা ফুটিত না। তিনি দেশের ও দশের হইয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন।

কৃষ্ণদাসের এই বিশিষ্টতা কিসের জন্য ছিল? তিনি সত্যই দেশকে ও দশকে আমার আপনার বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। এ পক্ষে তাঁহার তিলমাত্র ভাবের ঘরে চুরী ছিল না। তিনি দেশকে এবং দশকে ভাল বাসিতেন বলিয়া বামার মার বকুনী, ক্ষেমীর পিসীর কাঁদুনী, বেদোর মেধোর আপ্‌সানী কাণ পাতিয়া শুনিতেন। তাহারা যে তাঁহার পাড়া প্রতিবেশী, আপন জন! তিনি যে তাহাদের, তাহারা যে তাঁহার আপনার, তাই, তিনি অবিচলিতচিত্তে, হাস্যমুখে যেমন তাহাদের কাজ করিতেন, তেমনই হিন্দু পেট্‌রিয়ট লিখিতেন, এসোসিয়েশনের কাজ করিতেন। আজকালকার বাবুরা দেশ ও সমাজ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া আছেন; তাঁহারা দেশের একটু আধটু কাজ করিয়া মনে করেন, দেশের লোককে ও জাতিকে কৃতার্থ করিলাম, তাহারা আমার পদানত হইয়া থাকিবে। তাই তাহারা দুইটা বাজে লোকের সহিত দশটা কথা কহিয়া অবসন্ন হ'ন, আঃ-উঃ করেন এবং ব্যাঙের ছাতার মত ঠেলিয়া উঠিয়া নেতাগিরির বাহার ফুটাইতে চেষ্টা করেন। ইহারা সবাই ভাবের ঘরে চোর। যদি তুমি দেশের দরিদ্র এবং মূর্খদের আপনার জন বলিয়া ভালবাসিতে না পার, তাহাদের বকবকানী সহিতে না পার, তাহাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য সদা সচেষ্ট না হও, তাহাদের কুটীরে যাইয়া দাঁড়াইতে না পার, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব তুমি দেশভক্ত—মাতৃভক্ত। আবার বলি, ভাল হউক, মন্দ হউক, সুন্দর হউক, কুৎসিৎ হউক আমার দেশ, আমার জাতি, আমার জনক, আমার জননী বলিয়া কৃষ্ণদাস দেশের ও জাতির সর্ব্বস্বটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি তজ্জন্য কখনও লজ্জাবোধ করিতেন না, নিজেকে হীন বোধ করিতেন না; তাই তিনি হিন্দু, তাই তিনি হিন্দুয়ানীর হিসাবে বড় ডিমক্রাট ছিলেন।

কৃষ্ণদাসের হিসাবে বড়লোক এ দেশে ক্রমে লোপ পাইতেছে। এখন অনেক ধনী হইয়াছে, অনেকে দুই দিনের দুনীয়ায় দুই পয়সা উপার্জ্জন করিয়া বেজায় ভারী হইতেছেন, বড় মানুষ হইতেছেন, কৃষ্ণদাসের আদর্শের বড়লোক মুরুব্বী আর নাই বলিলে চলে। এক আছেন মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার কাছেও সেই পুরাতন বাঙ্গালার পুরাতন পদ্ধতি বিরাজমান। অবারিত দ্বারে যে ইচ্ছা সে যাও, একটু চাপিয়া ধরিলে যাহার তাহার নামে সুপারিস চিঠি আদায় করিতে পার। এই দুইদিন হইল এক গরীবের গরু মরিয়াছে, সেও সুরেন্দ্র বাবুর দ্বারস্থ। কৃষ্ণদাসের আদর্শের নেতা ও বড়লোক ঐ এক সুরেন্দ্রনাথ আছেন।

আজ মনে পড়ে কৃষ্ণদাসকে জাতির ভাগ্যের এই সন্ধি-ক্ষণে, জগতের এই মহা মুহূর্ত্তকালে মনে পড়ে সেই স্থির-মনীষী, দূরদর্শী কৃষ্ণদাসকে। তিনি সত্যই বাঁচিয়া থাকিলে আধুনিক হঠাৎ নায়ক, কাজকা নেতার দল তাঁহার সহিত কেমন ব্যবহার করিতেন বলিতে পারি না, হয়ত সে বুড়কে স্বার্থীর দল পিঞ্জরাপোলে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিত। কৃষ্ণদাস যে বেজায় ভালমানুষ ছিলেন, ইংরেজ লিবিলিয়ানদের

পোষ মানাইতে জানিতেন ; তাহা নহে। তিনি বিষয় বিশেষে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিতেন, আসামের কুলি আইন হইবার সময়ে তিনি যে সব সন্দর্ভ পেট্রিয়টে ছাপাইয়াছিলেন, তাহা এখন ছাপিলে 'ছাপাখানা' বাজেয়াপ্ত হয়। মাকুবর লায়ান সাহেবকে তাই একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কৃষ্ণদাসকে ত অত মিষ্ট মানুষ করিয়া চিত্রিত করিয়াছ, স্যর জর্জ্জ ক্যাম্বেলের বিরুদ্ধে তাঁহার লেখা এবং আসাম কুলি আইনের লেখাগুলি আমাকে পুনর্মুদ্রিত করিবার অনুমতি দিতে পার ? কৃষ্ণদাস কেবলই নরম ছিলেন না—নরম গরম দুই ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায়ের সহিত আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। আজ তিনি বা তাঁহার মত কেহ থাকিলে একটা সওদার বন্দোবস্ত হইতে পারিত। তিনি ভুলিতেন না এবং কাহাকেও ভুলিতে দিতেন না যে আমরা প্রজার জাতি, রাজা ইংরেজের বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা সভ্যতা সর্ব্বস্বই আমাদের গ্রহণ করিতে হইতেছে ; ইংরেজ আমাদের আদর্শ। অন্য সকল যেমন আমরা ইংরেজের নিকট হইতে গ্রহণ করিতেছি ; রাজনীতিক অধিকারও তেমনি গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের যাহা সহে ও রহে তিনি তাহাই লইতে পরামর্শ দিতেন। এই সন্ধিক্ষণে তাঁহার মত বিচক্ষণ রাজনীতিকের প্রয়োজন।

আমার দুঃখ এই, আমরা বড় শীঘ্র শীঘ্র সব ভুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। বাঙ্গালার গত চল্লিশ বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাস আমরা ভুলিয়াছি। যাঁহারা নেতা হইতে চাহেন, তাঁহারা পুরাতন ইতিহাস কথা শুনিতে বা সংগ্রহ করিতে শ্রম স্বীকার করেন না। সত্যই আমরা কৃষ্ণদাস পালকে ভুলিয়াছি ; তাঁহাকে চিনিতে ভুলিয়াছি, তাঁহাকে বুঝিতে ভুলিয়াছি। তাই তাঁহার নাম ধরিয়া আমরা আমাদের মনের কথা তাঁহার উপর আরোপ করিতে চেষ্টা করি। ইহা ঠিক নহে। লোকটা কেমন ছিল ও কি ছিল সেইটুকু বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। সে বোধের পক্ষে গত চল্লিশ বৎসরের রাজনীতিক ইতিহাসের আলোড়ন আমাদের সহায়তা করিবে। আমি কৃষ্ণদাস পালকে প্রথম কিশোরেই দেখিয়াছিলাম। আমার মনে আছে কৃষ্ণদাস পাল একজন খাঁটি দেশাত্মবোধপ্রবুদ্ধ বিরাট পুরুষ ছিলেন। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস দেশটাকে ও জাতিটাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন—আপনার বলিয়া দেশের সর্ব্বস্বটাকে জড়াইয়া ধরিতে জানিতেন। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস নিজের বিদ্যাবুদ্ধি ও মনীষার পুঁটুলি অহঙ্কারের কুক্ষিতে সংগ্রহ করিয়া, স্বদেশ ও স্বসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, উচ্চে দাঁড়াইয়া দেশের ও জাতির প্রতি অনুকম্পাপরায়ণ হইয়া অবসর মত দেশসেবা করিতেন না। আমার মনে আছে, কৃষ্ণদাস যেমন দর্প দম্ভের সহিত নিজের "বাপকে বাপ" বলিয়াছিলেন, তেমনই দর্পদম্ভের সহিত নিজের দেশকে ও নিজের জাতিকে আমার নিজের বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারিতেন। তাই কৃষ্ণদাস দেশের সকলের কৃষ্ণদাস ছিলেন, তাঁহার পর ছিল না—সবাই আপনার অন্তরঙ্গ পুরুষ ছিল। ধনী নির্ধন কেহই দানের সহায়তায়—অনুকম্পায় সাহায্যে—সহচর্য্যে বঞ্চিত ছিল না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

মৃত্যু—৯ই শ্রাবণ, ১২৭৭

কালীপ্রসন্নের এখনও নাম বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফিরিতেছে। কখনও তাঁহার স্মৃতি-সভা হয় না—কোথাও তাঁহার ছবি বা প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত দেখি নাই, কিন্তু দীনের বন্ধু, ভণ্ডের শত্রু, দুর্ব্বলের সহায় ও গুণীর গোলাম কালীপ্রসন্নের ছবি বাঙ্গালী আপনার হৃদয়-পটে আঁকিয়া রাখিয়াছে। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভার কালীপ্রসন্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন ভণ্ড ব্রাহ্মণের টিকি কাটিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল—টিকি-কাটা জমিদার। রেভারেণ্ড লঙ সাহেবের একমাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ড হইলে তিনিই ঐ অর্থ অযাচিতভাবে দান করিয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হইলে তিনি নিজ বাটীতে একটি সভা আহ্বান করিয়া মধুসূদনকে বঙ্গভাষায় একখানি অভিনন্দনপত্র ও রৌপ্যনির্ম্মিত একটি পান-পাত্র প্রদান করেন।

কালীপ্রসন্নের মতন অল্পায়ু কীর্ত্তিমান পুরুষ এ যুগে আর কোনও বাঙ্গালী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। উনত্রিশ বৎসর মাত্র বয়সের মধ্যে তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন,

তেমন কাজ এত অল্প বয়সের মধ্যে মনে হয় আর কোনও আধুনিক বাঙ্গালী করিতে পারেন নাই। তাঁহার সেবা, মনীষা ও হৃদয়বত্তার সাহায্য না পাইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কি ক্ষতি হইত, তাহা বলা যায় না। মাইকেল ও দীনবন্ধুর প্রতিভা-উদ্দীপনে তিনি অবিরত উৎসাহের বাতাস দিয়াছিলেন। তাঁহার বিরাট মহাভারত তাঁহার অতুল কীর্ত্তি। 'কালীসিংহীর মহাভারতে'র নাম কোন্ বাঙ্গালী না শুনিয়াছে?—তাঁহার সমস্ত কীর্ত্তি-কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার এই একখানি গ্রন্থ তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'ও এক শ্রেষ্ঠ দান। এই গ্রন্থের ভাষা ও ভাব-ভঙ্গী বাঙ্গালীর মনে এক নূতনত্বের আস্বাদ দান করিয়াছিল। ইহার তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বাণে কত ভণ্ডের ভণ্ড-জীবন যে শেষ হইযাছে, তাহার হিসাব হয় না। কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া ও তাহার অভিনয় করাইয়া বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের উন্নতির পথও তিনি প্রশস্ত করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র যে ছন্দে নাটক লিখিতেন, সে ছন্দের উন্মেষও প্রথম তাঁহার লেখায় পরিদৃষ্ট হয়।

১২৭৭ সালের ৯ই শ্রাবণ তাঁহার জীবন-লীলা শেষ হয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র

মৃত্যু—১০ই শ্রাবণ, ১২৯৮

বাঙ্গালার যাঁহারা গৌরব, বাঙ্গালীর যাঁহারা মান বাড়াইয়া গিয়াছেন, রাজেন্দ্রলাল তাঁহাদেরই একজন। তিনি তাঁহার অসামান্য মনীষাবলে দেশের জাতি ও ভাষা—দেশের শিল্প ও সভ্যতা সম্বন্ধে নানা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া দেশবাসীকে তাহা উপঢৌকন দিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীর মধ্যে প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা পূর্ব্বে ছিল না। রাজেন্দ্রলালই এ বিষয়ে সকলের অগ্রণী। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁহার হাতে গড়া শিষ্য। তাঁহার অসাধারণ গবেষণা-শক্তির পরিচয় পাইয়া শুধু এদেশের নহে,—বিদেশেরও পণ্ডিত মণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধগয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনত্ব বিষয়ক গ্রন্থ পণ্ডিত-সমাজ কর্ত্তৃক এখনও সাদরে ও সাগ্রহে পঠিত হইয়া থাকে। তিনি সর্ব্ব-শুদ্ধ ১২৮ খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৩ খানি বাঙ্গালা, ১৩ খানি সংস্কৃত ও অবশিষ্টগুলি ইংরাজী ভাষায় লিখিত। তাঁহার অধিকাংশ গ্রন্থই পুনঃ মুদ্রণের অভাবে দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগের অধিকাংশ অধ্যাপকই ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। যে ভাষা জানা না থাকিলে ভারত ইতিহাসের আলোচনা-অধ্যাপনা ঠিকমত হয় না, সে ভাষা না জানিয়াও তাঁহারা আজ ইতিহাসের অধ্যাপক—ইতিহাসের গবেষণা করিয়া ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। কিন্তু বিদেশী ভাষা শিক্ষা করিবার যখন সত্যই এদেশে তেমন সুবিধা ছিল না তখনকার কালে রাজেন্দ্রলাল সংস্কৃত, ইংরাজী, পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী ও জার্ম্মণ ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার গবেষণা-শক্তির পরিচয় পাইয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সেনেট সভা তাঁহাকে ডি-এল উপাধি প্রদান করেন। পরে তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এ সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে রাজেন্দ্রলালই প্রথম পাইয়াছিলেন। বাঙ্গার মাসিক-সাহিত্যে তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাও স্মরণ-যোগ্য। পুরাবৃত্ত, প্রাণি বিদ্যা, শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনা সম্বলিত সচিত্র মাসিক পত্রের প্রবর্ত্তন তিনিই এদেশে প্রথম করিয়াছিলেন। তাঁহার 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' ও 'রহস্য সন্দর্ভ' তাঁহার কৃতিত্বের পরিচায়ক। এই দুইখানি মাসিক পত্র হইতে রাজেন্দ্রলালের লেখা আত্মসাৎ করিয়া এ দেশের অনেকেই এখন লেখকরূপে পরিচিত হইতেছেন।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অদ্যকার তারিখে ঠিক ৭০ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার নিকট নানা ঋণে ঋণী হইয়াও আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনও আয়োজনই করি না। এ দেশে অনেক বাজে লোকের স্মৃতি-সভা হয়, কিন্তু রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু-দিনে

তাঁহার নাম করিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে শুনি না। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যদি এ বিষয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মৃত্যু—১৩ই শ্রাবণ, ১২৯৮

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রথম সংঘাতে বাঙ্গালার মানস-সরোবরে যে কয়টি শতদল ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার মধ্যে 'সৌরভে ও গৌরবে' যিনি অতুলনীয়, তিনি কে?—তিনি আমাদের বিদ্যাসাগর।

পাঠশালায় প্রবেশ লাভ করিয়াই প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, বোধোদয় ও সীতার বনবাস প্রভৃতি পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শুভ্র মলাটের উপর যাঁহার নাম অঙ্কিত দেখিয়া যাঁহাকে চিরদিন গুরু বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছি, তিনি কে?—তিনি নব্য বাঙ্গলার বাঙ্গালীর শিক্ষা-গুরু ঈশ্বরচন্দ্র।

দেশের আজ ঘোরতর দুর্দ্দিনে যাঁহার কথা বারবার মনে পড়িতেছে, আর্ত্তের ব্যথায় যাঁহার চক্ষে বর্ষার প্লাবন আসিত, যিনি দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের জন্য সদাই মুক্তহস্ত ছিলেন, তিনি কে?—তিনি দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

দেশাচারের দারুণ বাঁধ—সমাজের ভ্রূকুটী-ভঙ্গী যাঁহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধির স্রোতকে কখনও বিপরীত মুখে ফিরাইতে পারে নাই, যিনি নিজ জীবন দিয়া মনুষ্যত্বের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন, তিনি কে?—তিনি পুরুষসিংহ ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর।

যিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াও সভাস্থলকে কখনও কর্ম্মক্ষেত্র, এবং বাগ্মিতাকে জীবনের মহাব্রত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই;—যিনি নিজ বাক্যের অনুযায়ী কার্য্য চিরদিনই করিয়া গিয়াছেন, সেই নির্ভীক তেজস্বী পুরুষ কে? তিনি বিদ্যাসাগর।

পাঁচকড়ি বাবু একবার লিখিয়াছিলেন,—"মানুষ নয়নের সাধ মিটাইয়া সাগর-দর্শন সমাপ্ত করিতে পারে না; কারণ সাগর অনন্ত এবং অসীম, মানবচক্ষু ক্ষুদ্র এবং সীমাবদ্ধ। সাগরদর্শন মনুষ্যের পক্ষে একদেশ দর্শন হয়, সুতরাং মানুষের মুখে এবং ভাষায় সাগরের পরিচয় একদেশ নিবদ্ধ পরিচয় হইয়াই পড়ে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সত্যই আধুনিক বাঙ্গালার এবং বাঙ্গালীর পক্ষে সাগর সম অনন্ত এবং অসীম ছিলেন। তাঁহাকে আধুনিক বাঙ্গালী এখনও চিনিতে এবং বুঝিতে পারে নাই। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যেমন অভ্রভেদী পর্ব্বতচূড়ার তলদেশে যাইয়া উর্দ্ধনেত্র হইয়া দেখিলে গিরিরাজের মহিমা বুঝা যায় না—পর্ব্বতচূড়া দেখিতে হইলে দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়, যে চূড়া যত উচ্চ হইবে সে চূড়া দেখিতে তত পিছু হটিয়া—ততদূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে—তেমনি বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পনর কুড়ি বৎসর পরে বাঙ্গালার মনীষি বাঙ্গালী বিদ্যাসাগরকে চিনিতে জানিতে বুঝিতে চেষ্টা করিবে। কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিক বাঙ্গালার বাঙ্গালী এখনও বিদ্যাসাগর মহাশয়কে চিনিবার চেষ্টা করিতেছে না; বরং বলিব, বিদ্যা-সাগর মহাশয়কে এখনকার বাঙ্গালী ভুলিয়া যাইতেছে। এখন বিদ্যাসাগর নামে মাত্র পর্য্যবসিত হইয়াছে; তাই বিদ্যাসাগরের স্মৃতিসভায় এখন আর তেমন আকাঙ্ক্ষা, তেমন আগ্রহ, তেমন উৎসাহ উদ্যম দেখা যায় না।

বিদ্যাসাগর সত্যই সাগর ছিলেন—বাঙ্গালীর মানবতার সাগর ছিলেন। তাঁহাকে চিনিতে ও চিনাইতে হইলে বাঙ্গালার যাঁহারা সে সাগর দর্শন করিয়াছেন সে সাগরের পরিচয় গ্রহণে চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারা জোট বাঁধিয়া বিদ্যা-সাগরের পরিচয় দিবার আয়োজন করিলে তবে যদি কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগরকে চিনিবার সামর্থ্য আমরা লাভ করিতে পারি। লর্ড রোজবেরী একবার বলিয়াছিলেন যে, গ্লাডষ্টোনের জীবন কথা লিখিতে হইলে ইংলণ্ডের সকল পক্ষের প্রাজ্ঞ ও প্রাচীন, উদ্যমশীল নবীন সকল শ্রেণীর রাজনীতিক নায়কগণের একটা লিমিটেড কোম্পানী গড়িয়া, একটা সুদূর সমুত্থানের সূচনা করিয়া লেখা আরম্ভ করিতে হইবে। বিদ্যাসাগর-জীবন পক্ষেও সেই কথা খাটে। কিন্তু আবার বলিব,

তেমন সকল দিক দিয়া বিদ্যাসাগরকে চিনিবার চেষ্টা এখনকার বাঙ্গালী করিতেছে না।

আমি বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাঙ্গালার আদি পুরুষ বলিয়া মনে করি। তেমন বিরাট বিশাল মানবতার নিদর্শন বর্ত্তমান যুগে আর আমরা পাই নাই। বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান বাঙ্গলার আদি পুরুষ ভূমা পুরুষ। তাঁহার বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ হইতে বিধবা-বিবাহের আলোচনা পুস্তক পর্য্যন্ত সকল বহি বাঙ্গালার মনীষাকে এক নূতন প্রবাহে প্রবাহিত করিয়াছে; তিনি তরুণ বাঙ্গালাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, আধুনিক বাঙ্গালার বনীয়াদ গাড়িয়া গাঁথিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের একজন স্রষ্টা, সস্তায় উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা প্রচারে একজন প্রবর্ত্তক, সমাজ-সংস্কারক এবং দয়ার অবতার ছিলেন। এই তিন হিসাবে তাঁহাকে বিচার করা হইয়াছে; এই তিন দিক দিয়া তাঁহার চরিত কথা লেখা হইয়াছে। কিন্তু তিনি যে একজন আদর্শ বাঙ্গালী ছিলেন, একজন প্রকৃত জাতিপ্রীতি সম্পন্ন জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সাধক পুরুষ ছিলেন—তিনি যে বাঙ্গালার শেষ বাঙ্গালী, শেষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শেষ ব্যাখ্যাতা ও অধ্যাপক ছিলেন, তাঁর মনে-প্রাণে-চিত্তে-বুদ্ধিতে বাঙ্গালিত্ব, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বৈশিষ্ট্য জড়ান মাখান ছিল, এটুকু আমরা বুঝিতে ভুলিয়াছি, বুঝিবা সে শক্তি হারাইয়াছি। আমার মনে হয় এখন বিদ্যাসাগরকে বাঙ্গালীর হিসাবে, বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গুণসমেত অধ্যাপক হিসাবে চিনিবার সময় হইয়াছে। দেশাত্মবোধের উন্মেষের কালে বাঙ্গালার বিদ্যাসাগরকে চিনিয়া রাখিবার সময় হইয়াছে।

আমার আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদ, আমার দৃষ্টিতে অতি সুন্দর, অতি মনোহর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যুৎকৃষ্ট প্রতীয়মান হওয়া চাই। এই শ্রদ্ধা বুদ্ধি যতদিন থাকিবে ততদিন প্রাণপণ করিয়া আমি আমার আহারেতে এবং পরিচ্ছদগত বিশিষ্টতা এবং স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবই। যে দিন এই শ্রদ্ধাবুদ্ধি নষ্ট হইবে, সেই দিন ধুতী চাদর, গাড়ু গামছা চটি টিকে ছাড়িয়া অনুচিকীর্ষার বশে, সুবিধাবাদের মোহে ইংরেজের বা ইয়োরোপের সর্ব্বস্ব অবলম্বন করিব। ইংরেজের জাতি বজায় আছে, তাই এই অতি ঘোর গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বাস করিয়াও তাহারা শীতপ্রধান ইংলণ্ডের পোষাক পরিচ্ছদ এবং জীবন-রক্ষার পদ্ধতি অটুট এবং অব্যাহত রাখিয়া চলিতেছে। এই হিসাবে রসরাজ অমৃতলাল বসুর কথামত বিদ্যাসাগর ইংরেজ ছিলেন। তিনি ইংরেজের মতন নিজের পরিচ্ছদ কিছুতেই পরিহার করেন নাই। তিনি যে সাজে, যে পরিচয়ে বাঙ্গালার লোকলোচনের গোচর হইয়াছিলেন, সেই সাজে সেই পরিচয়ে চিতাশয্যায় আরোহন করিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালীত্বের খাতিরে সেই জাতীয়তার মহিমায় মুগ্ধ হইয়া রাজদত্ত উপাধিও প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কার কার্য্যে তিনি খাঁটি বাঙ্গালার শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের ধারা পরিবর্জ্জন করেন নাই। জীমূতবাহন হইতে শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত সকল অধ্যাপক-সংস্কারক ঋষিবাক্য এবং শাস্ত্র প্রমাণকে শিরোধার্য্য করিয়া স্ব-স্ব মতানুযায়ী ব্যাখ্যার আরোপ করিয়া ঈপ্সিত সিদ্ধান্ত লাভ করিতেন। জীমূতবাহন দায়ভাগ রচনা করিয়াছিলেন। ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়া, মীমাংসা শাস্ত্রের বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া, রঘুনন্দনও ঐ পদ্ধতি অনুসারে তাঁহার স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও সেই সনাতন বাঁধা রাজপথ ছাড়েন নাই; বাঙ্গালার ব্রাহ্মণপণ্ডিত সমাজের রীতি পরিহার করেন নাই। বিধবা-বিবাহ চালাইবার সময়ে তিনি ঋষিবাক্যকে প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া বিচার করিয়াছিলেন, বহু বিবাহ বন্ধ করিবার সময়ে শাস্ত্রপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আজকালকার খোসমেজাজী বাবু সংস্কারকদিগের মতন তিনি কেবল খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া কোন কথা কহেন নাই। তাঁহার সমাজ-সংস্কার চেষ্টার ইহাই বিশিষ্টতা। তিনি বাঙ্গালায় হিন্দু সমাজকে সংস্কৃত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বটে, পরন্তু উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গলাইয়া ইয়োরোপের ছাচে ঢালিতে চাহেন নাই। বিদ্যাসাগর খাঁটি বাঙ্গালী, খাঁটী বাঙ্গালার পুরুষসিংহ ছিলেন বলিয়া বাঙ্গালীত্বের পারম্পর্য্য নষ্ট করিতে কখনই উদ্যত হন নাই। কাজেই বলিতে হয় ন্যাসনালিজমের হিসাবে বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান বাঙ্গালার আদর্শ পুরুষ ছিলেন।

বিদ্যাসাগর বর্ত্তমান বাঙ্গালার শেষ বাঙ্গালী। তাহার জাতি যায় নাই, তিনি স্বেচ্ছায় বা অজ্ঞানে, বিলাসের মোহে

বা অর্থলোভে স্বীয় ব্রাহ্মণ্য বিশিষ্টতায় জলাঞ্জলি দেন নাই। তাই তাঁহার চটি এবং চাদর লাট প্রাসাদ পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন। যখন সে চটি এবং চাদর লাট দরবারে অচল হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন তিনি দরবারে যাওয়া লাট-বেলাটের সহিত সাক্ষাৎ করা বন্ধ রাখিয়াছিলেন। ইহাকেই বলি প্রকৃত জাতি-প্রীতি। তিনি সত্যই স্বজাতিকে ভালবাসিতেন, তাই স্বজাতির চটি চাদর কোন লোভে পড়িয়াও ছাড়িতে পারেন নাই। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, তিনি অনায়াসে সাহেবী পোষাক বা বাবুয়ানী পরিচ্ছদ খরিদ করিতে বা তৈয়ার করাইয়া লইতে পারিতেন। কিন্তু সে পরিচ্ছদ ত তাঁহার নহে, তাহার জাতির, তাহার বংশের, তাহার দেশের নহে; তাই তিনি তাহা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কার প্রয়োজন বুঝিয়াছিলেন; পরন্তু যে পদ্ধতি অনুসারে অনাদি কাল হইতে তাহার হিন্দু-সমাজ সংস্কৃত হইয়াছিল, তিনি সেই সনাতন পুরাতন পদ্ধতি পরিহার করিতে পারেন নাই। অতএব বলিতে হয়, তিনিই বাঙ্গালার দেশাত্মবোধ-সমৃদ্ধ আদিপুরুষ! আমার বলিয়া দেশ সমাজ জাতি প্রভৃতিকে আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে যে জানে এবং পারে, সেই বিদ্যাসাগরের অনুরূপ হইবে, তাহার অবলম্বিত পন্থা পরিহার করিতে পারিবে না। যে প্রকৃত দেশহিতৈষী তাহাকে বিদ্যাসাগরের অনুরূপ হইতেই হইবে। অতএব আইস আজ তাহার স্বর্গারোহণের বাসরে আমরা সকলেই করজোড়ে বাঙ্গালার শেষ অধ্যাপক, প্রথম, ও উত্তম পুরুষ, কর্ম্মময় জীবন, দেশসেবক, জাতিরক্ষক বিদ্যাসাগরকে বার বার প্রণাম করি। গুরু তিনি, পথপ্রদর্শক তিনি, দেশের সমাজের ধারক ও বাহক তিনি—তাহাকে নমস্কার।

রামকমল সেন

মৃত্যু—১৯শে শ্রাবণ ১২৫১

এদেশে ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে যে তিন জন বাঙ্গালী আপনার মনীষা ও পুরুষকার বলে অতি দীন অবস্থা হইতে অতি সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত হইয়াছিলেন, রামকমল সেন তাঁহাদেরই অন্যতম। রামকমলের নাম উঠিলেই তাঁহার সম-সাময়িক রামদুলালের ও মতিলাল শীলের কথা মনে পড়ে। রামদুলাল পাঁচ টাকা বেতনে, মতিলাল আট টাকা বেতনে ও রামকমল সেন সামান্য বর্ণ-সংযোজকের কার্য্য লইয়া আট টাকা বেতনে কর্ম্ম-জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরে সাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়—চরিত্র-গুণ অভিজ্ঞতার সাহায্যে ইঁহারা তিনজনই সংসার-সংগ্রামে বিজয়-শ্রী লাভ করেন!

আট টাকা মাহিনার প্রিণ্টার রামকমল কেমন করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে দুই হাজার টাকার বেতনে টাকশাল ও বাঙ্গাল-ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইয়াছিলেন, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার বিষয় বটে, কিন্তু এ স্বল্প পরিসরের মধ্যে তাহার সুযোগ ঘটিবে না। তবে কোন্ গুণে তিনি বাঙ্গালী-সমাজের বরেণ্য হইয়াছিলেন, আজ তাঁহার মৃত্যু-দিন উপলক্ষ্যে সেই কথারই সংক্ষেপে পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

রামকমলের চরিত্রের বিশিষ্টতা এই যে, তাঁহার হৃদয় চিরদিনই সারল্য ও সমবেদনার উৎস ছিল। এদেশে অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যত্বের প্রায়ই দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। কিন্তু রামকমলের জীবনে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ধনী রামকমলের সহিত দরিদ্র রামকমলের চরিত্রগত পার্থক্য কেহ কখনও লক্ষ্য করে নাই। তাঁহার সময়ে দেশে এমন কোনও বড় সদনুষ্ঠান বোধ হয় অনুষ্ঠিত হয় নাই, যাহা রামকমলের সেবা, সাহায্য ও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত। দেওয়ানী কাজের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃষি-সমাজের সহকারী সভাপতি, দাতব্য-সমাজের সহকারী অধ্যক্ষ, চাঁদনী চিকিৎসালয়ের অধ্যক্ষ এবং সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ও প্রধান পরিচালক হইয়া আশ্চর্য্য কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, আরও কত সভা-সমিতির সদস্য হইয়া, তাহার সংস্রবে থাকিয়া যে কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করা যায় না। আরও আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই অমানুষিক পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাত শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত একখানি ইংরেজী-বাঙ্গালা অভিধানও প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালী-জীবনে এমন কর্ম্মদক্ষতার দৃষ্টান্ত বিরল।

খোস্ খেয়ালের বশে বা নাম-যশের মোহে তিনি কখনও

কোনও কার্য্যে যোগদান করিতেন না। লোকের মুখ তাকাইয়া কথা বলা তাঁহার স্বভাব ছিল না। একজন খাঁটি হিন্দু হইয়াও তখনকার কালে তিনি যে দুইটি সামাজিক কু-প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার নির্ভীকতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। চড়ক-পার্ব্বণে শরীর বিদ্ধ করা ও গঙ্গা-যাত্রীকে গঙ্গার জলে ডুবাইয়া ধরা—এই দুইটা কু-রীতি এদেশ হইতে এক প্রকার তাঁহারই চেষ্টায় উঠিয়া গিয়াছিল।

ইংরেজী ১৮৪৪ সালের ১২শে শ্রাবণ ৬১ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকালে দেশে এক শোকোচ্ছ্বাসের প্লাবন আসিয়াছিল। সকল সভা-সমিতি, সকল সংবাদপত্রই তাঁহার অভাবে শোক প্রকাশ করিয়াছিল। 'ফ্রেণ্ড অব-ইণ্ডিয়া'র তখনকার সম্পাদক মার্শমান সাহেব তাঁহার মৃত্যুতে যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখন, তাহার একস্থলে ছিল—"লর্ড হেষ্টিংসের সমকালে আপনার দেশীয়দিগের মধ্যে জ্ঞানালোক বিস্তারের জন্য রামকমল সেন যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠে, তদ্বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্ট যত্ন ছিল।" মার্শমানের এ উক্তি শোকোচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি নহে।

উপেন্দ্রনাথ দাস

মৃত্যু—২২শে শ্রাবণ, ১৩০২।

উপেন্দ্রনাথ দাস নিজে যেমন নিজের নাম গ্রন্থকাররূপে কখনও ছাপাইয়া যান নাই, তেমন তাঁহার নাম বাঙ্গলার পাঠক-সমাজের নিকটও আজ পর্য্যন্ত এক রকম চাপা পড়িয়াই আছে। তিনি যখন 'শরৎ-সরোজিনী' নাটক প্রকাশ করেন, তখন লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার পরলোকগত কোনও বন্ধু সেই নাটকখানির রচনা সমাপ্ত করিয়া তাঁহার হস্তে মুদ্রণের ভার দিয়া যান। তারপর তাঁহার 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রকাশ কালেও তিনি লিখিয়াছিলেন যে সালিখাগ্রামে কোনও এক বটবৃক্ষমূলে এই পুস্তক তিনি কুড়াইয়া পান। তারপর, তাঁহার 'দাদা ও আমি' নামক নাটিকা যখন প্রকাশিত হয়, তখনও তিনি আত্মগোপন করিয়া গ্রন্থ-মধ্যে প্রকাশকরূপে নিজের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এ সকল অপ্রকাশিত কথা এখনকার পাঠক-সমাজের একপ্রকার অপ্রকাশিত অবস্থাতেই আছে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালার লেখক-সমাজ-কর্ত্তৃকও তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। কত বাজে লেখকের লেখার প্রশংসায় বাঙ্গালী মাসিকপত্রগুলি পূর্ণ হইয়া থাকে, কিন্তু উপেন্দ্রনাথের লেখা লইয়া আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও তেমন বিচার-বিশ্লেষণ করিতে দেখিলাম না। অথচ তাঁহার নাটকাবলীর কথা বাদ দিলে বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় কি না সন্দেহ!

উপেন্দ্রনাথ দাস সমাজের বা নিজ-গৃহে যাহাই করিয়া যান, কিন্তু তাঁহার সাহিত্যক্ষেত্রের কাজ বিস্মরণ হইবার যোগ্য নহে। বঙ্গদেশে যখন মোহন্তের মোকদ্দমা, নাপিতের মোকদ্দমা প্রভৃতি বিষয় লইয়া নাটক রচিত হইতেছিল, তখন তিনি উচ্চ আদর্শের নাটক লিখিয়া বাঙ্গালা নাটকের দুর্গতি অনেকটা দূর করিয়াছিলেন। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ তাঁহার 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' ও 'শরৎ-সরোজিনী'র অভিনয় প্রদর্শন করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে কতকটা স্বদেশ-হিতৈষণার ভাব জাগাইয়া দিয়াছিল। এই সময় শুধু সুরেন্দ্রনাথের অগ্নিময়ী বাগ্মিতা নহে, তাঁহার নাটকও অনেক কাজ করিয়াছিল। এ সব কথা ভুলিবার নহে। বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যে তিনি সত্যই এক নূতন আকার—নূতন ভাব দিয়া গিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

তিরোভাব—৩০শে শ্রাবণ, ১২৯২

আজিকার দিন—বাঙ্গালার একটা মহা স্মরণীয় দিন। তাঁহার কথা নূতন করিয়া কিছু বলিবার নাই। তাঁহার প্রভাব আজ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার নাম শুনে নাই, এমন বাঙ্গালী বোধ করি একজনও নাই। তাঁহার

কথামৃত আস্বাদনে বঞ্চিত, এমন পাঠকও বোধ হয় এদেশে একান্ত বিরল। রামকৃষ্ণের চিত্র নিরক্ষর কৃষকের কুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সুরেন্দ্রনাথের কক্ষ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই সমান ভাবে বিরাজ করিয়া থাকে। বাঙ্গালী হৃদয়ের উপর এতটা প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে বাস্তবিকই অদ্যাবধি আর কাহাকেও দেখা যায় নাই।

সকল ধর্ম্মের, সকল মতের, সকল বিশ্বাসের ও সকল সাধনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যিনি এদেশে মিলন-রাজ্য স্থাপনের ধনীয়াদ গড়িয়া গিয়াছেন, তাঁহার সমান হইবেই বা কে? তাঁহার ঘৃণা ছিল না, উপেক্ষা ছিল না, অবহেলা ছিল না,—ভক্ত সাধক, মদ্যপ ও সমাজ পরিত্যক্ত প্রভৃতি সকলকেই এই বিশ্বপ্রেমিক ভালবাসিতেন। তাঁহার জীবনে কোনও আড়ম্বর ছিল না,—সন্ন্যাসী-সুলভ-গৈরিক বস্ত্রাদির পরিবর্ত্তে তিনি লালপাড় ধুতি জামা ও চটি জুতা প্রভৃতি গৃহস্থোপযোগী সামান্য বেশ পরিধান করিয়া দরিদ্র পূজারীর ন্যায় বাঙ্গালার এক সামান্য পল্লীতে বাস করিতেন। নারীমাত্রকেই তিনি জগজ্জননীর অংশরূপিনী-বোধে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন। এমন পবিত্র জীবনের আদর্শ দেখিয়া মানুষ যদি তাঁহার নিকট ভক্তি-প্রণত হইয়া মস্তক অবনত না করে তবে কাহার নিকট করিবে?

তাঁহার উপদেশামৃত বাঙ্গালার গৃহে গৃহে গৃহ-পঞ্জিকার ন্যায় আজ বিরাজ করিতেছে। এমন সহজ সরল ভাষায়, এমন অপূর্ব্ব উপমা সাহায্যে আধ্যাত্মিক-তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতে এদেশে আর কাহাকেও দেখা যায় নাই।

—

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু

মৃত্যু—২রা ভাদ্র, ১৩১২

বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী পাঠকের জন্য তিনি যে কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সামান্য নহে। সাধারণের নিকট সম্ভবতঃ তিনি 'বঙ্গবাসী' কাগজের স্বত্বাধিকারী বলিয়াই পরিচিত, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্রের সামর্থ্যের ও কৃতিত্বের উহা পরিচয় নহে। তাঁহাকে ঠিকমত চিনিতে হইলে তাঁহার রচিত উপন্যাস-সমূহ পাঠ করিতে হয়, এবং তাঁহার 'বঙ্গবাসী' কি ভাবে কতটুকু দেশের কাজ করিয়াছে, তাহাও সবিশেষ জানিতে হয়।

বাঙ্গালা সংবাদপত্রের রাজ্যে দ্বারকানাথের পরই তাঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। দ্বারকানাথের কাজকে তিনি আরও প্রসারিত করিয়া গিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী' হইতেই বাঙ্গালার অতি অজ-পল্লীগ্রামেও খবর-কাগজের পাঠক সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। 'সোম-প্রকাশে'র ভাষা সহজবোধ্য ছিল বটে, কিন্তু পণ্ডিতি-বাঙ্গালার গন্ধ তাহার অঙ্গ হইতেও বাহির হইত। বঙ্গবাসীর ভাষায় কিন্তু সে গন্ধ একেবারেই ছিল না। যাহারা ইংরেজী জানে না, সংস্কৃতও জানে না; অথচ যাহারা রসিক রায়ের ও দাশরথী রায়ের পাঁচালী বুঝিত, কাশীরাম ও কৃত্তিবাস পড়িয়া তাহা বুঝিতে পারিত, এমন সকল পাঠকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই 'বঙ্গবাসী' বাঙ্গালা ভাষা লিখিতে প্রথম আরম্ভ করে। ফলে গ্রামের পরাণ মণ্ডল হইতে আরম্ভ করিয়া মুখুজ্যে-বাঁড়ুয্যে পর্য্যন্ত সকলেরই মনে খবর-কাগজ পড়িবার একটা প্রবৃত্তি জন্মায়। সুতরাং এক কথায় বলিতে গেলে বলা উচিত যে, যোগেন্দ্রচন্দ্র এদেশে 'পাঠকপড়ান ব্রত' গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শুধু তাহাই নহে। বাঙ্গালা সংবাদপত্র যে একটা শক্তি-বিশেষ, বাঙ্গালা সংবাদপত্রের কথার যে মূল্য আছে, বাঙ্গালা সংবাদপত্র ইচ্ছা করিলে যে দেশমধ্যে সজীব আন্দোলনের সৃষ্টি করিতেও পারে, এ কথা বাঙ্গালীকে বঙ্গবাসীই 'সহবাস-আইনে'র আন্দোলন-সময় সর্ব্বপ্রথম বুঝাইয়া দিয়াছিল।

এদেশে সংবাদপত্রের সঙ্গে বিরাট উপহারের ব্যবস্থাও যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রথম করিয়াছিলেন। অনেক লুপ্তপ্রায় শাস্ত্র-গ্রন্থের মূল সমেত অনুবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি তাহা 'বঙ্গবাসী'র গ্রাহকবর্গকে অতি সুলভ মূল্যে প্রদান করিতেন। তাহার ফলে অনেক বাঙ্গালীর গৃহেই শাস্ত্রীয় গ্রন্থ আজ বিরাজ করিতেছে।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের আর একটী কীর্ত্তি—তাঁহার রচিত উপন্যাসসমূহ। তাঁহার "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী," "নেড়া হরিদাস," "চিনিবাস-চরিতামৃত", "কালাচাঁদ" প্রভৃতি গ্রন্থ অনেক

পাঠকেরই আদরের সামগ্রী। ঔপন্যাসিকের অনেক শক্তিই তাঁহাতে ছিল। কল্পনা, রসিকতা, বিচার-শক্তি, ও মানব-প্রকৃতিতে জ্ঞান—এ সমস্তই তাঁহার ছিল। ইহার উপর ছিল—তাঁহার মনোমুগ্ধকারী ভাষা। অমন রসপরিপূর্ণ সুমিষ্ট ভাষা সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি কখনও নিজের নাম দিয়া তাঁহার কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। তাই তাঁহার লেখাকে অনেকে ইন্দ্রনাথের লেখা বলিয়াই মনে করিত। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পাঠক-সাধারণের এ ভুল অনেকটা ভাঙ্গিয়া যায়। বাঙ্গালী সমালোচকেরা বাঙ্গালা উপন্যাসের আলোচনার সময় যোগেন্দ্রচন্দ্রের উপন্যাসের নাম করেন না কেন, জানি না। কিন্তু এ বিভাগে তিনি যে একটু নূতনত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আলোচনার যোগ্য।

———

ভাদ্র ঃ—

আনন্দমোহন বসু

মৃত্যু—৩রা ভাদ্র, ১৩১৩

এ যুগে বাঙ্গালার যে কয়জন বাঙ্গালীকে মনীষি আগাইয়া দিবার ও জাগাইয়া তুলিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, আনন্দমোহন বসু তাঁহাদেরই একজন। তিনি বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান। তাঁহার গুণ-গৌরবে বাঙ্গালী গৌরব অনুভব করিতে পারে।

প্রতিভার জন্ম সচরাচর কুটিরেই হয়, কিন্তু আনন্দমোহন ধনীর সন্তান ছিলেন। যে অবস্থায় পড়িলে বাঙ্গালীর ছেলে সাধারণতঃ দুধের গোপাল,—জুতা-জামার গোলাম বনিয়া যায়, সেই পরিপূর্ণ সুখ-সম্ভোগের মাঝখানে লালিত-পালিত হইয়াও আনন্দমোহন কিন্তু তাহার দিক দিয়া যান নাই। তাঁহার আগাগোড়া জীবনই কৃতিত্বের সমুজ্জ্বল আলোকে আলোকিত। এফ-এ পরীক্ষা হইতে আরম্ভ করিয়া এম-এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সকল পরীক্ষাতেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তারপর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ইংলণ্ডে গণিত-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে গমন করেন। সেখানেও গৌরবাত্মক র‍্যাংলার উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতবাসীর মধ্যে এ গৌরব অর্জ্জন করিতে তাহার পূর্ব্বে আর কেহ পারেন নাই। তারপর অতি যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন।

তিনি মাতৃভূমির একজন প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তান ছিলেন। তাঁহার জীবন—কর্ম্মীর জীবন। তাঁহার জীবিতকালে এমন দেশহিতকর-কার্য্য বোধ করি অতি অল্পই ছিল, যাহাতে তিনি যোগদান করেন নাই। 'সিটিকলেজ' তাঁহার একটি কীর্ত্তি। কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জাতীয় মহাসমিতির তিনি একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৯৮ অব্দে মান্দ্রাজ কংগ্রেসের ১৪শ অধিবেশনে তিনি সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সুরেন্দ্রনাথের সহযোগে তিনিই সর্ব্বপ্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুবক-বৃন্দকে লইয়া এক ছাত্র-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য হইয়াও তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক সংস্কার করিয়া যান। তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করিবার নহে। এ দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস যদি কখনও রচিত হয়, তাহা হইলে সুরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার নামও তাহাতে সাদরে স্থান পাইবে।

———

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

মৃত্যু—৬ই ভাদ্র, ১২৯৩

দ্বারকানাথ বাঙ্গালা খবর-কাগজের যুগ-প্রবর্ত্তক। তিনি 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশ করিয়া লিপি-ভঙ্গীর ও বিষয় নির্ব্বাচনের যে পদ্ধতি দেখাইয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালা কাগজ-মহলে এখনও তাহা আদর্শ হইয়া আছে।

'সোমপ্রকাশ' হইতেই এ দেশের বাঙ্গালা কাগজে রীতিমত রাজনীতির আলোচনার সূত্রপাত হয়। ঈশ্বর গুপ্ত যখন 'সংবাদ প্রভাকর' নাম দিয়া এ দেশে প্রথম প্রাত্যহিক

প্রকাশ করেন, তখন তাহাতে লিখিয়াছিলেন,—"আমরা সম্পাদকীয় ব্রতে ব্রতী হইয়া সুখ-সম্পত্তির প্রার্থনা করি না; পাঠকবর্গের অনুরাগই আমাদের সম্পত্তি, এবং সুখ্যাতিই আমাদিগের সুখ, তাহার নিকট অর্থ-সুখ সুখ নহে; তবে কার্য্য-সম্পাদনার্থ যে যৎকিঞ্চিৎ প্রয়োজনীয় তাহা হইলেই পরম সৌভাগ্য স্বীকার করি। যাহাতে বঙ্গ ভাষার লিপি-বিত্তার পুরাতন রীতি পরিবর্ত্তন হইয়া উত্তমরূপে ভাব প্রকাশ হয়, আমরা তদর্থে যত্ন করি। নীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, চিকিৎসা, পদার্থ-নির্ণায়ক, ধর্ম্ম ও রাজকীয় প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ের আলোচনা করিয়া থাকি, দেশের কুরীতি সংশোধন জন্য বিস্তর অনুরাগ প্রকাশ করিতেছি।" সাহিত্য-গুরুর এই ভাব-মন্ত্রে দ্বারকানাথই প্রথম প্রকৃত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কার্য্যতঃ, এ বিষয়ে তিনি গুরুকেও অনেক ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। ফলে, তাঁহার 'সোম প্রকাশে'র প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখনকার কোনও কাগজের সঙ্গেই সে প্রভাবের তুলনা হয় না। শাস্ত্রী শিবনাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—"সোমবার আসিলেই লোকে 'সোম প্রকাশ' দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকিত। যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাই 'সোম প্রকাশে'র প্রভাবের মূলে ছিল। তিনি 'সোম প্রকাশে' যাহা লিখিতেন, তাহার এক পংক্তিও কাহারও তুষ্টিসাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লিখিতেন না। লোকসমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা সংস্কারের অনুরূপ করিয়া কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয় নিঃসৃত অকপট ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। তাহাই ছিল, 'সোম প্রকাশে'র সর্ব্ব-প্রধান আকর্ষণ।"—এ উক্তি, এ গুণস্তুতি এখনকার কোনও কাগজের প্রতিই প্রয়োগ করা চলে না। স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন 'হিতবাদী' পরিচালনা করিতেন, তখন 'হিতবাদী' এই 'সোম প্রকাশে'র গৌরব ও প্রভাব লাভ করিয়াছিল। ইহা ছাড়া, আর কোনও কাগজেরই 'সোম প্রকাশে'র সহিত নাম করা যাইতে পারে না। একমাত্র বিশারদ ছাড়া আর কোনও বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকই দ্বারকানাথের ন্যায় নিরপেক্ষতা, তেজস্বিতা ও স্পষ্ট বাদিতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে দ্বারকানাথের কীর্ত্তি-কথা যদি উপেক্ষিত হয়, তবে সে ইতিহাসের অঙ্গ হানি হইবে। স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসুর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাবে" অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিলেও তাহাতে দ্বারকানাথ উপেক্ষিত হন নাই। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার সম-সাময়িক হইয়াও তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন, "১৮৫৮ সালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোম প্রকাশ' প্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৪৭ সাল হইতে ১৮৫৮ সাল পর্য্যন্ত এই একাদশ বৎসরের মধ্যে নানা সংবাদ পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে অনেকগুলি জঘন্য। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ বাঙ্গালা সংবাদ পত্রকে এই দুরবস্থা হইতে প্রথম উদ্ধার করেন।

দুঃখের বিষয়, 'সোম প্রকাশে'র সমগ্র ফাইল কোথাও পাওয়া যায় না। তাহা সংগৃহীত হইলে শুধু দ্বারকানাথকে বুঝিবার ও বুঝাইবার যে সুবিধা হয়, তাহা নহে; সেই সময়কার বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক কথাও জানিতে পারা যায়। তাঁহার সাহিত্য-শিষ্য স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ দাস তাঁহার রচিত 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকের উৎসর্গ-পত্রে দ্বারকানাথকে যে কেন "আপনি বঙ্গ-সাহিত্য জগতের একজন প্রধান নেতা" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা 'সোম প্রকাশ' যাহারা না দেখিয়াছে, তাঁহারা বুঝিতে পারিবে না। দ্বারকানাথ "কল্পদ্রুম" নাম দিয়া যে মাসিক পত্র প্রকাশ করেন, তাহাতে তাহার তেমন কৃতিত্বের পরিচয় না পাওয়া গেলেও তাঁহার 'সোম প্রকাশ' তাঁহার অমর কীর্ত্তি। উপেন্দ্রনাথের ন্যায় তাঁহার অন্যতম সাহিত্য-শিষ্য দুর্গাচরণও তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "দেবগণের মর্ত্তে আগমন" তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। শিষ্য-ভাগ্য তাঁহার উজ্জ্বল ছিল।

নিরালার সাথী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত ভবানী চরণ লাহা।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

মৃত্যু—১৫ই ভাদ্র, ১২৭৫।

প্রসন্নকুমার নিতান্ত এ-কালের লোক নহেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—যাঁহাকে আমরা সে-কালের লোক বলিয়া মনে করিয়া থাকি, সেই যতীন্দ্রমোহনের ইনি খুল্লতাত ছিলেন। ইঁহার নাম—প্রসন্নকুমার ঠাকুর। প্রসন্নকুমারের সম-সাময়িক অনেক বড় বড় বাঙ্গালী মনীষীর কথা আধুনিক বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে সকলে ভুলিতে পারে নাই। সেনেট-গৃহের তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ঠাকুর ল লেক্‌চার' তাঁহার স্মৃতিকে এখনও অনেকটা সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

এক শত বর্ষের অধিক হইল, অর্থাৎ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে প্রসন্নকুমারের জন্ম হয়। ইনি বিশেষ সঙ্গতিপন্ন অবস্থার লোক হইয়াও, কলিকাতা-সদর-দেওয়ানী-আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতী করিয়া প্রতিবর্ষে তিনি প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার পূর্ব্বে বা তাঁহার সময়ে আর কোনও বাঙ্গালী জমিদার সন্তানকে এমন ভাবে পরিশ্রম করিয়া এত অর্থোপার্জ্জন করিতে দেখা যায় নাই।

প্রসন্নকুমার মনস্বী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ১৮৩৮ অব্দে গবর্ণমেণ্ট যখন লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন, তখন তিনি 'বেঙ্গল-হরকরা' নামক সংবাদ-পত্রে উহার বিরুদ্ধে তীব্র লেখনী চালনা করেন। শুধু তাহাই নহে, গবর্ণমেণ্টের ঐ প্রস্তাব অনুমোদন হইয়া গেলে, তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ কতিপয় বন্ধুকে লইয়া কলিকাতার টাউনহলে বিরাট এক সভা করিয়া এমন তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন যে তখনকার বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ডের মনও তাহাতে বিচলিত হইয়াছিল। ফলে, ৫০ বিঘার অনধিক লাখরাজ জমিগুলির বন্দোবস্ত রহিত হইয়া যায়।

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে অত্যন্ত সমাদরের চক্ষেই দেখিতেন। লর্ড ডালহৌসীর শাসন-সময়ে ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইলে প্রসন্নকুমারকে তথায় Clerk Assistant পদে নিযুক্ত করা হয়। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার তিনি অন্যতম সদস্য ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক-সভারও তিনি সদস্য হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালীর ভাগ্যে এ সম্মান লাভ ঘটে নাই।

তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের কথাও স্মরণযোগ্য। আইন-শিক্ষাকল্পে তিনি কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়কে তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। সেই টাকায় 'ঠাকুর-ল-লেক্‌চারে'র সেখানে অনুষ্ঠান হইয়াছে। ইহা ছাড়া, মূলাজোড়ের সংস্কৃত-বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মাণ জন্য পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা, এই স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে এক লক্ষ টাকা, এবং তাহার অনুগত আত্মীয়-স্বজন ও কর্ম্মচারীকে দুই লক্ষ পনর হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানও যে কত ছিল, তাহার সংখ্যা হয় না।

তিনি যেমন বিদ্বান ও বুদ্ধিমান, তেমনি বিদ্যোৎসাহীও ছিলেন। যৌবনে 'অনুবাদক' নামে একখানি বাঙ্গালা ও 'রিফর্ম্মার' নামে একখানি ইংরাজী সাময়িক পত্র প্রকাশ করিয়া নিজে সে দুইখানি কাগজের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। আইন শাস্ত্রেও তাহার অসামান্য জ্ঞান ছিল। সংস্কৃত হইতে দায় বিষয়ক গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া তাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দেশ-হিতকর অনেক প্রতিষ্ঠানের মূলে তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন নিহিত আছে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান ছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের পর তিনিই এই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। এদেশে নাটক অভিনয়ের জন্যও তিনি অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন। বাঙ্গালার রঙ্গালয়ের ইতিহাসে তাঁহার নাম বাদ পড়িলে সে ইতিহাস অঙ্গহানি হইবে! বাস্তবিক, প্রসন্নকুমারের মনীষা ও মনস্বিতা প্রভাবে এ দেশ অনেক উপকৃত হইয়াছে।

—

আশ্বিন ঃ—

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

মৃত্যু—১৩ই আশ্বিন, ১৩২৬।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর তাঁহার তুল্য প্রভাব বিস্তার করিতে ব্রাহ্ম-সমাজের আর কেহ পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্ম-সমাজ যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে এই তিনজন প্রতিভাশালী পুরুষেরই নাম করিতে হয়।

শুধু ব্রাহ্ম-সমাজের নহে, বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রেরও তিনি একটা দিক্‌পাল-বিশেষ ছিলেন। যখন ৩১।৩২ বৎসর তাঁহার বয়স, তখনই 'প্রসিদ্ধ কবি' বলিয়া তিনি সাধারণ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন। সেই সময়েই স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন,—"নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায় বর্ত্তমান কালের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি।" তাঁহার "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" ও "পুষ্পমালা" প্রভৃতি কাব্য সম্বন্ধে কেবল আধুনিক পাঠক নহে ;—আধুনিক লেখকগণও বড় একটা উচ্চ বাচ্য করেন না সত্য ; কিন্তু এককালে শিক্ষিত সমাজে উহাদের যথেষ্টই আদর-প্রতিপত্তি ছিল।

সোম প্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার মাতুল ছিলেন। এই সূত্রে ছাত্রাবস্থা হইতেই সোম-প্রকাশের সহিত তাঁহার একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। তিনি উহাতে প্রায়ই প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিতেন। এই সময় 'বঙ্গ-দর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের যখন—

"হইতাম যদি আমি যমুনার জল,
হে প্রাণবল্লভ"

কবিতাটি প্রকাশিত হয়, তখন শিবনাথ উহার অনুকরণে 'সোমপ্রকাশে' একটি বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন। এই দ্বারাই তাঁহার ভাগ্যে প্রথম খ্যাতি লাভ ঘটে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ কবিতা-পাঠে তখনকার সাহিত্যিক-মণ্ডলী অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

তবে কবিতা লিখিয়া তাঁহার যশ হইলেও তাঁহার রচিত উপন্যাসাবলীই তাঁহাকে অধিকতর যশস্বী করিয়াছিলেন। তারকনাথের পর বোধ হয় তিনিই সামাজিক উপন্যাস-রচনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার 'মেজ-বউ,' 'যুগান্তর' ও 'নয়নতারা' বাঙ্গালার উপন্যাস সাহিত্য-ভাণ্ডারে সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ছাড়া, তিনি 'আত্ম-চরিত' এবং 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামক দুইখানি মূল্যবান জীবনী-গ্রন্থও লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট লেখক ছিলেন, তেমনই উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন।

রামমোহন রায়

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষা ও সভ্যতার সংঘাতে বাঙ্গালার মানস-সরোবরে যে শতদলটি প্রথম ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার শোভা ও সৌরভ ভুলিবার নহে। ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁহার মৃত্যাহ। ৯৩ বৎসর গত হইল, তাঁহাকে আমরা হারাইয়াছি। কিন্তু এই সুদীর্ঘ কাল পরেও আত্ম-বিস্মৃত এই বাঙ্গালী জাতি তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই। অনেক মনীষীর মনীষা ও প্রতিভার প্রতি আমরা উদাসীন,—অনেক কর্ম্মবীরের কর্ম্ম-কথা আমরা আমাদের মর্ম্ম-ফলকে লিখিয়া রাখিতে পারি নাই, কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের কথা গদ্যে ও পদ্যে বহুবার বহু রকমে প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে—এখনও হইতেছে।

রামমোহনকে ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের প্রথম প্রবর্ত্তক ও এ যুগের সর্ব্বপ্রথম সমাজ-সংস্কারক বলিলে সব বলা হয় না। বঙ্গদেশে যে আজ বেদ-বেদান্ত ও প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের এত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার মূল রামমোহন। প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় ও উদ্যমে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। তিনি উদ্যোগী না হইলে বোধ হয় তখনকার দিনে সতীদাহ নিবারিত হইত না। নারীজাতির শিক্ষাবিস্তার-পক্ষেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। বিলাত-যাত্রা-ব্যাপারে তিনিই প্রথম পথ-প্রদর্শক হইয়াছিলেন। দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার

জন্য যাঁহারা যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে তাঁহারই নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। দেশের শিক্ষিত জনগণকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োগার্থ বিলাতে আন্দোলন তিনিই সর্ব্বপ্রথম করিয়াছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে বলা উচিত যে, যে যুগ-ধর্ম্মের ভিতর দিয়া আমরা এখন চলিতেছি, সে যুগ-ধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক—রামমোহন। বর্ত্তমান বাঙ্গালীকে বঙ্কিম বাবু 'পশু-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট-জীব' বলিয়া উপহাস করিলেও এ বাঙ্গালী যে কোনও নূতন শক্তি অর্জ্জন করে নাই, এমন কথা বলিতে পারি না। রামমোহনের সময় বাঙ্গালী যাহা ছিল, বঙ্কিমের সময় ঠিক সে বাঙ্গালী দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার বঙ্কিম-যুগের বাঙ্গালীর সহিতও এ যুগের বাঙ্গালীর কতকটা বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। এ বৈলক্ষণ্যের জন্য আমরা প্রধানতঃ রামমোহনের নিকটই ঋণী। তিনি এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিলে আমরা যে আজ কত বিষয়ে কত পিছাইয়া পড়িয়া থাকিতাম, তাহা বলা যায় না।

প্রতিভার অবতার রামমোহনের কীর্ত্তি-কথা সংক্ষেপে বলিয়া শেষ করিবার নহে। কি বর্ত্তমান জাতীয় চরিত্রে ও কি বর্ত্তমান জাতীয় সাহিত্যে—সকল বিষয়েই তাঁহার হস্ত-প্রেরণা দেখিতে পাই। যখন বর্ত্তমান বঙ্গীয় গদ্য-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন তাঁহার কথাই মনে পড়ে। তিনিই সর্ব্বপ্রথম উৎকৃষ্ট গদ্য-লেখক। গদ্য বাঙ্গালা সাহায্যে দুরূহ ও জটিল বিষয় যে সকলের বোধগম্য করা যাইতে পারে, তাহা তাঁহার লেখা পড়িয়াই বাঙ্গালী প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিল। বঙ্গভাষায় শুধু শাস্ত্রের ও সমাজ-তত্ত্বের আলোচনা নহে;—এমন কি, খগোল, ভূগোল, ব্যাকরণ ও ও বিজ্ঞান বিষয়কও নানা গ্রন্থ তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্য-সাধনাও তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি-স্তম্ভ। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অতি-ভক্তির অভিব্যক্তি নহে। আমরাও আজ সেই ভাষার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে পারি—"তোমার উপাধি রাজা। জড়ময় ভূমিখণ্ড তোমার রাজ্য নয়। তুমি একটি সুবিস্তার মনোরাজ্য অধিকার করিয়াছ। বাঙ্গালার শিক্ষিত সম্প্রদায় তোমাকে রাজ-মুকুট প্রদান করিয়া চিরদিন তোমার জয়ধ্বনি করিবে।"

অক্ষয়চন্দ্র সরকার

মৃত্যু—১৬ই আশ্বিন, ১৩২৪।

তিনি যখন সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, সাহিত্যের তখন কিশোর অবস্থা। সে সময়ে সাহিত্যালোচনার নেশা জন্মাইয়া দিবার মতন জিনিস সাহিত্যে বিশেষ কিছু ছিল না। এমন কি, সাহিত্য-সেবা করিয়া যশ-লাভ বা অর্থলাভ যে কিছু হইবে, সে সম্ভাবনাও তখন ছিল না। তখন ইংরাজী ভাষায় লিখিতে ও বলিতে পারিলেই দেশের লোকের নিকট আদর হইত। সেইটাই তখনকার দিনে বিশেষ রকম সম্মান ও গৌরবের বিষয় ছিল। অক্ষয়চন্দ্র কিন্তু ইংরাজী ভাষায় পরম পণ্ডিত হইয়াও সে সম্মান ও গৌরবের আশাকে উপেক্ষা করিয়া দীনা মাতৃ-ভাষারই সেবক হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। তাঁহার সম-সাময়িকদের মধ্যে সকলেই অবসর মত সাহিত্য-সেবা করিতেন, কিন্তু তিনিই একমাত্র সাহিত্য-সেবাকে জীবনের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। গুণবতী মাতার প্রতি সন্তানের যে শ্রদ্ধা, সেই শ্রদ্ধা ভক্তি তাহার মাতৃভাষার প্রতি পূর্ণ-মাত্রায় ছিল।

বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তাহার জন্য যে একটি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল, সেই বিজ্ঞাপনে লেখকগণের নামের তালিকা এই ভাবে মুদ্রিত ছিল,—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র।
„ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
„ জগদীশনাথ রায়।
„ তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
„ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।
„ রামদাস সেন।
এবং „ অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

—এই তালিকা মধ্যে অক্ষয়চন্দ্রের নাম সর্ব্বশেষে মুদ্রিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনিই 'বঙ্গ-দর্শনে'র সর্ব্বপ্রধান সহায় ছিলেন। 'বঙ্গ-দর্শনে'র অনেক সমালোচনা, যাহা বঙ্কিমের লেখা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা অক্ষয়চন্দ্রেরই লেখনী-

প্রসূত। তাঁহার 'শিক্ষা-নবিশের পত্র' সমালোচনা কালে তৃতীয় বর্ষের 'বঙ্গ-দর্শনে' স্বয়ং বঙ্কিমই লিখিয়াছিলেন, -"শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার—এই নামযুক্ত গ্রন্থ এই প্রথম প্রচারিত হইল। অতএব এমন অনেক পাঠক থাকিতে পারেন, যে অক্ষয়বাবুর বিশেষ পরিচয় জানেন না। আমরা তাহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিব যে বঙ্গ-দর্শনের কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তাঁহারই প্রণীত। তাহার প্রণীত এই সকল প্রবন্ধ-গুলির সবিশেষ আলোচনা করিলে, অনেকেই স্বীকার করিবেন যে অক্ষয়বাবুর ন্যায় প্রতিভাশালী গদ্য লেখক, অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" বাস্তবিক 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার 'উদ্দীপনা', 'তুলনায় সমালোচনা' প্রভৃতি রচনা পাঠে তখনকার পাঠকগণ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। 'তখন-কার, বলি কেন, এখনকার দিনেও তাহা পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ ও উপকৃত হই। তেমন সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সুস্পষ্ট প্রবন্ধ এখনকার দিনে একান্ত বিরল। নবপর্য্যায়ের 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় লিখিয়াছেন বটে,—"অক্ষয়-চন্দ্র সাহিত্যে কোনও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন নাই তাঁর আলোক-সামান্য কবি-প্রতিভার কিম্বা অনন্য সাধারণ চিন্তাশীলতার যে কোনও দাবী আছে, এমনও বলা অসম্ভব।" কিন্তু কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নহে। তিনি যে সাহিত্যে কোনও নূতন যুগের প্রবর্ত্তন করেন নাই, এ কথা স্বীকার্য্য। তাহার যে অলোকসামান্য কবি-প্রতিভার কোন দাবী নাই, তাহাও সত্য। কিন্তু 'অনন্য সাধারণ চিন্তাশীলতার যে কোনও দাবী' তিনি করিতে পারেন না, এ কথা বলিতে পারি না। তাঁহার 'হেমচন্দ্র,' 'সনাতনী' ও 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' প্রভৃতি লেখা যিনি পড়িয়াছেন, তিনি বিপিনচন্দ্রের মতে সায় দিতে পারিবেন, এমন বিশ্বাসও হয় না। এ সব রচনা তাহার অনন্যসাধারণ চিন্তাশীলতা ও সূক্ষ্মদর্শিতারই পরিচায়ক। তিনিই বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রথম শুনাইয়াছেন যে, 'পূর্ব্বতনকালে এদেশে বহু বহু কবি ছিল, কিন্তু একজনও উদ্দীপক ছিল না। আমাদের এই একটি ভাল জিনিস ছিল না,—উদ্দীপনা শক্তি ছিল না।' তারপর ঈশ্বর গুপ্তকে যখন একদল লেখক উপেক্ষার ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছিল, সে সময়ে তিনিই বাঙ্গালীকে ঈশ্বর গুপ্তের কৃতিত্ব বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় যখন 'ইংরাজী-গন্ধী, ইংরাজী-ছন্দী, তাহার উল ইংরাজী, তাহার ফুল ইংরাজী, একরূপ পরস্ব পদ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পসার' করিতে আরম্ভ করে, তখন তিনিই সাহস করিয়া বলেন,—"বলিতে একটু দুঃখ হয়, একটু সঙ্কোচও হয়, কিন্তু কথাটা ঠিক যে, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার শেষ কবি। মধুসূদন বাঙ্গালার মিল্টন, হেমচন্দ্র পিণ্ডার, নবীনচন্দ্র—বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ—শেলি,—বেশ কথা কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালার কি? ঈশ্বর গুপ্ত—বাঙ্গালার ঈশ্বর-গুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা, ঐকথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙ্গালীর নিজস্ব ; সেটুকু দরিদ্রের ক্ষুদ্র মুদ্রা হইলেও, তাহার নিজস্ব! আর নিজস্ব বলিয়াই বড় আদরের সামগ্রী।"—এই ভাবের কথা পরে বঙ্কিমের লেখাতেও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল।

'কবি হেমচন্দ্র' পুস্তকখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও গুণে ক্ষুদ্র নহে। ঠিক এ ধরণের পুস্তক বঙ্গভাষায় আর একখানি আছে বলিয়াও মনে হয় না। এত অল্প পরিসরের মধ্যে এত বিভিন্ন রকমের কথা এতটা গুছাইয়া বলিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। এ বহি পড়িলে যে কেবল কবি হেমচন্দ্রকে অনেকটা বুঝিতে পারা যায়, তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান সাহিত্যের দোষ-গুণ, উন্নতি-অবনতি সমস্তই একপ্রকার বুঝা যায়। কাল সাগরের ঢেউ খাইয়া কবি হেমচন্দ্র যদি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানিও অমরত্বের তরণীতে স্থান পাইবে, আমাদের বিশ্বাস। ইহা ভক্তি গদ্গদ অত্যুক্তি নহে। উচ্ছ্বাসের মুখে ইহা বেতালা স্তব নহে। বাস্তবিকই কবি হেমচন্দ্রের এমন সুন্দর পরিচয় আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই।

অক্ষয়চন্দ্রকে কেহ কেহ বঙ্কিমচন্দ্রের শিষ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু সে ধারণা ঠিক নহে। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যের পাঠশালায় হাতে খড়ি দিয়াছিলেন। আর অক্ষয়চন্দ্র নিজের কথা নিজ মুখেই বলিয়াছিলেন যে, "দক্ষিণে লক্ষ্মীস্বরূপা তত্ত্ববোধিনী, তৎপার্শ্বে উপবীত-বক্ষে গণেশ-মূর্ত্তি বিদ্যাসাগর, বামে সাক্ষাৎ সরস্বতী স্বরূপ ভারতচন্দ্র, তৎপার্শ্বে ময়ূর-চড়া, টেরিকাটা কার্ত্তিক স্বরূপ ঈশ্বর গুপ্ত, মধ্যে সাক্ষাৎ মহাদেবতা পিতৃদেব, চালচিত্রে শিবরূপী মদন-

মোহন,—সাহিত্যে আমি এই মহা প্রতিমার উপাসক।" অতএব অক্ষয়চন্দ্রকে বঙ্কিমের শিষ্য না বলিয়া 'গুরুভাই' বলিলেই বোধ করি অধিকতর সঙ্গত হয়। তবে বঙ্কিমের প্রভাব যে অক্ষয়চন্দ্রের উপর কিছু পড়ে নাই, তাহা বলি না। প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়াই বঙ্কিমের পতাকাতলে তিনি স্বেচ্ছায়—সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন যুগ-প্রবর্ত্তক লেখক। তাহার প্রজ্বলিত প্রতিভাগ্নির দ্বারা সাহিত্য-ক্ষেত্রের অনেক আবর্জ্জনাই ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল। এ কার্য্যে বঙ্কিম একমাত্র অক্ষয়চন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও তেমন সহায়তা পাইয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহারই অনুকরণে অক্ষয়চন্দ্রও মেকী সাহিত্যের উপর করুণ-কঠোর কশাঘাত করিতেন। বলা বাহুল্য, সে অনুকরণ ব্যর্থ হয় নাই। ব্যর্থ যে হয় নাই, তাহার সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ এই যে বঙ্গদর্শনের প্রাপ্ত, গ্রন্থের অনেক সমালোচনাই তাঁহার লিখিত হইলেও বঙ্কিমের লেখা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।

এই সঙ্গে আর একটি কথা না বলিলে অন্যায় হইবে। কথাটি এই যে বঙ্কিমের প্রতিভার নিকট যেমন অক্ষয়চন্দ্র ঋণী ছিলেন, তেমনই অক্ষয়চন্দ্রের শক্তি সাধন-সম্পত্তির দ্বারা বঙ্কিম প্রতিভাও যৎকিঞ্চিৎ পুষ্ট হইয়াছিল। প্রমাণ হাতে-হাতেই আছে। বিষবৃক্ষের ভাষা-ভঙ্গী যে দুর্গেশনন্দিনী ও কপাল কুণ্ডলার ভাষা হইতে একটু অন্য রকমের হইয়াছিল, তাহা অক্ষয়চন্দ্রেরই প্ররোচনায়। অক্ষয়চন্দ্র এ কথা একরূপ নিজেই বলিয়াছেন। তাঁহার "পিতা-পুত্র" নামক রচনায় তিনি লিখিয়াছেন - তাঁহার ভাষার "লম্ফত্যাগ," "নিদ্রাগমন" প্রভৃতি সমস্ত পদ লইয়া কায়স্থকুলভূষণ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবিধার্থ সংগ্রহে বিদ্রূপাত্মিকা সমালোচনা করিয়াছিলেন। আর কায়স্থকুলাধম আমি, ভাষার একান্ত সংস্কৃতানুসারিণী ভঙ্গি লইয়া বঙ্কিমবাবুর সহিত বিচার বিতর্ক করিয়াছি।...... সাধারণ বর্ণনায়, সাধারণ কথায় যেমন ভাব পরিস্ফুট হয়, সংস্কৃতানুসারিণী হইলে তেমন হয় না। এইরূপ কথার বিচার বিতর্ক অনেকদিন চলিল। বঙ্কিম বিষবৃক্ষে 'গঙ্গ ঠেঙ্গাইতে' লাগিলেন। বিষবৃক্ষে উভয়রূপ সমাবেশ হইল।"

বঙ্গভাষায় রীতিমত রাজনীতির আলোচনাও অক্ষয়চন্দ্র হইতে হইয়াছে। এ কথা সচরাচর উক্ত না হইলেও, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহার পূর্ব্বে দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় "সোম প্রকাশে" রাজনীতির আলোচনা করিতেন জানি; কিন্তু সে আলোচনা লিখন-ভঙ্গীর জন্য পাঠক সংগ্রহ করিতে পারে নাই। অক্ষয়চন্দ্রই রাজনীতির নীরস কথা সকল 'সাধারণী'র মারফতে সরল করিয়া প্রথম প্রচার করেন। সেই অবধি উহার চর্চ্চা দেশীয় কাগজে বাড়িয়া চলিয়াছে। রাজনীতির আলোচনার উদ্দেশ্যেই 'সাধারণী'র জন্ম। বঙ্গ-দর্শন প্রকাশের প্রায় দেড় বৎসর পরে এই 'সাধারণী' প্রকাশিত হয়। সাধারণীর পরিচয় প্রসঙ্গে অক্ষয়চন্দ্রই বলিয়া গিয়াছেন,—"সাধারণী সাহিত্য এবং রাজনীতি সমভাবে সমান সেবা করিবার নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, করিতও তাহাই। সাধারণী বলিত, ক্রন্দন ভিন্ন পলিটিক্স নাই; সুতরাং সরল বালিকার মতন কাঁদিত, ছোট ছোট আবদার করিত। রাজপুরুষেরা অতি ছোট আবদারে কর্ণপাত করিতেন। বড় আবদার করিলে এমন মুখ-বাঁকান, ভৎর্সনা করেন, তখন বালিকার কথা বুঝিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। সাধারণীর ক্ষুদ্র কথায় রাজা কর্ণপাত করিতেন বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল। আর সাহিত্য সেবা-পরায়ণ ছিল বলিয়া সাধারণীর যৎকিঞ্চিৎ সম্মান ছিল বাঙ্গালার কৃতবিদ্যের কাছে। বঙ্কিমবাবুর বঙ্গদর্শনের গুণে বাঙ্গালীবাবু সখ করিয়া বাঙ্গলা পড়িতে শিক্ষা করেন। আর রাজনীতি-জড়িত সাহিত্যের সখ মিটাইবার জন্য—সাধারণীর জন্ম।" 'সাধারণীর'র সাধনা যে সফল হইয়াছিল, তাহা এই লেখাটুকুর মধ্যেই সুপ্রকাশ; এ ক্ষেত্রে তিনি শুধু দূরদর্শিতা নহে, নির্ভীকতা ও স্বাধীনচিন্তারও বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিলেন। বঙ্কিম হইতে আরম্ভ করিয়া পরে বঙ্গবাসী পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই সেকালে বাঙ্গালার রাজনৈতিক আন্দোলনকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিতেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র তাঁহাদের সংস্রবে থাকিয়াও কখনও সে ভাবের ভাবুক হন নাই। তিনি বরাবরই কংগ্রেস প্রভৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

যৌবনে ও প্রৌঢ়ে তিনি রাজনীতি ও সাহিত্য-নীতির চর্চ্চা করিয়া শেষ জীবনটায় পল্লীর ও দেশের স্বাস্থ্যের কথায় মন দিয়াছিলেন। এই দুইটা জিনিষের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালীকে নানাকথা শুনাইয়া গিয়াছেন।

ইদানীং তাঁহার প্রধান কথাই ছিল এই যে,—"আমরা অস্বাস্থ্য তরঙ্গে নিমজ্জমান হইতেছি, হাবুডুবু খাইতেছি, অগ্রে আমাদের উদ্ধার সাধন কর, তাহার পর আমাদিগকে অন্য উপদেশ দিও।" তাঁহার ধারণা ছিল, বাঙ্গালীর বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব নাই, দেহে বল ও সাহস আসিলেই এ জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতীর মধ্যে গণ্য হইতে পারিবে। এই জন্য তাঁহার সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণে এই স্বাস্থ্যের কথাটাই বেশী করিয়া শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল তিনি যাহা বলিতেন, তাহাতেই আন্তরিকতা ফুটিয়া উঠিত।

মাতৃ-সর্ব্বস্ব, সাহিত্যগত প্রাণ অক্ষয়চন্দ্র এ দেশে যে ভাব বিলাইয়া গেলেন, তাহা অমর হউক। আমরা সেই বরেণ্য ভাবের আধার হইতে পারিলে, দেশ স্বর্গে পরিণত হইবে। তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হউক। তাঁহার 'আদর্শ' বাঙ্গালার দেদীপ্যমান হইয়া থাকুক।

—

কার্ত্তিক ঃ—

দাশরথি রায়

মৃত্যু—২রা কার্ত্তিক, ১২৬৪।

প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ণ হইল, দাশরথি রায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। এই ৬০ বৎসরের মধ্যে এদেশে কত কবি উঠিলেন, আবার জল-বুদ্‌বুদের মত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গেলেন' কিন্তু দাশরথির নাম আজিও এদেশের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাঁচালী-কবি বলিলে লোকে তাঁহাকেই বুঝিয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে' তাঁহার গান এখনও বাঙ্গালার হাটে-মাঠে গীত হইয়া থাকে। তাহা—

"দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।"

—ইতি শীর্ষক সঙ্গীতটি শ্রবণ করেন নাই, এমন বাঙ্গালী বোধ হয় অতি বিরল। তাঁহার আগমনীর গানের তুল্য আগমনী-গানও বড় বেশী দেখি নাই। ভিখারীরা অধিকাংশ সময়েই তাহার গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। একমাত্র রামপ্রসাদ ব্যতীত আর সকল সঙ্গীত-রচয়িতার অপেক্ষা তাঁহার গানের প্রচার অধিক বলিয়া মনে হয়।

শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের শ্রেণী-বিশেষের নিকট দাশরথি রায় উপেক্ষিত বা অনাদৃত হইলেও রসজ্ঞ-সমাজ তাঁহাকে কখনও অনাদর করে নাই। তাঁহার সময়ে যিনি বাঙ্গালার সাহিত্য-ক্ষেত্রে হর্ত্তা-কর্ত্তারূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তিনি—অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বয়ং তাঁহাকে একবার বলিয়াছিলেন,—"রায় মহাশয়ের শক্তি আমার হিংসার বস্তু।" শুধু এইটুকু নহে; তারপর, পরবর্ত্তী-যুগের সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও দাশরথির রচনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"যিনি বাঙ্গালা ভাষায় সম্যকরূপ ব্যুৎপন্ন হইতে বাসনা করেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত দাশুরায়ের পাঁচালী পাঠ করুন।"—এসব কথা পূর্ব্বে অনেকের নিকট অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইত, কিন্তু কালের নিকষপাথর উহাকে কষিয়া সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিয়াছে। খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ তাঁহার লেখায় যত আছে তত—এক ঈশ্বর গুপ্ত ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতে পাই না। মনু পরাশর, স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতিতে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল,—তাঁহার রচনা-মধ্যেও এ অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি শুধু ভাবুক নহেন, পরম ভক্তও ছিলেন।

—

দীনবন্ধু মিত্র

[মৃত্যু—১৭ই কার্ত্তিক, ১২৮০]

বঙ্কিম, রঙ্গলাল দ্বারকনাথ ও মনোমোহন প্রভৃতির ন্যায় দীনবন্ধুরও ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য-শিষ্য ছিলেন। এই কাব্য-শিষ্যগণের মধ্যে দেখা যায় যে, দীনবন্ধুতেই গুরু-দত্তশিক্ষার চিহ্ন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট। কিন্তু এজন্য তাঁহার যশ ও সুখ্যাতি নহে। তাঁহার কৃতিত্ব ফুটিয়াছে—তাঁহার নাটকে. নীলদর্পণ তাঁহার কীর্ত্তি-স্তম্ভ! যেদিন নীলদর্পণের জন্ম হয়,

বাঙ্গালার সেও একটা স্মরণীয় দিন ; সেই দিনে বাঙ্গালার প্রাণহীন নাট্য-প্রতিমায় প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। নাট্যাংশে ও সাহিত্যাংশে এমন উজ্জল গ্রন্থ ইহার পূর্ব্বে একখানিও এদেশে ছিল না, এবং ইহার পরেও তেমন বেশী রচিত হয় নাই।

দীনবন্ধু মিত্র।

ইহা ছাড়া, আর এক কারণে এ গ্রন্থের কথা বাঙ্গালী কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবে না। ভুলিতে পারিবে না যে, এই গ্রন্থখানির প্রচার-দ্বারাই "নীলকর-দুষ্ট রাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট" নিবারণ হইয়াছিল। বঙ্কিম বাবু এ নাটকখানির সহিত Uncle Tom's Ca in এর তুলনা করিয়াছেন। এ তুলনার মধ্যে তেমন আতিশয্যের গন্ধ আছে বলিয়া মনে করি না। এ গ্রন্থ সত্য সত্যই অত্যাচারীকে দমন ও অত্যাচারী-কে রক্ষা করিয়াছিল। এই নাটকের সহিত অতীতের অনেক ঘটনাই বিজড়িত আছে। পাদ্রী লং সাহেব ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এক মাসের জন্য কারাদণ্ডে-দণ্ডিত হন এবং সেই তাহার এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ডও হয়। এই জরিমানার টাকা স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদান করিয়াছিলেন। এই অনুবাদের প্রচার জন্য সীটনকার সাহেবও অপদস্থ হইয়াছিলেন। এই সব ঘটনার জন্য বঙ্কিম বাবু 'নীলদর্পণ' সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—'এমন সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই।—কথাটা এতদিন পরে এখনও পূর্ব্ববৎ সত্য আছে। বঙ্কিম বাবু যখন উহা লিখিয়াছিলেন, তাহার পর কত বৎসর গত হইল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত 'নীল-দর্পণে'র সৌভাগ্য আর কোনও গ্রন্থের লাভ হইল না। দীনবন্ধু আর কিছু না লিখিয়া যদি এই একখানি মাত্র গ্রন্থ লিখিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার নাম অমর হইয়া থাকিত।

দীনবন্ধু বঙ্গীয় নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রকারান্তরে বঙ্গ-রঙ্গালয়েরও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাহার নাটক অবলম্বন করিয়াই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ গড়িয়া উঠিয়াছিল। একথা নটগুরু গিরিশচন্দ্রও নিজ-মুখে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, বাঙ্গালা-কাব্য-সাহিত্যে দীনবন্ধুই সর্ব্বপ্রথম সামাজিক চিত্রের আমদানী করিয়াছেন, কিন্তু একথা সত্য নহে। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল,' রামনারায়ণের 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' নাটক ও মধুসূদনের প্রহসন দুইখানি দীনবন্ধুর নাটক রচিত হইবার পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সকল গ্রন্থেই বাঙ্গালী চরিত্রের চিত্র আছে। তবে দীনবন্ধু সম্বন্ধে এখানে এই বলা যায় যে, তাহার পূর্ব্বে আর কেহ এদেশে বঙ্গনারীর উন্নত ও উজ্জল চরিত্র-অঙ্কন করিতে প্রয়াস পান নাই।

করুণ রসোদ্দীপক চিত্র আঁকিয়া তিনি এদেশে একদিন মহা-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু হাস্যরসেই তাঁহার ক্ষমতা অধিক ছিল মনে হয়। তাঁহার অধিকাংশ রচনাই হাস্যরস-প্রধান। সে হাস্যরসে আজিও বাঙ্গালী মুগ্ধ। তাঁহার নাটকের রস-রসিকতা লইয়া এখনও লোক রসিকতা করিয়া থাকে।

অগ্রহায়ণ ঃ—

প্যারীচাঁদ মিত্র

মৃত্যু—২৩শে নভেম্বর (অগ্রহায়ণ)—১৮৮৩

মাতৃ-ভাষার সেবা করিয়া তিনি আমাদের যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহার মূল্য অসামান্য।

বাঙ্গালার গদ্য ভাষা যখন অত্যন্ত সংস্কৃতানুসারিণী হইয়া চলিতেছিল, যখন তারাশঙ্করের 'কাদম্বরী'র ভাষাকেই আদর্শ গদ্য ভাষা মনে করিয়া বাঙ্গালী লেখক তাহার অনুকরণ করিতেছিল, সেই সময় প্যারীচাঁদ মিত্র ও নীলমণি বসাক এই দুই বন্ধু মিলিয়া বাঙ্গালী পাঠকের সম্মুখে এক নূতন ভাষা-ভঙ্গির আদর্শ ধরিয়াছিলেন। প্রচলিত বাঙ্গালায় যে সুন্দর গদ্য রচিত হয়' এ কথা বাঙ্গালী তাঁহাদের দুইজনের লেখা হইতেই ভাল করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছিল। নীলমণির নাম সচারাচর কেন উক্ত হয় না, বলিতে পারি না। কিন্তু পণ্ডিত-বাঙ্গালার যুগে প্যারীচাঁদের ন্যায় নীলমণিও যে সহজ রচনা-রীতির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহার কথাও বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত।

তবে প্যারীচাঁদের আরও একটি অক্ষয়কীর্ত্তি আছে। সে কীর্ত্তি এই যে, এদেশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার 'মাসিক পত্র' নামক কাগজখানিতে সামাজিক কথা লইয়া আলোচনা আন্দোলন আরম্ভ করেন। সে সময় খৃষ্টান-লেখকেরা তাঁহাদের বাঙ্গালা মাসিক পত্রে খৃষ্টানী ধর্ম্মের চর্চ্চা করিতেন। 'তত্ত্ববোধিনী'তে সে সময় ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোচনা হইত। রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' তখন দেশীয় জীব-জন্তু ও দেশীয় ঐতিহাসিক কথা প্রকাশিত হইত। কিন্তু দেশের সামাজিক কথা লইয়া তখন একমাত্র প্যারীচাঁদ ব্যতীত আর কেহই লেখনী চালনা করিতেন না। তাঁহার 'আলালের ঘরে দুলালে' তৎকালিন বাঙ্গালী সমাজের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। তাহার 'মদ খাওয়া বড় দায়' প্রবন্ধে মদের দোষ নানাভাবে গল্পের ডাল পালা দিয়া বুঝান হইয়াছে। এবং তাঁহার 'রাম রঞ্জিকা'য় হরিহর-পদ্মাবতী দম্পতীর কথোপকথন-মধ্যে তিনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষ সমর্থন করিয়া নানা কথা বলিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন, যদি সাহিত্যের দ্বারা দেশকে উন্নত করা যায়, তবে বাঙ্গালা কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।"

রসিকচন্দ্র রায়

মৃত্যু—৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৯

ঈশ্বর গুপ্ত ও দাশরথির সময়ে বাঙ্গালায় আর যে একটি কবি কবিতা, সঙ্গীত ও পাঁচালী প্রভৃতি রচনা করিয়া দেশ-প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহার নাম রসিকচন্দ্র রায়।

বয়সে দাশরথি অপেক্ষা ১২। ১৩ বৎসরের ছোট হইলেও দাশরথির সঙ্গেই প্রায় এক সময়ে তিনি কবি-যশ অর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দাশরথির যখন ৩০ বৎসর বয়স, তখন তিনি পাঁচালী রচনা ও পাঁচালী গাহিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু রসিকচন্দ্র ১৮ বৎসর বয়স হইতে ২৩ বৎসর বয়সের মধ্যেই ছয়খানি পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া, বাউল, কীর্ত্তন ও যাত্রা প্রভৃতি নানাবিধ লেখাও ইতিমধ্যে তিনি লিখিয়াছিলেন। উপস্থিত রচনা-শক্তি তাহার অসাধারণ ছিল। তিনি মুখে মুখে কত গান—কত কবিতা যে রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না।

যিনি যত বড়ই কবি হউন, রামপ্রসাদের মতন বিস্তৃতি-লাভ আজ পর্য্যন্ত আর কে'নও কবির ভাগ্যে এদেশে ঘটে নাই। রামপ্রসাদের পর দাশরথির নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তার পর কাহারও নাম করিতে হইলে, রসিক রায় ও নীলকণ্ঠের নামই করিতে হয়। রসিক রায়ের আগমনী, শ্যামা সঙ্গীত ও কৃষ্ণ সঙ্গীত শিক্ষিত ধনীর গৃহ হইতে সামান্য কৃষকের কুটীরেও এখনও গীত হইতে শুনা যায়। তিনি ভক্ত ভাবুক কবি ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে উহার পরিচয় দেদীপ্যমান।

নির্জ্জনতা তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। ৩৫ বৎসর

কালের সময় তাঁহার যখন পিতৃবিয়োগ ঘটে তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর তাঁহাকে চিরদিন উদাসীন জানিয়া বিষয়-সম্পত্তি তত্ত্বাবধানের আংশিক ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু রসিকচন্দ্র সে ভার কনিষ্ঠের হস্তে ন্যস্ত করিয়া, বাটীর অনতিদূরে 'শান্তি-নিকেতনে' বাস করিতেন। এইখানে তিনি একাগ্রচিত্তে বাগদেবীর আরাধনা করিতেন।

পৌষ ঃ—

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

[মৃত্যু—২৯শে পৌষ, ১৩১৩]

পূর্ব্ব-বঙ্গের যে কয়জন কবিকে আমরা বাঙ্গালার কবি—বাঙ্গালীর কবি বলিয়া হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, কবি কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদেরই একজন তিনি হাফেজের ভাবসম্পদ্ বাঙ্গালায় বিলাইয়া গিয়াছেন। কবি নহিলে কবির মর্ম্ম-কথা কে ভাষান্তরিত করিবে? কৃষ্ণচন্দ্র শুধু হাফেজের গন্ধবহ ছিলেন না,—তাঁহার কবিতায় সমবেদনার উৎস দেখিতে পাই মানবের সুখ-দুঃখে তাঁহার প্রবল সহানুভূতি ছিল। তিনি কমল-বিলাসী ছিলেন না,—কখনও কামের ছবি ভাষায় ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন নাই। সেই সুদূর অতীতে তাঁহার মনে দেশাত্মবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশই স্বর্গ, ইহা তিনি বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। "এমন সুখের দেশ আর না কি আছে"—ইহাই সে-কালের স্বদেশপ্রেমের অভিব্যক্তি দেশ সুন্দর বলিয়া তাঁহারা দেশকে ভালবাসিতেন না বাঙ্গালা ভুবনমন-মোহিনী বলিয়া কৃষ্ণচন্দ্র দেশভক্ত হন নাই। দেশ 'দেশ' বলিয়াই তাঁহারা দেশকে অতুলনীয় ও রমণীয় মনে করিতেন। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"—এই প্রাচীন ভক্তি সূত্রের ভাষ্য তাঁহারা স্বর্ণাক্ষরে রচিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান-কালে যে দেশ-ভক্তি শতদলের মত বাঙ্গালীর মানস সরোবরে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার মূল ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় হইলেও কৃষ্ণচন্দ্রাদির দ্বারায় যে তাহার পুষ্টিসাধন ঘটিয়াছিল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক কবিতা প্রবচনে পরিণত হইয়াছে। এ যুগের আর কোনও কবির কবিতা যে মুখে-মুখে এত প্রচার ও প্রসারের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, এমন ত মনে হয় না।

"চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশী-বিষে দংশেনি যারে?

—এ কবিতা বাঙ্গালার কে না শুনিয়াছে? এমন epigrammatic রচনা কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক আছে।

কৃষ্ণচন্দ্রের রচনা বিশুদ্ধ ও প্রসাদগুণ-বিশিষ্ট। তাঁহার অনেক রচনায় সংস্কৃতের একটু বাহুল্য আছে বটে, কিন্তু সে দেবভাষার আতিশয্যও সহনীয়;—কেন না, তাহা সুপ্রযুক্ত এবং তাহা পঠনীয়। সংস্থানের গুণে কবিতার অর্থবোধ বাধা হয় না। যাঁহারা এখানকার চলতি বাঙ্গালায় 'পুষ্পিত' 'পল্লবিত' প্রভৃতি শব্দ ছড়াইতেছেন, তাহারা কৃষ্ণচন্দ্রের আশীবিষে সঙ্কুচিত না হইয়া, যদি তাহার ভাষা-প্রয়োগের কৌশলটুকু বুঝিবার একটু চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উপকৃত হইতে পারেন!

কৃষ্ণচন্দ্রের সমস্ত রচনা অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই। জীবিতকালে দরিদ্র কবি উৎসাহ পান নাই। স্বদেশে তিনি তাহার প্রাপ্য গৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিভা দারিদ্র্যের দাবানলে পুড়িয়া ছাই হয় নাই; সে আগুনে সে হেমের শ্যামিকা পুড়িয়াছিল,—বিশুদ্ধি বাড়িয়াছিল। স্বভাব-কবি কৃষ্ণচন্দ্র প্রশংসার মুখাপেক্ষা না করিয়া ভারতীর সেবা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সেই তপস্যার ফলের উত্তরাধিকারী হইয়াছি,—যেন সে ফল ভোগ করিতে পারি।

মানবতার বিশ্লেষণ করিয়া কবি আমাদের জন্য যে উপদেশাবলী রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার একটু আলোচনা হওয়া এ সময়ে এ দেশে প্রয়োজন। তাঁহার দেশভক্তির অনুশীলন করিলে, তাঁহার উপদেশগুলি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিলে—আমাদের উপকার আছে। আমরা আশী-বিষ-দংশনে

জগন্নাথ—তবু তো পদের কোনো বুঝিতে পারি না। যেদিন তাহা বুঝিতে পারিব, সেইদিন কৃষ্ণচন্দ্রের কবিতা-আলোচনা আমাদের সার্থক হইবে। সে শুভদিন কবে আসিবে, কে জানে !

আশ্রয়ঃ—

নবীনচন্দ্র সেন

মৃত্যু—১০ই মাঘ, ১৩১৫।

নবীনচন্দ্র প্রতিভাশালী মহাকবি। তিনি মহাকাব্যের সৃষ্টি করিয়া বাঙ্গালীকে বিশ্বজনীন প্রেমের ও সার্ব্বভৌমিক মানবতার আদর্শ দান করিয়া গিয়াছেন। নবীনচন্দ্রের সহিত মহাকাব্যের মেঘমন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে অন্তর্হিত ও শব্দব্রহ্মে বিলীন হইল কি ?

নবীনচন্দ্র কেবল 'কাব্যের কবি ছিলেন না। নবীনচন্দ্র সংসার-রঙ্গমঞ্চে কবির ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অকাল-পক্ব ভক্ত-সম্প্রদায়ের চিত্তরঞ্জনের জন্য কখনও 'কবি'র অভিনয় করিয়া কবিতার অপমান করেন নাই। তাঁহার মধুর প্রকৃতি কবিতায় গঠিত হইয়াছিল। তিনি 'রচনার কবি' বা 'রচিত' কবি ছিলেন না। যে জীবনে একবার সেই সরল, সদানন্দ, সহৃদয়, সুমধুর কবি-প্রকৃতির পরিচয় লাভ করিয়াছে, সেই সভাবসুন্দর হৃদয়ের গভীর স্নিগ্ধ প্রেমে ধন্য হইয়াছে, সে কি কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে ?

নবীনচন্দ্রের আদর্শ,—খণ্ড ভারতে মহাভারতের প্রতিষ্ঠা ; তাঁহার "রৈবতকে" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

> "এক মহারাজ্য, প্রভু, হয় না স্থাপিত—
> এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন ?"

ইহাই নবীনচন্দ্রের জীবনের মূলমন্ত্র, তাহার কবি-জীবনের ধ্রুব-তারা।

এই উচ্চ আদর্শ দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের ক্ষুদ্রতায় সঙ্কীর্ণ নহে। সে আদর্শে বিপুল জগতের বিশাল মানব পরিবারের সমান অধিকার। "রৈবতকে" শ্রীকৃষ্ণ পথভ্রান্ত পথিককে সেই বিরাট 'মানবতার'র পথ নির্দ্দেশ করিয়াছে ;—

> "সংসার সমুদ্র, পার্থ, আমরা মানব
> অনন্ত সমুদ্রযাত্রী, জ্ঞান ধ্রুবতারা ;
> ক্ষমা স্থান সুধাময়,
> বৈকুণ্ঠ যাহার নাম ;
> অনন্ত তাহার পথ ; জ্ঞান ধ্রুবালোকে
> আপন নিয়তিপথ,
> আপনার কর্ম্ম-ব্রত,
> যে পায় দেখিতে, সখে, সেই পুণ্যবান,
> সে পায় বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণু পদে-নিরবাণ।"

তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

> —মানব-হৃদয়
> কার সাধ্য অসি-ধারে করিবে বিজয় ?
> যে রাজ্যের ভিত্তি ধর্ম্ম,
> শাসন নিষ্কাম কর্ম্ম,
> কালের তরঙ্গে তাহা মৈনাক অচল।
> শক্তি ধর্ম্ম, ধনঞ্জয়, নহে পশুবল।"

নবীনচন্দ্র জাতীয় গৌরবে অনুপ্রাণিত, ভবিষ্যতের আশায় উদ্দীপ্ত ; কিন্তু তাঁহার উদার কল্পনা জাতীয়তার ক্ষুদ্রতায় সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ হয় নাই। তাঁহার আদর্শ,—মানবতা। তাঁহার স্বপ্ন—

> "বাঁধি' ধর্ম্ম-নীতি-পাশে
> মিলাইব অনায়াসে
> জননীর খণ্ড দেহ ; করিয়া চালিত
> জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদ-জ্ঞান করিব রহিত !
> শিখাব একত্ব-মর্ম্ম ;—
> এক জাতি, এক ধর্ম্ম ;
> একরূপে করিব এক সাম্রাজ্য-স্থাপন'
> সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।"

যে বিপুল সাম্রাজ্যের রাজা নারায়ণ, সে পুণ্য-রাজ্যের কল্পনাও ভারত ভিন্ন আর কোথাও সম্ভব কি ? বাঙ্গালীর মহাকবি বাঙ্গালীর জন্য এই বিশাল বিরাট 'মানবতা'র আদর্শ

গঠন করিয়া স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন, বাঙ্গালীকে ধন্য করিয়াছেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে ?

এই 'মানবতা'র মহামন্ত্র নবীনচন্দ্রের প্রাণ-বীণায় ঝঙ্কৃত হইয়াছিল। তাই তাঁহার দেশভক্তি ও স্বজাতিপ্রীতি দেশ ও জাতির সঙ্কীর্ণ কারা-পিঞ্জর চূর্ণ করিয়া বিশ্বে ও মানবে বিস্তৃত হইয়াছিল। তাই তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য 'মহাভারতে' জাতি ও দেশের ক্ষুদ্রতা সার্ব্বভৌমিক ভাবে বিলীন হইয়া গিয়াছে। "রৈবতকে" সেই মহাভাবের অভিব্যক্তি এইরূপ,—

"এই কর্ত্তব্যের স্রোতে যাইব ভাসিয়া
ফলাফল নারায়ণ-পদে সমর্পিয়া।
এক ধর্ম্ম, এক জাতি,
এক রাজ্য, এক নীতি,
সকলের এক ভিত্তি-সর্ব্বভূত-হিত ;
সাধনা নিষ্কাম কর্ম্ম,
লক্ষ্য সে পরম ব্রহ্ম,—
একমেবাদ্বিতীয়ম্! করিব নিশ্চিত
এই ধর্ম্মরাজ্য মহাভারত স্থাপিত।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার পদরেণুপূত পুণ্যভারতে সফল হউক।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

মৃত্যু—২৫শে মাঘ, ১৪১৮।

আজ ১৫ বৎসর হইল, গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার নাট্যশালা ও নাট্য-সাহিত্যের সিংহাসন শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন বটে ; তথাপি গিরিশচন্দ্র বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয়। যতদিন বঙ্গদেশে নাট্যশালা ও নাট্যগ্রন্থ থাকিবে, ততদিন গিরিশ-চন্দ্রকে কেহ ভুলিতে পারিবে না। কারণ, বঙ্গ-রঙ্গালয় ও তাঁহার নাট্যগ্রন্থাবলী—এই দুইটিই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি। এই উভয়ের দ্বারাই বঙ্গদেশ প্রভূত পরিমাণে উপকৃত। বাঙ্গালীজাতি গিরিশচন্দ্রের নিকট এজন্য পরম কৃতজ্ঞ। এ কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধনীয়। তাই গিরিশচন্দ্রকে বাঙ্গালী ভুলিতে পারে না।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ হইতে অনেক কুরীতির প্রতি দর্শকের ঘৃণার উদ্রেক করা যায়, অনেক কদাচারী শাসিত হয়। নীতিশিক্ষা, রাজনীতিক শিক্ষা রঙ্গমঞ্চ হইতে দেওয়া হয়। রঙ্গমঞ্চের কার্য্য দেশের কার্য্য।"—একথা শুধু কথায় নহে, কার্য্যে তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। লোকরঞ্জন অপেক্ষা লোকশিক্ষার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি নাটক রচনা করিতেন। তাঁহার 'বিল্বমঙ্গল', 'চৈতন্যলীলা', 'প্রফুল্ল,' 'বলিদান ও 'সংনাম' প্রভৃতি নাটক এই কথারই উজ্জ্বল উদাহরণ। রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণে গার্হস্থ্য-প্রধান জীবনের যে সকল আদর্শ চিত্র আছে, যে সকল সুনীতির প্রসঙ্গ আছে, সে সমুদয়ের অধিকাংশই তিনি তাঁহার পৌরাণিক নাটকগুলিতে সন্নিবিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এতদ্দেশীয় নানা মহাপুরুষের জীবন-কথা অবলম্বনে তিনি নাটক লিখিয়াছেন এবং সেই নাটকের ঘটনাবলী ও পাত্রপাত্রীর দ্বারা বহু জ্ঞানের কথা ও বহু আধ্যাত্মিক তত্ত্ব তিনি বেশ সহজ করিয়া, রসাত্মক করিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার সামাজিক নাটকগুলিতেও বাঙ্গালীর মানসিক স্বাস্থ্য সম্পাদনের উপযোগী বিস্তর উপাদান আছে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমাজ-দেহের ব্রণ বা স্ফোটক সকলের উপর শস্ত্র প্রয়োগ-কল্পে এই শ্রেণীর নাটক কল্পিত। বাঙ্গালী জীবনের দুর্ব্বলতা কোথায়, তাহা তিনি এই সকল নাট্যগ্রন্থে আমাদিগকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন এবং বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, যত দিন আমরা স্বার্থের বশে ভাই হইয়া ভাইয়ের গলায় ছুরি বসাইব,—ভাইয়ের বুকে হাঁটু দিয়া বসিব, ততদিন আমাদের কোনও আশা নাই।

তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে অপূর্ব্ব রাজনীতিক ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশপ্রীতি ও আত্মোৎসর্গ সত্ত্বেও যে কি দুর্ব্বলতার প্রভাবে দেশবাসীর সমস্ত যত্ন, সমস্ত উদ্যম ব্যর্থ হইয়া যায় প্রাণান্তক পরিশ্রম পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়, তাহা অতি সুকৌশলে তাঁহার 'সংনাম' প্রভৃতি নাটকে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার সামান্য লোক-শক্তি কিরূপে

রাজকীয় অত্যাচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া আত্মশক্তির বলে মাথা উঁচু করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়, সে শিক্ষাও এ তাহার এই শ্রেণীর নাটকে যথেষ্ট আছে।

নাটকের ভাব, ভাষা ও ছন্দ—এই কয়টিতেই তিনি অপূর্ব্বত্ব সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। তাহার ভাবের বিশিষ্টতা এই যে, তিনি পাশ্চাত্য বিদ্যায় পরম পণ্ডিত হইয়াও সাধারণ কবির ন্যায় কখনও অসামাজিক ভাবের ফেরী করিয়া বেড়ান নাই। তাই শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত সকলেই তাহার রচনা পাঠ করিয়া বুঝিতে পারে—পড়িতে for art's sake—বলিয়া এই যে একটা ধুয়া উঠিয়াছে, তাহা তিনি মানিতেন না। তিনি বলিতেন যে, উচ্চ অঙ্গের নাটক বা কাব্য পড়িয়া আমরা আনন্দ পাই—এ কথা বলিলে, সে কাব্য নাটকের অবমাননা করা হয়। কেবল আনন্দদানে কলাবিদ্যাবিশারদ তৃপ্ত নহে। তাঁহার আজীবন উদ্যম,—কিরূপে আনন্দস্রোত মানব-হৃদয় স্পর্শ করিয়া মানবের উন্নতি সাধন করিতে পারে।"

গিরিশচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দ, এই দুই মহাত্মাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের দুই প্রধান শিষ্য ছিলেন! দুই জনেই
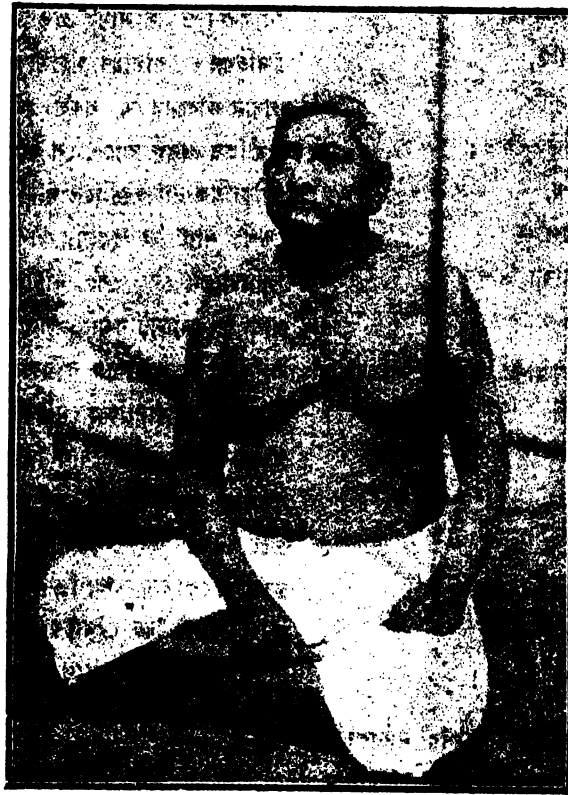
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

ভালবাসে। গিরিশচন্দ্র হিন্দুর সমাজ—হিন্দুর গৃহ হইতে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিতেন। তাহার সৃষ্ট সাহিত্য অনুচিকীর্ষার চর্ব্বিত চর্ব্বন নহে, তাহার ভাবসৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হওয়া চাই। 'Art কতকটা একভাবের ভাবুক। উভয়েই দেশবাসীকে একই ধরণের ভাব সম্পদ বিলাইয়া গিয়াছেন। দেশের জন্য উভয়েরই প্রাণ কাঁদিত। একদিন স্বামীজী শিষ্যদের বেদান্ত পড়াইতেছিলেন, এমন সময় গিরিশচন্দ্র তাহাকে বলিলেন,—

"হাঁ হে নরেন, একটা কথা বলি। বেদ বেদান্ত ত ঢের পড়লে, কিন্তু এই যে দেশে ঘোর হাহাকার, অন্নাভাব, ব্যভিচার, মহাপাতকাদি চোখের সামনে দিনরাত ঘুরছে, এর উপায় তোমার বেদে কিছু বলেছে! ঐ অমুকের বাড়ীর গিন্নী - এককালে যার বাড়ীতে রোজ পঞ্চাশখানি পাত পড়ত, সে আজ তিন দিন হাঁড়ি চাপায় নি; ঐ অমুকের বাড়ীর কুলস্ত্রীকে গুণ্ডাগুলা অত্যাচার করে মেরে ফেলেছে, ঐ অমুক জুয়ারী করে বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করেছে—এ সকল রহিত করবার কোনও উপায় তোমার বেদে আছে?"—গিরিশচন্দ্রের এই কথায় স্বামীজীর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল।

গিরিশচন্দ্রের স্বদেশানুরাগে কৃত্রিমতা ছিল না,—ভান ছিল না। তিনি প্রাণ ভরিয়া দেশকে ভাল বাসিতেন। দেশ ভুবন মনোমোহিনী বলিয়া তিনি দেশের ভক্ত হন নাই। দেশমাতাকে ভুবন—মনোমোহিনী বলিতে শুনিলে তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। বলিতেন,—অমন করিয়া মার রূপ-বর্ণনা করিতে নাই। দেশ আমার জন্মভূমি বলিয়াই জগতে তাহা অতুলনীয়—স্বর্গাদপি গরীয়সী। নেপোলিয়ান যখন সেণ্ট হেলেনায় বন্দী ছিলেন, তখন তিনি বলিতেন,—"যদি সেণ্টহেলেনা ফ্রান্স হইতে, তবে এমন যে ভীষণ মরুভূমিতুল্য দ্বীপ' তাহাকেও আমি ভালবাসিতাম।"—ইহাই প্রকৃত স্বদেশ প্রেমের অভিব্যক্তি—ইহাই খাঁটি দেশাত্মবোধ।

গিরিশচন্দ্র যে ভাবে স্বদেশকে ভালবাসিতেন, সেই ভাবের ভাবুক হইয়া বাঙ্গালী যদি স্বদেশকে ভালবাসিতে পারে, তাহা হইলে গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার দান সার্থক হইতে পারে। তাহার ইঙ্গিতে জীবন পথ নির্ণয় করিতে না পারিলে আমরা সেই অমর মহাকবি স্মৃতি-সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিব না।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

মৃত্যু—২৫শে মাঘ, ১২৬৫।

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের নাম আধুনিক পাঠক-সমাজে সুপরিচিত না হইলেও বঙ্গদেশে এক দিন তাঁহার অসামান্য খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল! ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে এমন বাঙ্গালী পাঠক বোধ হয় ছিল না, যিনি গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যকে চিনিতেন না বা জানিতেন না। গুড়গুড়ের 'রসরাজ' পত্রের সহিত ঈশ্বরগুপ্তের 'প্রভাকরের' কবিতা-যুদ্ধ দেশ প্রসিদ্ধ কথা। এই গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যই—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। 'ভাস্কর' তাহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'সংবাদ ভাস্করের' নাম সগৌরবে উল্লেখযোগ্য। ১২৪২ সালে তাঁহার 'সংবাদ ভাস্কর' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রখানি প্রকাশ করিয়া সংবাদ পত্র পরিচালনার তিনি এক নূতন পথ দেখাইয়াছিলেন। তিনি উদার হৃদয় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন! তাঁহাকে জজ পণ্ডিতের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ,—'ভাস্কর' ভিন্ন অন্য কোন কিছুর জন্য আমার অর্থের আবশ্যক নাই।"—এ ত্যাগ-স্বীকার আধুনিক বাঙ্গালী সম্পাদক-জীবনে সুদুর্ল্লভ।

ফাল্গুন :—

মহেন্দ্রলাল সরকার

মৃত্যু—১১ ফাল্গুন, ১৩১০।

হাওড়ার ১৮ মাইল পশ্চিমে পাইকপাড়া গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বরে ডাক্তার সরকারের জন্ম হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ডাঃ ফেরারে ইচ্ছায় তিনি এম্, ডি, পরীক্ষা দেন ও তাহাতে সর্ব্বপ্রথম স্থান গ্রহণ করিয়া উত্তীর্ণ হন,—প্রসিদ্ধ ডাক্তার ৺ জগবন্ধু বসু মহাশয় দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম, ডি, হন ডাক্তার ৺চন্দ্রকুমার দে; তাহার পরে ডাক্তার সরকার।

ইহার পর তিনি ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েসন প্রভৃতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক গৌরবের সম্মান-পদ গ্রহণ করেন।

তাঁহার অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথ্ হওয়ায় তাঁহার মতের সরলতা ও দৃঢ়তা প্রমাণিত হয়। এই ব্যাপারে তাঁহাকে প্রথমে অনেক নির্য্যাতন ও অর্থহানিও সহ্য করিতে হয়, কিন্তু তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, সাহসে ও আনন্দে তাহাই করিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার ন্যায়-নিষ্ঠার একটী উদাহরণ পত্রিকা-বিশেষে সম্প্রতি বাহির হইয়াছে, তিনি যখন কলিকাতার শেরিফ—তখন বর্ম্মা প্রত্যাগত লর্ড ডাফরিণের সম্মানার্থ সভা আহ্বানের জন্য তাঁহাকে সাধারণে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন, "আমি শেরিফ, আমাকে বাধ্য হইয়া সভা আহ্বান করিতে হইবে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, লর্ড ডাফরিণকে তাঁহার বর্ম্মায় ডাকাতি করার জন্য কি প্রশংসাপত্র দেওয়া হইবে?"

ডাক্তার সরকার ও ফাদার লাফোঁ এক সময়েই ভারত-বন্ধু গুণগ্রাহী উদার হৃদয় লর্ড রিপণ কর্ত্তৃক সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন; এই উপলক্ষে সম্পাদকপ্রবর শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন 'এতদিনে এইবার মাত্র গভর্ণমেন্টের উপাধি-প্রাপ্তি অপাত্রের পরিবর্ত্তে সুপাত্রের লক্ষণ হইল। এ ক্ষেত্রে যোগ্যতার মর্য্যাদা লর্ড রিপণই প্রথম রাখিলেন!

মহেন্দ্রলাল ধর্ম্মপ্রাণ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। জীবন সায়াহ্নে দুরন্ত রোগ যখন তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিল তখন তিনি যে সকল সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় আছে। তাঁহার রচিত দুইটি গান এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

(১)

আমার বলিয়া মনে করি যাহা, দেখি সে সবই তোমার।
কি দিয়া তবে পূজিব হে আমি কি আছে বল আমার।
তোমারি এ ধন, দেহ প্রাণমন, সঁপিনু শ্রীপদে কর হে গ্রহণ।
বারিধি হইতে বারিদ যেমন ঢালে তাহে বারিধার।
অন্য কোন ধন, নাহি প্রয়োজন, স্মৃতিপথে জেগে থেক অনুক্ষণ
একমাত্র তুমি হৃদয়ের ধন, নিত্য সত্য নির্ব্বিকার;
তব আবির্ভাব থাকিলে স্মরণে, কি ভয় ভাবনা বিপদে মরণে
রেখ দাসে স্থান দিও চরণে, এই ভিক্ষা বার বার,

(২)

ভয় করো না রে মন, দেখে শমন আগমন,
শত্রু নয় সে পরম বন্ধু কর তারে আলিঙ্গন।
এসেছে প্রভুর আজ্ঞায়. লয়ে যেতে তোমায়,
করিতে তোমার সব দুঃখ জ্বালা বিমোচন।
বাঁধা আছ ভূমণ্ডলে, কঠিন মায়া শৃঙ্খলে,
এসেছে সে কাটিতে ঐ দারুণ বন্ধন।
দেহ পিঞ্জরের দ্বার করি উন্মোচন,
দিতে তোমায় সুখময় অনন্ত জীবন।
পাইয়া নূতন জীবন, দেখিবে তুমি তখন,
যে সব দুঃখ পেয়েছিলে যায় নাই বিফলে,
সে সব দুঃখ হয়ে আছে, নিত্য সুখের কারণ,
(কৃপাময়ের শাসন) নহে কভু নহে কভু অনর্থক পীড়ন।

যে ভাবে তিনি কালের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃত ধার্ম্মিকের পক্ষেই সম্ভব। তিনি নির্ভীকচিত্তে শয্যায় উপবিষ্ট থাকিয়া সহাস্যবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভা প্রদীপ্ত মুখের কোনরূপ বিকৃতি হয় নাই।

চৈত্র :—

তারকনাথ প্রামাণিক

মৃত্যু—৭ই চৈত্র, ১২৯১।

তাঁহার দেহত্যাগের প্রায় পাঁচ মাস পূর্ব্বে, 'নবজীবন' পত্রে কবিবর হেমচন্দ্রের যে 'হুতোম প্যাঁচার গান,' বাহির হইয়াছিল, তাহার একস্থানে আছে—

"তুমিও আসরে এসে বসো একবার,
কলিতে কাঁসারী কুলে প্রভা জ্বলে যার!
কণ্ঠে তুলসীর মালা, দীন হীন বেশ;
কাঁধেতে চাদর ফেলা—পোষাকের শেষ
সহরের দীন দুঃখী দরিদ্র অনাথ,
আনন্দে দু-হাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ;

চাহিয়া তোমার দিকে তাকায় আকাশে,
শিশুর চক্ষুর ধারা মুছে চীরবাসে।
ভয় নাই এসো তুমি আছে অধিকার,
বসিতে এঁদের পাশে, ছাড় বিধাতার,
কি হবে বোঝায় পোঁটা ? কে চায় চালরাশ ?
অনাথ-তারক নামে পেয়েছ যে 'পাশ'।"

—সংক্ষিপ্ত হইলেও, তারকনাথের ইহা এক সুন্দর পরিচয়-পত্র। ঐ কয়টি ছত্রে কবি হেমচন্দ্র তাঁহাকে যেরূপ ফুটাইয়াছিলেন, তেমন ভাবে ফুটাইতে আর কেহ পারেন নাই। এই সঙ্গে ইহাও অবশ্য বলিয়া রাখি যে, তারকনাথের জীবন কথা—তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যের কাহিনী—যেমন ভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত ছিল, তাহার কিছুই হয় নাই। গল্পাকারে তাঁহার দুই চারিটা কথা লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু সেগুলিও ছাপার অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতে আজ পর্য্যন্ত দেখি নাই। আজকালকার মাসিক পত্রগুলি গল্প নহিলে চলে না শুনিয়াছি, অথচ অধিকাংশ মাসিকেই ভাল গল্পের একান্ত অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।—এমন অবস্থায় আমাদের মনে হয়, তারকনাথের জীবনের ঘটনা ধরিয়া যদি কিছু-কিছু লেখা যায়, তাহা হইলে, তাহা যে শুধু ঔষধ ও পথ্য দুয়েরই কাজ করিবে, তাহা নহে; তেমন করিয়া ভাষায় ফুটাইতে পারিলে গল্প-সাহিত্যেরও পুষ্টি সাধন হইবে। 'টলষ্টয়' 'টলষ্টয়' করিয়া আমরা অজ্ঞান হই, গল্পের 'প্লটের' জন্য বিদেশী গল্পের অনুসন্ধান করি, কিন্তু ঘরে আমাদের গল্পের যে সমস্ত চমৎকার উপাদান রহিয়াছে, সেদিকে আমাদের কাহারও দৃষ্টি যায় না। ইহাও 'slave mentality'র প্রকৃষ্ট পরিচয়। গোলামীর চাপে আমাদের এমনই চিত্ত-বিকৃতি ঘটিয়াছে যে, তারকনাথের স্মৃতিসভা করা দূরে যাউক, তাঁহার নামটুকুও গৌরবের সহিত উচ্চারণ করিতে সকল সময়ে সাহসে কুলায় না। ইংরাজী লেখা-পড়া-জানা লোক না হইতে পারিলে যে দেশে 'শিক্ষিত' বলে না, সে দেশে তারকনাথের শিক্ষা-দীক্ষার আলোচনা না হওয়াই কতকটা স্বাভাবিক। যে শিক্ষা-প্রভাবে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও নিজে হাঁটুর উপর ধুঁটি কাপড় পরিতেন, যে শিক্ষা-প্রভাবে তিনি তৃণ অপেক্ষাও নম্র, বনস্পতির অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া সংসারে দরিদ্র-নারায়ণ-রূপ ব্যতীভূত হরিকেই দিবারাত্র স্মরণ করিতেন; যে শিক্ষা-প্রভাবে তিনি প্রাতে উঠিয়া দুর্গানাম লিখিতেন, স্বহস্তে গাভীকে ঘাস খাওয়াইতেন, বৈকালে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতেন এবং আট প্রহর মালা জপ করিতেন; যে শিক্ষার মর্ম্ম ও মর্য্যাদা ইহকাল-সর্ব্বস্ব ইংরেজী-নবীশ বাবুর দল কি বুঝিবে ? যে সময় বাঙ্গালার ধর্ম্মে, সমাজে, প্রথায় ও সদাচারে রীতিমত ভাঙ্গন-কার্য্য চলিতেছিল, সে সময় একদিকে ভূদেব ও অন্যদিকে তারক প্রামাণিক জাতির বিশিষ্টতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। তারকনাথের জীবন—আদর্শ হিন্দু-জীবন। জীবন-কথা স্মরণ করিলে মানুষের মন মনুষ্যত্বের পথে আকৃষ্ট হয়। সাধুতা বা বীরত্ব সকলেরই পক্ষে আদর্শ।

কৃষ্ণপান্তী, রামদুলাল সরকার, মতিশীল ও রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের সহিত তাঁহার নামও নিত্য স্মরণযোগ্য। মহাত্মা তারকনাথ প্রামাণিকও বাঙ্গালায় এখন একটিও নাই।

"সহরের দীন-দুঃখী দরিদ্র অনাথ,
আনন্দে দু-হাত তোলে যখনি সাক্ষাৎ।"

—এ আদর্শ তারকনাথের সঙ্গে সঙ্গেই এদেশ হইতে লোপ পাইয়াছে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃত্যু—৯ই চৈত্র, ১৩১৭।

ইন্দ্রনাথ বঙ্গ সাহিত্য-ভাণ্ডারে যাহা দিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমাণে প্রচুর না হইলেও গুণের হিসাবে অসামান্য। এখনকার দিনে হয়ত তাঁহার কোনও কোনও লেখার তেমন বিশেষ উপযোগীতা নাই, কিন্তু একদিন সে সব লেখা বাঙ্গালার বাবু-সমাজের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। তাঁহার 'পঞ্চানন্দ' ও 'ভারত-উদ্ধার', তাঁহার 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' বাবুদিগের মর্কটামী দমন করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল। নিজেকে জানিবার জন্য—নিজের নিজস্বটুকুকে জাগাইয়া তুলিবার জন্য আজ আমাদের মধ্যে যে ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে, ভূদেব বা ইন্দ্রনাথের সময় তাহা ছিল না। তখন সাহেবী-

যাবার দিকেই আমাদের সমস্ত ঝোঁকটুকু একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। তখন উচ্চ গলায় বলিতেছিলেন—"Do away with your joint family system" "Break down the walls of your Hindu zenana" "Do away with your caste system." "Remarry your Hindu widows."—শুধু সামাজিক আচার ব্যবহারে নহে ; সকল বিষয়ে, এমন কি, হাসি কান্নাতেও সাহেবের ভঙ্গীটুকু অনুকরণ করিয়া যখন নিজেদের জীবনকে ধন্য মনে করিতেছিলাম, সেই সময়ে আমাদের সেই অনুকরণ-মোহ ভাঙ্গিবার জন্য প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিলেন ভূদেব ; এবং তাঁহার কিছুকাল পরেই দর্শন দিয়াছিলেন ইন্দ্রনাথ। আমরা সাহেব যে সঙ্ সাজিতেছি, একথা বুঝাইবার জন্য ভূদেব যে পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, সে পথ অবশ্য ইন্দ্রনাথ অবলম্বন করেন নাই। কিন্তু মূলতঃ উভয়েই এক ভাবের ভাবুক ছিলেন—একই মন্ত্রের দ্রষ্টা ছিলেন। আজ আমরা নিজ নিকেতনে ফিরিয়া যাইতে যে উদ্যত হইয়াছি, তাহা কতকটা ঐ দুই মহাত্মারই প্রসাদাৎ।

স্বজাতির সঙত্ব দেখিয়া ভূদেব কাতর হইতেন, কিন্তু ইন্দ্রনাথ বিরক্ত হইতেন, ঘৃণায় মুখ ফিরাইতেন। তাঁহার সে ঘৃণা ও বিরক্তি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও শ্লেষের আকারে নিত্য ফুটিয়া উঠিত। তিনি ভণ্ডামি ও 'হম্বাগিজিম্'কে ক্ষমা করিতে কখনও পারিতেন না। যত বড় লোকই হউন না কেন, যাঁহার কর্ম্মে তিনি দোষ বা ত্রুটী বুঝিতেন, তাঁহারই পশ্চাতে উদ্যত কশা লইয়া সবেগে ছুটিতেন। বিদ্যাসাগরের প্রতিও বিদ্রূপ বাণ বর্ষণ করিতে তিনি ইতস্ততঃ বোধ করেন নাই। স্যর আশুতোষের বিধবা কন্যার বিবাহে, স্বর্গীয় রামেন্দ্র সুন্দরের কোনও এক প্রবন্ধ-পাঠে তিনি যে সব পত্র 'বঙ্গবাসী'তে লিখিয়াছিলেন, তাহা পড়িলে তাঁহার সারল্য ও নির্ভীকতার অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। কাপুরুষ লেখকেরা হয়ত সে সব লেখাকে 'ব্যক্তিগত আক্রমণ' বলিয়া ইন্দ্রনাথের নিন্দা করিতে অগ্রসর হইবেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া ব্যক্তির দোষ আলোচনা করাকে শুধু কাপুরুষতা নহে, পরন্তু কপটতা বলিয়াই বোধ করিতেন। ভাবের ঘরে তাঁহার চুরি ছিল না। অনুরোধ-উপরোধ বা খাতিরে পড়িয়া তিনি কাহারও অন্যায়কে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেন না। 'কংগ্রেস'কে কঙ্গরস বলিয়া তিনি যে রঙ্গরস করিতেন, তাহা অনেক পাঠকের তখন রুচিকর হইত না বটে, কিন্তু একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, তিনি সেই রঙ্গরসের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে কংগ্রেসের যে রূপান্তরটুকুর আকাঙ্ক্ষা জানাইতেন, আজ কংগ্রেস সেই মূর্ত্তিই গ্রহণ করিয়াছে। তিনি আজ জীবিত থাকিলে, মনে হয়, তিনি স্বয়ং যাইয়া কংগ্রেসে যোগদান করিতেন,—মহাত্মা গান্ধী ও ভারতরঞ্জন চিত্তরঞ্জনের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতেন। ইন্দ্রনাথের কোনও কোনও লেখায় তখনকার কালে যেটা 'গোঁড়ামী' বা 'বাড়াবাড়ি' বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহার বিচার করিলে মনে হয় তাঁহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি অতি প্রখর ছিল। তিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেন না,—সময়ের কিছু অগ্রগামী ছিলেন। আজ এই জাতীয় মহা সমস্যার দিনে তাঁহার ন্যায় মেকীর শত্রু—ভণ্ডের দণ্ডদাতার অভাব অনুভব করিতেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র

মৃত্যু—২৬শে চৈত্র, ১৩০০ ;

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের বিকাশ অতি পরিপাটী। স্তরে স্তরে উহার বিকাশ ; বিকাশ সর্ব্বথা একই অনুশীলনো-ন্নতির দিকে অগ্রসর এবং অনুশীলনোন্নতির যাহা চরম লক্ষ্য অবশেষে তথায় যাইয়া উপস্থিত। ৺প্রতাপবাবু যথার্থই বলিয়াছেন—বঙ্কিমচন্দ্র "An apostle of culture"। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক এবং প্রচারক, তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-জীবন এতদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত ; এবং তাঁহার ধর্ম্মজীবন ইহা হইতে উদ্ভূত এবং ইহারই দ্বারা পালিত, বর্দ্ধিত। বঙ্কিম-চন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম্ম সর্ব্বথা সনাতন হিন্দু ধর্ম্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র শেষ জীবনে বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচার করেন Substance of religion is culture। তাঁহার প্রচারিত এই উচ্চতরের উক্তি তাঁহার নিজের সাহিত্য-জীবনে অতি সুন্দররূপেই প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র এক দিকে

অতুমার সাহিত্যের ক্ষেত্র হইতে গৌণ কল্পে যেমন ধর্ম নীতি প্রচার করিয়াছেন, অপর দিকে তেমনি সাহিত্যালোচনার দ্বিতীয় স্তর হইতে প্রথম বা সর্ব্বোচ্চ স্তরে অর্থাৎ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ধর্মপ্রচারের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনার কথা বলি। এই রচনা সাহিত্যাংশে খুব অস্ফুট। রচয়িতা নিজেই বলেন, উহা অপাঠ্য, উহা হেঁয়ালী। তাহা হউক, তাঁহার কিন্তু অস্পষ্ট অমিষ্ট বাল্য-রচনায় আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা রচয়িতার মানসিক অবস্থা। বাল্যকালের রচনায় নিজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সমাঙ্কিত করা লেখক মাত্রের স্বাভাবিক। বালক বঙ্কিমের সর্ব্বপ্রথম রচনা—'ইাজিডি'। রসিক চূড়ামণি তরুণ বয়সে তরল রসের ছড়াছড়ি না করিয়া 'শেষের সেদিন' ভাবিতে বসিয়াছিলেন, ইহা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে। বাল্যাবস্থাতেই বঙ্কিমের মন সংসারের অসারতা অনুভব করিয়া "ললিত মন্মথের" প্রণয় ও তাহার পরিণাম বর্ণনা-স্থলে বলিল ;—

> মানবের কি কপাল সংসার কি ছার!
> বহিতে জীবন ভার কে চাহিবে আর!

পরন্ত,—

> এ গভীর স্থির মত হয়েছে এখন
> কারো অনুরাগী নই বিনা সনাতন।
> জপিয়া পবিত্র নাম হইব পতন॥
> অনন্ত মহিমা স্মরি ছাড়িব এ দেহ,
> জানিবে না শুনিবে না, কাঁদিবে না কেহ।

এ গভীর মত তখন সম্পূর্ণরূপে স্থির হইয়াছিল কি না, নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। কিন্তু মত স্থির না হইলেও তাঁহার মনের গতি যে কোন দিকে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কারণ পরিণত বয়সেও তিনি বলিয়াছেন :—

"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, জীবন লইয়া কি করিব? লইয়া কি করিতে হয়?" সমস্ত জীবন উহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে।" ইত্যাদি

* * *

পঞ্চদশ হইতে দ্বাবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালের মধ্যে ললিতা ও মানস ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্র আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ও অনতিক্ষুদ্র গদ্য পদ্য প্রবন্ধ রচনা করেন; তাহাদের কতক প্রকাশিত হয়, কতক প্রকাশিত হয় না; যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাও এখন দুষ্প্রাপ্য। বঙ্কিমের ত্রয়োবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, তাঁহার একটী ইংরেজী লেখা (Raj mohan's wife) "ইণ্ডিয়ান্ ফিল্ড" নামক ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। "দুর্গেশনন্দিনী"ও লিখিত হয় এই সময়ে;—প্রকাশিত হয় দুই বৎসর পরে। 'কপাল-কুণ্ডলা' লিখিত ও প্রকাশিত হয় 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হওয়ার দুই বৎসর অতীত হইলে। 'মৃণালিনী' লিখিত হয় কপালকুণ্ডলার তিন বৎসর পরে; প্রকাশিত হয় আরও দুই বৎসর পরে।

দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহিত্যের এই সর্ব্বপ্রথম সুপ্রসিদ্ধ গদ্য কাব্যত্রয়, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত সুবিখ্যাত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের পূর্ব্ব ব্যাপার; বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সাহিত্য-যুগ আবির্ভাবের অগ্রগামী সূচনা। বঙ্গদর্শন প্রবর্ত্তন হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে, বাঙ্গালাভাষায় সাহিত্য-যুগের আরম্ভ। পরন্তু 'নবজীবন' ও "প্রচার" প্রকাশ হইতেই এক দিকে সাহিত্যানুশীলনমূলক ধর্ম্মের ও অপর দিকে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান-সূচক আন্দোলনের আরম্ভ হয়। নবজীবন ও প্রচার, উভয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন-ধর্ম্ম বক্ষে করিয়া বাহির হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রই, বাঙ্গালাভাষায় সাহিত্যের ন্যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যে সনাতন ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিলেন; ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের শত্রু মিত্র (যদি কেহ শত্রু থাকেন) সকলেই স্বীকার করিতে বাধ্য; কেন না ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ঐতিহাসিক কথা।

* * * *

বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়, বঙ্গাব্দ ১২৭৯ সাল হইতে। বঙ্গদর্শনের ইতিবৃত্ত এবং বঙ্গদর্শনের সহিত বাঙ্গালীর ও বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ সম্বন্ধ সবিস্তারে বলিতে গেলে স্বতন্ত্র সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়। অতএব সে কথা আমরা এখানে কিছুই উল্লেখ করিব না। উপরে যাহা বলিয়াছি, তাহাই পুনরুক্ত করিয়া বলিতেছি যে, বঙ্গদর্শন দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

উহার পূর্ব্বে আমাদের সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্ন সাহিত্য ছিলই না; সমালোচনা, সাহিত্য-মূলক সমালোচনা এবং সমালোচনা মূলক সাহিত্য, আদৌ ছিল না। পক্ষান্তরে আজ যে আমরা অলি-গলিতে এবং অজ পাড়াগাঁয়ের অত্যন্ত অজ্ঞাত পল্লীতে এত এত উত্তম, মধ্যম, অধম এবং অধমাধম মাসিক পত্র

পর্য্যন্ত 'স্ব-স্ব' যাহা কিছু সমস্তেরই উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি। রসের টল টল ঢেউ হইতে গাম্ভীর্য্যের অতলস্পর্শী দৃশ্য পর্য্যন্ত যাহা কিছু তাহার একই মাত্র উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোন্নতি। এখন স্মরণ করিয়া দিতে হইবে কি যে, চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তোন্নতিই ধর্ম্ম ?

বঙ্গদর্শনে বঙ্গসাহিত্যের নবীন সংস্কার ও নব যুগোৎপাদন
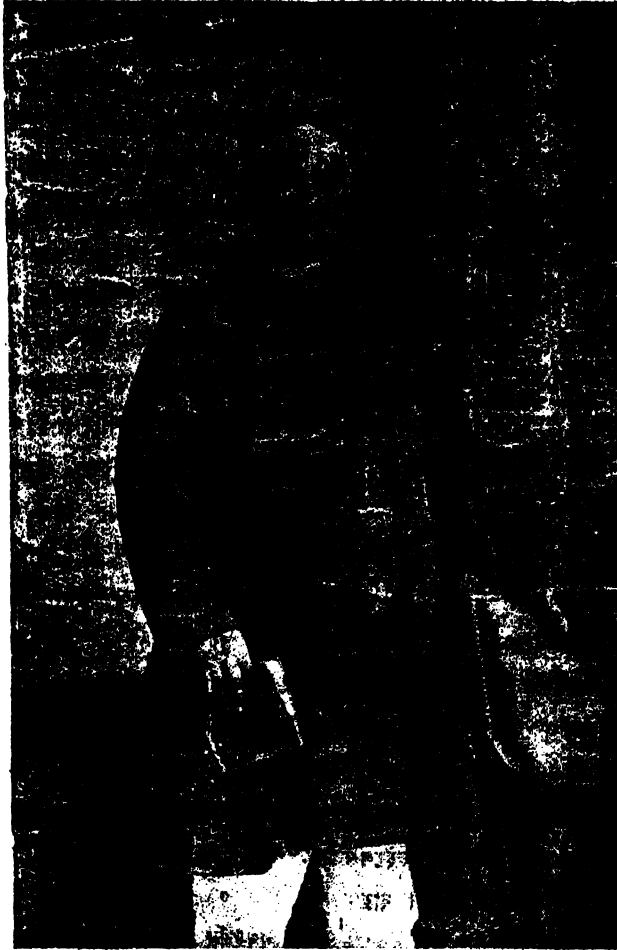
বঙ্কিমচন্দ্র

দেখিতেছি; বঙ্গদর্শন হইতেই এই সাহিত্য-রক্তবীজ-বংশের উৎপত্তি।

* * * *

বঙ্কিমের যত কিছু সৃষ্টি নগেন্দ্র দেবেন্দ্র হইতে প্রতাপ, চন্দ্রশেখর এবং রোহিণী শৈবলিনী হইতে সূর্য্যমুখী, প্রফুল্লমুখী

করার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুকাল বিশ্রাম। কিন্তু এই বিশ্রাম পরিশ্রমের পরিকাষ্ঠা বলিয়াই বোধ হয়। এই বিশ্রাম বা পরিশ্রমের ফল অনেক। আর সে ফল বঙ্কিমের শেষ জীবনে বঙ্গসাহিত্যে নানা আকারে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যের খাস অধিকার হইতে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রত্যাগমনের প্রথমাভাস

আনন্দ মঠে। বঙ্কিমবাবুর রাজনীতি ও ধর্ম্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিস্থল কোথায়, তাহা আনন্দমঠে বেশ দেখিতে পাই। জননী জন্মভূমির জন্য কবি-হৃদয় যে কিরূপ কাতর, কিরূপ উদ্বেলিত ও উচ্ছ্সিত, তাহা "বন্দেমাতরং সঙ্গীতে বুঝিতে পারি। "আনন্দমঠে" যাহার আভাস, দেবী-চৌধুরাণীতে তাহার প্রকাশ যে নিষ্কাম কর্ম্ম চন্দ্রশেখরে অঙ্কুরিত, প্রফুল্লমুখীতে তাহা বিকশিত ; পরিণাম তাহার ধর্ম্মে,—সে ধর্ম্মও কিন্তু সাহিত্য। সাহিত্যের ধর্ম্ম পরিণামের প্রথম সোপান, আনন্দ মঠ দ্বিতীয় দেবী চৌধুরাণী, তাহার পর প্রচারে, সে সম্পূর্ণ পূর্ণ। প্রচারে ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল, কিন্তু উৎপন্ন হইয়াছিল অতি উপাদেয় সাহিত্য। কৃষ্ণ চরিত্রে মহাভারত-সমালোচন সুকুমার সাহিত্যেরই অন্তর্গত।

বঙ্কিমচন্দ্র ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিয়া কোন পথে গিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ ধর্ম্মের নৈসর্গিক ভিত্তি কি ? দ্বিতীয়তঃ হিন্দু ধর্ম্ম সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত কি না ? এই কথা বুঝান প্রথম কল্পে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি ধর্ম্মের বিবিধ ভাগ বিভাগ শাস্ত্রের স্তরে স্তরে সমালোচনা করিয়াছিলেন। সে সমালোচনা শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধই হউক, তাহার ফল ভবিষ্যতে যাহাই হউক, ইহা যে আমাদের সাহিত্যের যৎপরোনাস্তি উপকারও পুষ্টিসাধন করিয়াছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। বঙ্কিমে আমরা সাহিত্যমূলক ধর্ম্ম দেখিতে পাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন খুব একটা প্রকাণ্ড নয়। উহা হয়ত দিগ্‌গজ পাণ্ডিত্যের ও অগাধ গবেষণার আধারও নয় ; উহা হইতে অন্ধকারময় স্তূপাকার গ্রন্থাবলীও উৎপন্ন হয় নাই ;—কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার তুলনা নাই। বঙ্কিম অপেক্ষা খুব বড় পণ্ডিত বঙ্গ-সাহিত্যে থাকিতে পারেন, তাঁহার অপেক্ষা মনস্তত্ত্ববিদ্ গ্রন্থকার ও লম্বা চওড়া কবিও বঙ্গ সাহিত্যে থাকিতে পারেন। বঙ্কিমবাবু হয়ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়েই কম ; কিন্তু তা, যাহাই হউন, তবু নিঃসঙ্কোচে বলিব, তিনি একটা সাহিত্যের স্রষ্টা, সংস্কারক, এবং পরিচালক—এ তিনই। প্রমাণ—অদ্যকার বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য ও উহাদের উপর বঙ্কিমের নামাঙ্কিত বঙ্কিমের হাতের স্পষ্ট পরিষ্কার ছাপ। যেদিন হইতে উহা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের উপর পড়িতে আরম্ভ হইয়াছিল, সেইদিন হইতেই উহার মূর্ত্তি ফিরিয়াছিল। সেই দিন হইতেই উহাতে, শ্রী, সৌন্দর্য্য, শক্তি ও স্ফূর্ত্তি স্বতঃপ্রবিষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

দুর্গাবাড়ীতে উদ্যোগ-পর্ব্ব

[শ্রীশ্রীপদ মুখোপাধ্যায়]

প্রথম পর্ব্ব।

কুমার কার্ত্তিকের খাস্ কামরা।

কার্ত্তিক। দেব-যক্ষ-রক্ষ-গন্ধর্ব্ব-ত্রাস তারকাসুরকে বধ করা পর্য্যন্ত চেহারাটা যে কেমন মানোয়ারী গোরার মতন হয়ে গেল, আর কিছুতে শোধরাচ্ছে না! রোজ এক সের করে সাবান মাখছি, এক ছটাক করে সাবান খাচ্ছি,—অটো-কলম, পমেটম, টিন্‌চার আইডিন্, ল্যাভেণ্ডার, বেলেডোনা, বেলেস্তারা কিছুই মাখতে, খেতে, পুল্‌টিস্ দিতে কসুর কচ্ছি নে, কিন্তু কিছুতেই চেহারাটা মামার বাড়ীর দেশের পছন্দ-সই ক'রে তুলতে পারছি নে! রবি মামার কাব্য, শরৎ মামার নভেল যেখানে যত ছিল, সবই ত পড়ে ফেললাম, কিন্তু কিছুতেই চেহারায় ত সেই নরম নরম মেয়েলি ভাবটা দেখা দিচ্ছে না। প্রতি উইক-এণ্ডে ভাদুরী মামার থিয়েটারে কলার অভিনয় দেখছি, রোজ কলা-ভাতে খাচ্ছি, কলা পুড়িয়ে খাচ্ছি, পাওনাদারদের কলা দেখাচ্ছি, তবুও কলা-সুলভ আকার কিছুতেই এই কেঠো গায়ে বিস্ফুরিত হোচ্ছে না।

সেমিজ, পাঞ্জাবী, ব্লাউজ, বডিজ, লপেটা, পাম্প, চশমা, ছড়ি —এ সব ত পয়সা হোলেই যোগাড় হয়, যোগাড়ও হয়েছে, কিন্তু সেই মিহি সুর, মিহি হাসি, এলায়িত ভাব, চাঁচর-চিকুর কেশ, নটবর বেশ—এ সব ত আর পয়সায় মেলে না। তাই কি কৈলাসে একটা ভাল নাপ্‌তে পাবার যো আছে— বাবার ত চুল ছাটবার দরকার হয় না, গণেশ দাদার ত চুলই নেই। আর আমিই বা চেষ্টা-বেষ্টা করে চেঁচে-ছুলে সভ্য হোলে কি হবে? বাবার যে সভ্য ভব্য চেহারা—ওই বাবার ছেলে বলে পরিচয় দিতে গেলেই, আমার চেহারায় হাজার আর্ট থাকলেও সব মাটি হোয়ে যাবে। দাদারও কি চেহারাটা পরিচয় দেবার মত? ভাগ্যে বোন দুটো একটু মানুষের মত আছে, তাই মামার বাড়ীর লোকের কাছে মুখ পাই।

[সিগারেট ধরাইলেন]

হ্যালো সিষ্টার ডিয়ার! এই যে তোমাদের নাম কর্ত্তেই এসে উপস্থিত!

[লক্ষ্মী, সরস্বতীর প্রবেশ. কার্ত্তিক ভগ্নীদ্বয়ের দাড়ী ধরিয়া আদর করিলেন ও উভয়কে সিগারেট "অফার" করিলেন]

সরস্বতী। ছিঃ কার্ত্তিক—তোমার এতদূর উন্নতি হয়েছে? বোনদের দাড়ী ধরে সম্ভাষণ? নিজে সিগারেট ধরেছ—উত্তম; তার ওপর আবার আমাদের সিগারেট দিতে এস, কোন্ সাহসে?

কার্ত্তিক। ছোটদি' ডিয়ার, এ কটা দিন কিছু দোষ ধরো না ভাই। মামার বাড়ী রওনা হবার আগে, আমি সেখানকার চল্‌তি চাল চলনের মতনমত রিহার্সাল দিয়ে নিচ্ছি। সেখানকার কায়দা কানুন এতদিন ধরে রীতিমত "ষ্টাডি" করেছি। সেখানে এখন ভাই, সুন্দরী বোন হোলে তার দাড়ী ধরে আদর করে, বাড় বা গালে টুস্কি দেয়। তোমাদের মত বিউটিফুল সিষ্টার সেখানকার ব্রাদারদের একটা গৌরবের জিনিস. পাঁচজনকে দেখাবার মত সামগ্রী! আর সিগারেট—সেটা এখন মামুলালয়ে প্রত্যেক সভ্য মেয়েই খেয়ে থাকে।

[লক্ষ্মী ইতিমধ্যে কার্ত্তিক-দত্ত সিগারেট ধরাইয়া নাক দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন]

কার্ত্তিক। Well done বড়দি' ডিয়ার! Three cheers for your masculine gendership! তিন্ ফুর্ত্তি তোমার পুংলিঙ্গ জাহাজ!

সরস্বতী। চুপ্, কার্ত্তিক চুপ্! অমন করে আমার কাছে বিদ্যের পরিচয় দিও না। আর, তুমিও অবাক করেছ দিদি,—দিব্বি নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়চো তো?

লক্ষ্মী। সরি, তুই হাজার মুখরা হোলেও, তুই আমার ছোট! আমি বাঙ্গালাদেশে যাচ্চি—আমি এখন আর সেই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী নই। সে লক্ষ্মী অনেকদিন থেকে বাঙ্গালা দেশে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন। সে লক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্যাচায় চড়ে এখন মার্কিন মুল্লুকে পুজো নিচ্চেন। আমি এখন অলক্ষ্মী, আমার বাহন এখন কাল প্যাঁচা। তাই বাঙ্গালা দেশের এই অলক্ষ্মীর মুখে সিগারেট, তাই তার নাক দিয়ে এখন প্রলয়ের ধোঁয়া বেরুচ্চে! বুঝলি?

সরস্বতী। বাঙ্গালার তা হ'লে নিতান্তই পোড়াকপাল। আমার বিদ্যাও সেখানে এখন অবিদ্যারূপে প্রকট হয়েছেন! হায়! চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, বঙ্কিম সেবিত বাঙ্গালা!

কার্ত্তিক। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলো না দিদি। তোমার ওঁদের বিদ্যাই ছিল অবিদ্যা। আর এখন যা বাঙ্গালায় প্রকট, —তুমি যাকে অবিদ্যা বলচ—সেই অবিদ্যাই হোলো যথার্থ বিদ্যা। রবিমামা এই বিদ্যের জোরে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, হিণ্ডেনবার্গের যুবতী কন্যার হাত থেকে গলায় মালা পেয়েছেন—নরওয়ের রাজার সঙ্গে চা খেতে পেয়েছেন —ইটালীর মুসলিনির প্রাসাদে আতিথ্য লাভ করেছেন—তা খবর রেখেচ?

সরস্বতী। রেখেচি বইকি ভাই! আসল বিদ্যায় এতটা হয় না জানি। আমার সুসন্তান হেমচন্দ্রের কথাগুলো মনে আছে বৈকি?

সেই—

হায় মা ভারতি, কি কুখ্যাতি তোর
চিরদিন রবে ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদযুগল
সেই যে দরিদ্র হবে!

তা সত্যি আমি যার কাছে থাকি, দিদি—হাজার হোক সতীন ত—তার কাছ থেকে তফাতে থাকবেন বৈকি ?

কার্ত্তিক। কিন্তু দিদি আমি এই একালের বিস্তেই চাই, দিব্বি কলা-কলা ভাব—বেশ!

সরস্বতী। সেটা ত তোমার চেহারাতে ইতিমধ্যেই ফুটে বেরুচ্চে।

কার্ত্তিক। বেরুচ্চে - বেরুচ্চে নাকি ? সত্যি ?

সরস্বতী। সত্যি নয় ত মিথ্যে ? কিন্তু এবার বাঙ্গালায় যে হিঁদু মোচলমানের লড়াই, তাতে এই মেয়েলী চেহারা নিয়ে—মা বোনদের ইজ্জৎ বাঁচিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনবে কি করে ? দেবসেনাপতির এই চেহারা! ছি: ছি: কার্ত্তিক —এই মেনীমুখো চেহারা তুমি ইচ্ছে করে তোয়ের করছ,— তোমার লজ্জা করে না ?

কার্ত্তিক। কিছু ভয় নেই দিদি,--কিছু ভয় নেই! মোচলমানরা বড় ভাল লোক তারা আমার এই butter-fly গোঁফ আর ফ্রেঞ্চকাট দাড়ী দেখেই অবাক্ হোয়ে যাবে —কিছু বলবে না।

সরস্বতী। দিদি, তুমি বস—আমার এখানকার হাওয়া বড় গরম বোধ হচ্চে। আমি চললুম—মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

[সরস্বতীর প্রস্থান]

কার্ত্তিক। বড়দি'— আর একটা সিগারেট খাবে ? চুপ করে রয়েছ যে ? আদার নারাণের জন্যে বুঝি মন কেমন কচ্চে ?

লক্ষ্মী। থ্যাঙ্ক য়ু—ডিয়ার বয়!

কার্ত্তিক। দিদি—এবার কিন্তু আমায় হাজার দশেক টাকা দিতে হবে মামার বাড়ী খরচ কর্ব্ব।

লক্ষ্মী। আচ্ছা সে হবে এখন—এখন চল একবার গণেশদা'র সঙ্গে দেখা করে আসি।

কার্ত্তিক। বেশ চলো।

(লক্ষ্মী ও কার্ত্তিকের প্রস্থান)

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

গণেশের অন্দর মহল।

(গণেশ কলাবৌয়ের ঘোমটা খুলিয়া দিতে ব্যস্ত)

গণেশ। বলি ও ভাই কলাবৌ, একবার বদনখানি খোল না ভাই ?

কলাবৌ। যাও—

গণেশ। আচ্ছা ভাই, তুমি কি চিরদিনই লজ্জাবতী লতাটির মত থাকবে। বাঙ্গালা দেশে যাওয়া যাচ্চে—সে দেশটাতেও এখন যে রকম ভয়ঙ্কর নারী জাগরণ আরম্ভ হয়েছে, তাতে তোমাকে এই একহাত ঘোমটা দিয়ে আমি আর কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবো না বলছি। লক্ষ্মীটি এস ?

কলাবৌ। কি কর—যাও!

গণেশ। আহা কি চমৎকার দেশ—সেই বাঙ্গালা। সেখানকার কবি একবার কি গেয়েছিল জান—

"একদিন দ্বিপ্রহরে, দেখিলাম সরোবরে
কমলিনী বাঁধিয়াছে করী।"

ভারতচন্দ্রের "বিদ্যা" তোমার মত কমলিনী হোলেও, "সুন্দর" ত আর আমার মত সত্যিকারের "করী" ছিলেন না। এস দেখি, তোমার এমন হস্তী-ভাতার হাজির রয়েছে, ভারতচন্দ্রের মতে একবার সেটিকে বেঁধে ফেল দেখি!

[গণেশ কলাবৌয়ের কণ্ঠদেশ শুণ্ডের দ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন]

কলাবৌ। ছাড়—ছাড় - ওই কে আসছে—এখুনি তোমার কেলেঙ্কারী দেখে ফেলবে...

[লক্ষ্মী ও কার্ত্তিকের প্রবেশ]

লক্ষ্মী। বাঃ বাঃ গণেশ দাদা—তোমার ভেতরও এত— ওমা আমি বলি দাদাটি আমার গোবর গণেশ—কিছুই জানেন না।

কার্ত্তিক। আর তুমি—তুমি কি পাথরের বৌঠান— দাদার এতটা কবিত্বে respond করলে না—সাড়া দিলে না ?

গণেশ। আর বলিস্ নে ভাই কার্ত্তিক—ইনি কি আর

বাঙ্গালা দেশের "দিবাকরের" বৌঠান "কিরণময়ী" ? জানিস ত বাঙ্গালাতে এখন কি রকম নারী জাগরণ সুরু হয়েছে। এ সময় তোমার বৌঠানটিকে একটি কাপড়ের পুঁটুলী সাজিয়ে নিয়ে যাই কি করে, বল ত ?

লক্ষ্মী। তা সত্যি বৌদিদি—তোমার যত বয়স হচ্ছে ততই তোমার ঘোমটার ওসার বেড়ে চলেছে! তুমি ত এখন আর বিয়ের কনেটি নও।

কার্ত্তিক। না বৌদি—ও সব করো না। আমি তোমাকে এবার এমন টাইট্‌-ফিট্‌ ব্লাউজ-টাউজ পরিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাবো যে মামার বাড়ীর লোকেরা তোমাকে সেকেলে কলা-বৌ বলে আর একদম্‌ চিনতেই পার্ব্বে না। কি বলো দাদা, তোমার কি মত ?

গণেশ। আমারও ঐ মত রে ভাই—আমারও ওই মত। শেষে যে বাঙ্গালী বাঙ্গালীনীরা আমাদের up-to-date নয় দেখে ঠাট্টা করবে—সেটা কিন্তু বরদাস্ত হবে না ? আমিও এবার হ্যাট-কোট-পেণ্ট্‌ লেন পরে যাবো মনে কচ্চি—তাতে একটা সুবিধা এই হবে যে আমার মাথার বর্ব্বরতাটা অনেকটা ঢাকা পড়ে যাবে।

কার্ত্তিক। A capital idea দাদা গণেশ। তোমার ও বৌদিদির পোষাক-আষাকের সমস্ত বন্দোবস্ত আমি ঠিক করে দিচ্ছি। এখনই র‍্যান্‌কেনের বাড়ী রিং কচ্চি—কুচ্‌ পরোয়া নেই।

লক্ষ্মী। কার্ত্তিক, এর জন্যে তোমার যা টাকার দরকার আমি দিতে প্রস্তুত আছি।

কার্ত্তিক। এমন নইলে দিদি। সাধে কি আর বাঙ্গালী বেজয়া "আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্তং—" সকল নারীকেই "ভগ্নী" বলে। আচ্ছা, দাদা তোমার আর সব ঠিক করে নাও, এই-বেলা।

গণেশ। আর ঠিক কি ভাই—বাকি মনখানেক সিদ্ধি, তা সে জিনিসটা আমার ঠিক করাই আছে। ওগো কলা-বৌ—কার্ত্তিককে এক কাপ চা করে দাও না ? লক্ষ্মী চা খাবি—না, সিদ্ধির সরবৎ খাবি ?

লক্ষ্মী। সরবৎ এখন থাক্‌—চা-ই বরং এখন এক-কাপ দাও বৌদি।

[কলা-বৌয়ের "চা" প্রস্তুত করিতে প্রস্থান ও মূষিক রাজের প্রবেশ]

মূষিক। বলি কর্ত্তা—তোমাদের ত বেশ রওনা হবার শলা কলা চলছে। আমার কিন্তু এবার একজোড়া নতুন দাঁত বাঁধিয়ে দিতে হবে ?

গণেশ। কেন, তোমার দাঁতে আবার কি হোলো হে ?

মূষিক। আজ্ঞে কর্ত্তা—এ পুরোণো দাঁতে আর চলছে না। বাঙ্গালী বাবুদের অন্তরে ঢুকে অষ্টপহর "কুরুর কুরুর" করে কাজ চালাতে হবে যে ? আপনি কর্ত্তা নিজে বেদ-ব্যাসের কেরাণী—বাঙ্গালীদেরও খুব মস্ত মস্ত "কেরাণী" ক'রে তুলেচেন। আমি ক্রুর, খল, কুটিল ইঁদুর—আমিও এখন প্রতিনিয়ত বাঙ্গালীকে আমার মত করে তুলচি। বাঙ্গালীরা তাদের "পত্তপাঠে" যেমন আমাকে এককালে গাল দিয়েছিল—তার তেমনি প্রতিশোধ নেবো।

গণেশ। আচ্ছা—আচ্ছা বিশ্বকর্ম্মাকে বলে এক-জোড়া মনের মতন করে দাঁত গড়িয়ে নাও গে। দাঁত বাঁধান'র billটা এর পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলো, বুঝলে ?

মূষিক। হেঁ—হেঁ—তা আর বুঝিনি কর্ত্তা! হুজুর আমাদের বড্ড ভাল লোক গো।

[হাসিতে হাসিতে মূষিকের প্রস্থান]

গণেশ। এস লক্ষ্মী, এস কার্ত্তিক—কলাবৌ ঐ পাশের ঘরে চা দিয়েছে। চল বসিবে চল।

[গণেশ, লক্ষ্মী ও কার্ত্তিকের প্রস্থান]

—

তৃতীয় পর্ব্ব।

(কৈলাসপুরী—বেলতলা রোডের একাংশ)

নন্দী, ভৃঙ্গী, অসুর ও সিংহরাজ বসিয়া গল্প করিতেছিল।

সিংহ। নন্দী খুড়ো—এবার মাকে বলে কয়ে আমার একটা রেশমী ট্রাউজার করিয়ে দাও না দাদা ?

নন্দী। আবার ট্রাউজার কেন বাপ ?

সিংহ। আরে খুড়ো—বাঙ্গালা এখন সভ্য হোয়েচে।

সভ্য মেয়েরা এখন ঠাকুর দেখতে আসে, আর আমাকে "অশ্লীল" দেখে মুখ টিপে টিপে হাসে। ভারী লজ্জা করে মাইরি।

ভৃঙ্গী। তা বাপ্, সিঙ্গি, ট্রাউজার পরে ত অশ্লীলতা নিবারণ করবে—কিন্তু সেটি রেশমি চাইছ কেন ধন?

সিংহ। নাঃ ভৃঙ্গী খুড়ো, আর জ্বালিও না বাপ। রেশমী হোলে একটু বাহার খোলে, বুঝছ না খুড়ো।

অসুর। আরে রেখে দে তোর ট্রাউজার। বনের পশু আবার ল্যাঙট পরে লজ্জা নিবারণ করবে? ওরে ব্যাটা পরার কথা রেখে এখন খাওয়ার চিন্তে কর। নাঃ নন্দিদা, আমার সে দেশে যেতে ইচ্ছে নেই ভাই।

নন্দী। কেন, কেন, তোর আবার কি হোলো?

অসুর। হবে আবার কি! বাঙ্গালী বড়লোকগুলো ভারী চামার মাইরি। ভক্তি-ছেদ্দা কিছু নেই। দুটো চালকলা ফেলে দিয়ে পুজো হোয়ে গেল—রাত্তিরে দু'খানা শুক্নো লুচী। আরে মা কি আমাদের রাঁড় যে, হবিষ্যি করবেন চাল কলা দিয়ে?

ভৃঙ্গী। তুমি আবার চাও কি?

অসুর। কেন, চপ্, কাটলেট, কোর্ম্মা, ডেভিল, ফাউল, আবার কি? বাবুরা নিজে মজা করে খাবেন, আর আমাদের বেলা শুক্নো চাল। নিজেরা মদ, মেয়েমানুষ নিয়ে হল্লোড় করবেন—আর আমাদের বেলা পুরুত ঠাকুরের ঘণ্টা নাড়া আর চাকর বাকরেরা যা করে।

ভৃঙ্গী। অসুর কিনা—তোর ব্যাটা যত আসুরিক খাবারের ফর্দ্দ! তুমি কি চাও, এবার থেকে চপ, কাট-লেটের নৈবিদ্যি হবে?

অসুর। আলবৎ! ঠাকরুণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কলা-বৌ সকলেই ত সধবা মানুষ—তাতে দোষ কি? তাঁরা না খান্ —আমরা ত আছি।

নন্দী। তুমি বাপু মোষের মুড়ী খাও—তাতেও হয় না?

অসুর। কোথায় মোষের মুড়ী? বাবুরা যে বলিদান বন্ধ করে দিচ্চেন। বাবুরা বলি খেতে ভালবাসেন, বলিদানের রক্ত দেখতে পারেন না—মূর্চ্ছো যান। গরীবের বুকের রক্ত চুসে খান—কিন্তু বলিদানের রক্ত বাপ্ রে!

ভৃঙ্গী। এইটে বেশ বলেছিস ভাই অসুর—ঠিক।

নন্দী। তা মিছে আর ঝগড়া করে কি হবে? যেতেই ত হবে। সে এখন চল, বেলা হলো। কর্ত্তার আজ আবার ইন্‌জেক্সনের দিন।

অসুর। ইনজেক্সন্ কি খুড়ো?

নন্দী। আরে তা বুঝি জানিস নে। কর্ত্তার এখন আর ভাং খেয়ে নেশা হয় না। সপ্তাহে দু'দিন কোলকাতা থেকে নীলরতনবাবু এসে সিদ্ধি ইনজেক্ট করে ফুঁড়ে দিয়ে যান।

অসুর। ও বাবা এমন! চড়কের সময় সন্ন্যাসীরাই ত ফুঁড়তো? এখন আবার ডাক্তারে ফোঁড়ে। কর্ত্তাও দেখছি একেবারে আবগারীর ধর্ম্ম অবতার!

নন্দী। হ্যাঁ হ্যাঁ, চল, বেলা হোলো। যাওয়া যাক্ দুগগো বাড়ীর দিকে।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ পর্ব্ব।

কৈলাসপুরী।

মহাদেব অর্দ্ধশায়িত ভাবে সিদ্ধির ঝোঁকে ঝিমাইতেছেন।

[কার্ত্তিক ও দুইজন সাহেব প্রবেশ করিলেন]

কার্ত্তিক। বাবা, ঘুমুচ্ছ নাকি?

মহাদেব। কে ও, নীলরতনবাবু! বলিহারী তোমার হাত যশ বাবা। চিরজীবি হোয়ে বেঁচে থাক—তোমার বেক্ষ ধর্ম্মে অচলা মতি থাকুক—তোমার চামড়ার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হোক্—তুমি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর হও। নেশাটা বড় মসগুল হোয়ে এসেছে—রেক্টাম্ দিয়ে ইন্‌জেক্সান, বড় সামান্যি নয়—বেশ কাজ দিয়েচে।

কার্ত্তিক। বাবা একটু সভ্য হও—কি বাজে বক্‌চো?

মহাদেব। ওঃ তাই বলি;—মাষ্টার কার্ত্তিক? কি মনে করে বাবাজি?

কার্ত্তিক। আমি এই দু'জন সাহেব মিস্ত্রী এনেচি—এরা তোমার গায়ের, পায়ের মাপ নেবে। তোমাকে এবার সভ্য ভব্য বেশে বাঙ্গালা দেশে যেতে হবে। তোমার যাবার এখনও ত তিন চারদিন দেরী আছে, এরা তারই মধ্যে

তোমার একসুট পোষাক, একজোড়া জুতো বানিয়ে দেবে। ওঠো, মাগ দাও।

[মহাদেব আলুথালু ভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন]

একজন সাহেব। What a sight !

অপর সাহেব। Ghastly iudeed !

প্রথমোক্ত সাহেব। Almost Naked ! Horrible, Horrible।

মহাদেব। কে বাবা বকেয়া আওয়াজ দিচ্ছ ? রাধিকা বাবুর বিপরীত সংস্করণ নাকি ?

সাহেবদ্বয়। Don't mind master Kartick, we are off. It is simple provoking !

[সাহেবদ্বয় বেগে প্রস্থান করিলেন]

কার্ত্তিক। Old fool কোথাকার। আমাকে এমনি ক'রে অপমান করালে। দুত্তোর ছাই, চুলোয় যাক্—

[কার্ত্তিক গট গট করিয়া চলিয়া গেলেন]

সরস্বতী। (অপর দিক দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে) এই যে বাবা, তোমার নাক ডাকচে ? বাবা, ও বাবা ?

মহাদেব। কে সরস্বতী ? কখন এলে মা ?

সরস্বতী। আচ্ছা বাবা, তুমি কি কেবলই ঘুমুবে ? মা দক্ষালয়ে তোমার নিন্দা শুনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন আর তুমি মর্ত্ত্যধামে সতী-নিন্দা শুনে বেশ নিশ্চিন্ত রয়েছ ত ? মা আমাদের সতীকুলরাণী, সতীর নিন্দাও যা, মায়ের নিন্দাও ত তাই।

মহাদেব। ও তুই বাঙ্গালা দেশের কথা বলচিস। সেখানে সতীর সতীত্বটাকে কুসংস্কার বলচে, এই ত ?

সরস্বতী। হ্যাঁ বাবা ?

মহাদেব। আচ্ছা সরস্বতী। দক্ষালয়ে সতীর প্রাণ-ত্যাগে একটি দক্ষের ছাগ-মুণ্ড হয়েছিল জানিস ত ? কিন্তু তুই যদি কিছু দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখিস, তা হোলে দেখবি, বাঙ্গালায় সমস্ত সতী-নিন্দাকারীদের ঘাড়ে আমি ছাগমুণ্ড বসিয়ে দিয়েছি। তারা নরাকারে সবাই ছাগল—তাদের ঘরে ঘরে ছাগলের মত আচার – ছাগলের মত ব্যবহার।

সরস্বতী। তা হোলে বাবা, তুমি ঘুমিয়ে নেই ?

মহাদেব। তা কি পারি মা—সতীর সতীত্ব যে আমার পরম সাধনার সামগ্রী।

[মা দুর্গার প্রবেশ]

দুর্গা। তা হোলে আসি ভোলানাথ। বৎসরান্তে শুধু এই তিনটি দিন—

মহাদেব। যাবে যাও—না বলতে পারবো না। কিন্তু পার্ব্বতি, গিয়ে কি এখন আর সে সুখ পাবে ?

দুর্গা। তা জানি ঠাকুর—সে সুখ পাই না, সে সুখ আর পাবো না। কিন্তু স্নেহের টান—অনেক দিনের অভ্যেস ! বাঙ্গালার "আগমনী" গান আমার কাণে এসে পৌঁছুলে কি জানি কেন, আমি আর স্থির থাকতে পারি নে।

সরস্বতী। সত্যি মা সত্যি ! আমার রামপ্রসাদ আমার দাশরথি, আমার হরু ঠাকুর, আমার রাম বসু, আমার গিরিশ এরা সত্যিই যে যেখানে যত মা মেয়ে আছে, সব্বাইকে এই সময়টা কেঁপিয়ে দেয়।

দুর্গা। জানি ঠাকুর, কেউ আর বড় আমাকে তেমনি করে ডাকে না। চণ্ডীপাঠ করে না, করতে জানে না। পুরোহিত অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করে, জাগায় না—আমাকে জাগাতে পারে না। আমার পুজো এখন তাদের কাছে বিলাস-ব্যসনের নামান্তর মাত্র হোয়ে দাঁড়িয়েচে। কিন্তু তবু, তবুও যাই, কেন জানেন ? এখনও—এখনও বাঙ্গালার কুটীরে, কান্তারে এমন এক আধজন আছে—যারা সত্যিই এখনও আমায় তেমনি করে ডাকে—আমি তাদের ডাক উপেক্ষা করতে পারি নে—তাদেরই জন্যে যাই—তাদেরই জন্যে যাবো। ভোলানাথ বিদায় দাও - শুধু তিনটি দিন—তিনটি দিন—

মহাদেব। আচ্ছা, এস—আমিও নন্দী ভৃঙ্গীদের নিয়ে নবমীর নিশিতে তোমাদের আনবার জন্যে যাত্রা করবো।

দুর্গা। চল্ সরস্বতী, সকলকে ডেকে নিয়ে এখন আমরা দুর্গা দুর্গা বলে যাত্রার আয়োজন করি।

সরস্বতী। তুমিও মা "দুর্গা-দুর্গা" বলে যাত্রা কর্ব্বে।

দুর্গা। হ্যাঁ মা,—আমিও যে ওই নামের বশ !

দুর্গা—দুর্গা—দুর্গা !

রসগোল্লা চুরি

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)
(৮)

(৯)

(১০)

(১১)

(১২)

স্মৃতি ।
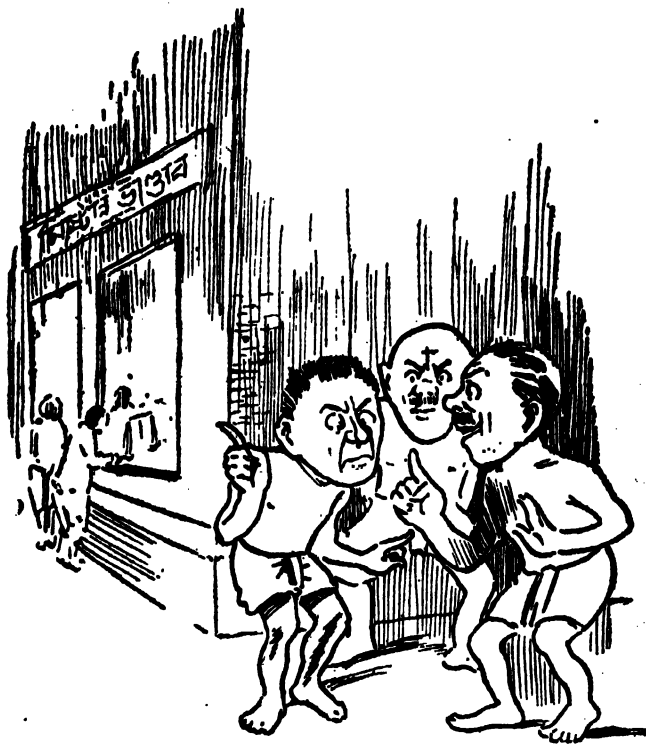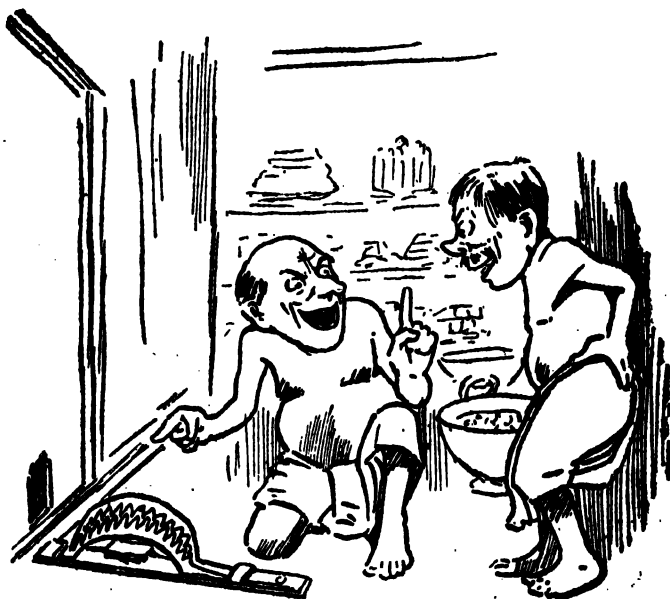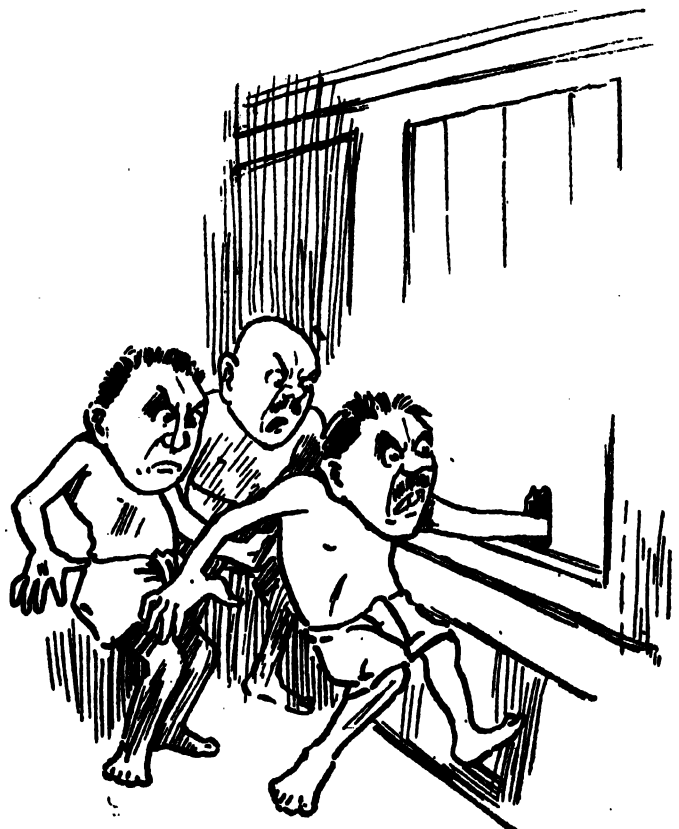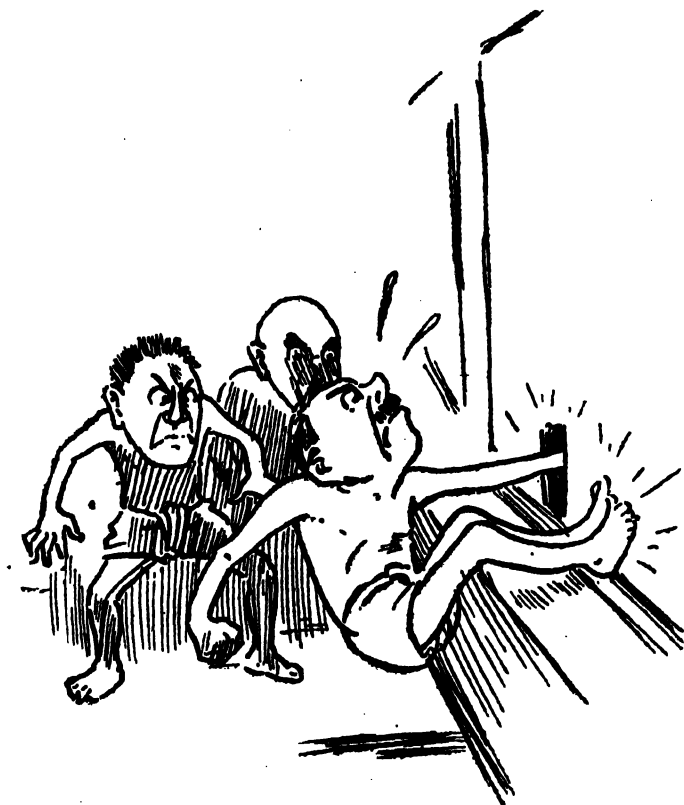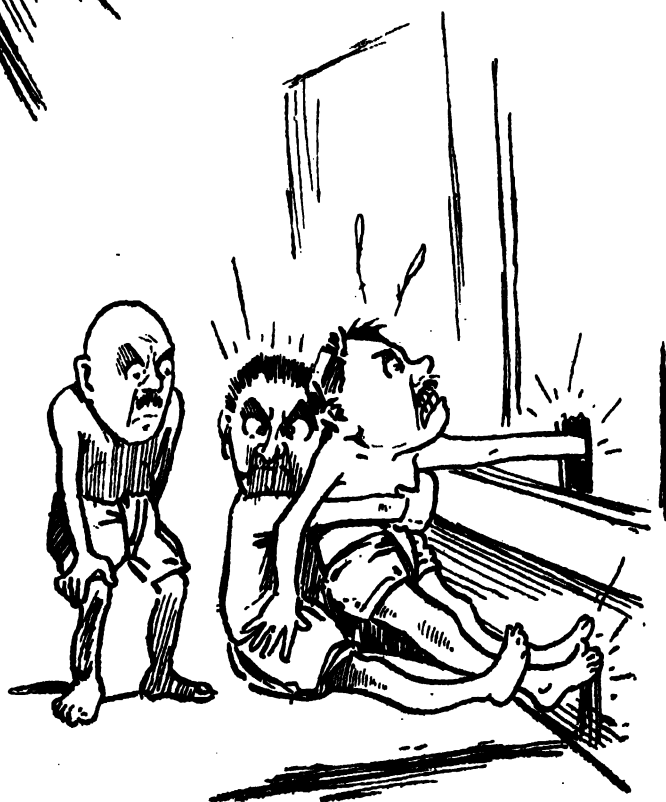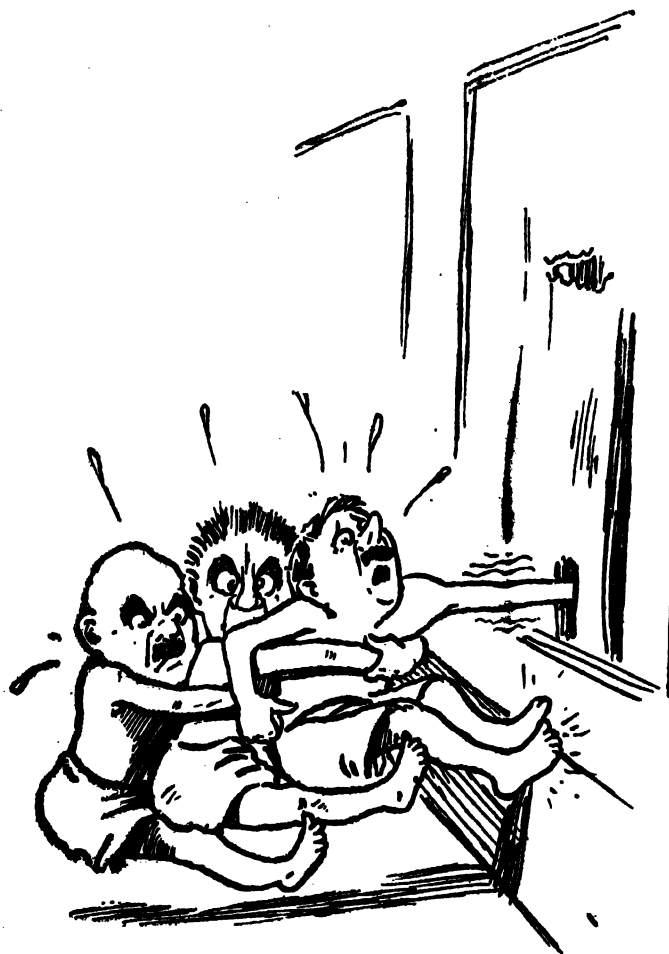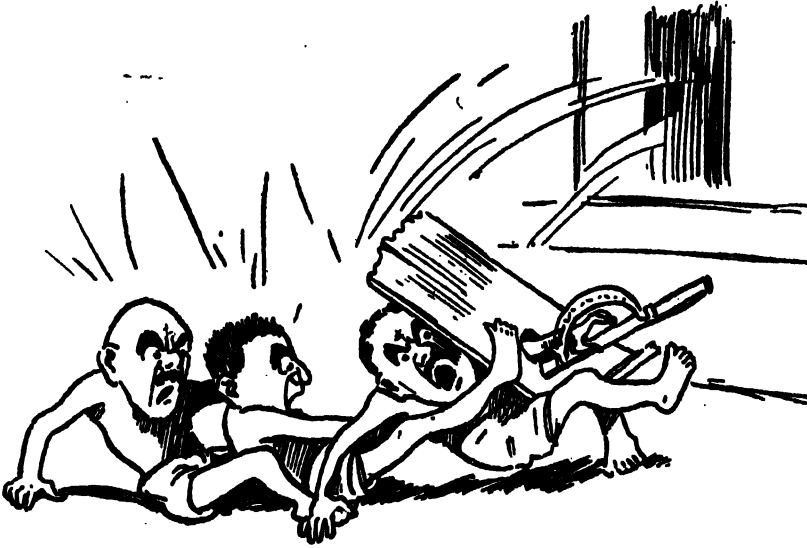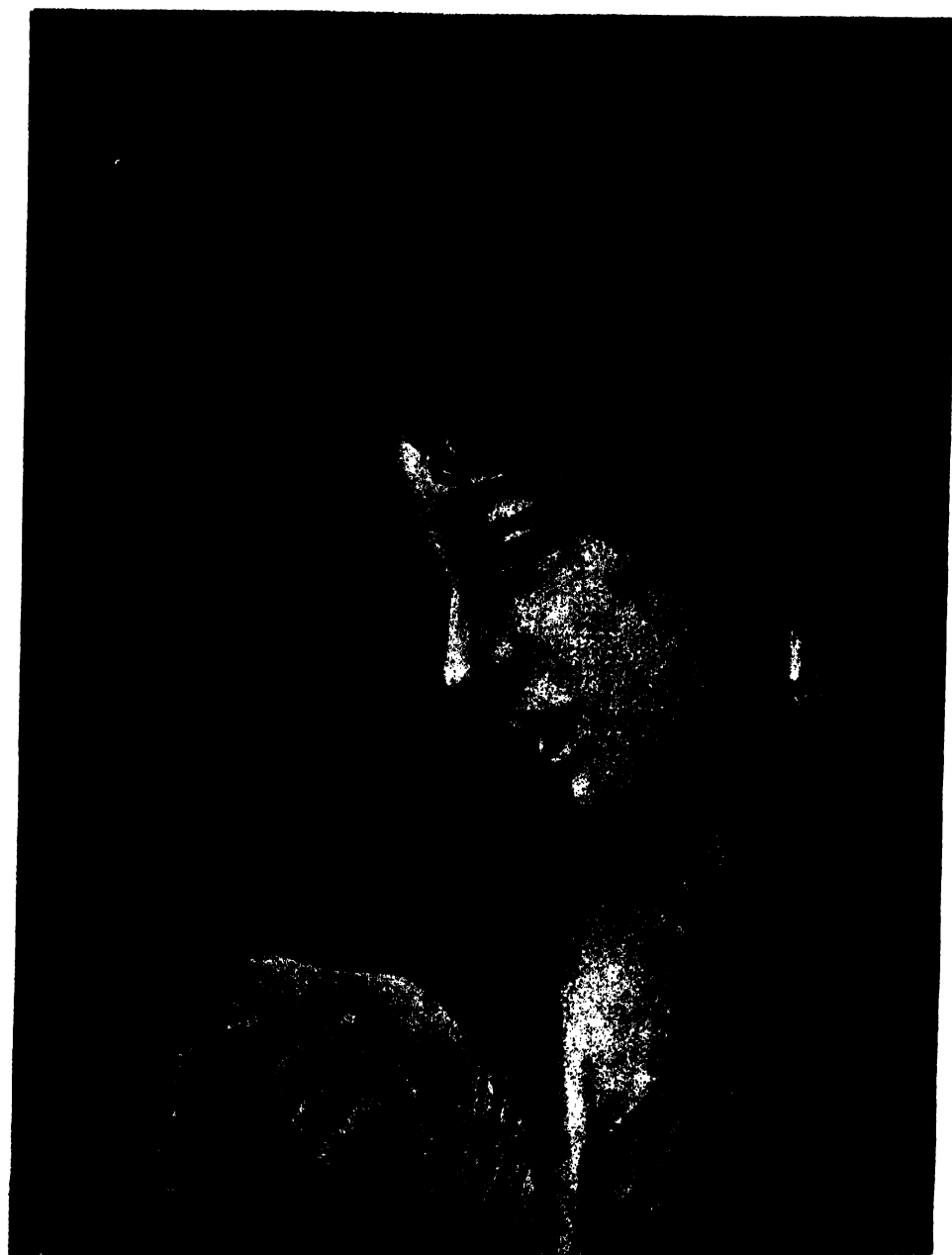
শিল্পী—শ্রীসত্যচরণ সেন ।

স্ত্রী না পুতুল?

(বড় গল্প)

[শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার এম-এ, ভাগবতরত্ন]

(১)

বিবাহের পরদিন সুজাতা শ্বশুর বাড়ী আসিল। ষ্টেশন হইতে বাড়ী আসিবার পথে শোভাযাত্রার কোন হাঙ্গামা ছিল না। সে তাহাতে বরং খুসীই হইয়াছিল। কেননা একে তাহার বয়স সতের তাহার উপর আবার স্বামীর সহিত মাথায় সে প্রায় সমান। এ অবস্থায় শোভাযাত্রায় তাহাকে অত্যন্ত বে-মানান দেখাইবে বলিয়া সে মনের মধ্যে একটা গোপন ভয় পোষণ করিতেছিল। সে জানিত পাড়াগাঁয়ে এইসকল ছোটখাট বিষয় লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপের কত তীক্ষ্ণ বানই না বর্ষিত হয়। আর তাহার সুরুচি-মার্জ্জিত শিক্ষার চোখে রূপ যৌবন লইয়া গ্রামের মধ্য দিয়া রীতিমত অভিযান করাটাও বিসদৃশ বোধ হইত।

কিন্তু শ্বশুর বাড়ী পৌঁছিয়া যখন সে দেখিল সাহানার কোন মধুর মঙ্গল রাগিনী বিবাহের মঙ্গল গীতি গাহিতেছে, ল্যজনত্র কোন উলুধ্বনি তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল না, তখন তাহার মনের মধ্যে বাঙ্গালীর মেয়ের চিরন্তন সংস্কার জাগিয়া উঠিল। কৈশোরের প্রথম উন্মেষ হইতে, অনেকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই বিবাহের যে প্রীতিস্নিগ্ধ কল্যাণ ছবিটি মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতেছিল, আজ তাহাতে কে যেন কালিমা লেপিয়া দিল। সুজাতার বক্ষ হইতে অলক্ষ্যে ছোট একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। বিবাহ বাড়ী—অথচ সেখানে আলো নাই, উৎসব নাই, শিশুদের কলহাস্য মুখরিত আনন্দ ধ্বনি নাই।

এই বিশ্রী নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া নরেন অন্যান্য বরযাত্রী বন্ধুদিগকে বলিল "ওরে তোরাই না হয় উলু টুলু দে। বাড়ীর ভিতর একজন যেয়ে শাঁখটা বাজা।" নরেনের কথায় উৎসাহিত হইয়া বন্ধুর দল বিকট বেসুরা রবে উলুধ্বনি করিয়া উঠিল। তাহাদের উল্লাস কোলাহলে বিয়ে বাড়ীর নিঝুম নিস্তব্ধতা অনেকটা বিদূরিত হইল। একজন বর্ষীয়সী মহিলা সদ্য-নিদ্রোত্থিতা হইয়া বধূকে ঘরে তুলিতে অগ্রসর হইলেন। কোলে করিয়া বধূ বরণ করিবার প্রশ্নও এ ক্ষেত্রে কাহারও মনে জাগিল না। সুজাতা ধীর মন্থর পদে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল। যে মহিলা তাহাকে বরণ করিয়া উঠাইতেছিলেন, তিনি প্রথমেই তাহাকে দেব মন্দিরের দিকে লইয়া গেলেন। সুজাতা গৃহাধিষ্ঠিত রাধাবিনোদের মন্দিরে যাইয়া মাথা নোয়াইল মাত্র। শ্রীবিগ্রহের সেবার যে এককালে বিশেষ পারিপাট্য ছিল, তাহা মন্দিরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়। শ্রীরাধাবিনোদের অঙ্গে বহু-মূল্য অলঙ্কার ঝলমল করিতেছিল। কিন্তু বিগ্রহের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে ভক্তের ঐকান্তিক সেবায়—ঐশ্বর্য্যের বিভূতির মধ্যে নহে। মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থানে স্থানে ধুলা জমিয়াছে, কোথাও বা মাকড়সায় জাল বাঁধিয়াছে। তাই বিগ্রহের মূর্ত্তি যেন মলিন এই মলিন মূর্ত্তি দেখিয়া সুজাতার মন প্রসন্ন হইল না। দেবদেবীর মূর্ত্তিকে শিশুকাল হইতেই সে কেবল শিল্পকলার নিদর্শন স্বরূপে দেখিয়া আসিয়াছে—শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া নয়ন জলের মধ্যে কোনদিন দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করার সৌভাগ্য হয় নাই।

কিন্তু তাহার স্বামী শ্রীরূপ গায়ের জামা খুলিয়া সারা দেহ লুটাইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া রাধাবিনোদকে প্রণাম করিল। বুঝিবা মনে মনে সে প্রার্থনা করিতেছিল...নারীর প্রণয় বন্ধনে সে যেন জীবনের ধ্রুবতারাকে হারাইয়া না ফেলে—তাহার সংশয় দোলায়িত চিত্তে যেন শ্যামসুন্দরের বিমল প্রেম জাগিয়া উঠে। শ্রীরূপ প্রণাম সারিয়া করজোড়ে বিল্বমঙ্গলের "কর্ণামৃত" কাব্য হইতে সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া ঠাকুরের স্তব করিল।

কাব্যের সুললিত ছন্দ শ্রীরূপের সুস্পষ্ট উচ্চারণে যেন তালে তালে নাচিয়া উঠিল। শ্রীরূপের বন্ধুবান্ধব স্তব্ধ হইয়া ভক্তি-ভরে সেই স্তব শুনিল। কিন্তু সুজাতা তখন মুখ ফিরাইয়া বাড়ীটার অবস্থা দেখিয়া লইতেছিল।

দোতালা বাড়ী—বহুদিনের প্রাচীন। একটা অংশ তাহার ধসিয়া গিয়াছে—তাহা আর কেহ সংস্কার করায় নাই। জরাগ্রস্তের শ্বেত কেশে কলপ দিবার মতন সম্মুখের একটি ঘরে চুণকাম করা হইয়াছে। সেই ঘরটার তুলনায় বাড়ীর অন্যান্য অংশ আরও ম্লান ও বিষাদাচ্ছন্ন দেখাইতেছিল। শোকের একটা ঘন যবনিকা যেন বাড়ীটাকে ঘিরিয়াছিল।

শ্রীরূপের বিধবা মাতা গ্রামের এই বাড়ীখানিতে থাকিয়া রাধাবিনোদের সেবা করিতেন। তাঁহার ভক্তিপূত সেবাতে শ্রীবিগ্রহ যেন আনন্দে ঝলমল করিত। তিনি সংস্কৃত ভক্তি শাস্ত্রে বিদুষী ছিলেন। নিজে শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া পাঠ করিতেন—পাড়ার মেয়েরা সন্ধ্যার পর সমবেত হইয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। একটি স্নিগ্ধ, পবিত্র, শান্ত ভাব তখন বাড়ীতে বিরাজ করিত। আজ দুইমাস হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

তিনি পাঁচ বৎসরের একটি শিশু পুত্রকে রাখিয়া গিয়াছেন। এই দুইমাস শ্রীরূপ তাহাকে বুকে বুকে করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু আর তাহার বাড়ীতে বসিয়া থাকিলে চলে না। সে দর্শন শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া একখানা বাঙ্গলা সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কাজ করে। দেশের ও মাতৃভাষার সেবা করিবে বলিয়া সে আর অন্য কোন চাকুরীর চেষ্টা করে নাই। মাতার মৃত্যুর পর সে আড়াই মাসের ছুটী লইয়া বাড়ীতে আসিয়াছিল। খোকাকে মানুষ করিবার জন্য একজন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন। তাহার এমন কোন ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজন ছিল না, যাহাদের নিকট খোকাকে সে রাখিয়া দিতে পারে। আর যাহারা ছিল তাহাদের নিকটে খোকাকে রাখিতেও তাহার মন সরিতেছিল না। তাই বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে সে বিবাহ করিল।

এ বিবাহে তাহার আগ্রহ বা অনিচ্ছা বিশেষ কিছুই ছিল না। বাড়ীতে একজন স্ত্রীলোকের প্রয়োজন, তাই সে বিবাহ করিতেছিল। কাহাকে বিবাহ করিতেছি, তাহার সঙ্গ পাইয়া সে আনন্দ পাইবে কি না, কোন নারীর অভাব অভিযোগ পূর্ণ করিতে সে পারিবে কি না, তাহা সে একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। শোকের প্রবল আঘাতে তাহার মন এমনই মুষড়াইয়া গিয়াছিল যে সে এখনও সামলাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই সে এ বিষয়ে একরকম উদাসীনই ছিল। কেবলমাত্র বন্ধু নরেনকে বলিয়াছিল যে মেয়েটী যেন কচি খুকী না হয়—কেননা তাহা হইলে সে বিবাহের পরই সংসার করিতে আসিতে পারিবে না। আর মেয়েটীর বাপের যেন অন্ততঃ এমন অবস্থাও হয় যে সে নিজে দু' চারিমাস অসুস্থ হইয়া পড়িয়া থাকিলে যেন স্ত্রী বাপের বাড়ী যাইয়া দুইটী খাইতে পায়। ইহার বেশী সে আর কিছুই চাহে নাই। কিন্তু নরেন তাহার জন্য সুন্দরী সুশিক্ষিতা সুজাতাকে স্থির করিয়া আসিয়া বলিল "একটিবার মেয়েটীকে দেখে আসি না চল ?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল—"দেখ নরেন ! আমি তো সৌন্দর্য্যের সরোবরে হাবুডুবু খাবার জন্যে বিয়ে করছি না, যে যাচাই করে অপ্সরা নিয়ে আসতে হবে। কোনরকমে সংসারের কাজ চলে গেলেই হ'লো।"

নরেন বলিল—"সংসারে কাজটাই তো সব নয়—কাজ তো শুধু অবকাশকে পাবার জন্যে। সেই অবকাশের মধু-ক্ষণের জন্য আনন্দের সম্ভার সংগ্রহ করতে হবে তো ?"

শ্রীরূপ। "কবিত্ব করে কথাটা বেশ বললে, কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ কোন লজিক্ আছে বলে তো মনে হয় না। প্রথমতঃ কাজ আমরা অবকাশকে পাবার জন্য করি না—অবকাশ হইল কাজে নূতন শক্তি পাবার জন্য। আর ঘরে ভাত না থাকলে সৌন্দর্য্য দেখে তো আর পেটের ক্ষুধা মিটবে না ?"

নরেন। "পেটের ক্ষুধা না মিটলেও চোখের ক্ষুধা নিশ্চয়ই মিটবে। কর্ম্মক্লান্ত দিবসের পর ঘরে এসে যদি একটি জীবন্ত গোলাপ দেখতে পাওয়া যায়, তবে দুঃখ-দৈন্যের অর্দ্ধেক ভার লাঘব হয় কি না বল তো ?"

শ্রীরূপ। তোমার কথা মেনে নিলেও একটী ফুটন্ত গোলাপকে দুঃখ-দৈন্যের ক্লেদের ভিতর আনবার আমাদের

কি অধিকার আছে ? আমি নিজে নামে শ্রীরূপ হলেও দেখতে বিশ্রী রূপ, তখন কোন অধিকার নিয়ে আমি এক নারীর সৌন্দর্য্য যাচাই করতে যাব ?"

নরেন। "অধিকারের কথা যদি বল, তবে তুমি পুরুষ এই তোমার শ্রেষ্ঠ অধিকার। তুমি তার ভরণপোষণের ভার নিচ্ছ, এই অধিকারে তোমার যাচাই করবার ক্ষমতা আছে। লোকে গরু, ভেড়া কিনতে হলেও দেখে পরীক্ষা করে নেয়, আর তুমি একটি সজীব মানুষকে ঘরে আনবে— তাকে একেবারে না দেখে ?

শ্রীরূপ উত্তেজিত হইয়া নরেনের হাত চাপিয়া ধরিল, "থাম থাম বলছি।" আমি গরু, ভেড়া ঘরে আনব না বলেই, দেখার কোন প্রয়োজন বোধ করছি না। আমার এই কুৎসিৎ দেহটাকে যদি তার অপছন্দ করবার স্বাধীনতা দেওয়া হতো, তা হ'লে হয়তো সমানে সমানে দাঁড়িয়ে একবার দেখে আসা যেতো। কিন্তু আমি পুরুষ হয়ে জন্মেছি বলেই অমন অন্যায্য সুবিধা নেবো না।"

তথাপি নরেন বলিল, "দেখো ভাই রূপ! আগে বাপ মায়ে ছোট ছোট ছেলেদের বিয়ে দিতেন—কাজেই ছেলেদের পছন্দ বলে কোন জিনিষ ছিল না। কিন্তু এখন তো আর তা হতে পারে না—বিশেষতঃ তোমার আত্মীয় অভিভাবক কেহ নাই। তাই আমার দায়ীত্বটা কমাবার জন্যও তোমার একবার দেখে আসা উচিত।"

শ্রীরূপ। "কেন যে উচিত তা তো তুমি এতক্ষণেও বুঝিয়ে উঠতে পারলে না। আমার স্ত্রী দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন, তা যে কোন সদ্বংশের মেয়ে সম্পন্ন করতে পারবে।"

নরেন। "কিন্তু ভাল লোকের মেয়েই এর একমাত্র সার্টিফিকেট নয়। মেয়েটি যেমন লেখাপড়ায়, তেমনি সংসারের কাজকর্ম্মে। তবে একটা বিষয়ে তোমার সঙ্গে বড় অমিল হবে দেখচি। তার বাবা নাস্তিক—সেও শুনেচি দেবদেবী বড় একটা মানে না।"

শ্রীরূপ। "বেশ তো—তার সঙ্গে আমার একটা শক্তি পরীক্ষা হবে তা হ'লে। যদি ঘরের বউকে ধর্ম্মবিশ্বাসী করে তুলতে না পারি, তবে দেশের লোকে আমার কথা শুনে ভক্ত হয়ে উঠবে কেমন করে ?"

এইরূপ ঔদাসীন্য ও অহংকারের মধ্যে শ্রীরূপ সুজাতাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে।

যে মহিলাটি অভিভাবিকা স্বরূপে সুজাতাকে বরণ করিয়া আনিতেছিলেন, তিনি এক দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া। রাত্রি তখন গভীর হইয়াছিল—তাই তিনি বর বধূর আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিতে থাকিতে তন্দ্রাভিভূতা হইয়াছিলেন। পরে শ্রীরূপের বন্ধুবান্ধবের কোলাহলে জাগিয়া বাহিরে আসিয়াছিলেন। মন্দির হইতে তিনি বলিলেন—"চল মা, তোমার ঘরে তুমিই চল। যে তোমাকে আজ আদর আপ্যায়ন করিয়া ঘরে তুলিত, সে তো আর নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। শ্রীরূপ এতক্ষণ ধৈর্য্যের সহিত সমস্ত বিধিবিহিত কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়াছে ? কিন্তু এখন তাহার মায়ের কথা উল্লেখ হওয়াতেই তাহার নয়নে যেন বান ডাকিল। সে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল— "মাসীমা! আপনি ওদের নিয়ে বসান গা, আমি ঠাকুর মন্দিরেই একটু বিশ্রাম করি।"

মাসীমা সহানুভূতিতে গলিয়া যাইয়া বলিলেন, "বাবা রূপ! আজ যে তোর মায়ের জন্য গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করছে রে, কিন্তু আজ তো চোখের জল ফেলে অমঙ্গল করতে নাই—তাই বুকের মধ্যে সব চেপে যেতেই হবে। তুইও এ কথাটা মনে রাখিস্" এই বলিয়া তিনি সুজাতাকে লইয়া ওপরের চুণকাম করা ঘরটিতে লইয়া বসাইলেন। বন্ধুর দল বাহিরের ঘরে যাইয়া আড্ডা গাড়িল।

শ্রীরূপ মন্দিরের বারান্দায় উপুড় হইয়া পড়িয়া শিশুর ন্যায় ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। আজ সে বিবাহ করিয়া ঘরে বউ আনিয়াছে· কিন্তু তাহার স্নেহময়ী জননী আজ সে বউকে দেখিতে পাইলেন না। তাহার মনে পড়িল কতদিন তাহার মা তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য কত অনুরোধ উপরোধ অনুযোগ করিয়াছেন। কিন্তু তখন সে তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে নাই। তখন সে একক-জীবন যাপন করিয়া দেশহিতব্রতে প্রাণ উৎসর্গ করাই ছিল তাহার সঙ্কল্প। সে যে কতদিন মাকে বলিয়াছে সমাজের এমন অবস্থা যতদিন থাকিবে, ততদিন সে একটি মেয়েকে বিবাহ করিয়া তাহার স্বাধীনতা হরণ করিতে পারে না

মাতৃস্নেহের শত প্রচেষ্টাতেও বাহা করিতে পারে নাই, আজ বাস্তবের নির্মম আঘাতে তাহার সে আদর্শ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে বিবাহ করিয়াছে—কিন্তু মায়ের সাধ সে পূর্ণ করিতে পারে নাই—এই কথাটা ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে শেলের মতন বিঁধিতে লাগিল। যে বাড়ীতে প্রবেশ করিতে তাহার মন উল্লাসে নাচিয়া উঠিত, আজ সেই বাড়ীতে নব-পরিণীতা বধূসহ আসিয়া তাহার বুক কান্নায় ফাটিয়া যাইতেছে। আজ দুয়ারে আসিয়া "মা" বলিয়া সে ডাকিতে পারে নাই। জননীর ব্যগ্র নয়ন তাহাকে আদর করিয়া সমস্ত অঙ্গে কল্যাণ দৃষ্টি বর্ষণ করে নাই। শ্রীরূপ কোন দিন ভাবে নাই যে সংসারের সমস্ত দায়িত্ব ঘাড়ে লইয়া তাহাকে জীবন পথে চলিতে হইবে! কিন্তু আজ কেবল নিজের ভার বহন করিলেই হইবে না—একটী নারীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানও তাহাকে করিতে হইবে।

এই দায়িত্বের কথা মনে পড়িতেই সে কোন রকমে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া ধীরপদে ম্লানমুখে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিল।

বন্ধুদের শুইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রথমে সে বাহিরের ঘরে উপস্থিত হইল। বন্ধুর দল তখন কি একটা বিষয় লইয়া তর্ক করিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই সুব্রত বলিয়া উঠিল, "ওহে রাত যে একটা বাজে, এখন বউটাকে কিছু জলটল খাইয়ে শোয়াবার ব্যবস্থা হ'লো কিনা সেটা খোঁজ করলে?"

শ্রীরূপ বলিল—"ভাই নরেন, মাসীমার কাছ থেকে খোঁজটা জেনে এসো তো ভাই।" "এখানে কি তাঁর ভরণ-পোষণের ভার আমার উপরেই দেবে মনে করেছো?"

সুব্রত উত্তর দিল—"রূপ তো সন্ন্যাসী মানুষ, তা যখন বিয়ে দিয়েছো, তখন সকল রকম ভারই তোমাকে নিতে হবে।"

নরেন হাসিয়া বলিল, "সকল রকম ভার নিতে গেলে রূপই তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমাকে আহ্বান করবে—এ জগতে ওসমান ও জগৎসিংহ উভয়ের স্থান নাই।"

সুব্রত কপট গাম্ভীর্য্যের সহিত বলিল, "না তা করলে তো রূপের শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হবে। ওরা যে পরকীয়া রসের সাধক—পরকীয়া ভাবে বাধা দিলে ওদের ধর্ম্মহানি হবে যে।"

বঙ্কিম অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "নাও এই দুপুর রাতে তোমাদের ফষ্টি-নষ্টি বন্ধ কর। কাল রাতে ঘুম হয়নি এখন একটু শোবার জোগাড় করে দাও।"

তখন নরেন বাড়ীর ভিতর হইতে জানিয়া আসিয়া বলিল "মাসীমা বউকে জল খেতে বলেছিলেন, তাতে বউ বলেছে আজ তার মা তাকে এ বাড়ীর কোন খাবার খেতে মানা করেছেন—আর তার মায়ের দেওয়া মিষ্টিও সে এত রাতে খাবে না। তবে সঙ্গের ঝিকে কিছু খাওয়াইতে হবে।"

সুব্রত একথা শুনিয়া বলিল, "আচ্ছা আমি নিজের পয়সা দিয়ে বাজার হ'তে কিছু লুচি সিঙাড়া নিয়ে আসি। তাই বউকে আর ঝিকে খাওয়ান যাউক। নরেন তুমি যেয়ে প্রস্তাবটা করগে।" সে ছুটিয়া বাজারে চলিয়া গেল। নরেন আর দুইটি বন্ধু লইয়া বাড়ীর ভিতর গেল।

সুজাতা তখন বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া ঘরের এককোণে বসিয়াছিল। নরেন আহারের প্রস্তাব করিতেই সে ঝিকে দিয়ে বলাইল, "আজ আর তাহার আহারের কোন প্রয়োজন নাই—তাঁহারা যেন তাহার জন্য ব্যস্ত না হন।"

নরেন বলিল, "আপনার প্রয়োজন না থাকলেও আমাদের আছে। আপনি না খেলে আমরা কেউ কিছু খাব না।"

এই রকম কথাবার্ত্তা যখন হইতেছিল, তখন সুব্রত খাবারের চাঙাড়ী হাতে করিয়া আসিয়া বলিল, "বৌদি প্রসাদ করে দিন, আমরা খাই।"

সুজাতা আর দ্বিরুক্তি না করিয়া অল্প কিছু খাবার তুলিয়া লইল।

আহারের পালা শেষ করিয়া সকলেই শুইল। শ্রীরূপ অন্য একটা ঘরে শুইতে যাইবে এমন সময় তাহার মনে পড়িল খোকা দোতালার ঘরে, বউ যে বিছানায় শুইয়া আছে, সেই-খানে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সেখানে থাকিলে রাত্রে উঠিয়া তাহাকে না দেখিতে পাইয়া সে কাঁদিবে। তখন এতরাত্রে আর কাহাকেও বিরক্ত করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সে নিজে যাইয়া দোতালার ঘরে ঢুকিল। দেখিল ঝি মেঝেতে

ঘুমাইয়াছে। বউ ও খোকা চৌকীর উপরে। বউয়ের চক্ষু মুদ্রিত—মুখখানি ম্লান পায়ের শব্দ পাইয়াই সুজাতা চোখ মেলিয়া চাহিল। শ্রীরূপের সহিত তাহার সহসা চোখোচোখি হইল। শ্রীরূপ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইল। খোকাকে সন্তর্পণে তুলিয়া আনিবার সময় তাহার মনে হইল, কাল রাত্রিতে এই দেখাদেখিটা না হইলেই ভাল হইত। একটা অজানা আশঙ্কায় তাহার বুকখানি কাঁপিয়া উঠিল।

শুভদৃষ্টির সময়ে সুজাতা শ্রীরূপের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিতে পায় নাই—কেবল তাহার অলজ্বলে চোখদুটী উদাস ভরে ক্ষণেকের তরে সুজাতার চোখের উপর পড়িয়াছিল' আজ এই নিশীথ রাত্রে অসীম নীরবতার মধ্যে সুজাতা শ্রীরূপের মুখের দিকে চাহিয়াছিল। তাহার ম্লানমুখে হতাশার গভীর আক্ষেপ যেন ফুটিয়া উঠিল। আজন্ম সে সৌন্দর্য্যের উপাসক। সুন্দরের প্রতি তাহার যে একটা স্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশ পাইত তাহা কবির সৌন্দর্য্যানুভূতির ন্যায় সুতীব্র। ছিমছাম ঘরখানি চকচকে বইগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার বিড়াল ছানা ও গোরুর বাছুরটী পর্য্যন্ত সুন্দর ছিল। বিধাতাও তাহাকে রূপ লাবণ্য দিতে কার্পণ্য করেন নাই। সুঠাম সৌন্দর্য্যের আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়া সে সুন্দর স্বামীই কল্পনাতে দেখিতে পাইত। গত তিন চার বৎসরের মধ্যে কত পাত্র নিজে আসিয়া তাহার রূপ যাচাই করিয়া গিয়াছে। কিন্তু সৌন্দর্য্যের যে পরিপূর্ণ আদর্শটী তাহার মনের মধ্যে বিরাজ করিত তাহার নিকটে সকলকেই হীনপ্রভ দেখাইত। কিন্তু আজ তাহার ইহজীবনের ভাগ্যবিধাতার যে রূপ সে দেখিল, তাহা কল্পনার সকল সৌধকে একেবারে চুরমার করিয়া দিল—নগ্ন সত্যের কঠিন প্রস্তরে তাহার মন যেন আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহার পরের সমস্ত দিনটা গোলমালে কাটিয়া গেল।

(২)

সকাল হইতে না হইতেই পাড়ার মেয়ের দল বউ দেখিতে আসিল। সুজাতা সাদা সেমিজের উপর একখানা চওড়া কাল পেড়ে ফরাসডাঙ্গার সাড়ী পড়িয়া মেয়েদের সহিত দেখা করিতে বাহির হইল। অতি বিস্তৃত ঘোমটায় তাহার মুখ খানি ঢাকা ছিল না। বিয়ের কনেরা যেমন নাকে নলক দুলাইয়া পায়ে তোড়া বাঁধিয়া লজ্জাবনতামুখী হইয়া থাকে, সুজাতা ঠিক তেমন ভাবে রহিল না। তাহার মুখশ্রীর মধ্যে স্বভাব সুন্দর সংযমের এমন একটা ছাপ ছিল, যে স্বতন্ত্র অবগুণ্ঠনের তাহার আর প্রয়োজন হইত না। কপালের অর্দ্ধেকটার উপরে তাহার ঘোমটা পড়িয়াছিল—তাহাতে বসন্তের লঘুমেঘে ঢাকা চাঁদখানির মত তাহার মুখকে দেখাইতেছিল। কিন্তু পল্লী রমণীদের সে সৌন্দর্য্য উপলব্ধির ক্ষমতাই বা কোথায়, আর ইচ্ছাই বা কোথায়। সুজাতার রূপ দেখিয়া তাহারা অন্তরের মধ্যে যে দৈন্য অনুভব করিল, তাহাই তাহারা যথেষ্ট বিষ উদ্গীরণ পূর্ব্বক নববধূর গ্লানি করিয়া বিদূরিত করিতে প্রয়াস পাইল।

সুজাতার বয়সটা লইয়া তাহারা প্রথমে বাক্যবাণের খোঁচা মারিতে লাগিল। একজন এই বিষয়টা লইয়া অশ্লীল ইঙ্গিত করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। তাহার কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল, কিন্তু সুজাতার মুখের উপর একটা কঠোর গাম্ভীর্য্যের ছাড়া পড়িল—তাহা লজ্জায় নহে আমাদের দেশের মেয়েদের শিক্ষা ও সভ্যতার পরিচয় পাইয়া দুঃখে ও ক্ষোভে সে চুপ করিয়া সকল প্রকার আলোচনা শুনিতে লাগিল।

তাহাদের মধ্যে একজন যুবতীকে একটু লেখাপড়া জানা বোধ হইল। তাহার মতামত পাইবার জন্য সকলেই কথা বলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। সে সুজাতার কাছে ঘেঁসিয়া বসিয়া বলিল "তা ভাই বউ! রূপদার সঙ্গে তোমার ক'বছরের আলাপ?" সুজাতা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না—সে নীরবে শুধু মাথায় কাপড়টা আর একটু নামাইয়া দিল। তথাপি সে মহিলা নিরস্ত না হইয়া বলিলেন "বলই না ভাই; তোমরা তো আর আমাদের মতন অসভ্য অবলা নও, যে এসব কথা বলতে তোমাদের লজ্জা করবে?" কিন্তু সুজাতার কাছ হইতে কোন উত্তর না পাইয়া তাহার যেন রোখ্ চড়িয়া গেল। এই পরম প্রীতিকর প্রশ্নটীর উত্তর শুনিবার জন্য সকল রমণীই কৌতুক ভরে উদ্গ্রীব হইয়াছিল। তাই প্রশ্নকারিণী মহিলা এবার উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কতদিন খেলিয়ে

রূপদাকে জালে বাঁধলে তাই তা তোমাকে বলতেই হবে। আজ পাঁচ ছ বছর ধরে কত সম্বন্ধ রূপদার এলেছিল, কিন্তু কোনটাকেই তাঁর পছন্দ হলো না। আমরা ভাবলাম দাদা বুঝি আমাদের ভীষ্মদেবই হয়ে উঠলেন। কিন্তু তলায় তলায় তুমি যে তাঁর মনটী চুরি করে বসেছিলে তা তো জানতাম না। অপর একজন মহিলা বলিলেন" আরে প্রেমে না পড়লে কি আর রসুলপুরের বড়ঠাকুরকে তিনি অমন তাড়া করতেন। বেচারা নিতান্ত ভাল মানুষ, আমার শশুর বাড়ীর গাঁয়ে বাস। সে ওখানকার পত্তনীদারের মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসে বলেছিলো — বাবা তোমার বিয়ের খুব এক ভাল সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি--এক কল্‌কে তামাক খাওয়াও তো।" এই কথা শুনেই খাপ্পা হয়ে উঠে রূপদা তাঁকে বললেন "এখানে কিছু হবে না, অন্যত্র যান" বলেই সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে হন্ হন্ করে চলে গিয়েছিলেন। আমাদের বউর প্রেমে যে দাদা তখন মসগুল, তাঁর কি আর অন্য সম্বন্ধের কথা তখন ভাল লাগে ?"

প্রথম মহিলা মুচকি হাসিয়া বলিলেন "সে তো আজ ছ' বছরের কথা—তার আগে থেকেই বুঝি বউর সঙ্গে দাদার জানাশুনা ?"

সুজাতা আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। সে মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল "তাঁর সঙ্গে তো আমাদের বাড়ীর কারু বিয়ের আগে জানাশুনা ছিল না।"

এ কথা শুনিয়া রমণীদের মুখে কেবল একটা অবিশ্বাসের হাসি ফুটিয়া উঠিল। তাহারা বলিল "তোমাদের মধ্যে তো ভালবাসা না হলে বিয়ে হয় না সে কথা সকলেই জানে। তবে আর লুকিয়ে কি লাভ ?"

এই মৃঢ় আলোচনা শুনিয়া সুজাতা কেবলমাত্র নির্ব্বাক হইয়া রহিল—তাহার আর কোন উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে প্রবৃত্তি হইল না। রমণীর দল কিছুক্ষণ এক তরফা কথাবার্ত্তা বলিয়া শেষে সুজাতাকে তামাকে বলিয়া চলিয়া গেল। গ্রামের ভিতর যাইয়া তাহারা প্রচার করিল যে রূপ এক বেহ্মজ্ঞানী মেয়েকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে—আর ছ' তিন বছর ধরিয়া তাহার সহিত শ্রীরূপের প্রেম চলিতেছিল। এই সংবাদে কৌতূহলী হইয়া সমস্ত গ্রামের মেয়েরা বউ দেখিতে আসিল।

বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সুজাতাকে ঠায় বসিয়া থাকিয়া পরীক্ষা দিতে হইল। তবু মেয়ের দলের ভিড় কমিল না। তাহারা সুজাতাকে লইয়া জটলা করিতেছে, এমন সময় শ্রীরূপ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। তাহার গা আলগা, গা দিয়া ঘাম ছুটিতেছে, মুখে একটা ব্যস্ত সমস্ত ভাব। সে আসিতেছে দেখিয়াই মেয়ের দল একটু সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। শ্রীরূপ কোন দ্বিধা সঙ্কোচ না করিয়া সরাসর সুজাতার নিকটে আসিয়া বলিল "বেলা অনেক হয়েছে, তুমি স্নান কর গে।" সুজাতা তাহার কথা শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। একজন বয়স্কা মহিলা তখন অগ্রসর হইয়া আসিয়া শ্রীরূপকে বলিলেন "বাবা রূপ। বৌমা বিয়ের কনে—তিনি কালাপেড়ে সাড়ী পরলে অকল্যাণ হয়।" শ্রীরূপ এই কথা শুনিয়া ঘরের ভিতর যাইয়া উচ্চৈঃস্বরেই বলিল "স্নান করে তুমি একখানা লাল-পেড়ে সাড়ী পড়িও।" সুজাতা বিস্মিত হইয়া তাহার বড় বড় চোখদুটী তুলিয়া একবার শ্রীরূপের দিকে চাহিল, তারপর ঘাড় হেঁট করিয়া সম্মতি জানাইল।

এদিকে মেয়ের দল বুঝিল শ্রীরূপের সহিত সুজাতার নিশ্চয়ই আগে ভাব ছিল—তাহা না হইলে কি বর অমন নিঃসঙ্কোচে কনের সহিত কথা কহিতে পারে ? তাহারা এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে চলিয়া গেল। শ্রীরূপও বাহির বাড়ীতে আসিয়া লোকজন খাটাইতে লাগিল। আজ বৌ-ভাতে অনেক লোক তাহার বাড়ীতে খাইবে।

ঘণ্টাখানেক পরে শ্রীরূপের প্রতিবেশী নবীন মাধববাবু হুঁকা টানিতে টানিতে তাহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন; মাথায় টাক, গোঁফজোড়া পাকা—দেখিলেই মনে হয় তাঁহার মাথায় অনেক বুদ্ধি খেলে। তিনি ধীরে সুস্থে একখানা জল-চৌকীর উপর বসিয়া শ্রীরূপকে ডাকিলেন। শ্রীরূপ আসিয়া হাতজোড় করিয়া বলিল, "কাকা এসেছেন—আপনি একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দিন; বন্দোবস্তের যা কিছু ত্রুটী আছে

সংশোধন করতে উপদেশ দিন। রান্না প্রায় শেষ হয়ে এলো। আর আধঘণ্টার মধ্যেই নিমন্ত্রিতদের ডাকতে পাঠাব।"

নবীনবাবু বলিলেন "তা তো পাঠাবে কিন্তু এদিকে যে বিভ্রাট উপস্থিত। গ্রামের মধ্যে গুজব বৌমার বাবা নাকি ব্রহ্মজ্ঞানী। বৌমাও নাকি এখানে ব্রহ্মভাবে বেশভূষা করেছেন। তাইতে তো লোকজন কেউ খেতে চাচ্ছে না।"

শ্রীরূপ বলিল "আমার শ্বশুর অশোকবাবু ব্রাহ্ম এ কথা কে বললে? আমাদের বিবাহ সভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারবেন যে শালগ্রামশিলার সম্মুখে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে এ বিবাহ হয়েছে। আর আমি ব্রাহ্মের মেয়ে বিবাহ করিব এরূপ কল্পনাও লোকের মনে স্থান পাইল কি করিয়া?"

নবীনবাবু উত্তর করিলেন—"কি কারিয়া কি কথায় যে উৎপত্তি হয় তা কেমন করে বলবো বল। তবে লোকে আরও বলছে যে তুমি নাকি মোহে পড়েই জাতি-কুল-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে বিবাহ করেছ।"

শ্রীরূপ এই অপূর্ব্ব অভিযোগ শুনিয়া বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া গেল। সে ভাবিয়া পাইল না কেমন করিয়া ইঁহাকে বুঝাইবে যে সে মাতৃহীন হইয়া খোকাকে মানুষ করিবার জন্য বিবাহ করিয়াছে মাত্র; নারীর হৃদয় লইয়া খেলা করিবার প্রবৃত্তি তাহার মনে কোনদিনই জাগে নাই। খানিকক্ষণ মাথা নত করিয়া থাকিয়া সে বলিল "দেখুন, এ কথা লইয়া আপনাদের ন্যায় গুরুজনের সমক্ষে আমি কোন বাকবিতণ্ডা করিতে চাহি না। তবে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি আমার শ্বশুর ব্রাহ্ম নহেন।"

নবীনবাবু। "তা বাবা! শপথই যখন করতে চাচ্ছ, তখন একটা প্রায়শ্চিত্ত করার আর আপত্তি কি? তুমি বৌমাকে লইয়া সংস্কার প্রায়শ্চিত্ত কর – যা কিছু দোষ হয়েছে সব কেটে যাবে।"

এ কথা শুনিয়া শ্রীরূপ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিল, "বলেন কি আপনি? পাপ করলে তো লোকে প্রায়শ্চিত্ত করে। আমি জানি এই বিবাহ করিয়া আমি কোনরূপে জাতিভ্রষ্ট হই নাই। আমি কেমন করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিব?"

শ্রীরূপের মনে হইতেছিল যে সে নিজে কোনমতে প্রায়শ্চিত্ত করিলেও, সুজাতার নিকট কেমন করিয়া সে এরূপ প্রস্তাব করিবে? প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব যে কতদূর অপমানজনক, তাহা সুজাতার কথা মনে করিয়া সে ভালরকমেই বুঝিতে পারিল।

নবীনবাবু বলিলেন, "এতে যদি তুমি রাজী না থাক, তবে কেহ তোমার বাড়ীতে আহারাদি করিবে না।"

শ্রীরূপ কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া ভাবিল। তাহার পর দৃঢ়ভাবে বলিল "না খাইলে আর কি করিব? আপনাদের এরূপ অসঙ্গত প্রস্তাবে আমি সম্মত হই কি করিয়া?"

নবীনবাবু কেবলমাত্র "বেশ" বলিয়া উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

গ্রামের লোকের এরূপ ষড়যন্ত্র করিবার একটু ইতিহাস আছে। শ্রীরূপ উপযুক্ত পাত্র—তাহার সহিত বিবাহ দিবার জন্য গ্রামের মাতব্বর অনেক ব্যক্তিই অনেক সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। শ্রীরূপ অচল, অটল থাকিয়া সকলগুলিকেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এখন যখন তাঁহারা দেখিলেন শ্রীরূপ কলিকাতায় বিবাহ করিল ও ভাল মুরুব্বি শ্বশুর পাইল তখন একযোগে তাঁহারা ঈর্ষা ও অপমান বোধ করিলেন। শ্রীরূপের ঔদ্ধত্যের শাস্তি দিবার জন্যই এই ষড়যন্ত্র।

তাঁহারা শ্রীরূপকে সস্ত্রীক প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহার লাঞ্ছনা করাইবেন ইহাই ছিল তাঁহাদের সংকল্প। তাঁহারা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে শ্রীরূপ অকাতরে দুইশত ভদ্রলোকের আহারের আয়োজন এমন ভাবে নষ্ট হইতে দিবে।

কিন্তু আহার্য্য দ্রব্য সত্যই নষ্ট হইল না। শ্রীরূপ নরেনকে যাইয়া বলিল "গ্রামের ভদ্রলোকেরা কেউ আমার বাড়ী খাবেন না। তুমি কাঙ্গাল দুঃখীদের খবর দাও, তাহারা আসিয়া খাইয়া যাউক।" তাহার পর নবীনমাধববাবুর সহিত তাহার যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, তাহা সে বলিল। নরেন এ প্রস্তাবে আনন্দিতই হইল। সে বলিল "এই ভদ্রলোকের মুখোসপরা জোচ্চরগুলিকে না খাইয়ে, তুমি যে দরিদ্র নারায়ণের সেবা করবার একটা অবসর পেলে তার জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।"

কাঙ্গালী ভোজনের সংবাদ হাওয়ার বেগে চারিদিকে

ছড়াইয়া পড়িল। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে প্রায় তিন চারিশত ভিখারী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল না। কেহবা একটা কেহবা দুইটা ছেলে মেয়ে কাঁকালে করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের পরিধানে অতি জীর্ণ ময়লা এক এক টুকরা কাপড়—তাহাতে ভাল করিয়া তাহাদের লজ্জাও নিবারণ হইতেছে না। একজনেরও মাথার চুলে তেল নাই—তাই সেগুলি উস্কো খুস্কো। দেখিলেই মনে হয় তাহারা যেন দারিদ্র্যের করুণ প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা বিষণ্ণ নহে। তাহাদের মনে যথেষ্ট স্ফূর্ত্তি রহিয়াছে। তাহারা কোলাহল করিতে করিতে পাতা পাতিয়া খাইতে বসিল। শ্রীরূপ নিজে বন্ধুবান্ধব লইয়া তাহাদিগকে পরিবেশন করিতে লাগিল। ভাল ভাল সন্দেশ মিঠাই তাহাদের পাতে পড়িল; যে সমস্ত খাবার তাহারা কখন চোখেও দেখিতে পায় না, তাহা পাইয়া তাহাদের উল্লাস আর ধরে না। তাহারা আহার করিয়া যে আনন্দ পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিল, তাহা ভদ্রলোকদের হাজার খাওয়াইয়াও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহাদের তুষ্টিবিধান করিয়া শ্রীরূপ হৃদয়ের মধ্যে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। সে মনে মনে করিল তাহার এত অর্থব্যয়, এত পরিশ্রম সার্থক হইল।

আহার শেষ হইবার কিছু পূর্ব্বে নরেন আসিয়া প্রস্তাব করিল যে কাঙ্গালীদিগকে মাথা পিছু চার পয়সা করিয়া বিদায় দেওয়া হউক।

শ্রীরূপ বলিল "বেশ তো, দাও। তবে বিতরণের ভারটা তোমায় নিতে হবে। আমি সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, একটু বিশ্রাম না করলে শরীর আর বইছে না।"

নরেন পরিহাস তরলকণ্ঠে বলিল "হাঁ তুমি এখন নিরালায় যেয়ে একটু বিশ্রামই করগে—আবার সারারাত জেগে তো প্রেমালাপ করতে হবে। এখন শুয়ে শুয়ে শ্রীমতীর রূপ ধ্যান করতে করতে যদি চোখে যোগনিদ্রার আবির্ভাব হয়, তবে তাঁকেও আদর করতে অবহেলা করো না।"

শ্রীরূপ। "না ভাই ঘুম হবে না—আজিকার খাওয়া দাওয়া নিয়ে এ গোলমালটা সত্যি ভাল লাগল না। বাইরে শান্তভাব দেখালেও, মনের ভিতর কাঁটার মতন কথাটা খোঁচা দিতেছে। আমাদের এই নিষ্ঠাবান পরিবারের কোন দোষ সমাজ কোনদিন পায় নাই। আজ বিবাহ লইয়া এই অশান্তির সৃষ্টি হইল—এ অশান্তির অবসান কেবল এইখানেই নহে।"

নরেন বলিল "তোমার মতন লোকও যদি কয়েকটা কু-মতলবী লোককে সমাজ বলে মেনে নিয়ে, তাদের কাছে মাথা নোয়ায়, তবে এদের তো আর পরিত্রাণের কোন উপায় দেখছি না। দেবতার আসনে বসিয়া পিশাচ যেমন উপাসকের রক্ত শোষণ করে, এরাও তেমনি নিষ্ঠুর ভাবে নিরুপায় নরনারীকে পেষণ করিতেছে না কি?"

শ্রীরূপ বলিল "এরা দুশ্চরিত্র, অপদার্থ তা জানি—কিন্তু তবু এরা সেই সনাতন সমাজের নাম লইয়াও তো আছে। ইহাদিগকে অবহেলা করিলে যে আমার সেই সমাজকে অনাদর করা হয় ভাই! আর সমাজকে অবহেলা করলেই জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতা আসে।"

নরেন বলিল "কিন্তু সমাজের নাম নিয়ে এরা তো কেবল এদের স্বার্থ সংসিদ্ধিই করছে। ঈর্ষ্যা, দ্বন্দ্ব, কলহ প্রভৃতি যত কিছু পল্লী জীবনের আবর্জনা আছে তা এরা এই সমাজের নাম করেই সৃষ্টি করে। এমন সমাজকে দূরে পরিহার করাই ভাল।"

শ্রীরূপ বলিল "ভাল যে তা আমারও সময় সময় মনে হয়। হয়তো উত্তেজনার বশে সেই ধারণা মতই কাজ করি। কিন্তু অমন করিয়া সমাজকে পরিত্যাগ করিলেই কি সমাজকে উন্নততর করিয়া তোলা যাইবে? আমি যদি তাহাকে ঘৃণা করিয়া অবহেলা করি, তবে সে আমার উপকার লইবে কেন? আমার দেশের সেই পরিপূর্ণ সমাজ জীবনকে ফিরাইয়া আনিতে হইলে সময় সময় ইহার হাতে আমাদের নির্য্যাতন সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু আমরা রক্ত মাংসের মানুষ তা পেরে উঠি নাই। তাই আদর্শের সহিত বাস্তবের সংঘাত বাধিয়া মনকে অবসন্ন করিয়া ফেলে।"

নরেন বলিল "আচ্ছা এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা হবে এখন কাঙ্গালী বিদায়টা করে আসি।"

কাঙ্গালী বিদায় নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্রীরূপ বিশ্রাম করিব বলিয়া উঠিয়া গেলেও বেশীক্ষণ সে অলসভাবে থাকিতে পারিল না। বেলা শেষ হইয়া গিয়াছে অথচ বন্ধুবান্ধবের খাওয়া হয় নাই মনে করিয়াই সে উঠিয়া আসিল। তাহার মত কর্ম্মব্যস্ত লোকের পক্ষে কোন অবস্থাতেই অলস হইয়া থাকা ভাল লাগে না। স্বয়ং তদ্বির করিয়া বন্ধুদিগকে খাওয়াইতে বসাইল। বন্ধুর দল বলিল, "নতুন বৌ আসিয়া আমাদের পরিবেষণ করুন।"

শ্রীরূপ দোতালায় উঠিয়া বৌয়ের ঘরে গেল। সেখানে দেখিল সুজাতা বিছানার উপর শুইয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। খোকা তাহার মাথার কাছে বসিয়া আলুলায়িত চুলগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতেছিল। শ্রীরূপ দেখিয়া খুসী হইল যে এত অল্প সময়ের মধ্যে খোকার সহিত বৌয়ের ভাব হইয়া গিয়াছে। শ্রীরূপের পায়ের শব্দ পাইয়াই বৌ তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠিয়া বসিল—মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। শ্রীরূপ সুজাতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না করিয়া ব্যস্তভাবে বলিল "বন্ধুদের পরিবেষণ করিতে হইবে চল।" কথাটা এমন বেখাপ্পা কঠোর আদেশের সুরে বাজিল যে শ্রীরূপ নিজেই একটু লজ্জিত হইল।

সুজাতা খোকার কাণে কাণে বলিল "খোকা বলত যে আমি যাচ্ছি, আর ঝিকে ডেকে নিয়ে এস তো ভাই।"

খোকা আদেশমত কার্য্য করিল। শ্রীরূপ বাহিরে চলিয়া গেল।

তখন বন্ধুদের পাতে মিষ্টান্নাদি পড়া বাকী আছে। দধি লইয়া সকলে মিষ্টের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কয়েক মিনিট এরূপভাবে অপেক্ষা করার পর একজন বলিল, "কিহে শ্রীরূপ! বউকে এধারে আস্‌তে দিতে সাহস হচ্ছে না নাকি?"

নরেন বলিল, "ওহে ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর দেবীর দর্শন পেতে হলে সাধনার প্রয়োজন।"

শ্রীরূপ ত্বরিতবেগে আবার উপরে গেল। দেখিল সুজাতা একখানা বটিদার নীল ঢাকাই সাড়ী ও ব্লাউস পড়িয়াছে—মাথার কাপড়ের উপর একটা সেফ্‌টাপিন লাগাইতেছে—ঝি দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে। বেশ করিতে এত দেরী হইতেছে বুঝিয়া শ্রীরূপ অসহিষ্ণু ভাবে বলিল, "তারা যে দই পাতে লইয়া বসিয়া আছে। অনর্থক এত দেরী না করে যে কাপড়ে ছিলে, তাই পরে গেলেই হ'তো।"

ঝি বলিল, "তাও কি হয় জামাইবাবু? একটু ভাল কাপড় না পরে দশজনার সামনে দিদিমণি বেরুবেন কেমন করে।"

শ্রীরূপ বলিল, "আচ্ছা, সাজগোছ তো এখন করা হয়েছে, নিয়ে এস ওকে শীঘ্র করে।" এই বলিয়া শ্রীরূপ হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুজাতা আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া ঝির পিছনে পিছনে আহারের স্থানে রসগোল্লা হাতে করিয়া উপস্থিত হইল।

নরেন তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই দেখ তোমাদের সাধনায় তুষ্ট হইয়া লক্ষ্মী দেবী স্বয়ং সুধাভাণ্ড হাতে করিয়া উপস্থিত হয়েছেন। তা বৌঠান্ অনুগত ভক্তদের প্রতি কৃপা করে' এবার বর বিতরণ করুন।"

সুধীর বলিয়া উঠিল, "দেবীর নিজের বরটীকেও যেন বিতরণ করে না ফেলেন।"

সুজাতা সলজ্জ মৃদুহাস্য করিয়া রসগোল্লা প্রচুর পরিমাণে বিতরণ করিয়া গেল। শ্রীরূপের কথায় তাহার মনে যে একটা মেঘের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বন্ধুবান্ধবের হাস্য পরিহাসে কাটিয়া গেল। সে আবার হাসিমুখে ঘরে ফিরিল।

এদিকে কাঙ্গালী ভোজনের সংবাদে গ্রামের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। গ্রামের ভদ্রলোকেরা শ্রীরূপের উপেক্ষা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিলেন। তাহাকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য সকলে তাহাকে এক ঘরে করাই স্থির করিলেন।

সন্ধ্যাবেলা আর কোন রমণীই বউ দেখিতে শ্রীরূপের বাড়ী আসিল না। সুজাতা ইহাতে একটু বিস্মিত হইলেও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল. সন্ধ্যার পর শ্রীরূপের সেই দূর সম্পর্কীয়া মাসীমা সুজাতার নিকটে আসিয়া বলিলেন—"বৌমা! গ্রামের লোকে শ্রীরূপকে একঘরে করেছে, আমি এখানে আর থাকি এ রকম তাঁদের ইচ্ছা নয়। আমার ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘর করতে হয়—আমি তো আর থাক্‌তে

পারছি না। তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে—নিতান্ত ছেলেমানুষ নও, তুমি তো সব বুঝতেই পার। আমার উপর অভিমান করো না মা। তুমি ঘর সংসার সব বুঝে সুঝে নাও।"

সুজাতা স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথা শুনিল। তাহার পর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি আর আপনার কাছে বুঝে নেবো কি মা! আপনার দিয়ে যে এ সংসারের একটু অপচয় হবে না তা আমি একটুখানি দেখেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আমি একলা থাক্‌বো কি করে মা।"

মাসীমা বলিলেন, "কি করবে মা। একলা সংসারেই যে পড়েছো তুমি। তবে তোমার দেবতার মত স্বামী আছে, খোকা আছে, তাদের আপন করে' নিয়ে ঘর সংসার করো মা।" মাসীমা এই বলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। সুজাতা তাঁহাকে গড় হইয়া প্রণাম করিল। মাসীমা "সুখী হও মা" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সুজাতা একা ঘরে বসিয়া ভাবিতে লাগিল—সত্যই সে কি সুখী হইতে পারিবে? এই নির্জ্জন নির্ব্বান্ধব পুরীতে সে একা থাকিবে কি করিয়া? পুরাতন প্রকাণ্ড বাড়ীটার দিকে তাকাইতেই তাহার যেন দম ছুটিয়া যাইতেছিল। গ্রামের মেয়েদের সামান্য যা একটু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে তাহাদের সঙ্গে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তাহার একমাত্র ভরসা স্বামী। সে তাহার ঝিয়ের মুখে প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব ও গ্রামের গোলমালের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। শ্রীরূপের মনের দৃঢ়তা দেখিয়া তাহার প্রতি সুজাতার একটা সহজ শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছে। আর তাহাকে প্রায়শ্চিত্তের অপমান হইতে রক্ষা করিবার জন্যই যে শ্রীরূপ এমন ভাবে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহাও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। ইহাতে তাহার জন্য স্বামীর ত্যাগের পরিচয় পাইয়া সে পুলকিত হইল। কিন্তু যখনই তাহার মনে শ্রীরূপের মুখের চেহারাখানা ভাসিয়া উঠিল তখনই তাহার চিত্তে একটা অপ্রসন্নভাব দেখা দিল। আজ সারাদিনের মধ্যে কতবার তাহার কাণে শ্রীরূপের কঠোর আদেশের ধ্বনি আসিয়া পৌছিয়াছে। সে দেখিয়াছে শ্রীরূপ কোন আদেশ করিলে, তাহার বিলম্ব মাত্র সহ্য হয় না, সুজাতার নিজের প্রতি সামান্য একটু ব্যবহারেও তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। এরূপ স্বামীর সহিত ঘর করিয়া সে কি সুখী হইতে পারিবে? আশা ও উদ্বেগে তাহার মন দুলিতে লাগিল।

(৩)

সেই রাত্রেই ফুলশয্যা। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় শ্রীরূপ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে অগ্রসর হইল। তাহার হাতে একখানা মোটা ইংরাজী বই। বিধিবিহিত আচার ও সামাজিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে তাহার মন এতই নিবিষ্ট ছিল, যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিবাহের স্বরূপটা ভাল করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল বিবাহ করিতেছি সংসারের প্রয়োজনে। কিন্তু তাহার সহিত যে অন্য কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে তাহা সে বুঝিয়াও বুঝে নাই। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিতে যাহা জানিতে পারে, হৃদয়বৃত্তিতে তাহা সব সময় ধরিতে পারে না। জীব ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ লইয়া যেমন বহু মতবাদ তাহার জানা ছিল, অথচ তাহার সাধনার মধ্যে একটি সম্বন্ধও সত্য হইয়া উঠে নাই,—তেমনি তাহার মত পণ্ডিত লোকের যে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধটা কি তাহা জানা ছিল না, তাহা নহে; তবে বাস্তব জীবনে যে কি ভাবে তাহা প্রকাশ পায় সে সম্বন্ধে সে কোনদিনই নিবিষ্টভাবে চিন্তা করে নাই।

কিন্তু আজ যখন এক নির্জ্জন ঘরে নিশীথ রাত্রে যুবতী স্ত্রীর সহিত সে রাত্রিবাস করিতে যাইতেছে, তখন তাহার মনের মধ্যে কি এক অজানা ব্যাকুলতা বোধ করিতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি অনভ্যস্ততার জন্য অস্বস্তি ছিল, কতখানিই বা নূতনত্বের আস্বাদ পাইবার জন্য আগ্রহ ছিল তাহা যথেষ্ট মনস্তত্ত্বের বই পড়া থাকিলেও, সে ঠিক ধরিতে পারিল না। তর্ক করিয়া সে মনকে বুঝাইল যে স্ত্রীলোকও মানুষ এবং মানুষের সহিত আলাপ করিতে তাহার কোন সঙ্কোচ বোধ করা উচিত নহে। কিন্তু অপরিচিতা তরুণী যে এক নূতন শ্রেণীর মানুষ এই কথাটা সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। অথচ সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিল যে সাধারণ জীব যেমন নারীর মোহে পড়িয়া নারীর দাসত্ব করিয়া জীবন কাটায়, সে তাহা কোনমতেই করিবে না। নারীর প্রণয়

হইতেই মানুষ জীবনের লক্ষ্য হারাইয়া ফেলে একথা সে বহুবার ধর্ম্মশাস্ত্রে পড়িয়াছে তাই এখন হইতে তাহাকে সাবধান হইতে হইবে। মনকে এমন করিয়া চোখ ঠারা সত্ত্বেও তাহার চিত্ত এমন করিয়া দোলে কেন?

যাহা হউক অনেকখানি দ্বিধা ও সঙ্কোচ লইয়া শ্রীরূপ ঘরে প্রবেশ করিল। সে বড় বড় সভায় বক্তৃতা করিয়াছে—কিন্তু সেখানে কোন প্রকার সঙ্কোচ বোধ করে নাই—সিংহবিক্রমে মঞ্চ হইতে সে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়াছে। আজ সে বুঝিল বক্তৃতা করা অপেক্ষা তরুণীর সহিত আলাপ করা ঢের কঠিন কাজ। কি আলাপই বা সে করিবে? দিনের মধ্যে কাজের কথা সে দুইবার সুজাতার সহিত বলিয়াছে। নিশীথের সুদীর্ঘ অবসরের মধ্যে সে কোন্ কাজের কথা তুলিবে? চুপ করিয়া থাকা যাইবে না, তাই সে বইখানিকে ভরসা করিয়া ঘরে ঢুকিয়াছে। বই পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়া তাহার চিরদিনের অভ্যাস—আজও সেইভাবে শ্রান্তমনকে নিদ্রার কোলে ঢালিয়া দিবে বলিয়া মূঢ় শ্রীরূপ ফুলশয্যা ঘরে শুইতে চলিয়াছে।

সুজাতা বিছানার উপর একা শুইয়াছিল। খোকাকে আজ অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া নরেন তাহার নিকট রাখিয়াছে। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে কয়েকটী অন্তরঙ্গ বন্ধু লইয়া ফুলশয্যার আচার কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিয়া গিয়াছে। তাহাদের সেই সময়কার লঘুহাস্যের রেশ্ এখনও সুজাতার কাণে বাজিতেছে। ব্যাপারটা তখন একরকম লাগিয়াছিল, কিন্তু এতক্ষণ ধরিয়া ঐ বিষয়টা লইয়া চিন্তা করিতে করিতে তাহার মনের কোণে যেন একটা ক্ষোভ উঁকি মারিতে লাগিল। পিতার নিকট নব্যশিক্ষায় দীক্ষিত হইলেও, বাঙ্গালীর মেয়ের যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত সংস্কার যে তাহার মন হইতে সরিয়া গিয়াছে তাহা নহে। কত নভেলে সে এই ফুলশয্যার রাত্রির কত মধুময় বর্ণনা পড়িয়াছে। বাড়ীর বধূদের মাঙ্গলিকী—কন্যাদের পরিহাস—গোপনে আড়ি পাতা! কেহ আজ আড়িপাতিলে সে যে খুব খুসী হইত তাহা নহে, কিন্তু তথাপি তাহাদের দাম্পত্য মিলনের প্রথম মুহূর্ত্তে কেহ কোথাও একটু কৌতুহলও প্রকাশ করিল না এই চিন্তা তাহার নিকট প্রীতিকর হইল না।

তরুণ তরুণীর প্রথম মিলন। কবির অমর তুলিকায় এই চিত্রখানি কত মনোরম বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে—মানব সভ্যতার বিকাশের প্রথম প্রত্যুষ হইতে কত গীতি, কত কবিতা এই একই বিষয় লইয়া রচিত হইয়াছে, তথাপি ইহা পুরাতন হয় নাই। কিন্তু কবিকুল সমস্বরে যে প্রেমের প্রথম আবির্ভাবের কথা ঘোষণা করিয়াছেন—তাহার একটু চিহ্নও কি সুজাতা দেখিতে পাইতেছে? প্রেম কই, তাহার আসিবার অবসর কোথায়? বিবাহের মন্ত্র কি প্রেমের আগমনী স্তোত্র? হাতে হাত বাঁধিয়া দিলেই কি হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা পড়িয়া যায়? কই সে তো কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না?" কেবল নূতন অপরিচিতের সহিত নির্জ্জন আলাপের একটা ভীতি তাহার মনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। শ্রীরূপের যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাতে সে ভীতি তাহার কিছুমাত্র কমে নাই।

সুজাতা আরও ভাবিতেছিল এই যে তাহার আশঙ্কাজনিত উদ্বেগ ইহা কি কেবল সে-ই একমাত্র বোধ করিতেছে। বাঙ্গলার শত সহস্র কিশোরী, তরুণী কি ইহা এই দিনে অনুভব করে না? সে তাহার সখীদের নিকট হইতে এই রাত্রির অভিজ্ঞতার যে বর্ণনা পাইয়াছে তাহার বিষয় ভাবিতে লাগিল। তাহারাও ঠিক এমনি ভাবে উদ্বিগ্ন হৃদয়ে অজানিতের প্রতীক্ষা করিতে থাকে—এমনিভাবে আশা আশঙ্কায় কাঁপিতে থাকে। চিরন্তন সংস্কার বশে স্বামীর প্রতি একটা সহজ শ্রদ্ধা ও ভক্তির আকর্ষণ বোধ করে—কিন্তু তাহাকে ভালবাসা বলিলে কবি ও আলঙ্কারিকের ভালবাসার সংজ্ঞা উল্টাইয়া দিতে হয়। কিন্তু বিবাহের মন্ত্রের দাবীতে স্বামী-দেবতা যখন ঘরে ঢুকিয়াই স্ত্রীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরেন, চুম্বন করেন, তখনই কি মেয়েরা হঠাৎ প্রেমের পরশ অন্তরে অনুভব করে? লজ্জায় সে তখন চেঁচাইতে পারে না, সঙ্কোচে সে নিবারণ করিতে পারে না—নারীর অসহায় দুর্ব্বলতাকে ধিক্কার দিয়া অনেককেই তখন নীরবে সব সহ্য করিয়া যাইতে হয়। তারপর স্বামী যখন প্রেমের বুলি আওড়ান—তখন তাহাই কি নবপরিণীতার কাণে মধু বর্ষণ করে? কে জানে দশের মনে কি হয়, তাহাদের মুখের গল্প শুনিয়া সে সময়কার ভাবটা ঠিক বোঝাও

যায় না। কিন্তু এটা নিশ্চয় তাহাকে যদি এইরূপ ভাবে বিনা আলাপে বিনা পরিচয়ে কেহ সম্ভাষণ করে, তবে সে নিছক ন্যাকামী ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিবে না। কিন্তু শুধু এইরূপ সম্ভাষণ দেখাইয়াই তো সকল স্বামী ক্ষান্ত হয়েন না। ক্ষণেকের পরিচয়ে নারীত্বের চরম অবমাননা তো তাহার সখী লতিকার উপর হইয়াছিল। এই কথা মনে করিতেই তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল মাথা ঝিম ঝিম করিতে লাগিল। শ্রীরূপ সকল বিষয়েই কঠোর আদেশ করে—এক্ষেত্রেও কি তাহাই করিবে? না সে উচ্চশিক্ষিত সুমার্জ্জিত রুচি—কিন্তু রুচি ও শিক্ষা তো লতিকার স্বামীকে পাশবিকতা হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। সুজাতা আর ভাবিতে পারিতেছে না। সে অবসন্ন মনে শুইয়া পড়িল। এমন সময়ে শ্রীরূপ ঘরে প্রবেশ করিল।

তাহার হাতে মোটা বই দেখিয়া সুজাতার নূতন বোধ হইল। শ্রুত বা পঠিত কোন বর্ণনার সহিত ইহা না মিলিলেও, সে যেন অনেকটা আশ্বস্তি বোধ করিল? শ্রীরূপকে দেখিয়া সুজাতা বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। শ্রীরূপ তাহার মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইলও না। সুজাতার অন্তরের নারী প্রকৃতি ইহাতে একটু আঘাত পাইল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া তাকালেই সে নিজে নিশ্চয়ই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। শ্রীরূপ একেবারে খাটের উপর উঠিয়া বসিল। খাটের অপর প্রান্তে যাইয়া আলোটা হাফ্‌জানালার উপর রাখিয়া দিল। তাহার কাজের মধ্যে একটা অনাবশ্যক জোর প্রকাশ পাইতেছিল। সুজাতা তাহা বুঝিলেও, তাহার কারণ বুঝিতে পারিল না। শ্রীরূপ বিছানার উপর বসিয়া সুজাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, তুমি শোও, আমি একটু পড়ি তারপর শোব। আজ বৃথা কাজে সমস্তটা দিন গিয়েছে, একটুও পড়ার অবসর পাইনি। যে দিনটাতে আমি নূতন কোন জ্ঞান সঞ্চয় করিতে না পারি, সেদিন আমার বড় ব্যর্থ বোধ হয়—অনুশোচনায় আমার মন ভরিয়া উঠে। আলো জ্বালা থাকলে তোমার ঘুমুতে অসুবিধা হবে কি?" সুজাতা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে তাহার কোন অসুবিধা হইবে না। সে তথাপি বসিয়াই থাকিল।

শ্রীরূপ বলিল "তোমার কোন সঙ্কোচ বোধ করার প্রয়োজন নাই। তুমি শোও না। বরং তুমি আমার শোওয়ার অপেক্ষায় বসে থাক্‌লেই আমার পড়ায় মন বস্‌বে না।"

সুজাতা শুইল, শ্রীরূপ বই খুলিয়া বসিল, তথাপি পড়ায় তাহার মন বসিল না। এমন ব্যাপার তাহার জীবনে আর কখনও হয় নাই। শত উত্তেজনা, শত অবসাদের মধ্যেও সে বই খুলিয়া বসিলেই, তাহার মন কোন এক কল্পরাজ্যে উধাও হইয়া যাইত। রামানুজ ও বলদেব অরকেন ও বার্গসেঁার সহিত তাহার মনের বোঝা পাড়া আরম্ভ হইত। কিন্তু আজ একি নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইল? বই খুলিয়াই তাহার মনে হইল যাক্ প্রথম আলাপের সঙ্কোচটা খুব স্বাভাবিকভাবেই সে কাটাইয়া দিয়াছে। স্বাভাবিকই হইয়াছে তো? সুজাতাকে এরূপভাবে শুইতে বলায় কোনরূপ অভদ্রতা হয় নাই তো? আচ্ছা তাহার বই পড়া দেখিয়া সুজাতা কি ভাবিতেছে? তাহার বিদ্যানুরাগ দেখিয়া সুজাতা নিশ্চয়ই তাহাকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিতেছে। শ্রদ্ধা করিবার মত বোধ শক্তি তাহার আছে কি? সে কি চায় যে শ্রীরূপ তাহার সহিত এখন একটু আলাপ করে? কিন্তু বৃথা আলাপে সে আর সময় ব্যয় করিতে পারে না। আজ সারাদিন যে তাহার পড়া হয় নাই। বইয়ের দিকে ভাল করিয়া মন বসাইবার পুর্ব্বে শ্রীরূপের চোখ দুটা বিদ্রোহী হইয়া একবার সুজাতার দিকে চাহিয়া দেখিল। সুজাতা তাকাইয়া ছিল, তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই সে লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। মনকে তীব্র কষাঘাত করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহভরে বার্ণার্ডশয়ের Man and Superman এর ভূমিকায় চক্ষুকে নিবিষ্ট করিল। মোজার্টের গানের অভিনব ব্যাখ্যা কয়েক লাইন বেশ বুঝিল। তারপর যেন ঝোকের উপর কয়েক পাতা উল্টাইয়া গেল। মাঝে একটা কঠিন বাক্য পাইয়া তাহার মানে বুঝিতে পারিল না। পুনরায় সেই পাতাগুলি উল্টাইয়া তাহার অর্থ অনুসন্ধানের সময় দেখিল, সে এ পাতাগুলির উপর চোখ বুলাইয়া গিয়াছে মাত্র—কিছুই বুঝিবার চেষ্টা করে নাই। বিরক্ত হইয়া সে আবার সেগুলি পড়িতে আরম্ভ করিল।

সে ভাবিল সারাদিনের পরিশ্রমের পর বসিয়া পড়িতে তাহার কষ্ট হইতেছে বলিয়াই বুঝি পাঠে মনঃসংযোগ হইতেছে না। তাই সে চিৎ হইয়া শুইয়া বই পড়িতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কয়েকমিনিট পরে বুঝিল বই হইতে তাহার মন কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে। নাস্তিক্যবাদের কি একটা কথা চোখে পড়িতেই সে ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে যে সুজাতার পিতা নাস্তিক। তাহার মা শ্রীরাধামাধবের সেবায় যে অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করিতেন, সুজাতা কি তাহা পাইবার অধিকারিণী হইবে না? আহা জীবনের এক মাত্র সার্থকতা হইতে সে চিরবঞ্চিতা থাকিবে? তাহার জীবন ভোগ-বিলাসের আলেয়ার পিছু পিছু ছুটিবে, অবশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ব্যর্থতার দুঃখে ভরিয়া উঠিবে এ চিন্তাও যে তাহার নিকট অসহ্য।

কিন্তু জগতের কত লোকই তো এমন বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। একা শ্রীরূপ কি তাহাদের সকলের উদ্ধার সাধন করিতে পারিবে? সে যদি আকুলভাবে শ্রীভগবানের নিকট ভাগবতের রন্তিদেবের মতন প্রার্থনা করে যে—"হে ভগবান! জীবের সমস্ত পাপের দুঃখের বোঝা চাপাইয়া দিয়া তাহাদিগকে মুক্তি দাও।" তাহা হইলে ভগবান কি তাহার প্রার্থনা শুনিবেন? এ প্রার্থনা করিবার মতন শক্তি তাহার আছে কি? তবে এত জীব যদি ভগবদ্‌-বিমুখ হইয়া থাকে, তবে একটী বিশেষ রমণীর জন্য তাহার এত মাথাব্যথা কেন? কে সে তরুণী? শ্রীরূপের সহিত তাহার কিসের সম্বন্ধ? না না—সম্বন্ধকে সে যে নিজে মন্ত্র পড়িয়া দেবতা সাক্ষী করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে—"দুইজনের এক হৃদয় হউক" বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছে। সেগুলি কেবল কথার কথা? তবে তো আর সুজাতাকে বাহিরে ঠেলিয়া ফেলিয়া রাখা যায় না। তাহার সহানুভূতি প্রথমে আকর্ষণ করিয়া পরে তাহাকে শ্রীভগবানের অভিমুখী করিয়া তাহার জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে।

শ্রীরূপ মনস্তত্ত্বের অনেক অন্ধি সন্ধি জানিত। বহুকাল ধরিয়া মানবের মানসিক অবস্থার নানারূপ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে, তর্ক করিয়াছে। তাই সে সুজাতাকে ভক্তিপথে আনিবার এই ব্যাকুলতাকে একটু যাচাই করিতে গেল। অন্তরের দিকে দৃষ্টি করিয়া সে দেখিতে পাইল সুজাতাকে উদ্ধার করিবার মধ্যে কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ ভগবৎভাব তাহার নাই। তবে কি সে শয্যায় নারীর সান্নিধ্য লাভ করিয়াই মোহের ঘূর্ণীপাকে পড়িয়া গেল? না তাহাকে সাবধান হইতেই হইবে।

আর পড়িতে মন বসিতেছিল না। অন্য কোন চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়া সে সুজাতার চিন্তা হইতে মুক্ত হইতে চাহিল। সে বইখানা বন্ধ করিল। মনের অস্বাভাবিক অশান্ত ভাবকে দূর করিবার জন্য আলোটী স্তিমিত করিয়া সে গভীরভাবে আত্মানুসন্ধান করিবে স্থির করিল। কিন্তু ব্যগ্র হস্তে যেমনই আলোটী কমাইতে গেল তেমনি সেটী একেবারে নিভিয়া গেল।

চারিদিকে হাতরাইয়া দেশলাই খুঁজিতে গেল—কিন্তু কোথাও তাহা পাইল না। দেশলাই খুঁজিতে খুঁজিতে সহসা তাহার হাত সুজাতার চুলের খোঁপায় বাধিল। সে তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইল। ইহার পর আর তাহার দেশলাই খুঁজিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত রহিল না।

সে বিছানার শেষ প্রান্তে অতি সঙ্কুচিতভাবে পড়িয়া রহিল। কিন্তু কে যেন আজ তাহার মাথায় চিন্তার বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে। বহুচেষ্টা করিয়াও সে বোঝা ফেলিয়া দিতে পারিতেছে না। সে ভাবিতে লাগিল সুজাতা যদি জাগিয়া থাকে, তবে তাহার চুলে হাত পড়ায় সে কি মনে করিয়াছে? সে কি তাহার অন্য অভিসন্ধি কিছু কল্পনা করিয়াছে? এরূপভাবে আলো নিভাইয়া দেওয়াই বা তাহার চোখে কেমন ঠেকিবে? শ্রীরূপের মন যদি প্রকৃতিস্থ থাকিত, তাহা হইলে হয়তো সে বুঝিতে পারিত, যে গভীর রাত্রে আলো নিভাইয়া শয়ন করিবার মধ্যে দোষাবহ কিছুই নাই, কিন্তু সে যে জাগতিক সকল আকর্ষণের ঊর্দ্ধে ইহাই সুজাতার কাছে প্রমাণ করিবার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত, সেই জন্যই এই সব তুচ্ছ খুঁটিনাটি বিষয় তাহার মনকে পীড়া দিতে লাগিল।

ঘুম কিছুতেই চোখে আসিল না। কল্পনা সুন্দরীকে যেমন জোর করিয়া কিছুতেই আনা যায় না, ঘুমকেও তেমনি জোর করিয়া আনিতে গেলে, সে আরও দূরে পলায়ন করে।

খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া শ্রীরূপ বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে দেশলাইয়ের অনুসন্ধানে নীচে নরেন যে ঘরে শুইয়াছিল সেই ঘরে গেল। নরেন ও খোকা ঘুমাইতেছিল। নিঃশব্দে তাহাদের শিয়র হইতে দেশলাই লইয়া সে নিজের ঘরে ফিরিল। লণ্ঠনটী আবার সে জ্বালিল।

হঠাৎ আলোটী উজ্জ্বল হইয়া উঠায় সুজাতা হাতের আবরণ দিয়া আলো নিবারণ করিল শ্রীরূপ তাহা দেখিয়া বই দিয়া আলোকে আড়াল করিল।

বৈশাখ মাস। ঘরে বড় গরম বোধ হইতেছিল। শ্রীরূপ তালের পাখাখানি লইয়া বাতাস খাইতে লাগিল। কেহ কাছে থাকিলে ভদ্রতার খাতিরে তাহাকেও করা উচিত বিবেচনায় শ্রীরূপ সুজাতার দিকও পাখাটা কয়েকবার হেলাইয়া বাতাস করিল। সুজাতা শ্রীরূপের দিক চাহিয়া বলিল "দিন্, আমি বাতাস করছি।" শ্রীরূপ হাত বাড়াইয়া তাহাকে পাখাখানি দিল। সুজাতা বাতাস করিতে লাগিল। ঠাণ্ডা বাতাসে তাহার বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল। সুজাতার এই সহজ সেবাভাবে সে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না।

কিছুক্ষণ পরে সে বলিল, "থাক্ আর বাতাসে দরকার নাই— তোমার হাত ব্যথা হয়ে যাবে।"

সুজাতার অধর প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল—সে বলিল "না, তা যাবে না। আপনি সারাদিন আজ বেজায় খেটেছেন। আমি বাতাস করি, আপনি ঘুমান।"

শ্রীরূপ শুনিয়াছিল নব বধূকে কথা বলাইতে কত না সাধ্য সাধনা করিতে হয়। সে সব সে করিতে পারিবে না বলিয়াই ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্বে অত চিন্তাকুল হইয়াছিল। কিন্তু যখন দেখিল সুজাতা প্রথম পরিচয়টা বেশ স্বাভাবিক করিয়া তুলিল তখন তাহার মন হইতে একটা গুরুভার যেন নামিয়া গেল। সে সারাদিন পরিশ্রম করিয়াছে ইহা সুজাতা লক্ষ্য করিয়াছে জানিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল। আর তার চেয়েও বেশী আনন্দ পাইল সুজাতার সহানুভূতিতে। সে অতি কোমল স্বরে বলিল—"ঘুম আর আজ হবে না। অনেক রাত তো আমার বই পড়েও কেটে গেছে। না ঘুমুলে আমার বিশেষ কষ্ট হবে না। তুমি বরং পাখা রেখে ঘুমুবার চেষ্টা কর।"

সুজাতা। "ঘুম আমারও যে আসছে না।"

শ্রীরূপ। "আমি বিছানায় থাকাতে তোমার ঘুমের অসুবিধা হচ্ছে কি? তা হলে আমি না হয় নীচে একটা মাদুর পেতে শুই, আমার তো তা অভ্যাসই আছে।"

সুজাতা তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "না না আমার কোন অসুবিধা হচ্চে না। আর আজ যে আলাদা থাকতেও নাই।" এ কথার পর আর কি বলিবে—কি রকম করিয়া কথাবার্ত্তা চালাইবে তাহা শ্রীরূপ ভাবিয়া পাইল না।

নব দম্পতীর মধ্যে অনেকক্ষণ একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। আলাপের সূত্রপাত মাত্র করিয়াই এরূপ ভাবে চুপ করিয়া যাওয়া যে নিতান্ত বিশ্রী তাহা উভয়েই বোধ করিল। মনে কত রকম কত কথা জাগিতেছে। কিন্তু প্রথম পরিচয়ে মনে যখন যেটা ওঠে, সেটা বলাও যায় না। তাই দুজনাই চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। সুজাতা কোন প্রশ্ন করিলে পাছে শ্রীরূপ তাহাকে প্রগলভা ভাবেন, সেই ভয়ে কোন কথাও বলিতে পারিতেছিল না। অবশেষে শ্রীরূপ অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিল "বৈকালবেলা তোমার একলা থাকতে বোধ হয় খুব কষ্ট হচ্চিলো?"

সুজাতা একটু ভাবিয়া উত্তর দিল "না কষ্ট আর কি? বরং একা একা আপনার বইয়ের আলমারী দেখে বেশ সময়টা কাটছিল।"

শ্রীরূপ। "কোন বই পড়ছিলে কি?"

সুজাতা এ প্রশ্নে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল। সে সলজ্জ ভাবে বলিল, "আপনার অধিকাংশ বই-ই তো সংস্কৃতে লেখা। আমি তো সংস্কৃত জানি না।"

শ্রীরূপ। "সংস্কৃত কি মোটেই জান না?"

সুজাতা। "যেটুকু জানি তাতে বই পড়িয়া নিজে বুঝা যায় না। আমার বাবা বলেন, এ যুগের সাধারণ শিক্ষার পক্ষে সংস্কৃত শেখার কোন দরকারই নাই।"

শ্রীরূপ নিজের সংস্কারের বিরুদ্ধে কিছু শুনিলেই সহজে উত্তেজিত হইয়া উঠে। সুজাতার এই উত্তর শুনিয়া সে একেবারে সপ্তমে সুর চড়াইয়া বলিল "বল কি, সংস্কৃত না পড়লে আবার শিক্ষা? যে ভাষায় জ্ঞান রাজ্যের উচ্চতম চিন্তার বিকাশ হয়েছে, যে ভাষায় দার্শনিক জটিল সমস্যা-গুলির সরল, সুন্দর মীমাংসা হয়েছে, যে ভাষায় গীতা ভাগবতে

মানব জীবনের একমাত্র চরিতার্থতার বার্ত্তা ঘোষিত হয়েছে, সেই ভাষা না জেনেও শিক্ষার গর্ব্ব করা তো আমার কাছে নিতান্ত মূঢ়তা বলে বোধ হয়। আর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে, হিন্দুর ছেলে হয়ে যিনি সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগীতা স্বীকার করেন না, তাঁকে তো আমি স্বদেশদ্রোহী, স্বজাতি-দ্রোহী বলিয়া মনে করি। নবীন ভারত কি কেবল পশ্চিমের উচ্ছিষ্ট খেয়েই আজ স্বাধীন হবার আকাঙ্খা পোষণ করে? সংস্কৃত না পড়িলে আমাদের যুগ যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবীকাঠি পাব কোথায়? এ সব প্রশ্ন যাঁরা চিন্তা না করেন, তাঁদের পক্ষে শিক্ষা সম্বন্ধে কোন মতামত দিতে দিতে যাওয়াই উচিত নয়।" শ্রীরূপ একদমে এতগুলি কথা বলিয়া হাঁপাইয়া পড়িল!

সে চুপ করিল। সুজাতাও ইহার পর চুপ করিয়া রহিল। শ্রীরূপের উপর প্রথম দর্শনেই যে একটা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়াছিল, তাহা আবার মাথা তুলিল। তাহার অমন দেবতুল্য পিতাকে যে ব্যক্তি নিন্দা করিতে পারে—তাহার সহিত আর কোন বাক্যালাপ করিতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তাহার পিতার কোন নিন্দা কোনদিন তাহাকে শুনিতে হয় নাই—সেই সদানন্দময় পুরুষকে কেহ কখনও গ্লানি করিবার সুযোগ পায় নাই। আর আজ তাহার স্বামী তাঁহাকে নিন্দা করিলেন—যে স্বামীকে তাহার পিতা কত উপযুক্ত পাত্রের মধ্যে বাছিয়া লইয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন। সে আশা করিয়াছিল তাহার স্বামী তাহার পিতার অগাধ বিদ্যার পরিচয় পাইয়া কত জ্ঞানালোচনা তাঁহার সহিত করিবে—আর সে প্রশংসমান চক্ষুতে নীরবে সেই আলোচনা শুনিবে। কিন্তু একি তীব্র অসহিষ্ণু মন্তব্য তাহার স্বামীর। কই তাহার পিতা তো মতভেদ হইলে, এরূপ কঠোর ভাবে আক্রমণ করেন না।

কিন্তু এমন চুপ করিয়া পিতৃনিন্দা সহ্য করাও তো অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া তাহার মনে হইল। সে নীরসকণ্ঠে বলিল—"দেখুন আপনি আমার পিতার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না—অথচ আমার কাছে তাঁর একটা মত শুনেই তাঁর প্রতি অনেকগুলি কটুকথা প্রয়োগ করলেন। আপনি জানেন যে সংস্কৃতে তাঁর অসাধারণ দখল—তিনি সেকালের সংস্কৃতেরই এম-এ?"

শ্রীরূপ এরূপ প্রতিবাদ আশা করে নাই। সেও নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভাবে বলিল—"তিনি কি তা জেনে তো আমার লাভ নাই। তাঁর মতটাকেই আমি প্রতিবাদ করছিলাম—তাঁকে নয়।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া খুব জোর দিয়া বলিল—"তুমি যতদিন তাঁর কাছে ছিলে ততদিন তাঁর মতে চলেছো—বেশ ভালই করেছ। কিন্তু এখন তুমি আমার স্ত্রী—আমার ধর্ম্মেকর্ম্মে সহায় হবে বলেই তোমাকে ধর্ম্মপত্নী-রূপে গ্রহণ করেছি—অতএব তোমাকে এখন আমার মতামত জেনেই চলতে হবে। এতে তোমার উপর কোন জবরদস্তি করছি বলে মনে করো না। তোমারই মঙ্গলের জন্য এটা বলছি। তোমার কথাবার্ত্তা শুনে মনে হচ্চে তুমি বুদ্ধিমতী—অল্প চেষ্টা করলেই সংস্কৃত শিখতে পারবে। তখন ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কত আনন্দ পাবে। ইংরাজী শিক্ষায় মনকে বহির্ম্মুখ করে তোলে—ভোগবিলাসের প্রতি আমরা সহজেই আকৃষ্ট হই। আর সংস্কৃত শিক্ষায় আমাদের চিত্তবৃত্তি সমূহ অন্তর্ম্মুখী হয়—অন্তরে পরমার্থ অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছার উদয় হয়। তুমি আজ যে আলমারির বই নাড়াচাড়া করছিলে, ওগুলি সব আমার মায়ের। তিনি নিজে ওগুলি বহুবার পড়েছেন—গ্রন্থগুলির তিনি পূজা করতেন। তুমি যদি তাঁর উপযুক্ত পুত্রবধূ হ'য়ে ওগুলির সদ্ব্যবহার করতে পার তাহলে আমি বড় আনন্দিত হবো।"

সুজাতা এ কথায় কোন উত্তর দিল না। তাহার নিজের পিতার মতকে ত্যাগ করে, শ্রীরূপের মাতার স্মৃতি পূজা করিবার জন্য কেন যে সে নূতন করে জীবনকে গঠন করে তুলবে তার কোন সঙ্গত কারণ সে পাইল না। শ্রীরূপের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে—তিনি তাহার ভরণ-পোষণের ভার লইয়াছেন—সেই জন্যই আজ তাহাকে নিজের মতে লওয়াইবার জন্য তিনি কোন অনুরোধ উপরোধ করিলেন না—যুক্তি প্রদর্শনের কোন প্রয়োজনই বোধ করিলেন না—কেবল মাত্র স্পষ্টভাষায় আদেশ করিলেন যে যেহেতু তাহাকে স্ত্রী বলিয়া তিনি গ্রহণ করিয়া তাহাকে ও তাহার পিতাকে কৃতার্থ করিয়াছেন—সেই হেতুই তাহাকে তাহার আবাল্যের সংস্কার

ও মত পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার মতকে আজ এক কথায় অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে? "নস্ত্রীস্বাতন্ত্র্যমর্হতি" কথাটা তাহার জানা ছিল—কিন্তু স্ত্রীর কি কোন স্বতন্ত্র মত পোষণ করিবার ক্ষমতাও নাই? তাহাতেও কি নারী উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে? সুজাতার আজ সহসা মনে হইল নারীর জীবনটা বুঝি বিড়ম্বনা মাত্র। তাহা হইলে তাহার যে স্বামী খবরের কাগজে নিত্য স্ত্রী স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তিনি এমন মত প্রকাশ করিবেন কেন? স্ত্রী স্বাধীনতা কি কেবল একটা মতামতের বিষয়ই হইয়া থাকিবে—কোনদিন কি বাস্তবজীবনে তাহা প্রকাশ পাইবে না? এইরূপ নানা চিন্তায় তাহার মন ভরিয়া গেল।

এদিকে লম্বা বক্তৃতা করিয়া শ্রীরূপও যে মনের সমস্ত ভার নামাইয়া দিতে পারিয়াছিল তাহা নহে। ঝোঁকের মাথায় সে তাহার শ্বশুরের প্রতি সত্যই অবিচার করিয়াছে। বৃদ্ধের প্রশান্ত সমাহিত মূর্ত্তি দেখিয়া সে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার ভাবই পোষণ করিয়াছিল। তথাপি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া সে নিতান্ত উত্তেজনা বশেই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়াছে। এ জন্য সে অনুতপ্ত। অথচ সে অনুতাপ এখন প্রকাশ করিলে পাছে সুজাতা মনে করে সে তাহার সহিত আবার পায়ে পড়িয়া ভাব করিতেছে। এইজন্য তাহাও করিতে পারিল না। তাহার আরও মনে হইল সে নিজের অজ্ঞাতসারে সুজাতাকে তাহার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম জীবনের সঙ্গিনী হইবার জন্য আদেশ করিয়াছে। সে তো সঙ্গিনী পাইবার জন্য বিবাহ করে নাই, তবে এ দাবী তাহার মুখ হইতে বাহির হইল কি করিয়া?

দুইজনেরই মন যখন এইরূপ চিন্তাকুল তখন আর কথা-বার্ত্তা বলা চলে কি করিয়া? আলো জোরে জ্বলিতে লাগিল। ক্ষোভে ও অনুতাপে তরুণ তরুণীর মন ভারাক্রান্ত হইল। উভয়েই সে রাত্রি জাগিয়া কাটাইল। সুজাতার কেবলই মনে হইতে লাগিল যে আজ হইতে তাহার সমস্ত স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর হাতের পুতুল হইয়া থাকিতে হইবে। এ চিন্তা অসহ্য—কিন্তু আজও নারীর পক্ষে এ ভাগ্য অপরিহার্য্য।

স্মৃতি

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

অসীমের ওপারে ওই লালফাগুয়ার হোলিখেলা!
কেমনে মন বঁধুয়ার কাটবে গো এই অলস বেলা?
চিতস্রোত বাঁধ মানে না
অচেনায় জানাশোনা
মধুপ আর কুসুমকলির কোলাকুলির মোহনমেলা!
উড়ে যায় আকাশ কোলে
পাখীরা দলে দলে
ভেসে যায় উধাও হ'য়ে সেই সাথে মন হেলাফেলা!
আঁখি কার পড়ে মনে
আজি এই মধুরক্ষণে
জাগায়ে অতীত স্মৃতি মনের মাঝে দেয় হিন্দোলা!

ধানের ক্ষেত।

মায়ের আগমন

[শ্রীপ্রমথভূষণ পাল চৌধুরী এম-এ, বি-এল, এম, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)]

অরুণ যখন বিলাত হতে মিঃ এ বানার্জ্জি হয়ে ফিরে এল তখন সকলেই একটু আশ্চর্য্য হয়ে পড়েছিল। কাউকে বিলাত হতে সাহেবী ভাবাপন্ন হয়ে ফিরতে দেখলে চিরদিনই সে উপহাস করে এসেছে তাই সকলেই আসা করেছিল যে অরুণ যখন ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফিরবে তখন বোধ হয় সে অরুণ শর্ম্মাই থেকে যাবে কিন্তু চার বৎসর বিলাতে বাস করার পর অরুণ বন্দ্যো পুরোদস্তুর সাহেব হয়েই ফিরল।

দেশে এসে সে স্ত্রী রমার জন্য একটী মেম গভর্ণেস নিযুক্ত করলে, বাড়ীর দেববিগ্রহটীকে পুরোহিত বাড়ী পাঠিয়ে দিলে, দেবদেবীর ছবিগুলি খুলে দেওয়ালে বিলিতী ছবি টাঙালে ও পুরোন দাস দাসীর বদলে বাবুর্চ্চী খানসামা নিযুক্ত করলে।

রমা প্রথম প্রথম মৃদু আপত্তি করেছিল কিন্তু তাতে স্বামীর অসন্তোষ বৃদ্ধি পাওয়ায় সে মৌখিকভাবে অরুণের মতে মত দিয়ে চলতে লাগল। গোপনে কিন্তু সে তার পুরোণ জীবনকে ফিরে পাবার জন্য ঠাকুরের কাছে কত প্রার্থনাই করত। দেবতা তার প্রার্থনা কোন দিন সম্ভবপর করেন কিনা সে জানত না তবু সে সম্পূর্ণ প্রাণ মন দিয়েই দেবতাকে তার নতি জ্ঞাপন করত—ব্যাকুলতা জানাত। সে কেবলই ভাবত কেন তার স্বামী এমন বদলে গেলেন। অরুণের অতীত জীবনের ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি অযাচিত পরোপকার প্রভৃতি কত কথাই তার মনে পড়ত। রমার মনে হত কি করলে আবার পূর্ব্বের মত হয়

অরুণ আসার পর দেখতে দেখতে ছমাস কেটে গেল। বাংলায় শ্যাম অঞ্চলের ছায়ায় ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হলেন শরৎরাণী। পরিধানে তাঁর স্নিগ্ধ সবুজের পোষাক, কুন্তলে অজস্র তারার ফুল, হাতে তাঁর স্থলপদ্ম ও শেফালীকার থালী। তাঁর আগমনে দিকে দিকে হর্ষপুলক খেলে গেল, নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হল। অরুণের চণ্ডীমণ্ডপে কিন্তু এবার কোন হর্ষ শিহরণ খেলে গেল না। ভাদ্রমাস শেষ হল, আশ্বিন এসে পড়ল, তবু পূজার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। রমার ভয় হল, অরুণ কি দুর্গাপূজা করবে না? সে যে তার জ্ঞান-উন্মেষের দিন হতেই শারদীয়া পূজার এই দিন কয়েকটীর জন্য সারা বৎসর চেয়ে থাকে, অসুরদলনী অশিবনাশিনীর কাছে সে যে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ আশা আনন্দ নিঃশেষে নিবেদন করে জীবনকে ধন্য করে নেয়। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। পিতৃগৃহে তার দুর্গাপূজা হত, তার বড় ভয়ছিল শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধে। কিন্তু বিয়ের পর রমা যখন দেখলে যে এখানেও দুর্গাপূজা হয়, তখন তার কি আনন্দই না হয়েছিল।

রমা সেদিন ভয়ে ভয়ে অরুণকে কথাটা জিজ্ঞাসা করে ফেলল। অরুণ তখন সকালে চা খাচ্ছিল' রমার কথা শুনে সে বাটীটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে বললে, কি বলছিলে দুর্গাপূজার কথা? করতে ইচ্ছে হচ্ছে? করতে ইচ্ছে হয় করতে পার, আমি ওর মধ্যে নেই, যেদিন পূজো করবে আমায় আগে খবর দিও, দার্জিলিং কি শিলং যাবার ইচ্ছা আছে। অরুণের মুখে একটা তীব্র ব্যঙ্গের হাসি ফুটে উঠল। স্বামীর কথায় রমা একটু বিপন্নভাবে বলল, না, তোমায় শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার অমতে আমি কিছু করি? তবে কুলপূজা বলে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। অরুণ তখন সন্তুষ্ট হয়ে বললে, তুমি রমা এখনও পুতুল পূজা মান? এত শিখেও তোমার কুসংস্কার গেল না! মাটী দিয়ে পুতুল গড়িয়ে তার আবার পূজা। বিলাত যাবার আগে আমারও তোমার মত বুদ্ধি ছিল। রমা স্বামীর কথায় তাঁর মুখপানে একবার চেয়ে দেখলে, তারপর আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা মানুষ কি একবারেই অনন্ত ব্রহ্মের চিন্তা করতে পারে? আমাদের জ্ঞান, আমাদের কল্পনা ক্রমে ক্রমে বাড়ীয়ে না তুললে তাকে একেবারে কি অনন্ত সত্বার ধ্যানে নিযুক্ত করতে পারা যায়? ছেলে যখন প্রথম লেখাপড়া শেখে তখন প্রথম ভাগের একটা পৃষ্ঠাই তার কাছে কত বেশী মনে হয়, তারপর যখন তার জ্ঞান

ও কল্পনাশক্তির প্রসার হয় তখন সে একখানা দুহাজার পৃষ্ঠার বই অনায়াসে পড়ে যেতে পারে। ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়ে আমাদের জ্ঞান ত খুবই অসীম তাই সাকারের মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মের সত্তার সঙ্গে কল্পনায় পরিচয় পাবার চেষ্টা আমরা করি না কি? আমরা ত শুধু মাটী পূজা করিনা তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে তবে তার পূজা করি। অরুণের মনে রমার কথাগুলি ভাল করেই ঘা দিল কিন্তু সে তখনই তা ঝেড়ে ফেলে বললে, ও সমস্ত সূক্ষ্ম দর্শনের কথা নিয়ে এখন আমার তর্ক করবার সময় নেই তবে আমি এখন পুতুল পূজা করতে পারব না আর এককথা, দুর্গাপূজা আমাদের কুলপূজা বলেই কি করতে হবে? আমাদের পূর্ব্বপুরুষের যে বিশ্বাস ভুল, তাকে ভুল জেনেও মেনে নেব কেন?

এমনি কথাবার্ত্তা হচ্ছে এমন সময় চাপরাশী খবর দিল, বাইরে কে একজন সাহেবকে সেলাম দিয়েছেন। অরুণ রমাকে অপেক্ষা করতে বলে বাইরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে এসে রমাকে বললে, দেখ আমার একবার মফঃস্বল যেতে হবে একটা জরুরী মোকর্দ্দমা পেলাম। কতকগুলো দুষ্ট প্রজার চক্রান্তে একজন জমিদার ফৌজদারীতে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। শুনলাম জমীদারটী খুব ভাল, নিজের ক্ষতি সহ্য করে ও প্রজার হিত করাই তাঁর ব্রত ছিল, কিন্তু সাধারণ প্রজার ভাল করতে গিয়ে কয়েকজন দুষ্ট প্রজার বিষ-নয়নে পড়ে তাঁর এই অবস্থা দাঁড়িয়েচে। আমাকে আজই বার হতে হবে। রমা একবার জিজ্ঞাসা করলে, ফিরতে কদিন হবে? অরুণ বললে, যখন বেরোচ্ছি নিজের কটা কায আছে সে কটাও সেরে আসব, দিন বাইশ এর বেশী হবে না বোধ হয়।

অরুণের যাত্রার পূর্ব্বে রমা পূজার কথা আর একবার তুলেছিল কিন্তু অরুণের কাছে একটা বিরক্তিব্যঞ্জক কথা শুনে সে চুপ করে গেল। যথাসময়ে অরুণ মফঃস্বলে চলে গেল।

পূজার দিন যতই নিকটবর্ত্তী হচ্ছিল রমার অন্তরও যেন তত চঞ্চল হয়ে উঠছিল। তার শৈশবের আশা, যৌবনের আনন্দ—পূজা এবার হবে না যখন তার মনে হচ্ছিল তখনই এক দুর্নিবার অবসাদে রমা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল

পঞ্চমীর রাতে রমা স্বপ্ন দেখলে, মা দুর্গা তাঁর দশ হাতে দশ প্রহরণ ধরে সিংহের ওপর চড়ে রমার শিয়রে দাঁড়িয়ে যেন বলছেন, ওঠ রমা আমি এসেছি, তুই আমার বসবার জায়গাটা ঠিক করে দে দেখি। ঠিক সেই সময় রমার ঘুম ভেঙে গেল। রমা উঠে দেখে কোথায়ই বা মা দুর্গা, কোথায়ই বা সে! তার সমস্ত মনে পড়ে গেল। অপরের বাড়ীতে ষষ্ঠীর নহবৎ বেজে উঠল কিন্তু তার বাড়ীতে আজ আর নহবৎ বাজল না, শূন্য চণ্ডীমণ্ডপ বিরাট শূন্যতা নিয়ে তার পানে চেয়ে রইল। রমা আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না। হাত মুখ ধুয়েই সে চণ্ডীমণ্ডপে ছুটল। সেখানে সে মাটীতে পড়ে বড় কান্নাই কাঁদিল। অমন কান্না বোধ হয় আর সে কখনও কাঁদে নি। এবার পূজা হবে না মনে পড়ে আর দু'চোখ দিয়ে তার অশ্রুর বন্যা ছোটে। তার কেবলই মনে হতে লাগল কি পাপে মা তাকে ত্যাগ করে গেলেন। উদ্দেশে সে মাকে কত মিনতিই জানালে, কত প্রার্থনাই করলে। সে যে মায়ের অভাব সহ্য করতে পারে না। সে যে তার সারা প্রাণ মন দিয়ে মাকে চায়। সারা বৎসর সমস্ত সুখ দুঃখ নিঃশব্দে ভোগ করে সে যে শরতের এই দিন কয়টার আশায় আকুল আবেগ নিয়ে ভক্তির ডালা সাজিয়ে বসে থাকে কবে মা তাঁর পূত মঙ্গলযুক্ত দর্শন দিয়ে তাকে সার্থক করবেন, ধন্য করবেন। সে যে বড় দীন, বড় আর্ত্ত, বড় বিপন্ন। মা যে সময়ে অসময়ে দেশে প্রবাসে তাঁর সন্তানের মঙ্গল কামনায় ঘুরে বেড়ান, সন্তানের নিজ হাতে গড়া বিপদের মাঝে ফিরে ফিরে আসেন, তিনি কি তাঁর এই ক্রিয়াহীনা, ভক্তিহীনা কন্যাটীর কুটীরে আসবেন না? না না সে যে তা ভাবতেও পারে না। আয় মা, আয় মা, তোর এই মন্ত্রহীনা, ক্রিয়াহীনা কন্যাকে দয়া কর, তার এ দীন কুটীরে পদার্পণ করে তাকে ধন্য কর, কৃতার্থ কর, তার জীবনকে সফল কর। এও যে তোরই সন্তান মা! রমা আর ভাবতে পারল না, কেঁদে লুটিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হঠাৎ স্বামীর স্বর তার কানে গেল। সে শুনল, তার স্বামী যেন আবার সেই বহুদিন-ভুলে-যাওয়া পূর্ব্বের মতই সরল খোলা প্রাণে তাকে আহ্বান করে বলছেন, রমা ওঠ, মা এসেছেন, তোমার ডাকে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি, তাঁকে বরণ করে নাও, ওই দেখ তিনি আসছেন। রমা ভাবল সে বুঝি স্বপ্ন দেখচে, কিন্তু তারপর দেখল সে তো

স্বপ্ন নয়, সত্যই মা দশহাত বার করে আসছেন, পাশে তার স্বামী। প্রতিমার পশ্চাতে অসংখ্য ভারী থরে থরে বিভিন্ন পূজার উপকরণ নিয়ে আসছে। কিসে কি হল, সে বুঝতে পারল না, রমা অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

জ্ঞান হয়ে রমা দেখল যে সে তার শয়নকক্ষে শুয়ে আছে, পাশেই তার স্বামী উদ্বিগ্ন নয়নে তার পানে চেয়ে আছেন, পরিধানে তাঁর পট্টবস্ত্র। অদূরেই একজন ডাক্তার বসে তাঁর স্বামীকে কি বলছেন। রমাকে চোখ খুলতে দেখে ডাক্তার বললেন, মিষ্টার ব্যানার্জি, আর কোন ভয় নেই, দরকার বোঝেন ওষুধটা একবার খাইয়ে দেবেন, আমি এখন চললাম। এই কথা বলে ডাক্তারটী নমস্কার করে চলে গেলেন।

রমা তার স্বামীকে পট্টবস্ত্র পরে থাকতে দেখে বিস্মিত নয়নে তাঁর পানে ফ্যাল ফ্যাল করে চাইতে লাগল। অরুণ তার এই দৃষ্টি লক্ষ্য করে বললে, রমা আমাকে এমন বেশে দেখে বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছ? হাঁ, আশ্চর্য্য হবারই কথা। কেমন করে আমার এ পরিবর্ত্তন এত শীঘ্র হ'ল তা ভেবে আমিই আশ্চর্য্য হচ্ছি, তুমি ত হবেই। যে মোকর্দ্দমাটী সেদিন হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম দিন কয়েকের মধ্যেই সেটী হয়ে গেল, আমরা জিতলাম। সত্য কথা প্রকাশ পেল, জমীদারটী সসম্মানে খালাস পেলেন। তারপর ক'টা কাযে বাংলার অনেক জায়গায় ঘুরলাম, পশ্চিমেও একবার যেতে হয়েছিল। যেখানে গেছি সেখানেই দেখেছি বাঙালীর ঘরে ঘরে মহামায়া আসবেন বলে যেন এক আনন্দের মেলা বসে গিয়েছে। যে বড় দুঃখী তার মুখেও একটা শান্তির ছায়া, হর্ষের ছায়া ফুটে উঠেছে। এইভাব দেখেছি আর আমার মনে কিসের যেন এক ধাক্কা লেগেছে। মনে পড়েছে আমার বাড়ীতেও প্রতি বছর এমনি দিনে এমনি আনন্দের ঢেউ বয়ে যেত। প্রথম প্রথম মনের এ চাঞ্চল্যকে দূর করে দিইচি কিন্তু সে চাঞ্চল্য থামে নি, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছিল। তারপর পশ্চিমে গিয়ে যখন দেখলাম যে সেই সুদূর প্রবাসেও বাঙালীরা মাকে আনবার জন্য ব্যস্ত, যার অবস্থা নেই সে ভিক্ষা করে চাঁদা তুলেও জগজ্জননীকে আনবার জন্য কৃতসঙ্কল্প তখন মন আমার ভীষণভাবে দুলে উঠল। মনে হ'ল বাস্তবিকই কি এরা সকলেই ভ্রান্ত! হিন্দুরা কি একটা ভুলের পেছনেই যুগের পর যুগ ধরে ছুটেছে! সে যে অসম্ভব! আমরা তবে কি শুধু মাটীপূজা করি না? মনে পড়ল তুমি একদিন বলেছিলে আমরা মৃন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীর উদ্বোধন করি। মন বড় খারাপ হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি কায সেরে ছুটে এলাম, কুমোর বাড়ী নিজেই গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি সে প্রতিমা গড়িয়েই রেখেচে। আশ্চর্য্য হয়ে তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। কুমোর বললে, একদিন সে স্বপ্ন দেখল যেন মা তাকে প্রতিমা একখানি গড়িয়ে রাখবার জন্য বলছেন, সে প্রথম প্রথম সেটা তত খেয়াল করে নি কিন্তু দ্বিতীয় দিন তৃতীয় দিন সে একই স্বপ্ন দেখলে, তাই সে প্রতিমাখানি গড়িয়ে রেখেচে। চল রমা, মা তোমার আহ্বানেই এসেছেন, তাঁকে বরণ করে নেবে চল।

রমা তখন বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছিল কিন্তু মনে তখন তার যে এক অভূতপূর্ব্ব হর্ষ, বিস্ময়, আকুলতা, ভক্তি প্রভৃতির বন্যা বয়ে চলেছিল তাতে সে কথা বলতে পারল না, গলায় আঁচল দিয়ে স্বামীর পেছনে পেছনে চণ্ডীমণ্ডপে গেল। ঘণ্টা তিনেক আগে যে চণ্ডীমণ্ডপ একটা বিরাট ব্যর্থতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল রমা দেখলে এখন সেখানে জগজ্জননী সারা ঘর আলো করে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন, পাশেই ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠে নিযুক্ত। রমা একদৃষ্টে জগজ্জননীর পানে চেয়ে রইল, চোখ দিয়ে তার ধারায় ধারায় ভক্তি-অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। ব্রাহ্মণ তখন পাঠ করছিলেন,—

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি, পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা,
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি রনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তি-হেতুঃ॥

ব্যথা

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী গঙ্গোপাধ্যায়]

(১)

বিবাহ সময়ে করিলে মোদের সুখ কামনায় যাগ ;
করিলে শপথ চিরদিন তরে দিবে সুখ-দুখ-ভাগ ;
পরমেশ্বরে করিয়া সাক্ষী ক'রেছিলে পরিণয় ;
শপথ পালন কোথা গেল ? শুধু মিথ্যার অভিনয় !
বুঝেছি, পুরুষ জাতি—
ভ্রমরের মত বেড়ায় ফিরিয়া নিত্য নূতনে মাতি ।

(২)

বাসক শয়নে দিয়েছিলে প্রভু কত না সুখের আশা ;
সেখানে আমারে কত না আদর, বুকভরা ভালবাসা ;
'চিরতরে তোমা হৃদয়ে রাখিব' ব'লেছিলে কত তুমি
কোথা গেল প্রিয় সেই সব হায় ! কোথা আজ সেই তুমি !
বুঝেছি, পুরুষ জাতি—
ভ্রমরের মত বেড়ায় ফিরিয়া নিত্য নূতনে মাতি ।

(৩)

ছিলাম যখন শুধুই বালিকা ধরিয়া আমার হাতে,
কহিতে যে প্রিয় ভালবাস আমা আপনার প্রাণ হ'তে,
হরষ হৃদয়ে আঁকিতাম আমি স্বরগের কত ছবি ;
কোথা আজ হায় সেই ভালবাসা ! ভুলে কি গিয়েছ সবি ?
বুঝেছি পুরুষ জাতি—
ভ্রমরের মত বেড়ায় ফিরিয়া নিত্য নূতনে মাতি ।

(৪)

আগে ওগো প্রিয় আমারে দেখিয়া পাইতে কত না সুখ ;
কলেজ হইতে আসিতে পালায়ে দেখিতে এ পোড়ামুখ ;
চুপি চুপি মোরে পান সেজে দিতে কহিতে, চাহ না আর ;
আজকাল তব দেখা নাহি পাই দিনেও একটী বার !
বুঝেছি, পুরুষ জাতি—
ভ্রমরের মত বেড়ায় ফিরিয়া নিত্য নূতনে মাতি ।

(৫)

তোমার উপরে রহিতাম আমি যবে অভিমান ক'রে,
কত সাধাসাধি করিতে প্রাণেশ কথা কহিবার তরে ;
এখন হয়েছে সবই বিপরীত, তুমিই কহ না কথা !
পায়ে ধরে তব কাতর মিনতি, শুধু মোর হয় বৃথা ।
বুঝেছি, পুরুষ জাতি—
ভ্রমরের মত বেড়ায় ফিরিয়া নিত্য নূতনে মাতি ।

(৬)

আমারি একটী চুম্বন পরে ছিল তব কত লোভ,
না লভিলে তাহা জানাতে আমারে হৃদয়ের যত ক্ষোভ ;
কোথা সেই সব প্রণয়ের খেলা ? কোথা সেইদিন স্বামী ?
বৃথা অনুযোগ, বৃথা অভিযোগ, মিছা খেদ করি আমি ।
বুঝেছি, পুরুষ জাতি—
ভ্রমরের মত বেড়ায় ফিরিয়া নিত্য নূতনে মাতি ।

সাহিত্যিক

[শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত]

তরুণ প্রাণে প্রেমের আলো জ্বালিয়া কল্পনায় গড়া কোন এক তরুণী মূর্ত্তির পূজা বাস্তব জগতের চেয়ে কাব্য জগতে করা বেশী সম্ভব বলিয়াই বোধ করি প্রভাতকুমার সহসা একদিন কবিতা লেখা সুরু করিলেন।

প্রভাত চোখে রিমলেশ চশমা ধরিল, মেয়েলী সুরে কথা বলিতে সুরু করিল, মেঘনাদ, বলাকা, প্রভৃতি কবিতার রাশী কণ্ঠস্থ করিল—এক কথায়, কবি হইতে হইলে যাহা করিতে হয়, প্রভাত তাহার সব কটি ই করিল।

দুর্ভাগ্য-পীড়িত বাংলাদেশের অর্ব্বাচীন সম্পাদকগুলা বোধ করি গুণের আদর করিতে একেবারেই জানে না,—প্রভাত দেখিল, তাহার সযত্ন-রচিত কবিতার রাশী মাসিকের পাতার শোভা বর্দ্ধন না করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহারই নিকট ফিরিয়া আসিতে লাগিল। তাহাতে না ছাপিবার কোন কৈফিয়ৎ নাই, কারণ লেখা নাই, শুধু লাল কালীর হরফে মাত্র কয়েকটা অক্ষর—অমনোনীত।

প্রভাত স্থির করিল, কবিতা ছাড়িয়া গল্প লিখিতে সুরু করিবে। কিন্তু...কেমন করিয়া লিখিবে? এত বড় জীবন-টায় কখনো গল্প লেখার ধারণা তো তাহার মাথায়ও আসে নাই...কি করিয়া লিখিতে হয়—

..... ঠিক!—প্রভাত বহু পুরাতন মানসী, ভারতবর্ষের পাতা উল্টাইয়া প্লট সংগ্রহে মনোনিবেশ করিল। কিন্তু মুস্কিল হইল ভাষা লইয়া; ভাব ও ভাষা, এই দুইটীর মধ্যে একটা প্রবল দ্বন্দ্ব সে দেখিতে পাইল। প্রাণপণ পরিশ্রম ও চেষ্টা নাকি বৃথা যায় না একদিন বিজয়লক্ষ্মী আসিয়া ধরা দিলেন।

নির্ঝরের পাতায় যেদিন তাহার 'আকাঙ্খিতা' তাহার নামটাকে ছাপার হরফে সগৌরবে বক্ষে ধরিয়া জনসাধারণের সম্মুখে বাহির হইল, সে দিনটা তাহার কাছে বড় সুন্দর হইয়াই রাঙাইয়া উঠিল। বন্ধুমহলে প্রভাত জারী করিয়া দিল, অচিরেই সে বঙ্গ সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠলেখকের সম্মান গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে।

শুধু লেখক কেন, সম্পাদক মহলেও একটা অপবাদ আছে যে নূতন লেখকের লেখা তাঁহারা ছেঁড়া কাগজের-বাক্সে নিক্ষেপ করিতে প্রগাঢ় যত্ন লইয়া থাকেন। প্রভাতের ভয় কাটিয়া গেল, তাহার 'আকাঙ্খিতা' তাহাকে নূতন লেখকের আখ্যা হইতে মুক্তি প্রদান করিল। প্রভাত প্রাণপণে লেখনী চালাইতে সুরু করিল।

একটা দুইটা করিয়া যখন তাহার দশ বারোটা গল্প ও পাঁচ ছয়টা কবিতা একে একে জনসাধারণের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিল, প্রভাত নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিল। তাহার মত ভাগ্যবান কে?—এই তো সেদিন তাহার 'শতদ্রু নদীর তীরে' গল্পটা পড়িয়া ক্লাবের সেক্রেটারী মুক্তকণ্ঠে বলিলেন, এমন চমৎকার লেখা অনেকদিন পড়েন নাই, আলোর ছায়া, প্রায়শ্চিত্ত প্রতিভাহীনের নীচতা—কোন্‌টা-ই না প্রশংসা লাভ করিয়াছে? কেবল ধীরেন-ই বা মুখের উপর বলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার লেখা না-কি বাংলাদেশের বড় বড় গ্রন্থকারদিগের পুস্তক হইতে গৃহীত—আরে ছিঃ ছিঃ ওটা আবার একটা মানুষ? মূর্খ মূর্খ!

মূর্খটা বুঝিল না নিজে লেখার চেয়েও গ্রহণ করাটা কত শক্ত। আর বুঝিবে-ই বা কি করিয়া? কলম দিয়ে যদি পাটের চাষ চলিত—

ঠিক পরের মাসের নির্ঝরের পাতায় যে দিন তাহার 'জগা মাসী' বলিয়া গল্পটা স্থান লাভ করিল তাহার কয়দিন পরেই কোন এক সাপ্তাহিকে সুদূর পশ্চিম হইতে জনৈকা পাঠিকা সমালোচনা করিলেন, এমন গল্প না কি অনেকদিন সাহিত্যের কবলে আত্ম-সমর্পণ করে নাই। ভাব ভাষা অবর্ণনীয়! আরও লিখিলেন, লেখকের সহিত দুর্ভাগ্যক্রমে পরিচিতা নহি, তাই এই সুদূরে বসিয়াই তাহাকে অন্তরের সশ্রদ্ধ অভিবাদন

জানাইতেছি। নীচে স্বাক্ষরিত রহিয়াছে, শ্রীমতী স্নেহলতা বিশ্বাস।

প্রভাত পড়িল, একবার, দুইবার, প্রাণ যতবার চাহিল, পড়িল। সে রাত্রে বুকের ভিতর দিয়া কেবল দুটী অক্ষর ধ্বনিত হইতে লাগিল, স্নেহ, স্নেহ,স্নেহ ! কী সুন্দর, কী মিষ্ট, অথচ কী স্নিগ্ধ।

কল্পনার শক্তি লইয়া যাদের ব্যবসা তাহাদের চোখে না কি কিছুই বাদ পড়েনা। প্রভাত সেই কল্পনার চোখ দিয়াই তাহাকে দেখিল' বয়সটা তাহার ষোল কি সতেরো শ্রাবনের কালো মেঘের মত একরাশ চুল, চোখের দীপ্ত,—বোধ করি Cleopetra লজ্জায়ও মুখ লুকাইবার চেষ্টা করে,...

কে যেন মুগ্ধ প্রভাতের জাগ্রত চক্ষুর সম্মুখে আবেশময় সুপ্তির একটা জাল টানিয়া দিল।

প্রভাত মরিল।

একেবারে মরিল না মরিয়াও বাঁচিল। তরুণীর ভালবাসা বিশেষতঃ তরুণ যুবকের কাছে, সে যে কী জিনিষ, কত সুদূরের দুর্লভ—

হায় রে, এ যেন সত্য সত্যই বাঁচিয়াও মরিয়া থাকা। মাসখানেক পরে সহসা একদিন তুষারের পাতায় প্রভাতের চোখ পড়িল। ছোট্ট কবিতা, নাম বিরহিণী—লেখিকা শ্রীমতী স্নেহলতা বিশ্বাস।

প্রভাতের সারা বুকখানা দুলিয়া উঠিল।

প্রভাত পড়িল—

অন্তরের তমো নাশি আসিলে প্রভাত,
স্নেহ-ভরে দিলে ডাক জীবনেরে নাথ,
এ প্রাণ বলিতে চায় তোমা বার বার
তুমি যে আমার, প্রিয় তুমি যে আমার—

চমৎকার। প্রভাত পড়িল, আবার পড়িল, যতবার পড়ে প্রাণ যেন আরও পড়িতে চায়। সে যে কী অতৃপ্ত পিপাসা—

কিন্তু প্রথম ছত্রের শেষে ওই যে তাহার নাম...দ্বিতীয় ছত্রের প্রথমে—এ নিশ্চয়ই প্রেম ভালবাসা—

প্রেম, প্রেম, প্রেম !—প্রভাত মাতাল হইয়া উঠিল।

প্রেমে পড়িলে শতকরা নিরানব্বই জন প্রেমিকের যাহা হয়, প্রভাতের ঠিক তাহাই হইল। আহারে রুচি গেল, 'হাই' উঠে, গা ম্যাজ-ম্যাজ, একটা অসোয়াস্তি, চোখের সুমুখে শুধু ও-ই এক !

প্রভাতের কোন এক আত্মীয় সহরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার, অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, রোজ রোজ 'এক্সাইজ' কর্, ভাল করে খাওয়া দাওয়া কর বুঝলি,—দিন রাত্তির বই নিয়ে বসলে তো এরকম হবেই !

প্রভাত উত্তর দিল না, তাহার অন্তর-পুরুষটী অলক্ষ্যে হাসিল মাত্র !

প্রভাত ঠিক করিল যে করিয়াই হউক এই অজ্ঞাত অ-দৃষ্ট তরুণীর সহিত একবার দেখা করিবেই ! তাহাকে জানাইয়া দিবে কত গাঢ় প্রেম, কত গভীর ভালবাসা সে তিল তিল করিয়া তাহার বুকের তলায় জমাইয়া রাখিয়াছে ! সেখানে আর কিছুই নাই, শুধু প্রেম, প্রেম...

একটুকরা কাগজ লইয়া প্রভাত কবিতা লিখিতে বসিল, দূর ছাই, ভাব আসে তো ভাষা আসে না, ভাষা আসে তো ভাবের রাশী ধোঁয়ার মত কোথায় যে উড়িয়া যায়, তাহার চিহ্নটী পর্য্যন্ত...

ঠিক ! প্রভাত অনেক কষ্টে লিখিল,—

কোন্ সুদূরের বিরহিণী তুমি, কোন্ অসীমের পাখী,
মুক্ত প্রভাতে আজিকে কাহারে ফিরিতেছ তুমি ডাকি !

'তুষারের' ঠিকানায় সে তৎক্ষণাৎ সেটা শেষ করিয়া পাঠাইয়া দিল।

দিন পাঁচ ছয় পরে হঠাৎ একদিন 'তুষার' অফিসে তাহার ডাক পড়িল। প্রভাত যেন একটু বিহ্বল হইয়া পড়িল। তাই তো ! তবে কি—কে জানে, হয় তো গিয়া কত কি শুনিতে হইবে !

দুপুরবেলা ঘর্ম্মাক্ত মুখে সম্পাদকের ঘরে ঢুকিতেই প্রাণটা তাহার ত্ড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিল। এ যে তাহাদের অবিনাশ !

অবিনাশের সহিত সে এক সঙ্গে বি-এ ক্লাশ অবধি পড়িয়াছিল।

অবিনাশ চিঠি দেখিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, মাই 'গড' তুই-ই আমাদের প্রভাত বোস ?

...বোস, বোস,...তারপর ?

'তারপর' আর কি দাদা, তোমাদের সম্পাদকের চিঠি পেয়েই তো হাজির ! তা...তুই এখানে কি করিস্ রে ?

অবিনাশ হতাশভাবে বলিল, আর ভাই বলিস্ কেন ? বাবা মারা যাবার পর আর কোথাও কিছু জুটলো না, এখন এই সহকারী সম্পাদকের কাজ করে-ই,—

প্রভাত বাধা দিয়া বলিল, ভাল কথা, তোদের এই স্নেহ-বিশ্বাসটী কে রে ? কি করে, কোথায় থাকে—কি, কিছু জানিস ?

অবিনাশ একটু মুচকী হাসিয়া বলিল, সম্পাদকী করতে হলে তা কিছু কিছু জানতে হয় বৈ কি দাদা,—যাদের নিয়ে কাজ,—তা তোমার ভয় নেই দাদা, চলতে পারে—বল তো আলাপ করিয়েও দিতে পারি !

প্রভাত সচকিত হইয়া বলিল,—পারিস ?

সেই দিনই ঠিক হইয়া গেল, প্রভাত স্নেহলতাকে প্রথমে চিঠি দিবে, তাহার উত্তর আসিলে একদিন গিয়া আলাপ করিয়া আসিবে।

প্রভাত কলিকাতায় যে ঠিকানাতে তাহারা সম্প্রতি পশ্চিম হইতে আসিয়া উঠিয়াছিল, সেইখানেই পত্র দিল।

তুষারের পাতায় তাহার একটা বড় গল্প স্থান লাভ করায় প্রভাতের মনটা সেদিন ভারী খুসী ছিল, একে বড় গল্প তায়, অনেকে নাকি বলিয়াছে এমন সুন্দর গল্প বড় বড় লেখকদের কলম হইতেও কখনও বাহির হয় নাই। রবি ঠাকুর, প্রভাত মুখুজ্জ্যে, শরত চাটুর্য্যে,—ছুঃ তাহারা শুধু নামই করিয়াছে, এমন গল্প কয়টা, কয়বার তাহাদের মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়াছে।

প্রভাত মনে মনে যথেষ্ট গর্ব্ব অনুভব করিল, বন্ধু মহলে প্রচার করিয়া দিল, বিনা পারিশ্রমিকে আর সে কোথাও লেখা দিবে না ! তুষার ? সে তো তাহাকে প্রত্যেক গল্পের দরুণ পনেরোটী করিয়া মুদ্রার ব্যবস্থা করিয়াছে ! নীহারের সম্পাদক প্রত্যহ দুই বেলা আসা যাওয়া করিতেছেন।

দিন চারি পাঁচ পরে হঠাৎ সুন্দর হাতের লেখায়-ভরা একখানি চিঠি প্রভাত পাইল। অবিনাশ সেইদিনই বিকালে তাহাকে লইয়া বাহির হইল, বহুবাজারের ভিতর এ মোড় ওমোড় ঘুরিয়া ছোট্ট একটা গলির ভিতরে একখানা দ্বিতল বাটীর সম্মুখে আসিয়া অবিনাশ বলিল,—তুই এইখানে একটু দাঁড়া, আমি খপ্ করে একবার ভেতর থেকে খবর নিয়ে আসি !

অবিনাশ ভিতরে চলিয়া গেল, প্রভাত দোরের কাছে দাঁড়াইয়া সুমুখের জানালার ভিতর্ ঘন ঘন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সুরু করিল।

মিনিট পাঁচেক পরে হঠাৎ একটা কাশির শব্দে উপরের বারান্দার দিকে চাহিতেই বুকখানা তাহার ধড়াস্ করিয়া উঠিল। তাহার চোখের সুমুখ হইতে একরাশ কালো চুল নিমেষের মধ্যে সরিয়া গেল,—প্রভাত মাতাল হইয়া উঠিল।

আজ সারা প্রাণটা তাহার অকস্মাৎ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। চাই, চাই, যে করিয়াই হউক ওই তরুণীকে তাহার চাই !

কিন্তু,...

ওই মুখ, ওই চুলের রাশ, ··· প্রভাতের 'জাগ্রতে-স্বপন' হইয়া দাঁড়াইল।

মিনিট দশেক পরে অবিনাশ ফিরিয়া আসিয়া বলিল, না ভাই, আজ আর তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন না, সেজন্যে তিনি ভারী দুঃখিত—

প্রভাত বিমূঢ়ের মত হইয়া গিয়াছিল, শুধু বলিল, কারণ ?

কারণটা ঠিক বলতে পারলুম না, তবে...

প্রভাত উৎকর্ণ হইয়া রহিল।

অবিনাশ বলিল, তবে তিনি তোমায় দেখে নিয়েছেন ওপরের বারান্দা থেকে, তুমি দেখতে পেয়েছ কি-না জানিনা !

প্রভাতের বুকের সমস্ত রক্তটা যেন ছলাৎ করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

স্নেহ, স্নেহ, স্নেহ ! প্রভাত পাগল হইয়া উঠিল, মুহূর্ত্তের জন্য যাহার চুলের গোছাটুকু সে দেখিতে পাইয়াছিল, তবে সে আর কাহারও নহে, তাহারই মানসার ! একটা তৃপ্তিতে বুকটুকু তাহার ভরিয়া উঠিল।

পূবের আকাশ হইতে সূর্য্য কখন পশ্চিমের শয্যায় গা ঢালিয়া দিল, রাতের কালো পর্দ্দায় জগতখানা ক্রমে ঢাকিয়া

গেল, প্রভাত টের পাইল না, মনের পাতায় পাতায় শুধু এক চিন্তা—সে-ই !

প্রভাত যেন কোন্ এক কাব্য-গ্রন্থে পড়িয়াছিল,...

তারে চোখে দেখিনি,
শুধু কাব্যে মজেছি—

এখন তাহার তাই হইল, অবশ্য চোখে দেখার সৌভাগ্য যে হয় নাই, তাহা নহে, কিন্তু সত্য সত্যই তো আজ প্রেমের হস্তের নিগড় শৃঙ্খলকে সে বাধ্য হইয়াই বরণ করিয়া লইল !

কিন্তু তাহার দোষ কি ? যে বয়সে পূর্ণিমার চাঁদ ডুবিতে চাহে না, কোকিলের গান সারাটা বিশ্বময় ভরিয়া উঠে, চোখের ঘুম চলিয়া যায়, তাহার বয়স তো ঠিক তাই !

দিন সাতেক পরে হঠাৎ একদিন অবিনাশ আসিয়া অকস্মাৎ তাহাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, স্নেহকে বিয়ে করতে পারবি ?

একখানা প্রচণ্ড বজ্র যদি ঠিক সেই সময়ে তাহার চোখের সুমুখে আসিয়া পড়িত প্রভাত বোধ করি এতটা বিস্মিত হইত না ! বিমূঢ় বিহ্বলের মত সে অবিনাশের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

অবিনাশ বলিল, চুপ করে রইলি যে, সাহস হয় না ? তাহলে তার এভাবে সর্ব্বনাশ করবার তোমার কি দরকার ছিল ?

সর্ব্বনাশ ? প্রভাত বুঝি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে।

অবিনাশ একটু রুক্ষভাবে বলিল, সর্ব্বনাশ নয় তো কি ? এই যে একটা মেয়ে তোমার কথা ভেবে ভেবে খাচ্ছে না, দাচ্ছে না,——

প্রভাত বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিল, তুমি জানো ?

না জেনে আর বলছি, তোমায় ? না ভাই, অমত করিস নে, হুকুম যে আমি সব ঠিক করে ফেলি,—

প্রভাত তো তাহাই চায় ! সেই কালো চুলের গোছা,...

প্রভাত যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, আজ হইতে সুপ্রতিষ্ঠিতা লেখিকা শ্রীমতী স্নেহলতা বিশ্বাস তাহার—আর কাহারও নহে ! কেমন করিয়া কোথা দিয়া কি হইল, শুধু এটুকুই যেন সে বুঝিতে পারিতেছিল না !

অবিনাশ বলিল,—কবে মেয়ে দেখতে যাবি বল ? ওদের—

প্রভাত একটু হাসিয়া বলিল,—মেয়ে দেখা হয়ে গেছে ! এখন মাকে রাজী করবি চল,...

পুত্রের জেদ দেখিয়া মাতা বোধ করি আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। অবিনাশের সহিত পরামর্শ করিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন !

বিবাহের দিন শুভদৃষ্টির সাথে সাথে প্রভাত অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিল, এ কে ? কালো অতিরিক্ত রকমের মোটা একটা মেয়ে, নাকে নোলক,......

প্রভাতের কান্না আসিতেছিল, চোখের রুদ্ধ অশ্রু বুকের মাঝে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিল। কোনও রূপে দুইটা দিন কাটাইয়া ফুলশয্যার রাতে নববধূকে কাছে ডাকিয়া প্রভাত জিজ্ঞাসিল তোমার নাম কি ?

শ্রীমতী স্নেহলতা বিশ্বাস। মা ডাকেন টেঁপী বলে, দাদা ডাকেন—

প্রভাত বাধা দিয়া বলিল, কবিতা লিখতো কে, তুমি ?

স্নেহময়ী নোলক নাড়িয়া বলিল,—আমি লিখিনি,—অবিনাশদা লিখতেন !

অবিনাশদা ? প্রভাত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসিল,—অবিনাশ তোমার কে হয় ?

টেঁপী ওরফে স্নেহময়ী ক্ষীণস্বরে বলিল, আমার পিস্তুতো ভাই হ'ন।

হায়, হায়, সমস্ত জগতটা যেন প্রভাতের চোখের সুমুখে ঘুরিতে সুরু করিল, আজ তাহার কাব্য সাহিত্য সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মনে হইল।

বলা বাহুল্য প্রভাত কবিতা লিখা বা সাহিত্য-চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছে, অবিনাশকে বহু অনুসন্ধান করিয়াও খুঁজিয়া পায় নাই, সে নাকি রেঙ্গুনে না কোথায় একটা চাকরী পাইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সাবিত্রী

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

[শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত]

প্রথম দৃশ্য।

প্রাসাদ—প্রাঙ্গন।

রাজা অশ্বপতি ও মাণ্ডব্য ঋষি।

মাণ্ডব্য। মহারাজের জয় হৌক্।

অশ্বপতি। ঋষিবর! আজ আমাদের কি সুপ্রভাত। আপনার শুভ্র পদার্পণে আমার সমগ্র মদ্ররাজ্য আজ পবিত্র হ'ল, রাজা প্রজা,আত্মপরিজনসহ সকলেই আমরা ধন্য হলেম। যদি কৃপা করে দর্শন দিলেন, হতভাগ্য অশ্বপতির আতিথ্য গ্রহণ করে তাকে কৃতার্থ করুন।

মাণ্ডব্য। মহারাজ! ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করে আশ্রমপ্রত্যাবর্ত্তনের সময় আপনার আতিথ্য গ্রহণের জন্য কি জানি কেন হৃদয়ে অত্যন্ত বাসনার উদ্রেক হ'ল। রাজন! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনাকে যেন অত্যন্ত নিরানন্দ, বিষণ্ণ, চিন্তাভারাক্রান্ত দেখছি। আপনার এই পুণ্যময় রাজপুরীর সবারই মুখে যেন কি একটা অশান্তির ছায়া লক্ষিত হচ্ছে। এর কারণ জানতে পারি কি?

অ। কি আর বলব দেব! ঈশ্বর আমার প্রতি নিতান্ত বিমুখ। আমার এবং আমার সমস্ত পুরবাসীদের অশান্তির কারণ—আমার একমাত্র কন্যা—ষোড়শী কুমারী সাবিত্রী।

মাণ্ড। সেকি মহারাজ?

অশ্ব। নরাধম অপুত্রক আমি। অষ্টাদশ বৎসর ধরে কত যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা করে—সাবিত্রী দেবীর অর্চ্চনা করে প্রজাপতি ব্রহ্মার বরে যে অলৌকিক রূপ-গুণ-সম্পন্না জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যালাভ করেছি, তার জন্য বুঝি আমার মদ্র রাজবংশের গৌরব নষ্ট হয়।

মাণ্ড। কারণ কি মহারাজ?

অশ্ব। সাবিত্রীর ষোড়শ বর্ষ উত্তীর্ণ প্রায়, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমি—ভারতের সমস্ত রাজবংশে সন্ধান করেও আজও সাবিত্রীর বিবাহের জন্য পাত্র পেলেম না।

মাণ্ড। পাত্র পেলেন না? শুনলেম না আপনার কন্যা অলৌকিক রূপ-গুণ-সম্পন্না?

অশ্ব। শোনার আবশ্যক কি? ঐ দেখুন প্রভু—আমার কন্যা আসছে—স্বচক্ষে দেখে আপনার সন্দেহ ভঞ্জন করুন।

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

অশ্ব। মা সাবিত্রী! ঋষিবরকে প্রণাম কর।

সা। শুধু প্রণাম করে তো ছেড়ে দোবো না পিতা। ঠাকুর। কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখেছি—আমি যেন একজন দেবতা অতিথির সেবা কচ্ছি। উষার স্বপ্ন কখনো নিষ্ফল হয় না।

মাণ্ডব্য। মহারাজ! সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী এই কন্যার আপনি বিবাহের পাত্র পেলেন না?

অশ্ব। দেবীরূপিণী বলেই তো বিষম বিভ্রাট উপস্থিত। সাবিত্রীর রূপ দেখে কোন রাজপুত্র ওকে পত্নীভাবে গ্রহণ করতে চায় না। সকলেই ভক্তিমান হয়ে গুরু সম্বোধনে মাকে আমার প্রণাম করে যায়। ক্রমে দেশ বিদেশে সাবিত্রীর এই দেবী রূপের কথা প্রচারিত হওয়ায়, কোথাও কোন রাজবংশে আর বিবাহের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ভট্টেরা করতে সক্ষম হয় না।

মাণ্ডব্য। মহারাজ! আমি এতক্ষণ অত্যন্ত মনোযোগের সহিত আপনার কন্যার হস্তরেখা পাঠ করে দেখলেম—

অশ্ব। কি দেখলেন—কি দেখলেন ঋষিবর!

মাণ্ডব্য। দেখলেম জগৎ পবিত্রকারিণী ভগবতী গায়ত্রীর

অংশে আপনার এই অলৌকিক তেজোসম্পন্না কন্যা সাবিত্রীর জন্ম ; সংসার ভোগ বিলাসী গৃহস্থ শ্রেণী দৈবতেজহীন কোন ব্যক্তি তো আপনার এই কন্যার সম্মুখীন হতে পারবে না। সম্মুখীন হওয়া তো দূরের কথা—জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য্যকিরণ জ্যোতিঃ সম্পন্না এই কুমারীর প্রতি ক্ষীণশক্তি কোন মর্ত্তবাসী দৃষ্টিপাত কর্ত্তে সক্ষম হবে না।

অশ্ব। তবে কি আমার কন্যা আজীবন কুমারী থাকবে ঠাকুর !

মাণ্ড। না—না—কিছুতেই নয়। হস্তরেখায় তা কিছুতেই বলে না মহারাজ !

অশ্ব। তা হ'লে উপায় কি ?

মাণ্ড। উপায় ? উপায় নিশ্চয়ই আছে। তবে সে উপায় বোধ হয় নিরুপায়ের মধ্যে। শুনুন মহারাজ। পবিত্র তপোবনে তপস্যানিরত মুনি ঋষিগণের মধ্যেই সাবিত্রীর দেবাংশজাত পতিলাভ হবে। আর সেই পতি সাবিত্রী স্বয়ং অন্বেষণ করে বার কর্ব্বে। এ কার্য্যে আপনি সম্মত আছেন মহারাজ ? সাবিত্রীকে পতি অন্বেষণের জন্য বনবাসে প্রেরণ করতে পারবেন কি ?

অশ্ব। কঠোর বিধান ঋষিবর—প্রাণ ধরে কেমন করে একমাত্র কন্যাকে বনবাসে প্রেরণ করব ?

সাবিত্রী। পিতা! জগতে সমগ্র দেবতার প্রতিনিধি মুনি ঋষিগণের যে বনে বসতি—সে তো বন নয়—সে যে সাক্ষাৎ স্বর্গ ! পবিত্র মুনি ঋষিগণের আশ্রম—আমার আজীবনের বড় কাম্য স্থান। পিতা! অনুমতি করুন—আমার কামনা পূর্ণ কর্ত্তে, আপনার বংশমর্য্যাদা রক্ষা কর্ত্তে—আমি সানন্দে বনবাসে যাই।

অশ্ব। ঋষিবর। আর আমার চিন্তা করবার কোন কারণ নাই। আম এখনিই আপনার আদেশ পালন করব। সাবিত্রীকে তার পতি অন্বেষণের জন্য বনবাসে অদ্যই প্রেরণ কর্ব্ব।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্য—আশ্রম সান্নিধ্য।

মুনি বালকগণ ও মুনি কন্যাগণ।

দ্বৈত গীত।

মু-কন্যাগণ। (ওগো) করব আজি মদন পূজা ফুলবনে।
আয় তুলি সই কুসুম রাজি—ভরিয়ে সাজি,
(বসে) গাঁথবো মালা নিরজনে॥

মু-বালকগণ। বসন্তে পূজ্‌তে মদন হলে আগুয়ান—
তুষ্ট হয়ে মদন ঠাকুর হান্‌বে ভীষণ বান,
(তখন) কে বাঁচাবে প্রাণ ?
(মোদের) বিষম প্রীতি, পূজব রতি,
গিয়ে তোমাদের সনে॥

মু-কন্যা। যাওনা যে যার আপন পথে, মোদের
সাথে কেন ?

মু-বা। পুরুষ ভিন্ন নারীর অন্য গতি নাইকো জেনো।

মু-কন্যা। যদি পুরুষকে না চাই (আমরা) পুরুষকে
না চাই।

মু-বা। কায়া ছেড়ে থাকে ছায়া (কোথাও)
দেখতে তো না পাই।

মু-ক ও মু-বা। (হবে) মদন, রতির আদেশ যেমন,
(সবারে) চলতে হবে তাই মেনে।

(সকলের প্রস্থান)

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সা। মুনি কন্যারা সব মদন পূজা কর্ত্তে গেলেন। বেশ আনন্দে আছে। শান্তিময় আশ্রমে—শান্তিপূর্ণ প্রাণে—সংসার কোলাহলের বাইরে কি আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে ! বনের এই প্রকৃতির শোভার কাছে কি নগরের কৃত্রিম শোভার তুলনা হয় ? আঃ—কি সুন্দর মধুর মলয় বইছে। বসন্ত কালে প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে বেড়িয়ে দেখেছি, সেথায় মলয় পবন তো এত মিষ্ট বোধ হয় না।

(সত্যবানের প্রবেশ)

সত্য। একি—বনদেবী ? আ মরি মরি, এত সুন্দর তো আর কখনো কোথাও দেখি নি।

সা। আমিও না। হে তাপসকুমার! এত সুন্দর যে পুরুষ হতে পারে আমিও তা জানতেম না।

সত্য। আমি বনবাসী—সন্ন্যাসী—না না হতভাগ্য দীন দরিদ্র—আমায় কেমন করে আপনি সুন্দর দেখলেন! বোধ হয় আপনার চক্ষুদুটী সুন্দর বলে তাই জগতের সবই সুন্দর দেখছেন।

সা। তা হ'লে তো আপনাকে দেখে আমি এত মুগ্ধ হতেম না। চক্ষু যদি আমার, এত সুন্দর পুরুষ দু' চারজন ইতিপূর্ব্বে দেখে অভ্যস্থ হ'ত, তা হ'লে বোধ হয় আপনার সৌন্দর্য্যের এত প্রশংসাও করতেম না। আপনি কে—পরিচয় জানতে পারি কি?

সত্য। আপনি ভুবনমোহিনী—রাজরাজেশ্বরী—আপনার অপরূপ রূপ দেখে আমি আত্মহারা হয়েছি। মার্জ্জনা করবেন—আর আমার এ স্থানে থাকা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়।

(সত্যবানের প্রস্থান)

সা। হৃদয়েশ্বর! এতদিনে দাসীকে দেখা দিলে? পরিচয় না দাও, আমার প্রাণপতির পরিচয় আমি নিজেই সন্ধান করে নোবো।

সাবিত্রীর গীত।

তুমি আমার ধ্যানের ছবি—আমার সাধনা ধন।
তোমারি আশে ধরণীবাসে ধরিতেছি এ জীবন॥
(এ) নিভৃত হৃদয়কাননে তোমারে কত খুঁজেছি,
চকিতে দেখিয়া নয়নে—তখুনি ও মুখ চিনেছি।
(আর) ভুলাইয়ে ছলে মোরে,
(নাথ) কোথা যাবে তুমি সোরে,
(ওগো) কঠিন প্রণয়ডোরে, বেঁধেছি (ও) দুটী চরণ;
(এস) হে পতি দেবতা,—বোসো প্রীতিভরে;
(আছে) পাতা হৃদি সিংহাসন॥

(সাবিত্রীর প্রস্থান)

— —

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদ।

অশ্বপতি ও নারদ।

অশ্ব। দেবর্ষি! অতি শুভক্ষণেই আপনি দাসকে দর্শন দিয়েছেন। মহর্ষি মাণ্ডব্যের আদেশে কন্যা সাবিত্রী পতি অন্বেষণে বনগমন করেছিল, তিনদিন তিন রাত্রি সেথায় অবস্থান করে কার্য্যসিদ্ধি পরে আজ প্রাসাদে ফিরে আসছে। মন্ত্রীর মুখে শুনলেম—সাবিত্রী তাপস কুমারের মধ্যে রূপে গুণে শ্রেষ্ঠ যুবক সত্যবানকে পতি নির্ব্বাচন করেছে। দয়াময় প্রজাপতি এতদিন পরে দাসের প্রতি তুষ্ট হ'য়ে সাবিত্রীর বিবাহযোগ্য পাত্র নির্দ্ধারিত করে মদ্র রাজবংশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করলেন। প্রভু! যদি কৃপা করে আজ হেথায় পদার্পন করেছেন, সাবিত্রীর বিবাহের একটী দিন ধার্য্য করে দিন।

নার। মহারাজ! সাবিত্রী কাকে পতি নির্ব্বাচন করলে বললেন? তাপসকুমার সত্যবানকে?

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সা। ঠাকুর! আপনার অবিদিত ত্রি-সংসারে তো কিছুই নাই। বনবাসী সত্যবান তাপসকুমার ন'ন,—রাজকুমার। শাম্বদেশাধিপতি রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র।

নার। হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি মা বুঝেছি। প্রথমটা ঠিক কর্ত্তে পারি নি; এখন বুঝতে পেরেছি। মহারাজ! কন্যা আপনার উপযুক্ত পাত্রকেই পতি নির্ব্বাচন করেছে। রাজা দ্যুমৎসেন কালক্রমে অন্ধত্ব প্রাপ্ত হ'লে—সুযোগ পেয়ে বহিঃশত্রু এসে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করে তাঁর রাজ্য অধিকার করেছে। সত্যবান তখন শিশু মাত্র। অন্ধ রাজা নিরুপায় হয়ে পত্নী পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে অবশেষে বনবাসী হলেন। মহারাজ! আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি—সাবিত্রীর যোগ্য পতি সত্যবানই বটে, কিন্তু—

অশ্ব। কিন্তু কি দেবর্ষি? সত্যবান দরিদ্র বনবাসী এই কথা বলছেন! কোন চিন্তা নাই—আমি জামাতাকে যথেষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রদান কর্ব্ব—

নারদ। মহারাজ! রাজা দ্যুমৎসেনের পুত্র পর

প্রত্যাশী দীনভিখারী ন'ন। আমি তুচ্ছ ধন সম্পদের কথা বলছি না রাজন। সর্ব্বগুণসম্পন্ন কন্দর্প তুল্য রূপবান, তেজোময় সত্যবানের সমস্ত গুণরাশি এক মহাদোষে সমাচ্ছন্ন। মহারাজ! কি বলব—সত্যবান স্বল্পায়ু।

অশ্বপতি। স্বল্পায়ু? সে কি?

নারদ। আজ হতে এক বৎসরের মধ্যে সত্যবানের পরমায়ু শেষ হবে।

অশ্ব। কি সর্ব্বনাশ? ওমা সাবিত্রী? কি করিলি মা? কাকে পতি নির্ব্বাচন করলি? জেনেশুনে কেমন করে তোকে এই কোমল বয়সে ভীষণ বৈধব্য অনলে নিক্ষেপ করি?

সা। পিতা! সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হতে আজ পর্য্যন্ত ধরাবাসী শুনে আসছে—বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। স্বয়ং ভগবান পর্য্যন্ত তা খণ্ডন করতে সক্ষম হ'ন নি। বিশেষতঃ জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, এ তিন কার্য্য বিধাতারই অজ্ঞাতসারে লিপিবদ্ধ হয়। পিতা! আমি সত্যবানকে যে মুহূর্ত্তে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেছি—সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ কার্য্য ধর্ম্মতঃ সমাধা হয়েছে। তিনি দীর্ঘায়ুঃ হোন, অল্পায়ু হোন সুন্দর হোন্, কুৎসিৎ হোন্,—গুণবান হোন্ বা নির্গুণ হোন্—একবার তাঁকে স্বামীপদে বরণ করে আর তো কোন মতেই অন্যকে বিবাহ করতে পারি না।

অশ্ব। বিষম সমস্যা—বিষম সমস্যা! বলুন দেবর্ষি—এ সঙ্কটে কোন্ পথ অবলম্বন করি?

নারদ। তাইতো মহারাজ—আমিও অত্যন্ত বিপাকে পড়লেম। এ অবস্থায় কোন পথ প্রশস্ত, তা তো কিছুতেই ভেবে স্থির করতে পারছি না।

সা। ঠাকুর! রহস্যের কথা বটে। সংসারে ধর্ম্মপথই যে সর্ব্বাপেক্ষা সুগম এবং প্রশস্ত পথ, এ কথা আমি জ্ঞানহীনা অবলা—কোন্ সাহসে আপনাদের মনে করিয়ে দোবো তা তো জানি না। পিতা! ছায় ঐহিক ভোগ বাসনায় বঞ্চিতা হয়ে থাকবে এই ভয়ে ভীত হয়ে আপনি কন্যাকে অধর্ম্মাচারিণী হয়ে নিরয়গামিনী হ'তে আদেশ কর্ব্বেন? আর বৈধব্যই যদি এ পোড়া অদৃষ্টে লেখা থাকে, তা হ'লে সত্যবানকে পতিরূপে গ্রহণ না করলেই কি আমি তা হতে নিস্তার পাব?

নারদ। মহারাজ! আমি অনেক চিন্তার পর স্থির সিদ্ধান্ত করলেম—সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করেও ধর্ম্মরক্ষা করাই সবাকার অবশ্য কর্ত্তব্য। আপনার কন্যা যখন সেই ধর্ম্মকে রক্ষা করবার জন্য স্থির সঙ্কল্প করেছেন, তখন তাকে কোন কারণেই বাধা দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। আপনি তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করে সত্যবানের করেই সাবিত্রীকে সমর্পণ করুন। ধর্ম্ম সেবায় নিশ্চয়ই সুফল ফলবে। হয়তো সাবিত্রীর পুণ্যধর্ম্ম-প্রভাবে স্বল্পায়ু সত্যবান দীর্ঘায়ু হতে পারে—কে জানে?

অশ্ব। প্রভু। কুলগুরুর আদেশ অবিচারে পালনীয়। চলুন দেব—আপনার উপদেশে অদৃষ্টের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, ধর্ম্মকে একমাত্র আশ্রয় করে ঐ তাপসকুমার সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রীর বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করি।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজপথ।

নাগরিকাগণ।

গীত।

কাজ ফেলে চল্ যাই লো ছুটে ঐ চলে যায় বর বনে।
কোথায় বা যাই, কোথায় দাঁড়াই—সুবিধে নেই
কোনখানে॥
প্রজাপতির একি লো বিচার,
(কত) আদরের রাজকুমারী—
(হ'ল) সন্ন্যাসী বর তার।
(যেন) ভাঙর ভোলার বিয়ে সঙ্গেতে উমার;—
(রবে) লোক সমাজে—কোন্ লাজে সই?
চন্দ্র বুঝি তাই বনে!

(নাগরিকাগণের প্রস্থান)

(নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম। আমাদের রাজার কি আক্কেল দেখলি বৃকুন্দ।

২য়। কেন? মন্দ আক্কেল আবার কি?

১ম। আক্কেল নয়? অমন সোণার চাঁদ মেয়েটাকে একটা বুনো ছেলে ধরে বিয়ে দিলে?

২য়। বুনো ছেলে কিরে? আহা—কি চমৎকার চেহারা? যেন আকাশের চাঁদ? যেন একবারে টাটকা ফোটা গোলাপ ফুল!

১ম। আরে চেহারা যেমন হোক্‌গে একটা ভিখিরী সন্ন্যাসীর ছেলে—সে হ'ল কিনা রাজকন্যার বর! নাঃ—রাজাটা সত্যিই ক্ষেপেছে।

২য়। আরে—রাজার দোষ কি? রাজকন্যা যে একদিন বনে হাওয়া খেতে গিয়ে ছেলেটার রূপ দেখে প্রেমে পাগল হয়ে উঠল। ওকে ভিন্ন আর যে কাউকে গিয়ে কর্ত্তে চাইলে না—রাজা কি কর্ব্বে বল্?

১ম। মেয়ে যা বল্‌বে তাই বাপকে কর্ত্তে হবে? মেয়ে যদি বলে আমি ঘোড়ার ডিম খাব—তখন?

২য়। ঘোড়াকে দিয়ে যেমন করে হোক্ ডিম পাড়িয়ে নেবে।

১ম। ঘোড়ার ডিম হয়? আমাকে ন্যাকা পেয়েছিস নাকি?

২য়। হয় না? সত্যিই তুই বেহদ্দ ন্যাকা! রাজা রাজড়া মনে করলে ঘোড়া তো ঘোড়া—মানুষকে দিয়ে ডিম পাড়াতে পারে। তা জানিস্?

১ম। চালাকী করিস্ নি—চালাকী করিস্ নি! বলি—সাধ করে আমি রাজাকে আহাম্মক বলছি? আচ্ছা—মেয়েটার আবদারেই না হয় সন্ন্যাসী মন্ন্যাসী ধরে তার সঙ্গে বিয়েই দিলি,—তা বলে বাপ হয়ে—রাজা বাবা হয়ে কোন্ প্রাণে ঐ সবে-ধন-নীলমণি মেয়েটাকে ঐ বুনো বরের সঙ্গে বনে পাঠিয়ে দিলি? একে কি বাপ্ বলে—না—চামার বলে?

২য়। দেখ, রাজার নিন্দে করিস নি—এখুনি কেউ শুনতে পেলে টকাস্ করে গর্দ্দানটা চেঁচে নিয়ে যাবে? বলি—বাজে কথা কইছিস কেন? বর বিয়ে করেছে—কনেকে নিয়ে যাবে না?

১ম। বলি ঘরজামাই করে রাখলেই তো হোতো!

২য়। সে বাপের ব্যাটা—তোর মত তো নয় যে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ীতে বাবা, খুড়ো, জ্যাঠা, মাসী, পিসী, পাড়া প্রতিবেশী—মার গরু, বাছুর, বেড়াল, কুকুর ছানাটা পর্য্যন্ত এনে শ্বশুরের স্কন্ধে বিয়ের দিন থেকেই চেপে বসবে। সে হোলো মরদ বাচ্ছা—যাকে বলে—বাপের ব্যাটা! রাজা মশাই জামাইকে কত ধন দৌলত বিয়ের যৌতুক বলে দিয়েছিলেন,—তা পর্য্যন্ত ছোঁড়াটা যত গরীব দুঃখী ডেকে দান করে দিলে। নিজে এক কড়া কড়ীও নিলে না। একখানা কনে গয়না পর্য্যন্ত দিতে দিলে না। জান্‌লি—এ হ'ল বাপের ব্যাটা। ও কি ঘরজামাই হয়?

১ম। আর আমি ঘরজামাই হয়ে আছি বলে কি পিসের ব্যাটা নাকি?

২য়। আরে—তুমি হ'লে শ্বশুরের ব্যাটা। তোমার সঙ্গে কার তুলনা?

১ম। শ্বশুরের ব্যাটা কি? আমায় গালাগাল? আমি হেঁয়ালী বুঝতে পারি না—বটে? শ্বশুরের ব্যাটা তো আমার শালা? আমি তো হ'লে শালার ভাই? তা হ'লে আমি আমার শালা? শালার যে বোন, সেই তো মাগ। আমার বোন তা হ'লে আমার মাগ? তা হ'লে আমি বোন্‌মেগো?

২য়। উঃ—তোর তো হিসেব নিকেশে খুব মাথা রে? যা যা—রাজবাড়ীতে যা—খাতাঞ্জীখানায় একটা চাকরী পাবি।

১ম। কি বললি? ফের গাল দিলি? আমি চাকরী করব? আমি রাজার চাকরি করব? তুই এত বড় কথা আমায় বলিস? আমি চাকর?

২য়। নাঃ—তুমি একেবারে হীরের আকর। তোমার আগা পাশ্‌তলা খালি জুতোর ঠোকোর। ঘরজামাই কি কারও চাকরী করতে পারে দাদা? তার তেজ কত? তার ক্ষমতা কত?

১ম। আমার ক্ষমতা নেই তুই বলতে চাস?

২য়। তোমার কেমতা নেই ? আরে বাপরে—কেমতা না থাকলে কি কেউ ঘরজামাই হয় ?

১ম। আমায় কোন শালা এক কথা বলতে পারে ? হাঁ—হ্যাঁ—

২য়। আরে ছুর্গা ছুর্গা। ভাল কুকুরকে কেউ মুখে কোন কথা বলে ? কেবল কথায় কথায় নাগ্‌রা পেটা করে। আর সোহাগ করে ঘরে পুরে মাগ এমনি করে চুলের ঝুঁটি ধরে ঠাস ঠাস্ ঠাস্ চপেটাঘাত করে।

(প্রহার ও প্রস্থান)

১ম। উঃ—উঃ—উঃ—তবে রে শালা আমায় এলো পাতাড়ী চড়িয়ে দিলি ? দাঁড়া—শালা—এক ইঁটে তোর মাথার খুলি ফাটিয়ে দিই।

(পশ্চাদ্ধাবন)

—————

পঞ্চম দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যস্থ কুটীর সম্মুখ।

সাবিত্রী।

গীত।

(ঐ) সাঁঝের ছায়া আসে ধীরে কাল রাত্তি সাথে নিয়ে।
জানি না সে কেমন আঁধার—পড়িব কোথায় গিয়ে॥
(ঐ) ভীষণ ঝটিকা আসে,
কাঁপিছে পরাণ ত্রাসে,
ভাঙ্গিতে কুটীর মোর—নিদয় নিঠুর হয়ে ;
(এ) জীবন প্রদীপ দিবে নিভায়ে ফুৎকার দিয়ে॥

সা। দেখতে দেখতে এক বছর কেটে গেল। আজ বছরের শেষ দিন। এত শীঘ্র দিনগুলো কেটে গেল ! কোথা দিয়ে গেল—কেমন করে গেল—কখন গেল—কিছুই বুঝতে পারলুম না। সুখের দিনগুলি বুঝি এইরকমই তাড়াতাড়ি চলে যায়, আর দুঃখের দিন অতি অলস—অতি দুর্ব্বল হয়ে যেন যেতে আর চায় না। বিবাহের পূর্ব্বদিন দেবর্ষি বলে গেছেন—আমার স্বামীর পরমায়ু আর একবছর। বজ্রের মত সে কথা দিবানিশি যেন আমার কাণে বাজছে। সে একবছর তো আজ ফুরিয়ে যায়—আজ হয়তো আমার সকল সুখের অবসান। হয়তো কেন ? নিশ্চয়ই। দেবর্ষির গণনা তো মিথ্যা হবে না। যত পুণ্যকর্ম্মই করি না,—যত ধর্ম্ম আচরণই করি না—যত ব্রতব্রত উপবাসই করি না,—স্বামীর অমঙ্গল ভয়ে ভীত, বিচলিত অধৈর্য্য না হয়ে কি নারী—পতিপ্রাণা নারী—স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী নারী—স্বামীর সহধর্ম্মিণী নারী স্থির থাকতে পারে ? না—পারা সম্ভব ? মুখে বলা এক কথা, প্রাণে সহ্য করা আর এক কথা। হে নারায়ণ। হে অগতির গতি। হে জগদীশ্বর। হে ঠাকুর। অভাগিনীর সিঁথীর সিঁদুর মুছে দিও না। আমার প্রাণের দারুণ ব্যথা বোঝো। আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত কর।

(সত্যবানের প্রবেশ)

সত্য। অবশ্যই করবেন সাবিত্রী।

সা। এঁ্যা, একি দৈববাণী ? না—না—স্বামী দেবতা—নারীর ভাগ্য বিধাতা—তাঁর মুখের বাণী ! বল—বল—নাথ বল ! আবার বল—জগদীশ্বর আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত কর্ব্বেন। বল—আর একটাবার বল—তোমার পায়ে ধরি।

সত্য। হ্যাঁ কর্ব্বেন—নিশ্চয়ই কর্ব্বেন। নইলে বেদ মিথ্যা হবে যে প্রাণেশ্বরী। তোমার ন্যায় সতীর প্রার্থনা যদি জগদীশ্বর অপূর্ণ রাখেন তা হ'লে জগতে কে আর জগদীশ্বরের নাম গ্রহণ করবে ? সতীর প্রার্থনায় যদি ভগবতী না কর্ণপাত করেন, তা হ'লে মার নামে যে মহা কলঙ্ক হবে। কি এমন প্রার্থনা কর্‌ছিলে প্রিয়ে, যার জন্য এত আগ্রহ—এত ব্যাকুলতা—এত অধৈর্য্য ?

সা। থাক্ নাথ—এখন শুনে কাজ নেই। হৃদয়ের প্রার্থনা পূর্ণ হবার পূর্ব্বে কর্ণান্তর করতে নাই—শাস্ত্রে যেন কোথায় পড়েছি।

সত্য। যাও প্রিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলো, কুটীরে গিয়ে বিশ্রাম কর গে। আজ তিনদিন নিরম্বু উপবাস করে রয়েছ,—কল্য তোমার ব্রত সমাপ্ত হলে আমার দুর্ভাবনার অবসান হবে। যাও—আর এ অবলম্ব দেহে কুটীর বাহিরে থেকো না। আমি এখুনি ফিরে আসছি।

সা। এই সন্ধ্যাকালে কুঠার হাতে নিয়ে কোথায় চল্‌লে প্রাণেশ্বর ?

সত্য। কুটীরে যে সমস্ত ফলমূল সংগ্রহ করে রেখেছিলেম,—ব্রাহ্মণ ভোজনে আজ সমস্তই নিঃশেষিত হয়েছে। তোমার কল্যকার পারণের জন্ত একটীমাত্র অবশিষ্ট নাই।

সা। আমার জন্ত রাত্রিকালে ফল সংগ্রহে চললে নাথ ? আমায় কি তুমি নরকে পাঠাতে চাও প্রিয়তম ?

সত্য। তোমার জন্ত না হয় নাই বল্লুম। আমাদের সবাকার জন্তও তো আবশ্যক ! শুধু ফল সংগ্রহ নয়। অগ্নিরক্ষার কাষ্ঠও নিঃশেষিত। অগ্নিহোত্র কার্য্যের জন্ত কাষ্ঠ সংগ্রহও তো নিশ্চয়ই আবশ্যক।

সা। ফল কথা—তোমাকে যেতেই হবে। কেমন—এই তো !

সত্য। যেতেই হবে প্রাণেশ্বরী। আমি ত্বরায় ফিরে আসবো, তুমি কিছুমাত্র চিন্তা কোরো না।

সা। নাঃ—অন্ধকার চতুর্দ্দশীর ঘোর অন্ধকার রাত্রে স্বামী একাকী ভীষণ অরণ্যে প্রবেশ কল্লে সাধ্বী সতীর চিন্তা করবার কোন কারণ নাই,—এ শাস্ত্র কি তুমি নূতন রচনা কল্লে নাথ ? যাক্‌, বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নেই। চল দু'জনে যাই।

সত্য। তুমি যাবে ? সেকি কথা ? এই ভীষণ রাত্রে —দুর্গম কণ্টকময় পথে—তিনদিন অনাহারে অবসন্ন দেহে তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

সা। হ্যা—নিশ্চয়ই য'ব। কেন নাথ—কিসে আমি আজ তোমার এত চক্ষুশূল হলেম ? কিসে তোমার এত ভালবাসা থেকে অভাগিনী অকস্মাৎ বঞ্চিতা হ'ল যে তুমি আমার সঙ্গ পর্য্যন্ত তিক্তবোধ করছ ?

সত্য। এত বিদ্যা—এত বুদ্ধি আমার নেই যে তোমায় আমি তর্কে পরাজিত করতে পারি প্রাণেশ্বরী ! নিতান্তই যদি যাবে, তা হ'লে একবার কুটীরে গিয়ে পিতামাতার অনুমতি নিয়ে আসি চল।

সা। তাঁদের অনুমতি না পেলে কি কুটীর ত্যাগ করে তোমার সঙ্গে যেতে চাচ্ছি নাথ ?

সত্য। তা হ'লে প্রস্তুত হয়েই বসে আছ ? পিতাকে কি বললে যে তিনদিন নিরম্বু উপবাস ক'রে রাত্রে স্বামীর সঙ্গে বনগমন তোমার ব্রতের একটী অঙ্গ ?

সা। সত্যই তাই বলেছি। কি করে জানলে নাথ ? তুমি কি অন্তর্য্যামী ?

সত্য। অন্তর্য্যামী নই ! জানি তার কারণ,—তুমি আমার—আর তোমার আমি ! তোমার আমার দেহ, প্রাণ, মন অভিন্ন—আজীবন আমরণ !

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

নিবিড় অরণ্য।

যমদূতগণ।

গীত।

(তোমাদের) দিন ফুরুলো আমরা হাজির খবর দিতে
হয় না।
(ঠিক) সময় হ'লে খবর পলে—(মোদের) একটু দেরী
সয় না॥
(তোমার) ফুরুলো,—নেই ফুরুলো,—হাতের কাজ ক'টা,
থাকুগে পড়ে মেয়ে ছেলে আর পুঁজিপাটা,
(ওরা) ঘটা ক'রে কাঁদলে সবাই—
মড়া কথা কয় না ;
সময় আর স্রোত চলবে টানা, যেতে যেতে রয় না॥
(খুঁড়লে মাথা)

১ম-য-দূ। ওরে আর কত দেরী ভাই !

২য়-য-দূ। আর দেরী কিসের ? এই হ'ল বলে। ঐ যে সত্যবান বাছাধন গাছে চড়েছেন, খুব কুড়ুল দিয়ে গাছের ডাল কোপাচ্ছেন ; ছুঁড়ীটা তলায় দাঁড়িয়ে কাঠ কুড়িয়ে পোঁটলা বাঁধছে,—মনে করছে, মনের সাধে আহ্লাদে আটখানা হয়ে দু'জনে কপোত কপোতীর মত বক্‌ বকম্‌, বক্‌ বকম্‌ করে পীরিত করতে করতে ঘরে ফিরবেন ! হা—হা—হা—হা—

৩য়-য-দূ। উদিকে যে যমরাজা মশাই দণ্ডপাটটী নেই

যমের বাড়ী থেকে বাড়িয়ে দিয়ে মাথায় ওপোর বাগিয়ে ধরে আছেন তা জানেন না। কেমন মজাটী বল্ দিকি,—আমাদের খপ্পরে পড়বার একমুহূর্ত্ত আগে কেউ জানতে পারে না যে মরতে হবে—যমের বাড়ী যেতে হবে!

৪র্থ-য-দূ। ওরে ওরে সময় হয়েছে—সময় হয়েছে। ঐ দেখ—সত্যবান টল্‌তে টল্‌তে গাছ থেকে নামছে—ঐখানেই পোড়বে বুঝি? না না নেবেছে রে নেবেছে—এইদিকে আসছে, আশে পাশে বাগিয়ে থাকি চ—

(সকলের প্রস্থান)

(সাবিত্রী ও সত্যবানের প্রবেশ)

সত্য। সাবিত্রী, সাবিত্রী! ওঃ—

সা। কেন কেন, এই যে নাথ আমি তোমার কাছে! কি হয়েছে—কি হয়েছে! বড় ক্লান্তিবোধ হচ্ছে? বোসো, বোসো—

সত্য। উঃ সাবিত্রী—দারুণ শিরঃপীড়া! আমি আর বসতে পারি না—আমি মরি—এস কাছে এস—তোমার কোলে মাথা রাখি—উঃ—আর দেখতে পাচ্ছি না—সাবিত্রী আমি চললুম—

(মৃত্যু)

সা। প্রাণেশ্বর! হৃদয় সর্ব্বস্ব! আর্য্যপুত্র। নাথ! কোথায় যাও—দাসীকে চির জীবনের মত একা রেখে কোথা যাও—? কি হ'ল, কি হ'ল। এত করেও তোমায় রাখতে পারলুম না? দেবতার পায়ে এত করে মাথা খুঁড়েও তোমাকে ধরে রাখতে পারলুম না? সত্যিই আমাকে ত্যাগ করে চলে গেলে? প্রাণেশ্বর কথা কও—কথা কও—একবার সেই মধুমাখা স্বরে দাসীকে সাবিত্রী বলে ডাক!

১ম-য-দূ। ওরে দেরী কচ্ছিস্ কেন? এগো না—

২য়। তুই এগো না—

৩য়। তুই এগো না—

৪র্থ। চল্ সবাই একসঙ্গে এগুই—

সকলে। ওরে বাপ্ রে, বাপ্ রে—কি আগুন রে—কি আগুন রে—

(যমদূতগণের প্রস্থান

সা। ওমা সতীকুল রাণী—ওমা দাক্ষায়ণী—এত করেও আমার প্রার্থনা তোমার কাণে পৌঁছে দিতে পারলুম না! এত করেও তোমার পদে আশ্রয় পেলুম না! মাগো—কি করলে মা আমার?

(যমের প্রবেশ)

যম। আমি ঠিকই অনুমান করেছিলেম—দূতগণের দ্বারা এ কার্য্য সম্ভব নয়! আমাকে স্বয়ং এ কার্য্যে নিযুক্ত হতে হবে। সাবিত্রী!

সা। একি? কে এ বিশালকায় তেজঃপুঞ্জকলেবর বিরাট পুরুষ! রক্তবস্ত্রপরিধান, অগ্নিময়শিরস্ত্রাণ, স্কন্ধে ভীষণ লৌহদণ্ড পাশ হস্তে আমার সম্মুখে? প্রভু! কে আপনি?

যম। আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে—তাকে যমপুরে নিয়ে যেতে আমি এসেছি। সাবিত্রী! তোমার মৃত স্বামীকে পরিত্যাগ কর।

সা। প্রভু! বলবার আর আমার কিছুই নাই। তবে আপনি দেবতা—আপনার নিকট আমি কৃপাভিক্ষা করছি, অভাগিনীর প্রতি কৃপা করে আমার স্বামীর জীবন ভিক্ষা দিন। আমি অনাথিনী—ভিখারিণী। কৃপাদানের জন্যই দেবতার দেবত্ব, মহত্ব, খ্যাতি প্রসিদ্ধি।

যম। অসম্ভব প্রার্থনা কোরো না সাবিত্রী। মৃত কখনও পুনর্জীবিত হতে পারে না। সূর্য্য কখনও পশ্চিমে উদয় হয় না। পথ মুক্ত করে দাও, তোমার পতির প্রাণ লয়ে আমি স্বস্থানে প্রস্থান করি। তুমিও আপন কর্ত্তব্য পালন কর।

সা। ধর্ম্মরাজ! অকালে আমার স্বামীর প্রাণহরণ করা কি আপনার ধর্ম্ম? এই স্ফুটনোন্মুখ যৌবন কালে নিরপরাধিনী অবলা নারীকে ভীষণ বৈধব্যানলে নিক্ষেপ করা কি ধর্ম্মরাজের ধর্ম্ম?

যম। নিয়তি কেন বাধ্যতে! আমার ধর্ম্মাধর্ম্মের সঙ্গে নিয়তির ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ নেই সাবিত্রী। বৃথা সময় নষ্ট কোরো না।

সা। তবে—তাই হোক্ ধর্ম্মরাজ! নিয়তির কার্য্য নিয়তি করুন, আপনার কার্য্য আপনি করুন, আমার কার্য্যও

অগত্যা আমায় করতেই হবে। এই নিন্—আমার স্বামীকে গ্রহণ করুন।

(সাবিত্রীর একপার্শ্বে অবস্থান)

(যম কর্ত্তৃক সত্যবানের প্রাণহরণ)

(যমের প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ সাবিত্রীর গমন)

সপ্তম দৃশ্য।

বনের অপরাংশ।

যম ও তৎপশ্চাৎ সাবিত্রী।

যম। একি? সাবিত্রী? তুমি আমার সঙ্গে কোথায় যাচ্ছ?

সা। প্রভু! সতী স্ত্রী যে হয়···সে জীবনে-মরণে স্বামীর অনুগমন করে। ধর্ম্মরাজ! এ সনাতন ধর্ম্ম কি আপনার অবিদিত?

যম। কি বলছ সাবিত্রী? তুমি স্বামীর সঙ্গে যাবে কোথায়? তোমার স্বামী মৃত,—পৃথিবীতে তার পরমায়ু শেষ—তাই আমি তাকে নিয়ে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে যাবার তো অধিকার নাই। যাও ফিরে যাও—একি? তবু আমার কাছে দাঁড়িয়ে রইলে যে?

সাবিত্রীর গীত।

এ প্রাণহীন দেহ নিয়ে ঘরে ফিরি কেমনে।
দয়া করে দাও ফিরে অভাগীরে প্রাণধনে॥
ধরম করম মোর—ইহকাল পরকাল,
　　বিনিময়ে কর দান,
　　মম প্রাণপতি প্রাণ,
সে বিনা কামনা কিছু—
　　　　নাহি আর এ জীবনে॥

যম। তোমায় তো বলেছি সাবিত্রী, তোমার অনর্থক বিলাপে কোনও ফলোদয় হবে না। মৃত ব্যক্তি কখনই জীবিত হতে পারে না। আমি বললেম—তুমি ফিরে যাও। কি করবে বল—অদৃষ্ট।

সা। দাঁড়ান ধর্ম্মরাজ—দাঁড়ান চলে যাবেন না। আপনার সঙ্গে আমি সপ্তপদ ভ্রমণ করেছি, সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র-কার মতে আপনি আমার সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ। সেই সেই সূত্রে আমি আপনার গতিরোধ কচ্ছি, আপনি কিছুতেই আমায় পরিত্যাগ করে যেতে পার্ব্বেন না।

যম। ঠিক বলেছ সাবিত্রী আমি তোমার যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হয়েছি, সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি যে বর প্রার্থনা করবে, আমি তোমাকে প্রদান করব।

সা। আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হয়ে আছেন তিনি যেন তাঁর চক্ষুরত্ন পুনরায় প্রাপ্ত হন।

যম। তথাস্তু। যাও সাবিত্রী এইবার ফিরে যাও। একি—আবার আমার অনুসরণ কর কেন?

সা। প্রভু! বলেছি তো, আমার স্বামীর যে গতি—আমারও সেই গতি। সেই জন্য আমি আমার স্বামীকে অনুসরণ করছি—আপনাকে নয় ধর্ম্মরাজ! আর এক কথা; শাস্ত্রকারেরা বলেন—সাধুসঙ্গ একবার লাভ করলে—তাদের সংসর্গচ্যুত হওয়া কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। আপনি সাক্ষাৎ সাধুবর—সাধুতার প্রতি, আপনি বিশুদ্ধাত্মা নিষ্পাপ দেহধারী। সুতরাং কোন্ ধর্ম্মানুসারেই বা আপনার সংসর্গ পরিত্যাগ করে চলে যাই!

যম। সাবিত্রী! তোমার তুল্য বিদুষী জ্ঞানময়ী স্ত্রীলোক আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো কোথাও দেখতে পাইনি। তোমার কথায় আমার হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেছি। সাবিত্রী তোমার স্বামীর জীবন ভিন্ন অন্য আর এক বর প্রার্থনা কর।

সা। আমার শ্বশুর রাজ্যহারা হয়ে বনবাস করছেন। আমার প্রতি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন তাহ'লে হে ধর্ম্মরাজ! এই বর দিন যেন তিনি পুনরায় তাঁর হৃতরাজ্য প্রাপ্ত হন।

যম। তথাস্তু। তাহ'লে এইবার তুমি ফিরে যাও মা।

সা। প্রভু! শুনেছি আপনি চিরদিন নিয়মের বশীভূত হয়ে কার্য্য করেন,—নিজের ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনি কোন

আচরণ করেন না। সেই জন্য আপনার নাম যম। হে যমরাজ! বিধি নিয়মে আপনি জগতের লোকের জীবনহারী হ'লেও—আপনার এই সর্বভূতে ভালবাসার—এই দয়া-দান দাক্ষিণ্যে আমি অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করলেম। আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

যম। সাবিত্রী! আমিও তোমার নিকট মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করছি—যে আমি কঠিন হৃদয় যম হ'লে তোমার সুধাময় জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করে পরম পুলকিত হয়েছি। যদি ইচ্ছা হয়—তাহ'লে সত্যবানের জীবন ভিন্ন তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর্ত্তে পার। আমি সানন্দে তোমার সে প্রার্থনাও পূরণ করব।

সা। আমার পিতা মদ্রদেশাধিপতি রাজা অশ্বপতি পুত্রহীন। অতএব রাজবংশোজ্জ্বল তাঁর একশত পুত্র হোক্ এই তৃতীয় বর আপনার কাছে প্রার্থনা কর্চ্ছি—হে ধর্মরাজ! আমার কামনা পূর্ণ করুন।

যম। তথাস্তু। আর নয় সাবিত্রী। এইবার আমায় যেতে দাও—তুমিও কুটীরে ফিরে যাও।

(যমের প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ সাবিত্রীর প্রস্থান)

অষ্টম দৃশ্য

বনমধ্যস্থ—সরোবর তীর।

কাঠুরিয়া ও কাঠুরিয়াপত্নী।

কা-পত্নী। বলি হ্যাঁগো—অ মিন্‌সে তোর কাণ্ডখানা কি বল্ দিকি?

কা। চুপ কর—বলছি, চেঁচাস নি। এখুনি ফ্যাসাদে পড়ে যাবি!

কা-প। চুপ করব—চেঁচাব না? কেন বল দিকি? তোর জোর নাকি? না হয় বিয়েই করিছিস—না হয় তুই আমার সোয়ামীই হয়েছিস্! তা বলে চেঁচাব না না কি?

কা। শুধু শুধু চেঁচাবি কেন বল্‌তো রে হাবাতে মাগী?

কা-প। শুধু শুধু? এই তিনপোর রেতে ঘর থেকে টেনে বার করে এই বনের ভেতোরে...এই পুকুরের পাড়ে টেনে নিয়ে এলি! আর আমি চুপ করে থাক্‌বো? একে রাত্তির···তাতে ঘুট্‌ঘুট্‌টে অন্ধকার? শ্যালেই খাবে কি বাঘেই খাবে—তার কিছু ঠিক ঠিকানা আছে?

কা। ওরে মাগী চুপ করে থাক্—আর কথাটি কস্‌নি। এ বনে আজ একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ডকারখানা হচ্ছে—তা বুঝতে পারছিস্!

কা-প। তোর মাথা আর আমার মুণ্ডু হ'চ্ছে! দেখ দিকি—কি জালাতনে পড়লুম গা? সমস্ত দিন কাঠের বোঝা বয়ে বয়ে শরীলটা অল্লান্তি হয়েছে—একটু জেরোম করে বিছেনায় শুয়েছিলুম, মুখপোড়া সে সুখেও বাদ সাধলে? বলি—কি বিতিকিচ্ছি কাণ্ড হয়েছে বল্‌তো রে ড্যাক্‌রা!

কা। উদিক পানে একটা আলো দেখতে পাচ্ছিস্?

কা-প। পাবনা কেন। ঐ দিক্‌টা জ্যোচ্‌ছনা উঠেছে।

কা। ওটা তোর বাপের বাড়ীর দিক কি না—তাই চাদ্দিক অন্ধকার আর ঐ দিকটাই জোচ্‌ছনা। ওটা কোন্ দিক্ বল দিকি?

কা-প। আহা তোর মতন কিনা আমি মুরুক্ষু? আমার দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান নেই? ওটা সরাসর দক্ষিণ দিক?

কা। বারে পাগলি—তোর তাহ'লে জ্ঞানগম্যি আছে! আচ্ছা ঐ দিক থেকে একটা সৈরভ আসছে গন্ধ পাচ্ছিস্!

কা-প। হুঁ—একটা যেন গোবর পচার গন্ধ আস্‌ছে।

ক। তোর যমন গরুর মত থ্যাবড়া নাক তুই গোবর গন্ধ পাবি না তো কি কেয়াফুলের গন্ধ পাবি রে মাগী!

কা-প। তোর গরুর মত নাক—আমার হবে কেন? আমি ভাল গন্ধ পাচ্ছি না? ভর ভর করে চাদ্দিকে ফুলের গন্ধ বেরুচ্চে—আর আমি পাচ্ছি না?

কা। ওরে মাগী—এ ফুলের নয়—ফুলের গন্ধ নয়! আমার বনে বনে বনফুলের গন্ধ শুঁকে শুঁকে নাড়ে জেরো গণ্ডা বরস কেটে গেল—আমি ফুলের গন্ধ চিনি না?

কা-প। তবে কিসের গন্ধ ?

কা। এ বনে আজ দেবতারা বেড়াতে এসেছে। আমি এতক্ষণ তোকে বলিনি ? এইবার বলি শোন্। আজ বিকেল বেলা স্বচক্ষে দেখে গেছি বনে একটা গাছেও ফুল নেই,—আদ্ধেকের ওপোর গাছপালা সব শুকনো,—তার ওপোর বেজায় গরম-গুমোট—কোথাও একটু হাওয়ার চিহ্নও নেই—গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ছে না—শুনছিস্—

কা-প। পুরণো কথা নতুন করে শুনবে কি ? তোর ইচ্ছে হয়—তুই ভ্যাড় ভ্যাড় করে বলে যা না।

কা। তারপর শোন—হঠাৎ নিশুতি রেতে—বিছেনায় শুয়ে শুনতে পেলুম—চাদ্দিকে বনের ভেতোর বিটকেল আওয়াজ—ধুপ্ ধাপ্ লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি হ'তে লেগেছে ! তাই না শুনে যেই ঘর থেকে বাইরে ফাঁকায় বেরুলুম—অম্‌নি কি দেখলুম জানিস্—

কা-প। কি করে জানবো ? তোর মতন তো আর আমার বাতিক বাড়েনি যে ঘুম ভেঙ্গে আচম্‌কা ঘর থেকে বেরুবো !

কা। তোর তো ঘুম নয় রে মাগী—তোর ও কাল-নিদ্রে ! একবার বিছানায় লেটে পোড়লে মরিছিস কি বেঁচে আছিস্—কার বাবার সাধ্যি বোঝে ? কেবল বেজায় নাক ডাকার চোটে বোঝা যায় জ্যান্ত আছিস্ !

কা-প। তারপর কি দেখলি বলনা।

কা। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি—শুক্‌নো গাছের ডাল-পালা সব গজিয়ে উঠেছে—ঐ দেখ চাদ্দিকে ফুল ফুটেছে—বনের ঐ দিকটায় যেন ২০০।৫০০ চাঁদ উঠেছে,—কেমন একটা মজাদার ভরভর গন্ধ বেরুচ্ছে—ফুর ফুর বসন্তের হাওয়া দিচ্ছে,—এই সবেতে বুঝলি কিনা প্রাণটা যেতে গেল। তখুনি বুঝলুম, নিয্যস্ দেবতা-টেবতা কেউ বনে এসেছে ! তাই তোকে ডেকে একেবারে রুকে বেরিয়ে পড়লুম !

কা-প। বড়া বড়া তাড়ির ছেরাদ্দ করে তোর মাথা বিগড়ে গেছে। চারপো রাতে উঠে বলে—বনের ভেতোর দেবতা এয়েছে ! তাই মাগকে নিয়ে গাঁটছড়া বেঁধে দেবতার পেছনে ধাওয়া কর্ত্তে যাচ্ছে ! ওরে মুখপোড়া ও দেবতা-টেবতা নয়, ও উপদেবতা তোর ঘাড় মটকাবার জন্যে তোকে নিশিথে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে ! তুই যা—আমি ঘরে দোরে খিল এঁটে বিছ্‌ছেরেম করিগে।

কাঠুরিয়া ও তৎপত্নীর
গীত।

কা-প। তোর জ্বালায় মলুম জ্বলে।
হাড়কালী মাসকালী আমার, -মালা দিয়ে ঐ গলে—
ঐ অনামুখোর গলে ॥

কা। ফিরিয়ে নে তোর মালা, দে তুই উল্টো চোদ্দ পাক্—
মাগ নোস্ তুই বাঘরে মাগী, থাক্ তফাতে থাক্ ;
আজ থেকে সম্পর্ক ঘুচে যাক্ ;—

কা-প। তুই ভূতের পাছু করবি ধাওয়া,—(হ্যাঁরে)
তোর সঙ্গে কি পোষায় যাওয়া ? (বলনা)
(এখন) পেঁচোয় পাওয়া ভাতার নিয়ে—
(কার) সুখ হয় কোন্ কালে ?
(তোর) রাগ হ'ল,—মোর বয়েই গেল,—
(আমি) শুইগে শেষে গা ঢেলে ;

কা। তুই চুলোয় গিয়ে,—থাক্‌গে শুয়ে,
(আমি) ঐ বনের দিকে যাই চলে ॥

(উভয়ের প্রস্থান)

নবম দৃশ্য।
বৈতরিণী তীর।
যম ও তৎপশ্চাৎ সাবিত্রী।

যম। যাক্—অনেক কষ্টে অভাগিনী সাবিত্রীকে ভুলিয়ে চলে এসেছি ! গোটাকতক বর দিয়ে—কোন রকমে যে তাকে তুষ্ট করে আসতে পেরেছি—এই যথেষ্ট ! নইলে, তার মত পতিপরায়ণা সতীর হাত থেকে—এ অবস্থায় তার পতির

প্রাণ নিয়ে নির্বিঘ্নে যমপুরীতে প্রত্যাবর্তন করা আমার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হ'ত।

সা। উঃ কি ভীষণ নদী সম্মুখে গর্জন কচ্ছে!

যম। অঁ্যা—একি? সাবিত্রী? তুমি এখনও আমার সঙ্গে? তুমি এখান পর্য্যন্ত আমার পশ্চাৎ অনুসরণ করে এসেছ?

সা। ধর্ম্মরাজ! আপনিই তো আমাকে পথ দেখিয়ে এনেছেন! সংসারে সতী নারীর স্বামীর অনুগমন করার অর্থ ধর্ম্ম পথ অবলম্বন করা। ধর্ম্মের রাজা আপনি,—একথা আপনাকে বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র।

যম। প্রগল্‌ভা রমণী! এখনও আমার হিতকথা শোনো! আর আমার সঙ্গে একপদ অগ্রসর হবার চেষ্টা কোরোনা। দেখছ—সম্মুখে কি ভয়ঙ্কর নদী, কি ভীষণ তরঙ্গস্রোত ভীমরোলে প্রবাহিত। এ নদীর নাম বৈতরিণী। সংসারে জীবের দেহে যতক্ষণ প্রাণবায়ু বদ্ধ থাকবে—ততক্ষণ ঐ বৈতরিণীর এ পারে তাকে অবস্থান কর্ত্তেই হবে। প্রাণ দেহচ্যুত হলে তবে সূক্ষ্মশরীরে সে বৈতরিণী পার হয়ে—পরপারে ঐ বিকট অন্ধকার সমাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর যমরাজ্যে উপনীত হবে।

সা। প্রভু! যে রমণী স্বামীর অনুগামিনী হয়, কোন স্থানইতো তার পক্ষে ভয়ঙ্কর হতে পারে না! আমার স্বামী যদি স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কোন দেহেই হোক্—ঐ ভীষণ স্থানে যেতে পারেন, আমি পার্ব্বনা কেন?

যম। সাবিত্রী! এখনও তুমি তোমার বিপন্ন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি কর্ত্তে পাচ্ছ না? কেমন করে তুমি স্থূল-দেহে এই ভয়ঙ্করী বৈতরিণী নদী পারে যেতে সক্ষম হবে? শোন সাবিত্রী—ঐ যে বৈতরিণীতে তরল পদার্থ ধূম উদ্গীরণ করতে করতে প্রবাহিত হচ্ছে, ও পৃথিবীর অন্যান্য নদ-নদীর মত স্নিগ্ধ সুশীতল জল নয়! সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত ধাতু ভূগর্ভস্থ ভীষণ অনলে বিগলিত হয়ে—তরল আকারে এই বৈতরিণী নদীতে প্রবাহিত হচ্ছে! কার সাধ্য তীরে দাঁড়িয়ে এই অনল প্রবাহের প্রচণ্ড উত্তাপ সহ্য করে? শুধু তাই নয় সাবিত্রী—ঐ দেখ—ঐ পরপারে কি ভীষণমূর্ত্তি যমকিঙ্কর-গণ বিচরণ করছে—যাদের ছায়া পর্য্যন্ত দেখলে জীবের চৈতন্য বিলুপ্ত হয়! আর ঐ যে বিকট অন্ধকার ভেদ করে বিকট দাবানলের মত ভীষণ অনল ঐ যমপুরীতে দেখতে পাচ্ছ,—তার মধ্য হতে ভয়ঙ্কর কোলাহল চীৎকার শুনতে পাচ্ছ,—পৃথিবীর যত পাপী ঐ স্থানে ঐ নরকানলে শাস্তিগ্রহণ করছে। তুমি বুঝতে পারছ না সাবিত্রী—সে কি ভীষণ দৃশ্য! যাও তোমায় মিনতি কচ্ছি—তুমি এই মুহূর্ত্তে এস্থান হতে আপনার গৃহে প্রত্যাবর্তন কর! যাও—যাও সাবিত্রী, আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব কোরোনা—ফিরে যাও, ফিরে যাও!

সা। ধর্ম্মরাজ! ফিরে যাব কেমন কোরে—কোন মুখ নিয়ে তা আমায় বলুন। আপনি ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি—সাধু, মহানুভব, হৃদয়বান, দয়াময়! আপনি কখনই পাষাণ হৃদয় নন্—খুবই কোমল হৃদয়। আমাকে বলে দিন—কোন মুখে আমি আমার শ্বশুরকুলের একমাত্র বংশের প্রদীপটী নির্ব্বাপিত দেখে—সেই চির অন্ধকারময় সংসারে গিয়ে বাস করব? শাস্ত্রমতে আপনার সঙ্গে আমার বন্ধু সম্বন্ধ,—আমি ধর্ম্মতঃ আপনার বন্ধু—আপনিও আমার বন্ধু। হে সুহৃদ বন্ধুর বংশ নির্ব্বংশ করাই কি বন্ধুত্বের নিয়ম—এই কি সনাতন ধর্ম্ম?

যম। সত্য বলেছ সাবিত্রী! আমার কঠিন হৃদয়ে তোমার এই দুঃখ কথা শুনে বিষম বেদনা বেজে উঠল। ভাল—শেষবার তোমায় আর এক বর প্রদানে আমি প্রস্তুত। সত্যবানের জীবন ভিন্ন তোমার যাতে তৃপ্তিলাভ হয়—এরূপ আর একটী শেষ বর প্রার্থনা কর।

সা। ধর্ম্মরাজ! যথার্থই আমার তুল্য ভাগ্যবতী আর কেউ নাই। প্রভু, যদি শেষ বর প্রদান করেন তবে আমার এই প্রার্থনা যেন এ জগতে আমি নিষ্কালা রমণী নামে সবাকার ঘৃণ্যা না হই।

যম। তথাস্তু। আমার বরে তুমি শত সুপুত্রের জননী হয়ে সৌভাগ্যে ও সুযশে রমণীকুলের শীর্ষস্থান অধিকার কর।

সা। ধর্ম্মরাজ! আপনি দাসীর পুনরায় প্রণাম গ্রহণ করুন।

যম। এইবার তবে তুষ্ট হয়ে গৃহে ফিরে যাও মা। আমাকে আর অনর্থক বিলম্ব করিও না।

সা। আপনার কৃপায় আমার ব্রত সম্পূর্ণ হয়েছে—আমার কামনা সিদ্ধ হয়েছে। এইবার আপনি আমায় অনুমতি করলেই আমি আপনার কথা কার্য্যে পরিণত দেখে আনন্দে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি। দিন, আমার স্বামীর প্রাণ আপনার মুখ নিঃসৃত কথামত আমার ফিরিয়ে দিন।

যম। সে কি? আমি তোমায় কি কথা বললেম?

সা। আপনি সতীসাধ্বী এই সাবিত্রীকে এই পতিগত-প্রাণা, পতিব্রতা রমণীকে শত পুত্রের জননী হবার বর প্রদান করেছেন। আপনি আমার নিকট সত্যপাশে আবদ্ধ হয়ে—হে ধর্ম্মরাজ—আবার কি সে সত্যভঙ্গ কর্ত্তে চান? যদি সংসারে ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক লেপন কর্ত্তে না সাধ থাকে, যদি ধর্ম্ম অধর্ম্ম নয়—বালকের ক্রীড়া কৌতুকের সামগ্রী নয়—এই শিক্ষা জগতে চির প্রচলিত রাখতে সাধ থাকে, তা হ'লে হে ধর্ম্মরাজ—এই মুহূর্ত্তে আপনার প্রদত্ত বর অনুযায়ী আমার শত পুত্রের জন্মদাতা আমার স্বামীর প্রাণ এখুনি ফিরিয়ে দিন। নচেৎ আমি আপনাকে অভিসম্পাত প্রদান করে—

যম। মা মা সতীকুলরাণী—মা সাবিত্রী—রক্ষা কর—রক্ষা কর। সতী মুখ নিঃসৃত ভীষণ দাবানল সদৃশ শাপানলে ধর্ম্ম সংসার ছারখার কোরো না। এই নাও মা—তোমার পতির প্রাণ প্রত্যর্পণ করছি,—তোমার পতিধনকে পুনরায় লাভ কর। এবং সেই সঙ্গে জগতে পতিব্রতা রমণীর অসাধ্য সাধনের জলন্ত দৃষ্টান্ত বিঘোষিত কর। মা সতী শিরোমণি—অধম দাসানুদাসের কোটী কোটী প্রণাম গ্রহণ কর।

সা। ধর্ম্মরাজ! আপনিও পুনর্ব্বার আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

দশম দৃশ্য।

পূর্ব্বোক্ত নিবিড় অরণ্য।

ভূতলে সত্যবান পতিত।

সত্য। একি? কোথায় আমি? এ ঘোর বনে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলেম? সাবিত্রী! সাবিত্রী! প্রিয়তমে! কোথায় তুমি?

(সাবিত্রীর প্রবেশ)

সা। এই যে প্রাণেশ্বর। আমি এসেছি। চল গৃহে যাই—আমার ব্রত উদ্‌যাপন হয়েছে।

সত্য। সাবিত্রী। আমি এতক্ষণ বনে নিদ্রিত হয়েছিলেম—আমায় জাগাও নি প্রাণেশ্বরী? আমার জন্ত তুমি তিনদিন উপবাসী হয়ে আজ সমস্ত রাত্রি অনিদ্রায় কাটালে?

সা। চল এইবার রাজ্যে ফিরে গিয়ে—রাজপ্রাসাদে আরামে সুখ শয্যায় শয়ন করে দাসীর সেবা গ্রহণ করবে।

সত্য। রাজ্য,—রাজপ্রাসাদ, এ সব কি বলছ প্রিয়ে? কঠোর ব্রত পালন করে তোমার কি মস্তিষ্ক বিকৃতি হ'ল না কি?

সা। মস্তিষ্ক বিকৃত হবার মতন কি বললুম প্রাণেশ্বর? তুমি রাজপুত্র—তোমার পিতা রাজ্যেশ্বর,—তোমরা কি চিরদিন দীন হীন ভিখারীর মত বনবাসী হয়ে থাকবে নাকি?

সত্য। সাবিত্রী সাবিত্রী—চল কুটীরে যাই চল। দীর্ঘ অনশনে নিশ্চয় তোমার মস্তিষ্কে ভীষণ ব্যাধি উপস্থিত। তুমি বিকার রোগগ্রস্ত হয়ে প্রলাপ বকছ?

(নারদ, দ্যুমৎসেন, অশ্বপতি, মহিষীদ্বয়, মাণ্ডব্য, মন্ত্রী সভাসদ্ ও পুরবাসিনীগণের প্রবেশ)

নারদ। কেন প্রলাপ বকবে সত্যবান? সাবিত্রী সত্য কথাই বলছে। দেখ—একবার চেয়ে দেখ—

দ্যুমৎ। সত্যবান। প্রিয়পুত্র আমার। শুভক্ষণে আমি দেবী সাবিত্রীকে পুত্রবধূরূপে প্রাপ্ত হয়েছিলেম। আজ তারই কৃপায় অন্ধ আমি চক্ষুরত্ন ফিরে পেলেম, রাজ্যহারা আমি রাজ্য ফিরে পেলেম—

নারদ। দীর্ঘায়ু তুমি সত্যবান, দীর্ঘ পরমায়ু লাভ করলে—সতী সাধ্বীর কৃপায় তুমি শমন ভবন হতে পুনরায় ধরায় ফিরে এলে। মা সাবিত্রী সত্যই তুমি জগতে যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত করলে তা অক্ষয়—অমর—অব্যয়। যে রমণী তোমার চরিত্রগাথা শ্রবণ করবে—নিদারুণ বৈধব্য জ্বালার হাত থেকে সে চিরদিনের মত নিস্তার পাবে। যে প্রতি

প্রভাতে সাবিত্রী সত্যবানকে স্মরণ করবে—তার কখনো অমঙ্গল ঘটবে না। এস মা—পতিকে সঙ্গে লয়ে রাজ্যে ফিরে এসে পিতৃকুল শ্বশুরকুলের মুখোজ্জ্বল কর। উভয় বংশের গৌরব বৃদ্ধি কর।

সকলে। জয় সাবিত্রী সত্যবানের জয়।

গীত।

ধন্য এ জীবন,
পূত এ প্রাণ মন
সার্থক গাহি এ মিলন গান।
(এ) পুণ্য কাহিনী কথা,
শুনিলে জুড়ায় ব্যথা,
পাপী-তাপী সবে পাইবে ত্রাণ॥

পূজি পতি কায়মনে,
প্রেম ও ভকতি দানে,
ফিরায়ে আনিল সতী,
মৃত পতিদেহে প্রাণ;
স্থাপিল তিনলোকে কীর্ত্তি মহান,
জয় সাবিত্রী সত্যবান!
জয় সাবিত্রী সত্যবান!
জয় সাবিত্রী সত্যবান!

নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত উল্লিখিত এই "সাবিত্রী" নাটক সুপ্রসিদ্ধ "গ্রামোফোন্ কোম্পানী" কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ রেকর্ড হইয়া—বঙ্গদেশে অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে। "সচিত্র শিশিরের" পাঠকগণের আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য ৺পূজার সংখ্যায় আমরা এই নাটকখানি প্রকাশিত করিলাম। ইতি—সঃ সঃ শিঃ।

ভাঙা বাড়ীর কাহিনী

[শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়]

ভাঙা এক বাড়ী—প্রাচীরের জীর্ণ রন্ধ্রগুলো পর্য্যন্ত তার আঁধারের আবরণে মৌন। তার প্রবেশ পথে এক কাল বৃদ্ধ অশ্বত্থ পাহারা দেয়, আর তার বুকে পিঠে ছড়িয়ে থাকে তারই পত্রভারনত শাখাগুলি। যেন পুরাকালের সেই পাতালপুরীর নাগকন্যাটী।......

তারই এক কক্ষে এক তরুণী অকালে তার সমস্ত সাধ, আশা অপূর্ণ রেখেই এই ধূলো-মাটীর পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে ব্যগ্র হয়ে পড়েচে। শিয়রের কাছে প্রদীপটাও সেই মেয়েটীর ব্যথা-ক্লান্ত চোখদুটীর মধ্যে জেগে আছে। পাশটীতে বসে শেখরও তেমনি ভাবে সেই ক্ষীণ মেয়েটীর প্রতি চেয়ে।

কালীমাখা গাছপালা আর ভাঙা বাড়ীর বুকে অন্ধকার তখন ধীরে ধীরে স্বচ্ছ হয়ে আসছিল।

শুনচো শেখর—কতদূর থেকে একটা শব্দ ভেসে আসচে।...কিসের শব্দ ও।

কোথায় বুঝি শেষ প্রহরে দেবতার আরতি হচ্চে—

ভারী মিষ্টি লাগচে।...এইবার যা' কিছু মধুর সবই ছেড়ে যেতে হ'বে। কিন্তু ছেড়ে যেতে আমার ইচ্ছে হয় না—আমি যদি বাঁচতে পারতুম।...শেখর তুমি আজ এলে যেন দেবতার দূত হয়ে, নইলে আমায় বুঝি একেবারে নিঃসহায় হয়ে এই নির্জ্জন পুরীতে মরে থাকতে হ'ত। তেমন করে মরতে আমি চাই না। এমনি অবস্থায় দুটী মাস কেটেচে, দু'দিন হ'ল ওঠবার শক্তিটুকুও গেচে। তবু মুখে একটীবার এক গণ্ডুষ জলও কেউ দয়া করে দিতে আসে নি। অপরাধ—একলা মেয়েমানুষ এই বাড়ীতে এই বয়সে পড়ে আছি।... আমার নিজের বিশ্বাস নিয়ে আমি যদি এই ভিটেয় পড়ে থাকি—তাও তারা সহ্য করবে না। বলবে—এ অস্বাভাবিক —এর আড়ালে আরও কিছু আছে...কিন্তু তারা জানে না শেখর—

ছেলেটী তার ম্লান মুখের উপর লুটিয়ে-পড়া চুল ক'টী সরিয়ে দিয়ে বললে—রাণী, আমার কাছে তোমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে না। তিলে তিলে এমনি করে আপনাকে ক্ষয় করেই যে তুমি তোমার প্রতিবাদকে দৃঢ় করে গেলে—তাই আজ আর তোমার কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই।

চোখে অনন্ত-রাত্রি জাগার ব্যথা ভরে মেয়েটী আপন মনে বলছিল—আর একটী দিনের কথা মনে পড়েচে। সেবারও তুমি এমনি লড়াই থেকে ছুটীতে ফিরলে।...কতদিন পরে সেই সেবার দেখা—কতদিনের মনে রাখা। সেদিনের সব কথা মনে আছে—সন্ধ্যার অন্ধকারকে আলো করে চাঁদ উঠল—তোমাকে এই ঘরেরই বাইরে রকটীতে বসিয়ে তোমার কাছে এসে বসলুম। কি জানি কি কথা সেদিন তুমি বলতে চেয়েছিলে আমার মুখের দিকে চেয়ে।...

রাণী, আজ থাক্—সে কথা কাল বলো।

না, এরপর আর সময় হ'বে না বুঝি। খেয়া-পারের বাঁশী আমি শুনতে পাচ্চি...এরপর বুঝি বলবার সময় পাবো না।

একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো রাণী।

কিন্তু তখন আমরা পরস্পরের পাওয়ার বাইরে এসে দাঁড়িয়েচি। আমি তখন পরের স্ত্রী। গরীবের ঘরের খোঁড়া মেয়ে—পার করা সহজ নয় দেখে মা আমায় নারায়ণ শিলার হাতে সমর্পণ করে গেলেন। মানুষ হ'ল দেবতার পারণীতা। কিন্তু ভিতরে নারী আমায় দেবতাকে স্বামীরূপে পেয়ে সুখী হ'তে পারলে না। রূপ-রস ময় এই বিশ্বে এসে আমি পাষাণ কারায় বন্দী হয়ে রইলুম...

হয়ত মানুষের চোখে, সমাজের চোখে আমি দোষী, কিন্তু তুমি ত' জানো শেখর, মানুষ শুধু দেবতাকে নিয়ে বাঁচতে পারে না, চলার পথে তার পাশে মানুষ না পেলে চলা

তার হয় না। তাই আমি ভাবি—মানুষ আর সমাজের যিনি অতীত তাঁর চোখে অপরাধী হয়ত আমি হ'ব না—তাঁরই সৃষ্টি এই নারীকে হয়ত তিনি ভুল বুঝবেন না।...

ভারী মিষ্টি লাগচে ওই এলোমেলো বাতাসটা...আকাশের কোলে মেঘ জড় হ'চ্চে—জানলাটা আরও একটু খুলে দাও—। যার বুকে এই উনিশটা বছর কাটল সেই স্নেহ পবিত্র মাকে দেখে নিই...অভাগীর শেষ দেখা...

অশ্রু-করুণ স্বরে শেখর ডাকলে—রাণী !...

ও সুরে ডেকে আমার মরণ ভুলিয়ে দিয়ো না শেখর !... এ শাসন—কঠোর পৃথিবীতে নয় - এই ফেলে-আসা জীবনে যে ভুল করে চললুম মৃত্যুতে তাকে সংশোধন করে নেবো—সেখানে আমাদের অধিকারে কেউ হাত দেবে না !...না, সেই ছোট্টবেলার মত করে ওই সুরে ডেকে আমার এই শেষ প্রহরে পথ ভুলিয়ে দিয়ো না—

শেখর সব ভুলে অশ্রুসিক্তকণ্ঠে আবার ডাকলে—রাণী...

এক ঝলক সজল বাতাস ঘরে ঢুকে ম্লান দীপ শিখাটিকে নিবিয়ে দিয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে চিরদিনের মত নিবে গেল একটী ক্লান্ত বুভুক্ষু নারীর প্রাণের ক্ষীণ দীপশিখা !...

বাইরের আকাশকে মুখর করে তখন অভিসারিকার বরষার পায়ে মেঘ-মঞ্জীর বেজে উঠছিল ঝম্, ঝম্ ঝম্...

ভাঙা বাড়ীর সে রাত্রির ইতিহাস পল্লীর কেউ জানলে না। রাতের অন্ধকারে যে ছেলেটা এসে সেই রোগশীর্ণা মেয়েটীর পাশে বসেছিল—প্রভাত-আলোকে পৃথিবী ঘুম ভেঙে ওঠবার পূর্ব্বেই সে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল—তার ব্যর্থ যৌবনের রাণীকে নদীর বুকে সমর্পণ করে। পরদিন সেই বাড়ীর পাশের পথ দিয়ে কত লোক চলল—কত পসারী ডালা মাথায় করে সেই পথ দিয়ে হাটের দিকে এগিয়ে গেল—তারা কেউ জানলে না সেই অভিশপ্তা মেয়েটীর কথা, যার চোখের জলে সেই ভাঙা বাড়ীর প্রত্যেকটী পঞ্জর পবিত্র হয়ে রইল...

জীর্ণ শ্যাওলা-ধরা বাড়ীর প্রতি কেউ দৃষ্টি দেয় না। স্তব্ধ-বাক্ নিমেষহীন দৃষ্টিতে সেই ভাঙা ইঁটের স্তূপ নিপীড়িত জীবনের ব্যথা বুকে করে অসীম নীলের রাজ্যে চেয়ে থাকে—

আর সকল কথা উধাও হয় তারার মাঝে
যেখানে ঐ আঁধার বীণার আলো বাজে !

তুমি ও আমি

[কাঞ্চনপ্রভা রায়]

তুমি আমি আমি তুমি—এই দুটী ফুল
দুজনার সুরভিতে দুজনে আকুল।
তুমি আমি আমি তুমি—এই দুটী ঢেউ
অন্তরে বাহিরে এক পৃথক না কেউ।
তুমি আমি আমি তুমি—এই দুটী গান
দুই সুরে মিলিমিশি দুটী এক তান।
তুমি আমি আমি তুমি—দুটী 'ভালবাসা'
জীবনে মরণে এক নাহি ভিন্ন আশা।

সতীর আহ্বান

[শ্রীজিতেন দাশ গুপ্ত]

—এক—

আশ্বিনের মাঝামাঝি। পূজার আর মাত্র দুই দিন বাকী। চম্পক নদীর তীরের সাতলহর গ্রামখানা মা আনন্দময়ীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সবার প্রাণে একটা অভিনব আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। সুপ্তপল্লীখান হঠাৎ যেন রাজপুত্রের সোণার কাঠির স্পর্শে জেগে উঠেছে। সে পল্লীখানা এতদিন পর্য্যন্ত নির্জ্জন মরুভূমির মত ধূ ধূ করছিল—দুনিয়ার এক প্রান্তে পাষাণের মত নির্জ্জীব হয়ে পড়ে ছিল—হঠাৎ যেন কোন যাদুমায়ার প্রভাবে আবার তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে। আবার যেন তার সেই অতীতের গৌরবময় দিনকে ফিরে পেয়েছে। সমস্ত পল্লীখানা জনকোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠেছে। কাননে কাননে আবার দোয়েল-শ্যামার কাকলী শোনা যাচ্ছে—পুষ্প বৃক্ষের শুষ্ক পুষ্প আবার মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে—পল্লীবধূ কাঁকন বাজিয়ে কলসী কাঁকে দিঘীর পানে জল আনতে যাচছে চম্পকের তীরে আবার সেই অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বের মত লোক ছুট্‌তে সুরু করেছে।

সবার মনেই আজ আনন্দের বাণ ডেকেছে! আজ যেন তারা তাদের বহুদিনকার হারাণো জিনিষ আবার ফিরে পেয়েছে—তাই বুঝি অতীতের সব দুঃখ—সব জ্বালা ভুলে গিয়ে এমনিভাবে আজ সারা পল্লীখানা মেতে উঠেছে।

ঘরমুখো বাঙ্গালীর ঘরের দিকে মন টেনেছে। এক একবার গ্রামের সবাই আবার তাদের সাধের জন্মভূমিতে ফিরে এসেছে। কিছু দিনের জন্য যেন তারা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

সাতলহর গ্রামের ভিতরে রায়দের অবস্থা সব চেয়ে ভাল। প্রতি বৎসরই তাঁদের বাড়ীতে ঘটা করে পূজা হয় এবং তাঁদের প্রতিমাই সকলের চেয়ে বড় হয়। আজ তাঁদের বাড়ীতে পোটো ঠাকুর চিত্র করতে এসেছে। গ্রামের অনেকেই তাই দেখতে এসেছে। চণ্ডী মণ্ডপের একদিকে পূজারী ঠাকুর চণ্ডীপাঠ করছিলেন—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

একটি বাইশ, তেইশ বৎসরের যুবক একাগ্রমনে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল—এমন সময় তারই সমবয়সী একটি যুবক হাস্‌তে হাস্‌তে এসে বলল—কিহে মাতৃভক্ত যোধ, মায়ের কাছ থেকে শক্তি সঞ্চয় করছ নাকি? সুধীর একটু হেসে বল্‌ল—তুই কখন এলিরে অনিল? অনিল বল্‌ল—এইতো আজ ভোরে সবে এসে পৌছেছি।

কাল তোর আসবার কথা ছিল না?

কি করব বল—যে ভীড়। ভীড়ের জন্যে ট্রেনটা মিস্ করতে হলো—নয়তো কাল রাত্তিরেই এসে পৌছতুম! অনিল একটু থেমে বল্‌ল- আমি তোদের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিলুম।

পার্ট মুখস্ত করেছিস? আজ দুপুর থেকেই কিন্তু 'রিহার্সাল' বসবে। দ্বাদশীর দিন যেমন করে হোক, 'প্লে' নাবাতেই হবে। মাত্র আটদিন ছুটী পেয়েছি ত্রয়োদশীর দিনই আবার আমাকে ফিরে যেতে হবে।

সুধীর বল্‌ল—'পার্ট'তো একরকম মুখস্ত হয়েছে—কিন্তু এ বই কি Successful হবে? বিশেষতঃ আমার দ্বারা ও ভূমিকা চল্‌বে বলে মোটেই মনে হচ্ছে না।

অনিল বলল—তোর দ্বারা না চল্‌লে আর কার দ্বারা চলবে? বিনয় করা হচ্ছে বুঝি?—এ যাবত তো প্রত্যেক অভিনয়ে তুই-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে আস্‌ছিস। আর বার কার 'বঙ্গেবর্গী' অভিনয়ে তোর সিরাজের ভূমিকা কেমন চমৎকার হয়েছিল—কেমন সুন্দর মানিয়েছিল তোকে—

সুধীর বাধা দিয়ে বলল—ও হঠাৎ একটা উৎরে গেছে।

কেন ? 'সোরাব রুস্তমে' রুস্তম ?—সেটাও কি হঠাৎ উৎরে গেছে নাকি ?

সুধীর বলল—'রুস্তমের পার্ট' আর জনা নাটকে প্রবীরের পার্ট' ঢের তফাৎ।

অনিল বলল—আচ্ছা সে কথা এখন থাক্। রিহার্সালে সবই বোঝা যাবে। এখন চল—চট করে সবার সঙ্গে একবার দেখাটা করে আসি।

সুধীর বলল—আমার একবার বাড়ী যেতে হবে।

অনিল মৃদুহাস্যে বলল—কেন—বাড়ী গিয়ে মায়ের অনুমতি নিতে হবে নাকি ? প্রবীরের পার্ট পেয়েই খুব মাতৃভক্ত হয়ে উঠেছিস দেখতে পাচ্ছি।

সুধীর সহাস্যে বলল—কৃষ্ণঠাকুরও কি রাধার অনুমতি নিয়ে বেরিয়েছে ?

—না রাধার অনুমতি নেবার আর অবকাশ ঘটে নি। বাড়ীতে জিনিস পত্তরগুলি রেখেই তোর খোঁজে বেরিয়ে পড়েছি। তুই তো আর আমার রাধার চেয়ে কম নয়—তোর অনুমতি হলেই যথেষ্ট।

দুই বন্ধুতে হাসতে হাসতে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

সুধীর ও অনিল ছেলে বেলা থেকে একই সঙ্গে পড়েছে খেলেছে একই সঙ্গে গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছে। শৈশবের সেই বন্ধুত্ব এখন বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। মোটামুটি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে তারা জন্মগ্রহণ করেছে। দুজন কার অবস্থা প্রায় এক রকম—তাই বোধ হয় তাদের বন্ধুত্ব আরও বেশী করে জমে উঠেছে।

সুধীর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর কোন গ্রাম্য কলেজে আই. এ পড়ছিল—হঠাৎ তার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক তাকে ছিন্ন করতে হয়েছে। এখন বাড়ীতেই আছে—পূজার পরেই চাকুরীর খোঁজে বের হবে বলে মনস্থ করেছে।

অনিল ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর কোনও কার-খানায় শিক্ষানবিশি করে আপাততঃ পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকুরী পেয়েছে। সে কলকাতাতেই থাকে।

তারা যে বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেয়—সেই বৎসর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে তাদের গ্রামে "ভেনাস ক্লাব" নাম দিয়ে একটি নাট্য সমিতি স্থাপন করেছিল। প্রতিবার পূজার সময় এই সমিতির সভ্যবৃন্দ সাতলহর গ্রামে একটি অভিনয়ের আয়োজন করত। গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতার এতে পূর্ণ সহানুভূতিই ছিল।

এ বৎসর এরা "জনা" নাটকের অভিনয়ের সঙ্কল্প করেছে। প্রবীরের ভূমিকা নিয়েছে সুধীর আর শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকা নিয়েছে অনিল।

প্রতিবার পূজার সময় তারা এই ব্যাপারেই মেতে থাকে। সারা দিন-রাত রিহার্সাল দেয়। সে কী স্ফূর্তি—সে কী আনন্দ। সারা বৎসর তারা এই দিনের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করে।

এবারও পাড়ার ছেলেরা আর একটা নাট্য সমিতি গড়ে তুলেছে—তাই এরা একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ছয়মাস আগে থেকেই তারা বই ঠিক করে পার্ট মুখস্থ করতে আরম্ভ করেছে। এবার আনন্দময়ীর কাছে তাদের কামনা যেন তারা প্রতিযোগীতায় পিছিয়ে না পড়ে। সর্ব্বমঙ্গলা যেন তাদের জয়যুক্ত করেন।

—দুই—

সেদিন বারুণী।

আজ রাত্র নয়টার সময় সাতলহর গ্রামে রায়েদের বাড়ীতে স্থানীয় "ভেনাস ক্লাবের" সভ্যগণ কর্তৃক মহা-সমারোহে "জনা" নাটকের অভিনয় হবে বলে সারা গ্রাম খানার ভিতরে ঘোষণা করা হয়েছে। সবাই আনন্দে বিভোর। সারা বছরটা ধরে সবাই একঘেয়ে জীবন-যাপন করে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—আজ তারা দীর্ঘ একটি বছর পরে একটু নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করবার সুযোগ পাবে। অভিনয় দেখবার কৌতূহল সবারই আছে—তবে বৃদ্ধেরা গাম্ভীর্য্যের আবরণে সেটাকে লুকিয়ে রেখেছেন—বাইরে প্রকাশ করছেন না। আর গ্রামের তরুণ সম্প্রদায় সেই কৌতূহলটাকে আনন্দের আতিশয্যে বাইরে প্রকাশ করে বসেছে। তাদের আজ আর আনন্দ রাখবার ঠাঁই নেই। সকাল হতে না হতেই গ্রামের বালকবৃন্দ এক এক করে রায়েদের প্রাঙ্গনে এসে হাজির হয়েছে। সে বাড়ীতে আজ মহাসমারোহে অভিনয়ের মঞ্চ বাঁধা হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে সুধীর এল। সে আসতেই সবাই এক-বাক্যে চীৎকার করে উঠল—কিহে মাতৃভক্ত বোধ, এতক্ষণ বাড়ীতে বসে কী করা হচ্ছিল? মাতৃপূজা হচ্ছিল নাকি?

সুধীর একটু হেসে বলল—মাতৃপূজা খুব ভোরে সেরেই বেরিয়েছি, এতক্ষণ যুদ্ধের আয়োজন করতে ব্যস্ত ছিলুম। ও বাড়ীর মণিকে ঘট আর তীর ধনুক তৈরী করতে বলে এলুম। এই যে শ্রীকৃষ্ণ যে সশরীরে উপস্থিত। কতক্ষণ এসেছেন আপনি? ... তোকে আর উপেনকে যে আলো যোগাড় করবার ভার দিয়েছিলুম তার কী হোল?

সুধীর আরও কি বলতে যাচ্ছিল—এমন সময় রায়েদের বাড়ীর বড়বাবু এসে বললেন বেলা হোল—তোমরা কিছু জলযোগ করে নেও।

জলযোগের কথা শুনে সবাই আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। অভিনয় করবার পূর্ব্বেই তারা মহা সমারোহে জলযোগ ক্রিয়া সম্পন্ন করে ফেলল।

*　　*　　*　　*

রাত্রি প্রায় নয়টা বাজে। অভিনয় আরম্ভ হবার আর বেশী বিলম্ব নেই। 'কন্‌সার্ট' আরম্ভ হয়ে গেছে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা অভিনয় দেখবার জন্য রায়েদের প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছে। সকলের দৃষ্টিই মঞ্চের দিকে। কতক্ষণে ড্রপ উঠবে—কতক্ষণে অভিনয় আরম্ভ হবে।

ঠিক সাড়ে নয়টার সময় অভিনয় আরম্ভ হোল। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অভিনয় বেশ ভালই হচ্ছিল—সমবেত দর্শকমণ্ডলী নির্ব্বাক হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখে যাচ্ছিল। তৃতীয় অঙ্ক প্রায় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা গণ্ডগোল বেধে গেল।

পুরুষ দর্শকদের পিছনে রায়েদের চণ্ডীমণ্ডপে মেয়েদের বসবার স্থান নির্দ্দেশ করা হয়েছিল। তৃতীয় অঙ্ক শেষ হতে না হতেই সেইখান থেকে একটা কান্নার রোল উঠল—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের চীৎকার ধ্বনিতে একটা ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করল। ব্যাপার কী জানবার জন্য সবাই সেই দিকে ছুটে গেল। ষ্টেজ ম্যানেজার বিপদ দেখে ড্রপ ফেলে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল—তৃতীয় অঙ্কে শেষ দৃশ্যে অর্জ্জুনের শরাঘাতে প্রবীর যখন মৃত্যুর অভিনয় করে—সেই সময়ে সুধীরের মা তাঁর ছেলের বাস্তব মৃত্যু কল্পনা করে ক্রন্দন করে ওঠেন—সঙ্গে সঙ্গে সুধীরের স্ত্রী শোভা ও তার শাশুড়ীর সঙ্গে যোগ দেয়। শোভার যোগ দেবার আর একটি কারণ—সে বর্ত্তমান থাকতে তার চোখের সামনে মদনমঞ্জরীর সঙ্গে সুধীরের প্রেমাভিনয়। সে যতই মদনমঞ্জরীকে তার স্বামীর সঙ্গে প্রেম করতে দেখছিল—রাগে ক্ষোভে ততই সে জর্জ্জরিত হয়ে পড়ছিল।

মানুষের মন যখন দুঃখে ও ক্ষোভে অভিভূত হয় এবং সেই ক্ষোভ ও দুঃখ যখন তার মনের ভিতরটা তুষানলের মত দগ্ধ করতে থাকে—সে সময় সে যদি কোথাও একটু সহানুভূতির আভাষ যায় তবে বর্ষাপ্লাবিত নদীর মত তার ভিতরের ক্ষোভটা বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়ে—কেউ তার গতিরোধ করতে পারে না। শোভারও ঠিক তাই হয়েছিল। সে অভিনয় দেখতে দেখতে ক্ষোভে ও দুঃখে খড়ই স্রিয়মানা হয়ে পড়েছিল—হঠাৎ সুধীরের মায়ের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে সেও কেঁদে উঠল। অন্যান্য মেয়েরা এর কোন কারণ বুঝতে না পেরে তাদের থামাবার চেষ্টা করতে লাগল। যখন সকলে ব্যাপারটা জানতে পারল—তখন সবাই তাদের সান্ত্বনা দিতে লাগল। গ্রামের দুষ্টু ছেলেরা মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

ঘটনার কারণ অবগত হয়ে সুধীর এসে মা ও স্ত্রীকে বোঝাতে লাগল—তারপর তারা শান্ত হোলেন। কিন্তু লজ্জায় সুধীরের একেবারে মাথা কাটা গেল। প্রবীরের ভূমিকা অভিনয় করে সে যে বিজয়মাল্য পেয়েছিল—তা তার কাছে অত্যন্ত ম্লান বলে বোধ হতে লাগল। মা ও স্ত্রীর উপরে তার রাগটা অত্যন্ত বেড়ে গেল। সে আসছে কালই মনে মনে গ্রাম পরিত্যাগ করবার সঙ্কল্প করল।

রাত প্রায় তিনটার সময় অভিনয় শেষ হয়ে গেল। অভিনয় বেশ ভালই হয়েছে—অভিনেতাদের সবারই বিজয়ের আনন্দে বুক ভরে উঠেছে। কেবল শ্রেষ্ঠ অভিনেতাটি কিছুতেই এদের আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারছে না। লজ্জায় তার মুখখানা লাল হয়ে উঠেছে। সে কারও মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না।

হঠাৎ নরেশ এসে বলল—হ্যা ভাই সুধীর তোর মা আর বউ আজ কী কাণ্ডটাই করলে ?

মানুষ যেখানে নিজেকে দুর্ব্বল বোধ করে—সকল সময় সেটাকে সে চেপে রাখতে চায়—সেইটে যদি কেউ প্রকাশ করে দেয় তবে সে ভীষণ আঘাত পায়। নরেশের এই কথাটায় সুধীরের মুখ এতটুকু হয়ে গেল—লজ্জায় সে কোন কথা বলতে পারল না।

অনিল সুধীরের মুখের ভাব দেখে ব্যাপারটা বেশ বুঝতে পারল। সে তাড়াতাড়ি বলল—কাণ্ডটা আবার কিরে নরেশ ? সুধীরের অভিনয় আজ এতটা নিখুঁত ও মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে যে ওর নিজের মা ও বউ পর্য্যন্ত বাস্তব বলে মনে ভেবেছে। এ তো আমাদের গৌরবের কথা।

সুধীর অনিলের দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলল—তুই কি কাল যাওয়াই ঠিক করলি রে অনিল ?

অনিল বলল—কাল আর যাব না। পরশু ভোরের ট্রেণেই রওনা হব মনে করছি।

সুধীর বলল—আমিও তোর সঙ্গে যাব বলে ভাবছি। একটা চাকরী বাকরী খুঁজে নিতে হবে তো।

তা চলনা কেন, দুজনেই একসঙ্গে খোঁজা যাবে।

এমন সময় নরেশ বলল—তা সুধীর, তুই যেমন সুন্দর অভিনয় করিস—কোন পাবলিক থিয়েটারে গেলে তোকে লুফে নেয়। আজকাল তো দেশের বড় বড় লোক পাবলিক থিয়েটারে ঢুকছে—তাতে তো আর কোন অপমান নেই।

অনিল বলল—না থিয়েটারের সেদিন আজ আর নেই। দেশের যত শিক্ষিত ভদ্রলোক, আজকাল সানন্দে নটরাজকে বরণ করে নিয়েছে।

নরেশ বলল—এই যে সেদিন আমার কাকিমার ভাই এখানে এসেছিল—সুধীর তো তাকে দেখেছিস। সে বলছিল, সরস্বতী পূজার সময় তাদের কলেজের অভিনয় দেখে অনেক সমজদার লোক নাকি তাকে বলেছে যে পাবলিক থিয়েটারে মাত্র তিনজন অভিনেতা ছাড়া তার বড় আর কেউ নেই। তাকে নাকি থিয়েটারওয়ালারা নেবার জন্য লোফালুফি করছে।

অনিল একটু হেসে বলল—ওই যে ছিপ্‌ছিপে ছেলেটি তো—চোখ দুটো খুব বড় বড় নারে ? ওকে আমি বেশ চিনি—তোদের আচ্ছা ধাপ্পা দিয়ে গেছে যাহোক।

সুধীর ভাবতে লাগল—এখন আমার আর গ্রামে থাকা উচিত নয়। পরশুই অনিলের সঙ্গে কলকাতা যাওয়া যাক্। যদি কোন জায়গায়ই সুবিধে না হয় তবে পাবলিক থিয়েটারেই ঢুকে যাব।

আর কিছুক্ষণ পরে তারা সবাই বাড়ীর দিকে রওনা হোল। যখন বাড়ীতে পৌছিল—তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

—তিন—

প্রায় একমাস হোল সুধীর কলকাতা এসেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত চাকুরীর কোন সুবিধা করে উঠতে পারে নি। সমস্ত দিন চাকুরীর খোঁজ করে বেরিয়েছি—কিন্তু কোন ফল হয় নি। দু-একজন যদিও বা আশা দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের সে আশাবাণী সফল হয় নি কলকাতার মত সহরে চাকুরী পাওয়া যে এত কষ্টকর.. সুধীরের আগে সেটা ধারণা ছিল না। অন্য কোথাও কোন চাকরীর যোগাড় না করতে পেরে সে থিয়েটারে ঢোকবার চেষ্টাও করেছিল···কিন্তু তাতেও বিশেষ কোন সুবিধা হয় নি। সহরের তিনটে থিয়েটারের ভিতর দুটো থেকে পত্র-পাঠ বিদায় হয়েছে...এখন মাত্র একটা বাকী। সেখানে একটু আশা পেয়েছে—সেই থিয়েটারের কর্ত্তা আজ সকালে তাকে যেতে বলেছেন। আজ সেখানে গিয়ে যদি কোন সুবিধা না হয় তবে কালই সে বাড়ী চলে যাবে।

আজ খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে সুধীর এই সব কথাই ভাবছিল—এমন সময় অনিল এসে বলল -কিরে সুধীর বসে বসে কী ভাবছিস ? আজ সকালে কোথায় যাবার কথা আছে—মনে আছে তো রে ?

সুধীর বলল—মনে আছে বৈকি ? কিন্তু গিয়ে কোন লাভ হবে কি ?

অনিল বলল—দেখা যাক্ চেষ্টা করে—না হয়তো আর কি হবে ? তুই জামা কাপড়টা পর—আমি চট্ করে মুখটা ধুয়ে আসি।

বেলা প্রায় আটটার সময় সুধীর ও অনিল থিয়েটারের কর্ত্তার সঙ্গে দেখা করতে গেল। সেখানে গিয়ে শুনল—তিনি এখনও আসেন নি, আধঘণ্টার ভিতরেই এসে পৌঁছবেন। সুধীর মনে মনে দেবতাদিগের নিকট মানৎ করতে লাগল।

প্রায় একঘণ্টা পরে কর্ত্তা এলেন। তাদের দেখে বললেন, এই যে কতক্ষণ এসেছেন আপনারা ?

অনিল বলল, প্রায় একঘণ্টা।

আজ আমার একটু দেরী হয়ে গেছে। আসুন আমার সঙ্গে।

কয়েকটি কথাবার্ত্তার পর কর্ত্তাটি সুধীরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি কি ভূমিকা অভিনয় করেছেন ?

সুধীর তার জবাব দিতেই তিনি বললেন—প্রবীরের যুদ্ধের দৃশ্যটা একবার পড়ুন তো !

সুধীর যতদূর সম্ভব সংযত হয়ে দৃশ্যটি পড়ে ফেলল। তিনি বললেন—আপনাকে নিতে পারি। আপাততঃ ছয়মাস কুড়িটাকা করে মাইনে দেব, পরে যোগ্যতা অনুসারে মাইনে বাড়িয়ে দেব। কেমন রাজী আছেন এই সত্তে ?

সুধীর আর উপায়ান্তর না দেখে তাতেই সম্মত হোল।

থিয়েটারের ভিতরে ঢুকে সুধীর দেখল যে সে এক বিশ্রী ব্যাপার। 'চরিত্র' বলে কোন জিনিসই এদের নেই। প্রায় সবাই মদ খেয়ে আর নটীর পূজা করে সমস্ত টাকাই উড়িয়ে দেয়। এতে কারো মনে কোন সঙ্কোচ নেই, লজ্জা নেই। এইটেই যেন তাদের নিত্যকর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকে সে যে সব বড় বড় চমকপ্রদ কথা শুনতো—ভিতরে এসে দেখল যে সে সব কথাই ফাঁকা।

সুধীর এই সব মোটেই পছন্দ করতো না। সে সব মেয়ে অভিনেত্রীদের এড়িয়ে চলতো—পুরুষ অভিনেতাদের সঙ্গেও তেমন মিশতো না। অভিনয় করবার সময় ছাড়া কারো সঙ্গে বড় কথা বলতো না। প্রথম প্রথম তারা সুধীরের এ ভাবটা লক্ষ্য করে ভাবতো নতুন এসেছে, দুদিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তিনমাস কেটে গেল—কিন্তু সুধীরের কোন পরিবর্ত্তন হোল না।

সেদিন থিয়েটারে একখানা নতুন বইয়ের মহলা চলছিল। সুধীর এক কোণে একখানা টুল পেতে চুপ করে বসেছিল—এমন সময় নর্ত্তকী সঙ্ঘের মঞ্জরী তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল—এক কোণে অমন চুপটি করে বসে রয়েছ যে ?…আজ তিনমাস হোল থিয়েটারে ঢুকেছ—আমাদের সঙ্গে একটা কথাও বলতে নেই কি গো ?

সুধীর কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোল না। মঞ্জরী একটু মুচকে হেসে তাড়াতাড়ি তার পানের কৌটা থেকে দুটো পান বের করে সুধীরের মুখে গুঁজে দিল। সুধীরের ইচ্ছা না থাকলেও সে কোন আপত্তি করতে পারল না।

* * * *

ক্রমে ক্রমে মঞ্জরীর সঙ্গে তার খুবই জমে উঠল। একদিন মঞ্জরীর দর্শন না পেলে তার কিছুই ভাল লাগতো না। কোনদিন তার আসতে দেরী হলে তার মনটা কেমন ছটফট করতো।

সুধীর ভাবতো—কেন এমন হয় ? কিন্তু সে এ প্রশ্নের কোন সমাধানই করতে পারতো না।

প্রথম প্রথম সে সবই বুঝতো—কিন্তু কিছুতেই সে নিজেকে সংযত করতে পারতো না। কী একটা অজ্ঞাত শক্তি যেন তাকে জোর করে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। মঞ্জরীর এমন কোন দাহিকা শক্তি ছিল যাতে সুধীর দিন দিন একটু একটু করে পুড়ে মরতে লাগল। মাঝে মাঝে তার ভিতরের সত্তাটা তাকে নিষেধ করতো—কিন্তু মঞ্জরীকে দেখলে সে আবার সব ভুলে যেত।

এমনি করে প্রায় দুই বৎসর কেটে গেল। মঞ্জরীর সঙ্গে তার ভাব বর্ষা প্লাবিত নদীর মত দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে। এখন তার ভিতরের সত্তাটা আর বড় নিষেধ করে না।

সুধীর তার বাড়ীর কথা একরকম ভুলেই গিয়েছে। স্নেহময়ী মা ও সরলা খোকার কথা দিনান্তেও একবার মনে হয় না। মাঝে মাঝে যদিও বিদ্যুৎ চমকানোর মত মুহূর্ত্তের জন্য তাদের কথা একবার মনে হয়—পরক্ষণেই আবার তা গভীর আঁধারের মাঝে লুকিয়ে যায়। একবছর থেকে বাড়ীর কোন খোঁজই সে রাখে না—চিঠিপত্র লেখা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে। সে সারাদিন রাত্রিই মঞ্জরীর বাড়ীতে

মশ্গুল হয়ে পড়ে থাকে। থিয়েটার আর মঞ্জরী ছাড়া দুনিয়ার আর কোন সংবাদই সে রাখে না—রাখবার চেষ্টাও করে না।

প্রথম প্রথম অনিল তাকে ফিরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল—কিন্তু কোন ফল হয় নি। কয়েক মাস পূর্ব্বে অনিল একদিন শেষ চেষ্টা করতে এসেছিল। সে এসে জানাল—সুধীরের মা মৃত্যুশয্যায়, তিনি একটিবার সুধীরকে দেখতে চান। কিন্তু সুধীর তাতে গ্রাহ্যও করল না। সেইদিন থেকে তারা সবাই সুধীরের আশা ছেড়ে দিয়েছে।

অনিল এই ব্যাপারে অত্যন্ত মনোকষ্ট পেয়েছিল। আজন্মের বন্ধুত্বর পাশ সামান্য একটা নারীর মোহে যে মানুষ অবাধে এমনি ভাবে ছিন্ন করে ফেলতে পারে—এটা অনিলের আগে ধারণা ছিল না।

অনিল সুধীরের মায়ের অসুখের কথা থিয়েটারের কর্ত্তার কাছে জানিয়েছিল—কিন্তু কোন ফল হয় নি। কারণ সুধীর আজ আর সাধারণ অভিনেতা নয়। সে এই অল্প দুই বৎসরের ভিতর খুব নাম করে নিয়েছে। সে আজ একজন বড় অভিনেতা। সুতরাং থিয়েটারের কর্ত্তা আর তাকে ছাড়তে রাজী ন'ন—তাই অনিলের কথায় তিনি কোন কর্ণপাতও করলেন না।

— চার —

দশ বছর কেটে গেছে।

সুধীর আজ বাঙলার একজন নামজাদা অভিনেতা। বড় বড় ভূমিকা নিয়ে সে রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। সমস্ত বাঙলা জুড়ে আজ তার নাম। তার প্রতিভার কথা আজ দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে পড়েছে। বড় বড় লোক আজ তার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পেয়ে ধন্য।

সুধীরের অবস্থা ফিরে গেছে। দশ বৎসর পূর্ব্বে যে সামান্য কুড়ি টাকা বেতনে প্রথম চাকুরী আরম্ভ করেছিল—নিজের অসামান্য প্রতিভার গুণে আজ সে পাঁচশ' টাকা মাইনে পাচ্ছে।

সে নিজে বাসা করেছে—মঞ্জরীকে এনে তার বাসায় রেখেছে। এ খবরটাও বাইরে প্রকাশ হতে বাকী নেই। কিন্তু এতে সুধীরের কোন লজ্জা নেই—সঙ্কোচ নেই। সহজ সরল ভাবে সে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিচ্ছে। প্রথম প্রথম দুই একবছর বাড়ীর কথা একটু একটু মনে আসতো—এখন ভুলক্রমেও কোনদিন সে সব কথা মনে আসে না।

সেদিন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ নব পর্য্যায়ে—মহা সমারোহে "জনা" নাটকের অভিনয় হবে বলে ঘোষণা করে দিলেন। সুধীরকে প্রবীরের ভূমিকা দেওয়া হোল। প্রবীরের ভূমিকা রিহার্সাল দিতে দিতে হঠাৎ সুধীরের একটা অতীত স্মৃতি মনে পড়ে গেল। দশ বৎসর পূর্ব্বে সে তাদের গ্রামে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মিলে এই প্রবীরের ভূমিকাই রিহার্সাল দিয়েছিল। সে আজ কত যুগের কথা। সে সব দিন কত সুখেই না কেটেছে। তার প্রাণের বন্ধু অনিল? আজ প্রায় আট বছর তো সে তার খোঁজ রাখে না। সে কেন কেমন আছে? ক্রমে তাদের সেই অভিনয়ের দিনের কথা তার মনে পড়ল। প্রবীরের মৃত্যু দৃশ্যে তার মা ও শোভার ক্রন্দন। তার মা কী আজ আর ইহজগতে আছেন? অনিল তো একদিন বলেছিল যে তার মা মৃত্যুশয্যায়—তাকে একবার দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু—কিন্তু সে কী করেছে? যে মা তাকে শরীরের রক্ত দিয়ে বাঁচিয়েছে—নিজে না খেয়ে খাইয়েছে, যাঁর জন্য আজ সে দুনিয়ায় বেঁচে আছে—তার কী প্রতিদান সে দিয়েছে?...কিছু না—সে মায়ের মৃত্যুশয্যায় একবারও তাকে দেখা উচিত বিবেচনা করে নি—বরঞ্চ প্রাণের বন্ধু অনিল তাকে অনুরোধ করতে এসেছিল বলে তাকে অপমানিত করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তার সরল সাধ্বী স্ত্রী শোভা? যে শোভা তাকে বই কাউকে জানতো না—যে থিয়েটার দেখতে এসে পুরুষবেশী মদনমঞ্জরীর সঙ্গে তার স্বামীর প্রেমাভিনয় দেখে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিয়েছিল—তারও বা কী প্রতিদান সে দিয়েছে? সে আর ইহজগতে আছে কি না কে জানে?

এক এক করে অতীতের সমস্ত স্মৃতিগুলি এসে সুধীরকে বিদ্ধ করতে লাগল। তার ভিতরের ছাই চাপা আগুন যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে দাউ দাউ করে জলে উঠল। সুধীর আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না। অসুখ হয়েছে বলে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ল।

থিয়েটার থেকে বেরিয়ে বাসায় না গিয়ে সুধীর সোজা

অনিলের বাসার দিকে রওনা হোল। যেতে যেতে কত কথা ভাবল—যদি অনিল তাকে তাড়িয়ে দেয়—তবে নতজানু হয়ে তার কাছ থেকে ক্ষমাভিক্ষা করে নেবে তার যত দোষই হোক অনিল কখনও তাকে তাড়িয়ে দিতে পারবে না।

এই নিদারুণ দুঃখের মাঝেও তার আনন্দ হতে লাগল—আজ সে তার মা ও স্ত্রীর খোঁজ পাবে। তারা কিছুতেই তাকে ফেলতে পারবে না। সে যতই অপরাধী হোক—তাদের প্রতি সে যত নির্দ্দয় ব্যবহারই করুক—তবু সে তাদের আপনার—তবু সে তাদের আকাঙ্ক্ষিত।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে সুধীর অনিলের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হোল। সেখানে গিয়ে শুনল—একমাস হোল অনিল ছুটী নিয়ে বাড়ীতে গিয়েছে।

সুধীর আর বিলম্ব করল না। তখনই ষ্টেশনে এসে একখানা টিকিট কিনে ট্রেণে উঠে বসল। প্রায় আধঘন্টা পরে গার্ড সাহেব 'হুইসিল' দিলেন—ট্রেণ হুস্ হুস্ শব্দ করে বিদ্যুৎগতিতে তার গন্তব্য পথে ছুটতে লাগল।

—পাঁচ—

ভোর পাঁচটার সময় সুধীর ট্রেণ থেকে নেবে চম্পক বক্ষে নৌকায় আরোহণ করল। আজ তার কত কথাই মনে আসতে লাগল। শৈশবে এই চম্পক বক্ষে কতবার সে নৌকা চড়ে বেড়িয়েছে—কতদিন সাঁতার দিয়ে পার হয়েছে। কতদিন নিদাঘ সন্ধ্যায় এই চম্পকের স্নিগ্ধ সমীরণ সে উপভোগ করেছে। শৈশবের সেই সব পুরণো কাহিনী এক সঙ্গে তার মনে পড়ে গেল—সে শিশুর মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।

নৌকা থেকে নেবে সুধীর তাড়াতাড়ি সোজা তাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হোল। কিন্তু একি?...এখানে তো কোন ঘর বাড়ী নেই—কোন লোকজন নেই। প্রকাণ্ড খেলার মাঠ মরুভূমির মত ধূ ধূ করছে—সামনে মস্ত বড় একখানা চৌরী ঘর। ঘরখানার সুমুখে প্রকাণ্ড একখানা 'সাইনবোর্ড' টাঙান রয়েছে। সুধীর দ্রুতগতিতে সেদিকে ছুটে গেল। গিয়ে দেখল বড় বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে—"সাতলহর পাব্লিক লাইব্রেরী।" সুধীর তার চক্ষুকে বিশ্বাস করতে পারল না—সে চারদিকে একবার চেয়ে দেখল :... ওই তো তাদের সেই বড় বকুল গাছটা তেমনি ভাবে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে—ওই তো সেই বটগাছটা চারদিকে তার শাখা প্রশাখা বিস্তার করে গর্ব্বভরে বিজয়ী সম্রাটের মত বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।..সুধীর আর স্থির থাকতে পারল না। বর্ষাপ্লাবিত নদীর মত অশ্রুতে তার বক্ষঃস্থল ভাসিয়ে দিয়ে গেল।

সুধীর দেখল একটি লোক সেই রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে চলে যাচ্ছে। সুধীর ভাবল—ওই লোকটার কাছে সে সমস্ত সংবাদ জেনে নেবে। ধীরে ধীরে তার কাছে যেতেই দেখল—সে অনিল। সুধীর ভরা গলায় ডাকল—অনিল।

কেরে? নরেশ নাকি? তুই এত ভোরে—

হঠাৎ সুধীরের মুখের দিকে দৃষ্টি পড়ায় তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। হতভম্বের মত সে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

সুধীর বলল—আমায় চিনতে পারছ না অনিল? আমি সুধীর।

অনিল এবার একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে জিজ্ঞাসা করল—তুই কখন এলি রে সুধীর? আমি যে তোকেই টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলুম বাড়ী আসবার জন্য।

অনিল তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামের কাগজখানা সুধীরের হাতে দিল। সুধীর কাগজখানা পড়েই চীৎকার করে উঠল —Sova seriously ill—শোভা। অনিল—অনিল ভাই শোভা কি বেঁচে আছে? সে কোথায় আছে—কী অসুখ?

অনিল বলল-সে বেঁচে আছে—আমাদের বাড়ীতেই আছে। কিন্তু আর বুঝি তাকে রাখতে পারলাম না। কাল থেকে অসুখ খুব বেড়েছে—কেবল তোর কথাই বলছে। তাই তো তোকে টেলিগ্রাম করতে যাচ্ছিলুম। দেখলাম সতীর আহ্বান ব্যর্থ হবার নয়। তারই কাতর আহ্বানে ভগবান আজ তোকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

সুধীরের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। সে ভাঙা গলায় জিজ্ঞাসা করল—আমাদের বাড়ীর এ অবস্থা কেন? মা কি বেঁচে আছেন?

অনিল বলল—না আজ প্রায় আটবছর হোল তিনি স্বর্গে গেছেন। তুই কাঁদিস না—সব কথাই বলছি।

সুধীর বলল—বল ভাই—আমি আর থাকতে পাচ্ছি না।

অনিল লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় বসে বলতে আরম্ভ করল —আমি যখন তোকে তোর মায়ের মৃত্যুশয্যার কথা জানাই —তারই এক সপ্তাহ পরে তিনি আমাদের মায়া ত্যাগ করে মর্ত্তের মেলা স্বর্গে চলে যান। মরবার পূর্ব্বে শুধু তোর কথাই বলতেন। মরবার সময়ও আমার হাত ধরে বার বার তোকে দেখতে অনুরোধ করে যান। তিনি মরবার কিছুদিন পূর্ব্বেই শোভার মা বাবা একসঙ্গে কলেরায় মারা যান। তখন বাধ্য হয়েই শোভার ভার আমাকে নিতে হয়েছে।

তোর মায়ের মৃত্যুর পরেই তোদের বাড়ী নিলামে ওঠে। রায়েরা নিলামে বাড়ীটা কিনে নিয়ে গ্রামের ছেলেদের খেলবার মাঠ ও পাব্লিক লাইব্রেরী করে দিয়েছেন।

দুই বৎসর হোল আমার মা বাবাও ইহলোক হতে বিদায় গ্রহণ করেছেন। এখন আমার স্ত্রী আভাই গৃহের কর্ত্রী। সে আর শোভা দুটি বোনের মতই আছে—মায়ের পেটের বোনেরও বোধ হয় অত ভাব হয় না।

আজ ছয়মাস হোল তোর কথা ভাবতে ভাবতে শোভার 'থাইসিস্' হয়েছে। শরীর দিন দিনই শীর্ণ হয়ে পড়ছে; একমাস হোল তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। ডাক্তার বলেছেন—এই শেষ অবস্থা, এখন যে কোন সময়েই মারা যেতে পারে। তাই একমাস হোল আমি ছুটী নিয়ে বাড়ীতে এসেছি।

কাল থেকে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়েছে—কেবল তোর কথাই বলছে। ভগবান সতীর আহ্বান উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাই তুই স্বেচ্ছায় আজ সেই আহ্বানের সাড়া দিয়ে চলে এসেছিস।

অনিল চুপ করল। সুধীর বলল—আমি নরাধম—আমি পাষণ্ড। আমায় কি ক্ষমা করবি ভাই। তুই দেবতা— শোভা দেবী—

সুধীর আর কোন কথা বলতে পারল না। শিশুর মত হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

এমন সময় অনিলদের চাকর যোগেন এসে বলল—বাবু আপনি এখানে? আমি আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম। মা পাঠিয়ে দিলেন—শোভা মা যেন কেমন হয়ে পড়েছেন।

যোগেন আরও কী বলতে যাচ্ছিল—কিন্তু অনিল আর কোন কথাই শুনতে চাইল না। সুধীরের হাত ধরে তাড়াতাড়ি বাড়ীর দিকে ছুটে গেল।

* * * *

সুধীর ধীরে ধীরে শোভার শয্যার পাশে গিয়ে বসল। তার মুখের দিকে তাকাতেই মনটা কেমন ছ্যাৎ করে উঠল। এই কী সেই শোভা—দশ বৎসর পূর্ব্বে যে মুখখানা প্রস্ফুটিত পদ্মের মত ছিল, আজ তা ছাইয়ের মত পাংশুবর্ণ হয়ে গেছে। এর জন্য সেই দায়ী—এত বড় নৃশংস সে।

এমন সময় শোভা মৃদুস্বরে বলল—আভা বোন, আমার আর বেশী সময় নেই—তাঁকে কী আনতে পাঠিয়েছ?

সুধীর ভরা গলায় বলল—আমায় চিনতে পাচ্ছ না শোভা —আমি সুধীর, তোমার অসুখের কথা শুনে এসেছি। কোন ভয় নেই—শীগ্‌গিরই সেরে উঠবে।

শোভা একবার চোখ মেলে চাইল। আকাশভরা কালো মেঘের ফাঁকে হঠাৎ বিজলীর চমক যেমন মধুর— শোভার পাংশুবর্ণ মুখে সেইরকম একটু মৃদু হাসি দেখা গেল। সে ব্যাকুল আগ্রহে তার হাত দুইখানা সুধীরের দিকে প্রসারিত করে দিল। সুধীর তাড়াতাড়ি তার হাতদুটো ধরে ফেলল।

শোভা আস্তে আস্তে বলল—আমার ব্যাকুল আহ্বান আজ ভগবানের পদপ্রান্তে পৌচেছে—তাই তুমি এসেছ। আজ আমার মত ভাগ্যবতী কে? তোমার পায়ে মাথা রেখে মরব। আজ তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ— রাখবে কি?

সুধীর চীৎকার করে বলল—নিশ্চয়ই রাখব।

শোভা বলল—আমি মরে গেলে তুমি আবার বিয়ে কোর—আবার সংসারী হয়ো। বল—আমি তোমার উত্তর শুনে সুখে মরতে চাই।

সুধীর বলল—তুমি আমাকে ফেলে কোথায় যাবে শোভা?...আমি তোমার সব কথাই রাখব।

শোভা যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। সে আস্তে আস্তে পাশ ফিরে শু'ল। সুধীর ডাকতে লাগল— কিন্তু কোন সাড়াই মিলল না।

এমন সময় অনিল ডাক্তার নিয়ে গৃহে প্রবেশ করল। ডাক্তার নাড়ী দেখে বললেন—হার্টফেল করেছে।

সবাই আর্ত্তনাদ করে উঠল। সুধীর চীৎকার করে সেখানে লুটিয়ে পড়ল।

সাম্য

(উপন্যাস)

[শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী]

(১)

রোগীর মাথার কাছে টিপ্ টিপ্ করিয়া একটা প্রদীপ জলিতেছিল। ক্ষুদ্র কক্ষটির মধ্যেও সে আলো স্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই, কোণে কোণে অনেক অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রোগী তখন নীরবে মুদ্রিত চোখে পড়িয়া, জাগ্রত কি নিদ্রিত কে জানে। রোগীর পার্শ্বে একখানা পাখা হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন সাবিত্রী, অন্যমনস্ক ভাবে জমাট বাঁধা অন্ধকারের পানে চাহিয়া ধীরে ধীরে রোগীর মাথায় বাতাস দিতেছিলেন।

কোণে কোণে যে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছিল সে যেমন প্রতীক্ষা করিতেছিল কখন প্রদীপটি নিভিয়া যাইবে আর সে মুহূর্ত্তে সমস্ত গৃহটি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে, সাবিত্রীর হৃদয়ে ভবিষ্যৎও অন্ধকাররূপে তেমনি জাগিতেছিল, কখন আশার ক্ষীণ আলোটি নিভিয়া যাইবে আর সে তাঁহাকে নিবিড় ভাবে ঘেরিয়া ফেলিবে।

ক্ষুদ্র এই কক্ষটির বাহিরে জাগিয়া আছে সুচিভেদ্য অন্ধকার, গলির মাঝে মাঝে এক একটি আলো জলিতেছে, সে আলো আজিকার অন্ধকারের ভীষণতা আরও যেন বাড়াইয়া তুলিয়াছে। একে কৃষ্ণপক্ষনিশি, তাহার উপর আকাশে নিবিড় কালো মেঘ। মাঝে মাঝে সেই কালো আকাশের বুক চিরিয়া বিদ্যুৎ ছুটিয়া যাইতেছে, জানালার ফাঁকে সে আলো গৃহের মেঝের উপর আসিয়া পড়িতেছে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে, গৃহ তাহার গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিতেছে, কি ভীষণ দুর্য্যোগময়ী রজনী। আজ রাত্রির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত আলো ধরণীর গাত্রে ছড়াইয়া পড়িবে, অন্ধকার কাটিয়া যাইবে, সাবিত্রীর অন্তরের অন্ধকার কাটিয়া যাইবে কি?

একবার কড় মড় করিয়া ভীষণ শব্দে মেঘ ঠিক গৃহের উপরই ডাকিয়া উঠিল; অদূরে পৃথক শয্যায় শায়িতা নিদ্রিতা কন্যা মেধার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, ধড়ফড় করিয়া সে বিছানায় উঠিয়া বসিল, আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, "মা"—

"কি মা, এই যে আমি," তাড়াতাড়ি পাখা ফেলিয়া তিনি কন্যার নিকটে সরিয়া গেলেন, "ঘুমো মা, বড় মেঘ ডেকে উঠেছে, ভয় হয়েছে কি?"

মায়ের স্পর্শে সাহস পাইয়া মেধা বলিল, "হ্যাঁমা, বড্ড ভয় হয়েছিল। বাবার ঘুম ভাঙ্গেনি তো?"

মা বলিলেন, কি জানি, বুঝতে পারছিনে, দেখি। তুই শো, মেধা ঘুমো।

কন্যাকে শোয়াইয়া প্রদীপটা উস্কাইয়া দিয়া তিনি আবার স্বামীর কাছে আসিলেন।

মেঘ গর্জ্জনের শব্দে বরেন্দ্রনাথের মুহূর্ত্তের নিদ্রার ভাবটা দূর হইয়া গিয়াছিল। স্ত্রী নত হইয়া স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন স্বামী চাহিয়া আছেন, মৃদুকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ঘুম ভেঙ্গে গেছে?"

স্ত্রীর হাতখানা কম্পিত হাতে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া বরেন্দ্রনাথ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, ভাবতে ভাবতে একটু তন্দ্রা এসেছিল, মেঘের ডাকে সে তন্দ্রাটুকু দূর হয়ে গেছে সাবিত্রী।

সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এত ভাবছ?"

পাণ্ডুর মুখে একটু মলিন হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল, বরেন্দ্রনাথ একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কি ভাবছি এ কথা জিজ্ঞাসা করছ সাবিত্রী? আমার যে কত ভাবনা তা কি তুমি জানতে পারছনা, কতখানি ব্যাথা আমার মনের কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠেছে তা কি তুমি বুঝতে পারছনা? আমার

রোগে যত যন্ত্রনা না দিচ্ছে, ভাবনায় তার চেয়ে বেশী যন্ত্রনা দিচ্ছে যে সাবিত্রী।"

ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "তুমি কেন অত ভাবছ বল দেখি? এই সব বাইরের ভাবনা ভেবে ভেবেই তোমার রোগ কমের দিকে আসছেনা, আরও বেড়ে উঠছে। কিসের ভাবনা তোমার, কেন এত ভাবছ? তুমি ভাল হয়ে ওঠ, আবার আমাদের সুদিন আসবে।"

"আর ভাল হয়েছি সাবিত্রী" স্ত্রীর মুখের উপর দুইটি চোখের দৃষ্টি রাখিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, সে আশা আর আমার নেই, আর আশা থাকলেও আমি বাঁচতে চাই নে। আজ ছয়টি মাস বিছানায় পড়ে আছি, এই ছয়টি মাস তুমি অক্লান্তভাবে আমার সেবা করছ। কি করে জানবে সাবিত্রী, তোমার এই সেবা নিতে আমি কতদূর লজ্জিত, কতদূর কুণ্ঠিত হচ্ছি? আমি তোমার স্বামী, কিন্তু এই কথাটি মাত্র পরিচয় দেবার সময়ই ব্যবহৃত হত নাকি, কোন দিন স্বামীর যোগ্য আচরণ করেছি কি? স্ত্রী স্বামীর কাছে কতখানি পাওয়ার প্রত্যাশা করে, তুমি তার কতটুকু আমার কাছ হতে পেয়েছ সাবিত্রী? না, একদিন পেয়েছিলে,—কিন্তু সে কতটুকুর জন্যে বল দেখি? এই রোগশয্যায় শুয়ে জ্ঞান চক্ষু খুলেছে, আগে কেন খুলল না, অন্ততঃ দু'দিনের জন্যেও কেন খুলল না? এখন ভাবছি—কোথায় ছিলুম, কোথায় এসেছি; কিন্তু সে কথা ভাবতে যে জ্ঞান হারিয়ে ফেলি সাবিত্রী। একদিন কিনা আমার ছিল? মানুষের যা কিছু প্রার্থনার জিনিষ—বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বাস্থ্য সবই তো পেয়েছিলুম সাবিত্রী, আবার নিজের হাতেই সবই যে বিসর্জন দিয়েছি। আজ আমার সে সব বন্ধুরা কোথায়—যারা হাত ধরে আমায় নিয়ে বিপথে চলেছিল, ইহজীবনে আমার কাছছাড়া হবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল? আজ এই রুগ্নশয্যার পাশে তো কেউ নেই সাবিত্রী; সুখের সাথী যারা ছিল—দুখের বারতা পেয়ে তারা সরে পড়েছে। এই রুগ্নশয্যার পাশে কুড়িয়ে পেলুম তোমায়? কে জানত—চিরঅনাদৃতা তুমি—এখনও আমারই প্রত্যাশায় বসে আছ? কত অত্যাচার না করেছি, আজকে সেই সব কথা আমার মনে পড়ছে, তোমার ভালবাসা-পূর্ণ সেবা নিতে আমি যে কুণ্ঠিত হয়ে উঠছি। আমার অত্যাচারের চিহ্নতো আজও তোমার গা হতে মিলায় নি, তবু আজ সে সব চিহ্ন ঢেকে সেই অত্যাচারীর সেবাতে এমন করে আত্মনিয়োগ করলে সতী?"

হতভাগ্য স্বামীর কোটর প্রবিষ্ট দুইচোখ দিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল; আরও কথা বলিবার ছিল, বলা হইল না।

সাবিত্রী স্বামীর চোখে জল দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিলেন; আপনাঞ্চলে স্বামীর মুখ সযত্নে মুছাইয়া দিতে দিতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ওগো না না, সে অত্যাচার তো তুমি কর নি; তোমার ঘাড়ে যে ভূত চেপেছিল, সেই আমায় কষ্ট দিয়েছে, সেই তোমায় আমার কাছ হতে ছিনিয়ে নিয়েছিল। সে ভূত তোমায় ছেড়ে গেছে, আর আমি তোমায় হারাব না। তুমি ভাল হয়ে ওঠো, রুগ্ন শয্যার পাশে বসে তোমার সেবা করছি, একবার ভাল করে তোমার সেবা করব।"

হতাশ ভাবে বালিশের মধ্যে মুখখানা গুঁজিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আর সে দিন তোমার জীবনে পাবে না সাবিত্রী, আমায় বাঁচাতে আর কারও ক্ষমতা নেই। তুমি আমায় বাঁচাবার চেষ্টা করলে কি হবে, আমি যে আমার আয়ু নিজেই নষ্ট করে ফেলেছি। কিন্তু একটা যে বড় ব্যথা বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে সাবিত্রী; এসকল কষ্টের কথা ভুলতে পারছি, তোমার কথাও ভুলতে পারছি, কিন্তু একটা কথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি নে—।"

"ওগো থাক থাক, সে কথা আর তুলো না, তোমার পায়ে পড়ি—"

ব্যগ্রভাবে স্বামীর মুখের উপর হাতখানা চাপা দিয়া সাবিত্রী মেধার পানে তাকাইলেন, সে তখন আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

হাতখানা সরাইয়া দিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, আমায় বলতে দাও সাবিত্রী, আমার মনটাকে কতকটা হালকা করতে দাও, কথায় আমার মনটাকে ভরে উঠেছে। আমি কতদিন বলতে গিয়েছি, তুমি আমার মুখে হাতখানা এমনি করে চেপে ধরেছ; আমার বুকের ব্যথা যে ছাপিয়ে উঠতে চাচ্ছে সাবিত্রী, কোন বাঁধন আর যে মানতে চাচ্ছে না। যদি

এখনও একবার প্রাণভরে চীৎকার করে এ কথাটা বলে আমায় কাঁদতে দিতে, তবে হয়তো,—মেধা ঘুমিয়েছে কি ?"

"হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে ?"

স্ত্রীর হাতখানা প্রাণপণে দুইহাতে চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বরেন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিলেন, "ঘুমোক, ঘুমোতে দাও। উঃ, অভাগিনী মেয়ে, জানে না—বাপ হয়ে আমি তার কি সর্ব্বনাশই করেছি, তাকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। সে যে কিছু জানে না সাবিত্রী, আজও সে জানতে পারে নি যে তার বাপ নেশার খেয়ালে কারও কথা না শুনে তার শৈশবেই বিয়ে দিয়েছিল,—একটি বছর না যেতে—সে বিধবা —"

"ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ওসব কথা মুখে এনো না, চুপ কর। যদি জেগে ওঠে—সব জানতে পারবে। তোমাকে সে দেবতার মত ভক্তি করে, সে ভক্তি তার অটুট রাখতে দাও।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "না, আর বলব না,—কিন্তু কি চমৎকার বল দেখি সাবিত্রী; একমাত্র সন্তানের প'রে এত অবিচার করেও আমি তার কাছ হতে দেবতার ভক্তি অবাধে গ্রহণ করছি। তবু—তবু আমি সে সব কথা প্রকাশ করতে চাই নে, সে কথা আমার মনেই চাপা থাক। কিন্তু একটা কথা সাবিত্রী —"

তাঁহার মুখখানা অস্বাভাবিক দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, স্বামীর সেই দীপ্ত মুখখানা দেখিয়া ও অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া সাবিত্রী ভয় পাইলেন, তাঁহার হাতখানা নাড়া দিয়া বলিলেন, "কি, কি বলবে তুমি বল।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তাকে জানতে দিয়ো না, আর—আর, যদি সেরকম ছেলে পাও—যদি সে জেনেশুনে গ্রহণ করতে চায়—কোন দিকে চেয়ো না সাবিত্রী, কারও কথা শুনো না, মেধাকে তার হাতে অর্পণ করো। এ শুধু আমার অনুরোধ নয় সাবিত্রী,—এ আমার আদেশ বলে জেনো। জীবনে যার আমি নিজের হাতে সর্ব্বনাশ করেছি, মরে যেন—"

তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না, ঘন ঘন হাঁপাইতে লাগিলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে সাবিত্রী বলিলেন, "তুমি চুপ কর, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি,—তুমি অতটা অস্থির হোয়ো না, ওতে তোমার জীবনের অনিষ্ট করবে।"

"আর জীবনের অনিষ্ট," বড় মলিন হাসি বরেন্দ্রনাথের মুখে ভাসিয়া উঠিল, "এখনও আশা করছ আমি বাঁচব? ভুল,—ভুল সাবিত্রী, আমি আর বাঁচব না। তুমি প্রতিজ্ঞা কর, আমি বেঁচে থাকতেই আমার এই হাতের ওপর হাত রেখে তুমি বল—আমার আদেশ পালন করবে? আমি মরেও সুখী হব না সাবিত্রী, তোমাদের খুব কাছে থাকব। যেদিন জানব—আমার আদেশ তুমি পালন করেছ,—আমার মেধাকে সুখী করেছ, আমি সেইদিনই যথার্থ মুক্তি পাব। বল—বল সাবিত্রী, আমার কথা তুমি রাখবে তো?"

হাঁপাইয়া উঠিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "ওগো, তুমি এসব কি কথা বলছো, আমি কেমন করে তোমার এ আদেশ পালন করব?"

বরেন্দ্রনাথ জোর করিয়া বলিলেন, "কেমন করে? সাবিত্রী, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—তোমার সমাজ বড়, না স্বামী বড়?"

সাবিত্রী দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া শুধু হাঁপাইতে লাগিলেন, উত্তর দিতে পারিলেন না।

"বল সাবিত্রী, আমার কথার উত্তর দাও, আমি তা'হলে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারব।

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে সাবিত্রী বলিয়া উঠিলেন, "ওগো আমার সকলের ওপর যে তুমি; আমার সমাজ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম সকলের ওপর তোমার আসন তা কি—"

চোখের জল তাঁহার কথা শেষ করিতে দিল না।

বরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "তবে আমার অনুরোধ, আমার আদেশ শুনবে না সাবিত্রী?"

সাবিত্রী ব্যাকুলকণ্ঠে বলিলেন, "রাখব, তোমার আদেশ আমায় মেনে চলতেই হবে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি আর রাত জেগো না, ওতে আরও অসুখ বাড়বে।

আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া শুইলেন।

(২)

বরেন্দ্রনাথ বরাবরই জেদী প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজের খেয়াল অনুসারে তিনি চলিতেন, কাহারও মতামতের ধার ধারিতেন না।

পিতা ও মাতা উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন এবং বরেন্দ্রনাথ তখন কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ, পড়িতেন। পিতামাতা বিবাহের কথা তুলিয়াছিলেন এবং পাত্রীও নির্ব্বাচিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় বরেন্দ্রনাথ পিতামাতাকে গোপন করিয়া এক অজ্ঞাত কুলশীল দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করেন, সেই কন্যাই এই সাবিত্রী।

বিবাহ সমাপ্তে স্ত্রীসহ বাড়ী আসিবামাত্র পিতামাতা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, পুত্র পুত্রবধূকে বাড়ীতে উঠিতে দিলেন না। তাঁহারা গ্রামমধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী কুলীন বংশোদ্ভব বলিয়া গণনীয় ও মাননীয় ছিলেন; অপদার্থ, আত্মজ্ঞানহীন পুত্রের জন্য সমাজে ঘৃণ্য হইতে পারিবেন না স্পষ্ট এ কথা তাহাকে শুনাইয়া দিলেন।

দারুণ ক্রোধে বরেন্দ্রনাথের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি গ্রামের সমাজপতি কুলীনের কুলপ্রদীপ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সমাজে তাঁহার স্থান হইবে কিনা।" কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয় মাথা নাড়িয়া জানাইলেন অজ্ঞাত কুলশীলাকে বিবাহ করার জন্য হিন্দু সমাজে তাঁহার স্থান কিছুতেই হতে পারে না। সে সমাজে পতিত হইয়াছে, যাহারা তাহার সংশ্রবে আসিবে তাহারাও জাতিচ্যুত হইবে।

বরেন্দ্রনাথ মাথা নত করিয়া তাঁহার কথা শুনিয়া গেলেন, দারুণ জীঘাংসায় তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল তথাপি তিনি একটা কথা বলিলেন না। সমাজপতি অবশেষে ধীর-ভাবে জানাইলেন, সমাজ বরেন্দ্রনাথকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছে, কেবল বরেন্দ্রনাথকে পত্নী ত্যাগ করিতে হইবে এবং একটা প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

বরেন্দ্রনাথ সমাজের এ অনুশাসন মানিয়া সুবোধ ছেলে হইতে পারিলেন না, তিনি পত্নীত্যাগ করিলেন না, অন্ততঃ পক্ষে একটা কঠিন গোছের প্রায়শ্চিত্তও করিলেন না।

বরেন্দ্রনাথের চক্ষু দুইটি মুহূর্ত্তের তরে অস্বাভাবিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এই হিন্দুর সমাজ, আর এই সমাজের আশ্রয়েই ইহারা বাস করে। কেবলমাত্র অজ্ঞাত কুলশীলা এই অপরাধে এ সমাজ সাবিত্রীকে গ্রহণ করিতে চায় না। সমাজ দেখিল না সাবিত্রীও মানুষ, তাহারও ধর্ম্ম, শিক্ষা, জ্ঞান সবই আছে, সে মনুষ্য সমাজ বহির্ভূতা নয়।

এই সমাজ, এখানে একটা মূল হইতে কত শাখা জাতির উদ্ভব হইয়াছে, কত অস্পৃশ্য অন্ত্যজ জাতির সৃষ্টি হইয়াছে—যাহাদের স্পর্শ করিলে স্নানের আবশ্যক হয়। ইহারা মানুষ হিসাবে মানুষকে দেখে কই, দেখে শুধু বাহিরের আচরণ জাতিটা। এই সীমাবদ্ধ সমাজের মধ্যে থাকিয়া সমাজের অন্তর্ভুক্ত মানুষ আপনার উন্নতি করিতে পারিবে কি?

বরেন্দ্রনাথ মোটামুটি জানিতেন সাবিত্রী ব্রাহ্মণ কন্যা, ইহার বেশী আর তিনি জানিতে চান নাই, চাহিলেও সম্ভব পাইতেন না। সাবিত্রীর নিজের সম্বন্ধে জানার কিছুই ছিল না, কেননা বাল্যে তিনি মাতৃহারা, পিতার কাছে লালিতা-পালিতা। উপযুক্ত বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থা না করিয়া বৃদ্ধ পিতা শেষ শয্যায় শয়ন করিয়াও শান্তি পাইতেছিলেন না, বরেন্দ্রনাথ তাহার প্রস্তাবে সানন্দে মত দিলেন, বৃদ্ধের শেষ সময়টা শান্তিময় করিয়া তুলিতে তিনি সাবিত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

সমাজকে, দেশবাসীকে ধিক্কার দিয়া বরেন্দ্রনাথ বালিকা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া সেইদিনই আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। স্ত্রীকে এক বন্ধুর বাসায় রাখিয়া তিনি চাকরীর চেষ্টায় ঘুরিতে লাগিলেন, এবং শীঘ্রই পুলিশে একটি কার্য্যের জোগাড় করিয়া লইলেন।

সাবিত্রী বুঝিতেছিলেন, তাঁহার জন্য তাঁহার স্বামীকে কতটা ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে। কেবলমাত্র করুণা বশতঃ এক মৃত্যুশয্যাশায়ী বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিতে তাঁহার কন্যাকে জীবনের সহচারিণী করিয়া, তাঁহাকে পিতামাতার স্নেহ, দেশবাসীর সহায়তা, অতুল ধনসম্পত্তি সবই হারাইতে হইল। একমাত্র সাবিত্রীকে ত্যাগ করিলেই তিনি আবার সব পাইতে পারিতেন, সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু তিনি সাবিত্রীকে ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার জন্যই যে স্বামীর আজ সব থাকিতেও কিছু নাই, এই কথাটা সাবিত্রীর মনে অহোরহ জাগিয়া থাকিত, নিজেকে তিনি

স্বামীর চরণের ধূলার যোগ্যতা লাভ করিতে সমর্থা বলিয়াও মনে করিতে পারিতেন না ; স্বামী যাহা করিতেন, তাহা ন্যায় হোক—অন্যায় হোক তাহার উপর একটা কথা বলিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না, নিজের হীনতা তাঁহাকে সর্ব্বদা অত্যন্ত কুণ্ঠিত করিয়া রাখিত।

পুলিশের কাজে নিযুক্ত হইবার পর হইতে বরেন্দ্রনাথের চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়িল, শিক্ষিত হইয়াও তিনি মোহ কাটাইতে পারিলেন না। কথায় আছে—পাপের পথ বড় পিছল, তাহাতে একবার পা দিলে, নিচের দিকে নামিয়া যাইতে হইবে, উঠিবার ক্ষমতা আর থাকে না ; বরেন্দ্রনাথের তাহাই হইয়াছিল, একবার পিছল পথে পা দিয়া অত্যন্ত দ্রুতবেগে তিনি নামিয়া চলিলেন।

এই সময়ে সাবিত্রীকে উৎপীড়ন সহিতে হইত বড় কম নয়। স্বামীকে বুঝাইতে গিয়া অনেক সময় তাহাকে প্রহার সহ্য করিতে হইয়াছে, কিন্তু সে ব্যথা কোনদিনই তাঁহার মনে আঘাত দিতে পারে নাই। স্বামীর অধঃপতনের মূল যে তিনি, এই কথাটাই তাঁহাকে ভীষণ বেদনা দিত, স্বামীকে সৎপথে ফিরাইবার কোন উপায় তিনি খুঁজিয়া পাইতেন না। অনেক সময় মনে হইত, যদি এই সময় বরেন্দ্রনাথের পিতা-মাতা থাকিতেন, তাহা হইলে হয় তো তিনি এমন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলতার পথে চলিতে পারিতেন না। স্বামীকে লুকাইয়া তিনি শাশুড়ীকে কয়খানা পত্রও দিয়াছিলেন, যেন তিনি পুত্রকে লইয়া যান, সাবিত্রীর অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে, কিন্তু শাশুড়ী বা শ্বশুর কেহই সে পত্রের উত্তর দেন নাই।

একটিমাত্র কন্যা মেধা, তাহার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া বরেন্দ্রনাথকে বড় বেশী ভাবিতে দেখা যায় নাই। এ যে মেয়ে, ছেলে নয় ; দু'দিন বাদেই তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে, তখন পিতামাতার ভালমন্দের সহিত তাহার ভবিষ্যতের ভালমন্দ জড়িত থাকিবে না।

সব কার্য্যই তিনি জেদের বশে করিয়া যাইতেন। পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যা মেধার বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক করিয়া যখন তিনি বাড়ী ফিরিলেন তখন সাবিত্রী প্রাণপণ চেষ্টায় এ প্রস্তাবে বাধা দিলেন। আর্ত্তভাবে স্বামীর পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, অমন সর্ব্বনেশে কাজ করো না ; এই পাঁচ বছরের মেয়ে, বিয়ে দেবার এখনই কি এত তাড়া পড়েছে ? এখনও যে কাপড়খানা কি করে পরতে হয় তা ও জানে না, বিয়ের কি বুঝবে ? কত মেয়ের বড় হয়ে বিয়ে হচ্ছে, ওকে এই বয়সে বিয়ে দেবার কি দরকার ? তোমার পায়ে পড়ি অমন কাজ করো না, মেধার ভবিষ্যৎটা একটু ভেবে দেখ।"

বরেন্দ্রনাথ পা ছাড়াইয়া লইলেন, পত্নীর চোখের জলে, অনুনয়ে তাঁহার মন টলিল না। অত্যধিক মদ্যপানের জন্য অনেকেই তাঁহাকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সতর্ক হইতে উপদেশ দিত, নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিতে তিনি একেবারেই উদাসীন ছিলেন, পত্নীর জন্যও ভাবিবার বিশেষ আবশ্যক ছিল না। তবে মেয়েটির জন্য যে একটু ভাবনা ছিল না, তাহা বলিতে পারি না, সেই জন্যই তিনি তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার বিবাহ দিয়া কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মুক্তিলাভ করিতে চান।

যাহার বিবাহ, সে কিছুই জানিল না ; পুতুলখেলার মতই তাহার বিবাহ হইয়া গেল, পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা সীমন্তে সিঁদুর দিল।

কিন্তু হায় রে, সে কয়দিন ? বিবাহের পর ছয়টি মাসও যায় নাই, একাদশ বর্ষীয় জামাতা একদিন মেধার নাম বাঙ্গালার বিধবা তালিকাভুক্ত করিয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিল।

আকস্মিক এই ঘটনায় সাবিত্রী তো ভাঙ্গিয়া পড়িলেনই, বরেন্দ্রনাথও বড় কম আঘাত পান নাই। অনেক আশা করিয়াই মাতৃপিতৃহীন আত্মীয় পালিত বালকটিকে গৃহ-জামাতারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইচ্ছা ছিল তাহাকে সুশিক্ষিত করিবেন, যাহাতে সে যথার্থ মানুষ হইতে পারে, তাঁহার মেধাকে সুখী করিতে পারে তাহা করিবেন, তাঁহার কোন আশাই পূর্ণ হইল না। মদের মাত্রা কমিয়াছিল, আবার তাহা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। আর কোনও লক্ষ্য রহিল না, উদাসীনের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট পথে বরেন্দ্রনাথের জীবন তরণী ভাসিয়া চলিল।

মেধা একটু বড় হইতেই তাহাকে স্কুলে দেওয়া হইল। সে নিরুদ্বিগ্নভাবে লেখাপড়া শিখিতে লাগিল। পাঁচ বৎসর বয়সের সময় কয়টা দিনের কথা কয়েকদিন মাত্র তাহার মনে

উজ্জ্বলভাবে জাগিয়াছিল, ক্রমেই মলিন হইতে মলিনতর হইয়া অবশেষে একেবারেই নিভিয়া গেল। সে যে বিধবা এ জ্ঞান তাহার ছিল না, পিতামাতাও প্রাণ ধরিয়া তাহাকে বলিতে পারেন নাই।

তাঁহার এক বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে অতি গোপনে তিনি প্রত্যেক মাসের বেতন হইতে কিছু কিছু দিয়া রাখিতেন, সুতরাং কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে একেবারেই উদাসীন ছিলেন তাহা মনে হয় না।

পিতামাতার উপর অত্যন্ত রাগ করিয়াই তিনি খোঁজ খবর কিছুই দিতেন না। মাঝে মাঝে কেবলমাত্র কর্ত্তব্য মনে করিয়া কিছু করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতেন, ঠিকানা দিতেন না।

অত্যন্ত মদ্যপানের ফল আছেই, সেইজন্যই কয়েক বৎসরের মধ্যে বরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য একেবারেই নষ্ট হইয়া গেল; অবশেষে তিনি নানাপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন।

এই সময়েই তিনি যথার্থরূপে স্ত্রীকে চিনিতে পারিলেন। যাহাকে চিরদিন অবহেলাই করিয়া আসিয়াছেন, চিরদিন যাহাকে উৎপীড়নই করিয়া আসিয়াছেন, আজ এই দুর্দ্দিনে সেই আসিয়া মূর্ত্তিমতী করুণারূপে পার্শ্বে বসিল। মেধাও পড়াশুনা সাজ করিয়া দিনরাত পিতার নিকটে রহিল।

অনেক চিকিৎসা সত্ত্বেও ব্যারাম আরোগ্যের দিকে চলিল না, অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইয়া আসিতেছিল।

ডাক্তার যেদিন মুখখানা বিকৃত করিয়া গেলেন, সেদিন সাবিত্রী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, স্বামীকে গোপন করিয়া শ্বশুরকে একখানি টেলিগ্রাফ করিয়া দিলেন। এ সময়ে তিনি যে কখনই থাকিতে পারিবেন না, তাঁহাকে আসিতেই হইবে—এ বিশ্বাস সাবিত্রীর হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধভাবে জাগিয়াছিল।

(৩)

দিন দিন বরেন্দ্রনাথের অবস্থা খারাপ হইতে খারাপতর হইতে লাগিল, শেষে ডাক্তার একদিন সত্যই জবাব দিয়া গেলেন।

"বাবা গো—বাবা।"

পিতার বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রোরুদ্যমানকণ্ঠে মেধা পিতাকে ডাকিতে লাগিল।

পিতা চক্ষু চাহিলেন, একটু হাসির রেখা তাঁহার মৃত্যু-মলিন-কাতর মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল; কম্পিত হস্তে কন্যার মুখখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন, বুকের মধ্যে যে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা হইতেছিল তাহা যেন নিমেষে জুড়াইয়া গেল।

ক্ষীণকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন, "কেন ডাকছিস মা?"

উচ্ছ্বসিতভাবে কাঁদিয়া মেধা বলিল—"তুমি আমাদের ফেলে কোথায় যাচ্ছো বাবা?"

পিতার দুইচোখ দিয়া অনেকখানি জল উপছাইয়া পড়িল, তিনি একটি কথাও বলিতে পারিলেন না।

তখন সবেমাত্র ভোরের অরুণ আলো ধরার গায়ে নামিয়া আসিতেছিল, পক্ষীগুলি তখনও গান গাহিয়া উঠে নাই, কুলায় জাগিয়া উঠিতেছে মাত্র, সেই সময়ে ধীরে ধীরে বরেন্দ্রনাথের প্রাণদেহ পিঞ্জর ত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট এক পথে যাত্রা করিল।

সাবিত্রী নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন, পিতার বুকের উপর লুটাইয়া পড়িয়া মেধা কাঁদিতে লাগিল।

পাড়ার সদাশয় প্রতিবেশীগণের সাহায্যে শবদাহ হইয়া গেল, সাবিত্রীকে সে জন্য ব্যাকুল হইতে হইল না।

কয়েকটা দিন সাবিত্রী মুহ্যমানভাবে পড়িয়া রহিলেন, এ কয়দিন ভবিষ্যতের ভাবনা তাঁহার মনে জাগে নাই; তাহার পর, ধীরে ধীরে তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল এখন তাঁহারা যাইবেন কোথায়? মাসিক ত্রিশটাকা ভাড়া দিয়া বাসা রাখার সামর্থ্য সাবিত্রীর নাই। খোলার ঘরে থাকাও চলে না, তিনি অভিভাবকহীনা, যৌবনোন্মুখী কন্যা যে রহিয়াছে।

শ্বশুরকে তিনি টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন, চার পাঁচদিন কাটিয়া গেল, কেহই আসিলেন না বা কোন উত্তরও দিলেন না।

বুকখানা দলিত, মথিত করিয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস বাহির হইয়া গেল। হায় ভগবান, তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার

স্বামীকে কত নির্য্যাতনই না সহ্য করিতে হইয়াছে। লোকে কথায় বলে—কু-পুত্র যদিও হয়, কু-মাতা কখনও নয়। বরেন্দ্রনাথ কুপুত্রের আচরণ করিয়াছিলেন কি না জানি না, হয়তো করিয়াছিলেন, কিন্তু জননীর স্নেহ তাহাতেই শুকাইয়া যাওয়া কি সম্ভব ?

মায়ের গলাটা দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া অশ্রুমুখী মেধা রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা এখন কোথায় যাব মা? এ বাসার ভাড়া আমরা তো আর দিতে পারব না, তবে আমরা কোথায় থাকব ?"

অতিকষ্টে চোখের জল সামলাইয়া সাবিত্রী বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "ভগবানকে ডাক মা মেধা, তিনি একটা না একটা উপায় ঠিক করে দেবেন। অনাথের সখা তিনিই, পথ দেখাতে তিনিই পারবেন, আর কেউ পথ দেখিয়ে সোজা পথে নিয়ে যেতে পারবে না।"

পথের পানে ব্যাকুলনেত্রে তাকাইয়া এই দুইটি নারীর কি ভাবে যে দিন কাটিতেছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পাশের বাড়ীর বিপত্নীক ডাক্তারটি বরেন্দ্রনাথের চিকিৎসা করিতেন, মেধার প্রতি তাহার খরদৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া, সাবিত্রী তাঁহাকে আর ডাকেন নাই। কলিকাতার মত স্থানে পাশের বাড়ীর কথা কেহ জানে না, সাবিত্রীও কাহাকেও চিনিতেন না, স্বামীর চিকিৎসাসূত্রে এই ডাক্তারটিকেই কেবল তিনি চিনিয়াছিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পরে এই ডাক্তারটি যখন অযাচিতভাবে সাহায্য করিতে আসিয়াছিলেন, তখন সাবিত্রীর হৃদয় ঘৃণায়, আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি ধন্যবাদ দিয়া ডাক্তারকে বিদায় দিলেন।

তাঁহাকে বাহির করিয়া দিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, বড় আশঙ্কায় তাঁহার দিন কাটিতেছিল। স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তিনি জগতের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন। নিজের জন্য তাঁহার এতটুকু আশঙ্কা ছিলনা, আশঙ্কা ছিল মেধার জন্য।

কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার প্রাণ আর চাহিতেছিলনা। ইহার মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী বাড়ীর কয়েকটি দুর্দ্দান্ত ছেলে উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছিল; সাবিত্রী সমস্তদিন দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটাইতেন, রাত্রেও মেয়েটিকে বুকের কাছে টানিয়া সারারাত চোখের পাতা মুদিতেন না, দিনের বেলায় মেধার জন্য কাঁদিতে পাইতেন না, সমস্ত রাত কাঁদিয়া উপাধান সিক্ত করিয়া ফেলিতেন।

টেলিগ্রাফ করার সঙ্গে সঙ্গে সাবিত্রী শ্বশুরকে একখানি পত্রও দিয়াছিলেন। একয়দিনের মধ্যে সে পত্র ও নিশ্চয় পাইয়াছেন, তিনি কি এই নিরাশ্রয় পরিবারের কথা ভাবিয়া আসিবেন না ?

এক একবার হতাশ হইয়া তিনি বলিতেছিলেন, "মিথ্যে আশা মেধা, কখনই আসবেন না। ছেলেকে যে ক্ষমা করিতে পারেন নি, সে কেবল আমারই জন্যে। তিনি না গিয়ে যদি আমি যেতুম রে মেধা—তিনি তাঁর এদিককার কর্ত্তব্য হতে মুক্তি পেয়ে, তোকে নিয়ে, মা বাপের কাছে যেতেন, তাঁরা তাঁকেও ক্ষমা করতেন, তোকেও টেনে কাছে নিতেন। হতভাগিনী আমি, সেই জন্যেই আমি মরলুম না, তাই আমি রইলুম, তিনিই চলে গেলেন।"

মেধা রুদ্ধকণ্ঠে মাকে আশ্বাস দিয়াছিল, "আর দু'দিন অপেক্ষা করে দেখা যাক না মা। যদিও ঠাকুর দা এখনও নিজের কর্ত্তব্য বুঝিতে পেরে না আসেন, এই সব জিনিসপত্র বিক্রি করে বাসাভাড়া মিটিয়ে দিয়ে আমরা কোন পাড়াগাঁয়ে চলে যাব। আচ্ছা মা, তোমার বাপের বাড়ী কোথায় ছিল তা তো একদিনও বলনি, যদি কোন পাড়াগাঁয় হয়, তবে সেখানে গিয়ে থাকলেও তো বেশ চলে যায়"।

মৃদু হাসির রেখা সাবিত্রীর মুখে নিমেষের তরে ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল,—পোড়াকপাল রে মা আমার আমিই কে তা ঠিক জানিনে। বর্দ্ধমানের কোন গাঁয়ে এককালে আমার বাবা বেশ গৃহস্থ লোকই ছিলেন। কুক্ষণে কলিকাতায় এক দোকান করে সর্ব্বস্বান্ত হয়েছিলেন, তার ওপর "রেস"খেলে বাড়ী ঘর সব বিক্রি হয়ে যায়, আমার মা অনাহারে—বিনা চিকিৎসায় মারা যান। আমার বয়স তখন খুব কম, পাঁচ ছয় বছর হবে। বাবা আমায় নিয়ে এসে—একখানা খোলার ঘর ভাড়া করে থাকতেন। শেষ কালটায় তিনি অন্ধ হয়ে যান, পেটের দায়ে সেই অন্ধের হাত ধরে আমাকেই দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াতে হতো।

আমার জন্তে ভাবনায় অন্ধ বাপের আমার শান্তি ছিল না। তোমার বাপ—মহান হৃদয় দেবতা—আমায় গ্রহণ করে অন্ধকে চিরশান্তি দিয়েছিলেন, বাবা আমার বড় আরামে মরতে পেরেছিলেন।"

স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধায় সাবিত্রীর বুকটা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, মুখখানা দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তিনি হাত দু'খানা কপালে রাখিলেন।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় সাবিত্রী বারাণ্ডায় অন্ধকারের মধ্যে নীরবে বসিয়া নিজদের ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিতে ছিলেন। বাড়ীওয়ালা বরেন্দ্রনাথের ব্যারামের পূর্ব্বে কয়বার টাকার তাগাদা করিয়াছিলেন, তাহার পর কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া আজ সকালে আসিয়া ভদ্রভাবে জানাইয়া গিয়াছেন তাঁহার যে পাঁচমাসের ভাড়া বাকী রহিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া তিনি তাহার অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিতেছেন, বাকী অর্দ্ধেক দিয়া দিন দুই চারের মধ্যেই সাবিত্রীকে বাড়ী ত্যাগ করিতে হইবে, তাঁহার অন্য ভাড়াটিয়া স্থির হইয়া গিয়াছে, কেবল এখন তাঁহাদের উঠিলেই হয়। সাবিত্রী অকূল সাগরে ভাসিতেছেন একবার ভাবিতেছেন শ্বশুরালয়েই যাইবেন, আর একবার ভাবিতেছেন—বর্দ্ধমানে গিয়া পিত্রালয়ের খোঁজ লইয়া সেখানে গিয়া থাকিবেন। এ দুইটার একটাও ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না—অথচ উঠিয়া যে যাইতে হইবে ইহা জানিত সত্য কথা।

অন্তরের মধ্যে হাহাকার—তাহা তো ফুটিয়া বাহির হইতে পারিতেছে না, ভয়—পাছে মেধা সাহস হারাইয়া ফেলে। সে বালিকা যে দৃঢ়তা, সাহস ব্যক্ত করিতেছে তাহা তাহার জননীর নিকটই প্রাপ্ত।

"মা, ঠাকুর দা এসেছেন যে,—বাঃ তুমি কোথায় গেলে ?

আলোকোজ্জ্বল গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার বারাণ্ডায় আসিয়া মেধা থমকিয়া দাঁড়াইল, অন্ধকারে যদিও কিছু দেখা যাইতেছিল না, তথাপি সে দেখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল, মা সেখানে আছেন কিনা।

রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া সাবিত্রী বলিলেন, কি বলছিস মেধা ?

মেধা ব্যগ্রকণ্ঠে উত্তর দিল, "ঠাকুর দা এসেছেন। তোমায় ডাকছেন, তুমি এসো।"

বহুকাল পূর্ব্বে দেখা শ্বশুরের কথা সাবিত্রীর মনে চকিতে জাগিয়া উঠিল। সেই রুক্ষপ্রকৃতি, কর্কশ ভাষী বৃদ্ধ, তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে বারাণ্ডায় পর্য্যন্ত উঠিতে দেন নাই, প্রাঙ্গণ হইতে বিদায় দিয়াছিলেন। সেই রুক্ষ, কর্কশ কথাগুলি—যাহা বুকের মধ্যে একেবারে কাটিয়া বসিয়া ছিল, আজ তাহাই নূতন হইয়া জাগিয়া উঠিল মনটা বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল, সাবিত্রী জোর করিয়া সে ভাবটা অন্তর হইতে দূর করিয়া দিলেন। আজ জোর করিয়া মনে করিতে হইবে—এ দুঃসময়ে ইনিই একমাত্র আশ্রয়, অতীতের কথা আজ ভুলিয়া যাইতেই হইবে। অতীত,—সে বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু ভবিষ্যৎ যে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, উহাকে যে গ্রহণ করিতেই হইবে। বৃদ্ধের সে রুক্ষস্বভাব আজ পুত্রশোকরূপ মায়াদণ্ড স্পর্শে বিগলিত হইয়া গিয়াছে, আজ তিনি কোমল হৃদয় পাইয়াছেন, নহিলে দুঃখিনীর দুঃখপূর্ণ পত্র পাইয়া তিনি আসিবেন কেন ? আজ তিনি যথার্থ মানুষ হইয়াছেন, কেননা যাহাকে শাস্তি দিয়াছিলেন, সে আজ অনন্তের পথে মহাযাত্রা করিয়াছে।

একটা নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিতে উঠিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় মেধা, তাঁকে বসিয়েছ তো ?"

মেধা বলিল, "হাঁ, সে জন্তে তোমায় কিছু বলতে হবে না মা, সে সব আমি জানি। তুমি এখন তাঁর কাছে একবার চল, কথাবার্ত্তা কিছু বলবে না ?"

মায়ের আগেই মেধা চলিয়া গেল। আজ সত্যই তাহার হৃদয়ে আনন্দ ধরিতেছিল না। ঠাকুর দাদার চোখে সে যে জল দেখিয়াছিল, তাহার সহিত সে তাহার নিজের চোখের জল মিলাইতে পারিয়াছিল, কারণ, এই কয়টি প্রাণীর চোখের জল একজনের বিরহেই ঝরিতেছে, তিনি মেধার পূজ্যপাদ স্নেহময় পিতা, সাবিত্রীর দেবতা স্বামী, নারায়ণ দাসের একটি মাত্র পুত্র, পুঞ্জিভূত স্নেহের একমাত্র আধার। আজ ঠাকুরদাকে পাইয়া মেধার মনে হইল আর ভয় নাই, ঠাকুরদা আসিয়াছেন। যাঁহার সহিত মনান্তর ঘটিয়াছিল তিনি চলিয়া গিয়াছেন, বিরক্তি তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন, শিশু হৃদয়ে দিয়া গিয়াছেন ভালবাসা ও স্নেহ। ঠাকুরদা যে

তাহাদের একটা উপায় করিবেনই, মেধা ইহা বেশ জানিয়াছিল। মনের আবেগে সে প্রথম সাক্ষাতেই কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, তাহার পর ডাক্তারের কথা, পাড়ার যুবকগণের অত্যাচার জানাইয়া ফেলিল। বৃদ্ধ নারায়ণ দাস স্তব্ধভাবে সব শুনিয়া গেলেন। পৌত্রীর মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "আর কোন ভয় নেই দিদি, আমি তো এসেছি। বরেন নেই, আমি আছি। বড় দুঃখ রইল,—সে জেনে গেল আমরা তাকে ঘৃণা করি। অকৃতজ্ঞ সন্তান—যদি আগে একটা খবরও দিত—"

নিঃশব্দে তিনি চোখ মুছিলেন।

(৪)

সাবিত্রী প্রথমটায় কিছুতেই শ্বশুরের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না, অল্পে অল্পে কুণ্ঠা যখন কাটিয়া আসিল, তখন তিনি নারায়ণ দাসের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

আহারাদি সমাপ্তে নারায়ণ দাস তখন সতরঞ্চির উপর বসিয়া তাঁহার কড়িবাঁধা ছোট হুঁকাটায় তামাক খাইতে-ছিলেন, মেধা নিজের হাতে তাঁহাকে তামাক সাজিয়া দিয়াছিল। তামাক, টিকা তিনি বাড়ী হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। এটি তাঁহার চিরন্তন প্রথা ছিল, কোথাও যাইতে হইলে আর কিছু ভুল হইলেও এই জিনিষ কয়টি গুছাইয়া লইতে তাঁহার কোনদিনই ভুল হয় নাই।

তামাক টানিতে টানিতে তিনি ভাবিতেছিলেন অর্থের কথা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অর্থভক্ত লোক, আজকাল আর সকলের প্রতি অনুরক্তি কমিয়া, অর্থের প্রতি অনুরক্তি বেশী রকম বাড়িয়াছে। এতটুকু জিনিষ তাঁহার গায়ের রক্ত ছিল, কোন জিনিষ অপব্যয় করা তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না।

পুত্রের উপর রাগ করিয়া তাহাকে পত্নীসহ তাড়াইয়া দিলেও পুত্র প্রেরিত অর্থকে ঘৃণা করিতে পারেন নাই। অর্থানুরক্তি তাঁহার অত্যন্ত বেশী ছিল বলিয়াই, তিনি সেই ত্যক্তপুত্র প্রেরিত অর্থ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

আজ যে তিনি আসিয়াছেন ইহার মূলে প্রধানতঃ ছিল অর্থানুরক্তি, তাহার পর ছিল পৌত্রীর উপর কর্তব্য, পুত্রবধূর উপর তাঁহার বিন্দুমাত্র কর্তব্য ছিল না বলিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন। দায়ে পড়িয়া যেটুকু সম্পর্ক রাখিতে হইতেছিল তাহা কেবল মেধার জন্য।

মেধাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতেছিলেন, তাহার পিতা কত করিয়া বেতন পাইতেন, উপরি কিছু পাইতেন কিনা, কত রাখিয়া গিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঠাকুরদার একটা প্রশ্নের উত্তর—কত করিয়া বেতন পাইতেন সেই কথাটিই মেধা জানিত। উপরির কথা শুনিয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে সে বলিল, "বাবা তো কোনদিনই উপরি নেন নি ঠাকুরদা, মাস মাস মাইনেটা ঠিক নিতেন। উপরি যদি তিনি নিতেন, তা হলে আমাদের এমন অবস্থাই বা হবে কেন?"

কথাটা শুনিয়া নারায়ণ দাস কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইহাও কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারে যে পুলিসে কাজ করিয়া কেহ উপরি লয় না? যে এ কথা শুনিয়া সহজে মানিয়া লয় সে মূর্খ বই আর কি?

সাবিত্রী অনেকক্ষণ বাহিরে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন, তাহার পর প্রবেশ করিয়া শ্বশুরের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন। আজ পরলোক-গত স্বামীর কথা ভাবিয়া তাহার চোখের জল কিছুতেই মানা মানিল না, চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

রুদ্ধকণ্ঠে নারায়ণ দাস বলিলেন, কেঁদে কি করবে মা, এ সবই ভগবানের দান, নইলে তার বুড়ো বাপ—আমি বেঁচে রইলুম সে চলে গেল কেন? কোথায় আমার শ্রাদ্ধের যোগাড় সে করবে, তা নয় তার শ্রাদ্ধের ভাবনা আমায় ভাবতে হচ্ছে।"

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, সে সময়ে তাঁহার অন্তর হইতে অর্থচিন্তা যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল ইহা স্পষ্ট বলিতে পারা যায়।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নারায়ণ দাস একটা হুঙ্কার ছাড়িলেন—"নারায়ণ, তোমার ইচ্ছে।"

চোখ ফিরাইয়া পুত্রবধূর পানে তাকাইয়া বলিলেন, "সব

ব্যাপারই তো মেধার মুখে শুনলুম মা। এ রকম ব্যাপারের পর, আমি তোমাদের এখানে রাখতে আর ইচ্ছে করি নে, বিশেষ করে মেধাকে আমি নিয়ে যেতে চাই, কারণ ও আমার পৌত্রী, বরেণের মেয়ে, তার চিহ্ন। ওর জন্যে—যদি তুমি ইচ্ছে কর, তবে তুমিও গিয়ে আমার ওখানে থাকতে পার।"

সাবিত্রী নতমুখে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দয়া করে তাই নিয়ে চলুন বাবা, আমাদের কোথাও আর জায়গা নেই, যেখানে গিয়ে একটা দিন থাকতে পারি। বাড়ীওয়ালা তাগাদা করে গেছেন—দুই তিনদিনের মধ্যে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে, আমরা আশ্রয় খুঁজে পাচ্ছি নে। আপনার দুর্ভাগিনী পৌত্রী পুত্রবধূকে আপনারই কুড়িয়ে নিতে হবে বাবা, কারণ বিশ্বে সকলের পরিত্যক্তা এরা, এদের আর কোথাও স্থান নেই।"

শ্বশুরের দুখানা পায়ের উপর মুখখানা রাখিয়া সাবিত্রী চোখের জলে তাহা আর্দ্র করিয়া দিলেন।

শশব্যস্তে পা সরাইয়া লইয়া নারায়ণ দাস বলিলেন,—"ও কি মা, অমন করে কাঁদতে নেই। তুমি যার মেয়েই হও না, সে বিচার আমি এখন করছি নে, এখন তোমায় অসহায়া আশ্রয়হীনা একটি রমণী বলেই জানছি; মেয়ের প্রতি—মায়ের প্রতি, সন্তানের ও বাপের যা কর্ত্তব্য আমি এখন তাই করব, সমাজ নিয়ে কথা পরে হবে। আমি তো আগেই বলেছি মা, আমি যখন এসে পড়েছি তখন তোমাদের আর এতটুকু ভাবনা করতে হবে না, তোমাদের ব্যবস্থা আমিই করে দেব। টেলিগ্রাম পেলুম—কিন্তু সে বড় দেরীতে; কুক্ষণে আমি বাড়ী ছিলুম না। আজ সকালে বাড়ী ফিরে, দেখেই চলে এসেছি। যদি বাড়ী থাকতুম, সে হতভাগার সঙ্গে একবার দেখা হত।"

পরলোক গত পুত্রের জন্য পিতার মনে কতটা ক্ষোভ যে সঞ্চিত ছিল তাহা এইরূপ সামান্য দুই একটা কথায় প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল। অর্থের বাসনা দিয়া এ ক্ষোভ—এ দুঃখ ঢাকিতে পারা যায় নাই, নারায়ণ দাস অনেক চেষ্টা করিয়াও—একবার না দেখিতে পাওয়ার দুঃখ সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না।

কলিকার তামাক কখন পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, তিনি কলিকাটায় হাত দিয়া দেখিয়া, আবার তামাক সাজিবার উদ্যোগ করিতে মেধা বলিয়া উঠিল, "আমায় দিন ঠাকুরদা, আমি সেজে দিচ্ছি।"

স্নেহপূর্ণ নেত্রে পৌত্রীর পানে তাকাইতে বৃদ্ধের চোখ দুইটি আবার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিতেছিল, তাড়াতাড়ি তিনি চোখ নামাইয়া লইলেন।

"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মা, বরেণ কিছু রেখে যেতে পেরেছে কি?"

সাবিত্রী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, "কিছু না বাবা, কিছু রেখে যেতে পারেন নি। এই ঘরের জিনিসপত্র যা পড়ে আছে, এ ছাড়া আর কিছু নাই। মাহিনে যা পেয়েছিলেন, সংসারের খরচ চালিয়ে বাকি সব শুধু মদ খেয়ে উড়িয়ে দিয়েছেন, একটি পয়সা সঞ্চয় করতে পারেন নি। ইদানিং বড় মাতাল হয়ে পড়েছিলেন, বারণ করলেও একটা কথা শুনতেন না, নিজের জেদে চলতেন। যা দুই এক পয়সা ছিল, গায়ের গহনা ক'খানা ছিল, সব বেচে কিনে যে কয় মাস তিনি বিছানায় পড়েছিলেন তাঁর চিকিৎসা পথ্যের যোগাড় করেছিলুম—"

সাবিত্রীর কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া গেল।

চিন্তিত মুখে নারায়ণ দাস তামাক টানিতে লাগিলেন, মনের অপ্রসন্ন ভাবের ছায়া একটুখানি মুখের উপরে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সাবিত্রী সে মুখের পানে তাকাইয়া, আর কথা বলিবার সাহস পাইলেন না।

নারায়ণ দাস মেধার কথা যেমন বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সাবিত্রীর কথাও তেমনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ইহাও কি সম্ভব যে সে সমস্তই উড়াইয়া দিয়া গিয়াছে, স্ত্রী কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কিছু ফেলিয়া রাখিয়া যায় নাই। হাঁ, উচ্ছৃঙ্খল অনেকেই হয় বটে, তবুও তাহারা ভবিষ্যতের ভাবনা এতটুকু ভাবে বই কি। মেধা বালিকামাত্র, তাহার মায়ের মুখে যাহা সে শুনিয়াছে তাহাই সত্য বলিয়া জানিয়াছে এবং সরল বিশ্বাসে সে তাহা ব্যক্ত করিয়াও গিয়াছে। তাহার এই পুত্রবধূটী যে, যেমন তেমন মেয়ে নয়, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। সে নিশ্চয়ই কিছু টাকা লুকাইয়া

রাখিয়াছে, দায়ে পড়িলে আপনিই বাহির করিতে হইবে, এখন বেশী নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।

ইহার পর—বাধ্য হইয়া সাবিত্রীকে সবই বাহির করিতে হইবে, স্ত্রীলোকের হাতে অর্থ বড় বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। নারায়ণ দাস মনের গোপন কথা মনেই রাখিলেন, এখন কোনমতেই তাঁহার মনের সঙ্কল্প যেন প্রকাশ হইয়া না পড়ে সে বিষয়ে সতর্ক হইলেন।

পল্লীগ্রামে যাইবার আনন্দে মেধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। পল্লীগ্রাম কিরকম, সেখানে এমনই বাড়ী ঘর, লোকজন আছে কি না, এমনই লাইট জলে কি না, ট্রাম, মোটর চলে কি না ইত্যাদি প্রশ্নে সে সাবিত্রীকে ব্যস্ত করিয়া তুলিল।

বিষাদে হাসিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "তোর পাড়াগাঁ দেখার সাধ এইবার মিটবে মেধা, দু'দিন থাকতে না থাকতে আবার কলকাতায় আসতে চাইবি। সেখানে জঙ্গলে ঢাকা, এখানে একটা বাড়ী, ওখানে একটা বাড়ী, এত লোকজন তুই পাবি কোথায়? সেখানকার কাঁচা পথে ট্রাম, মটর দূরে থাক, ঘোড়ার গাড়ীও চলে না, গরুর গাড়ী চলে। পথে তুই ইলেকট্রিক লাইট পাবি কোথায়? চাঁদ যখন ওঠে তখনই যা একটু দেখতে পাওয়া যায়, নইলে সবই অন্ধকারে ছাওয়া।"

মেধা কল্পনায়, শুভ্র জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল শান্ত পল্লীগ্রামের ছবিখানা মনে আঁকিয়া বলিয়া উঠিল,—"কিন্তু মা—সেইখানেই চাঁদের আলো সত্যি করে জানতে পারা যায়, বুঝতে পারা যায়। মাসে যে কয়টা জ্যোৎস্না রাত পাওয়া যায়, পল্লীগ্রাম কেন—সহরবাসীও যদি সহর ছেড়ে সেখানে বেড়াতে যায়—তারও কাছে তাই বড় সুন্দর বোধ হবে। দিনরাত জ্যোৎস্নার আলো পেলে সে আলোর মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকে না; পনের দিন অন্ধকারের পরে ওই কয়টা দিন জ্যোৎস্না পাওয়া যায় বলেই জ্যোৎস্নার অত আদর। সত্যি মা, আমার আর এ গণ্ডগোল ভাল লাগছে না, এখন শান্ত পল্লীতে যেতে পারলে—মনে হয় আমি যেন বেঁচে যাই। একে এখানে দিনরাত গণ্ডগোল, তার ওপরে লোকের কি-রকম অত্যাচার বল দেখি মা, একটা রাত যে তুমি শান্তিতে ঘুমাতে পার না. একটা দিন যে তুমি শান্তিতে থাকতে পাও না, তা কি আমি কিছু বুঝতে পারি নে মা?"

মায়ের চোখে জল আসিয়া জমিয়াছিল, তিনি মুখ ফিরাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিলেন। গভীর স্বরে বলিলেন, "কে জানে মা,—যেখানে যাচ্ছি সেখানে এ পোড়া অদৃষ্টে আবার কি উৎপাত এসে জুটবে। ভগবান যে সব রকমেই আমায় মেরেছেন মা। নইলে কি আমি এতটুকু জয় করতুম রে? আমার মুখ থাকতেও যে মুখ নেই, অথচ অনুভব করবার শক্তি আছে;—নারায়ণ।"

মেধা মায়ের বেদনাভরা মুখখানার পানে তাকাইয়া খানিকটা চুপ করিয়া রহিল।

মা বলিলেন, "নে, এখন শো মেধা, রাত অনেক হয়ে গেছে। কাল বাবা যা ব্যবস্থা করেন তাই হবে, বাড়ী ভাড়াটা মিটিয়ে দিতে পারলে আমি নিষ্কৃতি পাই, আমার অনেক ভাবনা চুকে যায়।

মেধা মায়ের বুকের মধ্যে মাথাটা রাখিয়া শুইয়া পড়িল, এবং শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

তখনও গৃহে আলো জলিতেছিল, অন্ধকার ঘরে সাবিত্রী ঘুমাইতে পারিতেন না।

আলোর দীপ্তি মেধার মুখখানার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল। সেই চিন্তাশূন্য সরল পবিত্র মুখখানার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া সাবিত্রী আকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ভগবান, আমি কি করে সে কথা বলব?"

(৫)

কলিকাতার সহিত সকল সম্পর্ক চুকাইয়া সাবিত্রী কন্যাসহ শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতার বাসার জিনিষপত্র সবই বিক্রয় হইয়া গেল। দুই একখানা জিনিষ রাখিবার কথা সাবিত্রী বলিয়াছিলেন, কিন্তু নারায়ণ দাস সদুঃখে বলিলেন, "আর এ সবে দরকার কি মা? সেখানে যা আছে সবই তোমাদের, আমি আর কয়দিন, আজ বাদে কাল চোখ মুদব, তোমাদের জিনিষপত্র তোমাদেরই থাকবে। অনর্থক এই জিনিষপত্র রেখে কি ফল মা, সেখানে সবই তো পাবে।"

জিনিষপত্র বিক্রয় করিয়া—বাড়ী ভাড়ার টাকা মিটাইয়া দিয়া নারায়ণ দাসের হাতে কয়েক শত টাকা থাকিয়া গেল, বধূকে তাহা দেওয়ার আবশ্যকতা মনে করিলেন না। সাবিত্রীও তাহা চাহিলেন না, তাহার অর্থের কোনও আবশ্যকতা ছিল না, এখন এই দুঃসময়ে একটু আশ্রয় পাইলেই তিনি এখন বাঁচিয়া যান।

ট্রেন হইতে নামিয়া ষ্টেশনে পা দিতে সাবিত্রীর মনে বহুকাল পূর্ব্বের একটি দিনের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তখন তিনি নব বিবাহিতা বধূ, শ্বশুরালয়ে আসিতেছেন, বুকভরা আশা ও আনন্দ। শ্বশুরালয়ে আসিতেছেন, সেখানে সকলের মনের মত আদর্শ বধূ হইতে পারিবেন কিনা, তাহাই তাঁহার হৃদয়ে একমাত্র ভাবনা ছিল। একবার ভয়, একবার আনন্দ, একবার আশা—সঙ্গে সঙ্গে নিরাশয় তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল। বরেন্দ্রনাথ স্ত্রীর মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সাহস দিতেছিলেন, ভয় কি সাবিত্রী আমি এমন কোন কিছু অন্যায় কাজ করিনি যাতে তোমার এত ভয় পেতে হবে। বাবা মাকে না জানিয়ে গোপনে তোমায় বিয়ে করেছি এই আমার অপরাধ, এ অপরাধের মার্জ্জনা যে আমি পাব সে আশা আমার আছে।"

উঃ, সে আজ কতকালের কথা, তাহার পর দীর্ঘ কুড়িটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। যখন দিনগুলা যাইতেছিল, তখন তাহার পানে দৃষ্টি পড়ে নাই, আজ সে চলিয়া গিয়াছে, তাহার পানে তাকাইয়া, সাবিত্রী ভাবিতেছিলেন সে দিনগুলা জলের মত কাটিয়া গেল কেমন করিয়া? আজ যাহা মনে হইতেছে জলের মত কাটিয়া গিয়াছে, যখন ইহা আসিয়াছিল তখন কিন্তু বাস্তবিকই জলের মত কাটিয়া যায় নাই।

ষ্টেশনে কয়খানা গরুর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই একটা ঠিক করিয়া নারায়ণ দাস তাহাতে পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে উঠাইয়া দিলেন, সাবিত্রীর বাক্সটা তুলিয়া দিলেন। গাড়ী চলিতে লাগিল, নারয়ণ দাস গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে এই পথ বাহিয়াই একদিন সাবিত্রী চলিয়াছিলেন। আজ সেই পথে চলিতে সাবিত্রী গাড়ীর পিছন দিককার কাপড় একটু সরাইয়া দেখিতে ছিলেন। কুড়ি বৎসর আগে যে গাছগুলিকে তিনি এতটুকু দেখিয়া গিয়াছিলেন আজ তাহারা বড় হইয়াছে আকাশের গায়ে মাথা তুলিয়া সগর্ব্বে দাঁড়াইয়া আছে। বাজারের কাছে একটা আঁকা বাঁকা নারিকেল গাছ দাঁড়াইয়া, কুড়ি বৎসর আগে এ এতটুকু ছিল, বলে এমন নুইয়া পড়ে নাই। ওই যে বড় অশ্বত্থ গাছটা, সেদিন এটি ছিল এতটুকু, চারিদিক ঘেরা ছিল. পাছে গরুতে খাইয়া যায়। আজ সে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া শতবাহু বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়াছে, সুশীতল ছায়া দানে পথিককে তৃপ্ত করিতেছে।

জগতে আজ সকলেই বড় হইয়াছে, সকলেই মাথা উচু করিয়াছে, অবনত হইয়াছেন কেবল তিনিই, তাঁহারই সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে।

বাড়ীর দরজার কাছে গাড়ী থামাইতে আদেশ দিয়া নারায়ণ দাস বলিলেন,"এই যে আমাদের বাড়ী দিদি, তোমার মাকে নিয়ে নেমে এসো।

বাড়ীটা বোধ হয় নারায়ণ দাসের চার পাঁচ পুরুষ আগেকার তৈয়ারী। প্রাচীনকালে নূতন অবস্থায় দেখিতে মন্দ না থাকিলেও এখন তাহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দেয়ালে লোনা বাধিয়া বালী চুণ সব খসিয়া পড়িয়াছে, একখানা কঙ্কালের মত বাড়ী শুধু দাঁড়াইয়া আছে। বাড়ীর সম্মুখে কোন কালে এক সময় পাকা প্রাচীর ছিল তাহার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। খানিকটা জায়গা ঘেরিয়া লাউ কুমড়া প্রভৃতি গাছ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলা লতাইয়া ছাদের উপর উঠিয়াছে, দুই একটা ফুলও ধরিয়াছে।

মেধা হাঁ করিয়া খানিকটা সেই জীর্ণ বাড়ীখানার পানে তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল," এই বাড়ী আপনার ঠাকুর দা?"

ঠাকুর দাদা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন," এই বাড়ীই আমার মেধা, এই বাড়ীতেই তোমার বাপ জন্মিয়েছে, এইখানে খেলেছে, মানুষ হয়েছে। তার জীবনের আঠার বছর একাদিক্রমে এইখানেই কেটেছে মেধা, তখন সে এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে একদিন থাকতে পারত না। তখনও এ বাড়ীর এমন জীর্ণাবস্থা হয় নি! মানুষ না থাকলে ইন্দ্রপুরীরও এমনি দুরবস্থা হয়। আমি একা, বুড়ো মানুষ

কোন দিকে কি দেখি তার ঠিক পাই নে। তোমরা নেবে এসো মা, আমি ততক্ষণ তোমার ঠাকুরমাকে খবর দেই, তিনি তো জানেন না যে তোমরা এসেছ।"

গাড়োয়ানকে বাক্স প্রভৃতি ভিতরে লইয়া আসিবার আদেশ দিয়া, তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

অবসন্না জননীর হাত ধরিয়া মেধা বলিল," নেমে এস মা, তুমি যে মোটেই উঠতে পারছ না।"

একটা তিক্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া সাবিত্রী বলিলেন,"চল মা, কিন্তু আমার পা আর উঠছে না যে।"

বাড়ীর মধ্যে রোদনের রোল উঠিল, জানা গেল পুত্র শোকাতুর জননী আছড়াইয়া পড়িয়াছেন।

দরজার উপর একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাত ধরিয়া একটি ছোট ছেলে। মেয়েটির বয়স বড় জোর বাইশ তেইশ হইবে, শুভ্রথান তাহার পরণে, অঙ্গ অলঙ্কার শূণ্য। সে মাতা ও কন্যাকে অভ্যর্থনা করিল। সাবিত্রী জিজ্ঞাসায় জানিলেন, সে গৃহিণীর ভ্রাতুষ্পুত্র বধূ, ছেলেটি তাহার একমাত্র পুত্র।

মেধার হাত ধরিয়া সে ভিতরে লইয়া গেল, সাবিত্রীও তাহাদের পিছনে গেলেন। বারাণ্ডায় একটা মাদুরে তাঁহাদের বসাইয়া মেয়েটি কার্য্যান্তরে চলিয়া গেল।

ঠাকুর মা খানিকটা কাঁদিয়া আপনিই স্থির হইলেন; পৌত্রী ও পুত্রবধূকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, দুই একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া তিনি তাহাদের আহারের উদ্যোগে গেলেন।

দুই একদিন থাকিতে থাকিতে সকলের পরিচয় পাওয়া গেল। খাশুড়ী গৌরী দেবী অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন, সামান্য একটুতেই তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিত, কিছুতেই তিনি তখন নিজেকে সামলাইতে পারিতেন না। পুত্রবধূকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার অন্তরে কেবল বাজিতেছিল এ তাঁহাকে বড় ফাঁকি দিয়াছে, তাঁহার অন্তরের ধনকে তাঁহার বক্ষচ্যুত করিয়াছে। তাহাতেই বা রাখিতে পারিল কই, রাক্ষসী কোথায় তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া আসিল কে জানে। মনের মধ্যে তাঁহার যে বিরাট অপূর্ণতা জাগিয়াছিল, সাবিত্রী আসিয়া তাহা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন।

মেধাকে তিনি দূরে রাখিতে পারেন নাই কারণ তাহার মা যাই হোক সে তাঁহার বরেণের বড় আদরের মেয়ে। বরেণের মুখের সাদৃশ্য মেধার মুখে তেমনই সরল—বড় কোমল কথা।

তথাপি তিনি মেধাকে একেবারে কাছে টানিয়া লইতে পারিলেন না, তাহার মা, কাহার মেয়ে ঠিক নাই, এই কথাটা তাহার মনে অহোরহ জাগিয়াছিল। তিনি মাতা কন্যাকে ঠাকুর গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন না, রন্ধন গৃহে প্রবেশের অধিকার দিলেন না, কেননা এই দুইটি গৃহেই তাঁহার জাতি-ধর্ম্ম বিদ্যমান ছিল। মেধাকে তিনি ভালবাসিতে পারেন, তাহার জন্য জাতি-ধর্ম্ম নষ্ট করিতে পারেন না।

সাবিত্রী মরমে মরিয়া অত্যন্ত সঙ্কুচিতা হইয়াছিলেন, যতটা দূরে তাঁহাকে রাখা হইয়াছিল তিনি তাহাপেক্ষা বেশী-দূরে সরিয়া রহিলেন। তিনি কেন উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন, এই বাড়ীর একটা ক্ষুদ্র বস্তুতে হাত দিবার অধিকার তাঁহার ছিলনা। ঘাটের পথে গৌরীদেবীর সহ মাতা কন্যাকে দেখিয়া গ্রামের মেয়েরা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, তখন গৌরীদেবী সহৃদয়তার সহিত বলিয়াছিলেন,"তা উনি তো মানুষ বটে। বরেণের ব্যারাম শুনে গিয়ে দেখেন সব শেষ হয়ে গেছে, বাড়ীওয়ালা ভাড়ার জন্যে এদের যা না তাই বলছে। যাই হোক—বরেণ যাই করুক—সে যখন এখন নেই, তখন স্নেহের খাতিরে তার কাজের জের এখন এঁকেই টানতে হবে, না বলবার তো যো নেই। তাই যখন এরা তাঁর পায়ে কেঁদে পড়ল, তখন বাধ্য হয়ে নিয়ে আসতেই হল।"

গ্রামের মেয়েরা নারায়ণদাসের উদারতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, অনেকেই বলিলেন,"তা বটেই তো দিদি, সে ঠিক কথাই বটে। আহা, বরেণের এমনটা হবে তা কেই বা ভেবেছিল?—কিসের বয়েসই বা তার, এই বয়সে —· ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাঁহাদের মাতা ও কন্যার সম্বন্ধে গ্রামবাসী পুরুষ ও মহিলার মনের ভাব, নারায়ণ দাস ও গৌরীর মনের ভাব

স্পষ্ট জানিতে পারিয়া সাবিত্রী আরও বেশী কুণ্ঠিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন। না, এখানে না আসাই ভাল ছিল। এরূপ ঘৃণিত ভাবে সকলের লক্ষ্যের মধ্যে বাস করা যায় না, অসহ্য। যদি তিনি না আসিতেন।

কিন্তু থাকিতেনই বা কোথায়? কলিকাতায় কোথায় তিনি কন্যাসহ আশ্রয় পাইতেন? তিনি নিজে না হয় লোকের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিতেন, কিন্তু মেধা? সে দাসীবৃত্তি করিতে পারিত না, সর্বোপরি তাহার অসীম রূপ—মুকুলিত যৌবন; কে জানে মেধার অদৃষ্টে কি ঘটিত, প্রলোভন সে এড়াইতে পারিত কি না।

পল্লীগ্রামের লোকেরা বাহিরের হুজুগে অত কাণ দেয় না, কাহার গৃহে কি হইল; কে কাহাকে কি বলিল, এমন কি কে কি দিয়া ভাত খাইল, সে সংবাদটা পর্য্যন্ত রাখে, এইটী পল্লীবাসীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। সহরে পাশের বাড়ীতে কি হইল, সে খবরটা কেহ জানিতে পারে না, পল্লীগ্রামে এ প্রান্তের গোপনীয় সংবাদ ও প্রান্তে তখনি পৌঁছাইয়া যায় এবং সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া পল্লীবাসী পুরুষ ও স্ত্রীলোক অত্যন্ত মাথা ঘামাইয়া থাকেন দেখা যায়।

সাবিত্রী সকল অনুশাসন মাথা পাতিয়া মানিয়া লইলেও মেধা কিছুতেই মানিতে চাহিতেছিল না, সে এক একবার সর্পিণীর মত গর্জ্জিয়া উঠিতে চাহিতেছিল, তাহার মা তাহার মুখ চাপিয়া রাখিতেছিলেন। স্পষ্টবাদিনী মেধার জন্য তাঁহার বড় ভয় ছিল, কোন কথা কখন সে বলিয়া বসে তাহার ঠিক কি?

পুত্র চলিয়া গেলে অত্যন্ত রাগ করিয়াই গৃহিণী নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র মোহনকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোহনের বিবাহ তাঁহারাই দিয়াছিলেন, সুধা মোহনের পত্নী। পুত্র বিনয় জন্মিবার কিছুকাল পরে মোহন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিল।

গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল যদিই পুত্র ফিরিয়া আসে এবং অজ্ঞাত কুলশীলা রমণীকে বিবাহ করার ফলে অনুতপ্ত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সৎ ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী হয়, তাহা হইলে তাহার যাহা কিছু সেই লইবে, মোহনের বিধবা পত্নী ও পুত্রকে কিছু দিলেই চলিবে। সাবিত্রী ও মেধাকে গ্রহণ করিতে প্রথমাবধি তিনি বিরূপ ছিলেন। পুত্রের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে প্রথম শোকাবেগটা কাটিয়া গেলে, তিনি কর্ত্তাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, কিন্তু নারায়ণ দাস যখন টাকাকড়ি সম্বন্ধে তাঁহাকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, তখন তিনি আর কথা বলিতে পারিলেন না; মন্ত্রমুগ্ধ সর্পিণীর ন্যায় চুপ করিয়া গেলেন।

এই দুইটি অভ্যাগতার উপর সুধাও বিরক্ত হইয়াছিল বড় কম নয়। সে ঠিক জানিয়াছিল তাহার পুত্রের জন্যই বৃদ্ধ বৃদ্ধা যাহা কিছু সব সঞ্চয় করিয়া যাইতেছেন, এ দু'জন কোথা হইতে ভাগ বসাইতে আসিল? সে স্পষ্ট চক্ষে দেখিতে পাইল, বৃদ্ধ তাঁহার সকল সম্পত্তি মেধাকে দিয়া যাইতেছেন, তাঁহার পুত্র বিনয় এক পয়সাও পাইতেছে না।

নিঃসম্বল অবস্থায় এ সংসারে আসিয়া, মেধা সঙ্গী পাইল বিনয়কে। ছেলেমানুষ সে, সংসারের কুটিলতা এখনও তাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই, মেধাকে দেখিয়া, সে তাহার এই দিদিটিকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিল।

দিনের অধিকাংশ সময় সে মেধার কাছেই কাটাইয়া দেয়, মেধাও এই বালক সঙ্গীকে পাইয়া কথা বলিয়া বাঁচিয়া গেল; বিনয় না থাকিলে সত্যই তাহাকে বড় বিপদে পড়িতে হইত।

গ্রামে মেয়েদের মধ্যে বেশ একটু চাঞ্চল্য অনুভূত হইতেছিল। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে, মাত্র দুই তিন ঘণ্টার জন্য সাবিত্রী এ গ্রামে আসিয়াছিলেন, তখন তাহাকে দু'চার জন মাত্র দেখিলেও বিবাহের কথাটা গ্রামের সকলেই জানিয়াছিল। সকলের মনের মধ্যে এই অদ্ভুত বিবাহের পাত্রীটিকে দেখার ইচ্ছা জাগিয়াছিল। তিনি আসিয়াছেন শুনিবামাত্র, দলে দলে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া, যুবতী, কিশোরী বালিকা আসিয়া জুটিতে লাগিল, যেন সত্যই তাহারা দেখিবার বস্তু। ইহাদের বিস্ফারিত চোখ, বিস্ময়পূর্ণ কথা শুনিয়া মেধা হাসিবে কি রাগ করিবে তাহা ভাবিয়া পাইতেছিল না।

মেধাকে এখনও কুমারী অবস্থায় দেখিয়া লোকের চোখ কপালে উঠিয়াছিল,—"ওমা, এত বড় মেয়ে, বয়স কত হল গা?"

সাবিত্রী মৃদুকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"এই পনের বছর।"

গ্রামবাসিনীগণ কতক্ষণ কথা বলিতেই পারেন নাই, কারণ পনের বৎসরের কুমারী মেয়ে এরূপ পল্লীগ্রামে পাওয়া দুষ্কর। দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ না হইতে বিবাহ দেওয়াই চাই, নহিলে জাতি যায়।

গ্রামের দিদিমা স্থির থাকিতে না পারিয়া কোনমতে বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, "এত বড় মেয়ে সামনে রেখে দিব্যি ভাত গিলতে পারছ বাছা ?"

সাবিত্রী একেবারে নীরব হইয়া গিয়াছিলেন, আর একটি কথা তাহার মুখে ফুটে নাই। হায় রে, মেধা পাছে মনে করে তাহার সারা জীবনটা পিতা এমনভাবে ব্যর্থ করিয়া ফেলিয়াছেন, সামান্য একটা খেয়ালের বশে একটা নারীর আশাপূর্ণ জীবনখানা জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন। এতকাল একথা তিনি বলিতে পারেন নাই, আজ কেমন করিয়া বলিবেন ? হায় নারায়ণ, কেন এ সত্যকে গোপন করার প্রবৃত্তি তাহার মনে জাগাইয়াছিলে ? যাহা ঘটিয়াছে কেন তাহা প্রকাশ করিতে পারেন নাই ? একথা কি চিরকাল গোপন রাখিতে পারা যাইবে, একদিন না একদিন ইহা যে প্রকাশ হইবেই। তখন মেধার অন্তরে কি ব্যথাই না বাজিবে —তখন সে তাহার পিতামাতাকে কি নির্দ্দোষ ভাবিতে পারিবে ?

তথাপি তিনি বলিতে গিয়া বলিতে পারিলেন না, মেধার হাসিভরা মুখ, হাতের চুড়ি, শাড়ীর পানে চাহিয়া তিনি থামিয়া গেলেন। না, যে কয়দিন এমনি যায়—যাক্। এখন প্রকাশ হইলেই সমাজের অলঙ্ঘ্য শাসনের ফলে মেধার অঙ্গ অলঙ্কার-শূন্য করিতে হইবে, তাহাকে কঠিন ব্রত একাদশী করিতে হইবে। ওঃ, সে কি কষ্ট, না—না, সাবিত্রী একথা প্রকাশ করিতে পারিবেন না। যতদিন গোপনে থাকে থাক। তারপর যখন প্রকাশ হইবে, মেধা যখন তাহাকে বলিবে কেন তিনি পূর্ব্বে একথা জানান নাই, তখন,—তখন সব দোষই তিনি নিজের মাথা পাতিয়া লইবেন, কেননা স্নেহ তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে।

সাবিত্রী নীরব হইয়া রহিলেন দেখিয়া, দিদিমা আর দুই একটা কথা বলিবার প্রলোভন এড়াইতে পারিলেন না, বলিলেন, "তা বাছা কলকাতায় যা তা চলে, দেশে, ঘরে থাকতে গেলে সমাজের আইন কানুন মেনে চলতে হয়। মেয়েকে তো আইবুড়ো করে রাখা চলে না, ছেলে হলেও না হয় যা তা হতো।"

অত্যন্ত ক্ষীণস্বরেই সাবিত্রী বলিলেন, "ওকে আর কে বিয়ে করবে বলুন, ওর মায়ের কথা শুনে কেউ কি ওকে বিয়ে করতে চাইবে ? ভগবান ওর সুমতি দিন, চিরকুমারী থেকে দশজনের সেবা করে দিন কাটাক, আপনারা ওকে এই আশীর্ব্বাদই করুন।"

দিদিমা একটু ভাবিয়া বলিলেন, "সে কথা সত্যি বটে, জেনে শুনে কোন বামুনের ছেলে তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে না। তা হলেও আশা কি ছাড়তে আছে গা, বিয়ের ফুল ফুটলেই পাত্র আপনি আসবে। মেয়ে তোমার সুন্দরী, অনেকেরই ঝোঁক হবে। আচ্ছা, তা আমিই চেষ্টা করব বাছা, শ্বশুরকে বলে আমার ঘটক বিদায় করিয়ে দিয়ো।"

তিনি বিদায় লইলেন, সাবিত্রী একটু হাসিলেন মাত্র।

(৬)

গৌরী দেবী স্নানান্তে এক ঘড়া জল লইয়া বাড়ী আসিতেছিলেন, সেই সময়টাতে মেধাও স্নান করিবার জন্য ঘাটে যাইতেছিল, দৈব দুর্ব্বিপাকে বাতাসে স্খলিত অঞ্চলখানা স্কন্ধে আবার ফেলিতে গিয়া উড়িয়া গৌরী দেবীর গায়ে ঠেকিয়া গেল। পথটা সরু, একজন লোক মাত্র সে পথে চলিতে পারে, দু'জন কোনক্রমে পাশাপাশি চলিতে পারা যায় মাত্র। পথের দু'ধারে শেয়ালকাঁটা, ফেনীমনসা প্রভৃতি কাঁটা গাছ, দাঁড়াইবার স্থান কোথাও ছিল না।

অঞ্চলখানা গায়ে লাগিতেই গৌরী দেবী থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি কোথায় স্নানান্তে পবিত্র মনে, পবিত্র দেহে, ঠাকুর পূজার জন্য জল লইয়া যাইতেছেন, শুচিতা বাঁচাইতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কলসী কক্ষে লম্ফে লম্ফে পথ পার হইতেছেন, এমন সময় একি বিসদৃশ কাণ্ড।

কাংসকণ্ঠে তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"আ হতভাগা ছুঁড়ি, বলি, চোখ দুটোকে কোথায় রেখে পথে হাটিস্ লা ? বিয়ে যদি যোগ্য বয়সে হতো, এতদিন যে দু'ছেলের মা হতে

পারতিস্, সেই তুই এমনি করে পথে চলিস! একটু লজ্জাও ত হয় না লা, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ।

এই দারুণ ধিক্কারে মেধার কান পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, সেও রাগের বশে কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়িল; নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া সে নরমস্বরে বলিল, "ইচ্ছে করে তো দেইনি ঠাকুর মা, বাতাসে আঁচলটা উড়ে গিয়ে ঠিক তোমার গায়েই লাগল।"

"না লো না, ইচ্ছে করে দিস নি, অমনি বাতাস এল আর তোর আঁচলখানা উড়িয়ে এনে আমার গায়ে ফেললে। সব তোর নষ্টামি—দুরন্তপণা, যাতে না তাতে আমায় জব্দ করতে চাস। এই চান করে এলুম, আবার এখন ফিরে গিয়ে চান করতে হবে তবে জল আনতে হবে।"

প্রবল রাগ বশতই, যে কলস তুলিতে তিনি বিলক্ষণ কষ্ট পাইতেন, সেই জলপূর্ণ কলসী দুই হাতে ধরিয়া উপুড় করিয়া জলটা ফেলিয়া দিয়া আবার ঘাটে চলিলেন।

এই বৃদ্ধার শুচিতার প্রাবল্য দেখিয়া মেধার হাসি পাইতেছিল, তাহার রাগভাব সব দূর হইয়া গিয়াছিল। এরূপ শুচিতাগ্রস্তা নারী ঢের দেখিতে পাওয়া যায় যাহারা শুচিতা বাঁচাইতে গিয়া অনেকটা সময় নষ্ট করে, এবং শারীরিক ক্লেশও অনেকটা সহ্য করে। পল্লীগ্রামের পরিচয় মেধা আজকাল পাইয়াছে, কলিকাতা থাকার সময়ে জানিতে পারে নাই।

গৌরী দেবীর পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে মেধা বলিল, "ঘড়াটা আমায় দাওনা ঠাকুরমা, আমি চান করে একঘড়া জল এনে দিচ্ছি।"

অন্ধকারপূর্ণ মুখে ঠাকুর মা বলিলেন,—"না বাছা, আমিই জল নিয়ে আসছি, তোমার আর অত উপকার আমার করতে হবে না।"

মেধা হাসি চাপিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "তবেই আমি তোমার সতীন হতে পেরেছি ঠাকুর মা। আমায় কিছু ছুঁতে দেবে না, আমার ছুঁয়ে আবার চান করতে চললে, এতে আমি তোমার সতীন হই কি করে? সতীন হলে আধা-আধি বখরা—তা জান তো?"

গৌরী দেবীর মুখের জমাট বাঁধা অন্ধকার এইবার যেন খানিকটা ঘুচিয়া গেল, একটু হাসির রেখা তাঁহার দন্তবিহীন মুখখানার উপর ভাসিয়া উঠিল, তিনি আদরপূর্ণকণ্ঠে বলিলেন, "আধাআধি কেন ভাই, সবটাই আমি তোকে দিচ্ছি।"

মেধা তেমনি গম্ভীর মুখে বলিল, "তাইতো, ওটা তোমার মুখের কথা ঠাকুর মা, মনের কথা কক্ষণো নয়। তুমি রান্না ঘরে ঢুকতে দাও না, ঠাকুর ঘরে যেতে দাও না, একটা ঘড়া ছুঁলে সে জল ফেলে আবার জল আনা, তুমি আবার সমস্তটা আমায় দেবে? আমি আজ বাড়ী গিয়ে সব কথা ঠাকুরদাকে বলে দেব, যে তুমি আমাদের কিছু ছুঁতে দাও না, ঘরে উঠতে দাও না।"

গৌরী দেবী হাসিমুখে বলিলেন, "তা বলে দিস্, তোর ঠাকুর দা আমার একটা কান কেটে না হয় পথে বার করে দেবে।"

ঘাটে পৌঁছিয়া তিনি একটা ডুব দিয়া এক কলসী জল লইয়া উঠিলেন; মেধা অনুনয়ের সুরে বলিল, "একটু দাঁড়াও ঠাকুর মা, আমি চট করে ডুব দিয়ে নেই।"

গৌরী দেবী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "জ্বালিয়ে খেলি বাপু, তাড়াতাড়ি করে নে। আমার এখনও পূজোর জোগাড় করতে হবে।

তাড়াতাড়ি স্নান করিতে করিতে মেধা বলিল, "আমায় একদিন পূজোর যোগাড় করতে দেবে ঠাকুরমা, আমার বড় ইচ্ছে করে, একদিন নিজের হাতে পূজোর যোগাড় করে দেই। আজ তো ডুব দিয়ে যাচ্ছি, দেবে পূজোর যোগাড় করতে?"

গৌরী দেবী একটুখানি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, অনিচ্ছার সঙ্গে বলিলেন, "তা করিস একদিন, আগে বিয়েটা হয়ে যাক্—তারপরে।"

মেধা বলিল, "কেন, বিয়ে না হলে বুঝি পূজোর যোগাড় করতে নেই?"

গৌরী দেবী বলিলেন, "সব তো জানিস মেধা, তবে জেনে শুনে আবার জিজ্ঞাসা করছিস কেন?"

উপরে উঠিয়া আজানুবিলম্বিত চুল মুছিতে মুছিতে মেধা বলিল, "কেন জিজ্ঞাসা করব না ঠাকুরমা, এতদিন যে জিজ্ঞাসা করি নি এই আশ্চর্য্য। আমি কি বুঝতে পারি নে আমার

মায়ের গর্ভে আমি জন্মেছি বলেই তুমি আমায় এতটা দূরে রেখেছ ? ঠাকুরমা, আমার মা তো পতিতা ন'ন, আমার বাবা—আপনার ছেলে তাঁকে রীতিমত নারায়ণ সাক্ষী করেই বিয়ে করেছিলেন। তুমি আমায় ঠাকুরের পূজোর যোগাড় করতে দেবে না, শুধু আমার মায়ের জন্যে, —আপনারা মনে করেন, আমার বাপ আমার মাকে ধর্মসঙ্গতভাবে বিয়ে করেন নি, আমার মা বাবার রক্ষিতা মাত্র ছিলেন। কি জঘন্য ধারণা, আমি এ সব শুনে যে আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি। এই যে ঠাকুর পূজোর যোগাড়ের অধিকার আমায় দিচ্ছ না, সত্যি কথা বল দেখি ঠাকুমা, ঠাকুর কি তোমার একার, তোমারই কেবল পূজো করবার অধিকার আছে ? আমিও তো বামুন ঠাকুরমা, মা না হয় অজ্ঞাত কুলশীলাই হোন,—বাপ তো আপনারই ছেলে ছিলেন। এই মায়ের গর্ভে জন্মেছি বলে আমি সত্যিই এত ঘৃণিতা, আমায় ছুঁয়ে পুজোর যোগাড় তুমি করতে পারবে না, আবার তোমায় স্নান করতে হবে ? ঠাকুরমা, তোমার জাত এমন ঠুনকো জিনিষ নয় যে আমাদের ছোঁওয়া লাগলে তা ভেঙ্গে যাবে। ভগবান কারও একার ন'ন, তিনি সকলের ; তোমার যেমন পুজোর অধিকার আছে ঠাকুরমা,—আমারও তেমনি আছে, একটা অন্ত্যজ হাড়ী বাগ্দীরও সে অধিকার আছে। তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করে তুলছো ঠাকুরমা, আমাদের এতটা তফাতে রাখলে তোমার ঠাকুর পূজোয় কোনও ফল হবে না। তুমি নারায়ণকে ঘৃণা করে পাথরকে নারায়ণ বলে পূজো করছো।

"ওরে থাম থাম, তোর বক্তৃতে থামা বাপু ; নর নারায়ণ, পাথরের নারায়ণ,—হায় রে, কত কথাই না কালে কালে শুনতে হ'ল। তুই এতটুকু মেয়ে মেধা, তোর মুখে এ সব কথা শুনে সত্যি—গায়ে যেন বিষের জ্বালা দেয়। তুই আসবি মেধা,—না হয় আমি চলে যাই।"

তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে চলিতে মেধা বলিল, "এই তো চলছি ঠাকুরমা ; তুমি বরং পাঁচহাত তফাতে চল। তোমার যেমন শুচিতা দেখছি তাতে আমার পায়ের বাতাস লাগলেই তুমি অপবিত্রা হয়ে যাবে। দরকার নেই বাপু কাউকে কষ্ট দিয়ে, আমরা হাড়ি ডোমের অধম, আমাদের তেমনি ভাবেই থাকা ভাল।"

একটু কুণ্ঠিতা হইয়া গৌরী বলিলেন, "না ভাই, সত্যি কি আমি তাই বলি ? তবে পূজোর জিনিষটা আর খাওয়ার জিনিষটা,—কি জানিস ভাই,—আচারে লক্ষ্মী, বিচারে পণ্ডিত, সংসারে থাকতে গেলেই আচার বিচার করে চলতে হয়, কিন্তু মনে করিস নে ভাই। সমাজ এখনও তোদের নিতে চায় না, তফাৎ করে রেখেছি তাই এখনও চলছি, নচেৎ কি ভাই কেউ ছুঁতো, না আমাদের বাড়ীতে আসত, অমনি একঘরে করে রাখত। বুড়ো বয়েসে—সত্যি ভাই কেমন করে—"

অধৈর্য্য ভাবে মেধা বলিয়া উঠিল, "থাক হয়েছে ঠাকুরমা, তোমরা তোমাদের এই সমাজকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাক। যে সমাজ এমন অনুদার, এমন সঙ্কীর্ণ, সে সমাজে কেউ স্বেচ্ছায় বাস করতে চায় ? আমি এমন সমাজে বাস করতে চাই নে ঠাকুরমা আমি এমনি করে দূরেই থাকব, তোমাদের কাছেও যাব না।

অত্যন্ত রাগত ভাবেই সে দ্রুতপদে চলিল।

(৭)

"দিদি—"

বিনয় পথের ধারে দাঁড়াইয়াছিল, নিকটে একটা টগর ফুলের ডাল অবনত করিয়া একটি যুবক ফুল তুলিয়া বিনয়ের কাপড়ে দিতেছিল।

মেধা রাগভরে তাহাদের পাশ কাটাইয়া চলিল, তাহাদের দিকে তাকাইল না।

বিনয় ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "বেশ আক্কেল তোমার দিদি, আমি তোমায় ডাকলুম,—তুমি না শুনে চলে যাচ্ছো।"

মেধা থমকিয়া দাঁড়াইল, একটু হাসিয়া তাহার চোখের উপর পতিত গুচ্ছ চুলগুলা সরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "পথে দাঁড়িয়ে কি কথা শুনব ভাই, বাড়ী চল, কথা শুনব এখন। দেখছিস নে, ভিজে কাপড়ে রয়েছি।"

বিনয় বলিল, "এখন গিয়েই তো পুজোর যোগাড় করবে দিদি, চারটি ফুল নিয়ে যাও না, পূজোয় দিয়ো।"

পিছন হইতে রুদ্ধকণ্ঠে গৌরী দেবী বলিয়া উঠিলেন,

"মিথ্যে বকিস নে বিনয়, তোর দিদিকে কখনও দেখেছিস পুজোর যোগাড় করতে ?"

থতমত খাইয়া বিনয় বলিল, "না দিদিকে কই তুমি করতে দাও ঠাকুর মা ? তা তুমিই নিয়ে যাও না, দেখ কি সুন্দর টাটকা ফুলগুলো।"

ঠাকুর মা তেমনি সুরেই বলিলেন, "হ্যা, আমার তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই তাই নারায়ণের পুজোর জন্যে তোদের ওই বাসী কাপড়ের—যে সে হাতে তোলা ফুল নিয়ে যাব। ওই ফুলে কখনও পুজো হয়—?"

যুবকটি অগ্রসর হইয়া আসিল, হাসিমুখে বলিল, "কেন দিদি মা, এ ফুল দিয়ে কেন পুজো হতে পারে না ? জগতের যাবৎ জিনিসই তো তাঁর পুজোর জন্যে সৃজিত, ফুল ও তাঁর জন্যে, এর মধ্যে পবিত্রতাই রয়েছে, অপবিত্রতা এতে পাচ্ছ কোথায় ? তোমাদের সবই বাড়াবাড়ি কিন্তু, ফুল যেমন তেমন ভাবে তোলা হোক না কেন, নারায়ণ সবই নেন।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া গৌরীদেবী বলিলেন, "ওই সব তোদের এক কথা। কেউ চায় এখন পুজোর যোগাড় করতে কেউ চায় যেমন তেমন হাতে পুজোর ফুল তুলে দিতে। বাসী কাপড়ে ফুলগুলো তুলে নষ্ট না করে চান করে তুললেই নারায়ণের পুজোর লাগত।"

প্রতুল চিন্তিতমুখে বলিল, "পুজোর যোগাড় কে করতে চাচ্ছে তা তো বুঝতে পারলুম না।"

বিনয় বলিয়া উঠিল, "দিদি আর জ্যেঠাইমা। ঠাকুর মা ওঁদের পুজোর ঘরে যেতে দেন না, রান্নাঘরে যেতে দেন না, পুজোর যোগাড় করতে দেন না—"

প্রতুল মেধার পানে তাকাইল, দুঃখিতকণ্ঠে বলিল, "ওঁদের অপরাধ কি এতই গুরুতর দিদিমা ? বাস্তবিক, আমি জানতুম না আমাদের দেশে—আমাদের সমাজে এত সঙ্কীর্ণতা, এতখানি গলদ আছে। বরেন মামার অপরাধ—তিনি তোমাদের না জানিয়ে বিয়ে করেছিলেন, এর জন্যে তোমরাই ছেলের ওপর রাগ করে দেশে প্রচার করলে—বরেন মামা অজ্ঞাত কুলশীলা একটি মেয়েকে বরণ করে নিয়েছেন। আজ এই মেয়েটি মার সঙ্গে এখানে এসে রয়েছে, তোমরা নিজেরা যদি এদের তুলে নিতে, সমাজ এরকম ভাবে শুধু এদেরকেই নির্য্যাতিত করতে পারত না। যদি ওদিক দিয়ে না দেখে—অন্ততঃ মানুষ হিসাবেও এদের দেখতে পারতে দিদিমা, ঘৃণা করে এতখানি দূরে এদের কখনই রাখতে পারতে না, কেননা তোমার মধ্যে যে ভগবান বিরাজ করছেন, এদের মধ্যেও সেই ভগবান বিরাজ করছেন। আধার ভেদে এত দ্বিধা কেন ? যে সূর্য্যের আলো গঙ্গাজলে পড়ে, সেই সূর্য্যের আলো নর্দ্দামার অপরিষ্কার, অপবিত্র জলেও পড়ে ; যে বৃষ্টি গঙ্গার জল বাড়ায়, সেই বৃষ্টি কূপের জলও বাড়ায়। জিনিষ তো একই দিদিমা, আধার ভেদে ঘৃণা করবার মত এর মধ্যে কিছুই তো নেই। তুমি যেখান হতে এসেছ, একজন অন্ত্যজও সেখান হতে এসেছে, আবার তুমিও যেখানে যাবে, সেও সেখানে যাবে। দু'দিনের জন্যে সংসারে এসে এই স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার, তোমারই মত আর একজনকে একেবারে হেয় করে অনেক দূরে তাকে সরিয়ে রাখা, তাই কি করা উচিত ? এ দেশের সমাজ এমনি করেই না দিন দিন অবনতির পথে আরও এগিয়ে গেছে, এইসব সংস্কার গুলো এ দেশের সমাজের বুকে বদ্ধমূল থেকে গেছে। আজ যদি তুমি এই সংস্কার ত্যাগ করে একজন ঘৃণ্য অন্ত্যজকে তোমার পাশে টেনে নাও, লোকে তোমায় নিন্দা করবে, কিন্তু সে নিন্দার ভয়ে তুমি মিথ্যে নিয়েই ভুলে থাকবে, সত্যকে বরণ করতে পারবে না ? এ নিন্দে তোমার বেশীদিন থাকবে না, দু'দিন বাদে দেখবে—আর একজন তোমার দৃষ্টান্ত নিয়েছে, তার দেখাদেখি আরও দশজন নেবে, এমনি করে আমাদের দেশের এই সমাজের বুক হতে এই সংস্কারগুলো উঠে যাবে।"

অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া প্রতুলের মুখের কাছে হাত মাথা নাড়িয়া গৌরী দেবী কাংস্যকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যা, সব উঠে যাক, হিন্দু ধর্ম্মটা চুলোয় যাক, তোর ওই খৃষ্টানধর্ম্মটা সংসারে সবাই নিক, তাই তো ?"

প্রতুল হাসিয়া উঠিল, "তুমি বড্ড রেগে উঠেছ দিদিমা, নাঃ, তোমায় আর বেশী রাগাব না। তুমি বাড়ী যাও দিদিমা ; আমি আর একদিন তোমায় অনেক কথা শুনিয়ে আসব তোমার বাড়ীতে গিয়ে,—যাতে তুমি—"

বাধা দিয়া তীব্রস্বরে গৌরী দেবী বলিলেন, দরকার নেই বাপু, আমি তোমার ও ধর্ম্মের উপদেশ শুনতে চাই নে।

যা আমার আছে এই আমার ভাল, নতুন করে ধর্ম নিতে আমি চাই নে। আচ্ছা মেধা, তুই বাপু হাঁ করে তাকিয়ে কি শুনছিস বল দেখি? এতক্ষণ বাড়ী গেলেই তো হতো; এ সব কথা আবার মানুষে শোনে? ছ্যাঃ ছ্যাঃ, প্রতুল দেশের জাতধর্ম আর রাখতে দেবে না, সব মাটি করবে দেখছি।"

বাস্তবিক মেধা বিস্ময়ে এই ছেলেটির পানে তাকাইয়া ছিল, তাহার কথা শুনিতেছিল। এ দেশে বুঝি সে এই প্রকৃত একটি মানুষ দেখিতে পাইল—যে তাহাদের—শুধু তাহাদের কেন,—পতিত, অন্ত্যজ কাহাকেও ঘৃণা করে না, মানব ধর্ম পালন করা যাহার ধর্ম, এবং সেইজন্যই যে সকলকেই কাছে টানিয়া লইতে চায়।

গৌরী দেবীর কথায় সে চমকাইয়া উঠিল, তখনই বুঝি তাহার মনে পড়িয়া গেল অপরিচিত এক যুবকের সম্মুখে এরূপ সিক্তবস্ত্রে দাঁড়ানো সম্পূর্ণ ভদ্রতা বিরুদ্ধ।

মুখখানা তাহার লাল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া পড়িল, আর পিছন ফিরিয়াও চাহিল না।

(৮)

সাবিত্রী ও মেধার সহিত প্রতুলের শীঘ্রই আলাপ হইয়া গেল। শুধু এখানেই নয়, যেখানে ঘৃণা উপেক্ষা, সেইখানেই এই ছেলেটি ঘৃণিত, উপেক্ষিতের পক্ষে দাঁড়াইত, ইহাতে সমস্ত সংসার তাহাকে যতই কেননা উপহাস করুক তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপও করিত না।

এই সরল ও উদারমনা ছেলেটিকে সমাজ একটু দূরে রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে নিজে হইতে জোর করিয়া এই সমাজের কোলের মধ্যে তাহার নিজের স্থান গড়িয়া লইল। দেশের জনসাধারণ তাহাকে একটু দূরে রাখিয়া বরাবরই চলিতেছিল, কেবল যখন নিতান্ত আবশ্যক পড়িত তখন উপকারের জন্য তাহাকে কাছে লইত। যেখানে অভাব, অভিযোগ, অত্যাচার, ছেলেটি সেইখানে গিয়া অটল ভাবে দাঁড়াইত। অত্যাচারীর শাস্তি দিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিত, অভিযোগের প্রাণপণ যত্নে প্রতীকার করিত, অভাব অনেকের মোচন করিত। তাহার অর্থের অভাব ছিল না, পিতা যে প্রচুর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন একমাত্র সেই তাহার অধিকারী ছিল। দেশের লোক সামাজিক হিসাবে তাহাকে দূরে রাখিলেও তাহার কার্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিত না কেননা তাহাকে অনেক সময় অনেক উপকারে পাওয়া যাইত। দেশকে সকল প্রকারে উন্নত করিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিত কিন্তু দেশবাসীর উপেক্ষার ফলে তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যাইত; তথাপি সে আশা ছাড়ে নাই, দেশের কুসংস্কার দূর করিবার জন্য সে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছিল, যথেষ্ট অর্থব্যয়ও করিতেছিল। একান্ত একাগ্রতায় সে দেশের কুসংস্কার গুলিকে একে একে নাড়া দিতেছিল, দুর্ভাগ্য তাহার কথা শুনা অপেক্ষা—আবশ্যকের সময় অর্থ গ্রহণ করিতে সকলেই উৎসুক ছিল।

বাল্য হইতে সে কলিকাতাতেই ছিল, পল্লীগ্রামের সহিত তাহার মোটেই সম্পর্ক ছিল না। যখন দেশের নেতাগণ বাঙলার পল্লী সংস্কারের উপদেশ দিলেন সে উপদেশ তাহারও কর্ণ ভেদ করিয়া মরমে পৌছিয়াছিল, সে এই ব্রত গ্রহণ করিল এবং এম, এ, পড়া ছাড়িয়া দিয়া মাকে লইয়া দেশে আসিল।

দেশের অবস্থা এবং দেশবাসীর প্রকৃতি করুণাময়ী বেশ জানিতেন কারণ তিনি বহুকাল দেশে বাস করিয়া গিয়াছেন। প্রতুলকে বাধা দিবার অনেক চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। প্রতুল দৃঢ়পণ করিয়াছিল দেশকে সে উন্নত করিবেই,—ইহার জন্য সে সমস্ত জীবন পরিশ্রম করিবে, যদি দুইজনকেও সে মানুষ করিতে পারে তাহাই করিবে, সেই কথাই মাকে সে বুঝাইয়া বলিল, মা চুপ করিয়া গেলেন। তিনি বেশ জানিতেন প্রতুল কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না, তাহাকে অবশেষে হার মানিয়া কলিকাতাতেই ফিরিতে হইবে।

এই উদারচেতা যুবকটিকে খুব কাছে পাইয়া সাবিত্রী বাঁচিয়া গেলেন, তাঁহার কথা কহিবার মত একটি লোক হইল। আজ কতদিন তিনি এখানে আসিয়াছেন, গ্রামের অনেকেই বেড়াইতে আসিয়াছে, সকলেই দূরে দূরে রহিয়া গেছে, কেহই কাছে আসে নাই, ধরা দেয় নাই। লোকে তাঁহাকে ও মেধাকে কি ভাবে, কেন এতদূরে রহিয়া যায় তাহা তিনি মোটে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন না।

মেধা তবু জোর করিয়া ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা'র নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য স্নেহটা আদায় করিয়া লয়, তিনি যে তাহাতেও অসমর্থা ; তাঁহার যেন কোন একটা বিষয়ে জোর করার মত কথা বা শক্তি কিছুই ছিল না। শাশুড়ী সেদিন কি একটা কথায় পুত্রবধূকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছিলেন, "কে জানে, বরেন ওকে বিয়ে করেছিল কি না ? যে বিয়েতে গাঁয়ের কেউ সাক্ষী রইল না, কেউ জানতে পারলে না, সে বিয়ে নাকি আবার বিয়ে ? খেয়ালের বশে একটা কাজ করে ফেলেছিল, তার শাস্তি সেই ভুগে গেছে, নিজের জাত-জন্ম সব হারিয়েছিল, আমরা কেন তার জের টেনে চলি বাছা ? পরকালে সাক্ষী তো দিতে হবে, শুধু ইহকাল নিয়েই তো কাজ নয়।"

সাবিত্রীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গিয়াছিল, তথাপি তিনি নীরবে সহিয়া গেলেন, একটা প্রতিবাদ পর্য্যন্ত করিলেন না। মুখে তাঁহার কথা ফুটে নাই। কিন্তু অন্তরে তখন হাহাকার পড়িয়া গিয়াছিল। অন্তর্য্যামী নারায়ণ, তুমি তো সাক্ষী ছিলে তখন, সে কথা আজ তুমিই প্রকাশ করিয়া দাও প্রভু।

সেদিন প্রতুল মহা আনন্দে একটা নূতন সংবাদ লইয়া আসিয়াছিল। তাহার এক উদারনীতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বন্ধু এক কায়স্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, প্রতুল আনন্দে তাই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ধীরভাবে মাথা নাড়িয়া সাবিত্রী বলিলেন, "কিন্তু আমার মনে হচ্ছে প্রতুল, এতে বিশেষ কোন শুভফল হবে না।"

উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া প্রতুল বলিল, "কেন হবে না ? তুমি যদি প্রাচীন কালের ইতিহাস জানতে চাও মামীমা—জানতে পারবে সে যুগে এরকম বিয়ে প্রচলিত ছিল, আর সেই স্ত্রী পুরুষ সমাজেও গৃহিত হতো, আজকালকার দিনের মত সমাজত্যক্ত হয়ে একপাশে পড়ে থেকে ঘৃণ্যভাবে জীবন যাপন করত না।"

সাবিত্রী পূর্ব্ববৎ শান্তস্বরেই বলিলেন, "প্রাচীন যুগের ইতিহাস আমিও কতক কতক পড়েছি বাবা, তাতে আমিও একটু জেনেছি। হয়তো সে যুগে এরকম বিয়ের নিয়ম প্রচলিত ছিল কাজেই চলত ;—এখন যেমন অনেক সংস্কার প্রচলিত আছে, আমরা অনেকে দোষ জেনেও সেগুলোকে ছাড়তে পারি নে, তেমনি এ রকম বিয়ে খারাপ জেনেও হয়তো নিয়মানুসারে চালাতেই হ'ত। তারপর হয়তো কোন সময় সমাজের এইসব গলদ খুব বেশী রকম বেড়ে পড়েছিল বলেই সেকালের বিজ্ঞেরা এরকম বিয়ে বন্ধ করে সীমাবদ্ধ প্রণালী সৃষ্টি করেন, যেমন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকে বিয়ে করতে হবে, কায়স্থের কায়স্থকে বিয়ে করতে হবে।"

তিনি থামিতে না থামিতে প্রতুল বলিল, "ওইখানটায় তুমি মস্ত ভুল করে বসেছ মামীমা। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণকেই বিয়ে করতে হবে, শূদ্রের শূদ্রকে বিয়ে করতে হবে,—এ নিয়ম যিনি বেঁধে দিয়ে গেছেন তিনি মস্ত বড় একটা ভুল করে গেছেন উত্তরকালে সমাজ—তথাকথিত আমরা সেই ভুলের বোঝা ঘাড়ে করে বয়ে বেড়াচ্ছি। নিজের কথাটা একবার ভেবে দেখেছ কি মামীমা,—এই ব্যাপারটার সঙ্গে তোমারও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তা জানছ ? সমাজ এককালে ছিল যখন সকলের মত নিয়ে, সকলের প্রাণের দিকে তাকিয়ে এ কাজ করত আর সেই কাজের ফলে এ সমাজ বিস্তৃতিলাভও করত। আজ সেই সমাজ কিসে পরিণত হয়েছে ভাব দেখি, এর মধ্যে প্রকৃত প্রাণ আজ আছে কি ? সেকালের দিনের সঙ্গে আজকার এই দিন মিলিয়ে দেখ,—বল দেখি আমরা এত কড়া সমাজের শাসনে বাস করে সেদিনের সমাজে আছি না উন্নত হয়েছি অথবা একেবারে অধঃপতনের পথে নেমে চলেছি। শুধু বিয়ের ব্যাপারটাকে আমি ধরছি নে, প্রত্যেক বিষয়ে আমি দৃষ্টি রাখছি, দেখছি সেই বিস্তৃত সমাজ আপনার চারিদিকে জাল পেতে সেই জালে নিজে পড়েছে, যাতে তার মুক্তিলাভই দুষ্কর। এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, সেকালে যেটা হয়তো একটা কোন কাজে এসেছিল—সেটা এখনকার দিকে ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এই দেশে আগে এমন বিয়ে ঢের হয়ে গেছে, নইলে শুক্রাচার্য্যের মেয়ে দেবযানী কখনও যযাতির স্ত্রী হতে পারতেন না, সত্যভামা কৃষ্ণের স্ত্রী হতে পারতেন না। সে যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা এদিকে তাকিয়েও দেখতে পাই মধ্যবর্ত্তী যুগে অনেক হিন্দু মুসলমানকেও বিয়ে করেছেন, খৃষ্টানকে বিয়ে করেও হিন্দু নামে পরিচয় দিয়ে গেছেন। বিয়ে সমাজের প্রধান

অর্থ, একে এমন করে বিকৃত করে ফেলা হয়েছে—এও আমাদের সমাজের অবনতির একটা শ্রেষ্ঠ কারণ। এই বিয়ের ফলে দুইটি জীবন গড়ে ওঠে, তাহাই আবার কতকগুলি সন্তানের বাপ মা হয়, যে সন্তানেরা সবাই এক এক সংসারের কর্ত্তা বা কর্ত্রী হবে, তারাই এক একটী বংশের আদিপুরুষ হবে। এই সব সন্তানেরা বাপ মায়ের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়। আমাদের দেশে আদি যুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ সন্তান, যারা সকল বাধাবিঘ্ন অক্লেশে দলে যেতে পারে, আজ সেই দেশে—সেই সমাজে দেখছি দুর্ব্বল ক্ষীণকায় সন্তানের দল যাদের যে দিকে টানবে সেই দিকেই আছে; যারা মরার মত পড়ে থেকেও ক্ষীণকণ্ঠে বলে—আমরা বেঁচে আছি, আমরা মরি নি এদের দ্বারা সমাজে ক্ষত উৎপন্নই হচ্ছে মাত্র, সেই ক্ষত বিশাক্ত হয়ে উঠে সেই বিষে সারা দেশ—সারা সমাজ জ্বলিয়ে দিচ্ছে। এরা—নিজের ইচ্ছানুযায়ী সংস্কার এনে এই মৃতপ্রায় সমাজের গলায় মালার মত পরিয়ে দিচ্ছে, তার গন্ধ তার স্পর্শ যতই লজ্জাজনক হোক, সমাজকে তা মানতেই হবে। একটা কোন কাজে জোর করে এগিয়ে যাওয়ার সাহস আমাদের নেই,—বলের অভাব, কাজেই জেনে শুনেও এই নূতন গাথা সংস্কার আমাদের মেনে চলতেই হবে—নইলে এ সমাজ আমাদের গ্রাহ্য করবে না।

সাবিত্রী স্তব্ধভাবে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, সে থামিয়া গিয়া খানিক চুপ করিয়া রহিল, সাবিত্রী বলিলেন, "কথা গুলো ঠিকই বলছো বাবা, কিন্তু এই সংস্কার ত্যাগ করবার সাহস এ দেশের লোকের যে নেই।"

প্রতুল উত্তর দিল," নেই, সে কথা সত্য মামিমা। একটা কথা আছে— আত্মহত্যা মহাপাপ, এ দেশের লোক আত্মহত্যাকারীকে ঘৃণা করে। এই সংস্কার দোষে এ সমাজ আত্মহত্যা করছে, সমাজের মধ্যে যাঁরা যথার্থ শিক্ষিত তাঁদের কি উচিত নয়, বুঝিয়ে—তাতেও যদি না হয় জোর করে এ সমাজকে তার ভুলপথ হতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা? আমরা কেন দিন দিন অধঃপাতে যাচ্ছি এ খোঁজ করলে দেখা যাবে শক্তির অভাব, আর সেই শক্তি আমরা মায়ের বোনের, স্ত্রীর কাছ হতে পাই, মায়ের শক্তি নেই বলে সন্তান শক্তি হীন হয়, মায়ের বুকের দুধের সঙ্গে সে শক্তি সন্তানের মুখে পড়ে না। ছোটবেলা হতে সন্তানকে এইসব মায়েরা অতি সন্তর্পণে রাখেন তাদের নিজেদের পায়ে নির্ভর করতে দেন না, এতে সন্তানেরা কখনই আত্ম-নির্ভর শেখে না। এমনি করে আমরা একেবারেই পরাধীন হয়ে পড়েছি, সব তাইতেই কারও ওপর নির্ভর করতে চাই, নিজের যোগ্যতাকে বিশ্বাস করি নে। মামা আপনাকে যথার্থই বিয়ে করেছিলেন, অথচ দেখতেই পাচ্ছেন, কেউ আপনি যথার্থ যা' তা মানতে চাচ্ছেনা। আপনি দেখতে পাচ্ছেন সমাজের দারুণ অবনতি না হলে এ রকম ঘটতে পারত না। আমরা নতুন যুগের মানুষ, নতুন যুগের বার্ত্তা সকলের কানে দেব, সকলের প্রাণে ধাক্কা দেব, সকলের মধ্যে সত্য চেতনা জাগাবার চেষ্টা প্রাণপনে করব। আমরা সমাজের প্রধান জিনিস বিয়ে ব্যাপারটা প্রত্যেক জাতির সঙ্গে চালাবার চেষ্টা করব, প্রত্যেক জাতির সঙ্গে আদান প্রদান চালাব যেমন একদিন প্রাচীন যুগে চলতো। হিন্দু একটা জাতি, এর মধ্যে শ্রেণী অনেক আছে, সকলেই যদি নিজেদের মধ্যে স্বতন্ত্র করে এক একটা সমাজ তৈরী করে, সে সমাজে অন্য সমাজের কারও প্রবেশাধিকার না থাকে, কুসংস্কারের কাঁটাবেড়া দিয়ে আষ্ঠে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখা হয়, হিন্দুর মূল সমাজটা দাঁড়াবে কি করে? ছোট ছোট শাখা সমাজ একটাও কোনকালে প্রসিদ্ধ লাভ করতে পারেনি, কখনও করতে পারবেও না, কারণ এই সব সমাজের মধ্যে একতা নেই, কেউ কারও ভাল সইতে পারে না। কিন্তু এই সব সমাজ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এক হয়ে যদি দাঁড়ায় সমাজ বলতে একই হিন্দু সমাজ নামে পরিচিত হয়, তবে এ দাঁড়াতে পারবে উন্নতির আশাও হবে। ইংরাজ একটা জাতি, ফরাসী একটা জাতি, জার্মান একটা জাতি, এরা একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত হিন্দু সমাজের মত তিল হ'তে তিলে পরিণত হয় নি, তাই এরা জগতের ইতিহাসে চির বরেণ্যই থাকবে। হিন্দুর এই নিজের হাতে গড়া হাজার হাজার সমাজের মধ্যে একটাকে পদদলিত করলে অন্য সমাজের বুকে ব্যথা জেগে ওঠে না, বরং আমার মনে হয়, অন্য সমাজগুলি তাতে বর্ব্বরোচিত আনন্দই উপভোগ করে। আমরা এই টুকরো টুকরো ছোট বড় সকল সমাজকে একটা বাঁধনে বেঁধে ফেলতে চাই, একটা

বিরাট সমাজ প্রাচীন যুগের আদর্শানুযায়ী গড়ে তুলতে চাই। আমাদের একাগ্রতা থাকলে এ শুভ কাজে ভগবানের আশীর্বাদ আমরা নিশ্চয়ই পাব, আমাদের অধ্যবসায়ের ফলে হিন্দু একটা জাতি নামেই বিখ্যাত হবে, সমাজ বলতে একটাকেই বুঝাবে।"

ক্ষুব্ধভাবে হাসিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "আমার মনে হয় বাবা—এ তোমাদের মত তরুণদের কল্পনা মাত্র। প্রাচীন যুগের কথা আমরা তুলি, তার প্রশংসাও করি কিন্তু সে যুগের আদর্শ আমরা নিতে পারছি কই ? তোমার চেষ্টা তো ব্যর্থই হয়ে যাচ্ছে, একটা লোকের সহানুভূতি তো তুমি পাও নি, পাচ্ছো কেবল নিন্দে। ওতে কি বরাবর তোমার মনের এই দৃঢ়তা বজায় থাকতে পারবে ?"

প্রতুল দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "পারবে বই কি মামীমা, এ যে আমার প্রতিজ্ঞা, আমার ব্রত, এ ব্রত যদি সফল না করতে পারি, তবে জানব আমি মিথ্যেই মানুষ হয়ে জন্মেছি।"

সাবিত্রী বলিলেন, "মানুষ হওয়ার সময়, কার্য্যক্ষেত্রই বা তুমি পাচ্ছো কোথায় ? প্রতুল দেশের লোকে তোমায় স্পষ্টই ব্রাহ্ম খৃষ্টান বলছে শুনতে পাচ্ছি।"

প্রতুল হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তা বলুক না মামীমা লোকে যে যা বলে শান্তি পায় তাই বলুক। আমি জোর করে ওঁদেরই জানাব—আমি ওদেরই মত হিন্দু, তবে সে রকম প্রকৃতির নই যে, যা পূর্ব্বাপর হয় তো একটা ভুল ধারণা বশে চলছে আমিও সেটা বিনা বিচারে—বিনা প্রমাণে অমনি সত্য বলে জেনে নেব। আমরা যা করব তা বিচার করে দেখে, প্রমান পেয়ে। আপনি কি মনে করেন মামীমা,—আমি এ দেশের কারও স্বরূপ পরিচয় পাই নি ? দেশের মেয়েরা এত সঙ্কীর্ণ হৃদয়া,—কেউ যদি আমাদের বাড়ী বেড়াতে আসেন বাড়ী গিয়ে কাপড় কেচে ফেলেন। মেয়েদের কাছ হতে পুরুষেরা এই সব শিক্ষা করেন। আমি যদি বিশেষ দরকারে কারও বাড়ী যাই, প্রায়ই ঘরে কেউ আমায় ঠাঁই দেন না, বাইরে বাইরেই দরকারটা মিটে যায়। কিন্তু মনে করবেন না মামীমা—চিরকাল এদের এই ভাবটা বজায় থাকবে, জগৎ যখন পরিবর্ত্তনশীল—মানুষের মনের ভাবটাই বা কেন বদলে যাবে না ? আমার এই সাধনার ফল একদিন ফলবেই, দেশের লোকের চৈতন্য একদিন ফিরে আসবে, তখন এরা বুঝবে ভগবানের রাজ্যে—ভগবানের সৃষ্ট জীবের মধ্যে কেউ ঘৃণ্য নয়,—কেউ অস্পৃশ্য নয়।"

মেধা চিন্তিতমুখে বলিল, "এরা যদি কখনও নিজেদের সংস্কার না ত্যাগ করে, তবে আপনি কি করবেন ?"

প্রতুল একটু হাসিল, সম্মুখে কাপড় শুখাইতে দিবার যে বাঁশের আলনাটা ছিল, তাহার পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখ মেধা, তুমি ছেলেমানুষ হলেও বেশ বুঝতে পারবে ওই যে বাঁশটা মাটিতে পোতা আছে সেটাকে একবার ধরে টানলেই সে উঠবে না, তাকে বার বার নাড়তে নাড়তে ওর গোড়া আলগা হলে সে উঠবে। আমরাও দেশের বদ্ধমূল সংস্কারের গোড়ায় এমনি করে ধাক্কার পর ধাক্কা দিয়ে চলব—যাতে এর দৃঢ় বদ্ধমূল শিথিল হয়ে যায়, তারপর ভবিষ্যতে কেউ একে উপড়িয়ে ফেলতে পারবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে।"

সে দিন প্রতুল অনেকগুলি কথা বলিয়াছিল যাহা মেধাকে সারাদিন অত্যন্ত অন্যমনস্ক করিয়া রাখিয়াছিল।

তাহার চিন্তিত মুখখানার পানে তাকাইয়া সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই আজ এত কি ভাবছিস মেধা ?"

মেধা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা মা, প্রতুলদা যে রকম ভাবে দেশের সেবা করবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন ওরকম ভাবে আর কেউ করতে পারে না ?"

সাবিত্রী বলিলেন, "পারবে না কেন মা, ইচ্ছা থাকলেই পারে। এই তো যথার্থ কাজ, আর এতে যদি দু'জন মানুষেরও চেতনা হয় তাও যে যথেষ্ট, এরপর ওই দু'জনের দেখাদেখি আর দশজনের চেতনা ফিরবে। তবে মন তো সবার সমান নয় মা, প্রতুলের মত মহৎ, উদার মন আর কয়টি ছেলের আছে তা বল। অমনি করে সকল বাধা, বিঘ্ন, লজ্জা, ভয় ত্যাগ করার মত শক্তি থাকা চাই, সাহস করা চাই তবে—"

বাধা দিয়া মেধা বলিয়া উঠিল, "আমার যদি সে শক্তি থাকে মা,—সে সাহস যদি হয় তবে আমিও তো যেতে পারি মা।"

মা স্তব্ধভাবে খানিক তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন,—"তুই দেশের কাজ করবি মেধা ?"

মেধা শান্তস্বরে বলিল, "কেন, প্রতুলদা যেতে পারে আমি যেতে পারব না ?"

সাবিত্রী বলিলেন, "সে পুরুষ আর তুই মেয়ে সেটা মনে ভেবেছিস কি ?"

মেধা প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "অমনি করেই তো আমাদের তোমরা নির্জ্জীব করে রাখো মা। পুরুষের সেবার অধিকার আছে, আমার নেই একথা বললে আমি শুনব কেন মা, কেননা সেবার কাজ আমাদেরই, পুরুষের তো নেই। দেশ মাতৃকার পূজা শুধু একজনের দ্বারায় তো হবে না মা, মেয়েরা ভিন্ন সে পূজোর যোগাড় করে দেবে কে, তবে তো পুরুষ পূজো করবে ? তুমি একটু ভেবে দেখো মা, তা হলে নিশ্চয়ই আমায় অনুমতি দেবে।"

সাবিত্রী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন, কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহার ললাটোপরি পতিত অলকগুচ্ছ সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, "আমি এতে আন্তরিক অনুমোদন করছি মা, তোকে এমনি একটা কাজে প্রেরণা দিতে আমি দিনরাত ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি। কিন্তু মা—তোর ঠাকুরদা, ঠাকুরমা কখনই এ প্রস্তাবে মত দেবেন না।"

মেধা বড় দুঃখেই হাসিয়া ফেলিল, "কিসে তাঁরা অনুমতি দিয়েছেন তাই আগে বল মা, তারপর এ কাজে আমার যেতে দেওয়ার কথা পরে হবে। তাঁরা তাঁদের রান্নাঘরে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, পূজোর ঘরে যাওয়ার— কিম্বা পূজোর ফুল তুলে দেবার অনুমতি তুমি কি পেয়েছ ? তাঁরা ঘরে আমাদের সকল হতে দূরে রাখবেন, বাইরেও কাজ করতে দেবেন না। বাঃ, তবে কি আমরা এমনিই অচল পাথরের মত পড়ে থাকব নাকি ? আমি আজই ঠাকুরদাকে বলব, তিনি এর একটা কিছু ব্যবস্থা করুন, নইলে আমি নিজেই একটা কিছু করে বসব।"

ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া সে ঠাকুরদার সন্ধানে গেল।

(৭)

দু' চারদিন থাকিতে থাকিতে পাশের বাড়ীর বধূটির সহিত মেধার বেশ আলাপ হইয়া গিয়াছিল।

এই বাংলারই সে একটি নির্য্যাতিতা বধূ; বাস্তবিকই তাহাকে বড় উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত। মেধার শয়ন কক্ষের পার্শ্বেই বধূটির শয়ন কক্ষ থাকায় তাহার অনেক কথা মেধার অজ্ঞাতে কানে আসিয়া পৌছাইত। অত্যাচারীতা মেয়েটি কোনদিনই মুখ ফুটিয়া নিজের কথা না জানাইলেও মেধা তাহার সব কথাই জানিয়াছিল।

উভয়ের মধ্যে প্রথম আলাপ হইয়াছিল—জানালার পাশ হইতে, তেমনি আলাপ আজও চলিতেছিল, এ পর্য্যন্ত কেহ কাহারও সান্নিধ্য লাভ করে নাই। অপর্ণা বধূ বলিয়া তাহার বাড়ীর বাহির হওয়ার অধিকার ছিল না, সে মেধাকে কয়দিন ডাকিয়াছিল কিন্তু তাহার শাশুড়ী নাকি অত্যন্ত শুচিবায়ুগ্রস্তা এবং সাবিত্রীও মেধাকে নিতান্ত অবহেলার চোখে দেখিতেন বলিয়া সাবিত্রী মেধাকে যাইবার আদেশ দেন নাই।

শাশুড়ির ভয়ে অপর্ণা সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা থাকিত, ইহার উপর তাহার স্বামী ছিল অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির লোক, তাহার পান হইতে চুণ খসিবার যো ছিল না। সামান্য এতটুকু ত্রুটিতে বাড়ীতে হুলুস্থুল কাণ্ড পড়িয়া যাইত, বধূটিকে প্রচুর লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। দরিদ্র পিতামাতার কন্যা ছিল সে; পিতামাতা যথারীতি জামাতার সমাদর করিতে পারেন নাই, উপযুক্ত তত্ত্ব করিতে পারেন নাই, এই অপরাধে শাশুড়ী নবম বর্ষীয়া বালিকা বধূটিকে সেই হইতে এই এগার বৎসর আটক করিয়া রাখিয়াছেন।

একটি নারীকে যাহারা এতটুকু সময় হইতে পিতামাতা আত্মীয় স্বজনের স্নেহক্রোড় হইতে বঞ্চিতা করিয়া এ পর্য্যন্ত এই কঠোর শাসনের নীচে রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কথা ভাবিতে মেধার রক্ত গরম হইয়া উঠিত। এরূপ নির্য্যাতন চলে এই অধঃপতিত বাংলাদেশে, আর কোনও দেশে নারীর উপর এরূপ অত্যাচার চলে না। সকল দেশের মেয়েদের মুখ ফুটিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগ জানাইবার অধিকার আছে, বাংলার মেয়ের তাহা নাই। এ দেশবাসী এ দেশের

মেয়েদের চিরকাল অবহেলার চোখেই দেখিয়া আসিতেছেন, এ দেশের মেয়েদের সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে দেশবাসী সম্পূর্ণ উদাসীন। এ দেশের মেয়েদের সমাজ, ধর্ম, নীতি প্রভৃতির দারুণ পেষণে নিয়ত নিষ্পেষিত করা হয়; তাহাদের একটা নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগটুকু পর্য্যন্ত দেওয়া হয় না। এ দেশের লোকের ধারণা মেয়েরা শুধু সংসারে কাজ করিবার জন্ম আসিয়াছে, বংশ-ধরের জন্যই স্ত্রীর প্রয়োজন, সেইজন্ত তাহার দিকে দেশের লোক তাকাইবার আবশ্যকতা বোধ করে না। পতিত দেশের পুরুষ চায় আত্মসুখ, নারীর কষ্টের পানে তাকাইতে তাহারা সেইজন্যই উদাসীন। মেয়েদের জন্ম যে স্থান তাহারা সৃষ্টি করিয়াছে, মেয়েদের সেই স্থানেই থাকিতে হইবে, যে কাজ তাহারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, সেই কাজগুলি নারীকে অবশ্যই করিতে হইবে।

এই মেয়েটিকে যেভাবে খাটাইয়া লওয়া হইত মেধা জানালার পাশে বসিয়া তাহা দেখিত। এই অপর্য্যাপ্ত খাটুনির মধ্যে যদি সে দুইটি মিষ্ট কথা পাইত তাহা হইলেও তাহার এ শ্রম সার্থক হইতে পারিত, তাহার চিত্তে এতটুকু সান্ত্বনা সে পাইত, কিন্তু বড় দুঃখের কথা তাহার পানে চাহিয়া একটা ভাল কথা বলিবার লোক কেহ ছিল না। বাড়ীর কাহারও অসুখ হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়াও সেবা যত্ন দ্বারা তাহাকে আরাম করিয়া তুলিতে হইত, কিন্তু তাহার অসুখ হইলে কেহ তাহাকে দেখিতে ছিল না, এক ঘটি জলও দিবার লোক ছিল না।

বাংলার বধূ-নির্য্যাতন এই একটি গৃহেই নয়, প্রায় সকল গৃহে এমন ব্যাপার চলিতেছে। শাশুড়ি ননদ প্রভৃতি বধূর পানে তাকাইতে একেবারেই উদাসীনা থাকেন, নিজেদের স্বার্থ্য-গণ্ডা পুরাইয়া লন।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই মেয়েটি অযত্ন ব্যাধিগ্রস্তা হইয়া পড়িয়াছিল, স্বামী ও শাশুড়ি ইহার ঔষধের ব্যবস্থা করা দূরে থাক,—একবার চোখ দিয়াও দেখেন নাই। মেয়েটির যন্ত্রণায় সাবিত্রীর হৃদয় বিগলিত হইয়া গিয়াছিল, প্রভুলের দ্বারা ঔষধ আনাইয়া অপর্ণাকে তাহা খাওয়াইয়া তিনিই তাহাকে আরাম করিয়া তোলেন, এজন্ত অপর্ণা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞা ছিল।

বধূটির স্বাস্থ্য তখনও ফিরিয়া আসে নাই, সেই সময়ে সে জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

কয়দিন দারুণ জ্বরভোগের পর একদিন যখন সে প্রকাণ্ড একটা কলসী লইয়া জল আনিতে নদীর ঘাটে গিয়াছিল তখন মেধা তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—জিজ্ঞাসা করিল, "একি, তোমার যে খুব জ্বর কালও বললে,—আজকে তবে এত বড় ঘড়া নিয়ে এতদূর নদী হতে জল নিতে এসেছ যে?"

মলিন হাসিয়া অপর্ণা বলিল, "আর কে জল তুলবে ভাই? সংসারে আর তো কেউ নেই যে একঘড়া জল তুলে দেবে?"

মেধা এক মুহূর্ত্ত নীরব রহিল, বলিল—"তোমার শাশুড়ি?"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া অশ্রু গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া বিকৃত কণ্ঠে অপর্ণা বলিল, "তিনি ঘড়া করে জল তুলতে পারেন না; বুড়ো মানুষ, পারার তো কথাও নেই ভাই।"

ঈষৎ রুক্ষভাবে মেধা বলিল, "হ্যা, তা বুঝেছি। কিন্তু এ রকম অবস্থায় তোমারও তো জল তোলা উচিত নয় ভাই। কাউকে দুটো পয়সা দিলেই জল তুলে দিয়ে যেত।"

অপর্ণা মলিন হাসিল, মলিন চোখের দৃষ্টি মেধার মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল, "ভাই, পয়সা যে কি জিনিস তা তুমি আজও চিনতে পারো নি। আমার এই এতবড় দেহটা এমনিই থাকবে আর পয়সা দিয়ে জল কিনে নিতে হবে? লক্ষ্মী দিদিটি, আজ একবার আমাদের বাড়ী যেয়ো। আমি বেশীদিন বাঁচব না, তোমায় একবার আমাদের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমার খুব আছে, আমি বেঁচে থাকতে এইবেলা একদিন যেয়ো; অনেক নূতন জিনিষ দেখতে পাবে —যা তুমি কল্পনাতেও আনতে পারো না।"

তাহার করুণ সুরটা মেধার অন্তর স্পর্শ করিল, সে

ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "বাঁচবে না অমন কথা বলো না ভাই, ওরকম কথা মুখে আনতে নেই। আমি মাকে বলে জোর করে আজ তোমাদের বাড়ী যাব এখন। তুমি মরার কথা মুখে এনো না।"

অপর্ণা মলিন মুখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল,—"আজ তোমার মুখে প্রথম এই সমবেদনার কথা শুনতে পেয়েছি আর তোমার মায়ের সহানুভূতি! বুকটা আমার তোমাদের এই স্নেহ পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে ভাই, কিন্তু তবু বলি—আমার মরণই ভাল। শুধু আমার কেন, আমার মত অভাগিনী যারা—যাদের সব থাকতেও কিছু নেই তারা যেন বেঁচে না থাকে।"

অতিকষ্টে চোখের জল সামলাইয়া সে কলসীটা তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল, অত বড় এক কলসী পূর্ণ জল—যাহা একদিন সে অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইয়াছে, আজ তাহা কিছুতেই তুলিতে পারিল না।

মেধা আর্দ্রস্বরে বলিল, "তুমি সর, আমি কলসীটা নিয়ে তোমাদের বাড়ী দিয়ে আসছি।"

তাহার মুখখানা অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া উঠিল, অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে সে বলিল, "না না, তোমায় নিয়ে যেতে হবে না, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।"

তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া মেধা আশ্চর্য্য হইয়া গেল, "কেন ভাই, সত্যি—তোমার যতটা কষ্ট হবে আমার তার একটুও হবে না; এ কলসী আমি বেশ নিয়ে যেতে পারব।"

অপর্ণা খানিকটা চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি নিয়ে গেলেও জল আমার শাশুড়ী কি ঘরে নেবেন ভাই? তুমি জানো না—তিনি কি রকম লোক,—তিনি—"

বলিতে বলিতে বধূটি মুখখানা বাহুর মধ্যে লুকাইল।

মেধার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল, সে দুই পা পিছাইয়া আসিল; একটা নিঃশ্বাস সে কোনমতে গোপন করিতে পারিল না।

মুহূর্ত্তে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে ক্ষীণ হাসিয়া বলিল, "এর জন্যে অপদস্থ হচ্ছি, লাঞ্ছিতা হচ্ছি, কি জানি কেন—তবু ভুলে যাই।"

অপর্ণা জলভরা চোখে শুধু তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, একটা কথাও সে আর বলিতে পারিল না।

সেদিন মেধা দ্বিধায় পড়িয়া ভাবিতেছিল, অপর্ণার কাছে সে যাইবে কি না। সেদিনটা সে যাইতে পারিল না, গৃহেই রহিয়া গেল।

রাত্রে খোলা জানালা পথে পার্শ্বের গৃহের উত্তেজিত তর্জ্জন গর্জ্জন ভাসিয়া আসিতেছিল, প্রহারের শব্দও কাণে আসিল; যাহার উপরে এতটা আস্ফালন—যে প্রহার সহ্য করিল—তাহার মুখ হইতে একটা কথা—একটা শব্দও শুনা গেল না।

সাবিত্রী মেধাকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মাগো মা, বেচারা বউটিকে কি রকম করে মারছে দেখ। ভগবান ওকে রক্ষা করুন, ভগবান ওকে রক্ষা করুন। অমন জীবন কোন মেয়েরই বাঞ্ছিত নয়,—বাংলার মেয়ের দুর্ভাগ্য।"

মেধার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, মা তাহা দেখিতে পাইলেন না। গোপনে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "মা তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা,—বল, আমায় তোমার কাছ ছাড়া করবে না তো?"

সে যে কেন এ কথা বলিতেছে তাহা সাবিত্রী বেশ বুঝিতে পারিলেন; তিনি তাহার মাথায় একটা গভীর চুম্বন দিয়া গভীর স্বরে বলিলেন, "না মা, কখনও করব না। ভগবান ওকে সকল দিক হতে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, তোর দেহে বর্ম্ম আছে, এই বর্ম্মে ঠেকে সব বিপদ আপদ, সব প্রলোভন ফিরে যাবে। নিশ্চিন্ত থাক মা, তোর মায়ের বুক হতে কেউ তোকে কেড়ে নিয়ে যেতে পারবে না।"

মায়ের বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া মেধা নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইল।

(১০)

মেধাকে বাহির হইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা যাচ্ছো মেধা ?"

মেধা কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "এই—এদের বাড়ী।"

সুধা মুখখানা একটু অপ্রসন্ন করিয়া বলিল, "তোমার ওদের বাড়ী না যাওয়াই কিন্তু উচিত ছিল মেধা ; জান তো—অপর্ণার শাশুড়ী—ওই গিন্নীটি বড় কম লোক ন'ন, ওঁর ভারী শুচিরোগ আছে।"

মেধা থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল ; তাহাকে দাঁড়াইতে দেখিয়া সুধা ফিরিয়া বলিল "যাবে যাও আজ ওদের বাড়ী, কিন্তু একটু সাবধানে থেকো। ঘরে দোরে বেশী যাওয়া ভাল নয়, ওদের ঘরে জল থাকে।"

অপর্ণার তখন বড় জ্বর আসিয়াছিল, একখানা কম্বল মুড়ি দিয়া সে মেঝের একটা মাদুরের উপর পড়িয়াছিল ; শাশুড়ী পাশের ঘরে শুইয়া পড়িয়া তখন প্রাত্যহিক দিবানিদ্রা উপভোগ করিতেছিলেন।

দরজা খোলার মৃদু শব্দে তাঁহার সতর্ক নিদ্রা দূর হইয়া গেল, জড়িতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে গা ?"

"আমি, আমি মেধা।"

প্রবেশ পথে বাধা পাইয়া মেধা থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, যেন সে চুরি করিতে আসিয়াছে।

তাহার আগমনটাকে গৃহিণী মোটেই পছন্দ করিলেন না, তবে নেহাৎ নাকি অভ্যাগতা,—শাস্ত্রে আছে বাড়ী বহিয়া আসিলে তাড়ানো মহাপাপ, সেই জন্যই তিনি দারুণ বিরক্তি দমন করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া অত্যন্ত ভারিক্কিস্বরেই বলিলেন, "ঠিক দুপুর বেলা সদর দরজাটা খুলে রেখো না বাপু, ভেজিয়ে দিয়ে রাখ। কে জানে কার মনে কি আছে, কথায় বলে দিন যায় না ক্ষণ যায়। মানুষকে কখনও বিশ্বাস করতে আছে ? ছ্যাঃ—"

মেধা দরজা ভেজাইয়া দিয়া বরাবর অপর্ণার কাছে গিয়া বসিল। তাহার সাড়া পাইয়া অপর্ণা আবরণের মধ্য হইতে মুখখানা বাহির করিয়াছিল, আরক্ত স্ফীত চোখ দুটি সে বেশীক্ষণ মেলিয়া রাখিতে পারিতেছিল না। মেধা তাহার মুখ চোখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিল তাহার জ্বরের পরিমাণ আজ কত, তথাপি তাহার ললাটে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিল, "ইস, আজ যে তোমার ভয়ানক জ্বর হয়েছে ভাই।"

অপর্ণার মুখে একটু হাসির রেখা ভাসিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল, সে মুখখানা বালিশের মধ্যে গুঁজিয়া দিয়া অস্ফুটকণ্ঠে বলিল, "রোজই তো এমনি হয় ভাই, আজ জ্বরের জোর বেশী নয়।"

মেধা ব্যগ্র হইয়া উঠিয়া বলিল, "এত জ্বরে মাথাটা ধুইয়ে দিলে কি খানকত জলপটি দিলে ভাল হতো। তোমার শাশুড়িকে বলব একটু জল দিতে ?"

উৎকণ্ঠিতা অপর্ণা বলিল, "না না, ওঁকে ডাকবার কোন দরকার নেই। ওই ঘটিতে জল আছে, মাথায় দিতে হবে না, আমার মুখে একটু দাও, বড় তৃষ্ণা, বুক শুকিয়ে উঠছে।"

মেধা বলিল, "ওই নোংরা ঘটিতে বাইরের জল আছে—তাই তুমি খাবে ? খাবার জল নেই কি ?"

অপর্ণা পাশ ফিরিয়া শ্রান্তকণ্ঠে বলিল,—"যথেষ্টই আছে, কিন্তু তুমি দেবে কি করে ভাই ? সব কথা না জানতে পারো—কতক তো জানো। কাল ঘাটে গিয়ে তোমার সঙ্গে যে গল্প করেছিলুম—উনি ঘাটে যেতে তা দেখেছিলেন। নিজে যৎপরোনাস্তি অপমান তো করেই ছিলেন তারপর রাত্রে আমার স্বামী বাড়ী এলে—দশখানা করে বলে দিয়ে আমায় কি শাস্তি না দেওয়ালেন। উঃ, বুকের পাঁজর এক একখানা খসে পড়ে ভাই, কেমন করে সব কথা আমি বলি ? ভগবান আবার যদি জন্ম দাও, বাংলার মেয়ে করে যেন আমায় পাঠিয়ো না, আমায় ঘৃণিত বিষ্ঠার কীট যদি কর—সেও আমার শ্রেয়ঃ ; তবু বাংলার মেয়ে হয়ে আমি যেন না জন্মাই।"

তাহার মুদিত নেত্রকোণ বহিয়া দরদর্ ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল ; মেধা নির্ব্বাকে শুধু তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল, বেদনায় তাহার হৃদয়টা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অপর্ণা বলিল, "কিছু বলিনি ভাই, কিন্তু আর যে বুকের ভেতর এত ব্যথা চেপে রাখতে পারছি নে। তোমায় একটা কথা বলে যাই মেধা,—বিয়ে কর না। জেনে শুনে এই তিলে তিলে মরণের পথে এগিয়ে যেয়ো না, তার চেয়ে একেবারে মরো,—বিষ খেয়ো—জলে

ডুবো। অভাগিনী বাংলার মেয়ে, যন্ত্রণায় বুক ফেটে গেলে একটি কথা তবু মুখে আনতে পারবে না, কেউ শুনতেও চাইবে না, শুনলেও তোমার নিন্দে করবে। জানিনে— কোনকালে কোন মহামুনি বুঝি কোন আদর্শ স্বামীকে দেখতে পেয়েছিলেন, তাই তিনি ধারণা করেছিলেন - দুনিয়ার সকল পুরুষই দেবতা, তাই তিনি নারীকে এই দেবতার প্রতি সদা ভক্তিমতী থাকতে উপদেশ দিয়ে গেছেন। হায় রে, স্বামী দেবতা,—আজ যদি তিনি বর্ত্তমান থাকতেন— আমিই যে তাঁর সে ভুল ভেঙ্গে দিতে পারতুম মেধা।"

একটু থামিয়া রুদ্ধকণ্ঠে অপর্ণা আবার বলিল, "দেবতার দানবীয় কাজের সহস্র চিহ্ন আমার শরীরে বিদ্যমান; শুধু প্রহার নয়—ঘৃণিত ব্যায়রাম লোকে যাকে ঘৃণা করে দেবতা তা পর্য্যন্ত আমায় দিতে কার্পণ্য করেন নি। মেধা, এক সহস্রে—হ্যাঁ, এক সহস্রে একটা পুরুষ যথার্থ স্বামী হতে পেয়েছে, আর সব এমনি, এমনই আত্মসুখ পরায়ণ। নারায়ণ,—একটু জল দাও বোন, ওই কলসীতে জল আছে, ঘটিতে ঢেলে নিয়ে আমার মুখে দাও।"

মেধা কেমন থতমত খাইয়া গিয়াছিল, একটু থামিয়া বলিল, "কলসী ছোঁব ?"

অপর্ণা শান্তস্বরে বলিল, "তুমি যে এ ঘরে এসেছ এতে ও কলসী যা অপবিত্র হওয়ার তা হয়ে গেছে—তুমি ওই জল আমায় দাও, বড় তৃষ্ণা।"

মেধা তাড়াতাড়ি কলসী হইতে জল আনিয়া অপর্ণার মুখে দিল; সন্ধান করিয়া বস্ত্রখণ্ড বাহির করিয়া অপর্ণার মাথায় জলপটি দিয়া বাতাস করিতে লাগিল—অপর্ণা দুই একবার নিষেধ করিল, মেধা তাহার কথা কাণে তুলিল না। শ্রান্ত অপর্ণা শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িল।

অপর্ণার স্বামী সুরেশ আহারান্তে পাড়ায় তাস খেলিতে বাহির হইয়াছিল, এই সময়ে সে ফিরিয়া আসিল। তাহার সাড়া পাইয়া মেধা পাখাখানা রাখিয়া উঠিল, সেই সময় সুরেশের মা আসিয়া দরজার পার্শ্বে বসিলেন; তাঁহার আগমনে ভরসা পাইয়া মেধা আবার অপর্ণার পাশে বসিল।

সুরেশ গৃহে প্রবেশ করিয়াই মেধাকে দেখিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। কোনদিন মেধাকে সে সম্মুখে দেখিতে পায় নাই, সেই জন্য সে তাহাকে চিনিত না। মাতার পানে তাকাইয়া ইঙ্গিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, "মেয়েটি কে মা ?"

মা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিলেন, "ওমা, একে তুই চিনতে পারলি নে সুরেশ, এ যে আমাদের বরেনের সেই মেয়ে—যাদের নিয়ে এত গোলমাল হচ্ছে। তুই-ই তো কত কাণ্ড করলি, কত কথা বললি,—ও হরি, এদের না দেখে চিনেই সে সব করলি কি করে ?"

মেধার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল, সে নতমুখে আর একখানা পটি ভিজাইয়া অপর্ণার ললাটে সেখানা বসাইয়া দিল।

বিকৃত মুখে সুরেশ বলিল, "আঃ, ওকে আর অত যত্ন করতে হবে না গো; মেয়ে মানুষের এত সেবা ভাল নয়, ওতে ওরা বেজায় রকম আয়েষি হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত আয়েষ পেয়ে এর পর আর খেটে খেতে চাইবে না, কোন দিন পা হাত ব্যথা করলে আমাকেই না বলে টিপে দিতে।"

মা অন্ধকারপূর্ণ মুখে বলিলেন, "এ কথা ঠিকই বলেছিস সুরেশ। একবার আয়েষ পেলে আর কি কষ্ট করতে চাইবে? সামান্য একটু পা হাত ব্যথা করলেই অমনি শুয়ে পড়বে, তখন ওর সেবা করবে কে ?

মেধা শান্ত অথচ মৃদুকণ্ঠে বলিল, "সেবা তো আমি কিছুই করছি নে। জ্বরটা বড্ড বেশী এসেছে বলেই মাথায় জলপটি দিচ্ছি, এতে উপকার দেবে এখন, জ্বরটা শিগগীর ছেড়ে যাবে।"

সুরেশ ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আরে নাও, ও সব রেখে দাও। আমাদের জ্বর হলে অমনিই পড়ে থাকি, মাথায় জলপটি বাতাস আবার কে দেয়? যত সব খিষ্টেনি মত; ও সব ছেড়ে দাও না বাপু, দেখ জ্বর আপনা আপনি যায় কিনা।"

স্বামীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণার নিদ্রা ভাবটা দূর হইয়া গিয়াছিল, চোখ সে কিছুতেই মেলিতে পারিতেছিল না, চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া সকলের কথা শুনিতেছিল। নিদারুণ অভিমানে তাহার অন্তরখানা পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল

সে তাই ললাট হইতে জলপটি তুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া আপাদ মস্তক কম্বল দিয়া ঢাকিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল।

মেধা সুরেশের মায়ের পানে তাকাইয়া বলিল, "আজ কয়দিন হতে এমনি ধারা জ্বর হচ্ছে, একটা ডাক্তার দেখিয়ে একটু ওষুধের বন্দোবস্ত করলে জ্বরটা এতদিন সেরে যেত। একে অসুস্থ শরীর তার ওপর এমনি করে রোজ যদি জ্বর আসে তাতে কেমন করে বাঁচবে বলুন দেখি?"

সুরেশ একটু তীব্রভাবেই বলিল, মাথার দিব্য দিয়ে কেই বা ওকে বাঁচতে বলছে তোমার কিছু ভয় নেই, মেয়েদের বড় একটা কিছু হয় না, ওরা অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে জন্মায় মেয়ে জাতটাকে—বুঝেছ মা, যত স্পর্দ্ধা দেবে ওরা ততই বাড়তে চাইবে। আজ জ্বর হয়েছে বলে ডাক্তার আনব, কাল ব্যথা করছে ডাক ডাক্তার,—আঙুল মচকে গেছে—ডাকো ডাক্তার, এমনি করে ডাক্তার ডাকতে আর ভিজিটের টাকা গুণতেই সব যাবে, শেষে আর পেটে খেতে পাব না।"

মা একটা দম লইয়া বলিলেন, "অবাক করলে বাছা, খিষ্টেনি মত আর কাকে বলে? মেয়েদের ব্যারাম হলে একমাত্র প্রতুলদের বাড়ী ছাড়া আর কারও বাড়ীতে যে ডাক্তার এসেছে তাতো মনে হয় না। আমরাই কতবার মরতে বসেছি গো, তবু জোর করে বলতে পারি—কখনো একদাগ ওষুধ খাই নি। তোমাদের ঘরে ও সব চলতে পারে বাছা, আমাদের ঘরে চলতে পারে না; ও সব কথা রেখে দাও।"

তাহার পর চোখটা একটু টানিয়া মুখখানার একটা অদ্ভুত ভাবের বিশাল করিয়া তিনি চাপাস্বরে বলিলেন,—"তোমাদের বাছা সবই অদ্ভুত সবই বাড়াবাড়ি। এই যে আদত খিষ্টেন প্রতুলটা তোমাদের বাড়ী যাওয়া আসা করে, তোমার ঠাকুর দা ঠাকুর মা তো চোখ বুজিয়েই থাকেন, কোনদিন চোখ তুলে এ ব্যাপার দেখেন না। আমাদের বাড়ী একবার আসুক না, মাথায় ঘোল ঢেলে বিদেয় করে দেব না? আমাদের বাড়ী ও রকম খিষ্টেনকে ঢুকতে দিলে তবে তো ঢুকতে পাবে। না খেয়ে মরি, রোগে ভুগে মরি—সেও আমাদের ভাল বাছা, তবু আমরা খিষ্টেনকে বাড়ীতে ঢুকতে দেব না। আমাদের বাছা, আর কিছু না থাক, জাত জন্ম তো আছে, ধর্ম্ম মেনেও চলি, সব তো বিসর্জ্জন দিতে পারি নে।"

মেধা নত মুখে বসিয়া রহিল, ভাবিয়া দেখিল ইহাতে তার বলিবার মত কথা একটিও নাই। অপর্ণার যাহাই কেন হোক না তাহাতে তাহার কি? অপর্ণা পরের স্ত্রী, শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার, পরের তাহাতে কথা বলিতে যাওয়াই অনুচিত।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে খানিকটা বসিয়া রহিল, কারণ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া আসা ভদ্রতাবিরুদ্ধ।

(১১)

বৈকালে সে যখন বাড়ী ফিরিল তখন প্রতুল বাড়ী হইতে বাহির হইতেছিল।

"এই যে মেধা, কোথায় গিয়েছিলে?"

শ্রান্তভাবে মেধা বলিল, "এই পাশের বাড়ীতে গিয়েছিলুম। আপনি চলে যাচ্ছেন,—আমার যে কতকগুলো কথা বলবার মত ছিল।"

প্রতুল ফিরিয়া আবার প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, "চল, যা কথা বলবার আছে বলে নাও। আমার আবার অন্যদিকে একটা জরুরি কাজ আছে, এখনই যেতে হবে।"

মেধা প্রতুলকে বসাইয়া একটু ঝাঁজের সঙ্গে বলিল,—"আজ পাশের বাড়ীর বউটির কি দুর্দ্দশা দেখে এলুম প্রতুলদা, দেখে চোখের জল সামলাতে পারি নে। আচ্ছা, বলতে পারেন প্রতুলদা, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক মেয়েদের এত অবহেলার চোখে দেখে কেন, মেয়েদের ভাল, মন্দ, কষ্ট, দুঃখের পানে তাকায় না কেন? কল যেমন চালানো হয়, এ দেশে মেয়েদেরও তেমনি চালানো হয়, কেবল কাজটাই এ দেশের লোকে নিতে চায়, আদায়ও করে নেয় তাই। এ দেশের মেয়েদের কি কোনক্রমে জাগিয়ে তোলা যায় না, এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি জাগিয়ে দেওয়া যায় না? চিরদিন এইসব পশুদের অত্যাচার এমনি করে মেয়েদের সইতে হবে, ভগবানের অলঙ্ঘ্য নিয়ম বলে মাথা পেতে নিতে হবে?"

প্রতুল হাসিতে গেল, কিন্তু হাসি সে চেষ্টার ফলে তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল না, জাগিয়া উঠিল অরন্তুদ যন্ত্রণার চিহ্ন। সে খানিকটা উদাস ভাবে কোনদিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্যথাভরা দুটি চোখের দৃষ্টি মেধার মুখের উপর স্থির করিয়া তেমনি ব্যথাভরা সুরে বলিল, "এমনি অত্যাচার প্রায় ঘরে ঘরে চলছে মেধা, আজ তুমি নতুন দেখেছ—তাই তোমার অন্তরে বড় বেদনা লেগেছে। তুমি যেখানে যাবে শুনবে ঘরে ঘরে এমনই বধূ নির্য্যাতন। বাংলার মেয়ে তবু জাগতে পারে না—কেননা সে নিজেকে বড় দুর্ব্বল মনে করে; মনে করে সে এমনিই চিরকাল কাটাতে এসেছে, তাই তাকে কাটিয়ে যেতেও হবে কেননা এ তার অদৃষ্ট। আমাদের এ দেশের মেয়েদের সঙ্গে অন্য দেশের মেয়েদের পার্থক্য যে কতখানি তা এইখানেই বুঝতে পারা যাচ্ছে। আমাদের দেশের মেয়েরা একান্তভাবে নির্ভরশীলা - তাই তাঁরা অন্যায়, অত্যাচার—অধিকার সবই মুখ বুজে সহ্য করে যান, কিন্তু অন্য দেশের মেয়েদের সে সাহস আছে যাতে তাঁরা অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে সগর্ব্বে দাঁড়াতে পারেন। তাঁরা অবিচার সইতে পারেন না, স্পষ্ট তার প্রতিবাদ করতে ভয় পান না; এ দেশের মেয়েদের মত ঘাড় গুঁজে সকল রকম অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করেন না। এ দেশের মেয়েরা জ্ঞান হতে না হতে শিক্ষা পায় তাদের পৃথিবীর মত সহনশীলা হতে হবে, স্বামীকে দেবতা বলে মানতে হবে, তাঁর অন্যায় হোক, অবিচার হোক—সব সয়ে যেতে হবে; স্বামী যদি পদাঘাতও করেন, নিজের গায়ের ব্যথা ভুলে আগে দেখতে হবে তাঁর পায়ে ব্যথা লেগেছে কিনা। চমৎকার মেধা, সব রকমে মাতৃজাতিকে নির্য্যাতন করবার সুযোগ এ দেশবাসী যত পেয়েছে এরকম আর কোন দেশের লোক পায় নি। এরা বোঝে না—মাতৃজাতিকে এমনি ভাবে পিষে ফেলে অরন্তুদ যন্ত্রণা দেওয়ার ফলে তাদের হাসিভরা ঘর কান্নাভরা শ্মশানে পরিণত হচ্ছে। মেয়েরা এমনি করে বদ্ধ থাকার ফলে তাদের শক্তি, ক্ষমতা, সাহস সবই নষ্ট হয়ে গেছে। এঁদের সামনে অন্যায় কাজ হচ্ছে দেখেও এঁরা সাহস করে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করতে পারেন না কেন এ রকম অন্যায় হচ্ছে এঁরা নিজেদের অস্তিত্ব ভুলে গেছেন, পুতুলের মত রয়েছেন, যেদিকে এঁদের ফিরানো হবে এঁরা সেইদিকেই ফিরবেন। কোন পুরুষ যদি বলেন—জল উঁচু দিকে যায়, রাত্রে সূর্য্য ওঠে, এই দেশের মেয়েরাই সেটা বিনা বিচারে মেনে নেবেন। বলবে—এঁরা সত্য জেনেও ভালবাসা, স্নেহের খাতিরে স্নেহপাত্রের মতই মেনে নেন, কিন্তু সে ধারণা ভুল মেধা, কেননা এমন জীবন্ত মিথ্যাটাকে চালিয়ে নেওয়াই অন্যায়। স্নেহপাত্র সকল দেশেই আছে, তা বলে বিনা বিচারে তাদের মতটা কোন মেয়ে মেনে নেন না। এঁরা যে মেনে নেন এর কারণ এঁদের শক্তিহীনতা, নিজেদের পরে' দারুণ অবিশ্বাস।"

মেধা বলিল, "কোন কালে কোন মুনি নাকি ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন—মেয়েদের সকল সময়েই অধীন হয়ে থাকতে হবে। বাল্যে পিতামাতা, যৌবনে স্বামী, বার্দ্ধক্যে—

বাধা দিয়া প্রতুল বলিল, "হ্যাঁ, মনু সে ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন। হতে পারে—উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষদের একটা নিয়মে গেঁথে ফেলতে তিনি এই আইন তৈরী করেছিলেন, মেয়েদেরও এর প্রতিবাদ করা উচিত ছিল—যে নিয়ম তিনি লিখে রেখে গেছেন তা কি শুধু মেয়েদের জন্যেই, পুরুষদের জন্যে কি কিছুই না? এ দেশের মেয়েদের যে মুখ বন্ধ—এদের আইনকর্ত্তা পুরুষ, তাঁরা যা করবেন—বিনা বিচারে, বিনা প্রতিবাদে তাই সমাজে চলে যাবে। একবার আমি কোন পত্রিকায় নারী শিক্ষা সম্বন্ধে সামান্য একটু লিখেছিলুম, তাতে অনেক ভদ্রলোকই বেশ রাগ করেছিলেন; একজনের লেখাতে রাগের বেশ চিহ্নও পেলুম, বলা বাহুল্য তিনি পর মাসেই উত্তর দিয়েছিলেন। যিনি লিখেছেন তিনি মনুসংহিতা খানা আর একবার ভাল করে পড়ে তার থেকে অনেক কথা উদ্ধৃত করে দিয়েছেনই, তা ছাড়া নিজের মতটাও অবাধে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন—মেয়েদের কাজ স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনা, এতে আত্মসুখ একেবারে বিসর্জ্জন দিতে হবে, নিজের সত্তা তাকে একেবারেই বিসর্জ্জন দিতে হবে। সংসারের সব কাজ করবে, সন্তান পালন করবে, স্বামী সেবা করবে—তবে সে নারী; এই তার কর্ত্তব্য কাজ। তাকে যতটুকু কার্য্যক্ষেত্রে চলতে দেওয়া হয়েছে তার একটু এদিকে যদি সে পা দিতে চায় স্বামীর কোন কথায় সে যদি বিরুদ্ধ মত

প্রকাশ করে, তবে সে স্বেচ্ছাচারিণী, চাই কি ব্যভিচারিণী বলতেও তিনি কুণ্ঠিত হ'ন নি। সে বাইরের কোন কথা জানতে চাইবে না, তার নিজের ভালমন্দ কিছু জানাতে পারবে না, অত্যাচার কর—লাঞ্ছনা কর—নীরবে মুখ বুজে সয়ে যাবে—তবেই সে আদর্শ স্ত্রী। তার শরীরের ভাল মন্দের দিকে তাকাবে না, অসুস্থ শরীরেও তাকে সমান খেটে দিতে হবে, সে খাটনির এতটুকু ত্রুটি হলে তার ঊর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষকে গাল দেবে,—তার বাপ মা ভাই বোনের সোজা যমালয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দেবে ; প্রহার করবে—গা কেটে রক্ত পড়লেও তবু সে বলবে—বেশ করেছ, বোধ হয় আমারই দোষ হয়েছিল—সেই এ দেশের আদর্শ স্ত্রী। স্বামী খেতে দেবে না, পরতে দেবে না, যে তা সয়েও হাসি-মুখে স্বামীর সঙ্গে কথা বলবে, স্বামী ঘর হতে বার করে দিতে গেলে যে এসে আবার তার পা দু'খানা জড়িয়ে ধরবে, চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়ে অনুনয় বিনয় করবে—সেই এ দেশের আদর্শা স্ত্রী। সে গভীর ব্যথায় চোখের জল ফেলবে বড় গোপনে—স্বামী দেবতা যেন না দেখতে পান। সারাদিন অসুস্থ শরীরেও ভূতের মত খাটবে, রাত্রে আবার স্বামী দেবতার পদসেবা করবে, বাতাস করবে, তাঁকে না ঘুম পাড়িয়ে যে শ্রান্ত শরীরেও শুতে পাবে না—সেইরকম আদর্শা স্ত্রী এইসব আত্মসুখান্বেষী পুরুষেরা পেতে চায়। এরা স্নেহ, প্রেম দিয়ে হৃদয় জয় করে না, ভয় দেখিয়ে, চোখ রাঙিয়ে শাসন করে জয় করতে চায়। এইসব কর্ত্তব্যের একটু এদিক ওদিক হলে—সে হয় স্বেচ্ছাচারিণী, সে হয় ব্যভিচারিণী ; আমাদের এ দেশবাসী মুক্তকণ্ঠে তার নিন্দা করতে সঙ্কুচিত হবে না।"

মেধা নীরবে সম্মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। বাংলার মেয়ে—মনে করিতে তাহার মনে অপর্ণার কথাই জাগিয়া উঠিল। আহা, বড় দুঃখে—বড় কষ্টেই সে বলিয়াছে—"বিয়ে করো না বাংলার মেয়ে, বাংলার পুরুষের অবাধ অত্যাচার স্রোত প্রতিহত করতে তোমরা তোমাদের কৌমার্য্য অটুট রাখো।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মেধা বলিল, "উঃ কি পাপে বাংলায় ঘরে মেয়ে হয়ে জন্মেছি প্রতুলদা, আমাদের ভবিষ্যত আমাদের জন্যে কত বেদনাই না তার বুকে সঞ্চিত করে রাখে তাই ভাবছি।"

গম্ভীর মুখে প্রতুল বলিল, "তাই বটে মেধা। কিন্তু দেখ—গর্ব্ব ধ্বংসের মূল, এই নীতিটি সত্য কথা। পুরুষ অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে যা করছে—এই অতিরিক্ত শাসনের ফলে নির্য্যাতিতের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। একদিন এই মেয়েরা—এই নির্য্যাতিতারা সবাই একসঙ্গে জানতে চাইবে—কোন অধিকারে পুরুষ তাদের শাসন করতে আসে, কিসের জন্যেই বা তারা এত নির্য্যাতন সহ্য করবে ? সে দিনের বেশী দেরী নেই মেধা, জাগার বাণী বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছে, মরার বুকে জীবনের চিহ্ন দেখা গেছে। আগে মেয়েরা অদৃষ্টের পরে' নির্ভর করে সব সয়ে যেতো, আর তা সইবে না ; অত্যাচারে রাজ্য থাকে না কখন—এর সত্যতা শীগগিরই প্রতিপন্ন হবে। নারী সেদিন তার দাঁড়াবার মত স্থান পাবে, নারী সেদিন সাহস করে নির্ভীকভাবে নিজের মত ব্যক্ত করতে পারবে, জানব—সেইদিন আমাদের দেশ উন্নতির পথে দাঁড়িয়েছে। ভগবানের কাছে একমনে তাই প্রার্থনা করছি মেধা, আমরা বেঁচে থাকতেই যেন সেদিন আছে, আমরা যেন তা দেখতে পাই।"

(১২)

সেদিন বাহির হইতে বাড়ীতে ফিরিয়াই নারায়ণ দাস অন্ধকারপূর্ণ মুখে পুত্রবধূকে ডাকিলেন, "এদিকে এসো তো বাছা, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।"

সাবিত্রী এখানে এতদিন আসিয়াছেন ইহার মধ্যে নারায়ণ দাস কোনদিনই তাঁহাকে ডাকিয়া কোন কথা বলেন নাই। আজ তাঁহার গম্ভীর আহ্বান শুনিয়া কি এক অনিশ্চিত আশঙ্কায় সাবিত্রীর বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। অবগুণ্ঠন নাসাগ্র পর্য্যন্ত নামাইয়া দিয়া, অঞ্চলখানা সারা গায় জড়াইয়া তিনি কম্পিত পদে শ্বশুরের নিকটস্থ হইলেন।

বারাণ্ডার একখানা পিঁড়িতে বসিয়া দেয়ালের গায়ে আর একখানা পিঁড়িতে হেলান দিয়া ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া নারায়ণ দাস হুঁকায় তামাক খাইতেছিলেন। পুত্রবধূকে দেখিয়া সোজা

হইয়া বসিলেন, মুখ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "এ সব কি ব্যাপার হচ্ছে বউমা, এরকম করা তো তোমাদের উচিত হচ্ছে না। এক তো তোমাদের এনে বাড়ীতে রেখেছি তাতেই অনেক কথা আমায় শুনতে হয়েছে, এখনও শুনছি। তা যাক গিয়ে, তাতে আমি ভয় করি নে, কেন না অনেক আগেই আমি আমার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিয়েছিলুম। কিন্তু তার পরে এই যে সব ব্যাপার, –এ করা কি ভাল হচ্ছে?"

অনুমানে সাবিত্রী কথাটা বুঝিয়া লইলেন, তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হচ্ছে বাবা?"

বিকৃত মুখখানা আরও বিকৃত করিয়া নারায়ণ দাস বলিলেন, "কি হচ্ছে? লোকে যে আমার গায়ে থুতু দিচ্ছে বাছা, আমার যে মুখ দেখানোর পথ তোমরা বন্ধ করছো। কলকাতায় যা খুসি তাই করতে, আমি তার জন্যে কিছুমাত্র কথা শুনতে যেতুম না. অত করে এনে কি বাছা এরই জন্যে? ওই যে প্রতুলটা দিন রাত আসা যাওয়া করছেই, মেধাও নাকি তাদের বাড়ী যায় আসে, তার মার সঙ্গে মিলে কাল সারাটা দিন নাকি মুসলমান পাড়ায় ঘুরেছে। ছি ছি, লোকে আমায় কি যে বলছে তা তোমাদের আর বলব কি, আমি তো আর মুখ দেখাতে পারছি নে।"

পিছন হইতে গৌরী দেবী টিপ্পনি কাটিলেন, "সুখে থাকতে ভুতে কিলায় বলে যে একটা কথা আছে, তোমার হয়েছে তাই। কলকাতায় যা খুসি তাই করছিল, তোমার এত কি মাথা ব্যথা ধরেছিল যে সাত তাড়াতাড়ি ওদের আনতে গেলে? যার জন্যে যা—সেই ছেলেই যখন তোমার নেই তখন ওদের আনার তোমার কোন দরকার ছিল না। কার মেয়ে, কোন ঘরে জন্ম তা কে জানে, বরেণ ওকে সত্যি বিয়ে করেছিল কিনা তাই বা কে জানে। শুনেছি কলকাতায় নাকি অনেক বেশ্যার মেয়েরও এমনি ধারা বিয়ে হয়। হয় তো বরেণ বিয়ে করেছে বলে আমাদের ধাপ্পা দিয়েছিল,—সত্যি, পাড়ায় এমনি ধারা একটা গুজব উঠেছে, ওদের চাল-চলন দেখে আমারও তাই মনে হয় বাপু। সত্যি ভদ্দর ঘরের মেয়ে হলে কক্ষণো এমন ধারা চালচলন তাদের হয় না।"

সাবিত্রীর চোখের সম্মুখে সারা বিশ্ব ঘুরিয়া উঠিল, তিনি থর থর করিয়া কাঁপিয়া বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার দুই চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ভগবান, এমন জঘন্য কথাও আজ তাঁহাকে শুনিতে হইল, এই সব কথা শুনিতেই কি তিনি এখানে আসিয়াছেন? স্বামী,—দেবতা, তুমি আজ কোথায়? আজ এই মুহূর্ত্তে একবার এসো প্রিয়, আজ যে তুমি ছাড়া আর কেহ প্রমাণ করিতে নাই সাবিত্রী তোমার বিবাহিতা স্ত্রী।

ওই পাশের ঘরে সিংহাসনে তুমি যে বসিয়া আছ নারায়ণ, সেদিন কি তুমিও সাক্ষাৎ ছিলে না? আজ এ সময়ে—সতীকে অসতী প্রতিপন্ন করার মুহূর্ত্তে—যে সত্য দেবতা, তুমি নীরব কেন? ওগো নিদ্রিত দেবতা, তুমি যে আছ তাহা জানাও, তুমি যে সতীর সম্বল তাহা জানাও, জানাও সাবিত্রী কুলটা বেশ্যা, বরেন্দ্রনাথের রক্ষিতা ঘৃণিতা নারী নহেন, তিনি বরেন্দ্রনাথের ধর্ম্মপত্নী, সাধ্বী সতী।

কেহ আজ এ সময়ে সাড়া দিল না, নারায়ণ যেমন তেমনিই পড়িয়া রহিলেন, জাগায় কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

আকাশ বাতাস সমভাবেই রহিল, ঝড়ও উঠিল না, বজ্রও পড়িল না।

ঝড় উঠিল সন্তানের বুকে, মাতার অপবাদ বজ্রাগ্নি সৃষ্টি করিল সন্তানের হৃদয়ে,—

"কি আমার মা বেশ্যার মেয়ে, আমার মা সতী নন, ঘৃণিতা বেশ্যা,—আপনার ছেলের রক্ষিতা ছিলেন—"

মেধার বিস্ফারিত দুইটি চোখ দিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতেছিল, তাহার মুখখানা জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিয়াছিল, অত্যধিক ক্রোধে তাহার মুখ দিয়া কথা ফুটিতে-ছিল না।

"যারা এমন কথা মুখে আনে, সাধ্বী সতীকে যারা এমন কলঙ্ক দিতে পারে, তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক, তাদের সর্ব্বনাশ হোক। মা, ওঠো, যে বাড়ীর লোকে তোমায় এমন কথা বলতে সাহস করে—সে বাড়ীতে তুমি আর থাকতে পারবে না, আমি তোমার এ অপমান সইতে পারব না। ওঠো, আর একমিনিট তোমায় এখানে থাকতে দেব না, উঠে এসো তুমি—"

অধীর ভাবে সে মায়ের হাতখানা ধরিয়া টানিতে লাগিল। মেধার মত মেয়ের ভিতরে যে এতখানি ক্রোধাগ্নি সঞ্চিত থাকিতে পারে ইহা কেহই ধারণায় আনিতে পারে নাই। সাবিত্রীও তাহার ক্রোধ দেখিয়া নিজেকে সংযত করিয়া ফেলিলেন, শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "কি পাগলামি করছিস মেধা, হাত ছাড়।"

মেধার গলার মধ্যে অনেকখানি বাষ্প জমিয়া উঠিয়াছিল, সে দুই একটা ঢোক গিলিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "না মা, আমি তোমার হাত ছাড়ব না, তুমি ওঠো। এই জঘন্য কথা শুনেও তুমি আবার এখানে থাকতে চাও মা, এদের কুকুরের মত ঘৃণা করে ফেলে দেওয়া ভাত আবার তুমি খেতে চাও মা? তুমি এ দারুণ অপমান তোমার অসীম সহ্যশক্তির বর্মে ঠেকিয়ে দূরে ফেলতে পার, কিন্তু আমি তো তা পারব না মা। তোমায় উঠতেই হবে—ওঠো।"

সাবিত্রী চোখ মুছিয়া বলিলেন, "কোথায় যাব?"

মেধা উগ্রকণ্ঠে বলিল, "জায়গার অভাব কি মা? কেউ আশ্রয় না দেয়—গাছতলা আছে, ভিক্ষে আছে।"

মায়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে সে বাহিরে একেবারে পথে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথের ধারে বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছটি তখন কাঁচ সবুজ পাতায় ভরিয়া উঠিতেছে মাত্র; তাহার তলায় দাঁড়াইয়া হতাশ ভাবে মা কন্যার পানে তাকাইয়া বলিলেন, "এখন কোথায় যাব মেধা, আমাদের আশ্রয় কোথায়?"

কম্পিতকণ্ঠে মেধা বলিল, "এই গাছতলা মা, ঘরের চেয়ে গাছতলাও ভাল। মা, আমার নামে কেউ কিছু বললে তোমার বুকে যেমন ব্যথা লাগে, তোমার নামে তেমনি কেউ কিছু বললে আমার বুকে বড় ব্যথা বাজে। ওরা মানুষ নয় মা,—পশু; তোমায় চিনতে পারলে না, তোমায় যা তা বলছে, আমার বুকে যে তা বাজের মতই এসে পড়ছে মা; আমি কেমন করে শুনব মা—"

মায়ের গলাটা দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া মেধা ক্ষুদ্রা বালিকার মতই উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। মার নয়ন হইতেও ঝর ঝর করিয়া

অনেকক্ষণ এমনি কাঁদিয়া মেধার বুকের ভারটা অনেক হালকা হইয়া গেল; মায়ের বুক হইতে মুখ তুলিয়া সে বলিল, "চল মা, আমরা প্রতুলদার বাড়ী যাই।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সাবিত্রী বলিলেন, "তারা আমাদের আশ্রয় দেবে কেন?"

মেধা বলিল, "হ্যাঁ মা, এ জগতে যদি কেউ আমাদের আশ্রয় দিতে পারেন তবে তিনি প্রতুলদা'র মা। আর তো কোথাও আমাদের জায়গা নেই মা—সেখানে গিয়ে থাকব। বাবা আমার নামে কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখে গেছেন, সেই টাকাটা তুলে এনে তাতেই দিন চালাব। ভাবনা শুধু একটু আশ্রয়ের—সেখানে আমরা দু'জন একটু স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি। ভয় কি মা, ওঁদের অনেক ঘর এমনি পড়ে আছে, আমরা একটা ঘরে বেশ থাকতে পারব। এইখানে থেকেই আমি আমার কাজ করব মা। যেখানে পরাজয় লাভ করেছি, সেইখানেই আমার প্রতিষ্ঠা চাই। এইখানেই আমি আগুন ধরিয়ে দেব, ঘরে ঘরে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলব, দেখব এই সব অপদার্থ পুরুষরা কত আমাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারে, কতদিন আমাদের তফাতে রাখতে পারে।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তেজিত ভাবে সে বলিল, "কিন্তু মা, আমি কখনই আজকের এই অপমানের কথা ভুলতে পারব না। তুমি কি মনে কর—যে সমাজ সাধ্বী সতীর নামে এমন অযথা কলঙ্কের বোঝা চাপাতে পারে সে সমাজ উন্নত হবে,—অথবা এমনিই থাকবে? হয়তো—হয়তো কেন নিশ্চয়ই—আমাদের মত কত অসহায়া নারী এই সমাজের চাকায় পড়ে এমনি ভাবে নিষ্পেষিতা হচ্ছে, তাদেরও কত চোখের জল পড়ছে, কত দীর্ঘনিঃশ্বাস তাদের বুক ভেঙ্গে দিয়ে পড়েছে। পুরুষেরা—সমাজের অত্যাচারে প্রপীড়িতা নারীর চোখের জল আর দীর্ঘশ্বাস ব্যর্থ হয়ে যাবে না মা, এই সবই ধাতার পায়ের তলায় জমে উঠছে। যেদিন নিজের ভার আর সইতে পারবে না সেদিন সবশুদ্ধ ভেঙ্গেচুরে এই সমাজের বিধাতা পুরুষের মাথায় খসে পড়বে। হ্যাঁ মা, সত্যি কথা, অত্যাচারের ফল আছে, একদিন ফল

সাবিত্রী তাহার মুখখানা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে স্নিগ্ধ সুরে বলিলেন, "তুই এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন মা, একটু ঠাণ্ডা হয়ে সেখানে যাবি চল। আমি বলছিলুম কি—"

তিনি থামিয়া গেলেন দেখিয়া মেধা বলিল, "কি বলছিলে মা?"

সাবিত্রী আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "ওদের আবার জড়িয়ে ফেলব মেধা? লোকে—"

মেধা শান্তকণ্ঠে বলিল, "তাঁদের জড়ানোর জন্যে তোমার এতটুকু সঙ্কুচিত হতে হবে না মা। প্রতুলদার মাকে তুমি দেখ নি তাই তাঁর সম্বন্ধে তুমি অন্য একটা ধারণা করে রেখেছ। কিন্তু মা, প্রতুলদাকে তো দেখেছ, ছেলে দেখে মা যে কি রকম তা কেন ভাবতে পারছ না? মায়ের কাছে যে সুশিক্ষা পায় ভবিষ্যতে সেই সন্তানই প্রতুলদার মত উদার মহান হতে পারে। তাঁর মধ্যে এতটুকু সঙ্কোচ নেই মা, ভেদ ভাব একটু নেই, নইলে সেদিন আবদুলের রুগ্ন ছেলেটার কাছে বসে দিনরাত কাটালেন কি করে? তিনি জাত দেখেন না, ধর্ম্ম দেখেন না, সবই তাঁর চোখে সমান। অমন মা পেয়ে তাই প্রতুল দা এত বড় হতে পেরেচেন, নইলে যেমন সাধারণ এ দেশের লোককে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনিও তাই হতেন।"

সাবিত্রী উঠিয়া পড়িলেন, "তবে তাই চল মেধা, তাঁর বাড়ীতে চল, একটু আশ্রয় পেলেই আমার যথেষ্ট হবে, তার বেশী আর কিছু চাই নে।"

মেধা অগ্রসর হইল।

(১৩)

করুণাময়ী সাদরে মাতা ও কন্যাকে গ্রহণ করিলেন।

রুদ্ধকণ্ঠে মেধা বলিল, "আজ আমাদের কোথাও আশ্রয় নেই মা, সেই জন্যে আপনার কাছে এসেছি। মা আসতে চাচ্ছিলেন না, আমি জোর করে মাকে টেনে নিয়ে এসেছি।"

করুণাময়ী তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্বভাবসিদ্ধ মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "বেশ করেছ মা। আমি অনেকদিন হতে তোমাদের সম্বন্ধে এমনি নানা কথা শুনতে পাচ্ছিলুম, কতদিন ভেবেছিলুম তোমার মায় সঙ্গে দেখা করে সব কথা বলে ওঁকে আর তোমাকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি, এগিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছি কেন না এতদিন তোমাদের বাড়ীতে এ বিষয় নিয়ে কোন কথা হয় নি, কোন গণ্ডগোলও বাধে নি। আজ যদি তোমরা এমন অপমান সয়েও সেখানে থাকতে, আমার কানে এ কথা গেলে আমি কাল সকালেই নিজে গিয়ে তোমাদের নিয়ে আসতুম।"

সাবিত্রী সজল চোখ দুটি করুণাময়ীর মুখের পানে তুলিয়া ধরিলেন, কৃতজ্ঞতায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তিনি কি বলিতে গেলেন, কথা ফুটিলনা, একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল মাত্র।

তাঁহার হাত খানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া করুণাময়ী বলিলেন, "না না, এতে তোমার এতটুকু কুণ্ঠিত হতে হবে না বোন। একটি মেয়েকে কেউ অপমান করলে আমাদের সব মেয়েদেরই সে অপমান নিজের মনে করা উচিত। এ দেশের পুরুষেরা মেয়েদের মর্য্যাদা রক্ষায় সম্পূর্ণ উদাসীন। আজ তোমায় একথা বলেছে, কাল আমায় বলবে, কেননা ওরা সকল মেয়েকেই এই রকম অশ্রদ্ধার চোখে দেখে। শাস্ত্র বলেছেন নারীকে বিশ্বাস করোনা, এ দেশের পুরুষ সেই কথাটি ঠিক মনে করে রেখেছে। মেয়েরা বিশ্বাসের কাজ করলেও সে অবিশ্বাসিনী এ কথা বলতে পুরুষ ছাড়বে না। অথচ এই দেশেই শক্তি পূজার প্রচলন রয়েছে, কিন্তু সেই শক্তিকেই এরা কি ভাবে অপমান করছে নির্য্যাতন করছে তা একবারও ভেবে দেখে না। আমি মেয়ে, সকল মেয়ের ওপর আমার সহানুভূতী আছে কারণ তারা আমারই জাত, আমিও যা তারাও তাই। মেধা, তোমাদের যে কয়টি ঘর নেওয়ার ইচ্ছা হয় পছন্দ করে নাও। তোমার মা যাতে সঙ্কুচিতা হয়ে না থাকেন তাই কোরো।

মেধা বাস্তবিকই বলিয়াছিল মায়ের মত মা না হইলে সন্তান কখনই উন্নত হইতে পারে না। করুণাময়ী যথার্থ উচ্চ-হৃদয়া যথার্থ শিক্ষিতা নারী ছিলেন তাই তাঁহার সন্তানও এমন উচ্চহৃদয় লাভ করিয়াছিল।

দেশের দুরবস্থায় করুণাময়ীর প্রাণ কাঁদিয়াছিল, তিনি নারী তাঁহার ক্ষমতার অতীত অনেক কাজ ছিল, সেই গুলি

প্রফুল্ল করিত। পুত্রকে তিনি উৎসাহিত করিতেন, তাহাকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেন। মেধা ঠিক বলিয়াছিল যেদিন ঘরে ঘরে দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্খিণী এমন মা বিরাজ করিবেন সে দিন বাংলা ধন্য হইবে, দেশের ছেলে নিজের পরিচয় সগৌরবে দিতে পারিবে, অন্য মেয়েকে নিজের মায়ের মতই ভাবিবে। সেদিন এদেশে এমন নারী নির্য্যাতন অবাধে চলিবে না, দেশের সকল ছেলে নারী নির্য্যাতনকারীকে দলিত করিয়া মারিবে।

সাবিত্রী ও মেধাকে বসাইয়া রাখিয়া করুণাময়ী সন্ধ্যা দিবার জন্য চলিয়া গেলেন। মায়ের পানে তাকাইয়া মেধা বলিল, "কেমন মানুষ দেখলে মা? ওর কাছে যত থাকবে তত মুগ্ধ হয়ে যাবে, ওঁর মত হওয়ার ইচ্ছা তোমার মনেও জাগবে। আমি সে দিন বড় রাগ করে বলছিলুম—আমরা কলকাতায় খোলার ঘরে গিয়ে থাকব, এ পাড়াগাঁয় আর থাকব না। উনি আমায় বুঝালেন—আমার এখানে থাকতেই হবে। আমি দেশের কাজ করতে নেমেছি, অবশ্য কাজ আমি সকল জায়গাতেই করতে পারব, লোকের কষ্ট দূর করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। কষ্ট সকল জায়গাতে, সকল লোকেরই আছে। কিন্তু কথা হচ্ছে কি—সহরে দুঃখীকে দেখতে তবু অনেকেই এগিয়ে যাবে কেন না—আজকাল নামটাই সকলে চায়, সহরাঞ্চলে একটা ছোট কাজেও নাম বেরিয়ে যায় কাজেই, সেখানে কাজ করতে অনেক লোক পাওয়া যায়। এইসব পাড়াগাঁয় কাজ করতে কেউ নেই, এরা দুঃখ যন্ত্রণা— সংস্কারের বোঝা মাথায় নিয়ে একই ভাবে জীবন যাপন করছে। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের বিচার এদের মধ্যে এত যে একদিন বাগদী ডোম জগন্নাথ রায়ের হরি মন্দিরের বারাণ্ডায় উঠেছিল বলে তাকে সবাই এমন মেরেছিল যে বেচারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সেই হতে সে যে বিছানায় শুয়েছিল, আর ওঠে নি। সমস্ত গায়ে তার ঘা হয়েছিল, সেবা শুশ্রূষার অভাবে সেই ঘায়ে পোকা পর্য্যন্ত হয়েছিল কেননা দুনিয়ার তার আর কেউ ছিল না। পোকার কামড়ানিতে সে চীৎকার করত, লোকে বলত—হরি মন্দিরে ওঠার পাপে হরিঠাকুর ওর এমনি করে দিয়েছেন। তাকে চোখে দেখা দূরে থাক—লোকে তার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অন্ত্যজদের ভয় দেখিয়েছে, পাপের সাজায় হেসেছে। অবশেষে লোকটা মরে গেল।"

মেধা খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া উত্তেজিত ভাবে বলিল, আমরা পরের দেশে—অর্থাৎ বাংলার বাইরে অনেক জায়গায় জাতি বিচার দেখে মুখ বিকৃত করি, আমাদের দেশে—এইসব পাড়াগাঁয়ে কি রকম করে অন্ত্যজদের শাস্তি দেওয়া হয় তা দেখি নে। আমরা সে দিনে সংবাদপত্রে এক পারিয়ার হত্যাকাণ্ডে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, অনেকে এ বিষয়ে অনেক টিপ্পনিও কেটেছেন, আমাদের ঘরে ঘরে অস্পৃশ্যতা কি রকম ভাবে জেঁকে বসে আছে তাঁরা বোধ হয় তা জানেন না। সহরাঞ্চলে অনেক বক্তৃতার ফলে অস্পৃশ্যতা অনেকটা দূর হলেও বাংলার পাড়াগাঁগুলোতে এ রোগ সম্পূর্ণ ভাবে জেগে আছে। প্রতুলদার মা বলেছেন—সমস্ত সমাজ তাঁর বিপক্ষে দাঁড়ায় যদি দাঁড়াক, তিনি ছেলেকে নিয়ে এই সব অত্যাচার, অস্পৃশ্যতার বিপক্ষে দাঁড়াবেন। বাস্তবিকই তিনি দাঁড়িয়েছেন, তাঁর কাজের শেষ তাই নেই। তিনি ভদ্রঘরে যেমন ঘুরছেন, ইতরের ঘরেও তেমনি ঘুরছেন, ব্রাহ্মণ, ডোম, বাগদী, মুসলমান সকলকে এক চোখে দেখেছেন। তিনি মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখেছেন, জাতি বিচার করে মানুষের সেবা করতে নামেন নি।"

করুণাময়ীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় মেধার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে আবার খানিকটা চুপ করিয়া রহিল।

সন্ধ্যার খানিক পরে প্রতুল বাড়ীতে ফিরিয়া আসিল। সম্মুখে মেধা ও সাবিত্রীকে দেখিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—"এই যে, মেধা এখানে। আমি ও পাড়া হতে ফিরবার সময় তোমাদের বাড়ী গিয়ে কাউকে দেখতে পেলুম না; দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি মুখখানা অন্ধকার করে উত্তর দিলেন, —চুলোয় গেছে। দু'দিন আগে চুলো কথাটা ভাবতে পারতুম চুলো বুঝি একটা জায়গার নাম, এখন অবশ্য ওর অর্থ বেশ বুঝতে পেরেছি বলেই আর কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে আস্তে আস্তে পেছন ফিরেছি। তারপর,—হঠাৎ ও বাড়ী ত্যাগ করলে যে?"

করুণাময়ী বলিলেন, "ত্যাগ করবার কারণ হলেই ত্যাগ

কল্লে প্রতুল। আমি কি তোকে বলি নি এরা কক্ষণো ও বাড়ীতে টিকতে পারবে না?"

প্রতুল বিজ্ঞভাবে শুধু মাথা দুলাইতে লাগিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, ওরকম করছিস যে?"

প্রতুল চাপা হাসি হাসিয়া বলিল, "এ তো জানা কথা মা; তুমিও জেনেছিলে, আমিও জেনেছিলুম, এঁরা যে জানতে পারেন নি এই আশ্চর্য্য।

মা বলিলেন, "তবু তুই কি জেনেছিলি তাই বল দেখি।"

প্রতুল বলিল, "আমি জেনেছিলুম ওঁদের দূর হতেই হবে। এ দেশের মেয়েদের শক্তি থাকতেও তাঁরা শক্তিহীনা, তাঁরা অবলা,—কোমলা নামে খ্যাতা, কাজেই বিধবা হলে তাঁদের আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে থাকতেই হবে কেননা দুর্ব্বলা, অবলা মেয়েদের এ ছাড়া আর উপায় নেই। এ তো আর সে দেশ নয় যে প্রাণের চেয়ে আত্মসম্মান বেশী হবে, আর সেই আত্মসম্মান বজায় রাখতে জীবিকার জন্মে মেয়েরা আত্মীয়ের গলগ্রহ না হয়ে—যে শক্তি তার আছে সেই শক্তির সদ্ব্যবহার করবে, নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবে। এ রকম অপমান সহ্য করা—এ আমাদের দেশের মেয়েদের চিরপ্রাপ্য যে, আর এটা অপ্রত্যাশিতও তো নয়। ঘরে ঘরে স্বামী-হীনা দুঃখিনী বিধবা রয়েছে। শাস্ত্রে আছে নারীকে দেবীর মত ধারণা করতে হবে; স্বামীহীনা নারীকে মায়ের মত সংসারের উঁচু জায়গায় রাখবে; তিনি সংসারের মঙ্গল-কারিণী। কিন্তু আমরা ঘরে ঘরে কি দেখতে পাচ্ছি মা? সবাই মনে করে—এই বিধবার সংসারে ষোল আনা বঞ্চিতা হয়েও ষোলআনা দখল করতে এসেছে। তার কাছ হতে সংসার ষোলআনা কাজ আদায় করে নিচ্ছে, দিচ্ছে শুধু এইরকমই লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। আত্মীয়ের ঘরে দাসীর অধম হয়ে এদের কি রকম ভাবে জীবন যাপন করতে হয় তা দেখে চোখে জল আসে। একবার কোন একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে কথা হয়েছিল। ভদ্রলোকটি বিধবার অনুকূলে এমন সব কথা বলেছিলেন যাতে তাঁর পায়ের ধুলো নিতে আমার ইচ্ছা হয়েছিল। কিছুদিন বাদে দেখতে গেলুম—তিনি ঠিক এক ধারাতেই চলেছেন। তাঁর একটি বিধবা ভ্রাতৃবধূ, সে বেচারার দুনিয়ায় আর স্থান ছিল না; বাধ্য হয়ে তাকে গলগ্রহ স্বরূপ এই সংসারেই পড়ে থাকতে হয়। শুনতে পেলুম বিধবাটি দাসীর অধম হয়ে সংসারে থাকেন; তাতেও তাঁর নিস্তার ছিল না, পান হতে চুণটি খসলে তাকে এমন সব কথা বলা হতো যা শুনলে যে কেউ কানে আঙুল দিতে বাধ্য হবে। হতভাগিনীকে এত অপমান সত্বেও থাকতে হতো। তবু সে বেশ লেখাপড়া জানতো, শিল্পকর্ম্ম জানতো যাতে নিজের উপায় সে নিজেই করতে পারত। একটি পয়সার জন্মে তাকে কত সন্তর্পণে প্রার্থনা জানাতো হতো, অনেক সময় প্রার্থনা পূর্ণ হতো না। অবশেষে আমিই যে তার মৃত্যুর কারণ হয়েছি এই আমার জীবনব্যাপী দুঃখের কথা।"

রুদ্ধশ্বাসে মেধা বলিয়া উঠিল, "আপনি তার মৃত্যুর কারণ হলেন কি রকম কথা প্রতুলদা?"

আর্দ্র কণ্ঠে প্রতুল বলিল, "সত্যিই মেধা, আমার অযাচিত করুণাই তার সর্ব্বনাশ করলে। আমার কানে একদিন এ সব কথা পৌছানোতে আমার মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল, আমি একটা ছেলের হাতে দিয়ে লুকিয়ে তাকে টাকা পাঠিয়েছিলুম, যেন তাকে একটা পয়সার জন্মে ভাসুর বা জায়ের কাছে হাত না পাততে হয়। বিধবা আমার দান গ্রহণ করেনি, সে নাকি তার নিজের ওই হীন অবস্থাতেই সুখী ছিল। সে যদিও আমার দান নিলে না, তবু কথাটা গোপন রইল না। দেখতে দেখতে চারিদিকে তার নামে একটা অযথা কুৎসার সৃষ্টি হয়ে গেল। আমি তখন তাকে—ভাইয়ের মত আমায় ভেবে বোনের মত পাশে দাঁড়াতে বললুম, অভাগিনী বাংলার মেয়ের সে সাহস হ'ল না। তার পরদিন সকালে শুনতে পেলুম—অভাগিনী ইহজগৎ ত্যাগ করেছে।"

প্রতুল উদাস নেত্রে অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে চাহিয়া রহিল।

করুণাময়ী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ও সব কথা আর মনে আনছিস কেন প্রতুল, যা হয়ে গেছে তার জন্মে কষ্ট করা মিথ্যে। তুই যা এখন, হাত পা ধুয়ে বস গিয়ে, আমি তোর জলখাবার নিয়ে যাচ্ছি।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নীরবে প্রতুল উঠিয়া গেল।

(১৪)

নারায়ণ দাসের বাড়ীতে গ্রামের নিষ্ঠাবান ভদ্রলোক সমূহ এক হইয়াছিলেন, চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় একটা বিরাট সভা স্থাপিত হইয়াছিল। বারাণ্ডায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকেরা বসিয়াছিলেন, প্রাঙ্গনে কেলো হাড়ি, লক্ষ্মী বাগ্দী, বোনা মুচি প্রভৃতি নীচ জাতিয়েরা জমা হইয়াছিল। ইহারা কেহই স্ব-ইচ্ছায় আসিতে চায় নাই, ভয় দেখাইয়া, জোর করিয়া ইহাদের আনা হইয়াছে। একপার্শ্বে নেতা জেলেনীও তাহার চিরসাথী গুলের কৌটাটি হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া—আজিকার এ বিরাট সভার উদ্দেশ্য কি তাহাই বুঝিবার চেষ্টা করিতেছিল। সে ভদ্রগৃহের বধূ কন্যা নহে কাজেই তাহার স্বাধীনতা যথেষ্ট। গ্রামের এতগুলি মাতব্বর লোককে একত্রিত হইতে দেখিয়া ব্যাপারটা কি ঘটে,—কাহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্ম ইঁহাদের দারুণ মাথা ব্যথা পড়িয়া গিয়াছে, জানিবার কৌতুহল সে দমন করিতে পারিতেছিল না।

প্রবীণ শ্যাম চক্রবর্ত্তী হুঁকা হাতে—তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "বেজায় অন্যায়, ভীষণ অত্যাচার। এ রকম ভাবে চললে হিন্দুয়ানী আর টিকবে কি করে? সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই, সব গিয়ে পড়ে আছে অতীতের স্মৃতিটা। আজ সে সমাজ আছে না সমাজ-পতি আছে? আজ এমন কাণ্ড অবাধে সমাজের বুকে চলে যাচ্ছে, সে সব দিনে হলে—এক গালে চুণ আর এক গালে কালি দিয়ে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে ঢাক পিটিয়ে গাঁ হতে বিদায় দিত। উঃ, যত দেখছি বুকের রক্ত ততই জল হয়ে যাচ্ছে, ভাবছি, কালে কালে এ সব হ'ল কি, আরও না জানি কি হবে।"

তারক ভট্টাচার্য্য মাথার টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "তবু মশায়,—পুরুষেরা করে সে সব মানিয়ে যায়। শাস্ত্রে বলে পুরুষের অশুচি দোষ থাকে না;—থাকতে পারে না কেননা তিন পা চললেই তার সব দোষ খণ্ডে গেল। কিন্তু মেয়েরা—যাদের বার হাত কাপড়ে কুলোয় না, তাদের এ কি ভয়ানক কাণ্ড। সেই মেয়েরা—যারা চিরকাল পর্দ্দার আড়ালে কাটিয়ে এল, অপর পুরুষ দূরের কথা—চন্দ্র সূর্য্য যাদের দেখতে পায় না, তাদের ব্যাপার হ'ল কি? পুরুষদের মত তারা বাইরে আসবে, লম্বা কথা বলবে, দেশ হিতৈষিতা জানাবে—এ যে একেবারেই অসহ্য। হায় রে, কোনদিন দেখতে পাব—পুরুষেরা সত্যিই হাঁড়ি, বেড়ি হাতে নিয়ে রান্নাঘরে কাজ করছে, মেয়েরা চাকরী করতে যাচ্ছে। আগে কেউ এ কথা বললে হেসে উড়িয়ে দিতুম, তাকে পাগল বলে ঠাট্টা করতুম, কিন্তু চোখে যা দেখছি তাতে এখন যে আমায় বিশ্বাস করতেই হচ্ছে।"

রাম বসু নারায়ণ দাসকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখুন গাঙ্গুলী মশাই, আপনার এ রকম অবস্থায় চুপ করে থাকা কক্ষণো উচিত নয়। আপনারই নাতনী,—তার মা যাই হোক—সে যখন বরেণের মেয়ে বলে নিজের পরিচয় দিচ্ছে তখন আপনার নাতনীই বলতে হবে; হ্যাঁ, আপনার নাতনী এই যে উচ্ছৃঙ্খলতার বীজ পুঁতছে, প্রতিবিধান করতে হবে আপনাকেই তো, আর কেউ করতে পারবে না।"

অস্থিরভাবে নারায়ণ দাস বলিলেন, "আমি কি করব বোস মশাই? ওরা কি করছে না করছে সে খোঁজ আমি কিছু রাখি নে, আমার যা কাজ আমি তাই করে যাচ্ছি। যতদিন আমার বাড়ীতে আমার সম্পর্ক নিয়ে ছিল—প্রাণপণে আমি ওদের সংযত করে রেখেছিলুম। এখন ওরা সব সম্পর্ক উঠিয়ে দিয়ে পরের বাড়ী গেছে; আমাকে বলার চেয়ে যেখানে গেছে সেখানে গিয়ে কথাবার্ত্তা বলুন, আমায় মিথ্যে ওসব ব্যাপারে জড়াবেন না। আমি কোনদিন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিনি, এখনও নেই। ছেলেটা মারা গেছে খবর শুনে গিয়েছিলুম; ওরা যাই হোক—নারী মাতৃ-জাতি,—পায়ে ধরে কাঁদাকাটা করলে,—সইতে পারলুম না নিয়ে এলুম। তাদের চাল-চলন দেখে শেষে স্পষ্টই বলে-দিলুম—আমার বাড়ীতে জায়গা হবে না, চলে যাও।"

রমণ মিত্র বলিলেন, "শুনলাম—তারা নাকি নিজেরা চলে গেছে?"

মুখখানা অতিরিক্ত রকম বিকৃত করিয়া নারায়ণ দাস বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ও সব কথা রেখে দাও। আমার বাড়ীতে ও সব ব্যভিচারিতার প্রশ্রয় আমি দেই নি, আমিই

চলে যেতে বলেছি, নইলে ওরা কি যেত ? এমন আরামে নিশ্চিন্তভাবে খেতে পেলে কেউ কি আর যেতে চায় ?"

তরুণ দলের মধ্য হইতে সন্তোষ বলিয়া উঠিল, "আপনি তো অমনি ভাত দেননি দাদামশাই, শুনলুম—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া কলিকাতা হইতে আগত শিবনাথ বাবু বলিলেন, "এখানে যখন এ কথাটা উঠল তখন এখানে—এই সময়েই মীমাংসা হয়ে যাক। দেখুন নারায়ণ দাস বাবু, আমার অপরাধ নেবেন না, আমি জানি, মেধার বাপ, আপনার ছেলে—মেধার ভবিষ্যৎ ভেবে তার জন্যে কিছু টাকা এক জায়গায় জমা করে রেখে গিয়েছিল ; আপনি শুধু সেই টাকাটা হস্তগত করবার জন্যেই তাদের এ বাড়ীতে স্থান দিয়েছিলেন, আর যে পর্য্যন্ত না কাজ উদ্ধার হয় সে পর্য্যন্ত বাড়ীতে রেখেছিলেন। কাজ ফুরিয়ে গেলে তাঁদের এমন কষ্ট দিয়েছেন যাতে বাধ্য হয়ে তাঁরা চলে যান।"

"কে বলে হ্যা, একথা বলতে কে সাহস করে ?"

নারায়ণ দাস বিকটস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সে চীৎকারে শিবনাথ বাবু দমিলেন না, স্থিরকণ্ঠে বলিলেন, "আমিই বলি। দেখুন, এতকাল আমি দেশে ছিলুম না, এখন হঠাৎ দেশে ফিরে এসব ব্যাপার দেখে শুনে আমি ভারী মর্ম্মাহত হয়েছি। যে সময়ে অন্য দেশ—অন্য পল্লী প্রাণপণে উন্নতি লাভ করবার চেষ্টা করছে, সেই সময়ে আপনারা এই মিথ্যে পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, দলাদলি নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। এতে কি আপনাদের এতটুকু লজ্জা বোধ হয় না ? দেশের আজ কি দুর্দ্দিন তা একবার যথার্থ অন্তর দিয়ে ভেবে দেখুন, তারপর এসব করবেন। আমার শুভাদৃষ্টবশতঃ আজ আমি দেশের প্রাচীন ও তরুণদের এক জায়গায় পেয়েছি। আজ আমি এই সময়ে মেধা আর তার মা'র বিষয় নিয়ে আপনাদের দুটো কথা বলে যাব, তাতে কেউ ক্ষুন্ন হবেন না এই আমার প্রার্থনা। দেশের দিন দিন কি রকম অবনতি হচ্ছে সেদিকে আপনারা কেউ এখনও দৃষ্টি দেন নি। আপনারা বোঝার ওপর বোঝা চাপিয়ে দেশকে একেবারে অবনত করে ফেলেছেন যাতে তার কার্য্যকরী শক্তি বিনষ্ট হয়েছে, যাতে তার মাথা তুলবার যো নেই। এই দুঃসময়ে আমাদের দেশে কতকগুলি কর্ম্মী ছেলেমেয়ের দরকার ; এরা দেশের মাথা হতে বোঝা নামিয়ে দেবে, দেশের বুকের আবর্জ্জনা দূর করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। এরা আত্মোৎসর্গ করে দেশবাসীকে দেশলেবায় অনুপ্রাণিত করবে, সমস্ত দেশের ছোট বড় সবাইকে মঙ্গলের পথে এগিয়ে দেবে। আমাদের এই অধঃপতিত দেশে এ রকম যথার্থ কর্ম্মী একজনকে মাত্র দেখতে পেয়েছি, তার দৃষ্টান্ত দেশের তরুণদের মনে যে মহাপ্রাণতার সঞ্চার করেছে তাতে আশা করছি আমরা অনেকগুলি কর্ম্মী যুবক লাভ করতে পারব। আমরা পুরুষ কর্ম্মী পেয়েছিলুম, কিন্তু একা পুরুষ ঘর ও বার দুই সামলাতে পারবো না বলে ভগবান মেধার মত একটি তেজস্বিনী শক্তিময়ী মেয়েকে এনে দিয়েছেন। একটি হাতে যেমন কোন কাজই হতে পারে না, এক শক্তি দিয়ে তেমনি সমাজের কোন উপকার সাধিত হতে পারে না। দুইটি হাতে কাজ যেমন সুশৃঙ্খলার সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যায়, বাইরে পুরুষ শক্তি- অন্তঃপুরে নারী শক্তি জেগে ঐক্য রেখে কাজ করলে তেমনি অল্প সময়ের মধ্যে কাজ হয়। দেখুন গিয়ে প্রতুল বাইরে কাজ করছে—মেধা ভিতরে কাজ করছে। এই চাঁড়াল পাড়া, বামুন পাড়া, কায়স্থ পাড়া,—এমন কি মুসলমান পাড়াতেও রোগীর রোগ শয্যার পাশে মেধা বসে, প্রতুল পথ্য আনা, ওষুধ আনা, ডাক্তার ডাকা এসব কাজ করছে। আপনারা এতে বলতে চান মেধার সাহায্যের দরকার নেই, প্রতুলের আসারও কোন দরকার নেই ?"

বেচারাম ঘোষাল মাথা চুলকাইয়া—হ্যা উঁ করিয়া বলিলেন, "না, তা কেউ বলতে পারবে না সে কথা আমি বেশ স্পষ্ট করে বলছি। তবে কিনা—হিঁদুর ঘরের আচার বিচার গুলো—"

একটু হাসিয়া শিবনাথ বাবু বলিলেন, "আচার বিচার আপনি কাকে বলতে চান ঘোষাল মশাই ? আপনাদের রচিত কতকগুলো ভুল সংস্কারকে আপনারা আচার বিচার বলে মানেন আর সেইগুলো অন্যকেও জোর করে মেনে নেওয়াতে বাধ্য করেন। ভগবানের দত্ত যে আচার বিচার আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা লাভ করি, তারই জন্যে আমরা বিচার করতে শিখি, আচার পালন করে চলি। বড়

হয়ে আপনাদের গুরুজনের কাছ হতে যা শিখি তাকে আচার বিচার বলে না, সেটা সংস্কার মাত্র—যেমন এটা করতে নেই, ওটা ছুঁতে নেই ইত্যাদি। এই উচ্চ নীচ, জাতিভেদ জ্ঞানটা এসে জোটে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—কই ছোটবেলায় তো এ সব থাকে না। ছোটবেলায় মুসলমান বাগ্দী বামুন সব একসঙ্গে খেলা করে, তখন তো মনে হয় না বাগ্দী ডোম অথবা মুসলমানকে ছুঁলে স্নান করা দরকার। ধর্ম্ম বলতে একটিকে নির্দ্দিষ্ট করুন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কায়স্থ, হাড়ী, বাগ্দী, ডোম সবাই এই এক পর্য্যায়ভুক্ত। শ্রেণী-ভেদটা কি আমরা নিজেরাই গড়ে তুলিনি? প্রাচীনকালে লোকে কর্ম্মানুসারে উঁচু হতে পারত, এর শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বিশ্বামিত্র মুনি। তিনি ক্ষত্রিয় সন্তান হয়ে কর্ম্মবলে উচ্চ ব্রাহ্মণদেরও নমস্য হয়েছিলেন, কিন্তু আপনাদের যুগে হলে তিনি যা তাই তো থাকতেন। বর্ণগত পার্থক্য আপনারা অতিরিক্ত রকম বাড়িয়ে তুলেছেন, কেউ জিজ্ঞাসা করলে আমরা শ্রেণী—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কি কায়স্থ এই পরিচয়ই দিয়ে থাকি, আমরা যে হিন্দু, জোর করে এ কথা তো বলতে পারি নে। আমি ব্রাহ্মণ, সমাজে উচ্চশ্রেণীর আসন পেয়েছি, তাই কিছুতেই কোন অন্ত্যজের—যেমন চণ্ডাল, হাড়ি, জেলে এদের পাশে বসতে পারিনে বড় ঘৃণা করে এদের কাছ হতে দূরে বসি। ভাবতেও হাসি পায়—দেশ, এই শ্রেণীগত—বর্ণগত সংস্কার নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করে মরে। জাতটা আমাদের যেন কাঁচের মত ঠুনকো জিনিস, তাই এতটুকু ধাক্কা সামলাতে পারবে না ভেঙে চাতু হয়ে যাবে। যে ধর্ম্মের আমরা গর্ব্ব করি—সে ধর্ম্ম আমার পৃথক, একজন অস্পৃশ্য হিন্দুর পৃথক তো নয়; সেও যার উপাসনা করে, আমিও তারই উপাসনা করি। যে মাকে আমি প্রাণভরে ডেকে শান্তি পায়, সেই মাকে সেও প্রাণভরে ডেকে শান্তি পায়, তবে পার্থক্যটা কোনখানে বলুন দেখি? একই হিন্দু জাতির মধ্যে কতগুলো শাখা প্রশাখা বেরিয়েছে সেটা একবার ভেবে দেখেছেন কি? এই যে সংস্কার আমরা প্রথম লাভ করি কোথা হতে, সেটা দেখতে গেলে দেখা যাবে মায়ের শিক্ষা। আমাদের অন্তঃপুর সকল আচার বিচার সংস্কারের মূল স্থান, সন্তানেরা এখানে মায়ের কাছ হতে যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে তাই তাদের সারা জীবনের ভিত্তি হয় একথা বোধ হয় কাউকে আর বলে দিতে হবে না। এই সব জ্ঞানহীনা অন্ধ মা'দের দোষে সন্তানের চরিত্রগত অবনতি, ধর্ম্মগত অবনতি,—এক কথায় বলতে গেলে সকল রকমে অবনতি ঘটছে। মায়ের শিক্ষার ফলে সন্তানের চিত্ত অন্ধকার, সেই জন্যে কোনও নূতন ভাল কাজের প্রেরণা তাদের সঙ্কীর্ণ অন্তরে জাগতে পারে না, দেশের যথার্থ শুভ তাতে হচ্ছে না। দেশের উন্নতি, জাতির উন্নতি, ধর্ম্মের উন্নতি করতে গেলে সমাজের উদারতা দরকার, আর সমাজের সেই উদারতাটুকু লাভ করবার জন্যে সকল মা মেয়েদের উন্নতি হওয়া দরকার। মেধার মা তাঁর মায়ের কাছে শিক্ষা পাননি, কিন্তু তাঁর দীনদরিদ্র বাপ তাঁর অন্তরে যে শিক্ষার বীজ বপন করেছিলেন, এখন তাই বৃক্ষে পরিণত হয়েছে, তারই ফলরূপা মেধার মধ্যে সেই শিক্ষার মিষ্টতা অনুভূত হচ্ছে। আপনারা—"

বিরাট জনমণ্ডলীর একপ্রান্তে অনেকক্ষণ পূর্ব্বে একটা যে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি উঠিয়াছিল এই সময়ে তাহা রীতিমত একটা বিবাদ কোলাহলে পরিণত হইয়া গেল। একদিকে তরুণদলের কথা—অপরদিকে প্রাচীন দলের গম্ভীর অশ্লীল গালাগালিতে স্থানটা পূর্ণ হইয়া গেল, শিবনাথ বাবুর কথা আর শেষ হইতে পারিল না।

(১৫)

দেশের প্রাচীনদের মূলগত সংস্কার এবং তাহার জন্য মেধা ও সাবিত্রীর নির্য্যাতন শিবনাথ বাবুকে বড় বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। যদি একা নারায়ণ দাস মেধা সাবিত্রীর পক্ষে থাকিতেন, তাহা হইলে শিবনাথ বাবু এতটা কষ্ট অনুভব করিতেন না। তিনি দেখিতেছিলেন অভিভাবকহীনা এই দুইটি নারীকে নির্য্যাতন করিয়া গ্রাম্য প্রাচীনগণ অন্তরে কি বর্ব্বরোচিত আনন্দ উপভোগ করেন।

সেদিন তিনি সকালে যখন প্রাতঃভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন সেই সময় রামতনু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর সম্মুখে নারায়ণ দাস প্রমুখ প্রাচীনের দল গোলভাবে দাঁড়াইয়া গ্রামের শুভাশুভের কথা বলিতেছিলেন। প্রতুল ধনীর

সন্তান এবং গ্রামের অনেকখানি জমি তাহার অধিকারে থাকিলেও গ্রামের প্রাচীনেরা সংকল্প করিতেছিলেন তাহাকে রীতিমত ভাবে সমাজচ্যুত করিতেই হইবে, অপরাধ—সে মেধা ও সাবিত্রীকে আশ্রয় দিয়াছে।

শিবনাথ বাবুকে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলেই একটু থতমত খাইয়া গেলেন। তাঁহাদের মুখের বিকৃত ভাব দেখিয়া শিবনাথের মুখে একটু হাসি আসিল, তিনি সে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "আপনারা আমায় দেখে চুপ করে গেলেন কেন; যা বলছিলেন বলুন।"

বেচারাম ঘোষাল প্রথমটা থতমত খাইলেও বেশীক্ষণ সেরূপ অবস্থায় রহিলেন না; দর্পিতভাবে বলিলেন, "হ্যাঁ, তা বলব নাই বা কেন? আমরা তো মন্দ কথা কিছু বলি নি যে আপনাকে দেখে ভয় পেয়ে যাব শিবনাথবাবু? বলছিলুম—আমরা প্রতুলের মাকে গিয়ে জানাব হয় তিনি ওদের দুজনকে বাড়ী হতে বার করে দিন, না হয় সমাজচ্যুত হয়ে বাস করুন।"

নারায়ণ দাস মাথা দুলাইয়া বলিলেন, "ঠিক কথা। লোকে হাসতে হাসতে মরতে যায়, সমাজ ত্যাগ করবার কথা মনেও ভাবতে পারে না।"

শিবনাথবাবু বলিলেন, "হ্যাঁ, সেটা আপনাদের পক্ষেই খাটে নারায়ণদাস বাবু, এমন সমাজ ছেড়ে দিয়ে আপনারা বাঁচতে পারেন না। মেধা আর তার মা,—আপনার পৌত্রী ও পুত্রবধূর—"

নারায়ণ দাস শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আমার পৌত্রী পুত্রবধূ বলবেন না শিবনাথবাবু,—"

দৃঢ়কণ্ঠে শিবনাথবাবু বলিলেন, "আপনি না বললেই কি আমি ভয় পেয়ে যাব নারায়ণদাস বাবু? আমিই যে সে বিয়েতে বরকর্ত্তা কন্যাকর্ত্তা ছিলাম; সাবিত্রী মা'র হাত আমিই বরেণের হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সে বিয়েতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, যিনি পৌরহিত্য করেছিলেন, আমি সকলকে উপস্থিত করে দিতে পারি। আপনারা কি সে বিয়ের প্রমাণ চান?"

মুহূর্ত্ত কাল সকলেই নীরব, কেহই কথা বলিতে পারিলেন না। হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া দুই পা অগ্রসর হইয়া নারায়ণ দাস বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি,—তুমি আমার এই সর্ব্বনাশ করেছ শিবনাথ, এক পতিতাকে ধর্ম্ম সাক্ষী করে ব্রাহ্মণের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার ধর্ম্ম—"

ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠস্বর আর ফুটিল না।

শান্তভাবে শিবনাথ বলিলেন, "সর্ব্বনাশ করি নি অন্ততঃ এ বিশ্বাসটুকু আমায় করতে পারেন নারায়ণদাস বাবু। সাবিত্রী মায়ের বাপ আমারই বন্ধু ছিলেন; আমি তাঁর জীবনের সব ঘটনাই জানি, তবে সে সব কথা আজ আমি আপনাদেরকে বলতে চাই নে। বয়স্থা মেয়ে—অর্থাৎ তার বিয়ে দিতে না পেরে তিনি অবশেষে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তাঁর কষ্ট যথার্থই আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল, আমি আমার কর্ম্মস্থল—এলাহাবাদ হতে কলকাতায় ফিরে যোগ্য একটি পাত্রের খোঁজ করতে লাগলুম। সেই সময় দেশের সুযোগ্য ছেলে বরেণ এগিয়ে এল, সে বললে সাবিত্রী মাকে সে বিয়ে করবে। আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিয়েছি, আপনারা সকলে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পারেন।"

ক্রোধে নারায়ণ দাসের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, তিনি একটা কথাও আর বলিতে পারিলেন না।

ধীরকণ্ঠে শিবনাথ বলিলেন, "তারপর তাদের টাকাটা,—"

অতিকষ্টে নারায়ণ দাস রুক্ষতার ভাণ দেখাইয়া বলিলেন, "কিসের টাকা মশায়, আমি ওদের টাকার কথা কিছু জানি না।"

নম্রভাবে শিবনাথ বলিলেন, "দেখুন, বিচারটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ায় আপনার ওই একটি পৌত্রী ছাড়া আর কেউ নেই যে আপনার এত বিষয় সম্পত্তি ভোগ করবে। আজ একে সব হতে বঞ্চিতা করছেন, উল্টে তার বাপ তার নামে যা কিছু টাকা জমিয়েছিল তাও ফাঁকি দিয়ে নিলেন। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মশায়—যেন চটে উঠবেন না,—আপনি তো শ্মশানের দিকে পা বাড়িয়েছেন, আজ বাদে কাল সব ফেলে রেখে আপনাকে চোখ বুজতে হবে,—তখন এ সব ধনসম্পত্তি আপনার ভোগ করবে কে,—বারভূতেই নয় কি?"

নারায়ণ দাস যেরূপ চটিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মুখ

দেখিয়া জানা যাইতেছিল। তবে নাকি তিনি জরাজীর্ণ বৃদ্ধ, মারামারি করার মত শরীর উপযুক্ত নয়, সেইজন্যই খানিক বিস্ফারিত নেত্রে শিবনাথের পানে তাকাইয়া থাকিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

শ্যামসুন্দরবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন "যাক মশাই, ও সব কথা ছেড়ে দিন, ও ছাড়া আরও কথা আছে তাই হোক। ধরলুম—বরেণের স্ত্রী জারজা নয়, পতিতা নয়, তার ধর্ম্মসঙ্গত বিয়ে হয়েছে, কিন্তু তার মেয়ে যে—"

বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া শিবনাথবাবু বলিলেন, "থামলেন কেন বলুন।"

শ্যামসুন্দর বাবুকে কথা না বলিতে দিয়া বেচারাম ঘোষাল তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আমরা লোক পরম্পরায় শুনতে পেলুম—মেধা কুমারী নয়। তার নাকি খুব ছোটবেলায় বিয়ে হয়েছিল, তারপরে বিধবা হয়। এ কথাটা লুকিয়ে রেখে সমাজে কুমারী বলে তাকে চালিয়ে দেওয়ার দরকার যে কি তা তো বুঝলুম না।"

গোবিন্দ তর্কবাগীশ বলিলেন, "না বুঝবার মত এতে জটিলতা তো একটুও নেই হে বেচারাম, এর অর্থ জলের মত পরিষ্কার। শিবনাথ বাবুর বউমা আগে ঠিক করেছিলেন এখানে নারায়ণ দাসের আশ্রয়ে থাকলে সবাই তাঁকে তুলে নেবে, তখন তিনি অনায়াসে বিধবা মেয়েকে কুমারী বলে বিয়ে দিয়ে আর কোন ভদ্রলোকের জাতজন্ম খাবেন।"

প্রাচীনদের মধ্যে একটা বিপুল অট্টহাসির রোল উঠিল।

হাসি থামাইয়া বেচারাম ঘোষাল বলিলেন, "লোকে বলে—কলিযুগে নাকি ধর্ম্ম নেই। ধর্ম্ম আছে কি না আছে স্পষ্টই তা দেখা যাচ্ছে। ধরুন—মেধার মার সম্বন্ধে যদি প্রথম হতেই এ রকম গোলমাল না উঠত,—এতদিন কবে মেধার বিয়ে হয়ে যেত। এই দেখুন না—মেয়েটি সুন্দরী আর বয়স্থা বলে আমিই ভেবেছিলুম আমার ছেলে আত্মারামের সঙ্গে ওর বিয়েটা দেব। গিন্নী বলেন—ছেলে নাকি বদ হয়ে যাচ্ছে, একটি বড় মেয়ে চাই। অবশ্য যদিও তার বদ হওয়ার মত আমি কিছুই দেখি নি, তবে যে মাসে পনের কুড়ি রাত বাড়ী থাকে না, সে তার থিয়েটারের নেশার জন্যেই ; কিন্তু গিন্নি বলেন যে সে নাকি ওই কাওরা পাড়ায়, বাগ্দী পাড়ায় যেয়ে, সে নাকি মেধাকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করে। দূর হোক গিয়ে, ভাগ্যে বিয়ের কথা মুখে আনি নি, নইলে আমাকে সমাজচ্যুত হ'তে হতো যে।"

শিবনাথের মনের মধ্যে যে একটু দুর্ব্বলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, এতগুলি টিকা টিপ্পনি শুনিতে শুনিতে সে ভাবটা কখন চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। এইসব জঘন্য কথার উত্তরে অনেকগুলা শক্ত কথা তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু এই সব জঘন্য ধারণা বিশিষ্ট লোকেদের কাছে তাহা ব্যক্ত করিয়া ফল কি ?

শিবনাথকে নির্ব্বাক দেখিয়া তাঁহাকে দুর্ব্বল বোধে গোবিন্দ তর্কবাগীশ তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, "আপনাদের নূতন শাস্ত্রে বিধবা বিবাহও কুমারী বিবাহের সামিল হয়ে গেছে ; মেধার মায়ের বিয়েতে কর্ম্মকর্ত্তা হয়েছিলেন, মেধার বিয়েতেও হচ্ছেন তো ?"

উচ্ছ্বসিত ক্রোধ দমন করিয়া শান্তকণ্ঠে শিবনাথ বলিলেন, "ভগবানের আশীর্ব্বাদে মেধার উপযুক্ত পাত্র যদি পাই তর্কবাগীশ মশাই, মেধাকে তার হাতে সমর্পণ করব বইকি। আজ যদি বরেণ বেঁচে থাকত,—তার নিজের কাজের ফলে নিজেই সে অনুতপ্ত হতো বড় কম নয় ; কারণ শিশু কন্যার বৈধব্য সে নিজের খেয়ালেই ঘটিয়েছিল। সেই অনুতাপের ফলে এতদিন অনেক আগেই মেধার বিয়ে হয়ে যেতো, তার জন্যে আপনাদের এতটা ভাবতে হতো না।

শ্যামসুন্দরবাবু ব্যঙ্গভরা স্বরে বলিলেন, "উপযুক্ত পাত্র তো ঘরেই রয়েছে শিবনাথবাবু।"

শিবনাথ একটু হাসিয়া বলিলেন, "সত্য কথাই বলেছেন, আমি এতদিন এটা ভেবেও ভাবি নি। ভগবান যদি ইচ্ছা করেন, প্রতুলই মেধার সকল ভার নেবে, আপনারাও এই কুৎসিত ভাবনা, ধারণার হাত হতে নিস্তার পাবেন।"

দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন। এই বিশ্ব-নিন্দুকদের পানে চাহিতে তাঁহার ঘৃণা বোধ হইতেছিল।

(১৬)

"নিয়মিত প্রাত্যহিক আহ্নিকটি শেষ করিয়া অঞ্চলে ললাটের ধুলা মুছিতে মুছিতে সাবিত্রী পূজাগৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন, করুণাময়ী সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতে তাঁহাকে বলিয়া গেলেন, "তোমায় শিবু ঠাকুরপো একবার ডাকছেন ভাই; বাইরের ঘরে বসে আছেন। কথাটা নাকি ভারী জরুরি, একটু তাড়াতাড়ি করে তোমায় ডেকে দিতে বললেন।"

বাহিরের গৃহে তক্তাপোষের উপর বসিয়া শিবনাথ ও প্রতুল এই দেশ সম্বন্ধেই কি সব কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, সাবিত্রী প্রবেশ করিবামাত্র উভয়ের কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল।

সাবিত্রী ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি এমন জরুরী কথা বাবা যে আমায় তাড়াতাড়ি ডেকেছেন।"

বৃদ্ধ শিবনাথকে সাবিত্রী পিতৃ সম্বোধন করিতেন।

শিবনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ মা, বিশেষ দরকারী কথা আছে বলেই তোমায় তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়েছি। তুমি এখানে খানিক বসো; এখন বিশেষ কোন কাজ নেই তো?"

সাবিত্রী মাথা নাড়িয়া দরজার পাশে বসিয়া পড়িলেন।

প্রতুল উঠিয়া পড়িল, "আপনারা ততক্ষণ কথাবার্ত্তা বলুন, আমি মৈত্র মশাইকে একবার দেখে আসি। কাল রাত্রে নাকি তাঁর ব্যারামটা বড্ড বেড়েছিল, সকালেই ডাকতে লোক পাঠিয়ে দেছেন।"

সে চলিয়া গেল।

শিবনাথ অন্ধকারপূর্ণ মুখে অন্যমনস্কভাবে কোনদিকে চাহিয়া ছিলেন। সাবিত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমায় কি বলবেন বললেন যে বাবা—"

চমকাইয়া মুখ ফিরাইয়া শিবনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই কথা বলব বলেই তোমায় ডেকেছি। জানো মা, দেশের লোক একটা না একটা নিয়ে থাকতে চায়। আমি যখন তোমার পরিচয় দিলুম, তোমার বিয়েতে পুরোহিত প্রভৃতি যাঁরা ছিলেন তাঁদের আনবার কথা বললুম, তখন ওরা দেখলে তোমায় আর কিছু বলা যাবে না। এখন তারা তোমায় ছেড়ে মেধার পানে দৃষ্টি দিয়েছে।"

উৎকণ্ঠিতা সাবিত্রী বলিলেন, "আপনার এ কথা তো কিছুই বুঝতে পারলুম না বাবা।"

শিবনাথ বলিলেন, "তারা নাকি শুনেছে মেধার বিয়ে হয়েছিল, সে বিধবা। তারা আমায় জিজ্ঞাসা করেছে বিধবাকে বিধবা নামে পরিচিতা না করে কুমারী নামে পরিচিতা করার অর্থ কি?"

সাবিত্রীর মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হইয়া গেল। হায় রে, সত্য কখনও কি লুকানো যায়? আগুন যেমন চাপা দিয়া রাখা যায় না, কখন না কখনও সে তাহার নিজের রূপ বিকাশ করিবেই, সত্যও তেমনি কোনদিন না কোনদিন প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। যথার্থই তো, মেধার সত্য পরিচয় কেন তিনি দেন নাই, কেন তাহাকে তাহার স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ করেন নাই? তিনি তো আজীবনকাল জানেনই সত্য কখনও গোপন থাকে না, তবে জানিয়া শুনিয়া এ সত্যকে কেন চাপা দিয়া রাখিতে গিয়াছিলেন?

এ 'কেন'র উত্তর কে দিবে আর দিলেই বা কে শুনিবে? মেধা যে তাহার পিতাকে দেবতার মত ভক্তি করে। সে জানে তাহার পিতা যাহা করিয়াছেন তাহাই তাহার শুভ হইয়াছে। সে তো জানে না যে তাহার মূল জীবনখানাই তাহার অজ্ঞাতে পিতা একেবারে শূন্য করিয়া দিয়াছেন, পাছে সেই শূন্যতার বেদনা তাহাকে কষ্ট দেয় তাই তিনি ইহা উহা দিয়া সে ফাঁকে তালি দিয়াছেন। তিনি পিতা হইয়া যে মর্ম্মভেদী কথা কন্যাকে বলিতে পারেন নাই, সাবিত্রী মাতা হইয়া কেমন করিয়া তাহা বলিবেন? মাতা হইয়া কোন নারী সন্তানকে এ পর্য্যন্ত থান পরিতে অনুরোধ করিতে পারিয়াছে কি?

সাবিত্রী নিজে কোন কথা না বলিলেও জানিতেন এ সত্য আর কাহারও কাছে না হোক—একদিন মেধার কাছে স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, সে নিজেই তখন তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে। দিন এমন হঠাৎ আসিয়া পড়িবে তাহা সাবিত্রী ভাবেন নাই, তাই থতমত খাইয়া গিয়াছিলেন।

সাবিত্রীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের পানে তাকাইয়া শিবনাথ শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "এই গোলমালটা যেমন করেই হোক

আমাদের মিটাতেই হবে, মিটাবার উপায়ও আমি ঠিক করেছি, এখন কেবল তোমার মত পেলেই হয়।"

সাবিত্রী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "কি উপায় বাবা ?"

শিবনাথ বলিলেন,—"উপায় মেধার আবার বিয়ে দেওয়া।"

সাবিত্রী চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেলেন, শুষ্ককণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না, এ হয় না।"

দীপ্ত হইয়া উঠিয়া শিবনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ?"

সাবিত্রী শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "তা কি কখনও হ'তে পারে বাবা ? মেধার বিয়ে—সে যে বিধবা, বাবা।"

শিবনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা আমিও জানি যে সে বিধবা, সেই পুরাণো কথাটা আমায় আজ নূতন করে তোমায় মনে জাগিয়ে দিতে হবে না মা। আমি সব জেনে শুনেই মেধার বিয়ে দিতে চাচ্ছি, বিয়ে দেবও।"

সাবিত্রী রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি চাইলেও আমি যে তা চাইতে পারছি নে বাবা।"

কেন চাইতে পারবে না ? এই একটা ভুল সংস্কারের জন্যে তুমি মা শুধু নিজের সুখ স্বচ্ছন্দ্যতা হারাচ্চো না; তোমার মেধার জীবনটা একেবারে ব্যর্থ করে দিচ্ছো। মনে কর—যখন তার বিয়ে দিয়েছিলে, তখন সে কতটুকু মেয়ে ছিল, কতখানি তার জ্ঞান ছিল। আজ তাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি তার বিয়ের কথা, সে অবাক হয়ে তোমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকবে। তোমার যে গোড়াতেই ভুল হয়েছে মা, কেন তাকে জানাও নি সে পৃথিবীতে বাস করেও পৃথিবীর আশা আনন্দ সুখ হতে চিরবঞ্চিতা, কেন তাকে সেই রকম নির্লিপ্তভাবে গড়ে তোল নি, কেন তাকে জানিয়েছ সে কুমারী জীবনে রয়েছে। পাঁচ বছর বয়সের সময়ে একটি রাতে কি ঘটনা ঘটেছিল, আজ এগার বার বছর পরে' সে কেমন করে হঠাৎ সে কথা মনে করবে ?"

সাবিত্রী অপরাধিনীর মত অবনত মুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন; অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ তুলিয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আগে এতটা বুঝিনি বাবা, এখন বুঝছি কিন্তু এখন আর বুঝেও কোন লাভ নেই। তবু এখনও কি তাকে বলে বুঝিয়ে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার—"

একটু হাসিয়া শিবনাথ বলিলেন, "কি কথা বলছো মা ? তুমি তাকে এখন ব্রহ্মচর্য্য শিখাবে—কিন্তু সে যখন জিজ্ঞাসা করবে কেন—তখন কি উত্তর দেবে ? তখন তাকে তুমি বলতে পারবে—এতটুকু বয়সে তার পুতুল খেলার মতই বিয়ে দিয়েছিলে, দুদিন না যেতে তার সেই স্বামী তাকে বিধবা শ্রেণীভুক্তা করে রেখে চলে গেছে ? সে যখন বলবে সে কার স্মৃতি মনে জাগিয়ে রেখে একাগ্রতার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য পালন করবে, তখন তুমি তার সামনে কোন্ ছবি ধরবে মা ?"

সাবিত্রী চুপ করিয়া রহিলেন।

শিবনাথ বলিলেন, "তুমি এখন তাকে বলবে সে মানুষের নয়—দেবতার, কিন্তু সেটা কি হঠাৎ সে মনে ধরে নিতে পারবে মা ? এতখানি জীবনের মধ্যে কোনদিন সে হয় তো ভাবে নি সে পৃথিবীর মধ্যে বাস করেও পৃথিবীর মধ্যে নেই; হয় তো—হয় তো কেন নিশ্চয়ই—সংসারে প্রবেশ করবার, স্বামীর স্ত্রী হওয়ার, সন্তানের মা হওয়ার বাসনা তার মনে বিরাজ করছে, তুমি হঠাৎ যখন তাকে বলবে জ্ঞান না হতে সে স্বামীর স্ত্রী হয়েছিল—তাহার জ্ঞান না হতে সে স্বামীকে হারিয়ে বসেছে, তখন সে আঘাতটা তার মনে কতখানি গভীর ভাবে বাজবে সেটা একবার মনে করে দেখেছ কি ?"

সাবিত্রী মুখ তুলিলেন, "কিন্তু বাবা—"

শিবনাথ বলিলেন,—"আবার কিন্তু কি মা ?"

সাবিত্রী চাপাসুরে বলিলেন,—"আমি হিন্দু—"

শিবনাথ বলিলেন, "হিন্দু সমাজ বিগর্হিত কাজও তো এ নয় মা, হিন্দুত্বকে বাঁচিয়ে রেখেই একাজ হবে। যে শিশুকালে বিধবা—তার অনায়াসে বিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এ দুই একজন সংস্কারবাদী এতে আপত্তি করলেও সে আপত্তি টেঁকবেনা, যাদের যথার্থ অন্তর আছে, প্রাণ আছে, তাঁরা এতে অনুমোদন নিশ্চয়ই করবেন। দেশের লোকে এ নিয়ে দুদিন আন্দোলন করবেন, তারপর নিজেরাই মেনে নেবেন।"

সাবিত্রী বেদনার হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মেনে নিলুম বাবা, মেধার আবার বিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পাত্র পাব কোথায় ? জেনে শুনে বিধবাকে বিয়ে করবে এমন সাহস কার আছে ?"

শিবনাথ উত্তর দিলেন, "প্রফুল্লের আছে।"

সাবিত্রী নির্ব্বাকে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন।

জোর করিয়া শিবনাথ বলিলেন, "হ্যাঁ আমি বলছি প্রতুলের আছে, আমি জানি সে মেধাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণ করতে চায়, কারণ মেধার মত উপযুক্ত মেয়ে পাওয়া কঠিন। তুমি নারী হয়ে যা লক্ষ্য করতে পারো নি মা আমি তা লক্ষ্য করেছি, আমি বেশ জেনেছি—এদের দুইটি জীবন যদি একসঙ্গে গেঁথে দেওয়া না যায় দুইটি কর্ম্মীর অক্লান্ত কর্ম্মের অবসান হবে। এর জন্তে মেধাকে প্রতুলকে বিন্দুমাত্র দোষ দিতে পার না মা, কেন না, এরা জানে না এদের মাঝখানে কি বিরাট বাধা দাঁড়িয়ে আছে, এরা তাই পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা এদের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী, আমাদের কি উচিৎ যে কঠিন হাতে এদের দুজনকে দুদিকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া—দুইটি জীবন একেবারে ব্যর্থ করে দেওয়া? জোর করে একটা অন্যায়কে ন্যায় বলে চালানো যেতে পারে না এটা তো বেশই জানো মা? আমাদের শাস্ত্রানুসারে সেকালে বিধবা সহমরণেও যেতে পারতেন, ব্রহ্মচর্য্য পালনও করতে পারতেন, আবার ইচ্ছা হলে বিবাহিতাও হতে পারতেন। এটা কিছু বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে নেই যে বিয়ে করতেই হবে অথবা বিয়ে করতে পারবে না। প্রবৃত্তি অনুসারে যার খুসি হবে সে বিয়ে করবে, যার খুসি হবে না সে বিয়ে করবে না এমনি নিয়মই বরাবর চলে এসেছে। যে বিধবাকে ধরে বেঁধে ব্রহ্মচর্য্য পালন করাতে হয় অথচ তাদের মনটা থাকে শুধু কামনা বাসনার দিকে আমার মতে তাদের আবার বিয়ে দিয়ে একটা বাঁধনের মধ্যে রাখা উচিত। যাতে সমাজে অবাধ ব্যভিচারিতার প্রশ্রয় না হয়, অনেক গুলি সন্তান বিনষ্ট না হয় সেই ব্যবস্থা সবারই করা দরকার। না, তুমি মা আর কোন কথা বলতে পারবে না, তোমার বিয়ে দিয়েছিলুম, তোমার মেয়ের বিয়েও আমায় দিতে দাও।"

সাবিত্রী নীরবে পদাঙ্গুলী খুঁটিতেছিলেন, শিবনাথের যুক্তির প্রতিবাদ করার মত কথা তিনি একটাও তখন খুঁজিয়া পাইতে ছিলেন না।

শিবনাথ উঠিতে উঠিতে বলিলেন, "আমার এই কথা গুলো তুমি মা, ভাল করে বুঝে দেখ গিয়ে, এর মধ্যে অন্যায় অসত্য একটুকুও খুঁজে পাবে না। আমি যে কথা বলছি, এ নূতন কথা নয়, চিরপুরাণো কথা,—যা চিরকাল অনেকে বলে আসছেন—তাই। এখন আমি আসি তুমি ও বেলা তোমার মতটা আমায় জানালে আমি প্রতুলের কাছে এ কথা তুলব, তার মত পেলে তার মাকে—শেষকালে সমাজকে আমি জানাতে পারব।"

তিনি চলিয়া গেলেন।

সাবিত্রী মুহ্যমানা ভাবে বসিয়া এই কথাটা ভাবিতে লাগিলেন। কথাটা শিবনাথের কাছে নূতন না হইলেও তাঁহার কাছে একেবারেই নূতন তিনি ভাবিয়া কিছুতেই ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না ইহা কি রূপে সম্ভব হইবে, বিধবা মেধা কেমন করিয়া সধবা শ্রেণী ভুক্ত হইবে?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

(১৭)

সকাল হইতে আজ মেধার সন্ধান পাওয়া যাইতেছিল না, তাহার নিয়মিত কাজ পূজার যোগাড়টি করিয়া দিয়া সে আজ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছিল।

মেধাকে বাড়ীতে না দেখিয়া করুণাময়ী একটু ব্যস্ত ভাবে সাবিত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ মেধাকে যে দেখতে পাচ্ছি নে, কোথা গেছে— বলে গেছে কি?"

উৎকণ্ঠিতা সাবিত্রী বলিলেন "কই না, আমায় তো কিছু বলে যায় নি।"

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল মেধা ফিরিল না। অবশেষে পাড়ার একটি ছোট মেয়ে সন্ধান দিল মেধা বাগানে আছে।

ব্যস্তভাবে সাবিত্রী বাগানে প্রবেশ করিলেন।

আজ মেধা বাগানে সকাল হইতে এতবেলা পর্য্যন্ত কেন রহিয়াছে এই সন্দেহ তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়া ছিল।

মাধবীকুঞ্জের মধ্যে মেধা উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া ছিল, তাহার মুখখানা দুই বাহুর মধ্যে লুক্কায়িত, আজানুলম্বিত কুঞ্চিত কৃষ্ণ চুলগুলা অসংযত ভাবে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

সমস্ত বাগানটা তখন বৈশাখের দারুণ রৌদ্রে তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, ফুল পাতা দারুণ রৌদ্রতাপে শুকাইয়া উঠিতেছে।

ইহার মধ্যে এই মাধবী কুঞ্জটি বেশ শান্তিপূর্ণ আরামপ্রদ স্থান ছিল, এখানে রৌদ্রতাপ আসিতে পারে নাই।

"মেধা—"

মায়ের আহ্বানে মেধা চমকাইয়া মুখ তুলিল, তাহার সমস্ত মুখখানা আরক্ত, চক্ষু দুইটী স্ফীত আরক্ত। মুহূর্ত্তের জন্য মায়ের দিকে চাহিতেই প্রবল অশ্রু আসিয়া পড়িয়া তাহার দৃষ্টি ঝাপসা করিয়া দিল, সে আবার দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইল।

মা কতকটা আন্দাজে ধরিয়া লইলেন, তবুও জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে এই ধুলো আর শুকনো পাতার পরে শুয়ে আছিস কেন মেধা? শরীর খারাপ করলেও ঘরে তো জায়গা ছিল, বিছানাটায় গিয়ে শুয়ে পড়লে পারতিস।"

মেধা উত্তর দিল না, মুখও তুলিল না।

কন্যার পার্শ্বে বসিয়া পড়িয়া তাহার অসংযত চুলগুলা এক করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিতে দিতে সাবিত্রী বলিলেন, "কি হয়েছে মা তোর, আমায় কি কিছু বলবি নে? তুই তো কোনদিন আমার কাছে কিছু লুকাস নি মেধা, চিরদিন তোর যা কিছু কথা সবই তো আমার কাছে বলে ফেলে নিজেকে হালকা করে ফেলেছিস মা।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরটা বড় বেসুরা শুনাইল।

"হ্যা মা, এ রকম করে কাঁদছিস কেন, কেউ কি তোকে কিছু বলেছে? আমায় আজ সব কথা বলবি নে মেধা, আমি যে তোর মা, আমার যে তুই ছাড়া এ জগতে আর কেউ নেই মা।"

তাঁহার চোখ দিয়া অজ্ঞাতে দুইফোঁটা জল উছলাইয়া মেধার হাতের উপর পড়িল।

মেধা আবার একবার মুখ তুলিল তাহার পর অশ্রুসিক্ত মুখখানা মায়ের কোলের মধ্যে লুকাইল, ক্ষুদ্র বালিকার মতই উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া বলিল, "আমায় আগে কেন এ সব কথা জানাও নি মা? কেন বল নি আমি বিধবা, সংসারের যা কিছু ভাল—যা কিছু শুভ তাতে আমার অধিকার নেই? আমি যে তা হলে আগে—"

তাহার কণ্ঠ একেবারেই রুদ্ধ হইয়া গেল।

তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কান্নাভরা সুরে সাবিত্রী বলিলেন, "ওইখানেই আমার বুকে ভীষণ দুর্ব্বলতা জেগে উঠেছিল মেধা, আমি এ জগতে কাউকে জানাতে পারি নি, তোকেও জানাতে পারি নি তুই বিধবা—তুই সংসারের সকল শুভ হতে চিরতরে বঞ্চিতা। আমি ভগবানকে ভুল বুঝেছিলুম, তিনিই আঘাত দিয়ে আমার এই ভুলটা আজ ভেঙ্গে দিয়েছেন। মনে ভেবেছিলুম—এ কথা লুকিয়ে ফেলি, যেন কেউ না জানতে পারে, ও শুনতে পায়। আজ আমার বড় ভুল ভেঙ্গে গেছে রে, আজ আমি বুঝেছি সেই ভুল বিশ্বাস নিয়ে বসে থাকলেই চলে না, তার প্রতিবিধান করবার চেষ্টাও করতে হয়। মানুষের যতক্ষণ ক্ষমতা—সে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করুক, অদৃষ্ট বলে সব জিনিষকেই মেনে নিলে চলে না। আমার সে দুর্ব্বলতা আজ স্বীকার করছি আর তার সঙ্গে প্রতিবিধানের উপায়ও ঠিক করে নিয়েছি। সকল দ্বিধা, তর্ক ছেড়ে দিয়ে আমিও আজ মেনে নিচ্ছি আমার ভুল শুধরানো যাবে, আমি সকল দিক সামলাতে পারব।"

"তোমরা আবার আমার বিয়ে দেবার কথা বলছো মা, না মা ও কথা মনেও ভেবো না,—আমি বিয়ে করব না; আমার বিয়ে হয়েছিল তো, অদৃষ্টে বৈধব্য ছিল বলেই বিধবা হয়েছি। দেবতার পূজায় একদিন যে ফুল উৎসর্গ হয়ে গেছে তা দিয়ে আর কি পূজো হতে পারে? আমি যে উৎসৃষ্ট ফুল, আমার দ্বারা আর দেবপূজা হবে না মা, আমি যা— আমায় সেই ভাবেই থাকতে হবে যে।"

দুই হাতের মধ্যে মুখ লুকাইয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

সাবিত্রী জোর করিয়া তাহার মুখ হইতে হাত সরাইয়া দিলেন, অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া দিতে দিতে তিনি বলিলেন, "তুই উৎসৃষ্ট এ তোর ভুল ধারণা মেধা। তোকে অর্ঘ্যরূপে সাজিয়ে যার পায়ে দেওয়া হ'ল, সে তোকে নিলে কই? যদি নিত তা হলে দুইটি মাস না যেতে চলে যেত না। পাঁচ বছরের মেয়ে তুই, ভাল করে সব কথা তখনো বলতে শিখিস নি; বুঝতেও পারলি নে কি তোর অদৃষ্টে এল—আবার কখন সে চলে গেল। তখন তুই উপযুক্ত হ'স্ নি বলে তোর সে পূজা অসার্থক হয়ে গেল, কোন ফল

লাভ করতে পারলি নে। ওরে, তোর সারা চিত্ত ভরে আজ পূজার ফুল ফুটে উঠেছে, দেবতার পায়ে পড়বার জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠেছে, ওদের শুকিয়ে মারিস নে, নিজেকে পূজা হতে বঞ্চিতা করিস নে। শুধু তুই একাই তো ব্যর্থ হবি নে মেধা, তোর সঙ্গে আর একটি জীবনও যে ব্যর্থ হয়ে যাবে, সে কথা কোনদিন ভেবে দেখেছিস কি? মা, আমিও আগে জোর করে বলতে গেলুম বিধবার কখনো কি বিয়ে হতে পারে? অন্তর হতে কে আমার সকল দ্বিধা খণ্ডে দিলে, সেই সত্যের বাণী। আমি মিথ্যে তর্ক ছেড়ে দিলুম—কেন হবে না? পাঁচ বছর বয়সের কথা মানুষের মনে থাকে না, তুই কি নিয়ে তন্ময়তা লাভ করবি, কাকে ধরবি, কাকে ডাকবি? না, তোর বাপের আদেশ আমি পালন করব। তিনি বলে গেছেন—যদি সুযোগ্য পাত্র পাও—যে জেনে শুনে মেধাকে ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ করতে চায়, তার হাতে মেধাকে দিয়ো। আমি আর কারও কথা শুনব না মেধা, আমার স্বামী,—তোর বাপের আজ্ঞা পালন করে যাব। ওঠ মা, তুই যে এ রকম ভাবে এখানে পড়ে রইছিস, লোকে দেখলে শুনলে কি ভাববে বল দেখি? দিদিই বা কি মনে করবেন তা ভেবেছিস কি একবার? ওঠ পাগলী,—আমার সঙ্গে বাড়ী চল।"

মেধা উঠিল।

(১৮)

হঠাৎ মেধার প্রকৃতি যেরূপ ভাবে বদলাইয়া গেল, মেধা যেরূপ গম্ভীর হইয়া পড়িল তাহাতে প্রতুল ভারী মুষড়াইয়া পড়িল। সে ভাবিয়া ঠিক পাইল না মেধার এরূপ ভাবান্তরের অর্থ কি?

সেদিন সন্ধ্যার পরে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে বেড়াইয়া আসিয়া মায়ের সন্ধানে দ্বিতলে ছাদে গিয়া দেখিল মেধা একা মুক্ত ছাদে জ্যোৎস্নালোকে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। এরূপ নির্জ্জনে একা থাকা মেধার মত হাস্যমুখী চঞ্চলা তরুণীর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলিয়া প্রতুল জানিত, তাইতেই সে অতিরিক্ত রকম বিস্মিত হইয়া গেল।

"মা কোথায় মেধা? এখানে ছিলেন না?"

প্রতুলের কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র মেধা ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল; গায়ে কাপড়খানি যথাসাধ্য ক্ষিপ্রহস্তে টানিয়া দিতে দিতে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "মা নীচেয় গেছেন, আপনি নীচেয় যান, তাঁকে পাবেন।"

শ্রান্তভাবে আলিসার উপর বসিয়া পড়িল,—"আর ঘুরতে পারছি নে। এখানে খানিক বসে থাকলে তোমার কোনও অসুবিধা হবে না তো মেধা?"

মেধা সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল, "না না, অসুবিধা হবে কেন, আপনি বসুন না?"

কিন্তু নিজেই সে অনেকখানি কুণ্ঠায়, লজ্জায় ভরিয়া উঠিয়াছিল, এখন যেন সে পালাইতে পারিলেই বাঁচে। এখন সে উঠিয়া যায়ই বা কি করিয়া, প্রতুল কি ভাবিবে? নাঃ, প্রতুলের সরল মনে এ ছায়া দিবার দরকার নেই, সে যেমন প্রফুল্ল ভাবে বেড়াইতেছে, কাজ করিতেছে, তেমনই করিয়া যাক। এই সুদীর্ঘ একটা বৎসর মেধা যেখানে আছে সেখানে প্রতুলের সাহচর্য্য তাহার নিত্যকার প্রতি মুহূর্ত্তের, আজ কেমন করিয়া সে সরিয়া যাইবে?

চোখ ফিরাইয়া সে আকাশের পানে চাহিল। আজ আষাঢ়ের আকাশ নবীন নীরদ মেঘমালায় ভরিয়া উঠে নাই, সে আকাশ মুক্ত, অসংখ্য তারা ও সপ্তমীর ক্ষীণ চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীর গায়ে চাঁদের ক্ষীণ আলো ছড়াইয়া পড়িয়া সব হাসাইয়া তুলিয়াছে, জগতে আজ আলোর ছড়াছড়ি, আনন্দের উচ্ছ্বাস, শুধু মেধার হৃদয়েই দারুণ অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে।

সে আজ দিনের মধ্যে কতবার ভাবিয়াছে বিধবার মত সেও দিন কাটাইবে। তাহার মা;—প্রতুলদার মা যেমন আপনাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, পরলোকগত স্বামীর স্মৃতি মনে রাখিয়া যেমন দশের সেবা করিয়া জীবন কাটাইতেছেন, সেও তেমনি করিয়া জীবন কাটাইবে, জীবনে একটা লক্ষ্য সে স্থির করিয়া রাখিবে।

কিন্তু হায় রে, অন্তর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সে যে কিছু পায় না, যাহা ধরিয়া রাখিয়া সে কর্ম্মের স্রোতে তাহার জীবন তরণী বাহিবে। মেধা কতবার আছাড় খাইয়া পড়িল, তবে সে কি লইয়া জীবন কাটাইবে, মনের মধ্যে স্বামীর স্মৃতি

এতটুকু নাই যাহা সে আশ্রয় করিতে পারে, যাহা তাহার বিচলিত মনকে সুপথে আনিতে পারিবে। বহুকালের অতীত সেই ছোটবেলাকার কথা সে কতবার ভাবিয়াছে ; পুতুল খেলা, স্কুলে যাওয়া, সঙ্গিনীদের কথা সবই তো মনে পড়ে, কোন বালকের তো তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে না। হৃদয়ের পানে তাকাইয়া সে এ কাহার মূর্ত্তি দেখিতে পায়, সে যে আরও অধীর হইয়া উঠে। প্রাণপণ চেষ্টায় সে এ মূর্ত্তিকে স্থানচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু ইহাকে এতটুকু সরাণোর ক্ষমতা তো তাহার হয় নাই। আর্ত্তকণ্ঠে কাঁদিয়া সে তাই বলিতেছে,—"আমায় একি করলে প্রভু, আমার অজ্ঞাতে কাকে আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠিত করলে ?

প্রতুলের পানে সে চোখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না, চাহিবার তাহার অধিকার কই ? আপনার হৃদয়ের পানে তাকাইয়া আজ সে অতিরিক্ত রকম সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িয়াছে। কাল পর্য্যন্ত যে প্রতুলের পানে সে অকুণ্ঠিত ভাবে চাহিয়াছে, তাহার সহিত মিশিয়াছে, আজ সেই প্রতুলের পানে চাহিতে, তাহার সহিত কথা বলিতে তাহার সাহস হইতেছিল না।"

"মেধা—"

অবাধ চিন্তাস্রোতে হঠাৎ বাধা পাইয়া মেধা চমকাইয়া উঠিল, মুখখানা তুলিতেই সুস্পষ্ট জ্যোৎস্নার আলোয় সে দেখিতে পাইল প্রতুলের ব্যগ্র দুইটি চোখের দৃষ্টি তাহারই মুখের উপর স্থাপিত।

প্রতুল জিজ্ঞাসা করিল, "আজ তোমার কি হয়েছে মেধা, সারাদিনটা যেন আমার কাছে গোপন থাকতে লুকিয়ে রয়েছ। বিকেলে তোমায় ডাকলুম, তুমি যেন সে কথা না শুনতে পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেলে। তোমায় আজকের এ উদাসীনতার কারণ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে মেধা।"

মেধা অকারণ প্রচুর ঘামিয়া উঠিল,—"এদিকে অনেকগুলো কাজ পড়েছে সেইজন্যে "

প্রতুল জোর করিয়া বলিল, "ও কথা বললে আমার বিশ্বাস হয় না। আজ তোমার এমন কোন নতুন কাজে হাত দিতে দেখি নি যার জন্যে তোমায় সমস্ত দিন এত ব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে। কি ব্যাপার ঘটেছে, আমার কাছে তুমি তা লুকিয়ে রাখবে মেধা, আমায় তুমি কিছু জানাবে না ?"

তাহার কথার মধ্যে অনেকখানি আগ্রহ, অনেকখানি বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছিল, মেধার বুকে সে আঘাত বাজিল। সে মাথা নত করিয়া বসিয়া রহিল ; তাহার ভয় হইতেছিল কথা কহিতে গেলেই গোপন আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িবে, সে ধরা পড়িয়া যাইবে।

প্রতুল অনেকক্ষণ নীরবে তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া রহিল ; একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস অতি সাবধানে ফেলিল—যেন মেধা শুনিতে না পায়। ধীর সুরে বলিল, "বুঝেছি, আমায় বিশ্বাস করে কোন কথাই তুমি বলতে চাও না। একটা বছর নিয়ত যাদের কাছে আছ তাদের তুমি বিশ্বাস করে কোন কথা বলতে পার না, এখনও তুমি আমাদের এত পর ভাব কিন্তু মেধা, ভগবানের যদি অভিপ্রেত হয়—যাকে ক্ষণিকের সঙ্গী পেয়েছ, তাকেই তো চিরকালের সঙ্গী করতে হবে, তখন যা কিছু গোপন কথা সব তো তাকেই বলতে হবে।"

বজ্রাহতার মত মেধা চমকাইয়া বিবর্ণমুখে প্রতুলের পানে একবার তাকাইল।

'না না, ও কথা বলবেন না, ও কথা বলবেন না।" সে দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিল।

তেমনি ধীর সংযত কণ্ঠে প্রতুল বলিল, "কেন বলব না মেধা। তুমি নিজেকে দরিদ্রা বিধবার মেয়ে মনে করে আমার স্ত্রী হওয়ার অযোগ্য বলে মনে কর, কিন্তু আমি তা মনে করি নে। তোমায় স্ত্রীরূপে পেলে আমি আমার জীবনকে ধন্য মনে করব, কারণ আমার জীবনের কোনদিকে যদি এতটুকু অপরিপূর্ণতা থাকে তা পূর্ণ করে দিতে পারবে তুমিই। সকল পুরুষ নিজের স্বভাবানুযায়ী স্ত্রী পাওয়ার কামনা করে, আমিও সেই জন্যেই তোমায় কামনা করে আসছি মেধা। আমি যে রকম নারীর চিত্র কল্পনায় এঁকেছিলুম, তুমি ঠিক তাই। এতকাল এ কথা প্রকাশ করতে পারি নি মেধা, আজ তোমার এই গোপনতা আমায় আমার গোপন কথা প্রকাশ করতে বাধ্য করলে। আমি জানি—তুমি আমায় ভালবাস, হ্যাঁ, তুমি কিছু না বললেও

আমি আমার অন্তর দিয়ে তা জানতে পেরেছি। বল মেধা,—আমার এ ধারণা মিথ্যা নয়, আমার ধারণা সত্য তো?"

মেধা দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢাকিয়া তেমনিই থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। হায় দেবতা, তোমার এ অর্ঘ্য লইয়া আসিয়াছ কাহার দ্বারে? এ পাষাণীর মন্দিরের পাষাণ দ্বার যে চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এ দ্বার খুলিয়া দিবে কে?

"আমায় ক্ষমা করুন,—আমি—"

বলিতে বলিতে মেধা প্রতুলের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল, দুই চোখের জলে ভাসিয়া উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলিল, "আমি বিয়ে করতে পারব না। আমায় তফাৎ করে রাখুন, আমি আপনার উপযুক্ত কিছুতেই হ'তে পারব না।"

বিস্মিত প্রতুল বলিল, "কেন তফাৎ করে রাখব মেধা, কিসে তুমি আমার অনুপযুক্ত?"

হাঁফাইয়া উঠিয়া মেধা বলিল, "কিসে, সে কথা আজ কেমন করে জানাব, তবু আমায় সেই সত্য কথাই বলতে হবে। আমি বিধবা, তুমি চমকে উঠো না, আমায় দূরে রেখে চলে যাও, আমি সত্যই বিধবা। পাঁচ বছর বয়সে শুনছি আমার বিয়ে হয়েছিল, দুমাস না যেতে বিধবা হয়েছি। এতকাল কেউ সে কথা আমায় বলে নি। আজ শুনতে পেয়েছি—আজ জানতে পেরেছি—আমি—"

মেধা উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিতে লাগিল।

প্রতুলের মনে হইল নিমেষে এমন জগতখানা যেন উল্টাইয়া গেল, শুভ্র জগতখানা যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বিমূঢ় প্রতুল মেধার পানে তাকাইয়া রহিল।

"ওগো, সত্য কথাই আজ তোমায় বলব। কেন তা বলব না, আজই যে আমার বলার দিন এসেছে। আমি কাল পর্য্যন্ত তোমাকেই স্বামীরূপে পাওয়ার কামনা করেছি, শিবপূজা করে প্রার্থনা করেছি যেন তোমাকে স্বামীরূপে পাই। আজ যখন আমার কানে এল আমি বিধবা—তখন মনে হল আমার বুকখানা যেন শতধা হয়ে গেল, আমি মূর্চ্ছিতার মত মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লুম। আর আজই—আমার সেই বেদনায় আরও বেদনা দিতে আজই তুমি জানাতে এলে—আমাকেই তুমি ভালবাস, আমাকেই তুমি স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে চাও?"

বড় অভাগিনীর মতই মেধা কাঁদিতেছিল,—"কেন আর দুদিন পরে জানালে না; আমি যে সে দুদিনে আমার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিতুম।"

প্রতুল তাহার হাতখানা নিজের কোলে তুলিয়া লইল, শান্তকণ্ঠে বলিল, "ভগবানকে ধন্যবাদ যে আজই আমি এ কথা বলেছি, দুদিন পরে বলতে গেলে তোমায় তো আমি খুঁজে পেতুম না মেধা। আমি এর জন্যে তোমায় ঘৃণা করতে পারছি নে, শ্রদ্ধায় আমার হৃদয় আরও ভরে উঠছে। আমি তোমায় গ্রহণ করব মেধা, তোমায় আমার জীবনের পথে টেনে নেব। আমি জোর করে কোনদিন তোমার কাছ হতে কিছু আদায় করতে চাইনি মেধা, আজও কিছু চাইব না, শুধু এই মতটা দাও—আমায় সঙ্গী করে তোমার পাশে রাখো। আমি সমাজকে সগৌরবে জানাব,—তারা যাকে সংসারের উচ্চস্থানে রাখার নাম দিয়ে অত্যন্ত কদর্য্য ঘৃণ্য স্থানে রেখে দেয়, তাদেরই মধ্য হতে এক অভাগিনীকে তুলে নিয়ে আমি আমার ধর্ম্মপত্নী, আমার জীবনের সহচরীণ করেছি। আমার মা এতে আনন্দের সঙ্গে মত দেবেন, কত দিন মাকে আমার এই রকম শিশু বিধবার দুঃখে চোখের জল ফেলতে দেখেছি। বল মেধা, আমি এখনই মাকে একথা বলি?"

প্রতুলের পা দুখানা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার উপর অশ্রু-সিক্ত মুখখানা রাখিয়া মেধা বলিল,—"বুঝে দেখ—আমি বিধবা—"

প্রতুল হাসিল, "ওকে আমি বিয়ে হওয়া বা বৈধব্য বলে মানতে চাই নে মেধা। আমি মার মত নিয়ে তোমাকে এখনই সব জানিয়ে যাচ্ছি।"

অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সে উঠিয়া গেল।

(১৭)

গ্রামের লোক দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। যাহারা একান্ত উদারভাবে প্রতুলের মতের সমর্থন করিল তাহারা

দেশের আশা ভরসাস্থল তরুণ সম্প্রদায়। ইহারা সমাজের উন্নতি করিতে চায়, যথার্থ কাজ করিতে চায়। প্রবীণেরা সব একদলে জোট বাঁধিয়াছিলেন, ইহারা এই তরুণ সম্প্রদায়কে এক ফুৎকারে উড়াইয়া দিবার জন্ম বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন।

এই দলের মধ্যে প্রবীণোচিত বুদ্ধি ও গাম্ভীর্য্য লইয়া যে কয়টি তরুণ প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুর্ভাগিনী বাংলার মেয়ে অপর্ণার স্বামী সুরেশও ছিল।

আজ মাসখানেক হইল—সংসারের অসহ্য লাঞ্ছনার জালায় অপর্ণা আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা জুড়াইয়াছে। নারায়ণ দাসের বাড়ীতে মেধা থাকিতে সে মেধার সহিত দুই একটা কথা কহিয়া নিজের দুঃসহ যন্ত্রণার লাঘব করিতে পারিত। ইদানীং সুরেশের অত্যাচার বড় বাড়িয়াছিল, অপর্ণার নিজের স্বাস্থ্যও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, আগে যতটা সহ্যশক্তি তাহার ছিল, অসুখে ভুগিয়া সে সহ্যশক্তি তাহার ছিল না। এই জন্তই একদিন রাত্রে সুরেশ যখন মিথ্যা তাহাকে গালাগালি করিয়া পদাঘাত করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছিল, সেদিন সে আর সহ্য করিতে পারে নাই, এবং পরদিন প্রভাতে তাহার প্রাণশূন্ত রোগে শীর্ণ দেহটাকে সেই বাড়ীরই বাগানে একটা গাছের ডালে ঝুলিতে দেখা গিয়াছিল।

এই তরুণদলেরা সুরেশকে আন্তরিক ঘৃণা করিত, স্পষ্ট তাহাকে নারী হত্যাকারী বলিয়া উল্লেখ করিত। সেদিন বাজারে এই বিষয় লইয়া সুরেশের একদিন মারামারি হইয়া গিয়াছিল, প্রতুল না থাকিলে সেদিন সুরেশকে একখানি অঙ্গ স্ত্রী হত্যার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দান করিতে হইত।

কালে কালে এ সব কি ঘটিতেছে প্রবীণেরা অবাক হইয়া তাহাই দেখেন। দিন দিন সবই যেন বদলাইয়া যাইতেছে, বরাবর যাহা চলিয়া আসিতেছে যখন কেহ তাহা বিনা বিচারে মানিয়া লইতে চায় না। কোন কাজে ধর্ম্মের দোহাই দিলে ছেলেগুলো তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দেয় ; কোন একটা গর্হিত কাজ করিতে কোন কিছুর প্রমাণ দিতে গেলে তাহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চায়, পুঁথিগত প্রমাণ তাহারা মানিতে চায় না।

শুধু ছেলেদের মধ্যে নয়, মেয়েদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমে ধোঁয়াইয়া উঠিতেছে, বিশেষ করিয়া অপর্ণার মৃত্যুর পরে সকল মেয়ের মধ্যে কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছে। নিজেদের মতে যেটা সত্য, তাহারা তখন সেইটাই মানিতে চায়। সেই যে—হাতে জিনিষটি তুলিয়া দিলে ধরা, দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়ানো, বসিতে বলিলে বসা এরূপ কোন বাঁধাধরা নিয়মের মধ্যে বাস করিতে যেন তাহারা প্রস্তুত নয়।

এই সব তরুণদের উদ্যোগে গ্রামের মেয়েদের অনেক গোপন সাহায্যে গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইতেছে। ইহারই মধ্যে ইহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, মেধা তাহাতে শিক্ষয়িত্রীর ভার লইয়াছে। এখন ক্রমেই ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে ; গ্রামের মেয়েরা বই হাতে লইয়া অসঙ্কোচে স্কুলে যায় আসে, প্রবীণেরা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকেন।

বৃদ্ধেরা চিরকালের বৈঠক স্থান নারায়ণ দাসের চণ্ডীমণ্ডপের বারাণ্ডায় কড়িবাঁধা থেলো হুঁকা হস্তে বসিয়া বসিয়া এই সব অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার দেখিতেছেন আর ভাবিতেছেন এ আবার কি হইল। দেশে এ দিন বহিয়া আনিল কে, যে বাতাস চিরকাল একদিক হইতে বহিয়া আসিয়াছে, আজ হঠাৎ তাহার গতি ফিরাইয়া দিল কে ?

মুস্কিল সকল দিকেই। যে দেশের মেয়েরা চিরকাল রন্ধন, গৃহকর্ম্ম, সন্তান পালন প্রভৃতি কাজই করিয়া যায়, পুস্তক স্পর্শ করা যাহাদের পক্ষে মহাপাপ, তাহারা আজ বই পড়ে, অসঙ্কোচে স্কুলে যাওয়া আসা করে। এই সব মেয়েরা স্বেচ্ছাচারিণী হইবে না তো কি ? লেখাপড়া শিখিয়া আর কি ইহারা গৃহকর্ম্ম করিতে চাহিবে, আর কি স্বামীকে দেবতা বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে ? এই অধমা নারী জাতি বাহিরের বিশাল সৌন্দর্য্য বোধ করিলে আর কি গৃহে বদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিবে ? হায় রে, কলিতে সবই বিচিত্র হইল যে।"

বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় চোখ মুদিয়া সজোরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আর দেখছেন কি চাটুয্যে মশাই, ঘোর কলি উপস্থিত ; পুরাণে যা আছে তাই হাতে

হাতে চলে যাচ্ছে। আশ্চর্য্য যে আমাদেরই সে সব দেখতে হচ্ছে ? এর পর আর কি হবে বলে আশা করেন ?"

বড় ক্ষীণ স্বরে চাটুয্যে মহাশয় বলিলেন, "আর কি আশা করব ভশ্চাযি্য মশাই, এর পর যা হবে তা তো দেখাই যাচ্ছে। জাত জন্ম কিছু আর রইল না, যেটুকু আছে দু'দিন বাদে সব একাকার হয়ে যাবে। এর পর মুসলমান হিঁদু একসঙ্গে বসে খাবে, হিঁদু মুসলমানের বিয়ে ঘরে ঘরে চলবে। মনুর ব্যবস্থা এক কথায় কতকগুলো ছোঁড়া মিলে উল্টে দিয়ে নিজেদের মত জাহির করে বসলো। যাক মরুক গিয়ে, নিজেদের কাজের ফল নিজেরাই ভুগবে ভায়া, আমাদের কি বল। আজ বাদে কাল মরব, তবে কথা হচ্ছে, গোরে না দিয়ে চিতায় দিলে বাঁচি। রামোঃ, শেষকালটায় ছেলে নাতিরা বয়ে নিয়ে গিয়ে কবরে দেবে ? হরি হে, তোমারি ইচ্ছে।"

পাছে চিতার বদলে গোরে যাইতে হয় এই ভয়ে প্রবীনের দল যথার্থই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মেয়েদের শিক্ষার বিপক্ষে প্রবীণের দল দাঁড়াইলেন, মেধা যাহাতে শিক্ষা দিতে না পারে তাহার জন্ম তাঁহাদের আহার নিদ্রা রহিল না বলিলেও চলে। এ দলে নারায়ণ দাসও ছিলেন। পৌত্রীর ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত ছিলেন বলিয়া তিনিই সকলের অগ্রবর্ত্তী হইলেন।

ঠিক এমনি সময়ে গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল মেধা বিধবা। আহত সিংহের ন্যায় দেশের প্রবীণের দল গর্জ্জিয়া উঠিলেন। প্রবীণারা গালে হাত দিয়া বসিলেন।

ইহার পরই জনমুখে প্রকাশ পাইল মেধার আবার বিবাহ হইবে, প্রতুল তাহাকে বিবাহ করিবে।

"এ কখনই হতে পারে না।"

দারুণ ক্রোধের আতিশয্যে হাতের কড়িবাঁধা খেলো হুঁকা সদ্য-সাজা তামাকপূর্ণ কলিকাসহ মাটিতে গড়াইয়া পড়িল, সে দিকে দৃকপাত না করিয়া বেচারাম ঘোষাল বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "এ কক্ষণো হ'তে পারে ? ছোঁড়াগুলো সব মনে ভেবেছে কি যে দাঁড়িয়ে সমাজের বুকে লাথি মারবে ? এতগুলো অনাচার, অত্যাচার সব অবাধে চালিয়ে যেতে সাহস পেয়েছে, সেই জন্যে তারা বিধবা বিয়ে চালাবার সাহস পায় ? এ খিষ্টেনি আচারের প্রশ্রয় কে দেবে, এ ব্যভিচারীতাকে বাধা দিতে চাইবে না কে ? এই সব দৃষ্টান্ত পেয়ে আমাদের অন্য মেয়েরাও উৎসাহিতা হয়ে উঠছে, দেশে মনুষ্যত্ব আর থাকবে না। দেশের ছেলেরা মরেছে, কিন্তু আমরা তো মরি নি। উঠুন, আপনারা পুরাণো হিন্দুধর্ম্মের স্তম্ভ, মিনতি করছি—যেন স্নেহে বা করুণায় ভেঙে পড়বেন না। উঠুন, হিন্দুকে এমন ভাবে ধ্বংসের মুখে আর এগিয়ে যেতে দেবেন না, হিন্দুকে রক্ষা করুন। পবিত্র বিধবা, তার আবার বিয়ে,—উঃ, মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠছে।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল প্রতুলের মায়ের কাছে যাওয়া উচিত। তিনি বাল-বিধবা, সপ্তদশ বর্ষ বয়সে এক বৎসরের পুত্র প্রতুলকে লইয়া বিধবা হইয়াছিলেন, তাহার পর এই দীর্ঘকালে তাঁহার সে ব্রহ্মচর্য্য অটুট রহিয়াছে। পুত্র স্নেহে অন্ধা হইয়া তিনি এই ধর্ম্ম ও সমাজ বিগর্হিত কার্য্যের সমর্থন করিয়াছেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এতগুলি প্রাচীন বৃদ্ধ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে তিনি নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝিতে পারিবেন, কখনও বিধবা মেধার সহিত তাঁহার একমাত্র পুত্র প্রতুলের বিবাহ দিবেন না। প্রতুলের বিবাহের পাত্রীর অভাব কি ? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাতনী আছে, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুন্দরী কন্যা আছে, বেচারাম ঘোষাল মহাশয়ের ভাগনি আছে। দেশে সুন্দরী কুমারীর অভাব আছে কি ? বিধবার সহিত প্রতুলের বিবাহ ; নাঃ, তাহা কখনও সম্ভবপর নয়, ইহাতে সমাজ ও ধর্ম্ম দারুণ বৈরি হবে।

দল বাঁধিয়া সকলে প্রতুলের মায়ের কাছে গেলেন। তাঁহাদের সকলের বক্তব্য যখন শেষ হইয়া গেল, তখন করুণাময়ী একটু হাসিলেন মাত্র।

প্রধান নেতা নারায়ণদাস উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, মুখ চোখ লাল করিয়া দু একবার কাশিয়া বলিলেন, "হাসলে যে মা ? এতে হাসির মত কথা তুমি কি পেলে বল দেখি ? তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা, সাধ্বীসতী পুণ্যবতী, আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য পালন করে এসেছ, সমাজ গর্হিত, ধর্ম্ম গর্হিত বিধবা বিয়ে কি

তুমিও অনুমোদন করবে ? এই যে বিধবা বিয়ে—যা তুমি দিতে এগিয়েছ, এ কখনও এ সমাজে চলেছে কি ?"

মিষ্টসুরে করুণাময়ী বলিলেন, "হ্যাঁ বাবা এককালে চলেছিল। বিধবার বিয়ে অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত না হলেও স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনা করে অনেক জায়গায় অনেক সময় বিয়ে হয়ে গেছে। যারা বড় হয়েছে, স্বামীর সম্বন্ধে এতটুকু ধারণা করতে যারা পেরেছে তাদের বিয়ের নামে স্বেচ্ছাচারিতার অনুমোদন আমি কখনই করি নি, করব ও না। কিন্তু নেহাৎ ছোটমেয়েদের যাদের অভিভাবকরা আপনার ছেলের মতই খেয়ালের বশে চলে এতটুকু বেলায় ছেলেখেলার মত বিয়ে দিয়ে ফেলে—হয় তো বিধবা হওয়ার ফলে তাদের সারাজীবনটা ব্যর্থ করে দেন, সেই সব মেয়েদের আবার বিয়ে দেওয়া উচিত কি না তা আপনিই ভেবে দেখুন না কেন বাবা। আপনি কিন্তু প্রবীন, আপনি অনেক দেখেছেন, শুনেছেন আপনিই বলুন শিশুর বিয়ে এবং বৈধব্য এই দুটো কি রকম অতর্কিতভাবে পায়, ঠিক পুতুল খেলার মত ভাবা যায় না কি ? সত্যের দিক দিয়ে—আর কেউ না চা'ক, আপনি একবার চেয়ে দেখুন বাবা, মনে অতীতের একটা ছবি এঁকে নিয়ে তার সম্বন্ধে খানিক ভাবুন দেখি,আমি আজ যা করতে যাচ্ছি এর মধ্যে নিন্দা দেখতে পাবেন না বুঝতে পারবেন—ধর্ম্মকে রক্ষা করতে সমাজকে রক্ষা করতে, সমাজের উন্নতি করতে ঠিক এই-ই দরকার। আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করছি,—আমি সে পেরেছি বাবা, আমার স্বামীকে আমি ধারণা করতে পেরেছি বলেই আমি তাকে হারাই নি, তাঁর সঙ্গে আবার মিলতে পারব, আর সে মিলন ভোগের পথে ঘটবে না বলে আমি ত্যাগের পথ বেয়ে চলেছি, আমার সঙ্গে মেধার কথা আলাদা। আমি মেধাকে বেশ চিনেছি, বেশ বুঝেছি সেই জন্যেই আমি মেধাকেই পুত্রবধূ করব বলে ঠিক করেছি, আর তা করবও।"

গ্রামের প্রধানগণ মুখ অন্ধকার করিয়া বাহির হইলেন, নারায়ণদাসও পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন, করুণাময়ী ডাকিলেন, "আপনি একটু দাঁড়ান বাবা, আপনার সঙ্গে আমার কয়টা কথা আছে।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মলিনমুখে নারায়ণদাস বলিলেন, "আমার সঙ্গে তোমার কি কথা আছে মা ?"

করুণাময়ী একখানা আসন পাতিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। বলিলেন,"বাবা আমরা কেউই জানতুম না মেধা বিধবা, মেধা নিজেও তা জানত না। তার মায়ের মনের এই দুর্ব্বলতা, পাছে মেধা তার এই পোড়া অদৃষ্টের জন্যে স্বর্গগত পিতাকে দোষ দেয়,—মেয়ের কাছে তাঁকে এমনি ভক্তির পাত্র করে রাখবার জন্যেই মেধার মা কোন কথা প্রকাশ করেন নি। এখন তিনি বা মেধা—কেউই এ বিয়েতে মত দেন নি, আমিই জোর করে ধরেছি, প্রতুল নিজে মেধাকে বিয়ে করবে বলে এগিয়েছে। আপনি যথার্থ জ্ঞানী, এই সমাজে অন্যদার মতের পানে না তাকিয়ে যথার্থ ধর্ম্মের পানে চেয়ে একবার বলুন দেখি—মেধার বিয়ে কি অধর্ম্ম সঙ্গত হবে ? বাবা, যে সমাজের আইন কানুনের কথা আপনারা বলছেন, আমি জিজ্ঞাসা করছি, ধর্ম্মের জন্যেই সেই সমাজের দরকার, না সমাজের জন্যে ধর্ম্মের দরকার ? ধর্ম্মের জন্যেই যে সমাজ এ কথা আপনিও নিশ্চয় স্বীকার করবেন। আজ যদি বরেণ থাকত, দেখতেন সেই তার ফুল সুধরাতে এগিয়ে যেতো, আপনার পায়ে ধরে তার মেয়ে জামাইকে আশীর্ব্বাদ করবার জন্যে নিয়ে আসত। সকলের চেয়ে সেরা যে আপনার আশীর্ব্বাদ বাবা, দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই তা পবিত্র। আমি তাকে আপনার কাছে ডাকছি, এসব ব্যাপার দেখে সে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, কিছুতেই বিয়ে করবে না জেদ ধরেছে। কেবল আপনার অনুমতি যদি পায় সে, জানবে তা হলে তার এ বিয়ে অবৈধ নয়। বসুন একটু, আমি তাকে নিয়ে আসি।"

মলিনমুখী মেধার হাতখানা ধরিয়া টানিয়া আনিয়া করুণাময়ী তাহাকে নির্ব্বাক নারায়ণ দাসের পায়ের কাছে বসাইয়া দিলেন," আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে নাও মা, এ আশীর্ব্বাদের তুল্য আর কিছু নেই। বাবা, আজ ও সব কথা মন হতে মুছে ফেলে দিন, শুধু মনে করুণ এ আপনার সেই বরেণের মেয়ে। আপনি বরেণকে যতটা ভালবাসতেন বরেণ আবার ততখানি একে ভালবাসত। এর স্নেহ রক্ষ

মন সবই বয়েসের দাম, এর জ্ঞান, বিদ্যা সবই আপনার বয়েসের। দেখুন বাবা, একবার চান এর দিকে—"

"মা—"

বৃদ্ধের গোপন ব্যথা আর ধৈর্য্যের বাঁধন মানিল না, উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া অশ্রুর আকারে ছুটিল।

"আর বলো না মা, যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। আজীবন ভুল পথ বেয়ে চলেছি, কেবল ভুলই করে আসছি, আজ প্রাণ খুলে মেধাকে আশীর্ব্বাদ করে সে ভুলের আমি কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করছি।"

মেধা তাঁহার পায়ের উপর অশ্রুপূর্ণ চোখে মাথা রাখিতেই তিনি তাহাকে একেবারে কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন; বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, তোর ঠাকুরদার সব দোষ ক্ষমা করে যা দিদি। বুড়ো হয়েছি মাথার ঠিক নেই, যে যা বলছে তাই শুনে বিশ্বাস করে যাচ্ছি, তোকে বউমাকে কত রকমে যে নির্য্যাতন করেছি তার ঠিক নেই। আজ প্রাণ খুলে তোকে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি ভাই তুই সুখী হ, দেশের দশের উপকার করে যা; তোদের দুইটি শক্তি এক হয়ে দেশের শুভ করুক।"

দরজার পার্শ্বে লুক্কায়িতা সাবিত্রী চোখের জল সামলাইতে পারিলেন না, উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়া তিনি তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

(২০)

এই বিবাহ ব্যাপারে নারায়ণ দাসকে যুক্ত দেখিয়া গ্রামের তরুণ ও প্রাচীন দুই দলই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তরুণের দল মহা আনন্দে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিল,—বন্দে মাতরম, গান্ধি মহারাজ কি জয় বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিল; তাহার পর অস্পৃশ্য স্পৃশ্য সকল জাতিকে বিবাহে নিমন্ত্রণ করিয়া ফেলিল, এবং সকলকেই সমানভাবে অভ্যর্থনা করিল। এই বিবাহে ধোবা, নাপিত, ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই একস্থানে বসিতে পাইল।

প্রবীণের দল আশে পাশে ঘুরিতেছিলেন, দুই একজনকে বুঝাইয়া, ভয় দেখাইয়া এ বিবাহে মিলিত হইতে বিরত করিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। সেদিন কে কাহার কথা শুনে। আনন্দ মিলনের ধারা স্বর্গ হইতে আজ নামিয়া আসিয়াছে, অপূর্ব্ব সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ছোট বড় সবাই আজ এই ধারায় স্নাত হইতে চায়, পুরাতনকে আঁকড়াইয়া আজ কেহই থাকিতে চায় না।

সন্ধ্যার একটু পরে আহারাদির ব্যাপার আরম্ভ হইল, এবং নির্ব্বিবাদে শেষও হইয়া গেল। তাহার পর বিবাহ, নারায়ণ দাস নিজে কার্য্যকর্ত্তা হইয়া প্রতুলের হস্তে মেধাকে সম্প্রদান করিলেন। শত শত কণ্ঠে তখন ধ্বনিত হইতেছিল—জয়, "মহাত্মা গান্ধীর জয়।"

এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া নারায়ণ দাসের কঠোর প্রাণ গলিয়া গিয়াছিল, চোখে জল আসিতেছিল। সত্যই এ সজীবতা মরা গ্রামের বুকে আনিয়া দিল কে, এমন অসীম শক্তি কাহার যে আজ ছোট বড়র ভেদাভেদ ভুলিয়া দিল? এই সব যুবকেরা বরাবর নিশ্চেষ্টভাবে তাস পাশা খেলিয়া,—পরচর্চ্চা করিয়া দিন কাটাইয়াছে,—কাহার অসীম শক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া অসীম শক্তিশালী ইহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া, পুষ্করিণী সংস্কার, চাষ আবাদ, এসব স্বহস্তে করিতেছে? এই মহাপ্রাণতায় ইহাদের অনুপ্রাণিত করিল কে?

দেশ কি ছিল, কি হইয়াছে? এ বিবাহে দেশের অনিষ্ট হয় নাই, ইষ্ট হইয়াছে। যাহাদের বড় ঘৃণা করিয়া দূরে রাখিয়া এ সমাজ তাহাদের হৃদয়ে ঈর্ষানল দীপ্ত করিয়া রাখিয়াছিল, আজ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার না করিয়া তাহাদের পাশে টানিয়া লইয়া অনেকগুলি মৃত প্রাণকে সঞ্জিবীত করিয়া তুলিয়াছে। একি অভিনব দৃশ্য, এ কি মহানন্দের সম্মিলন।

বিবাহ অন্তে দম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাড়ী যাইবার জন্ম পথে বাহির হইতেই প্রবীণের দল তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিলেন।

"হ্যাঃ, আপনি করলেন কি গাঙ্গুলী মশাই? দেশে এমন একটা ভয়ানক কাজ যে হয়ে গেল, আপনি শুধু সমর্থনই করেন নি, কর্ম্মকর্ত্তা হয়ে কাজও মিটিয়ে দিলেন? এত বড় একটা জ্ঞানী লোক আপনি, শাস্ত্র আপনার যত জানা আছে—

এত আর কারও নেই,—সেই আপনি কিনা দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দিলেন ?"

নারায়ণ দাস শান্তস্বরে বলিলেন, "না, আমি শাস্ত্র বিগর্হিত কাজ কিছুমাত্র করিনি। এবং যদি এই বিয়েটা না দেওয়া হত, তাতে পাপের স্রোতই বেড়ে চলতো শাস্ত্রের মর্য্যাদা একটুকু থাকত না। অনেক ভেবে আমি নিজেই এ বিয়েতে কর্ম্মকর্ত্তা হয়ে পড়লুম। আমি বলছি—আমার কথায় বিশ্বাস কর,—এ বিয়ে অবৈধ নয়, এ শাস্ত্র সম্মত বিয়ে, তোমরা অনায়াসে মেনে নিতে পার।"

বেচারাম ঘোষাল ললাটে করাঘাত করিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, "জাত জন্ম এরা আর কিছু রাখলে না। বড় দুঃখের কথা যে আপনি প্রবীণ বুদ্ধিমান লোক হয়ে ওদের দিকে যোগ দিলেন। শুনছি ধোবা নাপিত বামুন নাকি একত্রে বসে খেয়েছে ?

গভীর সুরে নারায়ণ দাস বলিলেন, "ভগবানকে ধন্যবাদ দাও তাঁর জন্যে যে তিনি আমাদের আয়ুকাল দীর্ঘ করেছেন, তার জন্যে আজকের এই মধুর মিলন দৃশ্যটা আমরা দেখতে পেলুম। আজ যুগের গুরু সেই চিরপুরাণো কথাই নতুন করে আমাদের শুনাতে দরজায় এসেছেন সাম্যের বার্ত্তা তিনিই আমাদের দিয়েছেন। মহৎ যে—সে তার কাজের দ্বারাই ব্যক্ত হবে। উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে কেউ চণ্ডালের আচরণ করে যায়, তবুও সে যে সেই ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়েছে তার জন্যে বরেণ্য হবে, আর নীচ বংশে কেউ জন্ম নিয়ে ব্রাহ্মণোচিত আচরণ করে গেলেও সে আমাদের সমাজের নিয়মানুসারে নীচ হয়েই থাকবে, এমন কি কথা থাকতে পারে ? বর্ণ লোকের কর্ম্মের গুণ, বংশগত গুণ বলে ধরে রাখা যেতে পারে না। জীবনের শেষ দিনে আজ সহজ সত্য জ্ঞানটা যে লাভ করতে পেরেছি এর জন্যে ভগবানকে শত ধন্যবাদ দিচ্ছি। মিথ্যে নিয়ে জীবন কাটালুম, সত্য নারায়ণ যে কোথায় তা ধারণা করতে পারি নি, জানতে পারিনি। আজ তিনি স্বয়ং জানিয়েছেন জীবদেহে, তিনিই বিরাজমান, একটা কোনও নির্দ্দিষ্ট আধারে তিনি নেই।"

গৌরী দেবী সেদিন পৌত্রীর বিবাহে কোমরে কাপড় জড়াইয়া বৃদ্ধ দেহ লইয়াও খুব দৌড়াদৌড়ি করিয়াছিলেন, প্রতুলের কানও কয়েকবার ধরিয়াছিলেন। বিনয় একদণ্ডের জন্যও প্রতুলের পার্শ্ব ত্যাগ করে নাই। বিনয়ের মা সুষমা রন্ধনের ভার লইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতেও ছুটি করিয়া আসিয়া সে প্রতুলকে ঠাট্টা করিয়া যাইতে ছাড়ে নাই।

সমাপ্ত।

গল্পের প্লট্

[শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য]

—এক—

গোধূলির ম্লান ধূসর আঁচলখানি তখনো ধরণীর বুক আচ্ছাদন করে নাই .....

হ্যারিসন রোডের উপর তিনতলা মেসের ছাদের কোণে একটী অপরিচ্ছন্ন গৃহে দুইটী যুবক দুইটী বিভিন্ন কার্য্যে ব্যস্ত ছিল। সুধীর দেওয়াল বিলম্বিত বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়াইয়া সুসজ্জিত বেশে ব্রুস্ লইয়া চুল আঁচড়াইতেছিল এবং তক্তাপোষের উপর বসিয়া গালে হাত দিয়া খাতা পেনসিল সামনে কুমুদ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন।

ইলেক্ট্রিক বাতিটা ঝুল ও ধূলায় বিমলিন হইয়া ক্ষীণ আলো বিকীরণ করিতেছে—তাহারই ওধারে একটা টিক্‌টিকি নিজের শিকার অন্বেষণে ব্যস্ত—সেইদিকে তাকাইয়া কুমুদ একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—কিহে কবি, ক' পাতা লিখলে আজ?"

কুমুদ ভ্রূকুটি করিয়া কহিল—কিছু না—ক'দিন ধরে যে কি হয়েছে, মাথা থেকে আর কিছু বেরোতে চায় না।

সুধীর হাসিয়া বলিল—ভাবের মন্দা পড়েছে বল তা হ'লে?

তাইত দেখছি—আজ এক সপ্তাহ ধরে একটী গল্প বানাতে পারলাম না। ওদিকে 'বিশ্ববাণী' আবার যা তাগাদা লাগিয়েছে, কি যে করি।

করবে আর কি? বলে দাও এ মাসে আর গল্প দিতে পারলুম না—ও মাসে আবার দিও, ততদিনে একটী ভাব মাথায় জুটে যাবেই।

তা কি হয় হে? এত খাতির করে, নামটা খারাপ করব?

তা হ'লে বোসে বোসে ভাব, আমি চললুম, বলিয়া সুধীর ব্রুসটী তাকে তুলিয়া রাখিল।

কুমুদ কিছুক্ষণ কি ভাবিয়া বলিল—দেখো সুধীর, আমাকে দেখছি এ হতভাগা মেস বদলাতে হবে, নইলে উপায় নেই।

বিস্মিত স্বরে সুধীর জিজ্ঞাসা করিল—কেন হে, মেস আবার কি দোষ করলে? এতদিন রয়েছ এখানে।

সেইজন্তেই ত বলছি, এ মেসে থাকলে আমার লেখার শক্তিটা ক্রমেই মাটি হ'য়ে যাবে। ছাদের ওপর ঘর দেখে সিট নিলুম, তা এমন হতভাগা নীরস ঘর যদি আর দুনিয়ার কোথাও আছে।

কি রকম?

রকম আবার কি? সামনে তাকাও রাস্তা, বাঁ ধারে পাঁচিল, দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে গেল—ডাইনে ত কামারদের বস্তি, কেবল হাতুরের ঠকাঠক শব্দ—দিনরাত এই দেখে কি ভাব আসে ছাই? যা আছে তাও মাথা ছেড়ে পালাচ্ছে।

কথাটা বুঝিয়া সুধীর বলিল—বটেই ত, কোথায় গলির ভিতর একখানি বাড়ী হবে, এমনি ছাদের কোণে ঘর, সামনেই চারতালা বাড়ী আর তাতে অজস্র জানালা, আর এক একটী জানালায় এক একটী চন্দ্র উদয় হয়ে আমাদের কুমুদ ফুলটীকে ফুটিয়ে তুলবে—ঐ যাঃ, উপমাটাই গেল গুলিয়ে—গোড়ায় গলদ।

বাধা দিয়া কুমুদ কহিল—তোমার সব তাতেই ঠাট্টা।

আরে ঠাট্টা আবার কখন করলুম? তুমিই সত্যি করে বল দেখি আমি যে রকম বললুম সেইরকম একখানি ঘর তোমার পছন্দ হয় কি না।—বলিয়া সুধীর কুমুদের পানে চাহিল।

কুমুদ বলিল—যদি ঠাট্টা করে বলে না থাক তা হ'লে

বুঝলুম তোমার মনেও কবিত্ব আছে। সত্যি সুধীর, এরকম কাঠখোট্টা নীরস জায়গায় কি কবিতা আর গল্প জমে উঠে? ট্রামগাড়ী, জনতা, হট্টগোল আর মারামারি শুধু এই সব বর্ণনায় পাঠকের কতক্ষণ ধৈর্য্য থাকে বল? গল্প লিখতে হ'লে অনেক জিনিষ দেখা চাই, জানা চাই, সবই কি কল্পনায় চলে হে? এই ধর না কেন পাশের বাড়ীর একটা সুখের ঘরকন্না যদি প্রত্যহ চোখে পড়ে তাহ'লে তাদের সেই সুখের ইতিহাসটুকু রং ফলিয়ে লিখতে পারলে শুধু স্বাভাবিকই হবে না—লেখাও সার্থক হবে এই যে সেদিন পড়ছিলুম রবিবাবু লিখেছেন—

তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়া সুধীর বলিল—সে আমি জানি জানি, কিন্তু গতস্য শোচনা করে আর কি হবে—কাল থেকে সেইরকম মেস একটা খুঁজতে বেরিও, আসি তবে বন্ধু—বলিয়া সুধীর জুতা পরিতে পরিতে মনে মনে বলিল—বাবা, রবিবাবু কি লিখেছেন সে কথা শুনতে গেলে ত এইখানেই রাত কাবার—এ পাগলের কাছ থেকে মানে মানে সরে পড়তে পারলে বাঁচি।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল—কখন ফিরছ? রাত দুটো না তিনটে?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সুধীর বলিল—কি জানি? আজ আবার খাস বাগানে পার্টি। কাল সকালেই বোধ হয় একেবারে ফিরব।

কুমুদ হাস্যমুখে বলিল—বেশ আছ কিন্তু।

উৎসাহের সহিত সুধীর বলিল—বেশ বলে বেশ। সমস্ত দিন ত অফিসে খাটুনি, রাতেও যদি একটু আমোদ না করব তা হ'লে ত যৌবনটা বৃথাই যাবে বন্ধু!

সুধীর চলিয়া যায় দেখিয়া কুমুদ বলিল—সত্যি চললে নাকি হে?

হ্যাঁ কেন?

একটা কথা ছিল শোন।

এতক্ষণে বলতে হয়; যাবার সময় পিছু ডাকলে, কি বল—বলিয়া সুধীর ফিরিয়া আসিয়া ভক্তপোষে বসিল।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা তুমি যেখানে যাও সেখানে সত্যিই আমোদ পাও তুমি?

না পেলে আর রোজ যাই।

আচ্ছা যাদের কাছে যাও তাদের আগেকার জীবনের কাহিনীটুকু শুনেছ কোনদিন কারু কাছে?

না, সে শুনে আমার লাভটা কি? তবে জিজ্ঞাসা করলে বেশ একটা লেখবার ইতিহাস সংগ্রহ করা যায় বটে।

কুমুদ গম্ভীর হইয়া বলিল—আমিও তাই ভাবছিলুম, গল্পের প্লটের জন্যে মাথায় হাতুড়ি ঠুকেও ত এক সপ্তায় কিছু বার করতে পারলুম না, তাই ভাবছিলুম—

ওঃ বুঝেছি, কিন্তু তুমিই ত এতদিন obstinate ছিলে হে। কত সেধেছি, কত বলেছি তা সবই ত তুমি সিগারেটের ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়েছ—

তা দিয়েছি বটে, জানই ত তোমার মত এখনও অতখানি liberal হতে পারি নি বলে মনে একটা গর্ব্বও আছে—ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে মেয়ে মানুষের বাড়ী যাব, কি ভয়ানক কথা বল ত?

আহা তুমি ত আর কু-মৎলবে যাচ্ছ না হে, যাচ্ছ সাহিত্যের খোরাক সংগ্রহ করতে—

যে জন্যেই যাই, কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরোয় এই ভয় ছিল কি না এদ্দিন।

এখন সেটা গেছে তা হ'লে বল?

একদম যে গেছে তা বলতে পারি না—তবে যাবে বলে আশা হচ্ছে—মনের জোরের কাছে কিছু নেই রে ভাই, তা ছাড়া বাণী পূজায় যেমন পবিত্র হয়ে আছে তাতে কলঙ্কের ছোঁয়াচ লাগতে দেব কেন?

well said my friend, হাতে হাত দাও বন্ধু, তা হ'লে আজ আমি কথা দিয়ে আসি, কাল তোমায় নিয়ে যাব?

কুমুদ ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল—আরে না না, কথা টথা দিতে হবে না—সে যা হয় কাল হবে।

আচ্ছা আজকের দিনটা ভাব তা হ'লে, good-bye চল্লুম।

সুধীর বাহির হইয়া গেল—কুমুদ ভাবিতে বসিল।

—দুই—

কুমুদ ছেলেটী ভাল, বি-এ পাশ করিয়া ল' পড়িতেছে। আজ অবধি অতি বড় শত্রুও তাহাকে কোন অপবাদ দিতে সাহসী হয় নাই, এমনি নির্ম্মল চরিত্র ও শুদ্ধ ছিল তার মন। কলিকাতায় তাহার কোন আত্মীয় ছিল না। সুদূর পল্লীগ্রামে তাহার বাড়ী, পিতামাতা, পরিজনবর্গ যাহা কিছু সব সেই-খানে। তাই হোষ্টেলে এবং মেসে থাকিয়া আজ অবধি সে পড়িয়া আসিতেছে। আজ দুই বছর বি-এ পাশ করিয়া সে এই মেসটীতে আছে।

সুধীর কুমুদের Room-mate বন্ধু—তা ছাড়া আর কোন সম্বন্ধ নাই। সে অফিসে চাকরী করে আর রাত্রে আমোদ করিয়া অনেক রাতে ফিরে, কোনদিন ফেরেও না। প্রথম প্রথম এ নিয়ে সুধীরের সঙ্গে কুমুদের অনেক বচসা এমন কি হাতাহাতি অবধি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সুধীরকে ফেরানো অসম্ভব দেখিয়া কুমুদ হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন দু'জনে বন্ধুভাবেই বাস করে।

কুমুদের কিন্তু একটী রোগ ছিল, সে কবিতা ও গল্প লিখিত। লেখা তার ভালো বলেই বোধ হয় পত্রিকাধ্যক্ষরা সেগুলি তাহাদের মাসিকে স্থান দিতেন। বছর দুই এমনি লিখিয়া সে এখন দস্তুর মত একজন গল্প লেখক। বিশেষতঃ 'বিশ্ববাণী'তে যে গল্পগুলি বাহির হইতেছে সেগুলি নাকি চমৎকার। এই গল্প লেখা লইয়া সেদিন কুমুদের সহিত সুধীরের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা প্রথম পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে।

সেদিন কলেজে প্রফেসর বোস অনুপস্থিত। সকাল সকাল ছুটি হইয়া গেল। মেসে ফিরিয়া কুমুদ জামা জুতা ছাড়িয়া তক্তাপোষে সটান শুইয়া পড়িয়া একখানা মাসিক পত্রিকার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

হঠাৎ একটী লেখার প্রতি তার দৃষ্টি পড়িল। গল্পের নাম পতিতা, লেখক কোন অখ্যাতনামা কবি যশঃপ্রার্থী। গল্পটি সে আগাগোড়া মন দিয়া পড়িল। কোন হতভাগিনীর আত্মকথা—একটী চাপা করুণ সুরে কাহিনীটি বিবৃত। অনুতাপ ও বক্ষের জ্বালা লইয়া ভুলপথ হইতে সৎপথে ফিরিতে চাহিলেও কি করিয়া সে সমাজের কঠিন বিধানে ফিরিতে পারিল না তাহারই বিলাপে গল্প শেষ হইয়াছে। পড়িয়া সহানুভূতিতে কুমুদের প্রাণ চঞ্চল হইল বটে কিন্তু মনে হইল যেন গল্পটী প্রাণ দিয়া লেখা হয় নাই। লেখক খুব সম্ভব কল্পনার আশ্রয়ে কাহিনীটি গড়িয়া তুলিয়াছে। কুমুদ ভাবিল—সেও যদি এমন একটি কাহিনী কোন হতভাগিনীর নিজ মুখে শুনিয়া রং ফলাইয়া লিখিতে পারে তা হ'লে কি রত্নই না সে সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করিতে পারে? ভাবিতে ভাবিতে রগ দুইটী তার দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল।

কিন্তু অন্ধ সংস্কার তাহার মনকে কেবলই বিচলিত করিয়া তুলিতে লাগিল। না—না, গল্পের জন্য সে এতদিনের সুনামকে নষ্ট করিবে? তখনই আবার সেই ন্যায় অন্যায়ের বিচার আসিয়া উপস্থিত হইল। অনেক ভাবিয়া সে ঠিক করিল—যাইবে কিন্তু একাকী গোপনে। এ অপবাদ ও অপরাধের কাজ লোককে জানাইয়া গর্ব্ব করিবার মত নয় তো।

কিন্তু যাইবে যাইবে করিয়াও, কুমুদ লজ্জাবশতঃ দুদিন বিলম্ব করিয়া ফেলিল। সুধীরকে সে সেই রাত্রেই স্পষ্ট জবাব দিয়াছিল—নাঃ ভেবে দেখলুম, যাওয়া হবে না।

সুধীর জবাব দিয়াছিল—সে আমি আগে থাকতেই জানি যাক্ তোমার একটী পরীক্ষা হয়ে গেল।

পরদিন রাস্তায় কুমুদের সহিত. 'বিশ্ববাণী'র সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সম্পাদক বলিলেন—কই মশাই—গল্প?

গর্ব্বিত অন্তঃকরণে কুমুদ উত্তর দিল—এইবারে দেব, দুদিন সবুর করুন—ভারী চমৎকার জিনিস একটা দেব এবার।

দেখবেন যেন ফাঁকি দিয়ে আবার অন্য কোন কাগজে যোগ দেবেন না—বলিয়া সম্পাদক বিদায় লইলেন।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় সুধীর বাহির হইয়া গেলে কুমুদ ঠিক করিল—আজ যাইবে। ঠিক করিয়া বেশভূষার শ্রীসম্পাদন করিতে বসিল। ধোপদস্ত কাপড় বাহির করিল, রেশমী রুমালে খানিকটা 'কালিফর্ণিয়ান্ পপি' ঢালিল। তাহার পর চুল আঁচড়াইতে গিয়া ভাবিল—তাই ত করিতেছি

কি ? যাচ্ছি সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করতে, তবে এ অভিসারের বেশ কেন ? এই ভাবনা মনে আসিতেই কুমুদ সমস্ত ভুলিয়া রাখিয়া আধ ময়লা ধুতিচাদর করিয়া 'পাম্পসু'র পরিবর্ত্তে বুট পায়ে বাহির হইয়া পড়িল।

—তিন—

গ্রে ষ্ট্রীট ধরিয়া বরাবর চিৎপুর রোডের মোড়ে আসিয়া কাদাভরা রাস্তায় গাড়ী ঘোড়া ও লোকজনের ভিড়ের চাপে কুমুদ হাঁপাইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া ভাবিল—হায় কি সুখেই যে নির্ব্বোধ লোকেরা এই পথ দিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া আনাগোনা করে।

পথের দুপারে বিপিন শ্রেণী আলোকমালায় ঝলমল করিতেছে। দলে দলে প্রমোদ পিয়াসী বাবুরা অপরূপ সাজে ফুলের মালা গলায় চলিয়াছে। মাঝে মাঝে উপরকার বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া অথবা নীচে অন্ধকার দরজায় দাঁড়াইয়া অভাগিনীর দল শিকারের আশায় ওৎ পাতিয়া আছে।

তাহাদের মুখের দিকে তাকাইতেই ঘৃণায় কুমুদের নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল - যেন এক একটী রোগ, দুর্ভাগ্য ও শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি। একখানাও দেখিবার মত মুখ তাহার চোখে পড়িল না। ভীড় ঠেলিয়া চলিতে চলিতে কুমুদের ভারী বিরক্তি ধরিল—সে বড় রাস্তা ছাড়িয়া একটা গলির ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ঢুকিয়া কুমুদ দেখিল—এটাও পাপ পুরীর একটা অংশ। তবে ভিড় কতকটা কম এই যা। কিন্তু অন্ধকার বলিয়া এখানে তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা একটু বেশী। কেহ বা দমক চালে হেলিয়া দুলিয়া নিরীহ পথিকের গা ঘেঁসিয়া চলিয়াছে, কেহ বা ইসারা ও হাতছানিতে পথিকের মন ভুলাইতে চেষ্টা পাইতেছে।

চলিতে চলিতে হঠাৎ এক জায়গায় কুমুদের দৃষ্টি ও গতি মন্থর হইয়া পড়িল। একটী বাড়ীর সামনেই গ্যাস-পোষ্ট। তাহারই আলোকে কুমুদ দেখিল সামনের একখানা বাড়ীর দরজায় দাঁড়াইয়া অপরূপ লাবণ্যে ভরা উচ্ছলিত যৌবন ও সৌন্দর্য্যের আধার এক তরুণী। রূপের জ্যোৎস্না তার সারা অঙ্গে যেন অপূর্ব্ব মাদকতার ঢেউ তুলিয়াছে। সকল ভুলিয়া কুমুদ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহা দেখিয়া তরুণী অধর টিপিয়া মুচকি হাসিল তারপর হাতছানি দিয়া ডাকিয়া নাতি উচ্চস্বরে বলিল—আসুন না।

কুমুদের কান দুইটী লাল হইয়া উঠিল। লজ্জা ভয় ও এক অজানা পুলক সংমিশ্রণে কুমুদের বুক ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। সে সেই অবস্থাতেই যেন এক চুম্বকের আকর্ষণে তরুণীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

তরুণী আর একবার মোহন হাসি হাসিয়া বলিল—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন,—আসুন না ভেতরে।

কুমুদের হৃৎপিণ্ড তীব্রগতিতে চলিতে লাগিল। সে তরুণীকে অনুসরণ করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল।

চিমনির ক্ষীণ আলোয় আলোকরা সামনের দালানটুকু পার হইয়া কুমুদ রমণীর সহিত বরাবর কোণের দিকের সিঁড়ি বাহিয়া তাহার দ্বিতলের ঘরে আসিয়া উঠিল।

ঘরে ঢুকিয়াই দরজাটায় খিল দিয়া তরুণী একেবারে কুমুদের হাত দুখানি ধরিয়া তাহাকে খাটের উপর বসাইয়া দিয়া বীণাঝঙ্কৃতকণ্ঠে বলিল - বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? তারপর দেওয়াল ল্যাম্পটা উজ্জল করিয়া দিয়া তরুণী কুমুদের একেবারে কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—অমন চুপ করে আছেন কেন ? ভয় হচ্ছে ? আর কখনও এ ধারে আসেন নি বুঝি, এই প্রথম ?

সত্যই কুমুদের মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু তরুণীর কথায় সমস্ত লজ্জা, ভয় ত্যাগ করিয়া সে উত্তর করিল—না, ভয় আবার কিসের, তবে এ পথে আজ আমি এই প্রথম আসছি কিনা তাই বাধ বাধ ঠেকছে।

তরুণী কটাক্ষপাত করিয়া কহিল—হাঁ, ওরকম প্রথমটা হয়েই থাকে। সত্যি বলুন ত, আমরা ত আর বাঘ নই যে আপনাদের ধরে খাব।

কুমুদ মনে মনে বলিল—না, বাঘ হবে কেন, তবে টাটকা রক্ত চুষে খাও, এই যা। প্রকাশ্যে কহিল—তা ত বটেই !

কুবেরের লক্ষ্মীপূজা।

এইবার তরুণী কুমুদের গলাটা হঠাৎ জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কোলে বসিয়া পড়িতে গেল। কুমুদ তাড়াতাড়ি তাহার কবল হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া বলিল—না, না, তুমি ভুল বুঝছ, আমি ওজন্যে আসিনি।

—ওমা তবে কি করতে এসেছেন, সত্যনারায়ণের পুজো করতে? বলিয়া তরুণী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সাহস সঞ্চয় করিয়া কুমুদ বলিল—দেখ, আমি এখনি চলে যাব, বেশীক্ষণ থাকব না এখানে, তবে যাবার আগে তোমার মুখ থেকে দুটো কথা শুনে যেতে চাই।

কেন, আমি কি বোবা হয়ে আছি নাকি? তরুণী কটাক্ষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।

না—

তবে?

একটু একটু করিয়া কুমুদ বলিল—আমি এখানে আমোদ করতে আসিনি আমি শুধু শুনতে এসেছি তোমার আগেকার কথা, তুমি কি করে এপথে প্রথম পা দিলে?

তরুণী হাসিয়া বলিল সে সব কথা শুয়ে শুয়েই শুনবেন'খন—এখন জামাটা খুলুন ত—আমিও বলেন ত সাজ খুলে ফেলছি।

কুমুদ আৎকাইয়া উঠিল--বলিল—না, না, ওসব কিছুই করতে হবে না, আমি শুধু তোমার কাহিনীটুকু শুনে যেতে চাই।

বিস্ময়ে তরুণী অবাক হইল—কি রকম লোক এ? এমন খদ্দেরও আছে?

কুমুদ আবার বলিল—ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে সামনে বসে তুমি বলে যাও আমি শুনি।

তরুণী চেয়ারে না বসিয়া তাহারই পার্শ্বে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল দেশ থেকে আমার স্বামীর এক বন্ধু আমাকে নিয়ে পালিয়ে কলকাতায় এইখেনেই উঠেছিলো—সেই থেকেই এখেনে বাড়ীভাড়া করে আছি।

কুমুদ হতাশ হইল। অতিষ্ঠ হইয়া সে বলিল—আমি সেই কথাই ত তোমার কাছে আগাগোড়া শুনতে চাচ্ছি।

তরুণী বলিল—এর আর আগাগোড়া কি? স্বামীটা ছিল মাতাল, একদিনও রাত্রে বাড়ী থাকত না—আমিও তেমনি চলে এসেছি—নারী হয়ে জন্মেছি বলে কি জীবনের সব সুখ সব আশা জলাঞ্জলি দিতে হবে? আপনিই বলুন। তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া আবার বলিল—নিন্ হয়েছেত, এখন শুয়ে পড়ুন।

নিরাশ হইয়া কুমুদ কথা ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা তা যেন হল, এখন ঘরে ফিরে যাবার জন্যে তোমার অনুতাপ হয় না?

অনুতাপ আবার কিসের? আবার সেই—মাতালটার লাথি গুতো খেতে ফিরে যাওয়া? না: এ বেশ আছি।

কুমুদ কহিল—তোমাকে সৎপথে থাকবার যদি কোন উপায় করে দেওয়া হয় তাহলেও তুমি ফেরো না?

সৎপথে থাকবার জন্যেই কি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলুম? না আমার যৌবন ফুরিয়ে গেছে? সব সুখ ভাসিয়ে দিয়ে ব্রহ্মচারী সাজবার পাগলামী এখনও আমায় ধরে নি। এইত বেশ কাটছে—নিত্য নূতন আমোদ সাজসজ্জা, সন্ধ্যারাত্রে তোমাদের মতন চাঁদের হাট—তরুণী থামিল।

কুমুদ অন্যদিকে তাকাইয়া শুনিতেছিল—হঠাৎ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া, তাহার বিস্রস্ত বসন ও কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আবার অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিলে হঠাৎ তরুণী নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল—বলিল, নে ভাই অনেক বক্তিমে হয়েছে, এখন উঠে পড় দেখি, মাইরি কি রংয়েই ভুলিয়েছিস্ আমায়—বলিয়া রমনী এমন একটা কাণ্ড করিল যাহাতে কুমুদ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় লাফাইয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িল।

ঘৃণাভরে পকেট হইতে একখানা দশটাকার নোট তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়া দ্বিতীয় বাক্য না করিয়া কুমুদ বরাবর সিড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া গেল। নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল মেয়েটা জড়িত কণ্ঠে বলিতেছে—ঢং দেখনা মিন্সের, মরণ আর কি।

রাস্তায় আসিয়া কুমুদ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল নরকে থাকিয়া তাহার এতক্ষণ—দমবন্ধ

হইয়া গিয়াছিল—মুক্ত বাতাসে অনেকক্ষণ পরে সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

বাসায় ফিরিতে ফিরিতে কুমুদ ভাবিল—হায়রে, এদের আবার সৎপথে ফেরানো, এদের আবার অনুতাপের জ্বালায় ভরা মন, করুণ জীবন কাহিনী, তাতে আবার সহানুভূতি! কি অসম্ভব ভুল, কি দারুণ পরিহাস!

গল্পের প্লটকে জাহান্নমে পাঠাইয়া বাসায় না ফিরিয়া সে গঙ্গার ধারে গেল। সমস্ত শরীর ও তাহার মনে যেন একটা গ্লানি, একটা কলঙ্কের স্পর্শ সুঁচ ফুটাইতেছিল। তার সুচিবায়ুগ্রস্থ মনে পাপের এক কালিমাময় পরশ যে বিশ্রী দাগ বসাইয়া দিয়াছে তাহা যেন উঠিতে চাহিতেছিল না। সেই রাত্রে সে গঙ্গাস্নানে মনের ও শরীরের সকল কালিমা ধৌত করিয়া সিক্তবস্ত্রে মেসে ফিরিল।

পরদিন সকালে কুমুদ ঘরে বসিয়াছিল। সুধীর চা তৈরী করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ হে ভায়া, কাল অনেক রাত্রে গঙ্গায় নেয়ে ফিরছ শুনলুম, কাকে দাহ করে এলে?

আমার সেই গল্পের প্লটকে, বলিয়া কুমুদ বাহিরের দিকটায় চলিয়া গেল।

সুধীর কিছু বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

শান্তি

[শ্রীমতী আশালতা দাস]

(১)
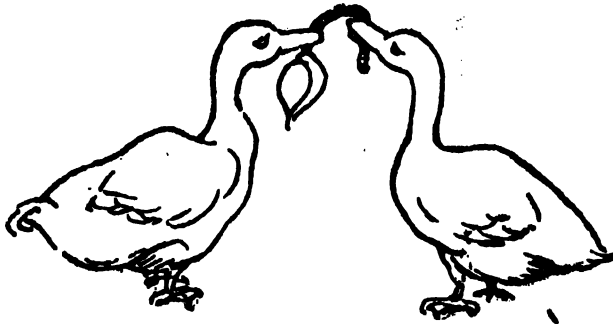
"সে আসে ধীরে
যায় লাজে ফিরে
রিণিকি, রিণিকি, রিণি, রিণি ঝিণি
মঞ্জু মঞ্জু মঞ্জু রে।"

বাইরের ঘরের সমস্ত জানালাগুলি খুলে দিয়ে হার্মোনিয়মটা টেনে নিয়ে অনিল একমনে উক্ত গানটি গাচ্ছিল। বাইরের ভরা বাদলের অবিচ্ছিন্ন রিম্ ঝিম ধ্বনি তার গানের সাথে সাথে তাল দিচ্ছিল। দম্‌কা বাতাসের সাথে ঠিক্‌রে আসা দু' চারটে বৃষ্টির কণা তার গায়ে সোহাগের মৃদু পরশ দিয়ে চঞ্চলা কিশোরীর মত ছুটে পালিয়ে যাচ্ছিল। অনিলের সেদিকে দৃকপাতই নেই…পথহারা উন্মাদ পথিকের মত তার সুরের ঢেউ উতলা হয়ে দিকে দিকে বিপুল আনন্দে ভেসে বেড়াচ্ছিল। কি সুমিষ্ট সুর। বিশ্ব কবির মধুর গানের প্রত্যেকটি কথা যেন সেই ঘরখানির চারপাশে সুরের জাল বুনছিল।

"ঠাকুরপো।"

পুলকবিস্মিতা অমিয়া দেবরের পৃষ্ঠে সস্নেহে হাত রেখে স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকল—"ঠাকুরপো।"

চমকে উঠে অনিল মুখ তুলে চেয়ে হেসে বলল—"কে, বৌদি!"

অমিয়া তরল কণ্ঠে বলল—"তুমি এমন গান গাচ্ছ…ভারী আশ্চর্য্য। আমি ভেবেছিলুম বুঝি তোমার কোন বন্ধু টন্ধু হবেও বা, তাই প্রথমটা ঘরে ঢুকতে সাহস করি নি। তা, থামছ কেন ভাই বল, সবটাই বল, তোমার গা'বার ভঙ্গী বড় সহজ, সরল—আর তেমনি মনোমুগ্ধকর।"

অনিল প্রশংসা বাক্যে ঈষৎ লজ্জিত ভাবে মাথাটা নত করে পুনরায় গান ধরল। প্রাণ ঢেলে দরদ মিশিয়ে গানটা শেষ করে, আবার একটা নূতন সুর বাজাতেই অমিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল—"দাঁড়াও ভাই, গোটাকতক প্রশ্ন করব।"

অনিল কপট বিস্ময়ে বলল—"সর্ব্বনাশ, এখানেও প্রশ্ন, এ প্রশ্নের হাত এড়ানো দেখছি সহজ সাধ্য নয়; আচ্ছা বল?"

অমিয়া একটু গম্ভীর ভাবে বলল—"আচ্ছা ঠাকুরপো—তোমার ঐ "সে"টি কে ভাই বল না আমায়?"

অনিলের মুখটায় কে যেন টাটকা রক্ত খানিকটা মাখিয়ে দিল। অবনত মুখে সে বলল—" 'সে' আবার কে বৌদি—গান তো আমি এম্নিই গাচ্ছিলুম; গান বুঝি কাকে লক্ষ্য করে গায় নাকি বৌদি?"

অমিয়ার মুখের উপর হাসির ঝিলিক ফুটে উঠল। মুচকী হেসে সে বলল—"তা, সময় বিশেষে গায় বইকি, গানেতে যেমন মানুষের মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে—এমনটি আর কিছুতে হয় না। তা যাক্ গে ভাই ও সব বাজে কথা—আমি আজ তোমার সঙ্গে একটু ঝগড়া করতে এসেছি, বুঝলে তো?"

অনিল তাড়াতাড়ি হারমোনিয়মটাকে ঠেলে বিছানার এক ধারে সরিয়ে রেখে—অমিয়ার সামনে ঘুরে বসে বলল—"ঝগড়া! ঝগড়ার কাণ্ডটা যে কি করেছি বৌদি মনে তো পড়ছে না। ওঃ তুমি বুঝি সেই পুরোণো কথা বলতে এসেছ বৌদি, বুঝেছি।"

অমিয়া একটু অনুযোগের সুরে বলল—"বুঝেছ তো ভাই …তবে কেন আমাদের মনে কষ্ট দাও বল ত? দেখ,—এর জন্যে আমার বা তোমার দাদার মনে একটুও শান্তি নেই—তুমি তো ভাই শিক্ষিত, বুদ্ধিমান—ছেলেমানুষটি নও, দুটো পাশ করেছ—তোমার এতটা অধীরতা কি শোভা পায়?

ছিঃ ভাই লক্ষ্মীটি ও সব ছেড়ে দাও, সমাজ যাদের নেয় না, ছোঁয় না, সেই সব লোকেদের সঙ্গে কি মিশতে আছে? যতই তারা শিক্ষিত হ'ক না কেন, তবু আমাদের চোখে তারা ঘৃণার্হ...এই সমস্ত ব্যাপারের জন্যে তোমায় যে লোকে পাঁচটা কথা বলে যাচ্ছে এটা শুনতে কত খারাপ লাগে বল দেখি?"

"লোকে আমাকে কি বলে যায় বৌদি?"

অমিয়া একটু থেমে থেমে বলল—"সে সব অনেক কথা, তা যাকগে আমি তাদের তুচ্ছ কথা মানি না—কিন্তু আজ আমি তোমায় মিনতি করে বলছি তুমি ওদের সংশ্রব একেবারে ছেড়ে দাও...বল আমার কথাটা শুনবে।"

অনিল একটু ক্ষুব্ধকণ্ঠে উত্তর দিল—"তুমি ভুল বুঝেছ বৌদি, তাদের সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা আছে তারা একেবারেই তা নয়—দেখলে তাদের একেবারে হিন্দু ঘরের মেয়ে বলেই তোমার বিশ্বাস হ'বে...হতে পারে আরতির মা পতিতা, সে আমাদের চোখে ঘৃণিতা হতে পারে, কিন্তু আরতির দোষ কোনখানটায় তুমি বিচার ক'রো বৌদি, তার মা যখন মরবার সময় আমাকে রাস্তা থেকে ডেকে এনে ছোট্ট মেয়েটিকে আমাকে মানুষ করতে দিলে, তখন তার বয়স কতই বা, আট কি নয় এই রকম...সেই বয়সের মেয়ের দ্বারায় যে আগে কোনরকম পাপ কাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে এত বড় অসভ্য কথাটা তুমি কখনই বিশ্বাস করবে না জানি... তারপর সেই থেকে তাকে আলাদা বাড়ীতে রেখে সৎশিক্ষা দিয়ে যাকে এত বড়টা করে তুলেছি...আজ তাকে নিঠুরের মত রাস্তায় বসিয়ে রেখে আসতে বল কোন হিসেবে বৌদি? আর সেই অকলঙ্কা মেয়েটিকে তোমার পায়ের তলায় আশ্রয় দিতে তোমার আপত্তিটাই বা কিসের...আমাকে সেটা বুঝিয়ে দাও?"

অমিয়া একটু অপ্রতিভ হইয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল— "না ঠাকুরপো, তাকে আশ্রয় দিতে আমার এতটুকুও আপত্তি ছিল না, কিন্তু জান তো ভাই দুষ্ট লোকের মুখে হাত চাপা দেওয়া যায় না..তাদের সেই ক্ষুরের ধারের মত তীক্ষ্ণ কথাগুলো বড্ড বুকে বাজে...সবার কথা না হয় নাই ধরলুম ...কিন্তু সমাজকে ছাড়া তো যাবে না...সেই সমাজ তো তোমায় নিয়ে চলবে না ভাই? তুমি হয়ত বলবে যে— "সমাজ ত্যাগ করলেই বা, আমাদের তো মিলন হ'লো...আর জাত আবার কি? ও সব হিন্দু ধর্ম্মের গোঁড়ামী—অন্ধ সংস্কার।" কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই এসেছে যে—'ঐ অন্ধ সংস্কারটা এখনও আছে বলেই তাই আমাদের হিন্দু ধর্ম্মটা এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছে... এখনও তাই সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ হচ্চে এই কুসংস্কারভরা হিন্দু ধর্ম্ম...'

অনিল একটু শ্লেষ মিশানো স্বরে বলল—"দোহাই বৌদি আমি 'টুলো' পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনতে একান্তই নারাজ, বেশ বাপু, তোমাদের হিন্দুধর্ম্ম যদি তাকে নিরাশ্রয়া, অনাথা জেনেও ঠাঁই না দেয়—তা হলে বলো, আমি অন্য ধর্ম্মে তাকে বিয়ে করি— তোমাদের ইচ্ছে হয় আমাদের ডেকো—"

"থাম, ঠাকুরপো,—আমাদের হিন্দুধর্ম্ম ছাড়া অন্য ধর্ম্মের বিয়ের বাঁধন কত আলগা, তা জান তো?"

"খুব জানি, আবার এটাও সত্য যে তোমাদের এই আদর্শ হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী মহাপুরুষেরা নাম মাত্র বিয়ে করে স্ত্রী বেচারীর সকল আশা, সকল বাসনা নিমেষে চূর্ণ করে অপর জায়গায় বিয়ে করবার জন্যে হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়, তবু বলবে যে আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের বিয়ের বাঁধন শক্ত! ওঃ সেটা বুঝি শুধু স্ত্রীলোকদিগের জন্য!"

অনিলের কথায় শ্লেষের আঘাত পেয়ে অমিয়া উত্তেজিত হয়ে বলল—"কেন বলব না, একাধিক বিয়ের জন্যে পুরুষদের দোষ দিতে পার, কিন্তু শুনেছ কি যে আজ পর্য্যন্ত যে সব স্ত্রীলোক স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যাক্তা হয়ে দিন কাটাচ্ছে তাদের মধ্যে কয়জন অন্য স্বামী বেছে নিয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে? না ঠাকুরপো, এখনও সেদিন আসে নি আর প্রার্থনা করি সে বিশ্রী দিন যেন কখনও না আসে।"

অনিল পূর্ব্ববৎ ব্যঙ্গপূর্ণ কণ্ঠে বলল—"যে রকম স্বাধীনতার ঢেউ এসেছে—তাতে মন ঠিক রেখে চলতে পারলে হয়।"

অমিয়া একটু আহতকণ্ঠে বলল—"তোমার সবেতেই ভাই ঠাট্টা...আমি যা বলতে এলুম...কতকগুলো বাজে কথা ক'য়ে তা তো উল্টেই দিলে। শোন ঠাকুরপো, আমি একটি বড় ঘরের শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে ঠিক করেছি—এখন তোমার

মত পেলেই 'পাকা দেখা' করে রাখি। সামনের এই ক'টা মাস গেলে অগ্রাণেই শুভকর্ম্মটা সেরে ফেলব, কি বল ?"

অনিল কথাটা শুনে বিশেষ প্রীত হলো না, খানিকটা চুপ করে থাকবার পর সে বলে উঠল—"আচ্ছা বৌদি, একটা কথা—'যে ইচ্ছে করে সৎপথে আসতে চায়, তার সঙ্গে কি ব্যবহার করাটা উচিত ? তাকে হাত ধরে পাপের পঙ্কে ফেলে দেওয়াটাই আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ব না ? 'পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে ঘৃণা করো না' এই একটা যে চলিত কথা আছে এটা মানো কি ? আচ্ছা...কিন্তু পাপী হওয়া চুলোয় থাক, পাপ কাকে যে বলে এ পর্য্যন্ত সে আদপেই জানে না...সে চায় গৃহস্থ ঘরের বধূ হ'তে। তোমাদের সঙ্গে মিশে তোমাদের মধ্যে একজন হতে; যে মনে প্রাণে পাপকে এড়িয়ে চলতে চায়, জানে না সে যে কার মেয়ে, যার অকলঙ্ক জীবনে এ পর্য্যন্ত পাপের ছোঁয়াচ লাগল না' তাকে তোমাদের হিন্দু সমাজ কি কারণে কোন শাস্ত্রের নজীর দেখিয়ে দূরে সরিয়ে রেখে নাক তুলে বলবে—'উহুঁ—ছুঁয়ো না ওকে, ওটা বেশ্যার মেয়ে, ছুঁলে তোমাদের জাতে ঠেলব।' কেন তারা এ সকল কথা বলবে বলো, আমায় সেটা জানিয়ে দাও বৌদি ? কিন্তু ধর্ম্মের মুখোস প'রে সেই বড় বড় সমাজ নেতারা যে কত বড় বড় অসংখ্য পাপ করে যাচ্ছেন—সে হিসেব আমাদের অন্ধ হিন্দু সমাজ রাখে কি ? তোমায় আমি এই শেষ কথা বলে রাখছি বৌদি—সমাজ আমাকে ঘৃণা করুক তাতে কোন ক্ষতি নেই—কিন্তু একজনের অন্তিম কালে যে শপথটা করে এসেছি আমি... প্রাণ গেলেও তার অন্যথা করতে পারবো না। তা ছাড়া যাকে আমি একবার ঈশ্বর সাক্ষী করে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছি—তাকে আমি জীবনে ত্যাগ করতে পারবো না—না—তোমার অনুরোধেও না বৌদি, তার জন্যে আমাকে ক্ষমা ক'রো। ধর্ম্মের নাম নিয়ে এত বড় অধর্ম্ম করে আমি বিধাতার অভিশাপ কুড়োতে পারবো না। তোমার পায়ে পড়ি বৌদি আমাকে আর দ্বিতীয়বার বিয়ের জন্যে আদেশ বা অনুরোধ করো না বৌদি, সে আদেশ আমি অকৃতজ্ঞ, রাখতে পারবো না। মিথ্যে বিয়ে করে আর একটা সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ ডেকে আনতে পারবো না...আমার মার্জ্জনা করো।"

অমিয়া স্তব্ধ হ'য়ে অনিলের আবেগপূর্ণ কথা শুনছিল—দেবরের কথায় অন্তরে আঘাত পেয়ে সে আহত করুণকণ্ঠে বলে ফেলল—"তা হলে তুমি আমার কথা রাখলে না ঠাকুরপো...তোমার 'আরতি' কি এত বেশী আপনার হ'লো যে তার জন্যে তুমি আমাদের ঠেলে রাখতে চাও ? সেই 'আরতির' জন্যে তুমি আমাদের প্রাণে ব্যথা দিতে কুণ্ঠিত হ'চ্ছো না। বেশ তবে তাই হোক ভাই, আর আমি তোমাকে কক্ষণো অনুরোধ করতে আসবো না। কি দরকার ভাই...এখন তুমি বড় হ'য়েছ, বুদ্ধি হয়েছে, এখন নিজেকে নিজে খুব চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে...আর তো আমাকে কোন দরকার নেই ভাই ?"

বলতে বলতে অমিয়ার কণ্ঠস্বর অশ্রুবাষ্পে বন্ধ হয়ে এল। অমিয়া দ্রুতপদে কক্ষত্যাগ করলে।

(২)

অনিল বৌদিকে ঘরে ঢুকতে দেখে সোজা হ'য়ে বসে ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসিল—"কি হলো বৌদি ?"

অমিয়া ঢোঁক গিলে বিমর্ষমুখে উত্তর দিল—"নাঃ হলো না ভাই, কথা পাড়তেই উনি একেবারে রেগে গরম হ'য়ে উঠলেন, আমাকে অনেক কথা শুনিয়ে দিলেন,—আর, আর—"

অনিল বাধা দিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বলল—"দোহাই বৌদি, তোমার কথাটা শেষ করে ফেল, তারপর দাদা কি বল্লেন ?"

অমিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলল—"তার এ বাড়ীতে স্থান হওয়া একেবারেই অসম্ভব—তাদের থাকবার ঢের জায়গা আছে, তাদের দেখবার লোকের অভাব নেই—কেবল তোমাকে রূপের ফাঁদে, কথার ছলে ভুলিয়ে রেখে দিয়েছে...নইলে তোমার পরে তার কণামাত্রও ভালবাসা নেই—যা করে, সেটা কেবল নিছক ছলনা মাত্র।' আর তুমি যদি তাকে ছাড়তে না পার' তাহলে, তাহলে—"

মুখের কথা টপ করে কেড়ে নিয়ে অনিল বলে উঠল—

"তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমারও এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া উচিত, না বৌদি ?"

অমিয়া কোন উত্তর দিতে পারল না, সজল চোখে মাটী পানে চেয়ে বসে রইল। অনিল চট করে খাট হ'তে নেমে অমিয়ার পা'দুটো জড়িয়ে ধরে তার পরে মাথা রেখে আবেগ ভরে অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলল—"দাদার কথা জ্ঞান হয়ে পর্য্যন্ত কক্ষণো অমান্য করিনি···কিন্তু আজ কর্ত্তে বাধ্য হচ্ছি... আরতির যখন এ বাড়ীতে স্থান হ'লো না বৌদি···তখন সেই অভাগী মেয়েটার স্বামীরও এ বাড়ীতে থাকবার মত মনের বল নেই বৌদি। দুঃখ করোনা তুমি···যে আমার স্ত্রী, একেবারে সম্পূর্ণ অসহায়া, তাকে আমি রাস্তায় নিরাশ্রয়া করে বসিয়ে রেখে কোন প্রাণে বাড়ী বসে সুখের অন্ন মুখে দেব ? তাহলে আমি চললুম বৌদি ; দাদার কাছে যাওয়া মিথ্যে—কেননা তিনি এ হতভাগ্যের মুখ দর্শন পাপ বলে মনে করবেন বোধ হয়। তাঁকে আমার প্রণাম জানিও। আর তোমাকে এই জন্মের মত প্রণাম করে গেলুম বৌদি... আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করো।"

অনিল ত্বরিত পদে ঘর ছেড়ে উঠানে নেমে দাঁড়াল... ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও তার দাদার দেখা মিলিল না—তখন অনিলের ন্যায় পুরুষেরও নয়নে অশ্রু ভরে উঠল।

অমিয়া শশব্যস্তে তার পিছু পিছু গিয়ে আকুলকণ্ঠে ডাকল—"ঠাকুরপো, অনিল—আজকের দিনটা, শুধু আজকের রাতটা থেকে যা ভাই—আজ যে বিজয়া দশমী।"

অনিল চলতে চলতে মাথা ফিরিয়ে পাণ্ডুমুখে বিষাদের হাসি ফুটিয়ে বলল—"বেশতো, আজতো শুভদিন বৌদি··· তবে এই দুঃখ রইল যে বীণু মা'র বিয়েটা দেখা আমার অদৃষ্টে ঘটল না—আচ্ছা প্রণাম—" অনিল আর তাকাল না! হন্ হন্ করে মেঠো রাস্তার পথ ধরে দৃষ্টি পথের বহির্ভূত হ'য়ে গেল।

অমিয়া একদৃষ্টে অনেকক্ষণ সেই দিকে চেয়ে চেয়ে নৈরাশ্য পীড়িত বক্ষে উঠানের মাঝখানে বসে পড়ে সজোরে মুখে আঁচল গুঁজে ফুলে ফুলে কেঁদে উঠল।

(৩)

আরতি যে খুব সুন্দরী ছিল তা নয়। তার বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যাম। কিন্তু নবীন বর্ষা সমাগমে নব কিশলয় যেমন বালার্ক কিরণ সম্পাতে সৌন্দর্য্য সম্পন্ন হ'য়ে ওঠে—তেমনি আরতির ষোলটি বসন্ত গত সুকুমার চারু দেহলতা খানি তরুণ যৌবন শ্রীতে স্নিগ্ধকান্তি সম্পন্ন হ'য়ে মৃদু সৌন্দর্য্যে ঝলমল করছিল। অসুন্দরের মধ্য দিয়েই চিরসুন্দরকে পাওয়া যায়। অরূপের অন্তরালেই জগতের সমস্ত আকাঙ্ক্ষিত রূপ মাধুরী খুঁজে পাওয়া যায়...শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, সকলেই এই অরূপের সাধনা করেন ; অসুন্দরের মধ্যে বিশ্বের চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আধার অরূপ রতনের মূর্ত্তিটিকে খুঁজে বার কর্ত্তে চেষ্টা করেন—তাই অনিলের এই অরূপের সাধনা ব্যর্থ হয় নি। আরতির সুপুষ্ট শ্যামাঙ্গ ঘিরে এমন একটা কমনীয়তা, এমন একটা মধুরতম লাবণ্য, একটা অনভ্যস্ত সরমের সঙ্কোচ ছিল—যে কোন ব্যক্তি তার পানে একবার তাকালে ক্ষণেকের জন্যে দৃষ্টি ফিরাতে পারত না। তার উপর ছিল তার অসীম ধৈর্য্যতা...অনন্যকরণীয় গুণাবলী, শিষ্টতা, নম্রতা···এই সমস্ত কারণগুলি একত্রীভূত হয়ে তাকে যেন অসীম সৌন্দর্য্য লক্ষী করে তুলেছিল। আকাশের ঘন নীল শান্ত যবনিকার অন্তরালে যেমন একটা বিরাট রহস্য বিশ্ব মানবের দৃষ্টি সম্মুখে অপরিজ্ঞাত থেকে যায় তেমনি আরতির ছোট্ট বুকটির গোপন কোণে বুঝি আরো কিছু সঞ্চিত ছিল—যা তখনও পর্য্যন্ত অন্ধ অনিল বুঝে উঠতে পারে নি।

* * * *

অনিল যখন কলকাতায় ফিরে আরতির কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তখন আরতি লজ্জায় কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হ'য়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেল। ক্ষণেক পরে সেভাব কেটে গেলে সে মুখ তুলে বলল—ছিঃ ছিঃ তোমার অমন করে দাদা আর বৌদিদিকে ব্যথা দিয়ে আসাটা ভারী অন্যায় হ'য়েছে—না এ আমি কক্ষণো হ'তে দেব না...আমার জন্যে তুমি তাঁদের স্নেহ হারাবে, কেন গো ?" তার কণ্ঠস্বর গভীর আত্মগ্লানিতে পরিপূর্ণ।

অনিল সাশ্চর্য্যে বলল—"তুমি আমাকে কি করতে বল আরতি ?"

দৃঢ় অবিচলিত স্বরে দীপ্তমুখে আরতি উত্তর দিল—"ফিরে যেতে অনুরোধ করছি...ওগো তুমি ফিরে যাও...দাদা আর বৌদিদির পায়ে ধরে মাপ চেয়ে নাওগে...তাঁরা তোমাকে নিশ্চয় ক্ষমা করবেন।

"আর তুমি ?"

আরতি অবনত মুখে বলল—"আমার পথ তো দাদা দেখিয়ে দিয়েছেন...আমি—সেই পথ অবলম্বন করে নিজের ব্যবসা চালাব।"

আরতির কণ্ঠের সুর বোধ হয় তখন কেঁপে উঠেছিল।

অনিল শিউরে উঠে আরতির কোমল করপল্লব দু'হাতে চেপে ধরে সবেগে বলল—"নাঃ তুমি এখন প্রকৃতিস্থ নও; তুমি পাগল হয়েছ আরতি···তাই এমন মারাত্মক বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করছ···দোহাই আরতি রহস্যেরও একটা সীমা আছে জেনো, সেটা সব সময়ে খাটে না।"

আরতি নিজেকে সামলে নিয়ে কঠিন স্বরে বলল—রহস্য করা আমার ব্যবসা নয়—আর সেটা কখনও তোমার সঙ্গে করিনি, তাই আজ সত্যি কথাই বলছি যে তুমি বাড়ী ফিরে যাও—আমি আমার চিরন্তন ব্যবসা আরম্ভ করি। আত্মবিক্রয়।"

অনিল স্খলিত চরণে ছুটে এসে আরতির মুখ চেপে পাগলের ন্যায় বলল—"উঃ চুপ কর আরতি—থাম, থাম,—তোমার মুখে ও কথাগুলো বড় বিশ্রী শোনাচ্ছে, যদি তোমার মন না জানতুম, তাহলে এ মর্ম্মঘাতী কথা বিশ্বাস করতুম... কিন্তু, তোমাকে যে আমি জানি...বেশ বেশ—তোমার ব্যবসা তুমি আরম্ভ কর, আমিও এদেশ ছেড়ে পালাই, সেই ভাল কথা।"

আরতির চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা তপ্ত অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ছিল। অনিল আদর করে তাকে পাশে বসিয়ে কোমল-কণ্ঠে বলল—"মনকে প্রতারণার চেয়ে আর বেশী পাপ নেই আরতি। তাতে সুখ পাবে না, তুমি স্ত্রী—আমি স্বামী। জন্ম জন্মান্তরের জন্যে বিধাতা আমাদের মিলনসূত্রে গেঁথে দিয়েছেন, ঈশ্বরের দেওয়া সে বন্ধন তুমি আমি ছিন্ন করবো কি সাধ্য আছে আমাদের আরতি। যে সমাজ তোমার মত পবিত্র মেয়েকে স্থান না দেয়, সে সমাজকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি—তার সঙ্গ প্রাণপণে এড়াতে চাই...তাকি জানো আরতি...তোমার মত দেবভোগ্য নির্ম্মাল্যে যদি তাদের মন্দির গৃহ অপবিত্র হয়, তাহলে কাজ কি তাদের সে জায়গায় গিয়ে ? ছিঃ আর ও সব 'যা-তা' কথা মুখে এনো না তাহলে শাস্তি দেব...আপনার কখনও পর হয় বোকামণি...এত কথা জানো এটা জানোনা—আবার দাদা বৌদি আমাদের ডেকে নেবেন···আমার সাথে তাঁদের আবার মিলন হবে দেখো -কিন্তু তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হ'লে তোমাকে তো আর মাথা কুটলেও ফিরে পাবো না আরতি ? আবার কাঁদে পাগলি, চলো আজ 'মডার্ণ থিয়েটারে' 'দেবলা দেবী' প্লে হচ্ছে দেখে আসিগে'।"

থিয়েটারের নামেও আরতির কোন ভাব পরিবর্ত্তন দেখা গেল না...তখন অনিল উঠে তার মাথার অসংযত কেশরাশি ধীরে ধীরে গুছিয়ে দিতে দিতে সোহাগ মাখা সুরে বলল—"আরতি তুমি আমার কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে না ?"

আরতি অনিলের উরুতে মুখ গুঁজে অঝোর ঝরে কাঁদছিল—এইবার মুখ তুলে ভারী গলায় বলল, "কোন কথাটা ?"

"তুমি আমার স্ত্রী !"

আরতি বিহ্বল নেত্রে অনিলের মুখ পানে চেয়ে ভাঙা ভাঙা সুরে অসংলগ্ন ভাবে বলল—"এতদিন তো তাই বিশ্বাস করেছিলুম—তবে আমার এ ভুল ভাঙিয়ে দিলে কেন তুমি। আমাকে কেন এসব কথা বললে ? আমিতো জানতুম না যে সত্যিই তুমি আমার কে ? উঃ—এখন বুঝলুম যে আমি পতিতার মেয়ে—তোমাকে আমি সর্ব্বনাশের পথে টেনে এনেছি—আমার জন্যে তুমি আপন জনের স্নেহ হারিয়েছ ; ওগো এ কথা আমি কি করে সইবো—এ যে আমাকে চিরকাল ব্যথার হুল ফোটাবে—"না না, যাও—তুমি এই দণ্ডে চলে যাও—আমি চাইনে তোমার স্নেহ—আমি তোমাকেও চাইনে—আর মায়া দেখাতে হবে না—"

অনিল শান্তভাবে আরতিকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলল—"চাইনে বললেই কি আমি যাব আরতি ?"

আরতি বড় করুণকণ্ঠে বলল—"তুমি বড় নিষ্ঠুর যাও।"

(৪)

তিন বৎসর পরের ঘটনা। সেদিন বিজয়া দশমী। পল্লীগ্রামে গঙ্গার তীরে ভয়ানক ভীড়। দেবী প্রতিমার নিরঞ্জন হচ্ছে। গঙ্গাবক্ষে সমাগত সুসজ্জিত উৎসুক নরনারী, বালক বালিকাদের মধ্যে—একটি নিম্ন শ্রেণীর ছোট মেয়ে বিসর্জ্জন দেখতে এসেছিল। দু হাতে সে প্রাণপনে ভীড় ঠেলেছিল—সবল পুরুষদের ধাক্কায় সহসা সে নিমিষে ভূমিতে অবলুন্ঠিতা হয়ে পড়ে অসংখ্য মানবের পায়ের চাপে নিস্পেষিত হয়ে গেল। তার একটি মুহূর্ত্তের করুণ আর্ত্তস্বর উত্তেজিত মানবের কর্ণে পৌঁছিল না। * * দূরে ছইঘেরা গরুর গাড়ীতে বসে সুনীল তার বড় মেয়েটির শ্বশুরবাড়ী হ'তে ক্ষুণ্ণ-মনে ফিরে আসছিল। নিগৃহীতা বালিকার মর্ম্মছেঁড়া কাতরস্বর তাঁর হৃদয়ে বারেকের তরে পশে তাঁকে চঞ্চল করে তুলছিল। কিসের জন্যে সুনীল একবার তার মেয়েটির কথা ভাবল—তারপর মোটা চাদরে প্রান্ত দিয়ে চোখের কোন দু'টো মুছে নিয়ে গাড়ীর উপর ক্লান্ত দেহে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যারাণী যখন তাঁর ধূসর আঁচল উড়িয়ে দিয়ে দিগন্তের বুকে ধীরে ধীরে জলন্ত দীপ বসিয়ে দিয়ে পৃথিবীর বুক হ'তে বিদায় নিচ্ছিল—যখন তাঁর প্রতি কোমল চরণাঘাতে ঘুমন্ত তারাগুলি ধীরে ধীরে দল মেলে দীপ্ত চোখে নীরব ভাষায় বিশ্ব দেবতার বন্দনা গীত গাইছিল। প্রতি ঘরে ঘরে যখন পল্লীবধূরা শঙ্খধ্বনিতে সন্ধ্যাদেবীর আরতি আরম্ভ করেছিল—তখন অমিয়া গলদেশে অঞ্চল বেষ্টিত করে তুলসী মঞ্চে প্রদীপ দিয়ে কায়মনোবাক্যে স্বামীর সংসারের আর সেই অভিমানী দেবরটির মঙ্গল প্রার্থনা কচ্ছিল। বহির্দ্বারে করাঘাত শুনে অমিয়া ত্রস্তপদে বাইরে এসে দ্বার খুলে সোদ্বেগে প্রশ্ন করল--

"বীনু মা কই ?"

সুনীল আর একবার চোখ দু'টো মলিন চাদরে মুছে নিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বল্ল—"বিনু—বীনুমাকে তারা পাঠালেনা অমু—তাকে আনতে পারলুম না।"

দাওয়ার খুঁটিটা সজোরে চেপে অমিয়া ধপ করে সুনীলের পায়ের তলায় বসে পড়ে সিক্ত কণ্ঠে বলল—"কি বল্লে—বীনুকে পাঠালে না—? হ্যাগা বীনার শ্বশুররা এমনিই নিষ্ঠুর—মানুষের চামড়া কি তার চোখে নেই—তাই তারা বছরের একটা দিন পূজোর সময় মায়ের বাছা মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলনা—এ কি সত্যি কথা ?"

সুনীল বেদনা ভরা সুরে বলল—"পাঠাতো অমু—যদি আমরা পূজোয় তত্ত্ব কর্ত্তুম।"

"এই কথা—কেন এম্নি দিনই কি চিরদিন তোমার গ্যাছে...তোমার এত বিষয় কেন নষ্ট হ'ল...সেতো ঐ ঘরে বীনার বিয়ে দিয়েইতো ? আজ এটা কাল এ দাও এই সমস্ত ছল ছুতোয় তো ভিটেটুকু পর্য্যন্ত বাঁধা পড়ে গেল উঃ আজ যদি পয়সা থাকত ..."

সুনীল অধোমুখে বলল—"অমু ঝকমারী করেছিলুম—পাশ করা ছেলের সঙ্গে বীনার বিয়ে দিয়ে - আজ যদি একটা সুস্থ সবল চাষীর হাতে মেয়ে দিতুম তা হলে মা আমার চাষার ঘরেও মনের সুখে থাকতে পার্ত্ত, জানো অমু—আরও কি মর্ম্ম ঘাতী কথা শ্রুপ হ'য়ে আমি শুনে এসেছ বীনুমার কপাল ভেঙেছে,—জামাই—একটা মাতাল, দুশ্চরিত্র, চরিত্রহীন—উঃ সেই ছেলের গর্ব্ব কত।"

অমিয়া সুনীলের বুকে মুখ রেখে মর্ম্মভেদী সুরে বলল—"ওগো আর বলনা—আমি যে তার মা, আমার যে বুক ভেঙে যাচ্ছে...হ্যাগা ঠাকুর পো গ্যাছে আজ দু বছর হল'না ?

ভগ্নকণ্ঠে সুনীল বলল—হ্যাঁ অমু।"

অমিয়া নিজের দুর্নিবার দুঃখ ভুলে সহসা মুখ তুলে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল - "উঃ এই দুটো বছর খোঁজ করে তার ও কোন সন্ধান মিলল্‌না—যাই বল বাপু অমন করে তার মনে আঘাত করাটা তোমার উচিত হয়নি সেই দীর্ঘ নিশ্বাস আজ আমাদের প্রতি পদে দহন করছে তা কি জানো ?"

সুনীল গাঢ় কণ্ঠে বলল—"রাগের মাথায় তখন উচিত অনুচিত জ্ঞান ছিলনা অমু—তাই মুখে অমন কথাটা বেরিয়ে গেল—কিন্তু এই যে আমি প্রতি নিয়ত তার পায়ের ধ্বনি শোনবার জন্যে অধীর হয়ে দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গুণে যাচ্ছি আমার এ আশা কি সফল হবেনা—সে কি তার অপরাধী দাদাকে ক্ষমা করতে একবার এই কঠিন বুকটাতে ফিরে আসবেনা ? সে যে আমার বীনা, রেণু—কমলের চেয়ে ও কত বড় স্নেহের ধন তাকি সে জানে না অমু ?"

যন্ত্রণায় উভয়ের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে লুটিয়ে পরছিল। অমিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল—"ওগো সে তা জানে—কেবল অভিমান করে চলে গেছে—ওকি বাইরে কে যেন ডাকছে না? দেখতো গিয়ে একবার?"

অনিলের যাওয়ার পর হতেই এই দুটি অনুতপ্ত স্বামী স্ত্রী প্রতি পদশব্দে—বুকের মর্মর ধ্বনিতে চমকিয়া ভাবিত এই বুঝি তাদের হারানিধির পায়ের ধ্বনি। সুনীল বলল—"যাও শীগগীর দেখগে অমু কে ডাকছে।"

সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে অমিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল—ধীরে ধীরে এক নারীমূর্ত্তি তাদের উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে! অমিয়া সংশয়ব্যাকুল কণ্ঠে জিগ্যেস করল—"তুমি কে গা? কথা কচ্ছনা যে—কে তুমি বল না?"

অপরিচিতা নারী সজল সুরে বলল "দিদি আমি আরতি"

অমিয়া তার কথার প্রতিধ্বনি তুলে উচ্চকণ্ঠে বলল "কি বল্লে—আরতি!"

আরতির নাম শুনে সুনীল তাড়াতাড়ি বাইরে কেরোসিনের ডিবেটা দেশলাইয়ের সাহায্যে ফস্ করে জ্বেলে দিতেই তার উজ্জ্বল অগ্নিশিখার আলোকে আরতির মূর্ত্তিখানি ধরা পড়ে গেল আরতির বিষাদ প্রতিমার ন্যায় সকরুণ মূর্ত্তি শুভ্র বসনে আবৃত হ'য়ে বড় মর্ম্মস্পর্শী দেখাচ্ছিল। সুনীল গভীর যন্ত্রনায় অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় বসে পড়ল। আরতি তার বুকের মধ্য হতে অতি সন্তর্পনে একটী কমল কলির ন্যায় শিশুকে বের করে উভয়ের পদ প্রান্তে নামিয়ে দিয়ে সঙ্কুচিত ভাবে স'রে দাঁড়ালো। চোখের উষ্ণ ধারায় তার বুকের বসন সিক্ত হ'য়ে উঠেছিল। সুনীলের এতক্ষণে লুপ্ত চৈতন্য ফিরে এল। সে উন্মাদের মত রক্ত-আঁখি মেলে বলল বৌমা—আমার অনিল—আমার বুকের ধন অনিল কে কোথায় রেখে এলি মা?"

হায় আনল কোথায় তখন। আরতি লজ্জা সরম ভুলে সুনীলের পায়ের তলায় ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় লুটিয়ে প'ড়ে আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে উঠল। ভগবান! ভগবান—একি মর্ম্মভেদী দৃশ্যের মধ্য দিয়ে তুমি মিলন সেতু গড়লে প্রভু! অমিয়া অনিলের শেষদান শিশুটিকে, সজোরে বক্ষে চেপে সরোদনে বলে উঠল "ঠাকুরপো এলেনা ভাই, আমাদের জন্মের মত অপরাধী করে চলে গেলে?"

সুনীল অমিয়ার কোল হ'তে শিশুটিকে ছিনিয়ে নিয়ে, তার কোমল গণ্ড চুমোয় চুমোয় আরক্ত করে তুলে হাহাকার করে বলে উঠল "অনিল অনিল, অভিমানী ভাইটি আমার বিসর্জ্জনের দিনে তোকে বিদায় দিয়েছিলুম বলে কি সেই পাপের জন্যে আমাকে এম্নি করেই শাস্তি দিতে হয় রে এক-বারও তুই আমার কথা ভাবলি নে ওরে এই শাস্তির বোঝা আমি জন্ম জন্ম কি করে বুক পেতে বহন কর্ব্বো রে..."

বাইরে তখন সজোরে বাজনা বাজছিল—এক পাশে এই ভাঙা ঘরের তিনটি প্রাণীর মিলিত কণ্ঠের আকুল হাহাকার ধ্বনি বিসর্জ্জনের বাজনা ও সমবেত জন কোলাহলের মধ্যে মিশে গিয়ে চাপা পড়ে গেল। গভীর রাত্রিতে যখন আমোদ প্রমোদান্তে সকলে প্রফুল্ল হৃদয়ে গৃহে ফিরছিল তখন তাদের কানে একটা অস্ফুট গোঙানী স্বর ভেসে আসছিল—

"ওরে এমনি শাস্তি কি দিতে হয়রে ফিরে আয়—আমার অভিমানী একবার ফিরে আয়রে।"

শুদ্ধি

[শ্রীমতী পূর্ণিমা দেবী]

বিশু ঘোষালের স্ত্রী শশীমুখী সুন্দরী এবং যুবতী।

বিশু নিজে কিন্তু কাঠখোট্টা, কাল, এবং ভয়ঙ্কর গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বয়সেও দুজনের মধ্যে অন্ততঃ পনেরটা বছরের তফাৎ।

তবু যে এই সম্পূর্ণ বিভিন্ন চেহারার লোক দুটী মিলনের পবিত্র বাঁধনে বাঁধা পড়ে এক হয়ে চলতে পেরেছিল, তার একটা ইতিহাস আছে।

বিশুর আপন বলতে আত্মীয় স্বজন বিশেষ কেহ ছিল না। পৈতৃক ছোট একটা কুঁড়ের মধ্যে মাথা দেবার স্থান তার একটুখানি ছিল সত্যি, এবং সম্বৎসরের ধান চালটাও যোগাড় হ'ত কোন রকমে; তথাচ দেশের পনের আনা লোকের মত 'নিষ্কর্ম্মার স্ফূর্ত্তি' ঘরে বসে উপভোগ করা তার ভাগ্যে ছিল না। সহরে বাসা করে থেকে, একটা সদাগরী আফিসে সে চাকরী করে। ছুটীর দিনে একবার করে দেশে বেড়িয়ে যায়। এমনি করে নির্ব্বাটে তার জীবনের পরিমাণ জ্ঞাপক অঙ্কটা তিরিশের কোঠায় গিয়েছিল। সে বিবাহ করে নাই। হিতৈষী লোক কেহ দেখা হলে এর জন্ত কৈফিয়ৎ চায়; সে উত্তর করে "নিজে খেতে পাই না, বিয়ে করে কি করব?"

পাশেই 'মোড়ল' নামে একটী যুবকের বাস। দু'মহল বাড়ী,—বাগান,—লোক লস্কর সবই আছে। অল্প বয়সে অগাধ সম্পত্তি হাতে পেয়েছে, মহা আনন্দে মদ ও গাঁজা টেনে, বড়মানুষী করে দিন কাটায়। মোড়লের একটী বিশিষ্ট দল আছে। পাড়ার বৌ-ঝিরা এদের অত্যাচারে সবাই ত্রস্ত। এইসব কেলেঙ্কারী ব্যাপার উপলক্ষ্য করে পাড়ায় দু' চারবার দাঙ্গা হাঙ্গামাও হয়ে গেছে।

টাকা আছে, তা ছাড়া চেহারাতেও কার্ত্তিক। স্বভাব চরিত্রের দিকটা বিশেষ কিছু যাচিয়ে না দেখে অনেকগুলি মেয়ের বাপের মতই, উমাচরণ মুখুয্যেও প্রলুব্ধ হয়ে মোড়লের কাছে হাঁটাহাঁটি করেছিলেন। তাঁর মেয়ে শশীমুখীকে দেখেই মোড়লের পছন্দ হয়েছিল। উমাচরণ মোড়লকে জামাতারূপে পাবার কল্পনায় বিভোর হয়েছিলেন।

নির্দ্ধারিত বিবাহের রাত্রে বর, বরযাত্রী প্রভৃতি উমাচরণের বাড়ী হাজির হলেন। দলের প্রত্যেকেই নেশায় বিভোর হয়েছিল। মোড়লের এক বিশিষ্ট সঙ্গী বলে উঠল, "আমরা কনে দেখতে চাই! বৌ ঠাকরুণকে আসরে নিয়ে এস। বিয়ের লগ্ন সেই রাত তিনটেয়—অতক্ষণ বসে থাকতে পারব না। শুনেছি গাইতে পারেন ভাল,...এবং হয়ত নাচতেও জানেন,...অতএব আসর মাতাবার সমস্ত গুণই আছে তাঁর।"

মোড়লও এই প্রস্তাবে যথেষ্ট উৎফুল্ল হয়ে বললে "নিশ্চয়! নিশ্চয়! আজকের রাত্রে আমোদ পূরো মাত্রাতেই উপভোগ করতে চাই। গোটা দুই চার গান গাওয়াতেই হবে।"

পানাসক্ত মোড়লের যথার্থ স্বরূপ উমাচরণ জানতে পেরে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ভবিষ্যৎ জামাতার রূপ ও ঐশ্বর্য্য দেখেই প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, গুণের পরিচয় জানবার জন্য অনুসন্ধান করেন নি বলে যথেষ্ট অনুশোচনা হতে লাগল।

কন্যাপক্ষ হতে মোড়লের অসঙ্গত দাবীর প্রত্যুত্তর দেওয়া হল, লাঠি ও জুতার সাহায্যে। বরের দল মার খেয়ে পালিয়ে বাঁচল। উমাচরণ বললেন "মেয়ের বে যদি নাই হয় তবু ওরকম লক্ষ্মীছাড়ার হাতে দেব না।

উত্তেজনার প্রথম স্রোত কিছু প্রশমিত হলে তখন নূতন বরের খোঁজ আরম্ভ হ'ল। সে রাত্রে কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও 'পাত্র' পাওয়া গেল না। মেয়েটী দো-পড়া হয়ে রইল। এবং তথাকথিত সমাজে মেয়ের বাপ একঘরে হলেন।

চোখের সামনে এই যে জীবন নাট্যের বিশিষ্ট অঙ্কটীর অভিনয় হয়ে গেল, তার প্রভাব উমাচরণকে মর্ম্মব্যথায় জর্জ্জরিত করেছিল। অবশেষে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন।

তাঁর আর জীবনের আশা ছিল না। চেষ্টা করেও শশীমুখীর একটা গতি করে যেতে পারছেন না, এ আক্ষেপ মর্ম্মান্তিক হয়ে বুকে বাজছিল।

বিশু ঘোষাল সমস্ত ঘটনাটা শুনেছিল। বিশেষ শশীমুখীর বাপের একঘরে হওয়ার ইতিহাস, এবং তাঁর বর্ত্তমান দুরারোগ্য রোগে পড়ার কথা শুনে বিশুর মন বিগড়ে গিয়েছিল। সমাজের কথা, নিজের চিরকুমার থাকবার সঙ্কল্প ইত্যাদি সব ভুলে গিয়ে সে উমাচরণের বাড়ী হাজির হ'ল এবং বললে "মহাশয়! আমি দরিদ্র—তবে খেটে চিরদিন নিজের অন্ন নিজে জোগাড় করে নেব এটুকু মনের জোর আছে। আপনি যদি আমাকে ভুল না বোঝেন, এবং আমার এই চাওয়ার মধ্যে অনধিকার ও অন্যায় আস্পর্দ্ধার বিষয় কিছু মনে না করেন, আমি আপনার মেয়ের পাণিগ্রহণ করব বলতে এসেছি।..."

উমাচরণ সন্তুষ্ট মনেই সম্মতি দিলেন। কথায় বার্ত্তায় বুঝেছিলেন, বিশু দরিদ্র হয়েও অনেক বড় সম্পত্তির অধিকারী।—তার মনের জোর, দেহে খাটবার উপযুক্ত বল আছে, এবং সে ভদ্র। ভাবলেন, বিশুর হাতে পড়ে 'মেয়ে' নিশ্চয়ই অসুখী হবে না।

চারিদিকে বিশুর যেচে 'একঘরে'র মেয়েকে বিয়ে করতে যাওয়ার কথা শুনে সকলেই ছিঃ ছিঃ করতে লাগল। বিশু তা' গ্রাহ্য করল না।

এদিকে উমাচরণও তাঁর পার্থিব একমাত্র 'বোঝা'টা সৎ পাত্রের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই এ জগৎ হতে বিদায় নিলেন।

বিশু নব পরিণীতা স্ত্রীকে নিজের বাড়ী নিয়ে এল। তাকে বললে, "আজই আমায় কলকাতায় যেতে হবে। কিছু ঠিক নেই সেখানে, তোমায় নিয়ে যেতে পারছি না। যাই হ'ক, এই পাঁচটা দিন তোমাকে একটু সাবধান হয়ে এই-খানেই থাকতে হবে। আসছে শনিবার ছোটখাট বাড়ী একটা ভাড়া করে রেখে তোমায় নিয়ে যেতে আসব। এবং এ দেশের বাসা চির জীবনের জন্য উঠিয়ে দেব। তোমার বাবা মারা গেলেন। ভগবানের আশীর্ব্বাদে তিনি এই জগতের সকল জ্বালা, যন্ত্রণার হাত হতে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁর জন্য আমাদের দুঃখ নেই। আমাদেরও ভোগ যতদিন আছে ভুগতে হবে। তবে যে ক'টা দিন হাতে পাব, যেন বাঁচার মতই বাঁচতে পারি। ব্যথায় কাতর হ'ব না—! ঝড়ে নুয়ে পড়ব না। পথের বাধা, বেদনা, অভিশাপ, গঞ্জনা অগ্রাহ্য করে চলতে থাকব।......"

শশীমুখী সর্ব্বান্তঃকরণে এই দেবতার মত স্বামীর পদতলে প্রণাম করল এবং তাঁর অভয় বাণীর অন্তরালে আপনার ভয়, ভাবনা যা কিছু কাতরতা বিলীন করে দিল।

মোড়ল দেখল সে ঠকে গেছে। দু' চারটে দিন স্বরূপে প্রকাশ না হয়ে একটু ধৈর্য্য ধরে শান্ত ও শিষ্ট থাকত যদি, এ মুক্তার মালা তার গলাতেই শোভা পেত। মাঝে পড়ে একটা বানর এসে সেটা তুলে নিলে।

লোকে যদিও বিশু ঘোষালকে গালাগাল দিচ্ছে, এবং তার ধোপা, নাপিত বন্ধ করে তাকে নির্য্যাতন করবে বলেছে, তবু মোড়লের মত সুখ পায় না। মোড়ল নিজে ভাবে বিশুর মত সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই আছে। শশীমুখীকে পেলে সে নিজেও একঘরে হয়ে থাকতে পারত।

সারা দিন, সারা রাত শশীমুখীর কথা ভাবতে ভাবতে মোড়ল অস্থির হয়ে পড়ল।

বন্ধুরা বললে "ভাবনা কিরে তোর? বেটাছেলে হয়ে এইটুকুতেই মুষড়ে পড়েছিস? যে না করলেও শশীমুখী তোর হবে, আমরা সে ব্যবস্থা করে দেব। সমাজের ভয় ত আর ওদের নেই,—আমাদেরও নেই। আর 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করাটাও যে একটা মানসিক ব্যাধি শুধু, আর কিছু নয় সে কথাটাও বুঝিয়ে দেব একদিন। তোর রূপ, যৌবন ও ঐশ্বর্য্য আছে, চার ক্যাল, সুন্দরী ভিখারী বুড়োটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দিয়ে তোকে যেচে বরণ করে নেবে।..."

সেদিন সকলে মিলে অনেক কথাই আলোচনা হ'ল।

শশীমুখী এ ক'টা দিন খুব সাবধানেই থাকে। দরকার হতে পারে ভেবে একটা ধারালো ছোরা সে কাছে রেখে দিয়েছিল। রাতের বেলাটা জেগে বসে কাটায়। সে বুঝতে পেরেছিল, মোড়লের দলটা তাকে বিপর্য্যস্ত করবার জন্য ছল খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বৃহস্পতিবার। সকাল। শশীমুখীর ঘরে মোড়ল হাজির হ'ল।

বললে "তুমি একলা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে আছ বৌদি, তাই একবার দেখা-শোনা করতে এলুম। আমি সেদিন কে-এক্তার হয়ে খারাপ ব্যবহার করেছিলুম তোমাদের বাড়ী গিয়ে, সে জন্ম মাপ কর। আর...যা হয়ে গেছে ভুলে যেও একেবারে। এখন তুমি আমাদের বাড়ীর বউ। বিশুদা' ও আমি বিভিন্ন সংসারের হলেও একই বংশের ছেলে ত। দাদার পিতামহ ও আমার পিতামহ সহোদর ভাই ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সবাই ষড়যন্ত্র করছে, তাঁকে অবিচার করে একঘরে করেছে,...তা' সে সব তুমি কিছু ভেব না। আমি মিটিয়ে দেব। দাদার অর্থের অনটন বড়, কিন্তু আমি রয়েছি যখন তোমাদের অনাহারে মরতে দেব না নিশ্চিন্ত থেক।..."

শশীমুখী মাথার কাপড়টা একটু নীচু করে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। মোড়লের কথার জবাব কিছু দিলে না।

মোড়ল কিছুক্ষণ থেমে আবার বললে "আমাকে ক্ষমা করবে না বৌদি? আমি দুষ্ট...লক্ষীছাড়া...লম্পট, সে সবাই জানে। তুমিও শুনে থাকবে। কিন্তু...তুমি যদি আমাকে ঘৃণা না কর...আমাকে শুধরে দাও ..আমাকে একটুখানি ভালবাস..."

শশীমুখী মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে উত্তর করলে,—"ঠাকুরপো! যদি সত্যই আপনি আমাদের ভালবাসা অথবা ক্ষমা চান আমার সামনে থেকে চলে যান এখনই।"

পরে আসব তাহলে?...কখন?...কখন তোমার সময় হবে?

চলে যাও বলছি! তোমার সয়তানী সব আমি বুঝেছি। ভেবনা তুমি, আমি দুর্ব্বল ও অসহায়, তুমি যথেচ্ছা এখানে বসে যাবে এবং অত্যাচার করবে আর আমায় তা নীরবে সইতে হবে।...আমায় যদি মরতেও হয়, তুমি বেঁচে ফিরে যাবে না।"

"মরবে? কি দুঃখে মরবে? শশীমুখী! সেধে ইচ্ছা করে প্রাণ নষ্ট করতে যাবে কেন? তুমি এতটুকু কৃপাদৃষ্টি কর।...আমার ধনরত্ন ঐশ্বর্য্য সব উজার করে দেব তুমি..."

শশীমুখী ক্ষিপ্রতার সহিত বস্ত্র মধ্য হতে ছোরাখানা বার করে বললে—"এবার যাবে?"

মোড়ল ইহার জন্ম প্রস্তুত ছিল না। কাপুরুষের মত পালিয়ে গেল। তবে শাসিয়ে গেল সেই সঙ্গে, "ভাল মানুষের মত সরল ব্যবহার করে তোমার স্নেহ ভিক্ষা চেয়েছিলুম, তুমি দিলে না। আমাকেও তাহলে উল্টো নীতি ধরতে হবে। অস্ত্র ধরতে আমিও জানি সেটা দেখিয়ে দেব।"

মোড়ল বন্ধুদের কাছে গিয়ে সব ব্যাপার খুলে বলে, তাদের অতঃপর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলে।

একজন শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললে,—"জাঁহাবাজ মেয়ে ত! ভেবেছিলুম, লোভ দেখালে আপনিই আসবে, তাই নরম পথে চলতে বলেছিলুম।"

আর একজন বললে, "তাতে আর হয়েছে কি গরমের ব্যবস্থা আজই করা যাবে।"

সেই কথাই ঠিক হল। মোড়ল নিজে আগে লুকিয়ে শশীমুখীর ঘরে বসে থাকবে, এবং সময় ও সুযোগ বুঝলেই সে ইসারা করে তাদের ডাকবে। তারা ততক্ষণ ওদের কানাচের বাঁশবনটার মাঝখানে লুকিয়ে থাকবে।

শশীমুখী এই নির্ব্বান্ধব কুঁড়ের মাঝে নিতান্ত উদ্বেগের সহিত দিনের মুহূর্ত্ত গুলা পর্য্যন্ত গুণে কাটাচ্ছিল। কতক্ষণে না জানি বাকী দুটো দিনের অস্তিত্ব কেটে গিয়ে শনিবারের বৈকালে হাজির হবে, সেই প্রতীক্ষায় বসেছিল।

সন্ধ্যা হয় হয়। কাপড় কেচে এসে উনুনে আগুন দিয়ে ভাতে ভাত চড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় এই বেবারে স্বামীকে হঠাৎ বাড়ী আসতে দেখে সে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিল।

বিশু বললে, "কাল আর পরশু ছুটী নিয়েছি। বাড়ীও ঠিক করে এসেছি। আর আমাদের ভাবনা নেই।"

শশীমুখী হাত পা ধোবার জল ও গামছা ধরে দিয়ে রান্না ঘরে ফিরে গেল।

বিশু ওঘর থেকে চেঁচিয়ে বললে, "দুজনকার বাড়তি চাল নিও। আমার একজন বন্ধুও আজ এখানে খাবেন নিমন্ত্রণ করে এসেছি।"

বাড়ী ঢুকতেই শোবার ঘরের দোরের পাশে সোণালী জরি দেওয়া পাম্পসু জুতা একজোড়া পড়ে রয়েছে, এবং

জলাতে সম্ভবতঃ, ঐ জুতার অধিকারী নিজেই, আত্মগোপন করেছেন দেখে বিশুর বিস্ময়ের সীমা ছিল না।

সে ঘরটাতে বার থেকে শিকল বন্ধ করে দিলে। এবং সামনের দাওয়াটায় মাদুর পেতে বসে ভাবতে লাগল। সংসার পেতে জীবন ধারা নূতন পথে কেমন করে চালিত করবে, তার খসড়া এই কটা দিনে ক্রমাগত ভেবে ঠিক করে রেখেছিল। আপনার মনে আগাগোড়া তা সমস্তই ওলট-পালট হয়ে গেল।

আজ মনে হল একযোগে সমস্ত পৃথিবীটা ষড়যন্ত্র করে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শশীমুখী পর্য্যন্তও সেই ছলনায় যোগ দিয়েছে? তবে ত বিশ্বাস করবার আর কেউ নেই। যে যে রমণীর পিতার জাতিরক্ষার জন্য সে বিশ্ব জগতের সকলকার লাঞ্ছনা উপেক্ষা করে অগ্রসর হয়েছিল, সে-ই আজ ছলনাময়ী সর্পিনীর মত তাহার অসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার বুকে ছোবল মারতেও পশ্চাৎপদ হল না।

এই আঘাতে বিশু ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। সে আর আপনাকে সামলাতে পারছিল না।

ডাল রাঁধা ছিল সকালে। ভাতটা নাবিয়ে আর দুখানা ডাল্লা ভেজে শশীমুখী স্বামীকে খেতে ডাকল। বললে,—"তুমি এস! আর...বন্ধু তোমার কোথায়? এখনও আসেন নি?"

মোড়ল হঠাৎ বিশুর আগমনে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হয়েছিল। বিশু কি তাকে দেখতে পেয়ে বাইরে থেকে দোর বন্ধ করে দিয়েছিল তা বুঝতে পারে নি। পালাবার ফন্দী এই এক ঘণ্টা কালের ভেতর ভেবে ঠিক করতে পারে নি। ভাবছিল দোর কেউ খুললে ফাঁক বুঝে পালাবে। অথবা চীৎকার করে বন্ধুদের ডেকে উদ্ধারের জন্য সাহায্য চাইবে। দোর ভেঙে বার হওয়াটাও সহজ ছিল না। বিশু যদি সত্যি এখনও না জেনে থাকে, চীৎকার গোলমালে একটা কেলেঙ্কারী ঘটবে। পাড়ার লোক পর্য্যন্ত জড় হবে এবং তাহলে নিগ্রহেরও এক শেষ হবে।

কিছু না করে দোর খোলার অপেক্ষাতেই চুপ করে সে বসে রইল।

বিশু মোড়লকে বার করে এনে হাতে ধরে বললে,—"খাবে এস ভাই! লজ্জা কিসের? আমার অনুপস্থিতিতে তুমি যে তোমার বৌঠাকরুণের রক্ষণাবেক্ষণের ও দেখা শোনার ভার নিয়েছ—একথা জেনে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি?"

মোড়ল ক্ষণেক অধোবদন থেকে—হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

শশীমুখী নিস্পন্দ ও নির্ব্বাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বিশু বললে, "এ আর কি এমন হয়েছে? আমার ত জানতে বাকী নেই। অনেক দেখেছি, সংসারের নিয়মই এই।"

শশীমুখী অনেকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললে, "আমাকে ভুল বুঝ না তুমি। যদিই দোষ করে থাকি—ক্ষমা কর। প্রায়শ্চিত্ত করব উপায় বলে দাও। যদি প্রাণ দিয়ে এর শোধন হয়..."

"দূর পাগলী! আত্মহত্যা কর না যেন!...তবে প্রায়শ্চিত্ত!...হা—হা—হা—প্রায়শ্চিত্ত? আপাততঃ সুখের লালসায় যে নরকে ছুটে চলেছ, আগে সেটা ভাল করে দেখে এস...তারপর বলে দেব।"

"ক্ষমা করলে না তাহলে? আমাকে ত্যাগ করলে তুমি?"

বিশু তার উত্তর করল না। ঘৃণাভরে ভাত ও খাবারের থালখানা পা দিয়ে ফেলে দিয়ে সে ঘরের ভেতরে গেল। তার সর্ব্ব শরীর অবশ হয়ে পড়েছিল। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে বিছানার উপর শুয়ে পড়ে সে বালিশে মুখ গুঁজে, নীরবে কাঁদতে লাগল।

এদিকে শশীমুখীও স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ বসে থেকে, হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। ভাবলে স্বামীর বিশ্বাস যখন হারিয়েছে তার মরাই ভাল। তার নিজের দোষ নেই কিছু একথা সে কেমন করে বোঝাবে? তার নির্দ্দোষ সরল প্রাণের ছবি তাঁর চোখে পড়ল না। এই ঘৃণ্য অপমানের কলঙ্ক সে সইতে পারবে না। দেবতা হয়েও স্বামী শুধু বাইরের খোলসটা দেখে শিউরে উঠলেন, ভেতরের আসল জিনিষটা যে খাঁটী ও নিষ্কলুষ রয়েছে তা বুঝলেন না। স্বামীর বিদ্রূপ

ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে, শশীমুখী অভিমানে ঘর হতে বার হয়ে পড়ল। ঘাটে নেমে আত্মহত্যা করবে এই ছিল তার সঙ্কল্প।

মোড়ল পালিয়ে এসেও সেখান থেকে তখনো একেবারে চলে যায় নি। ব্যাপার কতদূর গড়ায় লুকিয়ে দেখার জন্য সে সদলে অপেক্ষা করছিল।

এমন সময় শশীমুখী বাইরে এসে বরাবর পুকুরের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল দেখে, তার মাথায় একটা নূতন বুদ্ধি জাগল। দলের লোকেরাও তার মতের অনুমোদন করে এগিয়ে এল এবং শশীমুখী কিছু বাধা দেবার আগেই তাকে ধরে বেঁধে ফেললে।

শশীমুখী হঠাৎ আক্রান্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, "কে আছ রক্ষা কর। রক্ষা কর।"

সে মরতে চলেছিল, তাতে বাধা পেয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হল। মোড়ল প্রভৃতি শয়তানের অনুচরদের হাতে মৃত্যুর বাড়া অপমানের কল্পনায় সে যার পর নাই ভয় পেয়ে, প্রাণপণ শক্তিতে চীৎকার করতে লাগল—"বাঁচাও আমাকে। কে কোথায় আছ, আমাকে বাঁচাও।"

শশীমুখীর কাতর ক্রন্দন বিশুর কাণে গিয়েছিল। শশীমুখীর প্রতি ঘৃণায় তার বুক ভরে গেলেও তার কাতর আহ্বান শুনে উপেক্ষা করতে পারলে না। সেও ছুটে বেরিয়ে এল।

মোড়লের দল তখন শশীমুখীকে নিয়ে অনেকখানি এগিয়ে পড়েছিল।

বিশুও প্রাণপণে তাদের অনুসরণ করল।

মোড়ল বিশুকে দেখতে পেয়ে, সঙ্গীদের দুজনকে তার পথ আটকাতে বললে; এবং নিজে সে বাকী সকলের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

মোড়লের সঙ্গী দুজন সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বিশু কাছে আসতেই, তারা লাঠির আঘাতে তাকে সেইখানেই ধরাশায়ী করে দিলে। উত্থান-শক্তি-রহিত হয়ে বিশু পড়ে রইল। তার সামনে হতে শশীমুখীকে নিয়ে মোড়লেরা অদৃশ্য হয়ে গেল সে কিছু বাধা দিতে পারলে না।

বিশুর চীৎকারে দু'পাঁচজন ভদ্রলোক উপস্থিত হলেন। তাঁরা বিশুকে সেই অসহায় অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে, এবং শশীমুখীকে ডাকাতে ধরে নিয়ে গেছে শুনে, সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। সমাজের দেওয়া লাঞ্ছনার কথা মনে করে, বিশুর এই দুরদৃষ্টের সময়, মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে তাঁরা পারলেন না। বিশুকে ধরাধরি করে তার বাড়ীতে নিয়ে গেলেন, এবং নিজেরা হাতে পায়ে ধরে, ডাক্তারকে দ্বিগুণ দক্ষিণা দেবার প্রলোভন দেখিয়ে, চিকিৎসার জন্য সেখানে আসতে রাজী করলেন। এদিকে পুলিসকেও খবর দেওয়া হ'ল।

সে রাত্রে মোড়ল বা তাদের দলের কারও খোঁজ পাওয়া যায় নি।

শুক্রবার সকাল বেলা সকলেই দেখল, মোড়ল ও তার অনুচরেরা যে যার বাড়ীতেই রয়েছে। পুলিস এসে তাদের ধরাতে, তারা অপরাধের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বললে, যে তারা সে রাত্রে বাড়ীতেই ছিল। যা হ'ক পুলিস তাদের হাজতে পুরেছিল; অবশেষে তারা প্রত্যেকে পাঁচশ টাকার জামিন দিতে স্বীকার করে তখনকার মত খালাস পেলে।

কিন্তু শশীমুখী কোথায়?

তার সন্ধান কেউ দিতে পারছিল না। মোড়লদের কারও কাছ থেকে কোন খবরও পাওয়া গেল না।

অনেক লোকেই বিশুকে প্রবোধ দিতে এল, ঐ মেয়েটার জন্যই তাকে একঘরে করা হয়েছিল। শশীমুখী বের হয়ে গেছে, তার খোঁজ করে কোন লাভ নেই, তার মোহ থেকে মুক্ত হয়েছে বলে বিশুকে সকলেই আবার সমাজে ফিরে নেবে। তবে তবে একটা সর্ত্ত আছে, বিশু শশীমুখীর দেখা পেলের আর ঘরে নেবে না।

বিশুর প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলছিল তখন। তার ওপর এমনি সব সহানুভূতির আঘাত তার একেবারেই অসহ্য হয়েছিল। সে নিজের ঘরে দোর বন্ধ করে শুয়ে পড়ে রইল।

বিশু ভাবছিল, শশীমুখীর ওপর সে অবিচার করেছে। মোড়লের দল তাকে অপহরণ করবার যে ষড়যন্ত্র করেছিল তার ভেতর অভাগীর নিজের কিছু দোষ ছিল না ত। মোড়ল

তার অজ্ঞাতসারেই ঘরে লুকিয়েছিল—এই সহজ কথাটা সে কেন তখন বুঝতে পারে নাই? আত্মগ্লানিতে তার বুক ভরে গেল। শশীমুখীর দুরদৃষ্টের জন্ত সে নিজেও দায়ী। অস্বীকার করলে চলবে না ত! বিশু ভাবল একটা কলঙ্ক-হীন জীবনের ঘাড়ে অপমানের বোঝা চাপিয়ে তাকে মৃত্যুর পথে সেই এগিয়ে দিয়েছিল—বিশু নিজেই তাকে হত্যা করেছিল। সেদিন যদি শশীমুখীকে ঘৃণাভরে ফেলে রেখে পালিয়ে না যেত, তাকে হয়ত কেড়ে নিয়ে যাবার সুযোগ কেউ পেত না।

স্বামীর দেওয়া অপমান, এবং মোড়ল প্রভৃতির অত্যাচার সইতে না পেরে, শশীমুখী হয় ত প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে। অথবা...এর পরও যদি সে বেঁচে থাকে···কোথায় কেমন ভাবে সে জীবন কাটাবে? বিশু যদি তাকে ফিরে কাছে ডেকে না নেয়—সে কি বাংলাদেশের এমনি অত্যাচারিত শত সহস্র নারীর মতই অবশেষে জীবিকার জন্ত ঘৃণিত জীবন অবলম্বন করবে।

তাকে ফিরে নেবার মত উদারতা সমাজের নেই কি?

সমাজের ত অনেক খাঁটী পবিত্র জিনিষ বুকে রাখবার যোগ্যতা নেই। আবর্জ্জনার মত অনেক কিছুই সে দূরে ফেলে দেয়।

দশজনে ভুল করে বলে কারও যে ঠিক পথে চলতে নেই তা ত নয়!

এমন আর একটা পরীক্ষার দিনে বিশু এগিয়ে গিয়ে সমাজের বিধান অগ্রাহ্য করেছিল। আপন মনে সত্য ও ন্যায়ানুমোদিত বলে যা জেনেছিল, তাকেই বরণ করে নিয়েছিল।

আজও যখন সে মনে প্রাণে বুঝেছে শশীমুখীর কোন দোষ নেই—বরং শশীমুখীকে অপমান করে সে-ই অবিচার করেছিল, তাকে ফিরে ডাকবার উদারতা বিশুর নিজের আছে কি?

বিশু আপনার মনে এমনি সব প্রশ্ন করছিল, আর আপনিই তা সবের সমাধান খুঁজছিল!

কিন্তু যাকে নিয়ে এত সমস্যা, ভয় ভাবনা সে কোথায়?

শুক্রবারের দিন ও রাত কেটে গেল। শনিবারের সকালে, পায়ের যন্ত্রণা কিছু কম বোধ হতে বিশু, উঠে দাঁড়াল। শশীমুখীকে খুঁজতে যাবার মত পায়ের বল না পাওয়াতে সে আবার বসে পড়ল!

বেলা দশটার সময়, পুলিসের লোক এসে খবর দিল, শশীমুখীকে পাওয়া গেছে, নদীর ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে ছিল। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল প্রাণ নেই, কিন্তু ডাক্তারের শুশ্রূষায় জ্ঞান ফিরে এসেছে। তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দারোগা বাবু বিশুকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বিশু পাল্কী করে তখনই থানায় হাজির হল।

বিকারগ্রস্ত রোগীর মত শশীমুখী চীৎকার করছিল "আমি মরতে চাই—! মরতে চাই—! কেন আমাকে বাঁচালে? শুনতে পারছ না তোমরা? আমায় ছেড়ে দাও।"

"মরতে চাও শশীমুখী? কিন্তু...আমার পানে এক-বারটী তাকিয়ে দেখ। আমি তোমায় ফিরে ডাকছি—তুমি আমার দিকে চেয়ে দেখ। আমি নিজে এসেছি তোমায় ফিরে ডাকতে। দেখতে পারছ না? চিনতে পারছ না?"

না—না—না আমি কোন বাধা মানব না। আমি শুনব না কিছু। আমি দেখব না! আমি···মরতে চাই। স্বামীর বিশ্বাস হারিয়েছি···তা ছাড়া...ডাকাত ডাকাত তোমরা সব...আমায় ছেড়ে দাও...আমি জলে ডুবতে যাচ্ছি তোমরা কেন আমায় ধরলে? ···কেন?

"শশীমুখী"।

"কে? কে ডাকলে? বিশ্বাস হচ্ছে না। তুমি যে ঘৃণা করে মুখ ফিরিয়ে চলে গেছ...আমি কি স্বপ্ন দেখছি? আমি মরতে যাচ্ছিলুম, পথ খুঁজে পাইনি, তুমি কি তাই দেখতে এসেছ? বলেছিলে, নরক দেখে এলে পথ বলে দেবে তার পর,—তাই এসেছ কি আজ?"

"আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। আমি তোমায় অবিশ্বাস করেছিলুম সেই অন্যায়ের মার্জ্জনা চাই। তুমি আমাকে মাপ কর শশী।"

"অবিশ্বাস করেছিলে তাই...? ক্ষমা? মার্জ্জনা? সত্য বলছ? না, এখনও বিদ্রূপ করছ? দেবতা তুমি, স্বামী গুরুজন। সবই ত তুমি জান, বোঝ। আমাকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করলে না কেন? আমি ত ছলনা জানিনা—মিথ্যা

গেলো, বলি নি। জিজ্ঞাসা করলে না বললুম তোমায় পা ছুঁয়ে—লোকটা লুকিয়ে কখন ঘরে এসে বসেছিল আমি কিছু জানতে পারি নি। আমি যখন কাপড় কাচতে গিয়েছিলুম—সেই অবসরে এসেছিল। কেন আমায় অবিশ্বাস করলে? তোমারই অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ সইতে না পেরে ডুবে মরতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ ডাকাত এসে আমায় ধরলে। চোখের সামনে অন্ধকার দেখলুম। দুবার প্রাণপণে চীৎকার করলুম, বাঁচাও বাঁচাও বলে, বাঁচতে আমার ইচ্ছে ছিল না শুধু সয়তানদের হাত হতে মুক্তি পেতে সাহায্য চেয়েছিলুম, তুমি ছুটে আসছিলে, তোমায় ওরা মারলে দেখলুম। সে আঘাতও আমারি বুকে পড়েছিল আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম। তার পরে কখন যে ডাকাতেরা—বোধহয় আমাকে মৃত ভেবেই ভয়ে ফেলে রেখে পালিয়েছিল জানি না। আর কতক্ষণইবা সেই নদীর ধারে পড়েছিলুম তাও জানি না। আর কিছু মনে পড়ে না। তার পর আজ জ্ঞান আসতে এখানে, আমার মনে হল, যার বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা, তাকে বাঁচাবার জন্যে সবাই উঠে পড়ে লেগেছে। তাদের বাঁধন ছিঁড়তে চাই, কিন্তু তুমি...তুমি যখন ফিরে ডাকছ আবার আশা হচ্ছে...আবার বাঁচবার জন্যে ইচ্ছা হচ্ছে। শুধু তোমার জন্যই আমি বাঁচতে চাই যদি তোমার বিশ্বাস—আর ভালবাসা—ফিরে পাই।"

"তোমায় বিশ্বাস করছি অকুণ্ঠিত চিত্তে। তোমায় ফিরে পেয়েছি ভগবানের দয়ায়, আর হারাতে চাই না। তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না আর—এ সম্বন্ধে। এ দুটো দিনের স্মৃতির বোঝা আমরা ভুলে যেতে চাই। আগুনের শোধনে মনের আবর্জনা সব ছাই হয়ে গেছে। অবিশ্বাস আর অভিমানের অন্ধকার কালিমা দূর হয়েছে। আজ আমাদের নূতন জীবন। সমাজ, দেশ, জগৎ আমাদের লাঞ্ছিত করলেও, ভগবানের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব আমাদের নূতন পথে।"

* * * * *

মোড়ল ও তার অনুচরেরা, বিশু ও শশীমুখীর হাতে পায়ে ধরে নালিশটা মিটিয়ে নিয়েছিল। দারোগা বাবু অনিচ্ছা সত্ত্বে তাহাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বিশু দিন দুই চার পরে একটু সেরে উঠেই সস্ত্রীক দেশ ছেড়ে কলিকাতায় চলে গেল।

মোড়ল কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্যই সম্ভবতঃ কেবল বলে বেড়াতে লাগল,—"দেশের আপদ বালাই দূর হল। মেয়েটা নষ্ট দুষ্ট—কার সঙ্গে রাতের বেলা বেরিয়ে গিয়েছিল—আমাদের ভালমানুষ পেয়ে দোষ চাপিয়ে জেল দেবে ভেবেছিল। কিন্তু ধর্ম্ম আমাদের সহায়, আমাদের একটা চুল ও ছুঁতে পারলে না"

অন্তর্য্যামী শুনে হাসলেন।

অশোকের অনুশাসন

[অধ্যাপক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এ]

মহারাজ অশোক ভারতের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে অশোক রাজ্যজয়ী মহাবীর রূপে খ্যাত না হইয়া ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীর বলিয়াই বিদিত থাকিবে। কলিঙ্গ বিজয়ই তাহার প্রথম না হইলেও শেষ যুদ্ধযাত্রা। সেই যুদ্ধের ভীষণ কুফল দর্শনে তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে যে আঘাতপ্রাপ্ত হ'ন এ কথা নিজমুখেই শিলাখণ্ডে করুণভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই যুদ্ধের পর তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজভিক্ষু সাজিয়া প্রজাগণের ইহলৌকিক ও পারত্রিক উন্নতি প্রতিবিধানে যত্নবান হয়েন। এতদুদ্দেশ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিজের মতামত প্রকাশ ও প্রজাদিগকে ধর্ম্মের পথে চালিত করিবার জন্য ঘোষণাবলী প্রকাশ করিয়া রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে, গিরিগাত্রে ও প্রস্তর স্তম্ভসমূহে খোদিত করিয়া গিয়াছেন। এই অনুশাসনসমূহ অদ্যাবধি নানাস্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সমস্ত লিপিগুলি না পাওয়া গেলে মহারাজ অশোক সম্বন্ধে আমরা স্থিররূপে অতি অল্প সংখ্যক খবরই জানিতে পারিতাম ও এইরূপ মহাপুরুষ ইতিহাসের উপযুক্ত স্থান লাভে চিরদিন বঞ্চিত থাকিতেন।

প্রাপ্তিস্থান—

অশোকের প্রস্তরলিপি সকল পশ্চিমে পেশোয়ার হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে কলিঙ্গ ও দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যান্তর্গত স্থানসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার এতাবৎ বিস্তৃতি অশোকের রাজ্যেরও আয়তন নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। বিস্তৃত পাহাড়ের গাত্রে খোদিত করিয়া এরূপ পরিষ্কার ভাবে এ সমস্ত অনুশাসনগুলি লিখিত হইয়াছিল যে আজ পর্য্যন্তও তাহারা বেশ সহজে পাঠের উপযুক্ত রহিয়াছে। সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের নিমিত্ত যথায় লোক সমাগম ছিল সেরূপ স্থানেই এই লিপিসমূহ লিখিত করাইলেও অধুনা প্রায় সমুদায় স্থানই লোকালয়ের বহির্ভূত ও জনমানবহীন জঙ্গল ও গিরি প্রদেশ। পাশাপাশি খোদিত চতুর্দ্দশখানা লিপি পেশোয়ার জিলাস্থ সাহবাজগরহি স্থানে কপূর্দ্দি গিরিগাত্রে পাওয়া গিয়াছে। এই চতুর্দ্দশখানা লিপিই সামান্য বিভিন্ন আকারে ছয়টী স্থানে ও ইহার একটী ভগ্নাংশ মহীশূরে সোপারা নামক স্থানে পাওয়া গিয়াছে। হাজারা জিলাস্থ 'মানসরা' আমাদের দ্বিতীয় প্রাপ্তিস্থান। যুক্ত প্রদেশের দেরাদুন জিলায় কালসীতেও এই চতুর্দ্দশ গিরিলিপি দৃষ্ট হয়। সুরাষ্ট্র (গুজরাট) প্রদেশের পুরাতন রাজধানী জুনাগর নগরের পার্শ্বস্থ গিরিনগর পাহাড়ে হিন্দু রাজগণের অনেকগুলি খোদিত লিপি আছে। তন্মধ্যে রাজা অশোকের এই গিরি লিপিরও একটী সংস্করণ রহিয়াছে। এইরূপ ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ ধৌলি গ্রামে একটী প্রস্তর নির্ম্মিত বিশাল হস্তী গাত্রে ও মান্দ্রাজের গঞ্জাম জিলাস্থ জোগড় নামক স্থানেও এই লিপিসমূহ খোদিত আছে। অশোকের সর্ব্বসমেত ১০টী খোদিত স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ২টী দিল্লী নগরে, কয়েকখানা নেপালের পথে, একটী সাঁচী ও অপরটী সারনাথে আছে। এই স্তম্ভগুলিতে ৭খানা লিপি সন্নিবিষ্ট আছে। চতুর্দ্দশ গিরিলিপি ও এই ৭খানা স্তম্ভলিপিই প্রধান অনুশাসন। এতদ্ভিন্ন গয়ার বরাবর পাহাড়ের গহ্বরে ও নেপালে বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনি গ্রামেও অশোকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিপি আছে। মহীশূরের তিনটী স্থানে, দক্ষিণ বিহারে, সহগ্রামে, জব্বলপুর জিলাস্থ রূপনাথে ও রাজপুতনার জয়পুর সন্নিকটস্থ বৈরাটেও ২খানা ক্ষুদ্র গিরিলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাহারা ক্ষুদ্র হইলেও আবশ্যক সংবাদ দানে অন্যান্য লিপি অপেক্ষা কম প্রয়োজনীয় ছিল না। ধৌলি এবং জোগড়ে ১৩শ ও ১৪শ লিপি স্থলে ২টী বিশেষ লিপি কলিঙ্গবাসীদের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছিল।

সাধারণ আকৃতি—

অশোকের সমুদায় অনুশাসনগুলিই ব্রাহ্মী অক্ষরে ও প্রকৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। কেবলমাত্র কপূর্দ্দি গিরি

ও মানসরার লিপি দুইটী খরোষ্ঠি অক্ষরে খোদিত। তাহাদের ভাষার মধ্যেও কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অশোকের অনুশাসনেই আমরা ভারতের সর্ব্বপ্রথম না হইলেও অতি পুরাতন কালের ভাষা ও অক্ষরের পরিচয় পাই। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খরোষ্ঠি ভাষাই বোধ হয় সে সময় প্রচলিত ছিল। 'দিপি' প্রভৃতি কয়েকটী শব্দ ও খরোষ্ঠি ভাষা দর্শনে অনেকে অনুমান করেন যে অশোকের অনুশাসন সমূহে পারস্য দেশের প্রভাব লক্ষিত হয়। অনেকে এই সমস্ত লিপিগুলি রাজা দরায়ুসের গিরিলিপি হইতেই অনুকরণ করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। এই সমুদায় অনুমাণ

অশোকের সিংহস্তম্ভ।
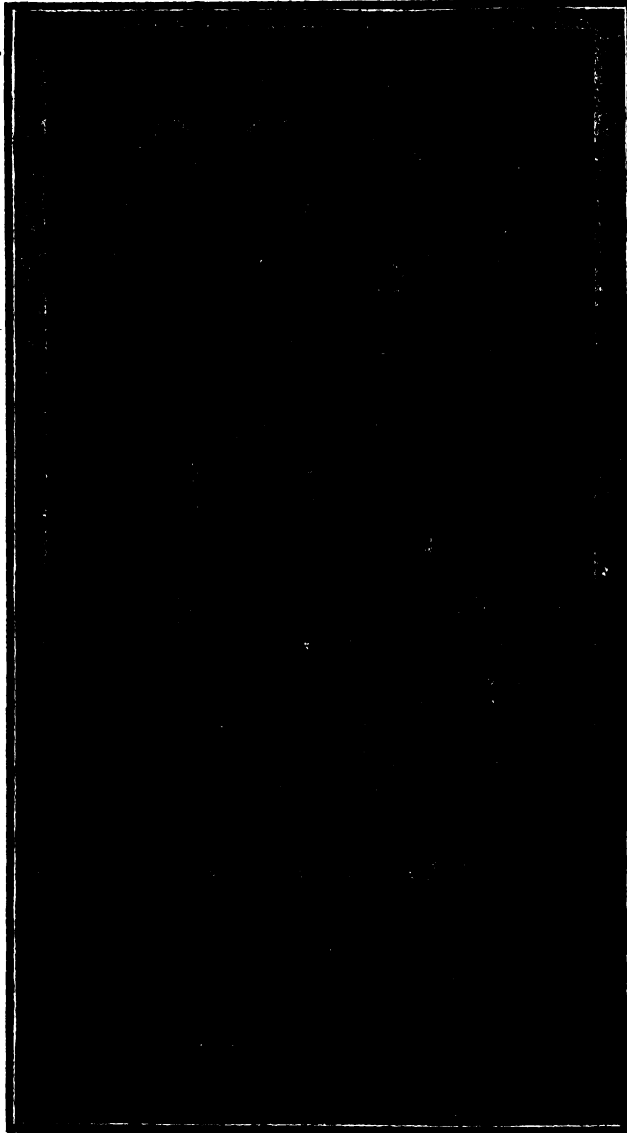
কতদূর সত্য তাহা নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। মহারাজ অশোক প্রথমতঃ রাজধানীতে ঘোষণাগুলি লিখিয়া দূরদেশে কর্ম্মচারীদের তাহাদের অধীন স্থানসমূহে খোদিত করিবার আদেশ প্রদান করেন। সেই সমস্ত দেশের উপযোগী করিবার নিমিত্ত ও কর্ম্মচারীদের অসাবধানতাহেতু প্রত্যেক লিপির মধ্যেই ভাষার কিছু কিছু তারতম্য দৃষ্ট হয়। ধৌলি, জৌগড় ও কালসীর ভাষায় সংস্কৃতের সর্ব্ব বেশী অপভ্রংশতা পাওয়া যায়। কপুর্দ্দিগিরি ও মানসরার ভাষাই সংস্কৃত ভাষার অনেকটা অনুরূপ। স্তম্ভ লিপিগুলির ভাষা অধিকাংশই ধৌলি প্রভৃতির ন্যায় মাগধী প্রাকৃত।

সমস্ত লিপিসমূহই তাঁহার কর্ম্মচারীদের ও প্রজাবর্গের ধর্ম্মভাব জাগরণের নিমিত্ত লিখিত হইয়াছিল। উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত দ্বারাই বেশী কাজ হইবে এই আশায় ও মনের আবেগে প্রত্যেক লিপিতেই অশোক তাহার নিজের কার্য্যাবলী সকল সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। এই সমুদায়ের কি উদ্দেশ্য ছিল অশোক নিজেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন "যাহাতে আমার পুত্র প্রপৌত্রগণ আমার ন্যায় সর্ব্ব লোক হিতব্রতে রত থাকে ও যাহাতে এই সমস্ত লিপি সকল "চিরস্থিতিক" থাকিয়া তাহাদের কর্ত্তৃক পালিত হইতে পারে তজ্জন্য যেখানে শিলাস্তম্ভ বা শিলাফলক আছে সেই সমুদায় স্থানেই এই ধর্ম্মলিপি লিখিত হউক।" তিনি স্বয়ং এই সমস্ত ঘোষণাবলীকে 'ধর্ম্মানুশাসন', 'ধর্ম্মলিপি', 'ধর্ম্মানুশস্তি' প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। প্রায় সমস্ত লিপিরই "দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এই ধর্ম্মলিপি লিখাইয়াছেন" বা "প্রিয়দর্শী রাজা এরূপ বলিয়াছেন"—এইভাবে আরম্ভ হইয়াছে। সমস্ত গুলিতেই রাজার নাম 'প্রিয়দর্শী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কেবলমাত্র মাস্কীযুক্ত গিরি লিপিতেই 'প্রিয়দর্শী' স্থানে 'অশোক' এই নাম পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং এই সমুদায় অনুশীলন যে অশোকেরই সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কতকগুলিতে তাঁহার অভিষেক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই লিপিগুলি লিখিবার অথবা উল্লিখিত কোনও ব্যাপারের কাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্ষুদ্র গিরিলিপি দুইখানাই সর্ব্বপ্রথমে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। চতুর্দ্দশ গিরি লিপির অনেকগুলি অভিষেকের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বৎসরে লিখিত হয়। সারনাথ লিপি অশোকের আহূত বৌদ্ধগণের সভার পরে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করেন। কেহ কেহ ক্ষুদ্র গিরি লিপিই অশোকের শেষ লিপি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন—কিন্তু তাহা সর্ব্ববাদী সম্মত নহে।

কল্যাণকর্ম্মে অশোক—

লিপি সমূহের উদ্দেশ্য যে ধর্ম্ম প্রচার ও ধর্ম্মের পথে চালিত করা তাহা তাঁহার স্বকীয় উক্তি হইতেই দেখাইয়াছি। সমস্ত লিপিতেই ধর্ম্ম কথাটীর নানাভাবে উল্লেখ আছে। এই 'ধর্ম্ম' যে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম নহে তাহা তিনি নিজেই ২য় স্তম্ভলিপিতে লিখিয়াছেন—"ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ পদার্থ এ কথা দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা বলিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্ম কি? অল্প পাপ, বহু কল্যাণ, দয়া, দান, সত্য ও শৌচ—ইহাই ধর্ম্ম। ইহা বৌদ্ধ ধর্ম্মানুযায়ী গৃহস্থ ধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই ছয়টী লক্ষণ কি ভাবে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে তাহা সমস্ত লিপিতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে তিনি স্বয়ং যে সমস্ত 'বহু কল্যাণ' করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিব। ২য় স্তম্ভলিপিতেই তিনি লিখিয়াছেন—"দ্বিপদ, চতুষ্পদগণের চক্ষুদান, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্তও আমি দান করিয়াছি। অস্থির অন্যান্য অনেক কল্যাণও করিয়াছি।" ১ম গিরি লিপিতে তিনি জানাইয়াছেন যে "পূর্ব্বে আমার পাকশালে সু-পথ্যের নিমিত্ত বহু শত সহস্র প্রাণবধ হইত। এক্ষণে ২টী ময়ূর ও ১টী মৃগ হত হইতেছে। ভবিষ্যতে এই প্রাণ তিনটীরও হানি সাধন হইবে না।" কল্যাণ কার্য্যের মধ্যে ৫ম গিরি লিপিতে 'ধর্ম্ম মহামাত্র' নামক কর্ম্মচারীবর্গের নিয়োগ উল্লিখিত আছে। কেবলমাত্র স্বরাজ্য মধ্যেই ধর্ম্ম স্থাপনেই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন না। সর্ব্ব ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে ও কম্বোজ, গান্ধার প্রভৃতি অপরান্ত প্রদেশেও ধর্ম্মাধিষ্ঠান ও ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত ধর্ম্মমহামাত্রগণ নিযুক্ত হইয়াছিল। যাহাতে কেহ বিনা কারণে শাস্তি না পায়, এবং দণ্ডিত ব্যক্তিগণের মধ্যে বৃদ্ধ প্রভৃতি উপযুক্ত লোকসকল যাহাতে সহজে মোক্ষলাভ করিতে পারে তাহারা সে বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিত। তদ্ভিন্ন অন্তঃপুরেও ভ্রাতৃগণ, ভাগিনেয়গণ ও অন্যান্য জ্ঞাতিগণের

মধ্যেও সদাচার স্থাপনের জন্য তাহারা নিযুক্ত ছিল। এ স্থলে ভ্রাতৃগণের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে অশোক ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়া রাজ্যাধিকার করেন বলিয়া যে প্রবাদ চলিত আছে তাহা বৌদ্ধগণ কর্তৃক মিথ্যা রচিত অথবা অতিরঞ্জিত হইয়াছে। অশোক রাজ্য বিজয় ছাড়িয়া ধর্ম্ম বিজয়ে মনোনিবেশ করিয়া যে সমস্ত প্রদেশে স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করেন তাহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"ছয়শত যোজন পর্য্যন্ত প্রত্যন্ত প্রদেশ সমূহ রাজা দেবপ্রিয় কর্তৃক এইভাবে (ধর্ম্ম বিজয়ে) লব্ধ হইয়াছে—যথা অন্তিয়ক নামক যবনরাজ, তাঁহার অধীন তুরাময়, অংতেকিণ, মক, অলিকসুন্দর নামক রাজগণ ; দক্ষিণে চোল, পাণ্ড্য ও তাম্রপর্ণী। যবন কম্বোজ নাভাক, নাভপংক্তি, (ভোজ, পিতিনীক, অন্ধ্র, পুলিন্দ সর্ব্বত্রই দেবপ্রিয়ের ধর্ম্মানুশস্তি শাসিত হউক।" দূত প্রেরণ করিয়া এইভাবে উত্তরে সিরিয়া ও মিশর পর্য্যন্ত ও দক্ষিণে নিজ ধর্ম্ম প্রচার করেন। এতদ্ব্যতিরেকে নিজ রাজ্যমধ্যে, ঐ সমস্ত প্রদেশে ও সত্যপুত্র কেরলপুত্র রাজ্যে—"দেবপ্রিয় রাজা দুইপ্রকার চিকিৎসা (চিকিৎসালয়) করিয়াছেন - মনুষ্য চিকিৎসা ও পশু চিকিৎসা। তাহাদের চিকিৎসার জন্য ঔষধি বৃক্ষসকল রোপিত ও আহরণ করাইয়াছেন।" পশু মনুষ্যের প্রতিভোগের জন্য তিনি কি করিয়াছিলেন ৭ম স্তম্ভ লিপিতে তাহা বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে—মার্গসমূহে পশু মনুষ্যের ছায়ার জন্য ন্যগ্রোধ ও আম্রবন রোপিত হইয়াছে। অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে কূপ খনন করা হইয়াছে ও বিশ্রাম স্থান সকল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। রন্ধনশালায় পশু বধের সঙ্গে সঙ্গে ১ম গিরি লিপিতেই তিনি পুনঃ লিখিয়াছেন—"এ স্থলে কোন জীব হত্যা করিয়া বজ্ঞাহুতি হইতে পারিবে না। (সমাজ নামক উৎসব সমূহে পশুবধ করিয়া আহারার্থ মাংসাদি প্রস্তুত হওয়ায়) সমাজ কর্ত্তব্য নহে।" এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত পশু চর্ম্মের নিমিত্ত বা খাদ্যের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইত না, ব্যসনরূপে তাহাদের বধ নিবারণের নিমিত্ত ৫ম স্তম্ভ লিপিতে কতকগুলি পশুর নাম করিয়া তাহাদিগকে অবধ্য বলিয়া বিশিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাতে পয়স্বিনী ও গো-বৎস্য ব্যতিরেকে গাভীর নাম দৃষ্ট হয় না। অন্যান্য ভাবে যাহাতে পশুগণের প্রতি অত্যাচার না হয় সে বিষয়েও কতকগুলি নিয়ম সন্নিবিষ্ট করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি মৃগয়া রাজ্যমধ্য হইতে উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে 'ধর্ম্ম যাত্রা' স্থাপন করেন সে সময় স্বচক্ষে প্রজাগণের মঙ্গলবার্ত্তা জানিবার ব্যবস্থা করেন। এইরূপ নানাবিধ কল্যাণকামী হইয়া দ্বাদশ বর্ষ রাজত্ব করিবার পূর্ব্বেই অশোক যেরূপ বহুবিধ ধর্ম্মাচরণ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ৪র্থ গিরিলিপিতে তাহা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—"বহু শত বৎসরেও যেরূপ ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয় নাই অদ্য প্রিয়দর্শী রাজা ধর্ম্মানুশস্তি দ্বারা-- প্রাণী বধ জীব হিংসা নিবারণ করিয়া, জ্ঞাতিবর্গের সম্মান প্রদর্শন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের প্রতি শ্রদ্ধা, মাতৃ-পিতৃ শুশ্রূষা, বৃদ্ধগণের শুশ্রূষা প্রভৃতির প্রচলন করিয়া নানাবিধ ধর্ম্ম স্থাপিত করিয়াছি।" কেহ কেহ বলেন সুবর্ণগিরি হইতে ১ম ক্ষুদ্র গিরিলিপিখানা প্রকাশের কারণ এই যে তিনি ঐ সমস্ত ধর্ম্ম স্থাপনের পর রাজত্ব পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বয়ং সুবর্ণ গিরিতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ ভাগ সেই স্থলেই যাপন করেন। এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

অশোকের ধর্ম্ম :—

অশোক নিজে যে সমস্ত কল্যাণ করিতেন তাহা বলা হইল। অনুশাসন সমূহ হইতে তাঁহার স্বধর্ম্ম যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। প্রজাবর্গকে যে ধর্ম্মপালন করিতে তিনি উপদেশ দিতেন তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে এক্ষণে অনুশাসন সমূহে কি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার আলোচনা করিব। উপরি উক্ত ৪র্থ গিরিলিপি হইতেই আমরা তাহার আভাস পাইয়াছি। ৩য় গিরিলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন :— "আমার যুক্ত, রাজুক, প্রাদেশিক নামক কর্ম্মচারিগণ পাঁচ বৎসরান্তর অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া লোকদিগকে এই ধর্ম্মানুশস্তি শুনাইবে—'মাতা পিতার শুশ্রূষা সাধু, বন্ধু, মাননীয় ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দান সাধু, প্রাণ হিংসা না করা সাধু, অল্পভাণ্ডতা, অল্পব্যয়তা সাধু।' এতৎ সঙ্গে ২য় ক্ষুদ্র গিরিলিপির—"সত্য বলিবে, শিষ্য আচার্য্যের সেবা করিবে, আত্মীয়বর্গের সহিত যথার্থ ব্যবহার করিবে" এই উপদেশ উল্লেখ যোগ্য পৃথিবীতে নানারূপ অবস্থায় পড়িয়া সকলের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মাচারণ সম্ভবপর হয় না তাহা অশোক

বুঝিতেন—তজ্জন্যই ৭ম গিরিলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন—"এমন অনেকে আছেন যাহাদের পক্ষে বিপুল দান সম্ভবপর নহে। কিন্তু ভাবশুদ্ধিতা, কৃতজ্ঞতা, দৃঢ়ভক্তিতা ও সংযম ক্ষুদ্রও সকলের পক্ষেই সম্ভবপর।" এইজন্য অশোক সর্ব্বশ্রেণীর লোককেই এই সংযম ও ভাবশুদ্ধিতা অভ্যাসের উপদেশ দিতেন। ধর্ম্মপ্রচারকরূপে যদিও নিজ ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তথাপি তিনি অপরধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না। কেবল মাত্র যজ্ঞে পশু বধ নিবারণ ভিন্ন হিন্দু ধর্ম্মের উপর কোনরূপ হাত দেন নাই। যেখানেই শ্রমণগণের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাদানের উপদেশ দিতেন তৎসঙ্গেই ব্রাহ্মণগণের উল্লেখ করিতেন। ১ম ক্ষুদ্র লিপির "অমিসা দেবগণকে মিসা করিয়াছি" ইহার ভুল ব্যাখ্যা করিয়া কেহ কেহ মনে করিয়াছিলেন যে এই 'দেবগণ' ব্রাহ্মণগণের কথা বুঝাইতেছে এবং অশোক হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের প্রভাব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ এই কথাটী দ্বারা অশোক যে ধর্ম্ম প্রভাবে দেবতাগণ মনুষ্যগণের সুখলভ্য হইয়াছে তাহাই বলিয়াছেন, বলিয়া মনে হয়। সম্প্রদায়গণ মধ্যে বিবাদ যে অশোকের সম্পূর্ণ মত বিরুদ্ধ ছিল, তাহা ১২শ গিরিলিপি পাঠেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। এই সমগ্র লিপিখানা নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায় মধ্যে যাহাতে একদল স্বকীয় সম্প্রদায়ের পূজা ও পর সম্প্রদায় নিন্দা বা অপকার না করে সে বিষয়ে উপদেশে পরিপূর্ণ। সর্ব্ব পাষণ্ড (সম্প্রদায়) গণের মধ্যে সমবায়ই প্রশস্ত" এই উপদেশই তাহার চির লক্ষ্য ছিল। তিনি "নানাবিধ উপায়ে সর্ব্ব পাষণ্ড, প্রব্রজিত ও গৃহস্থগণের পূজা করিতেন। দান ও পূজা অপেক্ষা যাহাতে সর্ব্ব পাষণ্ডগণের সার বৃদ্ধি হয় তাহাই তিনি ইচ্ছা করিতেন। ইহার মূল বাক্‌গুপ্তি, বহুশ্রুতিত্ব ও কল্যাণ গামিত্ব।" সমাজের বিবাহাদি উৎসবে নানারূপ মঙ্গল কার্য্য সকল নিরর্থক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও বলিয়াছেন—"মঙ্গল কার্য্য সকল অবশ্য কর্ত্তব্য কিন্তু এ সমস্তের ফল বড়ই অল্প।" পরে তিনি বলিয়াছেন যে ধর্ম্ম মঙ্গলই কেবল মহাফলপ্রসবী। দাস ও ভৃত্যগণের সম্যক আচরণ, পূজনীয়র ভক্তি, প্রাণীহত্যা বিষয়ে সংযম ও ব্রাহ্মণ শ্রমণগণকে দানই ধর্ম্ম মঙ্গল।" যাহা কিছু করিতেন সমস্তই পারত্রিক মঙ্গলের নিমিত্ত। পাপ বর্জ্জন করতঃ পুণ্যানুষ্ঠানে স্বর্গলাভই তাহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল ও সে জন্য সকলকেই তাহা শিক্ষা দিতেন। ধর্ম্ম বলিতে তিনি কি বুঝিতেন আমরা তাহা দেখাইয়াছি। পাপ কি তাহা তিনি ৩য় স্তম্ভলিপিতে লিখিয়াছেন—ক্রূরত্ব, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ মান ও ঈর্ষাই পাপ।" যাহাতে প্রজাগণ সকলেই ধর্ম্মাচরনে মনোনিবেশ করে তদ্বিষয়ে অশোকের এতাদৃশ আগ্রহ ছিল যে কেবলমাত্র নিজে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত ছিলেন না। সমস্ত না ছাড়িয়া চেষ্টা ব্যতিরেকে নীচ ও উচ্চ সকলের পক্ষেই যে পুণ্যলাভ দুষ্কর তাহা বারংবার বুঝাইয়া দিয়াছেন এবং তজ্জন্য সকলেরই যে ভীষণ উদ্যম ও তপস্যা দরকার তাহাও বলিতেন। সমস্ত কর্ম্মচারীদের প্রতি প্রজাগণকে ধর্ম্মোপদেশ দানের আদেশ করিয়াছিলেন। সর্ব্বদান ও অনুগ্রহ অপেক্ষা ধর্ম্মদান ও ধর্ম্মানুগ্রহই শ্রেষ্ঠ ও প্রত্যেক ব্যক্তিরই তাহার পুত্র, ভ্রাতা, স্বামী, মিত্র, জ্ঞাতি, প্রতিবেশীদিগকে সর্ব্বদা ধর্ম্মানুচরণে উপদেশ দেওয়া উচিত এ কথায় বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে কি দরকার তাহা ১ম স্তম্ভ লিপিতে লিখিত হইয়াছে—"প্রবল ধর্ম্মকামতা, আত্মপরীক্ষা, গুরু শুশ্রূষা, (ধর্ম্ম) ভয় ও উৎসাহ ব্যতিরেকে ইহত্র ও পারত্র লাভ করা দুষ্কর।" এই আত্মপরীক্ষা সম্বন্ধেও বিশেষ উপায় তিনি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজ্যশাসন প্রণালী—

অশোকের অনুশাসন সমূহ হইতে তিনি কি ভাবে রাজ্য শাসন করিতেন সে বিষয়ে আমরা বহু সংবাদ জানিতে পারিয়াছি। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি আদর্শ হিন্দু রাজা ছিলেন। নিজেই সর্ব্বদা প্রজাগণের আবেদন নিবেদন শ্রবণ করিতেন সে বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। যদিও রাজাই রাজত্বের উপর শ্রেষ্ঠ অধিকার ও আধিপত্য ছিল তৎাপি এই সাম্রাজ্য মধ্যেও যে জনসাধারণেরও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা বেশ প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় অশোকের সময় একটী প্রধান 'পরিষদ' ছিল। তাহার মতামত লইয়াই হিন্দুরাজগণ সর্ব্বদা রাজকার্য্য চালিত করিতেন। ৩য় ও ৬ষ্ঠ গিরিলিপিতে এই

পরিষদের কথা উল্লেখ আছে। এই পরিষদ ও মহামাত্রগণ সর্ব্বদা একমত হইয়া গুরুতর কার্য্য সকল পরিচালনা করিত। ৬ষ্ঠ গিরিলিপিতে লিখিত আছে—"যে সমস্ত আত্যায়িক কার্য্য সকল মহামাত্রগণের প্রতি ন্যস্ত হয়, তদ্বিষয়ে পরিষদ ও তাঁহাদের মধ্যে কোনও কারণে বিবাদ বা বিচার উপস্থিত হইলে সর্ব্বদা আমাকে জ্ঞাপন করিবে।" সুতরাং রাজ্যের বিশেষ গুরুতর কার্য্যসকল রাজার সম্পূর্ণ হস্ত ছিল না বলিয়া মনে হয়। রাজধানীর দূরস্থ জনপদ সকল রাজবংশের কুমারগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইত। কলিঙ্গ গিরিলিপিতে উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলাস্থ কুমারদ্বয়ের উল্লেখ আছে। কুমারগণের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণ 'রাজুক' (রজ্জুক ?) বলিয়া আখ্যায়িত আছে। তাহারা 'শত সহস্র প্রাণীর উপর নিযুক্ত' বলিয়া কথিত আছে। তাহারা যে স্বাধীনভাবে স্বকার্য্য চালাইতেন তাহা পরে আলোচনা করিব।

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নগরের উপর মহামাত্রগণ শাসন করিতেন। 'নগর ব্যবহারিক'গণ শ্রেষ্ঠ বিচারকর্ত্তা ছিলেন। রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ 'অন্তমহামাত্র' নামক কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রত্যেক কর্ম্মচারীর কার্য্যাবলী ও ক্ষমতায় কি প্রভেদ ছিল তাহা আমরা জানিতে পারি নাই তবে মহামাত্রগণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া খুব সম্ভব মনে হয়। 'প্রাদেশিক' নামক রাজপুরুষ যে ধর্ম্মার্থে অনুসন্ধানে বহির্গত হইতেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন তাহাদের পদ বর্ত্তমান কালের জেলাস্থ শাসনকর্ত্তার সদৃশ ছিল। রাজার সম্মুখে প্রজাবর্গের আবেদন নিবেদন সমূহ উপস্থাপিত করিবার জন্য 'প্রতিবেদক'গণ নিযুক্ত ছিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা প্রকার কর্ম্মচারী যথা যুক্ত, আযুক্ত ও দূতগণেরও নাম উল্লিখিত আছে। 'পুরুষ' নামক রাজার বিশেষ কর্ম্মচারীকে রাজা মাঝে মাঝে স্বচক্ষে প্রজাগণের অবস্থা দর্শন ও দুঃখের প্রতিবিধানের নিমিত্ত প্রেরণ করিতেন। 'ব্রচভূমিক' নামক কর্ম্মচারী যে কি কার্য্যে গোচারণ ভূমির পরিদর্শক নিযুক্ত ছিল তাহা নির্দ্ধারণে সমর্থ হই নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাহারা বর্ত্তমান কালের ইনস্পেক্টারের ন্যায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাজকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সমস্ত নানাবিধ রাজপুরুষগণের মধ্যে অনেকেই 'কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু 'ধর্ম্ম-মহামাত্র' ও 'স্ত্রীজনমহামাত্র' অশোকের স্বয়ং সৃষ্ট নূতন দুটী পদ বলিয়া মনে হয়।

প্রজাপালনে অশোক—

উপরি লিখিত নানাবিধ কর্ম্মচারী রাজ্যমধ্যে স্থাপিত করিলেও অশোক স্বয়ং যে প্রজার হিতার্থেই জীবনযাপন করিতেন তাহা প্রত্যেক অনুশাসন হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। কলিঙ্গ বিজয়ের পর আমরা দেখিয়াছি যে ভারতের সীমান্ত ও দূরদেশস্থ রাজা সমূহের সহিত অশোক সখ্যস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদের রাজ্যেও দূত প্রেরণ করিয়া স্বধর্ম্ম প্রচার করিতেন। তিনি এইরূপে একাধারে রাজা ও ধর্ম্মভিক্ষু সাজিয়া সমাজের প্রধান ব্যক্তিরূপে সমাজকে ধর্ম্মশিক্ষা দানেই নিজেকে ধন্য করিতেন। ধর্ম্মবিজয়ই তাঁহার রাজ্যবিজয় ছিল। ধর্ম্মযাত্রাই তাঁর বিহার যাত্রা এবং প্রজাগণের উভয়ত্র সুখ বৃদ্ধিই শ্রেষ্ঠ রাজধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। পশু-মনুষ্যের আর্থিক সুখের নিমিত্ত যাহা যাহা করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি। এক্ষণে ধর্ম্ম প্রচারক হইয়াও তিনি যে রাজকার্য্য অবহেলা করিতেন না তাহা দেখাইব। রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পরে তিনি কলিঙ্গ জয় করেন। ১৩শ গিরিলিপিতে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। যুদ্ধের ভীষণ পরিণাম ও তদ্দর্শনে তাঁহার মর্ম্মে দারুণ আঘাতের কি ফল হইয়াছিল তাহা এই লিপিতেই করুণ ভাষায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—"কলিঙ্গজয়ে দেড়শত সহস্র লোক অবরুদ্ধ হইয়াছিল, শত সহস্র হত ও তদসংখ্যক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে কলিঙ্গ বিজয় হেতু দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর অনুশোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত মৃত্যু দর্শনে তিনি বিষম বেদনা অনুভব করিতেছেন।" এই স্থলের ভাষা এইরূপ ভাবে লিখিত যে পাঠমাত্রেই ইহা যে অশোকের মর্ম্মের দীর্ঘনিশ্বাস তাহা পরিষ্কার পরিলক্ষিত হয়। "অধুনা সেই কলিঙ্গ লাভের পর দেবপ্রিয়ের তীব্র ধর্ম্মপালন, ধর্ম্মকামতা ও ধর্ম্মানুশস্তি হইয়াছে।" এই ধর্ম্মভাব জাগরণের ফলেই অশোক বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ১ম ক্ষুদ্র গিরিলিপিতে

তিনি এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—"যে আড়াই বৎসর আমি সামান্য উপাসক ছিলাম সেই সময় বিশেষ উত্তম প্রকাশ করি নাই ; তৎপর সঙ্ঘে যোগদানের পর দেড় বৎসর বিশেষ যত্ন সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এই উত্তমের ফলে তিনি যে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন পূর্ব্বে তাঁহা স্বকীয় উক্তি হইতেই দেখাইয়াছি। নবাধিকৃত কলিঙ্গ-বাসীদের সন্তোষ সাধনের নিমিত্ত তাহাদিগকে কি ভাবে শাসন করিবেন তাহা ঘোষণা করিয়া ধৌলি ও জৌগড়ের বিশেষ অনুশাসন দুখানা খোদিত করান। এই লিপিপাঠে আমরা অশোকের প্রজা বাৎসল্য ও রাজ্যশাসন প্রণালী বুঝিতে পারি। তিনি কলিঙ্গস্থ মহামাত্র ও নগর ব্যবহারিক দিগকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—"আমার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যোদ্ধার উপায়ে সাধিত হইবে। যাহাতে সুমনুষ্যগণের প্রণয় লাভে সমর্থ হই এজন্য তোমাদিগকে বহুসহস্র প্রাণীর উপর আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছি। সকল মনুষ্যই আমার সন্তান সদৃশ। পুত্রগণের ইহলৌকিক পারলৌকিক হিতসুখের নিমিত্ত আমার যাদৃশ আকাঙ্ক্ষা সেরূপ প্রত্যেক মনুষ্যেরই তাদৃশ হিতকামনা করি।" "অপরাস্তবাসিগণও যাহাতে আমাকে তাহার পিতৃতুল্য হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া গণ্য করে সে ভাবে তাহাদের দুঃখ দূর ও সুখবৃদ্ধি করিবে।" কেবল কলিঙ্গ রাজ্যই এইরূপ পিতৃবৎ পালন করিতেন তাহা নহে। রাজ্যের সকল প্রজারই পুত্রবৎ পালন ও উন্নতি বিধানে যে সর্ব্বদা যত্নবান ছিলেন তাহা মধুর ভাবে ৪র্থ স্তম্ভলিপিতে লিখিয়াছেন ; "যাহাতে রাজুক সকল আশ্বস্ত ও অভীতভাবে জনপদ সমূহের হিত-সুখকার্য্যে ও অনুগ্রহ দণ্ডাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে তজ্জন্য বিচার কার্য্য ও দণ্ড বিষয়ে আমি রাজুকদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছি। যেরূপ পুত্র সুখলাভ করিবে এই আশায় একটী নিপুণা ধাত্রীর হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া পিতা আশ্বস্ত হয়েন, সেরূপ আমিও জনপদগণের হিত-সুখের নিমিত্ত রাজুক সকল নিযুক্ত করিয়াছি।" কিরূপ সুন্দর ভাবে এই কথাগুলি লিখিত যে তাহাতে অশোকের মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। কলিঙ্গের মহামাত্রগণ কি ভাবে কলিঙ্গবাসীদের প্রতি আচরণ করিবে তদ্বিষয়ে অশোক বিশদ ভাবে উপদেশ দিয়াছেন,—"আমার সুবিহিত নীতি ইহাই জানিবে। কোন কোন ব্যক্তির কারাগারে বা অন্য প্রকার পরিক্লেশ হইয়া থাকে। বিনা কারণ বশতঃ কারাদণ্ড হইলে তাহার নিমিত্ত অপর অনেকেই মনঃকষ্ট পায়। সুতরাং তোমরা যাহাতে প্রত্যেকেই ন্যায়পরায়ণ হইতে পার তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। যাহাতে বিনা কারণে কেহ দণ্ড বা ক্লেশভোগ না করে সে বিষয় পরিদর্শনার্থ আমি পঞ্চ বৎসরান্তর একটী রাজপুরুষ প্রেরণ করিব। তাঁহার নিষ্ঠুরতাহীন, অকর্কশ ও কোমল স্বভাব হইবে এবং আমার উপদেশমত কার্য্য করিবে। উজ্জয়িনী ও তক্ষশিলার কুমারও এইরূপ রাজপুরুষ প্রেরণ করিবেন। তাঁহারা তিন বৎসরের অধিক ঐ কার্য্যে থাকিতে পারিবে না।" যাহাতে রাজ্যের সর্ব্বত্র একই নিয়মানুসারে বিচার কার্য্য ও দণ্ডবিধান হয় তদ্বিষয়ে ৪র্থ স্তম্ভলিপিতে উপদেশ দিয়াছেন। হতভাগ্য বন্দী ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তোন্মুখ ব্যক্তিগণও তাঁহার কোমল প্রাণের যথাসম্ভব স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইত না। মৃত্যুর পূর্ব্বে প্রত্যেক বন্দীই তিন দিনের অবসর পাইত। এই সময় যাহাতে তাহারা পরলোক বিষয়ে চিন্তা করিতে পারে অশোক সে বিষয়েরও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি বন্দীগণের মুক্তিদান করিতেন।

প্রজাগণের কার্য্যই যে তাঁহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল তাহা ৬ষ্ঠ গিরিলিপিতে কর্ম্মচারী ও পরিষদবর্গের প্রতি উপদেশ হইতেই বুঝা যায়। প্রজাগণের আবেদন শ্রবণ ও অর্থকর্ম্ম বহুকাল যাবৎ সর্ব্বকালে সাধিত হইতেছে না। সুতরাং আমি এই নিয়ম করিয়াছি—সর্ব্বসময়ে ও আমি যেখানেই থাকি না কেন—অন্তঃপুরে, গর্ভগৃহে, মল-মূত্রাদি ত্যাগের স্থলে, উদ্যানে বা ব্যায়ামাগারে (?)—সর্ব্বত্রই প্রতিবেদকগণ আমাকে প্রজাদের নিবেদন সকল শ্রবণ করাইবে। কারণ আমি সমস্ত কার্য্যই প্রজাদের জন্য করি কর্ম্মচারী ও পারিষদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে আমাকে সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে আবেদন করিবে। আমি যাহা কিছু করি সকলই প্রাণীগণের কাছে আনৃণ্যলাভের নিমিত্ত ও লোকের সুখবর্দ্ধন ও পরত্র স্বর্গলাভের নিমিত্তই করিয়া থাকি। মৃগয়া ও বিহার যাত্রার

পরিবর্ত্তে 'ধর্ম্মযাত্রার' ব্যবস্থা করেন। ভ্রমণে বহির্গত হইয়া স্থানে স্থানে সত্রাদি স্থাপন করিয়া স্বচক্ষে প্রজাগণের অবস্থা অবলোকনই এই ধর্ম্মযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। ৮ম গিরি লিপিতে তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে,—"ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের দর্শন ও দান বৃদ্ধগণের দর্শন ও হিরণ্য দান, জনপদ ও জনগণের দর্শন, ধর্ম্মানুশস্তি ও ধর্ম্ম বিষয় মঙ্গল প্রশ্ন"ই এই সময় সাধিত করিতেন। প্রজাগণ ধর্ম্মপালন ও ধর্ম্মপথে জীবন যাপন করুক এ বিষয়েই তিনি ইচ্ছা করিতেন। তদ্ভিন্ন যশ অথবা কীর্ত্তি তিনি মহার্থবহ বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। বৈরাব ও সারনাথের লিপিতে যাহাতে সঙ্ঘমধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত না হয় সে বিষয়ে উপদেশ দান করেন। ধর্ম্ম-মহামাত্রগণের সর্ব্বপ্রজার উপর নিয়োগ হইতে কোন শ্রেণীই যে তাঁহার অপত্য স্নেহে বঞ্চিত ছিল না তাহা বুঝা যায়। এইরূপে দেখিতে পাই রাজ্যমধ্যে কূপ খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন, বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি দ্বারা প্রজার সুখবৃদ্ধি এবং ধর্ম্ম মহামাত্রগণের নিয়োগ, অনুশাসনাবলী প্রকাশ দ্বারা প্রজার ধর্ম্মবৃদ্ধি এবং উচ্চ নীচ সকল কর্ম্মচারীগণকেও সর্ব্বদা ধর্ম্মপথে থাকিয়া প্রজাপালন, আজ্ঞা পালন, সুখবৃদ্ধি ও রাজকার্য্য পরিচালনায় উপদেশ দানে অশোক যে প্রকৃতই রঞ্জয়তি প্রজান্ ইতি রাজা এই নামের সার্থকতা করিয়াছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য।

অশোকের অনুশাসন সমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া তাহার রাজ্যের নানা বিষয়ক সংবাদ অবগত হওয়া গেল। তাঁহার রাজ্যশাসন প্রণালী, চরিত্র, ধর্ম্ম সমস্ত বিষয়ের আমরা খবর পাইয়াছি। গয়ার নিকটস্থ বরাবর গিরি গুহায় কয়েকখানা লিপিতে ঐ গহ্বরগুলি অশোক আজীবিক নামক সন্ন্যাসী দলের বাসস্থানরূপে দান করিয়া গিয়াছেন। তদ্বারা বুঝা যায় যে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণই তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন না। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামে তাঁহার খোদিত লিপি প্রাপ্তে আমরা বুদ্ধের জন্মস্থানের নির্দ্দেশ পাইয়াছি। নিগলিভ স্তম্ভলিপি হইতে অশোকের সময়ও সপ্তগুপ্তের প্রবাদ প্রচলিত ছিল বলিয়া জানিয়াছি।

যদিও অশোকের ভাষা অনেক স্থলে কর্কশ হইয়াছে—স্থলে স্থলে পুনরুক্তি দোষও ঘটিয়াছে তথাপি বাস্তবিক অশোক ১৪শ গিরি লিপিতে যে বলিয়াছেন যে মধুরতার নিমিত্ত ও যাহাতে প্রজার মর্ম্মে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মপথে চালিত করে তজ্জন্য অনুশাসন সমূহে একই কথা অনেক স্থলে বারংবার বলিতে হইয়াছে—এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। প্রত্যেক কথাতেই অশোকের মনের ভাব ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার মনের দৃঢ়তা, কার্য্যতৎপরতা, অক্লান্ত উদ্যম, পরলোকে দৃঢ় বিশ্বাস প্রত্যেক কথাতেই লক্ষিত হয়। যাহাতে তাহার পুত্র পৌত্রগণ তাঁহার পদানুসরণ করিয়া চলে এ বিষয়ে প্রত্যেক অনুশাসনেই উপদেশ ও প্রজাদিগকে আশ্বাস দিয়া গিয়াছেন। লিপিসমূহ অধিকাংশ আত্ম-কাহিনীময় হইলেও তাহা যে অশোকের ন্যায় ধর্ম্ম প্রচারকের প্রবল মনের আবেগের ফল তাহা ভাষা হইতে বেশ প্রতীয়মান হয়। ইহার ফলেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতের বহির্ভাগে প্রচলিত হইয়াছিল। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরাণ নিবোধত—উঠ, জাগ, নিজের দোষগুণ পরীক্ষা করিয়া ধর্ম্মপথে চল, ধর্ম্ম কাহিনী শুনাও, অশোকের সকল অনুশাসনের ইহাই সার মর্ম্ম।

"চার-পোণে" চৈতন্।

(রঙ্গ-চিত্র)

[নাট্যকার শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত]

(১)

মেদিনীপুর জেলায় "দীর্ঘপদী" গ্রামটাকে লোকে সহজ এবং চ'ল্তি কথায় "দেরকো-পিদিম" গাঁ ব'লেই ডেকে থাকে। সংসারে লম্বাচওড়া নামের দুর্গতি,—কালে এই রকম হয়েই থাকে; এর জন্যে দুঃখ কর্কার কিছুই নেই। গ্রামটা "পাড়াগাঁ" হ'লেও, খুব সুখের স্থান ব'ল্তেই হবে। কারণ, সংসারে জ্বালাতন হবার জন্যে এবং মানুষকে দুঃখ দেবার জন্যে যে সব ভয়াবহ জিনিষগুলির সৃষ্টি (সহর থেকে ক্রমে পল্লীগ্রামে) হয়েছে, যথা,—মুন্সিপাল্, তার দরুণ রাস্তার আলোর ব্যবস্থা, পাকা রাস্তা, ঘোড়ার গাড়ী,—ট্যাক্সি,—"বাস্",—থিয়েটার ক্লাব্,—"লাই বেরারি", গবর্ণমেণ্ট্-সাহায্যপ্রাপ্ত ইংরাজী হাই স্কুল, গ্রামের বুকের ওপোর রেল্ওয়ে ষ্টেশন, সুতরাং বাংলা দেশে কৃতান্তরূপী ভীষণ **ম্যালেরিয়া ঠাকুরুণের** উৎপাত,—এসবের কিছুই সেখানে নেই। সৌখীন বাবু-ভায়েরা এ কথায় "চটে-ম'টে" ব'ল্তে পারেন,—"ও সব যদি কিছুই নেই, তাহ'লে ও চুলোয় আছে কি?" ঠাণ্ডা হোন্ দাদামণিরা—ওটাকে "চুলো" ব'ল্বেন না। "ক্যাংলা বাংলা" দেশের ঐ আদর্শ পল্লীগ্রামটী, যেখানে প্রতি ঘরে ঘরে ধানের মরাই,—প্রতি গৃহস্থের অবস্থানুযায়ী একটি ক'রে বাগান- (তাতে প্রায় সকল রকমের তরিতরকারী—শাকসব্জী, আম, কাঁটাল, নীচু, শশা, পেঁপে—যে সময়ের যা'—তাই ফলে), যেখানে গ্রামবাসীদের লাঙ্গল ঘাড়ে ক'রে মাঠে গিয়ে নিজের অন্নের সংস্থান ক'র্ত্তে কোন লজ্জাবোধ নেই,—যেখানে প্রতিদিন মাছ খাবার জন্যে বাজারে পাঁচগুণো দাম দিয়ে পচা মাছ কিন্তে গিয়ে মেছুনীদের "মধুর" সম্ভাষণ এবং কখনো বা তাদের প্রক্ষিপ্ত আঁশজলে অভিষিক্ত হ'তে হয় না,—ঐ শান্তি দেবীর অধিষ্ঠানভূমীকে—ঐ বঙ্গলক্ষ্মীমাতার সুখের আবাসস্থানকে যদি আপনারা "চুলো" বলেন, তাহ'লে "চুলোমুখো" বাঙ্গালীরা যত শীগ্‌গির নিজেদের জন্যে ঐ রকম "চুলো" সৃষ্টি ক'রে তা'তে সেঁধোতে পারে,—ততই ত'াদের পক্ষে মঙ্গলের বিষয়।

ঐ "দেরকো-পিদিম" গাঁয়ে ভদ্রলোক (?) কেউ না থাক্লেও,—বামুন আছে কায়েৎ আছে, বৈদ্য আছে,—"নবশাক" আছে,—সদ্গোপ আছে,—চাষী আছে,—"যেলে" আছে,—ময়রা আছে,—গয়লা আছে। তোমাদের সৌখীন দেশের মত সেখানে আছে সবই। কেবল নেই "ভদ্দরলোক"। যদি বলেন,—সেকি কথা? বামুন কায়েৎ আছে,- তবে "ভদ্রলোক" নেই কি রকম? হ্যাঁ,—"ভদ্রলোক" নেই। ইংরেজ রাজত্বে - এই চরম সভ্যতার দিনে,—এই **"দিক্‌-ভূলা পেট-চলা—চোর-যুগে"**—এই "দাসত্ব পরমধর্ম্ম"—মন্ত্রপূত বাংলা দেশে,—নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, দেবগুরুদ্বিজে ভক্তিমান কায়স্থ,—আয়ুর্ব্বেদে শ্রদ্ধাপরায়ণ বৈদ্য, "যে-যার জাতীয় ব্যবসাবলম্বী" শূদ্র,—নিজপল্লীক্ষেত্রে নিজের অন্নোৎপাদনের জন্য লাঙ্গলচালনাকারী মনুষ্য,—কখনো কি 'ভদ্রলোক' হ'তে পারে? "ভদ্দরনোক" তাঁরা,—যাঁরা পেট ভরে দু'বেলা খেতে পাননা,—যাঁরা "পাড়াগাঁ" ছেড়ে সহরের পাইখানার পাশে দুটো ঘর ভাড়া ক'রে মাসে ৪০৲ চল্লিশ টাকা ভাড়া গোঁজেন,—যাঁদের দেনার দায়ে "ঘটি-বাটিটী" পর্য্যন্ত বাঁধা দিয়ে শতকরা পঁচাত্তর টাকা হারে সুদ দিতে হয়,—যাঁরা পয়সা দিয়ে ঘিয়ের বদলে যত রাজ্যের 'মরা-

পচা" জানোয়ারের চর্ব্বি খান, কিম্বা "ভেজিটেব্‌ল্‌" ঘিয়ে "লুচি" ভেজে আহার করেন,--"সরষের" তেলের নাম ক'রে "ম'সনের" তেলে ইলিস মাছ ভাজা খান, পাথরের গুঁড়ো-মিশ্রিত ময়দার "রুটি" সেবা ক'রে থাকেন,—যাঁরা জর্জেট্‌ মেখে— পাম্প্‌সু পোরে- আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে চড়িয়ে ৪৩্‌ টাকা মাইনেতে মার্চ্চেণ্ট্‌ আফিসে কেরাণীগিরি করেন.— আর দরোয়ানের কাছে টাকা ধার নিয়ে- প্রতি সপ্তাহে "রেসে" গিয়ে,- মাঝে মাঝে বায়স্কোপ—থিয়েটার দেখে জোর গলায় ক্লাবে ব'সে নাটক এবং অভিনেতার সমালোচনা করেন ভদ্রলোক তাঁরা, যাঁদের পল্লীগ্রামে নিজের পৈতৃক ভিটেয় শ্যাল্‌ কুকুরের বাসা হয়েছে,—দেখাশুনা এবং তদারক অভাবে—সেখানকার বাড়ীঘরদোর ভূমীসাৎ হ'চ্ছে,— জমীজমায় উলুখড় এবং বিছুটির জঙ্গল হয়েছে ভদ্রলোক তাঁরা,— যাঁরা সকালে উঠে বাসি মুখে তিনবার চা খান,দুধের বদলে মুর্গীর এণ্ডায় দেহপুষ্ট ক'র্ত্তে চান, সন্ধ্যের পর নিজের বাড়ীতে বা অবিদ্যার কুঞ্জে যাঁদের হুইস্কি-ব্র্যাণ্ডি পান অভ্যাস। সুতরাং, উক্ত "দেয়্‌কো-পিদিম" গাঁয়ে যখন ঐ দরের—ঐ অবস্থার লোক বাস করেনা,—তখন সেখানে "ভদ্দরনোক" আছে, আমি কোন্‌ সাহসে ব'ল্‌ব ? আর তা ব'ল্‌লেই বা "ভদ্দর-নোক" আপনারা,- স্বীকার ক'র্কেন কেন ?

কিন্তু কাজটা বড় খারাপ হয়ে গেল। এ যে ধান্‌ ভান্‌তে শিবের গীত হ'চ্ছে। "চার পোণে চৈত্তনের" জীবনকাহিনী ব'ল্‌তে গিয়ে—কি কতকগুলো বাজে কথায় এতটা সময় নষ্ট ক'রলুম। ছিঃ।

কিন্তু দোষ আমার মোটেই নয়। দোষ বাঙ্গালী জাতির। কাজের কথা ফেলে বাজে কথায় আসর মাত্‌ ক'র্ত্তে যাওয়া,— বাঙ্গালীর জাতিগত দোষ। অসংলগ্ন প্রলাপবাক্য বাঙ্গালীর মত জগতে কোন্‌ জাতি ব'ল্‌তে পারে ? যাক্‌—শুনুন তবে।

এ হেন "দেয়্‌কো-পিদিম" নামধারী "অজ্‌ পাড়াগাঁয়ে" রাধাবল্লভ পালের বহুকালের বাস। জাতিতে তিনি তন্তুবায়, —যাকে চ'ল্‌তি কথায় বলে—"তাঁতি"—আর সহরে বয়াটে ছেলেরা বলে "Manchester"। রাধাবল্লভের অবস্থা খুবই সচ্ছল। নিজের হাতে চর্‌কা কেটে সুতো তৈরি করেন; ঘরে ৩০।৪০টা তাঁতে লোকজন দিয়ে কাপড় চাদর গামছা তৈরি হয়। ৫।৬শো (৫০০।৬০০) বিঘে ধানজমী! নিজের "মেইন্দার" দিয়ে চাষ করান। মস্ত বড় তিন চার খানা বাগান, একটা বড় দীঘি, ৫।৬টা পুকুর। নগদ টাকা কত আছে ঠিক বলা যায় না বটে;—তবে, দু' তিন হাজার টাকা গাঁয়েতেই সুদে খাট্‌ছে। বাড়ীতে বার' মাসে তেরো পার্ব্বণ তো লেগেই আছে। তাঁর ওপোর—রাধাবল্লভ পরম বৈষ্ণব; বিস্তর "নেড়া-নেড়ী" তাঁর বাড়ীতে এসে জমায়েত্‌ হ'য়ে মাঝে মাঝে হরিসঙ্কীর্ত্তন উপলক্ষে মাল্‌সাভোগে রাধা-বল্লভের বেশ দু' পয়সা খরচ করিয়ে দেয়। রাধাবল্লভ (যাকে বলে) গোঁড়া হিঁদু। দেবতাব্রাহ্মণে তাঁর যথেষ্ট ভক্তি। বাংলা লেখাপড়া হিসেবনিকেশ বেশ জানা আছে। জাতে তাঁতি হ'লেও—গাঁয়ে সকলেই তাঁকে খাতির করে—ভাল-বাসে। রাধাবল্লভ ইংরিজি লেখাপড়া মোটেই জানেন না।

এক মহাদুঃখ—রাধাবল্লভের ছেলেপুলে নেই। পত্নী কালিন্দী,—বাংলা দেশে হেন "ওষুধ" নেই, বা ধারণ করেন নি। হেন দেবতা নেই—যাঁর কাছে মানৎ করেন নি। "দেয়্‌কো-পিদিম" গাঁয়ের ভেতরেই একটা বহুকালের পুরোণো ভাঙ্গা শিবমন্দির আছে। লিঙ্গমূর্ত্তিটির নাম অদ্ভুত রকম,- "রাবণেশ্বর"। নেপাল ভট্‌চাযি্য মশায়ের পরিবার এসে কালিন্দী ঠাক্‌রুণ্‌কে ব'ল্‌লেন,—"বৌমা! পিত্যহ যদি রাবণেশ্বর বাবার মাথায় এক ঘটী দুধ আর একটা সিকি আর চারটী বিল্বিপত্তর নিয়ে গিয়ে ঢেলে দিয়ে আস্‌তে পার, (অবিশ্যি—পায়ে হেঁটে যেতে হবে বাছা—) তা'হ'লে এক বছরের ভেতর তোমার ছেলে হবেই হবে। আমি তার জামীন।"

ভট্‌চার্য্যি মশাই খোদ্‌ কর্ত্তাকে ব'ল্লেন, "আমি দৈশ যোগের দ্বারা জান্‌তে পেরেছি, -"রাবণেশ্বর শিবায় নমঃ" ব'লে দুধ গঙ্গাজল বিল্বদল যদি গৃহিণী প্রত্যহ চড়াতে পারেন (যৎসামান্য কাঞ্চনমুদ্রা দক্ষিণাসমেত), আপনার পুত্রোৎ-পাদন অনিবার্য্য!"

পুত্রলাভের জন্ত সস্ত্রীক রাধাবল্লভ প্রায় বৎসরাবধি তাই কর্‌লেন। বৎসর কাবার হ'তেই কালিন্দী মরা চটে গেলেন।

কর্ত্তাকে ব'ল্লেন "মুয়ে আগুন,—মুয়ে আগুন! ঠাকুর দেবতারা সব একচোখো—সব একচোখো!"

রাধাবল্লভ গৃহিণীর মুখে হাতচাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলেন্—"হাঁ—হা হাঁ করিস্ কি করিস্ কি—বৌ? দেবতাদের "একচোখো" ব'ল্তে আছে? বাবা রাবণেশ্বর "দেরকো-পিদিম" গাঁয়ে একেবারে ভীষণ জাগ্রত! তাঁকে একচোখো ব'ল্লে আমাদের কি নিস্তার আছে?" ব'লেই দু' হাত একত্র ক'রে ভাবে গদগদ্ হ'য়ে কপালে ঠেকিয়ে দেবতাকে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টা ক'র্ত্তে লাগলেন।

কালিন্দী খুব গ'র্জ্জে উঠে ব'ল্লে—"নাঃ—বল্‌বে না? দেবতারা—বিশেষ তোমার এই গাঁয়ের ঐ রাবণেশ্বর ঠাকুর, ওতো একের নম্বর একচোখো!"

রা। "কেন কেন—হঠাৎ রাবণেশ্বর ঠাকুর বাবাটী তোমার সঙ্গে কি একচোখোর কাজ ক'ল্লেন?"

কা। "করেনি? আমি যেদিন থেকে পুজো আরম্ভ ক'র্‌লুম, আমাদের "নিত্তি জেলেনী" (তা'রও ছেলে হয়নি ব'লে—) সেও ঠিক সেদিন থেকে পুজো আরম্ভ ক'র্‌লে। আমি কত "শুদ্ধি" আচারে গঙ্গা নেয়ে গরদের শাড়ী পরে খাঁটি দুধ দুইয়ে মাজা ঘটী ক'রে নিয়ে গিয়ে কত ভক্তি ক'রে মাথায় ঢালি; পিত্তাহ্ এক্‌টা করে সিকি,—একগোছা বেল-পাতা মাথায় চড়িয়ে আসি। তারকেশ্বরে না গিয়ে এবার শিবরাত্তিরে ঐ ভাঙা মন্দিরে ব'সে "চার পোহর" পুজো ক'র্‌লুম,—সোণার বিল্বিপত্তর গড়িয়ে দিলুম,—"একচোখো" দেবতা মুখপোড়া, আমায় দিলে না এক্‌টা ছেলে। আর ঐ জেলেনী মাগী—বাজার থেকে ফেরবার মুখে এক ভাঁড় আঁশ্ ধোয়া জল—আর দুটো শুক্‌নো বেলপাতা নোংরা জ্যায়গা থেকে কুড়িয়ে এনে মাসখানেক না "অচ্ছেদ্দা" ক'রে দিতেই—আজ তার কোলে জলজ্যান্ত এক্‌টা ছেলে ধড়্‌ফড়্ ক'চ্ছে! মুখে আগুন,—মুখে আগুন! সকল দেবতাই কি একচোখো গা?"

রাধাবল্লভ একে গোবেচারী,—তার ওপোর "পরিবার-টীকে" কিছু "ভয়-ভক্তি" করে থাকেন। দেবতাকে বারবার "একচোখো" বলাতে যদিও বেচারা মনে মনে শিউরে উঠছিলেন, কিন্তু "কালিন্দীর" যুক্তিপূর্ণ কথার কোন প্রতিবাদ ক'র্ত্তে পার্‌লেন না! স্ত্রীর কথায় মনে মনে তাঁ'কে স্বীকার ক'র্ত্তেই হ'ল,—"রাবণেশ্বর বাবা যদি এমন কার্য্য করে থাকেন তাহ'লে কাজটা ঠাকুরের একটু "একচোখোর" মতই হয়েছে বটে!"

বৈকালে ভট্‌চার্য্যি মশাইকে গৃহিণীর অভিযোগের কথাটা রাধাবল্লভ স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। ভট্‌চার্য্যি মশাই হট্‌বার পাত্র নন্। একটু মুচ্‌কে হেসে ব'ল্‌লেন—"পাল্‌জি! বৌমাকে রাগ ক'র্ত্তে বারণ কোরো। নিত্তি জেলেনীর ছেলে হওয়া—আর তোমার ছেলে হওয়ার একটু তফাৎ আছে বাবা! এক্‌টা যেখান-সেখান থেকে, হাড়ী ডোম্ কাওরা বাগ্‌দি যার-তার ঘর থেকে টেনে এনে বাবা রাবণেশ্বর নিত্তি জেলেনীর মত মাগীকে গছিয়ে দিয়ে তুষ্ট ক'র্ত্তে পারেন। এ তো বেশী শক্ত ব্যাপার নয়,—এর জন্তে বাবাকে মাথাও ঘামাতে হবেনা,—ব্যস্তও হ'তে হবেনা। কিন্তু বাবাজি—তোমার এই অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ ক'র্ত্তে এই "আলালের ঘরের দুলাল" হয়ে থাক্‌বার জন্তে তো যাকে-তাকে এনে তোমাদের কোলে রাবণেশ্বর ঠাকুর ফেলে দিতে পারেন না! এমন লোক দেখ্‌তে হবে, তাঁকে—যিনি পুণ্য ক'রে, দানধ্যান ক'রে,—"পুজোআচ্ছা" ক'রে, দেহত্যাগ ক'রে-ছেন। এই রকম লোক পেলে তবে না তিনি তোমাদের কাছে এনে দেবেন? তা বাবা মা ঠাকরুণ্‌কে জিজ্ঞাসা করো দিকি, এ রকম লোক কি চট্ ক'রে এ বাজারে মেলে যে, নিত্তি জেলেনীর মত মা লক্ষ্মী আমার ঝট্ করে এক্‌টা ছেলে প্রসব ক'রে ফেল্‌বেন?

চণ্ডীমণ্ডপের ভেতর দিকে দাঁড়িয়ে কালিন্দী ঠাক্‌রুণ সমস্ত কথা শুন্‌লেন্! কথাগুলো শুনে এক্‌টু বুঝেও দেখ্‌লেন—"হ্যাঁ—যুক্তিপূর্ণ বটে!" কাজেই রাধাবল্লভ আর কালিন্দী,—দুজনকার মুখে আর কথাটী নেই।

রাত্রে স্বামীকে কালিন্দী ব'ল্‌লেন্—"তুমি ভট্‌চার্য্যি মশাইকে বল'গে—এ রকম 'পুণ্যিমানে' আমার দরকার নেই। এ রকম যখন আজকাল বাজারে মেলেই না,—তখন বাবা রাবণেশ্বরকে ব'লে ক'য়ে আমায় এক্‌টা যে রকম হোক্—ছেলে কোলে পাইয়ে দিন্। আমি যে আর 'ধর্য্যি' ধ'র্ত্তে পারিনে গো!" গৃহিণী—(ওরই মধ্যে একটু

ভাব্‌ছেয়ে আছেন কি মা—) স্বামীকে খুবই এই উদ্ভট আবদার নিয়ে জ্বালাতন ক'র্ত্তে লাগ্‌লেন।

পরদিন ভট্‌চার্য্যি মশাই এ' কথা শুনে ব'ল্‌লেন - "আচ্ছা—তাই হবে। একটা অমাবস্যে দেখে এরই মধ্যে তোমাদের জন্যে একবার পুত্রেষ্টি যাগ্‌টা তা'হ'লে করেই ফেলি। খরচ বড় বেশী হবেনা;—গত বছরে গোটা তিনেক আমি নিজের হাতেই ক'রেছি। বল্লিপুরে বাঁড়ুয্যে মশাইয়ের বড় ছেলের জন্যে যে রকম ক'রেছি, সেই রকম অল্প খরচায় সার্‌বো!"

তথাস্তু! রাধাবল্লভের এই পুত্রেষ্টি যাগে "দুইশত আঠারো টাকা সাড়ে তেরো আনা" ব্যয় হ'ল!

* * * *

"রাবণেশ্বর বড় জাগ্রত দেবতা! হেঁ—হেঁ—বাবা! তাঁর সঙ্গে বড় চালাকিটি নয়!" ভট্‌চার্য্যি মশায়ের "যাগের" ফল - "রাধাবল্লভ-কালিন্দী" একেবারে (যাকে বলে) হাতে হাতে পেলেন। বছর না ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে সশরীরে এক ছেলে এসে কালিন্দীর কোল জুড়ে শুলো। ভটচার্য্যি এবং তাঁর নথ্‌পরা বামুনগিন্নী কেবল চার পা তুলে নাচতে বাকী রাখলেন! গাঁয়ের লোক ভাবলে,—"সত্যি এঁ'রা দুটী সাক্ষাৎ দেব-দেবী! বাবা রাবণেশ্বরের নন্দী ভিঙ্গিজি!" রাধাবল্লভ আর কালিন্দীর আনন্দের সীমা নেই—সেতো বুঝতেই পাচ্ছেন। সস্ত্রীক ভট্‌চার্য্যি এ ব্যাপারে তাঁদের কাছ থেকে আদায়পত্র কি ভাবে ক'ল্লেন,—সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মা-বাপের মনে একটা বড় দুঃখু বেজে গেল। নবজাত "খোকাটার" একচোক্ কাণা!

ভটচার্য্যি লম্বা হাত নেড়ে ব'ল্‌তে লাগলেন—"হবেনা? ছেলের একচোখ্ কানা হবেনা? হেঁ—হেঁ বাবাজি,—মা কমলার কৃপায় বড় ঘরে,—তাঁতি (খুড়ি) তন্তুবায় মশাইদের ঘরেই না হয় জন্মেছ! একসঙ্গে "মাকু" আর "লাঙ্গল" ঠেলে একটা রাজৈশ্বর্য্যই না হয় লাভ ক'রেছ! সুখেসচ্ছন্দে ভোগ কর, প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ ক'চ্ছি! ব্রাহ্মণ সজ্জনকে দু' হাতে দান ধ্যান করো—তা'তে মানা করিনা! কিন্তু বাবা!—ঠাকুর দেবতাকে যে টিজ্জা! কেমন বাবাজি? কেমন হে দত্তজা? বলি ও নকরের পো! গোগ্রাসে তামাকই গিল্‌ছো,- বলি, ব্রাহ্মণের কথাটায় একটা সায় দাও! বলি, দু' লক্ষ ছিয়াত্তর বার বারণ করিনি?—বল না হে রাধাবল্লভ—বলই না ছাই! রাধাবল্লভ ব'ল্‌বে কি,—তাতো সে বুঝতেই পার্‌লে না! চুপ্ করে অপরাধীর মত ভট্‌চার্য্যির মুখের পানে চেয়ে ব'সে রইলো!

ভট্‌চার্য্যি মশাই মাথা নেড়ে নেড়ে খুব বক্তৃতা চালাতে লাগ্‌লেন,—"একচোখো,—একচোখো! দিনের মধ্যে সাতশো বার জাগ্রত দেবতাকে একচোখো ব'লে গালাগাল অগ্নি দিলেই হ'ল? নাও,—এইবার "একচোখো" বলার ঠ্যালাটা সাম্‌লাও বাবাজি! মনে ক'ল্লেন বৌমা ঠাকরুণ্ যে, সত্যি কি আর ঐ ভাঙ্গা মন্দিরের ঠাকুরটী—ঐ রাবণেশ্বর বাবাটী এ কথা শুন্‌তে পাবেন? দেখ্‌লে তো? হাতে হাতে সব দিকে কি রকম 'নরম গরম' ফল ফলিয়ে দিলেন?"

এই মহা অপরাধ খণ্ডনের জন্যে রাধাবল্লভ রাবণেশ্বর বাবার মন্দিরে 'পুজো আচ্ছা'—'শান্তি-সস্ত্যেন' বাবদে যে টাকাটা ব্যয় ক'ল্লেন,—বোধ হয় নিজের বাবার শ্রাদ্ধেও তার সিকির সিকিও ব্যয় হয়নি!

* * * *

কথায় বলে "নেই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল!" এক-চক্ষুহীন ছেলে হ'লে কি হবে,—ছেলে তো বটে গা? বাপ্ মার কাছে সে কি তার একটা চোখ অভাবে স্নেহ কিছু কম পাবে? ছেলের নাম রাখা হ'ল,—'রাবণেশ্বরপ্রসাদ!" নামটা বড্‌ডো লম্বাচওড়া, সকলেই একটু আধ্‌টু আপত্তি ক'ল্লে! রাধাবল্লভ কারুর কথা কাণেই তুল্লেনা! "আরে বাপ্‌রে! আবার ঠাকুর দেবতার সঙ্গে বিবাদ? যাঁর প্রসাদে ছেলে পেলুম—তাঁর কাছে অকৃতজ্ঞ হব? প্রাণ থাক্‌তেও না!"

ভট্‌চার্য্যি মশাই ব'ল্লেন—"হ্যাঁ—সুন্দর নামকরণ হয়েছে! তবে ওটা হ'ল "ডাক্ নাম",—যাকে বলে "আট-পউরে!" একটা পোষাকী নাম অন্নপ্রাশনে রাখা কর্ত্তব্য!"

রাধাবল্লভ পরম বৈষ্ণব। চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর ইষ্ট-দেবতা। পুত্রের পোষাকী নাম রইল—"চৈতন্য চরণ।"

* * * *

আঁট্‌কুড়োর ঘরে—বাপমার বুড়ো বয়সে যদি ছেলে জন্মায়,—তায় আবার সেই বাপের যদি"পয়সা"থাকে, তাহ'লে সে ছেলের যে কি খাতির, কি আদর, কি কদর—সেটা যদি এ ক্ষেত্রে আমাকে সবিস্তারে ব'লে বোঝাতে হয়,—তাহ'লে এ গল্পের এইখানেই আমাকে ইতি ক'র্ত্তে হবে!

"লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষানির" মধ্যে ধনমণি রাবণেশ্বর বাপ্‌মার "আদরে গোবরে" কি রকমটী যে দাঁড়িয়েছে,—তা রাধা-বল্লভের বাড়ীর লোকেদের, পাড়াপ্রতিবাসীদের, চাকর,—দাসীদের, এমন কি, গাঁয়ের চাষাভুষোদের গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। তা'রা সবাই একবাক্যে কি ব'লবে জানে?—ব'লবে—"বাপ। অমন ধারা "বজ্জাৎ হারামজাদ"ছেলে—পৃথিবীতে আর দুটী নেই!" কোনও ছেলেপুলে তার সঙ্গে খেল্‌তে চায়না। রাবণেশ্বর ধনমনির "খেলা" মানে,—পরের ছেলেকে মারধোর করা—আঁচড়েকাম্‌ড়ে দেওয়া! কালিন্দী ঠাকুরুণের তা'তেই কত আমোদ! কিন্তু বাড়ীতে অন্য কারুর ছেলেমেয়ে যদি রাবণেশ্বরের গায়ে হাতটি তোলে, তাহ'লেই সংসারে প্রলয়কাণ্ড বাঁধিয়ে দেন ঐ কালিন্দীসুন্দরী। চাকরবাকরেরা ছেলেকে কোলে নিতে চায়না। রাধাবল্লভ "ছেলে" নিয়ে বেড়াবার জন্যে যে ঝি-চাকরই রাখতে যান, তিন দিনের দিন তা'রা চাকুরি ছেড়ে পালায়। মায়ের সাম্‌নে ছেলের আব্দার হ'ল,—"বুড়ো বট্‌ঠাকুমার চুলের ঝুঁটি ধরে টান্‌বো।" বট্‌ঠাকুমাকে নীরবে তাই সহ্য ক'র্ত্তে হবে! ছেলে একটা ঠ্যাঙ্গা হাতে নিয়ে কান্নার সুর ধ'রলে, "পিসিমাকে মার্ব্ব!" পিসিমা গতিক খারাপ দেখে সেখান থেকে স'রে প'ড়ছিলেন। কালিন্দী ঠাকুরুণ হুম্‌কে উঠে ব'ললেন—"বলি—আক্কেলখানা তোমার কি রকম বলতো ঠাকুরঝি? কচি ছেলের হাতে দু'ঘা কঞ্চির বাড়ী খেলে তুমি কি একেবারে মরে যাবে নাকি?"

ঠাকুরঝি ব'ললেন—"ছেলে তোমার কচি হ'তে পারে বউ,—কিন্তু ঐ ঠ্যাঙ্গা গাছটা তো কচি নয়! "থানে অথানে" ধাঁ করে—উ—হু—হু—হু মাগো—মাগো—"বলেই তিনি নাকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে ব'সে প'ড়লেন; কারণ,—"ননদে-ভেজে" কথাবার্ত্তা হবার মাঝখানেই রাবণেশ্বরের সেই ঠ্যাঙ্গাগাছটি কচি হাতের দ্বারা পিসিমার নাকের ওপোর বেশ সজোরেই পড়ে গেছে!

রাধাবল্লভের ইচ্ছে হয় বটে মাঝে মাঝে,—ছেলেটিকে একটু "ধমক্ ধামক্" দেন। কিন্তু—গৃহিনী কালিন্দী বিদ্যমানে তাঁর ঘাড়ের ওপোর আর একটা মাথা থাকা কখনই সম্ভব নয়, যাতে ক'রে তিনি "ধনমণির" প্রতি তিলমাত্র বিরুদ্ধ ভাব দেখান।

ভট্‌চায্যি মশাই দূর থেকেই রাধাবল্লভকে উপদেশ দেন,—কারণ, কাছে আস্‌তে ভরসা হয়না! রাবণেশ্বর বাপধনটি একদিন চণ্ডীমণ্ডপে "সভাশুদ্ধ" লোকজনের সাম্‌নে তাঁর পরণের কাপড়খানি ধরে এমন টানাটানি করেছিল যে, ব্রাহ্মণ সবার সুমুখে অপ্রস্তুত হন্ আর কি! কোনও গতিকে পাঁচ জন ভদ্রলোকের সাহায্যে এবং কৌরবসভায় যিনি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ ক'রেছিলেন,—সেই লজ্জানিবারণ শ্রীহরিকে স্মরণ ক'রে তাঁর বস্ত্রহরণদায় হ'তে তিনি সে যাত্রা উদ্ধার পেয়েছিলেন! এ হেন নেপাল ভট্‌চায্যি মশাই পুকুরের "ও পাড়" থেকেই ব'ললেন,—"কিছু চিন্তা নেই বাবাজি! লালয়েৎ পঞ্চবর্ষাণি, দশবর্ষাণি তাড়য়েৎ! দশ বৎসরে প'ড়লে তবে পুত্রকে তাড়না কোরো,—তৎপূর্ব্বে নয়!"

রাবণেশ্বর বাপের কাঁধে চ'ড়ে (চাকরবাকরের সঙ্গে তো যাবেই না—) পাঠশালে"গোপাল মাইতি"গুরু মশায়ের কাছে "নিক্‌তে" যায়। রাধাবল্লভ-কালিন্দীর কাছে রাবণেশ্বর খোকাধন যেন ত্রয়োদশীর চাঁদ (পূর্ণিমের নয়,—কারণ, একচক্ষু হওয়ার দরুণ একটুখানি অঙ্গহানি হ'য়েছে কিনা)। কিন্তু পাঠ্‌শালের ছেলেরা দেখ্‌লে—রাবণেশ্বর নামটা যেমন "কিম্ভুত",—চেহারাটাও তার তেম্‌নি "কিমাকার!" "জোঁক্ কালো",—বেঁটে-খেঁটে চেহারা,—তার ওপোর একটা চক্ষু একেবারেই নেই! মাইতি গুরুমশাই বললেন—"পালজি! খোকার নামটা বদলে ফেলো! বিদ্যেশিক্ষে ক'র্লে,—দশ-জনের একজন হবে,—বড়লোক হবে,—"লাট্" সাহেবের

ট্যাক্‌শেলে (council'এ) হয়ত যেতে হবে "কালেক্ষে,— ও রকম লম্বাচওড়া নাম হ'লে বড় মুস্কিল বাঁধবে "পরেক্ষে" !

রাধাবল্লভ খানিক ভেবে চিন্তে গম্ভীরভাবে ব'ল্‌লেন,— "কথাটা নিন্দের বলনি মাইতির পো! তাহ'লে ওর নামটা লিখে নাও—"চৈতন্তচরণ পাল" !"

মাইতির পো সাদাসিধে লোক। গোলমাল "ঝক্কি-টক্কি" মোটেই ভালবাসেন না! . ভর্ত্তি কর্ব্বার সময় নাম লিখতে গিয়ে ব'ল্‌লেন আবার একটা বাড়্‌তি "য-ফলা" ওর ভেতর সাঁধ্‌ করালে কেন পাল্‌জি ? সোজাসুজি নাম রাখো— "চৈতন্‌ পাল।" রাধাবল্লভ একটু ব্যাজার হ'য়ে ব'ললে — "য-ফলা বাদ দেবে দাও,—আমার আপত্য নেই। কিন্তু "চরণ" আমি ছাড়বো না। বাপরে!" ব'লেই বোধ হয় ইষ্টদেব চৈতন্ত মহাপ্রভুকে স্মরণ ক'রে একটা পেন্নাম করে ফেল্‌লেন।

• • • • •

মাইতির পোর পাঠশাল্‌ উঠে যাবার উপক্রম হ'ল। চৈতন বাবাজি শুধু পাঠশালের পোড়োদের নয়, খোদ্‌ "গুরুমশায়কে" পর্য্যন্ত ভিটেছাড়া কর্ব্বার জোগাড় করে তুল্‌লেন্‌। ছেলেরা তো তার ভয়ে কেউ পাঠ্‌শালে আস্‌তেই চায়না!" গুরু-মশায়" একদিন দুপুর বেলা ছেঁড়া মাদুরে প'ড়ে নাসিকাগর্জ্জন ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে নিদ্রাসুখ উপভোগ ক'চ্ছেন,—চৈতন্‌ যাদুমণি এক মাল্‌সা গণ্‌গণে "গুলের আগুণ" গুরু-মশায়ের মুখের ওপোর ঢেলে দিয়ে একেবারে চোঁচা দৌড়,—কালিন্দী ঠাকরুণের কোলের ভেতর। ধড়্‌মড়িয়ে উঠে.—জ্বালার চোটে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে বেত হাতে ক'রে গুরুমশাই মাইতির পো তা'র পেছনে পেছনে ছুট্‌তে লাগলেন্‌, আর চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গ্রামবাসীদের ব'ল্‌তে লাগলেন্‌—"শালায় ঘরের শালা— তাঁতির ছেলে শালা—আমায় একেবারে বেগুণপোড়া ক'রে দিয়েছে! আজ শালাকে খুন ক'রে ফাঁসি যাব।"

মুখ পোড়ার যাতনার চোটে বেচারা "গুরুমশাইয়ের" বাস্তবিক তখন হ'সই নেই যে,—ছাত্র পুত্রের সমান,—তা'কে "শালা" সম্বোধন ক'র্ত্তে নেই।

বিস্তর টাকা জরিমানা আর উপর্য্যুপরি বড় রকম দৈনিক গোটাকতক সিধের ব্যবস্থা ক'রে পুত্রবৎসল রাধাবল্লভ মাইতির পোকে "সিধে" ক'রে ফেললেন্‌। চৈতন্‌ আবার পাঠশালে গিয়ে জেঁকে ব'স্‌লো।

চৈতন্‌ বাবাজিকে জব্দ ক'র্‌লে, মাঝের পাড়ার মুখুজ্যে-দের নিমাই। ধারাপাত পড়াতে পড়াতে গুরুমশাই নিমা-ইকে একদিন জিজ্ঞেস্‌ ক'র্‌লেন্‌—"নিমে! চারপোণে কত ?"

নিমাই ছোক্‌রা একটু 'ফক্কড়' ছিল। "গুরু মশায়" প্রশ্ন ক'র্ত্তেই—ছোঁড়া ফস্‌ ক'রে ব'ললে,—"চার পোণে গুরু মশায় ? চারপোণে—চৈতন্‌!"

গুরুমশাই এবং অন্যান্য "পোড়োরাও" নিমাইয়ের এ অদ্ভুত উত্তরটা কিছু বুঝতে পার্‌লে না। খানিকক্ষণ অবাক হয়ে নিমাইয়ের দিকে চেয়ে গুরুমশাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন— "কি ব'লছিস রে বেটা ? চার পোণে চৈতন্‌ কি ?" বত্রিশ পাটী দন্ত বের ক'রে নিমাই ব'ললে "আজ্ঞে গুরু-মশাই,—চার পোণে এক শ্লোক,—তা চৈতনেরও একচোক। তা'হলে চার পোণে চৈতন্‌ ব'ললে কি দোষ হয় ?"

পাঠশালের ছেলেরা নিমাইয়ের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলো। ভারি মজার কথা! "চার পোণে— চৈতন্‌! চার-পোণে চৈতন্‌!" ছেলেরা সমস্বরে ঐ কথা বলে আর হেসে গড়িয়ে পড়ে। গুরু-মশাই তাদের শাসন ক'র্ব্বেন কি,—নিজেই হাসি সাম্‌লাতে কষ্টবোধ ক'র্‌লেন। হাসি চাপ্‌বার জন্যে তিনি সেখান থেকে নীরবে উঠে গেলেন। চৈতন্‌ প্রথমে কথাটা তেমন বুঝ্‌তে পারেনি যে,—তাকেই ব্যঙ্গ করা হ'চ্ছে ছেলেদের সঙ্গে সেও প্রথম হেসে উঠেছিল; কিন্তু যখন বুঝলে,—নিমাইয়ের এই নবাবিষ্কৃত ব্যঙ্গোক্তিটী তাকেই নির্দ্দেশ ক'রে বলা হয়েছে, পাঠ্‌শালার তাবৎ ছেলেরা নিমাইয়ের সঙ্গে জোট্‌ বেঁধে তা'কে 'ক্ষেপাবার' মতলব ক'রেছে, তখন সে তা'র হাতীর মতন দেহটা নিয়ে একেবারে হুড়মুড়্‌ ক'রে গিয়ে প'ড়্‌লো— নিমাইয়ের ঘাড়ের ওপোর। নিমাইয়ের পাত্‌লা দেহ হ'লে কি হবে,—ছোক্‌রার গায়ে বেশ জোর আছে এবং মারামারি কর্ব্বার "প্যাচ্‌-ট্যাচ্‌" একটু আধটু সে বোঝে। সে তখুনি কায়দা করে "পাল্‌টা" মেরে একেবারে চৈতন্‌ বাবাজিকে

মেঝেতে চিৎ করে ফেলে—বোসলো তা'র বুকের ওপোর। ব'লেছি, গুরুমশাই সে সময়টা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না; তামাক টিকে আন্‌তে বাড়ীর ভেতর ঢুকেছিলেন। ছেলের দঙ্গল পরাজিত দুর্দ্ধর্ষ শত্রু চৈতন্‌কে নিমাইকর্ত্তৃক "পদ-দলিত—বিধ্বস্ত—ভূতলে পাতিত" দেখে মহানন্দে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে ব'লতে লাগলো—'চার-পোণে নাবেনা, হাতে রইল—কিচ্ছুনা। "চার-পোণে নাবেনা—হাতে রইল কিচ্ছুনা।" পাঠশালের ভেতর এ রকম ভীষণ গোলমাল শুনে, গুরুমশাই তাড়াতাড়ি বাইরে এসে নিমাইকে "চৈতনের" বুকের ওপোর থেকে নামিয়ে অনেক কষ্টে ছেলেদের ঠাণ্ডা ক'রলেন। হায়! চৈতন্ বাবাজি আজ পরাজিত! "বীর্য্যবান রথীশ্রেষ্ঠ" "রাধাবল্লভ-কালিন্দী-দুলাল", তন্তুবায়নন্দন, নিজগৃহমধ্যে অমিতবিক্রম সেই 'রাবণেশ্বর' ওরফে 'চৈতন্' পাল, আজ কিনা সমগ্র ছেলেদের সম্মুখে তুচ্ছ এক ব্রাহ্মণসন্তান 'নিমের' কাছে পরাজিত,—আর তা'রই রচিত এক নূতন মর্ম্মভেদী বাক্যবাণে মর্ম্মাহত—লজ্জিত অপদস্থ? অহো পুরুষস্য ভাগ্যং! গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে চৈতন্ বাবাজি উঠে বসলেন। ভালমানুষের মত—মুখটী নীচু করে ব'সে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে আরম্ভ ক'রলেন। হায়! এত অপমান তা'র এই সুদীর্ঘ দ্বাদশবর্ষব্যাপী জীবনে আর কখনো হয়নি। বাড়ী গিয়ে—বাপ মা পিসী মাসী, ঝি চাকর, বটঠাকুমা, রাঁধুনি বামুনি প্রভৃতি সকলকেই একধার থেকে খুন ক'রলে তবে এ দুঃখ নিবারণ হবে!

চৈতনের অবস্থা দেখে গুরুমশায়ের একটু দয়া হ'ল—সঙ্গে সঙ্গে একটু ভাবনাও হ'ল। হয়তো চৈতন্ কাল থেকে আর প'ড়তে আসবে না। মাইতির পো হঠাৎ রুদ্রাবতার হয়ে উঠে নিমাইকে ডেকে ব'ললেন—'নিমে! পাজী! বদমায়েস! পাঠশালা কি তোমার এয়ার্কি কর্ব্বার জ্যায়গা? এটা কি কুস্তির আখ্ড়া? আজ বিতিয়ে সবার পিঠের ছাল তুলি আয়তো।' ব'লেই মাটীতে সপাং সপাং করে বারকতক বেতের আওয়াজ করে নিমাইকে মারেন আর কি! নিমাই গতিক খারাপ দেখে লাফিয়ে একেবারে পাঠশালের সীমানা পার হ'য়ে "দে দৌড়!"

* * *

'দেয়কো-পিদিম' গাঁয়ে চৈতনের আর বেরুবার উপায় নেই। 'নীলকমল' যেমন 'বাছা হনুমান' শুন্‌লে যথার্থ ক্ষেপে উঠতো—'চৈতন্' তেম্নি 'চার পোণে' কথাটা শুন্‌লে একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়ে। গাঁয়ের ছেলেপুলেরা ভয়ানক দুষ্টু। ছেলেদের স্বভাবই এই, তাদের যে কোন কাজ ক'র্ত্তে যত বারণ করা যায়,—তা'রা ততই যেন সেই কাজটীতে বাড়াবাড়ি ক'র্ত্তে থাকে। কালিন্দী ঠাকরুণের কান্নাকাটিতে জ্বালাতন হ'য়ে শেষে রাধাবল্লভ গাঁয়ের সবাকার কাছে গিয়ে হাতে পায়ে ধ'রে অনুরোধ ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'রলেন—যেন তারা যে যার ছেলেপুলেদের শাসিয়ে দেয়,—ঐ 'চার-পোণে' কথাটা কেউ যেন চৈতনের সাম্‌নে কখনো উচ্চারণ না করে। রাধাবল্লভের কথা শুনে সকলেই হেসে উঠলো। কেউ কেউ ব'ললে 'আরে,—কি ক্ষেপার মত কথা কও পালজি? তোমার ছেলের আব্দারে কি আমাদের ছেলে-পুলেরা ধারাপাত পড়া বন্ধ ক'র্ব্বে নাকি?'

চৈতন্ পাঠশাল যাওয়া ছাড়লে কি হ'বে, মাইতির পো তো রাধাবল্লভকে ছাড়তে পারেন না! অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাইতির পো পালজিকে রাজী করালেন যে, দুপুরবেলা 'গুরুমশায়' তার বাড়ীতে গিয়ে চৈতন বাবাজীকে লেখাপড়া শেখাবে,—অবিশ্যি ধারাপাত বাদ দিয়ে। চৈতন কিন্তু কিছুতেই আর বই ছুঁতে চায়না। রাধাবল্লভ কালিন্দীকে বোঝালেন—, 'ছেলেটী তাঁদের সব দিকে যেমন বুদ্ধিমান হয়েছে,—এর ওপোর যদি তার একটু বিত্তেশিক্ষে হয়,—তাহ'লে দেখবে, কোম্পানী নিজে এসে ওকে দারোগা ক'রে দেবে।' দারোগা হবার সাধ চৈতনের নিজেরও যেমন,—তা'র গর্ভধারিণী কালিন্দী ঠাকরুণের তা'র চেয়েও বেশী। 'গুরুমশাই' এসে চৈতনকে পড়াতে লাগলেন। বিদ্যে 'বা' হ'ল,—তা দেখে স্বয়ং 'অবিদ্যেও' লজ্জা পেলেন।

ভট্‌চায্যি মশাই ব'ললেন—'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রমিত্র বদাচরেৎ।' চৈতনের যখন ষোলো বছর বয়স হ'ল, তখন তা'র বিয়ে না দিলে ছেলে 'বদ্' হয়ে যেতে পারে। চাদ্দিকে ঘটক ঘট্‌কী ছুট্‌লো। অবস্থা ভাল,—কিন্তু ছেলেটি

একচক্ষু ;—জাতের মধ্যে অবস্থাপন্ন যা'রা – তা'রা মেয়ে দিতে চাইলে না। ক'লকেতার খুব কাছাকাছি জ্যায়গা—বরানগর থেকে একটা সম্বন্ধ এলো। কনেদের অবস্থা তেমন সুবিধের নয়। কনের বাপের এককালে (যখন তাঁতের মাকু ঠেলতেন তখন) অবস্থা খুবই ভাল ছিল। এখন "ভদ্দরনোক" হ'য়ে—তাঁত ছেড়ে ইংরেজের চাকরি বাকরি ক'র্ত্তে আরম্ভ ক'রে,—ছ দশপাতা "ইন্‌জিরি পড়ে" আর চব্বিশ ঘণ্টা "সিগরেট" টেনে "সভ্য" হ'য়ে আর্থিক অবস্থা আজকাল 'অন্ত ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ'! বারো তেরো বছরের মেয়ে,— পয়সা অভাবে বিয়ে হ'চ্ছেনা।

হোক পাত্রের একচোখ কাণা। পয়সা আছে তো? হ'লেই বা পাড়াগেঁয়ে? রাধাবল্লভের পুত্রবধূ হ'লে মেয়ে খুব সুখে থাকবে, বন্ধুবান্ধব সবাই এইটে বেশ ক'রে নব গোপাল দত্তকে (মেয়ের বাপকে) বুঝিয়ে দিলে। নব-গোপাল একজন প্রতিবেশী বন্ধুর সঙ্গে "দেখ্‌কো-পিদিম গাঁয়ে একদিন "পাত্তর" দেখতে হাজীর হ'লেন।

পাত্রের বাপের বাড়ীঘর জমীজমা ইত্যাদি দেখে আর গাঁয়ের লোকের মুখে তাঁ'র অবস্থার কথা শুনে তুখোড় নব-গোপাল স্থির ক'র্‌লেন —মেয়ের বিয়ে এইখানে দিতেই হবে। "আকারসদৃশঃ প্রজ্ঞঃ" পণ্ডিতেরা স্পষ্টই ব'লেছেন। সুতরাং 'ঘণ্টু' নবগোপাল —ভাবি জামাতার চেহারাটা দেখে বেশ বুঝে নিলেন, – "ছেলেটা চৈতন্‌ ত সাক্ষাৎ চৈতন্‌।" নবগোপাল যেন দিব্যচক্ষে এই জামাতার দ্বারা নিজের অদূর ভবিষ্যতে কতখানি আর্থিক সুবিধে হবে,—স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

রাধাবল্লভের বাগানবাড়ীতে একটা সাজানো গোজানো" লম্বাচওড়া বসবার ঘর আছে। সবন্ধু নব গোপাল দত্ত সেই ঘরে 'পাত্তর' দেখতে ব'সলেন। রাধা-বল্লভের 'আত্মকুটুম' দু দশজন এসে গামছা গায়ে দিয়ে, ধুলো পা নিয়ে পরিষ্কার ধব্‌ধবে বিছানায় ব'সে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁদের 'পাড়া গেঁয়েত্ব" প্রমাণ করিয়ে দিলেন। স্বয়ং "গুরুমশাই" সেখানে উপস্থিত রইলেন। কি জানি—ছাত্রটী যদি কোন রকমে ভাবিশ্বশুরের কাছে বিদ্যে "হরবুটে" ফেলে,—তাহ'লে রাধাবল্লভের কাছে তাঁর পাওনাগণ্ডা সব মাটী। পাত্তর দেখতে এসে, তা'র বিদ্যেপরীক্ষে করা, তখনকার দিনে একটা বিয়ের প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ ছিল। নবগোপালের বন্ধু 'পাত্তরটীকে' জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেন "বল দিকি বাপু 'পঙ্কজ' মানে কি?"

বাপের জন্মে চৈতন্‌ বাবাজি 'পঙ্কজ' কথা কখনো কাণেও শোনেনি। শ্বশুরবাড়ীর 'লোকের' মুখে এই মারাত্মক প্রশ্নটা শুনে তা'র একেবারে যেন গলদঘর্ম্ম হবার উপক্রম। একবার মস্ত ঢোঁক গিলে ব'ললে – 'পঙ্কজ মানে?' ব'লেই চাদ্দিক চাইতে আরম্ভ ক'র্‌লে এবং বিড়বিড় ক'রে কি বকতে লাগলো। রাধাবল্লভ পুত্রকে খুব সাহস দিয়ে ব'লতে সুরু ক'র্‌লেন 'বল, বল—বেশ ভেবে চিন্তে বল ভয় কি? তুমি তো অনেক শক্ত শক্ত কথার মানে জানো। বল!" বাপের দিকে চেয়ে আবার সেই রকম ঢোঁক গিলে চৈতন্‌ ব'ললে—"পঙ্কজ মানে?"

মাইতির পো এইবার ব'লে উঠলেন—"এইতো সেদিন ব'ললে—'পঙ্কজ' কথার অর্থ কি? সেই যে—মনে নেই?' ব'লেই সেই ঘরের সামনের বাগানে যে বড় পুকুরটা ছিল,—(তা'তে বিস্তর পদ্মফুল ফুটেছিল)—ছাত্রকে আঙুল দিয়ে ইসারা ক'রে চোক ঠেরে তাই দেখাতে আরম্ভ ক'রলেন!

ছাত্রটি একেবারে যাকে বলে—"চতুরচূড়ামণি চালাক-দাস"! চৈতন্‌ বুঝলে বটে—'পঙ্কজ' কথার মানে যা,—তা' ঠিক ঐ পুকুরের মধ্যেই আছে। কপালদোষে সে নিজেই বুঝতে পাচ্ছেনা। একবার ক'রে গুরু মশায়ের মুখের পানে চায়—একবার পুকুরের দিকে দেখে,—আর ঢোক গিলে গিলে বলে,—'পঙ্কজ মানে?' রাধাবল্লভ বিপন্ন পুত্রকে উৎসাহ দিয়ে আবার ব'ললেন—"বল,—ভয় কি বাবা—বল।"

চৈতন্‌ ঝড়াক্‌ করে ব'ললে—'পঙ্কজ' মানে "ঘাটের রানা।"

রাধাবল্লভ। "হ্যাঁ—হ্যাঁ—কাছাকাছি বটে – বল বাবা —কাছাকাছি গেছ, আর একটু – নাবো,– নাবো—"

গুরু-মশাই দাঁত খিঁচিয়ে—চোক্‌ নেড়ে – পুকুরের পদ্ম-ফুলগুলো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ইসারায় জানিয়ে দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা ক'র্ত্তে লাগলেন!

"পাত্র ছাত্রটি" ব'ললে 'না—না,- পঙ্কজ মানে "গেঁড়ি গুগ্‌লি!"

রাধাবল্লভ দ্বিগুণ উৎসাহে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন—"রগ ঘেঁসে গেছ বাবা,—এইবার একটু উঁচুতে—একটু উঁচুতে! বল—বল—বেশ মাথা ঠাণ্ডা ক'রে বল—"

পুকুরপাড়ে একটা শুক্‌নো পোঁপে-মরা গাব্‌ গাছ ছিল। চৈতন ভাবলে—"বাবা বোধ হয়, সেটাকে ব'ল্‌তে ব'ল্‌ছে!" নিজের ভুল শুধ্‌রে তখুনি আবার ব'ল্‌লে—"পঙ্কজ মানে "গাব গাছের গুঁড়ি!"

রাধাবল্লভ হতাশ হ'য়ে ব'ল্‌লে, "দূর বেটা হেব্‌লো! জলে বেশ ছিলি—আবার ডাঙ্গায় উঠ্‌লি কেন?"

ছাত্রের মান, নিজের মান, পাল্‌জির মান, গাঁয়ের মান, পাঠশালার মান, আর রাধাবল্লভের কাছে নিজের পসার,—সবই একসঙ্গে যায় দেখে ক্রমে মাইতির পো দস্তুরমত মাথা চেলে—হাত নেড়ে ইসারা আরম্ভ ক'রলেন।

অতি কষ্টে হাসি চেপে নবগোপাল এবং তাঁর প্রশ্নকারী বন্ধুটি ব'ল্‌লেন—"থাক্‌—থাক্‌—ছেলেমানুষকে আর কষ্ট দিয়ে কাজ নেই!"

মাইতির পো খুব চ'ড়ে উঠে ব'ল্‌লেন "কাজ নেই কি? এত পড়ালুম, শব্দকল্পোদ্রুম্‌ পর্য্যন্ত মুখস্থ করালুম,—"পঙ্কজ" মানে ব'ল্‌বেনা কি? বল বাবা—চৈতন্‌—বল—" ব'লেই আবার সেই রকম ইঙ্গিত ক'রে পুকুরের দিকটা দেখিয়ে দিলেন:

চৈতন বাবাজি গোবর-ভরা বিশুদ্ধ মাথাটি খেলিয়ে বুঝ্‌লে,—"পঙ্কজ" জিনিষটা পুকুরের এ ধারে নেই,—জলেও নেই। তবে সেটা নিশ্চয়ই পুকুরের ও পাড়ে আছে। আর এমন ভাবে আছে,—যাতে সেটা এ ঘর থেকে সকলেই বেশ ভালরকম দেখ্‌তে পাচ্ছে। বুদ্ধিমান তাঁতির পো সেই দিকে বেশ ভাল ক'রে চক্ষু মেলে চেয়ে দেখতে লাগলো। বিবেচনা করে দেখ্‌লে এবং স্পষ্ট বুঝলে,—"ওপারে সহজে নজর কর্‌বার মধ্যে—তাদের ধানজমীতে লাঙ্গল দেবার কালো বলদটা পুকুরের পাড়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘাস খাচ্ছে।" চৈতন স্থির সিদ্ধান্ত ক'র্‌লে—এটা শুদ্ধ কথায় "পঙ্কজ" না হয়ে আর যায়না। মহানন্দে এক গাল হাসি হেসে—হ্যাত্‌লাধরা বত্রিশ পাটি দন্ত বের ক'রে ব'ল্‌লে—"হেঁ—হেঁ—"পঙ্কজ" মানে মনে পড়েছে! পঙ্কজ মানে—"ভুতি এঁড়ে"!

ঘরশুদ্ধ্‌ লোক (রাধাবল্লভ আর "গুরু-মশাই" ছাড়া) সকলে হেসে ঢলে কে কা'র গায়ে পড়ে! মাইতির পো লোকদেখানো একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে শাস্ত্র আওড়ালেন—

"অশ্রেতং বাল্যহাসিতং"!

• • •

চতুর নবগোপাল ঐ গাঁয়ে—ঐ পাত্রে—ঐ ঘরেই কন্যা সম্প্রদান ক'রলেন! রাধাবল্লভ বিস্তর খরচপাতি ক'রে—উপ্‌রো উপ্‌রি দশদিন "বজ্জি" করে, খুব ঘটা ক'রে ছেলের বিয়ে দিলেন। চৈতন আর তার মায়ের আবদারে বরযাত্র দশ বিশজন "আত্মকুটুম" ছাড়া কা'কেও নিয়ে যাওয়া হ'ল না। বিশেষতঃ গাঁয়ের ছেলেদের কা'কেও তো নয়ই! কি জানি,—কনের বাড়ীতে কোনো বদ্‌মায়েস্‌ ছোক্‌রা যদি —"চার পোণে—" ব'লে একবার সেই বকেয়া ধারাপাতটা আওড়ে ফেলে—তাহ'লে চৈতন্‌ বাপকে শাসিয়ে রেখেছে—, "কোন্‌ শালা টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে ক'র্ত্তে বাড়ীর ভেতর ঢুকবে! হুঁ।"

আট দশ দিন ধ'রে 'বজ্জি',—বড় সোজা ব্যাপার নয়—গাঁশুদ্ধ্‌ 'ভারিক্কি'লোকেরা যে যার ছেলেদের ক'ড়কে রেখেছে,—কেউ যদি রাধাবল্লভের ছেলেকে "চার পোণে" ব'লে কোন রকমে ক্ষেপায়,—তা'হ'লে তার মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ছাড়বে!

নবগোপালের মেয়েটী "পাঁচ্‌-পাঁচির" ভেতোর! সুন্দরী না হ'লেও, নেহাৎ কুৎসিতাও নয়। কনের নাম 'তিলোত্তমা'! কিন্তু চৈতন্‌ কিছুতেই এ নামটা তেমন দোরোস্তো ক'র্ত্তে না পেরে হঠাৎ ফুলশয্যের রাত্রে আলাপ পরিচয়ের পর ডেকে ফেল্‌লে 'তেল্‌ তম্‌-তমা'! কনেটি খাস সহরে না হোক্‌, 'আধা সহুরে' তো বটে! "বরানগর" ক'ল্‌কেতা থেকে কতদূর বা! তার ওপোর তিলোত্তমা ইস্কুলে পড়েছে;—ইংরিজি শিখেছে,—ফাষ্ট্‌ বুকের অর্দ্ধেকের ওপোর প্রায় সাঙ্গ ক'রে ফেলেছে! "আধা-সহুরে" যখন,

তখন খাস "সহরে" মেয়ের চেয়ে চার গুণ "সভ্যা-ভব্যা-নব্যা" তো হবেই! এটা স্বাভাবিক, বিশেষতঃ আজকালকার দিনে। খাস সহরের গেরোস্তো ঘরের মেয়েরা,—প্রায় দেখা যায়,—"চালিয়াৎ" বা "ফ্যাশানবাজ" যত না হোক্—সহরের আশেপাশের মেয়েরা "চালে" বা "ফ্যাশানে" বিশেষ রকম দোরোস্তো! এ সব বিষয়ে তারা সহরের শুধু হাওটা পেয়েই "সহুরে মেয়েদের" ওপোর টেক্কা মেরে যায়! তার একটা মুখ্য কারণ,—'ময়রাদের সন্দেশে তেমন রুচি থাকে না!' সহুরে মেয়েরা দিনরাত্তির 'চাল' এবং 'ফ্যাশানের' মধ্যে ডুবে থাকার দরুণ,—এ গুলোতে বোধ হয় তাদের স্পৃহা বা আকাঙ্ক্ষা থাকেনা। আর যাঁরা এ সব থেকে একটু দূরে থাকে, অথচ এর মন-মজানো,—প্রাণ-ভোলানো গন্ধটুকু পায়,—তা'রা একেবারে এ সবের জন্যে লালায়িত হয়ে পড়ে। তাই বলছিলুম,—এ ব্যাপারটা স্বাভাবিক।

"সদাই ফিট্-ফাট্", "পাউডার-মাখা", "নভেল-পড়া", -"থিয়েটার-দেখা", "পড়-পড়া" (খুড়ি) "কবিতারসরসিকা", "আধা-সহুরে" "বিলাস-প্রিয়া," কিশোরী তিলোত্তমা,—"দেরেকো-পিদিম-নিবাসী", "কাব্যময় পঙ্কজের"—"স্মৃতি এঁড়ে-অর্থকারী"—"চেহারায় বিশ্রী—বিদ্যেতে একেবারে অতি 'ঝিজ্ঝিরি',—'অক্ষ পাড়াগেঁয়ে' বরটীর মুখে নিজের মনোমোহিনী "তিলোত্তমা" নামটীর "তেল্-তম্-তমা" বদনামে একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বরকে একটি সরল ধাক্কা এমন ভাবে মারলেন যে, চৈতন্ বাবাজি দুম্ ক'রে পালঙ্ক থেকে একেবারে মেঝেতে পড়ে গেল! কনে বৌয়ের সোহাগে, খাট থেকে পড়ে গিয়েই আনন্দে চৈতন্ বাবাজির কি হাসির চোট! মনে পড়ে গেল, বটঠাকুমা ব'লতো—"এতো বাবা মারেনি,—এতো মা মারেনি! বৌ মেরেছে তিনটে লাথি কিছু লাগেনি!"

আর বোধ হয় ব'লতে হবে না! বোঝবারও কারুর তেমন কষ্ট হবেনা,—যে, মা মহিষমর্দিনী তিলোত্তমারূপে ধরায় অবতীর্ণা হ'য়ে পাতালের সংসারের সেই একচক্ষুহীন মহিষাসুরকে একেবারে পদতলে দলিত করে ফেলেছেন? তবু "চৈতন্" বাবাজি দলিত হ'লেন না, সেই সঙ্গে [illegible]

"কালিন্দী ঠাকুরুণও" একেবারে "বিষহীনা ভুজঙ্গিনীসম!" কনে-বৌয়ের কর্দিনের মধ্যে এমনি দাপট দেখা গেল,—যে, সংসারে কারুর মুখে 'রা' সরেনা! মেয়েপুরুষ সকলেই অলক্ষ্যে বলে,—"আহা মা! কলিতে তুমিই সত্য—তুমিই জাগ্রত!"

তিলোত্তমা তো খড়িবাজ নবগোপাল দত্তেরই মেয়ে! অনেক রকমে কনে-বৌটী খতিয়ে দেখ্লে—"বরের চেহারায়, মূর্খতায় এবং একচোখে যতটা লোকসান, তা'র চেয়ে ঢের বেশী লাভ,এই জানোয়ারটীকে নিজের তাঁবেদার করে তুলিয়ে রাখায়!"

দিন আষ্টেক "দেরেকো-পিদিম" গাঁয়ে শশুরঘর কর্বার ভেতরই "তিলোত্তমা" চৈতন্ বাবাজিকে "মানুষের মত" (পুরো মানুষ এত অল্পদিনে কখনো হওয়া সম্ভব নয়, সেই জন্যে বলি,—আনকটা মানুষের মত) ক'রে ফেললে! চৈতন্ একেবারে যেন "চৈতন্য-হারা!" বৌকে ছেড়ে সে তো আর একদণ্ড থাকতে পারবে না! বৌ চলে গেলে—তার যে প্রাণ 'বেইরে' যাবে! ওরে বাসরে! বৌকে যেতে দেওয়া হ'তেই পারেনা!

বটঠাকুমাকে একদিন চৈতন্ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা ক'র্লে "আচ্ছা বল দিকি বট্-বুড়ী! বৌকে খুসী করি কি রকম ক'রে?"

"বট্-বুড়ী (এই নামেই চৈতন্ বট্ঠাকুমাকে সম্বোধন ক'র্তেন) সংসারের ভেতর আজকাল (বিয়ের পরে) চৈতনের একটু সুনজরে পড়েছিলেন; তার কারণ,—তিনি'বরকে' যখন-তখন ধরে এনে কনের কাছে বসিয়ে দিয়ে যান,—যে কাব্যটা চৈতনের সম্পূর্ণ ইচ্ছে থাকলেও 'একচক্ষুর লজ্জায়' পেরে উঠ্তো না।

বটঠাকুমা ব'ল্লে—"কেন? বৌয়ের সঙ্গে কি তোর ভাব হয়নি?"

চৈতন্ হেসে চিহে ব'ল্লে—"হ্যাঁ—ভাব খুব হ'য়েছে! প্যাঁচা ঝিমতে বলে, পায়ে 'বাগাড়' ক'র্তে বলে। কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে দিতে বলে—"

বটঠাকুমা অতি কষ্টে হাসি চেপে ব'ল্লে—"এই তো

বেশ ভাব হ'য়েছে ! এত কাজ যখন তোকে ক'র্ত্তে ফরমাজ করে, তখন খুসী হয়নি তুই বুঝ্লি কিসে ?"

খুব দুঃখের সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চৈতন্ ব'ললে "খুসী যদি হবে—তবে আমাকে দেখলে বলে কেন—"সরে যাও কাছ থেকে !" আমাকে বলে "পাড়াগেঁয়ে ভূত !" আমার গাল দিয়ে বলে "ন্যাজ্কাটা হনুমান !"

বটঠাকুমা খুব যেন আহ্লাদ ক'রে ব'ল্লেন, "এ্যাঁ বলিস্ কি দাদা ? তোর সঙ্গে ঠাট্টা-বোটকেরা করে ? বা রে তোর কপাল ! খুব তো রসিক "রস-করা" বৌ পেয়েছিস তুই ভাই !"

চৈতন্ সেই রকম মুখভার করে ব'ললে—"আবার আমায় বলে—গোমড়ামুখো !"

বট। "তা তো ব'ল্বেই ! সে অমন রসিকা, তার সঙ্গে রসিকতা ফষ্টিনষ্টি না ক'র্লে—সহুরে মেয়ে সে,—তোর ওপোর চ'টবে না ?"

অবাক হ'য়ে খানিকক্ষণ বট্ঠাকুমার মুখের পানে চেয়ে চৈতন্ ব'ললে—"রস-কতা কি দিয়ে করে বট্-বুড়ী ? খেজুর রস, না, তালের রস ?"

বট আহা মা—মা সে সব রসের কথা ! সে কি খাবার জিনিষ রে পাগলা ? বৌয়ের কাছে কি গোমড়া মুখো হ'য়ে থাকতে হয় ? বৌয়ের সঙ্গে হাসি ঠাট্টা বোটকেরা ক'র্বি ! ফষ্টি-নষ্টি ক'র্বি ! হয় তো বা আদর করে, দাড়ীতে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলি "বৌ ! আমি তোর কে হই ?" বৌ যেই ব'লবে—তুমি আমার বর হও !" তুই হেসে হেসে ব'লবি "দূর,—আমি তোর নন্দাই !"

চৈতন্ বাবাজির মুখে হাসি আর ধরে না ! "বট্-বুড়ীর" মুখে এই সব রসের কথা যত শোনে,—আহ্লাদে প্রাণটা যেন তার ততই নেচে নেচে উঠতে থাকে ! বৌকে খুসী কর্বার জন্যে বট্ঠাকুমার কাছে রসিকতার কত নমুনা দেখালে ! বটঠাকুমা প্রাণের দায়ে যতই তার তারিপ করুক,—সে সবগুলো এমন বেয়াড়া—বিশ্রী—বেতালা অর্থ শূন্য যে, খুসী হওয়া চুলোয় যাক্—যে শোনে তা'র আপাদ মস্তক জলে যায় ! তিলোত্তমারও স্বামীর (রসিকতার জ্বালায়) প্রাণ ওষ্ঠাগত হবার উপক্রম।

দুপুর বেলা দশ পনেরো জন সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে দোতলার দালানে ব'সে তিলোত্তমা কথাবার্ত্তা কইছে,—এমন সময়, ষণ্ডের মতন চৈতন্ বাবাজি সেখানে এসে উপস্থিত। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে বাবাজির ভোল ফিরে গেছে। লজ্জা-সরম বোলে কোনও জিনিষ তো সে জীবনে কখনো জানেই না ! বি'য়ে ক'রে কনে এনে কেমন যেন দু'একদিন, একটা সঙ্কোচের ভাব মনে এসে পড়েছিল ! ঈশ্বরেচ্ছায় সেটুকুও দেশ ছেড়ে পালিয়েছে ! বাপ মার সামনেই বৌকে চীৎকার ক'রে ডাকে। মাকে ধম্কে জিজ্ঞাসা ক'রে,—'ভাল ক্ষিরের ছাঁচ্টা বৌকে না দিয়ে বাবাকে যে খেতে দিলে ?' থাক, মাত্র পাঁচ সাত দিনেই এই হাল দাঁড়িয়েছে তারপর যে কথা ব'ল-ছিলুম ! একদিন হঠাৎ দুপুরবেলা চৈতন্ বাবাজি দেখ্লেন, 'বৌ" তেল্তমতমা না—না 'তিল তামা"—দূর হোক্ গে ছাই,—তেলকুতমাক"—সখীদের সঙ্গে ব'সে ব'সে খুব হাসি রং তামাসা "রস-কথা" ক'চ্ছে ! এ ফুর্ত্তিতে বাবাজি যোগ-দান না ক'রে কি থাকতে পারেন ? হঠাৎ এসে বৌয়ের খোঁপাটা একটু টেনে মাথার আড়ঘোমটাটাও জোর ক'রে খুলে অট্টহাসি হেসে ব'ললে, "বল দিকি বৌ,—ওটা কি ?" ব'লেই বাগানের দিকে নারকোল গাছ দেখিয়ে দিলে গাছের ওপোর একটা বীর হনুমান ব'সেছিল। বৌ নির্ব্বিঘ্নে ব'ললে —"কি আবার ? মরে যাই ! ওকি আমাদের দেশে নেই নাকি যে, আমাকে একটা নতুন জিনিষ দেখাচ্ছ ?"

চৈতন্ তবু অট্ট হেসে "রস-কথা" ক'য়ে ব'ল্তে লাগ্লো —"বল না বৌ—ওটা কি নার্কোল গাছে ব'সে রয়েছে ?"

সখীরাও মজা দেখবার জন্যে "বৌ-কে" পীড়াপীড়ি ক'রে ব'ললে—"আহা—বল না বৌ—বাবুর যখন শোনবার সাধ হয়েছে, শ্রীমুখ দিয়ে তুমি না হয় একবার ব'ললে !"

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে তিলোত্তমা বরের মুখের দিকে চেয়ে ব'ললে,—"ওটা কি আবার ? ওটা হনুমান !"

হাসির মাত্রাটা আরও একটু বিকট রকম বাড়িয়ে—চৈতন্ বাবাজি ব'লে উঠলেন—"হু-ও বৌ ! ব'ল্তে পারলে না ! আরে—ওটা যে তোর শ্বশুর !"

গোবখাদ্যের সমীর বদল হেকে একেবারে "কুটোকুটি"! চৈতন্ ভাব্লে—ভারি "রস-কথা" ব'লেছি! সে এক রকম নাচতে নাচতেই মহানন্দে অট্টহাস্যে "দেবকো-পিদিম" গাঁ-টাকে যেন কাটিয়ে দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল! কবি ঠিক ব'লেছেন—"অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্—শিরসি মা লিখ!"

• • • •

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল—কথাটা খুব পুরোণো বটে,—কিন্তু খুব সত্য! আজ যা' দেখ্তে পাই,—কাল তা'র পরিবর্ত্তন ঘটে! চৈতন্ বাবাজির জীবনে বিশ বৎসরের মধ্যে যে ভীষণ ভয়াবহ পরিবর্ত্তন ঘটেছে,—এতে কারুর বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই! চালাক-চতুর বুদ্ধিমান ছেলে-টিকে আরও একটু বুদ্ধিমান কর্ব্বার জন্যে আর সেই সঙ্গে "ইন্জিরিতে" বেশ একটু "লায়েক" কর্ব্বার জন্যে রাধা বল্লভ পাল মশাই বৈবাহিক নবগোপাল দত্তের পরামর্শে চৈতন বাবাজীকে শ্বশুরশাশুড়ী এবং "বৌ-ঠাকরুণের" তত্ত্বাবধানে খাস ক'লকেতার সহরে বাড়ীভাড়া ক'রে রাখবার ব্যবস্থা ক'রলেন। ক'লকেতায় এসে বাবাজি আর দেশে ফিরতে চান না! তিলোত্তমা বলে—"মাগো! ও দেশে ভদ্রলোকে বাস করে? ছ্যা—দেশের নামটাও যেমন বিশ্রী,—মানুষগুলোও তার চেয়ে "হতকুচ্ছিত"! দেবকো-পিদিম? এ রকম উদ্ভট নামও তো কখনো শুনিনি!" "ইংরিজি-পড়া" সহুরে বাবু "চৈতন্ পাল" ব'ললে—"ঠিক ব'লেছ! ঝাঁটা মারি গাঁয়ের মাথায়!"

আর একটা বিশেষ কারণ—যার জন্যে দেশের এবং দেশের লোকজনের ওপোর চৈতন বিশেষ রকম চটে গেল,—সেটা হ'চ্ছে এই! হঠাৎ একদিন তিলোত্তমা স্বামীকে জিজ্ঞাসা ক'রে বোস্লো—"হ্যাঁগা—বিমল ঠাকুরপো—(চৈতনের পিসতুতো ভাই—) আমাকে ব'ল্লে তোমাকে জিজ্ঞেসা ক'র্ত্তে—"চার-পোণে কত?"

শুনেই রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে চৈতন্ বাবাড়ীতে এসে একটা চেলাকাঠের বাড়ী বিমলের মাথায় সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিলে! তা'তে বিমল বেচারার একেবারে জীবনসংশয় হ'য়ে উঠলো! মাথা ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড! প্রবল প্রহার খেয়ে দেড়মাস শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিল। গ্রামে একেবারে হুলস্থূল কাণ্ড! থানাপুলীশ হবার জোগাড়! অনেক পয়সা খরচ ক'রে রাধাবল্লভ বেচারা সে দায় থেকে সপুত্র রক্ষা পেলেন। বিয়ের পর বছর পাঁচেক বাদে যখন রাধাবল্লভ-কালিন্দী বংশরক্ষাবিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের দেহরক্ষা ক'রলেন,—তখন থেকে নবগোপাল দত্তের পারিবারিক সুখটা যেন বিশেষ রকমে বেড়ে উঠলো। সপুত্রপরিবারে নবগোপাল "জামাই বাবুকে" রক্ষণাবেক্ষণ কর্ব্বার জন্যে তাঁর Bona fide guardian হিসেবে বরানগরে নিজের ভিটে ছেড়ে ক'লকেতার সহরে বাস করে নিজেও বাবুগিরি সুরু ক'রলেন—জামাই বাবুটিকেও মস্ত বাবু তৈরি করে তুল্লেন। বিষয়আশয় দেবকো-পিদিম গাঁয়ে যা ছিল, জামাই বাবুর মঙ্গলের জন্যে নবগোপাল দত্ত মশাই মধ্যে মধ্যে "দেবকো পিদিম" দেখতে শুনতে শুভাগমন করেন, ক'লকেতার এটর্ণিদের সঙ্গে নিরিবিলী পরামর্শ আঁটেন,—বিষয় বাড়াবার জন্যে—নগদ টাকা বাড়াবার জন্যে,—বাবাজিকে মাঝে মাঝে একটা কি কাগজে "সই" ক'র্ত্তে বলেন,—আর রাত্রে বৈঠক-খানায় ইয়ারবন্ধু নিয়ে হুইস্কি টানেন। চৈতন বাবাজি, গাড়ী ঘোড়া চড়েন, বৌ নিয়ে ছেলেপুলে নিয়ে (পাঁচ সাত বছরের মধ্যে মা ষষ্ঠীর কৃপায় বাবাজির গুটী দুই ছেলে আর একটী মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাদের নিয়ে)—"সভ্য-সভ্য" বাবুবিবি সেজে বৈকালে হাওয়া খেতে বেরোন—থিয়েটার বায়স্কোপ দেখেন,—রোজই প্রায় "হক্ সাহেবের বাজারে" সৌখীন মাল সওদা ক'রে বাড়ী আসেন। কোনও গতিকে চৈতন ম্যাট্রিকুলেশান্ একজামিনটা (আশু মুখুজ্যে মহাশয়ের কৃপায়) পাশ ক'রে ফেললেন! "কালেজে" ঢুকে বাবাজি একেবারে পুরোদস্তুর সাহেব ব'নে গেলেন! হ্যাট্ কোট্ ছাড়া পরেন না,—ইংরিজি ছাড়া কথা কন্ না—হোটেল ছাড়া "খানা" খান না!

উন্নতিটা এতদূর হ'ল যে, লোকের কাছে নিজের জাত পর্য্যন্ত ভাঁড়াতে সুরু ক'রলেন! সবাইকে বলেন—"আমরা পালরাজার বংশ, সুতো মার্কা ক্ষত্রিয়!" বাবাজির আর একটা মহৎ গুণ দেখা গেল,—ভুলেও তিনি সত্যি কথা বলেন

না ! প্রতি কথায় মিথ্যা কথা তাঁকে বলতেই হবে ! কারণ নেই;—অকারণ নেই,—মিথ্যে কথাটা না কইলে তাঁর যেন "ভাত হজম হয় না !" লোককে বোলতেন - "ক'লকেতায় যখন বাবভাল্লুক চলাফেরা ক'র্ত্ত—তখন নবাব সেরাজ-উদ্দৌলা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে এই ক'লকেতার জঙ্গল সাফ করিয়ে আমার প্রপিতামহের পিতামহকে এইখানে বসতি করান ! ঐযে এখন writers' bulding (রাইটার্স বিলডিংটা) দেখছেন,—ঐটে ছিল আমাদের পূর্ব্বপুরুষের ভিটে !"

আর একটা চমৎকার অভ্যেস ছিল তাঁর,—যত বড়লোক গাড়ী চড়ে রাস্তা দিয়ে যেতো, অমি তার আরোহীকে নির্দ্দেশ ক'রে বন্ধুদের বোলতেন—"ঐ আমার বড় মামা গেলেন"—"ঐ আমার পিসেমশাই আমাকে নিতে আমাদের বাড়ীতে চলেছেন !" তা—সে গাড়ীর ভেতর মুসলমানই থাক,—কি ইংরেজই থাক,—কি ইহুদীই থাক !

হঠাৎ চৈত্তনের বন্ধু-বিরাগ জেগে উঠলো যেদিন হঠাৎ তর্কচ্ছলে উদীয়মান কবি সত্যভূষণ রায় ব'লে ফেল্‌লে—

" চার পোপে লোকগুলো
কখনো হয়না ভালো ।"

ব্যস—আর যায় কোথা ? চৈতনবাবাজি সত্যভূষণকে হত্যা করেন আর কি ! কিন্তু এতো তার 'দেয়কো-পিদিম' গাঁ নয় ! এ একেবারে খাস্ ক'লকেতা ! এখানে তো বাছা ধনের বীরত্ব খাটবে না ! সত্যভূষণকে দু'একটা গালমন্দ ক'র্ত্তেই তার বন্ধুরা তখুনি চৈতন বাবাজির গলাটি ধরে সেখান থেকে একেবারে বড় রাস্তা পার করে দিলে !

চৈতন বাবাজির আর একটী মহৎ গুণ,—তিনি জীবনে কখনো কোনও লোককে ভাল ব'লতে কিম্বা তার সুখ্যাতি ক'র্ত্তে চান না ! পৃথিবীতে সবাই 'বদ-লোক'—সবাই মুর্খ' সবাই 'চোর-জোচ্চোর,—'কেউ কিছু না !' তিনি নিজেই সর্ব্বগুণের গুণনিধি,—যাকে বলে 'হাম বড়া' ! বনিবনাও কারও সঙ্গে হয়না ! ইদানীং শ্বশুরঠাকুরটী এমন কি স্ত্রীর সঙ্গে পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে বচসা হয় ! কিন্তু সবার কাছেই অপদস্থ হন পদে পদে !

* * * *

দুর্দ্দশার চরম ! হঠাৎ নবগোপাল দত্ত (শ্বশুর মশাই) দেহত্যাগ ক'রলেন ! চৈতন বাবাজির ঘাড়ে যেন চার চাল ভেঙে পোড়লো ! উকীলবাড়ী কাগজপত্র নিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বাবাজি বুঝলেন,—পূজনীয় শ্বশুর মশাইটী তাঁকে একেবারে "আঁটি-সার" ক'রে দিয়েছেন পৈতৃক বিষয়আশয়, নগদ টাকাকড়ী—মায় তার স্ত্রী তিলোত্তমার পনেরো আনা গহনাগাঁটি পর্য্যন্ত সব "উবে" গেছে ;—তার ওপোর নিজের মাথার ওপোর মস্ত দেনা চাপানো,—"দেয়কো-পিদিম" গাঁয়ের অবশিষ্ট নিজস্ব পৈতৃক ভিটেখানি পর্য্যন্ত সেই নিমাই মুখুয্যের কাছে দু'হাজার টাকায় বন্ধক ! বলবার কিছু নেই। শ্বশুর মশাইয়ের সৎ পরামর্শে এবং শুভ ইচ্ছায়, বাবাজি চক্ষু বুজে কেবল ষ্টাম্পমারা কাগজে সই মেরে গেছেন, আর মাঝে মাঝে দু একটা "অফিসে" সই দিয়ে এসেছেন। কখনো খোজ করেন নি, শ্বশুর মশাই কিসে সই করাচ্ছেন, এমন কি—সই কর্ব্বার কাগজে কি যে সব লেখা ছিল তা পড়বার বা বোঝবার অবকাশ কখনো হয়নি ! চৈতন বাবাজি ভারি ব্যস্ত ! এই আজ অমুক থিয়েটারে নতুন "বই" প্লে হবে, তার জন্যে "বক্স" রিজার্ভ ক'র্ত্তে যেতে হবে,—এই আ "বায়োস্কোপে" নতুন 'ফিলিম' এসেছে, বৌকে নিয়ে সকাল সকাল বেরুতে হবে ! এই শীতকালে "সার্কাস" ভাল একটা এসেছে, তার "ম্যাটিনী" প্লে দেখতে হবে ! আর তা'র ওপোর—প্রতি সপ্তাহে বড়মজা—ঘোড়দৌড়ের মাঠে ! সাহেব সেজে "একচোখের" ওপোর চশমা লাগিয়ে, নোটের তাড়া নিয়ে বাবাজি "রেস" খেলতে যান ! উঃ—কি আনন্দ কি উৎসাহ—কি মজা এই ঘোড়দৌড়ের খেলাটায় ! চৈতন বাবাজি বিষয়কর্ম্ম দেখবার সময় পান কখন—বল দিকি ? "বাপের তুল্যি" শ্বশুর মশাই আছেন,—তিনি "বুদ্ধি" করে বিষয়আশয় টাকাকড়ী সব বাড়াচ্ছেন ! জামাই নিশ্চিন্তি হ'য়ে মজা মারছেন,—আর "সই" ঢালছেন্ ! ব্যস—শ্বশুরমশাই চক্ষু বুজতেই ক্রমে তাঁর কাণা চক্ষুটাও যেন অন্ধকারের ভেতর থেকে আপনি ফুটে উঠলো ! একচোখো চৈতন ক্রমে চারচোখে চেয়ে দেখতে পেলে,—শ্বশুর মশাই তাঁকে—"ভো

শূক্তে" বসিয়ে গেছেন ;—প'ড়ে মলেই হয় ! রাগের চোটে তাঁতির পো চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন—"উঃ শালার ঘরের শালা কি ভীষণ চোর !"

জামাইয়ের 'খ্যাড়া" ক'রে শ্বশুর মশাই নিজের স্ত্রী পুত্রের জন্তে বিশেষ কিছু সংস্থানও ক'রে যাননি ! ক'র্বেন কোথা থেকে ? চোর জোচ্চোরের চুরীবাটপাড়ী করা পরের ঠকানো পয়সা কি থাকবার জো আছে ? নবগোপালও বাবুয়ানি ক'রে নিজে খুব খরচ করে গেছেন ! তাঁর মর্বার পর তাঁর স্ত্রীপুত্রেরও "মেয়েজামায়ের" মতন অবস্থা ! সামান্ত দু শো পাঁচ শো যা' ছিল,—কায়ক্লেশে কোন রকমে মাস কতক চালিয়ে শাশুড়ী ঠাকরুণ জামাইকে ব'ললেন "এই-বার তুমি একটু কাজকর্ম্ম চাকরি বাকরি ক'রে মাগছেলে-দের "পিরতিপালন" কর্বার যোগাড় করো এ কলকেতায় বাড়ী ভাড়া দিয়ে থাকা তো আর চলবে না।" চৈতন মনের রাগ মনেই চেপে থাকে,—মুখে কথাটি পর্য্যন্ত বলেনা। উপায় কি ? নিজের পাঁচ ছটি ছেলেমেয়ে ! এক পয়সা রোজগার নেই ! চাকরির জন্যে কা'কেই বা বলবে, আর কার কাছে গিয়েই বা দাঁড়াবে ?

শাশুড়ী ঠাকরুণ আবার একদিন জামাইকে বললেন – 'তোমার সাতগুষ্টিকে আমি পুষবো কোত্থেকে বাছা ? আমারই ছেলেপুলেদের কে খাওয়ায়, তার ঠিক নেই ! তুমি তোমার মাগছেলে নিয়ে দেশে যাও ! আমিও বরানগরের ভিটেতে গিয়ে বসি !"

চৈতন বাবাজি নরম সুরে দু চারটে কথা ব'লে শাশুড়ীকে বোঝাতে লাগলো 'দেশে গিয়ে কোনও লাভ নেই ! এই খেনে থেকে যা হোক একটা চাকরি বাকরির চেষ্টাচরিত্ত করে দেখি !'

তিলোত্তমা মায়ের সঙ্গে একজোট হ'য়ে স্বামীকে উঠতে বসতে খুব লাঞ্ছনা গঞ্জনা অপমান তিরস্কার ক'র্ত্তে লাগলো ! চৈতন স'য়ে স'য়ে একদিন হঠাৎ নিজমূর্ত্তি ধরে স্ত্রীকে (আর ব'লতে লজ্জা করে—) সেই সঙ্গে শাশুড়ীকে বেধড়ক ঠেঙিয়ে দিয়ে স'রে পোড়লো !

• • • •

চৈতন আজ দু বছর যাবৎ দেশছাড়া। পাবনা জেলার "রাইগড়" নামে একটা ছোটখাটো ষ্টেশনে বাবাজি চৈতন পাল ষ্টেশনমাষ্টার রূপে অজ্ঞাতবাস কচ্ছেন ! অনেক কষ্টে একজন ক'লকেত্তাবাসী মহাপাত্রের সাহায্যে ২২টাকা মাইনের এই চাকরিটি তিনি যোগাড় ক'রে নিয়ে দিনযাপন ক'চ্ছেন। স্ত্রীপুত্রপরিবারের কোনও খবর চৈতন বাবাজি আর রাখেন না ! তা'রা বাঁচ্লো কি মোলো,—কি রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে,— বাবাজি সে চিন্তাকে মনের কোণেও ঠাঁই দেন না ! এমনি নির্ম্মম নিষ্ঠুর নরাধম পশু সে হতভাগা ! দিব্যি খাচ্ছে—দাচ্ছে—কাজ ক'চ্ছে—নিদ্রা দিচ্ছে ! আর ছুটি পেলে যত গেঁয়ো চাষাভূষোকে জড়' ক'রে নিজে যে একজন মস্ত বড় দরের 'লাট-সাহেব'গোছের হোমরা চোমরা, বিধিমত প্রকারে তাদের তাই বোঝাবার চেষ্টা ক'চ্ছে ! সেই একচোখে চসমা-আঁটা, সেই কোট-প্যান্ট আঁটা, সেই 'কালো কোলো' সাহেবসাজা – সেই "চার পোণে চৈতন" বাবাজি, চালচোলে-কথাবার্ত্তায়-মেজাজে-বুদ্ধিতে ঠিক সেই রকমটি আছেন ! একচুলও বদলায়নি ! অবস্থাহীনতায় বদমায়েসিটা যেন বেড়েছে ব'লেই মনে হয় ! ষ্টেশনের চাকরবাকরগুলো পর্য্যন্ত – তার ব্যবহারে – তার ওপোর হাড়ে চটা। কর্ত্তৃপক্ষীয় কেউ এলে এমন অজগরের মত কথাবার্ত্তা কয় যে, অনেক সময় তার চাকরি 'যায়-যায়' অবস্থায় দাঁড়ায় বিষ নেই কুলোপানা চক্রটুকু খুব আছে ! বিষদাঁত ভেঙে গেছে, কোঁসটুকু বাবাজি ছাড়েন নি। সত্যভূষণ কবি ঠিকই বলে-ছিল—

'চার পোণে লোকগুলো, -
কখনো হয়না ভালো !'

গাঁয়ের চাষাভুষোরা একদিন ম্যাষ্টের মশাইকে—(চৈতনকে 'রাইগড়ে' সকলে ম্যাষ্টের মশাই ব'লে ডাকতো) জিজ্ঞাসা ক'রলে – "ম্যাষ্টের মশাই ! আচ্ছা—কও দিনি,—ঐ যে পিত্যহ একটা লম্বা মস্ত জানোয়ার—বাজের মত ডাক পেড়ে রেলের ওপোর দিয়ে চ'লে যায়, ওটা কি ? আমাদের এ্যাদ্দিন দেখাতে পারো ?'

ম্যাষ্টার গম্ভীর হ'য়ে ব'ললে - 'ওটাকে বলে মেল-ট্রেণ। ও কি তোরা কখনো দেখিস নি ?'

সকলে। 'এজ্ঞে—নাষ্টারের মশাই! আমরা ওটাকে কখুনো দেকিনি। হেই মাষ্টের মশা—আমাদের অ্যাকদিন দেখা করাবে? তোমার পায়ে প'ড়ছি এই বার আমাদের নয়ান সাত্তোক করাও।' 'রাইগড়ের মত একটা অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে 'মেল ট্রেণ' থাবার কখনো কোনও সম্ভাবনা নাই। অথচ, এটা যদি চৈতন বাবাজি এই সব তাঁবেদার চাষাভুষোদের না দেখাতে পারে, তা'হ'লে তার পসার তো থাকেনা। ম্যাষ্টের ঠিক ক'রলেন 'কালই মেল ট্রেণকে রাইগড়ে থামাতে হবে!

চাষাদের ব'ললেন "আচ্ছা—আসিস কাল সকালে বেলা সাতটার সময়। বাড়ীর মেয়েছেলেদের ডেকে নিয়ে আসিস। কাল মেল ট্রেণ দেখাবো।" ম্যাষ্টেরের কথা শুনে হাতে যেন সবাই 'সাগর চাঁদ' পেলে! যথাসময়ে পরের দিন গাঁশুদ্ধু লোক ঝেঁটিয়ে এসে ষ্টেশনে উপস্থিত! 'রাইগড়ের' ষ্টেশনে 'মেল ট্রেণ এসে পোঁছুতেই ম্যাষ্টের 'সিগনেল' দিলেন। ব্যস—ট্রেণ তখুনি থেমে গেল।

গার্ড কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। মাষ্টার ব'ললেন 'তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে আমি বাধ্য নই! আমি ষ্টেশন মাষ্টার। আমি তা বুঝেছি—'মেল' থামিয়েছি!"

গার্ড হুইসেল দিলে, 'মেল' মিনিট পাঁচ সাত 'লেট' ক'রে চলে গেল।

যথাসময়ে ট্র্যাফিক ম্যানেজার (লালমুখ) সাহেব এসে ম্যাষ্টেরের কাছে কৈফিয়ৎ তলব ক'রলেন।

বুক ফুলিয়ে গম্ভীর হ'য়ে ম্যাষ্টের ইংরিজিতে কৈফিয়ৎ দিলেন—"To show my authority to the poor villagers, I have stopped the Mail Train! (হতভাগ্য গ্রামবাসীদের আমার প্রভুত্ব দেখাবার জন্যে আমি "মেল ট্রেণ" থামিয়েছি।'

শুনেই লালমূর্ত্তি সাহেব আরও রেগে লাল হয়ে চৈতন পালের গালে সজোরে বিরেশী সিক্কের ওজনে এমন একটি "চড়" মারলেন—'চার পোণে' চৈতন বাবাজি একেবারে তার ধমকে ষ্টেশনের প্লাটফর্মে বসে গিয়ে 'পপাত'! কিন্তু 'মমার' নয়! বাবাজি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন, তখুনি তখুনি ডিস্‌মিস্ হ'লেন।—মাথার টুপি আর ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে তুলে নিলেন,—বড় সাহেবকে একটা ভক্তিভরে 'সেলাম' ঠুকলেন—আর সুড় সুড় ক'রে সিধে গ্রাম্যপথ ধ'রে অদৃশ্য হ'লেন। চড় খেয়ে কাণের ভেতর যেন ভোঁ ভোঁ ক'র্ত্তে লাগলো,—আর কেবল যেন মনে হ'তে লাগলো—দেরকো-পিদিম গাঁয়ের ছেলেরা সবাই সুর ক'রে ব'লছে——

"চার পোণে চৈতন!
চার পোণে নাবে না—
হাতে রইল কিছু না!"

জয়যাত্রা

[শ্রীগৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, বি-এল]

আজকে আমি পণ করেছি—
নেবো, নেবো তোমার ও মন !
বুকের কঠিন দুর্গে, তারে
রাখো তা' সে যতই গোপন।
অস্ত্র তোমার শাণিয়ে নে'নাও,
ডরিনে তোয়, করিনে ভয় !
সশস্ত্র আজ আমিও, জেনো,
সে-অস্ত্রে মোর হবে বিজয় !
নয়ন দুটী ভরো তোমার
রুদ্র কঠোর ভৎর্সনাতে,
ঢাকো তোমার অঙ্গ কঠিন
বিমুখতার বর্ম্মপাতে,
মুখের পুরুষ বচন কঠিন
কর আরো কঠিনতর,
গণ্ডী মানের দীর্ঘ হতে
দীর্ঘ আরো যতই কর,—
আমার প্রাণের আকুলতা,
আমার বুকের মিনতি এ,
আমার মুখের মৌন ভাষা
করুণ কাতর চাহনি যে,
হতাশ প্রাণের দীর্ঘ নিশ্বাস,
বাষ্পে নয়ন ছল-ছল,—
এদের পাশে থাকবে, তুমি
ভাবচো, অটল, অচঞ্চল ?
নয়নেরি ভৎর্সনা ওই
পড়বে ফেটে হাজার ধারে,
পরুষ ভাষা, হবে কোমল
দরদ্-গলা সুর-বাহারে !
মান-অভিমান ভুলবে সবি ;
বুকে বেদন উঠবে বেজে
বিমুখতার বর্ম্ম থেকে
পড়বে খসি' নিঃশবে যে !
হায় জেনে কি করবে তখন,—
স্পষ্ট দেখি—নয়কো ভুল
বিবশ হয়ে কোমল তনু
আমার বুকে পড়বে ঢুলে !
কাতর গদগদ ভাষ
অশ্রু-সজল ও দুই আঁখি,—
ভাবচো, তখন মর্জ্জিনাতে
তোমায় আমি ছাড়বো না কি !
বন্দী করি' বাহু-বন্ধে
রাখবো তোমায় বন্দি-কারায়,
তিলেক ছাড়া পাবে না গো
পাবে না গো পাবে না তায় !
অধর তোমার অধর হতে
সুধার রাশি নেবে লুটে
বিকল-করা আবেশ, তোমার
মাখিয়ে দেবো নয়ন-পুটে !
প্রেমের এমন মধুর ভাষা
বলবো তোমায় শ্রুতির মূলে
সরমে দুই কপোল বয়ে
রাঙা কমল উঠবে দুলে !
প্রীতির কুসুম নিত্য নতুন
তোমার পায়ে করবো জড়ো—
কেমন করে ঠেলবে সে সব ?
দেখবো কেমন শক্তি বড় !
ওই বাহুতে গাঁথবে মালা,
আমার গলে পরাবে সে—
আনমনা সে কোন্ ক্ষণে গো
সোহাগ-ভরে স্নিগ্ধ হেসে !